রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিক সংখ্যা
CUK – No 1850-2-242330
৭৫০.০৭৭.৪৭ (2)

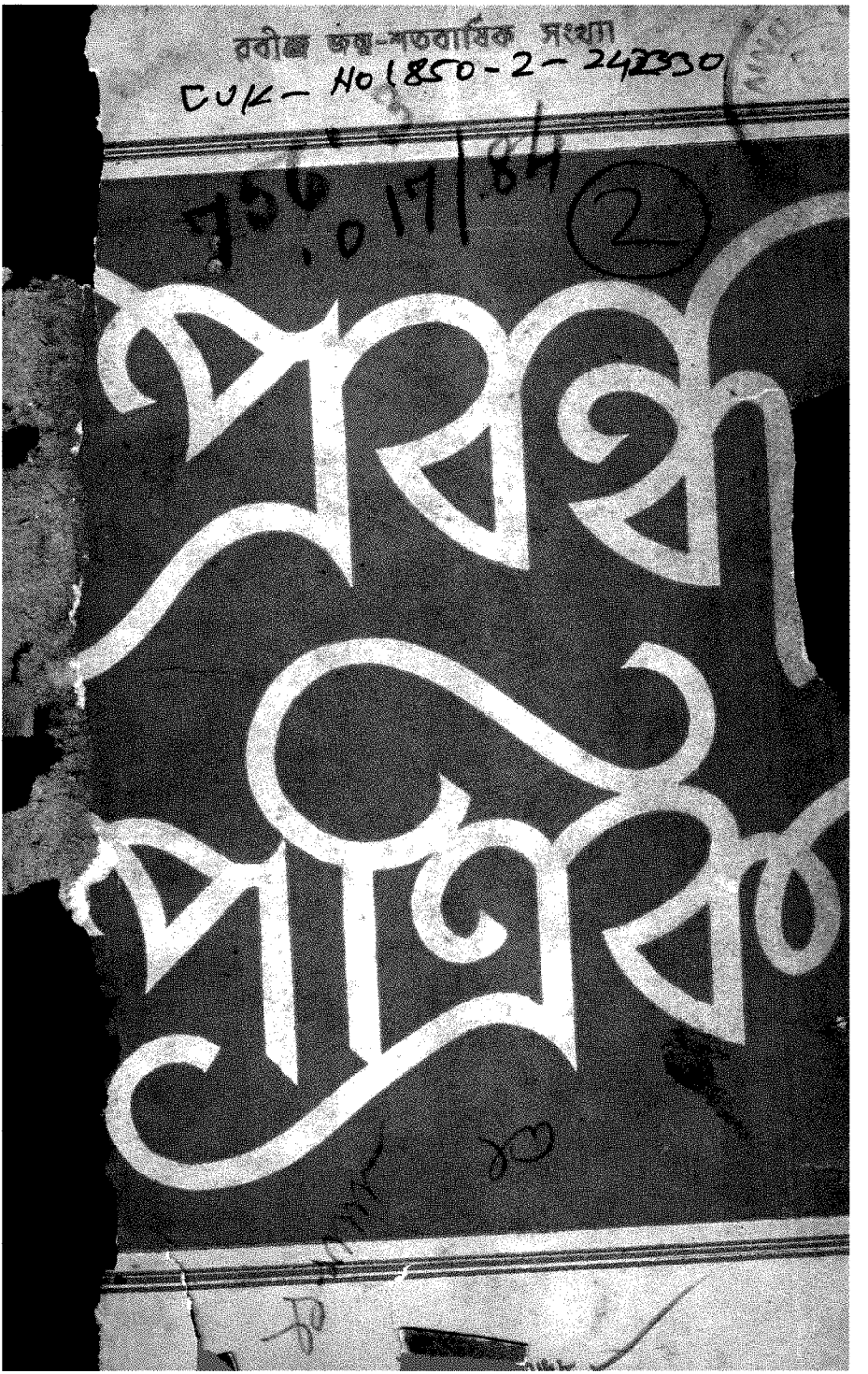

সদ্য প্রকাশিত ঃ

ডক্টর সুকুমার সেনের

বি চি ত্র নি ব ন্ধ ৬·০০

কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধের সমাবেশ। গ্রন্থখানি নিঃসন্দেহে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে অমূল্য সংযোজন। প্রতিটি গ্রন্থাগারে স্থান পাবার যোগ্য বই।

আমাদের অন্যান্য বই ঃ

সজনীকান্ত দাসের

রবীন্দ্রনাথ

জীবন ও সাহিত্য ৬·০০

শিবনারায়ণ রায়ের

নায়কের মৃত্যু ৪·৫০

শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ ৬·০০

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের

আকাশ নন্দিনী ৩·৫০

গ্র্যাণ্ড হোটেল ৬·০০

রাত্রির বয়স ৩·৫০

রমেশচন্দ্র সেনের

কাজল ৬·০০

নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ ২·৫০

সুশীলকুমার ঘোষের

গ্রহ সারথী ৬·০০

গৌরকিশোর ঘোষের

জলবত্তরলম্ ৩·০০

শতাব্দী গ্রন্থ-ভবন ঃ ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭

প্রবন্ধ পত্রিকা

রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিক সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৬৮ (১৮৮৩ শকাব্দ)
দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

সূচীপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ১—১০ ॥ অপ্রকাশিত পত্র
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ১১—১২ ॥ অপ্রকাশিত কবিতা
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ॥ ১৩—১৬ ॥ পাঁচজন লেখক
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ ১৭—২০ ॥ 'আমায় হয়তো করতে হবে আমার লেখার সমালোচন'
সুধীর করণ ॥ ২১—২৫ ॥ রবীন্দ্রনাথ ও কুন্তক
দেবীপদ ভট্টাচার্য ॥ ২৬—৩২ ॥ 'অচলায়তন'
বিপিনচন্দ্র পাল ॥ ৩৩—৪৮ ॥ রবীন্দ্রনাথ
শান্তি সিংহরায় ॥ ৪৯—৬১ ॥ "নামে বাঁধিবারে চাই, না মানে নামের পরিচয়"
আনন্দ দে ॥ ৬২—৬৬ ॥ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এজরা পাউণ্ড
মৃণালকান্তি ভদ্র ॥ ৬৭—৮০ ॥ রবীন্দ্রদর্শনে বিবর্তন
আঁদ্রে জীদ্ ॥ ৮১—৯২ ॥ ফরাসী গীতাঞ্জলির ভূমিকা
হরপ্রসাদ মিত্র ॥ ৯৩—৯৯ ॥ রবীন্দ্রনাথের গল্পরচনা
সত্যজিৎ চৌধুরী ॥ ১০০—১১৫ ॥ রবীন্দ্রনাথের নাটক : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ
ভাস্কর বসু ॥ ১১৬—১৩৬ ॥ অভিজ্ঞতার নদীতীরে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ॥ ১৩৭—১৪১ ॥ রবীন্দ্রনাথের জাতিচেতনা
বিজিত কুমার দত্ত ॥ ১৪২—১৪৬ ॥ দুটি সমালোচনা
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ॥ ১৪৭—১৫৩ ॥ রবীন্দ্রনাথ, অপরাজেয় পথিকৃৎ
রথীন্দ্রনাথ রায় ॥ ১৫৪—১৬০ ॥ রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত'
॥ ১৭১—১৭৯ ॥
আদিত্য ওহেদেদার ॥ ১৬১—১৬৮ ॥ রবীন্দ্রদৃষ্টিতে 'কল্পনা'
নিখিল চক্রবর্তী ॥ ১৬৯—১৭৬ ॥ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার

সম্পাদনা

রামেন্দু দত্ত চিত্তরঞ্জন ঘোষ

প্রবন্ধ পত্রিকা

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় রবীন্দ্র-কথাসাহিত্য সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ প্রবন্ধ থাকবে ঃ

সরোজ আচার্য ঃ চার অধ্যায়
হরপ্রসাদ মিত্র ঃ চোখের বালি
রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত ঃ উপন্যাসে আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ
বিজিতকুমার দত্ত ঃ রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক উপন্যাস
কার্তিক লাহিড়ী ঃ চতুরঙ্গ
অরবিন্দ ভট্টাচার্য ঃ রবীন্দ্রনাথের শেষ গল্প
সুনীল চক্রবর্তী ঃ তিন সঙ্গী
আর. পি. ভাস্কর ঃ ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ

এবং

এ ছাড়াও থাকবে
রথীন্দ্রনাথ রায়ের 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধের উত্তরাংশ
ও
বাসব সরকারের প্রবন্ধ—রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা

আষাঢ় সংখ্যায় কয়েকটি বিশেষ প্রবন্ধ থাকবে
রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্পর্কে।

Gram : GRAFOSOL

Phone : 22-6861—70
(10 lines)

FOR

PAINTS, VARNISHES & DRY COLOURS

Best Colours
Most Dazzling
Long Lasting

THE INDIA PAINT COLOUR & VARNISH
Co. Ltd.

Secretaries & Treasurers—

BANGUR BROTHERS

14, Netaji Subhas Road, Calcutta-1

অপ্রকাশিত পত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১)

(আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের সহধর্মিনী শ্রীযুক্তা কিরণবালা সেনকে লিখিত।)

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্বকনিবেদন—

আমার বিজয়ার অভিবাদন গ্রহণ করিবেন।

সমস্ত দেশের যে চিত্তবিক্ষেপ ঘটিয়াছে স্বভাবের নিয়মেই তাহার প্রতিক্রিয়া ঘটিবে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াতেও উদ্‌ভ্রান্ত করে। কিন্তু আমার শক্তি নাই পথ দেখাই। আমি অকর্মণ্য, কর্মক্ষেত্রে নামিলে আমি স্বধর্মভ্রষ্ট হই, সুতরাং দেখিতে দেখিতে তাহা ভয়াবহ হইয়া উঠে। আমার ক্লান্ত মন চারিদিক হইতে প্রতিহত হইয়া এখন বাল্যকালের মধ্যে ফিরিয়া গেছে; সেইখানে বসিয়া ছন্দের খেলা পাতিয়াছি। বাল্য হইতে বাল্যে ফিরিলে তবেই জীবনের প্রদক্ষিণ কার্য সমাপ্ত হয়—সেই সমাপ্তির জন্য আমার চিত্ত উৎসুক হইয়াছে। বিধাতা যদি দায়িত্ব বর্জন করিবার অধিকার আমাকে দেন তবেই আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

অধ্যাপক লেভির পত্র পাইয়াছি তিনি আসিবেন কার্তিকের শেষে।

ইতি—৩১শে আশ্বিন, ১৩২৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২)

(আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা কিরণবালা সেনকে লিখিত।)

ওঁ

Dartingson Hall

কল্যাণীয়াসু Tosnes

কিরণ, আমার জন্মদিনে তোমরা যে চিঠি লিখেছিলে সেটা আজ পেলুম। এতদিনে আশ্রমের আকাশে আষাঢ়ের ঘনঘটা। দূরের থেকে যেন ধারাবর্ষণের শব্দ শুনতে পাচ্চি, আর কল্পনায় অনুভব করচি ভিজে বাতাসে মালতী ফুলের গন্ধ। যখন যাত্রা করে বেরিয়েছিলুম মনে ছিল ছুটির পরে ফিরব—কিন্তু প্রবাসের মেয়াদ বেড়ে চলেচে। যেহেতু এবারে বিশ্বভারতীর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়েছি—বন্ধুরা বলচেন অক্টোবরের পূর্বে আমেরিকায় ধনী গৃহস্থদের পাওয়া যাবে না। অপেক্ষা করতেই হবে। কারণ অর্থাভাবে আমাদের সমস্ত সংকল্প অনিশ্চয়তার স্রোতে ভেসে বেড়ায় কূল পায় না—তল পাবার সম্ভাবনাই বেড়ে ওঠে। অর্থকৃচ্ছ্রের দীনতা সবচেয়ে স্থূল এবং হীন দীনতা—অন্নব্রহ্ম বিমুখ হলে অধিকাংশ লোকের পক্ষেই আত্মশ্রদ্ধা বিমুখ হয়ে যায়, তখন পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ কলুষিত হতে থাকে। ভিক্ষার কাজ আমার নয় কিন্তু সকলের হয়ে ভিক্ষা আমি ছাড়া আর কে করবে? কত অপরিচিত ধনীর দ্বারে কত বাক্যজাল বিস্তার করতে হবে—তাদের দিক থেকে কত প্রশ্ন কত সংশয়, আমার দিক থেকে নতি-স্বীকার। অর্থশালীরা স্বভাবতই অর্থের সার্থকতা হিসাব করে। নিজের ভাণ্ডারে তাদের যে টাকা সঞ্চিত সেটাকে বিবিধ উপায়ে সুরক্ষিত করে তবে তারা নিশ্চিন্ত হয়—পরের ভাণ্ডারেও যখন তাদের উদ্বৃত্তের এক অংশ যায় তখনও সেটা সুরক্ষিত হোলো কি না এ উদ্বেগ তাদের মনে থাকে। যদি বা আমার বর্তমানকে তারা বিশ্বাস করে আমার অবর্তমানকে তারা শূন্য বলেই জানে—তখন কি হবে এ প্রশ্ন তাদের মনে জাগে। এ কথা মনে করতে পারে না যা দিয়েছি তার পরে আর আসক্তি রাখা উচিত নয়। আমাকেই যারা ভালোবেসে সম্পূর্ণ আগ্রহে দিতে পারে তাদের দান সম্বন্ধে আমার মনেও কোনো সঙ্কোচের কারণ থাকে না। কিন্তু বিশ্বভারতীর নাম করে যখন বিশ্বের দ্বারে দাঁড়াই তখন দানকর্তার যে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় সে উত্তর

আমি নিজেই জানি নে। তারা থলির বন্ধন মোচন করবার পূর্বেই নীরবে বা সরবে জিজ্ঞাসা করে বিশ্বভারতী দেশে ও কালে ভাবে ও রূপে কতখানি সত্য। কেমন করে বলব? আমার ইচ্ছা ও আমার চেষ্টার মধ্যে যে সত্য আছে তাই আমি কিছু কিছু জানি—কিন্তু তার বাইরে কিছুই জানি নে। জানি বাধা বিস্তর আছে। আমার অবর্তমানে সে বাধা ক্ষয় হবে কি বাড়বে কেমন করে বলব? আমাদের শুভইচ্ছাকে চিরস্থায়ী করতে চাই। সে আমাদের লোভ। শতসহস্র লোকের ইচ্ছার উপর তার স্থায়িত্ব নির্ভর করে। না, ঠিক বললুম না, অল্পলোকের সত্য ইচ্ছার পরেই তার স্থায়িত্ব। অর্থাৎ পরিমাণের উপরে নয়, সত্যতার উপরে। কিন্তু সত্যই সবচেয়ে দুর্মূল্য—নানা প্রলোভন দিয়ে দল বাড়ানো যায় কিন্তু সত্য তাতে বাড়ে না। আমার বিপদ হয়েচে তাই—অর্থের প্রয়োজন আমি বুঝি। কিন্তু সে প্রয়োজন বাহ্য প্রয়োজন। যে পদার্থ আপনাতেই আপনি সার্থক সব ছেড়ে তারই জন্যে যদি একান্তভাবে তপস্যা করতুম তাহলে বাহ্য সফলতার দৈন্যের দিকে তাকিয়ে কোন লজ্জা বা দুঃখের কারণ থাকত না। তার সাধনা ও তার সিদ্ধি আমার নিজের ভিতর থেকে। কিন্তু অন্য সমস্তর জন্যে যে প্রয়োজন আছে তাকে বাইরে থেকেই মেটাতে হয়। গোড়া থেকেই যদি তার জন্যে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করতুম তাহলে আজ এতবড় দুশ্ছেদ্য দৈন্যজালে আমাকে জড়িত হতে হ'ত না। যাই হোক ভিক্ষা আমাকে করতেই হবে এবং ভিক্ষুককে অন্যের সময়েরই অপেক্ষা করতে হয়। এই মনে করে আমার মনে আক্ষেপ জন্মে যে আমার তো সময় বেশি নেই। এইটুকু সময়ও আমি সম্পূর্ণ ভাবে পাব না। কাজ করে অনেক সময় নষ্ট করেছি—বেলা শেষের বাকি সময়টুকু ভোগ করে সার্থক করতে ইচ্ছা করে। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, আমার ভোগ সৃষ্টিতে—সে সৃষ্টিকে বুদ্ধিমান লোক সৃষ্টিছাড়া বলেই জানে—বলে সময় নষ্ট করা। কিন্তু আমি বলি, তেমনি করেই সময় যদি নষ্ট না করি তাহলে সময় আমাকে নষ্ট করবে। বিধাতা অনাদি অনন্তকাল এমনি নষ্ট করেই আসচেন নিজেকে সার্থক করবার জন্যেই—তিনি নিরন্তর সৃষ্টি করে আসচেন কিন্তু সৃষ্টি ব্যতীত তার আর কোনো অর্থই নেই।

ইতি—৬ই জুন, ১৯৩০

তোমাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩)

[শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবীকে লিখিত]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তোমার কবিতাটি যখন আমার হাতে পৌঁছল তখন আমি দার্জিলিং এবং আমার শরীর একেবারেই ভাল ছিল না। তাই মনের মতো করে তোমাকে জবাব দিতে পারিনি। তোমার লেখাটিতে তুমি যেমন হেসে নিয়েছ, আমার জবাবে আমিও তার পাল্টা হাসি হাসব এইটেই উচিত ছিল। আমি স্বভাবতঃ হাসতে ভালইবাসি। কিন্তু তার উল্লাস আজ কাল মরে আসবে বুঝিবা। তা-নাহলে তোমার কাছে হার মানতুম না।

আশঙ্কা আছে তুমি ভাববে আমি রাগ করেছি। রাগী মেজাজ আমার একেবারেই নয় তাছাড়া রাগ করবার কোন উপলক্ষ্য ঘটেনি। তোমার লেখাটির রস আমি উপভোগ করেছি তাতে মনে সন্দেহ রেখোনা। রাধারাণীকে বোলো, সে আমার জীবনী লিখবে বলে শাসিয়ে গেছে কিন্তু সে যেন কল্পনা না করে যে আমি আপন গাম্ভীর্য রক্ষা করবার উপলক্ষ্যে হাসবার বেলায় হাসি চেপে রাখি। তোমার চিঠি পড়ে রাগ যেন না করি সে আমাকে এই অনুরোধ করেছিল। তার থেকে মনে হয় আমাকে সে যাত্রার দলের ঋষি তপস্বীর শ্রেণীতে গণ্য করে থাকে। ইতি—৪ জুলাই, ১৯৩১।

শুভাকাঙ্ক্ষী—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৪)

(নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত)

ওঁ

সুরুল

বোলপুর

বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আমার অবস্থাটা একটু বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিবেন। আমি যে কাজে অক্ষম হইয়াছি তাহা নহে। কিছু না কিছু কাজ চলিতেছেই— এমন কি সভার বক্তৃতাও করিতে হয় ও হইবে। কিন্তু দিনে বারো

ঘন্টার মধ্যে নাওয়া খাওয়া বাদে অন্তত আট ঘণ্টা আমাকে নিভৃতে মেরুদণ্ডটাকে তাকিয়ার পরে সটান করিয়া দিয়া পড়িয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। পড়িয়া পড়িয়া যাহা করা যায় সেরকম কাজের ত্রুটি নাই। সুতরাং কলম ও রসনা কিছু কিছু চলিতেছে—অবশ্য পুরা দমে নয়। আপনাদের উৎসবে যোগ দিতে হইলে কলিকাতায় ভোরের বেলায় আয়োজন সুরু করিতে হয়। তারপর সমস্ত দিনই কতক পথে—কতক সভায়—নাড়াচাড়া করিয়া সন্ধ্যার পর বাড়ি ফেরা ছাড়া উপায় নাই। কাজ অল্প কিন্তু তার ঝাঁকানি অত্যন্ত বেশি। এইরূপ বারো ঘণ্টার নিরন্তর ধাক্কা সামলাইবার মত শক্তি আমার মজ্জায় নাই। এক সময়ে যুবা ছিলাম—তখন যদি আপনাদের নিমন্ত্রণ পাইতাম তবে ডাক্তার বৈদ্য কারো শাসন মানিতাম না—কিন্তু এখন কিছু বিলম্ব হইয়া গেছে। এখন আমার মেরুদণ্ড আমার অধীন নয়, আমিই তার অধীন। যদি দক্ষিণ হাওয়ায় পাল তুলিয়া আপনাদের চূর্ণী নদী বাহিয়া বাংলার মহাকবির ভিটায় এই ক্ষুদ্র গীতিকবির নৌকা ভিড়িতে পারিত তবে সেখানে আমি দুই তিন ঘণ্টা রসনা চালনা করিলেও কাবু হইতাম না—কিন্তু সমস্ত দিন পথের মার খাইয়া পনেরো মিনিট কালও আমার পক্ষে এক যুগের সমান হইবে। অতীতকালের মহাকবি এখন চির-বিশ্রামে আছেন। ক্লান্ত মেরুদণ্ডের জন্য তাঁহাকে ভাবিতে হয় না, বর্তমানকালের গীতিকবির সেই মস্ত আরামের শয্যাটা এখনো জোটে নাই অথচ আরামের প্রয়োজন একান্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই বিপদে পড়িয়াই কবির স্মৃতিকে দূর হইতে প্রণাম করিতে হইল—একদিন যখন দুই কবির মোকাবিলা হইবে তখন নিকট হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারিব—ইতিমধ্যে আপনারা যুবক-কবি ও কমীর দলে মিলিয়া তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া করিয়া তুলুন।। ইতি—১৪ই ফাল্গুন।

জরাজীর্ণ—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৫)

(শ্রীযুক্তা হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত)

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

বাসন্তী ফুলের খবর জান্‌তে চেয়েছ, ভাষায় বর্ণনা করে জানাবার উপায় নেই। একটি ফুল চিঠির মধ্যে পাঠালুম—কিন্তু ডাকঘরের দলনে পিষ্ট হয়ে যখন তোমাদের হাতে পৌঁছবে তখন নিষ্ঠুর শাশুড়ীর পীড়নে অবসন্ন নববধূর মতো ওর পরিচয় ক্লিষ্ট হয়ে যথার্থ আত্মপ্রকাশ করতে পারবে না! বসন্তের প্রথম সমাগমের আমন্ত্রণে এই ফুল আমার বাগানে গাছ ভরে ফুটে উঠেছে—এর কচি পাতাগুলি সিঁদূরে বরণ, তারি স্তরে স্তরে সোনার রঙ-এর অজস্র ফুল যেন বসন্তের বীণায় বাহার রাগিণীর ঝঙ্কার লাগিয়েছে। বাতাসে দিয়েছে সুগন্ধের মীড়। এই সময়টাতেই আর এক জাতের সাদা ফুল গোল গোল মঞ্জরীতে শাখার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, এখানকার লোকের কাছে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলে—বুনোফুল নাম জানা নেই। আমরা সেই অনাদৃত জঙ্গল থেকে আনিয়ে কিছুকাল আগে বাগানে লাগিয়েছিলুম এখন তার পুরস্কার পাচ্ছি। সৌন্দর্যে ও সৌগন্ধে বহুদূর পর্যন্ত কৃতজ্ঞতা বিস্তার করেছে, আমি এর নাম দিয়েছি বনপুলক। এর গুচ্ছ কতকটা রঙন ফুলের মতো, কিন্তু এ অন্য জাতের এর গন্ধ কোমল অথচ ব্যাপক। এরা বসন্তের প্রথম দূতী, ঋতুরাজের আগমন ঘোষণা করেই রঙ্গভূমি ত্যাগ করে নেপথ্যে চলে যায়। এরা যেন নাটকের নান্দীর মতো—দুটি একটি শ্লোকেই কাজ সেরে এরা বিদায় গ্রহণ করে, এদের আর একটি সহচরী আছে, সে মাধবী। দেখা দেয় শাখায় শাখায় মঞ্জরিত হয়ে, বেশি দিন থাকে না, বধূ যেন শ্বশুর বাড়ীতে এসেই বাপের বাড়ীতে ফেরবার জন্যে উতলা হয়ে ওঠে। তার একটি ফুল শীত ফুরোতে না ফুরোতে আমার বাগানে দেখা দিয়েছে, সে কাঞ্চন, তার প্রগল্‌ভতার অন্ত নেই, সমস্ত গাছ যেন মুখরিত করে সে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠেছে। বনভূমিতে সকলের আগে সেই চোখে পড়ে। আমাদের শালবীথিকা দেয় বসন্তের শেষ বিদায় অঞ্জলি, তরুতল

বিকীর্ণ করে দেয় ঝরা পাপড়িতে, দক্ষিণ বাতাসের পথে প্রসারিত করে দেয় সৌরভের আস্তরণ। আর এই সঙ্গে আছে আমের মুকুল, তার তর সয় না, মাঘের সুরু থেকেই সে অভিসার আরম্ভ করে, এবার শিলাবৃষ্টিতে আর কুয়াশায় সে মুহ্যমান হয়ে গেছে, মৌমাছিদের নিমন্ত্রণের আসর জমল না।

রথী ও বৌমা ভুবনেশ্বর থেকে ফিরেছেন। সেখানে ভালো ছিলেন। আমিও যাব সঙ্কল্প করেছিলুম, হয়ে উঠল না, বহুকাল পূর্বে একবার গিয়েছিলুম—খুব ভালো লেগেছিল—পুরীর চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। ইতি—৮ই মার্চ ১৯৩৪

দাদা

পুঃ রবীন্দ্র সঙ্গীত শেখাবার লোক পেয়েছ শুনে ভীত হলুম—সে রকম লোক কলকাতায় আছে বলে জানিনে, বিকৃত করে শেখাবে, তোমার মেয়েকে এখানে পাঠিয়ে দাও—রবীন্দ্রসঙ্গীতে ওস্তাদ করে দেবো। কিন্তু নজরুলের গান আমরা জানিনে।

(৬)

(শ্রীযুক্তা হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত)

কল্যাণীয়াসু, ওঁ

বারান্দায় বসে সন্ধ্যার সময় সুনন্দা সুধাকান্ত ও ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রীকে মুখে মুখে বানিয়ে একটা দীর্ঘ গল্প শুনিয়ে তার পরে বাদলা বাতাস ঠাণ্ডা বোধ হওয়াতে ঘরে গিয়ে কেদারাতে বসেছিলুম, শরীরে কোনো প্রকার কষ্ট বোধ করি নি, অন্তত মনে নেই; কখন মূর্ছা এসে আক্রমণ করল কিছুই জানিনে, রাত ৯টার সময় সুধাকান্ত আমার খবর নিতে এসে আবিষ্কার করলে আমার অচেতন দশা. পঞ্চাশ ঘণ্টা কেটেছে অজ্ঞান অবস্থায়, কোনোরকম কষ্টের স্মৃতি মনে নেই, ইতিমধ্যে ডাক্তার এসে রক্ত নিয়েছে, গ্লুকোজ শরীরে চালনা করেছে। কিন্তু আমার কোন ক্লেশ বোধ ছিল না, জ্ঞান যখন ফিরে আসছিল তখন চৈতন্যের আবিল অবস্থায় ডাক্তারদের কৃত উপদ্রবের কোন অর্থ বুঝতে পারছিলুম না। দীর্ঘকাল পরে মন মোহমুক্ত হোলো। তোমরা দূরে বসে আমার রোগের যেসব বিভীষিকা কল্পনা করছিলে তার সমস্তই অমূলক, রোগের আকস্মিক আবির্ভাব হয় তো সাংঘাতিক কিন্তু তার আদি অন্তে মধ্যে লেশমাত্র দুঃখ আমি পাইনি।

একটা সুবিধা এই হয়েছে সংসারের হাজার রকম দাবী থেকে নিষ্কৃতি নিতে পেরেছি। প্রতিদিন চিঠি আসবে ঝাঁকে ঝাঁকে, কেউ চায় প্রবন্ধ, কেউ চায় তাদের কোনো অধ্যবসায়ের জন্যে আশীর্বাণী। কেউ চায় তার মেয়ের জন্যে নাম, কেউ চায় কোনো দার্শনিক বা সাহিত্যিক সমস্যার সদুত্তর—তাছাড়া রচনার অভিমত—কারো আর ত্বর সয় না। আগে হলে নিরুত্তরে বসে থাকতে দুঃখ বোধ হত। এখন কর্তব্যবুদ্ধিতে পীড়া দেয় না, কিছু-কালের জন্যে মৃত্যুদূত এসে আমার ছুটির পাওনা পাকা করে গিয়েছে। মনে করচি আমার ভীষ্মপর্ব শেষ হোলো—অনবরত তচ্ছদাবীর শরবর্ষণ আজ থেকে ব্যর্থ হবে—স্বর্গারোহণপর্ব পর্যন্ত এই রকমই যেন চলে এই আমি কামনা করছি।

তুমি বৃথা কল্পনায় মনকে পীড়িত করেছিলে, সেইজন্যে আসল খবরটা—তোমায় জানালুম। ইতি—৯।১০।৩৭

দাদা

॥ অপ্রকাশিত পত্র

(১)

[শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষকে লিখিত]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

চলতি বাংলার বানান সম্বন্ধে প্রশান্ত বিধান নিয়েছিলেন সুনীতির কাছ থেকে। নিয়মগুলো মনে রাখতে পারি নে, অন্যমনস্ক হয়ে হাজারবার লঙ্ঘন করি। সেইজন্যে অসংগতি সর্বদাই দেখা যায়।

যেহেতু বাংলা অক্ষরে বিদেশী কথা সর্বদাই লিখতে হচ্চে সেইজন্যে অনেক নূতন ধ্বনির জন্যে নূতন অক্ষর রচনা করা আবশ্যক—আমাদের মনটা অত্যন্ত সাবেককেলে বলে শীঘ্র এর কোনো কিনারা হবে বলে বোধ হয় না।

প্রাকৃত বাংলার প্রভাব বাংলা সাহিত্যে বেড়ে চলেচে কিন্তু ভাষার এই যুগান্তরের সময় হাওয়াটা এলোমেলো ভাবেই বইবে। এ সময়কার কর্ণধারের কাজ সুনীতির নেওয়া উচিত—আমার বয়স হয়ে গেছে।

প্রাকৃত বানানের বিধি বিধান মনে রেখে প্রুফ সংশোধনের দায়িত্ব নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব বলেই অন্যদের হাতে সে ভার পড়েচে—সেই অন্যরাও নানাবিধ মানুষের মধ্যে বিভক্ত সেই কারণেই উচ্ছৃংখলতার অন্ত নেই। ইতি—১৯শে ভাদ্র, ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

টীকা

৩নং চিঠিটি কবি লিখেছিলেন অপরাজিতা দেবীকে চিঠির মধ্যে রাধারাণী দেবীর উল্লেখ আছে—তিনি জানতেন না যে অপরাজিতা দেবী রাধারাণী দেবীরই ছদ্মনাম। কবি তাঁর জীবনে জেনে যেতে পারেন নি যে অপরাজিতা দেবী তাঁরই পরমভক্ত শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী। শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবীর নিজের ভাষায়ঃ—

"বারো বৎসর আপনাকে অপ্রকাশিত রাখার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ছদ্মনামে ও ছদ্ম পরিবারে এই পরীক্ষায় অতি সাবধানে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। পরীক্ষা কালে আমি অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি ....

....নতুন লেখকের সামনে তার লেখার দাম দেবার সময় অধিকাংশ সময়েই 'কবির ভাষায়' "যারা বিজ্ঞ লোক তারা হাতে রেখে কথা বলে" এ কথাটি অতি সত্য।

আমি আমার ঘনিষ্ঠ সখী "অপরাজিতা দেবীর" কবিতার অবাধ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও নির্বোধ নিঃসংকুচিত নিন্দা আমারই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধুবান্ধব এবং রসজ্ঞ সাহিত্যিকদের মুখে শোনার সুযোগ পেয়েছি। আমিই সে কবিতার রচয়িত্রী প্রকাশিত থাকলে, যা আমার নিজের পক্ষে জানা, কখনই সম্ভব হত না। প্রশংসাবাদীরা হাতে রেখে প্রশংসা করতেন—নিন্দাবাদীরাও ঠিক তাই করতেন স্বচ্ছন্দেই।"

৪ নং পত্র ১৩২৬ সালের ফাল্গুন মাসে ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ৺রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত কবিগুরুর পত্র—অনাদিনাথ চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

প্রথম চারখানি পত্র রানাঘাট রবীন্দ্র শতবার্ষিকী কমিটির স্মারক গ্রন্থের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৫নং ও ৬নং পত্র শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরীর সৌজন্যে মুদ্রিত।

কলিকাতা ৭০নং আঞ্চলিক রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উৎসব পরিষদ সংকলনের মাধ্যমে প্রাপ্ত।

৭নং পত্র শংখ ঘোষের সৌজন্যে মুদ্রিত।

অপ্রকাশিত কবিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১)

বর্ষণ হোলো বটে শান্ত,
পাণ্ডুর কৃশ মেঘ ক্লান্ত;
বন ছেড়ে মনে এলো নীপরেণু গন্ধ
অধিকার করে নিল কবিতার ছন্দ।

১৯শে ভাদ্র
১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২)

জন্মের দিন করেছিল দান
তোমারে পরম মূল্য
রূপমহিমায় হলে মহীয়ান
সূর্য্য তারার তুল্য।
দূর আকাশের পথে যে আলোক
এসেছে ধরার বক্ষে
নিমেষে নিমেষে চুমি তব চোখ
তোমারে বেঁধেছে সখ্যে।
দূরযুগ হতে আসে কত বাণী
কালের পথের যাত্রী
সে মহাবাণীরে লয় সম্মানি
তোমার দিবস রাত্রি।

১৯শে ভাদ্র
১৩৪০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

* আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মহাশয়ের দৌহিত্রী ও শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী সুনীপা সেনের জন্মদিনে উপহার এই দুটি কবিতা।

(৩)

বয়সের সাথে দেখি
বুদ্ধিটি অসমা,
তরুণের আঁখিপরে
প্রবীণের চশমা।
যারা প্রতিকূল তারা
হয়নি বিপক্ষ
কৃষ্ণ রাতের চাঁদে
অরুণের সখ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী রেবা গুপ্তার অটোগ্রাফ খাতায় লিখিত।

কবিতা তিনটি রানাঘাট রবীন্দ্রশতবার্ষিকী কমিটি প্রকাশিত স্মারক-গ্রন্থের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

পাঁচজন লেখক

ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সত্যকার প্রতিভাশালী লেখকদের তুল্যমূল্য বিচার চলে না, কেবল তাঁদের গুণাবলীর একটা খসড়া করা হয়ত যায়। তাই থেকে যার যা ইচ্ছা বিচার করা কিছুটা সম্ভব, কিন্তু সে-বিচারের কোনো প্রকৃত মূল্য থাকে না। মহাপুরুষ কি মহামানবের বেলা আরো বিপদ, সেখানে বিচার সম্পূর্ণ নিরর্থক। তাই মনে হয় দান্তে, সেক্সপীয়ার, গ্যেটে, টলষ্টয় ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একত্রে পুংখানুপুংখ আলোচনা চলে না, কেবল অবশ্য প্রত্যেকের বিষয় নিরিখ করা যায়। তবু একটা কোথায় বাধা সৃষ্টি করে; বিচার অচল, কিন্তু অজানিতে, এবং জানিত অবস্থায়ও, ভাল-মন্দর কথা মনে আসে, এমন কি পরীক্ষার জন্য মন তৎপর হয়ে ওঠে। এটা এক হিসেবে গণতন্ত্রের আশীর্বাদ; কিন্তু গণতন্ত্রকে বাদ দেওয়াও যায় না। এ-ছাড়া অন্য-এক হিসেব আছে, তার নাম তুলনামূলক বিচার, আলোচনা। তারও পিছনে আসছে শুদ্ধ-সাহিত্য। সাহিত্যের বোধ হয় এই একটা থিওরী আছে, এবং আজকাল তৈরী হচ্ছে। আমি অবশ্য নিতান্ত সাধারণ ভাবেই এই সব কথা বলছি। এঁদের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নিতান্ত কম, কিন্তু সেই স্বল্প জ্ঞান সত্ত্বেও, মনে হয়, যতটুকু জানি ততটুকু 'সাধারণ' জ্ঞানের নির্দেশ করা চলে।

সেক্সপীয়ারের আনুষ্ঠানিক জ্ঞান ও বিশ্বাস থাকলেও নিতান্ত কম। মধ্যযুগের গোটাকয়েক প্রাথমিক ধ্যান-ধারণা নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু আমার মনে হয় যে এই ধ্যান-ধারণা নিষ্ক্রিয়। তার পরিবর্তে ছিল নবযুগের ভূয়োদর্শন, এবং তারই অন্তরালে মানব-প্রকৃতির রহস্য। গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ ও টলষ্টয়ের মধ্যে অনুষ্ঠান নেই। গ্যেটের মধ্যে ছিল গ্রীক, মধ্যযুগ ও ফরাসী বিপ্লবের একীকরণ; রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ, কবীর-দাদূ, অর্থাৎ নতুন মধ্যযুগের চিন্তাধারা, ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার সুস্পষ্ট ছাপ; টলষ্টয়ের ঊনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে আদিম খৃষ্টান ধর্মের যোগ আর বিয়োগ; কিন্তু সেখানে কুত্রাপি আনুষ্ঠানিক ধর্ম পাই না। দান্তেতে পুরোপুরি মধ্যযুগীয় খৃষ্টান ধর্মের অনুষ্ঠানেই সবকিছু। মুসলমান

ধর্মের যোগ রয়েছে, কিন্তু সেটা যৎসামান্য। খৃষ্টান ধর্মের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার ওপরই জোর। আনুষ্ঠানিক ন্যূনতার জন্য অন্য সকলের মধ্যে পূর্বেকার askesis সেইজন্য কম। দান্তে-তে পাই সহজ, সরল, দৃঢ় ও ঋজু নিয়মবর্তিতা।

সেক্সপীয়ার ও গ্যেটের রচনায় মানবিকতাই সবখানি, পুরোপুরি। মানবিকতা বলতে আমরা তার তিনটি অঙ্গ বুঝি, প্রকৃতি, ভগবান, আর সেই মানুষ যেটা সমাজের সঙ্গে যুক্ত। সামাজিক মানুষ বেশ রয়েছে, ছোট গল্প ছাড়া রবীন্দ্রনাথে অল্প। সেক্সপীয়ার ও গ্যেটেতে ভগবান নেই বললেই চলে। ভগবান আছেন বাকী তিনজনের, দান্তে, টলষ্টয়, আর রবীন্দ্রনাথে। টলষ্টয়ে যেন একরকম ভগবানের নেশা, সেই নেশায় মশগুল না হলেও তার ফলে একটি পরিচ্ছন্নতা এসেছে। রবীন্দ্রনাথে নেশা নেই, আছে ব্রহ্মে (ভগবানে) দৃঢ় বিশ্বাস, তাইতে ওতঃপ্রোত। গ্যেটেতে, আমি যতদূর জানি, ভগবত বিশ্বাস কম, শক্তিতেই বিশ্বাস। দান্তের মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম এতই বেশী যে সেখানে ভগবান নেই বললেই চলে।

সকলের মধ্যে প্রকৃতি বলবান, তারতম্য দান্তের বেলায় যা কিছু। সেক্সপীয়ার, গ্যেটে ও প্রথম দিকের টলষ্টয়ে কিন্তু প্রকৃতি ভগবান থেকে পৃথক, এমন কি সমাজ থেকেও আলাদা। রবীন্দ্রনাথে পার্থক্য বড় বেশী নেই, সমাজের সঙ্গে মিশে আছে প্রথম দিকে, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে সেই প্রকৃতি ও সমাজের যোগ অনেকখানি। নিছক মানুষ পাই সেক্সপীয়ার, গ্যেটে ও টলষ্টয়ের প্রথমাংশে, কিছুটা আছে তবু দান্তেতে। রবীন্দ্রনাথের মানুষ যেন বিশুদ্ধ নয়, সে-মানুষ কেমন যেন সংসারের সঙ্গে জড়িত নয়, সমাজ ছাড়া মানুষ, ওপরের জগত (অবশ্য, আবার বলি, ছোট গল্প ছাড়া) সেখানে দুঃখ-দারিদ্র্যের কষ্ট যেন নেই, আছে এক অবিশেষ মানবতা। বিশেষ ব্যক্তি আর অবিশেষ মানবতা—দু'য়ে মিলে রবীন্দ্রনাথের মানুষ। সেক্সপীয়ার, গ্যেটে ও টলষ্টয়ে মানবের সাধারণ প্রত্যয় নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সে-প্রত্যয় যেন মানুষের নির্যাস, মানুষ থেকে ছাঁকা এক পদার্থ, যেন ফুটে ওঠা জিনিস, এবং সেই ওঠবার পর তার এক ভয়ঙ্কর অস্তিত্ব রয়েছে, যদিও তার হদীস পাওয়া শক্ত। দান্তেতেও নির্যাস রয়েছে, কিন্তু সেটা আরো কড়া পাকের। রবীন্দ্রনাথের মানব-প্রত্যয়ে সহজ সুর

বাজে। ব্রহ্মের অপেক্ষায় মানুষ ছোট বলেই মানুষ সহজ হয়, এবং ছোট মানুষ ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত হলেই ছোট বড় হয়ে ওঠে, ভূমার আশ্রয় পায়। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথে আত্মার প্রকাশ, এবং সেই প্রকাশই সীমা, আনন্দ; গ্যেটে, টলষ্টয়ে ও সেক্সপীয়ারে আত্মজ্ঞান; অন্ততঃ গ্যেটে ও টলষ্টয়ের দেহে সে-চিহ্ন বর্তমান। সেক্সপীয়ার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত জ্ঞান নিতান্ত কম।

নিছক মানুষ, তাই বিজ্ঞান। সেক্সপীয়ারে বিজ্ঞান ঠিক নেই, কিন্তু নবযুগের বিজ্ঞানের পর অনেক ছোঁয়াচ পাওয়া যায়। পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান সেখানে সবে আরম্ভ হয়েছে, বরঞ্চ মধ্যযুগের শেষ পরিচয়ই ছিল। গ্যেটেতে বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক মনোভাব আশ্রিত। দেহতত্ত্ব, রঙ, আর অপটিক্স্ নিয়ে তাঁর বিস্তর পরীক্ষা রয়েছে; দেহতত্ত্বে তাঁর অবদান অসামান্য। রবীন্দ্রনাথে বিজ্ঞান বেশ অনেকখানি রয়েছে, অনেক কবিতা থেকে বিশ্বপরিচয় পর্যন্ত, কিন্তু গ্যেটের মতন পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান-বিচার নেই। কবিতা ও কাব্যরূপ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথে র‍্যাশন্যাল বিচারই ছিল, কিন্তু সেটা ঠিক বৈজ্ঞানিক মনোভাব প্রসূত নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর মনোভাব সম্মত। অবশ্য বৈজ্ঞানিক মনোভাবের খানিকটা অংশ তিনি শ্রদ্ধা করতেন। টলষ্টয়ে বিজ্ঞানের বালাই ছিল না। দান্তেতে কিন্তু মধ্যযুগের বিজ্ঞান বেশ রয়েছে।

গ্যেটে, টলষ্টয়, দান্তেতে রসিকতা নেই, কিন্তু সেক্সপীয়ারে এবং রবীন্দ্রনাথে সেটা অত্যন্ত জুড়ে আছে। রসের আলোচনা যেখানে প্রধান ও প্রথম সেই রবীন্দ্রনাথে অন্ততঃ রসিকতা নিতান্ত স্বাভাবিক। রাবীন্দ্রিক রসিকতা অবশ্য আছে, কিন্তু সাধারণত, সেটা বুদ্ধিদীপ্ত, সূক্ষ্ম, ক্ষুরধারে জলজ্বল। রবীন্দ্রনাথে গ্রামীণ রসিকতা নিশ্চয়ই রয়েছে, কিন্তু সেখানে রুচিবিকার নেই। তাঁর রসিকতা নিতান্ত ভদ্র। সেক্সপীয়ারের রসিকতায় অনেক অভদ্রতা লক্ষ্য করা যায়। রসিকতায় মানুষকে সরল করে, কিন্তু নিতান্ত ভদ্র রসিকতায় মানুষ যেন শ্রেণীবদ্ধ হয়ে যায়।

দান্তে, সেক্সপীয়ার, গ্যেটে, টলষ্টয়, রবীন্দ্রনাথ সকলেই বিচিত্র পুরুষ। সেক্সপীয়ার গল্প-নভেল লেখেননি, দান্তেও নয়। সে সময় গল্প নিতান্ত কম, নভেল ত নয়ই। তাঁদের কাছে চিত্র, ভাস্কর্য ছিল না,

কিন্তু তাদের রূপ সর্বদাই পাই। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোথায় চিত্র ছিল না। রবীন্দ্রনাথে একমাত্র ভাস্কর্য নেই। টলষ্টয়, গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথ প্রাণভরে চিঠি লিখতেন; গল্প করতেনও প্রাণভরে। গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথ সমগ্র সংসারের সঙ্গে যুক্ত; গ্যেটে ছিল ছোট রাজ্যের স্বাধীন অমাত্য, রবীন্দ্রনাথ পরাধীন, অবশ্য পরাধীন হলেও স্বাধীন। দুজনেই নাট্যকার। কিন্তু চিত্রে ও রসিকতায় রবীন্দ্রনাথের প্রাচুর্য বেশী, সেখানে তিনি 'সম্পূর্ণতর' মানুষ। বাংলা দেশের সবখানিই তাঁর দান; সেই বৈচিত্র্য বাঙ্গালী বুঝেছে। ভারতবর্ষেও তাঁর দান প্রচুর, ভাষার অভাবে (এবং অন্য কারণেও) তারা ঠিক জানেনা। পৃথিবীতে তাঁর প্রাচুর্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে মনে হয়। প্রাচুর্য যদি মহত্বের সর্বপ্রথম চিহ্ন হয় তবে এই পাঁচজন লেখককে মহাপুরুষ বলব, এবং রবীন্দ্রনাথকে পরমপুরুষ বলতে কার্পণ্য করব না।

কলিকাতা ৭০নং আঞ্চলিক রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উৎসব পরিষদের সংকলন মাধ্যমে প্রাপ্ত।

আমায় হয়তো করতে হবে, আমার লেখার সমালোচন

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

"পরজন্ম সত্য হলে
কী ঘটে মোর সেটা জানি
আবার আমায় টানবে ধরে
বাংলা দেশের এ রাজধানী।
গদ্য-পদ্য লিখনু ফেঁদে
তারাই আমায় আনবে বেঁধে
অনেক লেখায় অনেক পাতক
সে মহাপাপ করব মোচন।

আমায় হয়ত করতে হবে আমার লেখার সমালোচন।"

পরজন্মে রবীন্দ্রনাথ কি করছেন সেটা আমাদের জানা নেই। তবে ইহজন্মেই নিজের লেখার এতো সমালোচনা করেছেন যে পরজন্মে "ধ্রুবলোচন" হয়ে তা করার অবসর আর দেন নি।

আটাশ খণ্ড রবীন্দ্ররচনাবলীর পত্রসংখ্যা হচ্ছে পনেরো হাজার। এটা আমরা পাচ্ছি ছাপার হরফে, কিন্তু এর পিছনে আছে কাটা-ছাঁটা কাগজের স্তূপ—যার মধ্যে গবেষকরা প্রবেশ করে কবিকে খুঁজছেন তাঁর আদি ও অসংস্কৃতরূপে—গ্রীণরুমে নায়ক-নায়িকাদের দেখতে চাওয়ার মতো।

কবি হয়ে তিনি লিখেছেন, ক্রিটিকরূপে কেটেছেন। উচ্ছ্বাসে ভাবালুতার হালকা হাওয়ায় পাল খুলেছে, ঘাটের রসি কেটে দিতেই নৌকা প্রাণ পেয়েছে। তাঁর ক্রিটিক সত্তাটি ধ্রুবলোচনরূপে নির্মমভাবে আপনার মূর্তি আপনি দগ্ধ করেছে।

অধিকাংশ লেখকই আপনার লেখা সম্বন্ধে অন্ধ। হাতে খড়ির লেখা জমিয়ে রাখতে চায় সাহিত্যের দপ্তরে। ছাপাখানা সস্তা ও সুলভ হওয়ায় বাজারে সাহিত্যের যত আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়েছে এমন বোধহয় আর কোনো বিষয়ে হয় নি। দেশে দেশে রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের কলেবর বেড়েই চলেছে। এর শেষ কোথায় কেউ বলতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী যখন ছাপবার কথা হয়, তখন উদ্যোগীরা স্থির করেন যে কবির যাবতীয় রচনা ছাপা হবে। তখন কবি 'অবর্জিত' কবিতায় লেখেন :—

"লিখিতে লিখিতে কেবলি গিয়েছি ছেপে
সময় রাখিনি ওজনে দেখিতে মেপে,
কীর্তি এবং কুকীর্তি গেছে মিশে।
…কিন্তু হেয় যা শ্রেয়ের কোঠায় ফেলে
তারেও রক্ষা করিবার ভূতে পেলে
কালের সভায় কেমনে দেখাবে মুখ।"

সাহিত্যের মধ্যে যে সব রচনা স্থানলাভ করতে পারে না তাদের প্রতিনি নির্মমভাবে তার গ্রন্থাবলী থেকে ছেঁটে বের করে দিয়েছেন।

১৮৯৬ সালে তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়; তখনই সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে স্পষ্টভাবে দেখা গেল। এই গ্রন্থাবলীতে "বনফুল", "কবিকাহিনী," "ভগ্নহৃদয়," "রুদ্রচণ্ড," "কালমৃগয়া" কোনটিই স্থানলাভ করলো না। তেরো থেকে আঠারো বৎসরের মধ্যে লিখিত কবিতার সংগ্রহ "শৈশব সঙ্গীত" হয়ে কয়েকটি কবিতা বেছে কৈশোরক নাম দিলেন। এরপর এটাও বাদ দেন। "কৈশোরক" ছাড়া কাব্য গ্রন্থাবলীতে আর যে সব রচনা স্বীকৃত হয়েছিল তা 'রচনাবলী পর্যন্ত চলে আসছে। কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে পাঠে। 'রাজা ও রাণী' প্রথম সংস্করণের অনেক কিছু বর্জিত হয়। এবার গ্রন্থাবলী সম্পাদনকালে 'বিসর্জন'কে কেটে ছেঁটে ছোট করলেন! বহু অবান্তর দৃশ্য কেটে দিয়ে নাটক-খানিকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। ভিতরের সমঝদার ক্রিটিক কবির উপর কলম চালালেন। কাটা ছাঁটা করছেন বটে, কিন্তু এখনো আপনার লেখার সমালোচনা লিখে ছাপাচ্ছেন না; পত্রমধ্যে মতামত দিচ্ছেন মাত্র।

"বঙ্গভাষার লেখক" গ্রন্থের জন্য (১৯০৪) কবিকে তাঁর জীবন কথা লিখতে বলা হলে তিনি তাঁর কাব্যজীবনের অভিব্যক্তির কথা নিয়েই আলোচনা করেন, জীবনী এতে নেই। এই লেখাটি কবির নিজকৃত তাঁর কাব্যের প্রথম **interpretative** সমালোচনা। জীবনস্মৃতি লেখবার সময় (১৯১০) রবীন্দ্রনাথকে নিজের লেখার তীব্র সমালোচকরূপে দেখতে পাই। কাব্য গ্রন্থাবলী (১৮৯৬) সম্পাদন কালে যেটা কাজে করেছিলেন। কৈফিয়ৎ দেন নি, এবার সেটি করলেন। বেশ বুঝতে পারছেন সাহিত্যের কাল বদলের হাওয়া বয়ে চলেছে। বৃদ্ধ বয়সে 'নূতন স্রোত' (১৯২৭) নামে যে কবিতাটি লেখেন, তার শেষের কয়েক পংক্তি স্মরণীয়ঃ—

"পড়া আমার শেষ হল যেই, ক্ষণেক নীরব থেকে
নন্দগোপাল উৎসাহেতে বলল্ হঠাৎ ঝেঁকে,
'দাদামশায় সাবাস্'।
তোমার কালের মনের গতি
পেলেম তারি ইতিহাসের আভাস। (পরিশেষ)

সাহিত্যের অনেকখানিই সাহিত্যের ইতিহাসের পাতার মধ্যে কয়েক পৃষ্ঠা স্থান দখল করে আছে; মানুষের মনে একদিন যে মোহ সৃষ্টি করেছিল নূতন মানুষের কাছে গতযুগের সাহিত্যিকদের ভাষা ও ভাব অনেকখানি অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। তাই কবি তাঁর পুরাতন লেখা 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভগ্নহৃদয়' সম্বন্ধে সমালোচনা করে তাঁর গ্রন্থাবলী থেকে বর্জন করে দিয়েছিলেন। আরও পরে সন্ধ্যা-সঙ্গীতকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন। ১৯১৫ সালে যে কাব্য গ্রন্থাবলী ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়, তার ভূমিকায় বলেছিলেন "যদি সুযোগ পাইতাম, তবে সন্ধ্যাসঙ্গীতকেও বাদ দিতাম;—দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্য ভাণ্ডারে আবর্জনা···যাহা একবার প্রকাশ হইয়াছে, তাহাকে বিদায় করা কঠিন।"

১৯৩০ সালে 'সঞ্চয়িতা'র ভূমিকায় সমালোচক রবীন্দ্রনাথ নিজের রচনার প্রতি আরও কঠোর হয়েছেনঃ 'সন্ধ্যাসঙ্গী'ত, 'প্রভাতসঙ্গীত', 'ছবি ও গান' এখনো যে বই আকারে চলছে,—একে বলা যেতে পারে কালাতিক্রমণ-দোষ। ওই তিনটি কবিতাগ্রন্থের আর কোনো অপরাধ নেই, কেবল একটি অপরাধ, লেখাগুলি কবিতার রূপ পায় নি।

"ইতিহাস রক্ষার খাতিরে এই সংকলনে ওই তিনটি বইয়ের যে কয়টি

লেখা সঞ্চয়িতায় প্রকাশ করা গেল, তা ছাড়া ওদের থেকে কোনো লেখাই আমি স্বীকার করতে পারব না ; ভানু সিংহের পদাবলী সম্বন্ধেও সেই একই কথা ; 'কড়ি ও কোমলে' অনেক ত্যজ্য জিনিষ আছে, কিন্তু সেই পর্বে আমার কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে।"

রবীন্দ্রনাথ 'মানসী'কে প্রথম কাব্যের মর্যাদা দিয়েছেন ; তাই দেখি 'মানসী' সম্বন্ধে কবি বারে বারে আলোচনা করেছেন। প্রমথ চৌধুরীকে ১৮৯০ সালে লেখা পত্রে 'মানসী' সম্বন্ধে দীর্ঘ সমালোচনাপূর্ণ পত্র দিচ্ছেন ; আবার তাঁকে ১৮৯৮ সালেও এই কাব্য নিয়ে লিখতে দেখি। বৃদ্ধবয়সে বিশ্বভারতীর ছাত্রদের ক্লাশ নেবার সময়ে 'মানসী' নিয়ে তাঁর আলোচনা চলে বেশ।

রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখাকে কি দৃষ্টিতে দেখতেন, তার একটা ভালোরকম আলোচনার ক্ষেত্র রয়েছে। তাঁর শেষ বয়সের কবিতার মধ্যে এখানে সেখানে নিজের কথা রয়ে গেছে। 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে 'নিবারণ চক্রবর্তী'র কথা স্মরণীয়। তাঁর শেষ সাহিত্য বিষয়ক কথা-বার্তা বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে হয়েছিল তার মধ্যে আত্মবিশ্লেষণ যথেষ্ট আছে। কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধের মধ্যে রয়ে গেছে আত্মবিশ্লেষণী রবীন্দ্রনাথের স্পর্শ। আত্মবিশ্লেষণ, কৈফিয়ৎ ও অন্যকে সমঝানোর জন্য সংলাপসৃষ্টি এবং সমালোচনা একগোত্রীয় পদার্থ নয়।

ফাল্গুনীর সূচনায় যে সংলাপ জুড়ে দিয়েছিলেন, ঋণশোধের মধ্যে যে কবিশেখরকে খাড়া করে দেন তাতে নাটকের ঔজ্জ্বল্য বাড়েনি ; ঋতু নাট্যগুলির সংলাপ এই সমঝানোর উদ্দেশ্য রচিত ; সেগুলি গানের ব্যাখ্যা মাত্র। তবে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের এইসব রচনার সমালোচনা লেখেন তাঁদের পক্ষে এগুলি খুবই কাজে লাগে।

আমরা এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে তাঁর নিজ রচনাকে দেখেছেন, তারই একটা রেখাচিত্র এখানে দিলাম। এ নিয়ে আরও বিস্তারিত কাজ করবার অবসর আছে।

রবীন্দ্রনাথ ও কুন্তক

সুধীর করণ

'সাহিত্য' শব্দটি 'সহিত' শব্দ-জাত বলে, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সম্পর্কে একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন, যদিও ঐ সংজ্ঞার মাধ্যমে সাহিত্য নামক বস্তুকে প্রতিভাত করা যায় না। বলা বাহুল্য 'সাহিত্য' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সাহিত্যের গুণ প্রকাশে অক্ষম। সাহিত্য তাই অধুনা বিশেষ কোন সংজ্ঞার মধ্যে সহজধৃত নয়; অধুনা-ই বা বলি কেন, সেই প্রাচীনকাল থেকেই অলংকার-শাস্ত্র এ বিষয়ে বহু মত প্রদান করে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথ অতি সহজ ভাবে সাহিত্যের অর্থ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন: 'সাহিত্যের সহজ অর্থ যা' বুঝি, তা' হচ্ছে নৈকট্য অর্থাৎ সম্মেলন।' এই নৈকট্যের স্বরূপ অবশ্যই ভিন্ন রুচিতে বিভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের কবি মানসিকতা এই সম্মেলনের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় আনন্দের স্পর্শকামী; কেবল মিলনের জন্যই মিলন, অথবা অহেতুক আনন্দের জন্যই মিলন,—এই হচ্ছে সাহিত্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব।

সাহিত্যের পরিসর যখন অল্প ছিল, যখন কাব্যার্থে উপন্যাস-ছোটগল্প এবং আধুনিক বহুবিধ সাহিত্য-শাখা গঠিত হয় নি, তখন কাব্যের সংজ্ঞাতে রসবাদকে-ও চোখ বন্ধ করে স্বীকৃতিদান করা হয়তো বা সহজ ছিল, কিন্তু রীতি-বাদী গোষ্ঠী রীতিকে কাব্যের আত্মা বলতে কুণ্ঠিত হন নি। রবীন্দ্রনাথের যুগে সাহিত্যের অর্থ শুধু নৈকট্য বা সম্মেলন ছাড়া অন্য কিছু হবে কি না, তা নিয়েও তর্ক চলমান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে এ বিষয়ে প্রাচীন আলংকারিকদের অনুগামী তা তর্কাতীত ভাবেই বলা চলে। এ বিষয়ে প্রাচীন আলংকারিক কুন্তকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, যদিও উভয়ের অভিমত বিচার করে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সংজ্ঞাকে বেশী মাত্রায় অগ্রসারী মনে হয়। দশম শতাব্দী-র পরে আরো হাজার বছরের কাছাকাছি সময়ে রবীন্দ্রনাথ কুন্তক-কে অতিক্রম করেছেন, কিন্তু এই অতিক্রান্তি বিপ্লবাত্মক নয়।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সংজ্ঞা নিয়ে কোন তর্ক উত্থাপনের উদ্দেশ্য আমার

নেই ; কুন্তকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য এবং বৈশাদৃশ্য নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করাই উদ্দেশ্য।

সাহিত্যের নৈকট্য বা সম্মেলনের কথা বলতে গিয়ে, রবীন্দ্রনাথ একটি সহজ উদাহরণ তুলে ধরেছেন। উদাহরণটি বহু প্রচলিত সবজীক্ষেতের এবং পুষ্পোদ্যানের সম্পর্কিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—শাকসবজীর ক্ষেতের সঙ্গে আমাদের যে যোগ, সেটা ফসল ফলানোর যোগ এবং ভোজ্য সংগ্রহের যোগ,—আর ফুলের বাগানের সঙ্গে যে যোগ তা শুধু আনন্দ আহরণের যোগ ;—আর এই শেষোক্ত যোগই হচ্ছে সাহিত্য। "তার কাজ হচ্ছে হৃদয়ের যোগ ঘটানো, যেখানে যোগটাই শেষ লক্ষ্য।" ইংরাজিতে art for art's sake নামক যে কথাটি প্রচলিত হচ্ছে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উপরিউক্ত সংজ্ঞা পুরোপুরি মেলে না। কারণ রবীন্দ্রনাথ 'আনন্দম্' 'অমৃতম্' প্রভৃতি শব্দগুলিকে স্বীকৃতিদান করেন। তাঁর কাছে, আর্টের জন্যই নয় ; আনন্দের জন্যই আর্ট ; এমন কি আনন্দই আর্ট।

ভাষাকে অবলম্বন করে আনন্দময় স্বরূপের প্রকাশকেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের প্রকাশ নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর অভিমতে, এই প্রকাশের তাৎপর্য কোন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না ; অসীমের অভিমুখে তার অভিযাত্রা। ভাষার মাধ্যমে ভাব ও রূপের যে সংবেদনশীল বিকাশ, যার প্রয়োজন দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ হয় না, যার সমগ্রতা স্থায়ী কালের বৃহৎ ভূমিতে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়, তাকেই তিনি সাহিত্য বলেছেন। বিশ্বের সমগ্রতার মধ্যে নিজের সাহিত্য বা নৈকট্য অনুভব করার মধ্যে এবং সেই অনুভূতিকে রূপদান করার মধ্যেই সাহিত্যের তাৎপর্য নিহিত আছে। রবীন্দ্রনাথ এই কথাকে ব্যক্ত করতে গিয়েই বলেছেন—"বিষয়ী লোক আপনার চারিদিকের সঙ্গে মেলে না, সে আপনাতে আপনি পৃথক, এমন কি জ্ঞানী লোকও মেলে না, সে স্বতন্ত্র, মেলে ভাবুক লোক। সে আপন ভাবরসে বিশ্বের দেহে আপন রং লাগায়, মানুষের রঙ।···বস্তুবিশ্বের সঙ্গে মনের সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তোলে। জগৎটা মানুষের ভাবানুষঙ্গে অর্থাৎ তার অ্যাসোসিয়েশানে মণ্ডিত হয়ে ওঠে।"

পৃথিবীকে ভালোবাসার যে মহৎ ক্ষমতা আছে মানুষের, সেই ভালোবাসার ক্ষমতাই পৃথিবীকে নোতুন রূপে দেখে। এই রূপকে রবীন্দ্রনাথ বলেন—রস-রূপ। এই রস-রূপের সৃষ্টি একান্তভাবে মানুষেরই সৃষ্টি এবং এরই ফলে

প্রকৃতির সঙ্গে মানব জীবনের সাহিত্য ঘটেছে। "মানুষ সমস্ত জগৎকে হৃদয়-রসের যোগে আপন মানবিকতায় আবৃত করেছে, অধিকার করছে, তার সাহিত্য ঘটছে সর্বত্রই। মানুষেরা সর্বমেবাবিশান্তি।" রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন যে যাকে আমরা সাহিত্য নামে অভিহিত করতে পারি, যে ভাবের মায়াঞ্জন দিয়ে তার সৃষ্টি, সেই ভাবকে প্রকাশ করার জন্য বিশেষ ধরণের ভাষার প্রয়োজন হয়—'কিছু যার অর্থ আছে, কিছু আছে সুর।' উদাহরণ স্বরূপ বলেছেন: 'খোকা যাবে নায়ে, লাল জুতুয়া পায়ে'—এর মধ্যে 'জুতুয়া' শব্দটির অর্থ অভিধানে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু বিশেষ ভাব-রূপ এবং বিশেষ প্রকাশ ভংগীর ফলে, এই শব্দের ব্যঞ্জনাই সাহিত্য সৃষ্টি করে। "এই ভাষাকে কিছু আড় করে বাঁকা করে এর সঙ্গে রূপক মিশিয়ে, এর অর্থকে উলট-পালট করে তবেই বস্তু বিশ্বের প্রতিঘাতে মানুষের মধ্যে যে ভাবের বিশ্ব সৃষ্ট হতে থাকে, তাকে সে প্রকাশ করতে পারে।"

সাহিত্য সৃষ্টির জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ সেই দৃষ্টিভঙ্গীকে অখণ্ড দৃষ্টি—বলেছেন। কোন কিছুকে খণ্ড খণ্ড করে দেখার মধ্যে সাহিত্য-দৃষ্টি থাকে না। সাহিত্য রচনার জন্য অখণ্ড দৃষ্টির প্রয়োজন। সাহিত্য, ভালো বা মন্দকে প্রকাশ করার বিচার করে না। সাহিত্যের রাজ্যে মহান পুরুষের যেমন স্থান আছে, নীচ কাপুরুষেরও তেমনি স্থান আছে। শুধু প্রকাশ রূপের সার্থকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। কারণ চরিত্রগুলিকে প্রয়োজন সাধনের মানদণ্ডরূপে বিচার না করে আত্মীয়তা সাধনের এবং 'সাহিত্য' সাধনের মানদণ্ডরূপে বিচার করা হয়।

সাহিত্যের এই 'সম্মেলনের' কথা এবং সমগ্রতার কথা আলংকারিক কুন্তকও বলেছেন। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের অভিমত কুন্তকের অনুগামী হলেও তা আরো দূরপ্রসারী, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। কুন্তকের মতে,—ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনির মিলনে এবং অর্থের সঙ্গে অর্থের মিলনে যে 'পরস্পর-স্পর্ধি-চারুতাদ্বয়' উৎপন্ন হয়,—তাই পারস্পরিক সামঞ্জস্য লাভ করে সাহিত্য পদবাচ্য হয়। বক্রোক্তিজীবিত গ্রন্থে সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কুন্তক বলেছেন:

'সাহিত্যম্ অনয়োঃ শোভাশালিতাং প্রতিকাপ্যসৌ
অন্যূনানতিরিক্তত্ব মনোহারিণ্যবস্থিতি:'—

অর্থাৎ,—সাহিত্য হচ্ছে শব্দ এবং অর্থের (অনয়োঃ) এক অলৌকিক

বিন্যাসভংগী, যা ন্যূনতা এবং অতিরিক্ততা বর্জিত হয়ে মনোহারী হয় এবং শোভাশালিতা প্রাপ্ত হয়।

কুন্তকের মতে সাহিত্যের ধর্মই হচ্ছে মিলন; শব্দ এবং অর্থের সুসমঞ্জস মিলনই হচ্ছে সাহিত্য। শব্দ এবং অর্থের যে স্বরূপের কথা তিনি বলেছেন, তাতে সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধেও তাঁর অভিমত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে কবি তাঁর বিশেষ ধরণের ভাব প্রকাশের ক্ষমতাকে তুলে ধরেন আর অর্থের মাধ্যমে তিনি সহৃদয়ের হৃদয়ে আনন্দ সৃষ্টি করেন। এই আনন্দকে প্রাচীন আলংকারিকেরা বলেন স্বভাবসুন্দর। 'পরস্পর-স্পর্ধি-চারুতার' কথা বলে কুন্তক এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে সমগ্রতার সামঞ্জস্য সাধনের মধ্যেই আর্টের প্রাণ নিহিত। শব্দ ও অর্থ স্পর্ধার সঙ্গে পরস্পরের অভিমুখী হয় এবং সমান ভাবে বড় হয়ে পরস্পরের সংযোগে রমণীয় হয়ে ওঠে।

কুন্তক আরো বলেন যে, শুধু—'কবি-কৌশল-কল্পিত-কমনীয়তা'-পূর্ণ শব্দ কাব্য হতে পারে না; আবার শুধু 'রচনা-বৈচিত্র্য-চমৎকারকারী' অর্থও কাব্য হতে পারে না। উভয়ের সম্যক মিলনেই সাহিত্যের জন্ম। তিনি বলেন যে, বিষয়বস্তু কবিরচিত্তের মধ্যে ভাবময় হয়ে আপনাকে প্রকাশ করে তাই শব্দরূপে অবতীর্ণ হয়।

সাহিত্য ক্ষেত্রে কুন্তক রসধ্বনি বস্তুধ্বনি এবং অলঙ্কারধ্বনির কথা স্বীকার করেছেন। সাহিত্যের মধ্যে যে অনির্বচনীয়তার আস্বাদ পাওয়া যায়, অর্থ-বোধ সম্পূর্ণ না হলেও যে একটি অপূর্ব আনন্দলাভ করা যায়, কুন্তক এ-ও বলেছেন এবং সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন পানক রসের।

এলা, শর্করা, মরিচ প্রভৃতি যোগে যে স্নিগ্ধ, সুস্বাদু পানীয় প্রস্তুত হয়, তাতে বিশেষ বিশেষ বস্তুর স্বাদ ছাড়াও একটি সামগ্রিক স্বাদ পাওয়া যায়। সাহিত্যের ব্যঞ্জনা-ও পাচক রসের সমগোত্র। সাহিত্যের শব্দ এবং অর্থ খণ্ডতাকে অতিক্রম করে একটি অখণ্ডতার, সমগ্রের স্বরূপকেই বিকশিত করে।

রবীন্দ্রনাথ এবং কুন্তকের সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি আন্তরিক যোগ আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সংজ্ঞা সর্বব্যাপক। রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য শব্দটিকে শুধু শব্দের এবং অর্থের মিলন বলেই ক্ষান্ত হন নি। সমাজগত সংস্কৃতিগত কালগত মিলনের কথাও তিনি বলেছেন। সাহিত্যের মধ্যে কেবল সংগীত ধর্ম-ই থাকবে তা নয়,—তার মধ্যে চিত্রধর্ম-ও থাকবে। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের

বৈশিষ্ট্য। "গাছের ডালে, বনের পথে, বাড়ীর ছাদে, পুকুরের জলে নানা ভংগীতে তার আলোছায়ার কোলাকুলি, সেই সঙ্গে নানা ধ্বনির মিলন—পাখির বাসায় হঠাৎ পাখা ঝাড়ার শব্দ, বাতাসে বাঁশপাতার ঝরঝরানি, অন্ধকারে আচ্ছন্ন ঝোপের মধ্য থেকে উঠছে ঝিল্লিধ্বনি, নদী থেকে শোনা যায় ডিঙি চলেছে তারই দাঁড়ের ঝপঝপ, দূরে কোন বাড়ীতে কুকুরের ডাক বাতাসে অদেখা অজানা ফুলের মৃদুগন্ধ যেন পা টিপে টিপে চলেছে, কখনও তারই মাঝে মাঝে নিঃশ্বসিত হয়ে উঠেছে জানা ফুলের পরিচয়।" জ্যোৎস্নারাত্রির এই চিত্রধর্মিতার পরিচয়, রবীন্দ্রসাহিত্যে সংখ্যাহীন চিত্রধর্মিতারই অন্যতম প্রকাশ।

কুন্তক সাহিত্যের মধ্যে সামগ্রিক সামঞ্জস্যের কথা বলেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আরো ব্যাপক ভাবে তাকে উপস্থাপিত করেছেন।

আলংকারিক-সমাজে কুন্তক এককালে স্বীকৃতি লাভ করেন নি, কিন্তু হাজার বছর আগে কুন্তক সাহিত্যের যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, তা আজও অস্বীকৃত হয় নি, যদিও তা তর্কাতীত নয়। আধুনিককালের সাহিত্য-সংজ্ঞার সঙ্গে তাঁর যে আশ্চর্য মিল দেখা যায়, তাতে কুন্তকের দূরদৃষ্টির-ই সম্যক পরিচয় মেলে। কুন্তকের বৈশিষ্ট্য—মৌলিক চিন্তাধারায় এবং গভীরার্থ উপলব্ধিতে। এমন সম্পূর্ণ এবং সামগ্রিক সাহিত্য-সংজ্ঞা কুন্তকের পূর্বগামীরা দিতে পারেন নি! শব্দ এবং অর্থের মিলনকে স্বীকার করে তিনিই প্রথম সকল প্রকার রচনাকে সাহিত পদবাচ্য হওয়ার সুযোগ দেন। ইংরাজী 'লিটারেচার' শব্দের মধ্যে, কুন্তকের সাহিত্য সংজ্ঞার সার্থকতা নিহিত আছে।

কুন্তকের পানক রস ন্যায়ের ব্যাখ্যায় রস-স্বরূপের সম্যক সমর্থন হয় না বলে রসবাদীগণ এই যুক্তিকে প্রায়শঃই অস্বীকার করে থাকেন, কিন্তু কুন্তকের এই ব্যাখ্যাও সাহিত্য-সংজ্ঞায় সহজগ্রাহ্য। কুন্তকের সাহিত্য-সংজ্ঞায় অর্থের চিত্রধর্মিতার কথা বলা হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ এবং কুন্তকের সাহিত্য সংজ্ঞা বিপরীতধর্মী নয়, বরং উভয় ক্ষেত্রেই মৌলিক মিলনের অবকাশ আছে।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ এবং কুন্তকের সংজ্ঞা একত্র মিলিত করলে সাহিত্যের একটি সার্বিক সংজ্ঞা লাভ করা যেতে পারে। বলা যেতে পারে শব্দ এবং অর্থের সাম্য-সুভগ অবস্থানের দ্বারা ভাবের যে রস-রূপায়ণ, যার মধ্যে বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে অভূতপূর্ব ব্যঞ্জনার প্রকাশ, যে ব্যঞ্জনায় সামগ্রিক মিলনের পূর্ণ বিকাশ তাকেই বলে সাহিত্য।

'অচলায়তন' প্রসঙ্গ

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

'অচলায়তন' নাটকখানির আখ্যানভাগ মূলতঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত Nepalese Buddhist Literature (১৮৮২) থেকে সংগৃহীত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পর্কে সশ্রদ্ধ আলোচনা করেছেন। বৌদ্ধসাহিত্য থেকে বহু আখ্যান রবীন্দ্রনাথ কাব্যে ও নাটকে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য উপগুপ্ত-বাসবদত্তা, শ্যামা-বজ্রসেন প্রভৃতি কাহিনীকে তিনি নতুনভাবে উপস্থাপিত করেছেন। মালিনী এবং অচলায়তনের আখ্যান রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

'দিব্যাবদানমালা-র অন্তর্ভুক্ত 'পঞ্চক' কাহিনীতে পাই :

একদা বিষণ্ণচিত্ত এক ব্রাহ্মণকে এক বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে তাঁর পত্নী আসন্নপ্রসবা এবং পূর্বজাত সন্তানগুলি মারা গেছে। এবারও তার পুনরাবৃত্তি ঘটবার আশংকায় ব্রাহ্মণ বিষণ্ণ। বৃদ্ধা তাঁর পত্নীর প্রসবকালে তাকে সংবাদ দিতে বলল। যথাসময়ে পুত্র ভূমিষ্ঠ হলে বৃদ্ধা ঐ শিশুটির মুখে মাখন পুরে তাকে সাদাকাপড়ে জড়িয়ে দাসীর হাতে দিয়ে বলল, একে বাজারের চৌমাথায় নিয়ে যাও এবং কোনো ব্রাহ্মণ বা শ্রমণকে দেখলে বলবে 'শিশুটি আপনাকে প্রণাম করছে'—তারপর সূর্যাস্ত হলে তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। এবারে ছেলেটি বেঁচে গেল, নাম হল মহাপঞ্চক। তার পরের ছেলেটির নাম পঞ্চক রাখা হল। ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর মহাপঞ্চক সন্ন্যাস অবলম্বন করলেন এবং অবিলম্বে তিনি "অর্হৎ" স্তরে উন্নীত হলেন। পঞ্চক নির্বোধ হল, কোনো শিক্ষাই লাভ করতে পারলনা সেজন্য মহাপঞ্চক তাকে সঙ্ঘারাম থেকে তাড়িয়ে দিলেন। পঞ্চক পথপার্শ্বে কাঁদতে লাগল—ভগবান বুদ্ধদেব সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি পঞ্চককে ডেকে নিলেন এবং জনৈক ভিক্ষুকে নির্দেশ দিলেন পঞ্চককে শিক্ষাদানের। সে-ও শীঘ্র "অর্হৎ"ত্ব লাভ করল।

এই আখ্যানের সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথ পঞ্চক ও মহাপঞ্চককে দুটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক চরিত্ররূপে দেখেছিলেন। মহাপঞ্চক প্রাণের ধর্ম,

রসের ধর্ম, আনন্দের ধর্মকে স্বীকার করতে চায় না। মন্ত্র, ও প্রথাসিদ্ধ ধর্মাচারকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। প্রাণের ধর্মের চেয়ে প্রথার ধর্ম বড়ো হয়ে উঠলে সেখানে প্রবেশ করে একজটা দেবী, কালঝণ্টি, মহাতামস ব্রত, আভিচারিক মন্ত্র লৌকিক-তান্ত্রিক প্রক্রিয়া। তাই তখন ধর্ম চলে গেল ধর্মমোহ বড়ো হয়ে উঠলো। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে॥ (ধর্মমোহ, পরিশেষ)

এরই পরিচয় অচলায়তনে ফুটেছে। এখানে তাই দেখতে পাই ধর্মমোহ নিয়ে এলো সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িক হিংসা। অচলায়তনিকদের সাধনার পথ অনুসরণের জন্য জনৈক শোণপাংশুর আগ্রহ হয়েছিল কিন্তু তাকে তার এই অপরাধের জন্য প্রাণ দিতে হয়েছিল —

দাদাঠাকুর॥ কীরে এত ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলি কেন।

প্রথম শোণপাংশু॥ চণ্ডককে মেরে ফেলেছে।

দাদাঠাকুর॥ কে মেরেছে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। স্থবির পন্তনের রাজা।

পঞ্চক॥ আমাদের রাজা? কেন মারতে গেল কেন।

দ্বিতীয় শোণপাংশু॥ স্থবিরক হয়ে উঠবার জন্যে চণ্ডক বনের মধ্যে এক পোড়ো মন্দিরে তপস্যা করছিল। ওদের মন্থরগুপ্ত সেই খবর পেয়ে তাকে কেটে ফেলেছে।

তৃতীয় শোণপাংশু॥ আগে এদের দেশের প্রাচীর পঁয়ত্রিশ হাত উঁচু ছিল, এবার আশিহাত উঁচু করবার জন্য লোক লাগিয়ে দিয়েছে, পাছে পৃথিবীর সব লোক লাফ দিয়ে গিয়ে হঠাৎ স্থবিরক হয়ে ওঠে।

চতুর্থ শোণপাংশু॥ আমাদের দেশ থেকে দশজন শোণপাংশু ধরে নিয়ে গেছে, হয়তো ওদের কালঝণ্টি দেবীর কাছে বলি দেবে।

মনে হয় এই অংশ রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের মনে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত (অনেকের মতে প্রক্ষিপ্তঅংশ) রামচন্দ্র শম্বুক কাহিনীর 'সংস্কার' ছিল। অনার্য শম্বুক আর্যনির্দিষ্ট সাধনায় ব্রতী হয়েছিল বলে রামচন্দ্র সেই শম্বুককে বধ করেন। কেননা, শম্বুকের তপস্যা ব্রাহ্মণ তনয়ের অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী! এই ঘটনা শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের কলঙ্কস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ এই

ঘটনাটিকে সুকৌশলে 'অচলায়তন' নাটকে বসিয়েছেন বলে অনুমান করা অসংগত নয়। শম্বুক বধ প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

"ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র একদিন গুহক চণ্ডালকে আপন মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এই জনশ্রুতি আজ পর্যন্ত তাঁহার আশ্চর্য উদারতার পরিচয় বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। পরবর্তী যুগের সমাজ উত্তরকাণ্ডে তাঁহার এই চরিত্রের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছে শূদ্র তপস্বীকে তিনি বধদণ্ড দিয়াছিলেন এই অপবাদ রামচন্দ্রের উপরে আরোপ করিয়া পরবর্তী সমাজরক্ষকের দল রামচরিতের দৃষ্টান্তকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিতেছে"। (ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা)।

হিন্দুসমাজে প্রচলিত জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকভেদ, বর্ণভেদকে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই নিন্দা করেছেন। আমাদের সমাজের 'তথাকথিত' নিম্নবর্ণকে, সেই শক্তিমান সম্প্রদায়কে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য বলে ঘোষণা করা যে ধর্মেরই অবমাননা সেকথা রবীন্দ্রনাথ বহুবার মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন ঃ

"এমন ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে যে রান্নাঘরের বাহিরের দাওয়ার উপরে একটি ঘুড়ি পড়িয়াছিল সেই ঘুড়িটা তুলিয়া লইবার জন্য একজন পতিত জাতির ছেলে ক্ষণকালের জন্য দাওয়ায় পদক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়া রান্নাঘরের সমস্ত ভাত ফেলা গিয়াছিল অথচ সেই দাওয়ায় সর্বদাই কুকুর যাতায়াত করে তাহাতে অন্ন অপবিত্র হয় না।" (ধর্মের অধিকার)

এই সূত্রে 'অচলায়তন' নাটকের নামগুলির রূপক ব্যাখ্যা আলোচনা করা যেতে পারে। লক্ষ্য করার বিষয় অচলায়তন যেখানে প্রতিষ্ঠিত, সে রাজ্যের নাম "স্থবির পত্তন", রাজার নাম "মন্থরগুপ্ত" তাদের পরিচয় "স্থবিরক"। অচলায়তন, স্থবির পত্তন, মন্থর গুপ্ত ও স্থবিরক নাম চারটি পাশাপাশি রাখলেই এদের অন্তর্নিহিত ভাব-ঐক্যটি ধরা পড়ে। ধর্ম ও প্রাণের বেগ এখানে স্থবির ও মন্থর, তার মধ্যে সচল জীবন ও ধর্মের স্রোতস্বিনীরূপ নেই। তাই কবি লিখেছেন ঃ

যে নদী হারাতে স্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবাল দাম-বাঁধে আসি তারে
যে জাতি চলে না কভু, তারি পথ' পারে
তন্ত্র-মন্ত্র সংহিতায় চরণ না সরে।

এবং সেখানে 'তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি বিচারের স্রোতঃপথকে' গ্রাস

করে। অচলায়তনে তাই ঘটেছে, সেজন্যেই অচলায়তন, স্থবিরপত্তন, মন্থর গুপ্ত প্রভৃতি নাম নির্বাচন করা হয়েছে।

শোণপাংশু-র অর্থ যার গায়ে গেরুয়া মাটি মাখে। কিন্তু সে-অর্থ এখানে নয়। শোণ পুষ্পের রং লাল। লাল রঙের মধ্যে ভাঙনের, ধ্বংসের ইঙ্গিত আছে। তাই শোণপাংশুদের হাতে অস্ত্র, মাথায় লাল টুপি। তাহা নিরীহ অহিংস নয়।

মহাপঞ্চক ।। তোমার পশ্চাতে ও অস্ত্র ধারী কারা ?

দাদাঠাকুর ।। এরা আমার অনুবর্তী—এরা শোণপাংশু।

সকলে ।। শোণপাংশু।

মহাপঞ্চক ।। এরাই তোমার অনুবর্তী ?

দাদাঠাকুর ।। হাঁ।

মহাপঞ্চক ।। এই মন্ত্রহীন, কর্মহীন ম্লেচ্ছদল।

* * *

প্রথম শোণপাংশু। এ পাগলাটা কোথাকার রে। এই তলোয়ারের ডগা দিয়ে ওর মাথার খুলিটা একটু ফাঁক করে দিলে ওর বুদ্ধিতে একটু হাওয়া লাগাতে পারে।

শোণপাংশুদের মধ্যে শুধু যে আমাদের দেশের অন্ত্যজ বর্ণিত অথচ শক্তিমান কর্মবীর জন-সম্প্রদায়ের কথা আছে তাই নয় তারা ভাঙনের দুর্বার শক্তি, অফুরন্ত প্রাণের বন্যা 'ম্লেচ্ছ' শব্দটির মধ্যে পাশ্চাত্যের প্রচণ্ড গতি ধর্মী শক্তির কথাও বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'ধূলা মন্দির' কবিতায় যে কর্মযোগী শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের মহিমা উদ্গীত হয়েছে শোণ-পাংশুদের ভূমিকা সে প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

'দর্ভক' শব্দের অর্থ কোমল তৃণ। চৈতন্যদেবের রচিত বলে স্বীকৃত চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে সংকলিত "শিক্ষাষ্টক" পর্যায়ের শ্লোকে বৈষ্ণব-লক্ষণ' পাই :

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা
অমানিনা মান দেয় : কীর্তনীয় : সদাহরি :"

তৃণের চেয়েও নত হবে চৈতন্যদেবের নির্দেশিত এই বৈষ্ণব লক্ষণই বোধ হয় দর্ভক নামের পিছনে বিদ্যমান। এই দর্ভকেরা অন্ত্যজ, পতিত জাতি। চৈতন্যদেব তাঁর যুগে এই স্পর্ধিত ঘোষণা করেছিলেন

'চণ্ডালোজপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণ' :

এই দর্ভকদের পল্লীতে গুরু এসেছেন দাদাঠাকুর বেশে নয় 'গোঁসাই'এর বেশে। দাদাঠাকুর আচার্যের গুরু, শোণপাংশুদের 'সকল কাজের কাজি' আর দর্ভকদের 'গোঁসাই'। দর্ভকেরা বলে আমরা শাস্ত্র জানি না, আমরা নামগান করি।

এই সহজ 'অহেতুক' ভক্তি রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ-পতিসর অঞ্চলে পদ্মা ইছামতী বিধৌত জগতে বাসকালে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জেনেছিলেন এই বৈষ্ণব-বাউলদের আনন্দময় সাধনা। লালনশাহ ফকির ছাড়াও জগা কৈবর্ত, —গগন হরকরা সকলেই সমাজের প্রচলিত আচার-বিচার প্রথা থেকে দূরে আনন্দময় ভক্তির সাধক। জগাকবৈর্ত ও গগন হরকরা কেউই উচ্চবর্ণের হিন্দু নন।

'গুরু'র রূপ অচলায়তনের পূর্বে এমন ভাবে আমরা পাইনি। শারদোৎসবের রাজ-সন্ন্যাসী বা ঠাকুরদা কিম্বা ডাকঘরের ঠাকুরদার সঙ্গে তার মিল নেই। এখানে তিনি "মানবযাত্রী", ঈশ্বরের প্রতিনিধি রূপে, শস্ত্রপানি হয়ে এসেছেন অচলায়তনকে ভেঙে নবজীবনের মন্দিরে পরিণত করবার জন্য। নৈবেদ্য কাব্যে (১৯০১-২) এর সূচনা ছিল :

নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত। (প্রার্থনা)

দাদাঠাকুর অচলায়তন ভাঙতে এলেন যোদ্ধৃবেশে। সেখানে তিনি কঠোর ও নির্মম, অন্যায় ও অধর্মের বিলোপ সাধনে ব্রজমুষ্টি।

মহাপঞ্চক ॥ তুমি গুরু? তবে এই শত্রু বেশে কেন?

দাদাঠাকুর ॥ এইতো আমার গুরুর বেশ। তুমি আমার সঙ্গে লড়াই করবে—সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

—তাই গুরুর অনুবর্তী শোণপাংশুরা অচলায়তনের যে দেয়াল ভেঙে দিয়েছিল সে ভাঙন বিনা রক্তপাতে হয়নি।

দাদাঠাকুর ॥ ওই ভিতের উপর কালদুপুর রাতে স্থবিরকের রক্তের সঙ্গে শোণপাংশুর রক্ত মিলে গেছে।

'অচলায়তন' প্রকাশিত হলে এর বিরুদ্ধে কঠিন সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের সমালোচনার জবাব দিয়েছিলেন সংযত অথচ দৃপ্ত ভাষায়। এই সময় শ্রীযুত অলম হোম মহাশয়কে একটি চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন :

"অচলায়তন নিয়ে বাংলাদেশে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে তার উত্তাপ তোমাদের ছাত্রমহলেও সঞ্চারিত হয়েছে দেখছি। তোমার ইনস্টিটিউটের বন্ধুদের বোলো যে ভারতের ধর্মসাধনাকে ছোট করার জন্য শোণপাংশুদের বড় করা হয়েছে একথা ভুল। ধর্মের নামে সমাজের নামে যে বিরাট কারাগার আমরা আমাদের চারপাশে গড়ে তুলেছি সেই বন্দীশালা থেকে আমাদের সংস্কারকে, অভ্যাসকে, যুক্তিকে মুক্তি দেবার আহ্বানই অচলায়তনের আহ্বান।

অধ্যাত্মসাধনায় মন্ত্রের স্থান আমি কোনদিনই অস্বীকার করিনি—আমার পিতৃদেবের ও পরিবারের দীক্ষা ও শিক্ষা উপনিষদের মন্ত্রেই, কিন্তু সে মন্ত্র যখন নিরর্থক আবৃত্তিচক্রে তার নিহিতার্থ লুপ্ত করে দেয় তখন সে মুক্তির নামে বন্ধনই করে সৃষ্টি। প্রাচীনের জয় ঘোষণার করতালি আজ আমার পক্ষে কঠিন নয়, একদিন তা পেয়েওছি ; কিন্তু মনকে আর দেশকে সনাতনের চুষিকাঠি হাতে ধরিয়ে ছেলেভোলানোর প্রবৃত্তি নেই আর। দেশের তরুণদের কাছেও প্রিয়বচন ছড়িয়ে প্রিয় হতে চাইনে—আঘাত দিতে ও নিতে প্রস্তুত যত দুঃখই পাই না কেন।"

কিন্তু তবুও মহাপঞ্চক চরিত্র আলোচনা করলে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ ঈষৎ আপোষপন্থী হয়েছেন। মহাপঞ্চক চরিত্রটিকে প্রথাবদ্ধ, আচারসর্বস্ব ধর্মাদর্শের প্রতীক রূপে দেখালেও, তাকে গুরুর কাছে নত করালেও, অচলায়তনকে ভেঙে দিলেও গুরুকে দিয়ে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ আহ্বান করলেন মহাপঞ্চককে শোণপাংশুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে। 'নূতন ও পুরাতন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> "আমাদের জ্ঞানীরাও সেইরূপ গোপন সতর্কতা সহকারে আধ্যাত্মিক চিরজীবন লাভের উপায় অন্বেষণ করেছিলেন। তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন—'যেনাহং' নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম' এবং অত্যন্ত দুঃসাধ্য উপায়ে অন্তরের মধ্যে সেই অমৃতরসের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন···কিন্তু হঠাৎ দ্বারভগ্ন করে বাহিরের দুর্দান্ত লোক ভারতবর্ষের সেই পবিত্র পরীক্ষা-শালার মধ্যে প্রবেশ করলে এবং সেই অন্বেষণের পরিণামফল সাধারণের কাছে অপ্রকাশিত রয়ে গেল।"—

অনেকে মহাপঞ্চককে আহ্বানের ব্যাখ্যা হিসাবে নূতন ও পুরাতনের এই অংশকে উৎকলন করেছেন কিন্তু মহাপঞ্চক কি প্রাচীন ভারতের ধর্ম সাধনা বা প্রাণসাধনার যথার্থ প্রতীক ? তার মধ্যে কি কোথাও মৈত্রেয়ী-প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে ? সে নিষ্ঠাবান, কিন্তু বিকৃত, পুথিসর্বস্ব ধর্মের প্রতিভূ মাত্র। সে কালঝণ্ঠি দেবীর কাছে চণ্ড বলির সমর্থক, একজটা দেবীর পূজক, মহাতামস ব্রত পালনের নির্মম রক্ষক। এখানে রবীন্দ্রনাথ আংশিকভাবে সংস্কারবাদকেই সমর্থন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য দাদাঠাকুরের বকলমে মহাপঞ্চকের "দৃষ্টি খুলে যাবার কথা বলেছেন। কিন্তু তার কোনো প্রমাণ বইয়ের মধ্যে আছে কি ? সে কৃচ্ছ্রসাধন জানে, যোগ-প্রাণায়াম জানে কিন্তু মৈত্রেয়ী সাধনার ব্যাকুলতা তার মধ্যে বিন্দুমাত্র নেই—সে নব-আয়তন গঠনের ডাকে সাড়াও দেয় নি—

সঞ্জীব ॥ মহাপঞ্চক দাদা, তুমিও এসো না।

মহাপঞ্চক ॥ না, আমি না।

মহাপঞ্চকের এই প্রত্যাখ্যান মর্যাদাভ্রষ্ট ক্ষুব্ধ মানুষের মনোভাব মাত্র।

কাজেই অচলায়তনে আচার্যের জ্ঞান, শোণপাংশুর কর্ম ও দর্ভকের ভক্তির সম্মিলনের কথা থাকলেও মহাপঞ্চকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ কৃতিত্বের পরিচয় দেন নি।

পুনর্মুদ্রন

রবীন্দ্রনাথ

বিপিনচন্দ্র পাল

রবীন্দ্র-সম্বর্ধনা—একদিক

রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা করিয়া বাঙ্গালী আজ আপনাকেই লোক-সমক্ষে সম্বর্ধিত করিয়াছে। কোনো জাতির যখন আত্মচৈতন্যের উদয় হয়, তখন তারা এইরূপ করিয়াই আপনাদের সমাজের মহৎ লোকদিগের মহত্ত্বের সমাদর করিয়া, পরোক্ষভাবে আপনাদিগকে বাড়াইয়া তুলে। যে গুণের আদর জানে না, সে আপনিও গুণহীন হইয়া পড়িয়া থাকে। যে যোগ্য ব্যক্তির উপযুক্ত সম্বর্ধনা করিতে কুণ্ঠিত হয়, সে আপনিও যোগ্যতাভ্রষ্ট হইয়া রহে। বাঙ্গালী একদিন গুণীর আদর ভুলিয়া গিয়াছিল। যোগ্যের সম্বর্ধনা যে সমাজের একটি অতি প্রধান কর্তব্য, বাঙ্গলার সমাজ একদিন ঐ বিধানকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের অন্ত্যলীলা তার সাক্ষী। কিন্তু বাঙ্গলার সে আত্মবিস্মৃতি ক্রমে ঘুচিয়া যাইতেছে। এই কয় বৎসরে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই সম্বর্ধনাও তারই প্রমাণ।

রবীন্দ্র-সম্বর্ধনা—আর একদিক

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুদ্ধ আপনার প্রতিভা-বলেই এইরূপ সমৃদ্ধ রাজসিক সম্বর্ধনা পাইয়াছেন, একেবারে এত বড় কথাটা বলিতেও সঙ্কোচ হয়। সরস্বতীর বরপুত্র হইয়াও রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্মীর কোমল অঙ্কেই ভূমিষ্ঠ হন। আজীবন তিনি সেই সম্পদের মধ্যেই লালিত-পালিত, সেবিত-বর্ধিত হইয়া আসিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কেবল কবি বা মনীষী নহেন। তিনি "প্রিন্স্" দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী ঠাকুর বংশের কুল-প্রদীপ। বাঙ্গলার বুনিয়াদী ও ফিরেঙ্গের বানানো রাজ-রাজড়ার সঙ্গে তার পরিবার-পরিজনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাঁর কুলের গৌরব ও ধনের গৌরব, রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক কবি-প্রতিভার সঙ্গে মিলিত হইয়া স্বর্ণ-সোহাগা যোগ সম্পাদন করিয়াছে।

এরূপ যোগাযোগ সংসারে অতি বিরল। এই শুভযোগ না হইলে আর্জ রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর দ্বারা যে সমারোহসহকারে সম্বর্ধিত হইয়াছেন, সেরূপভাবে সম্বর্ধিত হইতেন কি না সন্দেহের কথা।

ইহাতে রবীন্দ্রনাথের অগৌরবের কথা কিছুই নাই। যেখানেই নানা ভাবের, নানা চরিত্রের, নানাবিধ শিক্ষাদীক্ষাপ্রাপ্ত নানা লোকে সমবেত হইয়া, একসঙ্গে কোনো পূজা-অর্চনার আয়োজন করে, সেখানে এরূপ ভাবের খিচুড়ি পাকিয়া যাইবেই যাইবে। এ ক্ষেত্রে কখনো সকলে একভাবাপন্ন হইয়া আসে না। কেহ বা অর্চিতের রূপে মুগ্ধ হইয়া আসে, কেহ বা তাঁর গুণে বশ হইয়া আসে, কেহ বা স্বার্থের সন্ধানে, কেহ বা পরমার্থের অন্বেষণে আসে। আর কেহ বা সম্পূর্ণরূপেই উদাসীন ও উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে, শুধু যজ্ঞের জনতা বৃদ্ধি করিবার জন্যই পূজাস্থানে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এই সকলের দ্বারা উপাসকের অধিকারই জ্ঞাপিত হয়। উপাসকের ক্ষুদ্রতার দ্বারা কুত্রাপি উপাস্যের যোগ্যতার কোনো হানি হয় না। যিনি যে ভাবেই রবীন্দ্র সম্বর্ধনায় যোগ দিন না কেন, তাঁর ভাব তাঁহাকেই কেবল ক্ষুদ্র বা মহৎ করিয়াছে, তদ্দ্বারা রবীন্দ্রনাথের যোগ্যতার কিছুই হ্রাস বৃদ্ধি হয় নাই। এ যোগ্যতা রবীন্দ্রনাথের কুলের নহে। এ যোগ্যতা তাঁর কৌলিক ধনমর্যাদার নহে। এ যোগ্যতা তাঁর অলৌকিক কবি-প্রতিভার। তাঁর পৈত্রিক কুল ও ধনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই কবি-প্রতিভার এরূপ মণিকাঞ্চন যোগ না থাকিলে, বাঙ্গালী হয় ত আজ এইভাবে তাঁর সে শুদ্ধ সাত্ত্বিকী যোগ্যতার সম্বর্ধনা করিত না। কিন্তু তাহাতে কেবল আমাদেরই হীনতা প্রকাশিত হইত, রবীন্দ্র-প্রতিভার অযোগ্যতা প্রমাণিত হইত না।

বাঙ্গলা সাহিত্যে ও বাঙ্গালী জীবনে রবীন্দ্রনাথ

বাঙ্গলা-ভাষা ও বাঙ্গলা-সাহিত্যকে যাঁহারা এইকালে অভূতপূর্ব্ব শ্রীসম্পদে বিভূষিত করিয়াছেন ; বাঙ্গালীর জ্ঞান ও বাঙ্গালীর ভক্তিকে, বাঙ্গালীর আদর্শ ও বাঙ্গালীর আশাকে, বাঙ্গালীর ধর্ম ও বাঙ্গালীর কর্ম্মকে যাঁরা ইদানীন্তনকালে নানা প্রকারে ফুটাইয়া ও বাড়াইয়া তুলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ যে তাঁদের অগ্রণীদলভুক্ত একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। ডাক্তার যেমন শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া শারীরতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন, সাহিত্য-সমালোচক যদি সেই

প্রণালীতে রবীন্দ্রনাথের চিত্তের ও চরিত্রের বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করেন, তবে এদিক ওদিক দিয়া, অনেক অপূর্ণতা খুঁজিয়া পাইবেন, জানি। বাঙ্গলার অপরাপর শ্রেষ্ঠ কবিদিগের তুলনায় রবীন্দ্রের প্রতিভার সমালোচনা করিলে, তিনি তাঁদের চাইতে কোথায় বড় বা কোথায় ছোট, এ সকল কথা লইয়া অনেক তর্ক-বিতর্ক উঠিতে পারে, ইহাও মানি। বাংলা গদ্যে রবীন্দ্রনাথের দান কতটা ও স্থান কোথায়, এ প্রশ্ন লইয়াও মতভেদ হইতে পারে, স্বীকার করি। রবীন্দ্রনাথের ধর্মের সাধনা ও সমাজের আদর্শ সর্ববাদীসম্মত হওয়া সম্ভবই নহে। এ সকল মতান্তর অনিবার্য। কিন্তু এ সকল খণ্ডতা দ্বারা কোনো মহীয়সী প্রতিভার বিচার-বিবেচনা হয় না, হইতেই পারে না। কোনো কিছুরই সত্যকে তার আংশিকতার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রূপের যাচাই করিতে হইলে যেমন তাহাকে সমগ্রভাবে দেখিতে হয়, ভাগ ভাগ করিয়া দেখিলে সত্য দেখা হয় না; রূপ-বস্তুটা সমগ্রেই থাকে, একত্বেই বিরাজ করে, খণ্ডে খণ্ডে পৃথকভাবে তাহাকে পাওয়া যায় না; নাক, কাণ, চোক, হাত, পা, কটি, চুল, রং এ সকল খুঁটিনাটি ধরিলে প্রকৃত রূপের পরিচয় পাওয়া যায় না, তার ঠিক মূল্য নির্ধারণও সম্ভব হয় না। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মনীষীদিগের অলৌকিক প্রতিভার বিচারও সেইরূপ সমগ্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই করিতে হয়। টুকরা টুকরা করিয়া, তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, ওজন করিতে গেলে, সত্যিকার বস্তুটি যে কি ও কত বড় তার সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয় না। যাঁরা খুঁটিনাটি ধরিয়া রবীন্দ্র-প্রতিভার বিচার আলোচনা করিতে যাইবেন, তাঁরা কদাপি সে প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাইতে পারিবেন না। রবীন্দ্র কবি। রবীন্দ্র ঋষি। রবীন্দ্র শক্তিশালী লেখক। রবীন্দ্র জনপ্রিয় লোকনায়ক। জাতীয় জীবনের বিশাল কর্মক্ষেত্রে রবীন্দ্র ধর্মপ্রচারক ও সমাজ-সংস্কারক। এই ত্রিশ বৎসরকাল তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন বিভাগে আত্মপ্রকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইয়াছে। ঋজু কুটিলভাবে, তির্যক গতিতে তাঁহার জীবন ও কর্মস্রোত এই পঞ্চাশ বৎসরকাল এক নিত্য লক্ষ্যাভিমুখে ছুটিয়াছে। তিনি নানা সময়ে নানা কথা কহিয়াছেন। নানা মত প্রচার করিয়াছেন। নানা আদর্শের অনুসরণ করিয়াছেন। অথচ তাঁর জীবনে ও চিন্তায়, ভাবে ও কর্মে, এই সকল বিভিন্ন আদর্শ ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যাহা সর্বদা আত্মপ্রকাশের প্রয়াস

পাইয়াছে, সে বস্তু এক, বহু নহে। সে বস্তুর রূপ অনেক, কিন্তু স্বরূপ এক। সেই স্বরূপেই রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রের প্রতিভাকে বুঝিতে হইলে, সর্বাদৌ তাঁর এই ভিতরকার স্বরূপটিকে ধরিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ

আর আপনার স্বরূপে রবীন্দ্র জ্ঞানীও নহেন, কর্মীও নহেন, কিন্তু শুদ্ধ কবি। এই কবি বস্তু যে কি, তাহা দেখিলে চেনা যায়, কিন্তু মুখে বলিয়া বোঝান সহজ নহে। রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলা যাইতেও বা পারে, কিন্তু রসাত্মক বাক্য রচনায় নিপুণতা থাকিলেও, কেহ সত্য সত্য কবি নাও হইতে পারেন। চোকে যাহা দেখা যায় না, তাহাই দেখা; কাণে যাহা শোনা যায় না, তাহাই শোনা; যাহা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ নহে, তাহারই প্রত্যক্ষ লাভ করা, আর এ সকল অতীন্দ্রিয় বিষয়কে প্রত্যক্ষ করিয়া ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ রূপরসের সঙ্গে তাহাদিগকে মিলাইয়া দিয়া, এক অভূত অদ্ভুত ভাব-জগতের সৃষ্টি করা, ইহাই কবির সত্যধর্ম। প্রকৃত কবি তর্ক করেন না, যুক্তি করেন না, বিচার করেন না, আলোচা করেন না, কেবল আপনার অন্তশ্চক্ষুতে সত্য ও সৌন্দর্য দেখেন, আর এই রূপে যাহা দেখেন, তাহাই ভাষার তুলিকায় আঁকিয়া লোকসমক্ষে ধারণ করেন। এই অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিই কবির প্রাণ। এই জন্য ঋষিদিগের ন্যায় কবিও দ্রষ্টা কিন্তু দার্শনিক নহেন, জ্ঞাতা কিন্তু বৈজ্ঞানিক নহেন। দার্শনিক সম্যক বিচারের উপরে আপনার সিদ্ধান্তকে স্থাপন করেন। কবি শুদ্ধ আত্মানুভূতির উপরে সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বিচারের জন্য চারিদিক দেখা আবশ্যক। শুদ্ধ অনুভূতির জন্য এরূপ সম্যক দর্শন নিষ্প্রয়োজন। আমরা আজিকালি যাহাকে বিজ্ঞান বলি, যাহা প্রকৃতপক্ষে কেবল জড়বিজ্ঞান মাত্র, এই বিজ্ঞানও বিষয়ীকে পশ্চাতে রাখিয়া বিষয়কেই সর্বথা এগিয়ে দেয়। জ্ঞাতার নহে, কিন্তু জ্ঞেয়ের প্রকৃতি ও গুণাদির পরীক্ষা করাই এই বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং এই বিজ্ঞানও জ্ঞেয় বিষয়ের বিশ্লেষণ করিয়া তাহার গুণ ও ক্রিয়াদি আবিষ্কার করিতেই ব্যস্ত। এই পথে যে ভাবের যতটুকু সত্য পাওয়া যায়, বৈজ্ঞানিক তারই অন্বেষণ করেন। কিন্তু কবির পথ এ নহে। কবি বস্তুর ভিতরকার গুণাগুণের গতি লক্ষ্য করেন না, কিন্তু বস্তু সাক্ষাৎকারে তাঁর আপনার অন্তরে

কোন রসের কতটা উদ্রেক হইল, তাহাই দেখেন ও আস্বাদন করেন। বৈজ্ঞানিক যেরূপ বস্তু-তন্ত্রতা চাহেন, কবির সেরূপ বাহ্য বস্তু-তন্ত্রতার একান্তই প্রয়োজনাভাব। বৈজ্ঞানিকের অধিকার বাহিরে, বিষয়-জগতে। কবির অধিকার ভিতরে অন্তর্জগতে। বৈজ্ঞানিক বহির্ম্মুখীন ও বিষয়াভিমুখীন। কবি অন্তর্মুখীন ও আত্মাভিমুখীন। বৈজ্ঞানিক বাহিরের প্রামাণ্য না পাইলে, সত্যের প্রতিষ্ঠা হইল বলিয়া বিশ্বাস করেন না। কবি ভিতরের ভাবের, রসের আত্মানুভূতির প্রামাণ্যকেই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট মনে করিয়া বাহিরের প্রামাণ্যের প্রতি উদাসীন হইয়া থাকেন। কবিতে ও বৈজ্ঞানিকে এই প্রভেদ। অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মানুভূতি এই সকলই কবি-প্রতিভার স্বরূপ। এই স্বরূপলক্ষণ যে কবির কবিত্বে যতটা বেশী প্রকাশিত হয় তাঁর কবি প্রতিভাকেই সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা

এই কষ্টিপাথর দিয়া পরীক্ষা করিলে, রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভাকে কেবল বাঙ্গলার নহে, সমগ্র সভ্যজগতের কবিসমাজে অতি উচ্চ আসন দিতেই হইবে। শব্দ-সম্পদে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ কবি আরও আছেন। চিত্রাঙ্কনের চাতুর্যেও তাঁর সমকক্ষ কিম্বা তাঁহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিল্পীও পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু রসানুভূতির তীক্ষ্ণতা ও অধ্যাত্ম দৃষ্টির প্রসার ও গভীরতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরে, বাঙ্গলায় জন্মিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। আর কালধর্মবশতঃ বৈষ্ণব-কবিদিগের মধ্যেও যতটা প্রসারতা ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় নাই, যুগপ্রভাবে রবীন্দ্রনাথের সে প্রসারতা ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে রবীন্দ্রনাথ অনুভূতির বিস্তৃতিতে ও অনুভাব্য বিষয়ের বিচিত্রতাতে যতটা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, অন্য দিকে সেই পরিমাণে তাঁর রসানুভূতির গভীরতা ও বাস্তবতা বৈষ্ণব-কবিদিগের অপেক্ষা হীন বলিয়াই মনে হয়। বৈষ্ণব-কবিগণ কেবল কবি ছিলেন না, অতি উচ্চ অধিকারের সাধকও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথেরও ধর্মপিপাসা প্রবল। সাধনের আকাঙ্ক্ষাও বহুদিন হইতেই জন্মিয়াছে। আপনার অলৌকিক কবি-প্রতিভার স্ফুরণেই তিনি জীবনের সার্থকতা লাভ হইল মনে

করেন না। ধর্মকে এবং ব্রহ্মকে না পাইলে, তাঁর সকলই বিফল ও ব্যর্থ হইয়া গেল,—রবীন্দ্রনাথের এ ভাবটা ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাঁর আপনার সম্প্রদায় মধ্যে যে সাধন প্রচলিত আছে, সে সাধনেও রবীন্দ্রনাথ এখন আর উদাসীন নহেন। কিন্তু বৈষ্ণব-কবিদিগের সাধনায় এমন একটা বস্তুতন্ত্রতা ছিল, আমাদের এই নবীনযুগের প্রমুক্ত সাধনায় যে বস্তুতন্ত্রতা নাই। প্রাচীন ধর্ম সকলেই গুরুমুখী। সকলেই অবতাররূপে বা গুরুরূপে ভগবানের একটা বহিঃপ্রকাশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বৈষ্ণব-কবিগণ ভগবানের দ্বিবিধ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এক অন্তরে—চৈত্য গুরুরূপে; অপর বাহিরে—মোহান্ত গুরুরূপে। এইজন্যই তাঁদের সাধনা যুগপৎ অন্তর্মুখীন ও বস্তুতন্ত্র হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তে ও সাধনায় কেবল চৈত্যগুরুরই স্থান আছে, বৈষ্ণবেরা যাঁহাকে মোহান্তগুরু বলেন, তার স্থান নাই। ভগবান চৈত্যগুরুরূপে জীবের অন্তরে, তার ভিতরকার জ্ঞানভাবাদির ভিতর দিয়া, তার স্বানুভূতিকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হন। চৈত্যগুরুকে অগ্রাহ্য করিলে চলে না। কিন্তু এই চৈত্য প্রকাশ আংশিক, পূর্ণ নহে। এই প্রকাশে জীবের অহংবুদ্ধি ভগবানকে ওতপ্রোতভাবে ঘেরিয়া থাকে। এখানে জীব অনেক সময় আপনার প্রাকৃত বুদ্ধির সিদ্ধান্ত ও অসংস্কৃত প্রবৃত্তির খেয়ালকেই আপনার ইন্দ্রিয়বিকার প্রসূত বিবিধ রসরাগে রঞ্জিত করিয়া, ভগবৎপ্রকাশ বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে। মোহান্তগুরু এই ভ্রম নিরস্ত করিয়া থাকেন। চিত্তে যে ভগবৎ প্রকাশ হয়, তাহা যখন মোহান্তগুরু বা সদ্‌গুরুতে তাঁর যে অধিষ্ঠান হয়, তার সঙ্গে মিলিয়া যায়,—চৈত্যপ্রকাশ ও মোহান্ত প্রকাশ—যখন একে অন্যের সমর্থন ও পরস্পরকে প্রতিষ্ঠিত করে, তখনই ভিতরকার আদর্শ ও ভাব সত্যাপেত ও বস্তুতন্ত্র হয়। ভিতর বাহিরের এই অপূর্ব সমাবেশ আছে বলিয়া, বৈষ্ণবকবিগণ একান্ত অন্তর্মুখীন হইয়াও অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কদাপি বস্তুতন্ত্রতা ভ্রষ্ট হন নাই। রবীন্দ্রনাথের সাধনার সঙ্গে তুলনায় বৈষ্ণবকবিদিগের সাধনার ইহাই বিশেষত্ব। আর এই বস্তুতন্ত্র সাধন গুণেই তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে কোনো কোনো দিকে একান্তভাবেই অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন, নতুবা তাঁদের প্রতিভা ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাতে জাতিগত শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট-ভেদে কোনো বিশেষ তারতম্য আছে কি না সন্দেহ।

রবীন্দ্রনাথের অন্তর্মুখীনতা

যে ঐকান্তিকী অন্তর্মুখীনতা ও রসানুভূতি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত করে, তাহাই আবার তাঁর দুর্বলতারও মূল কারণ হইয়া আছে। একদিক দিয়া একান্ত অন্তর্মুখীন প্রতিভা যেমন আপনার ভিতরকার ভাব গ্রহণ করিয়া থাকে ও তাহাতেই একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করে, অন্যদিকে সেইরূপ সর্বদাই একান্তভাবে বাহিরের প্রেরণারও অধীন হইয়া রহে। একান্ত অন্তর্মুখীন প্রতিভা সত্যের একদেশমাত্র প্রত্যক্ষ করে। সত্য কেবল বাহির লইয়া নহে, কেবল ভিতর লইয়াও নহে। বাহির ও ভিতর, সত্যের এই দুই অঙ্গ। এই দুই অঙ্গে সত্য পূর্ণতা লাভ করে। বাহিরের সঙ্গে ভিতরের যে সম্বন্ধ তাহা আকস্মিক নহে, অঙ্গাঙ্গী। একটিকে ছাড়িয়া, অপরটিকে ধরা সম্ভব নহে। "যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে," এ কথা যেমন সত্য, যাহা পাই না ব্রহ্মাণ্ডে, তাহা জাগে না ভাণ্ডে, এ কথাও তেমনি সত্য। ভাণ্ডকে ছাড়িয়া ব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার। ব্রহ্মাণ্ডকে ছাড়িয়া ভাণ্ড শূন্য, নিরাকার। আর অন্ধকার ও নিরাকার উভয়েই জ্ঞানসীমার বহির্ভূত। দুই-এর কোনোটাকেই জ্ঞানগোচর করা সম্ভব নহে। একান্ত অন্তর্মুখীন বুদ্ধি ও প্রতিভা কেবল ভাণ্ডেতেই, কেবল ভিতরকার অনুভূতির মধ্যেই, সত্যের প্রামাণ্য অন্বেষণ ও প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, ব্রহ্মাণ্ডের বা বহির্বিষয়ের প্রামাণ্যের প্রতি দৃকপাতও করে না। ইহার ফলে মতে ও সত্যে, কল্পনাতে ও বস্তুতে মূলতঃ কোন প্রভেদ আর থাকে না। এ অবস্থায় পরিণামে কেবল ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই বস্তুর প্রামাণ্য হইয়া দাঁড়ায় এবং একমাত্র অনুভূতিই সত্যের আসন অধিকার করিয়া বসে। সত্যের সার্বজনীনতা রাখা তখন একান্তই দুষ্কর হইয়া উঠে। যে তত্ত্বে এই সার্বজনীনতা রক্ষা পায়, রবীন্দ্রনাথ এখনো সে তত্ত্বকে ভাল করিয়া ধরিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আর তাঁর অলৌকিক প্রতিভার ঐকান্তিকী অন্তর্মুখীনতাই এ পথে সিদ্ধির অন্তরায় হইয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথের বাহ্য-প্রেরণার অধীনতা

কিন্তু মানুষ যতই কেন অন্তর্মুখীন হউক না, কিছুতেই সহজে বাহিরের প্রেরণার হাত এড়াইতে পারে না। বৈদান্তিক সাধনে বাহিরের সঙ্গে সর্ব-

প্রকারের সম্বন্ধ ছেদনের পন্থা ও প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সে পথ সন্ন্যাসীর পক্ষেই প্রশস্ত, গৃহীর পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নহে। সে পথে চলিতে গেলে, যথাসম্ভব বিষয়ের সঙ্গে সর্বপ্রকারের সম্পর্ক ছেদন করা আবশ্যক হয়। রবীন্দ্রনাথ সে পথের পথিক নন। "ভিক্ষাশনঞ্চ জীবিতম্"—তাঁর জীবনের ধর্ম বা আদর্শ নহে। রবীন্দ্রনাথ গৃহী। রবীন্দ্রনাথ এখন সংযমী কিন্তু কখনো সন্ন্যাসী ছিলেন না। সুতরাং বাহিরের সম্পর্কেও প্রেরণা হইতে তিনি মুক্তিলাভ করেন নাই। আর এই জন্যই ক্ষণে ক্ষণে বহির্বিষয়ের তাড়নায় বাহিরের অভিনব অবস্থার বা অভিজ্ঞতার আঘাতে, এক একবার রবীন্দ্রনাথের মনগড়া জগৎ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায় ও তাঁহাকে আবার নূতন করিয়া জীবনের সমস্যাভেদে নিযুক্ত হইতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের উপরে তাঁর পিতার চরিত্রের ও সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত ও আদর্শের প্রভাব

এই ঐকান্তিকী অন্তর্মুখীনতা রবীন্দ্রনাথের পৈত্রিক বস্তু। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেও ইহা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। আধুনিক যুগের ধর্মসংস্কারকদিগের ইহা একরূপ সাধারণ ধর্ম বলিলেও হয়। যে ব্যক্তিত্বাভিমান আমাদের দেশে ও অন্যত্র শাস্ত্রগুরুর প্রয়োজন ও প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া, আপনার ধর্মের প্রামাণ্যকে একান্ত ভাবেই প্রাকৃত বুদ্ধিবিচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হয়, তাহা এই ঐকান্তিকী অন্তর্মুখীনতারই ফল। এই অন্তর্মুখীনতার আতিশয্য হইতেই, ইংরেজীতে যাহাকে subjective individualism বলে, তাহার উৎপত্তি হয়। এই নিঃসঙ্গ স্বানুভূতির উপরেই বহুদিন হইতে আমাদের ব্রাহ্মসমাজের ধর্মের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে। যাঁরা শাস্ত্রগুরু বর্জন করিয়া ধর্মসাধনে প্রয়াসী হইবেন, তাঁহাদের পক্ষে এই subjective individualism বা ব্যক্তিগত অনুভূতির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব ও অসাধ্য। ব্রাহ্মসম্প্রদায়-প্রবর্তক রাজর্ষি রামমোহন শাস্ত্রও মানিতেন, গুরুগ্রহণও করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার নিজের ধর্মের প্রামাণ্য শুদ্ধ স্বানুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রাকৃত জনে যে শাস্ত্র-প্রামাণ্যে বিশ্বাস করে, রামমোহন সেরূপ শাস্ত্র-প্রামাণ্য মানিতেন না, সত্য। কিন্তু

ভারতের প্রাচীন ঋষি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তেও এইরূপ অতিপ্রাকৃত শাস্ত্র-প্রামাণ্য গৃহীত হয় নাই। রামমোহন এই বিষয়ে প্রাচীন ঋষিপন্থা অবলম্বন করিয়া, যোগবাশিষ্ঠের নির্দ্দেশ অনুসারে, সুশাস্ত্র, সদ্‌গুরু ও স্বানুভূতি এই তিনের একবাক্যতার উপরেই সত্যের ও ধর্মের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজার পরবর্তী ব্রাহ্মআচার্যগণ ঠিক এই পথ ধরিয়া চলেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র উভয়েই শাস্ত্রের প্রামাণ্য ও সদ্‌গুরুর প্রয়োজন অস্বীকার করিয়া, প্রথমে শুদ্ধ স্বানুভূতির উপরে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। আর শুদ্ধ স্বানুভূতির উপরে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিলে, ব্যক্তিগত মতামতে ও সার্বভৌমিক সত্যে, প্রবৃত্তির প্ররোচনাতে ও ধর্মের প্রেরণাতে যে বস্তুতঃ কোনই প্রভেদ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়, মহর্ষি ও ব্রহ্মানন্দ উভয়েই ক্রমে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা উভয়েই পরে, আপনাদের সম্প্রদায়কে নিঃসঙ্গ ও নিরঙ্কুশ স্বানুভূতির অরাজকতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আপনারাই শাস্ত্রপ্রবর্তক হইয়া পড়েন। মহর্ষি প্রথম বয়সে বেদের প্রামাণ্য অগ্রাহ্য করিয়া, শেষ জীবনে আপনার সঙ্কলিত ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থকেই ব্রাহ্ম-সম্প্রদায় মধ্যে শাস্ত্রের আসনে বসাইয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থভগবৎ-প্রেরণাতেই সঙ্কলিত হয়, ও এই গ্রন্থে সঙ্কলিত শ্রুতিসকলের যে ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও যে তাঁর নিজের কল্পিত নয়, কিন্তু সর্বতোভাবেই ঈশ্বরানুপ্রাণিত, মহর্ষি ইদানীং বহুবার এই কথা বলিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও এক সময়ে প্রাচীন শাস্ত্রসংহিতাকে বর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার শিষ্যমণ্ডলীর স্বানুভূতির অনিয়ন্ত্রিত প্রভুত্বে সমাজে অরাজকতার ও যথেচ্ছাচারের প্রতিষ্ঠার আশঙ্কা করিয়া, শেষে আপনিই "নবসংহিতা" প্রণয়ন করেন। কেশবচন্দ্রের নববিধানমণ্ডলী মধ্যে এই "নবসংহিতা" হিন্দুর মনুসংহিতার ন্যায় স্বীকৃত ও সম্মানিত হইয়া আছে। কিন্তু এ সকল চেষ্টা সত্ত্বেও ব্রাহ্মসম্প্রদায় মধ্যে নিঃসঙ্গ স্বানুভূতি বা subjective individualism-এর প্রভাব এখনও অপ্রতিহত রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের পরিবার ও সমাজ

রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিকী অন্তর্মুখীনতা এই নিঃসঙ্গ স্বানুভূতির বা subjective individualism-এরই রূপান্তর মাত্র। এ বস্তু তাঁর পৈত্রিক ও সাম্প্রদায়িকা যে শিক্ষা ও সাধনাতে এই অন্তর্মুখীনতাকে বস্তুসংস্পর্শে

সংযত ও শোধিত করিতে পারিত, রবীন্দ্রনাথ সে শিক্ষা ও সাধনা লাভ করেন নাই। কলিকাতার আধুনিক অভিজাত সমাজে একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বাস করেন। সহরের সমাজে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রমুক্ত মেশামেশির ও প্রবৃত্তি থাকিতেই পারে না। সকলেই আপন আপন সংসার ও স্বার্থের সন্ধানেই ফেরে, একে অন্যের সঙ্গে আলাপ-আত্মীয়তা করিবার অবসর পায় না। যাঁদের অন্নচিন্তা নাই, সঞ্চিত ধন যাঁহাদিগকে দৈনন্দিন জীবিকা-উপার্জনের শ্রম ও ব্যস্ততা হইতে মুক্তি দিয়াছে, তাঁরাও কেবল আপনার সমশ্রেণীর ধনীজনের সঙ্গেই আলাপ-আত্মীয়তা করেন, জনসাধারণের সঙ্গে কোনরূপ ঘনিষ্ঠতা তাঁদের জন্মিতেই পারে না। পল্লীসমাজে ধনী-নির্ধনের মধ্যে, বিজ্ঞ ও অজ্ঞের মধ্যে, লোকে যাহাদিগকে ভদ্র বলে ও যাদের ইতর বলে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যেরূপ হইয়া থাকে, এইজন্য যেরূপ একটা মেশামেশি খোলাখুলি ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, বড় বড় সহরে, বিশেষ আজিকালিকার দিনে, তাহার একান্তই অভাব হয়। এই মেশামেশির অভাবে কলিকাতার বড়লোকদের পক্ষে দেশের আপামর সাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কোনো যোগাযোগ স্থাপন করা একরূপ অসম্ভব ও অসাধ্য। ইহাদের জীবনের অন্তঃপুরে জনসাধারণের প্রবেশপথ নাই। জনসাধারণের জীবনের অন্তঃপুরেও ইহাদের কোনো প্রবেশপথ নাই। চারিদিকের দীনদরিদ্রেরা কিরূপে দিনপাত করে, তাদের সংসারের সমস্যা, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ের আবেগ, জীবনের সংগ্রাম, কোন্ দিক দিয়া, কি ভাবে যে উঠে পড়ে, প্রতিবেশী ধনীসম্প্রদায় তার কিছুই জানিতে পারেন না। তাঁরা আপনাদের ত্রিতল প্রাসাদের ছাদ হইতে গরীবের খোলার চালা ও মাটীর দেওয়াল মাত্র দেখেন। ঐ চালার নীচে, ঐ দেওয়ালের মাঝখানে, ঐ ক্ষুদ্র, জঞ্জালময়, কুটীর প্রাঙ্গনে, কত আশা, কত ভয়, কত অনুরাগ, কত বিরাগ, কত লোভ ও কত ত্যাগ যে দিনরাত্রি কত ছোটাছুটি করিতেছে. সেখানে জীবে ও শিবে কি যে মাখামাখি, কি যে লীলাখেলা, কি যে হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি লাগিয়া আছে—, এ সকল দেখিবার অবসর ও বুঝিবার অধিকার তাঁহাদের হয় না। তাঁদের নিজেদের জ্ঞানের, ভাবের, ভোগের, বিলাসের সখ্যের ও সৌখীনতার জগৎটাই তাঁদের কাছে প্রত্যক্ষ ও সত্য এবং ইহার বাহিরে যে বিশাল সমাজ পড়িয়া আছে, সেটা তাঁহাদের অপ্রত্যক্ষ ও অজ্ঞাত।

রবীন্দ্রনাথ এই ধনীসমাজে জন্মিয়া, তাহারই মধ্যে বাড়িয়া উঠেন। তার উপরে মহর্ষি আপনার ধর্মমতের জন্য সমাজচ্যুত হওয়াতে, তাঁর পরিবারবর্গের জীবন কলিকাতার সাধারণ ধনীসম্প্রদায়ের জীবন অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণতর হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রের উদার প্রাণ, এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আপনার স্বাভাবিক মুক্তভাব আস্বাদন করিবার জন্য, আশৈশবই এক সুবিশাল কল্পিত জগৎ রচনা করিয়া, তাহারই মধ্যে বিহার ও বিচরণ করিয়াছে। তাঁর আপনার পরিবারের দুচারটি প্রাণের সঙ্গেই রবীন্দ্রের প্রাণের প্রত্যক্ষ ও সত্য যোগাযোগ ছিল। এই গুটিকয়েক আধারেই রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎভাবে লোকচরিত্র অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন। স্নেহের, প্রেমের, ভক্তির এই গুটিকয়েক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের উপরেই রবীন্দ্রনাথ আপনার বিচিত্র রসজগৎ নির্মাণ করিয়াছেন। এর বাহিরে তিনি যাহা গড়িতে গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক প্রভাবই প্রকাশিত হইয়াছে, সত্যের স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ শতরঞ্চগালিচামণ্ডিত ত্রিতল প্রাসাদকক্ষে বসিয়া, মানসচক্ষে কর্দমমর্দিত, পিচ্ছল পল্লীপথ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুচিক্কনবপু, সুমার্জিতরুচি স্বজনবর্গে পরিবৃত থাকিয়া, সুদূর দরিদ্রপল্লীর শুষ্কদেহ, রুক্ষকেশ নরনারী সকলের অপূর্ব তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। অলৌকিক কবিপ্রতিভার এ 'অঘটনঘটন-পটীয়সী' মায়িক প্রভাব সর্বত্রই থাকে। আর এইরূপ মায়িক সৃষ্টির এমন একটা মোহিনী শক্তিও থাকে, যাহাতে মানুষকে এমন করিয়া মাতাইয়া তুলিতে পারে যে, সত্যিকার সুখদুঃখের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ সর্বদা সকলকে সেরূপভাবে মাতাইয়া তুলিতে পারে না। কল্পনার তুলিকায় দারিদ্র্যদুঃখ অঙ্কিত করিয়া সেই চিত্রসহায়ে দারিদ্র্যের মধুটুকুই আমরা আস্বাদন করিয়া থাকি, তার তীক্ষ্ণ হুলটা আমাদের গায়ে বিঁধে না। উৎকৃষ্টতম তৈলচিত্র যেমন কতকটা দূরে দাঁড়াইয়াই দেখিতে হয়, একান্ত নিকটে গেলে, বর্ণের বন্ধুরতা চক্ষুগোচর হইয়া চিত্রের সৌন্দর্য নষ্ট করিয়া ফেলে, জনচিত্রে সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। এ সংসারে ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই মধ্যে ছায়াতপের ন্যায় ভালমন্দ মিশিয়া আছে। দূর হইতে ভালটুকুই আমরা অনেক সময় দেখি, মন্দটুকু চক্ষে পড়ে না। এইজন্য দরিদ্র ধনীকে ঈর্ষা করেন, আর কখনো কখনো ধনীও যে আপনার বিষয়ের দুর্ভাবনার ও প্রতিদিনের

জীবনের অসার কৃত্রিমতা দ্বারা একান্ত পীড়িত হইয়া, পর্ণকুটীরের সরল, সহজ জীবনের প্রতি লোলুপদৃষ্টি প্রেরণ করেন না, এমনও নহে। কিন্তু প্রমোদ প্রাসাদ হইতে কল্পনার দূরবীক্ষণ সহায়ে, দূরস্থিত পর্ণকুটীরের অনাবিল প্রেমলীলা প্রত্যক্ষ করাতে যে আনন্দ জাগিয়া উঠে, সেই পর্ণকুটীরের জীর্ণ-কন্থার কীটানুলীলা ও শীর্ণদেহ, জীর্ণপ্রাণ কুটীরবাসীদিগের কলহ-কোলাহল প্রত্যক্ষ করিলে আর সে আনন্দটুকু থাকে না। বস্তু সংস্পর্শে এই কল্পিত জগৎ চক্ষের পলকে মায়াপুরীর ন্যায় শূন্যে মিলাইয়া যায়।

আমি এ কথা ভুলি নাই যে, তাঁর পৈত্রিক জমিদারী তত্ত্বাবধানের ভার বৎসর ব্যাপিয়া রবীন্দ্রনাথের উপরেই ন্যস্ত ছিল। এবং এই উপলক্ষ্যে তিনি বহুকাল শিলাইদহ ও অন্যান্য স্থানে থাকিয়া সাক্ষাৎভাবে বাঙ্গলার পল্লীজীবন পর্যবেক্ষণ করিবার অবসরও পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই বাহ্যযোগ নিবন্ধনই যে সে জীবনের অন্তঃপুরে তিনি প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিলেন, একেবারে এ মীমাংসা করা যায় না। বড় বড় জমিদারীর "বাবুদের" সঙ্গে তাঁহাদের প্রজাসাধারণের কোনো প্রকারের ঘনিষ্ঠ ও প্রমুক্ত মেশামেশি কুত্রাপি সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথের উদার অন্তরে এইরূপ যোগাযোগ স্থাপনের বলবতী আকাঙ্ক্ষার উদয় হওয়া স্বাভাবিক। সাংসারিক ধনপদাদির অবস্থার আকস্মিক তারতম্যকে অগ্রাহ্য করিয়া, মানুষ বলিয়াই মানুষকে শ্রদ্ধা ও প্রীতিভরে প্রাণে টানিয়া লইবার জন্য একটা লালসা ধর্মপ্রাণ রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে যে সময় সময় আকুল করিয়া তুলিয়াছে, ইহাও সত্য। সাংসারিক অবস্থার তারতম্য মানুষে মানুষে যে ব্যবধান সৃষ্টি করে, আপনার আচার-ব্যবহারে ও সন্তানগণের শিক্ষা-দীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ সে ব্যবধানটাকে ঘুচাইবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন, ইহাও জানি। কিন্তু এ সকল সাধু চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের প্রাণের উদারতা মাত্রই প্রকাশিত হয়, সে সকল চেষ্টার সফলতা তো আর সপ্রমাণ হয় না। বড় ছোট উভয় পক্ষের সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতির উপরেই এ সকল চেষ্টার সফলতা নির্ভর করে। আর এ আত্মবিস্মৃতিলাভ কোনো পক্ষেরই সহজ নহে। বিশেষতঃ পাদ্রিজন সুলভ সৌহার্দ্য ও বিশ্বমানবী প্রেমে কিছুতেই এরূপ আত্মবিস্মৃতি জন্মানো সম্ভব হয় না। এ আত্মবিস্মৃতিলাভ করিতে গেলে, ধনীকে ধনের মূল্যটা ভুলিতে হয়, জ্ঞানীকে জ্ঞানের প্রাধান্যটা ভুলিতে হয়, ললিতকলার

উপাসককে ললিত-লালিত্যের সুকুমার অনুভূতিটা ভুলিতে হয়, আর ধার্মিককে অপরের ধর্ম হইতে আপনার ধর্মটা যে শ্রেষ্ঠ এই ভাবটা পর্যন্ত একেবারে বিস্মৃত হইতে হয়। যেখানে সমাজের সাধারণ বিধিব্যবস্থা আপনা হইতেই ধনী ও নির্ধনের, বিজ্ঞ ও অজ্ঞের, ধার্মিক ও অধার্মিকের মধ্যে কোনো প্রকারের আত্যন্তিক ব্যবধান প্রতিষ্ঠার ব্যাঘাত না জন্মায়; যেখানে সামাজিক জীবনে ধনী দরিদ্রের সঙ্গে দৈনন্দিন কার্যকলাপের মধ্যে সিঃসঙ্কোচে ও নিরভিমান সহকারে মেশামিশি করেন না; যেখানে বিজ্ঞেরা আপনাদের বিজ্ঞতার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গেই খ্রীষ্টীয় কথা-প্রসিদ্ধ সেণ্ট সাইমনের মত, দিবানিশি বসিয়া রহেন, অজ্ঞের ন্যায় অজ্ঞের সঙ্গে প্রমুক্তভাবে মিশিবার প্রবৃত্তি ও অবসর লাভ করেন না; যেখানে ধার্মিক একচক্ষে আপনার সম্প্রদায়গত সিদ্ধান্ত ও সংস্কারাদির শ্রেষ্ঠতা ধ্যান করেন, আর অপরের চক্ষে অন্য সম্প্রদায়সকলের সিদ্ধান্ত ও সংস্কারাদির হীনতা দেখিয়া সেগুলিকে উন্নত ও বিশুদ্ধ করিবার জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন;—সেখানে এ ব্যবধান নষ্ট করা কেবল অসাধ্য যে তাহা নহে, চেষ্টা মাত্রেই যে ব্যবধানকে নষ্ট করিতে যাওয়া হয়, তাহাকেই আরো বাড়াইয়া তোলে। এই জন্য এই শতাধিক বৎসরের অশেষ চেষ্টাতেও মার্কিণ সমাজে শেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের সামাজিক ব্যবধানটা নষ্ট তো হয়ই নাই, বরং এই সাধুচেষ্টারই ফলে শ্বেতকৃষ্ণে বাহিরের আইন কানুনের বৈষম্য যে পরিমাণে কমিতেছে, ভিতরকার মনের ব্যবধানটা যেন সেই পরিমাণেই আরো বাড়িয়া যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার আধুনিক অভিজাত সমাজে জন্মিয়া তাহারই অঙ্কে, তারই দোষগুণের ভাগী হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছেন। এই সমাজে এই ব্যবধানটা চিরদিনই আছে। কলিকাতার বড় বড় জমিদারদের জমিদারীতে এ ব্যবধানটা স্থায়ী হইয়া গিয়াছে। সেখানে না আছে প্রজার কুলের আদর, না আছে তার বিদ্যার গৌরব, না আছে তার চরিত্রের মর্যাদা। মহর্ষির জমিদারীতেও এ সকলের কোন বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। আর বহুকাল হইতে তাঁহাদের জমিদারীতে যে সকল জমিদারী আচার-নিয়ম প্রবর্তিত রহিয়াছে, তার কিম্বদন্তী পর্যন্ত যতদিন প্রজাবর্গের স্মৃতিতে জাগরূক থাকিবে, ততদিন তাহাদের পক্ষে আপনাদের প্রজাত্বের অগৌরব বিস্মৃত হইয়া একান্ত প্রমুক্তভাবে জমিদারবাবুদের সঙ্গে মেশামেশি করা সম্ভবই নয়। আর প্রজারা

যতদিন না এ অকুণ্ঠা লাভ করিয়াছে, ততদিন কেবল জমিদারের উদারতায় বা বিশ্বমানবপ্রেমে পরস্পরের মধ্যকার পুরুষানুক্রমিক ব্যবধানটা কিছুতেই ঘুচিবারও নহে। আর এই ব্যবধান নষ্ট হয় নাই বলিয়াই, আপনার জমিদারীর পল্লীসমাজের মাঝখানে বহুদিন বাস করিয়াও, ঔদার্য সাধনের আন্তরিক আগ্রহ চেষ্টা সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথ সে সমাজের প্রাণের অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করেন নাই। অতি নিকটে থাকিয়াও, বাঙ্গলার পল্লীজীবন ও বাঙ্গালীর সাচ্চা প্রাণটা চিরদিনই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথের মায়িক সৃষ্টি ও মায়াশক্তি

রবীন্দ্রনাথের অনেক সৃষ্টিই এইরূপ মায়িক। ঊর্ণনাভ যেমন আপনার ভিতর হইতে তন্তু বাহির করিয়া অদ্ভুত জাল বিস্তার করে, রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ আপনার অন্তর হইতেই অনেক সময় ভাবের ও রসের তন্তু সকল বাহির করিয়া, আপনার অদ্ভুত কাব্য সকল রচনা করিয়াছেন। তাঁর কাব্য যেমন কচ্চিৎ বস্তুতন্ত্র হইয়াছে, তাঁর চিত্রিত লোকচরিত্রেও অনেক সময় এই বস্তুতন্ত্রতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষুদ্র গল্প লিখিয়াছেন, দুচারখানি বৃহদাকারের উপন্যাসও রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁর চিত্রিত চরিত্রের প্রতিরূপ বাস্তব জীবনে কচ্চিৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। কেবল রবীন্দ্রনাথ যেখানে আধুনিক ইঙ্গবঙ্গের বা তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের চরিত্র চিত্রিত করিতে গিয়াছেন, সেখানেই তাঁর চিত্রগুলি অসাধারণ বস্তুতন্ত্রতা লাভ করিয়াছে। এ বিষয়ে "গোরা"র হারাণবাবুটি অপূর্ব বস্তু হইয়াছে। কিন্তু এরূপ গুটিকতক চিত্র ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের অনেক সৃষ্টিই মায়িক। আর যেমন তাঁর কাব্যে ও গল্পে এই মায়ার প্রভাব বেশী, সেইরূপ তাঁর সমাজ সংস্কারের প্রয়াস ও ধর্মের শিক্ষাও বহুল পরিমাণে বস্তুতন্ত্রতাহীন হইয়াছে। তিনি একটি কল্পিত স্বদেশ রচনা করিয়া, তাহারই উপরে একটা সত্য স্বদেশী সমাজ গড়িয়া তুলিতে গিয়াছিলেন। সে মায়ার সৃষ্টি কিছুদিন পরে আপনাতে আপনিই মিলাইয়া গিয়াছে। আশৈশবই রবীন্দ্রনাথের ধর্মের রচনায় ও উপদেশে এই মায়ার প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

তাঁর স্বাদেশিকতা কেবল শৈশবেই নয়, আজি পর্যন্ত বহুল পরিমাণে বস্তুতন্ত্রতাহীন হইয়া আছে। আর আজ তিনি যে এক বিশাল "বিশ্বমানব" কল্পনা করিয়া তাহারই উদারপ্রেমে আত্মসমর্পণ করিতেছেন,—তাহারও প্রতিষ্ঠা প্রত্যক্ষেও নয়, আগমেও নয়, কিন্তু তাঁর অলৌকিক কবিপ্রতিভার অঘটনঘটন-পটীয়সী মায়া শক্তিতে।

আর মায়ার মোহিনী শক্তিই আছে, তৃপ্তিদানের অধিকার নাই। এ সংসারে মায়াধীন জীব নিত্যই, পাই পাই পাই না; ধরি ধরি ধরিতে পারি না, এরূপ অপূর্ণ চেষ্টা ও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় চঞ্চল হইয়া রহে। রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক সৃষ্টিও পাঠকের প্রাণে এই চিরলোলুপ ও নিত্য-অতৃপ্তভাবের সঞ্চার করে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য অনেক সময়ই চিত্তকে মুগ্ধ করে, কিন্তু স্নিগ্ধ করিতে পারে না। জ্ঞানের, ভাবের, কর্মের পিপাসা বাড়াইয়া দেয়, কিন্তু সে পিপাসার নিবৃত্তি করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের সন্দর্ভ-সকল সর্বদাই কানে মধু ঢালে, প্রাণে গিয়া সাড়া দেয়, বুদ্ধিকে যাইয়া জাগাইয়া তোলে, কিন্তু পাঠককে ক্বচিৎ কোনো স্থির সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়। রবীন্দ্রনাথ একবার "ততঃ কিম্?" নামে একটি উপাদেয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁর নিজের লেখাতেও প্রায় সর্বদাই ঐ দুর্দমনীয় প্রশ্নটা জাগিয়া রহে। রবীন্দ্রনাথের রচনা সর্বদাই বড় মিষ্টি লাগে, কিন্তু সর্বদাই আবার তার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অপূর্ণতা ও অতৃপ্তিবোধ জাগিয়া উঠে। ইহাও মায়ারই ধর্ম।

রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব ও ঋষিত্ব—ভাব ও অভাব

কিন্তু রবীন্দ্রের কবিপ্রতিভার অলৌকিক শক্তিকে মায়িক বলিলে তার কোনই গৌরবের হানি হয় না। কবিত্বের শক্তি সর্বদাই মায়িক। অশরীরীকে শারীরধর্মে বিভূষিত করা, অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়কে নামরূপ দিয়া জ্ঞানাধিকারে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করা, ইহাই কবি-প্রতিভার সাধারণ ধর্ম। ইহাকেই অঘটনঘটন-পটীয়সী মায়া ধর্ম বলে। কবি-প্রতিভা যে কদাপি এই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে না, তাহা নয়। সেখানে কবি শুধু কবি নহেন, কিন্তু সাধকও; সাধনাবলে কবি যেখানে আত্মসাক্ষাৎকার

লাভ করিয়া, সেই নিগূঢ় তত্ত্বের উপরেই আপনার কবিকল্পনাকে গড়িয়া তুলেন, সেখানে তাঁর প্রতিভা এই মায়াকে অতিক্রম করিয়া যায়। সেখানে কবি ঋষিত্ব লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের এই পরম পদলাভের অনেক যোগ্যতাই আছে, অভাব কেবল একবস্তুর। যে বস্তুর অভাব পূরণ করিবার জন্য যিশু যোহনের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার নিকটে দীক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যাহার জন্য শ্রীচৈতন্য ঈশ্বর-পুরীর শরণাগত হন, যে সঞ্চারের অভাবে অধ্যাত্ম-জীবনের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকিতেও তাহা কদাপি ফলপ্রসূ হয় না, রবীন্দ্রনাথের অভাব সে বস্তুর। এই সঞ্চারের অভাবেই রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক কবি-প্রতিভা এখনো মায়াতীত সত্যলোক ও ব্রহ্মলোক অধিকার করিতে পারিতেছে না। য়ুরোপ-পর্যটনে না যাইয়া রবীন্দ্রনাথ যদি ভারতের পুণ্যতীর্থ ভ্রমণে আজ বাহির হন, তবে হয় ত' ভগবৎ প্রসাদে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোনো 'সাধুবৈষ্ণের' সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া এ অভাব পূরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু আজ না হউক, একদিন এ অভাব তাঁর পূর্ণ হইবেই হইবে। তাঁর ক্ষয়োন্মুখ সংসার বেশি দিন তাঁহাকে মনগড়া সিদ্ধান্তের এবং কল্পিত সংস্কারের মায়াজালে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না।

বিপিনচন্দ্র পালের 'চরিত-কথা' গ্রন্থ থেকে।

"নামে বাঁধিবারে চাই, না মানে নামের পরিচয়"

শান্তি সিংহরায়

সচল মনের ধর্মই গ্রহণ-বর্জন। জীবনযাপন করতে করতে কত অভিজ্ঞতাই না সঞ্চিত হয়। তারই ফলে পুরাতনের পরিবর্তন ও পরিবর্জন অত্যন্ত স্বাভাবিক। রবীন্দ্রমানসের এই সচলতা সাহিত্যকর্মে অজস্র রূপান্তর-নামান্তর ঘটিয়েছে। অনেক-গুলি সাময়িক পত্রিকার চাহিদা মেটাতে গিয়ে কবিকে নিরন্তর লিখতে হয়েছিল। লেখার সে স্রোত ঝরণার মত। কিন্তু এই সব লেখাকে স্থায়িত্বদান করতে গিয়ে কবিকে অনেক অদল-বদল করতে হয়েছে। কোন রচনাই তার বাল্যরূপ শেষ পর্যন্ত রাখতে পারে নি। এমন-কি তাঁর রচনাগুলির শৈশবরূপও কত সযত্নে লালন-চিহ্নিত। যে-কোন পাণ্ডুলিপির সঙ্গে চাক্ষুস পরিচয়েই এ-কথার প্রমাণ মিলবে। যখনই কোন রচনার দিকে নজর গেছে, তখনই কিছু না কিছু পাঠান্তর ঘটেছে। অবশ্য কবিতারই পাঠান্তর সর্বাধিক। নাটকেও আছে। এ-সবের কারণ কবি নিজেই জীবন-সায়াহ্নে স্বীকার করে গেছেন 'অবজিত' কবিতায়। তাতে বলেছেন—

লিখিতে লিখিতে কেবলি গিয়েছি ছেপে
সময় রাখি নি ওজন দেখিতে মেপে·····

এই ওজন সাহিত্যের ওজন। কালের সভায় মুখ দেখাতে হলে এ-গুলিকে সাহিত্য হতে হবে। তাই কবির কি নিরন্তর পরিচর্যা! এবং সুনিপুণও বটে। কেবল পাঠান্তর নয়, রবীন্দ্র-সাহিত্যে রূপান্তরের ও নামান্তরেরও একই ইতিহাস। উপন্যাস-গল্পকে নাটকের রূপ দেওয়া, একই নাটকের বহু বিচিত্র রূপান্তর সৃষ্টির নমুনা রবীন্দ্র-সাহিত্যে সুলভ। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রগ্রন্থের নামান্তরের প্রশ্নও মনে জাগে। রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রচলিত কোন কোন রচনার ছেলেবেলায় অন্য নাম ছিল। অর্থাৎ বিশেষ রূপান্তর বা পাঠান্তর ছাড়াও কোন কোন গ্রন্থের নামান্তরও ঘটেছে।

এ সম্পর্কে কবির একটি বিশেষ চিন্তা ও বক্তব্য আছে। সংক্ষেপে তা স্মরণ করার জন্যই এই ছোট লেখাটির অবতারণা। পাঠান্তরের সংগে সংগে বহু কবিতারও নামান্তর ঘটেছে। সে-সব আলোচনা সুদীর্ঘ হতে বাধ্য। তাই কেবল কয়েকটি গ্রন্থের নামান্তরের প্রসঙ্গই এই স্বল্প পরিসর রচনাটিতে আলোচিত হচ্ছে।

'বৈকুণ্ঠের খাতার' বৈকুণ্ঠ বাবুর সংগীতশাস্ত্রের গ্রন্থখানার তের হাত লম্বা এক নাম দিয়ে বৃদ্ধ খুব খুশি। কারণ ঐ নামে বিষয়টা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কোন কথাটি বাদ যায় নি। কিন্তু কেদারের তা মনে ধরে নি। সে বলেছিল '.....মাফ করবেন বৈকুণ্ঠবাবু—কিছু বাদসাদ দিয়েই নাম রাখতে হয়।' ব্যাস এই পর্যন্তই। কিন্তু কেন বাদসাদ দিয়ে নাম রাখতে হয় এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা আছে 'যোগাযোগ' নামকরণ প্রসঙ্গে। এই উপন্যাসখানার কয়েক কিস্তি 'বিচিত্রায়' তিনপুরুষ' নামেই বেরিয়েছিল। কিন্তু পরের কিস্তিগুলি 'যোগাযোগ' নামেই বের হয়। এই সম্পর্কে 'বিচিত্রায়' কবি 'নামান্তর' নামে এক দীর্ঘ কৈফিয়ৎ প্রকাশ করেন। তাতে তাঁর মূল বক্তব্য যা ছিল তা' উদ্ধৃত হচ্ছে! কবি বলেছেন—

".....নবজাত কুমার-কুমারীদের নাম দেবার জন্যে আমার কাছে অনুরোধ এসে থাকে, অবকাশমতো সে অনুরোধ পালন করেও এসেছি কারণ এতে কোন দায়িত্ব নেই। ব্যক্তিসম্বন্ধে মানুষের নাম তার বিশেষণের নয়, সম্বোধন মাত্র।.....ব্যক্তিগত নামে ডাকবার জন্য, বিষয়গত নাম স্বভাব নির্দেশের জন্য। মানুষকে যখন ব্যক্তি বলে দেখি নে, বিষয় বলে দেখি, তখন তার গুণ বা অবস্থা মিলিয়ে তার উপাধি দিই,—কাউকে বলি বড়োবউ 'কাউকে বলি মাস্টারমশায়।

'সাহিত্যে যখন নামকরণের লগ্ন আসে দ্বিধার মধ্যে পড়ি। সাহিত্য-রচনার স্বভাবটা বিষয়গত না ব্যক্তিগত এইটে হ'ল গোড়াকার তর্ক। বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিষয়টাই সর্বেসর্বা, সেখানে গুণধর্মের পরিচয়। মনস্তত্ত্ব-ঘটিত বইয়ের শিরোনামায় যখনই দেখবে 'স্ত্রীর সম্বন্ধে স্বামীর ইর্ষা' বুঝব বিষয়টিকে ব্যাখ্যার দ্বারাই নামটি সার্থক হবে। কিন্তু 'ওথেলো' নাটকের যদি ঐ নাম হত পছন্দ করতুম না। কেন না এখানে বিষয়টি প্রধান নয়। নাটকটিই প্রধান। অর্থাৎ আখ্যানবস্তু, রচনারীতি, চরিত্রচিত্র, ভাষা, ছন্দ, ব্যঞ্জনা,

নাট্যরস সবটা মিলিয়ে একটি সমগ্র বস্তু। একেই বলা চলে ব্যক্তিরূপ। বিষয়ের কাছ থেকে সংবাদ পাই, ব্যক্তির কাছ থেকে তার আত্মপ্রকাশ-জনিত রস পাই। বিষয়কে বিশেষণের দ্বারা মনে বাঁধে, ব্যক্তিকে সম্বোধনের দ্বারা মনে রাখি।

'এমন একটা কিছু অবলম্বন করে গল্প লিখতে বসলুম যাকে বলা যেতে পারে বিষয়···। রসশাস্ত্রে গল্পটা বিষয়ের চেয়ে বড়। এই জন্যে বিষয়টিকেই শিরোধার্য করে নিয়ে গল্পের নাম দিতে আমার মন যায় না।...গল্পের এমন নাম দেওয়া উচিত নয় যেটা সংজ্ঞা, অর্থাৎ যেটাতে রূপের চেয়ে বস্তুটাই নির্দিষ্ট। বিষবৃক্ষ নামটাতেও আমি আপত্তি করি। কৃষ্ণকান্তের উইল নামে দোষ নেই। কেন না ও নামে গল্পের কোন ব্যাখ্যাই করা হয় নি।' এই হচ্ছে নামকরণ সম্পর্কে কবির মত। এবং নামান্তরের কৈফিয়তও বটে।

রবীন্দ্ররচনাবলীতে 'চিরকুমারসভা' আছে 'নাটক-প্রহসন' বিভাগে। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' আছে গল্প-উপন্যাসের কোঠায়। কিন্তু 'প্রজাপতির নির্বন্ধে'র নাট্যরূপ 'চিরকুমারসভা' হলেও এই নামটিই 'প্রজাপতির নির্বন্ধে'র আদি নাম ছিল। গ্রন্থখানা যখন রবীন্দ্রগ্রন্থাবলীতে (হিতবাদী উপহার) প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন এর নাম ছিল 'চিরকুমার সভা'। এর একুশ বছর বাদে এই নামেই নাট্যরূপ প্রকাশিত হয়। মাঝখানে এই নামান্তরের কারণ কি? নাটকের পক্ষে 'চিরকুমার সভা' খুবই উপযুক্ত। কারণ, চিরকৌমার্য আর প্রণয়-প্রবণতার দ্বন্দ্ব নাটকখানার প্রাণবস্তু। একটি প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের মুখের কথার আর মনের ইচ্ছার অসংগতি কৌতুকহাস্যের আলো ফেলে নাটকখানিকে স্মরণীয় করেছে। এতে মানবচরিত্রকে কৌতুকের লক্ষ্য করা হয় নি'—একটি সভার ওপরই যত নজর। সেই জন্যে এ নামটা নাটক বলেই ভাল লাগে। কিন্তু 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' তো ঠিক নাটক নয়। গল্প-নাট্য অনেকটা 'কর্মফলে'র মত। এবং 'কর্মফল' থেকেও 'শোধবোধ' নাটকের সৃষ্টি। 'প্রজাপতির নির্বন্ধে' কাহিনী রসই প্রধান। তাই প্রজাপতির নির্বন্ধ নামটি ঠিকই হয়েছে। ভেতরের একটা অর্থ যে প্রজাপতির নির্বন্ধ কোমর বেঁধে চিরকৌমার্য উদ্‌যাপনের আয়োজন এলোমেলো হয়ে যায়। প্রজাপতির রঙিন শাখা দেখেই নির্মলা, পূর্ণ এরা চিরকুমারসভার সভ্য হয়েছে। প্রজাপতিকে সামনে রেখেই রসিক ও অবলাকান্ত এ সভার সদস্য হয়। শেষ পর্যন্ত বিপিন ও শ্রীশের মনেও প্রেমের ভ্রমর গুণগুণিয়ে

উঠল। এ গল্পের লক্ষ্য সভার সভ্যদের অসংগতি দেখানো নয়। মানুষের মনে প্রজাপতির প্রভাব কত বেশি তাই দেখানো। মনে হয় নাম-বদল ঠিকই হয়েছে।

যদিও 'চোখের বালি' ছাপার অক্ষরে অন্য নামে আগে বের হয় নি, তবুও এর খসড়ায় 'বিনোদিনী' নাম ছিল বলে রবীন্দ্রজীবনীকার জানিয়েছেন। পরে আবার সেটিকে মেজে-ঘসে প্রকাশযোগ্য করেন। তখনই হয়ত এর নাম বদলে ফেলেন। যাই হোক 'বিনোদিনী' নামের চেয়ে 'চোখের বালি' নাম অনেক ব্যঞ্জনাপূর্ণ এ সিদ্ধান্ত প্রায় তর্কাতীত। কেন্দ্রীয় চরিত্রের নামে গ্রন্থের নামকরণ বঙ্কিমচন্দ্রের এবং সেই যুগের একচেটিয়া ব্যাপার। বাংলা উপন্যাসের দিগন্ত রবীন্দ্রনাথ বহুদূর প্রসারিত করেছেন, সুতরাং বিশ শতকের গোড়ার দিকেই তিনি যে নামকরণের ব্যাপারে এক অভাবনীয় পরিবর্তন আনলেন, এটা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার। যেহেতু এই রচনার উদ্দেশ্য সমালোচনা করা নয়। সেইজন্য বিনোদিনীকে বিশদ করে বোঝাবার দায় কম। এবং ইতিমধ্যে পাঠক মহলে বিনোদিনী সুপরিচিতা হয়েছেন। তবুও একটা কথা বলতে হয় যে উপন্যাসের উপসংহারে বিনোদিনীর স্বভাবিক পরিণতির হয়ত সংহার হয়েছে। কারণ বিনোদিনী রোহিনীরই সহোদরা, রমার নয়। কবিবন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে উৎসর্গ করা নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'তমস্বিনী' বইখানা পড়ে রবীন্দ্রনাথই প্রিয়নাথ সেনকে লিখেছিলেন, "স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বাংলা উপন্যাসে তিনি (নগেনবাবু) উন্মুক্ত **realism**-এর অবতারণা করতে চাচ্ছেন। তাতে আমি কিছুই আপত্তি করিনে। কিন্তু সেটা পারা চাই। যেমন নাচতে বসে ঘোমটা সাজে না, তেমনি এ রকম বিষয় লিখতে বসে কিছু হাতে রাখা চলে না। সম্পূর্ণ নির্ভীক নগ্নতা ভাল, কিন্তু স্বল্প আবরণ রাখতে গেলেই আব্রু নষ্ট হয়। এ বইয়ে তাই হয়েছে। গ্রন্থকার সাহসপূর্বক সব কথা পরিষ্কারভাবে শেষ পর্যন্ত বলতে পারেন নি। নগেনবাবু তাঁর ঘটনাবিন্যাসের স্বাভাবিক পরিণামের পূর্বেই হঠাৎ থেমে যাওয়াতে বোঝা যাচ্ছে নিঃসঙ্কোচ নিরাবরণ তাঁর লেখনীর পক্ষে সহজ নয়। ওটা তিনি জবরদস্তি করেচেন।" তমস্বিনীতে একটি বিধবা যুবতী ও একটি কিশোরের যৌন-আকর্ষণের কাহিনী আছে—বাংলা উপন্যাসে যৌনচেতনার প্রথম চিত্র; যাইহোক, বিনোদিনীর কথা মনে করলে তাকে বিলাসকলা-কুতূহলী বিনোদিনী বলেই মনে পড়ে। শেষের বিনোদিনীকে যেন জোর করেই মনে করতে হয়। যে

বিনোদিনীর সঙ্গে মহেন্দ্রের বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল, যে বিনোদিনী বিহারীকে লেখা মহেন্দ্রের চিঠি লুকিয়ে পড়ে। সে চিঠির মধ্যে বিনোদিনী কী রস পাইল, তাহা বিনোদিনীই জানে। কিন্তু তা কৌতুকরস নহে। বার বার করিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার দুই চক্ষু মধ্যাহ্নের বালুকার মত জ্বলিতে লাগিল, তাহার নিশ্বাস মরুভূমির বাতাসের মত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। এ বিনোদিনী আশার সঙ্গে সই পাতালো কেবল মহেন্দ্রের সংগে ঘনিষ্ঠ হবার জন্যে। তাই তো আদরের নাম বাদ দিয়ে পাতানো নাম রাখলো, 'চোখের-বালি' বিনোদিনীর চরিত্রের আর সমগ্র কাহিনীর সূক্ষতম ব্যঞ্জনায় এই অনাদরের নাম চোখের বালি সাহিত্যে চিরআদরিণী হয়ে রইল।

এর পরই মনে পড়ে 'রক্তকরবীর কথা। যক্ষপুরী থেকে নন্দিনী! নন্দিনী থেকে রক্তকরবী। অবশ্য এইসব বদল ঘটে প্রাণ্ডুলিপিতেই। প্রবাসীতে যখন এটি প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন এর নাম হয় রক্তকরবী। এই নাটকটি সম্পর্কে স্বয়ং নাট্যকারের দুটি ব্যাখ্য আছে। প্রথমটি যাত্রী গ্রন্থে 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরি'তে আছে। তাতে তিনি বলেছেন, নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তাহলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্টি যন্ত্রের আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়। এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।" কিন্তু এই ভাবটা রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ভাব হতে পারে রক্তকরবীর আসল ভাব নয়। নারীর রসময় প্রাণের প্রবর্তনার অভাবে পুরুষের উদ্যমে যে বিকৃতি আনে, সে কেবল মকররাজের চরিত্রেই আমরা দেখি নি, রাজা ও রাণীর বিক্রমের মধ্যে এরই পূর্বাভাস পেয়েছি। আবার ঠিক নারীর নয়, বালিকার আনন্দময় প্রাণের প্রবর্তনায় কি ভাবে বিকৃতি দূর হয় তাও দেখেছি প্রকৃতির পরিশোধে, বাল্মীকি প্রতিভায় আর বিসর্জনে। সে যাই হোক একটি নারীর আবির্ভাবে কিভাবে পুরুষ নিজের 'কারাগারকে ভেঙ্গে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধা মুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলো' রক্তকরবীর মধ্যে এইটেই কবির বিশেষ বক্তব্য। অর্থাৎ একটি নারীর অবদানের কথাই মন জুড়ে আছে। আর আছে একটি নিষ্প্রাণ জগতের ছবি—'নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত।' সেইজন্য যক্ষপুরী আর নন্দিনী নামটিই

কবির প্রথমে মনে হয়েছিল। কিন্তু 'নন্দিনী' নামটির প্রতিই পক্ষপাতিত্ব বেশি ছিল। কারণ রক্তকরবীর একটি দীর্ঘ 'প্রস্তাবনা' যাত্রীর আলোচনার বছর খানেক পরেই প্রবাসীতে বের হয়। তাতে কবি বলেছেন, 'এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সংকীর্ণতার পীড়নে হাসিতে-অশ্রুতে কলধ্বনিতে ঊর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তেমনি।' এখানেও কবির মনে নন্দিনীরই সশব্দ পদসঞ্চরণ। প্রায়শ্চিত্ত-পরিত্রাণের সুরমাই যেন সতৃপ্ত পরিণতি লাভ করেছে নন্দিনীতে রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রিয় মানবী। নন্দিনী নামের প্রতি ঝোঁক এ থেকে কিছুটা বোঝা যাবে। কিন্তু রক্তকরবী লেখেন একটা হঠাৎ তাগিদে। কবি সবে আমেরিকার 'ঐশ্বর্যের দানবপুরী' থেকে ফিরেছেন ধনগরিমার ইতরতায় মনটা বিষণ্ণ। এমন সময় শিলং পাহাড়ে বিশ্রামের দিনগুলিতে লক্ষ্ণৌ'র অধ্যাপক রাধাকমল মুখার্জির কাছে বোম্বাই অঞ্চলের শ্রমিক এলাকার নিষ্প্রাণ-নিরানন্দ জীবনযাপনের কাহিনী শুনেই এই নাটকটি লেখেন। তাই যে দেশের ব্যবস্থা যা মানুষকে সংখ্যায় পরিণত করে যে দেশের ব্যবস্থায় মানুষ কেবল মজুরি সংগ্রহেই ব্যস্ত সেই রাজ্যের নাম দিলেন যক্ষপুরী। প্রথমে ব্যবস্থাটার কদর্থতাই মনকে বিষিয়ে ছিল তাই নাটকের নাম হয়েছিল যক্ষপুরী। পরে এই কদর্থতা দূর করবার কথা মনে হতেই এক আদর্শ কন্যার কথা মনে জাগল তখনই নাটকের দ্বিতীয়বার নাম বদল হল। এই অবস্থায় কাটল কিছুদিন। তারপর সদর ফটকের বাড়ির বারান্দা থেকে নারকেল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যোদয় দেখে মনের অপূর্ব পুলক-শিহরণকে যেমন নির্ঝরের স্বপ্নভংগ হয়েছিল, তেমনি আর এক ঘটনা ঘটলো। জানলা দিয়ে দেখলেন বাড়ীর ফটকের সামনে আবর্জনা-লোহালস্কর ইঁটসুরকীর স্তূপের মধ্যে এক রক্তকরবীর ফুল। তক্ষুনি কবির মনে পড়ল যক্ষপুরীর আবর্জনার মধ্যে নন্দিনীও তো তেমনি এক ফুল —চারদিকের পীড়ন ভেদ করে তার আত্মপ্রকাশ। নিষ্প্রাণ ব্যবস্থার মধ্যে আনন্দের ও সৌন্দর্যের আবির্ভাব। আর এ আবির্ভাবে আছে প্রলয়ের আভাস। সেই প্রলয় মেঘের রং লাল। অমনি নাটকের নাম চিরতরে স্থির হয়ে গেল—রক্তকরবী। এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা মনে পড়ে। রক্তকরবী রবীন্দ্রনাথের সর্বাধিক অভিনয়ধন্য নাটক। এদেশে একদা পেশাদার

ও অপেশাদার রঙ্গমঞ্চে বহু নাটকের অভিনয় হয়েছে। বিদেশেও হয়েছে—ডাকঘর আর রাজা (King of the Dark Chamber)। কিন্তু রক্তকরবীর মত এত জনপ্রিয়তা আর কোন নাটকের হয়েছে কিনা সন্দেহ। নাটক, অভিনয় ও প্রয়োগনৈপুণ্য এই ত্রিবেণীসঙ্গমেই রক্তকরবীর পুণ্যলাভ হয়েছে। আবার সংগে সংগে এই রক্তকরবীর পাঁপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজে খুঁজে অনর্থও কম হয় নি। তাই বলছি, রক্তকরবীকে শ্রেণীদ্বন্দ্বের নাটক বলেই যদি ধরা হয় তা'হলে 'যক্ষপুরী' নামেই চলত। কিন্তু কেবল শ্রেণীদ্বন্দ্ব নয় তারও পরের কথা নিয়েই রক্তকরবীর নাট্যভাবনা! আবার এর নাম যদি থাকতো নন্দিনী, তাহলে এটি হতো অনেকটা প্রেমের নাটকের মত। নন্দিনীর প্রেমে মরুভূমির মত তৃষার্ত একটি চিত্তে জীবনের স্পন্দন জাগরণ নাটকের একমাত্র বক্তব্য হলে 'নন্দিনী' নামেই চলত। কিন্তু যক্ষপুরীর অসম সমাজব্যবস্থার কুশ্রীতাও নাটকে যেমন আছে, তেমনি আছে নন্দিনীর অবদান। কিন্তু সব চেয়ে বেশী আছে ধনগরিমার ইতরতা থেকে, ধনসঞ্চয়ের লালসা থেকে সহজ মানুষটিকে উদ্ধার করা। কাজটি সহজ নয়। পাথর ফুঁড়ে ফুল ফোটারই মত। তাই 'রক্তকরবীর' নাম বহু বিস্তৃত অর্থের ইঙ্গিত ধন্য। যক্ষপুরীও রইল, নন্দিনী তো আছেই এবং এ সবের সংগে আরও অনেক কিছু যোগ করলো একটি নাম—রক্তকরবী।

'যোগাযোগ' উপন্যাসের আঁতুর ঘরের নাম সম্পর্কে আগেই কিছু আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথের প্রথমে ইচ্ছে ছিল তিন পুরুষের গল্প বলা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবিনাশ ঘোষালের বত্রিশ বছরের জন্মদিনের উল্লেখ মাত্র করেই মধুসূদন কুমুদিনীর কাহিনী শুরু করলেন—কিন্তু শেষ করলেন তার জন্ম-সম্ভাবনার ইসারা করেই। তিন পুরুষের গল্প আর বলা হল না। বিয়ের পরে প্রেমের সমস্যা নিয়ে এক তত্ত্বমূলক উপন্যাস তৈরী হলো। উপন্যাসে যে অ্যানালিসিসের তিনি বিরোধী তার চরম হল এইখানে। তিন-পুরুষের গল্প না বলার কারণ সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকারের অনুমান, কবির পক্ষে এই মর্মন্তুদ কাহিনীর সৃজন বেদনা বহন করে বলা কঠিন হয়ে পড়েছিল। তা'ছাড়া ঐ সময়ে জলধর সেনের 'তিনপুরুষ' নামে একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। এই দুটি মোটা কারণ ছাড়া সূক্ষ্ম ও গভীরতর যে কারণে এই উপন্যাসের নাম-বদল হয়েছে, সে সম্পর্কে কবির নিজের বক্তব্য পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে, উপন্যাসের ট্রাজেডি অত্যন্ত তীব্র ও সূক্ষ্ম। মধুসূদনের

ধনগৌরবের ও দাম্ভিকতার মধ্যে যে স্থূলতা ছিল—যে হীনতাবোধ অবচেতন মনে ছিল, তাহার কাছে ব্যক্তির কোন মূল্য নেই। ঘোষাল পরিবারের ঐশ্বর্যের একটা ইতরতা ছিল। তাই কুমুদিনী সে বাড়ীর বড় বউ মাত্র। কুমুদিনী নয়। মধুসূদন তাকে সহজ করেই পেয়েছিলেন, কিন্তু 'কঠিন করে বাঁধতে গিয়েই হারালেন।' মধুসূদন তাই মনে করলেন 'কুমুদিনীকে নিজের জীবনের সংগে শক্ত বাঁধনে জড়াবার একটি মাত্র রাস্তা আছে, সে কেবল সন্তানের মায়ের রাস্তা। তাই তো দেখি যে বিপ্রদাস কুমুদিনী শ্বশুর বাড়ির ইতর পরিবেশে পাঠাতে অনিচ্ছুক ছিলেন, তিনিই বলছেন 'তোকে নিষেধ করতে পারি এমন অধিকার আমার নেই। তোর সন্তানকে তার নিজের ঘরছাড়া করব কোন স্পর্ধায়।' কুমুদিনী স্বামীগৃহে ফিরে গেল। বাইরে থেকে দেখলে এ যোগাযোগই বটে কিন্তু স্বামী প্রেম বলতে যে ভক্তিকে কুমুদিনী বুঝত সেই ভক্তি কিসে কোন দিন ফিরে পেয়েছিল? এ উত্তর উপন্যাসে নেই। তাই উপন্যাসের অন্তিমে কুমুদিনীর ট্রাজেডির রেশটুকু কিছুতেই ফুরোতে চায় না। অবিনাশ ঘোষালের জন্ম-সম্ভাবনা ঘোষালাবাড়ির সংগে বড় বউ-এর যোগস্থাপন করল—কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর যোগাযোগ ঘটলো না। উপন্যাসের নামের এই অর্থই বুঝেছি। মনে হয় ভুল বুঝি নি।

কালানুক্রমে এর পরেই মনে পড়ে 'তপতী' নাটকের কথা। ১৯২৯-এর জুলাইয়ে কানাডা, জাপান, ইন্দোচীন ঘুরে এসে শান্তিনিকেতনে বর্ষার নিঃসঙ্গ দুপুরে যখন ছবি আঁকায় মসগুল, তখন খবর পেলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুররা কলকাতায় 'রাজা ও রানী'র অভিনয়ের মহড়া দিচ্ছেন। দীর্ঘকাল ধরেই রাজা ও রানীর লিরিক প্রাবল্য কবির মনে একটা অতৃপ্তির সঞ্চার করেছিল। তপতীর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "অনেকদিন ধরে রাজা ও রানীর ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েছে। কিছুদিন পূর্বে শ্রীমান গগনেন্দ্রনাথ যখন এই নাটকটি অভিনয়ের উদ্যোগ করেন তখন এটাকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত করে একে অভিনয়যোগ্য করবার চেষ্টা করেছিলুম। তখন এর নাম হয়েছিল "ভৈরবের বলি"। ভৈরবের বলি কখনও প্রকাশিত হয় নি—পাণ্ডুলিপি আকারেই আছে। কিন্তু এতেও কবি খুসি হলেন না। তিনি বলছেন 'দেখলুম এমনতরো অসম্পূর্ণ সংস্কারের দ্বারা সংশোধন সম্ভব নয়। তখনই স্থির করেছিলুম এ নাটক আগাগোড়া নূতন করে না লিখলে এর

সদ্‌গতি হতে পারে না' এবং একেবারে নূতন করে গদ্যে লিখলেন তপতী— অভিনয়ও করলেন জোড়াসাঁকো বাড়ীতে। তাতে বিক্রম সেজেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু নাটকটির পূর্বনাম ছিল সুমিত্রা। রবীন্দ্রভবনের একটি পাণ্ডুলিপিতেও 'সুমিত্রা' নামই আছে। পথে ও পথের প্রান্তের একটি চিঠিতেই কবি বলেছেন, "গতকল্য আমার লেখনী একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর নাটককে জন্ম দিয়েছে।···রাজা ও রানীর রূপান্তরীকরণ। সেই নাম রইল; সেই রূপ রইল না। বিশ্বভারতীর কর্মসচিবকে খাজনা দিতে হবে না। যদি সাবেক নামটার জন্যে ভাড়ার দাবী করেন সেটাকে বদলাতে কতক্ষণ। সুমিত্রা নাইে ঠিক করেছি।" সুতরাং তপতীর জন্মমুহূর্তে যে সুমিত্রা নাম ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রকাশিত হলো "তপতী" নামে। অপূর্ব নাম। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তির জন্য সুমিত্রর প্রেম ব্যর্থ হয়েছিল, সুমিত্রার মৃত্যু বিক্রমকে আসক্তি থেকে মুক্ত করে সেই প্রেমের সত্যে দীক্ষা দিয়েছিল। যোগাযোগের শেষে যা নেই—তপতীতে তাই আছে। কুমুদিনীও আত্মবিসর্জন না দিলেও, বিলুপ্ত ঘটেছিল। হয়ত বিক্রমের মত মধুসূদনও কুমুদিনীর "আইডিয়া" বুঝতে পেরেছিল কিন্তু সে বিবরণ অনুক্ত তাই যোগাযোগ নাম ব্যঞ্জনাময়। যাই হোক্ সুমিত্রাও কুমু'র মত চেয়েছিলেন প্রেমের দস্যুতা নয় প্রেমের মর্যাদা। সুমিত্রা সূর্য-সাধিকা; মার্তণ্ডদেবের মন্দিরে প্রজ্বলিত অগ্নি-উৎসধারে নিজেকে বিসর্জন দিলেন। বিক্রমের প্রেমের আবেশকে ধৌত করে তাকে নির্মল প্রেমে উদ্বুদ্ধ করলেন। সূর্যের ইমেজ সুমিত্রা-চরিত্রে প্রচুর! তা'ছাড়া রবীন্দ্রনাথেরও বিশ্বাস ছিল সূর্যই আমাদের চিত্তে ধীশক্তির ধারাগুলি প্রেরণ করেছেন। অন্ধমোহাচ্ছন্ন প্রেমের বন্ধনকে যিনি স্বীকার করেন না তিনি তো সূর্যকন্যা। তিনিই তো তপতী।

রবীন্দ্রনাথ নানা অনুষ্ঠানের জন্য অনেক কবিতা আর গান রচনা করেছিলেন। প্রবন্ধের কথা তো বাদই দিলাম। এমন কি কোন কোন অনুষ্ঠানের জন্য গল্পও লিখেছিলেন। 'বলাই' গল্পটি তো প্রায় ভূমিজ-বৃক্ষরোপন উৎসবের জন্যই এর জন্ম। বিয়েতে আশীর্বাদী অনেক কবিতাও লিখেছিলেন। কিন্তু সেগুলি বিয়ের পদ্য নয়, কবিতাই। প্রেমের কবিতা। প্রশান্ত মহলানবিশের অনুরোধে সেইসব কবিতার একটা সংকলন প্রকাশ করবার সংকল্প থেকেই 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের জন্ম। অবশ্য তাতে উপহারের কবিতা ছাড়াও কিছু কিছু প্রেমের কবিতা,

লিখেছিলেন। অন্য গ্রন্থ থেকেও একই ভাবের কবিতা এই গ্রন্থভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু ঋতু-বিষয়ক কবিতাও আছে। 'দোল-পূর্ণিমা'র আবৃত্তির জন্যেই এদের রচনা করা হয়েছিল। কিন্তু নববসন্তের আবির্ভাবই মহুয়া কবিতার উপযুক্ত ভূমিকা বলে নকিবের কাজে ওদের এই গ্রন্থে আহ্বান করা হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থের নাম ঠিক হয়েছিল 'বরণডালা' বা রাখী। এই নামে কাব্যগ্রন্থ ছাপাবার ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও জানিয়েছিলেন। কিন্তু বই যখন ছাপা হলো, তখন দেখা গেল যে মলাটে নিজের আঁকা ছবি ছাপা হলো। এবং কবি বইয়ের নাম বদলে 'মহুয়া' রাখেন। কারণ, তিনি বলেছেন 'কাব্যের বা কাব্য-সংকলন-গ্রন্থের নামটাকে ব্যাখ্যামূলক করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। নামের দ্বারা আগে-ভাগে কবিতার পরিচয়কে সম্পূর্ণ বেঁধে দেওয়াকে আমি অত্যাচার মনে করি! কবিতার অতিনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রায়ই দেওয়া চলে না। আমি ইচ্ছে করেই 'মহুয়া' নামটি দিয়েছি, নাম পাছে ভাষারূপে কর্তৃত্ব করে এই ভয়ে।" নাম বদলের তাৎপর্য নিশ্চয় আর কোন নতুন ব্যাখ্যা দাবি করে না। 'মুক্তধারার' কথাও আগেই আলোচনা করা উচিত ছিল। "মুক্তধারা' নাটকেরও নাম রবীন্দ্রনাথ মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন 'পথ'। রানু অধিকারীকে লেখা ভানুসিংহের পত্রাবলীর একটি চিঠিতে সেই কথাই আছে। অবশ্য 'পথ' প্রায় নাটকের সবটা জুড়ে আছে। সমগ্র নাটকটি একটি দৃশ্য পথ। তাতেই সব ঘটনার অভিনয়। তা' ছাড়া আরও একটি গভীর ভাবনা ছিল। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকার বলেন "রবীন্দ্রনাথের মনে কিছুকাল হইতে যে সব প্রশ্ন জাগিতেছে তাহারাই মুক্তি পাইয়াছে এই নাটকে। য়ুরোমেরিকা পরিভ্রমণ করিয়া পাশ্চাত্য জাতীয়তা ও কলীয়তার সে বীভৎস মূর্তি উভয় মহাদেশে দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে কিভাবে পীড়িত করিয়াছিল, তাহার নিদর্শন আমরা বহু রচনায় পাইয়াছি।.....পাশ্চাত্যদেশে বিজ্ঞানীরা আজ অবিচ্ছিন্নভাবে বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পকে দেখিতেছে।.....সকল দেশের শিক্ষা-নীতি, ধর্মনীতি স্বজাতীয় রাজনীতির পাদপীঠতলে পিষ্ট; উগ্র জাতিপ্রেমের ইন্ধন জোগানোই সকলের কর্তব্য। সেই ইন্ধন সংগ্রহে পরাঙ্মুখ অভিজিতের পক্ষে আত্মাহুতি দান ছাড়া আর কোন 'পথ' উন্মুক্ত ছিল না।" এ মনোভাব তো আছেই। উগ্রজাতি প্রেমের সংকীর্ণ পথটা কেটে দেওয়ার

কথাও আছে। অর্থাৎ নাটকটা বেশ positive. একমাত্র অভিজিৎ ছাড়া উত্তরকূটের কেউ গৌরীশিখরের ওপারে পথ দেখাত পেত না। অভিজিৎ কিন্তু বলেছিল, "যে সব পথ এখনও কাটা হয় নি ওই দুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই ভাবীকালের পথ দেখতে পাচ্ছি দূরকে নিকট করার পথ। দুর্গম পাহাড়টা দুস্তর বাধার মতই। স্বদেশ-চিন্তার বিকৃতি সেই বাধা। সূর্যাস্তের মূর্তি দেখেও অভিজিৎ রাজকুমার সঞ্জয়কে বলেছিলেন, 'কোন আগুনের পাখি মেঘের ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেছে। আমার এই পথযাত্রার ছবি অস্তসূর্য আকাশে এঁকে দিলে।' গভীর ইঙ্গিতময় এই পথ-সংগীতের পাশাপাশি মুক্তধারার কথাও আছে। অভিজিতেরই কথায়, সে বলেছে "মানুষের ভিতরকার রহস্য বিধাতা বাইরের কোথাও না কোথাও লিখে রেখে দেন; আমার অন্তরের কথা আছে ওই মুক্তধারার মধ্যে। তারই পায়ে ওরা যখন লোহার বেড়ি পড়িয়ে দিলে তখন হঠাৎ যেন চমক ভেঙে বুঝতে পারলুম উত্তরকূটের সিংহাসনই আমার জীবনস্রোতের বাঁধ। পথে বেরিয়েছি তারই পথ খুলে দেবার জন্যে। খোলা পথ সকলের—তাই অভিজিৎ নন্দিসংকটের পথ খুলে দিয়েছিল এবং মুক্তধারার স্রোতের পথও খুলে দিল। কারণ স্রোতের পথ তার ধাত্রী—তার বন্ধন মোচন করল। সুতরাং পথপাগল বাউলের মত রবীন্দ্রনাথও খোলা পথের প্রেমে মেতেছিলেন। দূর ও অপরিচিত নিকট হয় এই পথের কল্যাণে। পথের প্রেমেই আছে নকলের জন্য প্রেম। তা হলেও মনে হয় 'মুক্তধারা' নামটা শুনতেও ভাল আর এই নামটারই ইংগিত দিগন্তলীন। নামটি বদলে ভালই হয়েছে।

এর পর আসছে 'কালের যাত্রা'র কথা। এই 'নাট্যসংলাপটি'র মূল কথা হচ্ছে গণজাগরণ। 'রথযাত্রা' থেকে 'রথের রশি'র মধ্য দিয়ে ন বছর পরে নাটকটির স্থায়ী নাম হয় 'কালের যাত্রা'। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিনে এই নাটিকাটি তাঁকে উৎসর্গ করে যে পত্র লেখেন তার মধ্যেই নামান্তরের তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়। কবি লিখেছেন 'রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে। মহাকালের রথ অচল। মানব সমাজের সকলের চেয়ে বড় দুর্গতি, কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানিবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে

না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাঁদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে ; তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।" 'কালের যাত্রা' এই নামটির উপযোগিতা এ চিঠিতেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ যেন পাঁচ বছর আগে লেখা রাশিয়ার চিঠির গোড়ার দিকের কথাগুলিরই প্রতিধ্বনি।

রবীন্দ্রনাথ একসময় তাঁর 'ফাল্গুনী' নাটকটিকে খেয়াল নাটক বলেছিলেন। এই ফাল্গুনীর তিনটে ভাগ। সূচনা, গীতি-ভূমিকা এবং নাটক অংশ। প্রথম প্রকাশের সময় সূচনার নাম ছিল 'বৈরাগ্য সাধন'—এটি সবুজপত্রে বেরিয়েছিল। গীতিভূমিকাগুলিও সবুজপত্রে 'বসন্তের পালা' নামে বেরিয়েছিল। যেহেতু সূচনায় বৈরাগ্যসাধনের মন্ত্র নাটকটির ভূমিকা এবং গানগুলির 'চাবি দিয়েই এর (নাটকটির) এক-একটি অঙ্কের দরজা খোলা' যায়। সেই জন্যই এই তিনটি অংশের একটি নামের দ্বারা অভিহিত করা খুবই সংগত হয়েছে। এ ছাড়াও নাটকটির পাণ্ডুলিপিতে প্রথমে "বসন্তোৎসব" এই নামটি ছিল। যাই হোক বৈরাগ্যসাধন বা সূচনা অংশ ফাল্গুনী নাটকটিকে একটু বাড়াবার জন্যই লেখা হয়েছিল। এবং সবুজপত্রে কবির কৈফিয়ৎ রচনা করে তৃপ্ত না হয়ে বৈরাগ্যসাধনে যেন মূল নাটকটির টীকা রচনা করলেন। এর কোন প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। কলকাতায় ফাল্গুনীর অভিনয়ের সময় আরও একটা নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন। কারণ এই অভিনয় হয়েছিল বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ তহবিলে সাহায্যের জন্য এবং যারা দশটাকা দিয়ে টিকিট কিনবেন তাঁরা ছোট্ট ফাল্গুনী নাটক দেখে দুঃখিত হবেন—এই রকম আশঙ্কা করি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা একটি পত্র প্রকাশ করেছিলেন তাই প্রথমে ভাবলেন বৈকুণ্ঠের খাতার কথা। কিন্তু দেখলেন ওতে সমস্ত অনুষ্ঠানটা বড্ড বড়ো হবে। 'তাছাড়া দুটোর মধ্যে মিল থাকবে না। আজ 'বৈরাগ্য সাধন' লিখে ফাল্গুনীর সংগে জুড়ে দিলেন। তাতেও যথেষ্ট হ'ল না দেখে "বশীকরণ" নাটকটিকে একটু অদল-বদল করে 'বহুবিবাহ' নামে অভিনয় করলেন। বহুবিবাহের সংগে ফাল্গুনীর খুব ঘনিষ্ঠ না হলেও কিছু যোগ আছে। অন্নদা আর আশুর কোন কোন সংলাপে তারই ইংগিত আছে!

এই রকম আরও বহু নামান্তরের ইতিহাস মাসিক পত্রে ও পাণ্ডুলিপির

মধ্যে লুকিয়ে আছে। যেমন 'লেখনের' কিছু কিছু কবিতা 'দ্বিপদী' নামে প্রবাসীতে বেরিয়েছিল। পঞ্চভূতের রচনাগুলি পঞ্চভূতের ডায়ারি নামেই সাধনায় প্রকাশিত হয়েছিল। এবং 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটি প্রথমে চারটে গল্প হিসেবেই সবুজপত্রে বেরিয়ে ছিল। স্বতন্ত্র চারটে গল্প—নাম ছিল জ্যেঠামশায়, শচীন, দামিনী, শ্রীবিলাস। আবার এগুলিকে একটি অখণ্ড আখ্যানে চারটে অঙ্গ হিসেবে নেখা যায় বলে 'চতুরঙ্গ' নামটি বেশ মানিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণকাহিনী 'জাপানযাত্রী' নামক গ্রন্থখানা আর 'পারস্যে' নামে এক সঙ্গে বের হয়। এর মধ্যে 'পারস্যে' নামক বৃত্তান্তের প্রথম পরিচ্ছেদ প্রবাসীতে 'পারস্য যাত্রা' নামে বের হয়। তার পরের দশটি পরিচ্ছেদ আবার 'পারস্য ভ্রমণ' নামে বিচিত্রায় ছাপা হয়।

এমনি কত নামান্তরের ইতিহাস হয়ত এখনও অজানা আছে। রূপান্তরের ইতিহাস তো আগেই বলেছি দীর্ঘতর। পাঠান্তরের তো শেষ নেই বিশেষ করে গানে। রবীন্দ্র-রচনার বিভিন্ন রূপের একাধিক নামের ও বিচিত্র পাঠের ইতিহাস সম্পূর্ণ জানতে পারলে কবির চিন্তা কোথা থেকে শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত কোথায় এসে থামলো তা জানা যায়। এতে কবির আসল অভিপ্রায়ের সংগে পরিচয় ঘটে। অনুমান করে কিছু বিশেষ বলতে হয় না।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এজ্‌রা পাউণ্ড

আনন্দ দে

রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দান করার ঘোষণাটি সুইডিশ একাডেমি করেছিলেন ১২-১১-১৯১৩ সালে। এই তারিখের আগে ইংল্যাণ্ডের কবি-মনীষী মহলে রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হয়ে যান। এই পুরস্কার ঘোষণার একবছর আগে অর্থাৎ ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার চিকাগো সহর থেকে প্রকাশিত "কবিতা" (Poetry : A Magazine of verse) নামক পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ছ'টি কবিতা মুদ্রিত হয়। কবিতাগুলি সম্পাদিকা মিস্‌ হ্যারিয়েট মন্‌রো-র নিকট আপন মন্তব্যসহ লণ্ডন থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তখনকার কবিতা আন্দোলনের নেতা ও বর্তমান বিশ্ববিখ্যাত কবি এজরা পাউণ্ড। এই ঘটনা সামান্য নয়। কারণ, এ-কথা বর্তমানে 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক ঘোষণা করেছেন যে, ঐ পত্রিকাই সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রতীচ্য জগতের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। এ ঘোষণায় সত্যের অপলাপ নেই। আরও উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি অবশ্য ইংরাজি গীতাঞ্জলি থেকে গৃহীত; যখন প্রকাশিত হয় তখন কবি ছিলেন আমেরিকাতে ইলিনয়-এ। সম্পাদিকা সে খবর পেয়ে কবিকে আমন্ত্রণ জানান: কবি সে আমন্ত্রণ রক্ষা করেন। এজরা পাউণ্ড যে ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন এখানে তা অনুবাদ করে দেওয়া গেল—

> বাঙালা থেকে ইংরাজিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাগুলির যে স্বকৃত অনুবাদ বেরিয়েছে; তা ইংরাজি কাব্যের ইতিহাসে ও বিশ্ব-কাব্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমি এই কথাগুলি সমসাময়িক সাংবাদিকতা-সুলভ চটুলতা নিয়ে বলছিনে। কাব্য-শিল্প কঠিন ব্যাপার, হাল্‌কাভাবে বা বাহাদুরী নেওয়ার মেজাজে অলোচ্য নয়।
>
> বঙ্গদেশ পাঁচকোটি লোকের দেশ। আমরা যে যুগে বাস করছি সেটা বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ যুগ। রবীন্দ্রনাথের গান

গাইতে যে বাঙালীকে প্রথম শুনলাম, তিনি বললেন অতি সহজে যেমন সহজে কেউ বলে চারটে বেজেছে ঘড়িতে, আমরা এ যুগকে রবীন্দ্র-যুগই বলি।

যে ছ'টি কবিতা এখানে প্রকাশিত হলো সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিতব্য একশতটি গীতিকবিতা থেকে বাছাই করে নেওয়া অন্য যে কোন ছ'টিকে বাছাই করে নেওয়া যেত, কারণ এ-গুলিই তাঁর কৃতিত্বের চূড়ান্ত প্রতিনিধি নয়, অন্যগুলির সমান।

মূল এগুলি এমনই উৎকৃষ্টতম ও সূক্ষ্মতম ছন্দে গ্রথিত যে সম্ভবত তা আমাদের কেউই জানে না। যদি ত্রবাদুর-শৈলীকে আপনি আরও মার্জিত করেন, তার সঙ্গে যদি প্লীয়ড (pleiade) বৈশিষ্ট্য যুক্ত করেন, এবং সেই সংগে যদি মুক্তক ছন্দের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবির ধ্বনি-সূত্র জুড়ে দেন তবে হয়ত আপনি বাঙলা কবিতার পদ্ধতির কাছাকাছি যেতে পারবেন। এই ভাষার ধ্বনি উচ্চারিত হলে কতোকটা গ্রীক ভাষার মতো মনে হয়, কারণ বাঙলা হলো সংস্কৃতের কন্যারূপা; আবার এই সংস্কৃত হলো হোমেরীয় বাক্-পদ্ধতির কতকটা পিতৃব্য বা জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্বরূপ।

এই যে একশ'টি কবিতার মালা এগুলি সঙ্গীতের উপযোগী করে তৈরী, কারণ "মিঃ" রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবি নন, তিনি বাঙলার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞও। তিনি গান শেখান, এবং তাঁর গান সারা বাঙলায় গাওয়া হয়, কতোকটা দ্বাদশ শতাব্দীর ইউরোপে ত্রবাদুরদের গান যেমন গাওয়া হতো।

আমি মনে করি লণ্ডনে এখন আমরা সেই রকম বোধ করছি যেমন পেত্রার্কের সময়ে লোকে যেমন সেই রহস্যময় হৃত ভাষণ গ্রীক সম্বন্ধে মনে করতো যেহেতু তখন বহু শতাব্দীর বিস্ফোরণের পরে আবার গ্রীকভাষা পুনরুদ্ধৃত হচ্ছে। ঐ গ্রীকভাষা আমাদের রেনেসাঁর আলোকাবর্তিকা স্বরূপ এবং ঐ ভাষার সাফল্য তারপর থেকে আমাদের সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েই বলছি বাঙলার সংগে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগের এই যে সূচনা, এইটে আর একটা নতুন যুগের উদ্ঘাটন করবে। কারণ কবিতার এই প্রথম গুচ্ছের বিষয়বস্তু বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে

আমাদের প্রচলিত ধারণা নষ্ট করে দেবে ; প্রতীচ্যে আমরা এই ধর্মকে নেতিবাচক ও খৃষ্টধর্ম-বিরোধী বলে গণ্য করতে খুব পটু।

গ্রীক সাহিত্য মানবতাবাদ শিখিয়েছিল, 'সুস্থ শরীরে সুস্থ চিন্তা' এই ধারণা এনে দিয়েছিল, আস্থা এনে দিয়েছিল পরিমিতি ও ভারসাম্য বোধে। গ্রীক সাহিত্য মানুষকে দেবতার ক্রীড়নক হিসাবে দেখিয়েছিল আর দেখিয়েছিল নিয়তি ও নিসর্গ-শক্তির নিরন্তর শত্রু হিসাবে। বাঙলা সাহিত্য বয়ে এনেছে আমাদের কাছে এক প্রশান্তির প্রতিশ্রুতি, যা এই ইস্পাত আর যন্ত্রতন্ত্রের যুগে আমাদের অতীব প্রয়োজন। বাঙলা সাহিত্য মানুষ ও দেবতার মধ্যে, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বন্ধুত্বের শান্ত ঘোষণা উপস্থাপিত করেছে।

অবশ্য আপত্তি তোলা যেতে পারে যে এই প্রথম আমরা এই বন্ধুত্বের ঘোষণা শুনছিনে, কিন্তু শিল্পসাহিত্যেই একমাত্র আমরা একটা জাতির অন্তঃ প্রকৃতির দেখা পাই। প্রাচ্যবাণীতে আমরা যা পেয়েছি তারও চেয়ে গভীরতর শান্তি, গভীরতর বিশ্বাস পাচ্ছি এই প্রাচ্যবাণীতে। শিল্পসাহিত্যের মাধ্যমেই মানুষ শিক্ষা করে দূরবর্তী মানুষের সংগে মিশতে, বন্ধুত্বে ও শ্রদ্ধায়।

আমি সকল গাম্ভীর্য নিয়েই বলছি লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগমন বিশ্বমৈত্রীকে নিকটতর করেছে।

এই হলো এজরা পাউণ্ডের রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে প্রথম রসগ্রাহী আলোচনা যদিও এই রসপ্রমাতায় কিছু তথ্যগত প্রমাদ রয়েছে, তথাপি প্রতি পংক্তিতে যে আন্তরিকতা ও কাব্যবোধ রয়েছে তা নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধার্হ। কিন্তু এই আন্তরিক অভিনন্দনেই পাউণ্ডের বক্তব্য শেষ নয়। পাউণ্ড এর পরেও—নোবেল পুরস্কার ঘোষণার আগে এবং পরে—রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রকৃত কাব্যরসিকের উক্তি করেছিলেন। তাঁর সম্পূর্ণ লেখাগুলি সম্ভবত ভারতবর্ষে বিশ্বভারতী ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু সেগুলি সংকলন করা অতীব প্রয়োজন এই কথা বলে পাউণ্ডের দুটো সমালোচনার কথা এখানে উল্লেখ করবো।

ইয়েটস্ গীতাঞ্জলির ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন এবং শোনা যায় প্রথম দিন রবীন্দ্রকণ্ঠে আবৃত্তি শুনে তিনি এ-খণ্ড গীতাঞ্জলি সংগ্রহ করে যত্রতত্র সংগে নিয়ে বেড়াতেন। পাউণ্ড ঠিক তেমনটি করেন নি।

তিনি রবীন্দ্রকণ্ঠে গীতাঞ্জলির ইংরেজি ও বাঙলা আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। নোবেল পুরস্কার ঘোষণায় আগে গীতাঞ্জলি ও দি গার্ডেনার-এর সমালোচনা যথাক্রমে ফর্টনাইটলি রিভ্যু (মার্চ ১৯১৩) ও ফ্রী-ওম্যান (১-১১-১৯১৩) পত্রিকায় করেছিলেন এবং তদ্দ্বারা ইংলণ্ডের কাব্যরসিকমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। পাউণ্ডই সর্বপ্রথম রবীন্দ্র-কাব্য প্রতিভার সঙ্গীতাত্মকতার দিকে সকল দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যতোদূর মনে হয় বাঙলাদেশে বোধ হয় তার আগে কেউ রবীন্দ্রকাব্যের এই বিশেষ গুণটির দিকে নজর দেন নি। শব্দসৌষম্য, ধ্বনিবৈশিষ্ট্য ও সঙ্গীতাত্মকতার কথা বলতে গিয়ে তিনি দি গার্ডেনারের সমালোচনায় লিখেছিলেন :

> 'আমি বুঝি না কেন এই দ্বীপের সজ্জনেরা একজন চমৎকার শিল্পীকে শুধু শিল্পী হিসাবেই সম্মান দিতে পারেন না। তাঁর জীবন তুলো দিয়ে ঢেকে রেখে এক বাক্‌সর্বস্ব নীতিবাগীশের মূর্তি গড়ে তাই নিয়ে চারিদিকে সোরগোল তোলার চেয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের অন্য কোন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে এদের অক্ষমতা এমনই যে তা আমার কাছে এক দুর্ভেদ্য রহস্য, আর এ রহস্য সমাধান আমার সাধ্যাতীত, কখনও সাধ্য হবেও না। আমি মনে করি যে এই কবিতাগুলি সম্বন্ধে আমি বলতে চেষ্টা করছি যে প্রত্যেকটি কবিতা আগাগোড়া পড়তে হবে, এবং তারপরে নিজের মনে তাকে গড়তে হবে একটা গানের মতো করে, যে গানের কলি যেন অর্ধ-অবলুপ্ত। আর তখনই মনে হবে যে গানগুলি যেন তারা, একটা পতাকায় যেমন তারা আঁকা থাকে তেমন নয়, আকাশের গায়ে যে তারা থাকে সেই তারা।' (ডঃ আরানসন্ উদ্ধৃত)

এজরা পাউণ্ড, যিনি বহুভাষাবিদ্, যিনি কাব্য-সমালোচনায় ঈর্ষাজনক পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন, সর্বোপরি যিনি নিজে কবি, তিনি গীতাঞ্জলির সমালোচনায় লিখেছেন :

> I do not think I have ever undertaken so difficult a problem of criticism, for one can prize most poetry in a series of antitheses. In the work of Mr. Tagore the source of the charm is in the suitable underflow. It is nothing else than his "sense of life." The sort of profound apperception of it which leads Rodin to proclaim that "Energy is Beauty."

এবং যে-কথা 'কবিতার' পৃষ্ঠায় তিনি বলেছিলেন ঠিক সেই কথাই তিনি গীতাঞ্জলির সমালোচনায় লিখেছিলেন : যন্ত্রের ঘড়ঘড়ানির মধ্যে তিনি saner stillness শুনতে পেলেন গীতাঞ্জলির কাব্যরসসিক্ত গদ্যপংক্তিগুলোর মধ্যে। তিনি নিউ টেস্টামেন্টের বাণীর সংগে তুলনা করলেন ; গীতাঞ্জলিতে খুঁজে পেলেন নিউ টেস্টামেন্টের মতোই জীবন-উল্লাস। এ ছাড়াও পাউণ্ড আগে থেকেই সাধারণ পাঠককে সাবধান করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে যেন মরমিয়াবাদী মিস্টিক মনে না করা হয়। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পরে (দ্রঃ অকাল্টরিভ্যু পত্রিকা, সেপ্টেম্বর ১৯১৪) ইংলণ্ডের কোন কোন মহলে, এবং পুরস্কার প্রাপ্তির আগে 'মিস্টিসিজম' গ্রন্থের লেখিকা আণ্ডারহিল রবীন্দ্রনাথকে মিস্টিক বিশেষণে বিশেষিত করার চেষ্টা করেন। গীতাঞ্জলির সমালোচনায় তিনি সাধারণ পাঠককে অনুরোধ করেন তাঁরা যেন রবীন্দ্রনাথকে ভুল বুঝে তালগোল না পাকিয়ে ফেলেন—**with that jolly and religious bourgeois Abdul Baha ; nor with any Theosophist propaganda nor with any of the various missionaries of the seven and seventy issus of the mystical East.**

(ডঃ আরান্‌সন্‌ উদ্ধৃত)

এই হলো পাউণ্ডের রবীন্দ্রকাব্য মূল্যায়নের ধারা। পরবর্তীকালে তিনি নানাকারণে রবীন্দ্রনাথকে কটুকথা বলে থাকতে পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের মূল সুরটি তিনি প্রতীচ্যখণ্ডে ধরিয়ে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। এখন অনেকেই রবীন্দ্রকাব্যে অর্থ (দু'অর্থেই) খুঁজে পাচ্ছেন ; কিন্তু সেকালে প্রাচ্যের একজন কবিকে আবিষ্কার করার মধ্যে তাঁর সর্বপ্রথম কৃতিত্ব প্রশংসার্হ এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

রবীন্দ্রদর্শনে বিবর্তন

মৃণালকান্তি ভদ্র

কবি-দৃষ্টির সৌন্দর্য-সৃষ্টির গভীরে রবীন্দ্রনাথ এক জীবন-সত্যকে প্রকাশ করেছেন। দর্শনকে সাধারণতঃ সত্য অনুসন্ধান বলে অভিহিত করা হয়। জগতের লীলা-বৈচিত্র্যের মাঝে ডুব দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সত্যকে উদ্ধার করার কাজে তাঁর দীর্ঘ জীবন-সাধনাকে নিয়োজিত করেছেন। তাই দর্শন-চর্চার রীতি-বদ্ধ শব্দ-কাঠামোয় সে জীবন-অনুভূতিকে সজ্জিত না করলেও কবি আমাদের কাছে সত্যের সাক্ষাৎকারকে প্রকাশ করেছেন। দার্শনিক পরিভাষায় রবীন্দ্রনাথ কথা বলেন নি, কিন্তু জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে যে মহৎ সত্যকে অনুভব করেছেন, তা দার্শনিক বিচারে পরম ও চরম তত্ত্ব। বর্তমান যুগের দার্শনিকদের সম্বন্ধে একজন লেখক বলেছেন, "Philosophers to-day exist in the Acadamy, as members of departments of philosophy in Universities, as professional teachers of a more or less theoretical subject known as philosophy." (১) রবীন্দ্রনাথ এই সংজ্ঞা অনুযায়ী দার্শনিক ছিলেন না। কিন্তু "philosophy is the soul's search for salvation which means for Plato deliverance the only reason for bothering with philosophy is to find release or peace from the torments and perplexities of life." (২)দর্শন বলতে এ| লেখক যা বুঝিয়েছেন, তা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সকল দেশেরই কথা। রবীন্দ্রনাথ দর্শন অর্থে জীবনের এই গভীর সত্য-জিজ্ঞাসাকে বুঝেছিলেন, যার | া জগতের রহস্যকে বোঝাবার চেষ্টা করা যায় এবং যা সমস্ত দৈনন্দিন বিদ্যাকে অতিক্রম করে এমন এক জ্ঞানের সন্ধান দেয়, যার মধ্যে আছে আশার বাণী, আনন্দের বাণী।

রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি'কে অনেকে দার্শনিক কাব্য বলে থাকেন। কথাটা বোধ হয় ঠিক নয়। বরং বলা উচিত, "গীতাঞ্জলি" কাব্য এবং সেই কাব্য জীবনের এমন এক গভীরে আমাদের নিয়ে যায়, যেখানে দার্শনিক

সত্যের মুখোমুখি আমরা দাঁড়াই। দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের বিচারে আমরা "গীতাঞ্জলি"কে কবির জীবনে একটা বিশিষ্ট পর্ব বলে ধরে নিতে পারি। এই কাব্যের আগে কবির হৃদয়ে দার্শনিকতার উন্মেষ দেখা দিয়েছে, কিন্তু দর্শনতত্ত্ব সুস্পষ্টভাবে দানা বাঁধে নি। "গীতাঞ্জলি"তে প্রথম এই তত্ত্বের পরিষ্কার রূপ পাওয়া যাচ্ছে। এই কাব্যের মূল দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ "শান্তিনিকেতন" গ্রন্থের মধ্যে এক জায়গায় ব্যক্ত করেছেন। কবি বলেছেন, "এই জন্যেই যিনি অসীম তিনি সীমার আকর হয়ে উঠেছেন—কেবলমাত্র ইচ্ছার দ্বারা আনন্দের দ্বারা। সেই কারণেই উপনিষৎ বলেন: আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। সেই জন্যেই বলেন: আনন্দরূপমৃতং যদ্ বিভাতি। যিনি প্রকাশ পাচ্ছেন, তাঁর যা কিছু রূপ, আনন্দরূপ, অর্থাৎ মূর্তিমান ইচ্ছা; ইচ্ছা আপনাকে সীমায় বেঁধেছে।.....এমনি করে যিনি অসীম তিনি সীমার দ্বারা নিজেকে ব্যক্ত করেছেন, যিনি অকালস্বরূপ খণ্ড কালের দ্বারা তাঁর প্রকাশ চলেছে। এই পরমাশ্চর্য রহস্যকেই বিজ্ঞানশাস্ত্রে বলে পরিণামবাদ। যিনি আপনাতেই আপনি পর্যাপ্ত তিনি ক্রমের ভিতর দিয়ে নিজের ইচ্ছাকে বিচিত্ররূপে মূর্তিমান করছেন।" (৩) রবীন্দ্রনাথের এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, সমস্ত পৃথিবী, তার তুচ্ছাতিতুচ্ছ কণা অসীমের প্রকাশ, অসীম আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মা এবং সেই আনন্দের লীলা বা ইচ্ছা থেকে অন্য সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি। "গীতাঞ্জলি"র তত্ত্বের দিক হোল এটা। এখন দার্শনিক পরিভাষায় আমরা এর থেকে একটা স্পষ্ট মত পাবার চেষ্টা করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ যে বলছেন, সমস্ত পৃথিবী অসীমের প্রকাশ, এই অসীম সম্বন্ধে ধারণা সবটাই উপলব্ধি-সংস্কার নয়। কবি তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে এই অসীমকে উপলব্ধি করেছেন? কিন্তু এই অসীমের রূপ কি? তিনি কি ব্যক্তি-স্বরূপ না ব্যক্তি-রূপের ঊর্দ্ধে এমন এক বিরাট ব্যক্তিত্ব যাকে ব্যক্তিত্বের রূপে সম্পূর্ণ ধরা যায় না? আমাদের মনে হয়, এই অসীম supra-personal, যদিও মানুষের সঙ্গে মিলনে তিনি personal এবং বহুভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আভাস ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। অতএব দেখা যচ্ছে অসীম ব্যক্তি রূপের ঊর্ধ্বে, কিন্তু যাঁর চিত্তে সমগ্র পৃথিবী এবং মানুষ কেন্দ্রীভূত, কিন্তু ব্যক্তিরূপে যাঁর প্রকাশ হলেও যিনি ব্যক্তি নন। ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব নিয়ে দার্শনিক মহলে একটা প্রশ্ন আছে। বেদান্তের মতে, ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ঈশ্বর সগুণ, অতএব অসীম। বরং ঈশ্বরের

এই ব্যক্তিরূপটিই মায়া এবং ব্যক্তিত্ব অতিক্রান্ত নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মাই প্রকৃত সত্য। এই মতের অনুরূপে বক্তব্য পাওয়া যায় পাশ্চাত্য দর্শনে হেগেলপন্থী ব্রাড্‌লের দর্শনে। তিনি বলতে চান,"...for me a person is finite or meaningless...assuredly the Absolute is not merely personal. it is not personal, because it is personal and more. It is in a word, super-personal." (৪) হেগেল পন্থী অন্যান্যদের মধ্যে আমেরিকান দার্শনিক রয়েস্ একটি সঙ্গীতের সঙ্গে অসীমের তুলনা করেছেন। সঙ্গীতে বিচিত্র সুরের সমন্বয়, প্রত্যেকটি সুরের স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও সমস্ত সুরের ঐক্যই সঙ্গীত এবং তা পৃথক সুরগুলি থেকে অনেক বিরাট। অসীমও তেমন বহু সীমার সমন্বয় হয়েও আলাদা এক বিরাট রূপ, তাই তাকে ব্যক্তিচেতনা বলাও যেমন ভুল; তেমনি নৈর্ব্যক্তিক বলা ভুল। দর্শনের এই সমস্যাকে রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে দেখেছেন, যা অভিজ্ঞতার দিক থেকে সত্য, আবার দার্শনিক সত্যের দিক থেকে হেয় নয়, কারণ তাঁর অসীম ব্যক্তি-চেতনায় প্রকাশিত, অথচ ব্যক্তি-চেতনায় সীমিত নয়। দার্শনিক পরিভাষায় আমরা তাহলে বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের অসীম ব্যক্তি-চেতনা-অতিক্রান্ত একটি বিরাট চেতনা। যেহেতু অসীম ব্যক্তি ও জগতে নিঃশেষিত নয়, অতএব তা জগৎ-অতিক্রান্ত, আবার যেহেতু "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর," অতএব তা জগৎ-লীন, বা transcendent ও immanent দুই-ই।

"গীতাঞ্জলি পর্বে অসীম চেতনা রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক বিশিষ্টতা এবং এই চেতনায় তাঁর আত্মোপলব্ধি থাকলেও ব্রহ্ম-ধর্ম-চেতনাও কম নয়। কিন্তু এই অসীম চেতনাই কবিকে ধীরে ধীরে পরম মানবের চেতনায় নিয়ে গেছে। ধর্ম-নিরপেক্ষ-পরম মানব-চেতনা রবীন্দ্রদর্শন বিবর্তনে একটি বিশিষ্ট অধ্যায় বলে মনে করা যেতে পারে।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রথম দার্শনিক সম্মেলন আহূত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর অভিভাষণে একটি দার্শনিক প্রশ্ন বিচার করেন তা হোল—মুক্তির প্রশ্ন। আমাদের ভারতীয় দর্শনে বলা হয়ে থাকে, সংসারের দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে হলে পরম জ্ঞান প্রয়োজন এবং যে জ্ঞান এই মুক্তি দিতে পারে তাই দর্শন। রবীন্দ্রনাথ বললেন, সমস্ত জীবনের মধ্যে যে অসীম নিজেকে প্রকাশ করেছে, যে অসীম আনন্দ-স্বরূপ

জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে তাঁকে উপলব্ধি করাই মুক্তি। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে জীবনকে ব্রহ্মময় করে তোলাই ছিল মুক্তি। রবীন্দ্রনাথ অন্য বহু জায়গায় বলেছেন, যে জীবনের প্রতিটি পর্বে বিরাটের স্বরূপকে উপলব্ধি করেছে, সেই অমৃতের আস্বাদ পায়। এই অবস্থাকে কবি ব্রহ্মবিহার বলেছেন এবং এই রকম পুরুষ সমস্ত মানুষের মাঝে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করে আনন্দকে উপলব্ধি করে। রবীন্দ্রনাথ মুক্তি অর্থে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে, জগৎ-সংসার ত্যাগ করে নিজের আত্মাকে সহস্র পাপবন্ধন থেকে মুক্ত করার কথা ভাবেন নি। তাঁর আরও আগের কাব্যে এই ভাবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। "গীতাঞ্জলি"তেও কবি বলেছেন, ঈশ্বর আপনি কর্মের বাঁধনে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে বাঁধা। সুতরাং মুক্তি হোল কর্মের পথে নিজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীকে অতিক্রম করে বহু মানুষের মাঝে নিজেকে বিস্তীর্ণ করে দেওয়া এবং যে অসীম সমস্ত জীবনের প্রকাশ, তার সাথে একাত্মতা অনুভব করা। কবি দার্শনিক সম্মেলনে বলেছিলেন, **This amrtam, the immortal life is not a mere prolongation of physical existence, it is in the realisation of the perfect, it is in the well proportioned beautiful definition of life which every moment surpasses its own limits and expresses the eternal।** (৫)

এই মুক্তি প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। "গীতাঞ্জলি"তে কবি যে অসীমের কথা বলেছেন তাঁর প্রতি আধ্যাত্মিক আকুতি এবং কাব্যিক সৌন্দর্যানুভূতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু এই অসীমকে জীবনের বিভিন্ন পর্বে অনুভব, বহু মানুষের মধ্যে অসীমকে অন্বেষণ—রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের অপর একটি বৈশিষ্ট্য। তিনি শুধু অসীমের আনন্দের নিশ্চেতন থাকতে চান না। সমস্ত মানুষের মধ্যে যে একটি অসীম ঐক্য আছে, তাঁকে হৃদয়ে উপলব্ধি করাটাই বড় কথা নয়, জীবনের কর্ম-যজ্ঞে তাঁকে জানতে হবে সমস্ত মানুষের হৃদয়ের সূত্রে। "গীতাঞ্জলি"তে যে অধ্যাত্ম উপলব্ধি কবির একান্ত ছিল, কবি তাকে বিশ্বজীবনের মাঝে প্রত্যক্ষ করতে চাইছেন, যার পরিণতিতে আমরা পাচ্ছি "মানুষের ধর্ম"। আমাদের তাই মনে হয়, রবীন্দ্র দর্শন বিচারে এই মুক্তি তত্ত্ব একটা বড় স্থান অধিকার করে। "নৈবেদ্য" কাব্যে কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অধ্যাত্ম অনুভূতিকে কর্ম-তত্ত্বের সঙ্গে মিশতে দেখা যায়। কিন্তু "গীতাঞ্জলি"তে যে অসীমকে কবি উপলব্ধি করলেন, যা

প্রত্যেক ব্যক্তিচেতনায় প্রকাশিত অথচ ব্যক্তিচেতনার ঊর্ধ্বে, তার মাঝে বিশ্ব-জীবনের প্রকাশের তত্ত্ব কবি উদ্‌ঘাটন করেছেন, "মানুষের ধর্মে।" কিন্তু কি কর্ম-তত্ত্বে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মানুষ যখন নিজের সংকীর্ণ সীমাকে ত্যাগ করে বহুজনের হৃদয়ে মিলনের আসন খোঁজে, তখনই সে পায় অসীমকে আর যা পাবার পথ হচ্ছে নিখিল মানবের কর্ম-সাধনা। দার্শনিক সম্মেলনের ভাষণ শেষ করেন রবীন্দ্রনাথ একটি বাউল-গান দিয়ে এবং তার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের দর্শনের এই মূল কথাটাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

"হৃদয় কমল চল্‌তেছে ফুটে কত যুগ ধরি,
তাতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা উপায় কি করি।
ফুটে ফাটে কমল ফোটার না হয় শেষ,
এই কমলের যে এক মধু, রস যে তায় বিশেষ।
ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর, পারে না যে তাই,
তাই তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা, মুক্তি কোথাও নাই।"(৬)

"গীতাঞ্জলি"র আগে রবীন্দ্রনাথ "ধর্ম" ও "শান্তিনিকেতন" লিখেছেন। সুতরাং মনে করা যেতে পারে, "গীতাঞ্জলি" কাব্যের দার্শনিক প্রস্তুতি এই দুই গ্রন্থের ভিতর দিয়ে হয়েছে। প্রমথনাথ বিশি এক প্রবন্ধে বলেছেন, "গীতাঞ্জলি সাধনার বীজ শান্তিনিকেতন গ্রন্থ।" এই গ্রন্থ ও "ধর্মে" রবীন্দ্রনাথ যে দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন, তা বহুলাংশে আত্ম-অধ্যাত্ম উপলব্ধি সমন্বিত হলেও অস্বীকার করা যায় না, মূলতঃ তা উপলব্ধি প্রভাবিত ব্রহ্ম-ধর্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাই "গীতাঞ্জলি"তে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কবি অসীমের ধ্যানে নিমগ্ন, যেখানে অসীম নিজেকে প্রকাশ করেছে তার রূপ-বৈচিত্র্যে মুগ্ধ এবং ব্যক্তি চেতনার ঊর্ধ্বে অসীমকে উপলব্ধির জন্য কবির আকুল আগ্রহ। "গীতাঞ্জলি" তাই রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-জীবনের চরম প্রকাশ। কিন্তু কবি চিরকালই জীবন-সাধনার পথিক, তাই শুধু অধ্যাত্ম-রসে তৃপ্ত নন। অবশ্য "গীতাঞ্জলি" বা "শান্তিনিকেতন" মানুষের কর্ম-জীবনের দিক অস্বীকৃত হয়েছে, তা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এবং আমরা বলতে চাই এই পর্বে কর্মের সাধনা অধ্যাত্ম-জীবনের মায়া আলোকে উজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথ এখানে অসীমকে উপলব্ধি করবার জন্য যতটা জোর দিয়েছেন, সমগ্র মানবের কর্ম-সাধনায় তাকে আয়ত্ত করবার ততটা চেষ্টা করেন নি। কিন্তু এই অসীম যাঁর জন্য আধ্যাত্মিক আকুলতা রয়েছে, যাঁকে ধ্যানে ধরা যায়, তাঁকে সমস্ত জীবনে

ধরতে চেয়েছেন কবি। অসীম যখন বিশ্ব-মানবতায় উত্তীর্ণ, তখনই রবীন্দ্রনাথের দর্শন উপনিষদ অনুসৃত ব্রাহ্মধর্ম থেকে মুক্তিলাভ করে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা "ধর্ম" ও "শান্তিনিকেতন" থেকে দু'একটি উদ্ধৃতি সহযোগে আমাদের রবীন্দ্র দর্শন বিচারের বক্তব্য বোঝাতে চেষ্টা করছি।

"আমরা ধ্যানযোগে আমাদের অন্তর বাহিরকে যেমন বিশ্বেশ্বরের দ্বারাই বিকীর্ণ দেখিতে চেষ্টা করিব, তেমনি আমরা প্রার্থনা করিব যে সত্য, যে জ্যোতি যে অমৃতের মধ্যে আমরা নিত্যই রহিয়াছি, তাহাকে সচেতনভাবে জানিবার যাহা কিছু বাধা, সেই অসত্য, সেই অন্ধকার, দূর হইয়া যায়।"৭

"এই যে আত্মা দিয়ে বিশ্বের সর্বত্র আত্মার মধ্যে প্রবেশ করা এই তো আমাদের সাধনার লক্ষ্য। প্রতিদিন এই পথেই যে আমরা চলেছি এটা তো আমাদের উপলব্ধি করতে হবে।···সকলের সঙ্গে বেশি করে মিশতে পাচ্ছি, অল্পে অল্পে সমস্ত বিরোধ কেটে যাচ্ছে—মানুষের সঙ্গে মিলনের মধ্যে, সংসারের কর্মের মধ্যে ভূমার প্রকাশ প্রতিদিন অব্যাহত হয়ে আসছে।"৮

"সংসারকে যদি ব্রহ্মের দ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া জানিতে পারি তাহা হইলে সংসারের বিষ কাটিয়া যায়, তাহার সংকীর্ণতা দূর হইয়া তাহার বন্ধন আমাদিগকে আঁটিয়া ধরে না। এবং সংসারের ভোগকে ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিলে কাড়াকাড়ি মারামারি থাকিয়া যায়।"৯

এইরূপ অজস্র উদাহরণ সহযোগে দেখান যায়, "ধর্ম" ও "শান্তিনিকেতনে" ধর্মাশ্রিত দার্শনিক সমস্যাই কবি আলোচনা করেছেন বেশি। তারই আলোকে লেখা "গীতাঞ্জলি" আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কাব্য। কিন্তু যে অসীমের উপলব্ধিতে রবীন্দ্রনাথের দর্শন সুরু, যার শুধু ধ্যানরূপই "গীতাঞ্জলি"তে মেলে, তা আরও বিবর্তিত হয়েছে। সেই বিবর্তনের ধারায় দার্শনিক সম্মেলনে কবির অভিভাষণ একটি পর্যায়, যেখানে অসীমকে সমস্ত মানবের জীবনেও কর্মসাধনায় আয়ত্ত করবার প্রচেষ্টা আছে। এই কথা মনে রেখেই আমরা দার্শনিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আলোচনা করেছি। অসীমের বিশ্ব-মানবে রূপায়ণের প্রেরণার সাক্ষাৎ রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী প্রবন্ধ-মালা Personality ও Nationalisim-এ পাওয়া যায়। বরং বলা যায়, এই গ্রন্থে যা পাওয়া যায়, তারই প্রস্ফুটিত রূপ মিলেছে "মানুষের ধর্ম"। দার্শনিক সম্মেলনের বক্তব্যে তারই একটা ইংগিত পাওয়া যায়। সুতরাং অসীম কিভাবে বিশ্বমানবতায় রূপান্তরিত হোল, তার আগের ইতিহাস হিসাবে

Personality ও Nationalism-এর সংক্ষিপ্ত বিচার অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রথম মহাযুদ্ধের বিভীষিকা যখন সমস্ত জগতে প্রায় শেষ হয়ে আসছিল, সেই সময় রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে তাঁর বাণী প্রচার করেছেন। জাপানে ও আমেরিকায় তিনি তাঁর যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন, তাই Personality ও Nationalism গ্রন্থের বিষয় বস্তু। প্রথম গ্রন্থে তিনি মানুষের আদর্শ সম্বন্ধে বলেছেন, অসীমকে জীবনে উপলব্ধি করাই ব্যক্তির প্রকৃত স্বরূপ। মানুষে মানুষে যে স্বাতন্ত্র্য তা দূর হতে পারে এই অসীমকে অনুভব করেই। মানুষের চেষ্টা হচ্ছে নিজের সীমা থেকে নিজেকে মুক্ত করা। জগতে প্রাণের বিবর্তনে মানুষের মধ্যে একটা নূতনত্ব দেখা যায় যার ফলে সে জগতকে নিজের মত করে যোগ্য করে নিতে চায়।

নিজেকে সমস্ত বিশ্ব জগতের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াই তার স্বাধীনতা। স্বকীয়তার সীমা থেকে মুক্ত হওয়াই তার শ্রেষ্ঠত্ব। এই অসীমকে লাভ করতে আমাদের প্রতি মুহূর্তে দুঃখের সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হচ্ছে। কিন্তু এই দুঃখ আর কষ্টের মধ্যেই মানুষের অমরত্বের সাধনা। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে এক হয়েই মানুষ দেবত্ব লাভ করতে পারে এবং সকলের প্রতি প্রেমই তাকে এই বিশ্বজীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, we have known the fulfilment of man's personality in gaining god's nature for itself, in utter self-giving out of abundance of love Men have been born in this world of nature with our human limitations and appetities and yet..... become one with their god in the free active life of the infinite. (১০) বলা বাহুল্য Personality-র বক্তব্যে "ধর্ম" ও "শান্তিনিকেতন" গ্রন্থের বহু প্রতিধ্বনি আছে বা বহু অংশে সেগুলি ইংরাজী অনুবাদ বলে মনে হয়। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ মানুষের উদ্দেশ্য বা আদর্শ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলেন যে অসীমকে জীবনে কর্মের মধ্যে পাওয়াই ব্যক্তিত্বের চরম সার্থকতা। অসীম শুধু ধ্যানের বিষয় নয়, অসীম বিশ্বজীবনে প্রতি মানুষের মনে সুপ্ত। তাঁকে জানা, প্রতি মানুষের হৃদয়ে তাঁকে উদ্বোধন করাই মানুষের প্রকৃত ধর্ম। অসীম সম্বন্ধে এই ধারণা এখনও পর্যন্ত ব্রহ্ম-ধারণার পুনরাবৃত্তি, কিন্তু তাকে অনেকখানি মানুষের চিরন্তন জাগতিক সংগ্রামের মধ্যে কবি মূর্ত হতে দেখেছেন। Personalityতে

ব্যক্তিজীবনের দিক থেকে যেমন অসীমকে উপলব্ধি করবার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, Nationalism সেইরকম সমাজ-জীবন বা জাতীয়-জীবনের কথা বলেছেন।

ব্যক্তি মানুষ সমাজ-জীবনে-স্বার্থবোধ থেকে অনেকখানি মুক্ত। কিন্তু সমাজ-জীবন বা জাতীয়-জীবন যখন একটা বিশেষ সামাজিক স্বার্থে সমস্ত ব্যক্তিকে নিয়োজিত করে, তখন সমাজ বা জাতি অসীমকে উপলব্ধির পথে পিছিয়ে পড়ে। প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন অন্য ব্যক্তির মধ্যে একই অসীমকে লাভ করবার চেষ্টা করে, সমাজকেও সেই রকম বিশিষ্ট সীমা অতিক্রম করে সমস্ত সমাজের মধ্যে মিলনের সূত্র খুঁজতে হবে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই স্বার্থবোধ জন্ম দেয় অন্য সমাজের উপর আধিপত্য করার প্রবৃত্তি এবং তা থেকেই জন্ম নেয় আত্মঘাতী সাংঘাতিক যুদ্ধ। এক জায়গায় প্রত্যেক ব্যক্তি বা সমাজের স্বাতন্ত্র্য আছে, যেমন ব্যক্তির নিজস্ব দৈহিক প্রয়োজন বা সমাজের বিশিষ্ট দাবী। কিন্তু দৈহিক সীমাকে পেরিয়ে সমস্ত মানুষ অন্তরে মিশতে পারে, তেমনি দেশ-কালের বেড়া ডিঙিয়ে সমস্ত সমাজই মহামানবতার তীর্থক্ষেত্র রচনা করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "As the mission of the rose lies in the unfoldment of the petals which implies distinctness, so the rose of humanity is perfect only when the diverse races and the nation's have evolved their perfected distinct characteristics' but all attached to the stem of humanity by the bond of love." (১১)

"গীতাঞ্জলি" ও "শান্তিনিকেতন" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ অসীমের স্বরূপ অসীমের সঙ্গে সীমার সম্বন্ধ এবং সৃষ্টি-তত্ত্ব আলোচনা করেছেন। এগুলি নিছক ধর্ম ও দর্শনের সমস্যা এবং রোজকার মানুষের সঙ্গে এই সমস্ত প্রশ্নের যোগ কম। রবীন্দ্রনাথ ধর্ম-জীবনকে বাস্তব-জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে প্রয়াসী, কারণ তিনি জানেন, তা না হলে ধর্ম-জীবন এক বিশেষ পর্যায়ে আবদ্ধ থাকে। এই জন্য Personality-তে অসীমের প্রকাশ, তাঁর আনন্দরূপে ইত্যাদির ব্যাখ্যা থাকলেও বিশেষ করে তা ব্যক্তি-জীবনের পটভূমিকায় ব্যক্ত। যে অসীম "গীতাঞ্জলি" পর্বে ছিল অনির্বচনীয়, তাই এখন মানব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। অসীম এখন শুধু ধ্যানবস্তু নয়, তাকে মানুষ সংগ্রামে, কর্মক্ষেত্রে উদ্বোধিত করে জীবনের

শ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসাবে বরণ করে নিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের দর্শনের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই পর্বে লক্ষণীয়। কবি ব্যক্তির সার্থকতা মনে করছেন অসীমের উপলব্ধি কিন্তু তা ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে নিশ্চিহ্ন করে নয়। ব্যক্তিত্বের সীমায় অসীমের অনুভূতি মানুষকে মহিমান্বিত করে এবং সীমার বাইরে অসীমের সঙ্গে তার মিলন হয়। সীমা কখনও অসীমে বিলীন হচ্ছে না, না ব্যক্তিজীবনে, না সমাজজীবনে।

প্রসঙ্গত, সমসাময়িক পাশ্চাত্য দর্শনে অসীমে সীমার স্থান নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। ব্রাড্‌লে ও বোসাঙ্কের দর্শনে মানুষ সীমায় খণ্ডিত এই খণ্ড-জীবন থেকে তার উত্তরণ তখনই সম্ভব হয়, যখন সে সার্বিক সত্তায় উপনীত হয়। কিন্তু সেই পর্যায়ে তার অবস্থা হয় নদীর মহাসমুদ্রের সঙ্গে মিলনের মত। নদী যখন মহাসমুদ্রে মেশে তখন নদীর ধারাকে আলাদা করে চেনা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে, অসীম মহাসঙ্গীতের মত, যার মধ্যে প্রত্যেকটি সুরের স্বাতন্ত্র্য আছে, কিন্তু যেখানে প্রতিটি সুর তার থেকে আলাদা সুরের সঙ্গে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করেছে এবং প্রত্যেক সুরের মধ্যে সেই মহাসঙ্গীত নিজেকে প্রকাশ করেছে। আমরা "গীতাঞ্জলি" পর্বে অসীমের স্বরূপ প্রসঙ্গে এই তুলনার কথা বলেছি। ব্যক্তির স্বরূপ সম্বন্ধেও এই তুলনার উল্লেখ করা যেতে পারে। হেগেলের দর্শন অনুযায়ী, ব্যক্তি যতই তার থেকে বিস্তৃততর আয়তনে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করে, ততই সে সার্বিক সত্তার বৃহত্তর প্রকাশ হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত সমাজ, জাতি বা রাষ্ট্রে তার পরম প্রকাশ। সুতরাং ব্যক্তির উচিত সমাজ বা জাতির সঙ্গে নিজে সম্পূর্ণ বিলীন করে দেওয়া। আমরা Nationalism গ্রন্থ থেকে যে উদাহরণটি তুলেছি তাতেই দেখেছি রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যে, জাতির স্বকীয়তায় যেমন বিশ্বাস করেন, তেমনি বিশ্বাস করেন, সমস্ত কিছুর মধ্যে অসীমকে উপলব্ধি করার সাধনা।

"গীতাঞ্জলি" কাব্য লেখা হয় প্রথম মহাযুদ্ধের আগে। তখনও মনুষ্যত্বের সর্বদেশে লাঞ্ছনা সুরু হয় নি, যদিও ভারতবর্ষে অপমানিত মানবাত্মার মুখে কবি ভাষা জুগিয়েছেন। কিন্তু আমাদের স্বদেশের প্রথম যুগের আন্দোলনে ধর্ম-সংস্কারের ভূমিকা ছিল বড়। রবীন্দ্রনাথ যুগে যে কর্মের আহ্বান জানিয়েছেন, যে অসীমকে উপলব্ধি করতে

বলেছেন, তার মধ্যে তাই আধ্যাত্মিক দিকটা ছিল প্রবল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের নৃশংস বিভীষিকায় কবির মনে, আন্তর্জগতে যে আঘাত লেগেছে, তাতে তিনি বুঝেছেন, অসীমের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পর্কের চেয়ে বড় মানবমনের সীমানায় বিরাটত্বের বোধকে জাগান। তাই Personality ও Nationalism-এ ব্যক্তি ও জাতির জীবনের পটভূমিকায় কবি সেই অসীমকে আহ্বানের দাবী জানিয়েছেন, যে অসীম সমস্ত মানুষের মনে বিধৃত, যে অসীমকে বিশ্ব-মানবতার আসনে বসান যায়। কিন্তু অসীম এখনও বিশ্ব-মানবতার রূপ পায় নি; আমরা কেবল তার পদধ্বনি শুনতে পেয়েছি। এই বিশ্ব-মানবতার পরিপূর্ণ রূপ ফুটে উঠেছে "মানুষের ধর্মে।"

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ হিবার্ট বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা হোল "The Religion of Man।" কিছুকাল পরে এইটিই বাংলায় ব্যাখ্যান করেন 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে।" (১২) এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন," আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন, যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।' তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানুষ। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব।...সেই মানুষের উপলব্ধি সর্বত্র সমান নয় ও অনেক স্থলে বিকৃত বলেই সব মানুষ আজও মানুষ হয় নি।...সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে, তাকেই বলেছে, 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা।' সকল মানুষের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাব আশা করে তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছেন—'স দেবঃ মনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।"(১৩)

"মানুষের ধর্মে"র বিস্তৃত আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু দেখাতে চাই, "গীতাঞ্জলি"র অসীম অনির্বচনীয়তারূপ পরিত্যাগ করে কবির কাছে এখনে বিশ্ব-মানবের রূপে দেখা দিয়েছে। এই বিশ্ব-মানবের ধারণা কবি সচেতনভাবে দর্শনচর্চার মধ্য দিয়ে লাভ করেন নি। জীবনে ও পৃথিবীতে যে সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে, তা তাঁর অবচেতন মনে যে ভাব সৃষ্টি করেছে, তারই প্রকা "মানুষের ধর্মে।" "The Religion of Man"-এ রবীন্দ্রনাথ বলেছে The idea of the humanity of our God or the divinity of m

the Eternal is the main subject of this book. This thought of God has not grown in my mind through any process of philosophical reasoning……it stddenly flashed……with a direct version."(১৪)

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে সমস্ত জগতে এক কষ্টকর সংগ্রামের যুগ চলেছে। বিজিত জার্মানীর প্রতি অমানুষিক ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ নিজের চোখে দেখেছেন, ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ শ্মশানপ্রান্তর দেখে মানুষের সভ্যতার কথা ভেবে দুঃখ পেয়েছেন! ভারতবর্ষে প্রতিদিন বিদেশী শাসক পুঞ্জীভূত বেদনার গ্লানি চাপিয়ে দিয়েছে আমাদের জাতীয় জীবনে। পঞ্জাবের রক্তাক্ত হত্যা[illegible] রবীন্দ্রনাথের মনে যে দুঃখের ভার জমেছিল, 'নাইট' উপা[illegible]ত্যাগ করে তার কিছুটা লাঘব করবার চেষ্টা করে[illegible] খৃষ্টাব্দে সমস্ত জগতে একটা অর্থনৈতিক সংকট এই সব বিভিন্ন দুঃখকর ঘটনা কবির মনে একটা অভিঘাত [illegible]হল। সবদেশে মনুষ্যত্বের অপমান তাঁর হৃদয়ে বড় বেজেছে। উপলব্ধি করেছেন, জগতব্যাপী এই দুঃখের আগুন থেকে পূর্ণ মুক্তি পেতে পারে সমস্ত মানুষের মধ্যে প্রেমের মধ্য দিয়ে। যদি সে উপলব্ধি করে, সকল মানুষের মধ্যে এক পরম মানব আসীন, যিনি মানুষের দেবতা, আবার যিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ, তাহলেই মানুষ দুঃখের শর্বরীকে অতিক্রম করে নতুন যুগের ভোরে জাগতে পারে।

কবি জীবনে এই আশার বাণী পেলেন কোথা থেকে? উপনিষদের আনন্দতত্ত্ব তাঁর সমস্ত জীবন জুড়ে রয়েছে কিন্তু উপনিষদে ব্রহ্মকে পরম মানব থেকে আরও বড় করে দেখা হয়েছে। এই ব্রহ্মতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রথম দিকে একটু বিমূর্তরূপে ছিল, কিন্তু "মানুষের ধর্ম" পর্বে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করলেন, ব্রহ্ম পরম মানব ছাড়া আর কিছু নয়। সর্ব ধর্মেই এই পরম মানুষের কথা বলা হয়েছে। এই সময় রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন জার্মানীতে ভ্রমণ করেছেন এবং সেখানে 'প্যাশন প্লে'তে যীশুখৃষ্টের জীবনের শেষ পর্ব দেখেছেন: মানব-পুত্র যীশুখৃষ্টের আত্মত্যাগের মহিমা উপলব্ধি করেছেন। তাছাড়া, সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়ে সর্বমানবের মুক্তির প্রয়াস দেখেছেন। আমাদের মনে হয়, উপনিষদের অনির্বচনীয় ব্রহ্মের পরম মানব-রূপায়ণের পিছনে যীশুখৃষ্টের জীবনপ্রেরণা ও সোভিয়েট রাশিয়ার

সর্বমানবের মুক্তিপ্রয়াসের অবদান থাকা বিচিত্র নয়।

"গীতাঞ্জলি" কাব্যে যে অসীমের অনুভূতি কবি লাভ করেছেন, এই ভাবে পরম মানবের রূপের মধ্য দিয়ে তা রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট দর্শনের মর্যাদা লাভ করেছে। এই পরম মানব দেশ ও কালের অতীত, কিন্তু সমস্ত মানুষের হৃদয়ে তার উপলব্ধি আছে। এই পরম মানব-চেতনা প্রত্যেক ব্যক্তির মনে আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি পরম মানবের প্রকাশ হয়েও স্বতন্ত্র এবং অবিরত চেষ্টা করছে, নিজের অর্ধবিকশিত রূপকে সেই পরম পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। পরম মানুষের জয়গানের ভিতর দিয়েই কবি মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা করে তুললেন। যে মানুষ আদর্শ, যে মানুষ পূর্ণ, যে সব মানুষের হৃদয়ে, সেই মানুষকে লাভ করাই মানুষের ধর্ম। এই ধর্ম বিশেষ কোন ধর্ম নয়, এ সর্বমানবের ধর্ম ও দর্শন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অগাস্ট কেমেতে যে মানব-ধর্ম প্রচার করেছিলেন, তার ছায়া, আমাদের উপনিষদের আনন্দরূপ, বাউলের মনের মানুষ, খৃষ্টান ধর্মের মানবপুত্র যীশুর আত্মত্যাগ—সব মিলিয়ে নিজের হৃদয়ের আগুনে পুড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রচার করলেন নূতন যুগের মানব-দর্শন। যখন পরম মানবের উপলব্ধি হারিয়ে যায়, তখনই মানুষ ভেদবুদ্ধি ব্যক্তিগত হিংসার মোহে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষের মনে একদিকে আছে জীববোধ, আর একদিকে বিশ্ববোধ। দ্বিতীয় বোধটির সাহায্যে মানুষ ব্যক্তিসীমার ঊর্ধ্বে উঠে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে। এই বিশ্বপ্রেমই মানুষের জীবনের সাধনা।

দার্শনিক পরিভাষায় আমরা যখন রবীন্দ্রদর্শনের এই বিশেষ পরিণতি বিচার করি, তখন দেখি প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ সচেতন আনন্দময় অসীম সত্তার উপলব্ধিকে কাব্যে ও প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। এই পর্যায়ে তাঁর দর্শনকে বলা যেতে পারে আনন্দময় সগুণব্রহ্মবাদ এবং তাঁর ব্রহ্ম ব্যক্তিচেতনার ঊর্ধ্বে এক বিরাট পুরুষ। মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ অংশ ও সমগ্রের, কিন্তু অংশ হলেও মানুষ পূর্ণের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে বলে তার অস্তিত্ব অসম্পূর্ণ নয়। আমরা আগেই উদাহরণ দিয়ে সীমা ও অসীমের এই সম্পর্ক বোঝাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দার্শনিক দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তারপরে আরও এগিয়েছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে **Prsonality**-ও **Nationalism**-এ আনন্দময় অসীম

সমগ্র জগতে দেখবার চেষ্টা। এখানে জগত-উত্তর রূপ অপেক্ষা অসীমের জগতলীন রূপই বেশী প্রকট, অর্থাৎ অসীম transcendent ও immanent হলেও immanence এর দিকে বেশি ঝোঁক। কিন্তু অসীম চেতনাস্বরূপ তা হলেও তা এখনও পরম মানবের রূপে কবির দৃষ্টিতে ধরা দেয় নি। অতএব বলা যেতে পারে, এই দ্বিতীয় পর্বে রবীন্দ্রদর্শন জগত-লীন অসীমবাদ। তারপরে, "মানুষের ধর্ম" পর্যায়ে এসে অসীম হয়ে উঠ্‌ল পরম মানব, যা আমাদের সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট এবং যাকে পাবার জন্য আমরা সকলে উদগ্রীব। এই পরম মানব ব্যক্তি-মানুষের কাছে সীমা অতিক্রান্ত বা transcendent আবার তার মধ্যে লীনও বটে অর্থাৎ immanent। তাই এ পর্বের দর্শনকে বলতে পারি পরম মানববাদ। আমরা মনে করি "গীতাঞ্জলি" থেকে "মানুষের ধর্ম", পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের এই দর্শনিক বিবর্তন।

কিন্তু এটা মনে করা ভুল হবে, যে রবীন্দ্রনাথ এই পরম মানব-বাদকেই চরম বলে গ্রহণ করেছেন। আসলে, এটা কবির একটা বিশেষ কালের মানসিক রূপ। তিনি মনের দিক থেকে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে এক হোতে চেয়েছেন, সর্ব অস্তিত্বেই তিনি তাই মনের পাখা মেল্‌তে চেয়েছেন। পরম মানববাদ সেই সর্বাস্তিবাদের একটি বিশেষ দিকমাত্র, বরং রবীন্দ্রমানস পরম মানববাদের সঙ্গে সর্বাস্তিবাদের সাঙ্গীকরণ। এই সর্বাস্তিবাদ সম্পর্কে কবির একটি কথা দিয়েই আমাদের আলোচনা শেষ করব—"আমি স্বভাবতই সর্বাস্তিবাদী—অর্থাৎ আমাকে ডাকে সকলি মিলে আমি সমগ্রকেই মানি। গাছ যেমন আকাশের আলো থেকে আরম্ভ করে মাটীর তলা পর্যন্ত সমস্ত কিছু থেকে ঋতু-পর্যায়ের বিচিত্র প্রেরণা দ্বারা রস ও তেজ গ্রহণ করে তবেই সফল হয়ে ওঠে—আমি মনে করি আমারও ধর্ম তেমনি—সমস্তের মধ্যে সহজে সঞ্চরণ করে সমস্তের ভিতর থেকে আমার আত্মা সত্যের স্পর্শ লাভ করে সার্থক হতে পারবে।"(১৫)

গ্রন্থপঞ্জী

১-২। Irrational Man —William Barrett

৩। শান্তিনিকেতন—রবীন্দ্রনাথ

৪। Appearance and Reality—Bradley

৫। Poet's address at the First Indian Philosophical Congress.

৬। ঐ

৭-৮-৯। ধর্ম ও শান্তিনিকেতন—রবীন্দ্রনাথ

১০। Personality—রবীন্দ্রনাথ

১১। Nationalism—রবীন্দ্রনাথ

১২। রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১৩। মানুষের ধর্ম—রবীন্দ্রনাথ

১৪। The Religion of Man —রবীন্দ্রনাথ

১৫। রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড —প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

ফরাসী গীতাঞ্জলির ভূমিকা

আঁদ্রে জীদ্

প্রাচীন ভারতবর্ষের স্তূপাকার প্রকাণ্ড গ্রন্থাবলীর পরিচয় লইবার সুযোগ আমার ঘটে নাই। সময়ের অভাবে না হউক,—এ বিষয়ে রুচির অভাববশত সে পরিচয় লাভ করা আমার ভাগ্যে কখনও ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। **Paul de Saint Victor** উক্ত সাহিত্য সম্বন্ধে রসিকতাচ্ছলে এই কথা বলিয়াছেন যে,—'অনিয়মই তাহার নিয়ম।' তাঁর মতে য়ুরোপীয় এবং ভারতবর্ষীয় মনোভাবের মধ্যে শতকোটি ভীষণ দেবতার ব্যবধান।

গীতাঞ্জলি আয়তনে ক্ষুদ্র, ইহাই আমার মতে তাহার একটি প্রধান গুণ। আর একটি গুণ এই যে, এই পুস্তক কোনো প্রকার পুরাণপ্রসঙ্গে ভারাক্রান্ত নহে। আর একটি গুণ এই যে, এ কবিতা পড়িবার জন্য কোনো প্রকার পাণ্ডিত্যের আবশ্যকতা নাই। অবশ্য প্রাচীন ভারতবর্ষের চিন্তার ধারার সহিত ইহার কোন্ সূত্রে যোগ, সেটি নির্ণয় করার লোভ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের মনের সহিত তাহার সম্পর্ক কি, সে আলোচনার মূল্য অনেক বেশি।

প্রশংসা ভিন্ন কিছু হাতে রাখিব না এই ভাবিয়া বইখানির যেটি মস্ত দোষ সেটি প্রথমেই নির্দেশ করিতেছি; যতই ছোট হউক, উহার গঠন ভালো নহে। এ-রচনাতে যে আমাদের পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিধিবদ্ধ ছন্দমাত্রা ও যতির নিয়মভঙ্গ ঘটিয়াছে, অবশ্য এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু গ্রন্থশেষে একটি ক্ষুদ্র টীকাই আমাদের সতর্ক করিয়া দিতেছে যে, গীতাঞ্জলি খণ্ড খণ্ড কবিতা ও গানের সমষ্টি, এবং সে খণ্ডগুলি পরস্পর-সম্বন্ধ নহে। ইহার অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন কবিতা প্রথমত বাংলায় তিনটি স্বতন্ত্র পুস্তকে প্রকাশিত হয়,—নৈবেদ্য, খেয়া ও গীতাঞ্জলি; শোষোক্তের নামে এই নামকরণ করা হইয়াছে, এমন অন্যান্য কবিতাও ইহাতে আছে। সেগুলি যেন যদৃচ্ছারোপিত। অপরাপর শ্রেণীবদ্ধ কবিতার মধ্যে এই সকল ইতস্তত-প্রক্ষিপ্ত কাব্যখণ্ড ভাবের ধারাবাহিকতায় বাধা দেয়, এবং চিত্তকে হেলায় উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে।

অতএব, গীতাঞ্জলির বৈষম্য ঘোষণা করিবার নিমিত্ত এই পাদটীকাটির আবশ্যক ছিল না ; উহা যে একনজরেই চোখে পড়ে শুধু তাহাই নহে, যেন চোখে আঙুল দেয়। প্রথমে হয়তো ইহাতে মনে আঘাত লাগে, কিন্তু ক্রমে যেন কিঞ্চিৎ আমোদও বোধ হয়। সত্য বলতে কি, কবি এ গ্রন্থে একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় ধরা পড়িয়াছেন বলিয়া আমার বড় ভালো লাগে। গঙ্গাতীরে তিনি এমন খ্যাতনামা কবি, তিনি চুয়ান্ন বৎসর বয়সে, কতকগুলি বন্ধুর অনুরোধে নিজের কবিতার ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন—অথচ একযোগে একটি পুস্তক পূর্ণ করিতে পারেন এমন সঞ্চয় তাঁহার নাই।

ইহা কি কম কৌতুকের বিষয় যে ইংরাজ সম্পাদক যে ছোট পেয়ালাটি অগ্রসর করিয়া ধরিলেন, তাহা ভরিয়া তুলিতে এবার অন্তত বিশাল ভারতবর্ষের ভাবের বিপুল স্রোতকে তিনবার চারিবার, এমন কি পাঁচবার চেষ্টা করিতে হইয়াছে!

মহাভারতের ২১৪,৭১৮ শ্লোক, এবং রামায়ণের ৪৮০০০ শ্লোকের পর গীতাঞ্জলি,—আঃ, কি আরাম! হায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌলতে ভারতবর্ষকে অবশেষে স্বল্পতাদোষে দোষী হইতে হইল,—সেই জন্য আমি তাঁহার নিকট কত না কৃতজ্ঞ! এই-যে দৈর্ঘ্যের বদলে সার,—এ পরিবর্তনে আমাদের কত না লাভ! কারণ গীতাঞ্জলির ১০৩টি ক্ষুদ্র কবিতার প্রায় প্রত্যেকটিই যথেষ্ট সারগর্ভ।

আমি আবার কবিতাগুলির খাপছাড়া ভাবের উল্লেখ করিব। প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি অতি সন্তর্পণে বাদ দিয়া এই বিসদৃশ ভাবটি ক্রমশ কমাইয়া আনিয়া যতশীঘ্র পারি বইখানির প্রাণস্পর্শী মর্মটুকু সম্বন্ধে আলোচনা করাই আমার মনোগত অভিপ্রায়। সেইজন্য আমি প্রথমে ঠাকুরমহাশয়ের অন্যান্য রচনা সম্বন্ধে কিছু বলিব।

গীতাঞ্জলির আবির্ভাবের পরে আর দুইখানি কবিতাপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি, The Crescent Moon,—শিশুপাঠ্য বা শিশু-সম্বন্ধীয় কবিতাসংগ্রহ। তাহাতে আমরা গীতাঞ্জলির তিনটি কবিতার দেখা পাই। সেগুলি যে সর্বোচ্চ শ্রেণীর তাহা নয়, কিন্তু সম্প্রতি সেগুলি নানাস্থলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে (LX, LXI ও LXII)।

"জগৎ-পারাবারের তীরে"
"খোকার চোখে যে ঘুম আসে"
"রঙিনখেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে"
—শিশু।

The Gardener—নামক আর একটি গ্রন্থ গত নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পদ্যমালাটি ঠিক যৌবনকালে না হউক, অন্ততঃ গীতাঞ্জলির বহু পূর্বে রচিত, একথা ভূমিকায় লেখা আছে। এই পুস্তকের অন্তর্গত কবিতাগুলির তারতম্য বিস্তর; কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কবিতার মধ্যে গুটিকতক প্রণয় কবিতা জ্বলজ্বল করিতেছে। গীতাঞ্জলির শ্রেষ্ঠ কবিতায় যে ভগবৎ প্রেম, ইহা সে প্রেম নহে; ইহা মানবীয় প্রেম, এমনকি ইন্দ্রিয়জ প্রেমও বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার মধ্যে এমন একটি অতীন্দ্রিয় ভাব আছে যে, এই শ্রেণীর একটি কবিতা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না:—

"কাছে যাই, ধরি হাত,
বুকে লই টানি"
—হৃদয়ের ধন, মানসী।

এই গ্রন্থের অপর অনেক কবিতা সম্পূর্ণ আর এক ধরণের। সেগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং তাহাতে ভাবকে সোজাসুজি প্রকাশ না করিয়া যেন একটু তফাতে সরাইয়া একটি মঞ্চে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই রঙ্গমঞ্চে সেটি অভিনীত হয়, এবং একটি হালকা নীতি-সূত্রে গাঁথিয়া কখন কখন কথোপকথনচ্ছলেও সেটি ব্যাখ্যা করা হয়। গীতাঞ্জলির কতকগুলি নিরেস কবিতাও এই ছাঁচে ঢালা। এই প্রণালীটি যে আমার বিশেষ মনঃপূত তাহা বলিতে পারি না। জ্ঞানের কথা বা ভাবের কথাকে এই প্রকার অকিঞ্চিৎকর নীতিকথার রেজকিতে পরিণত করা সকল সময়ে সুফলপ্রদ নহে। ইহার কোন কোনটি দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের বড়পাদ্রী Schmidt সাহেবের ছোট গল্প স্মরণ করাইয়া দেয়। এই জাতীয় কবিতার দৃষ্টান্তস্বরূপ LI ও XXXI সংখ্যার উল্লেখ করা যাইতে পারে। আর একটি গূঢ় কবিতায় যোদ্ধা বর্ম ও তীরের কথা আছে সেটিও এস্থলে মোটেই মানানসই হয় নাই এবং কেবলমাত্র কলেবর বৃদ্ধি ছাড়া আর কি উদ্দেশ্যে এই সংগ্রহে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা বোঝা কঠিন। এটি

একেবারে স্থানচ্যুত হইলে আমি তো কোন আপত্তির কারণ দেখি না। অপর পক্ষে নিম্নলিখিত নীতিকথাদ্বয় আমি সহজে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি। (LXXVIII ও L)

"বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন
সৃষ্টি করার কাজে"

—হারাধন, খেয়া।

এই কবিতাটির বহু-দেব-বাদ্ গীতাঞ্জলিতে অশ্রুতপূর্ব; এবং সহসা মনকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয়। কিন্তু ইহা বস্তুত বহু-দেব-বাদ নহে, আপাত-দৃষ্টে সেরূপ মনে হয় মাত্র। যে ঋগ্বেদ প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রাচীনতম পুঁথি এবং যাহার ভাষা তখনো সংস্কৃত নামে অভিহিত হয় নাই, সেই ঋগ্বেদের এই সুন্দর শ্লোকটি যাঁহাদের মনে আছে, তাঁহারা ইহাতে আশ্চর্য হইবেন না:—

"এ সকল কথা কে জানে? কেই বা আমাদের কাছে বলিতে পারে? জীবগণ কোথা হইতে আসে? এই সৃষ্টি কি? দেবগণও তাঁহা হইতে উৎপন্ন; কিন্তু তিনি,—কে জানে তাহার অস্তিত্ব কিরূপ?"

দ্বিতীয় কবিতাটি এই:—

"ভিক্ষা করে ফিরতেছিলাম
গ্রামের পথে পথে"

'কৃপণ', খেয়া।

এই কবিতাটি আর একদিকে অপর একটি দীর্ঘ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এ সম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করিব। এ কবিতাগুলি গীতাঞ্জলি হইতে অনায়াসে পৃথক করিয়া লওয়া যায়—যে হিসাবে Heine-এর "Buch der hider" হইতে "Heimkehr" মালা অথবা "Lyrisches Intermezvo" পৃথক করা সহজ। Mussera কবিতার একটি পুরাতন নামে উক্ত কবিতাবলীর নামকরণ করিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়—"ভগবানে ভরসা; অথবা ঈশ্বরের প্রতীক্ষা" বলিলে আরও ভালো হয়।

ভাবে মনে হয় ঠাকুরমহাশয়ের দুইটি নাটকের মধ্যে একটি ভাঙ্গাইয়া, কবিতা ও গানে রূপান্তরিত করিয়া এইগুলি রচিত। তন্মধ্যে এই নাটকটি প্রথম যৌবনে প্রণীত ও মহাভারত প্রণোদিত। দ্বিতীয়টিই সম্প্রতি আলোচ্য। সেটির চেহারা সম্পূর্ণ আধুনিক এবং উল্লিখিত কবিতা শ্রেণীর সহিত এক-

ভাবে অনুপ্রাণিত বলিয়া বোধ হয়। তাহার নাম "ডাকঘর"। ইহাতে আমরা একটি রুগ্ন বালকের সাক্ষাৎ পাই। সে রাজার চিঠি পাইবার উদ্বিগ্ন আশায় ও প্রতীক্ষায় জীবন ধরিয়া রহিয়াছে। ছেলেটি জানলার ধারে বসিয়া থাকে ও পথিকদিগকে প্রশ্ন করে। তাহারাও কথাবার্তা আরম্ভ করে, প্রথমে কিঞ্চিৎ অনিচ্ছার সহিত; কিন্তু অনতিবিলম্বে সেই বালসুলভ কথোপকথন তাহাদের মনের ভার লাঘব করে। তাহারা স্পষ্টত ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না-পারিলেও আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া যায়। এই যে চিঠির জন্য ছেলেটি অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে, সে চিঠি আসে, আসে, আসে না। অবশেষে যখন ছেলেটি মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত তখন রাজা নিজে তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি নিজের পরিচয় দেন না, কিন্তু সে তাঁহাকে চিনিতে পারে। নিম্নলিখিত ছোট কবিতাটি যেন উক্ত অপূর্ব নাটকের পৃষ্ঠাপার্শ্বে লিখিত বলিয়া সহজেই অনুমান করা যায়।

"আমার এই পথচাওয়াতেই আনন্দ"

—গীতিমাল্য (৭)।

এটি যে আলাদা কবিতা শ্রেণীভুক্ত, তাহাতে প্রতীক্ষার সকলপ্রকার দশা বা রূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে। কতকগুলি শ্লোক এমন একটি অন্তরঙ্গ সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত যে, সেগুলি কখন কখন Bach-এর এক একটি সুর মনে করাইয়া দেয়। (XLV, XLVI, XLVII এবং XL)

এক একবার মনে হয় যে, এ প্রতীক্ষা প্রেমাস্পদের আগমনের প্রতীক্ষা; কিন্তু দেখিতে দেখিতে আবার তাহা উদ্বেলিত আধ্যাত্মিক রসে পরিণত হয়। এই কবিতাগুলির কোন কোনটিতে সহসা একটি স্ত্রীলিঙ্গ সর্বনাম দেখিয়া আমরা ধরিতে পারি যে, বক্তা স্ত্রীলোক। কিন্তু এই কবিতার শ্রেণী যে কোথায় আরম্ভ ও কোথায় শেষ, তাহার কোনরূপ চিহ্ন নাই; এবং যেহেতু ইংরাজি ভাষায় বক্তা স্ত্রী কি পুরুষ সে কথা অনেকক্ষণ চাপিয়া রাখা যায় সেই জন্য ফরাসী অনুবাদকের সময়ে সময়ে মুস্কিলে পড়িতে হয়। কেননা ফরাসী ভাষার ব্যাকরণে পদসমূহের সঙ্গতির নিয়ম অধিকতর সুনির্দিষ্ট। কিন্তু আসল কথা এই যে, এ মহলে গানগুলি সেই আত্মার গান, যাহার কোন লিঙ্গ নাই।

"কথা ছিল একতরীতে কেবল
তুমি আমি"
—গীতাঞ্জলি (৮৪)

এক্ষেত্রে সহজেই বোঝা যায় যে, যে নৌযাত্রার কথা হইতেছে, তাহা আধ্যাত্মিক যাত্রা, অথবা সেই যাত্রা যাহার উদ্দেশে কবি Baudelaire বলিয়াছেন—"হে মৃত্যু! বৃদ্ধ কাপ্তেন, এবার নোঙর তোল"—'সময় হয়েছে নিকট, এবার বাঁধন খুলিতে হবে।' ইহারই প্ররোচনায় ঠাকুর-কবির সর্বাপেক্ষা সুন্দর এবং অভিনব গীতিকবিতা রচিত, যদিও Baudelaire-এর ভাবের সঙ্গে তাঁহার ভাবের কিছুমাত্র মিল নাই।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা আলোচ্য পুস্তকের কেন্দ্রস্থলে আসিয়া পৌঁছিয়াছি এবং আশপাশের খণ্ড কবিতাকে তফাৎ করিয়া দিয়াছি। জীবনের নিকট বিদায়সূচক কবিতা বাদে এখন আমার সমুখে যাহা আছে, তাহা প্রায় সবই অতীন্দ্রিয় জগতের বস্তু।

তবু, এসম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে আমি আবার আলোকের দুইটি স্তব পাঠ করিতে চাহি—সেগুলি এত সুন্দর যে, ভোলা যায় না। এ পুস্তকে এ দুটি স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে, কিন্তু একত্র করাই যেন স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়ঃ—

"কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো"
"আলো আমার আলো"

এই খণ্ড কবিতাগুলি যে পরস্পর সম্বন্ধ যে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি বলিয়াছি—এগুলি একত্র করা স্বাভাবিক; কিন্তু আবার বলি—না যেটি যেখানে আছে, সেইখানে থাকাই ভাল। প্রথমটি এখনো আকুলতাপূর্ণ, ইহা সেই শ্রেণীতেই থাকুক যাহাতে আত্মার উদ্বিগ্ন ব্যাকুল প্রতীক্ষার ভাব প্রকটিত যেন জীবাত্মা এখনো পরমাত্মাকে খেয়ার এপারে খুঁজিয়া ফিরিতেছে—এখনো তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে পারে নাই। দ্বিতীয়টি ব্রহ্মানন্দ উদ্বেলিত অন্তরাত্মার বিজয় সঙ্গীত।

*

এই যে আকুল আনন্দ, উৎসের ন্যায় উৎসারিত ও বিচ্ছুরিত হইতেছে, দিবসের ন্যায় আলোক ও উত্তাপ দিতেছে, ইহার গোপন রহস্য কি? এই সত্য কি? যাহা আত্মাকে একাধারে পুষ্ট ও মত্ত করিয়া তোলে? ইহা কি ব্রাহ্মণ্য দর্শন-শাস্ত্রের ফল? ইহা কি বৈষ্ণব ধর্ম? না, তাহা নহে, ইহা সেই শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ। কারণ, যে গ্রন্থে তাঁহার বক্তৃতা সংকলিত হইয়াছে, তাহার ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন—

"পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের মূল সূত্রগুলি কেবলমাত্র প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাবৃত্ত হিসাবে আদরণীয়, কিন্তু আমাদের নিকট তাহা প্রাণসম মূল্যবান।"

এই কবিত্বের এই যে ব্যগ্র প্রাণপূর্ণ মনোভাব, ইহাতেই আমি যুগপৎ হাসি ও কান্নায় অভিভূত হই। যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে আমরা কেবলমাত্র জ্ঞানপ্রধান ও তত্ত্ব সর্বস্ব মনে করিয়া থাকি, এই কবিতায় যেন তাহাকে প্রাণের স্পর্শে কম্পিত এবং হৃদয়ের আবেগে স্পন্দিত করিয়া তুলিয়াছে। Pascal তাঁহার "Mystere de Jesus"তে যে ব্যাকুল স্পন্দনের উল্লেখ করিয়াছেন ইহাও সেই জাতীয়, —ইহা কেবল আনন্দের স্পন্দন।

"যেন শেষ গানে মোর
সব রাগিনী পূরে"
—গীতাঞ্জলি (১৩৫)

বিশ্বপ্রাণের অনুভূতি এবং সেই প্রাণে যোগ দিবার অনুভূতি হইতে এ আনন্দ স্বতঃই উৎপত্তি হয়।

"এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়।"
—নৈবেদ্য (২৩)।

প্রথমে আমরা ইহাতে একটি অদ্বৈত ভাব ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাই না। দ্বিতীয় Faust-এর আরম্ভেই যে জাগরণব্যঞ্জক উক্তি আছে, তাহাতে আমরা ইতিপূর্বেই এই একই ভাবের সুন্দর প্রকাশ দেখিয়াছি:—

"উষাদেবীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিবার জন্য জীবনের স্পন্দনে নূতন বেগের সঞ্চার হইয়াছে। হে ধরণী! তুমিও গত রাত্রে সমভাবেই অবস্থান করিয়াছিলে, এখন আমার পদতলে বিশ্রামান্তে নূতন প্রাণবায়ুর নিঃশ্বাস লইতেছ এবং ইহারই মধ্যে আমাকে ইন্দ্রিয়সুখে মগ্ন করিতেছ। এই মহৎ সংকল্প তুমি আমার মনে জাগরিত এবং উদ্দীপ্ত করিতেছ,—যেন শ্রেষ্ঠতম জীবন লাভে সর্বদাই সচেষ্ট থাকি।"

অন্যত্র পর্বত হইতে নির্ঝর করিয়া পড়িতে দেখিয়া Faust যে স্বগতোক্তি করেন, তাহার শেষভাগে বলিতেছেন—

"সোপান হইতে সোপানান্তরে নির্ঝরিণী ঝরিয়া পড়িতেছে, মুহূর্তে মুহূর্তে শত সহস্র ধারায় বিভক্ত হইতেছে, উচ্ছ্বসিত ফেনপুঞ্জ বাতাসে উচ্চৈঃস্বরে বাঁশী বাজাইতেছে। কিন্তু এই ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে হইতে উদ্ভূত, পরিবর্তনশীল, বিচিত্র বর্ণ ইন্দ্রধনু কি অপরূপ ভঙ্গিতে হেলিয়া রহিয়াছে, কখন পরিচ্ছন্নরূপে অঙ্কিত, কখন বাতাসে মিলিতপ্রায় হইয়া চতুর্দিকে একটি স্নিগ্ধ বাষ্পময় হিল্লোল বিস্তার করিতেছে। ইহাই যে মানবশক্তি প্রতিচ্ছায়া—এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলে তুমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে—এই রঙিন প্রতিবিম্বই আমাদের জীবনের প্রতিচ্ছবি।"

হিন্দুধর্ম যাহাকে মায়া বলে, তাহা এই রঙিন প্রতিবিম্বেরই অনুরূপ। কিন্তু ঠাকুরমহাশয় যে আনন্দের ব্যাখ্যা করেন, মায়ার পরপারেই তিনি তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছেন এবং যতক্ষণ তিনি এই রঙিন প্রতিবিম্বের ওপারে, এই দোদুল্যমান ঘটনা-যবনিকার অন্তরালে তাঁহার দেবতাকে খুঁজিয়া ফিরিতেছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার অন্তরাত্মা তৃষিত হইয়াছিল।

"যে দিন ফুটল কমল"

—গীতিমালা (১০)।

*

জীবনের তাৎপর্য সম্বন্ধে ঠাকুরমহাশয়ের কি মতামত, সে তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিবার যোগ্যতা আমার নাই, এবং থাকিলেও আমি সে চেষ্টা করিতাম না—সংক্ষেপেও নহে। তাহার একটি বিশেষ কারণ এই যে, তিনি উপনিষদের ধর্মতত্ত্বের কোন প্রকার বদল করিতে বা তাহাতে কোন প্রকার অভিনবত্ব আরোপ করিতে সম্পূর্ণ নারাজ। এবং সে ধর্মতত্ত্ব আর যাহাই

হউক, নূতন একেবারেই নহে। সুতরাং এস্থলে আমি সে তত্ত্বের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতে বসি নাই। কিন্তু ঠাকুরমহাশয় যে আবেগ দ্বারা তাহা সঞ্জীবিত করিয়াছেন ও যে নিখুঁত নৈপুণ্যের সহিত তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই আমি মুগ্ধ।

তাঁহাকে ভগবানের প্রয়োজন আছে, একথা ঠাকুরমহাশয় জানেন। তিনি কবি হইয়া যে বাঁশীকে নিজের ফুৎকারে অনুপ্রাণিত করিতেছেন, নিজেকে ভগবানের হাতে সেই বাঁশীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। তিনি ঈশ্বরকে "আমার কবি"—কখন কখন "কবিগুরু" বলিয়া সম্বোধন করেন; তিনি নিজে এবং মানুষ মাত্রই এই কবিগুরুর জীবন্ত কবিতা। তিনি বলেন "আমি যেন আমার জীবনকে ঋজু ও সরল করিয়া, একটি বাঁশীর মতন করিয়া তুলিতে পারি; সেই বাঁশীটি তুমি ভরিয়া দাও; এইমাত্র চাই।"

ভগবান নিজের সৃষ্টিতে, নিজসৃষ্টি জীবে নিজেকে উপলব্ধি করেন। কবি যেন ঈশ্বরের চৈতন্য হইতে পারেন, বা বস্তুত তিনি সেই চৈতন্য—এই ভাবের দ্বারা তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতা অনুপ্রাণিত।

যে কবিতায় মায়ার সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দেওয়া আছে এবং মায়ার আবরণ ভেদপূর্বক জ্ঞানের মর্মস্থল উদ্ঘাটন করা হইয়াছে, সে কবিতাগুলিও নিখুঁত।

ঠাকুরমহাশয়ের যে ব্যাখ্যানগুলি সম্প্রতি "সাধনা" নামে পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে এমন অনেক বাক্য আছে, যাহা উল্লিখিত কবিতার টীকাস্বরূপ। তাহার একটি দৃষ্টান্ত "প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি" শীর্ষক পরিচ্ছেদের শেষাশেষি দেখিতে পাওয়া যায়।

"বাস্তবিক ইহা কি অতি আশ্চর্য নহে যে, প্রকৃতিতে একই সময়ে যুগপৎ দুইটি বিরোধী ভাবের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, একটি অধীনতার, অপরটি স্বাধীনতার।

একদিকে প্রকৃতির শ্রম ও চেষ্টার মূর্তি, অপরদিকে অবকাশের মূর্তি দেখিতে পাই। বাহিরে প্রকৃতি অবিশ্রান্ত কর্মশীল; অন্তরে প্রকৃতি সম্পূর্ণ শান্ত ও নিস্তব্ধ।"

ইহাই কি নিম্নলিখিত কবিতার ভাবার্থ নহে?

"একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়"

—নৈবেদ্য (৮১)

আমি শেষে যে-কয়টি কবিতার উল্লেখ করিয়াছি, সবগুলিই এই দ্বৈতভাব প্রণোদিত। 'সাধনার' একটি সুন্দর অংশ এই ভাবের সুনিপুণ টীকা স্বরূপ :—

"দৃষ্টান্তস্বরূপ ধর, ফুল। ফুল যতই সুন্দর দেখিতে হউক না কেন, সে একটি মস্ত কাজে ব্যস্ত। তাহার গড়ন ও রঙ কেবলমাত্র সেই কাজেরই উপযোগী। তাহার হাতে নির্বিঘ্নে ফল ফলানোর ভার; নহিলে গাছের জীবনের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয় ও পৃথিবী অচিরে মরুভূমিতে পরিণত হয়। ফুলের রঙ এবং গন্ধ শুধু এই কারণেই। যেমনি মৌমাছি দ্বারা তাহার গর্ভাধান হয়, অমনি ফলের সময় আসে, অমনি তাহার পেলব পাপড়ি ঝরিয়া পড়ে এবং প্রাকৃতিক মিতব্যয়িতার নিষ্ঠুর নিয়মে সে তাহার সুমধুর গন্ধ বর্জন করিতে বাধ্য হয়। সূর্যের আলোকে রূপের বাহার দিবার অবকাশ তাহার নাই, তাহার দ্বারা কার্য উদ্ধার হইয়া গিয়াছে।

"বাহিরের দিক হইতে দেখিলে মনে হয় প্রকৃতির প্রত্যেক কার্য একমাত্র প্রয়োজনের শাসনেই সম্পন্ন হয়; তাহারই তাগিদে কুঁড়ি ফুলের দিকে অগ্রসর হয়; ফল মাটিতে বীজ বপন করে; বীজ পুনশ্চ অঙ্কুরিত হয়; এবং সেইরূপে কর্ম হইতে কর্মান্তর প্রবাহ নিরবিচ্ছিন্ন ধারায় ধাবিত হইতে থাকে। কিন্তু এই একই ফুলকে মানুষের হৃদয়ের দিক হইতে দেখ, তৎক্ষণাৎ তাহার কার্যের প্রয়োজনীয়তার কোন কথাই আর উঠিবে না; সে তখনি বিরাম ও অবকাশের প্রতিমূর্তিরূপে প্রতিভাত হইবে। অতএব যে বস্তু দ্বারা অনন্ত উদ্যমের প্রকাশ হয়, সেই একই বস্তু অপরদিকে শান্তি ও সৌন্দর্যের অখণ্ড প্রতিরূপ।"

Schopenhauer "উদ্যমশীল" ও "শান্তশীল" এই উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ নির্দিষ্ট করিয়াছেন, এখানে আমরা সেই পুরাতন পার্থক্যের আভাস পাই। অবশ্য এই দ্বৈতভাব সদাসর্বদা উপলব্ধি করিতে পারাই বড় কম কথা নহে কিন্তু ঠাকুরমহাশয়ের বক্তব্য এই যে তিনি মায়ার ওপারে একটি মহত্তর আনন্দের নাগাল পাইয়াছেন—কারণ তিনি "সাধনায়" বলেন—

"আমাদের জীবনের যে দিক অনন্তের অভিমুখী তাহা ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষা রাখে না, তাহা স্বাধীনতা ও আনন্দের প্রত্যাশী। এইখানেই প্রয়োজনের রাজ্য শেষ হয়,—এখানে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য পাওয়া নয়, হওয়া। কি হওয়া? না, ব্রহ্মের সহিত এক হওয়া, কারণ অনন্তের ধর্ম মিলনের ধর্ম।

এই জন্যই আমরা উপনিষদে দেখিতে পাই, 'যিনি ঈশ্বরকে জানেন, তিনি সত্য হয়েন।' পাওয়ার সীমানা ছাড়াইয়া এইখানে হওয়ার সীমানায় পৌঁছানো যায়। যেমন, কথার অর্থ যখন জানিতে পারি, তখন কথা যে বেশি বড় হয় তাহা নহে; কিন্তু সত্য হইয়া উঠে—তখন ভাবের সহিত ভাষা এক হইয়া যায়।

"যিনি পরম পিতার সঙ্গে নিজের ঐক্য নির্ভীকচিত্তে প্রচার করিয়াছিলেন, যিনি ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যেরূপ পূর্ণ, তোমরা সেইরূপ পূর্ণ হও, সেই ব্যক্তিকে যদিও পাশ্চাত্য জগৎগুরু বলিয়া মানে, তবুও অনন্ত সত্তার সহিত আমাদের ঐক্যভাব পাশ্চাত্য জগৎ কখন সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে নাই। মানুষের দেবত্বলাভের সকল দাবীই তাঁহারা পরম স্পর্ধা বলিয়া নিন্দা করেন। কিন্তু যিশুখৃষ্ট কখনই তাঁহার উপদেশে এরূপ নিন্দাবাদ করেন নাই,—সম্ভবতঃ তাঁহার পরবর্তী খৃষ্টীয় সাধুগণও এই ভাবের সমর্থন করেন নাই। অথচ ক্রমশঃ এই ভাবই পাশ্চাত্য খৃষ্টধর্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।"

অপরপক্ষে ভগবানের সঙ্গে এই ঐক্যের ভাব হিন্দুদের মধ্যে এমন প্রবল যে, আমার প্রবন্ধের প্রথম অংশে ঋগ্বেদের একটি ঋকের যে সুন্দর পদটি আবৃত্তি করিয়াছিলাম, তাহার রচয়িতা যে ঋষি তিনি "প্রজাপতি" বলিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন; অর্থাৎ তিনি যে নূতন দেবতার স্তব করিতেছেন, সেই জীবেশ্বর প্রজাপতির নামে নিজের নামকরণ করিয়াছেন। "সাধনার" আর এক স্থলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন—"যখন এই ঐক্যের পূর্ণতাবোধ কেবলমাত্র বুদ্ধিগত নহে, যখন তাহা বিশ্বের সমগ্রতা সম্বন্ধে আমাদের চিত্তকে জাজ্বল্যরূপে সচেতন করিয়া তোলে, তখনই আনন্দ বিকীর্ণ হয় ও প্রেম বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়ে।"

গীতাঞ্জলির নিম্নলিখিত কবিতাটিতে তিনি ব্রহ্মের সহিত এই প্রকার পুনর্মিলনে লীন হইবার কথাই বলিয়াছেন:

"আমি শরৎ শেষের মেঘের মত
"তোমার গগনকোণে"
'লীলা'—খেয়া।

এইখানেই এই "স্বচ্ছ শুদ্ধ স্নিগ্ধতার মধ্যে" জীবাত্মার সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুঃখ কষ্ট ভাবনা চিন্তা ও ভালবাসা সবই লীন হইয়া যায়।

"আমার ঘরেতে আর নাই
সে যে নাই"—স্মরণ।

গীতাঞ্জলির শেষ কবিতা কয়টি সবই মৃত্যুর স্তব। ইহাপেক্ষা গভীর ও সুন্দর সুর আমি কোন দেশের কোন সাহিত্যে শুনিয়েছি বলিয়া মনে হয় না।

(ফরাসী হইতে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী কর্তৃক অনুদিত ।
৮।৫।১৯৬০ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত।)

রবীন্দ্রনাথের গল্পরচনা

হরপ্রসাদ মিত্র

গল্প-রচনার আবেগ রবীন্দ্রনাথ প্রথম যখন তীব্রভাবে অনুভব করেন, সেটা ছিল গত শতাব্দের শেষ দশক। 'সোনার তরী'র 'বর্ষাযাপন' কবিতাটির কথা অনেকে অনেকবার মনে করিয়ে দিয়েছেন। ১২৯৯ সালের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে সে কবিতা লেখা হয়। তাতে তিনি বলেছিলেন—

মাথাটি করিয়া নিচু বসে বসে রচি কিছু
বহুযত্নে সারাদিন ধরে,—
ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে।
ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।

১৮৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ছিন্নপত্রের' কোনো কোনো চিঠিতে তাঁর সেই সময়কার গল্পসৃষ্টির ব্যাকুলতা দেখা গেছে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষাকালের একখানি চিঠিতে (৩০, আষাঢ়) এবং তার পরের বছরের আর একখানি চিঠিতে (২৭, জুন) তিনি সে-ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছিলেন। শেষের চিঠিখানিতে গিরিবালার কাহিনী সম্বন্ধে উল্লেখ দেখা যায়। এই দু'খানি চিঠিই 'ছিন্নপত্রে' ছাপা হয়েছে। 'আত্মপরিচয়'-এর পরিশিষ্ট অংশে পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লেখা যে চিঠি ছাপা হয়েছে তাতে বোলপুর থেকে তিনি লিখেছিলেন (২৮ ভাদ্র, ১৩১৭)—'সাধনা বাহির হইবার

পূর্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়। ...সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোটো গল্প সমালোচনা ও সাহিত্য প্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোটো গল্প লেখার সূত্রপাত ওইখানেই। ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।'

তাঁর গল্পধারার পর্বভেদ আছে। জীবনের বিভিন্ন পর্বে তাঁর অভিজ্ঞতার প্রকৃতি বদলেছে—যেমন সব মানুষের জীবনেই সাধারণতঃ ঘটে থাকে। প্রথম দিকে তাঁর গল্প কতোটা রেখাচিত্রধর্মী, কতোটাই বা গীতিধর্মী ছিল—এবং তারই মধ্যে কী পরিমাণে বাস্তব-রস প্রবেশ করেছিল, সে আলোচনা সংক্ষেপে সাধ্য নয়। তবে, সে-আলোচনার ভূমিকা হিসেবে এখানে এই তথ্যটি স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে যে, গল্পের ক্ষেত্রেও তাঁকে নিজের পথ নিজের ঐকান্তিক পরিশ্রমেই গড়ে নিতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যখন 'হিতবাদী' সম্পাদনা শুরু করেন, সে সময়ে বাংলাদেশে 'বঙ্গবাসী' এবং 'সঞ্জীবনী' সাপ্তাহিক পত্রিকা দুখানির বিশেষ খ্যাতি ছিল। কিন্তু এ দুটির একখানিও যথার্থ সাহিত্য-পত্রিকা নয়। ১৮৯১ সালের প্রথম দিকে 'হিতবাদী' প্রচারের এক সংঘবদ্ধ আয়োজন হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'হিতং মনোহারী চ দুর্লভং বচঃ।' এই আদর্শবাণী দিয়ে 'হিতবাদী'র উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 'হিতবাদী'র প্রধান সম্পাদক হন; রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য বিভাগে সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন, আর মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় হন রাজনৈতিক সম্পাদক। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি থেকে [রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড-১৩৫৩ পৃঃ ২৮৮ দ্রষ্টব্য] আরো জানা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি অনেকেই এই পত্রিকায় লেখবার সম্মতি দিয়েছিলেন। 'হিতবাদী'র আমলে রবীন্দ্রনাথ বোধহয় ছয় সপ্তাহে মোট ছটি গল্প লেখেন এর আগে 'ঘাটের কথা' 'রাজপথের কথা' নামে তাঁর আর দুটি গল্প প্রকাশিত হয় এবং ১৩১৪ সালে সে দুটি তাঁর। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' বইখানি অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৩৩৩ সালে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ সেগুলি প্রথম গল্প হিসাবে, মর্যাদা পায়। 'হিতবাদী'র এই ছ'টি গল্প হোলো যথাক্রমে-'দেনা পাওনা', 'গিন্নী', 'পোষ্টমাষ্টার' 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি', 'ব্যবধান' এবং 'রামাকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা'। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতিতে' নর্মাল স্কুলের শিক্ষক হরনাথ পণ্ডিতের কথাসূত্রে তাঁর এই 'গিন্নী' গল্প রচনার ইশারা আছে। 'ছিন্নপত্রের' ১৮৯১ সালে ফেব্রুয়ারি এবং

১৮৯২-এ জুন মাসে দু'খানি চিঠিতে তাঁর 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পের কথা আছে। সম্ভবতঃ 'হিতবাদী'তে তাঁকে অরো হালকা ধরনের গল্প লিখতে বলা হয়। ফলে 'হিতবাদী'র সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে যায়। মোট প্রায় তিনমাস রবীন্দ্রনাথ 'হিতবাদী'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

—'হিতবাদী'র পরে ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'সাধনা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' প্রকাশিত হয়। তারপর পৌষে 'সম্পত্তি সমর্পণ', মাঘে 'ডালিয়া', ফাল্গুনে 'কঙ্কাল', চৈত্রে 'মুক্তির উপায়'—এবং এইভাবে প্রতি মাসে একটি করে পরের বছর ১২৯৯ সালে বৈশাখে 'ত্যাগ', জ্যৈষ্ঠে 'একরাত্রি', আষাঢ়ে 'একটা আষাঢ়ে গল্প', শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যায় 'জীবিত ও মৃত' এবং 'রীতিমত নভেল' আশ্বিনে 'স্বর্ণমৃগ' এবং কার্তিকে তাঁর 'জয়-পরাজয়' ছাপা হয়। এই 'সাধনা'-পত্রিকাতেই ১৩০১ সালে রবীন্দ্রনাথের 'প্রায়শ্চিত্ত', 'বিচারক' এবং 'নিশীথে' প্রকাশিত হয়। ঐ ১৩০১ সালে তিনি 'ব্রাহ্মণ' এবং 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতা দুটি লিখেছিলেন যথাক্রমে ফাল্গুন মাসের ৭ই এবং ১২ই তারিখে। তাঁর জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই দুটি রচনাকে গল্প কবিতা অর্থাৎ পদ্যে লেখা গল্প বলেছেন। 'সাধনা'র শেষ গল্প ১৩০২ সালে ভাদ্র সংখ্যায় ছাপা হয়। এই যুগের শেষে গল্প 'ইচ্ছাপূরণ' প্রকাশিত হয় ভুবনমোহন রায় সম্পাদিত 'সখা ও সাথী'র আশ্বিন সংখ্যায়। এই 'সখা ও সাথীতে'ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনী এবং তাঁর প্রথম আত্মচরিত যথাক্রমে ১৩০২ শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় ছাপা হয়। বাংলায় বিদেশী গল্পের ব্যাপক অনুসরণ শুরু হয়ে গেছে তখন। অনেক অনুবাদ-গল্প দেখা দিয়েছে। তখনকার পত্র-পত্রিকা সন্ধান করে দেখলেই এ-মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। ১২৯৮ সালে অগ্রহায়ণের 'সাহিত্য' পত্রিকায় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের অনুবাদ-গল্প 'আয়না' ছাপা হয় ১৩০৬ সালের শ্রাবণে 'প্রদীপ' পত্রিকায় রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ 'তামাকের পাইপ' [ডিকেনোর পিক্‌উইক্‌া থেকে] প্রকাশিত হয়। ১২৯৮ সালের 'সাহিত্য' পত্রিকাতেই প্রমথ চৌধুরীর 'ফুলদানি' [প্রস্‌পের মেরিমির : ১৮৩০-৭০ থেকে] প্রকাশিত হয়। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের সতরই আগষ্ট স্বর্ণকুমারী দেবীর [১৮৫৫-১৯৩২] প্রথম ছোটগল্পের বই 'নবকাহিনী' প্রকাশিত হয়। ১২৯৩ সালে 'ভারতী ও বালক'-এর বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'নবকাহিনী'র

প্রথম দুটি গল্প ছাপা হয়। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প লেখা তখনও শুরু হয় নি। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের [১৮৬১-১৯৪০] লেখা ছোটগল্পও 'হিতবাদী' প্রকাশের অগেকার ঘটনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' থেকে জানা যায় যে, তিনি তাঁর প্রথম যৌবনে একসময়ে প্রতিসন্ধ্যায় ঠাকুর-বাড়ির সকলকে একত্র করে ইংরেজি থেকে ভালো ভালো গল্পের তর্জমা করে শোনাতেন। তারই ফলে অল্পদিনের মধ্যেই স্বর্ণকুমারী দেবী কয়েটি ছোটগল্পও লিখে ফেলেছিলেন। এবং সে-ঘটনা স্বর্ণকুমারীর বিবাহের পূর্ববর্তী ব্যপার। তাঁর বিবাহ হয় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের সতরই নভেম্বর।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'নব-কথা' ১৩০৬ সালে ছাপা হয়েছিল। সর্বসমেত এ বইয়ের গল্পের সংখ্যা এগার। প্রথম লেখাটি অঙ্গহীনা। ছোট চার পরিচ্ছেদে,—দ্বিতীয় গল্প 'হিমানী' তিন পরিচ্ছেদে—এবং এইভাবে প্রায় সব গল্পগুলিই একাধিক পরিচ্ছেদ-বিভাগে ভাগ করে লেখা হয়েছিল। তাঁর 'বেনামী চিঠি' নামে গল্পটির একেবারে শেষে সংযোজিত একটি 'উপসংহার পর্ব' এর মধ্যে তিনি লিখেছিলেন আমরা গল্প লেখকেরা বিধাতার বরে অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারি বটে, কিন্তু আমাদেরও ক্ষমতার একটা সীমা নির্দিষ্ট আছে। বিলাতফেরত ব্যক্তিগণ আমাদের গল্পের বিষয়ীভূত হইলে, তাহাদিগকে মিষ্টার ছাড়া অন্য কিছু বলা আমাদের সেই ক্ষমতাসীমার অতীত।

গল্পের মধ্যে এই ভাবে উপসংহার যোজনার অভ্যাস গল্পের শিল্পাঙ্গিকের দিক থেকে উল্লেখ অবশ্যই দাবি করে। উপসংহারের যেটুকু অংশ এখানে তুলে দেওয়া হোলো, তার পরেও আরো কয়েকটি বাক্যে প্রভাতকুমার তাঁর মন্তব্য শেষ করেছিলেন। আবার, এই বইয়েরই 'কুড়ানো মেয়ে' গল্পটির চতুর্থ পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত 'একখানি পত্র'-ও সেকালের বাংলাগল্পের শিল্পরীতির আলোচনায় কখনোই ভোলবার নয়।

উত্তম পুরুষের সর্বনামের মাধ্যমে লেখকের কথকসত্তা গ্রহণের রীতি প্রভাতকুমারের অনেকগুলি গল্পেই দেখা যায়। তাঁর ভুল-ভাঙ্গা থেকে প্রথম দুটি অনুচ্ছেদ এখানে নমুনা হিসেবে তুলে দেখানো যেতে পারে :

> আজকাল শ্বাশুড়ীকে নিন্দা করা বধূদের একটা ফ্যাসান হইয়াছে। নাটকে-নভেলে পর্যন্ত শ্বাশুড়ী বেচারীদের পরিত্রাণ নাই। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন,—'মূর্খেরে তুষিবে তার মত কদাচারে'—গ্রন্থ-

কারেরা কি এই মহাজন বাক্যের বশবর্তী হইয়া এইরূপ করেন নবীনা পাঠিকাদের তুষ্টিসাধন ব্যতীত বাঙ্গলা বহি বিক্রয় হইবার আর উপায় নাই বুঝি ?

আমি শ্বাশুড়ীদের হইয়া ওকালতি করিতে বসিয়ছি, তাই যেন তোমরা পাঁচজনে আমাকে বুড়া মাগী বলিয়া গালি দিও না। আমার বয়স এখনও কুড়ি পার হয় নাই; সুতরাং তোমরা কোনও মতেই আমাকে বুড়ি বলিতে পারিবে না!—আমার শ্বাশুড়ীর মত অমন শ্বাশুড়ী কলিকালে হয় না। আমি যাহা করিয়াছিলাম, তোমরা যদি তাহা করিতে, তবে তোমাদের শ্বাশুড়ী—থাক্ আর অপ্রিয় সত্য কথাটা বলিব না—আমার গল্পটা শ্বাশুড়াকে শুনাইয়া তাহার মতটাই না হয় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও।

বাংলা গল্পের ক্ষেত্রে এই ছিল তখনকার রীতি আর তখনকার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের আদিপর্বের গল্প এইসঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই রবীন্দ্রনাথের রীতি, ভঙ্গি, দৃক্‌কোণ এবং সর্বব্যাপারের অনস্বীকার্য পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়। সেকথা বলা বাহুল্য। 'নবকথার' অনেক দিন পরের লেখাতেও প্রভাতকুমারের বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিরন্তর বদলেছেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছটি গল্পের সঙ্কলন গল্পাঞ্জলি ২/৫ চৌরঙ্গী, মানসী কার্যালয় থেকে ১৩২০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্প-সংকলনের ভূমিকাটির তারিখ পয়লা আশ্বিন, ১৩২০। গল্প রচনায় লেখকদের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং তাঁদের কল্পনা—এই দুইয়ের অনুপাত সম্বন্ধে সেকালের পাঠকসমাজে যে চিন্তা এবং কৌতূহল দেখা দিয়েছিল সে-বিষয়ে কিছু ইংগিত পাওয়া যায় তাঁর এই ভূমিকার মধ্যে। প্রভাতকুমার লিখেছিলেন ঃ

এই সংগ্রহে প্রকাশিত বিলাতফেরতের বিপদ—'বঙ্গদর্শন' হইতে 'রসময়ীর রসিকতা'—প্রবাসী হইতে, 'আদরিণী'—'সাহিত্য' হইতে এবং অবশিষ্ট তিনটি গল্প 'মানসী' হইতে পুনর্মুদ্রিত হইল।

'মাতৃহীন' গল্প মানসীতে প্রকাশিত হইলে অনেকেই মনে করিয়াছিলেন ঘটনাটি সত্য। এমন কি, নায়কের পিতা প্রবীণ ব্যারিষ্টারটি কে, —কেহ কেহ এ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। সেই কারণে প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করিতেছি—উক্ত প্রবীণ ব্যারিষ্টারটি কোনও বার-লাইব্রেরিতে কোনও দিন পদার্পণ করেন নাই—সম্পূর্ণভাবেই কল্পনা

রাজ্যের অধিবাসী। আমি মনঃকল্পিত ঘটনা লইয়াই অধিকাংশ গল্প লিখিয়া থাকি—তবে ক্বচিৎ কখনও বাস্তব জীবনেরও দুই একটা ঘটনা থাকে বটে। কেবল 'আদরিণী' গল্পটি এই নিয়মের ব্যতিক্রম। উহার প্রায় চৌদ্দ আনা কথা সত্য। এত সত্য ঘটনা আর কখনও আমি লিপিবদ্ধ করি নাই।

গল্পাঞ্জলির গল্পগুলি ছিল যথাক্রমে—'বাল্যবন্ধু', 'বিলাতফেরতর বিপদ', 'মাতুলী', 'রসময়ীর রসিকতা,' 'মাতৃহীন' এবং 'আদরিণী'। প্রভাতকুমারের লেখাতেও কাহিনীর সূচনাতেই কতকটা নাট্যরীতি অনুসৃত হতে দেখা, যায়; অর্থাৎ স্থান-কাল-চরিত্রের প্রথম পরিচিত এবং আখ্যান-প্রসঙ্গের অভ্যুদয় কতকটা আকস্মিক ভাবে সাধিত হয়। বাংলা ছোটগল্পের আদিপর্বের প্রথম প্রবর্তক-দলের মধ্যে প্রভাতকুমারের নাম স্বীকার্য। কিন্তু তাঁর পরবর্তী লেখকদলের কারো কারো রচনায় সুদীর্ঘ ভূমিকা এবং অবান্তর গৌরচন্দ্রিকা পরিবেষণের যে অভ্যাস চোখে পড়ে, প্রভাতকুমারের রচনায় সে দোষ দুর্লক্ষ্য। তাঁর বাল্যবন্ধুর প্রথম কয়েকটি অনুচ্ছেদ এই সূত্রে উদ্ধৃত হতে পারে ঃ—

পৌষ মাস। ঠিক সন্ধ্যার সময় এক ব্যক্তি কালীঘাটের ট্রাম হইতে ভবানীপুর থানার সম্মুখে নামিয়া পড়িল। তাহার মাথায় আলবার্ট টেরি গায়ে বাদামী রঙের শাল, পায়ে ফুলমোজার উপর পাম-সু, হাতে একগাছি রূপা-বাঁধানো বেতের ছড়ি। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি হইবে।

তাহার পর প্রায় দশমিনিটকাল পদচালনা করিয়া লোকটি প্রসন্ন প্রাসাদোপম এক বৃহৎ বাসভবনের বহির্দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিল—বাবু হায়'?

দ্বারবান তাহার সেই সুপুষ্ট গোঁফ-জোড়াটিতে অঙ্গুলি-চালনা করিতে করিতে বাবুটির পানে অর্ধ মিনিটকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল—নেহি হ্যায়।

সে-সব নমুনা বাড়াবার দরকরে নেই। গল্প-রচনার ক্ষেত্রে নিজের বিশিষ্টতার কথা বলতে গিয়ে ১৯৪১ সালের মে মাসে—অর্থাৎ যে বছর তিনি লোকান্তরিত হন, সেই বছরেই বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে তার যে আলোচনা হয় সেই আলোচনার অনুলিপি আছে রবীন্দ্ররচনাবলীর চতুর্দশ খণ্ডে। সেই অনুলিপির কয়েকটি কথা এখানে উদ্ধৃত হোলো—

'আমি বলবো আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটেনি। যা কিছু লিখেছি নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।...তাকে গীতধর্মী বললে ভুল করবে। 'কঙ্কাল' কি 'ক্ষুধিত পাষাণ'কে হয় তো খানিকটা বলতে পার, কারণ সেখানে কল্পনার প্রাধান্য, কিন্তু পুরোপুরি নয়।

আর তার গল্প-ধারাতে ব্যবহৃত গদ্য-রীতি সম্বন্ধে সেই অনুলিপিতেই তাঁকে বলতে হয়েছিল—

তোমরা আমার ভাষায় কথা বল, বল যে গদ্যেও আমি কবি। আমার ভাষা যদি কখনো আমার গল্পাংশকে অতিক্রম করে স্বতন্ত্র মূল্য পায়, সেজন্য আমাকে দোষ দিতে পার না। এর কারণ, বাংলা গদ্য আমার নিজেকেই গড়তে হয়েছে। ভাষা ছিল না, পর্বে পর্বে স্তরে স্তরে তৈরি করতে হয়েছে আমাকে।'

এ-সব কথা দৃষ্টান্ত তুলে উপলব্ধি করা দরকার। তিনি যে বাস্তব বাঙ্গালী সংসারের খুঁটিনাটি সব তখনই জানতেন এবং বেশ রসের দৃষ্টি দিয়েই আমাদের জীবন-প্রবাহের যাবতীয় বিচিত্রতা তিনি যে লক্ষ্য করে গেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর জীবনে শেষবারের মতন গল্পের ঝোঁকে দেখা দিয়েছিল তিনসঙ্গীতে। সেই তিনসঙ্গীর প্রকৃতিও ভেবে দেখা দরকার।

রবিবার-এর অভীক, শেষকথার নবীনমাধব, লেবরেটরী আনন্দকিশোর তিনজনেই সমুদ্র পারের খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক। রবীন্দ্রনাথের তিনসঙ্গীর রবিবার এবং শেষকথা দুটিই সমস্যা-নির্ভর গল্প। তাঁর লেবরেটরী কিন্তু চরিত্রনির্ভর গল্প। নৌকাডুবির কমলা এবং শেষকথার অচিরা দুজনেরই প্রেম-উপলব্ধির মধ্যে একটি নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গি দেখা যায়।

১৩২১-এর শ্রাবণ সংখ্যার সবুজপত্রের তাঁর 'স্ত্রীর পত্র' ছাপা হয়। সে গল্পে মীরাবাঈ-এর উল্লেখ আছে। মীরাবাঈ-এর ভক্তিসাধনালব্ধ সংসার-আদর্শে স্ত্রীর পত্রের মৃণালকে খুবই মুগ্ধ হয়ে থাকতে দেখা গেছে। তখনকার বহুল-আলোচিত বাংলাদেশের আর এক প্রসঙ্গে ছায়া পড়েছিল এই স্ত্রীর পত্র গল্পে। বিন্দু শাড়িতে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। সেই সূত্রে স্নেহলতার কুখ্যাত কাহিনী স্বভাবতঃই মনে আসে।

রবীন্দ্রনাথের নাটক ঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ

সত্যজিৎ চৌধুরী

॥ ১ ॥

য়ুরোপের সংস্পর্শে বাঙালী চিত্তের উন্মীলন বালক রবীন্দ্রনাথের সমকালীন ঘটনা। শিল্প-সাহিত্যে সেকালে কীর্তিমানদের অনেকেই ছিলেন তাঁর পরিবারের মানুষ। তাঁদের সূত্রে পারিবারিক বৃত্তের মধ্যেই বাঙালীচিত্তের জাগরণ ও বহু শাখায়িত বিকাশ তিনি প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পান। তাঁর প্রতিভার উন্মেষে পারিপার্শ্বিকের শুশ্রূষার গুরুত্ব বিষয়ে জীবনস্মৃতির অনতি-বিস্তৃত আলোচনা থেকে আমরা জানি সেদিনের ছিন্নবাধা আত্মমনস্ক বালককে যথার্থ মুক্তির ক্ষেত্রে আহ্বান করে এনেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ; গুণেন্দ্রনাথের অনুকম্পায়ী মনের প্রশ্রয় ছিল তাঁর মনের ডালপালা মেলবার আকাশের মতো। শিল্প-সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো বাঙলায় থিয়েটার গড়ে তুলবার আয়োজনেও রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ এই যুবকেরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বাঙলা থিয়েটারের সূচনা হয়েছিল কলকাতার অভিজাত পরিবারগুলির উদ্যোগে, ঠাকুরপরিবারের যুবকেরা এ-বিষয়ে সংগঠিত আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। রীতিমত নাট্যসংস্থা গঠন করে পারিশ্রমিক দিয়ে নাটক লেখানো এবং অভিনয়ের আয়োজন গুণেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে ঠাকুরবাড়িতে প্রচলিত হয়েছিল। এই সব অনুষ্ঠানে বাড়ির ছেলেমেয়েরা অসংকোচে অংশ গ্রহণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের পাঠক তাঁর কবিতায় এক আত্মমনস্ক নিঃসঙ্গ জীবন-পথিকের সঙ্গলাভ করেন, অথচ নাটকের যৌথ শিল্পে তাঁকেই দেখি রচনা, পরিচালনা, অভিনয় ইত্যাদি নানা শাখায় পারদর্শী সংগঠননিপুণ নাটের গুরুরূপে। "বাল্যকাল হইতেই আমার মনের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের শখ ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এ কার্যে আমার স্বাভাবিক নিপুণতা আছে। আমার বিশ্বাস অমূলক ছিল না তাহার প্রমাণ হইয়াছে" (জীবনস্মৃতি)। এমন নিঃসংশয় আত্মপ্রত্যয়ে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছিল পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলিতে

প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ফলেই। নাটক নিঃসঙ্গ সাধনার বিষয় নয়। মঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোকেই এ শিল্পের যথার্থ বিচার সম্ভব। তাই মঞ্চের সঙ্গে সংযোগহীন কোন নাট্যকারের 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা অর্থহীন। ঠাকুরবাড়ির অভিনয় বাংলা থিয়েটারে ঐতিহাসিক মর্যাদাসম্পন্ন, রবীন্দ্রনাথ ২০ বৎসর বয়সে নিজের রচিত নাটকে নাম ভূমিকা গ্রহণ করে পাদপ্রদীপের আলোয় দাঁড়িয়েছিলেন এই পারিবারিক রঙ্গমঞ্চে। জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাতে সমবেত বিদ্বজ্জন "বাল্মীকি প্রতিভা" অভিনয় দেখে তরুণ কবিকে নিঃসংশয়ে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। অকুণ্ঠিত অভিনন্দন উচ্চারিত হয়েছিল রাজকৃষ্ণ রায়ের কবিতায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উঠেছে নবীন রবি নব-জগতের ছবি, নব বাল্মীকি-প্রতিভা দেখাইতে পুনর্বার'—গানে এবং বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত প্রশস্তিতে। নাটক এবং অভিনয়েই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম বাঙলা দেশে স্বীকৃতি পেলেন, তাঁর কবিতার ধ্বনি আরও বহুকাল স্বদেশের হৃদয়ে সাড়া জাগাতে পারে নি।

রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনার ধারা কাব্য প্রবাহের সমান্তরালে জীবনের অন্তিমপর্ব অবধি প্রসারিত, এবং তাঁর নাটকের প্রসঙ্গ ও প্রকরণ বিস্ময়কররূপে বিচিত্র। রবীন্দ্রনাথের মতো আত্মসচেতন শিল্পীকে যখন একটি শিল্পমাধ্যম নিয়ে জীবনব্যাপী অনুশীলনে রত দেখি তখন স্বভাবতই তাঁর সাধনায় এই শিল্পরূপ নির্মাণের সমস্যাবিষয়ে নিষ্ঠাপূর্ণ আলোচনার দায়িত্ববোধ জাগে।

॥ ২ ॥

যদিও সেকালে ভদ্রঘরের শিক্ষিত ছেলের পক্ষে শেক্সপীয়র চর্চা ছিল অপরিহার্য এবং নাটক নামাঙ্কনযোগ্য যে কোন রচনাতে শেক্সপীয়রকেই আদর্শ মানা হত, তবুও রবীন্দ্রনাথ প্রথম মঞ্চ-সফল রচনা 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় প্রকরণের দিক থেকে প্রচলিত রীতি বর্জন করেই সাফল্য অর্জন করলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানোয় দেশী-বিদেশী সুর নিয়ে দুঃসাহসী পরীক্ষা চালাতেন, কখনো কখনো তাঁর হাতে অভাবনীয় শক্তি নিয়ে সঙ্গীতের নতুন রূপ ফুটে উঠত। বিস্মিত আনন্দে সঙ্গীতের সেই রূপকল্পগুলিকে কথার অবয়ব দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রস্তুত থাকতেন পিয়ানোর পাশে। ইতিপূর্বে গীতিবাহিত নাটকের একটা পরীক্ষাও হয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্রের 'মানময়ী' নাটকে। দৃশ্যমান চরাচরের এবং অনুভূতির নানা বিরোধ গানে প্রকাশের

সম্ভবপরতা বিষয়ে হার্বার্ট স্পেন্সারের The Origin and Function of Music' প্রবন্ধই রবীন্দ্রনাথকে প্রথম ভাবায়। নাটকীয় বিষয়ের প্রকাশ মাধ্যম রূপে গানের যোগ্যতা কবি বাল্মীকি-প্রতিভায় পরীক্ষা করে দেখেছেন। ঘটনা-ধারার বিচিত্রতা এবং চরিত্রের উপলব্ধির স্তরে স্তরে উত্তরণ পরিস্ফুট করবার জন্য গানের প্রচলিত রীতি তাঁকে ভাঙতে হয়েছিল। সদ্য ইংলণ্ডপ্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথের গীতিচেতনায় বিলাতী সঙ্গীতের অভিজ্ঞতা এ জাতীয়া পরীক্ষায় প্রেরণা সঞ্চার করে থাকবে। ভারতীয় সঙ্গীত-জীবনের নিত্যতাকে অতিক্রম করে যায়, অন্য পক্ষে য়ুরোপীয় সঙ্গীতে তিনি অনুভব করেছিলেন বাস্তব জীবনের সংলগ্নতা। "জীবন সমুদ্রের তরঙ্গ লীলার দিক" 'অবিরাম গতি চাঞ্চল্যের উপর আলোছায়ার দ্বন্দ্ব সম্পাতের দিক' উন্মীলিত হয় ও দেশের গানে। বাল্মীকি-প্রতিভায় কোন অতীন্দ্রিয় অনুভূতিলোকে প্রয়াণের প্রসঙ্গ নেই, বরং গানে গানে গেঁথে তোলা হয়েছে ঘটনার প্রতিঘাত-জনিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় একটি মানুষের উপলব্ধিতে করুণা নামক মানবিক বৃত্তির উন্মেষ। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে দ্বন্দ্বে বাল্মীকির চেতনোদয় নতুন আলোক বিচ্ছুরিত হয়। বাল্মীকির তন্ময়তা দস্যুদলের কোলাহলের বৈপরীত্যেই তাৎপর্য পায় দর্শক চিত্তে। সঙ্গীতকে একই সঙ্গে দুই বিরোধী আবেদনের বাহক হতে হয়েছে। চরিত্রের মূল্যবোধে রূপান্তর এ নাটিকায় কাহিনীর ধারার সঙ্গে আকৃষ্ট হওয়ায় নাটকীয় রচনাটাই মুখ্য। দস্যু নায়ক বাল্মীকির হৃদয়ে কোমল বৃত্তি অর্ধস্ফুট হতে দেখি বন্দিনী বালিকার প্রতি করুণায়। সহচরদের উদগ্র হিংসার বিরুদ্ধতাই এই আবেগে প্লাবনের শক্তি সঞ্চার করে, তার সমগ্র সত্তা ক্রৌঞ্চ বধের প্রতিক্রিয়ায় যখন করুণায় প্লাবিত হয় তখন অবিশ্বাস্য লাগেনা পূর্বপ্রস্তুতির জন্য। যুক্তিসঙ্গত অনুক্রম মেনে চরিত্রটি পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। মনে রাখা উচিত, যা য়ুরোপীয় সঙ্গীতে হয়ত বা সহজসাধ্য রবীন্দ্রনাথ সেই বহুস্তরান্বিত জীবন-আশ্লিষ্ট আবেগকে রূপ দিয়েছেন মুখ্যত এ দেশেরই সঙ্গীতের উপরে নির্ভর করে, মাত্র তিনটি গানেই তিনি বিদেশী সুর ব্যবহার করেছেন।

'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় এই বিশিষ্ট নাট্যরূপ উদ্ভাবনা আমার বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, মধ্যবর্তী একটি স্তরে শেক্সপীয়রের অনুসরণে সিদ্ধিলাভের ব্যর্থ চেষ্টার পরে যখন কবি স্বকীয় নাট্যরূপ নির্মাণের পরীক্ষায় নিরত হন, সেই প্রতীকী নাটকের যুগে মাঝে মাঝে নাটকীয় বিষয় গীতিবাহিত

হয়েছে এমন রচনা চোখে পড়ে। এবং প্রতীকী নাটকেও কোথাও কোথাও এক ধরনের চরিত্র গানেই আপন চরিত্র ফুটিয়েছে এমন দেখা যায়। এ জাতীয় প্রকরণের সঙ্গে বাল্মীকি-প্রতিভার একটি আপাত-অদৃশ্য ধারাবাহিকতা আছে।

॥ ৩ ॥

কবিতায় অনন্য-সদৃশ শক্তির উপলব্ধি চিহ্নিত 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' 'প্রভাত সঙ্গীত' পেরিয়ে নাটকের একটা বড় পর্ব পাই, প্রকৃতির প্রতিশোধ থেকে মালিনী বা কাহিনী পর্যায়ের রচনা অবধি যার বিস্তার। ঐশ্বর্যে ভরপুর এই কালখণ্ডে কবিতায় মানসী, সোনার তরীর বিস্ময়কর সাফল্যের পথে শুধু নিজ কাব্য ধারাকেই নয়, সমগ্রভাবে বাংলা কবিতাকেই তিনি মুক্তির প্রশস্ত মোহানার দিকে অগ্রসর করে নিয়ে যান, গল্পগুচ্ছে চোখের বালিতে কিম্বা বিচিত্র বিষয়াশ্রিত নিবন্ধে তাঁর ব্যক্তিত্বের বহুমাত্রিকতা তর্কাতীত ভাবে ফুটে উঠছিল। কিন্তু এই কালের অন্যবিধ রচনার উৎকর্ষকে প্রতিমান মানলেও তুলনায় নাটক তাঁকে দীন এবং দ্বিধান্বিত মনে হয়। ভাবতে বাধ্য হই আপন ক্ষমতার প্রতীতি কবিতায় যতটা প্রবল নাটকে ততটাই দুর্বল। না হলে সূচনাতেই যিনি শেক্সপীয়রের অক্ষম অনুগামীদের চিহ্নিত পথ বর্জন করে 'বাল্মীকি প্রতিভা' লিখলেন এবং আপন স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গত শিল্পরূপ উদ্ভাবনের দুরূহতা অনায়াসে অতিক্রম করে গেলেন—শেক্সপীয়রের অনুগমনে এমন অসংশয়িত আগ্রহ তিনিই কী করে পোষণ করেন। ইংরেজী রোমান্টিক ট্রাজিডির গোটা কাঠামো ব্যবহার এবং কাব্য ও নাটকের যোগ-সূত্রটি আবিষ্কারের চেষ্টা এ যুগের নাটকে মূল সমস্যাগুলি সৃষ্টি করেছে।

বিশ্ব-চরাচরের সঙ্গে ব্যক্তিস্বরূপকে মেলানোই শিল্পীর প্রাথমিক সমস্যা। রবীন্দ্রনাথে এ মিলন intuitive। সদর স্ট্রীটের একটি সকাল কী অন্তহীন বিস্ময় জাগিয়ে তুলল কবির দৃষ্টিতে, 'একটি অপরূপ মহিমায়' বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন দেখলেন। তুচ্ছতার মধ্যেই আনন্দের দান ছড়ানো—অনুভব করলেন। 'চাহিয়া থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল' (জীবনস্মৃতি) এই revealationই তাঁর স্বকীয় জীবনদৃষ্টি উন্মীলিত করে। জীবন দৃষ্টির অনন্যসদৃশতাই প্রতিভার মৌলিকত্বের প্রমাণ। শিল্পের প্রসঙ্গ ও প্রকরণ উভয়ই শিল্পী

ব্যক্তির এই বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টির সঙ্গে অণিত। ফলে সব মৌলিক প্রতিভাকেই নিজস্ব শিল্পরূপ নির্মাণ করতে হয়। কোন পূর্বসূরীর অধমর্ণতা শুধু এই প্রমাণ করে যে শিল্পী নিজস্ব প্রকাশ মাধ্যমটি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন নি।

এ পর্বের প্রথম নাটক 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' অভিনয়যোগ্যতার দিক থেকে সব চেয়ে ব্যর্থ রচনা হওয়া সত্ত্বেও বারংবার কবির আত্মপরিচয়মূলক লেখায় গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে, কারণ নাটকটিতে তাঁর একটি মূল idea-কে সজ্ঞানে রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর সমগ্র কীর্তি বিচারেরই মূল সূত্র এই "সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা" এরকম স্পষ্ট নির্দেশ জীবনস্মৃতিতে আছে। শাখা প্রশাখায় বিচিত্র জটিল রবীন্দ্র-কীর্তির বিচারে বহু সমালোচকই এই অতি সরলীকৃত সূত্রের প্রয়োগে প্রলুব্ধ হন এবং অনায়াসে একেবারে তাঁর সমগ্র দৃষ্টির হৃদয়কেন্দ্রে গিয়ে সহজে উপনীত হয়ে যান। আমার ধারণা, প্রকৃতির প্রতিশোধে সেই বহু আলোচিত সীমা-অসীমের মিলন সাধন তত্ত্বের আড়ালে তাঁর শিল্পীজীবনের একটি সংকট ও সংকটোত্তীর্ণ হবার সংগ্রামের কথা প্রচ্ছন্ন আছে। ব্যক্তি ও বিশ্বের অন্তর্লীন সংযোগ ভিন্ন বিশ্বের সারূপ্য ভিন্ন শিল্পীব্যক্তির কৃতি যে নীহারিকার স্তর পেরোয় না—প্রাক্-মানসী সমগ্র কাব্যেই তার প্রমাণ খুব স্পষ্ট। মহাবিশ্বের এবং মানব জীবনের অনেকান্ত বিচিত্রতা ব্যক্তিস্বরূপের দর্পণে বিম্বিত করায় যে মহৎ শিল্পের সিদ্ধি, শুধু নিজেরই অন্তরের গহনে অন্তর্মুখী প্রস্থানের পথে সেই সাফল্য অর্জন সম্ভবপর হয় না। অনির্দেশ্যতাময় হৃদয় অরণ্য থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে একদিন তাই চেতনাকে বিশ্বলীন করবার প্রেরণা কবিকেও অনুভব করতে হয়েছিল। আসলে শিল্পসিদ্ধির এই সমস্যা উত্তীর্ণ হবার সংগ্রামটিই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'র প্রচ্ছন্ন বিষয়। সন্ন্যাসী আপনাকে যথার্থ ভাবে পায় বিশ্বের জনাকীর্ণ পথে পদার্পণ করে। বিশ্বকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণের অক্ষমতাতেই সন্ন্যাসীর হৃদয় শ্মশান হয়ে ছিল। "জগৎকে তাহার নিজের স্বরূপে" দেখবার আগ্রহে যখন কবি চরাচরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তখন চলমান সংসারের তুচ্ছতম তরঙ্গ ও রূপবদ্ধ হয়ে তাঁকে আশ্চর্য করে। "রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে কেহ চলিত তাহাদের গতি ভঙ্গী শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী ভারি আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইত; সকলেই যেন নিখিল সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মত

বহিয়া চলিয়াছে। কারোয়ার থেকে জাহাজে আসতে আসতে এই দেখার আনন্দকেই "হেদে গো নন্দরাণী আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও" গানটিতে বেঁধে ছিলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধে আত্মলীন সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যের বৈপরীত্যে প্রাত্যহিকের তুচ্ছতাতেই জীবনের আনন্দিত রূপ পরিস্ফুট করবার জন্য এই গান ব্যবহার করেছেন। গানে যে অনুভূতি প্রকাশিত তারই দৃশ্যমানরূপ দেখা যায় নাটকটিতে একাধিক জনতার দৃশ্যে। সন্ন্যাসীর মূল্যবোধে রূপান্তর এ নাটকের মূল প্রসঙ্গ এবং বালিকা চরিত্রটির সঙ্গে তার সম্পর্কের স্তরগুলির বিবর্তনের পথে এই রূপান্তর স্পষ্ট করতে চেয়েছেন কবি। সন্ন্যাসীর মনের জগতে ভাঙাগড়ার পশ্চাৎপটরূপে ব্যবহার করতে চেয়েছেন জনপ্রবাহের ধারাটিকে। কিন্তু প্রকৃতির প্রতিশোধে ষোলটি দৃশ্য কোন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সংহতি পায় নি। সন্ন্যাসীর বিচ্ছিন্নতাকে পরিস্ফুট করবার জন্যেই জনতার কোলাহলে নাটকটির একটা বড়ো অংশ ভরে তোলা হয়েছে অথচ পারস্পরিক প্রভাবের কোন যুক্তিসংগত সংলগ্নতা সন্ন্যাসী এবং জনপ্রবাহের ধারাটির মধ্যে কখনোই আসে না। এমন কি বালিকার স্নেহভিক্ষার অনুনয় ও সন্ন্যাসীর অটল হৃদয়ের দুর্গ কী ভাবে দীর্ণ করতে পারলো—সংঘাত প্রতিঘাতে প্রাণবন্ত তার কোন বিবরণ নেই। মনে হয় সূচনা ও সমাপ্তির দুটি প্রান্তে সন্ন্যাসীর মানসতার দুটি রূপই শুধু কবি মনে রেখেছেন, আর মধ্যবর্তী স্তরগুলি বানিয়ে তোলা ঘটনা ও চরিত্রে ভরা যার সঙ্গে মূল চরিত্রের আবশ্যিক যোগ কিছু নেই। ফলে রচনাটি দৃঢ়পিনদ্ধ নাট্যকায়া লাভ করে নি।

রবীন্দ্রনাট্যের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ রূপের আভাষ তবুও প্রকৃতির প্রতিশোধে অনুভব করা যায়। জীবন-ভাবনার এমন একটি আত্মগত ভঙ্গী তার সমগ্র রচনাতেই পরিস্ফুট যার পরিভাষিক নাম—লিরিক। তাঁর লিরিক উপলব্ধিতে আপন মানসের নানা বিরোধী অনুভবের সংঘাত ও সমীকরণের সমস্যা যেমন কাব্যের তেমনই নাট্যেরও বিষয় যে অনুভব কবিতায় শব্দের সংঘর্ষ জাত ধ্বনির সুমিত তরঙ্গমালায় বিকীর্ণ হয় তাকেই নৈরাত্ম্য প্রতিবেশে সংক্রামিত করেন নাট্যে। বিরোধী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন চরিত্রের পারস্পরিক সংঘাতের মাঝ দিয়ে সেই অনুভবকেই পরিস্ফুট করার আগ্রহ তাঁর নাটকে প্রকাশিত। কবির আপন কণ্ঠের স্বরে নয়—নানাস্তরের মানুষের বিচিত্র কণ্ঠ স্বরে একই প্রসঙ্গ বিভিন্ন ভঙ্গীতে উচ্চারিত হয়ে ঐকতানে মিলিতে চায়। বস্তুত প্রকরণ পৃথক হলেও রবীন্দ্রনাথের নাটকের ফলশ্রুতি তাঁর

কবিতায়ই সগোত্র। সচেতন ভাবে নাটকের চরিত্রে জীবনের নানা স্তরের প্রতিরূপ বিম্বিত করা হলেও এদের অন্তরালে একই ব্যক্তি উপস্থিত থেকে কথা বলেন এবং তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ব্যক্তিত্বের সূত্রের নাটকের আবহে যারা আসে যায় তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। নিরাসক্তভাবে নৈরাত্ম্য আধারে বিষয়কে স্থাপন করা নাটক পদবাচ্য রচনার প্রাথমিক সর্ত, যে অর্থে শেক্সপীয়র তাঁর নাটকের আবহ থেকে দূরবর্তী—রবীন্দ্রনাথ কখনোই সেই নিরাসক্তি অর্জন করতে পারেন নি। পারেন নি বলেই শেক্সপীয়রের অনুবর্তনে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন না।

॥ ৪ ॥

রাজা ও রাণী এবং বিসর্জনে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ভাবে শেক্সপীয়রকে অনুসরণ করেছেন। প্রকৃতির প্রতিশোধে ঘটনার একটা বহমান ধারা ছিল ঠিকই, কিন্তু চরিত্রের সঙ্গে ঘটনা ধারার বুনানি থেকে গিয়েছে। এই অভিজ্ঞতা কি কবিকে প্রথাসিদ্ধ রীতির পারবশ্য স্বীকারে আগ্রহী করেছিল! তিনি কি ভেবেছিলেন, বিষয় যাই হোক—শেক্সপীয়রের হাতে রচিত নাট্য-রূপের কাঠামো ব্যবহারেই তাকে সফল নাটকের অবয়ব দেওয়া যাবে। 'শেক্সপীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ।' মালিনীর ভূমিকায় এই উক্তিতে 'আমাদের' শব্দটির দ্বারা কবি এদেশে নাট্য-চর্চায় নিয়ত সকলের সঙ্গে দ্বিধাহীন ভাবে নিজেকে মিলিয়ে দেন, অথচ 'মালিনী' নাটকের প্রথম প্রকাশের চুয়াল্লিশ বৎসর পরে যখন রচনাবলীর জন্য এই ভূমিকা লিখেছিলেন ততদিনে কি শেক্সপীয়রকে যান্ত্রিক ভাবে গ্রহণ করে যে তাঁর পক্ষে সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয় নিজেরই রচনায় তা প্রমাণিত করেন নি? রাজা ও রাণী এবং বিসর্জনের একাগ্র উদ্যম চিত্রাঙ্গদা বা মালিনীতেই সংশায়িত দেখি।

রাজা ও রাণীর এবং বিসর্জন নাটক দুইটিতেই কাহিনী স্পষ্ট দুটি ভাগে বিভক্ত। যেন ঘটনার দুইটি তরঙ্গ নাটককে পরিণামে পৌঁছে দিচ্ছে। অথচ প্রথম তরঙ্গের সঙ্গে দ্বিতীয় তরঙ্গের যোগ অনিবার্যতার বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়ায় সংহতি ভেঙে পড়েছে। যে বীজ নাটকের সুরুতে রোপিত, সমগ্র কাহিনীতে তারই শাখা-প্রশাখায়িত বিকাশ ঘটে না, বরং দ্বিতীয়াংশে এমন সব চরিত্র এনে কিছু ঘটনার আয়োজন করিতে

হয় যার সহায়তা ভিন্ন মধ্যপথেই যবনিকাপাত করতে হত। 'রাজা ও রাণী'তে ঘটনার প্রথম তরঙ্গ দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে মিলিয়ে গেল। বিক্রমের আসক্তি নিরন্তর প্রতিহত হয়ে কোন একটা বাঁকা পথ নিতে পারে—এমন সম্ভাবনা এ পর্যন্ত আমাদের মনে আসে নি। শুধুই দেখেছি তার আচ্ছন্ন চিত্তের দ্বারে সংসারের অনুনয় ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। কর্তব্যের সংসার থেকে তাকে প্রথমাবধি তাকে পলায়নপর মনে হয়, 'ক্ষুধার্ত কঙ্কালসার কাঙাল কামনা'র বৃন্তে-বদ্ধ বিক্রমের জগতে চরিত্রের সেই শক্তির পরিচয় মেলে না যা প্রলয়ংকর রূপে প্রকাশ পেতে পারে। তৃতীয় অঙ্ক থেকে সূচিত ঘটনার দ্বিতীয় তরঙ্গটি পূর্বধর্মের পটভূমি থেকে সবদিক দিয়েই বিচ্ছিন্ন। উত্তরাংশে চন্দ্রসেন, কুমার, শংকর, অমরুরাজ, ইলা এবং রেবতীকে নিয়ে প্রায় সম্পূর্ণ নতুন একটি কাহিনীর বিবরণ পাই। সন্দেহ নেই, কুমারকে প্রতিমান রূপে ব্যবহার করে বিক্রমের বিশ্ব-বিচ্ছিন্ন প্রেমের অচরিতার্থতা ফোটানো লেখকের উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু বিক্রম সুমিত্রার বিরোধের প্রসঙ্গ থেকে তিনি নাটকটিকে এতদূরে সরিয়ে আনলেন যে কোন অভাবনীয় উপায় ছাড়া কাহিনীটি কোন পরিণামে এগিয়ে নেবার সুযোগ থাকল না। বিক্রম-সুমিত্রার মূল প্রসঙ্গ এবং চন্দ্রসেন, রেবতী ও কুমারকে নিয়ে কাহিনীর উপবৃত্ত—দুয়েরই সংকটমুক্তি ঘটে কুমারের আত্মোৎসর্গে, অথচ এই মৃত্যু পরিণামের কোন পূর্বভূমিকা কোথাও ছিল না। বহুদিন পরে রাজা ও রাণী পুনর্লিখিত হয়ে তপতীতে যে রূপ পেয়েছে তাকে নতুন রচনা বলাই সমীচীন। ততদিনে কবি নানা পরীক্ষার স্তর পেরিয়ে নাটকে নিজস্ব শিল্পরূপের সন্ধান পেয়েছেন। তপতী গঠনের দিক থেকে তাঁর পরিণত পর্বের প্রতীকী নাটকেরই সগোত্র।

বিসর্জনেও ঘটনার তরঙ্গ দুটি প্রায় অবিশ্বাস্য এক দুর্বলগ্রন্থি দিয়ে বাঁধা। 'এত রক্ত কেন'—এই প্রশ্নটি নাটকের প্রথমেই বিভিন্ন চরিত্রে নানামুখী প্রতিক্রিয়া জাগালো এবং সহজেই নাটকে দুটি বিরোধী শক্তি পরস্পরের সম্মুখীন হ'ল। দ্বিতীয় অঙ্ক অবধি বিরোধী শক্তি দুটিকে নানা ঘটনার মাঝ দিয়ে বারবার সংঘাতের সমীপবর্তী করার চেষ্টা আছে কিন্তু কাহিনীর ভেতর থেকে সেই সুযোগ সৃষ্টি করে তোলা যাচ্ছে না কিছুতেই। অকস্মাৎ তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয়

দৃশ্যে একটি শিশুকে মঞ্চে দেখা গেল যার পরিচয় আমরা কিছুই জানি না। গুণবতীকে তো আমরা প্রথম দৃশ্য থেকেই দেখেছি! নিঃসন্তান রমণীর ক্ষোভ তার কণ্ঠে তীব্র ভাবেই বেজে উঠেছে, কিন্তু যে ধ্রুবকে হত্যা করবার কথা অত্যন্ত সহজে সে নাটকের মধ্য অংশে উচ্চারণ করে তার অস্তিত্বের সংবাদ গুণবতীর মুখ থেকেও শুনিনি। 'ধ্রুবই' সেই দুর্বলগ্রন্থি যার সাহায্যে নাটকের দুটি অংশকে সংযুক্ত করা হয়েছে। তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে গোবিন্দমাণিক্য এবং রঘুপতির প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ সম্ভব হল। রঘুপতির প্রতি নির্বাসন দণ্ড, শ্রাবণের শেষ দুটি দিন সময় ভিক্ষা, জয়সিংহকে দিয়ে রাজহত্যার আয়োজন এবং শ্রাবণের শেষ রাত্রে জয়সিংহের আত্মোৎসর্গ—ঘটনাগুলি পরপর ঘটতে পারে ধ্রুবকে মঞ্চে আনবার ফলে। ঘটনার এই দ্বিতীয় তরঙ্গটি পূর্বাংশ থেকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে উদ্‌বর্তিত হয়ে আসে না। শেক্সপীয়রে ঘটনার পূর্বাংশ ও উত্তরাংশ পরস্পরের সংলগ্ন হয় বিপরীত শক্তির প্রবল প্রতিঘাতে উদ্ভূত ঘটনা-তরঙ্গের তুঙ্গশীর্ষে, রবীন্দ্রনাথে এ সংলগ্নতা প্রক্ষিপ্ত ঘটনার দুর্বল সূত্রে সাধিত হয়েছে। দৃশ্য বিন্যাসের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়রের নাটকের বাইরের আদলটাই শুধু কোনক্রমে রক্ষা করেছেন, দৃশ্যগুলি যথাযোগ্য ভাবে সংস্থিত হয়ে একটি সুঠাম অবয়বেরের মতো সম্পূর্ণতা লাভ করে নি।

কাহিনীর মূলবৃত্তের চেয়ে উপবৃত্তের প্রাধান্য শেক্সপীয়রীয় প্রতিমাণের বিচারে রবীন্দ্রনাথের এ-দুটি রচনার আর একটি মারাত্মক ত্রুটি। কুমার এবং জয়সিংহই আমাদের মনোযোগ নিঃশেষে আকর্ষণ করে নেয়। এরাই আমাদের অনুভূতিতে বিষাদ এবং অনুকম্পার বোধ জাগিয়ে তোলে। জয়সিংহ বুকের রক্ত দিয়ে মন্দিরের সোপান থেকে রক্তের দাগ মুছে দিয়ে গেল—এই কথাটা আমাদের মর্মকে ঘিরে থাকে।

কুমার এবং জয়সিংহ নাটকের গঠনগত সংহতি দুর্বল করে দিয়ে এমন ভাবে প্রধান হয়ে ওঠে কেন? এতসব আপত্তি সত্ত্বেও এই দুটি চরিত্রই রবীন্দ্রনাট্যের কোন গূঢ় প্রবর্তনার কথা ভাবতে বাধ্য করে আমাদের।

॥ ৫ ॥

মূলত যিনি কবি, তিনি যদি নাটকের মাধ্যম ব্যবহারে আগ্রহী হন, একটা

সমস্যা তাঁকে উত্তীর্ণ হয়ে আসতেই হয়। সে সমস্যা কাব্য এবং নাটকের যোগসূত্র আবিষ্কারের। কবিতার অবয়বে রূপবদ্ধ অখণ্ড আবেগ কবির অনুভূতিলোকের নেপথ্যে অনুভবের নানা সংঘর্ষের মাঝ দিয়েই উন্মীলিত হয়ে ওঠে। নানামুখী অনুভবের সংঘর্ষে একটি উত্তত আবেগকে সম্ভব করে তোলে, কবিতায় যার পরিশ্রুত শুদ্ধতা ভাষা পায়। এই সব নানাচারী অনুভব—যার চিহ্ন কবিতার শরীরে ফোটে না, তাকেও শিল্পের বিষয় করে তোলা যায় হয়তো। কবিতা জননে তার হৃদয় যে বিরুদ্ধ অনুভূতির আঘাতে জেগে ওঠে, বিসদৃশের, বৈপরীত্যের সেই সংঘর্ষকে মেনে ধরবার আগ্রহ একজন কবিকে নাটকের জগতে আকর্ষণ করে আনতে পারে। কবিতা জননের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নাট্যের এ প্রেরণা কোথাও নিগূঢ় সংযোগে যুক্ত। রবীন্দ্রনাথে সমস্যা এ নয় যে, একজন নাট্যকার নাটকে কবিতার ব্যবহারে এবং সুপ্রযুক্ততা বিষয়ে পরীক্ষা করছেন। এখানে দেখছি একজন কবিকে, যিনি কবিতার অভিজ্ঞতাকেই নাটকে রূপ দেবার আগ্রহে নাটক এবং কাব্যের কোন একটা মিলন বিন্দু আবিষ্কার করতে চাইছেন। 'বাল্মীকি প্রতিভায়' তাঁর সাফল্যের মূলে ছিল সংগীতের আবহের আনুকূল্য। বাল্মীকি-চেতনায় যে উপলব্ধির উন্মীলন চিত্রিত না প্রকারান্তরে কবির স্বকীয় অভিজ্ঞতারই বিবরণ গানের আবহে অনুভূতির স্তরগুলি সেই রচনায় সহজে পরিস্ফুট হতে পেরেছিল। তাঁর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' সম্পর্কে কবি বলেছেন—"এই বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত।" এই বাক্যে এবং শব্দটির উপরেই আমি জোর দিতে চাই। 'কাব্য' এবং 'নাট্যে' নাটকটিতে কোন মিলন বিন্দু খুঁজে পায় নি। প্রাত্যহিক সংসারের অকিঞ্চিৎকরতার সংঘর্ষে আত্মকেন্দ্রিত সন্ন্যাসীর চার পাশ থেকে আবরণ খসে গেল, প্রসঙ্গের অন্তরালে কবির নিজেরই উপলব্ধিগত একটি emotional reality তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন এ-কথা আগে বলেছি। সন্ন্যাসীকে আশ্রয় করেই সেই উপলব্ধিকে রূপ দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তার উক্তি পূর্বাপর স্বগত ভাষণের মতো শোনায়, সংলাপ হয়ে ওঠে না। তার জগৎ এবং প্রাত্যহিক সংসারের ধারা দুটি সমান্তরাল, কোথাও সংযোগে-সংঘাতে পরস্পরকে প্রভাবিত করতে পারছে না। ফলে এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় নি যেখানে বিরোধী অনুভূতির প্রবল সংঘাতে দীপ্র মুহূর্তে একই সঙ্গে চরিত্রের মহিমা এবং কবিতাকে মিলিয়ে দেওয়া যায় সন্ন্যাসীর সংলাপ ছন্দে রচিত হলেও কবিতার

সীমা স্পর্শ করতে পারে নি। অন্য স্তরে সংলাপে একান্ত ভাবে ধূলি-মাটির সংসারের সংলগ্নতা ফুটে উঠেছে ভাষা প্রয়োগের বিশিষ্টতায়।

"এত ব্যস্ত হয়ে কম্‌নে চলেছ'॥ তুমি কোথায় যাচ্ছ গা॥ পথে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে জিগ্‌গেস্‌-পড়া কর তার জো নেই॥ আজকাল তুমি যে বড়ো ম্যাগ্‌গি হয়েছ॥ হ্যাঁলো অলঙ্গ, তোদের পাড়ায় সেই যে কথাটা শুনছিলুম সেকি সত্যি॥ সে ভাই বেস্তর কথা॥"

সন্ন্যাসীর অসংযত উচ্ছ্বাসের ভাষার ব্যবধান এতই যে কিছুতেই এ দুটি স্তরকে মেলানো সম্ভবপর হয় নি। অথণ্ড আবেগের সংহতি তাই প্রকৃতির প্রতিশোধে অনায়ত্ত থেকে গেছে। কাব্যনাট্য হিসাবে সফল হতে হলে রচনাটিতে প্রাত্যহিক সংসারের তুচ্ছতাকে অন্য কোন ভাবে, স্থূলতা থেকে পরিশ্রুত করে বাক্যের ফলপ্রদ হ'ত হয়ত।

রাজা ও রাণী এবং বিসর্জনে এই একই প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে কুমার ও জয়সিংহ চরিত্রে। "কবি যাকে লিরিকের প্লাবন বলেন,—রাজা ও রাণীর শেক্‌সপীয়রীয় কাঠামোয় তা নিশ্চয়ই শোচনীয়রূপে অসঙ্গত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ অসঙ্গতিকে প্রশ্রয় না দিয়েও কোন উপায় ছিল না। জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্যেই যে প্রেম সুন্দর সমসাময়িক কবিতার বিষয়রূপে সেই প্রেমচেতনাই মর্যাদা পেয়েছে। বিক্রমের প্রতিমানরূপে কুমার চরিত্রের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে যত আপত্তিই উঠুক, এ চরিত্রটিতে সেই একই প্রেম-চেতনা মূর্তি পেতে চায়। কিন্তু একটা রীতিমত ট্রাজিডি লিখবার আগ্রহে চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ করেন নি কবি। বিসর্জনে জয়সিংহ ও ঘটনা ধারাকে কোন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে না এবং প্রথাসিদ্ধ নাটক বিচারের দৃষ্টিতে তাকে অপ্রাসঙ্গিক মনে হওয়াই স্বাভাবিক। অথচ এমন একটি চরিত্রের জন্যেই নাটকটির সবচেয়ে বড় অংশ কবি ব্যয় করলেন। এ নাটকে সবচেয়ে স্পর্শকাতর এই চরিত্রটি, স্পষ্টত বিরোধী শক্তি দুটির কোন একটির সঙ্গে সে নিঃসংশয়ে যুক্ত হতে পারে না। রঘুপতির প্রতি তার শ্রদ্ধা ক্রমে শিথিল হয়ে গেছে, কিন্তু পিতৃস্নেহের বন্ধন সে অস্বীকার করতে পারে না; অপর্ণা তার হৃদয়কে জাগিয়ে তোলে, সম্পূর্ণতা দেয় তবুও সে জানে মিলনে অপর্ণার প্রেম জীবনকে কোন দিন চরিতার্থ করবে না। সমগ্র নাটকে নানামুখী ঘটনার আঘাত তারই হৃদয়কে প্রহত করে, তার ভেতর থেকে প্রত্যয়ের দৃঢ়তা জাগিয়ে তোলে। তার বাচনে এবং আচরণে বিবেকবান, অনুভূতিপরায়ণ শালীন

একটি মানুষকেই দেখি আমরা। জয়সিংহ কবিতায় কথা বলে—এবং মনে হয় এই তার যথার্থ ভাষা। এমন সব চরিত্র সম্পর্কেই বলা যায় 'the characters themselves are poetry, and were poetry before they began to speak poetry : it would be a wrench for them not so to utter themselves. (Abercrombie) জয়সিংহের দোলাচল বৃত্তিকে দীর্ঘসূত্রী করা হয়েছে, কোথাও বা তার সংলাপ অতিদীর্ঘ—এ সব ত্রুটি সত্ত্বেও মনে হয় বিসর্জনে রবীন্দ্রনাথ কাব্য এবং নাট্যের মিলনবিন্দুটি আবিষ্কার করেছেন, এবং তা নিঃসন্দেহে জয়সিংহের চরিত্রে।

॥ ৬ ॥

বিসর্জনের পরে কবি আর কখনো শেক্সপীয়রীর রীতি অনুসরণে আগ্রহী হয় নি। পরবর্তী স্তরের রচনার কাব্য-নাট্যের শিল্প রূপ তাঁর দীর্ঘ অনুশীলনের বিষয় হয়েছিল। চিত্রাঙ্গদা, মালিনী বা কাহিনীর কাব্যনাট্য গুলিতে একটি রূপগত সাধারণ লক্ষণ আছে। এসব রচনায় নাট্য-কাহিনীকে কিছুতেই জটিল হতে দেন নি এবং একটি চূড়ান্ত মুহূর্তের প্রতি লক্ষ্য স্থির থেকেছে। পরস্পর প্রতিঘাতী অনুভবের সংঘর্ষ হৃদয়ের বা কবির সমগ্র সত্তার শিখাটিকে দীপ্যমান করে তোলে যে মুহূর্তে কবিতা এমনই সব মুহূর্তের ফসল। কাব্যনাট্যে ও রবীন্দ্রনাথ বিপরীত ধারণার বা চরিত্রের সংঘর্ষে জাত এমন একটি সংহত স্থির মুহূর্তের সংক্ষিপ্ত অথচ ভাস্বর পটে নাট্য বিষয় স্থাপন করেন যা কবিতার জন্মমুহূর্তের সঙ্গে তুলনীয়। সেই মুহূর্তের চূড়ায় কবিতা মিলিত হয় নাট্যের সঙ্গে। আবেগের তীব্র অন্দোলন এবং আবেগ-তরঙ্গের তুঙ্গশীর্ষগুলি কবিতার ভাষা ভিন্ন অবয়ব পেতে পারে না।

নারী-ব্যক্তিত্বের যে রূপ চিত্রাঙ্গদায় পরিস্ফুট আধুনিক জীবন দৃষ্টি ভিন্ন ব্যক্তিত্বের এ মহিমা উপলব্ধি সম্ভব ছিল না। প্রাচীন সমাজের বৃত্তবদ্ধতা ভেঙ্গে ব্যক্তিকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামের পথেই আমাদের মূল্য-বোধে রূপান্তর সম্ভব হয়েছে। রূপান্তরিত মূল্য-বোধে জীবন, আর জীবনের পুষ্পিত রূপ প্রেম নতুন তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিল। চিত্রাঙ্গদার আত্মঘোষণায় সর্ববন্ধন-মুক্ত ব্যক্তির দৃঢ়প্রত্যয় কী প্রবল শক্তিতে প্রকাশ পায় :

আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি; যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

এই দৃপ্ত ব্যক্তিত্বের বৃন্তেই সমগ্র সত্তার পুষ্পিত রূপ তার প্রেম। চিত্রাঙ্গদার বিষয় তাহলে স্বপ্নের নয়, জীবনের সঙ্গেই আশ্লিষ্ট। রচনাটির সমগ্র অবয়বে সঞ্চারিত আবেগের উৎসমূল সমাজের প্রত্যক্ষে নিহিত সমাজ বা ইতিহাসের প্রত্যক্ষ সত্য পরিস্রুত করে ব্যবহার করেছেন, বিষয়টি কাব্যনাট্যের উপযোগী করে তুলবার জন্যে এ-প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়েছে। 'রাজা ও রাণী'র সুমিত্রা চরিত্রেও এই একই কথা বলতে চেয়েছিলেন মনে হয়; কিন্তু আরোপিত রূপের নির্মোক পরিত্যাগ করে অর্জুনের সামনে চিত্রাঙ্গদার আত্মপ্রকাশের মুহূর্তটিতে কবির উপলব্ধি যেমন তীক্ষ্ণভাবে প্রকাশ পায়, রাজা ও রাণীতে তেমন কোন ভাস্বর মুহূর্ত সৃষ্টি হয় নি। চিত্রাঙ্গদার প্রথম দৃশ্যটির ব্যয়িত হয় চিত্রাঙ্গদার পূর্ব পরিচয়,—যা চরিত্রটিকে সুষ্ঠু ভাবে বুঝবার জন্য প্রয়োজন,—জানাতে। রাজা ও রাণীর মতো কোন জটিল প্লট গড়ে না তুলেও চিত্রাঙ্গদা মূল প্রসঙ্গে উপনীত হতে পারেন কবি শুধু প্রথম দৃশ্যে চিত্রাঙ্গদার আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক বিবৃতিটির সাহায্যে কবিকে যে হেতু বিভিন্ন চরিত্রের কণ্ঠস্বরে নিজের কথা বলতে হচ্ছে সুতরাং চরিত্রগুলি যুক্তিসঙ্গত ভাবে গড়ে তুলবার দায়িত্ব থাকছেই। এত সীমিত পরিসরে এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেক সময়ে চরিত্রের নিজের মুখেই তার আত্মপরিচয় বলিয়েছেন। আবার একাধিক রচনায় চরিত্রগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে এমন কৌশলে পরিচিত করিয়েছেন, তার ফলে নাটকীয় গুণ-যুক্ত পরিস্থিতিতে চরিত্রের সম্পূর্ণ রূপটি সহজে

সুষ্ঠু হতে পেরেছে। মদনের বরে, বসন্তের দাক্ষিণ্যে রূপলাবণ্যময়ী চিত্রাঙ্গদা এবং অর্জুনের প্রথম পরিচয় বা কর্ণের কাছে কুন্তীর আত্মপরিচয় এ প্রসঙ্গে মনে পড়বে। আবার কচ ও দেবযানী বা নরকবাসে যে কাহিনীর বিবরণ চিত্রগুলি উপস্থাপিত করে তার ঘটনাকাল অতীত। অতীতের দীর্ঘ ঘটনাধারা বর্তমানের একটি চূড়ান্ত মুহূর্তে মিলেছে। দেবযানীর অন্তর্জ্বালা বা সোমকের শোচনীয় গ্লানি স্পষ্ট মূর্তি পেত না অতীত প্রসঙ্গে পটভূমিতে স্থাপিত না হলে, অথচ কালসীমা লঙ্ঘন করে নানা দৃশ্যে এই সব প্রসঙ্গ বিতত করে 'বিসর্জন' বা 'রাজা ও রাণী'র ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি না নেওয়াই স্বাভাবিক ছিল। তাই প্রকরণগত এমন সব কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে যাতে চরিত্রের দ্যুতি অপরিম্লান রেখে, চরিত্রের ন্যায় অক্ষুণ্ণ রেখে নাটককে কবিতায় প্রকাশ করা যায়।

বিন্যাসের দিক থেকে 'মালিনী' এ পর্যায়ের সবচেয়ে সতর্ক রচনা মনে হয়, নাটকটির প্রতিটি দৃশ্য কবি গড়ে তুলেছেন; একটা পর্ব পরিকল্পনা অনুসরণ করে। ফলে কাহিনীর ধারা কোথাও এলিয়ে যায় না, অপ্রাসঙ্গিক কোন বৃত্তে প্রবেশ করে না। মালিনীতে মূল প্রেরণা ছিল স্বপ্নলব্ধ একটি নাটকীয় মুহূর্তকে রূপায়ণের। দুই বন্ধুর প্রীতি ও বিশ্বাস-ঘাতকতার সেই প্রসঙ্গটিকে পূর্ণ কাহিনীতে পরিণত করেন মালিনী জাতকের গল্পবস্তুর সহায়তায়। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের বিরোধের আড়ালে মানবিক মহিমার পূর্ণ বিকাশে সহায়ক কবির নিজস্ব ধর্ম-চেতনার সঙ্গে প্রথানুগত্য ও অনুষ্ঠানসর্বস্ব দেশের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিরোধটাই স্পষ্ট। মানবিক বৃত্তির পূর্ণ উন্মীলনে ব্যক্তিস্বরূপের অবিরাম সম্পূর্ণ প্রকাশ সুপ্রিয় চরিত্রে। জীবনের জয়টিকা সে মৃত্যুর হাত থেকে নিয়েছে দ্বিধাহীন আত্মোপলব্ধির দৃঢ় ভূমিতে দাঁড়িয়ে। চারিটি মাত্র দৃশ্যে এ নাটকের কাহিনী বিতত, এবং প্রথম তিনটি দৃশ্য একই সময়সীমায় সংহত। মালিনীর এত কালের চেনা জগৎ ভাঙছে দেখি প্রথম দৃশ্যেই। নমায়ের চরিত্রটিই দিব্য-চেতনায় উদ্বোধিত মালিনীর রূপান্তর স্পষ্ট করে তোলে। ক্ষেমংকরের নেতৃত্বে বিদ্রোহের আয়োজনে উন্মুখর দ্বিতীয় দৃশ্যটিও একই সময়ের বৃত্তে-স্থিত। প্রবল উদ্দীপনায় জনতার সামনে মালিনী এসে দাঁড়ালো, সুপ্রিয় এবং ক্ষেমংকরের চরিত্রে বিপরীতমুখী গতি আসে মালিনীর প্রভাবে। নাটকের মূল প্রসঙ্গ

রূপায়ণের সুযোগ সৃষ্টি হয় এই ভাবে। তৃতীয় দৃশ্যে রাজঅন্তঃপুরে মালিনীর প্রত্যাবর্তন ও ওই একটি দিনের সময়সীমাকে অতিক্রম করে না। শুধু চতুর্থ দৃশ্যটি সময়ের দিক থেকে একটু দূরবর্তী। রক্তের বন্যায় নবধর্ম নিশ্চিহ্ন করবার জন্য বিদেশ থেকে সৈন্য সংগ্রহে ক্ষেমংকরকে সময় দিতে হয়েছে। আর অন্যদিকে এই সময়টুকুতেই সুপ্রিয়র সঙ্গে মালিনীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলবার সুযোগ পান কবি। তত্ত্বগত ভাবে সুপ্রিয় যে প্রেম-ধর্মকে জানতো ব্যক্তিগত ভালোবাসার স্বাদ সেই ধর্মের উপলব্ধিকে তার সমগ্র সত্তার সত্য করে তোলে, মূল্য-বোধে এই রূপান্তর তাকে অকুণ্ঠিত, দ্বিধাহীন করে। তাই মরণের আলিঙ্গনে অগ্রসর হয়ে যেতে তাকে নিঃশব্দে দেখি। ঘটনা মালিনীতে খুবই স্বল্প। কাহিনীর গতি সরল এবং ক্ষিপ্র। শেক্সপীয়রের "বহু শাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাত-প্রতিঘাত" কবি যেন সজ্ঞানেই এড়িয়ে গেছেন। আপন ক্ষমতার সীমা সম্পর্কে বহু পরীক্ষায় চূড়ান্তে পৌঁছেছে কাহিনীর কাব্যনাট্যে।

কাহিনী পর্যায়ের রচনাগুলিকে তুলনা করা যায় শেক্সপীয়রীয়-নাটকের সেই সব চূড়ান্ত দৃশ্যের সঙ্গে যেখানে Crisis আসে, বা Catastrophe ঘটে যায়। 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' পঞ্চাঙ্ক নাট্যে Crisis scene হতে পারতো। কাহিনী পর্যায়ের রচনাগুলির মধ্যে কর্ণ-কুন্তী সংবাদ সংহততম রচনা। একটি সন্ধ্যার পটে কর্ণের জন্মমুহূর্ত থেকে সংগ্রামে বিক্ষত জীবনের বিভিন্ন স্তর যেমন সম্পূর্ণ উন্মীলিত, জীবনের অনিবার্য শূন্য পরিণামও তেমনই তার সংগ্রাম-সত্তা দীর্ণ করে হাহাকার ছড়ায়। কোন ঘটনাই ঘটে না, তবুও একটি মানুষের জীবনের বিচিত্র সংকট, শৌর্যময় সংগ্রাম ও নিরুপায় ব্যর্থ পরিণাম কী প্রবলভাবে আমরা অনুভব করি। সমগ্র রচনাটির একটি ছত্রও বর্জনীয় মনে হয় না। বহু ঘটনার সারাৎসার কর্ণের সংলাপের কবিতায় সংহত এবং প্রতিটি শব্দের বা উপমার প্রভা ওই চরিত্রের আজন্মের অতৃপ্ত স্নেহ-পিপাসা, অশান্ত ক্ষোভ এবং অন্তিমের নির্বেদ, এই সব অনুভব আলোকিত করে তুলছে।

॥ ৭ ॥

'কাহিনী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০০ খৃষ্টাব্দে। দশ বৎসর পরে ১৯১০-এ 'রাজা' প্রকাশিত হয়। মধ্যবর্তী সময়ে শারদোৎসব (১৯০৮) এবং

পূর্বলিখিত উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯) ভিন্ন রবীন্দ্রনাথ আর কোন সিরিয়স নাটক লেখেন নি। এই সুদীর্ঘ ক্ষান্তি কি কোন নতুন প্রকরণ উদ্ভাবনা, সৃষ্টির কোন নতুন পর্বে উত্তরণের প্রস্তুতির কারণে? কাব্য-নাট্যের সাফল্য তাঁকে স্বস্তি দিয়েছিল, কিন্তু অভিনয়যোগ্যতার দিক থেকে ওই সব রচনার মূল্য অকিঞ্চিৎকর। মঞ্চ থেকে নির্বাসিত কোন রচনার নাট্য-মূল্য বা কতটুকু। এই দশ বৎসর কি তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন এমন কোন রূপ-কল্প নির্মাণের জন্য যা তাঁর স্বভাবের বিরোধী না হয়েও অভিনয়-যোগ্য হবে? 'রাজা' থেকে রবীন্দ্রনাথের নাটকে শিল্প-রূপের একটা সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল এবং শিল্পের এ শাখায় তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধি অর্জন করেছেন এই পর্বের রচনাতেই।

কিন্তু বিষয় ও প্রকরণের দিক থেকে তাঁর প্রতীকী নাটকের এই বিচিত্র জটিল অধ্যায়টির আলোচনার জন্য আর একটি প্রবন্ধের পরিসর প্রয়োজন।

অভিজ্ঞতার নদীতীরে

ভাস্কর বসু

॥ এক ॥

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন ষাট বছরে প্রকাশিত একটি দীর্ঘ অধ্যায়। এর মধ্যে কত অনুভূতি, কত উপলব্ধির রাগিণী বেজেছে সমালোচকের একটি জীবনে তার অনুসন্ধান এক দুঃসাধ্য ব্রত। কত সারস্বত সাধনার উচ্ছ্বসিত আবেগে বারবার কবির বীণা বেজেছে, ভাবতেও বিস্ময় লাগে। কবিতা যদি আবেগের বাণীরূপ হয়, তবে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির উৎসতটে কত অযুত আবেগের মুহুর্মুহু তরঙ্গাঘাত বেজেছে, রবীন্দ্রজীবনীর পৃষ্ঠায় যার উল্লেখ নেই!

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনকে কতকগুলি মূল স্তবকে ভাগ করা যায়। ১২৮৫ থেকে ১২৯৩ কড়ি ও কোমল পর্যন্ত উন্মোচন-পর্ব, ১২৯৬-র রাজা ও রাণী থেকে ১৩০০ পর্যন্ত মানসী রচনাকাল উদ্‌ঘাটন পর্ব। ১৩০০ সোনারতরী থেকে ১৩০৭ ক্ষণিকা পর্যন্ত কালকে বলা যেতে পারে উল্লাস-পর্ব। ১৩০৭-এর পর থেকে নৈবেদ্য খেয়া গীতাঞ্জলি গীতালি প্রভৃতি কাব্যরচনা অর্থাৎ ১৩২১ পর্যন্ত সময় আত্মনিবেদন-পর্ব। ১৩২৩ এর বলাকা রচনা এক বিদ্যুৎদীপ্ত ঘটনা। এই সময় থেকে ১৩২৯ শিশু ভোলানাথ পর্যন্ত পর্বের নাম দেওয়া যেতে পারে উদ্‌বোধন-পর্ব। ১৩৩২ পূরবী থেকে ১৩৪৮ জন্মদিন পর্যন্ত পর্বকে বলা যায় উদ্‌যাপন-পর্ব।

নানা বিচিত্র ভাবপল্লবশোভিত রবীন্দ্রকাব্য বনস্পতি। উন্মোচন পর্বেই তার পরিণত ফলশ্যাম রূপটি বিকশিত করেছিল। এ কথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে উত্তরকালীন রবীন্দ্রকাব্যের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ চিন্তা, অনুভাবনা ও চিত্রগুলি ১২৯৩-এর মধ্যেই অঙ্কুর আকারে প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘায়ত রবীন্দ্রজীবনের দুটি প্রধান অভিজ্ঞতার কথা এখানে আলোচনা করব, যে দুটি অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের বাণীসাধনার মূল প্রেরণারূপে অন্তিমকাল পর্যন্ত কার্যকরী হয়েছে।

১২৮৯ সালে লিখিত নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ রবীন্দ্রনাথের আজীবন আচরিত কাব্যপ্রতীকের মূল বিন্দু। এই কবিতাটি সম্পর্কে জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য পাঠক মাত্রেরই পরিচিত, যদিও উক্ত মন্তব্যের ব্যাখ্যানে প্রৌঢ় বয়সের সচেষ্ট তত্ত্বারোপ ঘটেছে। এই নির্ঝরই কালক্রমে রবীন্দ্র-কাব্যে নদীতে পরিণত হয়েছে, কিন্তু সে কথা যথাক্রমে।

প্রভাতসংগীতের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের পূর্বে শিশির রবীন্দ্রকাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য চিত্রকল্প। শিশিরের নশ্বরতা এবং প্রভাতী রবিকরের সঙ্গে তার কবিপ্রসিদ্ধিগত সম্পর্ক সম্ভবত কবিকল্পনাকে আকৃষ্ট করেছিল, সন্ধ্যা-সংগীত পর্বের বিষণ্ণতা নিরাশ্বাস হতাশা এবং প্রণয়-ব্যর্থতার সঙ্গে শিশিরের উপমা সুপ্রযুক্ত হয়েছে মনে হয়। দু'একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

বায়ু হ'তে আর লো কবিতা,
... ...
মরণ যেমন করে আসে,
শিশির যেমন করে ঝরে। (আরম্ভ। সন্ধ্যাসংগীত)

অথবা,
অবশ নয়ন নিমীলিয়া
সুখ কহে নিশ্বাস ফেলিয়া,—
... ...
মিশাব এ যামিনীর সনে,
কিছুই রবে না আর প্রাতে,
শিশির রহিবে পাতে পাতে। (সুখের বিলাস। ঐ)

হৃদয়ের গীতিধ্বনি কবিতায় কবি তাঁর চিত্তের এক পুনরাবৃত্ত নৈরাশ্যের কথা স্বীকার করেছেন যে হৃদয় গাহিতেছে 'একই গান একই গান একই গান'। এই কাব্যের অন্তিম কবিতাটিতে শিশিরের ক্ষণকথা ভঙ্গুরতাই কিশোর কবির একমাত্র প্রার্থিত হয়েছে—

আমি কেন হইনি শিশির ?
কহে কবি নিশ্বাস ফেলিয়া।
প্রভাতেই যেতেম শুকায়ে
প্রভাতেই নয়ন মেলিয়া।
হে বিধাতা শিশিরের মত

গড়েছ আমার এই প্রাণ,
শিশিরের মরণটি কেন
আমারে করনি তবে দান? (শিশির। ঐ)

॥ ২ ॥

শিশির অপরিণত বোধশক্তির, কি দুর্জ্ঞেয় বিষণ্ণতার, প্রভাতের তথা শৈশবের প্রতীক। সন্ধ্যাসংগীতের পর প্রভাতসংগীতকাব্যে কবির চিন্তা ও চেতনা অপেক্ষাকৃত পরিণতিকামী। সেইজন্য শিশির রৌদ্রতাপে অন্তর্হিত এবং এই পর্বের সার্থক প্রতীক নির্ঝর। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি রচনার মূলে একটি বিস্ময় এবং বিশ্বাস জড়িত আছে। সদর স্ট্রীটের বাড়িতে সূর্যোদয়ের মুহূর্তে একদা নিরঞ্জন দৃষ্টিতে কবির কাছে বিশ্বলোকের রহস্য আবিষ্কৃত হয়েছিল, সেখানে নির্ঝরের স্থান নেই, অথচ সমস্ত কবিতাটিতে একটি পার্বত্য অঞ্চলের পরিবেশ ছড়িয়ে আছে। পর্বত-বিদারক বহির্মুখী জলধারা বন্ধুর মৃত্তিকাভূমে পড়ছে, তারপর তার উপলবিশীর্ণ স্রোত-প্রবাহের প্রভূত আনন্দে জনপদে আনন্দ দান করে ছুটে চলেছে, এই কল্পনাময় চিত্রটি তাঁকে অভিভূত করেছিল, তাঁর যৌবনার্ধকে পুলকিত এবং কবিধর্মকে বিচলিত করেছিল।

এখন জিজ্ঞাস্য নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতায় কবি নির্ঝরের চিত্রকল্প কেমন ক'রে পেলেন? কোন্ অভিজ্ঞতার বিস্ময় এই প্রেরণার বিষয়ে রূপান্তরিত হ'ল? এই সম্পর্কে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে কিছুটা পরোক্ষ সাক্ষ্যের দ্বারা একটি অনুমান করা যেতে পারে।

আমি পূর্বে বলেছি, রবীন্দ্রনাথের কৈশোরের জীবনের মূল অভিজ্ঞতাগুলিই তাঁর উত্তরপর্বের কবিতায় নানাভাবে তত্ত্বে দর্শনে কবিত্বে অপরূপ ভঙ্গীতে মুদ্রিত আছে। আক্ষরিক অর্থে যাকে অভিজ্ঞতা বলে, সেই অভিজ্ঞতাকে রবীন্দ্রনাথ ব্যর্থ করেন নি। একটা প্রমাণ দেওয়া যাক।

> সেই বিলেত যাবার পথে লোহিতসমুদ্রের স্থির জলের উপর যে একটি অলৌকিক সূর্যাস্ত দেখেছিলুম, সে কোথায় গেছে! কিন্তু ভাগ্যিস আমি দেখেছিলুম, আমার জীবনে ভাগ্যিস সেই একটি সন্ধ্যা উপেক্ষিত হ'য়ে ব্যর্থ হ'য়ে যায় নি—অনন্ত দিন-রাত্রির

মধ্যে সেই একটি অত্যাশ্চর্য সূর্যাস্ত আমি ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো কবি দেখে নি। আমার জীবনে তার রঙ রয়ে গেছে।

(ছিন্নপত্রাবলী। নং ৪৯—১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯)

ইংলণ্ডে যাবার পথে প্রথম যৌবনে রেড-সীর উপর দৃষ্ট যে একটি আশ্চর্য অনির্বচনীয় সন্ধ্যাগমের দুর্লভ ক্ষণখণ্ড কবি সঞ্চয় করে রেখেছেন, একত্রিশ বৎসর বয়সে তার অনিঃশেষ স্মৃতি অবশ্য স্বভাবিক। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময় লাগে যখন দেখি সত্তর বছর পেরিয়েও সেই দীর্ঘপুরাতন মুহূর্তটিকে কবি কৃপণের ধনের মত অতীতের বৃক্ষতল খনন ক'রে মূর্ছাতুর চোখে তুলে দেখছেন :—

শরৎকালে পশ্চিম আকাশে
সূর্যাস্তের ক্ষণিক সমারোহ
রঙের সঙ্গে রঙের ঠেলাঠেলি—
তখন পৃথিবীর এই ধূসর ছেলেমানুষির উপরে
দেখেছি সেই মহিমা
যা একদিন পড়েছে আমার চোখে
দুর্লভ দিনাবসানে
রোহিত সমুদ্রের তীরে তীরে
জনশূন্য তরুহীন পর্বতের রক্তবর্ণ শিখর শ্রেণীতে,
রুদ্রের প্রলয় ভ্রূ কুঞ্চনের মত।

(৩০ শ্রাবণ ১৩৩৯। খোয়াই। পুনশ্চ।)

সুতরাং এই উদাহরণের দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, জীবনের আদি অভিজ্ঞতার পুলক কোনোদিন রবীন্দ্রনাথের কাছে নিষ্প্রাণ হয় নি। প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতা কাব্যরূপ লাভ করেছে, স্বকালে অথবা দূরকালে। অভিজ্ঞতার সঙ্গে কাব্যরূপের একটি সময়গত ব্যবধান বাঞ্ছনীয়। ঘটনাকে দূরত্বের বীক্ষায় দেখলেই তার মধুরতা ; তখনই তার সংঘটনার ব্যবহারিক দৈন্য লোপ পায়, তুচ্ছ অপরূপ হয়ে ওঠে। সুতরাং নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের পিছনে নিকটকালের অথবা অপেক্ষাকৃত বিগতকালের কী অভিজ্ঞতা আছে অনুসন্ধান করলে, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লেখার তেতাল্লিশ বছর পর

১৩৩৪ সালে লেখা বনবাণী কাব্যের 'হাসির পাথেয়' কবিতায় নির্ঝরের প্রতীকের উপলক্ষ্য আবিষ্কার করা যেতে পারে। উক্ত কবিতার সূচনায় তিনি লিখেছেন ঃ—

> তখন আমার অল্প বয়স। পিতা আমাকে সঙ্গে করে হিমালয় চলেছেন ডালহৌসি পাহাড়ে। সকালবেলায় ডাণ্ডি করে বেরতুম, অপরাহ্নে ডাকবাংলোয় বিশ্রাম হত। আজো মনে আছে, এক জায়গায় পথের ধারে ডাণ্ডিওয়ালারা ডাণ্ডি নামিয়েছিল। সেখানে শ্যাওলার শ্যামল পাথরগুলোর উপর দিয়ে গুহার ভিতর থেকে ঝরণা নেমে উপত্যকায় কলশব্দে ঝরে পড়ছে। সেই প্রথম দেখা ঝরণার রহস্য আমার মনকে প্রবল করে টেনেছিল। এ দিকে ডান পাশে পাহাড়ের ঢালু গায়ে স্তরে স্তরে শস্য ক্ষেত হলদে ফুলে ছাওয়া, দেখে দেখে তৃপ্তির শেষ হয় না, কেবলি ভাবি এইগুলো ভ্রমণের লক্ষ্য কেন না হবে, কেবল ক্ষণিক উপলক্ষ কেন হয়! সেই ঝরণা কোন্ নদীর সঙ্গে মিলে কোথায় গেছে জানিনে, কিন্তু সেই মুহূর্ত কালের প্রথম পরিচয়টুকু কখনো ভুলব না।

স্মরণের কি রমণীয় উত্তরায়ণ। নির্ঝরের স্বপ্নতা স্বপ্নভঙ্গ কবিতার ভাষা ও আবহের সঙ্গে এই স্মৃতির নিকটতম অনুযোজনা আছে। প্রৌঢ় এই অনুভূতির অকৃত্রিমতা জীবনস্মৃতির পৃষ্ঠার দ্বারাও সমর্থিত হয়। জীবন স্মৃতির হিমালয় যাত্রা অধ্যায়ে লিখেছেন—

> যেখানে পাহাড়ের কোনো কোনো পথের কোনো বাঁকে পল্লবভারাচ্ছন্ন বনস্পতির দল নিবিড় ছায়া রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এবং ধ্যানরত বৃদ্ধ তপস্বীদের কোলের কাছে লীলাময়ী মুনিকন্যাদের মত দুই একটি ঝরণার ধারা সেই ছায়াতল দিয়া শৈবালাচ্ছন্ন কালো পাথরগুলোর গা বাহিয়া ঘনশীতল অন্ধকারের নিভৃত নেপথ্য হইতে কুলকুল করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, সেখানে ঝাঁপানিরা ঝাঁপান নামাইয়া বিশ্রাম করিত। আমি লুব্ধভাবে মনে করিতাম, এ সমস্ত জায়গা আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে কেন! এখানে থাকিলেই তো হয়!

ফলত উভয় রচনার স্মৃতিগত ভূমিটি অভিন্ন এবং মনোভঙ্গীটিও পরস্পর সন্নিভ। কেবল কালগত ব্যবধান বেশ কয়েক বছরের মাত্র। বলা বাহুল্য এই শৈশব অভিজ্ঞতাটিকেই স্মৃতির উদ্ধার রূপে বনবাণীর আলোচ্য কবিতায় বাণীময়তা দান করা হয়েছে।

সেইদিন দেখেছিনু নিবিড় বিস্ময়মুগ্ধ চোখে
চঞ্চল নির্ঝর ধারা গুহা হতে বাহিরি আলোকে
আপনাতে আপনি চকিত, যেন কবি বাল্মীকির
উচ্ছ্বসিত অনুষ্টুপ।.....
আপনার পরিচয়ে নিঃসীম বিস্ময় আপনার।
আপনারি রহস্যের পিছে পিছে উৎসুক চরণে
অভ্রান্ত সন্ধান। সেই ছবিখানি রহিল স্মরণে
চিরদিন মনোমাঝে।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাতেও গুহার অজ্ঞাত অন্ধকারে প্রভাত পাখির গান এবং রবিকর প্রবেশ করেছে। স্ব-অচেতন নির্ঝর আত্মবিস্মৃতির সহসা তন্দ্রামোচন করে উন্মাদের মত বহির্গমনে নির্বন্ধপ্রায়। তখন সে নবপ্রতিভ তরুণ কবির আত্মপ্রকাশের প্রতিনিধি, কবির সারস্বত বাসনার চিত্রকল্প—

আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।

এই শস্য-সম্ভবা ইচ্ছাও বহুমুখী বাসনার কথা ছিন্নপত্রের পাঠকের কাছে অগোচর নয়। নির্ঝরের স্বপ্নসাধের সঙ্গে একচিত্তে স্মরণ করা যায় এই স্তবকাঙ্গটি—

ইচ্ছা করে আপনার করি
যেখানে যা কিছু আছে, নদী স্রোতোনীরে
আপনারে ভাসাইয়া দুই তীরে তীরে
নব নব যে লোকালয়ে করে যাই দান
পিপাসার জল, গেয়ে যাই কলগান
দিবসে নিশীথে; (বসুন্ধরা। চিত্রা) ২৬শে কার্তিক ১৩০০

দ্বিতীয় উদ্ধৃতির সৈকতিনী প্রথমোদ্ধৃতে নির্ঝরেরই ভাবপরিণাম মাত্র। এই নির্ঝর ও প্রবাহের ক্রমবিকশিত চিত্রকল্পই রবীন্দ্রপ্রতিভার মূল বাহন। কড়ি ও কোমল পর্যন্ত কাব্য নির্ঝরের শীকরকণায় সিক্ত। সোনারতরী থেকে নদীর সূত্রপাত। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতায় ভাবার্থের নামান্তর কবি-প্রতিভার বয়ঃসন্ধির উপলব্ধি। শৈশব এবং যৌবনের এক ক্রান্তিপর্বের

কঠিন বেদনাময় অনুভূতিকে রবীন্দ্রনাথ এখানে ধরবার চেষ্টা করেছেন। দেহের দিক দিয়ে আক্ষরিক অর্থে যাকে বয়ঃসন্ধি বলে, আলোচ্য কবিতা তারই বস্তু ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং সদর ষ্ট্রীটের অভিজ্ঞতার কোনো তত্ত্বগত ভিত্তি নেই। কেবল উত্তরকালীন দার্শনিকীকরণ ঘটেছে মাত্র। "একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত" এই উপলব্ধি তৎকালীন হয় এবং কবিতার সঙ্গে সম্পর্কহীন। রবীন্দ্রনাথের মনে নির্ঝরের চিরকালই একটি পূর্ণতার আদর্শ ছিল. খণ্ডকে বিচ্ছিন্নকে তিনি গ্রহণ করতে কষ্টবোধ করতেন: এই সামগ্রিকতার উৎস বুর্জোয়া নবজাগৃতির উত্তরাধিকার, পুরাতনের মূল্যবোধ এবং মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস। এই অখণ্ডতার চেতনাই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সীমার সহিত অসীমের মিলন সাধনের পালা নামে আবির্ভূত হয়েছে। আর এই পূর্ণতার বোধই রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির সমগ্রতাকে একটি পূর্ণ-দৈর্ঘ্য নদীর যাত্রপথের সঙ্গে উপমিত করেছে। প্রভাতসঙ্গীতের কবিতায় পর্বতোৎসারিত নদীর প্রথম অবস্থা, সোনারতরীতে জ্ঞানপদী নদী এবং বলাকায় কেবল নদীর নিষ্কর্ষরূপ। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের কেবল স্বপ্নভঙ্গের উল্লাস নয়, জাগরণের শেষ দশারও ভবিতব্য ছিল: "দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।" এই কৈশোরক নির্ঝর শেষ পর্যন্ত মহাসাগরে মিশেছিল কিনা এবং সে মহাসাগরের স্বরূপ কী তাও আলোচনা ও গবেষণার বিষয়। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটিকে পরবর্তী কালে দৃষ্ট অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করে রবীন্দ্রনাথ একটি বৃহত্তর কবিতা লিখেছিলেন বলেন্দ্রনাথের বিবাহ উপলক্ষে, সেখানেও একই উপলব্ধির পুনর্বয়ান। কয়েকটি পংক্তি স্মরণ করা যেতে পারে—

আমি বসে বসে তাই ভাবি
নদী কোথা হতে এল নাবি ?
... ...
সেথা সাদা বরফের বুকে
নদী ঘুমায় স্বপন সুখে।
কবে মুখে তার রোদ লেগে
নদী অমনি উঠিল জেগে ;
... ...

তাই ঝুরু ঝুরু ঝিরিঝিরি
নদী বাহিরিল ধীরি ধীরি।
মনে ভাবিল যা আছে ভবে
সবই দেখিয়া লইতে হবে। (নদী। রবীন্দ্ররচনাবলী ৪র্থ)

কবিতাটি শিশু মনোরঞ্জনের জন্য রচিত এবং যুক্তাক্ষর বর্জিত। রবীন্দ্র-কাব্যালোচনায় অপাংক্তেয়ই আছে। কিন্তু নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের সঙ্গে এর ভাবনা ও ভাষাগত সারূপ্যের জন্য এখানে মনে রাখা যায়। পরন্তু এ পর্যন্ত রবীন্দ্র-কবি-মানসের মূল ধর্ম ও তার চিত্রকল্পটি অভিন্ন আছে, এই প্রমাণও পাওয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের দ্বিতীয় প্রবুদ্ধি অভিজ্ঞতা নির্ঝর দর্শনের চেয়েও গভীর, হৃৎস্পন্দধ্বনিত বিস্ময়বহ এবং রোমাঞ্চক, তা হল পদ্মার সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার ইতিবৃত্ত। কিন্তু তার পূর্বে প্রভাতসংগীতের আর দু-একটি কবিতার সংক্ষিপ্ত স্মৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ এবং প্রভাত উৎসব অব্যবহিত রচনা একই অভিজ্ঞতা-বৃক্ষের যুগ্ম কিশলয়। উভয় কবিতাবন্ধে একই অনুষঙ্গের চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে। তবে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ চিত্রপ্রতীকিত এবং প্রভাত উৎসব ভাবপ্রতীকিত রচনা। প্রথমটিতে রূপকেই কবিতাটির আদ্যন্ত গ্রথিত আর একটির রূপক আভাসিত। প্রথম কবিতায় গুহা এবং নির্ঝর নাট্যের মূল কুশী-লব। দ্বিতীয় কবিতায় নাট্যসংস্থানের দৃশ্যা-ভিন্নত্বের উপর কবির স্বগত সংলাপ। এখানে গুহাচিত্র গৃহচিত্রে রূপান্তরিত বিভাব একটিতে নির্ঝর স্বস্থান ত্যাগ করে বহির্মুখী আর একটিতে বাহির প্রভাতসূর্য। অন্তঃপ্রবেশাধিকার লাভ করেছে। দুই কবিতারই উদ্দীপন বিভাব প্রভাত সূর্য।

॥ তিন ॥

কর্মব্যপদেশে শিলাইদহ যাত্রা, সেখানে দীর্ঘকাল স্থায়ীভাবে বাস করা এবং দিবস রজনীর নিরবচ্ছিন্নতায় পদ্মা নদীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকা,

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের এক স্মরণীয়তম ঘটনা। নদীর সঙ্গে নৈকট্য তাঁর জীবনে ইতিপূর্বে কয়েকবার ঘটেছিল: চন্দননগরে গঙ্গাতীরে অবস্থানকালে গঙ্গার তরঙ্গসৈকতে তিনি একদা জলধারা দেখেছিলেন এবং কড়ি ও কোমল রচনাপর্বে একবার শিলাইদহে এসেছিলেন। কড়ি ও কোমলে নৌকা-যাত্রা বিষয়ক একটি পত্র কবিতায় কবি-সুহৃত্তম প্রিয়নাথ সেনকে লিখে পাঠিয়েছিলেন,

জান তো ভাই আমি হচ্ছি জলচরের জাত
আপন মনে সাঁতরে বেড়াই ভাসি যে দিনরাত।

পত্র। নৌকাযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া লিখিত।

—কড়ি ও কোমল।

এখানে নদীকে অবলম্বন করে তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা লঘু পরিহাস ও তরল রহস্যভঙ্গী দ্যোতিত হয়েছে। কিন্তু শিলাইদহের উন্মুখ প্রান্তরের পার্শ্বগামিনী প্রমত্তা স্বেচ্ছাবিহারিণী দিগালিঙ্গিত প্রভাত সন্ধ্যায় অপরূপ পদ্মাকে দেখে কবি যেন তাঁর 'জননান্তর সৌহৃদানি' স্মরণ করলেন। শিলাইদহ থেকে ইন্দিরা দেবীর কাছে লেখা তাঁর প্রথম চিঠিতেই এই অবাক্ বিস্ময়ের সবাক অভিব্যক্তি ফুটেছে। এই প্রথম তিনি আবিষ্কার করলেন পৃথিবী বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী, এই যে ছোট নদীর ধারে স্বপ্নবতী সন্ধ্যাসূর্যালোকদীপ্তিতে শান্তিময় বৃক্ষতরুতলের নেপথ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্তংগামিতমহিম হয়ে চলেছে, এবং পদ্মাতীরের অনন্ত ধূসর শব্দহীন প্রসারিত বালুচরের উপরে অযুত নক্ষত্রের পদধ্বনিলুপ্ত অভ্যুদয় ঘটছে এই মহৎ আশ্চর্য ঘটনাটি একটি বিদ্যুদ্দীপ্ত বিস্ময়রেখার মত তাঁর এতকালের আকাশে জ্বলে উঠল। কেবল ভেসে চলা, কখনো জলস্থলের সীমারেখাহীন দিগন্তবিস্তৃত স্রোতস্বিনী কখনো স্নেহশালিনী অন্তঃপুরচারিণী নদী—"কেবলমাত্র গতির কেমন যেন একটা আকর্ষণ আছে—দুধারের তটভূমি অবিশ্রাম চোখের উপর দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে" (ছিন্নপত্রাবলী, নং ১৪)। এই বিচিত্রগামিনী নদী যেন কবির ইচ্ছা এবং চলমান্ তটদৃশ্য সে ইচ্ছার সামগ্রীর মত। এই ইচ্ছার নাম সোনারতরী, চিত্রা চৈতালি, আর ইচ্ছার সামগ্রীর নাম ছোটগল্প। এই নদী রবীন্দ্রনাথের যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ চিন্তার জন্ম দিয়েছে। এই

নদীর চিত্রকল্পেই পরবর্তী সমস্ত কবিতা-গ্রন্থের পংক্তিগুলি সচকিত হয়ে উঠেছে। সুতরাং এই নদী দর্শনের অভিজ্ঞতাই রবীন্দ্রকাব্যে একটি প্রবল প্রেরণা হয়ে দেখা দিয়েছে এবং তাঁর কাব্যকে পরিচালিত করেছে একই সময়ে লেখা সমস্ত রচনায় নদীর স্মৃতি বিজড়িত। এই স্মৃতির তিনটি স্তর লক্ষণীয়। প্রথমে নদীর বর্ণনা অর্থাৎ চিত্রের উপাদান। দ্বিতীয় স্তরে চিত্রকল্পের আভাস (**broken image**) এবং তৃতীয় স্তরে উপাদানের বিশুদ্ধীভাব ও চিত্রকল্প সৃষ্টি। নিতান্ত পৃথক খণ্ডে তিনটির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

প্রথম স্তর ঃ

আশ্বিনের সুন্দর দিনগুলি নদীপথের বিচিত্র দৃশ্যগুলিকে রমণীয় করিয়া তাহারই মাঝখানে কমলার এই প্রতিদিনের আনন্দিত গৃহিণী-পনাকে যেন সোনার জলের ছবির মাঝখানে এক একটি সরল কবিতার পৃষ্ঠার মত উলটাইয়া যাইতে লাগিল। [নৌকাডুবি)

নদীভরা কূলে কূলে খেতে ভরা ধান
আমি ভাবিতেছি বসে কী গাহিব গান।
কেতকীর জলের ধারে
ফুটিয়াছে ঝোপে ঝাড়ে
নিরাকুল ফুলভারে বকুলবাগান
কানায় কানায় পূর্ণ আমার পরান।
(ভরা ভাদরে। সোনার তরী)

দ্বিতীয় স্তর ঃ যৌবন নদীর স্রোতে তীব্র বেগ ভরে
একদিন ছুটেছিনু ; বসন্ত পবন মাঠে
উঠেছিল উচ্ছ্বসিয়া।...
আজি দিবা অবসানে
সমাপ্ত করিয়া খেলা উঠিয়াছি তীরে।
বসিয়াছি আপনার নিভৃত কুটীরে।
(প্রৌঢ়। চিত্রা)

সোনারতরী চিত্রার সমকালীন রচনা নাট্যকার মালিনীর মধ্যেও নদী ও নৌকার সংকেতটি ব্যবহৃত হয়েছে একই উদ্দেশ্যে। শাস্ত্র-বহির্ভূত নবোদ্-

ভূত মানবধর্মে বহির্গামিনী মালিনীর মনটিকে রবীন্দ্রনাথ সেই পরিচিত চিত্রকল্পে বিদ্ধ করেছেন ঃ

আমি স্বপ্ন দেখি জেগে
শুনি নিদ্রা ঘোরে, যেন বায়ু বহে বেগে,
নদীতে উঠেছে ঢেউ রাত্রি অন্ধকার,
কর্ণধার নাই গৃহহীন যাত্রী সবে
বসে আছে নিরাশ্বাস—মনে হয় তবে
আমি যেন যেতে পারি, আমি যেন জানি
তীরের সন্ধান, মোর স্পর্শে নৌকাখানি
পাবে যেন প্রাণ, যাবে যেন আপনার
পূর্ণ বলে।

এখানে নিরাশ্বাস যাত্রীর পথোত্তীর্ণতার বাহনরূপে নৌকা এবং উদ্ধারকের ভূমিকায় কর্ণধারের পরিকল্পনা (তুলনীয়, আমাদের যাত্রা হল সুরু)।

তৃতীয় স্তর ঃ

বলো কোন্ পারে ভিড়িবে তোমার
সোনারতরী।
(নিরুদ্দেশ যাত্রা। সোনার তরী)
ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী
আমার সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।
(সোনার তরী। ঐ)
হৃদয় পাষাণ-ভেদী নির্ঝরের প্রায়
জড়জন্তু সবাপানে নামিবারে চায়।
(হৃদয়ধর্ম। কল্পনা)
এই খেয়া চিরদিন চলে নদীস্রোতে
কেহ যায় ঘরে কেহ আসে ঘর হতে।
(খেয়া। চৈতালি)

নদীমাতৃক অভিজ্ঞতার প্রথম সার্থক কাব্য সোনারতরী; সোনার তরী রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিত্রকল্পবাদী কাব্য। বাঙলা সাহিত্যে চিত্রকল্পের সম্ভাবনা প্রথম রবীন্দ্রনাথই সূচিত করলেন, কবিতার বাণী ও ভাষণে, চিত্রণে ও অলংকারে অভিজ্ঞতার ঘনীভূত সার মিশ্রিত করলেন। প্রসাধিত

সাংকেতিক, দ্ব্যর্থবহ ছবি কেবল পংক্তির সৌষ্ঠব বর্ধনেই নিয়োজিত হল না সমগ্র চেতনার মন্থনজাত অমৃতের একটি চিত্রফলক সমগ্র কবিতার কণ্ঠে দোদুল্যমান হল। সম্পূর্ণ অপরিচিত এই রীতি বাঙলা কবিতায় সেদিন ভিন দেশীয় মনে হয়েছিল। কেবল সোনারতরী কবিতা অবলম্বন করে ব্যাখ্যা মতান্তর সন্দিহানতা ও উন্নাসিকতার যে প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল, তার মূল কারণ সম্ভবত এই অভিজ্ঞতার নদীতীর সম্পর্কে কবিদের অপরিচয়, সমালোচকদের বিস্ময়বোধ! উপমাবাচক চরণ ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ অজস্র করেছেন। আধুনিক অনেক সমালোচক আবার সেগুলি চিত্রকল্প বলে ভুল করেন এবং রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প আলোচনায় উদ্ধৃতির যত্ন-সাধিত বিন্যাসে এই সকল আলংকারিক কৃতিত্বের অপব্যাখ্যা করেন। দৃষ্টান্তের অভিনবত্ব বা চকিত উৎপ্রেক্ষিক দৃষ্টিমাত্রই ইমেজ নয়। সমগ্র জীবনের চেতনাবহ না হলে পুনঃপুন অনুরাগে রঞ্জিত না হলে তা চিত্রকল্প হয় না, যদি মূল প্রয়োগসম্মত অর্থে তাকে গ্রহণ করি। অবশ্য পাশ্চাত্ত্য কবিতাতেও চরণের মধ্যবর্তী একটি তুলনামূলক চিত্রকে চিত্রকল্প বলে মনে করা হয়। আমরা তাকে অনুকরণ করি। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে আমাদের মত একটি সৌন্দর্য-সম্মত সূক্ষ্মনেত্র বিচিত্র অলংকার শাস্ত্র আছে? কবিতার সৌন্দর্যকে এত কারুকার্যে মণ্ডিত করা আছে অলংকৃত করাই কবিতার কাজ, এ কালে এবং চিরকালই। সুতরাং চিত্রকল্প বিদেশ থেকে আসেনি, হৃদয় থেকে এসেছে, কিন্তু তার জ্ঞানটা আধুনিক। রবীন্দ্রনাথের কাছে চিত্রকল্পের ধারণা খুব তীক্ষ্ণ ছিল না। কাব্যসজ্জার উপকরণ সম্বন্ধে তিনি কোনোদিন বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করেন নি। অথচ একান্ত অচেতনভাবে তিনি চিত্রকল্প সৃষ্টি ক'রে গেছেন। যেখানে তাঁর অভিজ্ঞতা কবিতার প্রত্যঙ্গের শোভা, সেখানেই তিনি আলংকারিক; যেখানে অভিজ্ঞতা কবিতার সর্বাঙ্গে সঞ্চালিত সেখানেই তাঁর চিত্রকল্প। চিত্রকল্প হৃদয়ের গভীরে নিহিত থাকে, তাই চৈতন্যের অন্ধকার গুহায় সেই মানসোত্রী থেকে যাত্রা করে। ঠিক একই কারণে জীবনের নানাপর্বে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে একই চিত্রকল্পের উৎসারণ ঘটেছে।

॥ চার ॥

চৈতালির কবিতাগুলি ১৩০২-এর শেষ থেকে ১৩০৩-এর গোড়ার

দিকের লেখা। চৈতালির সাধারণ অর্থ চৈত্রময় বা চৈত্রে রচিত, কিন্তু কাব্যের অন্তরঙ্গ সাক্ষ্যে একথা প্রমাণ সম্ভব যে, চৈতালি শীর্ণাতন্বী চৈত্রের পদ্মা, তথা তার উপনদী শাখানদী, যেগুলির স্মৃতিপ্রবাহের উপকূলে এই কাব্যের কবিতাগুলির ঘনছায়াপাত ঘটেছে। এই কাব্য উৎসর্গিত হয়েছে জনৈকা অজ্ঞাতনামাকে। এই উৎসর্গের ভাষাও নদীর চিত্রস্পৃষ্ট ঃ—

তোমার কোমলকান্ত চরণ-পল্লব
চিরস্পর্শ রেখে দেয় জীবনতরীতে।

পলিমাটিবিধৌত নদীমাতৃক মৃত্তিকাভূমিতেই যৌবনপর্বের রবীন্দ্র-চেতনা সঞ্জীবিত হয়েছে। পদ্মানদীর সঙ্গে অতি ব্যাপ্ত স্রোতোঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দ্বারপথেই রবীন্দ্রনাথের সুপ্রতিম সত্যমমতা ও বিশ্বাত্মবোধের জন্ম হয়েছে। পদ্মাকূলই রবিশস্যের রোহভূমি।

চৈতালির পদ্মা কবিতায় পদ্মা কবির কাছে নতনয়না, সন্ধ্যাতারা সখীর সকৌতুক নীরবতায় ব্রীড়াময়ী, নবোঢ়া বধূসদৃশা সন্ধ্যাভিসারিকা পদ্মার উপকূলে বসেই কবির জাতিস্মরতার অব্যক্ত আবেদন জেগেছে। চৈতালির কবিতাগুলি আকারে কনিষ্ঠ, সনেটকল্প, প্রায় প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা। চৈতালি যেন চৈতী নদীর দিনলিপি। এই কাব্য সমাপ্ত হয়েছে মাথুর বেদনায়, নদী-ললিত দিবস-যৌবন পরিত্যাগের বিরহ বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারে। সুতরাং চিত্রা-চৈতালি পর্বের নদী রবীন্দ্র-নাথের কাব্যফসলের জলদাত্রী, কিন্তু পরবর্তীকালের নদী রবীন্দ্রনাথের জীবনবৃক্ষের প্রান্তবর্তিনী মাত্র। এখনকার মত এমন ক'রে পরবর্তী জীবনে তিনি নদীনৈকট্যে দীর্ঘকাল আর কখনও কাটাননি। অর্থাৎ উত্তরকাব্যে নদী স্মার্ত অভিজ্ঞতার বিষয় হয়েছে মাত্র, দৃষ্টি থেকে অন্তরে স্থানান্তরিত হয়েছে। সেই হেতু সেখানে আর নদীর 'ডিটেল' পাওয়া যাবে না। এখানে নদী কেবল কবির যাত্রাপথ, পরবর্তী জীবনে নদী তাঁর ধ্যানস্থ। এখানে নদী তাঁর দর্শনকে উন্মীলিত করেছে; পরবর্তীকালে নদী তাঁর দার্শনিকতাকে উন্মোচিত করেছে। চৈতালিযুগের নদীঘটিত অভিজ্ঞতাই তাঁর ছোট গল্প লেখার ভূর্জপত্র। নদী কেবল কবির সিসৃক্ষার ও দিদৃক্ষার নাব্য ধারা মাত্র ঃ—

আমি যেন চলিয়াছি বাহিয়া তরণী
কূলে কূলে দেখা যায় শ্যামল ধরণী।
... ...
তীরে হতে দুঃখসুখ দুই ভাইবোনে
মোর মুখপানে চায় করুণ নয়নে।
ছায়াময় গ্রামগুলি দেখা যায় তীরে
মনে ভাবি, কত প্রেম আছে তারে ঘিরে।
(ধরাতলে। চৈতালি)

॥ পাঁচ ॥

কল্পনা কাব্য রচনাকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রত্যক্ষদৃষ্ট বর্ণনার বদলে বিশুদ্ধ চিত্রকল্পের ইতস্তত প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। নদী সম্পর্কিত চিত্রগুলি নানাভাবে আভাসে প্রতীকে ব্যঞ্জনায় এই পর্ব থেকেই তাঁর রচনায় প্রকীর্ণভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। বিশেষ কতকগুলি শব্দের প্রয়োগ, উপমার ভঙ্গী, উৎপ্রেক্ষারূপকের পৌনঃপুনিকতার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সেই প্রিয় উপমানের বহু ব্যবহারের ধারাটি লক্ষ্য করি। কূল, তট, তরঙ্গিত উচ্ছ্বসিত ঊর্মি, ঢেউ, নৌকা, খেয়া, মাঝি প্রভৃতি শব্দ অজস্র প্রসঙ্গে নিঃশব্দে উক্ত হয়েছে। আংশিক চিত্রকল্পে অনেকক্ষেত্রেই প্রসঙ্গান্তরের নদীকলধ্বনিত এক একটি চিত্রের ব্যঞ্জনা আসে। দুএকটি কবিতায় নদী এবং নৌকার যৌগপত্যে এমন চিত্রকল্প পাওয়া যায় যেগুলি আসন্ন খেয়া পর্বের পূর্বাভাস। কিন্তু কোথাও পদ্মার প্রসঙ্গ নেই, পদ্মাতটের দিগন্তস্পর্শী ব্যাপ্তি নেই, পদ্মাস্রোতের খরবেগ গতি নেই। অতএব নদী এখন অতীত অভিজ্ঞতার বিষয়ীভূত অথবা অভিজ্ঞতা এখন পরোক্ষ ও অবচেতায়িত। এখন চিত্রকল্পগুলি অনেক সংযত ও কেন্দ্রীভূত, বুদ্ধিনির্ভর ও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কোন একটি প্রিয় ভূদৃশ্য সংস্থান পরিত্যাগ করে যাবার বেদনাকে তিনি চিত্রায়িত ও ঊর্ধায়িত (Sublimated) করে দেখেছেন, তাই নদীর কূল থেকে নৌকো নিগ্রন্থি করার চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে, বৃহত্তর জীবনের আহ্বানে সংকীর্ণ জীবনবৃত্ত পরিহার করার আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে ঃ

এবার চলিনু তবে
সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।
উচ্ছল জল করে ছলছল
জাগিয়া উঠেছে কল-কোলাহল
তরণী পতাকা চলচঞ্চল কাঁপিছে অধীর রবে।
[বিদায়। কল্পনা]

বিশ্বজগত কবিকে প্রার্থনা করেছেন, এখন 'কে মোর আত্মপর'? সুতরাং অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার খুলে যে চিত্রটি পেলেন, তাকেই প্রয়োগ করলেন। এটি খাঁটি চিত্রকল্প, তাই একই ভাবার্থে রবীন্দ্ররচনায় পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত। এলোমেলো দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়ঃ

বাঁধন ছেড়ার সাধন হবে
ছেড়ে যাব তীর মাভৈঃ রবে। [গীতবিতান]
এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী
তীরে বসে যায় যে বেলা মরি গো মরি।
[গীতিমাল্য]

বন্দরে বন্ধন কাল এবারের মত হল শেষ
[ঝড়ের খেয়া। বলাকা]

কল্পনার মত ক্ষণিকার অনেকগুলি কবিতাতেই নদীর চিত্রকল্প প্রযুক্ত হয়েছে। পরামর্শ কবিতাতে নৌকা-বাওয়া চিত্রকল্পের একটি আকর্ষণীয় সমর্থন আছে। আলোচ্য কবিতার চিত্র-কবিতার জীর্ণ তরী নিয়ে গ্রামের ঘাটে আশ্রয় নিয়েছেন, অন্তরাত্মা শুভবুদ্ধি অবসর গ্রহণের পরামর্শ দিচ্ছে। কিন্তু যে অদৃষ্ট কবিকে স্থানান্তরে কূলান্তরে নিয়ে চলেছে, সে এখনো অশ্রান্ত। সুতরাং—

ঘাটে সে কি রইবে বাঁধা
অদৃষ্টে যাহার
আছে নৌকাডুবি। (পরামর্শ। ক্ষণিকা)

কেবল ভেসে যাওয়ার একটি আকর্ষণ আছে, ছিন্নপত্রের এই উল্লাসের স্মৃতির আলোচ্য চিত্রকল্পের মূল অভিজ্ঞতা। কূলে, স্বল্পশেষ, যাত্রী, দুইতীরে নববর্ষা, যৌবন বিদায়, কল্যাণী প্রভৃতি একাধিক কবিতায় এই একটি মাত্র চিত্রকল্পের বিচিত্র বিন্যাস যে কোন পাঠক লক্ষ্য করতে পারেন। নৈবেদ্যের দু'একটি কবিতায় নদীর আবহে ভাগবৎ উপলব্ধি সঞ্চার করা হয়েছে। কাহিনীমূলক কবিতার নানা প্রসঙ্গে পরিস্থিতিতে নদীর উল্লেখ আছে, যেখানে পুরা কাহিনীর পটভূমিতে জাহ্নবী, যমুনা, সরস্বতী, বেণুমতী প্রভৃতি নাম ব্যবহার ঘটেছে। তাছাড়া মধ্যবর্তী অনেক কবিতায় বিক্ষিপ্তভাবে অনুরূপ প্রসঙ্গ আছে।

কিন্তু সোনার তরীর পর রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য চিত্রকল্পী কাব্য খেয়া। 'ক্ষণিকার পরামর্শ' কবিতায় নৌকা বেয়ে অজানা উদ্দেশে ভেসে যাওয়ার তুলনায় কেবল মাত্র খেয়া পারাপারকে কবি বিদ্রূপ করেছিলেন। কিন্তু কেবল মাত্র খেয়া পারাপারের প্রতি তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ মোহ চৈতালির খেয়া কবিতায় ছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে কবি সাগ্রহ উত্তেজনায় যোগ দিয়েছিলেন। মরা গাঙের বানে জয় মা বলে তরী ভাসিয়েছিলেন। কিন্তু মনের ভেতরে জমেছিল রাজনীতির গ্লানি ও আন্দোলন সম্পর্কে অশান্ত অপ্রীতি। এই বিপন্ন অস্বস্তি তাকে হাতছানি দিচ্ছিল কোনো কোলাহলহীন চাঞ্চল্য বিরত উপত্যকায়। কর্মের ব্যস্ততার আত্মগ্লানির এবং পলায়নী ইচ্ছার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে, নদী এই জটিল মানসিক অবস্থায় তিনি উপনীত হয়েছেন. এবং সার্থক ভাবেই হয়েছেন, নদী উত্তরণের বাহনের কাছে। তাই এই পর্বের অনুপম চিত্রকল্প খেয়া, রূপে এক হলেও সোনারতরীর চেয়ে কত পৃথক! গৃহ এবং নদী কূলের সংকটই সন্ধিস্থানে থাকার বা বিভিন্ন আর্তনাদ শুনতে পাওয়া যায় এই চিত্রকল্পে :

দিনের আলো যার ফুরালো সাঁঝের আলো জ্বলল না,
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।
(শেষ খেয়া। খেয়া)

খেয়ার একাধিক কবিতায় মূল নামকরণের প্রযোজনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সর্বত্রই এই বিবিক্ত নৈরাশ্য হতাশ বৈরাগ্য এবং সামান্য তৃপ্তি। কখনো পারান্তরে যাওয়ার বদলে যে হাওয়াতে চলত তরী, অঙ্গে সেই হাওয়া লাগানোর বাসনা কখনো নৌকা নিয়ে সাগর অন্বেষণে যাত্রা, কখনো জীবনের

পাটনির সঙ্গে সংলাপ। স্পষ্টতই চিত্রকল্প এখন অন্তরঙ্গ, স্মৃতির কাঠামোর উপর চিন্তার প্রলেপ দেওয়া, যেন নদীতীরের মৃত্তিকা এনে গৃহকোণে গঙ্গা-মূর্তি নির্মাণ। এখন তিনি বহুদর্শী, ক্লান্ত প্রাণ, অকস্মাতের আশা পরিত্যাগ করেছেন ঃ

এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি,
এখন শুধু আকুল মনে যাচি
তোমার পানে খেয়ার তরী ভ্যসা।

(পথের শেষ। খেয়া)

ঠিক এমন করেই রবীন্দ্রকাব্যের নানাস্থানে পদ্মাকূলের অভিজ্ঞতা বাণী-রূপ ধারণ করেছে। একটি ধূসর অভিজ্ঞতা এখন পল্লবিত কুসুমিত হয়েছে একটি চিত্র এখন চিত্রকল্প হয়েছে। নির্ঝর থেকে নদী, উপল থেকে উপত্যকা, বন্ধুরতা থেকে সমতটে, উৎস থেকে উপকরণে রূপান্তরিত হয়েছে এই ব্যাপারটি। দৃষ্ট সত্য উপলব্ধ সত্যে এবং উপলব্ধ সত্য সাংকেতিক চিত্রে অনুদিত হয়েছে। প্রেরণাকে প্রেরণ করা হয়েছে কবিতার অস্থিকায়ে, আত্মা হয়ে তাকে সপ্রাণ, রূপ হয়ে তাকে অবয়বী করে তোলার জন্য। গীতাঞ্জলির ১২, ২০, ২১, ৮৩ সংখ্যক, গীতালির ৩০ সংখ্যক কবিতা বা গানগুলি সমসূত্রে এই মর্মে স্মরণ করার ইচ্ছা হয়।

॥ ছয় ॥

রবীন্দ্রনাথের জীবনে ডালহৌসি পাহাড়ে ঝরণা দর্শন, উত্তরবঙ্গে পদ্মা দর্শন যেমন দুটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা, তেমনি আর একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতা ঘটেছিল ঝিলম নদীর তীরে, একটি কাশ্মীরী সন্ধ্যায়। যেখান থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গীতবাদের উপলব্ধি এবং নদীর পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত চিত্রকল্প গ্রহণ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের জীবনের শ্রেষ্ঠ আধুনিক উপলব্ধি গতিবাদের দর্শন ও নদী প্রান্তবর্তী অভিজ্ঞতা। 'হে বিরাট নদী' লেখা হয়েছে এলাহাবাদের গঙ্গা তীরে। বলাকা গ্রন্থের প্রায় সকল কবিতার মধ্যেই একটি প্রবহমানতার, একটি ক্লান্তিহীন চলার অকুণ্ঠ আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়েছে। এর নাম গতি নয়, গতির অনুভূতি। স্থিতিবিরোধিতা রবীন্দ্রনাথের আজীবন আবরিত ধর্ম, কিন্তু একে বলা হয়েছে গতিবাদ। বহু

শাখায়িত এর ব্যাপ্তি ও বিস্তার, বহু চিন্তান্বিত এর মহিমা। বের্গসঁর কাছে কবি হয়ত অনুপ্রাণতা পেয়েছিলেন, কিন্তু চিত্রকল্প সম্পূর্ণ কবির নিজস্ব ; প্রেমধর্মের চেয়ে জীবনধর্ম বড়, এই জীবন উপলব্ধি ইতি পূর্বের কাব্যে এমন পুনঃপুনঃ ঘোষিত হয় নি, এমন নিষ্ঠুর নির্বিকল্প ঔদাসীন্যে বলা হয়নি ঃ

জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে ;
এক হাটে লও বোঝা শূন্য করে দাও অন্য হাটে।
(৭নং কবিতা। বলাকা)

অথবা, অভিজ্ঞতাকে তার সমস্ত পার্থের লাবণ্য থেকে মুক্ত করে একটা অশরীরী কল্পিত চিত্রসত্তা দান করা—

দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে ;
(৩৬নং কবিতা। ঐ)

নদী এখানে যাবতীয় পুনরুক্তির প্রক্ষেপ থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে। সে এখন উন্নীতচিত্র, আদর্শায়িত, শুদ্ধরূপ, বস্তু বিচ্যুত তড়িত শক্তির মত। চঞ্চলা কবিতাটি অবশ্য কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট নয়, নদীকে তত্ত্বব্যাখ্যা দান করার জন্য ক্লিষ্ট হয়েছে। অস্তিত্বে আবিলতাকে উন্মথিত করে যে অখণ্ড কালের প্রতীতি তাকেই আলোচ্য কবিতায় নদীরূপ দান করা হয়েছে। চন্দ্র-সূর্য নক্ষত্র মণ্ডলী কালেরই বুদবুদ মাত্র-এই Cosmic imagination ও ইতি-পূর্বে পাইনি। প্রবহমানতা বের্গসঁর কাছে ছিল কেবল beyond good and evil, beyond all pleasures and pain. রবীন্দ্রনাথের কাছে—

শুধু ধাও শুধু ধাও শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও।
ফিরে নাহি চাও।
(৮নং। বলাকা)

যৌবধর্ম, তারুণ্য, প্রগতিশীলতার স্বপক্ষে যে কবিতাগুলি আছে সেখানেও একাধিকবার অভ্যস্ত রূপকল্পের প্রয়োগ ঘটেছে। জীবন ধর্মের নিষ্ঠুর আমন্ত্রণে কবি নবযুগের প্রতিধ্বনিকে দুর্গম সংগ্রামক্ষেত্রে টেনে এনেছেন। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ তরঙ্গকেন্দ্রে প্রকম্পিত নৌকারক্ষার দায়িত্ব দান

করেছেন—অর্থাৎ একটি চিত্রকল্পের দিক থেকে যা খণ্ডিত, নিষ্ঠার দিক থেকে স্খলিত।

উত্তর-বলাকা পর্বে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় চিত্রকল্প ব্যবহারে বৈচিত্র্য এসেছে, আধুনিকতা দেখা দিয়েছে, অভিজ্ঞতার প্রসার এবং ব্যবহারিক সূক্ষ্মতা তাঁর কবিতাকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে। চিত্রকল্প কবিতার ভাব বা ভাবপুঞ্জের উদ্দীপক এবং তারই সঙ্গে সচেতন কবিশিল্পীর মানস-লোকের মানচিত্র। চিত্র ব্যবহার বা চিত্রকল্প রচনা এক একটি কবিতার সমগ্র চেতনার স্ফুটিত প্রকাশ। পূরবীর অধিকাংশ কবিতা লেখা হয়েছে পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণ কালে, অনেক কবিতায় নদীর সঙ্গে তার শান্তবহতী ধারার সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছেন নারীকে, 'যে নারী বিচিত্র হেসে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার'। স্মৃতির কূলে কল্লোল তুলে ডাক দেয়, তাকে। ক্রমশ প্রৌঢ়ি পর্বের কাব্যে নৌকা প্রসঙ্গ এসেছে জীবন থেকে জীবনান্তরে উত্তরণের বাসনায়।

॥ সাত ॥

পরিশেষ কাব্যে জন্মদিন উপলক্ষে রচিত তিনটি কবিতা আছে, জন্মদিন (রবি প্রদক্ষিণ পথে জন্মদিবসের আবর্তন), মুক্তি (শুধায়োনা মুক্তি কোথা) এবং অপূর্ণ। প্রথম দুটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিন স্মরণে লিখিত। দুটি কবিতার ভিতর দিয়ে পুনরায় রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ ব্যাকুল কবিধর্মের চিরন্তন সহজাত আগ্রহ অভ্যস্ত রূপকে অভিব্যক্ত হয়েছে। সূর্য এবং নদী আদি ভূমণ্ডলের এই দুই আদিতম সদস্যই রবীন্দ্রনাথের কবিআত্মার নিকটতম প্রতিবেশী। পান্থ কবিতায় কবি বলেছেন :

আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই,
আমি কবি, আছি
ধরনীর অতি কাছাকাছি
এ পারের খেয়ার ঘাটায়।
সম্মুখে প্রাণের নদী জোয়ার ভাঁটায়
নিত্য বহে নিয়ে ছায়া আলো,
মন্দ ভালো
ভুলে যাওয়া কত রাশি রাশি

লাভ ক্ষতি কান্না হাসি,—
এক তীর গড়ি তোলে অন্য তীর ভাঙিয়া ভাঙিয়া,
সেই প্রবাহের পরে ঊষা ওঠে রাঙিয়া রাঙিয়া,
* * *
এ বিশ্বপ্রবাহে
সে ছন্দ বন্ধন মোর মুক্তি মোর তাহে।

অবিস্মর্তব্য কবিতা; যে নদী মাতৃকা চেতনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস গভীরভাবে মিশ্রিত, তার পূর্ণালেখ্য এই কবিতায় বিধৃত হয়েছে। পক্ষান্তরে পুনশ্চের কোপাই কবিতায় কোপাইকে গদ্য ছন্দের প্রতীকরূপে নির্বাচিত করা অনেকটা প্রয়োজনবশত এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ। বীথিকায় জীবনের স্মৃতি-সঞ্চয় করা তরী অতীতমুখী। শ্যামলীতে কবি লিখেছেন—

আমি বসে আছি···
অতীতের দিকে গড়িয়ে পড়া ঢালু তটে।

(প্রাণের রস। শ্যামলী)

পত্রপুটের পনেরো সংখ্যক কবিতায় প্রাচীন প্রেমের অনুধ্যানে দুই নারীর পরিকল্পনায় নদীপ্রসঙ্গের স্নিগ্ধ অবতারণা করেছেন।

রবীন্দ্র-কাব্যের অপরাহ্ণ লগ্নের কবিতা প্রভাতী যৌবনের বেদনায় বিষণ্ণ বিগতের বৈরাগ্যে মুহুর্মুহু মন্থরকরুণ। কী অনির্বচনীয় করুণায় শেষ বয়সের স্বল্পপ্রভাচোখে কেবলি ফুটে উঠেছে 'যত কিছু ঝাপসা হয়ে যাওয়া রূপ, কথা-হারিয়ে-যাওয়া গান।' তাকেই আবার বসিয়েছেন চিত্রকল্পের ভেলায়, ভাসিয়েছেন স্মার্ত নদীর স্রোতে, আতুর দুঃখের হাওয়া লাগিয়েছেন তার পালে, পারের খেয়ার আরোহিণীকে ডাক দিয়েছেন বরণ করার জন্য। শ্যামলীর বিদায় বরণ কবিতা এই সূত্রে দ্রষ্টব্য।

সেঁজুতির কোনো কোনো কবিতায় অভ্যস্ত পুরাতনের ব্যবহার আছে। কিন্তু সেইগুলির চেয়ে উল্লেখযোগ্য অসুস্থ অবস্থার অনুভূতির চিত্রকল্প। প্রান্তিক রোগশয্যায় উভয় গ্রন্থেই ব্যাধিশায়িত অনুভূতির অবচেতনায় কবি নদী প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ করেছেন, কিন্তু এই নদী অন্তঃসলিলা, ঘনকৃষ্ণ, তরণীহীন। প্রান্তিকে একে বলা হয়েছে কালিন্দী। জন্মদিনে কাব্যে শেষ নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদীতলে দাঁড়িয়েও নদীর প্রতি তাঁর শেষকৃত্য পালন করেছেন:

নদীর পালিত এই জীবন আমার
নানা গিরি শিখরের দান
নাড়িতে নাড়িতে তার বহে
নানা পলি মাটি দিয়ে ক্ষেত্র তার হয়েছে রচিত।
প্রাণের রহস্য রস নানা দিক হতে
শস্যে শস্যে লভিল সঞ্চার। (২৮নং। জন্মদিনে)

তারপর বিগতচৈতন্য অনুভূতির অর্ধস্খলিত অন্তিম সংলাপেও মর্তের প্রবাহধারার প্রতি কবির সমাপ্তি নৈবেদ্য ঃ

রূপনারাণের কূলে জেগে উঠিলাম
দেখিলাম এ জগৎ
মিথ্যা নয়।

কিন্তু নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের নির্ঝর কি শেষপর্যন্ত মহাসাগরে মিলিত হতে পেরেছিল? অভিজ্ঞতার নদী সান্দ্র উপলব্ধির অনন্ত অসীমে?

রবীন্দ্রনাথের জাতি-চেতনা

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

১৮৭৬ সাল।...পনেরো বছরের বালককবি রবি 'হিন্দুমেলা'র দশম-বার্ষিক উৎসবে এক জ্বালাময়ী কবিতা পাঠ করেছিলেন। সে কবিতা তাঁর নাম দিয়ে ছাপানো হলে ইংরাজ সরকারের হাত থেকে রেহাই পাওয়া হত দুষ্কর। ছাপা অবশ্য হয়েছিল, তবে সে দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "স্বপ্নময়ী" নাটকের এক বীরের মুখে লাগিয়ে। তখন কবির কিশোর-পর্ব। অনুকরণ অনুসরণের স্তর তখনও কাটিয়ে ওঠেন নি। আজন্ম প্রতিভার অমূল্য পুঁজি তার ওপর জ্যেষ্ঠদের উৎসাহে প্রশ্রয়ে অবারিত অবিরত কাব্যসাধনায় ঐ স্তরেও অতি চমৎকার হয়েছিল তাঁর কবিতা।—নিতান্ত বালক বয়সেও দুরন্ত প্রেমের কবিতা অনায়াসে বেরিয়েছে। পদাবলী-সাহিত্যের চর্চা করে ব্রজবুলী ভাষায় "ভানু সিংহের পদাবলী" যা লিখলেন তার কাব্যমর্যাদা কোনদিন অস্বীকার করার নয়। তখন হিন্দুমেলার উৎসবে দেশের স্বাজাত্য-স্ফূরণ চলছে আর গোপনে চলছে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি—"সঞ্জীবনী সভা"—জ্যোতিদাদা যার একজন পাণ্ডা। কবি লিখেছেন—"আমার মতো অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। অহরহ ঐ খ্যাপামীর তপ্ত হাওয়ার মধ্যে থেকে বালক কবির কয়েকটি স্বদেশী গান বেরিয়েছিল। কবিমানস কিন্তু তখনও ঊর্ণাজালে আবদ্ধ। জ্যোতিদাদার স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু (১৮৮৬) পর্যন্ত যেন কবির প্রতিভা স্বাবলম্বী হয় নি।

তারপরে "মানসী"। এতে ছিল কয়েকটি দেশপ্রেমের কবিতাও। তার মধ্যে "দুরন্ত আশা" সর্বোৎকৃষ্ট বলা যায়। তবুও এটি স্থান পায় নি কবির উত্তরকালে সঞ্চয়ন করা "সঞ্চয়িতায়"। কারণ এ-সব কবিতার মূল্য কবির কাছে স্বীকৃতি পায় নি। কিন্তু মানসীর কতকগুলি কবিতায় যে "আমির" বৃহত্তরতায় বিশ্বজনীনতায় প্রকাশিত হবার উপক্রম দেখা গেছে—ক্রমশ তা পূর্ণ পরিণতির দিকে এসে স্বজাতি চিন্তাকেও অপরূপ কাব্যমর্যাদা দিয়েছে। যেমন "চিত্রার" "এবার ফিরাও মোরে"। নিজেকে কবি তিরস্কার করেছেন—

"সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শতকর্মে রত
তুই শুধু ছিন্ন-বাধা পলাতক বালকের মতো···
···সারাদিন বাজাইলি বাঁশি ? ওরে তুই ওঠ্ আজি
আগুন লেগেছে কোথা ?...ইত্যাদি।

তারপরে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়েছেন—"নতশির, মূক, শতাব্দীর বেদনাহত ম্লানমুখ" হতভাগ্যদের দিকে, যারা

"নাহি ভৎ'সে অদৃষ্টেরে নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মনেবেরে নাহি দেয় দোষ। নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্ট-ক্লিষ্ট-প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া।..."

কবি নিজেকে সচেতন করেছেন—

"···এই সব মূঢ়-ম্লান মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত-শুষ্ক-ভগ্ন-বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে,
"মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে ;
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে,"

কবিকে "এ দৈন্য মাঝারে একবার স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি" নিয়ে আনতে হবে —এদের যে—

"বড়ো দুঃখ বড়ো ব্যাথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই প্রাণ চাই, আলো চাই চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস বিস্তৃত বক্ষঃপট।"

এই হতভাগ্যরা কারা?—কবির স্বজাতিই তারা। এই কবিতাটি লেখার আগে ১৮৯২ সালের সংশোধিত ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্টের জন্য দেশব্যাপী অসন্তোষ প্রধূমিত হয়েছিল। কবির কবিত্বের নৌকার পালেও সে দমকা হাওয়া লেগেছিল। বঙ্কিমের সভাপতিত্বে তিনি পড়লেন এক প্রবন্ধ "ইংরেজ ও ভারতবাসী"। আরও লিখলেন প্রবন্ধ "ইংরেজের আতঙ্ক" "সুবিচারের অধিকার" "রাজা ও প্রজা" "রাজনীতির দ্বিধা" প্রভৃতি। এই সব

প্রবন্ধে আর গানে কবি প্রকাশ করলেন তাঁর স্বজাতি-প্রীতি। কিন্তু কবিতায় এসে পড়ে তাঁর সেই ছোট "আমির" উপরে বড় "আমি" যিনি জগতের মাঝে "বিচিত্ররূপিনী" অথচ "অন্তরমাঝে অন্তরব্যাপিনী" যিনি কবির "জীবনদেবতা" আবার বিশ্বদেবতাও। তাই স্বাজাতিকে যখন কবি বাণী শোনাতে গিয়ে বললেন—

"বলো মিথ্যা আপনার সুখ, মিথ্যা আপনার দুঃখ।
স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
মহা-বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে না করি শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজল-ধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি—তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে, জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি।"

তিনি কে? তিনিই মানুষের জীবন দেবতা, তিনিই বিশ্বদেবতা।

কবির ভাবসাধনা, যা তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া —তাতে এই বিশ্বদেবতা সর্বময় হয়ে আছে। এই ভাবসাধনার idealism-এর উপর স্বজাতির দুর্দশার বাস্তব আঘাত এসে যখন পড়েছে, কবির অতি তীক্ষ্ণ অনুভূতিপ্রবণ মন তখন সাময়িকভাবে বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছে।

যখন "সিডিশান বিল" বেরিয়ে এল, কবি প্রবন্ধ লিখলেন "কণ্ঠরোধ"। "বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন" যখন প্রবলভাবে দেশে ছড়িয়ে পড়ল। কবি আগ্রহের সঙ্গে নামলেন স্বজাতির দুঃখ-বেদনায়-ক্লিষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে, সমস্যার সমাধানে। কবির সমাধানের নির্দেশ একেবারে মূল ধরে। তিনি চাইলেন পল্লী উন্নয়নে স্বদেশ সেবা, তিনি চাইলেন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে সমাজের দৃঢ়তা। তিনি চাইলেন শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে জাতির বুনিয়াদ শক্ত করতে।

কিন্তু নির্মম আঘাত পেল তাঁর অতিশয় স্পর্শকাতর মন। যে মন বিদেশীর আঘাতে স্বজাতির জন্য সংক্ষুব্ধ হয়, সেই মনই আবার গুটিয়ে নেয় নিজেকে আপন কবিত্বের নীড়ে, যখন স্বজাতীয় রাষ্ট্রদলপতিরা কঠোর বিরূপ

সমালোচনায় বিদ্রূপের অগ্নিবানে তাঁকে আহত করে, কবিকল্পনা বলে তাঁর সুচিন্তিত অভিমতকে অমর্যাদা দিয়ে ক্ষুণ্ণ করে।

কবির কবিত্বই সর্বস্ব। তিনি কবিত্বতন্ময় হয়ে আপনহারা হয়ে লিখে চলেন, জমিদারী পরিদর্শনে গিয়ে লিখে চলেছেন নৌকায় বসে, পাল্কীতে চড়ে। চরমপন্থীরা তাঁকে নরমপন্থী বলে উগ্রভাবে অভিযুক্ত করল আর নরম-পন্থীরাও তাঁকে অশোভনভাবে অগ্রাহ্য করল। কবি বললেন অভিমানে—

"বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই,
কাজের পথে আমি তো আর নাই।" (খেয়া)

কবির জাতিপ্রেমমূলক গান কিন্তু দেশপ্রেমিকদের কণ্ঠে কণ্ঠে। ইতিপূর্বে কবি লিখেছেন ভারতের মহান্ ঐতিহ্য গৌরব কথা উপনিষদের বাণীর প্রশস্তি। প্রাচীন ভারতের এই অধ্যাত্মসম্পদ জাগিয়ে তুলল কবিমনে বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভাব। অগ্নিযুগের বীরদের তিনি তিরস্কার করেন নি কিন্তু "পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধে দিলেন পথনির্দেশ। এই সময়ে এক অপরূপ ভাবনা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কবিচেতনায়। "প্রায়শ্চিত্ত" কবির "বৌঠাকুরানীর হাট" উপন্যাসের নাট্যরূপায়ণ। তাতে নূতন সৃষ্টি হল ধনঞ্জয় বৈরাগী। উত্তরকালের মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহ যেন তাঁর বাক্যে আচরণে একটা পূর্বতন সংস্করণরূপে দেখা গেল। সে হল ১৯০৮ সালে। ১৯১২ সালে মিঃ গান্ধী আফ্রিকায় ডারবানে ভারতীয়দের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে এই অহিংস সত্যাগ্রহ চালালেন।

জাতীয়তাবাদী স্বদেশীদের কলকোলাহল ইতিমধ্যে জাতীয়তার প্রতি একটা প্রবল বিরাগ তার মনে সৃষ্টি করেছিল। সংকীর্ণ স্বাজাত্যবোধ আমাদের দেশে প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে একথা তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন। ১৯১৬ সালে জাপানে গিয়ে তাদের উৎকট জাতীয়তার অত্যাচারে চীনের লাঞ্ছনার সীমা নেই একথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে তিনি জাপানীদের কাছে অপ্রিয় হলেন। স্বজাতি বিজাতির ভাবনা গেল কেটে। তিনি লিখলেন, "দেশের গণ্ডী আমার ঘুচে গেছে, সকল দেশকেই আমার হৃদয় মধ্যে একদেশ করে তুললে তবে আমি ছুটি পাব।" তখন কবিজীবনের মধ্যদিন।

সেদিন থেকে কবি আন্তর্জাতিবাদের ভাবধারায় অবগাহন করেছেন। তাঁর কাব্য-সাধনায় জাতি-চেতনা হল দ্বিবিধ। তবু শেষার্ধে কবি

যখন ভারতের বা বাংলা দেশের গৌরব করে অথবা জাতিকে ডাক দিয়ে কোনও কথা বলেছেন, তখন তার কারণ দেখা যাবে, হয় ভারতের বিশ্বমৈত্রী শিক্ষামন্ত্রের ঐশ্বর্যের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা না হয়, কোনও বিদেশীর কাছে এই মহান্ আত্মিক সম্পদের অবমাননা বা অন্য কোনও লাঞ্ছনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লাগার সঙ্গে সঙ্গে অকারণে এদেশের বহু ব্যক্তিকে অন্যায় ভাবে অন্তরীণ করল, অ্যানি বেসাণ্টকে রুদ্ধ করে রাখল মদমত্ত ইংরাজ সরকার। তিনি লিখলেন প্রবন্ধ "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম"। জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর ইংরাজ রাজপ্রতিনিধির কাছে "স্যার" উপাধি ফিরিয়ে দিলেন। স্বদেশানুরাগী বলে পরিচিত হলেন এবং ইংরেজরা সর্বত্র হল তাঁর উপর বিরক্ত। কিন্তু স্বজাতির চারণ-কবি হওয়ার আকর্ষণ তিনি আর কখনও বোধ করেন নি। জীবনের অস্ত-গোধূলিতেও দর্পিতা মিস রাথবোনের ধৃষ্ট প্রবন্ধের সমুচিত প্রতিবাদ জানালেন রোগশয্যা থেকে। মানুষের অপমানে, অধ্যাত্ম-সম্পদের দেশ ভারতের অপমানে তিনি ক্ষুব্ধ। এ ভারত যে বিভেদ ভোলাবার সাধনা শেখায়।—"একের ডাক" শোনাবার জন্য যে "ভারততীর্থে" মহামানবের সাগরতীরে তিনি সবাইকে আহ্বান করেছেন। Religion of Man হল তাঁর হিবার্ট বক্তৃতা ইংলণ্ডে। আজও দেশে দেশে শান্তিকামীর কাছে তার সমাদর। মুসোলিনীর ইতালী এবং হিটলারের জার্মাণী তাঁর আন্তর্জাতিবাদ বা বিশ্বমানবতাবাদের ভয়ে ছিল শঙ্কিত।

রবীন্দ্রনাথের স্বাজাত্যবোধ যে ক্রমে ক্রমে বিশ্বজাতিত্বে পরিণতি লাভ করেছে—শুধু বাহ্য হেতু দ্বারা তা সম্ভব নয়। দেশ যদি তাঁর স্বদেশানুরাগকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করত। যদি স্বীকার করে নিত তাঁর সমস্যা সমাধান তবু মন তাঁর ঝুঁকতই অনিবার্যভাবে ঐ বিশ্বমানবতার দিকে। এই প্রবণতা তাঁর সমগ্র জীবনধারায় ধীরে ধীরে রূপ গ্রহণ করেছে। "মানুষের ধর্মে" পাই তার পরিচয়। পত্রধারায় লিখলেন—"স্বাজাত্যের খুঁটি গাড়ি করে নিখিল মানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা হয়ে উঠল না, অমরতা তাঁরই মধ্যে যে মানব সর্বলোকে।" (প্রবাসী ১৩৩৮)

কবির সাহিত্যে দেখা যায় আরম্ভ স্বজাতিচেতনায় ক্রমে ক্রমে তার পরিণাম বিশ্বজাতিচেতনায়, তেমনই তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার সময়ে ছিল জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্রহ্মচর্যাশ্রম, কিন্তু পরে তা হল— "যস্যাং বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্" ॥

দুটি সমালোচনা

বিজিত দত্ত

[Calcutta Reviewতে 'Vernacular Literature' নামে পুস্তক সমালোচনার একটি বিভাগ থাকত। সেই বিভাগে তখনকার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহের সমালোচনা দেওয়া হত। এইসব সমালোচনা ছিল নির্ভীক, নিরপেক্ষ এবং সাহিত্যগুণ-সম্পন্ন। কোন বই-এর একতরফা প্রশংসা কিংবা নিন্দা এইসব সমালোচনায় থাকত না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির আলোচনা দেখলেই তা বোঝা যাবে। রবীন্দ্রনাথের বইগুলির সমালোচক কে তা জানা গেল না। কিন্তু এই সমালোচনাগুলি যে শিক্ষিত বাঙ্গালীকে রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে আগ্রহসম্পন্ন করেছিল সে বিষয়ে কিছু পরোক্ষ প্রমাণ আছে। রূপান্তরে সে বিষয়ে কিছু বলবার ইচ্ছে রইল।

Chhabi O Gana. By Rabindranath Tagore. Printed and Published by Kalidas Chakrabarti at the Adi Brahmo Samaj Press, 1805 Saka.

Babu Rabindranath's poetry is gaining rapidly and remarkably in sweetness, solidity, and strength. The poetry hitherto written by him was undoubtedly excellent of its kind. But it was the poetry of a soul which loved to contemplate qualities apart from the objects to which the qualities belonged, or rather to bring qualities to the front, keeping their possessor concealed in the far background where other

eyes than the poet's went not. That poetry was therefore rather baseless and unsubstantial. One who read it could feel its force, fire and energy, but was seldom moved by it as the human heart ought to be moved by poetry. But the poems they are the poems before us are of a very different order indeed. Reason of earthly things, of things with which men are familiar, of things which they know and can sympathise with. And all these are described in a realistic style, but with a sufficient mixture of idealism to raise the sketches above the low category of merely descriptive poetry. Babu Rabindra nath has of a certainty descended on the earth from the almost invisible region where he had been hitherto striking notes upon his lyre which called forth no real response in the hearts of his fellow-men. The poetry he has now written may live; the poetry he had heretofore written, although good, will soon die.

With this important change in the general character of Babu Rabindranath's poetry, some of his old characteristics have disappeared, and some new characteristics have been developed. The almost savagely fierce and vehement tone of his old poems is gone, and its place has been supplied by the tender eloquence and the simple earnestness of a heart that loves the earth as an earthly thing, and delights to dwell in it.

Babu Rabindranath has always displayed sympathy with external nature. But with the realistic turn of mind evinced in his new poems, that sympathy has also assumed a new and deeper form. Nature is no longer treated as a cold but beautiful abstraction, but as a sentiant Being, with a heart that beats in sympathy with the pulsations of the heart of

the poet. This development has, of course, a profound effect upon the spirit of these poems.

The following extract from the piece entitled অভিমানিনী will illustrate all that we have said regarding Rabindranath's new poetry :—

এলোথেলো চুলগুলি ছড়িয়ে……
মুখের পানে চেয়ে রয়েছে।

Babu Rabindranath's new poetry possesses several other characteristies of much interest and importance. But the limited space at our disposal prevents us from discussing these on this occassion. We cannot, however, close this brief notice without observing that we have not come across anything at all infelicitous in this volume of poems consisting of 104 duodecime pages, except the following verses in the piece entiltled আর্তস্বর :—

জলন্ত বিদ্যুৎ অহি
ক্ষণে ক্ষণে রহি রহি……

The simile appears rather unfortunate, because the very name of Kumbhakarna gives rise to ludicrous ideas in at least the Bengali mind.

The Calcutta Review, No C L VII 1884, Volume LXXIX.

Sandhya Sangit by Rabindra Nath Tagore.

Printed & Published at the Adi Brahma Samaj Press, Calcutta 1289 B. S.

We lately reviewed two Bengali books entitled Rudra-chanda and Yurop-jatrir-Patra. Both of them were written by Babu Rabindra Nath Tagore, and of both, we are glad to say, we have been able to speak in terms of praise. The work

now before us is also written by Babu Rabindra Nath and seems to be very much better than his two last productions. Sandhya Sangit is a collection of love poems, giving expression to certain deep but exceedingly tender sentiments of a lover, or of a loving mind. A tone of sorrow, melancholy, or disappointment, arising from unfulfilled hope, unanswered self-dedication, or unsatisfied desire, pervades most of the pieces. In the opening piece the author describes the strain in which he propo es to sing in a passage which is no characteristic of him, and contains such true and exquisite poetry, that we cannot resist the temptation to reproduce a portion of it in this place. Addressing his muse he says :

এসো তুমি ঊষার মতন
কবিতা রে বধূটি আমার।

It is impossible to praise too highly the wealth of imagery the fine peay of fancy, the sweet and tender sympathy with external nature, the warmly spiritualistic conception of the world of matter, displayed by the author in these lines. And these qualities, we repeat, are characteristic of all the poems contained in this work. In all these poems, the poet appears to us truly and warmly inspired, lost in the waves of the feelings which he has created for himself, speaking the language of the heart, sometimes with inexpressible softness, sometimes with appalling vehemence of a soul which has been stirred to its depths. In the fulness of his heart, the author forgets conventionalism, and expresses himself in a spirit which cares little for artificical barriers, and in words which either breathe the very soul of tenderness, or appear savagely naked on account of their intense and glowing fierceness. Of the former, take the following as a specimen :

করুণার উপাসক আমি ... ...
আঁখি দুটি ভাসে অনিবার ।
* * *
জগতের বাতাস করুণা ... ...
জগতের সৃষ্টি বারিধারা
* * *
কাননের ছায়া সে করুণা, ...
করুণা যে প্রেমিকের মা ।

And of the latter, the following :

প্রাণের যেথায় ... ...
গড়িস্ খেলনা নানারূপে (?) ।

All these are the characteristics of a true poet, where office, in the department of lyric song, is to open the fountain springs of the human heart, and let them play according to their own true nature. Babu Rabindra Nath is a true lyric poet—one of the best living lyric poets of Bengal.

Of the moral aspect of Rabindra Nath's poetry, we have neither time nor space to speak on this occasion.

The Calcutta Review. No. CLI. Volume LXXVI. 1883.

রবীন্দ্রনাথ, অপরাজেয় পথিকৃৎ

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

[কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বর্তমান নিবন্ধটি তাঁর ইংরেজি প্রবন্ধের অনুবাদ। মূল ইংরেজি প্রবন্ধটি ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার পুস্তক সমালোচনা বিভাগে রবীন্দ্ররচনাবলীর ১ম খণ্ডের সমালোচনা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল বিগত ১৯৩৯ সালের ১৫ই অক্টোবর সংখ্যায়। ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন সমালোচক হিসাবে যথারীতি তাঁর স্বাক্ষর ছিল না। গত ৮ই মে ১৯৬১ তারিখে সংখ্যায় ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা কবির এই লেখাটি পুনর্মুদ্রিত করেছেন, লেখাটি যে সুধীন্দ্রনাথের সেই ঘোষণাটি করে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মন্তব্য করেছেন—As a great Bengali poet's tribute to the greatest, this article is of enduring valu—আরও একটি কারণে লেখাটির মূল্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে এই সমালোচনা লিখিত, এবং কবিগুরু নিশ্চয়ই প্রবন্ধটি পড়ে থাকবেন। পড়ার পরে তিনি কোন মন্তব্য করে থাকলেও তা আমদের জানার বাইরে।

এখানে উল্লেখযোগ্য ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম সুবিন্যস্ত রবীন্দ্ররচনাবলী খণ্ডশ বেরোয়। এবং বারো খণ্ডে বেরুবে স্থির হয়েছিল। এখানে প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন : আনন্দ দে। —সম্পাদক]

বর্তমান খণ্ডটি রবীন্দ্রনাথের স্ব সংস্থা শান্তিনিকেতনের উদ্যোগে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলীর স্মরণীয়, প্রামাণিক ও সম্পূর্ণ সংস্করণের প্রথম খণ্ড। মনোরম কাগজ ও সুদৃশ্য ফর্মায় মুদ্রিত এই খণ্ডগুলি প্রকাশনার প্রশংসনীয় উদাহরণ ; এগুলি অবিশ্বাস্য রকমের স্বল্পমূল্যেই বিক্রেয়, যদিও অধিক মূল্য-পরায়ণ সংস্করণও লভ্য।

সম্পূর্ণ প্রকাশিত হলে রচনাবলীর খণ্ডগুলি কাব্যরসিক, বাংলা ভাষাপ্রেমিক

বা বাঙ্গালী-মনন ও প্রকাশের সমুন্নতির ইতিহাস অন্বেষী ছাত্রের পক্ষে হবে অপরিহার্য।

যে হেতু রচনাবলী কালানুক্রমিক পর্যায়ে প্রকাশিত, তাই বর্তমান খণ্ডটিতে (কবির) শৈশবকালীন রচনার স্থান হয়েছে। বক্তব্য এই নয় যে, এই প্রাথমিক খণ্ডটিতে পুনর্মুদ্রণ অযোগ্য রচনা রয়েছে, যদিও রচয়িতার নিজেরই আপাতমত তাই; তিনি শেষ পর্যন্ত সম্মত হয়েছেন, তাঁর আরও বহু অল্পবয়সের প্রভূত ছেলেমানুষী লেখাগুলি তাঁর প্রামাণিক খণ্ডগুলিতে স্থান না পেয়ে শেষে কোন এক সংযোজনী খণ্ডে বিধৃত হবে। যাহোক, বাংলা-সাহিত্যের তথা বাঙ্গালী সংস্কৃতির কোন মনোযোগী ছাত্রের পক্ষে এই পুস্তক সংগ্রহ অনতিক্রম্য কর্তব্য। এবং ইতিহাসবোধসম্পন্ন প্রতিটি ব্যক্তির পক্ষে অনতিবিলম্বে স্বীকার্য যে, উত্তরকালের লেখকদের নিকট এই পুস্তক পথিকৃৎ হিসাবে বিবেচিত না হলে বাঙ্গলা কাব্য ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত নির্দেশিত মান ও বাঙ্গলা গদ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত শৈলীতেই গুহায়িত হতো।

নিঃসন্দেহে তাঁরা উল্লেখযোগ্য লেখক ছিলেন, এবং এমনকি একজন আধুনিকতা-পন্থী সমালোচকও যুক্তিনির্ভর সূত্রগুলির প্রতি অবিচার না করে তাঁদের সৃষ্টিকর্মকে নিছক সাহিত্যিক কৌতূহল হিসাবে গণ্য করতে পারেন না। তাঁদের নিকট থেকে বুদ্ধিজাত ও নিরুপাধিক সন্তোষই লভ্য; তাঁদের গুণ অব্যক্তিমুখীন ক্লাসিক্যাল; এবং তাঁদের মহত্তম প্রচেষ্টায় প্রদত্ত রচনাশৈলীয় প্রাচীন বাঙ্গলা গৌরব ও বর্ণনার বস্তুমুখীনতা আমাদের সমাজ থেকে এমনভাবে অবলুপ্ত যে আমরা সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত যতোটা একাত্মতা বোধ করি তার চেয়ে কম বোধ করি ঐসব মধ্য-উনিশ-শতকী লেখকদের সংগে। তাঁরা ছিলেন সেই জীবনের প্রবক্তা যে জীবন আমাদের মধ্যে বহিরঙ্গীয়ভাবে এখনও উপস্থিত।

ভাষান্তরে, তাঁদের অবদান চরিত্রেরই ফল ব্যক্তিত্বের চেয়ে বরং, এবং তাঁরা পরের মুখে স্বাদ গ্রহণে নিবিষ্ট, ফলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অবিনশ্বর ঐতিহ্যের বশ্যতায় স্থিত। এই কারণেও আমাদের পূর্বসূরীদের সম্পর্কে অশ্রদ্ধাশীলতা পোষণ ভ্রমাত্মক। তাঁদের সীমাবদ্ধ আবেদনশীলতার বিরুদ্ধে আমাদের কটূক্তি সত্ত্বেও অনস্বীকার্য যে, সামাজিক রীতি-রেওয়াজে অ-সীমিত মধুসূদনের উদ্দাম প্রতিভা শৃংখলাবদ্ধ হয়েও কদাচ স্থায়ী কাব্য সৃষ্টিতে সমর্থ হতো।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই প্রথম প্রাচীন সংস্কারে যন্ত্রণাহত হন; তাই কবির

আপন বন্ধুজন ব্যতীত তিনিই যে প্রথম যুবক রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করবেন নূতন আত্মনিষ্ঠতার উদ্গাতা হিসাবে এটা খুবই স্বাভাবিক ; এই আত্মনিষ্ঠতা বাংলা সাহিত্যের নিঃসংগতা ভেঙে তাকে প্রাচ্য ভাষায় লিখিত প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রশাখায় পরিবর্তিত করেছে। কারণ, ইতিমধ্যেই বাইশ বছর বয়েস রবীন্দ্রনাথ কয়েকখানি কবিতা পুস্তক প্রকাশ করেছেন, যেগুলি অবশ্য আঙ্গিকের দিক থেকে অনুল্লেখ্য, কিন্তু বিষয়ে উল্লেখ-যোগ্যভাবে অননুকৃত, এবং আর সব কিছু বাদ দিলেও, অতীব গতানুগতিক বিষয়েও তিনি তাঁর আপন অভিজ্ঞতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন।

সম্ভবত এই আত্মনির্ভরতা—যে আত্মনির্ভরতা তদানীন্তন কালে প্রতীচ্যে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানে পরিপুষ্ট -- তাঁর রচনাশৈলীকে দুর্বল করেছিল, এবং তাঁর ছন্দকে কখনও কর্কশ করেছিল ; এবং তাঁর বালক-বয়সে তিনি যখন পুরোনো আদর্শ অনুকরণে রত তখন তিনি তাঁর অব্যবহিত পূর্ববর্তী লেখকদের কিংবা কোন তৎকালস্বীকৃত লেখকদের দ্বারস্থ হন নি, তিনি অনুবর্তন করেছিলেন মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির, যিনি তাঁর কালে প্রচলিত সংস্কার ভেঙেছিলেন অভিব্যক্তির নূতনতর মাধ্যম সৃষ্টির জন্য, যে মাধ্যম তাঁর সকল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বাঙ্ময় রূপ দেবে। এতদ্ব্যতীত, বিদ্যাপতি ছিলেন ধর্মানুসারী ; এবং যেহেতু বৈষ্ণবরা সর্বদা ব্যক্তির মূল্য অনুধাবন করেছিল, তাই সকল হিন্দুর মধ্যে তারাই ছিল রবীন্দ্রনাথের চিরস্থায়ী আকর্ষণ।

অন্যদের সম্পর্কে বক্তব্য, তাঁরা জাতিভেদের প্রতাপে খানিকটা গোষ্ঠী মনোভাবাপন্ন হয়েছেন ; রবীন্দ্রনাথের পরিবারের জাগতিক ঐশ্বর্যে ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছেন ; তাঁরা ঠাকুরপরিবারকে সামাজিকভাবে একঘরে করেছিলেন, অজুহাত ছিল, ঠাকুরপরিবারের সমৃদ্ধি ইস্‌লামধর্মানুসারীদের সহিত অপবিত্র যোগাযোগের ফলশ্রুতি। এবং যদিও রবীন্দ্রনাথের জন্মকালীন সময়ে তাঁর সত্যিই বিশিষ্ট পূর্বপুরুষদের একটি শাখা এই সমাজচ্যুতির কঠোরতাকে অনেকটা সহজ করে এনেছিলেন, তথাপি তাঁদের সংগে পান-ভোজন প্রচণ্ড অন্যায় বলেই বিবেচ্য ছিল, স্বজনবর্গের বাইরে বিবাহাদি মারাত্মক ব্যয়-বহুল ছিল, এবং তাঁদের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন বাতুলতার নিশ্চিত চিহ্ন বলে গৃহীত হতো। এই অবস্থায় এটা খুবই স্বাভাবিক একটি স্পর্শ-সচেতন বালক অবাধ্য হয়ে উঠবে, ভবিষ্যতে বিদ্রোহী যুবকে পরিণত হতে।

তাছাড়া, স্বভাব-সমৃদ্ধ তাঁর অগ্রজগণ মেকলের পর থেকে বাঙ্গালী যুবকদের উপর আরোপিত কেরানীগিরি বিদ্যায় ঘৃণাপরায়ণ ছিলেন ; এবং সাধারণ বয়স্কদের উপর যে সাধারণ বিদ্যালয়িক বিদ্যা আরোপিত তিনি সে-ঐতিহ্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা না নিয়েই জীবন সুরু করেন। তারপরে তিনি ছিলেন নিতান্ত নিঃসঙ্গ ঃ তাঁর অগ্রজেরা তাঁর চেয়ে অনেক বড় ছিলেন, তাঁদের ছিল অন্যতর জীবন ; অন্য মহিলা আত্মীয়রা ছিলেন যাঁদের সংগেই তাঁর দিন অতিবাহিত হবে বলে আশা করা যেতো, কিন্তু সেখান থেকে তিনি হীনমন্যতা অর্জন করেন এমনই যে, তিনি পালিয়ে গিয়ে বাঁচতেন তাঁর অবসর-গ্রহণকারী পিতার বহির্বাটীস্থ উদ্যানে, পুকুরে সূর্যরশ্মির খেলা দেখতে।

তাই এমনকি বালককালেই তিনি মনোজীবী হয়ে পড়তে বাধ্য হন ; এবং যে পার্থিব সাফল্য তাঁর অনেক আত্মীয়ই ভোগ করেছেন তার অভাব বয়স বৃদ্ধির সংগে সংগে তাঁকে ক্রমেই নিঃসঙ্গ করে ফেলে আর তাঁর আত্মমুখী অভিজ্ঞতাগুলিতে যেন অতিরিক্ত মূল্য আরোপে বাধ্য করেন। অনতিবিলম্বে নিজেকে নিয়ে এই বিশেষ ভাবনা তাঁর রচনাকেও প্রভাবান্বিত করতে থাকে। তিনি তাঁর পরিবার-মধ্যে ব্যবহৃত কথ্য-ভাষাকে শুধু পছন্দ করতে লাগলেন তাঁর সহকর্মীদের ব্যবহৃত সাহিত্যিক ভাষায় চেয়ে, তাই নয়, নিজের পরে তাঁর আস্থা এতোখানি হয়েছিল যে তাঁর যে কোন রচনা সংগে সংগে প্রকাশের যোগ্য মনে করায় বিপজ্জনক স্বভাবের মধ্যে গিয়ে পড়লেন তিনি। ফলে, তাঁর প্রায় সকল রচনাই সমালোচকের কাছে বিস্ময়কর রকমের জীবন্ত প্রতীয়মান হয়েছিল। এই সব সমালোচকের যাঁর প্রতিই চরম আস্থা থাকুক না কেন, যথার্থ গুণ অতিরিক্ত তদানীন্তন প্রতিটি লেখকের রচনায় সমপ্রকার বৈশিষ্ট্যে স্বভাবতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

সেই সংগে রবীন্দ্রনাথ একদল দায়িত্বশীল সমালোচককেও কুপিত করে তুলেছিলেন ; তাঁরাও সঠিকভাবেই শিউরে উঠেছিলেন গতানুগতিকতার প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধায়, আর সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁর আবেদনে ব্যক্তিগত অনুষঙ্গ ব্যবহারে যথার্থভাবেই তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁর উৎকৃষ্টতম দুর্বোধ্য হিসাবে অভিযুক্ত হয়েছিল, এবং নিকৃষ্টতম ছেলেমানুষী হিসাবে। তাঁদের প্রতি অবিচার না করেও এ-কথা স্বীকার্য, ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের অগভীর বিশ্লেষণে অভ্যস্ত তাঁদের পক্ষে হৃদয়মূর্ছনার প্রতি এই নব-সৃষ্ট আচ্ছন্নতা দৃষ্টিকটু

এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত জটিল। তাঁদের পাণ্ডিত্য প্রশংসার্হ যদিও, তাঁদের অন্ধত্ব দুঃখজনক; রবীন্দ্রনাথে দুর্বোধ্যতা তাঁর অদ্ভুত অভিব্যক্তি-প্রকরণেই নিহিত যতোটা, ততোটা নয় তাঁর অভিজ্ঞতার অস্বাভাবিকত্বে; এইটেই তাঁরা অনুধাবন করতে বাধা পেয়েছেন তাঁদের গোঁড়ামির কারণে। বস্তুত, মনস্তত্ত্বিক সূক্ষ্মতার অসীম সামর্থ্য নিয়ে গুহ্যায়িত-মন সৌন্দর্যরসিক ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ; তিনি আত্মমুখী, অবশ্য আবেগ-বাধিত নন্।

রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিগুলি সাধারণভাবে অ-বিশেষনিবদ্ধ; এবং এতোই অ-বিশেষনিবদ্ধ যে সেই অনুভূতিগুলি কেবলমাত্র তাঁর স্বদেশ-বাসিগণের নিকটই সুবোধ্য নয়, শিক্ষিত বিদেশীর নিকটও, আপন ভাষায় ও বিদেশী ভাষায়ও বটে, এবং তাই তিনি সারা শিক্ষিত জগতের সর্বত্র সমভাবে স্বীকৃত। এবং এইখানেই বাঙ্গলা দেশের কাছেই তাঁর চিরস্থায়ী অবদান: তিনি সংকীর্ণ গতানুগতিকতা ও স্থানীয় ভাবানুষংগ জড়িত একটি ভাষাকে সার্বজনীন প্রকাশ-বাহনে পরিণত করেছেন। অবশ্য, এই পরিবর্তন বিনা ত্যাগে সাধ্য নয়; পরিত্যক্ত বাক্‌বিধির সংগে তিরোহিত হলো প্রাচীন যথানুযথ বর্ণনাভঙ্গী। কিন্তু অর্থ-বোধের অনিবার্য হানির পূরণ হলো শিল্প-গুণের গভীরতায়; গদ্যে ও পদ্যের একঘেয়ে ছন্দের ইচ্ছাকৃত বিনষ্টি ভাষায় নূতনতর নমনীয়তা আন্‌লো এমন করে যে সবচেয়ে জটিল মের্জাজও তারপর থেকে ধরা পড়্‌তে লাগ্‌লো।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, যদিও সত্য, আন্তর অভিজ্ঞতার ঋজুতা রবীন্দ্রনাথকে বাধ্য করেছিল নূতনতর বাকপ্রকরণ সৃষ্টির, কিন্তু তাঁর ভাষাগত আত্যন্তিকতা শেষ হয়েছে তাঁর অনুভূতি ও পর্যবেক্ষণশক্তির পরবশ্যতায়। অর্থাৎ বয়সের অগ্রসরমানতার সংগে সংগে তাঁর রচনাশৈলী পূর্বের ঋজুতা হারিয়ে তির্যকে সান্ত; এবং তাঁর অজস্র মৌলিক অভিজ্ঞতা উত্তরকালের রচনায় নিতান্ত অনীহায় আমন্ত্রিত, দীর্ঘায়িত উপমা ও উৎপ্রেক্ষায় প্রযুক্ত হওয়ার জন্য। যাই হোক, সন্দেহ নেই তাঁর অগ্রগতির ইতিহাসে প্রাথমিক বৎসরগুলি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাঁর দীর্ঘ জীবনের চেয়ে, যে দীর্ঘজীবনভোগে তিনি ভাগ্যবান।

অবশ্য, তাঁর অভিজ্ঞতা আহরণকারী বৃত্তিগুলো তখনও বিস্ময়কর

শক্তি নিয়েই কার্যকরী। এবং এমনকি আশি বছর বয়সেও তিনি সেই পুরোনো সামর্থ্য নিয়ে নূতন সাহিত্যরীতির পরিচালনায় প্রধাবিত। প্রাগুক্ত আত্মসংকুচনকার্য সমাপ্ত করতে অনেক বছরই লেগেছিল। আর ইতিমধ্যে তাঁর পূর্বেকার উচ্ছ্বাস তাঁর সমসাময়িকদের ক্ষুব্ধ করেই চলেছে। কিন্তু এই আত্মসংকুচন সুরু হয়েছে তাঁর সংগ্রহীত রচনাবলীর প্রথম খণ্ড শেষ হওয়ার আগেই। তিনি ইংলণ্ডে তাঁর স্বল্পকালীন অবস্থান সময়ে যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন তার সংগে তাঁর দ্বিতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণের শেষে প্রকাশিত ডায়েরীর মধ্যে প্রভেদটা হলো, প্রথমটি নব নব অভিজ্ঞতায় আগ্রহী যুবকের বিদেশ-ভ্রমণের চিত্রবৎ বিবরণ, আর যদিও দশ বছর পরে লিখিত, দ্বিতীয়টি অকালপক্ক সমালোচকের আয়াস-কৃত বিচার-বিশ্লেষণ, যে সমালোচক নিজের স্বরূপ তখন জেনেছে এবং যে চটকদার বৈদেশিকদের ভুলতে আপত্তি জানায়।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কেউই জীবনের এতো বিচিত্রতার মধ্যে দিয়ে এতো আপাতস্বল্প উত্তেজনা নিয়ে চলাফেরা করতে পারে নি। এবং এমনতর নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি যদিও সূচিত করে এক মৌলিক সূচনা, যে দার্ঢ্য ক্লাসিক্যাল বাংলা সাহিত্যের নৈর্ব্যক্তিক সম্পদের মধ্যে প্রাপ্তব্য, তা-ই-ই আবার রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনাকে মন্দভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। কারণ নাট্যকার অকুণ্ঠিতভাবে তাঁর চরিত্রগুলির সংগে একাত্ম হতে বাধ্য হন; সুদক্ষ সংলাপ, জটিল ঘটনাসংস্থান ও নিখুঁত পরিমণ্ডল থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের নাটকসমূহ এক ব্যর্থ যান্ত্রিকতার চতুর্দিকে আবর্তিত।

তৎসত্ত্বেও তিনি কিন্তু বাঙ্গলাদেশে সর্বাপেক্ষা সার্থক সাহিত্যিক; এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা তাঁদের পক্ষ থেকে প্রগতির দিকে অগ্রসরের যতোটা দাবীই করুন না কেন, এমনকি অনুভূতির রাজ্যে এমন কোন পথে তাঁরা গমন করেন নি যে পথ পূর্বেই রবীন্দ্র-কর্ষিত নয়। তারপর থেকে যা ঘটেছে তা হলো তাঁর অসীম রাজ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভাজন। আর সেই খণ্ড খণ্ড অংশে আগের চেয়ে গভীরতরভাবে উৎকৃষ্ট আবাদ হয়েছে; প্রশস্যতম সাহিত্যিকরা পরিশ্রমের দ্বারা ফলন বৃদ্ধি করেছেন কেবল, নূতনতর কোন ফসল উৎপাদন করতে পারেন নি।

কিন্তু এহো বাহ্য : রবীন্দ্রনাথ অপরাজেয় পথিকৃতের চেয়েও মহত্তর ; তিনি আজকের বাংগালী সংস্কৃতির সামগ্রিক স্রষ্টাই নন্ কেবল, এখনও তার একমাত্র প্রবক্তা ও সর্বনিয়ন্তা। তিনি আমাদের যে আদর্শ দিয়েছেন সেই আদর্শ তাঁর সহজাত কিংবা তা দেশীয় আদর্শের সংগে সমুদ্রপারের আমদানী-করা আদর্শের সংমিশ্রণে তৎকর্তৃক গঠিত কিনা তা নিয়ে মাথা ব্যথা কম ; শিক্ষিত বাংগালীর ব্যবহৃত ভাষা ত তাঁরই অনন্ত ঐশ্বর্যের অংশ। আমাদের ভাষা কেমন করে গঠিত হলো, এবং ভাষার এই শ্রীবৃদ্ধি আমাদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভংগীতে কী মনোভাব এনেছে তা সবচেয়ে ভালো বোধগম্য রবীন্দ্রনাথের আপন-কীর্তির কালানুক্রমিক খতিয়ানে ; সেই কারণে তাঁর সমগ্র রচনাবলী রচনার কাল অনুসারে প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়ে বিশ্বভারতীর প্রকাশন বিভাগ আমাদের সকলকে ঋণে আবদ্ধ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত'

রথীন্দ্রনাথ রায়

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র গদ্যরচনার মধ্যে 'পঞ্চভূত' এক নজরেই চোখে পড়ে। শুধু চোখে পড়া নয়, বিনা দ্বিধায় হৃদয় অধিকার করে। অথচ 'পঞ্চভূত'-এর পর প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী বাংলা গদ্যে তিনি অকৃপণভাবে প্রসাদ বিতরণ করেছেন, রূপ ও রীতির কত দুঃসাহসিক পরীক্ষাই না করেছেন! সবুজপত্রপর্ব থেকে গদ্যের ক্ষেত্রেও কবি আর নজির মিলিয়ে চলেন নি। দ্বিধার লেশমাত্র অবকাশ সেখানে ছিল না। ঊনিশ শতকীয় বাংলা গদ্যের ক্ষীণতম পদধ্বনিও তখন বহুদূরে মিলিয়ে গিয়েছে। কিন্তু যে-কালে 'পঞ্চভূত' রচিত হয়েছে, তখনও বাংলা গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট-চিহ্নিত। 'সাধনা'র পৃষ্ঠায় 'পঞ্চভূত' বিভিন্ন নামে কয়েকবছর ধরে প্রকাশিত হয়েছিল (মাঘ ১২৯৯—কার্তিক ১৩০২)। 'পঞ্চভূত'-এর প্রথম দিকের রচনাগুলি যখন প্রকাশিত হয়, তখনও বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত। কিন্তু কোথাও বঙ্কিমচন্দ্রের বা বঙ্কিমপর্বের গদ্যরীতির কোনও ছাপ পড়ে নি। কর্মের দিক থেকেও তিনি কোনও প্রচলিত মার্গের পথিক নন। কবি সদ্য তিনের কোঠায় পা দিয়েছেন, কিন্তু বক্তব্যের গভীরতা ও আঙ্গিকের অভিনবত্ব একটি প্রৌঢ় পরিণতির পরিচয় দেয়।

'পঞ্চভূত'-এর পরিকল্পনাটি সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবি পঞ্চভূতকে যতদূর সম্ভব ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছেন। পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। কবি পঞ্চভূতের স্বরূপানুযায়ী পাঁচটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন! শ্রীযুক্ত ক্ষিতির প্রকৃতিতে ক্ষিতিসত্তার আধিক্য বিদ্যমান। তাই ক্ষিতির পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন, "শ্রীযুক্ত ক্ষিতি আমাদের সকলের মধ্যে গুরুভার। তাঁহার অধিকাংশ বিষয়েই অচল অটল ধারণা। তিনি যাহাকে প্রত্যক্ষভাবে দৃঢ় আকারের মধ্যে পান, এবং আবশ্যক হইলে কাজে লাগাইতে পারেন, তাহাকেই সত্য বলিয়া জানেন। তাহার বাহিরেও যদি সত্য থাকে, সে সত্যের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা নাই.

এবং সে সত্যের সহিত তিনি কোনো সম্পর্ক রাখিতে চান না।" ক্ষিতির বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রেখেই কবি তার মানবমূর্তি রচনা করেছেন।

এই পাঞ্চভৌতিক বৈঠকে দুজন মহিলা সদস্য আছেন : শ্রীমতী স্রোতস্বিনী (অপ্) ও শ্রীমতী দীপ্তি (তেজ)। স্রোতস্বিনীর ভাষা ললিত-তরল ও সংগীতস্পন্দী। বারি ও নারী এখানে এক হয়ে উঠেছে। স্রোতস্বিনীর প্রভাবে যুক্তিপ্রবণ ক্ষিতির অবস্থাটিও সরসভাবে বর্ণিত হয়েছে : "শ্রীমতী স্রোতস্বিনীর এই অনুনয়-প্রবাহে শ্রীযুক্ত ক্ষিতি প্রায় গলিয়া যান। কিন্তু কোনো যুক্তির দ্বারা তাঁহাকে পরাস্ত করিবার সাধ্য কী।" জলের সংস্পর্শে মাটি গলে যায়—এই সাধারণ সত্যটিকে কবি নরনারীর হৃদয়ের স্পর্শে রমণীয় করে তুলেছেন। রূপকের সূক্ষ্ম তুলির রেখায় এক মৃদু-মধুর সৌকুমার্যের সৃষ্টি হয়েছে। দীপ্তি 'নিষ্কাষিত অসিলতার মতো'; তার কণ্ঠে শাণিত সুন্দর সুর। স্রোতস্বিনীর ললিত-তরল সংবেদন এখানে অনুপস্থিত, ব্যক্তিত্বের দীপ্তি তার সংলাপে-পরিহাসে ও অগ্নিকটাক্ষে। শুধু ব্যক্তিত্বের দীপ্তিই নয়, তার সঙ্গে দাহও বিদ্যমান।

শ্রীযুক্ত সমীর (বায়ু) ক্ষিতির মতো বাস্তবনিষ্ঠ নয়, জীবনাচরণে সে অনেকখানি লঘুপন্থী, সর্বদাই চঞ্চল। কোনো কথাই সে খুব গভীর মনোযোগের সঙ্গে শোনে না—'প্রথমটা একবার হাসিয়া সমস্ত উড়াইয়া' দেয়। শ্রীযুক্ত ব্যোম গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, সব কথারই গভীরে প্রবেশ করাই তার ধর্ম। অনন্ত শূন্যমণ্ডলীর বিস্তার ও মৌন গাম্ভীর্য তার চরিত্রধর্ম। অনেক ভেবে, খানিকক্ষণ চোখ বুজে ধীরে সুস্থে ভারী মেজাজে কথা বলতেই সে অভ্যস্ত। কিন্তু ব্যোমের কথা কেউ মনোযোগ দিয়ে শোনে না। ব্যোম সম্পর্কে দুজন মহিলার মনোভাবকে খুব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে : পাছে তাহার মনে আঘাত লাগে এই আশঙ্কায় স্রোতস্বিনী যদিও তাহার কথা প্রণিধানের ভাবে শোনে, তবু মনে মনে তাহাকে 'বেচারা পাগল' বলিয়া বিশেষ দয়া করিয়া থাকে। কিন্তু দীপ্তি তাহাকে সহিতে পারে না। তাহার কথা ভালো বুঝিতে পারে না বলিয়া তাহার উপর দীপ্তির যেন একটা আন্তরিক বিদ্বেষ আছে।" কবি যদিও প্রথম রচনাটিতে (পরিচয়) কৈফিয়ৎ দিয়েছেন যে পাঁচভূতের সঙ্গে পাঁচটি মানুষকে অবিকল মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব

নয়, তবুও যেভাবে তিনি পঞ্চভূতকে মানবীয় অনুভূতিতে সমৃদ্ধ করেছেন, তার মৌলিকতা অনস্বীকার্য।

পাঞ্চভৌতিক বিজ্ঞান-সত্যকে মানব-মূর্তিরূপে প্রকাশ করা কবির অসামান্য দক্ষতার পরিচায়ক, সন্দেহ নেই। কিন্তু চরিত্রগুলি রবীন্দ্রসাহিত্যে নিতান্ত ক্ষণিক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই আবির্ভূত হয়নি, পরবর্তীকালেও কোথায়ও কোথায়ও তাদের সাক্ষাৎ মিলেছে। পাঞ্চভৌতিক বৈঠকের দুটি নারী চরিত্র পরবর্তীকালের গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে কখনো মিশ্রভাবে আবার কখনো বা অবিমিশ্রভাবে উপস্থিত হয়েছে। মৃদুভাষিণী ও প্রিয়বাদিনী স্রোতস্বিনী প্রথম যুগের উপন্যাসে ও গল্পগুচ্ছের প্রথম যুগের গল্পে একাধিকবার উপস্থিত হয়েছে, শেষ যুগের অনেকগুলি নায়িকা চরিত্রের মধ্যে বিদ্যুৎ জ্বালাময়ী দীপ্তির তীব্র আত্মপ্রকাশ লক্ষণীয়। 'মহুয়া' কাব্যে কবি স্রোতস্বিনী-নারীর বর্ণনা করেছেন ঃ

কলছন্দে পূর্ণ তার প্রাণ—
নিত্য বহমান
ভাষার কল্লোলে—
জাগাইয়া তোলে—
চারিধারে
প্রত্যহের জড়তারে ;
সংগীতে তরঙ্গ তুলি—
হাসিতে ফেলিল তার ছোটো দিনগুলি।

আর দীপ্তিরূপিনী নারী সম্পর্কে কবি বলেছেন ঃ

ব্যঙ্গ-সুনিপুণা,
শ্লেষবাণ-সন্ধান-দারুণা।
অনুগ্রহ বর্ষণের মাঝে—
বিদ্রূপ বিদ্যুৎঘাতে অকস্মাৎ মর্মে এসে বাজে।

'পঞ্চভূত'-এর দুই নারী রবীন্দ্র-সাহিত্যে নানারূপে ধরা দিয়েছে।

॥ ২ ॥

'পঞ্চভূত'কে সাহিত্যের কোন বিভাগের পর্যায়ভুক্ত করা সঙ্গত, এ প্রশ্ন জাগা নিতান্ত স্বাভাবিক। কারণ এই গ্রন্থটি এমন একটি গদ্যরচনার সঙ্কলন, যার জ্ঞাতিগোত্র নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ। 'পঞ্চভূত'-এর রচনাবলীর বিষয়বস্তু নিয়ে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ রচনা করা সম্ভব। রচনাগুলির কোনো

কোনো অংশ প্রবন্ধ লক্ষণাক্রান্ত। তবু 'পঞ্চভূত'কে প্রবন্ধ সংকলন বলা যায় না। কবি সচেতনভাবেই এখানে প্রবন্ধের বন্ধন থেকে মুক্তির পথ আবিষ্কার করেছেন। 'পঞ্চভূত'-এর গদ্যরচনায় একটি প্রসঙ্গের পল্লবিত বিন্যাস আছে, কিন্তু বক্তব্য সম্প্রসারণের রীতি প্রাবন্ধিকের নয়। 'পঞ্চভূত' ও ভূতনাথবাবুর সংলাপের লঘুগুরু প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে বক্তব্য বিন্যস্ত হয়েছে। সাধারণ প্রবন্ধের রীতি ও বন্ধনকে তিনি গ্রহণ করেন নি। ছটি চরিত্রের আলাপ আলোচনা, সরস মন্তব্য, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে লঘুগতিতে ছুটে চলা, তর্ক বিতর্ক, পরিহাস রসিকতা প্রভৃতি রচনাগুলির মধ্যে ব্যবধান দুস্তর। প্রচলিত প্রবন্ধে প্রবন্ধকারই একমাত্র বক্তা, সবটুকু বলার দায়িত্বও তার। পাঞ্চভৌতিক বৈঠকের সদস্য ছ'জন, কোনো বক্তব্যের দায়িত্ব ছ'জনই বহন করে। সম্ভবত কবি প্রচলিত প্রবন্ধের বন্ধন শিথিল করে বক্তব্যকে আরো চিত্তহারী করে তোলার জন্যই নূতন রীতির উদ্ভাবন করেছেন।

'পঞ্চভূত'-এর রচনাগুলির সঙ্গে কেউ কেউ ছোট গল্পের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। এখানকার অধিকাংশ রচনার মধ্যে ছোট গল্পের আস্বাদন পাওয়া যায়, কিন্তু কুলগত লক্ষণের দিক থেকে যে এরা মোটেই ছোট গল্প নয়, এ কথা প্রমাণ করতে খুব বেশি প্রমাণ-প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। পঞ্চভূতের কোনো রচনাতেই সুবলয়িত প্লট বা একটি গল্পাংশ নেই, অনেক ক্ষেত্রে 'গল্পের মতো' মনে হলেও ঠিক গল্প নয়। যে চরিত্রগুলি এখানে উপস্থিত হয়েছে, তাদের প্রকৃতি ও হাবভাবের খানিকটা বাইরের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে তাদের কোথাও যুক্ত করা হয় নি। তারা বিভিন্ন প্রসঙ্গের আলোচনা করেছে মাত্র, কিন্তু নিজেদের জীবনকে কোথায়ও উন্মীলিত করে নি। চরিত্রের ক্রমবিকাশ বা জীবন-রসের সমগ্র আস্বাদন এখানে অনুপস্থিত। প্রচলিত প্রাবন্ধিক রীতি বর্জন করে কবি বক্তব্যকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করার জন্যই খানিকটা গল্পের টেক্‌নিক এখানে নিয়ে এসেছেন। 'পঞ্চভূত'-এর রচনাগুলি নাটক নয়, তবু কোনো কোনো রচনা পড়ে মনে হতে পারে যে, অল্প আয়াসেই একাঙ্ক রচনা করা যেতো। সে ধারণাও ঠিক নয়, কোথায়ও কোথায়ও নাটকীয় সম্ভাবনা থাকলেও কর্ম ও কবির বক্তব্যের রীতি কোনটিই নাটকীয় নয়।

'পঞ্চভূত'-এর শ্রেণী নির্ণয় সম্পর্কে ডায়োরির প্রসঙ্গও উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থের রচনাগুলি 'ডায়ারি' 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' নামে 'সাধনা' পত্রিকায়

প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাগুলির মধ্যে ডায়ারির লক্ষণ কতখানি আছে, তা বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। ডায়ারির সাধারণ লক্ষণ আলোচনা করলে দেখা যায় যে, দিনপঞ্জী বা রোজনামচাই এর সবটুকু নয়। সাহিত্যিক গুণান্বিত ডায়ারির মধ্যে লেখকের নির্জন মনের ছায়া পড়ে, খেয়াল-খুশীর বিচিত্র স্পন্দনে ভাবনার গভীর মর্মমূল আলোকিত হয়ে ওঠে। 'পঞ্চভূত'কে ডায়ারির অন্তর্ভুক্ত করা অসঙ্গত নয়। তবে প্রচলিত অর্থে ডায়ারি বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে 'পঞ্চভূত'-এর পার্থক্য আছে। ডায়েরির সবটুকুই ডায়েরি লেখকের দৃষ্টির দ্বারা ব্যাঘাত হয়। অপরের প্রসঙ্গ সেখানে থাকে, কিন্তু তাদের চরিত্র করে তোলা হয় না। রবীন্দ্রনাথ এখানে পঞ্চভূতের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য স্পষ্ট করে তুলেছেন, তাদের কণ্ঠস্বরকেও ফুটিয়ে তুলতে কার্পণ্য করেন নি। ডায়েরির লেখক পঞ্চভূতদের একজন সঙ্গী—তিনিই ভূতনাথবাবু যখন কোন একটি বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্ক ও বিশ্লেষণ শুরু হয়, তখন তাতে ভূতনাথবাবুও যোগ দেন। কিন্তু ভূতদের সঙ্গে ভূতনাথবাবুর পার্থক্য আছে। তিনি ভূতদের সঙ্গে বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা করেন, পরমত খণ্ডন করে স্বমত প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা করেন, কিন্তু তাদের তুলনায় তিনি অনেকখানি নিরাসক্ত। ভূতনাথবাবুর আর একটি বিশেষত্বও আছে। পাঞ্চভৌতিক বৈঠকের কোনো সভাপতি না থাকলেও, ভূতনাথবাবু খানিকটা সভাপতির কাজ করেন—সব সময় না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেন বক্তব্যকে **'sum up'** করার দায়িত্ব তাঁর। তাঁর ডায়ারি থেকেই যে পাঞ্চভৌতিক লীলার বিচিত্র তথ্য জানা যাচ্ছে, এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ থাকে না।

'পঞ্চভূত' গ্রন্থে 'পল্লীগ্রামে' ও 'মন' নামক রচনা দুটির বৈশিষ্ট্য আছে। এই দুইটি রচনায় পঞ্চভূতের কোনো প্রসঙ্গ নেই। এই দুটি রচনা রচয়িতার ব্যক্তিগত ভাবনার আলোকেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। অন্য রচনাগুলির মধ্যেও পঞ্চভূতের মধ্যে বিশিষ্ট সংযোগ সূত্র হচ্ছেন 'আমি'। 'পঞ্চভূত'-এর ষোলটি রচনার মধ্যে বিষয়গত পার্থক্য যতই থাক না কেন, একটি বিদগ্ধ মনের অভিজাতরুচি রচনাগুলির মধ্যে একটি অচণ্ড রসলোকের সৃষ্টি করেছে। এই জন্য 'পঞ্চভূত'কে বিশেষ ধরণের ডায়ারি আখ্যা দিলে খুব বেশি অসঙ্গতি হবে না। কোনো কোনো রচনায় সংলাপের অংশ নিতান্ত সামান্যই—যেমন'অখণ্ডতা'। এখানে সংলাপ অংশের চেয়ে চিন্তার অংশ অনেক বেশি। তাই প্রথম রচনাটিতে ডায়ারি লেখক বলেছেন: "কিন্তু আমার

নিজের কথা লিখিব না। এমন কথা লিখিব যাহা আমাদের সকলের। এই আমরা যে সব কথা আলোচনা করি"—

॥ ৩ ॥

'পঞ্চভূত' রচনার প্রেরণার সম্পর্কে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: "ঠাকুরবাড়ীতে চিরদিন সাহিত্যিকদের মজলিস বসিত, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এই ধারা বরাবর চলিয়া আসিতেছিল; সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতে একটি সাহিত্যচক্র প্রায়ই বসিত। 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি' নামে একখানি হাতেলেখা খাতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বাড়ির লোকেরা ও বাড়ির বন্ধুরা ঐ বাসায় নানা বিষয় সম্বন্ধে নিজ নিজ মনের ভাব লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, হিতেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, লোকেন পালিত, প্রমথ চৌধুরী, যোগেন চৌধুরী প্রভৃতির বিচিত্র মন্তব্য উহাতে আছে। কোনো কোনো স্থলে একটা বিষয় লইয়া পাঁচজনের মত। সাহিত্য-বিষয়ক কয়েকটি রচনা ও পঞ্চভূতের কয়েকটি প্রবন্ধের খসড়া এখানে খুঁজিলে পাওয়া যায়।"

যে-কালে কবি 'পঞ্চভূত' রচনা করেন, তখন তাঁর রসজীবন কানায় কানায় উচ্ছ্বাসিত। 'সাধনা' পত্রিকা কেন্দ্র করে কবির কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ অজস্র-ধারে রচনা করে চলেছেন। এই যুগ 'ছিন্নপত্রে'র অনবদ্য পত্রগুচ্ছের রচনায়ও শেষ লগ্ন। পদ্মালালিত বাংলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে কবির মানস-মুক্তিও ঘটেছে। পঞ্চভূতের রচনাগুলির মধ্যে এই যুগের রূপ-রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চভূতের বৈঠকগুলি প্লেটোর বিখ্যাত 'সিমেপাসিয়াম' গ্রন্থের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বৈঠকী আলাপের অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে প্রাচীন গ্রীসের মনীষীরা বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা করতেন। একটি বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করে একাধিক বক্তা নানাদিক থেকে তার আলোচনা করতেন। সংলাপাত্মক ভঙ্গীর এই অনবদ্য রচনাগুলি প্রাচীন গ্রীক মনীষার শ্রেষ্ঠ পরিচয় দেয় বহন করে। পঞ্চভূতের রচনাবলীর মধ্যেও অনুরূপ রীতির আস্বাদন লাভ করা যায়। পঞ্চভূতের চরিত্রগুলির মধ্যে সত্যমূলক কোনো উপাদান আছে কি না, এই নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। কিন্তু কবি তাকে কল্পনার দ্বারা বিশেষভাবে পরিমার্জিত করেছেন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয়। কবি 'সাধনা' পত্রিকায় (মাঘ ১২৯৯) উল্লেখ করেছিলেন: "শাস্ত্রমতে পঞ্চভূতের সমষ্টিই জগৎ। মানুষও তাই। প্রত্যেক মানুষই প্রায় পাঁচটি

মানুষ মিলিয়া। ভিতরেও পাঁচটা, বাহিরেও পাঁচটা।···কিন্তু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে গুটিকতক বিশেষ মানুষ বিশেষ রূপে সংলগ্ন হইয়া একটি বিশেষ ঐক্য নির্মাণ করে। তাহার অসংখ্য আলাপী আত্মীয়দের মধ্যে সেই কয়েকটি লোকই যেন তাহারা সীমানা নির্দেশ করিয়া দেয়। রচনার সুবিধার জন্য তাহাদের মধ্য হইতে কেবল পাঁচজনকে লওয়া যাক।"

মার্কিন লেখক অলিভার ওণ্ডেল হোমস রচিত 'The Autocrat of the Breakfast Table' নামক গ্রন্থের সঙ্গে 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের টেকনিক সাদৃশ্যের কথা কোনো সমালোচকের মনে হয়েছে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, এই সাদৃশ্যটি নিতান্তই বহিরঙ্গগত। হোমসের বৈঠকী আলাপগুলির কতক আসলে একজন, তিনি বলে যান আর শ্রোতাদের মধ্যে কেউ কেউ মাঝে মাঝে দু'একটি প্রশ্ন বা মৃদু প্রতিবাদ করে মাত্র। পটভূমিও 'পঞ্চভূত'-এর মতো বিচিত্র নয়—একটি বোর্ডিং বাড়ির প্রাতরাশ কক্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। 'পঞ্চভূত'-এর পটভূমির বৈচিত্র্য ও রমণীয়তা বক্তব্যকেও রমণীয় করে তুলেছে। ভ্রাম্যমাণ কবির অভিজ্ঞতাগুলি ডায়ারির সেটিংকে সুষমা-মণ্ডিত করে তুলেছে। 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ' নামক দ্বিতীয় ডায়ারীর প্রথমেই কবির বোটে করে পদ্মাভ্রমণের অভিজ্ঞতাটির একটি প্রসন্ন চিত্ররূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে: "বর্ষায় নদী ছাপিয়া খেতের মধ্যে জল প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের বোট অর্ধমগ্ন ধানের উপর দিয়া সর্‌ সর্‌ শব্দ করিতে করিতে চলিয়াছে। অদূরে উচ্চভূমিতে একটা প্রাচীরবেষ্টিত একতলা কোঠাবাড়ি এবং দু-চারিটি টিনের ছাতবিশিষ্ট, কুটীর, কলা কাঁঠাল আম বাঁশঝাড় এবং বৃহৎ বাঁধান অশ্বত্থ গাছের মধ্য দিয়া দেখা যাইতেছে।"

ডায়েরির প্রারম্ভের এই বর্ণনাটি ছিন্নপত্রের কোনো দৃশ্যচিত্র অথবা গল্পগুচ্ছের কোনো কোনো গল্পের পটভূমি স্মরণ করিয়ে দেয়। "কৌতুকহাস্য" রচনাটির প্রারম্ভও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শীতের সকালবেলায় আতপ্তমধুর রৌদ্রে চা-চক্রকে কেন্দ্র করে পাঞ্চভৌতিক আসর জমে উঠেছে। এই সেটিংটি না থাকলে যেন বৈঠকের আলোচনা তেমন হৃদয়গ্রাহী হতো না। 'পঞ্চভূত' রচনার যুগে কবি গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি লিখেছিলেন, তাই গল্প বলার বিশেষ ভঙ্গীটি এখানেও অনুপস্থিত নয়। 'সেটিং' ও 'সিচুয়েশন' সৃষ্টিতেও কবি কুলাকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। বৈঠকী আলাপের উপযুক্ত পরিবেশের প্রারম্ভচিত্রটি চমৎকার:

(১৭৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

রবীন্দ্রদৃষ্টিতে কল্পনা

আদিত্য ওহদেদার

কবি একস্থানে রূপশিল্পের আলোচনায় বলেছেন "মানুষের সকল উদ্ভাবনার মূলে তার কল্পনাবৃত্তি। সেই কল্পনার মধ্যে এই প্রেরণা রয়ে গেছে যে, মানুষ নকল করবে না—রচনা করবে।" (সাহিত্যের পথে, ১৩৬০ সং। সংযোজন।) যেহেতু সাহিত্যও মানুষের একধরণের উদ্ভাবনা, সুতরাং তার মূলেও আছে কল্পনা। কিন্তু এখানে প্রশ্ন আসে, একই প্রকৃতির কল্পনা কি মানুষের সাহিত্য-উদ্ভাবনা এবং বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য উদ্ভাবনার মূলে? এর একটা স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায় কবির প্রথম বয়সের একটি রচনার মধ্যে।—"নিজের প্রাণের মধ্যে, পরের প্রাণের মধ্যেও প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব।.....মর্মের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য যে কল্পনা আবশ্যক করে তাহাই কবির কল্পনা।" (সমালোচনা। চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি।) সুতরাং দেখা যাচ্ছে সাহিত্য-উদ্ভাবনার মূলে যে কল্পনা তার প্রকৃতির একটা বিশেষত্ব নির্দেশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এবং এই বিশেষত্বই কবির পরবর্তী রচনায় আরও বিশদ হয়েছে, বিশেষ করে "সাহিত্যের পথে"র রচনাগুলিতে।—এই গ্রন্থের ভূমিকায় কবি বলেছেন, "মানুষ শিশুকাল থেকেই নানাভাবে আপন উপলব্ধির ক্ষুধায় ক্ষুধিত, রূপকথার উদ্ভব তারই থেকে।—কল্পনার জগতে চায় সে হ'তে নানাখানা—রামও হয়, হনুমানও হয়, ঠিকমত হ'তে পারলেইখুশী। তার মন গাছের সঙ্গে গাছ হয়, নদীর সঙ্গে নদী। মন চায় মিলতে, মিলে হয় খুশী।"

সুতরাং কবির মতে কল্পনা হল মানুষের নানাভাবে নিজেকে উপলব্ধি করার একটা ক্ষমতা। এই ক্ষমতার বশেই মানুষ নিজেকে অন্য কিছুর সঙ্গে একাত্ম করতে পারে, এবং এই রকম করতে পেরে খুশী হয়। প্রশ্ন হতে পারে এতে খুশী হবে কেন মানুষ। কবি তারও উত্তর দিয়েছেন।

"আমি আছি, এই সত্যটি আমার কাছে চরম মূল্যবান। সেইজন্য যাতে আমায় সেই বোধকে বাড়িয়ে তোলে তাতে আমার আনন্দ। বাইরের যে-কোনো জিনিসের 'পরে আমি উদাসীন থাকতে পারি নে, যাতে আমার

ঔৎসুক্য অর্থাৎ যা আমার চেতনাকে জাগিয়ে রাখে, সে যতই তুচ্ছ হোক্, তাতেই মন হয় খুশী, তা সে হোক্ না ঘুড়ি-ওড়ানো, হোক্ না লাটিম-ঘোরানো। কেননা, সেই আগ্রহের আঘাতে আপনাকেই অত্যন্ত অনুভব করি।

"আমি আছি এক, বাইরে আছে বহু। এই বহু আমার চেতনাকে বিচিত্র করে তুলেছে, আপনাকে নানা-কিছুর মধ্যে জানছি নানাভাবে। এই বৈচিত্র্যের দ্বারা আমার আত্মবোধ সর্বদা উৎসুক হয়ে থাকে। বাইরের অবস্থা একঘেয়ে হলে মানুষকে মন-মরা করে।

"শাস্ত্রে আছে, এক বললেন, বহু হব। নানার মধ্যে এক আপন ঐক্য উপলব্ধি করতে চাইলেন। একেই বলে সৃষ্টি। আমাতেই যে এক আছে সেও নিজেকে বহুর মধ্যে পেতে চায়, উপলব্ধির ঐশ্বর্য সেই তার বহুলত্বে।" (সাহিত্যের পথে। সাহিত্যতত্ত্ব।)

কল্পনার সাহায্যে নিজেকে নানা-কিছুর মধ্যে নানাভাবে জানাটা হলো অনুভবে জানা, কারণ অনুভবের অর্থ হলো অন্যকিছুর অনুসারে হয়ে ওঠা। এই জানা হলো প্রত্যক্ষ, অব্যবহিত। অনুভবে আমরা নিজেকে বোধ করি। কবি তাই বলেছেন, "আমাদের জানা দুরকমের, জ্ঞানে জানা, আর অনুভবে জানা। অনুভব শব্দের ধাতুগত অর্থের মধ্যে আছে অন্যকিছুর অনুসারে হয়ে ওঠা; শুধু বাইরে থেকে সংবাদ পাওয়া নয়, অন্তরে নিজেরই মধ্যে একটা পরিণতি ঘটা। বাইরের পদার্থের যোগে কোনো বিশেষ রঙে, বিশেষ রসে, বিশেষ রূপে আপনাকেই বোধ করাকে বলে অনুভব করা।" (সাহিত্যের পথে। সাহিত্যতত্ত্ব।) অনুভব আমাদের হৃদয়বৃত্তি—তার প্রয়োজন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনধারণের মধ্যে দেখা দেয়। আত্মরক্ষা, শত্রুহনন, সন্তানপালন ইত্যাদি কাজে অনুভব প্রেরণা বা বেগ সঞ্চারকরে। সেখানে অনুভব প্রয়োজন-সাধক, স্বার্থসিদ্ধিতে নিঃশেষিত। এই সীমাবদ্ধ অনুভবের ক্ষেত্রে জন্তুর সঙ্গে মানুষের কোনো প্রভেদ নেই। তবে প্রভেদ ঘটেছে কোথায়? কবির ভাষায় "প্রভেদ ঘটেছে সেইখানেই যেখানে মানুষ হৃদয়ানুভূতিকে কর্মের দায় থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে কল্পনার সঙ্গে যুক্ত করে দেয়, যেখানে অনুভূতির রসটুকুই তার নিঃস্বার্থ উপভোগের লক্ষ্য। সেখানে আপন অনুভূতিকে প্রকাশ করবার

প্রেরণার ফললাভের অত্যাবশ্যকতাকে সে বিস্মৃত হয়ে যায়।" (সাহিত্যের পথে। সাহিত্যতত্ত্ব।)

দেখা যাচ্ছে, কবি কল্পনাকে নিছক হৃদয়ানুভূতির সঙ্গে এক করেন নি। কল্পনা আছে বলে মানুষ জন্তু থেকে পৃথক। এ এমন বৃত্তি যার সংস্পর্শে এসে হৃদয়ানুভূতি রসে পরিণত হয়। অবশ্য এই সংস্পর্শে আসবার জন্য হৃদয়ানুভূতিকে প্রয়োজনের দায় থেকে মুক্ত হতে হয়। এ মুক্তি দরকার, কারণ কল্পনার জগতে মানুষ সব প্রয়োজনের বন্ধন থেকে মুক্ত।

কল্পনা কী, সেটা কবি স্পষ্ট করেই জানিয়েছেন। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে কবির মতে কল্পনা হলো মানুষের নিজেকে নানাভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা। এই উপলব্ধি ঘটে বাইরের বস্তুকে মনের জিনিস করে নিয়ে। কল্পনা বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের মানব মিলন ঘটায়।—"যে শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনটা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের মিলন না হয়ে মনের মিলন হয়ে ওঠে সে শক্তি হচ্ছে কল্পনাশক্তি; এই কল্পনাশক্তিতে মিলনের পথকে আমাদের অন্তরের পথ করে তোলে, যা কিছু আমাদের থেকে পৃথক এই কল্পনার সাহায্যেই তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্মবোধ সম্ভবপর হয়, যা আমাদের মনের জিনিস তার মধ্যেও মন প্রবেশ ক'রে তাকে মনোময় ক'রে তুলতে পারে।" (সাহিত্যের পথে। সাহিত্যের তাৎপর্য) বাইরের বিশ্বকে কল্পনায় নিজের মতে আপন ক'রে নিলে তবেই সাহিত্যসৃষ্টি।—"মানুষের বিশ্ব মানুষের মনের বাইরে যদি থাকে সেটাই নিরানন্দের কারণ হয়। মন যখন তাকে আপন করে নেয় তখনই তার ভাষায় শুরু হয় সাহিত্য, তার লেখনী বিচলিত হয় নতুন গানের বেদনায়। (সাহিত্যের পথে)

কল্পনা আমাদের মনে অন্যের সঙ্গে ঐক্যবোধ ঘটায় বলে কল্পনা হলো আমাদের আত্মার ঐশ্বর্য। এই ঐশ্বর্য মানুষেরই আছে, পশুদের নেই। কল্পনায় ক্রমাগত মানুষকে কেবলমাত্র প্রাণধারণের সীমার বাইরে নিয়ে যায়। কবি বলছেন "এইখানেই আছে প্রকাশতত্ত্ব।" (সাহিত্যের পথে। সাহিত্য।) অর্থাৎ কল্পনায় মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে। আলো যেমন তাপের ঐশ্বর্য, তেমনি আমাদের মনের ঐশ্বর্য হলো কল্পনা।—"লোহা গরম হতে হতে যতক্ষণ না দীপ্ততাপ পর্যন্ত যায় ততক্ষণ তার প্রকাশ নেই। আলো হচ্ছে তাপের ঐশ্বর্য। মানুষের যে-সকল ভাব স্বকীয় প্রয়োজনের মধ্যেই ভুক্ত

হয়ে না যায়, যার প্রচুর্যকে আপনার মধ্যেই আপনি রাখতে পারে না, যা স্বভাবতই দীপ্যমান, তারই দ্বারা মানুষের প্রকাশের উৎসব।" (সাহিত্যের পথে। সাহিত্য।)

কল্পনা মানুষকে নিজের সীমাবদ্ধ অহং থেকে মুক্ত ক'রে অসীম অন্যের সঙ্গে যুক্ত করে। এই ঐক্যবোধের প্রেরণাই মানুষকে নানাপ্রকারে নিজেকে প্রকাশ করতে সচেষ্ট রাখে। এই বোধ মানুষকে বৃহৎ করে, মহাজীবনের স্পর্শ আনে—মানুষকে একলা রাখে না। একলা মানুষের প্রকাশ নেই।—"যেখানে একলা মানুষ সেখানে তার প্রকাশ নেই। টিঁকে থাকার অসীমতা-বোধকে অর্থাৎ 'আপনার থাকা অন্যের থাকার মধ্যে' এই অনুভূতিকে মানুষ নিজেরই ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র দৈনিক ব্যবহারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারে না। তখন সেই মহাজীবনের প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার সেবায় ত্যাগে সে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই মহাজীবনের আনন্দকে আবেগকে সে নানা সাহিত্যে স্থাপত্যে মূর্তিতে চিত্রে গানে প্রকাশ করতে থাকে।" (সাহিত্যের পথে। সাহিত্য।)।

কল্পনা মানুষকে বস্তু ও ঘটনার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত যোগ থেকে মুক্ত রাখে বলে বস্তু ও ঘটনার যথার্থ রূপ বা সমগ্রতা দেখাতে পারে। কবি বলেছেন, "আমাদের কল্পনার দৃষ্টি ঐক্যকে সন্ধান করে এবং ঐক্যস্থাপন করে"। (সাহিত্যের পথে। সাহিত্যের তাৎপর্য।) ঐক্য হলো যথার্থ রূপ, সমগ্রতা। বাইরের বস্তু বা ঘটনা আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা দেখি তা অধিকাংশই সুসংলগ্ন নয়। তার অনেক কিছুই আমাদের অগোচরে থাকে। সুতরাং তাকে আমরা দেখি অসম্পূর্ণভাবে। বহু অবান্তর বিষয় ও ব্যাপারের দ্বারা তা পরিচ্ছিন্ন থাকতে পারে। তার সম্পূর্ণ রূপ বা সমগ্রতার জন্যে সেই বিষয় বা ঘটনার উপাদানগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি সার্থক ও কোন্‌গুলি নিরর্থক তা বাছাই করে নিলে তবেই সেই বস্তু বা ঘটনার বৃহৎ তাৎপর্য ধরা পড়ে। এই বাছাই করতে পারে কল্পনা। কবির ভাষায়, "মানুষের সংসারে দ্বন্দ্ব বহুল বৈচিত্র্য আমাদের উদভ্রান্ত করে দেয়। যদি তার কোন একটি প্রকাশকে স্পষ্টরূপে হৃদয়গম্য করতে হয় তাহলে আর্টিস্টের সুনিপুণ কল্পনা চাই। অর্থাৎ বাস্তবে যা আছে বাইরে তাকে পরিণত করে তুলতে হ'বে মনের জিনিস ক'রে। আর্টিস্টের সামনে উপকরণ আছে বিস্তর—সেগুলির মধ্যে গ্রহণ

বর্জন করতে হবে কল্পনার নির্দ্দেশমত। তার কোনটাকে বাড়াতে হবে, কোনটাকে কমাতে, কোনটাকে সামনে রাখতে হবে. কোনটাকে পিছনে। বাস্তবে যা বাহুল্যের মধ্যে বিক্ষিপ্ত তাকে এমন করে সংহত করতে হবে, যাতে আমাদের মন তাকে সহজ গ্রহণ ক'রে তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। প্রকৃতির সৃষ্টির দূরত্ব থেকে মানুষের ভাষায় সেতু বেঁধে তাকে মর্মঙ্গম নৈকট্য দিতে হবে ; সেই নৈকট্য ঘটায় ব'লেই সাহিত্যকে আমরা সাহিত্য বলি।" (সাহিত্যের পথে। সাহিত্যেব তাৎপর্য।)।

কল্পনার স্বরূপ সম্পর্কে কোল্‌রিজের চিন্তা সাহিত্যতত্ত্বে খ্যাতিলাভ করেছে। কোল্‌রিজ "ইমাজিনেশান্" অর্থাৎ কল্পনাকে বলেছেন esemplastic বা shaping power, সেই শক্তি যা কোনো বস্তু বা ঘটনার বিভিন্ন অংশকে একটা যোগসূত্রে গেঁথে দেয়। তাদের মূল ঐক্য আবিষ্কার করে। এই ঐক্য ও যোগসূত্র দ্বারাই কবি-কল্পনা বাইরের জগৎকে নিজের মনের মধ্যে গ্রহণ ক'রে তাকে আবার প্রকাশ করতে পারে। কোলরিজ কল্পনা-বৃত্তিকে দুটো স্তরে ভেদ করেছেন। প্রাথমিক স্তর হলো মানুষের সাধারণ চেতনা যার বশে বাইরের জগৎ তার মনে প্রতিভাত হচ্ছে। দ্বিতীয় স্তর হলো কবিকল্পনা, যে শক্তির দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করে, প্রকাশ করে। (The Imagination then, I consider either as primary, or secondary The primary Imagination I hold to be the living power and prime Agent of all human Perception, and as a repetition; in the finite mind of the eternal act of creation in the infinite I AM. The secondary Imagination I consider as an echo of the former co-existing with the conscious will, yet still as identical with the primary in the kind of its ageney, and differing only in degree and in the mode of its operation. It dissolves, diffuses, dissipates, in order to recreate"—Biographia Literaria, Chapter XIII)

কল্পনার এই দুটো রূপকে বলতে পারি মানবাত্মারই দুটো রূপ। রবীন্দ্র-সাহিত্যচিন্তার কল্পনার এই দুটো রূপ ছাড়া আর একটা রূপও আছে—যা হলো এ দুই এর মাঝামাঝি। উপনিষৎ ব্রহ্মস্বরূপের তিনটি ভাগ করেছেন—সত্যম,

জ্ঞানম্, অনন্তম্। কবি বলেছেন, চিরন্তনের এই তিনটি স্বরূপকে আশ্রয় ক'রে —মানবাত্মারও তিনটি রূপ আছে। একটি হলো, আমরা আছি, আরেকটা, আমরা জানি, এবং তারপরে যেটি সেটি হলো আমরা ব্যক্ত করি, প্রকাশ করি। (সাহিত্যের পথে। 'সাহিত্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

খাঁটি কবিকল্পনার সঙ্গে কোলরিজ আর একটি বৃত্তির পার্থক্য দেখিয়েছেন যে বৃত্তি হলো ফ্যান্সি (fancy)। কল্পনা উপকরণকে সাজায় না, সৃষ্টি করে, অর্থাৎ রূপান্তরিত করে, কিন্তু ফ্যান্সি উপকরণকে একত্র সাজায়, তার বেশী কিছু করতে পারে না। কল্পনা রূপ তৈরী করে প্রাণের নিয়মে, ফ্যান্সি রূপ গাঁথে। যন্ত্রের নিয়মে এক কথায়, কল্পনা বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তায় প্রবেশ করে, ফ্যান্সি বস্তুর বাইরের বহুলতায় নিজেকে তৃপ্ত রাখে। (Fancy ……has no other counters to play with, but fixities and definities. The Fancy is indeed no other than a mode of Memory emancipated from the order of time and space; while it is blended with, and modified by that empirical phenomenon of the will, which we express by the word CHOICE. But equally with the ordinary memory the Fancy must receive all its materials ready made from the law of association. —Biographia Literaria, Chapter XIII)

কল্পনা ও ফ্যান্সির এই প্রভেদ রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন। তাঁর পরিভাষায় ফ্যান্সি হলো 'কাল্পনিকতা'। "কল্পনা এবং কাল্পনিকতা দুইএর মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ আছে। যথার্থ কল্পনা, যুক্তি সংযম এবং সত্যের দ্বারা সুনির্দিষ্ট আকারবদ্ধ—কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভাণ আছে মাত্র কিন্তু তাহা অদ্ভুত আতিশয্যে অসঙ্গতরূপে স্ফীতকায়। * * * * ইহা দেখিতে প্রকাণ্ড কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত লঘু।" (আধুনিক সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্র।) 'তথ্য ও সত্য' এবং 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধ দুটির ভিত্তি হলো কল্পনা ও কাল্পনিকতার পার্থক্য, এমন কথা বলা যায়। সত্য বা রস নিয়ে কাল্পনিকতা। কবি তাই বলেছেন, "রসবস্তুর এবং তথ্যবস্তুর এক ধর্ম এবং এক মূল্য নয়। তথ্যজগতের যে আলোকরশ্মি দেয়ালে এসে ঠেকে যায়, রসজগতের সে রশ্মি স্থূলকে ভেদ করে অনায়াসে পার হয়ে যায় ……।" (সাহিত্যের পথে।

তথ্য ও সত্য।) তথ্যজগতের আলোকরশ্মি হলো ফ্যান্সি বা কাল্পনিকতা রসজগতের রশ্মি হলো কল্পনা। কাল্পনিকতার নবত্ব বা ওরিজিন্যালিটি হলো আর্জগুবি ও উত্তেজনা; কল্পনার ওরিজিন্যালিটি হলো চিরন্তনকেই নূতন করে প্রকাশ করা। কবি স্পষ্টই বলেছেন, "সাহিত্যের বিষয়মাত্রই অতি পুরাতন আকার গ্রহণ করিয়া সে নূতন হইয়া উঠে।" (পঞ্চভূত। মনুষ্য।)।

[৩]

রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্বের অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটির উল্লেখ করতে গিয়ে একজন সমালোচক (শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। 'রবীন্দ্রনাথ' পুস্তক দ্রষ্টব্য।) অভিমত প্রকাশ করেছেন যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তায় কল্পনার সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক সুস্পষ্ট হয় নি। খুব সম্ভব তিনি বলতে চেয়েছেন যে সাহিত্যকর্মে বুদ্ধির স্থান কতখানি তার নির্দেশ রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে দেন নি। কিন্তু আমরা ত মনে করি, সে নির্দেশ যথেষ্ট স্পষ্ট করেই দেওয়া আছে। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, "যাকে সীমায় বাঁধতে পারি তার সংজ্ঞা নির্ণয় চলে; কিন্তু যা সীমার বাইরে, যাকে ধরে ছুঁয়ে পাওয়া যায় না, তাকে বুদ্ধি দিয়ে পাই নে, বোধের মধ্যে পাই।.....আমাদের এই বোধের ক্ষুধা আত্মার ক্ষুধা। সে এই বোধের দ্বারা আপনাকে জানে। যে প্রেমে, যে ধ্যানে, যে দর্শনে কেবলমাত্র এই বোধের ক্ষুধা মেটে তাই স্থান পায় সাহিত্যে রূপকলায়।" (সাহিত্যের পথে। সাহিত্যধর্ম।) সুতরাং দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যকর্মে বুদ্ধির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ নয়। সাহিত্যের সামগ্রী নির্দিষ্ট হয় বোধ বা অনুভূতির দ্বারা।

আর এক স্থানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কবি যেমন কাব্যগঠন করে..... রমণী তেমনি আপনার জীবনটি রচনা করিয়া তোলে।.....তাহাকে বলে শ্রী। ইহা তো বুদ্ধির কাজ নহে, অনির্দেশ্য প্রতিভার কাজ; মনের শক্তি নহে, আত্মার অভ্রান্ত নিগূঢ় শক্তি।" (পঞ্চভূত। অখণ্ডতা।) এখানে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ কাব্যের প্রকাশকেও বুদ্ধির অনায়ত্ত বলে নির্দেশ করেছেন।

সুতরাং রবীন্দ্রদৃষ্টিতে সাহিত্যকর্মের কর্তা যেমন প্রয়োজন ও নিজত্বমুক্ত ব্যক্তিস্বরূপ বা "পারসোনালিটি", সাহিত্যকর্মের শক্তি হল তেমনি কল্পনা। ভাব এবং তার প্রকাশ দুইই কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট বা রচিত হয়। বুদ্ধি গৌণভাবে কল্পনার নৈপুণ্য অর্জনে সাহায্য করতে পারে। প্রথম যৌবনের একটি রচনায় কবি বলেছেন, "কল্পনারও শিক্ষা আবশ্যক করে। যাহাদের কল্পনা শিক্ষিত নহে তাহারা অতিশয় অসম্ভব কল্পনা করিতে ভালবাসে···।" (সমালোচনা। চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি) যেহেতু শিক্ষা বুদ্ধিবৃত্তিকেই অবলম্বন করে সুতরাং বলা যায় বুদ্ধি কল্পনাকে সমৃদ্ধ ও মার্জিত করে। অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সেও কবি বলেছেন, "মানুষের ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা অতিশয় অল্প; এইজন্য প্রকাশের সহিত নির্দেশ, ভাষার সহিত ভঙ্গী, ভাবের সহিত ভাবনা যোগ করিয়া দিতে হয়। (পঞ্চভূত। মনুষ্য) ভাবনা হল বিশেষ করে বুদ্ধির সৃষ্টি, সুতরাং ভাবের সঙ্গে অর্থাৎ কল্পনা-সৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে ভাবনার অর্থাৎ বুদ্ধি-গঠিত বস্তুর কিছু যোগাযোগ ঘটে। এইভাবে বুদ্ধির একটা স্থান সাহিত্যে রয়েছে।

আগামী কালের উত্তরাধিকার

নিখিল চক্রবর্তী

[রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ক্যালকাটা ম্যুনিসিপ্যাল গেজেটের যে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তাতে Legacy for tomorrow নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক নিখিল চক্রবর্তী। সেই লেখাটির বর্তমান অনুবাদ করেছেন মৃণাল ভদ্র। —সম্পাদক।]

॥ ১ ॥

লেনিন একবার একদল সোভিয়েট ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তারা রুশ-সাহিত্যের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে কাকে মনে করে। ছাত্ররা উত্তর দিয়েছিল—'মায়াকভ্স্কি'। লেনিন স্বীকার করলেন এবং প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু পুশ্কিন সম্বন্ধে কি তা বলা যায় না?" তিনি বললেন, "পুশ্কিন না থাকলে কি মায়াকভ্স্কি হতে পারতেন?" আজ থেকে একশ বছর পরে লোকে ঠিক এই ভাবে এবং এর থেকে আরও সত্যভাবে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কথা বলবে। এখন আমরা তাঁর ব্যক্তিত্বের খুব কাছাকাছি আছি বলে পুরোপুরি তার মহত্ত্ব অনুভব করতে পারছি না। বিরাট পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্পূর্ণ মাপা যায়না। আমাদের মাপে আমরা রবীন্দ্রনাথের মূল্য নির্ণয় করতে পারি না, তাঁর প্রতিভা যে অনন্ত বিচিত্র পথে নিজেকে প্রকাশ করেছে তার পরিমাপও আমরা করতে পারিনা। তিনি শুধু একজন ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠান ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি যুগ। তিনি যেমন একটা যুগকে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তিনিও ছিলেন যুগের সৃষ্টি।

ভারতবর্ষের পরিবর্তনশীল স্রোতে বহু মনীষীর আবির্ভাব হয়, এবং তারপর তাঁরা দ্রুত মিলিয়ে যান। গতদিনের নেতা আজ পরিত্যক্ত হন এবং আজ্কের বীর হয়ত আগামী কাল বিস্মৃতিতে তলিয়ে যাবেন। এটা জাতির দোষ নয়, কিংবা এই সব ক্ষণস্থায়ী ভূমিকা যাদের, তাদেরও নয়। ভারতবর্ষে আমরা চঞ্চল পৃথিবীর ঘূর্ণ্যাবর্তে পড়েছি, দৈত্যের ঘুম ভেঙেছে, অচঞ্চল প্রাচ্য নড়ে উঠেছে। কিন্তু, তবুও এই পরিবর্তনের যুগে রবীন্দ্রনাথ

সময়ের সঙ্গে তালে তালে পা ফেলেছেন। তিনি কখনও পিছিয়ে পড়ার দলে ছিলেন না।

বহু দিক দিয়ে তিনি প্রগতিবাদী ছিলেন। একদিকে, তিনি প্রচলিত পথ থেকে—ভাষায়, সঙ্গীতে, চিত্রে এবং ধর্মে মুক্তি লাভ করেছিলেন; অন্য দিকে, যুগের সজীব ধারার সঙ্গে তাঁর কখনও যোগ ছিন্ন হয়নি এবং তাঁর সংবেদনশীল মননে তাঁর যুগের সমস্ত নতুন ধারণা এবং চিন্তার ছাপ ফেলে ছিল। তাঁর জীবনের শেষ পঞ্চাশ বছর সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বিচার তাঁকে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ধ্রুব নক্ষত্র রূপে স্বীকৃতি দেবে।

রবীন্দ্রনাথ যে অমূল্য উত্তরাধিকার রেখে গেছেন তা আমাদের বিবেচনা করতে হবে। বাঙ্গালা দেশ সত্যই রবীন্দ্রযুগকে লাভ করেছে। ভাষায় তিনি পুরাতন বাংলার বহুদিনের বন্ধনকে মুক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে সরিয়ে নিলে আমরা একেবারে ঈশ্বরগুপ্তের যুগে গিয়ে পড়ি, এক শুধু আমাদের খুব কাছের কাব্যিক ঐতিহ্য হিসাবে মাইকেলকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। প্রচলিত আঙ্গিকে মোড়া রচনারীতিকে এই কথার যাদুকরের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। সুন্দর এবং শক্তিশালী রচনারীতি দিয়ে তিনি ভাষাকে সম্পদশালী করে তুলে লেন। এটা একটা বিরাট কীর্তি—আঙ্গিকের দিক দিয়ে একটা বিপ্লব—ভাষা আগের থেকে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ এবং প্রকাশক্ষম হয়েছে, কারণ ভবিষ্যৎ প্রগতির দিকে চেয়ে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত বাধা আমাদের প্রকাশের মাধ্যমকে জড়ীভূত করে রেখেছিল, তাকে ধ্বংস করেছেন। কথ্য এবং লিখিত ভাষা, সাধারণ মানুষ এবং পণ্ডিতদের ভাষার মধ্যে ব্যবধান তিনি দূর করেছেন। বাংলা একটি সজীব ভাষা হয়ে উঠেছে, ভবিষ্যতে যে সব নূতন রীতি এবং প্রকাশের পথ আসবে সেগুলিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য ভাষা এখন প্রস্তুত।

সাধারণ মানুষ যখন স্বল্প কয়েকজনের সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হয়, তখন তাকে ভাষার পুরাতন রীতির সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজের ভাব প্রকাশের যোগ্য বাহন করে তুলতে হয়। জরাজীর্ণ সাহিত্যরীতির সঙ্গে প্রথম যুদ্ধ করে রবীন্দ্রনাথ একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। যে ভাষা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, তা আজ আগামী দিনের পাঠকদের দাবীর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে সক্ষম।

সঙ্গীতে এবং চিত্রাঙ্কনেও তিনি অনুরূপ যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ধ্রুপদী ঐতিহ্যের ভাবকে পুরোপুরি বর্জন না করে তিনি নূতন প্রথার সৃষ্টি করেন। মানবিক সমস্ত মূল্যের শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলিকে গ্রহণ করে তিনি অনুভব করেছিলেন, কোন শিল্প-পদ্ধতিই চিরন্তন নয়। প্রত্যেক প্রত্যেক যুগেই নূতনভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথের পরের যুগের সজীব সংস্কৃতিই এত সৃষ্টিশীল রূপের তাই একটি কারণ বলে মনে হয়। শুধু আজকের মানুষ নয়, আগামী দিনের মানুষও ও তাঁর মহত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবে, কারণ তিনি আমাদের ভাষাকে, চিত্রকে এবং সঙ্গীতকে অতীতের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং একই সঙ্গে পরীক্ষা ও নিরীক্ষার এক নূতন ঐতিহ্য স্থাপন করেন।

কেবল আঙ্গিকগত নৈপুণ্যই আমাদের সংস্কৃতিতে তাঁর দানকে নিঃশেষিত করে নি। যে সাহিত্য আমরা তাঁর কাছ থেকে লাভ করেছি, তা আয়তনে ও গুণে বিরাট। একজন ব্যক্তির জীবনে এত প্রচুর ফলন যার প্রত্যেকটি কথাই মূল্যবান সুদুর্লভ ঘটনা। তাঁর কবিতা আমাদের সমস্ত আবেগ এবং অনুভূতিকে ভাষা দিয়েছে। আমাদের ব্যক্তিজীবনের বা সমষ্টি জীবনের সুখ দুঃখ, আশা-নিরাশা রবীন্দ্রনাথের রচনায় ধ্বনিত হয়েছে। জীবনের সঙ্গে তিনি কখনও যোগ হারাননি এবং অনুভব করেছিলেন, জীবন সর্বদাই গতিশীল। কবিও এই গতির সঙ্গে চলেছেন এবং কখনও পিছু হটেননি। তিনি বাস্তবের সম্মুখীন হতে ভয় পাননি এবং সেইজন্য তিনি ফাল্গুনী নাটকে যে জীবন-বিমুখ সাংকেতিক রীতি নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন, তা শীঘ্রই পরিত্যাগ করেন। দান্তের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির মধ্যে এমন ভাবে একটা যুগের সংস্কৃতি বিধৃত হয়নি।

প্রগতিবাদীদের কাছে রবীন্দ্রনাথের ধর্মও কম মূল্যবান নয়। তিনি মূল্যের ধারণাকে কখনও অপরিবর্তনীয় তত্ত্বে পরিণত করেননি। তাঁর ঈশ্বর মিল্‌টনের ভগবানের মত কর্তব্য-বিধাতা নন, ন্যায়-অন্যায়ের বিচারক নন, বা তিনি ভালো-মন্দের ভাষায় কথা বলেন না। তিনি সৌন্দর্যের দেবতা হিসাবে নিজের ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাছে, অসুন্দরই খারাপ, সত্য সুন্দর বলেই ভালো। তিনি নিঃসন্দেহে ভাববাদী ছিলেন, কারণ ধর্ম ভাববাদের সৃষ্টি। তবে তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ ভাববাদী। কঠোর

নিয়মের শ্বাসরোধকারী সংকীর্ণতা থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। একথা বলা ভুল হবে যে তিনি কখনও কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। অন্যান্য ধর্মের সুন্দর দিকগুলিও তাঁকে আকর্ষণ করত। ব্যক্তিগত বন্ধনের জন্যই হয়ত তিনি বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি সংস্কার এবং আচার মান্‌তেন না। যে দেশে ধর্মের সামন্ততান্ত্রিক ধারণা দৈনন্দিন জীবনের মান নির্ণয় করে, সেদেশে জন্মেও তাঁর ছিল উদার মন এবং সেই মন নিয়ে তিনি এক দিগন্ত খুঁজেছিলেন। ইয়োরোপে মানবতা-বাদীরা যেমন ধর্মের অন্ধ-সংস্কারের ভিত্তিকে ধ্বংস করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও সেই রকম একটি ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ভাববাদের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থেকেও, যতই সুন্দর তার রূপ হোক না কেন, তিনি আমাদের পুরাতন সংস্কারের বন্ধন থেকে উদ্ধার করেছেন। মুক্ত মনের বিবর্তনে রবীন্দ্রনাথের মতবাদ একটি বিশিষ্ট পর্যায়।

রবীন্দ্রনাথের যুগ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রবাদের উত্থান ও পতন এতে লিখিত আছে। এই যুগেই ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আসে এবং বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সমস্ত জাতিকে নেতৃত্ব দেয়। স্বাধীনতার সংগ্রামে মধ্যবিত্তের স্বার্থ কিছুদূর পর্যন্ত সাধারণ মানুষের সঙ্গে একই ছিল। ১৯০৫ একটা সন্ধিক্ষণ এবং সেই সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণী গণ-আন্দোলনের সারিতে এসে দাঁড়ায়। এই মৈত্রী চরম আকার ধারণ করে ১৯২০তে। আন্দোলনের নিরাপদ জায়গায় দাঁড়িয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্ব বিপর্যয়ের বেলায় আন্দোলনকে থামিয়ে দিয়েছে। ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনের সময় এটা ঘটেছিল, এবং গত দুবছর ধরে এটা হয়ে আসছে, কারণ সঙ্ঘবদ্ধ গণ-আন্দোলনের ভয় জাতীয় ধনিকশ্রেণীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে এই পরিপ্রেক্ষিতে ধনিকশ্রেণীর নিশ্চয়ই একটি প্রগতিবাদী ভূমিকা আছে, যদিও সেই ভূমিকার সম্ভাবনা জনসাধারণ যতই এগিয়ে আস্‌ছে আর বাইরের দিক দিয়ে, যতই ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরছে, ততই নিঃশেষিত হচ্ছে।

সংস্কৃতির জগতে শ্রেণী-শক্তির এই প্রতিফলন সুস্পষ্ট ও অভ্রান্ত। জাতীয় চেতনার প্রথম উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লেখকও কবিদের মধ্যে রেনেসাঁস

এল এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এর শ্রেষ্ঠ পূজারী। ১৯০৫-এর আন্দোলন তাঁর নিষ্ক্রিয়তা দূর করে দিল এবং তিনি দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। তার গান ও কবিতার মধ্যে দিয়ে তিনি জাতিকে প্রেরণা দিলেন কিন্তু তিনি নিজে আরও বহুদূর এগিয়ে গেলেন। সাম্রাজ্য-বাদের নিন্দায় তাঁর লেখনী তীব্র হয়ে উঠ্‌ল। বিদেশে নানা জায়গায় ভ্রমণের সময় তিনি যে সব বক্তৃতা দেন, সেগুলি ছিল সম্পূর্ণভাবে আপোষের সুর বর্জিত। জাতির ক্লান্ত সৈনিক যখনই আশ্রয়ের জন্য তাঁর কাছে গেছে, তিনি শান্তিনিকেতনে কখনও আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হননি। তাঁর প্রভাবে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবিরা কখনই জাতীয় সংগ্রাম থেকে যোগছিন্ন হয়নি।

জনসাধারণের সাথে এই সচেতন সংযোগই রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদের মহৎ উপাদানগুলিকে প্রকাশ করেছে। উঁচু আসন থেকেই তিনি সংগ্রামী মানুষকে উৎসাহিত করেননি। তিনি তাঁদের মধ্যে নেমে এসেছেন এবং জনসাধারণের দাবীর সঙ্গে উচ্চ কণ্ঠে নিজের সুর মিলিয়েছেন। একজন মহৎ ব্যক্তির পক্ষে 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করা সামান্য ঘটনা, কিন্তু এই উপাধি তাঁর কাছে বৃটিশ রাজপ্রতিনিধির রোষ হিসাবেই প্রকাশ পেয়েছিল। সেই সময়ের ইংলিশম্যান কাগজ লিখেছিল, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম পাঞ্জাবের মত অসভ্য জায়গায় কেউ জানেনা এবং তিনি লেখকে হিসাবেও ফ্রাঙ্ক জনসনের মত জনপ্রিয়ও নন, সুতরাং তিনি বৃটিশ সরকারের নীতিসমর্থন করলেন কিনা, তাতে কিছু এসে যায়না। বাঙ্গালী কবি 'নাইট' উপাধি রাখলেন কি শুধু বাবু রইলেন, তাতে বৃটিশ সরকারের সম্মান, নিরাপত্তা ও ন্যায়নীতি, কিছুই ক্ষুণ্ণ হয়না।" কিন্তু ফ্রাঙ্ক জনসনের চাটুকাররা একজন বাঙ্গালীবাবুকে কিছুতেই নোয়াতে পারেনি। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর অবিশ্রাম প্রতিবাদ বর্ষিত হতে লাগল এবং তাঁকে আর একবার নির্জনতা থেকে জনসাধারণের মধ্যে নিয়ে এল। বৃদ্ধ বয়সে তিনি হিজলীতে চণ্ডনীতির বিরুদ্ধে জাতির প্রতিবাদে নেতৃত্বে করতে এগিয়ে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দশ বৎসর উল্লেখযোগ্য। এই বৎসরগুলি জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে বিরাট সংগ্রামের কাল। কিন্তু এই সময়েই আবার আমাদের নেতারা দুর্বল হয়ে অসহায়ভাবে নিষ্ক্রিয়তায় আশ্রয় নিয়ে-

ছিলেন। বাইরের জগতে এই সময় ফ্যাসিবাদের বিভীষিকার অভ্যুত্থানের কাল এবং প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াশীলতার মধ্যে সংগ্রাম সুরু হয়েছে। বুদ্ধিজীবিদের কাছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষণ ছিল এটা। অনেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে রইলেন, হয় তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীলতাকে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করলেন, নয় তারা পুরাতন পরিত্যক্ত রোমান্টিক পলায়নবাদের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। তাদের দুর্বল মনের পক্ষে বাস্তব সত্য খুবই রূঢ় ছিল। কিন্তু মহৎ ব্যক্তিরা নীতি পরিত্যাগ করলেন না, তারা জনগণের সাথেই রইলেন। সচেতন অথবা অচেতনভাবে তাঁরা অনুভব করলেন, তাদের স্থান জনতার সঙ্গে এবং তা থেকে পিছিয়ে আসা যায়না। রবীন্দ্রনাথ এই প্রগতির পথকেই বেছে নিলেন। তিনি হয়ত এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না, কিন্তু তাঁর অবিচল মানবতাবাদ থেকে এ বোধ আপনিই নিঃসৃত হয়েছিল। কবি বহুদিন আগে একবার গজদন্ত মিনারের ব্যর্থতা উপলব্ধি করেছিলেন, আবার 'এবার ফিরাও মোরে'র প্রার্থনা স্মরণ করলেন। তিনি অনুভব করলেন, এই সংঘাতের মধ্যে তিনি তাঁর রোমান্টিক জগতে মৌমাছির গুঞ্জনের মধ্যে ফিরে যেতে পারেন না। রোগশয্যায়ও র‍্যাথবোনের চিঠির উত্তরে তিনি যে খোলা প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন, তার মধ্যে যৌবনের ক্রোধ ও দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছেন। তিনি যে শ্রেণীর মানুষ, সেই শ্রেণী যখন সংগ্রামের পথ থেকে সরে আসছিল, তিনিই তখন এগিয়ে এসে জনসাধারণের সঙ্গে মিলিলেন।

এই জন্যেই তিনি জনগণের কবি বলে খ্যাত হলেন। ধনিক সংস্কৃতির মাঝে জন্মগ্রহণ করে এবং লালিত-পালিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ সময়ের সঙ্গে পা ফেলেছেন। সেই কালের নিদর্শন থেকে জানা যায়, ধনিকশ্রেণী এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলনে, সাধারণ-ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সংস্কৃতির এই মহামিলনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধান মুখপাত্র। তিনি শুধু ধনিকশ্রেণীর কবি, একথা বল্‌লে ভুল হবে।

আবার, তাঁকে স্বশ্রেণীচ্যুত জনগণের কবি বলাও সমান ভুল হবে। সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পরিষ্কার কোন ধারণা ছিল না। সোভিয়েট রাশিয়ায় তাঁর কাছে যেটা সবচেয়ে বড় ঘটনা বলে মনে হয়েছিল, তা বিপ্লব নয়, নিরক্ষরতা-লোপ, কিন্তু এ ঘটনা 'জগতে ধনতন্ত্রবাদের বহু দেশেই সংঘটিত হয়েছে। কৃষকদের মঙ্গলের জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে হিতৈষী

উদ্দেশ্য নিয়ে অনেকটা পিতৃজনোচিত শুভেচ্ছা নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলেন এবং ভেবেছিলেন, শ্রীনিকেতনের মত আদর্শ গ্রাম দারিদ্র্য মোচন করবে। জাতীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি জাতীয় পরিষদ বা বিশ্বভারতীর ভিতর দিয়ে শিক্ষা প্রচার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখানেও তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন যে, শিক্ষাও সামাজিক পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

কিন্তু এসব তার মহত্ব থেকে তাঁকে বিচ্যুত করেনি। তাঁর প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর দরুণই সমসাময়িকযুগের অনেকের থেকে আলাদা হয়ে সাহস এবং স্পষ্টতার সঙ্গে ধনিক যুগের মূল্যাদর্শ সম্পর্কে তার স্বপ্নভঙ্গের কথা ঘোষণা করেছিলেন। স্বশ্রেণীর নৈতিক আদর্শের বিপর্যয়ের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর শেষ জন্মদিনে চরম ব্যর্থতার স্বীকারোক্তি করলেন। তিনি অনুভব করলেন, সত্যকার মানবতাবাদ নূতন দর্শনের মধ্যে, নূতন সমাজব্যবস্থায় এবং নূতন সামাজিক আদর্শে জন্ম নিতে পারে। তিনি শুধু সেই নূতন আদর্শের বহিঃরেখা দেখতে পেয়েছিলেন, তবু তিনি তাকে সাদর অভিনন্দন জানালেন। এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব, যে-মহত্ত্ব আজ যখন সমস্ত জগৎ তাঁর শোকে অভিভূত, তখন হয়ত বোঝা যাবে না, কিন্তু যেদিন সেই সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, সাধারণ মানুষ তার ন্যায্য ঐতিহ্যকে লাভ করবে, সেদিনই তা পূর্ণ স্বীকৃতি পাবে। তারা তাকে এ যুগের কবি বলে আহ্বান জানাবে, কারণ আজকের ঐশ্বর্যময় উত্তরাধিকারই আগামী দিনের উন্নততর সংস্কৃতির যাত্রাপথের প্রথম পদক্ষেপ হবে।

মানবভূমা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যিনি সর্বজগদগত ভূমা তাঁকে উপলব্ধি করবার সাধনায় এমন উপদেশ পাওয়া যায় যে, 'লোকালয় ত্যাগ করো, গুহা-গহ্বরে যাও, নিজের সত্তাসীমাকে বিলুপ্ত করে অসীমে অন্তর্হিত হও।' এই সাধনা সম্বন্ধে কোন কথা বলবার অধিকার আমার নেই। অন্ততঃ আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটাই হচ্ছে এই যে, অপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্র আছে যিনি নিখিল মানবের আত্মা। তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন, তবে সে কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেননা, আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয়, আমার কল্পনা মানবকল্পনা। তাকে যতই মার্জনা করি, শোধন করি, তা মানবচিত্ত কখনই ছাড়তে পারে না……এই বুদ্ধিতে এই আনন্দে যাঁকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা, কিন্তু মানবভূমা। তাঁর বাইরে অন্য কিছু থাকা না থাকা মানুষের পক্ষে সমান। মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি তবে মানুষ হলুম কেন?

[রবীন্দ্রনাথের "মানবসত্য" থেকে]

(১৬০ পৃষ্ঠার পর)

"শীতের সকালে রাস্তা দিয়া খেজুর রস হাঁকিয়া যাইতেছে। ভোরের দিককার ঝাপসা কুয়াশাটা কাটিয়া গিয়া তরুণ রৌদ্রে দিনের আরম্ভ বেলাটা একটু উপভোগযোগ্য আতপ্ত হইয়া আসিয়াছে। সমীর চা খাইতেছে, ক্ষিতি খবরের কাগজ পড়িতেছে এবং ব্যোম মাথার চারিদিকে একটা অত্যন্ত উজ্জ্বল নীলে-সবুজে মিশ্রিত গলাবন্ধের পাক জড়াইয়া একটা অসংগত মোটা লাঠি হস্তে সম্প্রতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

"অদূরে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া স্রোতস্বিনী এবং দীপ্তি পরস্পরের কটিবেষ্টন করিয়া কী একটা রহস্য প্রসঙ্গে বারম্বার হাসিয়া অস্থির হইতেছিল। ক্ষিতি এবং সমীর মনে করিতেছিল এই উৎকট নীলহরিৎ-পশমরাশি-পরিবৃত সুখাসীন নিশ্চিন্তচিত্ত ব্যোমই ঐ হাস্যরসোচ্ছ্বাসের মূল কারণ।"

'পঞ্চভূত' রবীন্দ্রনাথের নূতন ধরণের সৃষ্টি। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে বৈঠকী পরিবেশে কাল্পনিক সংলাপ রচনার উদাহরণ বিরল নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত'-এর সঙ্গে তাদের পার্থক্য কম নয়। বক্তব্যকে স্বচ্ছ ও সুপরিস্ফুট করার জন্য তিনি যে টেকনিক্ অবলম্বন করেছেন, তার মৌলিকতা অনস্বীকার্য।

॥ ৪ ॥

'পঞ্চভূত' কবির প্রথম বয়সের রচনা, কিন্তু মাত্র ত্রিশ বছর বয়সেই যে কবি কতদূর প্রৌঢ় মানসিকতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, তা ভাবলেও বিস্মিত হইতে হয়। নূতন টেক্‌নিকে ডায়েরিগুলি রচনা করলেও, বক্তব্যের গভীরতা খর্ব হয় নি। রচনাগুলিতে পাণ্ডিত্য, তত্ত্ব ও তথ্যের কোনো অভাব নেই, কিন্তু কোথায়ও সেগুলি স্বয়ম্‌প্রধান হয়ে ওঠে নি। প্রচলিত প্রবন্ধের রূপ ও রীতির বন্ধন থেকে কবি তার বক্তব্যকে মুক্ত করেছেন। হাস্যকৌতুক ও লঘু পরিহাসের ভঙ্গীতে কবি যা বলেছেন, তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। 'কাব্যের তাৎপর্য' 'কৌতুকহাস্য', 'মনুষ্য' প্রভৃতি রচনা শুরু হয়েছে লঘু মেজাজে—কৌতুক-পরিহাসের তরলরেখার তুচ্ছ বিষয়ককে ঘিরে উদ্ভাসিত হয়েছে। কিন্তু আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে বক্তব্য যতই অগ্রসর হয়েছে, ততই এর গুরুত্ব ও গভীরতা বেড়েছে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অনেক গভীর

বক্তব্য তিনি বৈঠকী আলোচনা ও পরিহাস-বিতর্কের মধ্য দিয়ে বলেছেন। সহজ ও হালকা চালেও যে জীবনের যে-কোনো গভীর সত্যই আলোচনা করা যায়, এবং এতে বিষয়ের মহিমা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয়ে বরং তাকে শিল্পগৌরবে উজ্জ্বল করে তোলে—'পঞ্চভূত' তার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ।

'পঞ্চভূত'-এর প্রথম রচনাটিতে (পরিচয়) কবি পাঞ্চভৌতিক বৈঠকের নায়ক-নায়িকাদের চরিত্রধর্ম বিশ্লেষণ কার ডায়ারি স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। 'প্রকৃত জীবন' ও ডায়ারির মধ্যে সম্পর্ক কি আলোচনা করতে গিয়ে ব্যোম বলেছে : 'আমি নিজেকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙিতে চাহি না। ভিতরে একটা লোক প্রতিদিন সংসারের উপর নানা চিন্তা, নানা কাজ গাঁথিয়া গাঁথিয়া এক অনাবিষ্কৃত নিয়মে একটি জীবন গড়িয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ডায়ারি লিখিয়া গেলে তাহাকে ভাঙিয়া আর একটি লোক গড়িয়া আর একটি দ্বিতীয় জীবন খাড়া করা হয়।" ডায়ারি সম্পর্কে এই মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। জীবনবিধাতা যে অদৃশ্য জীবনী রচনা করে চলেছেন তার সঙ্গে আত্মজীবনাশ্রয়ী ডায়ারীর একটি অসঙ্গতির আশঙ্কা করেছেন কবি। কারণ "কে আসল কে নকল ক্রমে স্থির করা কঠিন হয়।" জীবনের গতির মধ্যে বহু অসামঞ্জস্য ও স্বতোবিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু ডায়ারির লেখক বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করার চেষ্টা করেন। জীবনের গতির উপর কারও কোনো হাত নেই—সে এক অদৃশ্য শিল্পীর রহস্যময় চিত্রশালা। কিন্তু সচেতনভাবে যখন কেউ ডায়ারি রচনা করে তখন যতদূর সম্ভব সেই ডায়ারিনিহিত জীবনটিকে সে সুবলয়িত ও পূর্ণাঙ্গ করে তোলার চেষ্টা করে। সুতরাং রহস্যময় জীবন-শিল্পীর অদৃশ্য শিল্পরচনার সঙ্গে ডায়ারি রচয়িতার সচেতন প্রয়াসের যে বিরোধ ঘটবে তাতে আর বিচিত্র কি!

'জীবনস্মৃতি'র প্রথমেই কবি 'জীবনের ছবি' সম্পর্কে যা বলেছেন তা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে : "স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবি আঁকে। অর্থাৎ, যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়ো ছোটো করে, ছোটোকে বড়ো করিয়া তোলে। সে আগের জিনিষকে পাছে এবং পাছের জিনিষকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত, তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।"

'জীবনস্মৃতি'র ভূমিকায় কবি মূলত স্মৃতির শিল্পের কথাই বলেছেন। কিন্তু আত্মস্মৃতি ও ডায়ারির মধ্যে যে পার্থক্যই থাকুক না কেন, ব্যক্তিত্বের নিভৃত উৎসমুখ উদ্‌ঘাটনে কারও ভূমিকা কম নয়। স্রোতস্বিনী ডায়ারি রচনার যে দুর্বলতাকে নির্দেশ করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য : "ডায়ারি রাখিতে গেলে একটা কৃত্রিম উপায়ে আমরা জীবনের প্রত্যেক তুচ্ছতাকে বৃহৎ করিয়া তুলি, এবং অনেক কচি কথাকে জোর করিয়া ফুটাইতে গিয়া ছিঁড়িয়া অথবা বিকৃত করিয়া ফেলি।" রচয়িতার দৃষ্টি দ্বারাই ডায়ারি নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই তার বিশেষ মেজাজ অনুযায়ী জীবনের ঘটনা নির্বাচিত হয়। জীবনের দিক থেকে যা সামান্য, ডায়ারি রচয়িতার কাছে তাই অসামান্য হয়ে ওঠে, অর্ধস্ফুটকে অতিস্ফুট করে তোলা হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে ডায়ারি অর্থ জীবনের ঘটনাপঞ্জী নয়, জীবনের পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্তও নয়। 'জীবনস্মৃতি'র মধ্যে যেমন কবি জীবনের ইতিবৃত্ত রচনা করতে চান নি, তেমনি প্রতিদিনের তুচ্ছ ঘটনা দিয়ে ডায়ারিকেও ভারাক্রান্ত করতে চান নি। তাই কবি বলেছেন : "কী হইবে প্রত্যেক তুচ্ছ দ্রব্য মাথায় তুলিয়া প্রত্যেক ছিন্নখণ্ড পুঁটুলি পুরিয়া, জীবনের প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত পশ্চাতে টানিয়া লইয়া। প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক ভাব প্রত্যেক ঘটনার উপর যে ব্যক্তি চাপিয়া পড়ে সে অতি হতভাগ্য।" ডায়ারি সম্পর্কে কোনো পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা কবির উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু যেটুকু আভাস-ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন তা ডায়ারির স্বরূপ-প্রকৃতিকে অনেকখানিই আলোকিত করে।

সম্পাদনা—মনোহর দাস।

: গল্প :

শিশিরের রাত—স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

: প্রবন্ধ :

সাহিত্যে অশ্লীলতা—নিত্যপ্রিয় ঘোষ

হোফ্‌মান সম্পর্কে—মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরনো বই : নতুন চিন্তা

কল্যাণকুমার সরকার

: কবিতা :

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, দীপক মজুমদার, গৌর পাল, অশোক চট্টোপাধ্যায়, প্রগতি মল্লিক, বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, রণেন ভৌমিক, মনোহর দাস।

আলোচনা

এই দশকের গল্প (বিমল কর সম্পাদিত)

অলোক রায়

তিন দিন তিন রাত্রি (নরেন্দ্র মিত্র)

বীরেন্দ্র দত্ত

মহীয়সী (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী)

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

মল্লিকা (বিমল কর)

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

New English Dramatists

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

একতা (বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা)

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

দাম : ০·৬২ ২৫।১, ঘোষাল বাগান, শালকিয়া, হাওড়া।

পরিবেশক : নিউ বুক ষ্টল, ১৭৯।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কোলকাতা-৬

প্রবন্ধ পত্রিকা

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা
জৈষ্ঠ, ১৩৬৮ (১৮৮৩ শকাব্দ)
দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

সূচীপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	॥ ১— ॥	অপ্রকাশিত চিঠি
রথীন্দ্রনাথ রায়	॥ ২—১২ ॥	রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূত
আর. পি. ভাস্কর	॥ ১৩—১৬ ॥	ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ
বাসব সরকার	॥ ১৭—৩৫ ॥	রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি-চিন্তা
	॥ ৪৯—৫৫ ॥	
রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত	॥ ৩৬—৪৩ ॥	উপন্যাসে আধুনিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ
সরোজ আচার্য	॥ ৪৪—৪৮ ॥	রবীন্দ্রনাথ : "চার অধ্যায়"
সুনীল চক্রবর্তী	॥ ৫৬—৭২ ॥	'তিন সঙ্গী'র স্বরূপ ও সামগ্রিকতা
প্রণবেশ সেন	॥ ৭৩—৮৩ ॥	গল্পগুচ্ছে-মৃত্যু
জিতেন্দ্র ঘোষ	॥ ৮৪—৯২ ॥	রবীন্দ্রনাথের কথাশিল্প
অজয় ভট্টাচার্য	॥ ৯৩—১০২ ॥	রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভূমিকা
অশোক মুস্তাফী	॥ ১০৩—১০৬ ॥	রবীন্দ্রদর্শন : সমাজ ও কাল

সম্পাদনা

রামেন্দু দত্ত

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

দেশ-বিদেশে রবীন্দ্রনাথ

(সংকলন)

রবীন্দ্রজন্ম-শতবর্ষ উপলক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মনীষীরা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরেও অনেকে রবীন্দ্র-প্রতিভার আলোচনা করেছিলেন। বর্তমান সংকলন পত্রে সেই সমস্ত লেখার বাংলা অনুবাদ একত্র করে প্রকাশ করা ব্যবস্থা হয়েছে। ভারতের বাইরের বিভিন্ন দেশের তেইশটি রচনাসহ মোট পঁয়ত্রিশটি রচনা সংকলিত হয়েছে। এই সংকলন পত্রের বৈশিষ্ট্য হলো, কবির নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির সংগে সংগে প্রতীচ্যে কী প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্যে রবীন্দ্রপ্রভাব ॥ সম্পাদনা করেছেন: **কমলাপতি দে** ও **বাসব সরকার** ॥ মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ ॥

॥ প্রকাশক ॥

বসু প্রকাশনী

১১৯ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬ ।

অপ্রকাশিত চিঠি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(অধ্যাপক শ্রীকালীপদ সেনকে লিখিত)

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

সঙ্কলনে উদ্ধৃত যে লেখাটির উল্লেখ করেচ সেটা বহুকাল পূর্বের রচনা। শরৎকালের বর্ণনাটি কোন্ ইংরেজি কবিতা থেকে তর্জমা করেছিলাম স্পষ্ট মনে পড়চে না—আন্দাজ করচি Watson-এর কোনো লেখা থেকে। যদি তাঁর রচনাবলী হাতের কাছে থাকে হয়তো খুঁজে পাবে। আর একবার সন্ধান করে দেখব যদি চোখে পড়ে তোমাকে খবর দেব। তর্জমাটি খুব অবিকল হয়েচে কি না সন্দেহ আছে। ইতি—২৫শে আগষ্ট ১৯৩৪।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীকালীপদ সেন তখন হুগলি মহসীন কলেজের অধ্যাপক। 'সংকলন'-এর 'শরৎ' নামের প্রবন্ধটিতে ('পরিচয়' থেকে সংকলিত) একজন ইংরেজ কবির একটি শরৎ-বর্ণনার উল্লেখ আছে। অধ্যাপক সেন সেই কবির নাম জানতে চেয়ে পত্র লেখেন। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ এই চিঠি দিয়েছিলেন।

'শরৎ'-এর প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এখানে তুলে দেওয়া হোলো :

একজন আধুনিক ইংরেজ-কবি শরৎকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন, "তোমার ঐ শীতের আশঙ্কাকুল গাছগুলাকে কেমন যেন আজ ভূতের মতো দেখাইতেছে, হায় রে; তোমার ঐ কুঞ্জবনের ভাঙা হাট, তোমার ঐ ভিজা পাতার বিবাগী হইয়া বাহির হওয়া! যা অতীত এবং যা আগামী তাদের বিষণ্ণ বাসরশয্যা তুমি রচিয়াছ। যা কিছু ম্রিয়মান তুমি তাদেরই বাণী, যত-কিছু 'গতস্য শোচনা' তুমি তারই অধিদেবতা।" —সম্পাদক

'সংসদে'র সৌজন্যে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রবীন্দ্রনাথের "পঞ্চভূত"

রথীন্দ্রনাথ রায়

৫

'পঞ্চভূত' গ্রন্থের রচনাগুলি বৈঠকী আলোচনার নানা উপকরণে দানা বেঁধে উঠেছে। বিচিত্র প্রসঙ্গের অবতারণা করা হলেও মূল বক্তব্য খণ্ডিত হয় নি। তাই কবির বক্তব্যকে মোটামুটি কয়েকটি সূত্রে নির্দেশ করা যায়ঃ (ক) নারী-পুরুষের সম্পর্ক-বৈচিত্র্য, (খ) প্রেম, (গ) সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কিত মন্তব্য (ঘ) সৌন্দর্য সম্পর্কিত কয়েকটি মূলগত অলোচনা। অবশ্য এই কয়েকটি প্রধান বিষয় ছাড়াও তিনি লঘুগুরু নানা প্রসঙ্গ সম্পর্কে বিদগ্ধ মন্তব্য করেছেন।

'নরনারী' রচনাটিতে নারী-পুরুষের তুলনামূলক আলোচনা বহু বিতর্কের তীক্ষ্ণ শরক্ষেপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আলোচনার সূত্রপাত করেছে সমীর; তার মতে বাংলা সাহিত্যে নায়িকারই প্রাধান্য, নায়ক "ক্ষীণতম উপগ্রহের ন্যায়।" একটি উপমার দ্বারা সে তার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করেছে। "বঙ্গসাহিত্যে পুরুষ মহাদেবের ন্যায় নিশ্চলভাবে ধূলিশয়ান এবং রমণী তাহার বক্ষের উপর জাগ্রত জীবন্তভাবে বিরাজমান।" সমীর বঙ্কিমচন্দ্রের যে কয়েকটি উপন্যাস থেকে উদাহরণ দিয়েছে, ক্ষিতি তাকে একটি ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছে। মানসপ্রধান জগতে নারীর প্রাধান্য, কিন্তু কর্মপ্রধান জগতে পুরুষের কর্তৃত্ব। দীপ্তি শান্তি, বিমলা, দেবীচৌধুরাণী প্রভৃতি চরিত্রের উল্লেখ করে ক্ষিতির মন্তব্যকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছে। সমীর কোনো প্রকারে এই দুটি বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য স্থাপন করার চেষ্টা করেঃ 'হৃদয়বৃত্তিতে স্ত্রীলোকই শ্রেষ্ঠ এমন কেহ লিখিয়া পড়িয়া দিতে পারে না। ওথেলো তো মানসপ্রধান নাটক কিন্তু তাহাতে নায়কের হৃদয়াবেগের প্রবলতা কী প্রচণ্ড! কিং লিয়ারের হৃদয়ের ঝটিকা কী ভয়ংকর।" ব্যোমে নারী-পুরুষের ভূমিকার মধ্যে একটি দার্শনিক ভাব আবিষ্কার করেছে। তার মতে, "কার্যক্ষেত্র

ব্যতীত স্ত্রীলোকের অন্যত্র স্থান নাই। যথার্থ পুরুষ যোগী, উদাসীন, নির্জনবাসী।"

স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, এই নিয়ে যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে, সেখানেও ভূতনাথবাবুর সমর্থন পেয়েছে মেয়েরা। কিন্তু এই আলোচনার মধ্য দিয়ে দীপ্তি ও স্রোতস্বিনীর চরিত্রধর্ম ও অন্তঃপ্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। দীপ্তির কণ্ঠে বিদ্রোহের ঝাঁজ ও তিক্ততা পুরুষজাতের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ শরবর্ষণ করেছে: "পতিদেবপূজা হ্রাস হইতেছে বলিয়া যাঁহারা আধুনিক স্ত্রীলোকদিগকে পরিহাস করেন, তাঁহাদের যদি লেশমাত্র রসবোধ থাকিত তবে সে বিদ্রূপ ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের নিজেদের বিদ্ধ করিত।" নারীর যে 'সবলা' মূর্তি রবীন্দ্র-সাহিত্যে নানা-ভাবে রূপ পেয়েছে, দীপ্তি চরিত্রে তারই আভাস পাওয়া যায়। নারীর বিদ্রোহ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দীপ্তি চরিত্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে। স্রোতস্বিনী শুধু প্রেয়সী-নারীই নয়, তার মধ্যে সেবাব্রতা কল্যাণীমূর্তিরও খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। ভূতনাথবাবুর কণ্ঠেও গৃহলক্ষ্মীবন্দনা মুখরিত হয়ে উঠেছে। আধুনিক নারীর কাছে এর আবেদনটিও লক্ষণীয়: "তোমরা শিক্ষিতা নারীরা তোমাদের হৃদয়ের সৌন্দর্য লইয়া যদি এই সমাজের মধ্যে এই অসংযত কার্যস্তূপের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াও তবেই ইহার মধ্যে লক্ষ্মীস্থাপনা হয়, তবে অতি সহজেই শোভন পরিপাটি এবং সামঞ্জস্য হইয়া আসে।"

'নরনারী'তে নারীচরিত্র বিশ্লেষণের দিকটিকই বিস্তৃততর, পুরুষের দিকটি তুলনামূলকভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এ কথা মনে করা অন্যায় হবে না যে, নারীচরিত্র বিশ্লেষণই রচনাটিতে মুখ্য হয়ে উঠেছে এবং এইজন্য পুরুষ চরিত্র বিশ্লেষণের যতটুকু প্রয়োজন, তার বেশি এখানে নেই। কিন্তু আলোচনার শেষ অংশে পুরুষ চরিত্র সম্পর্কে কবি যে মন্তব্য করেছেন, একাধিক কারণে তা উল্লেখযোগ্য: "যথার্থ পুরুষ হওয়া সহজ নয়, তাহা দুর্মূল্য বলিয়াই দুর্লভ। আদর্শ নারীর উপকরণ আয়োজন অনেকখানিই যোগাইয়াছে প্রকৃতি। প্রকৃতির আদুরে সন্তান নয় পুরুষ, বিশ্বের শক্তিভাণ্ডার তাহাকে লুঠ করিয়া লইতে হয়। এইজন্য পৃথিবীতে অনেক পুরুষ অকৃতার্থ। কিন্তু যাহারা সার্থক হইতে পারে তাহাদের তুলনা তোমাদের মেয়েমহলে মিলিবে কোথায়?...

মেয়েরা সেখানেই ত্যাগ করে যেখানে তাহাদের প্রবৃত্তি ত্যাগ করায়, তাহাদের সন্তানের জন্য, প্রিয়জনের জন্য! পুরুষের যথার্থ ত্যাগের ক্ষেত্র প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে।"

'নরনারী' ডায়ারির প্রথমেই যে প্রশ্নটি উপস্থাপিত হয়েছিল, তর্কের ধূলিজালের মধ্যে তা সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। আমাদের সাহিত্যে স্ত্রী-চরিত্রগুলি প্রাধান্য লাভ করেছে—ডায়ারি পড়ে মোটামুটি এই ধারণা করা যায়, কিন্তু তার যথোপযুক্ত কারণ দেখানো হয় নি। প্রশ্নটিকে পাশ কাটিয়ে নারী-পুরুষের বিচিত্র জীবনতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। নারীর গৃহলক্ষ্মী মূর্তি, ও ব্যক্তিত্বময়ী বিদ্রোহিনী রূপ কবিদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। নারীসত্তার বিচিত্র উদ্বোধনের নানা পরিচয় রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিচিত্ররেখায় উৎকীর্ণ। 'দুইবোন' উপন্যাসে কবি দুই নারী তত্ত্বের যে কাহিনী-ভাষ্য রচনা করেছেন, তার বীজমন্ত্রটিও এখানে নিহিত আছে। নারী-পুরুষের আভ্যন্তরীণ ভাবরূপটিকেও কবি নানা উপমায় রূপ দিয়েছেন। 'অখণ্ডতা' রচনাটির মধ্যেও কবি তাঁর পূর্ববর্তী বক্তব্যকেই স্পষ্ট করে তুলেছেন: "রূপকে যদি কাহারও আপত্তি না থাকে তবে আমি বলি আমাদের এই চঞ্চল বহিরংশ পুরুষ, এবং এই বৃহৎ গোপন অচেতন অন্তরংশ নারী।...পুরুষ উপস্থিত আবশ্যকের সন্ধানে সময়স্রোতে অনুক্ষণ পরিবর্তিত হইয়া চলিতেছে, কিন্তু সেই সমুদয় চঞ্চল প্রাচীন পরিবর্তনের ইতিহাস স্ত্রীলোকের মধ্যে স্তরে স্তরে নিত্যভাবে সঞ্চিত হইতেছে।" বলাবাহুল্য, নারী-পুরুষের ভাবরূপ ও আইডিয়ার নানা ব্যাখ্যা কবি দিয়েছেন। ব্যক্তি-জীবনের নেপথ্যে কবি চিরন্তন আইডিয়া নিয়ে যে ভাবসত্যগুলি ফুটিয়েছেন, তার মধ্যে বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু কবির নিত্যরূপসন্ধানী বিদগ্ধ মনের ঐশ্বর্য অস্বীকার করা যায় না।

'নরনারী'র ডায়ারির শেষ দিকে কবি পুরুষ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা সংক্ষিপ্ত হলেও তীক্ষ্ণ। 'যথার্থ পুরুষ' চরিত্রের দুর্লভ সাধনাকেই কবি এখানে ইঙ্গিত করেছেন। পুরুষের ত্যাগের ক্ষেত্র বৃহত্তর জগৎ, সেখানে তাকে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়। তাই সার্থক পুরুষের সংখ্যা কম হলেও, যাঁরা সার্থক হয়েছেন মেয়েমহলে তাঁদের তুলনা নেই। প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্যই তাদের সিদ্ধির পথে নানা

অন্তরায়, পথভ্রষ্ট করার জন্য ছলনার নানা নিপুণ ফাঁদ পাতা। 'কাব্যের তাৎপর্য' ডায়ারিতে কবি কচ ও দেবযানী সংবাদ আলোচনা করেছেন। কাব্যের রসের চেয়ে তাৎপর্য ব্যাখ্যার দিকেই এখানে জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই কাহিনীর মধ্যেও কবির বক্তব্যটি সুপরিস্ফুট হয়েছে। কচ ও দেবযানীর ট্র্যাজেডির মূলে নারী ও পুরুষের বিরুদ্ধ জীবন-প্রবাহের সংঘাত। দেবযানী প্রেমমুগ্ধা, সে তার উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ দিয়ে কচের তপঃনিষ্ঠ মানসলোকে একটি স্মৃতিরঞ্জিত প্রেমবেদনার সুর ঝঙ্কৃত করে তুলেছে। দেবযানীর প্রেমের প্রবাহ বর্ষাতরঙ্গিনীর মতো—এখানে বেগের প্রবলতা যেমন আছে, তেমনি আছে শ্লেষের ঘূর্ণ্যাবর্ত। সূর্যালোকিত লাভাস্রোতের মতো তার দীপ্তি ও দাহ। প্রেমৈকজীবিতা এই নারীর প্রবল প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অন্য কোনো শক্তি এখানে নেই। কিন্তু কচ সম্পর্কে ঠিক এ কথা বলা যায় না। দেবযানীকে সে ভালোবাসে, কিন্তু সে ভালোবাসার পথ বিঘ্নসঙ্কুল। কঠোর কর্তব্য তার সামনে—দৈত্যগুরুর কাছে সঞ্জীবনীবিদ্যা শিখে স্বর্গলোকে যেতে হবে। সঞ্জীবনীবিদ্যা আহরণের কঠোর কর্তব্যই তার পৌরুষ। তাই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে তার দাঁড়াতে হয়েছে। সার্থকতার স্বর্গলোক রচিত হয়েছে তারই বাণবিদ্ধ হৃদয়ের রক্তচিহ্নিত পথে :

ভালবাসি কি না আজ
সে তর্কে কি ফল? আমার যা আছে কাজ
সে আমি সাধিব।

কর্তব্যনিষ্ঠা ও প্রেমের দ্বিধাগ্রস্ত তার মধ্যেও কচ দেবযানীকে ত্যাগ করেছে। দেবযানীর কাছে এ আদর্শের কোনো আবেদন নেই। নারী-পুরুষের এই চিরন্তন ট্র্যাজেডিতেই 'পঞ্চভূত' এর 'নরনারী' ডায়ারির শেষ অংশে চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

'পঞ্চভূত' এর ডায়ারিগুলির মধ্যে নানাপ্রসঙ্গে কবি শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। পাঞ্চভৌতিক বৈঠকের সভ্য-সভ্যাদের উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়ে অনেক জটিল তত্ত্বের উপর আলোকপাত করা হয়েছে, কিন্তু পাণ্ডিত্য ফলানোর সামান্যতম চেষ্টাও এখানে নেই। বৈষ্ণব কাব্যপ্রসঙ্গে প্রেমতত্ত্বের স্বরূপটি এখানে স্বল্পসংক্ষিপ্ত একটি মন্তব্যে উদ্ভাসিত হয়েছে : "যাহাকে আমরা ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা

অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি, জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই আর এক নাম ভালবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য-সম্ভোগ। ইহা হইতেই মনে পড়িল, সমস্ত বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে।"

'মনুষ্য' রচনাটির মধ্যে কবি যে মন্তব্য করেছেন তা বৈষ্ণবধর্মের মৌলিক রহস্যটিকে উদ্‌ঘাটিত করেছে। পাণ্ডিত্য প্রকাশ বা টীকা-কণ্টকিত গবেষণার স্বল্পতম প্রচেষ্টাও এখানে অনুপস্থিত। রসদৃষ্টির চাবিকাঠি হাতে নিয়ে তিনি সহজেই বৈষ্ণবধর্মের নিগূঢ় মর্মমূলে প্রবেশ করেছেন। কবি এখানে যে সূত্রের সাহায্যে বৈষ্ণবধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন তা তাঁর অতিপরিচিত সীমা-অসীমতত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই নাই।— 'এ চিরজীবন তাই আর কিছু কাজে নাই, রুচি শুধু অসীমের সীমা।" তাঁর প্রেমচেতনার মধ্যেও যে সীমা-অসীমতত্ত্ব কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে, বৈষ্ণবধর্মের ব্যাখ্যা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রেমিকের হৃদয় বিশ্লেষণের চেয়েও প্রেমের অসীম স্বরূপ নির্ণয়ের দিকেই কবির অধিকতর প্রবণতা।

সাহিত্যতত্ত্বের যে সমস্ত কথা সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধে বলেছেন, এখানে বৈঠকী আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে তাকে সহজেই হৃদয়গ্রাহী করে তোলা হয়েছে। প্রকাশের কথা আলোচনা করতে গিয়ে কবি বলেছেন: "মানুষের ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা অতিশয় অল্প; এইজন্য প্রকাশের সঙ্গে নির্দেশ, ভাষার সঙ্গে ভঙ্গী, ভাবের সহিত ভাবনা যোগ করিয়া দিতে হয়।" শুধু মানুষের ব্যক্ত করার ক্ষমতাই কম নয়, ভাবপ্রকাশ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তাই সঙ্কেত-ব্যঞ্জনা, উপমা, চিত্রকল্প, নানা রূপসজ্জা ও কৌশল-চাতুর্যের আশ্রয় নিতে হয়। কবি এখানে যে প্রশ্নটি তুলেছেন, তাও প্রণিধান-যোগ্য: বলার বিষয় ও বলার ভঙ্গি, কোনটির গুরুত্ব বেশি? এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছে ব্যোম: "যতটুকু বিষয়রূপে প্রকাশ করিলে ততটুকু জড়দেহ মাত্র, ততটুকু সীমাবদ্ধ; যতটুকু ভঙ্গির দ্বারা তাহার মধ্যে সঞ্চার করিয়া দিলে তাহাই জীবন, তাহাতেই তাহার বুদ্ধিশক্তি, তাহার চলৎশক্তি সূচনা করিয়া দেয়।" পুরাতন বিষয় কুশলী শিল্পীর নবীন ভঙ্গিমায় নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। বলাবাহুল্য, কবি এখানে 'ভঙ্গি' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। কবির মতে ভঙ্গি শুধু রচনারীতি নয়, রচয়িতার

ব্যক্তিত্বও বটে। সেইজন্য দীপ্তির মুখ দিয়ে পরে 'স্টাইল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অবশ্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের বিষয় ও ভঙ্গিকে স্বতন্ত্র করা সম্ভব নয়। কারণ যিনি প্রতিভাবান সাহিত্যিক তাঁর কোনোটির জন্যই পৃথক যত্নের প্রয়োজন হয় না।

'মনুষ্য' ডায়ারির শেষদিকে কবি আধুনিক সাহিত্যের সুর-পরিবর্তনের উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন যুগের সাহিত্যে বড়ো বড়ো কীর্তিমান মানুষের কাহিনীই উচ্চারিত হতো, কিন্তু এ কালের সাহিত্যে 'অকৃতী' অক্ষমেরাও স্থান পেয়েছে। 'পঞ্চভূত' যে যুগে রচিত হয়েছে, তখন কলকাতার নাগরিক জীবনের বাইরেও যে বৃহত্তর বাংলাদেশ আছে, তার সঙ্গে কবির পরিচয় ঘটেছে। পল্লীবাংলার শান্তস্নিগ্ধ নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রা এর আগে বাংলাসাহিত্যে তেমন মূল্য পায় নি, 'ছোট প্রাণ ছোট কথা, ছোট ছোট দুঃখ ব্যথা' তেমন ভাবে শিল্পমহিমায় উদ্ভাসিত হয় নি। গল্পগুচ্ছের গল্পমালায় ও ছিন্নপত্রে এই জীবনের রসভাষ্য রচিত হয়েছে। এই যুগে কবি যথার্থই 'মূক-জাতির ভাষা' ও 'ভস্মাচ্ছন্ন অঙ্গারের আলোক' প্রকাশ করেছেন। জীবনের নবীন অভিজ্ঞতাই সুন্দর একটি উপমায় বিকৃত হয়েছে: "নবোদিত সাহিত্য সূর্যের আলোক প্রথমে অত্যুচ্চ পর্বতশিখরের উপরেই পতিত হইয়াছিল, এখন ক্রমে নিম্নবর্তী উপত্যকার মধ্যে প্রসারিত হইয়া ক্ষুদ্র দারিদ্র্য কুটিরগুলিকেও প্রকাশমান করিয়া তুলিতেছে।"

'গদ্য ও পদ্য' প্রসঙ্গটিয় মূল বক্তব্য পদ্য ও গদ্যের পার্থক্য তথা সম্পর্ক নির্ণয়। কিন্তু মূল বক্তব্য ছাড়িয়ে এখানে বিচিত্র প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। বাস্তববাদী ক্ষিতির মতে কবিতার মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে গদ্য মিশিয়ে দিলে বা সাধারণ গদ্যজীবী লোকের পক্ষে পরিপাকের সুবিধা হয়, 'কিন্তু গদ্যের মধ্যে কবিত্ব একেবারে অচল।' রবীন্দ্রনাথ এখানে বলেছেন: 'পদ্য অন্তঃপুর, গদ্য বহির্ভবন।' অবশ্য শেষজীবনে কবি গদ্য ও পদ্যের ভাশুর ভাদ্রবৌ সম্পর্কে মানেন নি—'ভাষার জলস্থল' ও 'ভাষার গৃহস্থালী'কে মিলেয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রথম জীবনের সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে কবিতা ও গদ্যের রূপগত ও আস্বাদনগত পার্থক্যের কথা একাধিকবার উল্লেখ করেছেন, প্রসঙ্গক্রমে সাহিত্যিকে কেন সঙ্গীতাশ্রয়ী হতে হয় তাও বলেছেন: "এছাড়া ছন্দে শব্দে বাক্যবিন্যাসে সাহিত্যকে সংগীতের আশ্রয় তো গ্রহণ করিতেই হয়। যাহা কোনোমতেই বলিবার

জো নাই, সেই সংগীত দিয়াই তাহা বলা চলে।" (সাহিত্যের তাৎপর্য : সাহিত্য) প্রবন্ধটি রচনার এগার বছর আগে 'গদ্য ও পদ্য' রচিত হয় (ফাল্গুন, ১২৯৯)। কবি এখানেও পূর্বোক্ত প্রবন্ধেরই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন : "এইজন্য কবিরা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে একটা সংগীত নিযুক্ত করিয়া দেন। সে আপন মায়াস্পর্শে হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করিয়া দেয়।" গদ্য, ও পদ্যের সম্পর্ক ডায়ারির সূত্রপাত ঘটেছে, কিন্তু নাট্যপ্রসঙ্গ দিয়ে উপসংহার করা হয়েছে। সমালোচকেরা নাটককে একটি যৌথ শিল্প বলেছেন। সার্থক নাট্যশিল্পের জন্য নাট্যকার, প্রযোজক, মঞ্চনির্দেশনা, অভিনয় এমন কি দর্শকদলের রসরুচিরও বাঞ্ছিত সমন্বয়ের প্রয়োজন। এদের মধ্যে বিশেষ একদলের বা একজনের প্রতিভার উপরেই নাটক নির্ভরশীল নয়। রবীন্দ্রনাথ নাটকের মধ্যে বিভিন্ন শিল্পের সম্মিলিত রূপ লক্ষ্য করেছেন। সাহিত্যের আর কোনো প্রকরণের মধ্যে বিভিন্ন শিল্পের এখন যৌথরূপ অনুপস্থিত। একজন খ্যাতনামা সমালোচকের মতে **"To the creation of a play the author is only one contributor for success, co-partnership is essential, and in it actors, produces, designers and technicians must also be consulted."** রবীন্দ্রনাথ যৌথশিল্প বলতে আরো অগ্রসর হয়েছেন, শিল্পপ্রকরণ ভাবরূপের মধ্যে প্রবেশ করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন : "নাট্যাভিনয়ে আমাদের হৃদয় বিচলিত করিবার অনেকগুলি উপকরণ একত্রে বর্তমান থাকে। সংগীত, আলোক, দৃশ্যপট, সুন্দর সাজসজ্জা, সকলে মিলিয়া নানাদিক হইতে আমাদের চিত্তকে আঘাত করিয়া চঞ্চল করে; তাহার মধ্যে একটি অবিশ্রাম ভাবস্রোত নানা মূর্তি ধারণ করিয়া, নানা কার্যরূপে প্রবাহিত হইয়া চলে—আমাদের মনটা নাট্যপ্রবাহের মধ্যে একেবারে নিরুপায় হইয়া আত্ম-বিসর্জন করে এবং দ্রুতবেগে ভাসিয়া চলিয়া যায়। অভিনয়স্থলে দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন আর্টের মধ্যে কতটা সহযোগিতা আছে, সেখানে সংগীত সাহিত্য চিত্রবিদ্যা এবং নাট্যকলা এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সম্মিলিত হয়, বোধ হয় এমন আর কোথাও দেখা যায় না।"

৭

'কাব্যের তাৎপর্য' রচনাটিতে কাব্যবিচারের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও

মানদণ্ডের কথা আলোচিত হয়েছে। কচ ও দেবযানী সংবাদ (বিদায় অভিশাপ) কেন্দ্র করে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। পাঞ্চভৌতিক সভার সভ্য-সভ্যারা উৎসাহের সঙ্গে বিতর্কে যোগ দিয়ে কবিতাটির নানা ব্যাখ্যা করেছেন। কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে তত্ত্বনির্ণয়ের প্রচেষ্টা রসাস্বাদনের বিঘ্ন ঘটায়, প্রকৃত রসব্যাখ্যাতার সে পথ নয়: "কচ দেবযানী সংবাদেও মানব হৃদয়ের এক অতি চিরন্তন এবং সাধারণ বিষাদ কাহিনী বিবৃত আছে, সেটাকে যাঁহারা অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন এবং বিশেষ তত্ত্বকেই প্রাধান্য দেন তাঁহারা কাব্যরসের অধিকারী নহেন।" কচ ও দেবযানী সংবাদ কবিতাটি থেকে বহু তত্ত্বই নিষ্কাষিত করা সম্ভব, তাতে প্রচুর পরিমাণে নীতিবাক্য ও তত্ত্ব কথাও থাকতে পারে। কিন্তু কাব্যরস আস্বাদনে এই শ্রেণীর বিচার সম্পূর্ণ নিরর্থক। তত্ত্বের অবাঞ্ছিত স্পর্শে কাব্যের সহজ সৌন্দর্য নিষ্প্রভ হয়। কবি শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে বলেছেন: "কাব্য হইতে কেহ বা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহ বা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহ বা নীতি কেহ বা বিষয় জ্ঞান উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকেন, আবার কেহ বা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না—যিনি যাহা পাইলেন তাহাই লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিতে পারেন, কাহারও সহিত বিরোধের আবশ্যক দেখি না—বিরোধে ফলও নাই।"

'পঞ্চভূত'-এর হাস্যরস সম্পর্কিত দুটি ডায়ারিও (কৌতুকহাস্য ও কৌতুকহাস্যের মাত্রা) অত্যন্ত মূল্যবান। বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিচার করলে 'কৌতুকহাস্য' নামকরণকে নিতান্ত আংশিক বলে মনে হয়। কৌতুক হাস্য বা 'ফান'ই প্রবন্ধ দুটির উপজীব্য নয়—মোটামুটিভাবে হাস্যরস সম্পর্কে সাধারণ আলোচনাই করা হয়েছে। কৌতুকে হাসি কেন?—এই প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনার সূত্রপাত্র। বস্তুবাদী ক্ষিতি হাস্য প্রকাশ সম্পর্কে দৈহিক বিকৃতির যে গদ্যাত্মক বর্ণনা করেছেন তা হার্বার্ট সেপন্সারের মনের অনকূল। সেপন্সারও বলেছেন: **"Nervous excitation always tends to beget muscular motion, and when it rises to a certain intensity, always does beget it."** এই কারণই সমীরের মনে হয়েছে যে কৌতুকে আমোদ অনুভব করা নিতান্ত অযৌক্তিক। মুখের হাসি ও কৌতুকের হাসির মধ্যে যে পার্থক্যের সূক্ষ্ম সীমারেখা টানা হয়েছে তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য: "...প্রকৃত আনন্দের প্রকাশ

স্মিতহাস্যে এবং আমোদ-কৌতুকের প্রকাশ উচ্চহাস্য; সে হাস্য যেন হঠাৎ একটা দ্রুত আঘাতের পীড়নবেগে সশব্দে ঊর্ধ্বে উদ্‌গীর্ণ হইয়া উঠে।"

কমেডি ও ট্র্যাজেডির মধ্যে যে পার্থক্য, তা প্রকৃতপক্ষে পীড়নের মাত্রাগত পার্থক্য। কয়েকটি সুপ্রযুক্ত উপমা ও উদাহরণের সাহায্যে কবি তাঁর বক্তব্যকে পরিস্ফুট করেছেন। কৌতুকের মধ্যে একটি 'অসঙ্গতি ও নিয়মভঙ্গজনিত পীড়া' আছে। হাস্যরসের এই মূলগত বৈশিষ্ট্যকে কবি নানাদিক থেকে বিচার করেছেন। 'কৌতুকহাস্যের মাত্রায়' কবি প্রথমে প্রবন্ধটির দু'তিনটি মূল সূত্রকেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন, নূতন কোনো বক্তব্যের অবতারণা করেন নি। ট্র্যাজেডি ও কমেডির মধ্যে আঘাতের মাত্রাগত পার্থক্যকে এখনি আরো বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

'প্রাঞ্জলতা' রচনাটিতে কবি আর্ট সম্পর্কে একটি গভীর মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। আতিশয্য, অসংযম ও আড়ম্বর উচ্চাঙ্গের শিল্পচর্চার প্রতিবন্ধক—কারণ তা কড়া রঙ ও চড়া সুরের দ্বারা সর্বদাই আত্মঘোষণা করে বটে, কিন্তু মন সেখান থেকে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। গ্রীক প্রস্তরমূর্তির মধ্যে রূপকরণের ও বর্ণের আতিশয্য নেই; কিন্তু এর সর্বপ্রয়াসহীন প্রাঞ্জলতা মনকে সহজেই অধিকার করে। কবি বলেছেন: "কলাবিদ্যায় সরলতা উচ্চ অঙ্গের মানসিক উন্নতির সহচর। বর্বরতা সরলতা নহে। বর্বরতা আড়ম্বর-আয়োজন অত্যন্ত বেশি। সভ্যতা অপেক্ষাকৃত নিরলংকার। অধিক অলংকার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু মনকে প্রতিহত করিয়া দেয়।"

সৌন্দর্য সম্পর্কিত কিছু মন্তব্যও 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ' প্রসঙ্গটির প্রথমেই সৌন্দর্যের অ্যাবস্ট্রাক্ট উর্বশী ও কংক্রিট রূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। পরবর্তীকালে কবিতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে চিঠি লিখেছেন (২-২-১৯৩৩) তাতে এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে: "একই হিসাবেই সৌন্দর্য মাত্রই অ্যাবস্ট্রাক্ট্—সে তো বস্তু নয়, সে একটা প্রেরণা যা আমাদের অন্তরে রসসঞ্চার করে। নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের যে প্রকাশ, উর্বশী তারই প্রতীক।...এর মধ্যে কেবল

অ্যাব্‌সট্র্যাক্‌ সৌন্দর্যে টান আছে তা নয়, কিন্তু যেহেতু নারী রূপকে অবলম্বন করে সেই সৌন্দর্য, সেইজন্যে তার সঙ্গে স্বভাবত নারীর মোহও আছে।" অনেক সময় অ্যাব্‌সট্র্যাক্ট আইডিয়ার সঙ্গে বাস্তব রূপটির কোন যোগ থাকে না। এর জন্যে আইডিয়াটির কোন ক্ষতি না হতে পারে, কিন্তু কবি একে অনুমোদন করতে পারেন নি "সৌন্দর্য অনুভব করিবার জন্য সুন্দর জিনিসের আবশ্যকতা নাই, ভক্তি বিতরণ করিবার জন্য ভক্তিভাজনের প্রয়োজন নাই, এরূপ পরম সন্তোষের আস্থাকে আমি সুবিধা বলিয়া মনে করি না। ইহাতে কেবল সমাজের দীনতা, শ্রীহীনতা এবং অবনতি ঘটিতে থাকে। বহির্জগৎটাকে উত্তরোত্তর বিলুপ্ত করিয়া দিয়া মনোজগৎকেই সর্বপ্রাধান্য দিতে গেলে যে ডালে বসিয়া আছি সেই ডালকেই কুঠারাঘাত করা হয়।"

যে বিচিত্র পাঞ্চভৌতিক বৈঠকের বিবরণ পঞ্চভূতে আছে, তার মধ্যে শিল্প-সাহিত্যের আলোচনা প্রধান স্থান অধিকার করলেও লঘু-গুরু নানা আলোচনাই এখানে স্থান পেয়েছে। সামাজিক জীবনে আচার, আচরণ, সৌজন্য সম্পর্কে তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন, তার যথার্থ সহজেই উপলব্ধি করা যায়। বাঙ্গালী সমাজে যেখানে কবি সৌজন্যের ও ভদ্রতার অভাব দেখেছেন, সেখানে তিনি কঠিন মন্তব্য করতে ছাড়েন নি। সমীর বলেছে "আসল কথা, বেশ-ভূষা আচার-ব্যবহারের স্খলন অজ্ঞতা ও জড়ত্ব সূচনা করে সেইখানেই তাহা কদর্য দেখিতে হয়। সেইজন্য আমাদের বাঙ্গালি সমাজ এমন শ্রীবিহীন।" ভদ্রতার সঙ্গে অর্থের কোন যোগ সেই। এমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। সুতরাং দারিদ্র্যকে অভদ্রতার অনিবার্য কারণ বলা যায় না তাই কবি বলেছেন: "টাকা থাকলেই বড়মানুষি করা যায়, টাকা না থাকলেও ধার করিয়া নবাবি করা চলে, কিন্তু ভদ্র হইতে গেলে আলস্য অবহেলা বিসর্জন করিতে হয়, সর্বদা আপনাকে উন্নত সামাজিক আদর্শের উপোযোগী করিয়া প্রস্তুত রাখিতে হয়, নিয়ম স্বীকার করিয়া আত্মবিসর্জন করিতে হয়।" রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি যে শুধু সুদূর কল্পলোকের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না, তিনি যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকেও সুন্দর ও শোভন করে তুলতে চেয়েছিলেন, এই জাতীয় রচনা থেকে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি শুধু রসেরই সম্রাট ছিলেন না, তিনি ছিলেন রুচিরও পূজারী

তিনি তাঁর জীবনসাধনার ভিতর দিয়ে কামলোককে রূপলোকে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন।

'পঞ্চভূত' গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের গদ্যস্টাইলের বৈচিত্র্য ও বিবর্তনের দিক থেকে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ভাষাতিশয্য, প্রকাশের অস্পষ্টতা, অতিচিত্রল ভাষা, মাত্রাজ্ঞান ও লক্ষ্যভেদের অভাব এখানে নেই। স্পষ্টতা, পরিচ্ছন্নতা ও সংযম ক্ল্যাসিক্যাল স্টাইলের কয়েকটি বড়গুণ। পঞ্চভূতের গদ্যরীতি বিচার প্রসঙ্গে সেই পরিমার্জিত ক্লাসিক্যাল স্টাইলের কথাই মনে হয়। এখানে যে ফ্রেমের উপর বাক্যবিন্যাসই স্থাপিত হয়েছে, তা বিচিত্র কারুকার্যে অলঙ্কৃত না হতে পারে, দৃঢ়তা ও ও স্থিতিস্থাপকতা গুণের কোন অভাব নেই। এই বিশিষ্ট ফ্রেমের মধ্যে কোন প্রকারের আতিশায্যরই স্থান থাকতে পারে না। অথচ পরিহাস থেকে শুরু করে গভীর দার্শনিক ভাব পর্যন্ত এ ভাষা সহজ লীলায় প্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রগদ্যের বিস্তৃত ইতিহাসে কোথায়ও কোথায়ও অতিরিক্ত কৌশল চাতুর্যেরও পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। ভাষাকে জোর করে বাঁকাতে গিয়ে অনেকখানি কৃত্রিমতাও প্রকাশিত হয়েছে। পঞ্চভূতের গদ্যস্টাইলের কৃত্রিমতার অবকাশ নেই। বুদ্ধি ও আবেগের সমন্বয় যেখানে অনুপস্থিত সেখানকার ভাষারই ভারসাম্য হারায়। কৌতুক পরিহাসে, বুদ্ধিদীপ্তিতে, প্রসন্নতায়, সর্বশেষে মানসিক অভিজাত্যের মার্জিত প্রতিফলনে পঞ্চভূতের গদ্যরীতি বিশিষ্টতায় মণ্ডিত।

ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ

আর. পি. ভাস্কর

[প্রখ্যাত হিন্দি সাহিত্যিক বাবু আর, পি, ভাস্কর লিখিত বর্তমান প্রবন্ধটি ডিলিমান রিভ্যু (Diliman Review, University of the Philippines, Diliman Rizal, the Philippine)-তে প্রকাশিত হয় ; দিল্লীর লিটারারী নিউজ বুলেটিন এদেশে প্রথম লেখাটি ইংরেজিতে প্রকাশ করেন। শেষোক্ত পত্রিকা থেকে এখানে অনুবাদ করেছেন পরিতোষ মুখোপাধ্যায়। —সম্পাদক]

যেকোন মূল্যায়নেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬০-১৯৪১) বর্তমান ভারতের উজ্জ্বলতম সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্ব। অন্যান্য বাঙালী লেখকদের মত রবীন্দ্রনাথও মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে তাঁর প্রতিভাকে উৎসর্গিত করেন। বস্তুতঃ তাঁর কয়েকখানি গ্রন্থের অনুবাদের মাধ্যমে বহির্ভারতে বিরাট-সংখ্যক পাঠকলাভের পূর্বে তিনি সরাসরি ইংরেজীতে লেখা সুরু করেন নি।

তিনি বহু ছোটগল্প, উপন্যাস এবং নাটক রচনা করেছেন এবং এসব ক্ষেত্রের অন্যান্য ভারতীয় লেখকদের সৃষ্টি থেকে সেগুলো শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ভুক্ত। যাইহোক, কবি হিসেবে তাঁর আন্তর্জাতিক দীপ্তখ্যাতির নিরিখে আলোচ্যক্ষেত্রে তাঁর অবদানের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি ও স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। ১৯১২ সালে লণ্ডনস্থ ভারতীয় সমিতি (ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব লণ্ডন) কর্তৃক কবির নিজের অনূদিত কয়েকটি বাংলা কবিতার সীমিত সংস্করণ 'গীতাঞ্জলি' নামে প্রকাশিত হওয়ার পর ইংরেজী জানা পাঠকের জগতে তিনি ছড়িয়ে পড়লেন। এই দর্শন-চিন্তা বিধৃত গদ্যকবিতাগুলি সংগে সংগেই সাহিত্যমনা ইংরেজদের কল্পনা ও চিন্তাকে আকৃষ্ট করে এবং পরের বছর কবি পরম আকাঙ্ক্ষিত সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। গীতাঞ্জলির জনপ্রিয়তা বিস্ময়কর : ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে এর প্রথম প্রকাশ্য-সংস্করণ প্রকাশিত হয়, বছর শেষ হওয়ার

আগেই আরও তেরবার পুনর্মুদ্রণ ঘটে এবং পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে আরও চোদ্দবার পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য ভাষায় গীতাঞ্জলির অনুবাদ তার সমান জনপ্রিয়তার স্বাক্ষর বহন করে।

গীতাঞ্জলির এশীয় লেখককে ইউরোপ যে অনতিক্রান্ত এবং অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা জানিয়েছিল তা একটা অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে। সম্ভবত আগের শতকে ইংরেজ, ফরাসী ও জার্মান প্রাচ্যবিদ্‌দের দ্বারা পূর্বের গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পশ্চিমের চোখে তুলে ধ'রবার উদ্যমশীল প্রচেষ্টা তাঁর জনপ্রিয়তাকে সুসাধ্য করে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ইতি-পূর্বেই ভারতীয় ধ্রুপদী-সাহিত্যের সংগে পরিচিত হয়েছিলেন এবং গ্যেটের শকুন্তলা-প্রশস্তিও কয়েক দশক আগেই প্রকাশিত হয়। এও সম্ভব যে, যে বিপর্যয়কারী যুদ্ধের প্রান্তে ইউরোপ তখন অবস্থান করছিল্ সেই দুর্যোগের দিনে রবীন্দ্রকাব্যের সুউচ্চ আদর্শ ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা তাদের আকৃষ্ট করে। পশ্চিমের পাঠকসম্প্রদায়ের কাছে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় প্রদানপ্রসংগে কবি ইয়েটস্ বলেছিলেন, "ঠিক যেমন আমরা যুদ্ধ করি, অর্থ উপার্জন করি এবং রাজনীতির বাজে কচ্‌কচি দিয়ে আমাদের মাথা ভরিয়ে তুলি, তেমনি ভাবে গতানুগতিক পন্থায় আস্থা রেখে আমরা বিরাট বিরাট গ্রন্থ রচনা করি; কিন্তু এ-রচনায় বোধকরি একটা পৃষ্ঠাও লেখার আনন্দ থাকেনা; অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সভ্যতার মতই আত্মার আবিষ্কারেই পরিতৃপ্ত থাকেন এবং তারই স্বতঃস্ফূর্ততার কাছে আত্মসমর্পন করেন।" এই বক্তব্য যদি ইউরোপীয় পাঠকবর্গের চিন্তাধারা প্রতিফলিতক তা হ'লে এটা সুস্পষ্ট যে, রহস্যময় প্রাচ্যের কবির অতীন্দ্রিয়বাদ তাদের প্রভাবিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসই সর্ব-প্রথম ইংরেজীতে প্রকাশিত হয় (১৯১৯)। তারপরে 'গোরা' (১৯২৪) এবং ইংরেজীতে একখানা মৌলিক উপন্যাস 'নৌকাডুবি' (১৯২৫) প্রকাশিত হয়। 'ফেয়ারওয়েল মাই ফ্রেণ্ড' বা 'শেষের কবিতা' (১৯৪৮) লেখকের মৃত্যুর কয়েক বছর পরে প্রকাশিত হয়। (কৃষ্ণ কৃপালনী কর্তৃক অনুদিত)

পাঠক সম্প্রদায়ের কাছে 'গোরা'র জনপ্রিয়তা বেশী হলেও 'ঘরে বাইরে'

রবীন্দ্রনাথের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস। তিনটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত একটি মোহের কাহিনী এই উপন্যাসে বিবৃত—সমগ্র কাহিনীটি স্বামী নিখিল, স্ত্রী বিমলা এবং এই পরিবারের বন্ধু সন্দীপ, এই তিন প্রধান চরিত্রের বিবরণের মাধ্যমে প্রকাশিত। শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান যুবক নিখিল মেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রচলিত পদ্ধতিকে অগ্রাহ্য করে তার বিপরীতে বাড়িতে মেম-শিক্ষয়িত্রী রেখে স্ত্রীকে উত্তম ইংরেজী শিক্ষা দেয়। উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক রাজনৈতিক কর্মী সন্দীপ তাদের পরিবারে যেদিন থেকে বাস করতে এল সেইদিন থেকে সুরু হল নিখিলের অস্বস্তি। বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ ন'বছর পরে নিখিল এই প্রথম বুঝলো বিমলা শুধু তার সংসারেই এসেছে, তার জীবনে আসেনি। সে লক্ষ্য করল যে, স্ত্রীর সংগে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার ইচ্ছার একটা একগুঁয়েমি আছে যার রূপটি হচ্ছে রূঢ়; সরলরেখ ও বিশুদ্ধ। নিখিলের এই উপর-চাপের ফলে বিমলা তার জীবনের যথার্থ সুসামঞ্জস্য খুঁজে না পেয়ে এই আবদ্ধতার থেকে বেরিয়ে আসার একটা সুড়ংগ পথ খুঁজছে। অবস্থা বেশীদূর গড়াবার আগেই বিমলাও বুঝল যে সে তার স্বামীর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। পীড়াদায়ক কঠোর পরীক্ষার পর স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আবার পরস্পরের নিকটসান্নিধ্যে ফিরে এল এবং সন্দীপ হঠাৎ যেমন তাদের জীবনে এসেছিল তেমনি হঠাৎ একদিন আবার উধাও হল। নারীর ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ানোর সমস্যা দৃঢ়সংবদ্ধ এই সামাজিক বিষয়-বস্তু তৎকালীন রাজনৈতিক জগতের এক গভীর সংকটকাল। নিখিল এবং সন্দীপ উভয়েই জাতীয়তাবাদী এবং উভয়েরই এক শক্তিশালী, স্বাধীন মাতৃভূমির স্বপ্ন রয়েছে। তবুও তাদের মধ্যে মেরু-পার্থক্য। সন্দীপের কাছে, উপায় বা পথ যতক্ষণ পর্যন্ত দৃষ্টিসীমায় অবস্থিত লক্ষ্যের দিকে প্রধাবিত ততক্ষণ তার কোন গুরুত্ব নেই; অপর পক্ষে নিখিলের এটা ধারণাতীত যে অসাধু, অন্যায় পন্থা মহান্ পরিণতি ঘটাতে পারে। বিদেশী শাসকদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ এবং দেশের প্রতি অন্ধ ভক্তি, উদ্দেশ্য সাধনের শক্তিশালী সহায়ক বলে সন্দীপ বিবেচনা করে; অন্যদিকে নিখিলের কাছে দেশপ্রেমের এমন মোহাচ্ছন্ন বক্তৃতা নিন্দনীয়। সন্দীপ বিশ্বাস করে শক্তির সংগে মুখোমুখি হতে হবে শক্তি নিয়েই, কিন্তু নিখিল এই অভিমত পোষণ করে যে, যে-কোন রূপেই শক্তির ব্যবহার দুর্বলতার পরিচায়ক কারণ এক মাত্র দুর্বল, শক্তি-হীনরাই ন্যায়বান, সৎ হতে ভয় করে এবং অন্যায়ের সোজা রাস্তায় ফললাভের

প্রয়াস পায়। যতক্ষণ না পরপর কয়েকটা ঘটনার মাধ্যমে নিখিলের মতের অন্তর্নিহিত শক্তি বিমলার কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে ততক্ষণ সে সন্দীপের যুক্তিতে ভেসে যায়।

'ঘরেবাইরে' স্পষ্টতই একখানা রূপক-উপন্যাস। কবি-কল্পনায় ভারতের যে নারীরূপ প্রকাশিত, বিমলা তারই প্রতিরূপ। ভারতীয় ঐতিহ্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ প্রাণবস্তু, নিখিল তারই রূপক, আর সন্দীপ আক্রমণপ্রবণ, পশ্চিমী ধরণের জাতীয়তাবাদী, যে জাতীয়তাবাদ ভারতে আকার নিতে সুরু করেছে বলে রবীন্দ্রনাথ শংকা প্রকাশ করেছিলেন। ঐতিহ্য জগত ব্যবস্থার বিকল্প বা পরিবর্ত হিসেবে 'পশ্চিমী জঙ্গী নীতি'কে সন্দীপ খোলাখুলিভাবে সমর্থন জানায়। তবুও ভারতীয় ঐতিহ্যের শক্তিকে স্বীকার করতে সে বাধ্য হয়; সে বলে, সে ভারতেই জন্মগ্রহণ করেছে, তার শিরায় শিরায় এর আধ্যাত্মিকতার বিষ প্রবাহিত হচ্ছে। আত্মোৎসর্গের পথে চলার উন্মত্ততা যত চীৎকার করেই সে ঘোষণা করুক না কেন, একে সম্পূর্ণরূপে এড়াবার ক্ষমতা তার নেই। নিখিল এই ঐতিহ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী। আত্মার বিনিময়ে সাফল্য অর্জনের কথা সে চিন্তাই করতে পারে না, কারণ, অন্য সব কিছুর থেকে, সাফল্য থেকেও, আত্মা তার কাছে মহত্তর।

পশ্চিমী জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সংশয় ও অবিশ্বাসের কথা স্মরণ করলে এই রূপকের তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তিনি এক সময় বলেছিলেন, আসল ঘটনা এই যে, পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের গোড়ায় রয়েছে সংগ্রাম ও জয় এবং তার কেন্দ্রেও তাই; সামাজিক সহযোগিতার ওপর এর ভিত্তি নয়। এই জাতীয়তাবাদ শক্তির পূর্ণাঙ্গ সংগঠনরূপে বিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক আদর্শে নয়। শিকারী জন্তুদের মত যারা নিজেরাই শিকার হয় শেষ পর্যন্ত। তিনি এই আশংকা করেছিলেন যে, ভারতের পক্ষে এক-জাতিত্বের বোধ এই প্রথম। তার দীর্ঘ ইতিহাসের ক্ষেত্রে ইউরোপ এবং আমেরিকায় পরিলক্ষিত যে জঙ্গী জাতীয়তাবাদ অনভিপ্রেত সেই জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি এদেশেও অনুসৃত হবে। আমেরিকার শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, শুধুমাত্র পরাধীন জাতিরাই নয়, তোমরা ভ্রান্তির মধ্যে বাস কর যে তোমরা মুক্ত, স্বাধীন, আসলে বিশ্বজোড়া সন্দেহ, লোভ এবং সন্ত্রাসের বিষাক্ত পরিবেশে বাস করে প্রতিদিন তাদের স্বাধীনতা ও মানবতাকে এই অন্ধ অনুসৃত জাতীয়তাবাদের কাছে

(৪৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি-চিন্তা

বাসব সরকার

॥ এক ॥

রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি, কি প্রধানত রাজনীতিবিদ্, এ নিয়ে তুমুল আলোচনা একদা বাংলা দেশের বুদ্ধিজীবিমহলে সুরু হয়েছিল। সেটা হলো বিশের দশকের কথা। যদিও কবি স্বয়ং বহুবার এ কথা বলেছেন যে তাঁর সবচেয়ে বড়ো পরিচয় তিনি কবি, তবু এ আলোচনা থেমে যায়নি। কারণ একদিকে তা যেমন সম্ভব ছিল না, অন্যদিকে থেমে যাওয়া উচিতও হতো না। বিরাট জীবনের পরিসরে, রবীন্দ্রনাথ ভারত তথা সারা পৃথিবীর যে বিরাট পরিবর্তন দেখে গেছেন তার ঘাত-প্রতিঘাতের ছাপ শুধু কবি-চিত্তকে আলোড়িত, ব্যথিত করেনি, তারা ভাষা পেয়েছে, প্রাণ পেয়েছে তাঁর কাজে ও কথায়, জীবনে ও শিল্পে। সেখানে কোথাও কোথাও সমকালের চিন্তার সঙ্গে, মানসিকতার সঙ্গে তার আপাতঃ পার্থক্য লক্ষ্য করা গেলেও, যে কোন সাধারণ পাঠকের চোখে ধরা পড়ে তার সামগ্রিক সত্য-রূপ; যেখানে কবি তাঁর স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্যে, চিন্তার যুক্তিসিদ্ধ দৃঢ়তায়, ভবিষ্যত পৃথিবীর বিপুল সম্ভবনায় আশাবাদী। লোভের হিংস্র বর্বরতায়, জীবনের প্রত্যন্ত সীমায় এসে গভীর মনস্তাপের সঙ্গে যেদিন কবি ব্যথিত-কণ্ঠে পশ্চিমের সভ্যতার প্রতি তাঁর আজীবন বিশ্বাসের দেউলিয়া ঘোষণা করলেন, সেদিনও তাঁর কণ্ঠ উচ্চারণ করেছিল "মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ"। সভ্যতার সংকটে, কবির সেদিনের সেই বাণী, তাঁর অভিজ্ঞতা নিঃসৃত। যে অভিজ্ঞতা সারা জীবনের অন্বেষণের পরে, বলিষ্ঠ নোতুন পথের ইংগিত পেয়েছিল তিরিশের দশকে।

স্বাদেশিকতা রবীন্দ্রনাথের আজন্ম সংস্কার। উনিশ শতকের বাংলা দেশে যে নবজাগরণের কল্লোল শোনা গিয়েছিল তার এক অন্যতম কেন্দ্র ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। ভারতে ইংরেজ বিজয়ের পর, পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ে মনোজগতে যে পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটেছিল, তাতে

যেমন একদিকে সুরু হয়েছিল উৎকট বিদেশীয়ানার প্রচলন, তার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে আত্মস্থ করার প্রয়াসও ছিল অন্যদিকে। পরাধীন দেশের মানুষের পক্ষে, প্রতিকূল রাষ্ট্রিক শক্তির শাসনে, এই আত্মস্থ করার প্রয়াস যে তার স্বাভাবিক শক্তিতে বিকাশ লাভ করতে পারে না, সে পরিচয় উনিশ শতকের সমাজ-জীবনে প্রচুর। শুধু তাই নয় বিরুদ্ধ শক্তির অধীনে, তাদের 'শ্রেষ্ঠত্বের দাবীকে উপেক্ষা করার তাগিদে সম্পূর্ণভাবে পশ্চিম-বিদ্বেষী মানসিকতার প্রবণতাও দেখা গিয়েছিল পাশাপাশি। ফলতঃ পশ্চিমী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের কারণগুলিকে, সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে, জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণে তাকে প্রসারিত করাও কোনদিন চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে যায় নি।

ঠাকুরবাড়ির আবহাওয়াতে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় সুন্দর ভাবে। দ্বারকানাথের উৎকট ইংরেজীয়ানা, ডিনার পার্টীর পিরীচ পেয়ালার ঠুংঠাং, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই, ঠাকুরবাড়িতে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। মহর্ষির প্রভাবে, উপনিষদের ভাবগম্ভীর মন্ত্রের মুর্ছনায়, ঠাকুরবাড়ির আবহাওয়া ছিল ভরপুর। অন্যদিকে উৎকট ইংরেজীয়ানার বাহুল্য কমলেও, পশ্চিমী প্রভাবের ইতিবাচকদিক তার সংস্কারমুক্ত, যুক্তি-নির্ভর মানসিকতার ঘাটতি হয়নি একটুকুও। স্বদেশের ঐতিহ্যের যা কিছু মহান্ যা কিছু সত্যসন্ধ তার সঙ্গে পশ্চিমের ইতিবাচক, মানবতন্ত্রী উদারনৈতিক যুক্তি-নির্ভর মানসিকতকে আত্মস্থ করার সচেতন প্রচেষ্টার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের জন্ম। সুতরাং বলা যেতে পারে যে জন্মসূত্রেই রবীন্দ্রনাথ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পরিপূরক এক মহান্ ঐতিহ্যের পেয়েছিলেন সহজ উত্তরাধিকার। রবীন্দ্র-মানসের বিচার, বিশ্লেষণে এই কথাটি সর্বদা স্মরণীয়। কারণ এই যুগ্মধারার মিলিত সাধনার যা কিছু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল, যার বনিয়াদের উপর সমকালের ভারতীয় সংস্কৃতি দাঁড়িয়ে আছে, রবীন্দ্রনাথ তার সমবয়সী।

॥ দুই ॥

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিচর্চার হাতেখড়ি এক "খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার" মধ্যে সেখানে "জাতীয় গৌরবেচ্ছা" সঞ্চারণের জন্যে যে পরিমাণ উত্তেজনার উদ্রেক হতো, রাজনৈতিক চিন্তার সুষ্ঠু বিকাশের জন্যে তার তুলনায় কিছুই করা হয় নি। অন্যদিকে এরই পাশাপাশি লক্ষ্য করা যায় হিন্দুমেলার সংগঠন, যার একটা অন্যতম লক্ষ্য ছিল সংস্কৃতি নির্ভর ভারতীয় সমাজের সমকালের

প্রয়োজনের তাগিদে পুনর্গঠন। যে কালে দেশের অশিক্ষিত মানুষের সমাজ সচেতনার কোন অস্তিত্ব নেই এবং শিক্ষিত মানুষের মনেও বিরাট দেশের সম্পর্কে চেতনার কোন ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায় না, যারা ভাবে ভাষায়, আচারে আচরণে সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে কোন যোগ রাখার প্রয়োজনীয়তা স্বীকারে অপরাগ ছিল, এই দুই ভিন্ন ধারার যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়াসটিই চোখে পড়ে হিন্দুমেলার সংগঠনের মধ্যে। এখানে হিন্দু নামটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক ঝোঁক থেকে চালু করা হয় নি। ১৮৫৭ সালের পর থেকে ভারতের সমাজজীবনে মুসলমান সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীগত প্রাধান্য যে পরিমানে কমতে থাকে, তার প্রায় কুড়ি বছর পরে হিন্দুমেলার জন্মলগ্নে সে প্রভাবের রেশ প্রায় ছিল না বললেই চলে। তা ছাড়া বাংলা দেশে রামমোহনের যুগ থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তি সিদ্ধ মানসিকতা গঠনের যে প্রচেষ্টা সুরু, সেটা প্রধানতঃ নিবদ্ধ ছিল ইংরেজী-শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে। এবং সর্বশেষ কথা হলো এই যে সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি ভারতের জীবনে আরো পরবর্তীকালের ঘটনা, যখন ইংরেজ শাসকের চোখে হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি সত্তা ঘোষণার প্রয়োজন হয়েছিল, শাসনশক্তিকে দৃঢ় করবার জন্যে। সুতরাং নিঃসংশয়ে বলা যায় হিন্দুমেলায় সরব হিন্দুত্বের যে ঘোষণা ছিল সেটা সম্পূর্ণ ভারতকে দেশমাতৃকা হিসেবে কল্পনা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ যে ভারত মিলিত হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধের ভারত, যেখানে হিন্দুত্ব ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, ভারতের জাতিগত পরিণামের কথা। রবীন্দ্র-মানসে এই চিন্তাধারা যে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশিষ্ট রূপলাভ করেছিল, বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের যুগে এবং গীতাঞ্জলির পর্বে তা নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

হিন্দুমেলার যুগে কিশোর কবির এই যে স্বাদেশিকতরে চর্চা, তা রবীন্দ্র-মানসকে শুধু স্বদেশের সীমায় ধরে রাখতে পারেনি প্রথম ইংল্যাণ্ড সফরের পরেই তাঁর দৃষ্টির যে প্রসার ঘটেছিল তার মধ্যে দেশ ও বিদেশের ভৌগলিক সীমাগত পার্থক্য নানা কারণে অপসৃত হয়। বিরাট বিশ্বে মানুষের জন্মস্থানের মহাত্ম্যকে অবলম্বনে করে চোখে বুজে থাকা যে মানুষের অপমানের নামান্তর, সমস্ত বিরোধ বিদ্বেষের উৎস, প্রথম যৌবনেই এক প্রবন্ধে কবির এই মনের ছবি রূপ পরিগ্রহ করতে আরম্ভ করে। তিনি বলেছেন: "বিশ্বের প্রত্যেক বিঘা, প্রত্যেক কাঠাতেই বিশ্ব বর্তমান। একদিনে তাহা

আয়ত্ত হয় না। প্রত্যহ অধিকার বাড়িতে থাকে। যিনি দশ বৎসরে এক স্থানের কিছুই অধিকার করিতে পারিলেন না তিনি বিশ্বকে অধিকার করিবেন কি করিয়া বিশ্ব সর্বত্রই অসীম গভীর এবং অসীম প্রশস্ত। অতএব বিশ্বের এককাঠা জমিকে ভালবাসিতে গেলে বিশ্ব-জনীনতা থাকা চাই।" "ডুব দেওয়া" (অচলিত সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, ১২ পৃঃ)।

স্বাদেশিকতা ও বিশ্বজননীতা যে পরস্পর বিরোধী চিন্তা নয় বা হওয়া উচিত নয়, রবীন্দ্র-মানসের এই মৌলিক ধারণার অঙ্কুর এরই মধ্যে নিহিত। এবং যেখানেই এদের মধ্যে একটির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে, বিশ্বমানবতার স্বার্থে, সেখানে তার বিরোধ বেধেছে অনিবার্যভাবে। সেখানে হয় অত্যুগ্র স্বাদেশিকতার পরিণামে ঘটেছে রক্তক্ষয়ী স্বার্থের সংগ্রাম নয় তো দেখা দিয়েছে বিশ্বজনীনতার আনুষ্ঠানিক অনুসরণের মহড়ায় বলহীন মানুষের দুর্দশার মিছিল। কারণ দুর্বলের দুর্বলতাকে ঢাকা দেওয়ার একটা সহজ কৌশল হলো আত্মশক্তির অভাবকে বিশ্বজনীনতার ঔদার্য মণ্ডিত করে রাখা। রবীন্দ্র-সাহিত্য এর প্রতি কটাক্ষ প্রচুর।

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি চিন্তার এই প্রাথমিক স্তরটি অভিজ্ঞতা ও আত্মপ্রত্যয় প্রসূত। হাউস অব্ কমন্সের সভায় আইরীশ সদস্যদের স্বাধীনতা সংগ্রামের আংশিক চিত্রের পাশাপাশি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির সদম্ভ প্রকাশের যে আড়ম্বর তিনি দেখে ছিলেন, রবীন্দ্র-চিন্তায় তা দিগ্‌দর্শনের কাজ করেছে। তথাকথিত গণতান্ত্রিকতা যে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পরিপন্থী, এ দেশের সে কালের কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের বোধগম্য হওয়ার অনেক আগেই সে কথা রবীন্দ্র নাথের মনকে আলোড়িত করেছিল। আঘাত যেমন প্রতিহত না হলে লাগে না, কেবল অর্থহীন আস্ফালনে পর্যবসিত হয়, জাতীয় আত্মসচেতনতা ও সেই রকম অপ্রতিহত ক্ষমতার দম্ভের মুখোমুখি না হলে জাগ্রত হতে পারে না। প্রথম ও দ্বিতীয় ইংল্যাণ্ড সফর রবীন্দ্রনাথের চোখে এই সাদা সত্যটিকে নানাভাবে প্রকট করেছিল।

॥ তিন ॥

স্বাদেশিকতা ও বিশ্বজনীনতার অভেদ চেতনায় সমৃদ্ধ হয়েই গত শতাব্দীর শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক বিচারে অগ্রসর হলেন। রবীন্দ্র-জীবনে এটাই সুবিখ্যাত "সাধনা"র পর্ব। বিশাল বিশ্বের অনন্ত বৈচিত্রের মধ্যে শুধু

স্বদেশ হিতৈষিণাকে একান্ত করে দেখা, তারই কাছে সমস্ত শ্রেয় ও প্রেয়বোধের বিসর্জন দেওয়া রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। দেশকে তিনি দেখেছেন ভালোবেসেছেন সারা বিশ্বের পটভূমিকায়, মানব সভ্যতার একটা সামগ্রিক অনুভূতির মধ্যে, যেখানে ভারতীয় সভ্যতা একটা বিশিষ্ট ধারা মাত্র, একটা বিশিষ্ট জীবনবোধ, যার সঙ্গে কারো প্রতিযোগিতা ইতিহাসে পরস্পর পরিপূরক মাত্র। সুতরাং ভারতীয় সমাজের ভালোমন্দের সঙ্গে যেমন ভারতবাসীর অবিচ্ছেদ্য স্বার্থ সম্পর্ক, সারা বিশ্বের স্বার্থও সেখানে কম, জড়িত নয়। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন: "স্বজাতির মধ্য দিয়া সর্বজাতিকে এবং সর্বজাতির মধ্য দিয়া স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া" এটাই মানব সভ্যতার সত্য পরিচয়। ভারতের ইতিহাসের প্রকৃত ধারা এরই মধ্যে নিহিত। একেই সার্থকভাবে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতের প্রাণবস্তু বলা যেতে পারে।

গত শতাব্দীর শেষ দশক সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের ব্যাপক অধিকার বিস্তারের সুবর্ণ যুগ। ইউরোপীয় সভ্যতার লোভ কেন্দ্রিক আত্মবিকাশের সর্বগ্রাসী অস্তিত্বের জ্বালা তখন পৃথিবীর কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়ছে। অসাধারণ দূর দৃষ্টিতে রবীন্দ্র-মানসে তার ভয়াবহ পরিণামের ইংগিত তখন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কবির নিজের জগতের অনাবিল আনন্দের রসাস্বাদ রবীন্দ্রনাথকে আর ধরে রাখতে পারলো না। রবীন্দ্রনাথ ফিরতে চাইলেন কর্মের আহ্বানের মধ্যে সমাজের যন্ত্রণার দারদাহে, সংসারের তীরে। "এবার ফিরাও মোরে" তাঁর সেই মানসিক প্রত্যাবর্তনেরই কাহিনী। দুনিয়া জুড়ে স্বার্থের যে সংঘাত কোথাও প্রকট, কোথাও প্রকাশের অপেক্ষায় অগ্নিগর্ভ হয়ে আছে, তার পোষাকীরূপের নাম হলো প্যাট্রিয়টিজম্ বা দেশপ্রেম। কিন্তু তার আটপৌরে নাম লোভ, অর্থ গৃধ্নুতা। দেশপ্রেমের এই ভদ্রপোষক রবীন্দ্র-মানসকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। বিদেশের রাজনীতি সম্পর্কে এই ধারণা, রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীয়দের কাজের বিচারে প্রয়োগ করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। জাতিচিন্তার প্রধান অবলম্বন যদি মানবিক সত্যের নিরিখে নির্ণিত না হয়ে শুধু একপেশে ধারণার পরিপোষক হয়ে দাঁড়ায়, সেই আত্ম-সর্বস্বতা রবীন্দ্রনাথের অসহ্য ছিল। তাই "মিথ্যার দ্বারাই হোক, ভ্রমের দ্বারাই হোক, নিজেদের কাছে নিজেকে বড়ো করিয়া প্রমাণ করিতে হইবে এবং সেই উপলক্ষ্যে অন্য নেশনকে ক্ষুদ্র করিতে হইবে, ইহাই নেশনের ধর্ম, ইহা

প্যাট্রিয়ট্‌ইজ্‌মের প্রধান অবলম্বন "এই সজাগ চিন্তা কোন দিনই রবীন্দ্রনাথকে প্রচলিত, স্বীকৃত অর্থে দেশপ্রেমিক হতে দেয় নি।

তাই তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছিল ভারতের পরাধীনতা শুধু ভারতের লজ্জা নয়, ইংরেজদেরও লজ্জার বিষয়। সন্দেহ নেই এটা পেশাদার রাজনীতিকের কথা নয়। কারণ রাজনীতি যদি জীবনের চরম ও পরম সত্য বলে বিবেচিত হতো তাহলে বিশুদ্ধ পোলিটিকেল অ্যাজিটেশনের মাধ্যমেই যে কোন দেশের যে কোন জাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের পথ মুক্ত করা সম্ভব হতো। রাজনীতি সমাজ নির্ভর অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে মানুষ নির্ভর। তার হেরফের ভালো মন্দের বিচার মানুষকে নিয়ে। যেখানে মানুষের সেই জীবন সেই মনুষ্যত্ব অবহেলিত কিম্বা অচেতন, সেখানে তথাকথিত রাজনীতির চঞ্চলতা সাময়িক স্বার্থকেই পুষ্ট করতে পারে মাত্র, কোন স্থায়ী কল্যাণের পথ প্রশস্ত করতে পারে না। কারণ "যেখানে জীবন অধিক, সেখানে স্বাধীনতা অধিক এবং সেখানে বৈচিত্র অধিক।' স্বাদেশিকতার যে রাজনীতি সৃষ্টিধর্মী নয় রবীন্দ্রনাথের মতে তা কোন রকমেই যথার্থ বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয় এবং সেই অর্থেই তাকে সুস্থ ও সার্থক দেশানুরাগ বলা সম্ভব নয়। কারণ "মানুষ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি করে। আমাদের দেশের মানুষ দেশে জন্মাচ্ছে মাত্র, দেশকে সৃষ্টি করে তুলছে না, এই জন্যে তাদের পরস্পর মিলনে কোন উপলক্ষ্য নেই, দেশের অনিষ্টে তাদের প্রত্যেকের অনিষ্ট-বোধ জাগে না। দেশকে সৃষ্টি করার দ্বারাই দেশকে লাভ করবার সাধনা আমাদের ধরিয়ে দিতে হবে।" (স্বরাজ-সাধনা, কালান্তর)। বলা বাহুল্য সেকালের কংগ্রেসের আবেদন নিবেদনের রাজনীতির সঙ্গে, নিছক নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তা বিপরীত মেরুর ব্যবধানকে প্রকাশ করে। উচ্ছিষ্টলোভী রাজনীতিতে মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটার আগেই রবীন্দ্রনাথ তাই সচেষ্ট হয়েছিলেন, দেশকে স্বদেশ বলে চিনে মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনের জন্যে আত্মশক্তি নির্ভর হতে।

॥ চার ॥

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মত শুধুমাত্র রাষ্ট্রিক মুক্তি আন্দোলনে সীমাবদ্ধ ছিল না। স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা স্তরে, নানা ঘটনায়,

ভারত ইতিহাসে তিনি যুগান্তকারী, মোহমুক্ত নানা মত ও পথের প্রবক্তা। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার লোভের দিকটা বাদ দিয়ে তার যে আধ্যাত্মিক শক্তির দিক আছে, সেখানে ইউরোপ মহান গৌরবের অধিকারী, শুধু ভিক্ষার দানে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা লাভ করে ভারত কোনদিনও তার সমকক্ষ হতে পারবে না। তাই তাঁর চিন্তায় প্রাথমিক হয়ে উঠ্‌ল আত্মমর্যদার অনুশীলন, সমস্ত কাজকর্মে, আচারে অনুষ্ঠানে জীবনের প্রতিটি স্তরে সম্পূর্ণ স্বাদেশিকতা, যা সাহায্য করবে আত্ম-নির্মাণে, জাতি গঠনে এবং রাজনীতির কর্মকাণ্ডে সম্পূর্ণ অসহযোগ। রবীন্দ্র-মানসের এই চিন্তা যে গোমুখী ধারার উৎসকে বাধামুক্ত করেছিল, সেটা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটা পরম লগ্ন, বাংলার স্বদেশীযুগ। দেশের সক্রিয় রাজনীতিতে এমন সহযোগিতা রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনে পরবর্তী আর কোন কালে দেখা যায় নি। সেই বিপুল রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মোহমুক্ত মনে, অনেকের মতে, অত্যন্ত সাময়িকভাবেই একটা ছায়া পড়েছিল। সেটা "প্রাচ্যাভিমান"। সন্দেহ নেই দেশের অগণিত অশিক্ষিত মানুষের মনে স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করে সাড়া জাগাতে গেলে শুধু আদর্শবাদের অনমনীয় ভাবধারা যথেষ্ট নয়। দেশের চিন্তাকে সার্বিক চিন্তায় রূপান্তরিত করতে গেলে, সর্বজনের বোধগম্য কোন মানদণ্ড তার প্রয়োজন। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান রবীন্দ্রনাথ, উপনিষদের ভাবরসে পুষ্ট রবীন্দ্রনাথ, ভারতের বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের আদর্শকেই সভ্যতার একমাত্র পথ বলে ঘোষণায় দ্বিধা করলেন না। প্রাচ্য সভ্যতার ভাব গাম্ভীর্য যে মানুষের স্বাধীন সত্তার পরিপন্থী নয়, সভ্যতার ক্রমবিকাশে মহাদেশীয় বা জাতীয় চরিত্রের যে প্রতিফলন ঘটে, যা তাদের বৈষম্যকেই সৃষ্টি করে থাকে, আজীবন রবীন্দ্রনাথ সে কথা বলেছেন। সুতরাং ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শের মাপকাঠি উপস্থিত করেছিলেন তাকে নিছক "প্রাচ্যাভিমান" নাম দিলে মনে হয় রবীন্দ্র-মানসের যথার্থ বিচার হয় না। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের নখদন্ত বিস্তারের নগ্ন বীভৎসতায়, কবি-চিত্তের প্রতিক্রিয়া যে সহজ ভাবেই সভ্যতার তুলনামূলক বিচারে অগ্রণী হবে এবং যুক্তি নির্ভর আলোচনায় কোন

একটির শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি নির্দেশ করবে, এটা নিশ্চয়ই পক্ষপাতদুষ্ট মনের প্রকাশ নয়। সুতরাং যা নৈর্ব্যক্তিক চেতনা-প্রসূত, তাকে অভিমান বলা সঙ্গত কোন কারণে?

"নেশানতত্ত্ব" ইউরোপীয় সভ্যতার মানসপুত্র। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের যুগে ভারতীয় রাজনীতির লক্ষ্যও দেশকে নেশানে রূপান্তরিত করা। রবীন্দ্রনাথ আপন অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ করেছেন যে নেশানবাদের উগ্র রূপটাই হলো সাম্রাজ্যবাদ। ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ, আত্মশক্তির চর্চাবিহীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ভারতে যে নেশনবাদের ভূমিকা সূচনা করবে, তার অনিবার্য ফল হবে জাতিপ্রেমের অন্ধ আবেগ, যা যুক্তি-বিহীন বলেই মুক্তির পথ হতে পারে না। শুধুমাত্র জাতিস্বার্থ নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টার লক্ষ্যই হলো বিরোধের সম্ভাবনাগুলোকে স্ব-চিত্তে রাখা। ভারতের সমাজচিন্তায় তার শুভ ফলের সম্ভাবনা নেই, এ বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের বদ্ধমূল ছিল। কারণ তিনি মনে করতেন নেশনতত্ত্ব, ইউরোপীয় সভ্যতার ধণিকতন্ত্রী সমাজচিন্তারই বহিরঙ্গ মাত্র। রবীন্দ্রনাথ মানুষের জীবনবিকাশের সাধনাকেই ভারতের জাতীয় আদর্শের শ্রেষ্ঠধর্ম বলে অভিহিত করলেন। রাষ্ট্র যেহেতু মানুষ ছাড়া গঠিত হয় না, যা মানুষের ধর্ম তাই রাষ্ট্রের আদর্শ। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ এখানে ধর্ম বলতে প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্রয় দেন নি। তাঁর মতে ধর্ম "রিলিজিয়ান নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র—তাহার মধ্যে যথাযোগ্যভাবে রিলিজিয়ন, পলিটিক্স সমস্তই আছে।" (সমাজভেদ, স্বদেশ)। এই সামাজিক কর্তব্যতন্ত্রের স্বরূপটি রবীন্দ্রনাথ পেশ করেছেন তাঁর স্বদেশীসমাজ প্রস্তাবে (১৯০৪ সাল)।

স্বদেশী সমাজের প্রাণকেন্দ্র আমাদের গ্রাম। সেখানে দেশের বিরাট সম্ভাবনাকে মূর্ত করে তোলার জন্যে প্রয়োজন পাঠশালা, শিল্প শিক্ষণ-কেন্দ্র, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার, সমবায় ব্যাঙ্ক, সালিশী ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষের প্রবর্তন। গণমানসের উদ্বোধনের এই পরিপ্রেক্ষিতে গড়তে হবে প্রতিনিধি সভা যেখানে পল্লীমণ্ডলীর নির্বাচিত সদস্যরা অংশ গ্রহণ করবেকাজ কর্মের খতিয়ান করতে, নোতুন নীতি নির্ধারণ করতে। এই প্রস্তাব কার্যকরী করতে যে সাংগঠনিক প্রস্তুতি ও শিক্ষিত অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে ভাবগত যোগাযোগের যে প্রাথমিক ভূমিকা

আছে, রবীন্দ্রনাথ সেই বাস্তব সমস্যার দিকেও দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ১৯০৮ সালের পাবনা কনফারেন্সে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজের যে ব্যাপক চিত্র তুলে ধরেন, স্মরণ রাখা দরকার তা মহাত্মা গান্ধীর বিখ্যাত পঞ্চায়েৎরাজ গঠন প্রস্তাবের একযুগেরও বেশি পূর্বে রচিত। ভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সমাজচিন্তা ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ গঠন— রাজনীতির সবকটি চূড়ান্ত লক্ষ্যের প্রতি দেশের সমস্ত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আত্মশক্তি অর্জনের মাধ্যমে স্বরাজসাধনার পথ নির্দেশ করা, রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এবং অব্যবহিত পরে ভারতের কোন রাজনীতিবিদ্‌দের দূরতম কল্পনার মধ্যেও ছিল না। রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার মর্মবাণী এরই মধ্যে নিহিত আছে।

॥ পাঁচ ॥

স্বাদেশিকতার এই অভিনব ধারণা সমৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতাদর্শ দেশের তদানীন্তন নেতৃবৃন্দের মনঃপূত হয়নি। ফলতঃ স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। দেশ তখন আন্দোলনের অভিজ্ঞতায়, নোতুন শক্তির চেতনায়, চরমপন্থী মতের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। সেটা সন্ত্রাসবাদ। আন্দোলনের কার্যক্রমের যে বনিয়াদ সন্ত্রাসবাদী মতের পরিপোষক হয়ে উঠ্‌ছিল রবীন্দ্রনাথের পক্ষে, তার সঙ্গে সহযোগিতা করা সম্ভব হলো না। কারণ তিনি মনে করতেন সন্ত্রাসবাদের ভিত্তি হলো দেশব্যাপী অজ্ঞতার ওপর, যার চমৎকারিত্বের দিকটা যতো জোরালো, যতো সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তার মূল্যায়নের দিকে ঘাট্‌তি ততোই বাড়ে। রবীন্দ্রনাথ অন্ধ আকর্ষণের বিমূঢ় সম্মতির ভূমিকাকে, জাতীয় আন্দোলনে কোন গুরুত্বই দেন নি। এটা একটা নেশার মতো, যা মানুষের চিৎশক্তিকে আচ্ছন্ন করে মনকে করে তোলে পশ্চাৎগামী। সন্ত্রাসবাদীদের মোহান্ধ দৃষ্টিতে দেশের যে ছবি ভাসে, সে দেশ সাধারণ মানুষের দেশ নয়, তার সব কিছুই বিকৃত মনের অতীন্দ্রিয়ভাবের দ্যোতক, এক কথায় অবাস্তব চেতনা। "ঘরে বাইরে"র নিখিলেশের কথায় কবির সেই মনের কথাটি ধরা পড়ে, যেখানে সে বলছে : "দেশকে সাদাভাবে দেশ বলেই জেনে, মানুষকে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করে, যারা তার সেবা

করতে উৎসাহ পায় না, চীৎকার করে মা বলে দেবী বলে মন্ত্র পড়ে, যাদের কেবল সম্মোহনের দরকার হয় তাদের সেই ভালোবাসা দেশের প্রতি তেমন নয়, যেমন নেশার প্রতি।"

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিকে হয়তো ইতিহাসের বিচারে মনে হবে যথাযথ নয়। কারণ পরাধীন দেশের রাজনীতিতে যেখানে সাধারণ মানুষের সমাজচেতনা শাসকশক্তির অপ্রতিহত ক্ষমতার দাপটে পঙ্গু, সেখানে তার মুহ্যমান অস্তিত্বকে জাগরিত করতে গেলে এই উন্মাদ সাহসেরও প্রয়োজন আছে। মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে, ভারতে এই ঘটনার স্বপক্ষে প্রভূত পরিমাণ নজীর উপস্থিত করা যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর যে মতবিরোধই থাক না কেন, সন্ত্রাসবাদী যুবকদের সাহস, আত্মত্যাগকে রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা না করে পারেন নি। বহু বছর পরে সুভাষ-চন্দ্রের উদ্দেশ্যে দেশনায়ক বক্তৃতায় তিনি বললেন: "ইচ্ছার অগ্নিগর্ভ রূপ দেখেছি বাংলার তরুণদের চিত্তে। দেশে তারা দীপ জ্বালাবার জন্যে আলো নিয়ে জন্মে, ভুল করে আগুন লাগাল। দগ্ধ করল নিজেদের, পথকে করে দিল বিপথ। কিন্তু সেই দারুণ ভুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে বীরহৃদয়ের যে মহিমা ব্যক্ত হয়েছিল সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাও তা দেখিনি।" রবীন্দ্রনাথ এর বিরোধিতা করেছেন আদর্শগত কারণে, একে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে অন্তরায় মনে করে। কারণ সন্ত্রাসবাদীদের কাছে ভাগ্যবিপর্যয়ের প্রকৃত কারণের চেয়ে, উপলক্ষ্য বড়ো হয়ে উঠে অনর্থই সৃষ্টি করে বেশি। তাতে কাজের বেলায় উপায়ের ওপর জোর পড়ে উদ্দেশ্যের চেয়ে, আর সেটাই প্রধান হয়ে ওঠে।

স্বদেশীযুগের রবীন্দ্রনাথের দূরদর্শিতার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেটা সাম্প্রদায়িকতা। সখারাম গণেশ দেউস্করের প্রবর্তিত ও তৎকালীন নেতৃবৃন্দের সমর্থনপুষ্ট শিবাজী উৎসব বা ঐ জাতীয় ধর্মনৈতিক অনুষ্ঠানের পুনরুজ্জীবনে, মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে বেশ কিছুটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। আর সেই আতঙ্কের বিষময় ফল ফলে, স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল জোয়ারে বয়কটের দাবী গৃহীত হওয়ার জবরদস্তির মধ্যে। ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় ১৮৫৭ সালের পর

থেকে রাজনীতির আবহাওয়ার দূরে থাকছিল। সেই গৌরবহীন সাধারণ-তার মধ্যে তাদের অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা কোন কোন অঞ্চলে চালু হলেও, স্বদেশী আন্দোলনের সময় পর্যন্ত তা ব্যাপক হয়ে ওঠেনি। কিন্তু বয়কটের দাবী তাদের চেতনাকে হঠাৎ সচকিত করে তুলল। তার প্রধান কারণ অর্থনৈতিক। একদিকে হিন্দুত্বের সরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা, অন্য দিকে আন্দোলনের দায়ভাগের বোঝার চাপ, এই দুয়ের মাঝে পড়ে, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তির সম্ভাবনা কমে গিয়ে দেখা দিল বিরোধ। শাসক-শক্তি সেই বিরোধের বীজকে পাকা করে বপন করলো মর্লে-মিন্টো শাসন সংস্কারের মাধ্যমে; যার অন্য নাম বিভেদ ও শাসননীতি। বর্তমান প্রবন্ধে তার বিশদ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

রবীন্দ্রনাথ এই সম্ভাবনার ইংগিত করে দেশবাসীকে সাবধান করেছেন। হিন্দুত্বের পুনরুজ্জীবন যদিও তার কাছে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার দাবী বলে দিবাস্বপ্নেও মনে হয়নি তবুও অশুভ আশংকা তাঁর ছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের মতে, হিন্দুত্ব কোন ধর্মতত্ত্ব নয়, ভারতের জাতিগত পরিণাম মাত্র। তবুও যৌথ আন্দোলনের সম্ভাবনাকে ব্যাপক করার জন্যে ১৯০৫ সালের "বিজয়া সম্মিলনে" তিনি বললেন আবেগদীপ্ত কণ্ঠে: 'যদি বিদ্যুৎচকিত হইয়া থাকে, বজ্রধ্বনিত হইয়া উঠে, তবে তোমরা ফিরিয়ো না, ফিরিয়ো না···যে চাষী চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো···অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো।" কিন্তু যখন দেখলেন বয়কটের জবরদস্তি এই মিলিত সাধনাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে তখন তাঁর মনে ধ্বনিত হয়েছে, স্বরাজ সাধনার পথে শুধু বিদেশী শাসকশক্তিই একমাত্র বাধা নয়, বাধা দেশের মধ্যেও আছে। "সদুপায়" প্রবন্ধে তাই তাঁর মন্তব্য দেখা যায় "বিলাতী দ্রব্য ব্যবহারই দেশের চরম অহিত নহে, গৃহবিচ্ছেদের মতো এত বড়ো অহিত আর কিছু নাই।" হিন্দু,মুসলমান যে রাষ্ট্রিক সাধনার ক্ষেত্রেও এক নয়, সেই ভেদরেখাটির সম্পর্কে কবি সচেতন হয়ে ওঠেন। পাবনা কনফারেন্সের সুবিখ্যাত ভাষণে তাই শোনা যায়: 'চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশী পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। —যে

রাজপ্রাসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি।.....ভারতবর্ষের এই দুই প্রধান ভাগকে রাষ্ট্র সম্মিলনের মধ্যে বাঁধিবার জন্য যে ত্যাগ, যে সহিষ্ণুতা, যে সতর্কতা ও আত্মদমন আবশ্যক তাহা আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে।" কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক সচেতনতার চেয়ে শাসক শক্তির কূটবুদ্ধি অনেক সজাগ ও সতর্ক ছিল। ফল তার প্রত্যক্ষ হলো প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগে।

॥ ছয় ॥

স্বদেশী আন্দোলনের যে দুর্নিবার আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথকে সক্রিয় রাজনীতির আবর্তে টেনে এনেছিল, যেখানে কবি সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, নবজাগ্রত চেতনার বাণীরূপ হিসেবে, তা তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে রাখতে পারেনি। এর পরে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনে রবীন্দ্রনাথ কোন আন্দোলনে আর এমন ভাবে অংশ গ্রহণ করেন নি। যদিও জাতির ঘোর দুর্দিনে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় (১৯১৯ সালে গান্ধীকে আহ্বান করেছিলেন সারা ভারতের তরফ থেকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্যে তাঁর সহযাত্রী হয়ে পাঞ্জাব যেতে, যে প্রস্তাব গান্ধী সেই পরিবেশে বিশেষ ফলদায়ক হবেনা বলে গ্রহণ করেন নি। স্মরণ রাখা দরকার বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও, কলকাতায় সভা করে, রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে, এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করতে সাহসী হন নি।) এবং অংশতঃ সক্রিয় হয়েছেন তিরিশের দশকে হিজলীর বন্দীশিবিরে গুলিচালনার প্রতিবাদে। পাবনা অভিভাষণের পর কবির চিন্তাজগতে যে পরিবর্তন দেখা গেল তাকে অনেকে ভারত-তীর্থের পর্ব বলে অভিহিত করেছেন। কবির চিন্তায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সর্বনাশা পরিণামের ইঙ্গিত, সমস্ত জগতের রাজনৈতিক সংকট এবং দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের নিস্ফল যন্ত্রণা, এক সঙ্গে বিরাট বিশ্বচেতনায় পর্যবসিত হলো।

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের প্রধান কারণ যে লোভ এবং সেই লোভ যে

জাতিপ্রেমের জারক রসে জারিত হয়ে উগ্র দেশাত্মবোধে রূপান্তরিত হয়, সে ধারণা রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘদিনের। জার্মাণ সামরিকবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণে "লড়াইয়ের মূল" প্রবন্ধে তিনি বললেন: 'জার্মাণ পণ্ডিত যে তত্ত্ব আজ প্রচার করিতেছে এবং যে তত্ত্ব আজ মদের মতো জার্মাণকে অন্যায় যুদ্ধে মাতাল করিয়া তুলিল সে তত্ত্বের উৎপত্তি তো জার্মাণ পণ্ডিতের মগজের মধ্যে নহে, বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে।" ইউরোপের বিভিন্ন জাতির মধ্যে রাষ্ট্রিক স্বার্থের বিরোধ ঘটছে পৃথিবীর দখলদারী নিয়ে। কারণ তার "প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা।" সে দখলদারী কায়েম করতে জার্মাণীর দেরী হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এখন আর অবশিষ্ট বড়ো কিছু নেই। সুতরাং তার বক্তব্য অত্যন্ত সরল "আমার জন্য যদি পাত পাড়া না হইয়া থাকে আমি নিমন্ত্রণপত্রের অপেক্ষা করিব না আমি গায়ের জোরে যার পাই তার পাত কাড়িয়া খাইব।"

রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি শুধু লড়াইয়ের মূল নির্ণয় করেই ক্ষান্ত হলো না। তাঁর মতে লোভের এই দ্বন্দ্বই শেষ যুদ্ধ নয়। কারণ এই লড়ায়ের হারজিতের ওপর যেহেতু লোভের সামগ্রিক রূপের কোন পরিবর্তন হবে না, সে কারণে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের সম্ভাবনা থেকেই যাবে। এ যুদ্ধের অংশীদারদের লড়াই ক্ষত্রিয় বৈশ্যের লড়াই কিন্তু "ইহার পরে আর একটা লড়াই সামনে রহিল যে বৈশ্যে-শূদ্রে, মহাজন-মজুরে —কিছুদিন হইতে তার আয়োজন চলিতেছে। সেইটা চুকিলেই বর্তমান মনুর পালা শেষ হইয়া নোতুন মন্বন্তর পড়িবে।" (লড়াইয়ের মূল: কালান্তর) সেই মহাজনে মজুরের অনিবার্য লড়াইয়ের কারণ সম্পর্কে প্রথম যুদ্ধের প্রথম বছরেই রবীন্দ্রনাথের এই স্বচ্ছ মানসিকতা সেকালের ভারতীয় রাজনীতিবিদ্‌দের কাছে অকল্পনীয় ছিল বলে মনে হয়। কারণ তার স্বপক্ষে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

এ-যুগে চিন্তাধারার মধ্যে সমাজের সমস্যার যে অপরিসীম গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়, তা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অম্লান ছিল। ধন বন্টন, সামাজিক অসাম্যের মূল কারণ উল্লেখ করে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে জনসাধারণের রাজনৈতিক ভূমিকার পার্থক্যকেই তিনি ভারতের একটা বিশেষ সমস্যা বলে চিহ্নিত করেন। ১৯১৪ সালের

"লোকহিত" প্রবন্ধে তীব্র সচেতনতায় কবি বল্‌লেন: "ধনের ধর্মই অসাম্য। জ্ঞান কর্ম কলাসৌন্দর্য পাঁচজনের সংগে ভাগ করিলে বাড়ে বই কমে না, কিন্তু ধন জিনিষটাকে পাঁচজনের হাত হইতে রক্ষা না করিলে সে টেঁকে না। এই জন্য ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে।———এখন-ও দেশে লোকসাধারণ কেবল সেন্সাস-রিপোর্টের তালিকাভুক্ত নহে, সে একটা শক্তি। সে আর ভিক্ষা করে না দাবী করে। এই জন্য তাহার কথা দেশের লোক আর ভুলিতে পারিতেছে না। সকলকে সে বিষম ভাবাইয়া তুলিয়াছে। আমাদের দেশে লোক সাধারণ এখনো নিজেকে লোক বলিয়া জানে না, সেইজন্য জানান দিতেও পারে না। তাহাদের নিজের অভাব ও বেদনা তাহাদের নিজের কাছে বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত। তাহাদের একার দুঃখ যে একটা বিরাট দুঃখের অন্তর্গত এইটা জানিতে পারিলে তবে তাহাদের দুঃখ সমাজের পক্ষে একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইত।" বলা বোধহয় এ প্রসঙ্গে অযৌক্তিক নয় যে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষেও কবির অর্দ্ধ-শতাব্দীর পূর্বের বিশ্লেষণ চূড়ান্ত ভাবেই নির্ভুল। কবি সেদিন তাঁর সনাতন স্বদেশে বিশ্বদেবতার উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন সাধারণ মানুষের সার্বিক সমস্যার পটভূমিকায়।

তাই প্রথম মহাযুদ্ধের সুরু ও মধ্য-পর্বে রবীন্দ্রনাথকে দেখা যায় লোভ কেন্দ্রিক যুদ্ধমত্ত সভ্যতার বিরুদ্ধে তিনি শান্তির সংগ্রাম করেছেন পৃথিবীর দেশে দেশে। "ন্যাশন্যালইজম" বক্তৃতার সার কথা তাই। সাদা অর্থে তাঁর বক্তব্য বিচার করে সেদিন দেশের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে ধিক্কার দিতে ইতস্ততঃ করেন নি। কিন্তু তাঁর ধারণায় তিনি অটল ছিলেন এইজন্যেই যে এই ন্যাশন্যালইজম মানবতা-বিরোধি, এটী মানব ইতিহাসের পরিণাম নয়: **"Neither the colourless vagueness of cosmopolitanism, nor the fierce self-idolatry of nationworship, is the goal of human history."** সমস্ত অপমান, ঘৃণা, প্রতিকূলতাকে মাথায় করে নিয়ে সেদিন রবীন্দ্রনাথ "মানব বিধাতার রাজপথে মহামানবের গান গেয়ে" বেড়ানোর জন্যে সমস্ত সৎবুদ্ধি, চিন্তাশীল মানুষকে আহ্বান করেছেন।

॥ সাত ॥

১৯২৯-২১ সাল থেকেই ভারতের জাতীয় আন্দোলন প্রকৃত অর্থে জাতীয় আখ্যা লাভ করার গৌরব পেতে পারে। এত দিনের আরাম কেদারার রাজনীতি ছেড়ে এবার থেকে জনসাধারণের সাড়া তার মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠ্‌তে থাকে। সন্দেহ নেই এই কৃতিত্ব গান্ধীর। এই নবজাগরণের প্রবক্তা বলে রবীন্দ্রনাথের গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল বরাবর আন্তরিক। কারণ গান্ধীর অসহযোগ নীতি রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দূরদর্শিতারই প্রত্যক্ষ রূপ। সুতরাং অসহযোগে গনমানসের উদ্বোধনকে স্বাগতঃ জানানো রবীন্দ্রনাথের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু অসহযোগের নীতিকে অকুণ্ঠ সমর্থন করলেও তার বাস্তব কার্যক্রমের অধিকাংশকেই তিনি সমর্থন করতে পারলেন না। গান্ধী জনমতকে সংগঠিত করার জন্যে স্বরাজলাভের নানা উপায়ের কথা বলছিলেন। দীর্ঘদিন পরে আজ তাদের আমরা পরীক্ষামূলক নীতি বলে অভিহিত করতে পারি। কারণ "চরকা কাটিলে স্বরাজ," "আইন অমান্য করিলে স্বরাজ," "এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ," এ সমস্তই ছিল অর্ধচেতন বা অচেতন গনমানসকে উত্তেজিত করার পদ্ধতি মাত্র। ইতিহাস তা প্রমাণ করেছে।

এই পরীক্ষামূলক নীতি কখনো মুক্তি আন্দোলনে প্রকৃত পথ। নর্দেশ করতে পারে না। শুধু তাই নয় নীতি হিসেবেও তারা বর্তমানের বিজ্ঞান-সাধনার কল্যাণকর দিকের প্রতি মুখ ফিরিয়ে থাকছে। অথচ দারিদ্র-লাঞ্ছিত দেশে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার মোহ, স্বরাজ লাভের অল্প পরেই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে যদি না মানুষের জীবনে কোন প্রকৃত পরিবর্তন সূচিত হয়। তার ক্ষুধার অন্ন, মনের দৈন্য, জীবনের অস্বাচ্ছন্দ্য তাতে ঘুচবে না, যা ইংরেজ শাসনে কায়েমী হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ তখন বলেছিলেন ঃ চরকা-কাটা স্বরাজ সাধনার প্রধান অঙ্গ এ কথা যদি সাধারণে স্বীকার করে তবে মানতেই হবে সাধারণের পক্ষে স্বরাজটা একটা বাহ্যফল লাভ।···চরকার মানুষ চরকারই সঙ্গ হয় অর্থাৎ যেটা কল দিয়ে করা যেত সেইটেই করে, সে ঘোরায়। কল জিনিষটা মনোহীন বলেই একা···তেমনি যে মানুষ সুতো কাট্‌ছে সেও একলা সে যন্ত্র, সে নিঃসঙ্গ, সে বিচ্ছিন্ন।···আজ আমরা দেশে চরকালাঞ্ছন পতাকা উড়িয়েছি। এযে সংকীর্ণ জড় শক্তির পতাকা, অপরিণত যন্ত্র শক্তির পতাকা, স্বল্পবল পন্য শক্তির পতাকা—এতে চিত্তশক্তির কোন আহ্বান নেই।" (কালান্তর)।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতামত প্রবন্ধাকারে লিখে প্রকাশ করলেন মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় ১৯২১ সালের জুলাই মাসে। গান্ধী তাঁর ইয়ং ইণ্ডিয়া কাগজে তার জবাব দিলেন। কিন্তু বিতর্কের বাস্তব ক্ষেত্রে ফল দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের অনুকূলে। গুজরাট প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক নানা সাহেব দলপতরামকে রবীন্দ্রনাথ চিঠি দিলেন রাজনীতিকে অধ্যাত্ম সাধনার মাধ্যমে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে। কারণ রাজনৈতিক সিদ্ধির পথ আর আধ্যাত্মিক অভীষ্ট লাভ একজাতের ব্যাপার নয়। তাঁর চিঠির একটা অংশ হলো : "No doubt through a strong Compulsion of desire for some external result, men are capable of repressing their habitual inclinations for a limited time, but when it concerns an immense multitude of men of different traditions and stages of culture, and when the object for which such repression is exercised needs a prolonged period of struggle, complex in character, I can not think it possible of attainment" (প্রভাতকুমার : ভারতে জাতীয় আন্দোলন : পৃঃ ১৬৯ উদ্ধৃতি)। রবীন্দ্রনাথের এমত পরিবর্তন করার কোন কারণ ঘটেনি।

তিরিশের দশকের আর দুটি কথা উল্লেখ করে এ-প্রসঙ্গের আলোচনা শেষ করা যেতে পারে। সাম্প্রদায়িকতার বিষময় ফল সম্পর্কে স্বদেশী আন্দোলনের যুগেই রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে সতর্ক করেছিলেন। তাঁর সাবধান বানীতে তখন অনেকেই কর্ণপাত করেন নি। পরবর্তী পঁচিশ বছরে তরি শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে অমুসলমানদের অজ্ঞানতায় এবং প্রশ্রয়ে আর ইংরেজ সরকারের পক্ষপাত দুষ্টে আচরণে। শাসক শক্তি বরাবরই চেয়েছে এই দুর্বলতাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে। ১৯৩১ সালে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের বিখ্যাত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পরিকল্পনা সম্পর্কে কংগ্রেসের "না-গ্রহণ-না-বর্জন নীতি" দেশব্যাপী অসন্তোষ সৃষ্টি করে। বৃদ্ধ কবি তার প্রতিবাদে, সম্প্রদায়িকতার যে কুৎসিত শক্তির কথা বলেন, সেদিনও দেশের সচেতন জনমত তাকে গ্রহণ করতে, অনুসরণ করতে অপারগ হয়। কারণ না-গ্রহণ-না-বর্জন নীতি" কোম সুস্পষ্ট মত নয়, একটা ঘৃণ্য আপোষমূলক মনোভাবের পরিচায়ক, যা, না হিন্দু, না মুসলমান কারো পক্ষেই আত্মাম্মান সম্পন্ন নয়। শাসক শ্রেণী ও জন নায়ক, দুই পক্ষেই লক্ষ্য করিয়া

রবীন্দ্রনাথ বলেন : "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দেশের রাজনৈতিক জীবনকে ছিন্ন বিছিন্ন করিবার জন্য একটা অভিশাপ। যে সকল সম্প্রদায় ইহা চাহে নাই, তাহাদেরও উপর এই অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে। আমরা দূরদর্শিতা অবলম্বন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করি যে, সাবধানীর পৃষ্ঠপোষকতায় যে সুবিধা লাভ হয়, তাহা ভাগ্যবান অনুগৃহীত এবং দুর্ভাগ্য বিমুখ—উভয়ের পক্ষেই সমান ক্ষতিকর। তাহার ফলে যে সকল জটিলতার সৃষ্টি হইবে, তাহা পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উসকাইয়া দিবে এবং যাহারা পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সন্তায় কিস্তিমাত করে, পরিণামে তাহাদেরও কোন মঙ্গল হইবে না।... এই অন্যায় অনুগ্রহের যে একটি নিশ্চিত প্রতিক্রিয়া আছে, তাহাই চিন্তার বিষয় ; কারণ একদিন আসিবে যেদিন আর এইরূপ অনুগ্রহ করা সম্ভব হইবে না, যেদিন এক তরফা আব্দার পালনে স্বেচ্ছাচারীরও চক্ষু লজ্জা হইবে, অথচ সেই দিনও অন্যায় অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্খা পরিতৃপ্ত হইবে না।" (টাউন-হলের সভায় বক্তৃতা : ১৯৩৭, উদ্ধৃতি : জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ। প্রফুল্লকুমার সরকার, পৃঃ ১১১)

তিরিশের দশকের রাজনীতি আন্দোলন বিভিন্ন নোতুন দলের উদ্ভব দেখলেও, প্রধানত : নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে কংগ্রেসের নির্দেশে। দেশে এমন কোন প্রতিপক্ষকে তখন দেখা যায়নি যারা কোন বিকল্প পথের দিকে জনমতকে চালিত করতে পারে। ফলতঃ স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনীতি সর্বতোভাবে কংগ্রেস কেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়ায়। শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে রাজনীতির নিয়ামক হয়ে দাঁড়ান মহাত্মা গান্ধী। গণমানসের সুস্থ, সুঠাম রাজনৈতিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই গান্ধী-নির্ভরতা দেশের সামনে এমন একটা অসহায় মনোভাব সৃষ্টি করেছে, যা কোন মতেই গনতান্ত্রিক চেতনা সম্মত নয়। ক্ষমতার এই কেন্দ্রীকারণ জাতি ও নেতৃত্ব দুয়ের পক্ষেই চরম বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। জীবনের প্রত্যন্ত সীমায় এসে, দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক আন্দোলনের ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও, দেশের চিত্তশক্তির এই বিহ্বলতায় রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত হয়ে ছিলেন। তাই ১৯৩৯ সালের ২০-মে'র একটি চিঠিতে (অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত) তিনি মন্তব্য করেন : "পৃথিবীতে যে দেশেই যে কোন বিভাগেই ক্ষমতা অতিপ্রভুত হয়ে সঞ্চিত হয়ে ওঠে সেখানেই সে ভিতরে ভিতরে নিজের মারণ-বিষ উদ্ভাবিত করে। ইম্পি-রিয়ালিজম বলো, ফ্যাসিজ্‌ম বলো অন্তরে অন্তরে নিজের বিনাশ নিজেই সৃষ্টি

করে চলেছে। কংগ্রেসের অন্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার তাপ হয়তো তার অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠেছে বলে সন্দেহ করি।...ভিতরে ভিতরে কংগ্রেসের মন্দিরে এই যে শক্তিপূজার বেদী গড়ে উঠ্‌ছে তার কি স্পর্ধিত প্রমাণ এ বারে পাই নি যখন মহাত্মাজিকে তাঁর ভক্তেরা মুসোলিনী ও হিট্‌লারের সমকক্ষ বলে বিশ্ব সমক্ষে অপমানিত করতে পারলেন।" এবং এই চিঠির আরেক জায়গায় মহাত্মার নেতৃত্বে দেশবাসীর অন্ধ আস্থা স্থাপনের দাবীকে উদ্দেশ্য করে তিনি লেখেন যে মহাত্মার "স্বীকৃত সকল অধ্যবসায়ই চরমতা লাভ করবে এমন কথা শ্রদ্ধেয় নয়।" গনতান্ত্রিকতার এই প্রাথমিক সর্তটিকে সেদিন কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কোন নেতাই গ্রহণ করতে পারেন নি।

॥ আট ॥

১৯৩০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত "Religion of Man" বক্তৃতামালার মধ্যেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতের একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ স্বীকৃত অর্থে কোন বিশেষ অনুসৃত চিন্তা (school of thought) পদ্ধতিতে বিশ্বাস করতেন না। সুতরাং তাঁর রাজনৈতিক চিন্তায় বিশেষ কোন বর্তমানের চালু মতাদর্শের পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক রূপ পাওয়া যাবে না। তাঁর রাজনীতি চিন্তার স্বরূপ হলো গণতান্ত্রিকতা—ব্যাপক অর্থে গণতান্ত্রিকতা, যেখানে সাধারণ মানুষের চরমতম কল্যাণের পথ প্রশস্ত হতে পারে। এই গণতন্ত্র চেতনা নিয়মতান্ত্রিক নয়, শুধু রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিকও বটে। সমস্ত মানুষের সহযোগীতায়, সমস্ত অসাম্যের অবসানে, সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনই, তাঁর রাজনীতি চিন্তার ধ্রুব লক্ষ্য। এ চিন্তা যেমন এক-দিকে রাজনৈতিক অন্যদিকে তা জীবনদর্শনের অঙ্গ। তাই তা জাতি-প্রেমের ধার ধারে না, মানবিকতা বিরোধি বলে। ১৯১৬ সালের Nationalism বক্তৃতায় যা বিশ্লেষণধর্মী হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, ১৯৩০ এর Religion of Man-এ তা লাভ করেছে পূর্ণতা। ১৯১৬ সালে তিনি বলেছেন "Humanity is greater than nationality", ১৯৩০-এ তিনি বলেছেন ঃ

"The history of the growth of freedom is the history of the perfection of human relationship.

পৃথিবীর দেশে দেশে সভ্যতার পিলসুজদের আত্মাবমাননায় এই সত্য কবির জীবনে যেমন রূপ নিয়েছে মানুষের ধর্ম হিসেবে, তাকেই আমরা ভাষান্তরে বলতে পারি মানুষের রাজনীতি। সেটাই প্রকৃত স্বাধীনতা ও সম্পূর্ণ স্ব-রাজ "যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতাকে সর্বসাধারণের সম্পদ করে তোলার মূল উপায় হচ্ছে ধন অর্জনে সর্বসাধারণের শক্তিকে সম্মিলিত করা।" রুশদেশে "নির্ধনের শক্তি সাধনার" কর্মকাণ্ডে "আগা-গোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলেছে" বলেই রবীন্দ্রনাথের উক্তি "রাশিয়ায় না এলে এ জন্মের তীর্থযাত্রা অসমাপ্ত থাকতো।" তাঁর কল্পনার একটা বাস্তব রূপদানের প্রয়াসের চেষ্টা সেখানে তিনি দেখেছিলেন যা ত্রুটী বিচ্যুতি সত্বেও সমর্থন যোগ্য। কারণ "এদের এখানকার বিপ্লবের বাণী·····বিশ্ববাণী। আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটা দেশের লোক স্বাজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে।" রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতের সর্বমানবিকতার এর চেয়ে স্পষ্ট চিত্রণ বোধহয় সম্ভব নয়।

এই মতের পরিচয় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন কোন এক বিশেষ আলোচনা প্রবন্ধ বা পুস্তকে নিবদ্ধ নেই। দীর্ঘজীবন ধরেই তারা ধীরে ধীরে সুগঠিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুতরাং তার বিচারে সতর্কতা অবলম্বন সম্পর্কে সাবধান বানী কবি স্বয়ং উচ্চারণ করে গেছেন তাঁর "রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত" শীর্ষক প্রবন্ধে। সেটা হলো : "যে মানুষ সুদীর্ঘ কাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিক ভাবে দেখাই সংগত। রাষ্ট্রনীতির বিষয়ে কোন বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোন এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়নি; জীবনের অভিজ্ঞতার সংগে সংগে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই সমস্ত পরিবর্তন পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহ একটা ঐক্য সূত্র আছে।...বস্তুত সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাকে পাই।" এ কথার চেয়ে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতের নির্দেশক আর কিছু নেই, হতেও পারে না।

উপন্যাসে আধুনিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

ইংলণ্ডে দুইশতক এবং বাংলাদেশে উপন্যাস একশতকের প্রাপ্ত-বয়স্ক হলেও সাহিত্যের ধ্রুপদী অঙ্গনে সে এখনো নবজাতক। তাই তার সংজ্ঞা, লক্ষণ এবং পরিণামী লক্ষ্য নিয়ে কখনোই তিনজন সমালোচক একমত হতে পারেন নি। হঠাৎ বড়োলোক যেমন বনেদী হবার বাসনায় কুলপঞ্জীতে মহিমা আবিষ্কার করে, উপন্যাসের পক্ষে কলম ধরতে গিয়ে সেন্টস্‌বেরী প্রমুখ সমালোচকেরাও অতি-আগ্রহে চসার-বিউলফ এমনকি তারো আগে থেকে নজীর দেখিয়েছেন। প্রত্নগবেষণা মাত্রই যেহেতু পাঠকের কাছে সমীহার বিষয়, তাই খুশী না হলেও সেই উৎসসন্ধান উপন্যাসেরই ইতিহাস বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'-ও এই প্রত্ন-কৌতূহলী মনের নিদর্শন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ, রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ বা আধুনিক কোন উপন্যাসের সমস্যা, জীবনজিজ্ঞাসা বা পাত্রপাত্রীর মনোলোক উদ্ঘাটনে চৈতন্যভাগবত বা বৌদ্ধজাতকে পৌঁছানোর প্রয়োজনীয়তা নেহাতই সাদৃশ্য সন্ধানী প্রবণতা।

এখন অবশ্য রিচার্ড চার্চ, ওয়াল্টার অ্যালান, রবার্ট লিডেল প্রমুখ উপন্যাস-আলোচকেরা স্পষ্টই বলেন:

They (হেনরিসনের টেস্টামেন্ট ও চসারের টেল্‌স্‌) were works of their world and time. It happens that they transcended both. Perhaps they might have bridged the gulf between the mediaevai metrical romance and something like the novel we know to day; but chancer and Henryson were an end, not a begining.

রিচার্ডসনের পামেলা থেকে ইংরাজী এবং বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী থেকেই বাংলা উপন্যাসের শুভারম্ভ। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে সহজেই আমরা

এসে গেছি রবীন্দ্রনাথে, ভাবে ও ভাবনায় এই দুই মহৎ শিল্পীর উপন্যাসে কালান্তর সুস্পষ্ট ; যদিও দুজনেই সমীপবর্তী, সমকালীন। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে যাঁরা উপন্যাস লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং রমেশচন্দ্র দত্ত ছাড়া সকলেই বঙ্কিম-প্রদক্ষিণে নিরত। কিশোরবয়স থেকেই পারিবারিকসূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত এবং তাঁর প্রতি সম্যক শ্রদ্ধান্বিত হয়েও রবীন্দ্রনাথের মনে কিঞ্চিৎ উষ্মা ছিল। এ উষ্মা নিছক সাহিত্যিক এবং সময়োচিত। বঙ্কিমচন্দ্র সত্যি 'দেশব্যাপী একটি ভাবের আন্দোলন' সৃষ্টি করেছিলেন ; এবং এ সত্যও বিস্ময়কর যে রোম্যান্টিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক প্রভৃতি বিচিত্র শ্রেণীর উপন্যাসে তিনিই প্রথম ও প্রধান শিল্পী। তবুও বঙ্কিমী বাতাবরণ বাংলা উপন্যাসের পক্ষে স্বাস্থ্যকর ছিল না। এর বিরুদ্ধে সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ্য বিদ্রোহ চোখের বালি ; তার কারণও নির্দেশিত হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রশেখর, প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলি বড়ো বড়ো মানুষ এঁকেছেন,—কিন্তু 'বাঙ্গালি' আঁকতে পারেন নি।' তখন 'বাঙ্গালি' কথায় সাধারণ মানুষের কান্নাহাসির গঙ্গাযমুনাসঙ্গমই রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল। অর্থাৎ তখনো বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব পেরিয়ে আসার চিন্তা নেতিবাচক স্তরেই সীমিত। নতুবা 'চিরপীড়িত, ধৈর্যশীল, স্বজন-বৎসল, বাস্তুভিটাবলম্বী, প্রচণ্ড কর্মশীল-পৃথিবীর এক নিভৃত-প্রান্তবাসী শান্ত 'বাঙ্গালীর কাহিনী' তাঁকে এত আকর্ষণ করবে কেন? এই গুণ শ্রীশচন্দ্রের রচনায় কী পরিমাণে আছে তা এখন কেবল ইতিকথা, তবে শরৎচন্দ্রের রচনাবলীর স্বধর্ম যে এই পরিধিকে আশ্রয় করে প্রকাশিত, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। তাহলে শরৎচন্দ্রের কোন উপন্যাস পাঠে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ কেন স্তুতিবাদ করলেন না? বরং স্নেহসম্বন্ধ সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের শিল্প-প্রকরণ তাঁকে সাধুবাদে কুণ্ঠিত করেছিল।

এর কারণ ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের মননে বিষয়বিন্যাসে ও চিত্ত-বিশ্লেষণে নিহিত। ইংরেজী উপন্যাসের সূক্ষ্ম পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে তাঁর অনীহা যতই সোচ্চার হোক, ('কেবল প্যাঁচের উপর প্যাঁচ, অ্যানালিসিসের উপর অ্যানালিসিস ; কেবল মানবচরিত্রকে মুচড়ে নিংড়ে কুঁচকে-মুচকে, তাকে সজোরে পাক দিয়ে দিয়ে তার থেকে নতুন নতুন থিওরি এবং নীতিজ্ঞান বের করবার চেষ্টা') উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়ে

তিনি সমস্যাজর্জর জীবনালেখ্য অঙ্কনে সর্বদা উৎসাহ দেখিয়েছেন। 'বাস্তুভিটাবলম্বী' বা 'নিভৃতপ্রান্তবাসী শান্ত বাঙ্গালীর কাহিনী' তাঁর কোন উপন্যাসেরই উপজীব্য নয়। 'নষ্টনীড়', 'করুণা' 'বিনোদিনী'তে যে সত্যসন্ধানী সাহসী মনের প্রকাশ, 'চোখের বালি'তে তারই প্রতিষ্ঠা। এর কাহিনী 'একালের কারখানাঘরে বানানো'; মহেন্দ্র-বিনোদিনী-বিহারী আশা'র কাহিনীতে গল্পাংশ গৌণ, 'ধৈর্যশীল, স্বজন বৎসল' চরিত্র একটিও নেই। মহেন্দ্র দুর্বল, স্বার্থপর, ভোগী, ব্যক্তিত্বহীন,-অন্য-পক্ষে আদর্শ বিহারী অনেকাংশে উগ্র, অসহিষ্ণু; অবশ্য তার বন্ধু-বাৎসল্য সন্দেহাতীত। কারণ যেমন ক্ষুদ্র রন্ধ্র দিয়ে নলের দেহে কলি প্রবেশ করেছিল, এই উপন্যাসেও বন্ধুবাৎসল্যের রন্ধ্রপথেই মহতী বিনষ্টির বীজ উপ্ত হয়েছে। বিহারীর ভাবী স্ত্রী আশা হ'ল মহেন্দ্রের স্ত্রী, এবং মহেন্দ্রের সম্ভাবিত পাত্রী বিনোদিনীর আহত, প্রত্যাখ্যাত নারীত্ব প্রবৃত্তির বহ্ন্যুৎসব ঘটিয়ে নিজেকেই ছারখার করলে। গল্পাংশে মৌলিকতা সামান্য, তাও বঙ্কিমচন্দ্র অনুসারী, প্লট-বিন্যাসেও রচনাটি 'দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ'; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চরিত্রগুলির 'আঁতের কথা টেনে' বের করেছেন। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ তবু কিছু আছে, সূর্যমুখী কুন্দনন্দিনীর চিত্তজগৎ কেবলি লেখকের বিবৃতি মাধ্যমে বিজ্ঞাপিত। অথচ খুব বড়ো ঝড় এই দুটি নারীর জীবনেই এসেছে। কুন্দনন্দিনী তো 'অস্ফুটবাক্', সূর্যমুখীর অভিমান এবং গভীর বেদনা মাত্র উল্লিখিত। ব্যক্তিত্বময়ী কোন নারী তার জৈব ক্ষুধা, ভালোবাসা সেবা প্রভৃতি চরিত্রধর্ম নিয়ে কুন্দের স্থলাভিষিক্ত হলে সমস্যা কেমন দাঁড়ায়, 'চোখের বালি' তারই অভিজ্ঞান। দিনানুদৈনিক ঘটনাবলী বর্ণনা এবং মহেন্দ্র-বিহারী-বিনোদিনীর মনে তার প্রভাব, প্রতিক্রিয়া আশ্চর্য নৈপুণ্যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর শেষ পর্যায়ের রচনা দুইবোন বা মালঞ্চে যেমন কাব্যগুণ ঔপন্যাসিক মূল্য ক্ষুণ্ণ করেছে; চোখের বালি সে ত্রুটি থেকে মুক্ত। অথচ রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি তখন দেশজয়ী। 'চোখের বালি'র পর 'নৌকাডুবি' আশ্চর্য পশ্চাদ্‌গতি! দুঃসাহসিক অভিযাত্রার পরেই যেন লেখক রক্ষণশীলভাবে নীড়বিলাসী হয়েছেন। আকস্মিক, অতিপ্রাকৃতের কেন্দ্রে বেঁধে কয়েকটি নিরীহ ভালোমানুষ নরনারীকে স্বভাবভ্রষ্ট করেছেন। অবশ্য গোরা-র

কয়েকটি সমস্যা এবং নরনারীর প্রস্তাবনা এই উপন্যাসেই লেখক-মানসে সূচিত হয়। সেই সূত্রে নৌকাডুবির তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

গোরায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-ঐতিহ্য মুক্ত হয়ে যে স্বকীয় ভিত্তিতে দাঁড়ালেন, তা বাংলা উপন্যাসের বিস্ময়কর অগ্রগতি সূচিত কর'ল। দেশের জাতীয়তা ও জাতি-অভিমান, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, রামমোহন থেকে দয়ানন্দ সরস্বতী পর্যন্ত ধর্মান্দোলনের ভাব-সংঘাত, প্রেম ও বিবাহজনিত ধারণা গোড়ায় মহাকাব্যীয় বিস্তৃতি লাভ করেছে। র‍্যালফ ফক্স যে-শ্রেণীর উপন্যাসকে এ কালের মহাকাব্য বলেছেন, 'গোরা' সেদিকে নিশ্চিত পদপাত। গোরা ও বিনয়ের বন্ধুত্ব, উভয়ের মানস-সংকট, এবং সেই সংকট মোচনের তাগিদে বন্ধুত্বচ্ছেদ, দুটি মানুষের 'অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে' লেখকের অসীম দক্ষতার পরিচয়। হরকামিনী শরৎচন্দ্রীয় বর্ষিয়সী স্বার্থপর রক্ষণশীল নারীদের অগ্রজা এবং মহিম একান্ত পরিচিত বিষয়ী মানুষটি।

'গোরা' বারংবার পড়বার মত বই, নানা জায়গা থেকে আরম্ভ করে অগ্রসর হলে ভিন্ন আস্বাদন বা রম্যবোধ পাওয়া যায়। সমাজপতিদের কাছে অসহায় না হলেও যে মানুষের আত্মিক সমস্যা কী দুঃসহ কঠিন, আদর্শবাদী রোমান্সের ধ্বজা না উড়িয়ে সমকালের ক্রিয়াশীল এবং যুযুধান সত্যকে অধিকার করাই যে ঔপন্যাসিকের সাধনা, তার সার্থক উপলব্ধি গোরা'র শিল্পরূপে ব্যক্ত। দুঃখের বিষয় গোরা'র পদ্ধতি ও প্রকরণ পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে গৃহীত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও একবার মাত্র খাঁটি ঔপন্যাসিকের মত কলম ধরেছিলেন যোগাযোগে; কিন্তু অনবধানতাবশে যোগাযোগেও মহৎ সৃষ্টি হতে পারে নি। অবশ্য পত্রান্তরে জনৈক আগ্রহী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গোপাল হালদার সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের রচনায় রবীন্দ্র-উপন্যাস তত্ত্বের সার্থক উত্তরাধিকার লক্ষ্য করেছেন। এহেন কার্যকারণস্পৃহা কাকতালীয় উপপত্তি স্মরণ করায়।

যোগাযোগের কেন্দ্রগত বিষয় মধুসূদনের সংসারে কুমুদিনীর যন্ত্রণা। চট্টোপাধ্যায় ও ঘোষাল দুটি পুরনো জমিদার বংশ, দুজনেরই দোর্দণ্ডপ্রতাপ, প্রচণ্ড বংশাভিমান। কিন্তু কালক্রমে সামন্তপরিবারে লক্ষ্মী চঞ্চলা হলেন মধুসূদন গণ-দেবতার কৃপায় বৈশ্যরাজকতন্ত্রে বহু মর্যাদা পেলেন। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বিপ্রদাসের বোন কুমুদিনীকেই বিবাহ করলেন। কন্দর্পের চেয়ে, দর্পের জোর ছিল বড়, তাই পদে পদে বিরোধ বাধল। শ্যামসুন্দরের

আদর্শ রূপের সঙ্গে বাস্তব মধুসূদন মিলল না এবং পজিটিভিস্ট বিপ্রদাসের শিক্ষায় মোতির মার মত সামঞ্জস্য সাধনে অপারগ হল। মধুসূদন শক্তিমানকে তোষামোদ করে বিত্তবান হয়েছে, সে-ও সকলের আনুগত্য চায়, অপিসে এবং বাড়িতে। নারীর যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবোধ থাকতে পারে; মধুসূদন তার পরিচয় ইতোপূর্বে পায় নি। সামাজিক ভূমিকার কথা বলেছেন, তার মধ্যে গৃহিণী সচিব সখী ললিতকলানিপুণা আছে, কিন্তু দাসী তো নেই। আধুনিক উপন্যাসের একটি কঠিন প্রশ্ন উচ্চারিত হল যোগাযোগে। হাবে-ভাবে শান্ত স্নিগ্ধ; কিন্তু বিনোদিনীর চেয়ে সে বড়ো বিদ্রোহিনী। অধিকাংশ উচ্চ-প্রশংসিত দাম্পত্য-জীবনে আসলে সবটাই বিয়োগ, মিলনসূত্রটা অভ্যাসিক এবং সন্ততিধারায় রক্ষিত। আধুনিক সমাজের সারশূন্যতা বর্তমানে ঔপন্যাসিকদের সচেতন করে তুলেছে। সেই পটভূমিতে যোগাযোগ পুরোবর্তী।

অবশ্য রবীন্দ্র-উপন্যাসের ত্রুটি থেকেও আধুনিক বাংলা উপন্যাস শিক্ষা নিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যেখানে শেষ করলেন বিনোদিনী উপাখ্যান, সেখান থেকে আবার গল্প সুরু করা যেতে পারে, কারো কুণ্ঠাশ্রমে যাবার দরকার নেই। গোরার সমাজপ্রতিবেশ নিপুণভাবে চিত্রিত হলেও গোরা বা বিনয়ের যে ব্যক্তিগত প্রেমবোধের কাহিনী উপন্যাসে বিবৃত, আধুনিক লেখক গোরা'র কল্পনাবিস্তৃতির থেকে পাঠ নিয়েও বিনয়-ললিতার প্রেম-বিবাহ-ঘটিত আলোচনাকে নিশ্চয়ই যথেষ্ট মনস্তাত্ত্বিক বলবেন না। গোরার জীবনে দুটি পরিবর্তন—নিভৃত কারাবাস ও হৃদয়ে প্রেমোদ্বাবোধন, সুচরিতার মূল্য উপলব্ধি এবং কৃষ্ণদয়ালের মুখে আত্মপরিচয় উদ্ঘাটন। দ্বিতীয়টি যথাযথ, অবশ্য এই পরিচয় ব্যতিরেকে তার সংস্কার মুক্তি ঘটলেই গোরার বুদ্ধি ও উপলব্ধির মর্যাদা বাড়ত, প্রথমটির তাৎপর্য উপন্যাসের পরিকল্পনায় যথেষ্ট প্রাধান্য পেলেও গ্রন্থে উল্লিখিত মাত্র। নিভৃতি যাপনে কী নতুন চিন্তার প্রভাব, প্রেমের আলো তার জীবনের গতিপথ বদলে দিল, সে বিষয়ে আধুনিক ঔপন্যাসিক কিছুতেই উদাসীন হতে পারেন না। অথচ রবীন্দ্রনাথের মত লেখক গল্পের বহিরাশ্রয়ী আকর্ষণে তা পেরেছিলেন।

এর পরে উপন্যাসের কয়েকটি নিরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। উপন্যাসের কোন পূর্ব নির্ধারিত সংজ্ঞাতেই শেষের কবিতা, দুই বোন, মালঞ্চ বা চার অধ্যায়কে চিহ্নিত করা চলে না। কোথাও নাটকের সংক্ষিপ্তি, কাল-

ব্যাবধানে যবনিকা উদ্ঘাটন, কোথাও বা চরিত্রায়ণে, সংলাপে কথা-শিল্পের উপলবন্ধুর জমি পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ কবিকল্পনায় বসতি করেছেন। বাংলা উপন্যাসে তথা গদ্যে চিত্তচমৎকারী অভিনবত্ব এনেছেন নিঃসন্দেহ, কিন্তু আধুনিক উপন্যাসকে বোধহয় কিয়ৎপরিমাণে লক্ষ্যচ্যুত করেছেন। তাই এখন রম্য-রচনা, প্রতিবেদন, কাল্পনিকতার ব্যসন সবই উপন্যাস নামে চলে যাচ্ছে এবং স্বপক্ষে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত হচ্ছে। শেষের কবিতার থীম অবশ্যই উপন্যাসোচিত, শোভনলাল, অমিত রায়, কেটি, লাবণ্য, যোগমায়া সব চরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য আছে দ্বন্দ্ব আছে, আত্মগত ভাবনায় গভীরতার স্পর্শ আছে। তবু কী যেন নেই; চরিত্রগুলি কবির ইচ্ছেমত কথা বলেছে, এবং জীবনের পথে চলেছে—স্বাধীনভাবে স্তরে স্তরে ফুটে উঠতে দেওয়া হয় নি। যতই ইঙ্গিতবহ সংকেতদ্যোতনা থাক, উপন্যাসকে অন্তত কিছুটা বিবর্তনের মোটা সুতো ছুঁয়ে আসতে হয়। সে ঔপন্যাসিকের ভাষা এবং নায়কের ভাষা এক হলেও আকর্ষণ কমে, এমন কি শেষের কবিতার আশ্চর্য এপিগ্রাম-উদ্ভাসিত গদ্য হলেও তার ত্রুটি মনে বাজে। ভাষার খরবেগে নরনারীর চিত্তলোক ভেসে যায়। কবিতায় উপসংহারও উপন্যাসের পথ ছেড়ে চলে যাওয়ার নিদর্শন।

দুইবোন নীরক্ত আইডিয়ার গল্পরূপ। মালঞ্চেও গল্প আইডিয়াপ্রধান, সমগ্র মানুষের চেহারা নেই, কেবল চিত্তনির্যাস সংকলন করেছেন। তবু শর্মিলার চেয়ে নীরজার মানবিক কারুণ্য সুন্দর ফুটেছে। দুজনেই অসুস্থ। অসুস্থ দেহে অসুস্থ কল্পনার উদয় অস্বাভাবিক নয়; স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তখন ভাবতে পারেন, 'এই মহাবিশ্বতলে যন্ত্রণার ঘূর্ণযন্ত্র চলে'; সুতরাং ঊর্মিলা ও সরলাকে নিয়ে যদি কোন ঈর্ষা ঘনিয়ে ওঠে শর্মিলা নীরজার মনে তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ তার চিত্র এঁকেছেন, কিন্তু ছোট-আমিকে ছাড়িয়ে ওঠার জন্য আন্তরিক আগ্রহেই সেই ঈর্ষার উত্তরণ। 'দেব, দেব, দেব, সব দেব' বলার পরেও "সরলা এসে প্রণাম করবার জন্য পায়ে হাত দিতেই যেন বিদ্যুতের আঘাতে ওর সমস্ত শরীর আক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। পা দ্রুত আপনি গেল সরে। ভাঙা গলায় বলে উঠল, 'পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না।' আধুনিক চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস এই পথ নিলে রবীন্দ্র-উত্তরাধিকার সার্থক হতে পারে। চেতনাপ্রবাহে কেবলি মরবিডি, ক্লিন্নতা,

নৈরাশ্য, পরাভব, অর্থহীন ডিটেল্‌সের সমারোহ না ঘটিয়ে একটু আত্ম-বিচারণা, মরবিডিকে অতিক্রম করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাক। তাহলেই চেতনাপ্রবাহমূলক কথাসাহিত্য সুস্থচিন্তায় স্বাস্থ্য লাভ করবে; এবং রবীন্দ্রনাথের কথাশিল্পের ঐতিহ্য অঙ্গীকার করলে সে পথ দুঃসাধ্য নয়।

ঘরে-বাইরে এবং চার-অধ্যায় কালব্যবধানে রচিত হলেও একত্র আলোচ্য। কেননা দুটিরই পটভূমি এক—রাজনৈতিক আবর্তে বিক্ষুব্ধ বাংলা দেশ; প্রথমটিতে অসহযোগ, পরেরটিতে সন্ত্রাসবাদ। এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা না করে এখানে শুধু আঙ্গিকে এবং অন্যপ্রসঙ্গে দু'একটি কথা বলি। ঘরে-বাইরে-র গল্প স্থূলনগ্ন বাস্তবকে ভিত্তি করেছে। গল্পের প্রাণপুরুষ সন্দীপের চরিত্রে আছে 'লালসার লোলতা,; সেই প্যাশন তাকে স্বদেশসেবা থেকে নিয়ে যায় রমণীরঞ্জনে এবং শেষপর্যন্ত গহণাচুরিতে। যেকোন কুলবধূর পক্ষে এহেন ব্যক্তির সান্নিধ্যে এসে আত্মবিস্মৃতি ঘটা স্বাভাবিক। বিশেষত যখন দেশের আদর্শ এবং অমিট্রায়ে-সুলভ কথাচাতুর্য সহজেই সংসারবন্ধন শিথিল করে দেয়। কিন্তু এই উপন্যাসের ভাষা এত কাব্যধর্মী হল কেন। এভাষায় আবেগ-স্পন্দিত মুহূর্তে দু'চার পৃষ্ঠা ডায়েরি লেখা যায়, চিঠিও সম্ভব, কিন্তু একটি সমগ্র উপন্যাস রচিত হতে পারে না। গল্পের বিবৃতিতেও ভাবের প্রাধান্য, বিশ্লেষণ উহ্য। রবীন্দ্রনাথও বুঝেছিলেন, কিন্তু লিরিকের তোড়া রচনার মোহ কাটাতে পারেন নি। চার-অধ্যায় সম্বন্ধে তাঁরই স্বীকৃতি 'চার অধ্যায়ের' যেদিকটা আমাদের পাঠকদের ভোলায় সে ওর কবিতা অংশ। ওর ভাষায় লাগিয়েছি জাদু। সেইটের ভিতর দিয়ে তারা যে জিনিসটা পায় সেটা ঠিক গদ্যের বাহন নয়।

প্রসঙ্গত লিডেলের কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়।

১। Can a good novel bea a poor work of art ?

২। Can a good work of art, which is in the form of a novel, be a poor novel (or poor as a novel) ?

৩। Is it possible to say something significant and yet write bad prose ?

৪। Can prose be good when its content is insignificant ?

শেষের কবিতা work of art হিসেবে অবশ্যই অনবদ্য, কিন্তু

ঔপন্যাসিকগুণ বিচারে সার্থকতা ব্যাহত হয়েছে, অর্থাৎ **'good novel'** হয় নি। অন্যপক্ষে, গোরা নিশ্চয়ই 'নভেল' হিসেবে মহৎ, কিন্তু **work of art** রূপে ত্রুটিমুক্ত নয়। টলস্টয়ের ওয়ার অ্যাণ্ড পীস বা রেসারেকষণও নিখুঁত শিল্পকর্ম নয়, অথচ কালোত্তীর্ণ উপন্যাস—কেবল রুশ সাহিত্যে নয়, বিশ্বের উপন্যাস-সাহিত্যে। তাই পার্শি লুবক বা অন্যান্য লেখক উপন্যাসের ইতিবৃত্ত লিখতে গিয়ে টলস্টয়কে বড়ো মর্যাদা দিয়েছেন। আঙ্গিকের নিরীক্ষা, নতুন রীতি যখন নতুন করে আমাদের দেশে আর্টের জিগির তুলেছে, তখন বলা উচিত উপন্যাসের কালজয়িতা নিভাঁজ আর্টে নয়; উপন্যাসের আর্ট শোলার ফুল বা ভাস্কর্যের আনুপাতিক সৌষম্য নয়। চলমান জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণবেগে, মনোরহস্যের ঔচিত্যেই উপন্যাসের শিল্পসিদ্ধি।

তৃতীয় প্রশ্নটির সংক্ষিপ্ত উত্তর, না। যদি প্রকৃত জীবনশিল্পীর আবেগ ইচ্ছা আকৃতি থাকে, তাহলে **'bad prose'** তার প্রকাশবাহন হতে পারে না। শরৎচন্দ্রের ভাষায় বাংলাগদ্যশৈলীর কোন নতুন অগ্রগতি ঘটেনি, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভাষাকেই প্রায়শঃ যথাস্থিত রূপে ব্যবহার করেছেন, হয়ত বৈয়াকরণ বিচারে পুনরুক্তি, গুরুচণ্ডালি, দীর্ঘভাষণ, **cramming**, যুক্তির ক্লিষ্টতাও দুর্লভ নয়, অথচ সহস্র সহস্র বাঙালী পাঠক কখনো মনে করেন নি, তাঁর ভাষা খারাপ। কারণ প্রকৃত কথাশিল্পীর আবেগ, বাস্তবপ্রতিবেশের জ্ঞান তাঁর ছিল। শেষ প্রশ্নটির উত্তর জটিল। তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য তার ভাষা আপনি সৃষ্টি করে, নদী যেমন স্রোতের বেগে পথ কেটে চলে। কিন্তু অসার বক্তব্য সত্ত্বেও গদ্যভাষা সুন্দর হতে পারে। অবধূত, নীহাররঞ্জন গুপ্ত এমনকি সৈয়দ মুজতবা আলী তার প্রমাণ। ইদানীংকালের বহু উপন্যাসেই ঔপন্যাসিক সাধারণ পরিচয় নেই, আছে বর্তমান জগৎ সম্বন্ধে অগভীর জ্ঞান, সামান্য পড়াশোনা, কিঞ্চিৎ রোমাণ্টিক কল্পনা এবং দীর্ঘ অনুশীলনে প্রাপ্ত ভাষার ওপর দখলাধিকার; তাই সেগুলি ব্যর্থ উপন্যাস হলেও সুখপাঠ্য। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সাধনা অনুসরণযোগ্য। নেহাৎ **insignificant** গল্প বলার দায়ে তিনি কখনো তাঁর সুখ্যাতি পঠন-পাঠন এবং ভাষাধিকার প্রয়োগ করেন নি। অন্তত প্রধান সবকটি উপন্যাসে তিনি জীবনশিল্পী, সততই জীবনরহস্য উদ্ঘাটনে তাঁর আগ্রহ ছিল। কিন্তু প্রতিভার স্বধর্মহেতু মাঝে মাঝে কবি রবীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে অজ্ঞাতসারে পথ ভুলিয়েছেন। অভিজ্ঞতার ফাঁকি এড়াতে কখনো তিনি ভাষার আবির কুংকুম ছড়িয়ে পাঠকের চোখে রঙ ধরান নি। ধৈর্যশীল, শান্ত, বাস্তু-ভিটাবলম্বী বাঙ্গালীর জীবনালেখ্য অংকন যে কখনো ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে বসে নি, এটাই সবচেয়ে আশার কথা।

রবীন্দ্রনাথ ঃ "চার অধ্যায়"

সরোজ আচার্য

রবীন্দ্রনাথের "চার অধ্যায়" যখন বার হয় আমরা তখন রাজবন্দী, বাংলা দেশের বাইরে আজমীর থেকে মাইল চল্লিশ দূরে দেউলী বন্দী-নিবাসের বাসিন্দা আমরা। "চার অধ্যায়" আমাদের হাতে পৌঁছুল অনেক বিধিনিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে, আর আমরা, সে বই আগাগোড়া পড়লাম একদমে, একটানা। ঠিক সে-সময় আমাদের মনের অবস্থা কী রকম হয়েছিল তা এখনও অনায়াসে স্মরণ করতে পারি। বাংলাদেশ থেকে প্রায় নির্বাসিত রাজস্থানের মরুভূমির মধ্যে পাঁ-টা বন্দী-শিবিরে, ব্রিটিশরাজের বিভীষিকা স্বরূপ শ-পাঁচেক বঙ্গসন্তান আমরা। ভালো মানুষ আমরা নই, বরং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা নিজেদের 'লক্ষ্মীছাড়ার দল' জেনেই খুশী। সেই রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে বার হয়ে 'চার অধ্যায়' যখন নানা সরকারী হাত ঘুরে আমাদের হাতে পৌঁছুল এবং আমরা যখন ঘরে ঘরে গোল হয়ে দল বেঁধে পড়লাম ইন্দ্রনাথ, এলা, অতীন্দ্রের কাহিনী তখন সত্যিই আমরা যেন অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ঘরে ঘরে নিদারুণ বিষাদের ছায়া, চাপা সুরে সকাতর প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথ—আমাদের রবীন্দ্রনাথ, তিনি এই বই লিখলেন, কেন লিখলেন ঠিক এই সময়ে যখন কিনা বাংলাদেশ জুড়ে এণ্ডারসনী তাণ্ডব চলছে? এ কোন রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছ থেকে বিপ্লবীরা জপমন্ত্র পেয়েছিল, "ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে, নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ"? একী সেই রবীন্দ্রনাথ, যাঁর বজ্রগর্ভ বাণী থেকে বিপ্লবীরা মরণজয়ী সাধনার পাথেয় সংগ্রহ করছিল,—"পিতামহের বিরুদ্ধে এইটিই সবচেয়ে বড় অভিযোগ। সেইত, আজ তাঁহারা নাই, তবে ভালমন্দ কোন একটা অবসরে তাঁহারা রীতিমত মরিলেন না কেন? তাঁহারা যদি মরিতেন তবে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরাও নিজেদের মরিবার শক্তি সম্বন্ধে আস্থা রাখিতে পারিতাম।" স্বদেশী যুগ থেকে উত্তরত্রিশের তথাকথিত সন্ত্রাসবাদের

যুগ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিপ্লব প্রচেষ্টায় যাঁরা সংযুক্ত ছিলেন তাঁরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন তাঁদের মরণজয়ী সাধনা রবীন্দ্র-মানসের উত্তরাধিকার সমর্থিত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবীদের এই বিশ্বাসকে কখনও স্পষ্টভাবে প্রশ্রয় দিয়েছেন বলা যায় না। তবু 'চার অধ্যায়ের' আঘাতটা এসেছিল ঠিক সেই সময়ে বাংলাদেশের যুব-শক্তি যে সময় বিপ্লবের উত্তাল তরঙ্গের শীর্ষবিন্দুতে উপনীত। ঠিক সেই সময়ে 'চার অধ্যায়' অধ্যয়ন শেষে দেউলী বন্দীশিবিরে নির্বাসিতদের মনের অবস্থা অবর্ণনীয় শোকাচ্ছন্ন।

বাইরে বাংলাদেশে 'চার অধ্যায়' যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা আমাদের পক্ষে তখন জানা সম্ভব ছিল না। প্রভাত মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনীতে' লিখেছেন, বই বাহির হওয়া মাত্র দেশের মধ্যে ভীষণ একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। এই বই সম্বন্ধে যে-পরিমাণ সমালোচনা হইয়াছে তাহা 'ঘরে বাইরের' পর কবির অন্য কোন বই সম্বন্ধে হয় নাই।··· লোকে বলিতে আরম্ভ করিল গভর্ণমেণ্ট এই বই কিনিয়া অন্তরীণাবদ্ধদের দিতেছেন, বিপ্লব দমনের জন্য এই বই সরকারের উপযুক্ত অস্ত্র হইয়াছে।" লোকে যাই বলুক গভর্নমেণ্ট এই বই কিনে অন্তরীণাবদ্ধদের দেন নি। অন্ততপক্ষে দেউলী বন্দীশিবিরে 'চার অধ্যায়' তখন সহজে প্রবেশ করতে পারে নি। মনে আছে, প্রথমে এক কপি মাত্র 'চার অধ্যায়' সরকারী সেন্সরের দরজা দিয়ে দেউলী বন্দীশিবিরে ঢুকতে পেরেছিল। এক কপি বই, পাঁচটি ক্যাম্পে প্রায় পাঁচশ রাজবন্দী 'চার অধ্যায়' পড়বার জন্য আগ্রহে-উন্মুখ। অগত্যা সহজ উপায় আবিষ্কৃত হল, গোটা বইখানার সব-গুলি পাতা ছিঁড়ে আলাদা আলাদা করা এক একটি করে পালা করে দশ বারো জনের পাঠচক্রে এক এক বেলার বৈঠকে পাতার পর পাতা 'চার অধ্যায়' অধ্যয়ন সমাপন। 'চার অধ্যায়কে' বিপ্লব দমনের প্রচার পুস্তক রূপে' ব্রিটিশরাজ ব্যবহার করেন নি। ব্রিটিশরাজ কী করেছিলেন বা করেন নি 'চার অধ্যায়' নিয়ে সে কথা আমরা তখন মোটেই ভাবি নি। 'বিপ্লব দমনের প্রচার পুস্তক' হিসাবে রবীন্দ্রনাথ 'চার অধ্যায়' রচনা করেছেন এমন কোনো সন্দেহের ঘুণমাত্র আমাদের মনে স্থান পায় নি, যদিও আমরা বিচলিত, ব্যথিত হয়েছিলাম এই ভেবে যে রবীন্দ্রনাথ, আমাদের রবীন্দ্রনাথ বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে, বিপ্লবীচরিত্রকে কী করে এত লঘু ভাবে প্রগলভ

প্রণয়কাহিনীর সামিল করতে পারলেন? রবীন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে পরে যে কৈফিয়ত দিয়েছেন (প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪২) তার নিপুণ সাহিত্যিক যুক্তি সমাবেশ রবীন্দ্রনাথের লেখনীর উপযুক্ত সন্দেহ নেই। কিন্তু বিপ্লব প্রচেষ্টা এবং বিপ্লবী চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কী সে বিষয়ে সংশয় দূরীভূত হয়েছে বলা যায় না।

'চার অধ্যায়ের' প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের একটি "মর্মান্তিক কথা"র সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "উপন্যাসের আরম্ভে এই ঘটনাটির উল্লেখযোগ্য।" স্বদেশী যুগে উপধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় ছিল "বাংলাদেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকা পন্থার সূচনা।" অতঃপর কোন এক সময়ে উপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন "রবিবাবু আমার খুব পতন হয়েছে।" 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের নীতি সূত্রের "আভাস" এই। এই আভাস এবং কাহিনীর চরিত্র-চিত্রণ, ঘটনা সমাবেশ ও পরিণতি একত্র মিলিয়ে দেখলে স্বতঃই মনে হবে বিপ্লব প্রচেষ্টার বন্ধুর পন্থায় পতন এবং অধঃপতনই একমাত্র অনিবার্য সত্য; বিপ্লবীকর্মে নিষ্ঠা, সততা, শুচিতা কোন কিছুরই স্থান নেই। "চার অধ্যায়" এই ধারণাই সমর্থন করে। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের বিলাপোক্তির সূত্রাভাস-সংযুক্ত প্রথম সংস্করণের ভূমিকা অবশ্য দ্বিতীয় সংস্করণে পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু তার ফলেও চার অধ্যায়ের কাহিনী এবং চরিত্র চিত্রণের তাৎপর্যগত কোন পরিবর্তন ঘটেছে বলা যায় না।

বিরূপ সমালোচনার লক্ষ্যস্থলকে অপসারিত করার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর "চার অধ্যায় সম্বন্ধে কৈফিয়তে" বলেন, গল্পের ভূমিকা বা পটভূমিকা অনেক পাঠকের মনে খুব বেশী প্রাধান্য পেয়েছে; তাঁর মতে চার অধ্যায়ের 'সাহিত্য রূপই' প্রধান বিচার্য। "যেটাকে এই বই-এর একমাত্র আখ্যান-বস্তু বলা যেতে পারে, সেটা এলা ও অতীন্দ্রের ভালবাসা।— স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এর মূল অবলম্বন কোনো আধুনিক বাঙ্গালী নায়ক-নায়িকার প্রেমের ইতিহাস। সেই প্রেমের নাট্যরসাত্মক বিশেষত্ব ঘটিয়েছে বাংলা-দেশের বিপ্লব প্রচেষ্টার ভূমিকায়। এখানে সেই বিপ্লবের বর্ণনা অংশ গৌণ মাত্র।" মনে হয়, চার অধ্যায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই কৈফিয়ত তাঁর দ্বিতীয় চিন্তা প্রসূত। 'চার অধ্যায়ে' "বিপ্লবের বর্ণনা অংশ গৌণ মাত্র" হলেও স্বদেশী যুগ থেকে উত্তরত্রিশে বাংলা দেশের বিপ্লব-প্রচেষ্টার

প্রকৃত পরিচয় বিকৃত হয়েছে ইন্দ্রনাথ এবং এলার চরিত্র-চিত্রণে। "অন্তু এবং এলার ভালবাসার বৃত্তান্তটা" রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "লিরিকের তোড়া" কিন্তু এলা-অন্তুর প্রণয়োপাখ্যানের "নাট্যরসাত্মক বিশেষত্ব" মাত্র বাংলা-দেশের বিপ্লব প্রচেষ্টার ভূমিকা—একথা মেনে নেওয়া সহজ হত যদি প্রথম সংস্করণের "আভাসে" উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের "পতনে" উপন্যাসখানির নীতি সূত্রের গূঢ় ইঙ্গিত না থাকত।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বলেছেন, "চার অধ্যায়ের রচনায় কোন বিশেষ মত বা উপাদান আছে কি না সে তর্ক সাহিত্য-বিচারে অনাবশ্যক।" সত্যিই কি অনাবশ্যক? সাহিত্য-বিচার কি সত্যিই এত সংকীর্ণ, বিষয়-নিরপেক্ষ? পাস্তেরনাক 'ডঃ জিভাগো'র আখ্যান বস্তু কি একান্ত ভাবে সাহিত্যিক বিচারে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আলোড়ন ঘটিয়েছে? পাস্তেরনাক একটি সমাজব্যবস্থার যে চিত্র কল্পনা বা রচনা করেছেন তার সাহিত্যিক উৎকর্ষ বিচারেই কি ডঃ জিভাগোর তাৎপর্য নিঃশেষিত? তেমনি 'চার অধ্যায়ের' প্রণয়োপাখ্যান, ভাষার 'জাদু' এবং বাংলাদেশের বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে "নাট্যরসাত্মক" উদ্দেশ্যে ব্যবহার--রবীন্দ্রনাথের 'কৈফিয়তের' এই ত্রিবিধ যুক্তির সারবত্তা মেনে নিলেও বিপ্লব প্রচেষ্ট এবং বিপ্লবী চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অস্বচ্ছন্দ মনোভাবকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। যায় না আরও এই কারণে যে, উত্তরত্রিশের 'চার অধ্যায়' আর তার আগের কালের 'ঘরে বাইরে', ইন্দ্রনাথ এবং সন্দীপ, দুই-ই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি বিশেষ ধারার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অস্বচ্ছন্দ মনোভাবের পরিচায়ক। সন্দীপ আত্মম্ভরী, আন্তরিকতাশূন্য, নীতিজ্ঞান-হীন; ইন্দ্রনাথের ধর্মাধর্মবোধের অর্থাৎ ভালোমন্দ বিচারের বালাই নেই। উভয়ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের যুক্তি "গল্প যখন লেখা যাচ্ছে তখন তার সঙ্গে লেখকের সাময়িক অভিজ্ঞতা জড়িত হয়ে পড়ছে এবং লেখকের ভালো-মন্দ লাগাটাও চেনা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই রঙিন সুতোগুলো শিল্পেরই উপকরণ। তাকে যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যায় তবে সে উদ্দেশ্য লেখকের নয়, পাঠকের।" অর্থাৎ লেখকের উদ্দেশ্য শুদ্ধ শিল্প-সৃষ্টি "ঘরে বাইরে" বা 'চার অধ্যায়ে' যদি কোন কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি বিরূপতার স্বাক্ষর থাকে তবে সেটি রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্য বিচারে 'গৌণ মাত্র'। সম্প্রতি সাহিত্য সমালোচনায় "intentionalist

fallacy" নামে একটি বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হচ্ছে। লেখকের উদ্দেশ্য কী সেটি আবিষ্কার করে সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী লেখার মূল্য-বিচার নাকি সাহিত্য-সমালোচনার প্রকৃষ্ট রীতি। এই রীতি অনুসরণে অবশ্য বিপত্তির সম্ভাবনা প্রচুর। কোনও লেখার তাৎপর্য পাঠকবর্গ কী ভাবে গ্রহণ করে অথবা তাদের কী ভাবে গ্রহণ করা উচিত সেটি অনুসন্ধান করাও সমালোচনারীতির আবশ্যক অঙ্গ। কাজে কাজেই 'চার অধ্যায়' রচনায় রবীন্দ্রনাথের শিল্পগত উদ্দেশ্যই 'চার অধ্যায়ে'র পূর্ণ তাৎপর্য প্রকাশ করে না। "চার অধ্যায়" এবং 'ঘরে বাইরে' কেবলই মনে করিয়ে দেয়, বিপ্লবপ্রচেষ্টার এবং বিপ্লবী চরিত্রের অসহিষ্ণুতা, উগ্রতা ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে অত্যন্ত পীড়িত করে এবং সেজন্য তাঁর কল্পনায় এমন কোনো বিপ্লবপ্রচেষ্টা ও বিপ্লবী চরিত্র প্রতিভাত হতে পারেনি যে প্রচেষ্টা এবং যে চরিত্রে সংযম, শুচিতা এবং আদর্শাভিমুখীনতা প্রাধান্য পেয়েছে। ভিক্টর হিউগোর 'লে মিসেরাবেলসে'ও ১৮৪৮ ত্রর বিপ্লবপ্রচেষ্টার পটভূমিকা 'গৌণ' মাত্র; 'গৌণ' হলেও হিউগো বিপ্লব প্রচেষ্টা এবং বিপ্লবী চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথের মত "নাট্যরসাত্মক" উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে গিয়ে কালিমারঞ্জিত করেন নি—মরণোন্মুখ বৃদ্ধ বিপ্লবী "ডি", পথের শহীদ গাভারাচ, আত্মভোলা বিজ্ঞানী মেবুফ-ব্যারিকেডের উপর ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলনের দুঃসাহসিক চেষ্টায় প্রাণ দিলেন যিনি—এদের খণ্ডচরিত্রের সঙ্গে 'লে মিসেরাবলসের' মূল কাহিনীর যোগাযোগ নাম মাত্র অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়ের' মতই এখানেও বিপ্লব প্রচেষ্টার ভূমিকাটা গৌণ এবং তার আবেদন নাট্যরসাত্মক, অথচ সেজন্য হিউগো বিপ্লবপ্রচেষ্টা এবং বিপ্লবী চরিত্রকে 'চার অধ্যায়ের' মত 'পতন' ও বিকারের দৃষ্টান্তরূপে পরিচিত করা প্রয়োজন মনে করেন নি।

চতুষ্কোণ, নবপর্যায়, প্রথম সংখ্যা থেকে।

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বিসর্জন দিচ্ছ।" মোহের উপরে বিমলার চরম জয় ও তার স্বামীর চিন্তাধারা গ্রহণকে বর্ণনা করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক রূপকের মাধ্যমে ভারতে যে জঙ্গী জাতীয়তাবাদের চেতনা জন্ম নিচ্ছে তারই বিপরীতে ভারতীয় ঐতিহ্যগত অহিংসা ও আত্মোৎসর্গের চূড়ান্ত জয়ের প্রতি তাঁর আস্থা প্রকাশ করেছেন।

বিনয় ও গোরা এই দুই যুবকের প্রেমব্যাপারকে কেন্দ্র করে 'গোরা' উপন্যাসের কাহিনী প্রবাহিত; ব্রাহ্মসমাজের দুটি মেয়ে, যথাক্রমে সুচরিতা ও ললিতাকে বিয়ে করে তারা জাতিপ্রথার সামাজিক বাধাকে উল্লঙ্ঘন করেছে। সংকীর্ণমনা সাম্প্রদায়িকতা অনেক বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেগুলিকে অতিক্রম করা গেছে, তাদের পরাভূত করা হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজী পরেশবাবু এবং হিন্দুনারী আনন্দময়ী এই দুই বয়স্ক ও বয়স্কার উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও ধীশক্তিকে ধন্যবাদ!

যাইহোক, 'গোরা' একখানি রোমান্সধর্মী উপন্যাস। প্রেম-আখ্যাটি শুধু সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা বর্ণনার একটি উপলক্ষ্য সৃষ্টির পন্থা মাত্র—ঠিক যেমন 'ঘরে বাইরে'র প্রলোভনটি রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনের একটি সহায়ক। সুচরিতার পাণিপ্রার্থী হারান উনিশ শতকের বাঙলার সেই যুব সম্প্রদায়ের আদর্শ প্রতিনিধি যারা ইংরেজী শিক্ষার ফলে হিন্দুসমাজের অনিষ্টকর দিকগুলি সম্পর্কে অবহিত এবং সেইভিত্তি থেকে সমগ্র হিন্দু-শিক্ষাকে তারা নিন্দা করে। অন্য আর এক যুব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি গোরা উপরোক্ত মনোভাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে একমাত্র প্রকাশ্য অগ্রাহ্যের মনোভাব নিয়ে গোঁড়া-পন্থার পক্ষে নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকার চেষ্টা করে। এই দুই বিরোধীদলের শত্রুতা এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করে যেখানে ধর্ম মানুষে মানুষে ঐক্যবন্ধনের সূত্র না হয়ে দুই দলের মাঝে একটা গোঁজ বা বেড়া হয়ে ওঠে।

'গোরা'র অধিকাংশ চরিত্র এই মতান্তর বা বিরোধের মধ্যে এমন গভীরভাবে মগ্ন যে নিজেদের হাস্যকর উদ্ভট অবস্থার দিকে তাদের লক্ষ্যই পড়ে না। এই উদ্ভট হাস্যকর অবস্থা তেজস্বিনী যুবতী ললিতার কাছে সুস্পষ্ট এবং সে সমগ্র সমাজকেও চ্যালেঞ্জ করতে সাহসী হয়। সে বলে, অনেক চিন্তা ক'রে সে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, কোন

মানুষের পক্ষে কখনও অন্য মানুষের সংগে মিলিত হবার জন্য তার নিজের ধর্ম, নিজের বিশ্বাস অথবা নিজের সমাজের সংগে, তারা যে কোন প্রকৃতিরই হোক না কেন, সমস্ত রকম সম্পর্ক ছেদ করবার কোনও প্রয়োজন নাই। আর যদি তাই প্রয়োজন হয় তাহ'লে হিন্দু ও খৃষ্টানের মধ্যে কোন বন্ধুত্ব থাকতে পারে না এবং তাদের পরস্পরকে পরস্পরের সীমানার মধ্যে রাখতে তাদের চারদিকে বিরাট প্রাচীর তোলার আবশ্যক হবে।

এদেশে পশ্চিমী উদার আদর্শের প্রবাহ আসবার পর বহুজাতি-অধ্যুষিত ভারতীয় সমাজের সংকটাবস্থার ও তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথনির্দেশক একখানি স্পষ্ট চিত্রিত গ্রন্থ 'গোরা'। গোরা প্রতিনিয়ত ভারতীয় জাতিকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে কিন্তু লক্ষ্য করে যে, ঐতিহ্য ও তার নিজের সৃষ্ট বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব; অবশেষে সে তখন জানালো যে, সে খাঁটি হিন্দু বামুন নয়, যা সে নিজেকে মনে ক'রত, পরন্তু ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের বা প্রথম ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রাম) এক অনাথ আইরীশ বালক মাত্র, তখন সে তার পীড়াকর চিন্তা থেকে সান্ত্বনা ও স্বস্তি লাভ ক'রল। এই সর্বব্যাপক সান্ত্বনাবোধ পরিশেষে তাকে দিয়ে শ্লেষভরে ঘোষণা করিয়েছে, সে প্রকৃতই একজন ভারতীয়, মুসলমান ও খৃষ্টান। ভারতের প্রত্যেক জাতই তার জাত, সকলের খাদ্য তারও খাদ্য।"

এক অর্থে 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে' পরস্পরের পরিপূরক। একের মধ্যে ভারতে একজাতিরাষ্ট্রের আদর্শ সম্পর্কে অস্বীকৃতি—নেতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গি—অন্য পক্ষে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দ্বিতীয়টিতে জাতি ও ধর্মের সীমাতিক্রান্ত সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভারত ব্যাখ্যাত এবং একজন প্রকৃত ভারতবাসী সংমিশ্রিত সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী, যার গঠনে বহু ধর্ম এবং কৃষ্টির ভূমিকা রয়েছে।

'গোরা'য় তৎকালীন বিশেষ ঘটনাবলী যথা, রাজনৈতিক অপরাধে কারা-বাস, পুলিশী নির্যাতন ইত্যাদি বর্ণিত। প্রকৃত ভারতবর্ষের সন্ধানে নায়কের গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ তাৎপর্যপূর্ণ; যে সামাজিক রাজনৈতিক ঝোঁক দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো এগুলি তারই প্রকাশ। নিজের শক্তি সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় অসচেতন খণ্ডিত, সংকীর্ণ দুর্বল 'গোরা'র গ্রাম-ভারতে গান্ধীর আবির্ভাব ঘটলো এবং এই অবস্থার মধ্য

দিয়েই গান্ধীজী এক জাতির সৃষ্টি ক'রলেন। 'ঘরে বাইরে'র মত 'গোরা'ও একখানি ভবিষ্যৎ-প্রবক্তক উপন্যাস।

'নৌকাডুবি' উপন্যাসের বিষয়বস্তুটি একটু অসাধারণ রকমের। দু'দল বরযাত্রী ভিন্ন ভিন্ন নৌকায় এক নদী দিয়ে চলেছে, এমন সময় তাদের ওপর নেমে এল এক ঘূর্ণি-ঝড় আর খুদে বহর দুটির কোন অস্তিত্বই পাওয়া গেল না। এক বর, তার নিজের বধূ ভুল ক'রে আর এক কনের সংগে বাড়ী আসে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সদ্যবিবাহিত তার বধূটি ঐ দুর্ঘটনায় মারা যায়। বর্তমান স্বামীটি তার ভুল বুঝতে পারে যে কনেটিকে সংগে করে এনেছিল তার স্বামীর অনুসন্ধান করে এবং শেষ পর্যন্ত কনেটিকে তার স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসে।

'নৌকাডুবি'তে গল্পের ছকটি বিষয়বস্তুর ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য পেয়েছে। আখ্যান-ছকের জটিলতা অদ্বিতীয়, অনুপম। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উপন্যাসগুলি থেকে এ উপন্যাসের সামাজিক তাৎপর্য অকিঞ্চিৎকর।

সমসাময়িক কোন সমালোচক বলেন, "কোন কোন লেখকের বলবার মত একটা কাহিনী আছে বলেই উপন্যাস রচিত হয় না, পরন্তু সত্যের পরিহার্য প্রকৃতিতে বিরক্ত হয়েই তাঁরা উপন্যাস রচনা করেন।" (অ্যালান প্রাইসি-জোন্স—প্লেগ্‌ড্‌ বাই দি নেচার অব ট্রুথ্‌)। এই উক্তির সার্বজনীন সত্যতা না থাকলেও, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা নিশ্চিতরূপে সত্য—তাঁর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, সামাজিক-রাজনৈতিক সত্যানুসন্ধানের এক গোপনীয়তাবিহীন প্রচেষ্টা। অবশ্য 'নৌকাডুবি' ব্যতিক্রম। এই উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে সামাজিক রাজ-নৈতিক সত্য সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত এবং এই সত্যের দ্বারা তার কারণ নির্ধারণ করা যেতে পারে যে, অভারতীয় পাঠকদের প্রতি লক্ষ্য রেখে উপন্যাসখানি সোজাসুজি ইংরেজীতে রচিত। ঔপন্যাসিক, খৃস্টমাস্‌ বা বড়দিনের উৎসবের সমান্তরালে রেখে ভারতে পূজাবকাশের উৎসবমুখর দিনগুলি ব্যাখ্যানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন; তিনি হয়ত এই চিন্তা করে থাকবেন যে, অন্যান্য উপন্যাসের ভারতীয় দৃশ্যাবলীর যে অন্তরঙ্গ বিবরণ দেখা যায়, বিদেশী পাঠকসম্প্রদায়ের কাছে তা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারবে না, আর এই ভাবে তিনি

যে নিদারুণ ভুলটি ক'রলেন, পরবর্তী কালে অন্যেরা করল তার পুনরাবৃত্তি।

সমস্ত রকম শোভনতাবিবর্জিত রোমান্সধর্মী উপন্যাস 'শেষের কবিতা' প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। অত্যন্ত রুচিবাগীশ পাণ্ডিত্যাভিমানী অমিত রায় পরীক্ষা-পরীক্ষা খেলা নিয়ে গোটা সাতটি বছর অক্সফোর্ডে কাটায়। যদিও পড়ুয়া না হওয়ার পক্ষে সে যথেষ্ট বুদ্ধিমান তবুও তার সহজাত বুদ্ধি তার সমস্ত ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা, ঢেকে রাখে। তার প্রতি কাহিনীর 'আহা-বেচারী-মনোভাব-সম্পন্না লাবণ্যের একমাত্র প্রবল ইচ্ছা জ্ঞানার্জন, আর প্রেমকে সে মনে করে দুর্বলতা; পরস্পরের প্রতি তাদের দু'দিনের মোহে দুটি পুরোনো শিখার প্রত্যাবর্তন ত্বরিত্ পরিণতি আনে। গ্রন্থকারের কৌতুকোচ্ছল মেজাজ উপন্যাসখানিকে রীতিমত সুখপাঠ্য করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের রসবোধ এই গ্রন্থে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

ঔপন্যাসিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের প্রধান বিশেষত্ব তাঁর চরিত্রচিত্রণ-দক্ষতা। কোমল কঠোর নিখিল এবং উচ্ছ্বসিত, বীর্যশীল, সতেজ গোরা তাদের বিরল সূক্ষ্মতা, তাদের প্রতিরূপ আদর্শের বিমূর্ততা সত্ত্বেও পাঠকের কাছে রক্তমাংসের মানুষ বলেই প্রতিভাত হয়। হাস্যকর, অতিরঞ্জিত চরিত্র থেকে বরং বদমেজাজী, অত্যুৎসাহী হারান এবং সুরসিক, আমুদে, কপটবুদ্ধিজীবী অমিত রায় প্রাণবন্ত চরিত্র। কুচক্রী, মতলববাজ, দুষ্টু বুদ্ধিপ্রবণ সন্দীপ—ইয়াগো (Iago) হয়ে উঠবার মত মাল-মশলা যার মধ্যে প্রচুর রয়েছে—ভারতীয় উপন্যাসের সম্ভবত সব থেকে উপভোগ্য শয়তান-চরিত্র। উপন্যাসগুলির বয়স্ক চরিত্রগুলো সাধারণত্য জীবনভোর অভিজ্ঞতায় বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির নারী-চরিত্ররা পুরুষ-চরিত্রগুলোর মতই বাস্তব। সুচরিতা ও ললিতা, কমলা ও বিমলা ভারতীয় নারী চরিত্রের অনেক দিকেরই প্রতিরূপ। তাদের চরিত্রচিত্রণে ধ্রুপদী আদর্শ বহুলাংশে অনুসৃত এবং অতিক্রান্ত শতাব্দীর নির্দেশে বহুপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আসতে হলেও এরা বাস্তবিকই সীতা-সাবিত্রী-শকুন্তলা জাতীয় অসংখ্য নায়িকাদেরই দলভুক্ত। বয়স্ক নারীরা সাধারণতঃ গোঁড়াপন্থী, কিন্তু তবুও তারা সবাই এক ছাঁচের নয়, তাদের নিজেদের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান বা পার্থক্য রয়েছে।

চরিত্রগুলির ঘাত-প্রতিঘাত লেখকের গভীর মনোবিকলক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয়। নিখিল-বিমলা-সন্দীপ-এর চাতুর্যময় আলোচনাই সম্ভবত ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, ব্যক্তিতে সমাজে, ব্যক্তির সঙ্গে তার অতীতের জৈব সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ—যার বহুল প্রমাণ-প্রকাশ উপন্যাসগুলিতে বর্তমান।

রবীন্দ্রনাথের আখ্যানগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য তাদের গীতিধর্মী সৌন্দর্য ও লঘু পরিহাস। 'শেষের কবিতা'য় উপন্যাসকার তাঁর নির্দিষ্ট অভ্যস্ততা থেকে সরে এসেছেন। অবাস্তব পরিহাসপূর্ণ ঝলমলে আখ্যান রচনায় যে সব আদর্শ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিতে অনুপ্রবিষ্ট তাদের পক্ষাবলম্বনে তিনি প্রায়ই বিশদ, স্পষ্ট। আদর্শের প্রকাশনের প্রবল বাসনায় অবশ্য সৌন্দর্যগুণাবলীর বিসর্জন ঘটেনি। বস্তুত বিনষ্ট আধারে আধারস্থ বস্তুও যে বিনষ্ট হয়, এই উপলব্ধি তাঁর ছিল বলেই সাহিত্যিক সৌকুমার্যের প্রতি তিনি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসগুলি তাঁর সাহিত্যিক চিন্তা-ভাবনারই প্রকাশ। আদর্শের বাহন হিসেবে উপন্যাস-গুলির কার্য সাহিত্যগুণকে খর্ব করে না; বরং তাদের গুরুত্ব ও যোগ্যতা বৃদ্ধি করে, কারণ আদর্শগুলো বিষয়বস্তুর সংগে নিপুণভাবে সংযোজিত। উন্নত আদর্শের প্রকাশ যে সৌন্দর্যের বিভিন্ন দিকগুলোকে বিনষ্ট করে এটি বহুল-পোষিত ভ্রান্তধারণা। আসল ঘটনা এই যে, "প্রায়শ সে সব বিখ্যাত উপন্যাস আমরা মনে রাখি, উন্নত আদর্শ সম্পর্কে সেগুলোর আচরণ খুবই স্পষ্ট এবং যদিও তাদের স্পষ্টতার পার্থক্য-পরিমাণ অনেকখানি তবুও স্বল্প-স্পষ্টতার চাইতে অধিকতর স্পষ্টতার দিকে তাদের ঝোঁক বেশী" এবং উপরোক্ত ভ্রান্তধারণাকে খণ্ড নকরতে একমাত্র এই বক্তব্যই যথেষ্ট।

রবীন্দ্রসাহিত্যের পরিমাণ-নির্ণয়ে এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ভারতীয় রেনেসাঁ আন্দোলন যখন ঘনায়মান সেই সময় থেকে তিনি লেখা সুরু করেন। ইংরেজী ভাষার প্রবর্তনের মাধ্যমে পশ্চিমী-সাহিত্যের সংগে সতেজ সংযোগের কাছে তাব পুনর্জন্মের জন্য ঋণী এই আন্দোলনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রাচীন উত্তরাধিকারের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ধনশীল সতর্কতা, অতীতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাকে রক্ষা করবার প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষা অন্যপক্ষে ভিন্নতর একটা ভবিষ্যৎ গঠন। এই আন্দোলন পশ্চিমের কাছে ভারতীয় চিন্তার ব্যাখ্যাপ্রয়াসী ইংরেজী ভাষায় প্রারম্ভিক ভারতীয় লেখকদের

যাঁরা আবার ইউরোপীয় আদর্শ ও কলাকৌশলের সংগে এদেশবাসীর পরিচয় সাধনের প্রয়াস পেয়েছিলেন, তাঁদের আগ্রহকে প্রকাশ করে। স্পষ্টতই, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সংস্কৃতি সমন্বয়ই তাঁদের লক্ষ্যে ছিল; আরও সংক্ষেপে বলা যায়, তাঁরা ঐতিহ্যগতমূল্যকে রক্ষা, অন্যদিকে ইউরোপীয় আদর্শ ও পদ্ধতিকে অনুকরণ করবার প্রয়াস পাচ্ছিলেন।

রোমান্টিক মনোভাব রেনেসীয় রচনাকে প্রভাবিত করে। সাহিত্যক্ষেত্রে তার পরিণতি এত সর্বব্যাপক হয়েছিল যে, এর প্রভাব থেকে থেকে লেখকের পক্ষে মুক্তিলাভ করা ছিল অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ এই পরিবেশে বর্ধিত, এবং স্বভাবতই এর উজ্জ্বল ভাবকে অধিগতও করে ছিলেন। কিন্তু এতই শক্তিশালী ছিল তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব যে এই উজ্জ্বল প্রবাহ তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি।

রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকিতা ভারতীয় পটভূমি থেকে অখণ্ডরূপে সংগৃহীত, আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শে কোমলায়িত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে আবেগের সুর-পরিবর্তনের ভাঁজে ভাঁজে সৃষ্টিশীল প্রকাশ-দ্যোতনা যথাসময় রূপ পায় এবং শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে আবেগময় আদর্শের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন।

অতীতের মূর্তস্বপ্নে রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক, রোমান্টিক তিনি কি হওয়া উচিত ছিল বা কি হওয়া উচিত তারই অনুরূপে বিভিন্ন দিক থেকে চরিত্র-চিত্রায়নের জোরালো প্রকাশে, রোমান্টিক তিনি দেশীয় এবং লোকপ্রচলিতের প্রতি তাঁর অনুরাগে আর তাঁর কল্পনা ও আত্মার জীবনের মুক্তিতে। অবশ্য অধিকাংশ ইরোপীয় রোমান্টিষ্টের দুর্বলতাসমূহ থেকে তিনি মুক্ত। তাঁর বিরুদ্ধে কখনও অমিতব্যয়িতা, রূপ বা ভঙ্গিহীনতা এবং অতিআবেগ প্রবণতার অভিযোগ আনা যায় না। "প্রাত্যাহিক ঘটনার আবদ্ধতা থেকে ব্যক্তি-আদর্শের বিচ্ছিন্নতা এবং তাকে সর্বগত ঊর্ধ্ববিচরণের মুক্তিপক্ষ দানের" প্রয়াসে রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক ধ্রুপদী রীতির প্রতি।

রবীন্দ্রনাথ কি তখন ধ্রুপদী ও রোমান্টিক বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ লাভের জন্য সচেতন ভাবে চেষ্টা করছিলেন? যদি কেউ মনে করে যে তিনি ছিলেন সচেতন শিল্পী, যিনি জানেন যে তিনি কি করছেন,···বস্তুত তা জানা উচিত তবে তার একমাত্র উত্তর ইতিবাচক। এই দৃষ্টিভংগির আলোকে জার্মান আদর্শবাদীরা তাঁর নিকটতম সাহিত্যিক আত্মীয় বা আপন জন বলে

বিবেচিত হন। আদর্শবাদী দার্শনিক ভন্ সেলীং বলেন, প্রকৃতি ও আত্মার অর্থাৎ জীবন ও চিন্তার ঐক্য সাধনে শিল্প একটি সৃষ্টিধর্মী শক্তি এবং মানুষের অস্তিত্বের এ সেই একই পরাকাষ্ঠা। এই মত রবীন্দ্রমতেরই কাছাকাছি শৈল্পিক ঐক্যকে যিনি "জড়, নিষ্ক্রিয় রূপে দেখেন নি, পরন্তু দেখেছিলেন কার্যকরী প্রকাশধর্মীরূপে।"

রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর সাহিত্যিক কলাকৌশলের জন্য ইউরোপের কাছে গভীর ভাবে ঋণী, এ রকম অনুমান অবশ্য ভুল। রোমান্টিক বিশিষ্টতা মূলত পশ্চিমী কিন্তু ধ্রুপদী ও আদর্শবাদী ঝোঁক সুস্পষ্টরূপে ভারতীয় সাহিত্যিক ঐতিহ্য থেকে আহৃত। আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের গীতিধর্মী প্রকাশের ইতিহাস বাঙলার দীর্ঘকালের এবং ইউরোপীয় রোমান্টিক চেতনা অন্তত পক্ষে তাঁর সময়ের দুই দশক আগে ভারতীয় সাহিত্যে প্রবেশ করে। ভিন্ন পরিবেশে ও ভিন্ন যুগে জাত দুই কলাকৌশলের একীকরণের অনুপম দক্ষতার মধ্যেই নিহিত ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর সাফল্য।

'তিন সঙ্গীর' স্বরূপ ও সামগ্রিকতা

সুনীল চক্রবর্তী

রবীন্দ্র-জীবন তখন সন্ধ্যার সিন্দুরে অবলিপ্ত। তিন সঙ্গী সে উত্তীর্ণ-গোধূলি লগ্নের কথামালা। তিন সঙ্গী রবীন্দ্রনাথের কথা শিল্পলোকে নিঃসঙ্গ। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বন্ধুত্বের প্রভাব, বনবাণী ও বিশ্বপরিচয় রচনার পশ্চাদ্বর্তী বোধিসত্ত্ব মানসিকতার রেশ রবীন্দ্র-মানসে তখনও সপ্রসার। সানাই কাব্যগ্রন্থে গান কবিতার ক্ষেত্রকে দখল করেছে, ছন্দের বদলে দেখা দিয়েছে ছন্দের আভাস। তাঁর সমকালীন চিত্রেও বর্ণের আভাস বর্ণবাহুল্যকে অপসারিত করেছে। রক্তকরবী প্রভৃতি নাটকে দেখা দিয়েছে প্রতীকধর্মী সাংকেতিকতা। পিকাসো প্রমুখ শিল্পীর চতুর্মাত্রিক চিত্ররীতির মত একই চরিত্রে একাধিক ব্যক্তিত্বের সমাবেশে রক্তকরবীর রাজা-রঞ্জন-নন্দিনী অভিনব। প্রান্তিকের কাল থেকে 'বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে চিত্তাকাশে অর্ধস্ফুট অস্পষ্টের রচিল বিস্ময়।' তিনি অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায় যে অনুভূতির অধিকার লাভ করেছিলেন, সে অনুভূতির পূর্ণতা তিন সঙ্গীর রচনা পদ্ধতিকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর রচনার তখন শব্দের অর্থ-বহনের ক্ষমতা চরম সীমাকে স্পর্শ করেছে। এ-হেন এক সমৃদ্ধির পরম ক্ষণে অশীতিবর্ষী বাণীকার তাঁর অতুলন প্রতিভার আশুমান স্বাক্ষর রাখলেন তিন সঙ্গীর কলাকৌশলে।

তিন সঙ্গীর প্রথম কাহিনী 'রবিবার', শেষ 'ল্যাবরেটরি' আর মাঝখানে 'শেষকথা'। কাহিনীর এ হেন বিন্যাসের মধ্যে কাহিনীকারের মনোভঙ্গি আভাসিত। সপ্তাহের গতানুগতিক জীবনধারাকে রবিবারের ছুটি এসে এলোমেলো করে দেয়। মানুষের জীবনে তেমনি এক একটি এলোমেলো হাওয়ার আবির্ভাব অনিবার্য। সে এলোমেলো হাওয়া আসে, মানুষের সব হিসাব নিকাশ ওলট পালট করে দেয়, জীবনের গতি বদল হয়। তার সুখতৃপ্ত স্বপ্নাবেশে একটি উদাত্ত অতৃপ্তির নিখাদ বেজে ওঠে। স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের, সম্ভাব্যের সঙ্গে সম্ভবের বিরোধে মানুষ অতৃপ্তি চঞ্চল হয়ে পড়ে।

তিন সঙ্গীর মুখ্য চরিত্র অভীক-নবীন মাধব-নন্দকিশোরে আবির্ভাব যেমন তাদের পারিবারিক রীতি নীতি সংস্কারের বাঁধি বোলের ব্যতিক্রম, নায়কের জীবনে নায়িকার আবির্ভাবও তেমনি রবিবারের এলোমেলো হাওয়ার মত। সে এলোমোলোর আকর্ষণে তাদের জীবনের হাল গেছে ঘুরে, পালে লেগেছে ঘূর্ণী।

অভীক 'আচারনিষ্ঠ বৈদিকে ব্রাহ্মণের বংশে দুর্দান্ত কালাপাহাড়ের অভ্যুদয়। তার আসল নাম ছিল অভয়াচরণ। এ নামের মধ্যে কুলধর্মের যে ছাপ আছে সেটা দিল সে ঘষে উঠিয়ে। বদল করে করলে অভীককুমার। ওর নামটা ভিড়ের নামের সঙ্গে হাটে বাজারে ঘেঁসা-ঘেষি করে ঘর্মাক্ত হবে সেটা ওর রুচিতে বাধে।

অভীকের চেহারাটা আশ্চর্য রকমের বিলিতি ছাঁদের, আঁট লম্বা দেহ গৌরবর্ণ, চোখ কটা, নাক তীক্ষ্ণ, চিবুকটা ঝুঁকেছে যেন কোন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে।'

নবীন মাধবের জীবনারম্ভের অর্থ বিপ্লবের পালার সুরু। তার আত্ম-পরিচয় 'আমি বাঙালা দেশের' বিপ্লবী দলের একজন। পূর্ববঙ্গীয় বেদ ছিল মর্জায়, একদিনও ভুলি নি যে, ভারতবর্ষের হাতে পায়ের শিকলে উখো ঘষতে হবে দিনরাত যতদিন বেঁচে থাকি। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলুম, বাঁচতে যদি চাই আদিম যুগের হাত দুখানায় যে কটা নখ আছে তা দিয়ে লড়াই করা চলবে না। এ যুগে যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের দিতে হবে পাল্লা।'

নন্দকিশোর লোকটা ছিল সৃষ্টি ছাড়া।

বোহেমিয়ান অভীকের চারপাশে যে সব চশমা পরা তরুণীরা বেআব্রু রীতিতে নগ্ন মনস্তত্ত্বের আলোচনায় মত্ত ছিল, ঘন সিগারেটের ধোঁয়ায় আবৃত করল তার কালিমা, বিভা ছিল এই দলের একেবারে বাইরে। অভীক ওকে একদিন বলেছিল, 'অনাহুতের ভোজে মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ। কিন্তু তোমার সৌন্দর্য ইতরজনের মিষ্টান্ন নয়। ও কেবল আর্টিস্টের, লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চির ছবির সঙ্গেই মেলে 'ইনম্ক্রুটেবল'। মনীষার যে দুঃসাধ্য উপহারটার মধ্যে তার বুকের ব্যথা ধুকধুক করছে, তাকেও উপহাস করে যে অভীক বলেছিল, 'আমি তো পৌত্তলিক নই যে বুকের পকেটে এই জিনিষটার বেদি বাঁধিয়ে মনের মধ্যে দিনরাত শাঁখ ঘণ্টা বাজাতে থাকব,' সে অভীকের প্রেম একনিষ্ঠ হয়েছিল বিভার মধুরতম আসক্তিতে।

অচিরার কোন পরিচয় না পেয়েই নবীনমাধবের মনে হয়েছিল 'ও আর এক জাতের—একালের বাইরে আছে দাঁড়িয়ে, নির্মল আত্মমর্যাদার, স্পর্শভীরু মেয়ে।' যে নবীন মাধবের জবানবন্দী 'যৌবনের গোড়ার দিকে নারীর ভাবের ম্যাগ্‌নেটিজমে জীবনের মেরুপ্রদেশের আকাশে যখন অরোরার রঙিন ছটার আন্দোলন ঘটতে থাকে, তখন আমি ছিলুম অন্যমনস্ক একেবারে কোমর বেঁধে অন্যমনস্ক,' তার মনেও আবেশের ঘোর লাগল ছিপছিপে নদী অনিকার তীরে, 'পূর্ণিমার বান ডেকে আসার মতো ক্ষতটে ধাক্কা দিতে লাগল জোয়ারের ঢেউ। কুসুমিত শাল গাছের ছায়া-লোকের বন্ধনে' অচিরাকে দেখে কঠোর বিজ্ঞানী নবীনমাধবের অটল অন্তঃস্তরে এক অপ্রতিরোধ্য ওলট পালট দেখা দিল। তারই আত্মস্বীকৃতি 'কোন প্রবল ভূমিকম্পে পৃথিবীর যে তলায় লুকানো আগ্নেয় সামগ্রী উপরে উঠে পড়ে, জিয়লজি শাস্ত্রে তা পড়েছি, নিজের মধ্যে দেখলুম সেই নীচের তলায় অন্ধকারের তপ্তবিগলিত জিনিষকে হঠাৎ উপরের আলোতে।'

'যৌবনের হাটে মন নিয়ে জুয়ো খেলাবার সময়, নন্দকিশোরের ছিল না।' কিন্তু সে 'নন্দকিশোর চমকে গেল' মোহিনীর কথা শুনে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, কষ্টিপাথর আছে ওঁর মনে তার উপরে দাগ পড়ল একটা দামী ধাতুর। দেখতে পেলেন মেয়েটির ভিতর থেকে ঝক্‌ঝক্‌ করেছে ক্যারেকটারের তেজ।'

সায়েন্সের ডক্টরেট রেবতী ভট্টাচার্য আচারনিষ্ঠ পিসিমার হাতে ক্রীড়নক। 'কাঁচা বয়সে ও এক মালাজপকারিনীর মালার গুটি বনে গেছে।' আকাশনিম-বীথিকার তলায় এক রবিবার রেবতীর সঙ্গে নীলার প্রথম সাক্ষাৎ। 'নদীর ঘাট থেকে আস্তে আস্তে দেখা দিল নীলা। রোদ্দুর পড়েছে তার কপালে, তার চুলে, বেনারসী শাড়ির উপরে জরির রশ্মি ঝলমল করে উঠেছে। ভিতরে বাসন্তী রঙ উঁকি মারছে, উপরে সবজে নীল। বিজ্ঞানীর চোখে আর্টপিপাসুর দৃষ্টি উঠল উৎসুক হয়ে।' মোহিনীর কাছে যে রেবতী ছিল মন্ত্রস্তব্ধ, নীলার মদির সান্নিধ্যে সে রেবতী তাকে অস্বীকার করতে উদ্যত হল, শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করল। হোক সাময়িক তথাপি রেবতীর জীবনে তা কম এলোমেলোর কথা নয়।

'রবিবার' নামটির মধ্যে সমগ্র তিন সঙ্গীর অন্তরাত্মা অভিব্যঞ্জিত 'রবিবারে' নরনারীর মর্মজীবনের যে সমস্যার সূত্রপাত সমগ্র তিন সঙ্গীতে

তারই বিচিত্র বিস্তার। 'শেষ কথা'কে তিনি সর্বশেষে স্থাপন করেন নি। নারীমানসের আলো-আঁধারি লীলা সম্পর্কে শেষ কথা বলার অহমিকা রবীন্দ্রনাথের নেই। তিনি কেবল অনলস নিরীক্ষায় নারী মনের তত্ত্বকে আবিষ্কার করেছেন বারংবার, নবরূপে নতুন করে। তিন সঙ্গীও সে পরীক্ষা নিরীক্ষার গবেষণাগার। তাই 'শেষ কথা'য় কথা শেষ নয়, অন্তহীন গবেষণার ইঙ্গিতগর্ভ নামরূপ 'ল্যাবরেটরি'ই তিন সঙ্গীর শেষের কথা।

তিন সঙ্গী তিনটি স্বতন্ত্র গল্পের সংকলন নয়।[১] ত্রিধাবিভক্ত তিন সঙ্গীর সামগ্রিকতা আপন স্বরূপে একটি দূরবগাহ অর্থবাহকতার ইঙ্গিতগর্ভ ব্যঞ্জনা বহন করে। বিভাগগুলির মধ্যে একটি আপাত অদৃশ্য যোগসূত্র আছে। 'অভীকের দুটো উল্টো পথ ছিল, এক কলকারখানা জোড়াতাড়া দেওয়া, আর এক ছবি আঁকা। ওর বাপের ছিল তিনখানা মোটর গাড়ি, তাঁর শখের বল অভিযানের বাহন। যন্ত্রবিদ্যায় ওর হাতে খড়ি সেইগুলো নিয়ে। ময়লা টুপি আর তেল কালি মাখা নীল রঙের জামা ইজের পরে বার্ণ কোম্পানীর কারখানায় প্রথমে মিস্ত্রিগিরি ও পরে হেড মিস্ত্রির কাজ পর্যন্ত চালিয়ে দিয়েছে। নবীনমাধবও বলেছে : দীক্ষা নিলুম যন্ত্রবিদ্যায়। ডেট্রয়েটে ফোর্ডের মোটর কারখানায় কোনমতে ঢুকে পড়লুম। ফোর্ডের কারখানা ঘর ছেড়ে তারপরে ন'বছর কাটিয়েছি খনিবিদ্যা খনিজবিদ্যা শিখতে। য়ুরোপের নানা কেন্দ্রে ঘুরেছি হাতে কলমে কাজ করেছি, দুই-একটা যন্ত্রকৌশল নিজেও বানিয়েছি, তাতে উৎসাহ পেয়েছি অধ্যাপকদের কাছে, নিজের উপরে বিশ্বাস হয়েছে, ধিক্কার দিয়েছি ভূতপূর্ব মন্ত্র

১ রবিবার, শেষ কথা ও ল্যাববেটরি তিনটি স্বতন্ত্র আখ্যান হিসাবে যথাক্রমে আনন্দবাজার পত্রিকা : ১৩৪৬ শারদীয় সংখ্যা, শনিবারের চিঠি : ১৩৪৬ ফাল্গুন এবং আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৪৭ শারদীয় সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশ কালের ব্যবধান সত্ত্বেও এ কাহিনী রচনায় রবীন্দ্রনাথের চেতন মনের অগোচরে একটি মানসিকতার ধারা প্রবহমান ছিল। তারই যোগসূত্রে এ রচনা একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবহমানতায় প্রভাস্বর। এ প্রবহমান ঐক্যসূত্র তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, এবং করেছিলেন বলেই এ গ্রন্থের নাম তিন সঙ্গী, গল্পগ্রন্থ নয়।

মুগ্ধ অকৃতার্থ নিজেকে।' বিজ্ঞানে অভীকের ছিল পথ, নবীন মাধব এসে সে পথ জীবনব্রতের রূপ লাভ করেছে। সে জীবনব্রতের পূর্ণতা নন্দকিশোরে। 'নন্দকিশোর ছিলেন লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি থেকে পাস করা এঞ্জিনিয়র। যাকে সাধু ভাষায় বলা যেতে পারে দেদীপ্যমান ছাত্র অর্থাৎ ব্রিলিয়ান্ট।

মুখ্যেতর চরিত্রগুলিও বিজ্ঞানী। 'অমর বাবু কোপেনহেগেনে সর্বজাতিক ম্যাথিমেটিকস্ কনফারেন্সের নিমন্ত্রণ পান। ডাক্তার অনিল-কুমার সরকার বিজ্ঞানের অধ্যাপক, তার পাণ্ডিত্য অসাধারণ। মন্মথ চৌধুরী বিজ্ঞানের অধ্যাপক। রেবতী ভট্টাচার্যও সায়ান্সের ডাক্তার পদবীতে চড়ে বসেছে। ওর দুটো একটা লেখার যাচাই হয়ে গেছে বিদেশে।'

যন্ত্রবিজ্ঞান ভূবিদ্যা ও জীবতত্ত্বের পারদর্শীতাকে শিল্পপিপাসু মানসিকতার সঙ্গে গেঁথে রবীন্দ্রনাথ তিন সঙ্গীর নায়ক চরিত্রটি গঠন করেছেন।

পুরুষ চরিত্রের মত নারী চরিত্রের ক্ষেত্রেও বহু ব্যক্তিত্ব সমাবেশ সুস্পষ্ট। চতুর্মাত্রিক চিত্ররীতির মত কাহিনীকার একটি চরিত্রকে চারপাশ থেকে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ নারীর মধ্যে যে উর্বশী ও লক্ষ্মীকে অনুভব করেছিলেন, তিন সঙ্গীর নারী চরিত্র এক একটি দ্বন্দ্ববিদীর্ণ উত্তপ্ত মুহূর্তে সে উর্বশী ও লক্ষ্মীসত্তার লোষ্ট্রপ্রস্তার ন্যায় গঠিত হয়েছে। মহুয়া কাব্যগ্রন্থের 'নাম্নী' শিরনামাঙ্কিত কবিতাগুচ্ছে বহু, ব্যক্তিত্ব-বিলাসিত নারীকে দেখার প্রয়াস সুস্পষ্ট। সে বহু ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন উপাদান এখানেও প্রযুক্ত হয়েছে।

বিভার লক্ষ্মী-সত্তার মধ্যে একটি হেঁয়ালীর স্পর্শ ছিল। দয়িতের মিনতিকে সে উচ্চহাস্যে উড়িয়ে দেয়,

তারপরে আপনার নির্দয় লীলায়
আপনি সে ব্যথা পায়,
ফিরে যে গিয়েছে তারে ফিরায়ে ডাকিতে কাঁদে প্রাণ
আপনার অভিমানে করে খান খান।
(হেঁয়ালী : নাম্নী, মহুয়া)।

সৃষ্টিকর্তার অট্টহাসি অভীকের দেখা নেই কিছুকাল। "চিঠিপত্র পাওয়া

যায় নি। বিভার মুখ শুকিয়ে গেছে। কোন কাজ করতে মন যাচ্ছে না। তার ভাবনাগুলো গেছে ঘুমিয়ে। দিনগুলো পাঁজর ভেঙ্গে দেওয়া বোঝার মতন। ওর কেবলই মনে হচ্ছে অভীক ওর উপরেই অভিমান করে চলে গেছে। ও ঘর ছাড়া ছেলে, ওর বাঁধন নেই, উধাও হয়ে চলে গেল; ও হয়তো আর ফিরবে না। ওর মন কেবলই বলতে লাগল, 'রাগ ক্বোরো না, ফিরে এসো. আমি তোমাকে আর দুঃখ দেবো না।' অভীকের সমস্ত ছেলেমানুষি, ওর অবিবেচনা, ওর আবদার, যতই মনে পড়তে লাগল ততই জল পড়তে লাগল ওর দুই চক্ষু বেয়ে. কেবলই নিজেকে পাষাণী বলে ধিক্কার দিল।" একজন অতি সুস্থ হতভাগাকে ভুলে থাকার জন্য সে কত কাজ তৈরি করেছিল। কিন্তু ভুলতে পারে নি। তার অন্তরে যে লক্ষ্মীসত্তা ছিল তারই জ্যোতির্ময়তায় বিস্মৃতিবিলাসের অন্ধকার প্রয়াস অবলুপ্ত।—

মর্তের ম্লানতা তারে
পারে নি তো স্পর্শ করিবারে।

বিভার বর্ণনা প্রসঙ্গে কাহিনীকার যে অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন, তাতেই তার কল্যাণময় স্বরূপটি স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে: 'বিভার চেহারায় রূপের চেয়ে লাবণ্য বড়ো'।

বিভার মধ্যে যে একনিষ্ঠ প্রেমের সূত্রপাত, অচিরার ক্ষেত্রে সে ভালবাসাই ইম্পার্সোনাল। 'কোন আধারের দরকার নেই'। অচিরার সাধনা আদর্শের সাধনা. একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনা, সতীত্বের সাধনা। অচিরার নিজের ভাষায়, 'ভালবাসার আদর্শ আমাদের পূজার জিনিস। তাকেই বলি সতীত্ব। সতীত্ব একটা আদর্শ। এ জিনিসটা বনের প্রকৃতির নয়, মানবীর। অচিরার রূপের মধ্যেও তারই আভাস। সামগ্রিকতায় সে যেন 'কাকচক্ষু স্বচ্ছ দীঘি জল'। নবীন মাধবের চোখে তার সহজ সুন্দর স্বরূপটি যথার্থভাবে ধরা পড়েছে: বাঙালী মেয়ে এই যেন প্রথম দেখলুম, ঠিক যে-জায়গায় তাকে সম্পূর্ণ দেখা যেতে পারে, এই নিভৃত বনের মধ্যে সে নানা পরিচিত অপরিচিত বাস্তবের সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে নেই; দেখে মনে হয় না, সে বেণী দুলিয়ে ডায়োসিশনে পড়তে যায়, কিংবা বেথুন কলেজের ডিগ্রিধারিণী, কিংবা বালিগঞ্জের টেনিসপার্টিতে উচ্চ কলহাস্যে চা পরিবেশন করে। অনেক দিন আগে ছেলে বেলায় হরু ঠাকুর কিংবা রাম বসুর যে গান শুনে তার পরে ভুলে গিয়েছিলুম, যে গান আজ রেডিওতে বাজে না. গ্রামোফনে পাড়া

মুখরিত করে না, জানি নে কেন মনে হলো সেই গানের সহজ রাগিণীতে ঐ বাঙালী মেয়েটির রূপের ভূমিকা—মনে রইল, সই, মনের বেদনা। এই গানের সুরে যে একটি করুণ ছবি আছে, সে আজ রূপ নিয়ে আমার চোখে স্পষ্ট ফুটে উঠল'। অচিরা সিনেমামঞ্চ পথবর্তিনী রঙমাখানো জাতবান্ধবী নয়। ও আর এক জাতের। সে উর্বশী নয়, লক্ষ্মী। 'তরুণ প্রাণের' পরে করুণায় নিত্য সে তরুণী।' তার এ লক্ষ্মী প্রকৃতি প্রতিকূলতার আঘাতে আজ বৈরাগ্যবিলাসী, সে আজ প্রতিমা। সে যেন চতুর্দশী, পূর্ণিমার প্রান্তে এসে থেমে গেছে তার পদক্ষেপ ঃ

অপূর্ণের ঈষৎ আভাসে
আপন বলিতে তারে মর্তভূমি শংকা নাহি বাসে।
দুঃখে শোকে অবিচল, ধৈর্য তার প্রফুল্লতা ভরা
সকল উদ্বেগভার-হরা।...
তবু তার মহিমায় কিছু আছে বাকী
সেইখানে রাখে ঢাকি
অশ্রুজল
বিষাদ ইঙ্গিতে ছোঁওয়া ঈষৎ বিহ্বল।

(প্রতিমা ঃ নায়ী, মহুয়া)

'ল্যাবরেটারির' সোহিনীর প্রাকনন্দকিশোরত্বি ও তার আত্মজা নীলা মিলে উর্বশীর পরিপূর্ণতা। সোহিনীর যৌবনাবসানকে পূর্ণ করেছে নীলা—তারই আত্মার, তারই দেহ মনের অংশ। সোহিনীর সঙ্গে নীলার সমন্বয়ে ল্যাবরেটারির উর্বশী নারী সম্পূর্ণ। দু'য়ের মিলনেই' সে অনন্ত যৌবনা। সোহিনী নির্দ্বিধায় স্বীকার করে ঃ 'মনে রাখবেন—ছেলেবেলা থেকে ভালো-মন্দ বোধ আমার স্পষ্ট ছিল না। কোন গুরু আমায় তা শিক্ষা দেন নি। তাই মন্দের মাঝে আমি ঝাঁপ দিয়েছি সহজে—পারও হয়ে গেছি সহজে। গায়ে আমার দাগ লেগেছে কিন্তু মনে ছাপ লাগে নি।' সে সমাজের আইন-কানুন ভাসিয়ে দিতে পারে দেহের টানে পড়ে। 'নীলা বলে, এই 'দেহটার' পরে আমাদের তো কোনো মোহ নেই, আমাদের কাছে এর দাম কিসের—আসল দামী জিনিস ভালোবাসা, সেটা কি বিলিয়ে ছড়িয়ে দিতে পারি।' সে রেবতীকে বিয়ে করতে চায়, কারণ, 'ওকে বিবাহ করা নিরাপদ, বিবাহোত্তর উচ্ছৃঙ্খলতায় বাধা দেবার জোর তার নেই'। নীলা নাগরী ঃ

প্রসাধন-সাধনে চতুরা—
জানে সে ঢালিতে সুরা
ভূষণভঙ্গিতে
অলক্তের আরক্ত ইঙ্গিতে।
জাদুকরী বচনে চলনে ;...

(নাগরী : নাম্নী, মহুয়া) লক্ষ্মীর স্পর্শ লাগে নি সোহিনী-নীলার দ্বৈত চরিত্রের অদ্বৈত সন্ধিতে। সোহিনী ও নীলার প্রেয়সীত্ব রবীন্দ্রনাথের কথা সাহিত্যে একেবারে পূর্বাপর নিরপেক্ষ হঠাৎ আগন্তুক নয়। তার একটি পূর্বসূত্র আছে। 'চিত্রাঙ্গদা ও দেবযানীর মধ্যে যে প্রেয়সীসত্তা চকিত প্রেক্ষণা তারই ক্রমপ্রসার 'চোখের বালির বিনোদিনীর কুণ্ঠিত মানসিকতায়। 'ঘরে বাইরে'র বিমলা প্রেয়সী-প্রধান। বাঁশরী সরকার দেবযানীর সগোত্রা। 'দুই বোনে'র ঊর্মিমালা প্রেয়সী জাতের। যোগাযোগের কুমুদিনী, 'পয়লা নম্বরের' অনিলা, 'স্ত্রীর পত্রে'র মৃণাল চরিত্রের মধ্যে সোহিনীর পূর্বাভাস স্পষ্ট। সোহিনীকে নিয়ে যখন কেউ কেউ আলোচনা করতেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের প্রায় বলতেন 'সোহিনীকে সকলে হয়তো বুঝতে পারবে না, সে একেবারে এখনকার যুগের সাদায় কালোয় মিশানো খাঁটি রিয়ালিজম, অথচ তলায় তলায় অন্তঃসলিলার মত আইডিয়ালিজমই হল সোহিনীর প্রকৃত চরিত্র' (নির্বান : প্রতিমা দেবী)। অচিরা ও সোহিনী যেমন নারীত্বের দুই বিপরীত কোটিতে অবস্থিত, তাদের আইডিয়ালিজমের মধ্যেও একটি রূপগত ব্যবধান আছে। 'সোহিনী মানুষটা কি রকম, তার মনের জোর, তার লয়ালটি এই হল আসলে বড় কথা—তার দেহের কামিনী তার কাছে তুচ্ছ। নীলা সহজেই সমাজে চলে যাবে, কিন্তু সোহিনীকে বাধবে' (প্রশান্ত মহলানবীশ : কবি কথা : বিশ্বভারতী পত্রিকা : কার্তিক-পৌষ, ১৩৫০)। সোহিনীর এ বাধাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে নীলা। তাই সোহিনীর সঙ্গে নীলা মিলে এ উর্বশী নারীর পূর্ণতা।

বিভা-অচিরা-সোহিনী-নীলা-মনীষা-পিসিমা ও ইয়োরোপ-আমেরিকার জাত বান্ধবীরা মিলে তিন সঙ্গীর নারী চরিত্রের বৃত্তটি সুসম্পূর্ণ। বহু মানসিকতা, বহু ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জিত নারীজীবনের বিভিন্ন মুহূর্তগুলিকে বিভিন্ন নামে নামাঙ্কিত করে রবীন্দ্রনাথ চেতনা প্রবাহের একটি বিশিষ্ট

রীতিতে তিন সঙ্গীর কাহিনী রচনা করেছেন। তিন সঙ্গীর নারী চরিত্রটি বহুব্যক্তিত্ববিলসিত শাশ্বত নারীর বিচিত্র মানসিকতার সমন্বিত প্রবাহ ধারা।

অভীক-নবীন মাধব-নন্দকিশোর-অমরবাবু-ডাঃ চৌধুরী-রেবতী-অম্বিকা-চরণ-প্রসন্ন-ন্যায়রত্ন-হালদার-প্রমদারঞ্জন প্রভৃতির বহু ব্যক্তিত্ব দিয়ে রচিত হয়েছে তিন সঙ্গীর পুরুষ চরিত্রের প্রবাহটি। অভীক সেণ্টিমেণ্টাল, ছেলে মানুষ তার আচরণে। নবীনমাধব কর্মী। প্রেম তার চরম লক্ষ্য নয়। অচিরার প্রেমকে সে কখনও কোন খাটো লেবেল এঁকে ছোট করে দেখে নি। তবুও একথা সত্য, প্রেম তার চলার পথে সরাইখানার সামিল, গন্তব্যস্থল নয়। তাই তার কাহিনীর শেষ কথা জিয়লজিস্টের। তার পায়ে এক টুকরো শিকল রয়ে গেল, তবু সে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে অচিরার অন্তর্ধানে। নন্দকিশোর পৌরুষ প্রধান। মেয়েদের মনকে আকর্ষণ করার মত ম্যাগনেটিজম্ আছে তার চরিত্রে।

ডঃ চৌধুরী নন্দকিশোর জাতের। কিন্তু রেবতীর জাত আলাদা। সে সুপুরুষ। কিন্তু 'মেয়েদের মনকে নোঙরের মত শক্ত করে আঁকড়ে ধরার জন্যে পুরুষের ভালো দেখতে হওয়ার দরকার করে না। বুদ্ধি বিদ্যেটাও গৌণ। আসল দরকার পৌরুষের ম্যাগনেটিজম। রেবতীর চরিত্রে সেই কামনার অকথিত স্পর্ধারই অভাব।'

তিন সঙ্গী চেতনা প্রবাহ পদ্ধতির এ বিশিষ্ট রীতিতে রচিত। এ রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য পোষ্ট ইমেশনিজম। এ রীতির রচনায় কাহিনীর যোগসূত্র আপাত-অদৃশ্য আর তাই বিচ্ছিন্ন বলে প্রতীয়মান। এর কাহিনী গঠনে কোন যোগসূত্র নেই যেন, একটি প্রবহমান নদী বা একটি ঝরণাই যেন তার সার্থক উপমা। একটি চিন্তা একটি অনুভূতি, একটি নর্মজীবন তার বক্তব্য। তিন সঙ্গীর অস্পষ্ট যোগসূত্রগুলি এ প্রসঙ্গে লক্ষনীয়।

'রবিবারে'র শেষে চিভার কাছে তার নাস্তিক ভক্ত অভীক প্রতীচ্যযাত্রী জাহাজ থেকে যে চিঠি লিখেছিল তার মধ্যে কয়েকটি স্বীকারোক্তি ছিল: 'হৃদয়ের একটা গোপন জায়গা আছে আমাদের নিজেরই অগোচরে···। আবার আমি ফিরব—তখন আমার মত, আমার বিশ্বাস, সমস্ত চোখ বুজে সমর্পণ করে দেব তোমার হাতে···। এতদিন বুঝতে চেয়েছিলুম বুদ্ধি দিয়ে, এবার পেতে চাই আমার সমস্তকে দিয়ে'। যন্ত্রবিদ্যায় দীক্ষা নিয়ে নবীন মাধব ফিরে এল প্রতীচ্য থেকে। তার কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে

পারি, 'পিছন থেকে সেই প্রাকগাল্পিক ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করতেই হয়। শেষ কথার সত্যিকার শুরু তার প্রত্যাবর্তনের পর থেকে। শেষ কথার প্রাথমিক অংশ স্মৃতিকথা, কারণ কাহিনীর সূত্রপাত এমন একটি ক্যানভাসে যা ছোট গল্পের ক্ষেত্রে অসুলভ।

শেষ কথার উপসংহারে কথাকার বলেছেন: 'পরেকার কথা জিয়লজিস্টের'। ল্যাবরেটারির শুরু বিজ্ঞান সর্বস্ব আত্মকেন্দ্রিকতায়। নন্দকিশোরের কথা আত্মপরতন্ত্র বিজ্ঞান কৈবল্যের ইতিকাহিনী।

যন্ত্রবিদ নবীন মাধব ভাল বেসেছিল অচিরাকে, কিন্তু সে তার সমস্ত দিয়ে তাকে পেতে চায় নি। অবিচ্ছেদ্য ভাবে পায়ও নি। নন্দকিশোর সোহিনীকে পেয়েছিল। সোহিনীর সঙ্গে তার মুহূর্তের বিচ্ছেদ আর ঘটে নি। নন্দ-কিশোর-সোহিনীর মিলন অসবর্ণ নয়। ব্রতের মিল ঘটিয়ে বিজ্ঞানী নন্দকিশোর তাদের মিলনকে সবর্ণ করে নিয়েছিল। সোহিনী নন্দকিশোরের প্রথম লগ্নেই সোহিনীর চোখে ধরা পড়েছিল। তারই স্বীকৃতি সোহিনীর সংলাপে: আমার জন্মস্থানে শয়তানের দৃষ্টি আছে।...তোমার মধ্যে ঐ শয়তানের মন্তর আছে'।

সোহিনী-নন্দকিশোরের মিলনেও একটি অপূর্ণতা ছিল। নন্দকিশোর তার সমস্ত দিয়ে সোহিনীকে ভালোবেসেছিল···এ সিদ্ধান্ত তর্কাতীত নয়। 'যৌবনের হাটে মন নিয়ে জুয়ো খেলবার সময়ই তার ছিল না।' সে সোহিনীকে গ্রহণ করেছিল একটি কারণে: বিজ্ঞানী নন্দকিশোরের মনে যে কষ্টিপাথর ছিল তাতে সোহিনীর ঝকঝকে ক্যারেকটারের কষ লেগেছিল প্রথম লগ্নেই।

রেবতী তার সবর্স্ব পণ করে নীলার হাতে আপনাকে সমর্পণ করেছিল। সোহিনী ও নীলা মিলে যেমন অনন্ত-যৌবনা নারীর উর্বশীত্ব, নন্দকিশোর এবং রেবতীও তেমনি একটি মানুষের অসম্পূর্ণ সমাপ্তিহীন মর্মজীবনের আপত অসমঞ্জস পূর্বানুসরণ, একটি চরিত্রাংশের দ্বিধাবিভাজন। হয়তো বা অভীকের বিজ্ঞান-প্রবণতার পরিণাম নন্দকিশোরের বিজ্ঞান কৈবল্য আর তার আর্ট-পিপাসু ভাব প্রবণতার উন্মাদির উচ্ছলতা রেবতী।

নারী চরিত্রগুলির মধ্যেও পারম্পরিক চরিত্রগত উপাদান সংক্রমনের একটি বিশিষ্ট ব্যাপার সক্রিয়। বিভার অচপল আচরণের মধ্যে যে একনিষ্ঠতা ছিল তাই বোধ করি অচিরার ক্ষেত্রে অনড় আদর্শে পর্যবসিত। সোহিনীর উত্তর

কাল এ নিষ্ঠারই রূপান্তর। তাই সে বলতে পেরেছিল : 'আমি সমাজের আইন কানুন ভাসিয়ে দিতে পারি দেহের টানে পড়ে, কিন্তু প্রাণ গেলেও বেইমানি করতে পারব না'। এ ইমানিষ্ট আর ঝকঝকে ক্যারেকটারের তেজ।

'জীবনের আরম্ভ থেকে বিভা তার বাবারই মেয়ে সম্পূর্ণরূপে। তার বাপ সতীশও মেয়েটির উপরে অজস্র স্নেহ ঢেলে দিয়েছিলেন। তাই নিয়ে ওর মার মনে একটু ঈর্ষা ছিল।' নীলা একান্তভাবে তার মায়েরই মেয়ে। তিন সঙ্গীতে তার কোন পিতৃ পরিচয় নেই। বিভার মায়ের ঈর্ষাই বুঝি ভিন্নরূপ ধারণ করেছে সোহিনীর মধ্যে। 'নিজের স্বামীর অভিজ্ঞতা অনুসারে সোহিনীর ধারণা ছিল বিদ্যাসাধনার খেত যে সে গোরুর চরবার খেত নয়। আজ আভাস পেল বেড়া সকলের পক্ষে সমান ঘন নয়। সেটা ভালো লাগল না।' বিজ্ঞানীর চোখে আর্টপিপাসুর উৎসুক দৃষ্টি ভালো না লাগার পিছনে একটি অপসৃতযৌবনার ঈর্ষা বোধ হয় ছিল। তাই রেবতী-নীলার বিবাহে অন্যান্য আপত্তির সঙ্গে সোহিনীর ঈর্ষাও যুক্ত হয়ে রইল।

অভীক-নবীন মাধব-নন্দকিশোর তিনজনই ইয়োরোপে শিক্ষালাভ করেছিল। রেবতীরও দু'একটা লেখার যাচাই হয়ে গেছে প্রতীচ্যের দরবারে। এদিক থেকেও একটি চারিত্রিক যোগসূত্র স্পষ্ট।

অভীক-নবীনমাধব-নন্দকিশোরের মধ্যে একটি চারিত্রিক ক্রমপরিণতির ধারা লক্ষণীয়। অভীক কৈশোরের উচ্ছল আবেগ চঞ্চল' নবীনমাধবে যৌবনের বোধিদীপ্ত আবেগনুভূতি আর নন্দকিশোরের মধ্যে প্রৌঢ়মনের নির্মোহ নিরাসক্তি। এ চরিত্রয়ীর মধ্যে বয়ক্রমিক পরিণতির ইঙ্গিত রয়েছে। বিভা-অচিরা-সোহিনী-নীলাও তেমনি একই নারীর বিচিত্র রূপ ও অভিব্যক্তি।

এ সকল আভ্যন্তরীণ সংযোগ সঙ্গতি ও উপাদান সাম্যের ফলে তিন সঙ্গীত একটি সামগ্রিক রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে রূপ বৈভবে তিন সঙ্গী উপন্যাসধর্মী রবিবার, শেষ কথা, ল্যাবরেটরি যেন তিন সঙ্গীর তিনটি পরিচ্ছেদ।

উপন্যাস গল্প বলে। উপন্যাসের মর্মকেন্দ্রে একটি কাহিনীর অস্তিত্ব অবিসম্বাদিত। অবশ্য রচনারীতির বিভিন্নতা সে কাহিনীর রূপরীতি, গতিপ্রকৃতি ও উপস্থাপনায় বিভিন্নতা আনে। আর সে বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে

উপন্যাসের জাত পালটায়। তাই ঘরে-বাইরে নৌকাডুবি গোরার সঙ্গে দুইবোন মালঞ্চ তিনসঙ্গীর এত পার্থক্য।

উত্তর জীবনের সাহিত্যকর্মে রবীন্দ্রনাথ ভাবাশ্রয়ী। মর্মজীবনের এক একটি ভাবসমস্যা তখন তাঁর রচনায় মুখ্য হয়ে উঠেছে। তিন সঙ্গীর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তিন সঙ্গীর পুরুষ চরিত্র আপন দেহসৌষ্ঠব সম্পর্কে অবহিত হয়েছে অন্যের কাছে তার প্রশংসা শুনে। দেহচেতনা থেকে তাদের মানসিকতাকে দূরে রাখার মধ্যে বোধ করি মনোজীবন প্রাধান্যের ইঙ্গিত রয়েছে।

চেতনাপ্রবাহ পদ্ধতির কথাশিল্প মনস্তত্ত্বমূলক ও মনোবিশ্লেষণ প্রধান। স্বতস্ফূর্ততা ও স্বাভাবিকতার প্রতিবিম্বন চেতনাপ্রবাহ রীতির অপরিহার্য উপাদান। ফ্লাশ ব্যাক, ভাবরোমন্থন, বক্রোক্তি, আত্মগত বাচনবিলাস, অন্তর্লীন স্বগতোক্তি প্রভৃতি কৌশলের মাধ্যমে চেতনাপ্রবাহ বিন্যস্ত কাহিনীতে চরিত্রগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং তৃতীয় ব্যক্তিত্ব—রচনাকারের মনোভঙ্গিও ধরা পড়ে। চিঠিপত্রের চরিত্রগুলি এখানে স্পষ্টতা লাভ করে। শব্দ এখানে অর্থভাবে সম্পৃক্ত।

তিন সঙ্গীর রচনারীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এ সব কৌশলের প্রায় প্রত্যেকটিই চোখে পড়ে। রবিবারের উপসংহারে যখন বিভার 'মন কেবলই বলতে লাগল, রাগ কোরো না, ফিরে এসো, আমি তোমাকে আর দুঃখ দেবো না', তখন এ অন্তর্লীন স্বগতোক্তির মধ্যে বিভা চরম রূপে ধরা দিয়েছে। সেখানেই সে স্পষ্টতম। অভীকের চিঠির মধ্যেই তার অমৃত যন্ত্রণা বিদীর্ণ মানসিকতার পরম প্রকাশ, পূর্ণতম অভিব্যক্তি।

আধুনিক উপন্যাসের আত্মজীবনী প্রবণতাকে আত্মস্থ করে প্রথম পুরুষ একবচনের স্বগতভাষণে নবীনমাধব শেষকথার কাহিনী উপস্থাপিত করেছেন। বঙ্কিমের একটি চিঠির বিদ্যুৎপ্রভ কয়েকটি কথাতেই ভবতোষ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভাবরোমন্থন, অন্তর্লীন স্বগতোক্তির মাধ্যমেই নবীনমাধবের মানসিকতা স্পষ্টতা লাভ করেছে। শেষ কথা ও ল্যাবরেটরির স্মৃতিরচনা ভাবরোমন্থনের ভঙ্গিতেই উপস্থাপিত। দ্বান্দ্বিক মনোজীবনের এ হেন উপস্থাপনা চেতনপ্রবাহ রীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিন সঙ্গীর মানসিক ক্রিয়া মাঝে মাঝে চেতনা থেকে চেতনাতিগে প্রবেশ করেছি। উদাহরণে বক্তব্য স্পষ্ট হবে ঃ

"নীচের ঘড়িতে দুটো বাজল। মুহূর্তের জন্য রেবতী তার চিন্তার বিষয় ভাবছিল জানলার বাইরে আকাশের দিকে চোখ মেলে। এমন সময় দেওয়ালে পড়ল ছায়া। চেয়ে দেখে ঘরের মধ্যে এসেছে নীলা। রাত-কাপড় পরা, পাতলা সিল্কের সেমিজ। ও চমকে চৌকি থেকে উঠে পড়তে যাচ্ছিল। নীলা এসে ওর কোলের উপর বসে গলা জড়িয়ে ধরল। রেবতীর সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল, বুক উঠতে পড়তে লাগল প্রবল বেগে। গদ গদ কণ্ঠে বলতে লাগল, 'তুমি যাও, এ ঘর থেকে তুমি যাও।'

ও বললে, 'কেন।'

রেবতী বললে, 'আমি সই করতে পারছি নে। কেন এলে তুমি এ ঘরে।'...

হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল পাঞ্জাবী প্রহরী। ভৎর্সনার কণ্ঠে বললে, বহুৎ শরমকি বাৎ হ্যায়, আপ বাহার চলা যাইয়ে।'

রেবতী চেতন-মনের অগোচরে ইলেকট্রিক ডাকঘড়িতে কখন চাপ দিয়েছিল।"

রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালের উপন্যাসে যে বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পেয়েছে, তিন সঙ্গীর ক্ষেত্রেও সেগুলি অনুপস্থিত নয়। সমালোচকেরা মনে করেন এখানে গল্পগ্রন্থন তত্ত্ব ও মনীষার চাপে সংকুচিত, কাহিনীবিকৃতি আংশিকতাধর্মী এবং প্রত্যাশিত ঘটনার লঙ্ঘনপ্রয়াস স্পষ্ট। ন্যূনতম রেখার সাহায্যে এখানে এক একটি চরিত্র পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্তি লাভ করেছে। পাত্রপাত্রীর সংলাপের মাধ্যমে তিনি তাদের মর্মজীবনকে নাটকীয় ভাবে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছেন। অর্থপ্রাচুর্য শব্দকে অপচয় থেকে রক্ষা করেছে।

তিন সঙ্গীর বক্তব্য: মিলনে পরিপূর্ণতা নেই, প্রেমে অপূর্ণতার অভিমুখী। এ বক্তব্যটি তিন সঙ্গীতে সৃষ্টির চেয়ে অধিক পরিমাণ প্রাধান্য দিয়েছে প্রমাণকে। উপরোক্ত ভাববস্তুকে কাহিনীবৃত্তের কেন্দ্রে উপস্থাপিত করে রবীন্দ্রনাথ তার উপর বিচিত্র সমস্যার আলোকপাত করেছেন।

বোহেমিয়ান অভীক কিভাবে সম্পূর্ণভাবে কামনা করেছিল। কিন্তু তাদের মিলনের পথে দুটি অন্তরায় ছিল। 'বিভার আর যা-কিছু আছে সবই সে দিতে পারে, কেবল ঠেকেছে ওর পিতার ইচ্ছায়। সে ইচ্ছা তো মত নয়, বিশ্বাস নয়, তর্কের বিষয় নয়। সে ওর স্বভাবের অঙ্গ। তার প্রতিবাদ

চলে না। বারবার মনে করেছে এই বাধা সে লঙ্ঘন করবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কিছুতে তার পা সরতে চায় না।' এ পা না সরার পিছনে তার অন্য একটি চেতনাতিগ মানসিকতার প্রভাব আছে। বিভার কথাতেই তা প্রকাশ পেয়েছে: 'তোমার দুষ্টুমি কতক্ষণের। এটা সাংঘাতিক শীলার পক্ষে, তোমার পক্ষে একটুও না। এমন ছেলেমানুষি কতবার তোমার দেখেছি, মনে মনে হেসেছি। জানি কিছুদিনের মতো এ খেলা না হলে তোমার চলে না। এও জানি স্থায়ী হলে আরও অচল হয়। হয়তো তুমি কিছু পেতে চাও, কিন্তু তোমাকে কিছু পাবে এ সইতে পারো না।..আমরা তো চিরকাল তোমাদের খেলনার দামই দিয়ে থাকি। তাতে দোষ কী। তারপরে আছে আঁস্তাকুড়। ঘরের মায়ায় অভীককে বাঁধা অসম্ভব—বিভা এ কথা প্রায় স্বতসিদ্ধের মত বিশ্বাস করেছিল। বিভা-অভীকের পরিপূর্ণ মিলনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের মানসিক বৈষম্য। উভয়েই তার জন্য দায়ী।

নবীন মাধবের সঙ্গে অচিরার বিরুদ্ধে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে অচিরার মানসিকতা তাদের আংশিক কথোপকথন উদ্ধৃত করলেই এ সিদ্ধান্তের যথার্থ সপ্রমাণ হবে:

"বললুম,...'আপনি একদিন ভবতোষকে অত্যন্ত ভালোবেসেছিলেন। আজও কি তাঁকে তেমনি ভালোবাসেন।'

'আচ্ছা, মনে করুন বাসি নে।'

'আমিই আপনার মনকে সরিয়ে এনেছি।'

'তা হতে পারে, কিন্তু একলা আপনি নন, বনের ভিতরকার এই ভীষণ অন্ধশক্তি। সেইজন্য আমি এই সরে আমাকে শ্রদ্ধা করি নে, লজ্জা পাই।... ভালোবাসার আদর্শ আমাদের পূজার জিনিস। তাকেই বলে সতীত্ব। সতীত্ব একটা আদর্শ। এ জিনিসটা বনের প্রকৃতির নয়, মানবীর।" এ সতীত্বের অনড় আদর্শ বিচ্ছেদের প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে উভয়ের মাঝখানে অচিরা নবীনমাধবের বিচ্ছেদের জন্য দায়ী অচিরার প্রেমচিন্তা ও সতীত্বচেতনার শুচিমোহসিক্ত বৈরাগ্যবিলাসিতা।

সোহিনীর বক্তব্যের মাধ্যমে রেবতী-নীলার বিচ্ছেদের কারণটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে: 'আমি লোক চিনতে পারি নি,...ল্যাবরেটরিতে গোয়ালঘর বসিয়ে দিয়েছিলাম—গোবরের কুণ্ডে আর একটু হলেই ডুবত 'জিনিসটা।'

মালাজপকারিণীর মালার ওঁটির কথা দিয়েই ল্যাবরেটরির উপসংহার : "হঠাৎ আর একটা ছায়া পড়ল দেয়ালে। পিসিমা এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'রেবি, চলে আয়।' সুড় সুড় করে রেবতী পিসিমার পিছন পিছন চলে গেল, একবার ফিরেও তাকাল না।" রেবতীর অন্তরের অন্তস্তলে একটি সনাতনী সংস্কারানুগত্য ছিল আর নীলার মধ্যে ছিল সমস্ত সংস্কার লঙ্ঘনপ্রয়াসী ভোগবিলাসী। রেবতীর সনাতনী সংস্কারপ্রবণতা আর নীলার ভোগবিলাসী ঊর্বশীত্ব এ বিচ্ছেদের জন্য দায়ী।

ল্যাবরেটরির সোহিনী চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ একটি অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করেছেন। সে মাত্রার জোরেই সোহিনী বলতে পেরেছিল : "প্রাণ গেলেও বেইমানী করতে পারব না।' উত্তরকালের সোহিনী চরিত্রে সতীত্বের চেয়েও বড় তার মানবীত্ব। ঔপনিবেশিক বাঙলার সমাজে নারীর এ মানবীত্বের মাত্রা বিরলদৃষ্ট হলেও, একেবারে অনুপস্থিত নয়। কায়িক সতীত্বশুচিতার চেয়ে মানসিক মানবীত্ব যেখানে বড় হয়ে উঠেছে সেখানেই এ অতিরিক্ত মাত্রার বাস্তবতা।

অন্যান্য কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথের যে সব মানসিক প্রবণতা প্রকাশলাভ করেছে, তিন সঙ্গীতেও তার অনেকগুলি স্পষ্ট। ল্যাবরেটরিতে রাজনীতিচিন্তার একটি সমাজমুখী রূপ স্বল্পতম রেখার সাহায্যে উজ্জ্বল।

'ল্যাবরেটি'র রচনার কিছুকাল আগে রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রবসুর আমন্ত্রণে মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে এসেছেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি তাঁর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করেন নি। এক রাজনৈতিক আন্দোলনের যুগে সুরু হয়েছিল তাঁর কথাসাহিত্য। তিন সঙ্গীর মধ্যেও সে রাজনৈতিক মনটি একেবারে অনুপস্থিত নয়। নবীনমাধবের মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দীক্ষার কথা সুস্পষ্টভাষায় অভিব্যক্ত। নীলার চরিত্র-চিত্রণেও রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মন সক্রিয়। নীলার রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : মেয়েটি একেবারে ফুটফুটে গৌরবর্ণ। মেয়ের দেহে ফুটেছে কাশ্মীরী শ্বেত পাথরের আভা, চোখে নীল পদ্মের আভাস আর চুলে চমক দেয় যাকে বলে পিঙ্গলবর্ণ। এ ইয়োরোপা রূপশ্রীর অধিকারিণী নীলা শেষ পর্যন্ত তার অভিসন্ধিকে সফল করতে পারেনি। রেবতী পিসিমার 'পিছন পিছন চলে, একবার ফিরেও তাকাল না'। নীলার এ ব্যর্থতার চিত্র যেন ইয়োরোপের নির্মানবিমুখ শ্রীহীন সংগ্রহ-

কার্যের অনিবার্য ব্যর্থতার ইঙ্গিতগর্ভ। প্রতীচ্যের সৃজনবিমুখ সংগ্রহকার্যের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের অন্তরে যে বিদ্রোহ বহুকাল যাবৎ প্রধূম্র ছিল তারই একটি বিদ্যুৎশিখা হয়তো জাতবান্ধবী নীলার যন্ত্রমনা সভ্যনামিক যাযাবরবৃত্ত মানসিকতাকে আশ্রয় করেছে। প্রত্যাশিত ঘটনাকে লঙ্ঘন করে ল্যাবরেটারির উপসংহারে কথাকারের রাজনীতি চিন্তার নাটকীয় উপস্থাপনা অনবদ্য। তিন সঙ্গীতে নারী পুরুষের মনোজীবনের যে দুটো ধারা পাপাপাশি প্রবাহিত হয়েছে তার তীরে তীরে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি সমস্যার বিচিত্ররঙা বিজলীবাতি জ্বালিয়েছেন এক একটি সমস্যার রঙে রঙিন প্রবাহের অংশবিশেষকে তিনি বিভিন্ন নাম নামাঙ্কিত করে তার বিশ্লেষণে নিমগ্নচেত। সে নিমগ্ননিবিড় বিশ্লেষণের স্বল্পরেখ লঘুস্পর্শে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে মানুষের নর্মজীবনের বিচিত্র-গতি লীলাবিলাস আর সে বিশ্লেষণভঙ্গিতে প্রতিবিম্বিত কথাকারের সৃষ্টিশীল জীবনচিন্তা।

রক্তকরবী-শেষের কবিতার ভাষায় যে সর্বগামিতা দেখা গিয়েছিল, তিন সঙ্গীর ভাষাতেও সে ব্যাকুলচিত্ত সাধনার চরমসিদ্ধি সুচিহ্নিত। 'কি মিষ্টি তার ধ্বনি, যেন ঝরণার স্রোতে নুড়ির সুরওয়ালা শব্দ।' বিদেহীকে দেহী করে অভীক যখন বলে: আমার মত, আমার বিশ্বাস সমস্ত চোখ বুজে সমর্পণ করে দেব তোমার হাতে; তুমি তাকে পৌঁছে দিও তোমার তীর্থপথের শেষ ঠিকানায়: তখন তার বক্তব্য তিন সঙ্গীর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অনেক বাণীচিত্রের মত একটি নিটোল রূপকল্পের মর্যাদা লাভ করে এবং সে রূপকল্পের বর্ণালীতে ধরা পড়ে তার আত্মদান কামনায় উচ্ছ্বসিত মানসিকতা। স্বেদসিক্ত জাদু, গাছপালার নিঃশব্দ চক্রান্ত আদিম প্রাণের মন্ত্রধ্বনি প্রভৃতি বহু কথা তিন সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থগৌরব অসাধারণ। পার্শ্বকাহিনীগুলিকে রবীন্দ্রনাথ স্বল্পরেখ লঘুস্পর্শে সজীব করে তুলেছেন। একটি উদাহরণই বক্তব্য স্পষ্ট হবে: 'মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গে কুলশীল জাতগুষ্টির কথা বিচার করবার রাস্তা ছিল না। একমাত্র ছিল মন ভোলাবার পথ, শাস্ত্রকে ডিঙিয়ে গেল তার ভেলকি। অল্প বয়সের মাড়োয়ারি ছেলে, তার টাকা পৈতৃক, শিক্ষা একালের। অকস্মাৎ সে পড়ল এসে অনঙ্গের অলক্ষ্য ফাঁদে।··· সিভিল মতে বিয়ে করলে সমাজের ওপারে। বেশী দিনের মেয়াদে নয়। তার

ভাগ্যে বধূটি এল প্রথমে, তারপরে দাম্পত্যের মাঝখানটাতে দাঁড়ি টানলে টাইফয়েড, তারপরে মুক্তি।' সর্বশেষ বাক্যটির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই লেখকের সুদক্ষ সংক্ষিপ্তকরণের ক্ষমতা অনুভূত হবে। ভবতোষের জন্যেও তিনি একটি ক্ষুদ্রাকার চিঠির বেশী জায়গা ছেড়ে দেন নি।

ছিপছিপে নদী তনিকাই তিন সঙ্গীর ভাষার সাধক রূপক। ঝিরঝির শব্দে হালকা নাচের ওড়না ঘুরিয়ে পলাশ ফুলের রাঙা মাৎলামি গায়ে মেখে শালবনের ফাঁকে ফাঁকে চলেছিল ছিপছিপে নদী তনিকা; তার অন্তরে ছিল সাগর সঙ্গমের অবশ্যম্ভাবিতা। তিন সঙ্গীর ভাষাতেও যৌবনোত্তাপের উষ্ণস্পর্শের অতলান্তিকতা; তার বাণী তনিকার অণুতে অণুতে অপরিসীম অর্থগর্ভ মহাসিন্ধুর অভিব্যঞ্জনা।

গল্পগুচ্ছে—মৃত্যু

প্রণবেশ সেন

"Unveiled by him, Death's mysterious image reveals her misunderstood beauty"

—Guruder, Andree Rarpbles.
Golden Book of Tagore.

উনিশ শতক বাংলার নবজাগরণের যুগ। ১৮১৭ খ্রীঃ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রসারকল্পে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে বাঙ্গালী আবিষ্কার করলো এক নতুন উষার স্বর্ণদ্বার। সোচ্চার প্রতিবাদ ধ্বনিত হল এদেশের সাহিত্যে কল্পিত দেবতার প্রতি অহেতুক আত্ম-সমর্পণের নামে মনুষ্যত্বের বিবেককে বলিদানের বিরুদ্ধে। সংস্কারের খোলস ছেড়ে অন্য নিরপেক্ষ মানুষ প্রবেশ করলো বাংলাসাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে। তিরোজিও এনে দেখালেন জ্ঞানের কষ্টিপাথর। সে পাথরে ধর্ম, সমাজ সংস্কার সব কিছুকে বিচার করে মানবতাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে স্বীকৃতি দেওয়া হ'ল। মধ্যযুগীয় রীতি, নীতি, অন্ধ আনুগত্য, সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জেগে উঠলো। অধ্যাপক মারোজভের ভাষায় এ যুগ হল—"It was a rebellion of the human personality against the compulsory standards of behaviour prevatent in the middle ages." ধর্মকে ধূপের ধোঁয়া, ফুলের স্তূপের আড়াল থেকে মুক্তি দিয়ে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণ করা হল একদিকে মানবতাবোধ আর একদিকে প্রাচীন।

ঐতিহ্যের মধ্যেই এই মানবতাবোধের স্বীকৃতি অনুসন্ধান—এই পাথেয় নিয়ে উনিশ শতকের পথ চলা। ১৮৬১-এ প্রকাশিত হল এই নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ বাণীরূপ মেঘনাদবধ কাব্যে!

রবীন্দ্রনাথের জন্মলগ্নও এই ১৮৬১। তাঁর কৈশোর ও যৌবন কেটেছে

রেনেসাঁর সমুন্নত আবহাওয়ায়। একদিকে যুগ আর একদিকে দার্শনিক পিতার প্রভাব এই দুইয়ের সমষ্টিই রবীন্দ্র-মানস। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক পিতা দেবেন্দ্রনাথ নিজে রেনেসাঁ আন্দোলনের পুরোভাগের একজন। তিনি বালক রবীন্দ্রনাথ যে ঔপনিষদিক শিক্ষাদান করেন তার পেছনে অহেতুক ভক্তি বা অন্ধ আনুগত্য ছিল না, ছিল যুক্তি দিয়ে শাস্ত্রকে বিচার করে তাঁর মধ্যে ছেকে মানবতাবোধকে উদ্ধার করার চেষ্টা। তার ফলে রবীন্দ্রদর্শনে অনায়াসেই ঈশ্বর এবং মানুষ এক হয়ে মিলে যেতে পেরেছে। মানবকে স্বীকার করেই তিনি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন। "আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।' রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবোধ মানবতাবোধ থেকে বিযুক্ত তো নয়ই বরং বলা যেতে পারে পরস্পর পরিপূরক। আর এই অধ্যাত্মবোধ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন বাস্তব জীবনের দিকে তাকিয়েছেন তখন দেখেছেন—

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে,
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।'—

এই বোধেই জীবন ও মৃত্যু অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক এবং অনাড়ম্বরভাবে তাঁর কাছে ধরা পড়েছে। মৃত্যুর icyhands-ও তাঁর কাছে মোটেই ভীতিপ্রদ নয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে মৃত্যু জর্মন কবি রিলকের কাব্যের (আলসেস্-টিস ও আদমেতস) অনুভূতির মত। মৃত্যু যখন আলসেস্-টিসকে নিয়ে চলেছে তখন সে দেখলো—

"he saw the maiden's face, that turned to him,
smiling a smile as radient as a hope,
that was almost a promise : to return,
grown up, out of the depths of death again
to him, thy liver—

মৃত্যুর পাতাল থেকেই বেড়িয়ে আসে যে জীবনের পূজারী—যে মৃত্যুঞ্জয়। "মৃত্যু অমৃত করে দান।"

মৃত্যু সম্পর্কে ভারতীয় দার্শনিক প্রত্যয় এবং রবীন্দ্র উপলব্ধ সত্য—একই কথা বলে। দৃশ্যতঃ মৃত্যু আছে কিন্তু কার্যতঃ নেই। সেই ঋতুরাজের গায়ের কাপড়খানার মত—"যখন উল্টে পরেন তখন দেখি শুকনো পাতা' ঝরাফুল, আবার যখন পাল্টে নেন তখন সকালবেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী—

তখন ফাল্গুনের আম্রমঞ্জরী, চৈত্রের কনকচাঁপা।" মৃত্যু ও জীবন—একই সত্যের এ-পিঠ আর ও-পিঠ। আমরা রূপ-রূপান্তর এবং জন্ম-জন্মান্তরের মধ্যে দিয়ে জীবনের পূর্ণ পরিণতির দিকে চলেছি। পূর্ণ পরিণতি অর্থাৎ অরূপের স্পর্শলাভ। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে জীবনে অরূপের আবির্ভাব ঘটে থাকে। "আমার রচনায় বারবার এই ভাবটা প্রকাশ পেয়েছে জীবনে এই দুঃখ বিপদ বিরোধ মৃত্যুর বেশে অসীমের আবির্ভাব।" তাই মৃত্যু জীবনের সাথে অচ্ছেদ্য এবং অপরিহার্যভাবে যুক্ত।

ধূসর গোধূলি লগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণবাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত
রক্ত সূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা
চিনিলাম তখনি দোঁহারে
দেখিলাম নিভেছে যৌতুক,
বরের চরমদান মরণের বধূ।

—তাই কবির কাছে—'মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান।'

গল্পগুচ্ছের গল্পগুলোর জন্মলগ্ন রবীন্দ্র-যৌবন। প্রভাতসঙ্গীত শেষ হয়েছে, প্রতিভা এখন মধ্যাহ্নের দিকে। প্রভাতসঙ্গীতের দিনে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন—"বিশ্ব স্থূল নয়। বিশ্বে এমন কোন বস্তু নেই যাতে রস স্পর্শ নেই।.....স্থূল আবরণের মৃত্যু আছে। অন্তরতম আনন্দময় যে সত্তা তার মৃত্যু নেই।" (মানব সত্য) একটা আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ এই সময় থেকেই।

কিন্তু গল্পগুচ্ছের রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ তখন পদ্মার বুকে 'সজন নিজ'নের নিত্য সংগমে' বাসা বেঁধেছেন। বাস্তবকে প্রকৃতির সাথে জীবনে মিশিয়ে এমন নিবিড়ভাবে অন্তরে গ্রহণ করবার সুযোগ ইতিপূর্বে হয় নি।

ছিন্নপত্রে লিখেছেন "অন্ধকারের আবরণের মধ্য দিয়ে এই লোকালয়ের একটি যেন সজীব হৃদস্পন্দন আমার বক্ষের উপর এসে আঘাত করতে লাগলো। এই মেঘলা আকাশের নীচে নিবিড় সন্ধ্যার মধ্যে জীবনের কত রহস্য—মানুষে মানুষে কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি কত শত সহস্র প্রকারের ঘাত-প্রতিঘাত। বৃহৎ জনতার সমস্ত ভালোমন্দ, সমস্ত সুখ-দুঃখ এক হয়ে তরুলতাবেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্ষা নদীর দুই তীর থেকে একটি সকরুণ-সুন্দর-সুগম্ভীর রাগিণীর মত আমার হৃদয়ে এসে প্রবেশ করতে লাগলো।"

রবীন্দ্র রচনাবলী বৈশাখ ১৩৪৭-এর সূচনাংশে লিখেছেন—"অহরহ সুখ-দুঃখের বাণী নিয়ে জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁচেছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমায় মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করে নি। কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি—সেই সংকল্পের সূত্র আজো বিচ্ছিন্ন হয় নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ ও কর্মের পথ পাশাপাশি রসান্বিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা ও ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা। বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবলোকের মধ্যে নিত্য সচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা। এই সময়কার প্রথম কাব্যের ফসল ভরা হয়েছিল সোনার তরীতে।" প্রকৃতি ও মানুষ উভয়েই স্থান পেল কবির কাব্যে। আর এই একই সময়েই তাঁর ছোট গল্প ধারাটিও খুলে গেল। এখানেই তিনি 'হাসিকান্না-সুখ-দুঃখ ভরা মানুষকে তাহার যথার্থ স্থানে দেখিলেন।' গল্পগুচ্ছ এই 'হাসিকান্না-সুখ-দুঃখ ভরা মানুষের' জীবন পথের পাঁচালী!

গল্পগুচ্ছে রবীন্দ্রনাথ মানুষের জীবনের নানা বিচিত্র রহস্যের জাল বুনেছেন। সচল প্রাণ ধর্মের উত্তাপ এতে সঞ্চারিত। আর জীবনকে দেখেছেন জন্যই জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত মৃত্যুর দক্ষিণ বাহুকেও তিনি অস্বীকার করেন নি। 'জীবনে যাহারে বলে মরণ তাহারি নাম।' তাই গল্পগুচ্ছের অনেক গল্পেই মৃত্যু তার আসন পেতেছে অনিবার্যভাবে। জীবনকে তিনি যেমন নানা বিচিত্রভাবে উপলব্ধি করেছেন তেমনি মৃত্যুকেও। মৃত্যুও নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে তাঁর গল্পে ধরা পড়েছে।

গল্পগুচ্ছের প্রথম গল্প 'ঘাটের কথা'। এখানে মৃত্যু এসেছে মানুষকে পার্থিব দুঃখ-বেদনার হাত থেকে রক্ষা করে শান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় দিতে। প্রিয়তমকে না পাবার বেদনা ও বিড়ম্বনার হাত থেকে কুসুমকে রক্ষা করতে মৃত্যু তার দক্ষিণ বাহু বাড়িয়ে দিল পরমবন্ধুর মত আশ্রয় দিতে।

"কুসুম কহিল তিনি আদেশ করিয়া গিয়াছেন তাহাকে ভুলিতে হইবে।" বলিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গার জলে নামিল।

এতটুকু বেলা হইতে যে এই জলের ধারে কাটাইয়াছে শ্রান্তির সময় এ জল যদি হাত বাড়াইয়া তাহাকে কোলে করিয়া না লইবে তবে আর কে লইবে।"

মাষ্টারমশায় গল্পে দেখেছি "বেদনার মধ্যে, অন্যায়ের মধ্যে, অপমানের মধ্যে বন্দী হরলাল "সুগভীর সুনিবিড় আনন্দপূর্ণ শান্তির" স্পর্শ পেল মৃত্যুর আগমনে। মৃত্যুই যে জীবনের প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা এমন একটা ইঙ্গিত এতে পরিস্ফুট।

"কলিকাতার রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, দোকান বাজার একটু একটু করিয়া তাহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইতেছে বাতাস ভরিয়া গেল, আকাশ ভরিয়া উঠিল, একটি একটি করিয়া নক্ষত্র তাঁহার মধ্যে মিলাইয়া গেল—হরলালের শরীর মনের সমস্ত বেদনা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চেতনা তাঁহার মধ্যে অল্প অল্প করিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল—ঐ গেল তপ্তরাশের বুদবুদ একেবারে ফাটিয়া গেল—এখন আর অন্ধকারও নাই, আলোকও নাই, রহিল কেবল একটি প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা।" "মরণ রবীন্দ্রনাথের কাছে এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা।"

'শেষের রাত্রি', 'কংকাল' প্রভৃতি গল্পগুলোয় মৃত্যু এক নূতন বেশে আপনাকে উপস্থিত করে। মৃত্যু এখানে মিলনের পটভূমিকা। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নায়ক-নায়িকা তাদের প্রেমকে পরিস্ফুট করেছে। মানুষের জীবনের বঞ্চনা, নীচতা, ক্ষুদ্রতাকে দূর করে মৃত্যু প্রেমকে আপন মহিমায় দাঁড় করিয়ে দেয়।

শেষের রাত্রি গল্পের যতখন তাঁর স্ত্রীকে প্রেমের পূজা নিবেদন করে চলেছে কিন্তু তাঁর স্ত্রী তার প্রেমের প্রতিদান দেয় না। তবুও যতীন ভাবে তার স্ত্রী তাকে সত্যিই ভালোবাসে। এই ভালোবাসা বোধের কাছেই মৃত্যুও যতীনের কাছে অপরূপ হয়ে দেখা দেয়।

"মাসি তোমাকে সত্য বলছি, মৃত্যুকে আমার মধুর মনে হচ্ছে।" অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইয়া যতীন দেখিতেছিল তাহার মণিই আজি মৃত্যুর বেশ ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে আজ অক্ষয় যৌবনে পূর্ণ—সে গৃহিনী সে জ্ঞানী, সে রূপসী, সে কল্যাণী···যতীন জোড়হাত করিয়া মনে মনে কহিল—'এতদিনের পর ঘোমটা খুলিল এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আবরণ ঘুচিল। অনেক কাঁদাইয়াছে সুন্দর, হে সুন্দর, তুমি আর ফাঁকি দিতে পারিবে না। "কিন্তু মৃত্যু যখন সত্যই ঘনিয়ে এল তখন সে দেখতে পেল ফাঁকি ছাড়া আর কিছুই পায় নি। আত্মপ্রতারণার রূপটি তার সামনে ধরা পড়ে। তার আর কাউকে দরকার নেই—কাউকে না—কোনো

মিথ্যাকে না। 'না, মাসি আমার পায়ের উপর শাল নয়, ও শাল নয়! ও শাল মিথ্যে, ও শাল ফাঁকি।" কি করুণ এই মৃত্যু! তবুও এই মৃত্যু অপরূপ মাধুর্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যখন দেখতে পাই যতীন আর মণির মাঝখানকার আড়ালটুকু ভেঙ্গে পড়ে। যতীনের পায়ের উপর আছড়ে পড়া মণির হৃদয়ের ভালোবাসা কান্নার রূপ নিয়ে ফুটে উঠে।

'কংকাল' গল্পে নারী হৃদয়ের প্রতিহিংসার গল্প। একটি মেয়ে বিয়ের দু'মাসের মধ্যে স্বামীকে (যাকে মেয়েটি ভালোবাসতে পারে নি) হারিয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসে। যেখানে পরিচয় হয় দাদার বন্ধুর ডাক্তার শশিশেখরের সঙ্গে। শশিশেখর তাকে বলতো 'কনকচাঁপা' আর এই 'কনকচাঁপা' মেয়ের কাছে "পৃথিবীর সমস্ত পুরুষজাতি শশিশেখরের মূর্তি ধরিয়া চরণাগত" বলে মনে হত। ধীরে ধীরে উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের উন্মেষ হল। তারপর একদিন মেয়েটি শুনতে পেল ডাক্তার বিবাহে চলেছেন—"এই বিবাহে ডাক্তার বারো হাজার টাকা পাইবেন।" মেয়েটি তীব্র প্রতিহিংসায় ডাক্তারকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করলো! কিন্তু কেন? হয়তো এ জীবনে যাকে পাওয়া গেল না মৃত্যুর পরপারে তাকে পাওয়া যেতে পারে। তাই মেয়েটিও আত্মহত্যা করলো। মৃত্যু তার কাছে "অনন্তরাত্রির বাসর ঘরে"র রূপ নিয়ে উপস্থিত হল। হত্যা এবং আত্মহত্যার ভয়াবহ পথ-দিয়ে মেয়েটি তার প্রেমের গভীরতার সাক্ষ্য উপস্থিত করলো আমাদের কাছে।

ছুটি গল্পে জ্বরতপ্ত ফটিকের প্রলাপের মধ্যে যখনই,—'মা এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি'—এই কথা কয়টি উচ্চারিত হয় সেই মুহূর্তেই আমরা যেন এক মহৎ ভাবলোকে প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়ে যাই। একটি ব্যক্তির মৃত্যুর শোক এক নিমেষেই যেন রসে পরিণত হয়ে যায়। গোটা গল্পটি একটা আশ্চর্য সাংকেতিকতায় পূর্ণ! আজন্ম প্রকৃতি ক্রোড়ে লালিত-পালিত ফটিক প্রকৃতিরই একটি অংশ। কিন্তু সভ্য জগতের শিক্ষায় তাকে শিক্ষিত করে তোলবার জন্য তাকে নিয়ে আসা হল ইট-কাঠ পাথরে গড়া—অর্থনীতির নিয়মে বাঁধা সহরে। হাঁপিয়ে পড়লো ফটিক—আবার সে চাইলো ফিরে যেতে যেখানে "প্রকাণ্ড একটি ধাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ তাইরে নাইরে না—" করিয়া উচ্চৈস্বরে স্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্মণ্য ভাবে ঘুরিয়া

বেড়াইবার সেই নদীতীরে দিনের মধ্যে যখন তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেই সব দলবদ্ধ উপদ্রব স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী, অবিচারিণী মা "যিনি তাঁর স্নেহসিক্ত কঠোর শাসন নিয়েছিলেন প্রকৃতির মতই সর্বংসহা। বাড়ির জন্য মন কেমন করলেই বাড়ি যাওয়া যায় না। সভ্য জগতের অনেক নিয়ম। স্কুলের ছুটির জন্য অপেক্ষা করতে হবে গৃহউন্মুখ বালক ফটিককে। কিন্তু স্কুলের ছুটির পূর্বেই যখন বাড়ী যাবার ছুটি পেল ফটিক তখন" ফটিকের মাতা ঝড়ের মতো ঘরে প্রবেশ করিয়াই উচ্চ কলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বহুকষ্টে তাঁহার শোকোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত করিলে তিনি শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিলেন—"ফটিক! সোনা! মাণিক আমার!" গল্প শেষ। মৃত্যু এসে ফটিককে মুক্তি দিল সংকীর্ণ জগত থেকে বৃহত্তর জগতের বুকে। এই গল্পটি পড়িতে গেলে বারবার মনের কোণে উঁকি যারে ছিন্নপত্রের সেই চিঠিগুলো যাতে কবি প্রকৃতির সঙ্গে নিজের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা বলেছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর আর্থিক ও সামাজিক বিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে বেড়িয়ে এল ঘোমটাখসা নারী যে আপন স্বরূপে আপনি ধন্যা। স্ত্রীর পত্র গল্প সেই মহীয়সী নারীর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এতদিন পর্যন্ত মেজবউ জানতেন তিনি অমুকের স্ত্রী পারিবারিক সম্পর্কের পরিচয়ই তার পরিচয়। কিন্তু আজ—"আমি তোমাদের মেজবউ। আজ পনেরো বছর পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেয়েছি আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে।" কিন্তু কি করে অভ্যাসের সীমাটানা জীবনে অভ্যস্থ মেজবউ জানতে পারলেন তাঁর মুক্ত স্বরূপ?

মেজবউ রূপসী এরূপ বিধাতার নিজের আনন্দে গড়া। ধর্মের সংসারে ওর কোনো দাম নেই। তাই সবাই অনায়াসেই ভুলে যেতে পেরেছেন তার রূপকে। যা সংসার ভুলতে পারতো না তা হল তাঁর বুদ্ধি—ঘরের বউয়ের যতটুকু বুদ্ধি দরকার বিধাতা তার চেয়ে তাকে কিছু বেশী বুদ্ধি দিয়েছেন। ফলে তাকে দুবেলা গাল খেতে হয়েছে 'মেয়ে জ্যাঠা বলে' মেজবউ কবিতা লিখতেন—মেজবউ কবি এ কথা ১৫ বৎসরের সাংসারিক জীবনে কেউ চিনতে পারে নি। নিজের ব্যক্তিত্ব, নিজের স্বকীয়তা সব কিছু বিসর্জন দিয়ে মৃণাল হয়েছিল মেজবউ। সংসারের পাকা বন্দোবস্তের

মাঝখানে ছোট একটুখানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এল একদিন।" বিধবা মায়ের মৃত্যুর পর মেজবউ-এর বড়ো জায়ের বোন বিন্দু তার খুড়তুতো ভাইদের অত্যাচারে তার দিদির কাছে এসে আশ্রয় চাইলে। সেদিন সবাই ভাবলে এ আবার কোথাকার আপদ। মেজবউ ভালবাসলেন বিন্দুকে নিজের সদ্যমৃতা কন্যার মত। বিন্দুও ভালোবাসলো মেজবউকে। এই ভালোবাসাতে নিজেকে জানলেন মেজবউ। মেজবউ লিখছেন—"বিন্দুর ভালোবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বরূপ দেখলুম। যা আমি জীবনে আর কোনো দিন দেখি নি। সেই আমার মুক্ত স্বরূপ। ...আর আমি তোমাদের ২৭নং মাখন বড়ালের গলিতে ফিরবো না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়ে মানুষের পরিচয়টা যে কি তা আমি পেয়েছি। আমার আর দরকার নেই।...(বিন্দুর) উপর তোমাদের যত জোড়ই থাক না কেন, যে জোরের অন্ত আছে। ও আপনার হতভাগ্য মানব জন্মের চেয়ে বড়। তোমরাই যে আপন ইচ্ছামত আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে তোমাদের পা এত লম্বা নয়। মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান সেখানে বিন্দু কেবল বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুতো ভায়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়, সেখানে সে অনন্ত···। মৃত্যুর বাঁশী বাজতে লাগলো কোথায় রে রাজমিস্ত্রীর গড়া দেয়াল কোথায় রে তোমাদের ঘোরো-আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া। কোন দুঃখ কোন অপমানে মানুষকে বন্দী করে রেখে দিতে পারে। ঐ তো মৃত্যুর হাতে জীবনের জয় পতাকা উড়েছে।

* * তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করিনে। আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।

তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলে। ক্ষণকালের জন্য বিন্দু এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে দেখে নিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যার চোখে ভালো লেগেছে সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখছেন। এইবার মরেছে মেজবউ।...আমিও বাঁচবো। আমি বাঁচলুম।" বিন্দু মরেছে কিন্তু

বেঁচেছে মেজবউ। বিন্দুর মৃত্যু তাঁর মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও অন্য নিরপেক্ষ নারীত্বকে উন্মেষিত—তাকে জোর দিয়েছে জরাজীর্ণ সংস্কারের মিথ্যে খোলসকে ভেঙ্গে আপন অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠ করতে। দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনের বাইরেও যে একটা আলাদা বৃহত্তর জগত আছে যে জগতে আরো যে একটি বিশিষ্ট এবং অনন্ত ভূমিকা আছে এ বোধ বিন্দুর মৃত্যুই তাকে এনে দিয়েছে। "পলাতকার-মুক্তি" কবিতার মেয়েটির নিজের বঞ্চিত-বিড়ম্বিত জীবনে মৃত্যুর আবির্ভাবে জেনেছিল—

'আমি নারী মহীয়সী,
আমার সুরে সুরে বেঁধেছে জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রাহীন শশী'—

মেজবউ বিন্দুর মৃত্যুতে সেই মহীয়সী নারীত্বকেই উপলব্ধি করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন 'মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়ছে।' তাই রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সহজেই মৃত্যুকে দেখেছেন নিরাবরণ অনাড়ম্বররূপে—শুভ্র নিরঞ্জন সত্যর মত। সেখানে কোনো ক্ষোভ নেই, দীর্ঘশ্বাস নেই। মৃত্যু রবীন্দ্রনাথে 'শোকের ঝড়' বইয়ে দেয় না। বর্ণনায় তাঁর অপ্রয়াসের নৈপুণ্যেই আমাদের বিস্ময় জাগে'।

'সম্পত্তি সমর্পণে'র যজ্ঞনাথের মৃত্যুদৃশ্যটি স্মরণ করুন।

"অবশেষে বৎসর চারেক পরে বৃদ্ধের মৃত্যুর দিন উপস্থিত হইল। যখন চোখের উপর হইতে জগতের আলো নিবিয়া আসিল এবং শ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইল তখন বিকারের বেগে সহসা উঠিয়া বসিল; একবার দুই হস্তে চারিদিক হাতড়াইয়া মুমূর্ষু কহিল—"নিতাই, আমার মইটা কে উঠিয়ে নিল।"

সেই বায়ুহীন, আলোকহীন মহাগহ্বর হইতে উঠিবার মই খুঁজিয়া না পাইয়া আবার সে ধপ্ করিয়া বিছানায় পড়িয়া গেল। সংসারের লুকোচুরি খেলায় যেখানে কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না সেইখানে অন্তর্হিত হইল। এর সঙ্গে মনে পড়বে কালীপদর মৃত্যুর কথা (রাসমণির ছেলে) খোকাবাবুর মৃত্যুদৃশ্য (খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন) কিংবা 'মা এখন আমার ছুটি হয়েছে, মা এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি, না মাসি, ও শাল শাল নয়, ও শাল মিথ্যে ও শাল ফাঁকি'—প্রভৃতির কথায় যখন নায়কের মৃত্যু হয় তখন আমরা অবাক হয়ে দেখি রবীন্দ্রনাথ কত সহজে মৃত্যুকে—সত্যকে গ্রহণ করেন।

জীবনের নানা বিচিত্র দিক যেমন বারবার গল্পগুচ্ছে উঁকি দিয়েছে তেমনি মৃত্যুর আনাগোনাও বারবার ঘটেছে গল্পগুচ্ছে। এ মৃত্যুর কোনটাই

অশ্রুজলে আকুল নয়—সিক্ত নয় বেদনায়। কারণ এ মৃত্যু শুধু জীবনের শেষ নয়—জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা।—'পূর্ণ পরিণতি'। রবীন্দ্রনাথের মনেই এ মৃত্যুর জন্ম। মৃত্যুকে এই দৃষ্টিতে দেখতে হলে রবীন্দ্র-প্রতিভার মায়া-অঞ্জন চোখে মাখিয়ে নিতে হয়। সবার পক্ষে এত সংযত, এত শান্তভাবে মৃত্যুকে দেখা সম্ভব নয়। গল্পগুচ্ছের নায়ক-নায়িকা প্রায় ক্ষেত্রেই এসেছে মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই আমাদের জানা আছে যে এ সমাজ মৃত্যুকে অন্য চোখে দেখে। এদের কাছে মৃত্যু অনিবার্য হলেও জীবনেরই আর এক নাম নয়। মৃত্যু এদের কাছে শ্যাম সমান নয়—ভয়াবহ। কিন্তু তবুও রবীন্দ্রনাথ জীবনের পূর্ণপরিণতি হিসেবে মৃত্যুকে গল্পগুচ্ছে এনেছেন এবং এমনভাবে এনেছেন যাতে আমরা 'শিল্পের একটি বিশুদ্ধ রূপ' দেখতে পাই। কংকাল গল্পে মেয়েটির কাছে যদি মৃত্যু 'অনন্ত-রাত্রির বাসরঘর' রূপে না ধরা পড়তো তবে শশিশেখরের হত্যা এবং মেয়েটির আত্মহত্যা—আইন ও আদালতের বিষয়বস্তু ছাড়া আর কিছু হতে পারতো কি? প্রায় প্রত্যেকটি গল্পে মৃত্যু এমনি অনিবার্য ভাবে, এমনি আবিলতা-শূন্য হয়ে এসেছে। ব্যতিক্রম শুধু 'মাল্যদান' আর 'মাষ্টারমশাই' গল্প দুটি। মাল্যদান গল্পে কুড়ানির মৃত্যুর কোনো প্রয়োজন ছিল কি? মৃত্যু ছাড়াও অন্যভাবেও যতীন কুড়ানির ভালোবাসাকে বুঝতে পারতো—মৃত্যু-অনিবার্য নয়। আর অনিবার্য নয় জন্য গোটা গল্পটি মেলোড্রামাটিক হয়ে পড়েছে। 'মাষ্টারমাশাই' গল্পে মাষ্টারমশায়ের মৃত্যু অপরিহার্য। অপমান অন্যায়ে পীড়িত মাষ্টারমশায়ের এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু মৃত্যুকে মাষ্টারমশাই যে-ভাবে উপলব্ধি করেছেন তাতে আপত্তি উঠতে পারে। ভাবতে অবাক লাগে মাষ্টারমশাই মৃত্যুকে এ-ভাবে উপলব্ধি করলেন কি করে; বিশেষ করে যখন তাঁর মানসিক শান্তি বিচলিত—সমস্ত দিন পর্যায়ক্রমে বেদনার উত্তেজনা ও অবসাদের অসাড়তা যখন তাকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। মৃত্যুকে আমরা **sublimate** করতে পারি তখনই যখন আমাদের মনের স্থৈর্য অক্ষুণ্ণ থাকে। পাশাপাশি তুলনা করা যাক 'শেষের রাত্রি' গল্পটি। যতীন মৃত্যুশয্যায়। এই মৃত্যুশয্যাতেও যখন সে মাসির কাছে শুনতে পেল যে মণির ভালোবাসা পেয়েছে—তখন সে এক আশ্চর্য প্রশান্তি অনুভব। সেই চরম আনন্দ মুহূর্তে মৃত্যুও তার কাছে অপরূপ হতে দেখা দিয়েছে।

"অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইয়া যতীন দেখিতেছিল, তাহার মণিই

আজ মৃত্যুর বেশ ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে আজ অক্ষয় যৌবনে পূর্ণ। সে গৃহিনী, সে জননী, সে রূপসী, সে কল্যাণী তাহারই এলোচুলের উপরে ঐ আকাশের তারাগুলি লক্ষ্মীর স্বহস্তের আশীর্বাদের মালা। তাহাদের দুজনের মাথার উপরে এই অন্ধকার মঙ্গলবস্ত্রখানি মেলিয়া ধরিয়া আবার যেন নূতন করিয়া শুভদৃষ্টি হইল। রাত্রির এই বিপুল অন্ধকার ভরিয়া গেল মণির অনিমেষ প্রেমের দৃষ্টিপাতে। এই ঘরের বধূ মণি, এই একটুখানি মনে আজ বিশ্বরূপ ধরিল; জীবন-মরণের সংগমতীর্থে ঐ নক্ষত্রবেদীর উপর সে বসিল; নিস্তব্ধ রাত্রি মঙ্গলঘটের মতো পূণ্য ধারায় ভরিয়া উঠিল।" কিন্তু তারপর যখন মোহ ভেঙ্গে গেল—যখন সে জানতে পারলো মণি তাকে ভালোবাসে না—তখন সে মৃত্যুকেই চেয়েছে—কিন্তু যে মৃত্যু ভালোবাসার রঙে রাঙানো নয়—ভালোলাগা দিয়ে তৈরী নয় সে মৃত্যু জীবনের শেষ—**annihilation**! অপমানকর বেদনাদায়ক আত্মপ্রবঞ্চনা যখন তাঁর নিজের কাছেই ধরা পড়লো তখন মৃত্যুকে অপরূপ করে দেখা সম্ভব নয়, স্বাভাবিক নয়। কিন্তু মাষ্টারমশাই ক্ষেত্রে এই স্বাভাবিকতা বিপর্যস্ত হয়েছে বলেই মনে হয়। মৃত্যুর ঐ উপলব্ধি মাষ্টারমশায়ের নয় রবীন্দ্রনাথের। অর্থাৎ মাষ্টারমশায়ের ব্যক্তিত্বকে ঠেলে ফেলে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বই ওখানে প্রবেশ করেছে এবং শিল্পের দিক থেকে এ প্রবেশ অনধিকার প্রবেশ।

রবীন্দ্রনাথ গল্পগুচ্ছে সৃষ্টিকর্তার পরম বিস্ময়ের ধন অনির্বচনীয় জীবনকে দেখিয়েছেন। মৃত্যুকেও দেখিয়েছেন। জীবনের যে অপরূপ মাধুর্য তাকেও চিনেছি আমরা। মৃত্যুর যে মহিমান্বিত রূপ সে রূপকেও চিনেছি। দুইয়ে কোন পার্থক্য নেই।

দেখেছি ক্লান্ত জীবনের যত গ্লানি ঘুচেছে মরণ-স্নানে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"আমি জানি সত্য তাই
মরণ মাঝে অমর জাগে অমৃতের তত্ত্ব তাই।"

—গল্পগুচ্ছ এই অমৃতেরই তত্ত্ব।

রবীন্দ্রনাথের কথাশিল্প

জিতেন্দ্র ঘোষ

জীবন-সায়াহ্নে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে আবিষ্কার করে বলেছিলেন—"একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে—সে আর কিছু নয়, আমি কবি মাত্র।" তাঁর এই আত্মপরিচয়লাভ রটনা হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ যদিও ঘটনায় তর্ক-কণ্টকিত।

এককালে কবিরা ছিলেন পদ্যবাহন। তাঁদের কাজ ছিল "ছন্দের পাড়ের মাঝে মাঝে মিলের চুমকী" গাঁথা। তখনও গদ্যের প্রাঙ্গণ কবির 'আন বধূঁয়ার আঙিনা' হয়ে ওঠে নি। তখন বাঁশি বাজত কানে-কচিৎ বা মনে। তারপর দেখা দিল কালান্তর, পদ্যের কালান্তক হয়ে। "গদ্য এলো" বাঁধা "ছন্দের বাইরে জমালো আসর।" গড়ে উঠলো "গদ্যরাণীর মহাদেশ।"

এ মহাদেশে প্রথম বাঙ্গালী বাস্তকার বঙ্কিমচন্দ্র—এলেন ঈশ্বরগুপ্তের পাতায় হাত মক্স করার দায় চুকিয়ে। কিন্তু কবিতা-কল্পনার আফিম-ফুলি-নেশা যাকে একবার ধরে তাকে আর ছাড়ে না। অন্ততঃ বঙ্কিমচন্দ্রকে ছাড়ে নি। রোমান্সের আলো-আঁধারীতে তাঁর গদ্যের সওয়ার চলতে গিয়ে শুনেছে—"পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?"

রবীন্দ্রনাথেও এরই উত্তর-সাধনা। 'হৃদয়-অরণ্যে'র পথে এসে তিনি পৌঁছুলেন "বৌঠাকুরাণীর হাটে" ইতিহাস যেখানে অপ্রয়োজনের প্রয়োজন-আশ্রয় মাত্র, "বৈচিত্র্য কোলাহলময় রঙ্গভূমি ছায়ার মত অস্পষ্ট।" কবি নিজেই বলছেন—"তখন···জীবনের অভিজ্ঞতাও ছিল অল্প, তাই গদ্য পদ্য যাহা লিখিতাম তাহার মধ্যে বস্তু যেটুকু ছিল ভাবুকতা ছিল তাহার বেশি। অথচ বাস্তবতাবর্জিত উপন্যাস কায়াহীন ভৌতিক অস্তিত্বের সামিল। "রাজর্ষি"তেও "লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি" (এ কথাটি অবশ্য একই কাহিনীর নাট্যরূপ "বিসর্জন" সম্পর্কে লিখেছিলেন কবি। তবে এটি উপন্যাসপক্ষেও প্রযোজ্য)। উদয়াদিত্যের বিষাদ-ম্লান মুখচ্ছবি, বিভার বিড়ম্বিত করুণ জীবন, জয়সিংহের দ্বিধাভিন্ন অন্তর, বসন্ত রায়ের উদার মুক্ত-প্রাণের সরল

আনন্দ গোবিন্দমাণিক্যের স্নেহ-কোমল রাজহৃদয় রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের উপযোগী বিষয়। সারাজীবন যিনি বস্তু-জগতের অর্থহীন কলকোলাহল এবং বাহ্য ঘটনাপুঞ্জের বহু বৈচিত্র্যের পশ্চাতে স্নেহপ্রেমপ্রীতিপূর্ণ উদার প্রমুক্ত প্রাণের অনবচ্ছিন্ন অখণ্ড শান্তির এষণায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাঁর পক্ষে এ-ইই স্বাভাবিক। যৌবন-তরুণ দিনগুলিতে জীবনকে তাঁর মনে হতো—"এ শুধু অলস মায়া!" গল্প রচনাতেও তাই চলেছে "মায়ার খেলা"। লিরিকের সঙ্গে কবির জীবনে আড়ি কখনও হয় নি! রাজর্ষির অনেক দিন পরে হলেও তাঁকে লিখতে তাই হয়েছে—"অন্ত আর এলার ভালবাসার বৃত্তান্তটা লিরিকের তোড়া রচনা।"

তারপর কাল এগিয়েছে আরও ষোলটি বছর। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে জমা হয়েছে অনেক কিছু। বাংলাদেশে শেষ হয়ে গেল প্রাচীন সামন্ত যুগ। বঙ্কিমের সমকালে উদ্ভূত মধ্যবিত্ত সমাজ এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। সে সমাজের বিরোধাকীর্ণ জীবনাদর্শের বিচিত্র সমস্যা, কায়িক সুখ ও অধ্যাত্ম দুঃখপীড়া, সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতার হতাশবেদনা, বিষাদের হাসি ও আনন্দের অশ্রু, স্বার্থের কলহ, সমাজ-শাসন ও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য, বিদেশপ্রীতি ও স্বজাত্যবোধ, ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য-শাস্ত্রাচারের সংঘাত, সামাজিক রাজনীতি ও রাষ্ট্রনৈতিক সমাজচিন্তা সেদিনে প্রতিভামাত্রেই সংক্রামিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথেও এ সংক্রমণ প্রতিহত হয় নি। "চোখের বালি" এই কালান্তরের স্বীকৃতির সূচনা। এখন রবীন্দ্রনাথ গল্পে সমাজ-সচেতন, উপন্যাসে আত্ম-চেতন। স্বচ্ছন্দগতি, নিস্তরঙ্গ নদীপ্রবাহের অন্তর্লীনস্রোতধারার মত মধ্যবিত্ত মানসের সংগুপ্তধারার বিশ্লেষণ এ-কালে রবীন্দ্রনাথের গদ্যশিল্পের উপজীব্য।

বঙ্কিমচন্দ্র ইতিপূর্বেই তাঁর সামাজিক উপন্যাসে তথ্যনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সমাজ পরিবেশ, তাঁর স্বভাবের কবিধর্ম, শিক্ষানুশীলনের প্রভাব এবং জাতীয় দীক্ষার আদর্শ অবশ্য শেষপর্যন্ত তাঁকে তত্ত্বভূয়িষ্ট করে তুলেছিল। হিতবাদী দর্শনের তাড়নায় বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলাকে বিসর্জন দিয়ে, রোহিণীকে হত্যা করে কৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যায় সান্ত্বনালাভে উদ্যোগী হয়েছিলেন। শ্রমবিমুখ স্বচ্ছন্দজীবন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর নিরুত্তাপ-জীবনে মনোভাবের বিশ্লেষণ-বিলাস ভাবপ্রবণ কবিচিত্তের সঙ্গত ধর্ম। মনোবিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্র ইংগিতাশ্রয়ী। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে প্রাগ্রসর। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের জীবনদর্শন রোমান্সের পরকলার মধ্যস্থতায়—রবীন্দ্রনাথে মননের

অনুবীক্ষণ-ক্ষমতার সহায়তায়। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র বিস্তৃতকালে ব্যাপ্ত ঘটনার সংক্ষিপ্তসার পরিবেশন করেছেন অর্থগর্ভ সংকেতবাক্যে; রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিনের বিরোধগ্লানির সবিস্তার বর্ণনায় চিত্রটিকে করেছেন আরও বেশী পূর্ণাংগ। পুঞ্জীভূত অথচ সুনির্বাচিত তথ্য সাহায্যে তিনি পাঠক-মনে বাস্তবতার ভাবটি করেছেন দৃঢ়াঙ্কিত।

'চোখের বালি' মনোবিকলনে মন্থর গতি। এ কাহিনীর দৈর্ঘ নেই, প্রস্থ আছে। উপন্যাসরচনাকালেও রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের স্বভাব ত্যাগ করেন নি। চরিত্রবহুলতায় তাঁর কাহিনীর সমৃদ্ধি নেই। দুটি চারটি চরিত্রের ভাব ও ভাবনার টানাপোড়েনে কাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে। ভিড়ের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ ছিল নেতিবাচক। বহুল-চরিত্র য়ুরোপীয় উপন্যাসগুলি তিনি বিশেষ পছন্দ করতে পারতেন না এই কারণেই। আপন কবি-কৃতির পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে লিখেছিলেন—

বাক্যের যে ছন্দোজাল শিখেছি গাঁথিতে
সেই জালে ধরা পড়ে
অধরা যা চেতনার সতর্কতা ছিল এড়াইয়া
অগোচরে মনের গহনে।

'চোখের বালি'তে রবীন্দ্রনাথ মহেন্দ্র-বিনোদিনী-বিহারীর মনের গহনকে সম্পূর্ণ নিরাবরণ ও প্রত্যক্ষগোচর করেছেন। মহেন্দ্র-বিনোদিনীর কাহিনীটি প্রথাগত সমাজনীতির নিরিখে বিপজ্জনক। উপন্যাসের উপাদান—বিবাহিত বয়স্ক ব্যক্তির অন্য নারীতে রতি। যৌনতার তরঙ্গ-প্রাবল্যে সুরুচিতরী বানচাল হওয়ার আশঙ্কা এ-সব ক্ষেত্রে দেখা দেয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকে দক্ষ নাবিকের মতোই কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। রিপুকে উত্তেজিত করে আমাদের রিরংসা-উন্মত্ত করতে রবীন্দ্র-সাহিত্য অপারগ; প্রবৃত্তির সংযম রবীন্দ্র-রচনার চরিত্র। পুষ্পধনু যোগীশ্বরকে পার্বতীসহায় অকাল বসন্তের সমাগমে মুহূর্তের জন্য বিচলিত করেছে বটে কিন্তু মুহূর্তপরেই চারিত্রতেজে ভস্মলীন হয়ে গেছে। "একদিন বিনোদিনী তাহার তৃষিত বুভুক্ষিত দেহচিত্ত একেবারে মহেন্দ্রের হাতে প্রায় তুলিয়াই দিয়াছিল, কিন্তু পরমুহূর্তেই শ্লেষবিদ্ধ হইয়া নিজেকে সংকুচিত করিয়া লইয়াছিল, আরও একদিন সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এলাহাবাদে যমুনার নির্জন পরিবেশে বিনোদিনী বিহারীকে একান্তভাবে নিজের

করপুটের মধ্যে পাইয়াছিল।" এ সমস্তই গল্পের চরম মুহূর্ত, কিন্তু এই সব চরম মুহূর্তেও লেখক অবিচলিত। উত্তেজিত মুহূর্ত আছে প্রচুর, কিন্তু লেখকের মনে নেই উত্তেজনা। নেই বলেই যখন এলা "মেঝের থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অতীনকে বার বার চুমো খেয়ে খেয়ে বললে "মারো এইবার মারো।" "ছিঁড়ে ফেললে বুকের জামা"—তখনও "অতীন পাথরের মূর্তির মতো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।" এলা বললে একটুও ভেবো না অন্তু। আমি যে তোমার·····নাও আমাকে। তখনও "অতীন কঠিন সুরে বললে'—যাও এখনই শুতে যাও, হুকুম করছি শুতে যাও।' অতীনকে বুকে চেপে ধরে এলা বলতে লাগলো"—অন্তু, অন্তু, আমার, আমার রাজা আমার দেবতা, তোমাকে কত ভালোবেসেছি আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ করে তা জানাতে পারলুম না। সেই ভালোবাসার দোহাই···।" তখন "অতীন এলার হাত জোর করে ধরে তাকে শোবার ঘরে টেনে নিয়ে গেল, বললে 'শোও, এখনই শোও। ঘুমোও।' জান্তবজীবনকে এমন করে ঘুম পাড়ানো যায় কি? বাস্তবে, লৌকিক জগতের স্থূল দেহের কামনার অধিকারে এমনটি সম্ভব না হলেও কাব্যের অলৌকিক বাঙ্ময় জগতে নিশ্চয়ই সম্ভব। অন্ততঃ কবি-ঔপন্যাসিক লেখক পাঠককে তাই সবিশ্বাসে গ্রহণ করাতে চেয়েছেন।

যেমন 'চার অধ্যায়ে' তেমনি 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বিপজ্জনকের দিকে পা বাড়িয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। দাম্পত্য-জীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক নিষ্ঠার মধ্যে যে বন্ধন-সংকীর্ণতা আছে, পতি-পত্নীর যৌথ-জীবনকে ঘিরে সতীত্ব-সংযমের যে ভাবপ্রধান ধ্যান সমাজ-মানসে নিহিত হয়ে আছে, তার বিরুদ্ধে প্রলোভনের মেঘে বিদ্রোহের বিদ্যুৎ সঞ্চার করেছেন কবি। কিন্তু সে মেঘগর্জন করেই ক্ষান্ত হয়েছে, বর্ষণ করে নি বিদ্যুৎজ্বালা আলোকের অন্ধতায় বিমূঢ় করেছে, কিন্তু বজ্রাঘাতের সর্বনাশ আনে নি। রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য সংযম ও সুরুচির সঙ্গে এই বিপজ্জনক বিষয়ের সীমান্তেই আগুন নিয়ে খেলা করেছেন; অগ্নিবিবিক্ষু পতঙ্গের মতো নরনারীর হৃদয়কে দেহ-কামনার উদ্দীপ্ত অগ্নিশিখার চারপাশে প্রদক্ষিণ করিয়েছেন, এক ভীষণ মধুর জীবন-যন্ত্রণায় তাদের চিত্তে কেন্দ্রাতিগ উৎক্ষেপের উন্মাদন জাগিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীকুমারবাবুর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"এই কাণ্ড ভীষণ আদর্শের মোহ যে হতভাগ্যকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার

মানসিক অবস্থা অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির ন্যায় প্রতিরুদ্ধ বেগ চঞ্চল ও একটা অপ্রত্যাশিত ভয়ানক পরিণতির জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। সমস্ত জীবনটা এক মুহূর্তে কেন্দ্রচ্যুত হইয়া কক্ষভ্রষ্ট ধূমকেতুর ন্যায় একটা দুর্নিবার মত্ত ঘূর্ণিপাকের মধ্যে আলোড়িত হইতে থাকে; চক্ষুর সম্মুখে নূতন নূতন বিভীষিকা আলেয়ার আলোর মতই অস্থিরভাবে কাঁপিতে থাকে, জীবনের পরম আশ্রয় ও একান্ত নির্ভরগুলি ধূলিসাৎ হইয়া যায়—যাহা কিছু জীবনের আদর্শ ও সাধনার লক্ষ্য ছিল সমস্তই অর্থহীন কুসংস্কারে পরিণত হইয়া পড়ে। একদিকে চরম সার্থকতার স্বর্গ ও অপরদিকে পতনের অতলস্পর্শ গহ্বর তাহাকে আকর্ষণ করিবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিতে থাকে।" কিন্তু পতনের মুখেই রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব কৌশলে টাল সামলিয়ে উঠেছেন 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর' পথের তিনি কুশলী যাত্রী। ঊনবিংশ শতকের নবোদ্ভিন্ন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ কী প্রচণ্ড আক্ষেপে প্রাচীন প্রচলিত সমাজ-মানসাদর্শকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছিল এবং মধ্যবিত্ত সমাজ আপন স্থিতিসংস্থাপকতার গুণে কেমন সহজেই তার অভিঘাত আপনার মধ্যে সংহরণ করেছিল রবীন্দ্রনাথের রচনা তারই অভিজ্ঞান। সমাজ-সমস্যার এমন বস্তুনিষ্ঠ সহৃদয় বিশ্লেষণ বাংলা কথাসাহিত্যে এই প্রথম। মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যে'র 'তারা' নারী-ব্যক্তিত্বের সমাজ-শাসন-মুক্ত স্ফূর্তি ও যৌনস্বাধীনতার যে দাবী জানিয়েছিল, সনাতনপন্থী বঙ্কিম 'রোহিনী'কে তা দিতে অস্বীকার করলেও রবীন্দ্রনাথ 'রোহিনী'র বিবর্তিত রূপ 'বিনোদিনী'কে তা আংশিক দিতে পেরেছেন। 'চতুরংগে'র 'দামিনী'তে যে বিদ্যুৎবহ্নি আন্তর রসাবেশে আর্দ্র, 'যোগাযোগে'র কুমুতে যা স্থিরদীপ্তি 'ঘরে বাইরে'র বিমলাতে তারই তীক্ষ্ণপ্রকাশ উদ্ধতরূপে। এ-সব ক্ষেত্রে সনাতন সমাজ-চিন্তা শেষ পর্যন্ত আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছে কারণ তা ইতিমধ্যেই সংস্কারে পরিণত হয়ে মর্মমূলে দৃঢ়লগ্ন হয়েছে।

নারীর যে রূপে 'বিষবৃক্ষের'র মুঞ্জরণ, তা আধুনিক অনাধুনিক সকল দেশের সাহিত্যেই স্ব-প্রকাশ। বঙ্কিম নিষিদ্ধ ফলাস্বাদের শোচনীয় পরিণতি তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাসে। বঙ্কিমের পুরুষ চরিত্র আদমের মতোই মহৎ ও মূঢ়ত নারী ঈভের মতই সরলা, প্রবৃত্তি-পরবশ। ইমোশনের পিছল পথে বঙ্কিমের পদচারণা—প্রতাপপাখীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করার অভিপ্রায়ে শৈবলিনী লরেন্স ফষ্টরকে অবলম্বন করে, মতিবিবি আপনার

অলঙ্কার সপত্নী কপালকুণ্ডলাকে স্বহস্তে পরিয়ে দেয়, কপালকুণ্ডলাকে সিকতাভূমির মোহ-আকর্ষণ দেয় ঘরছাড়ার হাতছানি—শ্রীর অদর্শনে সীতারাম জয়ন্তীকে পাশবজিঘাংসায় লাঞ্ছিত করে, জ্ঞানী চন্দ্রশেখর নিজের হাতে প্রাণ-প্রিয় পুঁথিপত্র জ্বালিয়ে দেন, সূর্যমুখীর শূন্যকক্ষে আলেখ্যদর্শনে বর্ষীয়ান্ নগেন্দ্রনাথ বালকের ন্যায় ক্রন্দন করেন, কুন্দ আত্মঘাতী হয়, গোবিন্দলাল ভ্রমরের স্বর্ণমূর্তি স্থাপনা করে। ভাবোদ্বেল অন্ধগতি—তবু সে পথে বেরিয়ে জীবন শূন্য হাতে ফিরে আসে না। তার কর্মের শায়ক কোন একটা লক্ষ্যভেদ করবেই—তা আদর্শের দ্যুলোকই হোক বা আদর্শ-চ্যুতির গ্লানিময় অধোলোক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে জীবনের এ বিচিত্র বাস্তব-চারণা অদৃষ্ট। কাব্যে যে রবীন্দ্রনাথ শাশ্বত-সত্য-সৌন্দর্যে সহজ-সমাহিত, উপন্যাসে তিনিই intellectual, tantalising. লোভনীয় নিষিদ্ধফল মোহনীর হয়ে চোখে ধরা দেয়, কিন্তু দেহসীমায় আস্বাদ মুহূর্তে—

থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকালতরে। পরক্ষণে ভূমিপরে
জানুপাতি বসি, নির্বাক বিস্ময়াভরে
নতশিরে পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা উপচার
তূণশূন্য করি।

রবীন্দ্রনাথে মন নয়—মনন। তাঁর জীবনের একটা আদর্শ ছিল সর্ব-অবস্থাতেই এমনকি ঈশ্বর সঙ্গলাভের মুহূর্তেও "চিত্ত রবে অমত্ত গম্ভীরে।" এই আদর্শেই রবীন্দ্র-সাহিত্যে এত অহংকার। একদা তিনি স্বীকারও করেছিলেন যে তাঁর রচনার চরিত্রেরা সকলেই 'রাবীন্দ্রিক'। 'গোরা'কে বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে পুরুষ চরিত্র নেই, 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাটে'র প্রতাপাদিত্য কিংবা 'যোগাযোগে'র মধুসূদনের মত দু'একটা পুরুষ চরিত্র আছে বটে। বাকী সবই—'সন্দীপ, নিখিলেশ, এলা, অতীন, শচীশ, অমিত, লাবণ্য—কথা বানাবার কল। এদের জীবন যেন ভাবের ফানুস, কথার বাষ্পে ভরা 'বুদ্ধিবৃত্তির অতিরেক' রবীন্দ্রনাথের শেষ কয়েকটি উপন্যাসোপম রচনার চরিত্রলক্ষণ। এ জগতের নরনারী কথা বলার আনন্দেই কথা বলে—আপনার বাক্যচ্ছটায় তারা আপনিই মুগ্ধ। আসলে এরা কবি রবীন্দ্রনাথেরই

এক-একটি সংস্করণ। এদের নামের আড়ালে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজের সঙ্গে কথা বলেছেন—নিজেকেই দেখতে চেয়েছেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। 'মিতা' গল্পের 'শেষের কবিতা'য় পরিণতি লাভ তারই নির্দেশনা। এ সব রচনায় "সম্মুখেতে কষ্টের সংসার নেই, আধিভৌতিক দুঃখ-দৈন্যের এখানে প্রবেশ নিষেধ। এরা তাঁর 'নরেন মিটার'এর মতই—"য়ুরোপ ফেরতা, জমিদারের ছেলে, আয়ের জন্য ভাবনা নেই, ব্যয়ের জন্যও।" এখানে রচনার 'আঙ্গিকে ফুটেছে চিত্রকল্পের বাহার।' 'ভূমিজ আভিজাত্য এখানে নেপথ্যে বিরাজমান, মধ্যবিত্তের সৌখীন জীবন-বিলাস আকাশ-কুসুম চয়নে ব্যস্ত নিশীথে স্বপন বপনের পর। 'এইজন্য উপন্যাস' রচনায় রবীন্দ্রনাথের তেমন স্ফূর্তি হয় নি, যেমনটি হয়েছে ছোট গল্পে। ছোট গল্প লেখাই তাঁর ধাত। সাধারণ জীবন-যাত্রার বিবরণ এ সব উপন্যাসে নেই—এ সব পাত্র-পাত্রীকে য়ুনিভার্সিটির আঙ্গিনায় কিংবা কফি-হাউসে ঢুঁড়তে হবে। শ্রীকুমারবাবু মন্তব্য করেছেন—"রবীন্দ্রনাথের সহিত আমাদের প্রকৃত সামাজিক জীবনের যেন একটা শোভন অন্তরাল ও সূক্ষ্ম যবনিকার মধ্য দিয়া সংশোধিত হইয়াছিল—সেইজন্য তিনি ইহাকে সম্পূর্ণ আবরণহীন ও নগ্ন করিয়া দেখেন নাই—ইহার আকাশ-বাতাস, ইহার জীবনযাত্রাও সমস্যা, ইহার হৃদয়হীনতা ও বিরলমাধুর্য সকলেরই উপর একটা স্বচ্ছ মায়া বিস্তার করিয়া দিয়াছেন।"

পরিপার্শ্বের প্রতি যে সহানুভূতি ঔপন্যাসিকের জীবনবোধকে পুষ্ট করে, স্ব-সমাজের সঙ্গে যে একাত্মবোধ দেশজ-জীবন বিচারে দৃষ্টিকে মোহমুক্ত করে, রবীন্দ্রস্বভাবে তা অপ্রতুল। তাঁর অনুভূতি মহৎ কবিজনোচিত প্রাখর্যে সর্বনিভৃঃ কিন্তু সহানুভূতি ততখানি অগ্রসর হতে পারে নি। সহানুভূতির অভাবেই তাঁর উপন্যাস রচনা চেষ্টা যথেষ্ট সরল নয়। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন—"আমাকে যারা ভাব-বিলাসী বলে গাল দেয়, তাদের কথাটার মধ্যে খানিকটা সত্য আছে। আমি ভাল কাজও যদি করি, সে ভাবের প্রেরণায়, চরিত্রের প্রেরণায় নয়—এইজন্যেই প্রশংসা আমি পেয়েছি, মানুষকে পাই নি। আমি আমার জনবহুল কাজের মধ্যে একলাই রয়ে গেছি। এই একাকীত্ব আমার পক্ষে সুখকর নয়.....কিন্তু যা দিয়ে মানুষকে পাওয়া যায় সেই সম্বল আমার প্রচুর নেই।" (শ্রীমতী রাণীকে লেখা পত্রাংশ)। একাকীত্বের সাধনায় মোক্ষলাভ হতে পারে, মিত্রলাভ নয়,

বরং সুহৃদ ভেদ হয়। তাই অরূপের আরাধনায় তিনি স্বয়ংসিদ্ধ হয়েছেন কিন্তু সমরূপ তাঁর হয়ে উঠেছে সাধ্য।

অবশ্য 'গোরা' এই প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রম। এই একটি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সমকালীন বাঙ্গালী জীবনের যে সমগ্র রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন, সেই সমগ্রতার দৃষ্টি বাংলা উপন্যাসে আজও অদ্বিতীয়। কবির এই সাফল্যের কারণ ছিল যে এখানে রবীন্দ্রনাথ আপনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করবার সুযোগ পেয়েছেন। সমসাময়িক বাংলাদেশে স্বাধীনতাস্পৃহার উন্মেষ এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে ও বাহিরে হিন্দুসমাজের সঙ্গে ধর্ম ও সমাজ আদর্শ নিয়ে, ধর্মগত আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে যে তর্ক-বিতর্কের উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছিল তার আঁচ রবীন্দ্রনাথের নিজের গায়েও লেগেছিল। এবার সমস্যা শুধু 'পরস্মৈতি' নয় 'মমেতি'ও বটে। এই বিতণ্ডায় কবি বেশ বড় একটা ভূমিকায় সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। 'গোরা'র জীবনদর্শন প্রকৃত-পক্ষে রবীন্দ্রনাথেরই। গোরা ও সুচরিতার, বিনয় ও ললিতার বিবাহ সম্বন্ধে যে সামাজিক সংস্কার আচার-পদ্ধতি এবং নরনারীর যৌন-ব্যক্তিত্ব-বোধের বিরোধ উদ্ভূত হয়েছে, তা বাংলা দেশের তৎকালিক সমাজ চেতনামূলক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সর্বাধিক বাস্তব রসাশ্রিত এই উপন্যাসেও রোমান্সের রঙ লেগেছে, যেমন লেগেছে 'নৌকাডুবি'তে। কারণ রবীন্দ্রনাথ জন্ম-রোমান্টিক, রসতীর্থ পথের পথিক'।

বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও নারী চরিত্রই সমধিক সমুজ্জ্বল। 'চোখের বালি'তে সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু বিনোদিনী যেমন 'নৌকাডুবি'তে কমলা, (কমলার কাহিনীর বিষয়টি অবশ্য ভিন্ন—ভ্রান্তিবিলাসের ভিত্তিতে উপস্থাপিত)। বিনোদিনীই বিহারীর ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন করেছে। তেমনি বিনয়ের ব্যক্তিত্বের উদ্বোধনের জন্য প্রয়োজন ছিল ললিতার। বিমলা তো মক্ষিরাণী সন্দীপ তাকে ঘিরেই গুঞ্জন তুলেছে 'লাভ' ও লোভের। দামিনী স্ব-নামেই প্রকাশ। কুমুর কোমল কারুণ্যেই মধুসূদনের মধ্যেকার 'আদিম জন্তুটার' এত বিক্রম। লাবণ্যর যত কথা সব গান হয়ে গেছে। কিটির পালিশ করা গালের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়া জলই তো আধুনিক পালিশ করা সভ্যতার চোখের জল। তাকে উপলক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর দুই নারীতত্ত্ব অনবদ্য ভাষায় আমাদের শুনিয়েছেন—"কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল,

প্রতিদিন তুলবো, প্রতিদিন ব্যবহার করবো। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা, সে রইলো দীঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।"

দুই নারী তত্ত্বের জৈবিক রূপ প্রখর হয়েছে 'দুই বোন' আর তারই উল্টো পিঠ 'মালঞ্চে'। দেহ-ক্ষুধার এমন উলঙ্গ প্রকাশ যেন নিতান্তই অরাবীন্দ্রিক। ভব্যতার অন্তরাল এখানে সম্পূর্ণই খসে পড়েছে, বিশেষ করে মৃত্যুমুখী নীরজা যখন সরলাকে বলছে—"জায়গা হবে না রাক্ষসী। পালা, পালা পালা, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলবো তোর রক্ত।" এ চিত্র ঈর্ষা-ক্ষিপ্ত নারীর স্বাধিকার রক্ষার সুস্পষ্ট সংকল্প একান্তই নগ্ন করেছে, রাবীন্দ্রিক শোভন সুরুচির পালিশ ঘুচিয়ে দিয়ে। কঠিন রোগের প্রাণশঙ্কিল আক্রমণে বিপর্যস্ত কবির সজ্ঞান লুপ্ত করে 'অকৃতার্থ অতীতের অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়ামূর্তি, প্রেতভূমি হতে নিয়েছে' কবির সঙ্গ আর তারই ফলে—তাঁর "বিকারের রোগীসম অকস্মাৎ ছুটে যেতে চাওয়া আপনার আবেষ্টন হতে।" নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্ক বিচারে ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিভঙ্গীর শাসনবিমুখ হয়ে যে কবি বৈষ্ণবের স্বকীয়া ও পরকীয়া তত্ত্বের অপরূপ সুষমায় প্রেম পর্যালোচনা করতে অভ্যস্ত তাঁর এ কী পরিণতি! কাব্যের জীবনে যে আক্ষেপ তাঁর ছিলো—

"সুকুমারী লেখনীর লজ্জা ভয়—
যা পুরুষ, যা নিষ্ঠুর, উৎকট যা, করে নি সঞ্চয়
আপনার চিত্রশালে……"

সে চিত্রশালার সংগ্রহ পূর্ণ হলো কথাসাহিত্যে। কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন **beauty intellectual** এর সন্ধিৎসু। কথাসাহিত্যে অচিরার বনামে জানিয়েছেন "ভালোবাসা ইম্পার্সোনাল" হতে পারে, তার "কোন আধারের দরকার নেই।" "মেয়েদের সম্পদ হৃদয়ের, যদি তার সব হারায়, যা কিছু বাহ্যিক, যা দেখা যায়, ছোঁওয়া যায়, ভোগ করা যায়, তবু বাকি থাকে তার সেই ভালোবাসার আদর্শ যা অবাঙ্মনসোগোচর ঃ। অর্থাৎ ইম্পার্সোনাল।" যেখানে "তবু বাকি থাকে" কিছু সব হারিয়েও সেখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা, যেখানে থাকে না সেখানে কবি মৃত্যুর মতই নির্মম দণ্ডধারী। তাই বৌঠাকুরাণীর হাটে'র রুক্মিণী আত্মহত্যা করে, 'যোগাযোগে'র শ্যামা অপমানিত ও অপসৃত হয়, 'চতুরঙ্গে'র ননীবালা আত্মঘাতী হতে বাধ্য হয়। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের মন উপন্যাসের বস্তু গণ্ডী-ঘেরা মর্ত্যে বেশী দিন বাস করতে পারে নি—পূর্বমেঘের সঙ্গী হয়েই মানস-হংসবলাকার পাখায় পাড়ি জমিয়েছে উধাও নিঃসীম কাব্যের আকাশে। তাই সাহিত্য-সমীক্ষায় রবীন্দ্র-কথাশিল্প এক স্বতন্ত্র শ্রেণী।

পুনর্মুদ্রণ

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভূমিকা

অজয় ভট্টাচার্য।

সাহিত্যের যেখানে বিশ্বজনীন ক্ষেত্র সেখানে রবীন্দ্রনাথ সব্যসাচী। রবীন্দ্ররচনা সে স্থলে ব্যাপকতায় সুদূর প্রসারী। সর্বদিকের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা অনায়াসে অধিকার করেছেন তিনি; তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্ববিদগ্ধজনের বিচার-বুদ্ধির কষ্টিপাথরে স্বীকৃত হয়েছে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের বা আন্তর্জাতিক। সেরবীন্দ্রনাথ আমাদের বিস্ময় কিন্তু আপনার নয়। সেখানে কবি-সত্তা বৃহত্তর মানব-সমাজের, আপন হৃদয়েরও সে নিজস্ব নয়।

রবীন্দ্রনাথ একক এবং একার, তাঁর অপরূপ গীতিকথায়। এ যেন আপন-মনে বলা নিবিড়তম অনুভূতির গভীরতম গুন্ গুন্ ধ্বনি। বক্তা আর শ্রোতা একা কবি। বিশ্বসাহিত্যের দিগ্বিজয় শেষে এ যেন প্রশান্ত পদে ঘরে ফিরে আসা। কবি আর কবি মানস সেখানে।

"দুজনে মুখোমুখি
গভীর দুখে দুখী।"

রবীন্দ্র-সংগীতের গোড়ার কথা তাই। কাজেই রবীন্দ্রনাথের গান এ শুধু তাঁরই গান, তাঁরই অন্তরতম বিত্ত। কবির এ পরিচয় বাঙ্গালীর চিরদিনের চেনা, যেমন চেনা তার জয়দেব চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতি। সংগীতের সৃজন-ভূমিতে দেখি, রবীন্দ্রনাথ গড়ে উঠেছেন বাঙ্গলার মাটি থেকে। সেখানে তিনি শুধু বাঙ্গালী এবং একান্তভাবে বাঙ্গালীর। প্রগতিবাদের খরতর প্রেক্ষণে এ-সত্য দুর্বলতা রূপে দেখা দিলেও পলিমাটির সৌকুমার্য বলেই তকে গ্রহণ করছি।

রবীন্দ্র-সংগীত সহস্রধারায় প্রবহমান। কাজেই তার বিচিত্র গতি শুধু বিচার করতেই নয় বুঝতে গেলেও উৎসমূলের সন্ধান নিতে হয়। আবেষ্টনী চিরকালই মানুষের মনন-বৃত্তির 'পরে অব্যর্থ শক্তিতে কাজ ক'রে যায়। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টির বেলায়ও একথা অস্বীকৃত হতে

পারে না কোন ক্রমেই। এ প্রতিভার সূর্যোদয় কোন উদয়াচলে তার সন্ধান করতে হবে বৈকি যদি তার ক্রমিবকাশ সম্বন্ধে আগ্রহ বিন্দুমাত্র কারুর থাকে।

শৈশবে রবীন্দ্রনাথ নিজগৃহে দেখলেন ব্রহ্ম-উপাসনার সাত্ত্বিক সমারোহ। বেদ উপনিষদের সূক্ত-মন্ত্রাদির নিত্য আলোচনায় ঠাকুরবাড়ি তখন তীর্থ মন্দিরে পরিণত হয়েছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু-আত্মার বিভূতি কিশোর কবিকে অলক্ষ্যে কখন উৎসুক করে তুলছে কে বলতে পারে তা! ব্রহ্মসঙ্গীত-রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের প্রেরণার মূল এইখানে। আর তারই সঙ্গে বিশ্ব-প্রকৃতির বিচিত্র বর্ণ-শোভা একটা প্রত্যক্ষ রহস্যের মত আকর্ষণ করেছে তখন তরুণ কবিকে। সৃষ্টির অন্তরালে ঐশী শক্তির অবস্থিতি বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি স্বীকার করে নিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীতে দেখি ঈশ্বরের আরাধনা আর নিখিল প্রকৃতির স্বর্গীয় প্রশস্তি। এ সময়কার রচনায় সাধক রবীন্দ্রনাথ কবি রবীন্দ্রনাথকে আড়ালে রেখে বিকশিত হলেন বেশি। ব্রহ্মসঙ্গীত রবীন্দ্রনাথেরই সঙ্গীত কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীত বলতে আজকের দিনে যা বুঝি এ তা নয়। ভগবানকে ধরা-ছোঁয়ার বহু ঊর্ধ্বে স্থাপিত করে এ যেন দীনতম ভক্তের দূর থেকে আরতি করা। প্রিয়তমরূপে কবি তাঁকে খুঁজে পান নি। তাই সাধক রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনি:

"ওহে দয়াময় নিখিল আশ্রয়, এ ধরা পানে চাও।"
"তার' তার' হরি দীন জনে
ডাক' তোমার পথে করুণাময়।"

এ রবীন্দ্রনাথই রূপান্তরিত হলেন গীতাঞ্জলিতে। ব্রহ্মসঙ্গীতের ভাষার অমসৃণ সারল্য কবিত্বের সুষমায় শুধু সুন্দরই হলো না, হৃদয়ের কথা হয়ে ফুটে উঠলো। সাধকের জীবনে যিনি ছিলেন পূজাই, কবির অন্তরে তাঁরই আবির্ভাব হলো চিরকান্ত দয়িত রূপে। সর্ব নিবেদনের মহিমায় যে প্রেম চিরকালের চিরত্ব পেয়ে সুধন্য হয় গীতাঞ্জলির প্রতি বর্ণে তার আকুলতা অবন্ধন স্বচ্ছতায় ফুটে উঠলো। গীতপঞ্চাশিকা, গীতলেখা, কেতকী এবং আর-আর গীতি গাথায় ও কবিচিত্তের প্রকাশ এ-পথ অবলম্বন করেই প্রসৃত হয়েছে। গীতিমাল্য আর গীতালির গানগুলিও এ স্থলে প্রাসঙ্গিক এবং উল্লেখযোগ্য। এ সময়ে কবি মরমী-ধর্মী। অথচ পুরাতন

পদ্ধতিতে ব্রহ্ম-সঙ্গীত রচনাতে তখনো ছেদ পড়ে নি। তবু প্রধানতঃ কবি তখন শুধু কবি-ই, আর কিছু নন।

প্রিয়তমরূপে অরূপকে এই যে নিকটতম ক'রে রাখা এ ভাব-রসের জন্যে রবীন্দ্রনাথকে বৈষ্ণব কবিদের কাছে ঋণগ্রস্ত করতে পারলে একাধিক গবেষক হয় তো আনন্দ লাভ করবেন। সাগরপারের Browing-কে নিয়েও টানাটানির অন্ত নেই। কিন্তু মনে হয়, এ-প্রচেষ্টা শুধু নির্জলা গবেষণাই হয়ে থাকবে, সত্যের সম্মান হয় তো পাবে না কোন দিন। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব-কাব্যের রস-গ্রাহী পাঠক, একথা সত্য। আর এও মিথ্যে নয় যে শ্রীরাধার পূর্বরাগ থেকে আরম্ভ করে মাথুরের বিচ্ছেদ-বেদনা অবধি পলে পলে প্রেমধর্মের যে বিচিত্র ভাবাবেশ তার পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্র-গীতিকথায় সার্থক এবং সফল হয়ে উঠেছে। এখানেই রবীন্দ্রনাথ সর্বাংশে মরমী এবং অপার্থিব। মানস-বৃন্দাবনে শ্রীমতীর মতই কবি নিঃসঙ্গপ্রেমে একান্ত ভীরু। তাই তাঁর গানে বেজে ওঠে—

—"ওগো কে যায় বাঁশরী বাজায়ে।
আমার ঘরে কেহ নাই যে।"—

—"ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধুহে আমার"—

আরো বহু বহু গীতি-রচনায় এ-সুরই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তথাপি একথাই অসঙ্কোচে বলা যায় যে কবিচিত্ত এ-ভাবধারার জন্যে পূর্বসূরী কারুর কাছেই ঋণী নয়। বাংলার মৃত্তিকার বাংলার সমাজের প্রাণধর্ম কবি-মানসের নিভৃত স্তরে গোপনে যে রসপ্রবাহ সঞ্চারিত করেছে রবীন্দ্রনাথের মরমী গীতি তারই প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। মহীরুহ মৃত্তিকার প্রাণসুধায় পুষ্ট, কিন্তু এ তার জন্মগত অধিকার, ঋণের অপবাদ দিয়ে তাকে অপমান করবার চেষ্টা বৃথা। রবীন্দ্রনাথ যেখানে ভানুসিংহ সেজে গেয়ে উঠলেন :

—"সজনি সজনি রাধিকা লো
দেখহ অবহুঁ চাহিয়া"—

—"মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান"—

সেখানে তিনি কৃতি অভিনেতা। সার্থক তাঁর রূপসজ্জা, স্বাভাবিক তাঁর

বাচনভঙ্গী। একটি বিশিষ্ট রচনাধারার পদ্ধতি পরীক্ষায় তিনি সাফল্য-প্রার্থী হয়ে প্রবেশ করেছিলেন; জয়মাল্য অনায়াসেই অর্জন করলেন।

রবীন্দ্রনাথের মরমীসঙ্গীত দু'ভাবে রূপায়িত হয়েছে; একটি কবির নিজস্ব, অপরটি দেশজ বাউলপদ্ধতি অনুসরণ করে। প্রথমধারার সংগে পরিচয়ের সূত্রস্বরূপ দু'একটি অতি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতের নাম করাকেই যথেষ্ট মনে করি:

—"সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর,"

—"জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণা ধারায় এসো।"

—"জীবনে যত পূজা হলো না সারা।"

এর ভাবসম্পদ আর প্রকাশভঙ্গী কবির একক বিত্ত। এক্ষেত্রে বিশ্ব-সাহিত্যের আর কোন ধুরন্ধরের কথা পাশাপাশি আমাদের মনে পড়ে না।

দ্বিতীয় ধারা—বাউল। বহু প্রাচীনকাল থেকে এ ধরনের সাধন-সঙ্গীত বাংলার আকাশে বাতাসে মিশে আছে। গ্রামের পথে আজো শুনতে পাই:

—"সাঁই, তোমার পথ ঢেকেছে মন্দিরে মসজিদে"

—"নিঠুর গরজি
ও তুই, মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে
ও তুই ফুল ফুটাবি বাস ছাটাবি সবুর বিহুনে।"

রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন:

..."আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে, আমার মনে।"

—"জানি নাই গো সাধন তোমার বলে কারে।"

—"ধনে জনে আজি জড়ায়ে হায়
তবু জান, মন তোমারে চায়।"

দেহকে মন্দির ক'রে মনের কথায় এই যে সহজ সাধনা বাউল গানের মাধুর্যই হলো সেখানে। রবীন্দ্রনাথ সে মণিকোঠার চাবিকাঠি পেয়ে ছিলেন, এবং সে রত্নদানও করে গেছেন পর্যাপ্ত পরিমাণে।

এরপর রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আর একটি বিশিষ্ট পর্যায় প্রাসঙ্গিক হয়ে আসে। জনসমাজে এ ধারাই সর্বাপেক্ষা অধিক সমাদৃত। গায়ক এবং শ্রোতার সমাজে এরই নাম বর্তমানে "রবীন্দ্র-সঙ্গীত"। ব্রহ্মসঙ্গীত মরমী সাধন-সঙ্গীতের অতীন্দ্রিয়তা এ-গীতিরচনার প্রতিপাদ্য নয়। এ জাতীয় গানে কবি শুধু কবি-লিরিক ধর্মই তাঁর একমাত্র ধর্ম। চির-কালের 'তুমি'র জন্য চিরকালের 'আমি'র গভীরতম অনুভূতি এ সমস্ত গানের প্রাণবস্তু। বসন্তে বর্ষায় শরতে হেমন্তে ধরিত্রীর রং ফেরে। মিলন-বিরহের নিবিড় ভাবাবেশে কত সুখের ব্যথা আর ব্যথার আনন্দ মধুচক্রের সৃষ্টি করে দুটি হৃদয়ের গভীরতম ছায়ালোকে। এ গান মানব-মানবীর সেই চিরন্তন অন্তর-রসে সুস্নিগ্ধ—রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যমণি বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রতিটি কথা রসাবস্তা গায়কের কাছে আনন্দনির্ঝর হয়ে ধরা দেয়। রসগ্রাহক শ্রোতা আত্মস্থ পরিতৃপ্তির সন্ধান পায়। বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র রঙের খেলার সংগে কবি-চিত্তের নব নব প্রকাশ একমাত্র ভূর্জপত্রের কবি কালিদাস ছাড়া সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে আর কোন্ শক্তিধর লেখক এমন স্বচ্ছন্দ লেখনীতে করতে পেরেছে, আমরা জানি না। এ পর্যায়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিদগ্ধজনের বিস্ময়। তারো মধ্যে মনে হয় বর্ষার মেদুরতায় কবিচিত্ত সমধিক বেগবান। বর্ষার বিষণ্ণতায় মানসলোকের কোথায় যেন কি একটা বিবর্তন ঘটে যায় যার ফলে একদিন আর্য সাহিত্য পেয়েছিলো অপরূপ 'মেঘদূত', যার দ্যোতনায় আজকের দিনে আমরা পেলাম রবীন্দ্র-নাথের বর্ষাসঙ্গীত। বসন্ত শরতের গীতিকথায় ঔজ্জ্বল্য আছে সত্য কিন্তু বাদলের গানে পাই অপরিসীম সুখের জড়িমা আপন মনে আপনাকে সর্বরিক্ত মনে করে। এ দুঃখ আনন্দময়, এ অশ্রু রৌদ্রের চাইতে দীপ্তিমান। যখন শুনি :

—"এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়!
এমন মেঘাম্বরে বাদল ঝর ঝরে
সে কথা শুনিবে না কেহ আর
নিভৃত নির্জন চারিধার।"—

তখন মনে হয় যাকে একটি কথা বলার জন্য এত কথার আয়োজন তাকে এমনদিনেই শুধু সে-কথাটি বলা যায়। চিরচাওয়াকে এই যে একান্তে নিভৃতে পাওয়া তার জন্যে কি মিলনসুখী চিত্তের কৃতজ্ঞতা ঐ আকাশের ঘনঘটাই সবটুকুই পাবে না? এ বর্ষা জীবনে দুর্লভ মিলনের চাইতেও যে দুর্লভ! রবীন্দ্রনাথ বর্ষাসংগীতে যথোচিত জয়মাল্য দান করেছেন তাকে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-রচনা থেকে আর অধিক পংক্তির উল্লেখ করা শুধু বাহুল্যই নয় অনাবশ্যকও বটে; কারণ রাজসৌধ থেকে পল্লীকুটির অবধি তার পরিব্যাপ্তি! তাছাড়া অপার অনুভবেই যার আনন্দ তাকে ধারণার সীমায় আবদ্ধ করবার অপচেষ্টা না করাই ভাল।

এ পর্যায়ে 'ঋতুনিরপেক্ষ রচনাবলীও রবীন্দ্র-সংগীতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তবে একথাও সত্য যে প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্য প্রায় অবিচ্ছেদ্য ভাবেই রবীন্দ্র-গীতিকথার সংগে বিজড়িত। সেখানে স্বভাবগত একটা প্রকৃতিপ্রিয়তার সন্ধান পাওয়া যায়।

তারপর দেশাত্মবোধের সংগীত। এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের সাফল্য বিস্ময়কর। মানস লোকের যে এককত্বের মাঝখানে অন্যান্য ধারার সংগীতের উৎস সুগোপন ছিল স্বদেশীগীতির বেলায় তার নির্জনতার প্রাচীর গেল ভেঙে। একান্ত ভাবের কবি রবীন্দ্রনাথ চারণবেশ পরিধান করে রাজপথে এসে দাঁড়ালেন। বিপুল জনতার পুরোধা হয়ে শুনালেন তিনি:

—"জনগনমন অধিনায়ক হে জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা—"
—"দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী"

স্বজাতির আশা আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্য বেদনা অপূর্ব ভাষাকে বাহন করে সমগ্র দেশের প্রাণে প্রাণে উন্মত্ত আলোড়নের সৃষ্টি করে সার্থক হল। এখানে রবীন্দ্রনাথকে পাই সর্বজনের একজন বলে। রাজস্থানের অগ্নি-বীণাধারী চারণদের অমোঘ তেজস্বিতার সংগে দেখতে পাই অদ্বিতীয় কাব্যরসের সুসংযত সংমিশ্রণ। জাতির রাষ্ট্রীয় অগ্রগতির পথে এ সংগীত মহামন্ত্রের মত কাজ করেছিল এতদিন। ভবিষ্যতেও এর ক্ষমতা দুর্নিবার থাকবে, আশা রাখি।

সর্বতোমুখী প্রতিভা এখানেই বিশ্রাম গ্রহণ করেনি। হাস্যরসের গান, নাটকীয় সংগীত আর বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে গাইবার উপযুক্ত

গীতিকথা—এই তিন দিকেও রবীন্দ্রনাথের লেখনী সাবলীল গতিলাভ করেছে। হাস্যরসের গান বল্লে চিরকালই কথাটা আমার কাছে হাস্যাস্পদ বলে মনে হয়, যদিও স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং কান্তকবি রজনীকান্ত সেন স্বকীয় প্রতিভায় এক্ষেত্রে অশেষ সাফল্যলাভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছেন মাত্র, বেশীদূর অগ্রসর হননি। এ পর্যায়ে অল্পসংখ্যক তাঁর রচনা, কিন্তু কৃতিত্ব অপরিমীম। একমাত্র 'চিরকুমার সভা'র নাম উল্লেখ করাই এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট মনে করি।

রবীন্দ্রনাথের নাটকীয় সঙ্গীতের সংগে পরিচয় লাভ করতে পারি তাঁর বাল্মীকি প্রতিভা, মায়ার খেলা প্রভৃতি নাটকে। সুষ্ঠু শব্দ চয়নে রচিত গানের ভেতর দিয়ে সংলাপের তীক্ষ্ণতা সৃষ্টি করা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। আর এক জাতীয় গানের নাটকীয় ভাবধারা তিনিই প্রমূর্ত করে দেখিয়েছেন মূক নৃত্যভংগিমার সাহায্যে "চণ্ডালিকা"য় আর "তাসের দেশে"। স্বীকার করতেই হয় যে এ সৃজনশক্তির তুলনা নেই।

সংক্ষেপে একে রবীন্দ্রগীতিকথার অতি সামান্য ইঙ্গিত বলা যেতে পারে। এটুকু বোধহয় অস্পষ্ট রইলো না যে, সঙ্গীত-রচনায় রবীন্দ্র প্রতিভা অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বহুমুখী তো বটেই।

কথার রাজা রবীন্দ্রনাথ সুরের জগতেও এক অভাবনীয় মায়ালোকের সৃজন করেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে সুরকে বাদ দিলেও একমাত্র কথার অনবদ্যতায় বিশ্বকে সে জয় করতে পারে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু গান গানই, কাজেই সুরকে অপ্রধান বলবার কোন কারণ থাকতে পারে না। কিছুদিন পূর্বে বাংলার আকাশ বাতাস উৎপীড়িত হয়ে উঠেছিল এরকমের একটি তর্কের আলোড়নে যে, কথা বড় না সুর বড়। কোমল কঠিন অনেক রকমের যুক্তির অবতারণাও হয়েছিল। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়, শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এ সম্বন্ধে কাগজেপত্রে অনেক আলোচনা-প্রত্যালোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ অকাট্য যুক্তির সাহায্যে এটুকু আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে: "কারুখচিত বাণী সমগ্র গানকে যদি শোভন করে তোলে তা হলে কোনো দিক থেকে মূল্যের কিছু হ্রাস হতে পারে বলে তো মনে করিনে।"—(সাঙ্গীতিকী, দিলীপকুমার রায়)

গান, তা' সে ক্ল্যাসিকেলই হোক আর আধুনিকই হোক, সুমার্জিত হতে দোষ কি ?

"কারি কারি কমরিয়া গুরুজি মোকো মোল দে"—অর্থাৎ গুরুজি, আমাকে কালো কালো কম্বল কিনে দে। গানের কথা এরকম না হয়ে যদি হয় :

"আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে"—তা হলে লাভ ছাড়া ক্ষতি আছে কি কিছু ? বিদগ্ধ শ্রোতার রসপিপাসুচিত্ত তা'তে কি দ্বিগুণ আনন্দ-রসের সন্ধান পায় না ? রবীন্দ্রনাথ এমতই প্রকাশ করেছেন একাধিক পত্রে এবং প্রবন্ধে। কিন্তু কথা এবং সুরের পরস্পরের সম্বন্ধ বিষয়ে তিনি এ-দুটির কারুর প্রতিই পক্ষপাতিত্ব দেখান নি। সমান এবং শোভন সম্মিলনই তিনি চেয়েছেন, তাই বলেছেন :

"কথাও সুরকে বেগ দেয়, সুরও কথাকে বেগ দেয়।" কথা সুরের সুষ্ঠু-মিলন সম্বন্ধে রহস্য করে বলেছেন :

"কুমার কুমারীদের সুন্দর রকম মিলন হোলে আনন্দ করতে আমার বাধে না।" কাজেই আজকের দিনে একথা আমরা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়েছি যে, গান গান হবে তখনই যখন মধুর কাব্যকথার সংগে যথোপযুক্ত সুরের সুমধুর মিলন হবে। সে হিসাবে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুধু সার্থকই নয় অতুলনীও বটে। অপূর্ব ভাবময় তাঁর কথা, আর স্বচ্ছন্দগতিময় তাঁর সুর তাই মনে হয় কবি রবীন্দ্রনাথের মতই সুরস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথও সমান প্রণিধান-যোগ্য। সে ক্ষেত্রেও তিনি একটি বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তন করে গেছেন যার উৎসমূল তাঁর নিজেরই মানসলোক। এ সুরের ঐশ্বর্যে পরিমণ্ডিত গানের নাম "রবীন্দ্র-সঙ্গীত"। এ সুধন্য নাম গ্রহণ করবার পথে রবীন্দ্রনাথের গান তাঁরই সৃষ্ট সুরের কাছে অধিকতর ঋণী।

রবীন্দ্রনাথের সুর সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে আবার সেই ব্রহ্মসঙ্গীতে ফিরে যেতে হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে একাধিক ধ্রুবপদ্ধতির সঙ্গীত নায়কের সান্নিধ্য লাভ করেছেন নিজগৃহে। এজন্যে ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্র এবং রাগ-রাগিনীর যথাযথ আকৃতি সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট একটা ধারণা জন্মে যায়। ব্রহ্মসঙ্গীতের বহু সুরে তৎকালে বিখ্যাত হিন্দীগানের সুরের অমেজ পাওয়া যায় ; তা ছাড়া এমনও কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত আছে যেখান হয় তো প্রায় হুবহু হিন্দী সুর সংযুক্ত হয়েছে। তখনকার সুর সৃষ্টিকালে

রবীন্দ্রনাথের সর্বদাই সজাগ দৃষ্টি ছিল রাগ-রাগিনীর বিশুদ্ধতার দিকে। এমন কি অজ্ঞাত এবং অপ্রচলিত রাগিনীতেও তিনি একাধিক সংগীত রচনা করেছেন। সংক্ষেপে ব্রহ্মসংগীতের সুরকর্তা রবীন্দ্রনাথকে পশ্চিম ভারতীয় পদ্ধতির সংগীতকার বলা যেতে পারে। এস্থলে এবিষয়েও লক্ষ্য করতে হয় যে, যখনি তিনি ধ্রুবপদ্ধতিতে কোন সংগীত রচনা করেছেন তখনি গানের ভাষাকে সুরের গুরুভার বইবার মত শক্তি এবং সামর্থ্য দান করেছেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রকাব্য সৃষ্টি করবার চেষ্টা একেবারেই করেন নি। কাজেই সে রচনা গান হলেও অধুনা প্রচলিত রবীন্দ্র-সংগীতের কাব্যাসন কোন কালেই সজোরে দাবী করতে পারেনি।

এর পরেই রবীন্দ্রনাথের সুর-সৃষ্টিতে এক অভিনব যুগের আবির্ভাব হলো। সুরকার সুরস্রষ্টা রূপে দেখা দিলেন। সক্রিয় প্রতিভাবলে একাধিক রাগ-রাগিনীর অনবদ্য সংমিশ্রণ করে বুঝিয়ে দিলেন যে, এতে করে সুরের শ্রী হানি তো হয়ই না বরঞ্চ একটা বিস্ময়কর গীতিরসের অবতারণাই করে। এ মিশ্রণের ফলে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যে সুর আমরা চিরদিনের মত পেলাম তাকেই জানি রবীন্দ্রনাথের **"Style"** বলে। গানের চারিটি অংশে, মানে অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী আর আভোগে এই সুর কবিত্বময় কথার সংগে অচ্ছেদ্যভাবে মিলিত হয়ে যে সংগীতরসের সৃষ্টি করে তার তুলনা আর কোন ভাষার গীতি-রচনায় পাওয়া যায় জানি নে। অনেক সংগীতবিশারদ অবিশ্যি বলতে চেষ্টা করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের গানে অন্তরা আর আভোগের সুর অভিন্ন হওয়াতে একটা একঘেয়েমি আসবার আশংকা থেকে যায়; একথাও এঁরা বলেন যে, রবীন্দ্রসংগীতে তান-কর্তবের অবাধ অবকাশ না থাকাতে বৈচিত্র্যের অভাব ঘটে। কিন্তু এ যুক্তি প্রধানতঃ তাঁদের যাঁরা গান বলতে বোঝেন একমাত্র সুরের খেলা—গানের কথার প্রতি যাঁদের কান চিরকালই বধির। কথার ঔজ্জ্বল্য যেখানে স্বয়ংস্ফূর্ত একটুখানি সুরের আলোই সেখানে যথেষ্ট। হীরকের দ্যুতি প্রকাশপথে বাইরের সূর্যরশ্মির বড় বেশি অপেক্ষা রাখে না। গানে কথার দৈন্যকে ঢাকতে হয় সুরের বাহ্যাড়ম্বর দিয়ে। কাঁচের দাম নেই বলেই রং করে তার কৌলিন্য বাড়াতে হয়। রবীন্দ্রনাথের গানের কথায় তাঁর দেওয়া সুরই একমাত্র সুর একথা বিশ্বাস করে "ষ্টীম রোলার" চালবার চেষ্টা

না করাটাই বোধহয় এক্ষেত্রে শোভন হবে। অতি সরল তাঁর সুর এজন্যেই বোধহয় অনেকের কাছে কঠিন। কিন্তু এঁরা একথাটি কি জানেন না যে, অমন করে সহজ সরল হওয়া সত্যিই কঠিন। অসাধারণ হবার দুশ্চেষ্টা চিরদিনই অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু যখন সাধারণের ভেতরে অসাধারণ লুকিয়ে থাকে তখনই জাগে আকস্মিক বিস্ময়। রবীন্দ্র সংগীত ঠিক তাই। কাছেই আছে বটে, কিন্তু ধরাছোঁওয়ার আওতায় নয়।

সুরের এজাতীয় মিশ্রণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেশীয় বাউল ও কীর্তনের সম্মানও অনেক স্থলে করেছেন। এ জন্যেই রবীন্দ্রনাথের সুর বাংলার প্রাণের বিত্ত হয়ে উঠবার সহজপথ খুঁজে পেয়েছে। একমাত্র সুধীসমাজেই নয়, পল্লীপ্রান্তরেও এর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ আছে।, ভবিষ্য সমাজের জন্যেও অক্ষয় অমৃতভাণ্ড হয়ে রইলো এ রবীন্দ্র-সংগীত।

সুর সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ একমাত্র ভারতীয় রাগ-রাগিনীর উপরই নির্ভর করেন নি। য়ুরোপের সংগীত-শাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছিলেন যৌবনের প্রারম্ভেই বিলেতে প্রবাসকালে। তখন তিনি ইংরেজি কণ্ঠসংগীতেও পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। বহু বিলাতী গান রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সাবলীল বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুটে উঠত তখন। য়ুরোপের 'Harmonised music' এবং 'Melody' এদেশের মাটিতে আমদানি করে বাংলা গানের ক্ষেত্রে সহনীয়রূপে রবীন্দ্রনাথ তার উপযুক্ত ব্যবহার করেন। কবির স্বদেশী সংগীতের অনেকগুলিই তার সাক্ষ্যদান করে। য়ুরোপীয় সংগীতের প্রাণধর্ম হচ্ছে পৌরুষ। এজন্যেই যখন শুনি, দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী, অথবা জনগনমন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা তখন তার সুরের ভেতর একটা দুর্জয় প্রেরণা অনুভব করি। এ স্থলে বিশ্বকবি য়ুরোপের কাছে ঋণী।

রবীন্দ্রনাথের সুবিপুল সংগীতসাহিত্যের সামান্য একটু প্রাথমিক ভূমিকা ছাড়া এ নিবন্ধ আর কিছুই নয়। সর্বদিক দিয়ে অত বড় সংগীতপ্রতিভা ভারতবর্ষে আর কটি হয়েছে আমরা জানি না। স্বকীয় সৃষ্টির ঐশ্বর্যে এ শক্তি সার্থক। বর্তমানে 'আধুনিক সংগীত' বলে যে গানের ধারা বাংলার মাটিতে খরস্রোতে প্রবাহিত তারও উৎসমূল এই রবীন্দ্রসংগীতের অতল তলেই নিহিত রয়েছে। আজকের দিনে এমন একটি জ্যোতিষ্কও নেই যার দীপ্তি না সেই মহাসূর্যের কাছ থেকে ধার করা।

রবীন্দ্রদর্শন ঃ সমাজ ও কলা

অশোক মুস্তাফি

সাম্প্রতিককালে "রাজনীতিক রবীন্দ্রনাথ" কথাটির প্রয়োগ প্রায়শ লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথকে এইভাবে বিশেষিত করায় অনেকের আপত্তি থাকতে পারে; সে আপত্তি নিতান্ত অযৌক্তিক বলা যায় না। কেন না, রবীন্দ্রনাথের জীবন এবং সমাজতত্ত্বকে আমাদের পছন্দসই কোন ছকে ফেলে বিচার করা উচিত হবে না। হয়ত সমসাময়িকতার অজুহাতে একটি খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় এবম্বিধ আলোচনায় আমরা দিয়ে থাকি। সত্যিকথা ব'লতে কি, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গবেষকরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যা আছে, তার চেয়ে যা নেই তার সন্ধানেই অত্যধিক ব্যস্ত। বোধহয় অনেক সময়েই এটা রবীন্দ্রমাহাত্ম্য কীর্তন বা বন্ধ্যা পণ্ডিত্য প্রকাশের একটা ক্লান্তিকর এবং সংকীর্ণ প্রয়াসে গিয়ে ঠেকে। তাঁরা প্রায়শই ভুলে যান যে রবীন্দ্র-আলোচনা আকবর বা চন্দ্রগুপ্তের সম্বন্ধে রচনার থেকে কিছুটা পৃথক। এখানে যা অসঙ্গতভাবে বড় হ'য়ে ওঠে তা হ'চ্ছে একটা 'ফরমূলা' বা পূর্বকল্পিত একটি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিকোণ; এতে রবীন্দ্রনাথকে সামগ্রিকভাবে বোঝার সুবিধা তেমন হয় না। যথাসম্ভব রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত হ'য়ে একটি সহানুভূতিশীল অথচ বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা আজ পর্যন্ত কমই হ'য়েছে হয়ত' এটা বললে বেশী বলা হবে না যে রবীন্দ্রনাথের একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজদর্শন বলতে সত্যি তেমন কিছু নেই। অন্ততঃ সাধারণ ভাবে আমরা তাঁর System ব'লতে কিছু বুঝি না। আর তাঁর সমাজদর্শন বিচ্ছিন্ন একটা কিছু নিশ্চয়ই নয়। আসলে তা কবির জীবনদর্শনেরই একটা ভগ্নাংশ মাত্র। আপাত দৃষ্টিতে তাঁর বিক্ষিপ্ত সামাজিক ভাবনা চিন্তার সরাসরি সামঞ্জস্য-বিধান আমাদের কাছে কিছুটা কষ্টসাধ্য মনে হতে পারে। কেন না, তাঁর লেখা থেকে খণ্ড বিক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে অনেক সময় প্রায় বিপরীত সিদ্ধান্ত পৌঁছান যায়। যেমন রাশিয়া ও ইতালির রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত পোষন করেছিলেন। আমেরিকা সম্বন্ধেও তাঁর

বক্তব্যের সঙ্গে প্রথম পর্যায়ে হেগেলের মতের কিছুটা মিল ছিল পরে অবশ্য কবি আমেরিকা সম্বন্ধে বীতরাগ হয়েছিলের। ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্কের বিবর্তনের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের মত-পরিবর্তন লক্ষ্যনীয়। এই ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে এই কারণে যে বিশেষক'রে তাঁর ক্ষেত্রে আমরা কিছু কিছু জিনিষ স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে ধরে নেই। তাঁর দেশচর্য্যা বলতে, নিতান্ত মধ্যবিত্তসুলভ মনবৃত্তির বশে, আমাদের অনেকের ধারণা স্বদেশী মেলা, 'নাইট' উপাধি ত্যাগ, 'র‍্যাথবোন' কে লেখা চিঠি এবং 'সভ্যতার সঙ্কটের' মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাঁর ইতিহাসবীক্ষার নজির হিসাবে আমরা 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' অথবা 'রাশিয়ার চিঠি' কেই বহুলাংশে বুঝি। মোটামুটি তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা ব'লতে আমাদের ধারনা কবির সমন্বয়বাদ, শিক্ষাতত্ত্ব এবং মানবিকতাবাদের বাইরে কিছু নয়। কিন্তু তাঁর সমাজ চিন্তার মূল সূত্রটি থেকে আমরা প্রায়শঃ দূরে সরে যাই। প্রত্যক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্রে অভিজাত পরিবারের সন্তান রবীন্দ্রনাথের স্থিতি স্বল্পকালের; প্রবেশ এবং প্রস্থান ক্ষিপ্র। স্পষ্টতঃ দলীয় রাজনীতির আবর্ত থেকে সে যুগের ঐতিহ্যবাদী এবং জাতীয়তাবাদী রবীন্দ্রনাথের নিষ্ক্রমণ নিতান্ত স্বাভাবিক ছিল। শিক্ষা এবং সমাজ উন্নয়নে উত্তরজীবনে কবির আগ্রহ এবং উৎসাহ উত্তপ্ত এবং ক্লেদাক্ত রাজনীতির একটা প্রতিক্রিয়া বলেই কেউ কেউ মনে করেন। মননশীল কবি গণসংযোগের বিপজ্জনক চেহারাটি বোধহয় বহু পূর্বেই দেখতে পেয়েছিলেন। কেন না, তিনি কোন বিশেষ শ্রেণীর, দলের বা মতবাদের ছিলেন না। তিনি অতীন্দ্রিয়বাদী ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্ববাদীও ছিলেন। সমাজ বা ব্যক্তির নিতান্ত ব্যবহারিক বা ক্ষীণ দিকটা তাঁর দর্শনে জায়গা পায় নি। তিনি ছিলেন মুখ্যতঃ কবি, তাঁর সমাজচিন্তা সাময়িকতার দ্বারা চিহ্নিত হ'লেও আসলে একটি গভীর দর্শনের মধ্যে বিলীন ছিল।

সমকালীন মূল্যবোধ বা বাস্তবঅবস্থা তাঁর লেখায় কতটা রূপ পেয়েছে তা বিবেচ্য। তবে বিভিন্ন লেখক সামাজিকে দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথকে বিভিন্নভাবে দেখেছেন। সকলেই যে সমানভাবে তাঁর প্রভাবমুক্ত হ'য়ে আলোচনা করতে পেরেছেন এমন কথা বলা যায় না। কেউ তাঁর উপনিষদের ধর্মে দীক্ষিত, কেউ বা দ্বৈত সার্বভৌমত্ববাদী হিসাবে দেখেছেন। যে অর্থে গান্ধী বা দান্তে বা টলষ্টয় আদর্শবাদী, সে অর্থে হয়ত রবীন্দ্রনাথও কিছুটা আদর্শবাদী ছিলেন। অপর দিকে তাঁর গভীর

অধ্যাত্মবাদের অন্তরালে একটি সংবেদনশীল অথচ বাস্তববাদী মনের পরিচয় মেলে। সবচেয়ে মুস্কিল এই যে সেই 'সাধনার' যুগে রবীন্দ্রনাথ ইতস্ততঃ এমন কয়েকটি প্রগতিবাদী মন্তব্য করেছিলেন, যেগুলোর জন্য স্বচ্ছন্দে এক ধরণের নির্দলীয় সমাজতন্ত্রী বলা যায়। সন্ত্রাসবাদ বর্জন এবং অহিংসার জয়গান গান্ধীবাদী প্রচারের আগেই তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। এই অর্থে হয়ত অনাগত উত্তর কালকে তিনি নীরব স্বাগত জানিয়েছিলেন। বিশেষ করে পশ্চিমীঅর্থে, রাষ্ট্রচিন্তায় তাঁর কোন System ছিল না এটা ঠিক। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর ছোট গল্পগুলি এবং উত্তর-কালের কবিতাগুলি না পড়ে যাঁরা বুর্জোয়াকবি আখ্যা দেন তাঁরা হয়ত পরের মুখে ঝাল খাওয়ায় বিশ্বাসী। আবার রবীন্দ্রনাথের মিল, মার্কস বা স্পেনসারের চিন্তাধারার অন্বেষণ করাও বোধহয় অতিকথন বা কষ্টকল্পনার নামান্তর হবে। রবীন্দ্রনাথকে রামমোহনের অর্থে সমন্বয়-বাদী বলা যায় না; আবার পরিপূর্ণভাবে নব্যসংস্কৃতির উত্তর-সাধকও বলা যায় না। গান্ধী বা অরবিন্দ আদর্শবাদী হ'লেও বিশেষ একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা, পন্থা ও দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। এই দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে একটি একক শ্রেণীভুক্ত করাই সমীচীন। অনবহিত স্তুতিবাদ বা অতিবাস্তববাদী সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র-দর্শনের অপব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব এটা মনে রাখতে হবে। কবিকে তাঁর যুগের আলোকে এবং নিজস্ব দর্শনের আঙ্গিকে উভয়তঃ বিচার করা প্রয়োজন। তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের চেয়ে মানবতন্ত্রী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারই আজকের দিনে অধিকতর গণ্য।

অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই রাজনীতির উপর ধারাবাহিকভাবে বা সুসংবদ্ধভাবে রবীন্দ্রনাথ কিছু লিখতে পারেননি বা চাননি। বরং তাঁর রচনা পাঠ করতে গিয়ে একটা জিনিষ মাঝে মাঝে আমাদের আকর্ষণ করে। তা হচ্ছে এই যে কোন রাজনৈতিক বিষয় সাময়িকভাবে কবিকে চিন্তিত করলেও পরমূহূর্তেই তিনি রূপরসের অনির্বচনীয় এক লোকে নিজেকে স্থানান্তরিত ক'রেছেন। রাজনৈতিক নিবন্ধ রচনার পরেই হয়ত কবি গভীর প্রেম-ধর্মী কাব্য-রচনায় নিজেকে নিয়োজিত ক'রেছেন। রবীন্দ্রনাথ সবার উপরে কবি এবং তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা, বিশেষ ক'রে দেশ-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ মানবপ্রেমিক একজন কবিরই সময় বিশেষের, সমাজবীক্ষা। রবীন্দ্রনাথ

হুজুকপ্রিয়তার প্রশ্রয় দেন নি; নিছক জনমনরঞ্জনের জন্য তাঁর কলম দিয়ে একটি বাক্যাংশও নিঃসৃত হয় নি। অন্তঃসারশূন্য প্রতিক্রিয়াশীল চরীত্রহীন তথাকথিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের শ্লোগানে তিনি কণ্ঠযোগ করতে অসমর্থ হ'য়েছেন। সারা জীবন ধ'রে কবি ভিড় আর হাততালি; অন্ধ উন্মাদনা আর আদর্শহীন গণবিক্ষোভকে অর্থাৎ পেশাদারী রাজনীতিকে সযত্নে পরিহার ক'রেছেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আবেদন ছিল তাঁর হৃদয়ের কাছে, মস্তিষ্কের কাছে কখনই নয়। এ অর্থে তাঁকে অভিজাত ব'ললে অন্যায় বলা হবে না। বঙ্গ-ভঙ্গ, হিন্দুমেলা, ভারতের সাম্প্রদায়িক বিবাদ বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে—অর্থাৎ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের এই একান্ত ব্যক্তিক দলনিরপেক্ষ বুদ্ধিপ্রধান ভূমিকাটি পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। তাঁর Composite nationalism, Synthetic Culture বা Creative rural education সবকিছুর মধ্যেই বড় হয়ে উঠেছে একটি আদর্শবাদ, যা সব চলতি মতবাদের মধ্য দিয়ে স্বচ্ছন্দে পথ কেটে একটা পরিপূর্ণ বন্ধনমুক্তির দিকে এবং আত্মোপলব্ধির দিকে এগিয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সামাজিক এবং রাজনৈতিক অন্ত্যজের মধ্যে তাঁর মূল অভিমতের একটা বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা যায়। দুঃখের বিষয়, তার যথাযোগ্য অনুসরণ বিশেষ হয় নি। আর একটা কথা। রবীন্দ্রনাথের সামাজিক মন্তব্যগুলির সাময়িকতাই আমাদের কাছে অনেক সময় প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছেন তাদের নিগূঢ় তাৎপর্য হয়। নিতান্ত মধবিত্ত সুলভ ক্ষণিকের একটা তৃপ্তির জন্য আমরা সামাজিক চিন্তাশীল রবীন্দ্রনাথকে কবি রবীন্দ্রনাথের থেকে বিশ্লিষ্ট ক'রে দেখতে চাই। এই দেখাটা আজকাল প্রায় একটা রেওয়াজ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে; বিশেষ করে শতবার্ষিকীর কল্যাণে। ডায়ালেকটিক্সের সূত্র অবলম্বন করবার ঝোঁকে আরও একটা ধারণা বেশ কিছুদিন হ'লো বাংলাদেশে শেকড় গেড়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে নিতান্ত উত্যক্ত হ'য়ে বা চক্ষুলজ্জায় পড়ে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে এসে পড়েছেন এবং অত্যন্ত সন্তর্পণে যথাসময়ে অন্তর্হিত হ'য়েছেন তাঁর কাব্যলোকে। রবীন্দ্র সাহিত্যে নাকি সাধারণ-মানুষের স্বীকৃতি খুঁজে পাওয়া শক্ত। তাঁর ব্যক্তিগত পরিবেশ ছিল নিঃসন্দেহে আধা-সমন্ত তান্ত্রিক। সেই জন্যে তাঁর অধিকাংশ

গল্প, উপন্যাস, কবিতায় নাকি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এক ধরনের জোলো কল্পনাবিলাস, সৌখীন আভিজাত্যের নিতান্ত মৌখিক ধর্মহীন সহানুভূতি এবং বাস্তবের প্রতি এক ধরনের সূক্ষ্ম উদাসীনতা। দেশের মাটির সংগে নাকি রবীন্দ্রনাথের সত্যকার যোগ ছিল না। এটা একটা অভিমতের ব্যাপার তা ঠিক; কিন্তু এই ধরনের অভিমতের পিছনে র'য়েছে এক ধরনের দার্শনিক নীতিবাদ এবং আমাদের লৌকিক প্রকৃতির অজ্ঞানতা, সংস্কার ও পরমত আনুকূল্যের দিকটি। নিষ্ঠার সংগে রবীন্দ্রনাথকে অনুশীলন না করার জন্যই হয়ত' এই ধরনের শিথিল ধারনা বেশ নিরুপদ্রবে গড়ে উঠেছে। কবির দার্শনিক তত্ত্বটি তাঁর রাজনৈতিক ধ্যান-ধারনার অনুধাবনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রতিধানযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের দর্শনে কোন জৈবিক বা ঐতিহাসিক ধারা অনুসরণের চেষ্টা প্রায় নেই ব'ললেই চলে। মানুষকে কবি তার ভাগ্য-নিয়ন্ত্রারূপে কল্পনা করতে পারেন নি। বরং বস্তুর থেকে আত্মার দিকেই তাঁর পদক্ষেপ। তাঁর পথ বা পন্থা রাজনৈতিক বা সামাজিক নয়, বরং আত্মার ও প্রেমের। কবি অন্তরের সত্যবিচারে জাগতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে কদাপি অগ্রসর হন নি। হ'তে পারেন নি। পৃথিবীতে মানুষের আত্মিক শক্তির অভিষেক বা উদ্বোধনই ছিল তাঁর একান্ত কাম্য। মানবতন্ত্রীরূপে কবি সর্বদা ব্যক্তির শুভবুদ্ধি এবং যুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন; কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল প্রেমের স্বর্গরাজ্যে উত্তীর্ণ হওয়া, যেখানে আত্মার অবমাননা ঘটবার সম্ভাবনা প্রায় তিরোহিত। এই বিশুদ্ধ ভাববাদ কবির মানবিকতার প্রধান অঙ্গ। ব্যবহারিক পথকে তিনি বর্জন ক'রেছেন বা এড়িয়ে গেছেন তা নয়। তাকে পথ ব'লে স্বীকার করতেই দ্বিধা বোধ ক'রেছেন। সামাজিক আবর্তের গতি নির্ণয় করা কোনদিন তাঁর দায় ছিল না। সামাজিক বিভ্রান্তি দূর ক'রে বৃহত্তর সত্যের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। শ্রেণী নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের প্রতি এই কারণেই তাঁর একটা সহজ স্বভাবসিদ্ধ আত্মীয়তা বোধ ছিল। তিনি সম্পূর্ণ মানুষের কথাই ভেবেছেন। মানুষের হৃদয়বৃত্তির অনায়াস এবং সুষ্ঠু প্রকাশের চিন্তাই তাঁর সমাজ চিন্তা এবং চেতনার নামান্তর ও রূপান্তর। রূপ ও রসে তিনি সাধারণ মানুষের একটি পরিপূর্ণ মূর্তি রচনা করেছেন। তার তুচ্ছাতিতুচ্ছ অনুভূতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল

নিবিড়। এই অনুভূতিকে শ্রদ্ধা করার একটি নৈর্ব্যক্তিক চেষ্টাই কবির সামাজিক আত্মার শুদ্ধি সাধনের ব্রতের মধ্যে পরিস্ফুট। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি বস্তুনিরপেক্ষ নয়, আবার নিছক বস্তুতান্ত্রিকও নয়। টলষ্টয়, গান্ধী বা অরবিন্দের মত অন্তর্নিহিত একটি মানবিক ঐক্যের সন্ধান রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন। যা অরবিন্দ চিন্তা এবং ধ্যানের মাধ্যমে সাধনের প্রয়াস পেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তা সার্থক করতে চেয়েছিলেন কল্পনা এবং অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে। একটি গতিশীল আত্মিকতাই কবির মানবিকতাবাদের মূল সুর। 'তারকার আত্মহত্যা', 'সবুজ' বা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' বস্তুকে অতিক্রম করে আত্মার অকুণ্ঠ প্রকাশের কথা বলা হ'য়েছে। আত্মার এই নিরন্তর সংগ্রামের কথা অবশ্য বার্গসংত ব'লেছেন। ঐতিহ্যের গোঁড়ামি থেকে রবীন্দ্রনাথ আত্মার সর্বদা মুক্তি কামনা করেছিলেন। অন্ধ প্রকৃতি প্রেম, প্রাচীন ভারতের প্রশস্তি এবং উপনিষদ সর্বস্বতা কবির 'মালিনী' প্রমুখ কাব্য কীর্তিতে প্রতিভাত। সৌন্দর্যভিত্তিক প্রকৃতিপ্রেম এবং সনাতনী প্রীতির অন্তঃসারশূন্যতা তাঁর 'নৈবেদ্য' কাব্যে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। কবির প্রথম দিককার প্রহসনগুলিতে চিরাচরিত বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রূপের সুর যেন ধ্বনিত হ'য়েছে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

আষাঢ়

॥ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল ॥

সাহিত্য-বিচিত্রা

রথীন্দ্রনাথ রায়

॥ সূচী ॥

বাংলা গদ্য-সাহিত্য ও বিদ্যাসাগর। হেমচন্দ্রের খণ্ড-কবিতাবলী। বংকিমচন্দ্রের 'বিবিধপ্রবন্ধ'। ত্রৈলোক্যনাথ। রমেশ দত্তের উপন্যাস। রবীন্দ্র-পত্র-সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর'। রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্য-রচনা। বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনা। পরশুরাম। বিভূতিভূষণের "আরণ্যক"। তারাশংকর : মন ও শিল্প।

॥ দাম সাড়ে আট টাকা ॥

জিজ্ঞাসা

কলিকাতা-২৯ ॥ কলিকাতা-৯

প্রবন্ধ পত্রিকা

আষাঢ়, ১৩৬৮ (১৮৮৩ শকাব্দ)
দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

সূচীপত্র

চিত্তরঞ্জন ঘোষ ॥ ১—৪৩ ॥ বাংলাদেশের লোকচর্যার এক অধ্যায়
অশোক মুস্তাফি ॥ ৪৪—৫১ ॥ রবীন্দ্র দর্শন ঃ দেশ ও কাল
সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ ॥ ৫২—৭১ ॥ আধুনিক ফরাসী কবিতা
অরুণ সান্যাল ॥ ৭২—৮৪ ॥ গুপ্ত-কবি ও বাংলার নব-জাগৃতি
আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ॥ ৮০—৮৯ ॥ উপন্যাস-শিল্প প্রসঙ্গে
বাণিক রায় ॥ ৯০—১০০ ॥ রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য
ই এম্ ফরস্টার ॥ ১০১—১০৩ ॥ রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'
ই এম্ ফরস্টার ॥ ১০৪—১০৬ ॥ রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা'

সম্পাদক

রামেন্দু দত্ত চিত্তরঞ্জন ঘোষ

UNIV

বাংলাদেশের লোকচর্যার এক অধ্যায়

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

'ফোকলোর' কথাটা আজকাল আমাদের কাছে যথেষ্ট পরিচিত। কিন্তু শব্দটার জন্ম খুব বেশী দিনের নয়। মাত্র শ'খানেক বছর এর বয়স। ইংলণ্ডের ফোকলোর সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডব্লু, জে, টমাস্ ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে প্রথম এই শব্দটির উদ্ভাবন করেন। এর পরে শব্দটির ব্যাপক প্রচলন হয়।

'ফোকলোর'-এর যথাযথ বাংলা প্রতি শব্দ নেই। সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় ভাষাবিদ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'লোকযান' শব্দটির ব্যবহারের কথা বলেছেন। মহাযান, হীনযান, ইত্যাদির অনুসরণে শব্দটি রচিত। ব্যুৎপত্তির দিক থেকে এর মানে দাঁড়াবে—লোকসমাজের জীবনপদ্ধতি। সুনীতিবাবুর ভাষায়,—I think "Loka-yana" would de a good Indian equivalent, in imitation of "Maha-yana," "Hina-yana," "Vajra-yana," "Deva-yana" etc, in as much as, it means "A way of Life (yana) among the people (Loka)" which is carried down by tradition without any book learning or sophistication. (Indian Folklore, Vol. I. No. I. P. IV.)

কিন্তু মহাযান, হীনযান, বজ্রযান ইত্যাদির ভাবানুষঙ্গে 'যান'-যুক্ত শব্দে একটা বিধি-নির্দিষ্ট জীবন-পদ্ধতি বোঝাতে পারে, কারণ পূর্বোক্ত 'যান'-গুলি সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব ও অনুশাসনের ভিত্তিতে রচিত। রাজনীতিক্ষেত্রে 'ইজ্‌ম্' বা—'বাদ' পদাংশ যেমন, ধর্মীয় ক্ষেত্রে 'যান' অর্থের দিক দিয়ে অনেকটা তেমনি। কিন্তু লোকসমাজের জীবনপদ্ধতি ঠিক কোনো সুসংগঠিত 'ইজ্‌ম্'-ভিত্তিক নয়, বরং অনেক শিথিল। লোকসমাজের জীবনপদ্ধতি তাদের সমবেত জীবন-প্রয়াস থেকে স্বতঃ-উদ্ভূত। আর ধর্মীয় ক্ষেত্রে 'যান' বা রাজনীতিক্ষেত্রে 'ইজ্‌ম্' একজন বা একটা দলের থেকে প্রসূত। পরে সেটা জনসাধারণের মধ্যে প্রয়োগ ও পরীক্ষার প্রয়াস চলে। সুতরাং 'যান'-এ এক

বা মুষ্টিমেয় কয়েক জনের মতামত বৃহত্তর জনমানসের অভিমুখী। আর ফোকলোর ঠিক তা নয়, বরং কিছুটা পরিমাণে তার বিপরীত ; এখানে সমবায় ঐতিহ্যের বিষয় উত্তর-পুরুষে প্রবাহিত। ফোকলোর সমাজ-সৃষ্ট, আর 'যান' মোটামুটিভাবে ব্যক্তিসৃষ্ট। সুতরাং 'যান' শব্দাংশ ব্যক্তিসৃষ্টির ভাবানুষঙ্গ জাগাতে পারে।

এখানে তাই দ্বিতীয় আর একটি শব্দ প্রস্তাব করছি—'লোকচর্যা'। এই শব্দে ভালভাবেই লোকসমাজের সামগ্রিক জীবনাচরণের অর্থ দ্যোতিত হতে পারে।

বাংলাদেশে লোকচর্যা-চর্চায় প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র সেন, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার প্রভৃতি।

বাংলাদেশের লোকচর্যার একটি বিশেষ বিষয়—ব্রত—এই প্রবন্ধের আলোচ্য।

॥ ১ ॥

সব অনুষ্ঠানেরই সুরুতে একটা মঙ্গলাচরণের প্রথা আছে। এই প্রবন্ধও শুরু করছি রবীন্দ্রনাথের একটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়ে ঃ

'—অনেকের নিকট এই সকল ব্রতকথা ও ছড়া নিতান্ত তুচ্ছ ও হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা গম্ভীর প্রকৃতির লোক এবং এরূপ দুঃসহ গাম্ভীর্য বর্তমানকালে বঙ্গ সমাজে অতিশয় সুলভ হইয়াছে।

'বালকদিগের এমন একটি বয়স আছে যখন তাহারা বাল্য-সম্পর্কীয় সকল প্রকার বিষয়কেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, অথচ পরিণত বয়সোচিত কার্যসকলও তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয় না। তখন তাহারা সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে কোন সূত্রে কেহ তাহাদিগকে বালক মনে করে। বঙ্গ-সমাজের গম্ভীর সম্প্রদায়েরও সেই দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা বঙ্গ-ভাষা, বঙ্গ-সাহিত্য, বঙ্গদেশ-প্রচলিত সর্বপ্রকার ব্যাপারের প্রতি অবজ্ঞামিশ্রিত কৃপাকটাক্ষপাত করিয়া আপন প্রকৃতির অতলস্পর্শ গাম্ভীর্য এবং পরিণতির প্রমাণ দিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। অথচ তাঁহারা আপন অভ্রভেদী মহিমার উপযোগী আর যে কিছু মহৎ কীর্তি রাখিয়া যাইবেন এমন কোন লক্ষণও প্রকাশ পাইতেছে না।

'য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসে যথেষ্ট মনোযোগ করিয়া

থাকেন এবং ছড়া, রূপকথা প্রভৃতি সংগ্রহেও সংকোচ বোধ করেন না। তাঁহাদের এ আশংকা নাই পাছে লোকসাধারণের নিকট তাঁহাদের মর্যাদা নষ্ট হয়। প্রথমত, তাঁহারা জানেন যে, যে-সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিয়াছে, তাহারা দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না—দ্বিতীয়তঃ, যাহারা স্বদেশকে অন্তরের সহিত ভালবাসে তাহারা স্বদেশের সহিত অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত হইতে চাহে, এবং ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি ব্যতিরেকে সেই পরিচয় কখনও সম্পূর্ণতা লাভ করে না।—'*

রবীন্দ্রনাথের সময়কার 'বঙ্গ-সমাজের গম্ভীর-সম্প্রদায়'-এর প্রভাব-প্রতিপত্তি বর্তমানে ক্ষীণ, কিন্তু তা সত্বেও বাংলা দেশের ব্রত সম্পর্কে তেমন আলোচনা হয় নি। 'সাধনা' পত্রিকা সম্পাদনাকালে রবীন্দ্রনাথ নানা ধরণের লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও প্রকাশে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন। তাঁর প্রেরণায় কিছু ব্রতও সংগৃহীত হ'য়েছিল। এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান সহায় ছিলেন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়—তাঁর ব্রত-সংকলন পুস্তক-আকারে প্রকাশিতও হ'য়েছিল রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ভূমিকার জয়টীকা ললাটে নিয়ে। এই বইখানিই বোধহয় প্রথম ব্রত-সংকলন গ্রন্থ। এর পরে আরো কয়েকখানি এই জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছিল। বাংলাদেশের সমগ্র ব্রতের বিবরণ এর কোনটিতেই নেই, তা সত্বেও প্রচেষ্টা হিসেবে এ-গুলি স্মরণীয়। কিন্তু আজকাল এই ধরণের সংগ্রহের প্রচেষ্টা অত্যন্ত বিরল, অথচ ব্রতানুষ্ঠান দিনের পর দিন অতি দ্রুতগতিতে বাংলাদেশ থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে। সেই জন্যে এই মুহূর্তে যথাসম্ভব-সম্পূর্ণ একটি সংকলনের কাজে হাত দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। আর ব্রতগুলি বিশ্লেষণ করে এর মধ্যে 'দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ' কিছু আছে কিনা তাও দেখা দরকার।

পূর্বোল্লিখিত সংকলনগুলি সবই অসম্পূর্ণ; তাছাড়া সম্পাদনাও ত্রুটিপূর্ণ। সব সংকলনই প্রায় সমস্ত ব্রতকে নির্বিচারে খাঁটি ব্রত বলে গ্রহণ করেছেন, ফলে আসলে-নকলে এমন মিশে গেছে যে ব্রতের আসল রূপটি খুঁজে বার করা কঠিনই রয়ে গেছে। সংকলন গ্রন্থে কোন বিচার-বিশ্লেষণের স্থান তাঁরা দেন নি। তাঁরা ভাবতেন যে বালিকাদের হিন্দু-ধর্মীয় রীতিনীতি

* অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, মেয়েলি ব্রত। ভূমিকা।

শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্রতগুলি উদ্‌ভাবিত। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন যে 'সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র পারাবার মন্থন করিলেও এ-গুলির অনুকূলে অনুষ্টুছন্দে রচিত একটিও শ্লোক উদ্ধার করিতে পারা যায় না।'১ কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত বলেছেন, 'এই সমস্ত ব্রতোপাখ্যান হইতে আমাদের রমণীগণ স্বামীভক্তি, দেবভক্তি, ভ্রাতাভগিনীর প্রতি স্নেহ-মমতা, ইন্দ্রিয়-সংযম, ধৈর্য, তিতিক্ষা প্রভৃতি বিবিধ রূপ শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন।" ২ এমন কি ভগিনী নিবেদিতারও ধারণা : 'Nothing could be more perfect educationally than the Bratas which Hindu Society has preserved and hands to its children in each generation, as perfect lessons in worship…'৩

এই ধর্মাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ব্রতকে তাঁরা মাথায় করে রেখেছিলেন, কিন্তু ব্রত নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান নি। ধর্মানুষ্ঠান পালন করে এবং বালিকাদের শিক্ষা দিয়েই তাঁরা তুষ্ট ছিলেন, ফলে ব্রত সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এঁরা মন দেন নি। তাঁরা কিছু কিছু ব্রতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে বালিকাদের হাতে তুলে দিয়ে তাঁদের শ্রম সার্থক বিবেচনা করেছেন। ফলে রবীন্দ্রনাথ নির্ধারিত বৈজ্ঞানিক-চর্চার পথে বিশেষ কাজ হয় নি। অবশ্য এঁদের সংকলনের মধ্যে পরবর্তী গবেষকদের জন্য বেশ কিছু মালমসলা জোগাড় করা ছিল তা অস্বীকার করা যায় না।

বেশ কিছুদিন পরে ঠাকুর বংশেরই আর এক কৃতী পুরুষ বাংলাদেশের ব্রত নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেছেন; অবনীন্দ্রনাথের 'বাংলার ব্রত' আকারে ক্ষুদ্র, সংগ্রহ ও আলোচনায় অসম্পূর্ণ, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি লুপ্ত অধ্যায়কে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার আলোকে উজ্জ্বল করে তোলবার প্রথম সুশৃংখল প্রয়াস—এ দিক দিয়ে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানির গুরুত্ব যথেষ্ট।'

এ কথাটা গোড়াতেই মনে রাখা দরকার যে ব্রত নারীদের শিক্ষা দেওয়ার একটি ফর্ম বা উপায় নয়। ব্রত হচ্ছে মূলত প্রাক-আর্য যুগের অনগ্রসর

১। মেয়েলি ব্রত, প্রস্তাবনা।

২। মেয়েলি ব্রত, প্রস্তাবনা।

৩ Siter Nivedita, The Place of the Kindergarten in Indian Schools. The Modern Review, August, 1908.

কৃষিনির্ভর মানুষদের যাদুশক্তিতে (magic) বিশ্বাসী সামাজিক অনুষ্ঠান। কোন বালিকাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এর উৎপত্তি হয় নি, উৎপত্তি হয়েছিল সেই পশ্চাৎপদ মানুষদের সামাজিক প্রয়োজনে। পরে অবশ্য ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্মার্তরা ব্রতানুষ্ঠানটিকে ব্যবহার করেছেন—তাতে ব্রতের স্বরূপ ঢাকা-পড়েছে পৌরাণিক আবরণে। সেই আবরণটিকেই যদি আমরা সত্য বলে গ্রহণ করি, তবে ব্রতের আসল পরিচয় লাভ সম্ভব হবে না। বরং সেই আবরণকে সরিয়ে একেবারে অন্তঃস্থলে প্রবেশ করা দরকার।

কিন্তু মুস্কিল এই যে, বহুদিনের সংস্পর্শে সেটি আর আবরণ মাত্র নেই, একেবারে মিশে-গেছে। এখন বিশ্লেষণ করে এর পৌরাণিক অংশকে ছেঁকে নেওয়া এবং লৌকিক অংশকে আলাদা করে দেখা অত্যন্ত দুরূহ। এ ব্যাপারে আমরা দুটো দিক থেকে প্রধানত সাহায্য পেতে পারি। প্রথমত যে ব্রতগুলিতে পুরাণের হাতের স্পর্শ বিশেষ লাগে নি, অনেকটা আদি রূপেই যে-গুলির পাশাপাশি রেখে তুলনামূলকভাবে বিচার করলে অনেক অনালোকিত অংশে কিছুটা আলোকপাত করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, মানুষের যে ধরণের সমাজের মধ্যে ব্রতগুলির জন্ম, সেই সমাজ সম্পর্কে, তার আচার-ব্যবহার, কামনা-ভাবনা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস ইত্যাদি সম্পর্কে একটু জেনে নিতে হবে, তাহলে তাদের অনুষ্ঠানগুলির উৎস খুঁজে পেতে সুবিধা হবে। এবং এই জ্ঞান ব্রতকে বিশ্লেষণ করে বোঝাবার পক্ষে প্রচুর সহায়তা করবে। সেই পুরাতন সমাজের অনুসন্ধানে বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অনগ্রসর মানুষের ইতিহাস আমাদের সাহায্য করবে।

সেই পুরানো মানুষের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে সে তখনও প্রাকৃতিক কার্যকলাপের মূলকে আবিষ্কার করতে পারে নি, প্রকৃতিকে জয় করতে পারে নি। যে প্রাকৃতিক শক্তির সামনে সে ছিল অত্যন্ত অসহায়। প্রকৃতিকে নিজের সুবিধা অনুযায়ী কাজে লাগাবার জন্যে একটি উপায় সে গ্রহণ করেছিল—সেটি হল ইন্দ্রজাল বা যাদুশক্তি বা ম্যাজিক। আজকে আমরা ম্যাজিক কথাটি সাধারণত যে অর্থে ব্যবহার করে থাকি, ঠিক সে অর্থ নয় এর, আরও অনেক ব্যাপক ব্যঞ্জনা এই শব্দটির। বর্তমানে ম্যাজিক কথাটির অর্থের অবনতি ও সংকোচন ঘটেছে। অথবা, অন্যভাবে বললে বলতে হয়, আধুনিক কালের সংকীর্ণ-অর্থ-সম্পন্ন

শব্দটির দ্বারা প্রাচীন কালের একটি ব্যাপক বিশ্বাস ও প্রক্রিয়াকে বোঝানো হচ্ছে।

বৃষ্টি চাই, তাই বৃষ্টির অনুকরণ করে একটা অনুষ্ঠান করা হ'ল, ঘড়া ঘড়া জল ঢালা হ'ল, বা মুখ দিয়ে চারদিকে জল ছিটিয়ে দেওয়া হ'ল, কিংবা পাত্রের তলা ফুটো করে তাইতে জল ভরে একটা বৃষ্টি-বৃষ্টি খেলা করা হল; বিশ্বাস, এই নকল বৃষ্টির প্রভাবে আসল বৃষ্টি হবে। শত্রুকে মারতে চাই, গড়লাম তার এক কুশপুত্তলিকা, তাইতে তীর বিঁধলাম; বিশ্বাস, এর ফলেই শত্রু তার নিজের জায়গাতে থেকেই নিহত হবে। এ দুটিই ম্যাজিকের উদাহরণ। আগেকার দিনের মানুষদের এ জাতীয় বিশ্বাস ছিল এবং অনুরূপ অনুষ্ঠানও তারা করেছে।

এ ছাড়াও আর একরকমের ম্যাজিক আছে। আমাদের মেয়েরা আজও তাদের মাথার পরিত্যক্ত চুল ফেলবার আগে তাতে একটু থুথু দিয়ে দেয়। কেন না, ঐ পরিত্যক্ত চুল কোন খারাপ লোকের হাতে পড়লে সে ইচ্ছা করলে মেয়েটির ক্ষতি করতে পারে। সেটা যাতে না করতে পারে তাই থুথু দেওয়া। এই বিশ্বাস, যে কাটবার পরও চুল বা নখ (বা দেহের সংস্পর্শের অন্য কোন বস্তু) ইত্যাদির সঙ্গে লোকটির সম্পর্ক থাকে, চুল বা নখে যা করা হবে তার ফল লোকটাতে বর্তাবে।

এই দু' ধরনের ম্যাজিকের দুটো আলাদা নাম দিয়েছেন ফ্রেজার।* প্রথম শ্রেণীর নাম দিয়েছেন 'সাদৃশ্যমূলক (বা অনুকরণমূলক) ম্যাজিক', কারণ এর অন্তর্নিহিত চিন্তাধারাটা হ'চ্ছে এই যে, একটা বিশেষ রকমের অনুষ্ঠান অনুরূপ অন্য আর একটির সৃষ্টি করে (like produces like)। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম 'সংযোগমূলক ম্যাজিক', কারণ এর অন্তর্নিহিত চিন্তাধারাটি হচ্ছে, কোন বস্তু যা একটি মানুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকে, ছিন্ন-সম্পর্ক হয়েও তা পারস্পরিক প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না।

আর এই দুই শ্রেণীর ম্যাজিকের একটি সাধারণ নাম দেওয়া হয়েছে—সীম্প্যাথেটিক ম্যাজিক (sympathetic magic), কারণ দুটি আলাদা ঘটনা বা বস্তুর মধ্যে একটা গূঢ় সহমর্মিতা কল্পিত হয়েছে।

দেহকে সুস্থ ও খাদ্যসম্ভার পর্যাপ্ত রাখবার জন্যই এই ম্যাজিক—মানুষের জীবন-যাত্রাকে সহজ করবার জন্য ও প্রকৃতিকে বশে আনবার জন্য

*The Golden Bough, Abridged Ed., I Vol.; P. II

এই প্রয়াস। এ চেষ্টা অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও হয়েছে—তার স্বাক্ষর আছে ব্রতে এবং অন্যবিধ বহু অনুষ্ঠানে। ব্রতে পূর্বোক্ত দু'রকম ম্যাজিকেরই চিহ্ন আছে—অবশ্য প্রথম ধরণটাই ব্যাপক।

একটা উদাহরণ নিয়ে অন্য দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের অনুষ্ঠানগুলি মিলিয়ে দেখা যাক।

বৃষ্টি প্রাণধারণের পক্ষে অপরিহার্য। খাদ্যসম্ভারের জন্যই প্রধানত এর প্রয়োজন; তাছাড়া আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষরা প্রখর তাপ থেকে আত্মরক্ষা ও প্রয়োজনীয় গাছপালাকে রক্ষার জন্যও বৃষ্টির স্নিগ্ধ সিক্ত স্পর্শ কামনা করি। সেইজন্যে প্রায় সমস্ত আদিম সমাজেই বৃষ্টিকে পৃথিবীর বুকে নিয়ে আসবার চেষ্টায় নানারকম যাদুশক্তি-বিশ্বাসী অনুকরণমূলক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল। রাশিয়ার ডোরপাট-এর নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলে অনাবৃষ্টির সময় তিনজন লোক একটি প্রাচীন পবিত্র বৃক্ষ-কুঞ্জের 'ফার' গাছে উঠত; তাদের একজন একটি লৌহপাত্রে হাতুড়ি পিটিয়ে বজ্রপাত ও মেঘগর্জনের অনুকরণ করত; আর একজন বিদ্যুৎ-চমকের অনুকরণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে উড়িয়ে দিত; আর তৃতীয় ব্যক্তি জল-পাত্র থেকে একটি পল্লব-গুচ্ছে জল নিয়ে চারিদিকে ছিটিয়ে-ছড়িয়ে দিত। তাদের বিশ্বাস ছিল—এতেই বৃষ্টি হবে।

প্লোস্কা গ্রামে অনাবৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য মেয়ে-বৌরা রাত্রে নগ্নগাত্রে গ্রাম-প্রান্তে গিয়ে মাটিতে জল ঢালে।

নিউগিনির পশ্চিমে হলমেহেরা নামক বৃহৎ দ্বীপটিতে বৃষ্টি নামাবার জন্য একজন যাদুশক্তি-সম্পন্ন লোক একটি বিশেষ গাছের ডাল জলে ডুবিয়ে তারপর সেই জল চারিধারে ছিটিয়ে-ছড়িয়ে দেয়।

নিউ ব্রিটেনের লোকেরা লাল ও সবুজ লতা পাতাকে একটি কলাপাতায় মুড়ে জলে ভিজিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখে এবং মুখে জল নিয়ে বৃষ্টিধারার অনুকরণে বাইরে ছিটিয়ে দেয়। তারা মনে করে, এইতেই বৃষ্টি নামবে এবং মাটি থেকে ফুল-ফল-ফসল ফলে উঠবে।

উত্তর-আমেরিকার ওমাহা ইণ্ডিয়ানদের ফসল যখন অনাবৃষ্টিতে শুকিয়ে যায় তখন তাদের পবিত্র 'মহিষ সমাজ' (Buffalo Society) একটি বড় পাত্র জল-পূর্ণ করে সেটাকে ঘিরে চারবার নাচে। একজন খানিকটা জল মুখে নিয়ে বৃষ্টির মত ছড়িয়ে দেয়; তারপর পাত্রটি উলটে দেওয়া হয়, জল গড়িয়ে

চলে মাটির উপর দিয়ে, নর্তকরা মাটিতে পড়ে সেই জল পান করে, মুখে তাদের লাগে কাদা, তারপর আবার সেই জল তারা ছড়িয়ে দেয়।

উত্তর-আমেরিকার নাট্‌চেজ্‌। এখানে বৃষ্টির দরকার হ'লে যাদুশক্তি সম্পন্ন লোকেরা নৃত্য আরম্ভ করে ; মুখে তাদের থাকে এক-একটি পাইপ, যার ডগাটা সচ্ছিদ্র ; এই ছিদ্রগুলির মধ্যে দিয়ে তারা তাদের মুখে-নেওয়া জল ফোয়ারার মত ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করে দেয়।

অনাবৃষ্টি বেশী তীব্র হ'লে ম্যাসিডোনিয়ার গ্রীকরা বালক-বালিকাদের একটি মিছিল বার করে—এরা সে তল্লাটে সব ইঁদারা ও ঝর্ণার কাছ দিয়ে ঘুরে আসে ; মিছিলের সামনে থাকে ফুলে-সাজানো একটি মেয়ে—থামবার জায়গাগুলিতে তার সাথীরা তাকে জলে ভিজিয়ে দেয়। এই সময় তারা যে গান গায় তার খানিক অংশ এখানে তুলে দেওয়া গেল ঃ

Perperia all fresh bedewed
Freshen all the neighbourhood ;
By the woods, on the highway,
As thou goest, to God now pray ;
O my God, upon the plain.
Send thou us a still small rain
That the fields may faithful be,
And vines in blossom we may see ;
That the grain be full and sound.
And wealthy grow the folks around,

অনাবৃষ্টির সময় সারবিয়ানরা একটি মেয়ের সাধারণ পোষাক খুলে ফেলে তাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরায় ঘাস, লতা-পাতা ও ফুলের পোষাক, এমন কি তার মুখও ঢেকে দেওয়া হয় সজীব সবুজের পর্দায়, এই পোষাকে তখন তাকে বলা হয় ডোডোলা (Dodola)। সে একদল মেয়ে নিয়ে গ্রামের মধ্যে দিয়ে যায়, প্রত্যেক বাড়ীতে থামে, সেখানে নাচে ও গান গায় (Dodola Song)। একটা গান তাদের এইরকম ঃ

We go through the village ;
The clouds go in the sky ;
We go faster,
Faster go the clouds ;
They have overtaken us,
And wetted the corn and the vine.

ভারতবর্ষে পুণাতে অনেকটা এই রকমের অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। বৃষ্টির প্রয়োজন হলে সেখানে বালকরা তাদের একজনকে পাতার পোষাক পরায়, তার নাম 'বৃষ্টির রাজা' (King of Rain)।

তারা তখন গাঁয়ের সব বাড়ী ঘুরে বেড়ায়—বাড়ীর কর্তা বা গিন্নীরা তাদের 'বৃষ্টির রাজা'-র মাথায়-গায়ে জল ঢেলে দেয় এবং কিছু খাবারও দেয়।১

সরহুল—ওরাওঁদের বাসন্তী-শস্য-উৎসব—অনুষ্ঠিত হয় চৈত্র মাসে। এই উৎসবের একটি অঙ্গ হচ্ছে, মেয়েরা গান গাইতে গাইতে যখন 'পাহানে'র (প্রধান) 'আঙ্গনে' আসে, তখন সেখানে আগে-থেকে-জড় মেয়ে-পুরুষেরা কলসী কলসী জল ঢেলে মেয়েদের ভিজিয়ে দেয়। এ ছাড়াও এই দীর্ঘ উৎসবটিতে আরো বহুবার পাহান ও 'পূজার'দের (পাহানের সহকারী) জলে সিক্ত করে দেওয়া হয়, এই সমবেত সিক্ত মানুষদের নৃত্যগীত চলে এর সঙ্গে। এটি করা হয় বৃষ্টির প্রাচুর্যের জন্য।২

ছতরপুরে ইন্দ্র ও মেঘের দুটি মূর্তির পা উপর দিকে ও মাথা নীচের দিকে করে এইরকম পড়ন্ত অবস্থায় রাখা হয়।৩

হোসঙ্গাবাদে একটি জল-ভরা মাটির কলসী রাত্রে পর পর চারটি মাটির তালের ওপর কিছুক্ষণ ধরে রাখা হয়। চারটি মাসের নাম অনুসারে এই মাটির তালগুলির নাম দেওয়া হয়। মেটে কলসী থেকে জল চুইয়ে চুইয়ে সারা রাতে সব মাটিই ভিজে যায় (পাত্রটি porous বলে), তখন বুঝতে হবে যে "ঐ ঘাসগুলিতে বৃষ্টি হবে।"৪

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমায় অনাবৃষ্টি হলে রুদ্রদেবের মন্দিরে কলসী ভরে জল ঢেলে ঢেলে বিগ্রহকে জলে মগ্ন করে দিলেই নাকি বৃষ্টি হয়। মন্দিরে সব ফুটো-ফাটা এবং দরজা বন্ধ করে দিয়ে জল দাঁড় করানো হয়।৫

---

১ The Golden Bough, Chap. V, 'The Magical Control of Rain,' পৃঃ ৬২-৬৮।

২ এস. সি. রায়, ওরাওঁ রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড কাস্টমস্, পৃঃ ১৯৩-২২৩।

৩ W. Crooke, An Introduction to the Popular Religion and Folklore in Northern India. পৃঃ ৪৪।

৪ ক্রুক, পৃঃ ৩৭২।

৫ S. C. Mitra. On a Rain Ceremony from the District of Murshidabad.

Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part III (Anthropological Part). No. 1, 1898. ; রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, গ্রামদেবতা, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা ১৩১৪।

বাংলার পূর্বাঞ্চলে খুব তীব্র অনাবৃষ্টি হলে গাঁয়ের লোকেরা নগর সংকীর্তন বার করে। সংকীর্তন-দল বাড়ি বাড়ি ঘোরে এবং প্রত্যেক বাড়িতে তাদের উপর জল ছড়িয়ে দেওয়া হয়। জল তাদের গা বেয়ে মাটিতে পড়ে, সেই ভেজা কাদা-মাটিতে তারা নৃত্য-গীত করে।

পূর্ব-বাংলারই আর একটি অনুষ্ঠান—'মেঘ্যারাণীর কুলা নামানো।' প্রধানত কৃষকশ্রেণীর (বিশেষ করে নমঃশূদ্র) মেয়েরা এটি করে। তারা প্রত্যেকে এক-একটি কুলো সারি সারি ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজায়, এইগুলি মাথায় নিয়ে গান গাইতে গাইতে বাড়ি বাড়ি ঘোরে। গৃহস্থেরা তাদের ঘরের চালার ওপর জল ঢেলে দেয়, সেই জল গড়িয়ে পড়ে ঠিক বৃষ্টি ধারার মত। মেয়েরা তাদের কুলো মাথায় ঐ ধারার নিচে গিয়ে দাঁড়ায়, কুলোয়—কিছুটা গায়-মাথায়—জল পড়ে। এদের একটা গান ঃ

অ্যাদে লো ম্যাঘারাণী,
হাত-পা ধুইয়া ফ্যালা পানি,
চিনা ক্ষ্যাতে চিন-চিনানি,
ধান ক্ষ্যাতে হাটু-পানি,
খরা না লো পূর্ণিমার চাঁদ,
ঝর্-ঝরাইয়া বৃষ্টি নাম।

উপরের অনুষ্ঠানগুলিতে একটি জিনিস সাধারণ—সব জায়গাতেই বৃষ্টি যাতে হয় সেই চেষ্টায় একটি নকল বৃষ্টি সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাদের বিশ্বাস, এইতেই আসল বৃষ্টি হবে।

আমাদের ব্রতেও ঠিক এই জিনিসটা পাচ্ছি। যেমন ধরা যাক বসুধারা ব্রতটির কথা—এটিও করা হয় বৃষ্টির কামনায়। যে আলপনা আঁকা হয় এ ব্রতে তাতে প্রধান হচ্ছে আটটি তারা ; তারার বসতি আকাশে, মেঘেরও তাই, হয়তো সেই ভাবানুষঙ্গে তারা আঁকা হয়! মাটির ঘটের তলায় ফুটো করে তাইতে জল ভরে বৃষ্টিধারার মত বট, পাকুড়, তুলসী ইত্যাদি গাছে (অভাবে ডালে) জল ঢালা হয়। কামনা জানানো হয় ঃ

গঙ্গা গঙ্গা ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ বাসুকি
তিন কুলে ভরে দাও ধনে জনে সুখী।

কারণ সারা পৃথিবী তখন যে—

কাল বোশেখী আগুন ঝরে!
কাল বোশেখী রোদে পোড়ে!
গঙ্গা শুকু-শুকু, আকাশে ছাই!

তাই ব্রত, তাই জলধারায় সিঞ্চিত করা হল বট, পাকুড়, তুলসী।

বট আছেন, পাকুড় আছেন, তুলসী আছেন পাটে,
বসুধারা ব্রত করলাম তিন বৃক্ষের মাঝে।
মায়ের কুলে ফুল, বাপের কুলে ফল, শশুরের কুলে তারা,
তিন কুলে পড়বে জলগঙ্গার ধারা।
পৃথিবী জলে ভাসবে,
অষ্টদিকে ঝাঁপুই খেলবে।

আর একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। নখছুটের ব্রত। এতে দ্বিতীয় জাতের ম্যাজিকের দেখা মিলবে। এটি চৈত্র মাসের যে কোন দিন করণীয়। চার বছর করতে হয়। চার জন (পরের বছরগুলিতে আট, বারো ও ষোলো জন যথাক্রমে) এয়োকে নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে নিয়ে আসে ব্রতিনী; তারপর একটা লাল রংয়ের গামছা উঠানে পেতে দিতে হয়, নাপিত-বৌ (তাকেও ডাকা হয়) তার উপরে কয়েকটি কড়ি রাখে, একটি পুতুলের মত চিত্র আঁকে এবং এয়োদের নখ (ও তৎসংলগ্ন মাংসাদি) কেটে ঐ গামছার উপর রাখে, কোন কোন জায়গায় চুলের প্রান্তভাগ থেকেও সামান্য একটু কাটা হয়। বহু স্থানে ব্রতিনীর নখচুলও কেটে দেয় নাপিত-বৌ; কিন্তু সর্বত্র এটা প্রচলিত নয়। এই নখচুল দুই ভাগ করে গামছার দুই প্রান্তে বাঁধে নাপিত বৌ, সেটা ব্রতিনী কাঁধে তুলে নেয়, তারপর সকলে সমবেত ভাবে নদীতে যায়। ব্রতিনী তখন তার কাঁধের ভার নামায় এবং প্রশ্ন করে:

'আমার নখমাংসের ভার উলিল?'
নাপিত-বৌ উত্তর দেয়—'উলিল'

এই রকম ব'লতে হয় তিনবার। তারপর নখ-চুল জলে ফেলে দিয়ে স্নান ও পরে ভোজন। এটি করা হলে স্বামীসোহাগিনী হয়ে স্বচ্ছন্দে বাস করে নারী।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এ ব্রতের মূল সংযোগমূলক ম্যাজিক। কোন খারাপ লোক (অর্থাৎ যাদুশক্তিসম্পন্ন) যাতে ছিন্ন নখ-চুলের সাহায্যে কোন ক্ষতি না করতে পারে তার আনুষ্ঠানিক প্রচেষ্টা এর মধ্যে। জলে একটা প্রহরী-শক্তি কল্পিত এ ব্যাপারে—এই বিশ্বাস সমস্ত দেশেই আছে। তাই ছিন্ন চুল হয় কোন পবিত্র দেবস্থানে বা জলে দেওয়া হয়। পৃথিবীর সকল দেশেই এর অগণ্য দৃষ্টান্ত আছে। আমাদের প্রতিবেশী শ্যামদেশে চুল কলাপাতার মধ্যে বেঁধে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয় এই বিশ্বাসে যে ওর সঙ্গে সব অসুখ-বিসুখও ভেসে চলে যায়।১ আবার সুদূর আয়র্লণ্ডেও এ বিশ্বাস আছে যে কারুর চুল দিয়ে যদি কোন পাখী বাসা তৈরী করে তবে তার সারা বছর মাথার যন্ত্রণা হবে।২

আমাদের ব্রতটির বৈশিষ্ট্য, এটি করা হচ্ছে স্বামী-সোহাগ লাভের জন্য। সেটি পাওয়ার পক্ষে যা বাধা, তা হয়তো ঐ নখ চুলের সঙ্গে ভেসে যেতে পারে এবং পরোক্ষভাবে ব্রতিনীকে তার ঈপ্সিত বস্তু পেতে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু ম্যাজিকে সাধারণত প্রত্যক্ষ সাদৃশ্য-মূলক ঘটনায় জোর দেওয়া হয়; কারণ আদি মানুষের বুদ্ধি অপরিণত ছিল বলে তার পক্ষে পরোক্ষ জিনিস বোঝা বা সেই অনুযায়ী কাজ করা খুবই মুস্কিল ছিল। কিন্তু এখানে সেই প্রত্যক্ষ-অনুষ্ঠানটি কোথায়?

ওরাওঁরা তাদের সন্তানদের নামকরণ উৎসবের সময় বাচ্ছাটির চুল কেটে নদীতে ভাসিয়ে দেয় এই বিশ্বাসে যে, নদীপথে সাগরে গিয়ে যথাসময়ে এই চুলের সঙ্গে বাচ্ছাটির ভাবী স্বামীর (বা স্ত্রীর) চুলের মিলন ঘটবে।* এখানে দেখতে পাচ্ছি, দেহের অংশ-বিশেষের মিলন ঘটাচ্ছে এরা মানুষ দুটির মিলনের প্রচেষ্টায়। এই ধরণের কোন বিশ্বাসের স্মৃতি 'নখছুটের ব্রতে'র অন্তরালে ক্ষীণ ভাবে জীবিত কি না আজ সে কথা নিশ্চিত করে বলা খুবই দুরূহ।

---

১ Kunjabehari Das, A study of Orissan Folklore. পৃষ্ঠা ৪৯।

২ ক্রুক, পৃঃ ৩৬১।

*ওরাওঁ রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড কাস্টমস্ পৃঃ ১২৯।

কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কামনাটি ব্যক্ত হয়েছে ছড়ায়, অর্থাৎ ব্রতের মন্ত্রে ঃ

পাট গাছটির মত চুল হবে,
দুধে আলতার বন্ন হবে।
ঘেঁচিকড়ির গতর হবে,
মধুপোরা গতর হবে।
পটলচেরা চোখ হবে,
বাঁশীর মত নাক হবে।
ননীর মত গড়ন হবে,
ছোট ছোট পা হবে।
গোল গোল হাত হবে,
চাঁদপানা মুখ হবে।

স্বামীর সোহাগ পাবার জন্য নারী সুরূপ কামনা করছে। সোহাগ ও সুরূপ—ফল ও কারণ ঃ এই দিক থেকে ভেবেছে তারা।

সুরূপ কামনা করে গুজরাটের মেয়েরা একটি ব্রত করে; তার নাম সুরূপাদ্বাদশী ব্রত। এটা কিন্তু ঠিক ঠিক ব্রত নয়, কারণ এখানে সুরূপা হবার চেষ্টায় শুধু বিষ্ণুপূজা করা হয়।

কিন্তু ধসুধারা ব্রতে বা নখছুটের ব্রতে ম্যাজিক যতটা স্পষ্ট, প্রত্যেকটি ব্রতে হয়তো তা নয়। অনেকগুলির সঙ্গে কিছু পূজা-আর্চা মিশে আছে। তা'ছাড়া, সাধারণ লোকের মধ্যে ব্রত একটি ধর্মানুষ্ঠান বলেই পরিচিত।

যে সব মনীষী ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেছেন, তাঁরা বলেন যে ধর্ম ম্যাজিকের পরের সৃষ্টি।

ধর্ম কথাটি নানা স্থানে নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আমরা এখানে ধর্ম বলতে কি বুঝেছি সেটা একটু সংক্ষেপে বলে নেওয়া দরকার, নইলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য নয়। ধর্মের মূল বিশ্বাস হচ্ছে অতিপ্রাকৃত শক্তিতে, যে শক্তি প্রকৃতি এবং মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা; এবং প্রার্থনা, উপহার দান, বলিদান ইত্যাদি দ্বারা সেই শক্তিকে তুষ্ট করে

মানুষ তার জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ধর্মের দুটো দিক; একটা হচ্ছে থিয়োরেটিক্যাল, অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস, আর একটা হচ্ছে প্র্যাক্‌টিক্যাল অর্থাৎ সেই শক্তিকে তুষ্ট করবার জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা।

এই দুটো দিকের মধ্যে প্রথমটি এসেছে সমাজে আগে, দ্বিতীয়টি পরে; কারণ, একটি শক্তি কল্পিত হবার আগে তার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা সম্ভব নয়।

ধর্মের সঙ্গে এই ধারণাটা মিশে আছে যে প্রকৃতির আইন-কানুন অলঙ্ঘনীয় নয়, এ নিয়মের রাজত্বে সব কিছুই পরিবর্তন-সাধ্য, শুধু সেই দেবতাটিকে মিষ্টবাক্যে বা পারিতোষিকে খুশী করে ভুলিয়ে করিয়ে নেওয়া।

ম্যাজিক কিন্তু বিশ্বাস করে প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। বৃষ্টির অনুকরণে মুখ দিয়ে জল ছিটিয়ে দিলে বৃষ্টি হবে—এটাকেও সে প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যেই ধরত। একটা যে কৃত্রিম ও একটা প্রাকৃতিক ঘটনাটির কারণ (cause) নয়, তা সে জানত না। ম্যাজিকের মূলে ভ্রান্ত ভাবানুষঙ্গ (mistaken association of ideas)। প্রথমটি যদি ঠিক-ঠিক ভাবে ঘটানো যায়, তবে পরেরটিও ঘটতে বাধ্য—প্রাকৃতিক নিয়মকে সে এত অলঙ্ঘনীয় (rigid) ভাবত যে এর ব্যতিক্রমের কথা সে কল্পনাই করতে পারত না। সেইজন্য বলার ভঙ্গির পার্থক্য আছে দু' দলের। ম্যাজিক-বিশ্বাসী বলে—'আমার অনুষ্ঠান সঠিক হ'লে বাকীটাও সঠিক হয়, হবে, হতে বাধ্য।' ধর্ম-বিশ্বাসী বলে, 'ভগবান (বা কোন বিশেষ দেবতা), তুমি আমায় এটা দাও, কি ওটা কর ইত্যাদি।'

পূর্বে সারবিয়ানদের 'ডোডোলা গান' (Dodola Song) যেটি উদ্ধৃত করেছি সেটিতে ম্যাজিক বিশ্বাসীদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি—আমরা গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি, আকাশেও চলেছে মেঘ, আমরা দ্রুত যাচ্ছি, মেঘও চলেছে দ্রুত, মেঘ এগিয়ে চলেছে আমাদের ছাড়িয়ে, ভিজিয়ে দিয়েছে আমাদের ফসল, আমাদের দ্রাক্ষালতা।

কিন্তু ম্যাসিডোনিয়ার গ্রীকদের গানটিতে ধর্মবিশ্বাসীদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে— O my God, upon the plain,

Send thou us a still, small rain ;"

কিন্তু এদের অনুষ্ঠানটিতে ম্যাজিক স্পষ্টভাবেই রয়েছে। এখানে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ম্যাজিকের সঙ্গে ধর্মের একটা মিশ্রণ ঘটেছে।

ঠিক এমনি মিশ্রণ ঘটেছে আমাদের 'মেঘ্যারাণীর কুলা নামানো'তে; মেঘকেও খানিকটা দেবী বানিয়ে ফেলা হয়েছে। যদিও অনুষ্ঠানটি পুরোই যাদু-অনুষ্ঠান।

এমনি মিশ্রণ আছে বসুধারা ব্রতের ছড়াটিতে। সুরুতে পৌরাণিক দেবদেবীর নামগুলি চুকেছে। আবহাওয়া ও বৃষ্টির প্রসঙ্গে গঙ্গা, ইন্দ্র ও বরুণের নাম আসা খুবই স্বাভাবিক। আকাশে বসতি বলে চন্দ্রও এলেন—বাসুকি কেন—ছড়ার মিলের খাতিরে? যাই হোক এদের উদ্দেশে প্রার্থনা জানানো হল। কিন্তু বট-পাকুড়ে জল ঢেলেই ছড়ায় ম্যাজিক-বিশ্বাসীর কণ্ঠ কথা কয়ে উঠেছে। 'বসুধারা ব্রত করলাম তিন বৃক্ষের মাঝে', অতএব 'পৃথিবী জলে ভাসবে।'

কিন্তু নখছুটের ব্রতে মিশ্রণটা ঘটে নি। এখানে নাপিত-বৌ বলছে, 'তোমার নখ-মাংসের ভার উলিল।' ব্যাস্, তাহলেই 'উলিল' অর্থাৎ নামল, এর জন্যে কোন দেবতাকে 'নামাও' বলে অনুরোধ করবার দরকার নেই। ছড়াতেও বলা হচ্ছে, 'পাটগাছটির মত চুল হবে।' ধর্মবিশ্বাসী বলত তার দেবতাকে, 'পাটগাছটির মত চুল কর।'

কিন্তু ছড়ার থেকেই হোক, কি অনুষ্ঠানের দিক থেকেই হোক, একেবারে নির্ভেজাল ব্রতের সংখ্যা খুব কম। কারণটা বোঝা অবশ্য কিছু কষ্টকর নয়। ম্যাজিকের যুগের পরে ধর্ম সমাজে বহুদিন—আজ পর্যন্ত—আধিপত্য বিস্তার করে আছে। তা ছাড়া ধর্মের উৎপত্তির দিন থেকেই কমবেশী কিছু কিছু ম্যাজিক অনুষ্ঠান তার সঙ্গে মিলে ছিল।

ধর্মের উৎপত্তির কারণ নিঃসন্দেহে ম্যাজিকের ব্যর্থতা। প্রকৃতিকে আয়ত্তাধীন করবার চেষ্টাতেই মানুষ ম্যাজিক সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সে দেখল যে তার অনুষ্ঠান বার বার বন্ধ্যা বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে। আগে তার ধারণা ছিল যে সে প্রকৃতিকে ইচ্ছা ও প্রয়োজন মত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে; কিন্তু ক্রমে তাকে সে ভুলের স্বর্গ থেকে বিদায় নিতে হল। সেদিনের মানুষের উদ্বেগ ও অস্থিরতা আমরা কিছুটা কল্পনা করতে পারি—পায়ের তলায় তার বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে ফাটল ধরেছে, চারিদিকে সংশয় ও অনিশ্চয়তার অকূল সমুদ্র, প্রাকৃতিক বিরুদ্ধতার ঢেউ

বার বার তার গায়ে আছড়ে এসে পড়েছে, বিক্ষুব্ধ ও হতবুদ্ধি মানুষ তখন নতুন বিশ্বাসের কোলে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত হতে চাইল।

সেই বিশ্বাসই ধর্ম। এই বিশ্বপ্রকৃতি যদি আমার কথা মত না চলে, তবে এটা অন্য আর কেউ নিশ্চয়ই চালাচ্ছে, এবং সেই আর কেউ নিশ্চয়ই আমার চেয়ে ও প্রকৃতির চেয়ে বেশী শক্তিসম্পন্ন, এই হল তার মনোভাব। প্রকৃতির যে অংশ মানুষের কাছে অজ্ঞাত, তার কাছে মাথা নত করল মানুষ এবং তার নিজের কল্পনা থেকেই দেবতার সৃষ্টি করল।

এ দিক দিয়ে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের মৌলিক তফাৎ। প্রকৃতিকে নিজের কাজে লাগাবার চেষ্টার দুটো দিক আছে; একটা হল মানুবের অক্ষমতার দিক, দুর্বলতার দিক, নেতিবাচক (Negative) দিক—এরই উপরে ধর্মের ভিত্তি; আর একটা দিক হল এর উল্টো অর্থাৎ সেই চেষ্টার ইতিবাচক (Positive) দিক—এরই উপরে বিজ্ঞানের ভিত্তি। এই বিরোধের জন্যই, বিজ্ঞানের যখন বিশেষ বিকাশ হয় নি, তখন সমাজে ধর্মের আধিপত্য খুব বেশী ছিল, আবার বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের প্রভাব খর্ব হচ্ছে। বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত চিন্তাটা এই যে, বিশ্বটা হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত বাস্তবিক বিকাশ পদ্ধতি, এবং এই পদ্ধতির জ্ঞান অর্জন করে তবেই তাকে প্রভাবিত করা যেতে পারে। ধর্মের দিক থেকে যে ঘটনা ঈশ্বরের ইচ্ছা মাত্র, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সেটা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ উপায়ে বাস্তবিক ভাবে বিশ্লেষণযোগ্য। ধর্মের চোখ অতিপ্রাকৃত শক্তির দিকে, বিজ্ঞানের চোখ প্রাকৃত শক্তির দিকে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের যেমন তফাৎ, আবার ম্যাজিকের সঙ্গেও তার তফাৎ আছে। ম্যাজিক এক ভ্রান্ত ভাবানুষঙ্গ দ্বারা চালিত, এবং প্রকৃতির নিয়মের দুর্লঙ্ঘ্যতায় বিশ্বাসী। ধর্ম প্রাকৃতিক নিয়মের নমনীয়তায় বিশ্বাসী।

এই বিরোধ সত্ত্বেও কিন্তু ধর্মের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিক জিনিসটা সমাজ বিলুপ্ত হয়ে গেল না। কারণ ছিল তার।

প্রথমত, কোন বিশ্বাসই সমাজ থেকে রাতারাতি মুছে যায় না, বিশেষ করে অনগ্রসর সমাজে তো নয়ই। দ্বিতীয়ত, অনুষ্ঠিত কার্যাবলীর অব্যবহিত পরে বা একটু দেরীতে ঈপ্সিত ঘটনা ঘটত বহু স্থানে—ঘটত অবশ্য প্রাকৃতিক নিয়মেই। যেমন, বৃষ্টির আহ্বানে কোন ম্যাজিক অনুষ্ঠান করা হল, বৃষ্টি, একটু দেরীতে হলেও হবে নিশ্চয়ই—প্রকৃতির বিধান

সেটা। আর কোন সময় যদি নিরংকুশ ব্যর্থতা আসতই, তবে মানুষ ভাবত যে তার অনুষ্ঠানের ত্রুটি ঘটেছে।

তৃতীয়ত, ম্যাজিক অনেক সময় কিছুটা মনোবল বাড়াত। এবং সেই মনোবল বাস্তব সাফল্য আনতে সহায়তা করত। মনোবল অবশ্য বৃষ্টিকে ডেকে আনতে পারে না। কিন্তু ফসলের বৃদ্ধির জন্য মানুষের যে অনুকরণ-মূলক নৃত্য তার মূলে বিশ্বাস ছিল যে এর প্রভাবেই ফসল বাড়বে; এবং এই বিশ্বাস থেকে তারা যে মনোবল পেত তাতে তাদের কাজ করবার উৎসাহ বেশী আসত ও পরিণামে কিছু বাস্তব সাফল্য-ও ইনাম মিলত।

প্রধানত এই কারণগুলির জন্যই ম্যাজিক সমাজ থেকে একেবারে অবলুপ্ত হ'য়ে গেল না। দু'য়ের মধ্যে যেন আপোষ হল। দু'য়ের মিশ্রণ ঘটল—একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে চ'লতে লাগল তারা। এই মিশ্রণের উদাহরণ আগেই দিয়েছি —ম্যাসিডোনিয়ার গ্রীকদের অনুষ্ঠানটি, বা আমাদের 'মেঘ্যারাণীর কুলা নামানো,' অথবা আমাদের বসুধারা ব্রত। বিরোধ সত্ত্বেও আপোষ, এ আমাদের আজকের জীবনে ধর্ম ও বিজ্ঞানের আপোষ-চেষ্টার মত। ছেলের অসুখ হ'লে আমরা ডাক্তার ডাকি, মানতও করি।

এই মিশ্রণ কতকগুলি ব্রতে এমন একাত্ম হ'য়ে ঘটেছে যে তার বিশ্লেষণ দুষ্কর; কতকগুলি ক্ষেত্রে আবার ধর্ম ম্যাজিক-অংশকে প্রায় মুছে ফেলেছে। তা সত্ত্বেও, সব ব্রত ভালভাবে দেখবার পর এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে হয় যে ব্রতের মূল প্রেরণা হচ্ছে ম্যাজিক। সেইটাই তার জাত-পরিচয়; তার পরে নানা ধর্ম অবশ্য তাকে দীক্ষিত করে রঙ-বেরঙয়ের ফোঁটা তিলকের ছাপ দিয়ে তার চেহারাটা খানিক পালটে দিয়েছে।

ধর্মের দু' পোঁচ রঙ লেগেছে ব্রতে। এক, প্রাক্-আর্য ধর্ম, দুই আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম।

ব্রত মূলত প্রাক্-আর্যদের জিনিষ বলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তাকে প্রথমে স্বীকার করতে চায় নি। এমন কি ব্রাহ্মণ্যধর্ম-বিরোধী বৌদ্ধরাও চায় নি। বৈদিক গ্রন্থে বা কোন প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র, ধর্মসূত্র প্রভৃতির কোথাও কোন লোক-সমাজ-চলিত ব্রতের স্বীকৃতি নেই, উল্লেখও নেই। বৌদ্ধ সম্রাট অশোক পরিষ্কার ভাবেই বলে গেছেন যে তিনি গ্রামাঞ্চলের লোকপ্রিয় ধর্মের আচারানুষ্ঠান অপছন্দ করতেন; বিশেষ করে তাঁর খারাপ লাগত নারীসমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলি। এ সমস্ত পরিত্যাগ করে অশোক-অনুমোদিত ধর্ম-

মঙ্গলের আশ্রয়ে আসবার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন।* নারীদের অনুষ্ঠানগুলি বলতে ব্রতানুষ্ঠানও অন্তর্ভুক্ত ছিল বলেই মনে হয়।

কিন্তু দেশজ অনুষ্ঠানগুলি দেশের মানুষের জীবনের সঙ্গে একেবারে মিশে ছিল—সে-গুলি থেকে মানুষগুলিকে আলাদা করা ছিল অসম্ভব; অথচ বিরোধ ও সংঘাত সত্ত্বেও পাশাপাশি বাস করার ফলে আর্য-অনার্যের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে একটা বোঝাপাড়াও হচ্ছিল। অনার্যরা যখন আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে গৃহীত হতে আরম্ভ করল, সঙ্গে সঙ্গেই তারা সেই গণ্ডীর প্রবেশ-দ্বারে তাদের আচার-ব্যবহার-বিশ্বাস ত্যাগ করে এল না; কাজেই স্মার্তদের সেগুলি মেনে নিতে হ'ল। বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতে অনার্য ব্রতকে স্থান দেওয়া হ'ল এবং ব্রাহ্মণরা এতে পৌরোহিত্যও আরম্ভ করলেন; স্বভাবতই এতে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবও প্রচুর পড়ল। এ প্রভাব সত্ত্বেও মূলের দিকে তাকিয়ে অবশ্য একে লৌকিক ব্রত ব'লতে আপত্তি নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে, লৌকিক ব্রতের তিনটি শ্রেণীবিভাগ আছে। প্রথম, যে ব্রতে তার জন্ম-কালের ম্যাজিক-অংশটা বেশ স্পষ্ট আছে, কোন ধর্মের আড়ালে চাপা পড়ে যায় নি। দ্বিতীয়, যে ব্রতে অনার্য ধর্মের ছায়া পড়েছে, কিন্তু আর্য ধর্মের পড়ে নি। তৃতীয়, যাতে আর্যধর্মেরও ছায়া পড়েছে।

কিন্তু এ-গুলি হচ্ছে অতি-সূক্ষ্ম শ্রেণীবিভাগ। সাদামাটা ভাষায় ব'ললে ব্রত দু' রকমের। এক, লৌকিক ব্রত, এতক্ষণ যার কথা বলেছি এবং সূক্ষ্ম-ভাবে ভাগ করলে যার তিনটি ভাগ। এ ছাড়া আর এক প্রকার ব্রতের নাম দেওয়া যেতে পারে, পৌরাণিক ব্রত। স্মার্তরা লৌকিক ব্রতের জনপ্রিয়তাকে লক্ষ্য করে মূলত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেব-দেবী বা অনুষ্ঠানকে ব্রতের ছাঁচে ঢেলে জনপ্রিয় করবার চেষ্টা করেছেন—এই ব্রতগুলিই পৌরাণিক ব্রত। ব্রতের নাম আছে এতে, কিন্তু ব্রতের প্রাণ নেই; লৌকিক ব্রতের অনুকরণে এ-গুলি কৃত্রিমভাবে তৈরী করা মেকি জিনিস। এ-গুলির স্বরূপ আবিষ্কার বিশেষ শক্ত নয়। যেমন, জন্মাষ্টমী ব্রত, কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টায় এটি পরিকল্পিত।

কতকগুলি ব্রত ব্রাহ্মণেরা সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র নিজেদের ধনপ্রাপ্তির জন্য। যেমন, গুপ্তধন ব্রত। সন্দেশের মধ্যে সোনাদানা বা টাকাপয়সার

---

* Bhandarkar, Asoka. পৃঃ ৩২২-২৩।

'গুপ্তধন' দেওয়া হয় ব্রাহ্মণকে। আদরসিংহাসন ব্রতের অনুকরণে সৃষ্ট হল আইওসংক্রান্তি ব্রত ও ব্রাহ্মণাদর ব্রত।

কতকগুলি পৌরাণিক ব্রতে আবার বিশেষ তিথির মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে। যথা, অঘোরচতুর্দশী, ভূতচতুর্দশী ইত্যাদি। এই তিথি-মাহাত্ম্য প্রচারে লৌকিক ব্রতও কিছুটা প্রভাবিত হয়েছে—অনেক লৌকিক ব্রত নির্দিষ্ট তিথিকে আশ্রয় করেছে। এ ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে পরবর্তী যোজনা। গোড়ায় লৌকিক ব্রতগুলি তিথি মেনে হ'ত না, হত ঋতু মেনে। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির এক এক চেহারা—সেই বিভিন্ন মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে প্রাচীন কালের মানুষের যে আচার-ব্যবহার-অনুষ্ঠান ক'রত তাই বিধৃত হয়ে আছে ব্রতে। এক এক ঋতুতে এক এক রকম তার মানসিক প্রতিক্রিয়া, এবং আলাদা তার অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের বিভিন্নতাও লৌকিক ব্রতের একটি বৈশিষ্ট্য। পৌরাণিক ব্রত যে উদ্দেশ্যেই করা হোক না কেন, তার অনুষ্ঠান একই। লৌকিক ব্রত যত রকমের, তার কামনা যত রকমের, তার অনুষ্ঠানও তত রকমের। পূর্ণিপুকুরে পুকুর কেটে তাকে জল দিয়ে ভরে দেওয়া দরকার, তোষলা ব্রতে গোবরের সারমাটিতে সবুজ তৃণ রোপণ করতে হবে, শস্যপাতা ব্রতে শস্যের অংকুরোদ্গম করাতে হবে, নখছুটের ব্রতে আবার ব্রতিনীর নখমাংসের ভার নামবে; শুধু এই ক্রিয়ায় নয়, আলপনায়, ছড়ায়, গীতে, নৃত্যে ব্রতিনীর কামনা একটা বিকশিত রূপ নেবে।

পৌরাণিক ব্রত কিন্তু এমন নয়; সেখানে কামনা যাই হোক, অনুষ্ঠান প্রায় একই। 'ব্রতমালাবিধানে' আমলকীদ্বাদশী ব্রতের বিধান এইরকম: প্রথমে স্বস্তিবাচনপূর্বক "ওঁ সূর্যসোমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পড়া, তার পর সংকল্প—ওঁ আদ্যেতানি মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে দ্বাদশ্যান্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকা দেবী (শূদ্রের বেলায় দাসী) পুত্রপৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্ন সন্ততিধনধান্য-সৌভাগ্যাদি প্রাপ্যন্তে বিষ্ণুলোক-গমনকামা অদ্যারভ্য একবর্ষ পর্যন্তং প্রতিমাসীয় শুক্লদ্বাদশ্যাং গণপত্যাদি দেবতাপূজাপূর্বকং বা সলক্ষীকবিষ্ণু-পূজামলকীযুক্তভোজ্যদানপূর্বকং ব্রহ্মপুরাণোক্ত বিধিনামলকীদ্বাদশীব্রতমহং করিষ্যে—এর পরে সামান্য কাণ্ডের অন্য অনুষ্ঠানগুলি, তার পরে ব্রতকথা শোনা। এই হ'ল ব্রহ্মপুরাণোক্ত আমলকীদ্বাদশী ব্রত। অন্যপুরাণোক্ত অন্যান্য ব্রতও মোটামুটি এই রকমই। সামান্য অদল-বদল হয়তো আছে—

কিন্তু সে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। ঐ সামান্যকাণ্ডটি সব পৌরাণিক ব্রতেই আছে। সামান্যকাণ্ডটি কিন্তু মোটেই সামান্য নয়; এর মধ্যে আছে—(১) মন্ত্রসহ আচমন, (২) আতপতণ্ডুল নিয়ে ব্রাহ্মণদ্বারা স্বস্তিবাচন, (৩) কর্মারম্ভ, (৪) সংকল্প, (৫) ঘটস্থাপন, (৬) পঞ্চগোব্য শোধন, (৭) শান্তিমন্ত্র, (৮) সামান্যার্ঘ, (৯) আসনশুদ্ধি, (১০) ভূতশুদ্ধি, (১১) ন্যাসাদি—মাতৃকান্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস ইত্যাদি, (১২) বিশেষার্ঘস্থাপন। ভূজিজ-উৎসর্গ এবং ব্রাহ্মণকে দান-ধ্যান করবার ও দক্ষিণা দেবার রীতি এই সময়। তারপর 'রোচনার্থে ফলশ্রুতি,' ব্রতে যাতে রুচি আসে, সেইজন্য এই ব্রত করার ফলটি শোনা। এটি শোনা হত ব্রতকথার মাধ্যমে।*

পৌরাণিক ব্রতকথারও দু'একটা বেশ বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমে আরম্ভ হবে 'অমুকেন উক্ত' বলে; এই অমুকটি হয় শিব, বা কৃষ্ণ, বা ভীষ্ম ইত্যাদি ধরণের পৌরাণিক লোক; কৃত্রিম ব্রতে যাতে কেউ সন্দেহ প্রকাশ না করে সেইজন্যে এঁদের নাম জুড়ে দেওয়া হল। এই পদ্ধতির প্রভাব কিছুটা লৌকিক ব্রতেও এসে পড়েছে—ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম গ্রহণ করবার সময় এদের কপালে পুরাণখ্যাত নামের ছাপ দিয়ে দেওয়া হত।

পৌরাণিক ব্রতকথা শেষ হত সাধারণত ইহলোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-প্রাপ্তিতে ও অন্তে বৈকুণ্ঠ-লাভের নিশ্চয়তায়। তারপরে ভয় দেখানো থাকত—এ ব্রত না করলে অনন্ত নরকভোগ, কুম্ভীপাক ইত্যাদি। লৌকিক ব্রত যখন সৃষ্টি হয়েছিল তখন মানুষ বৈকুণ্ঠ-লাভের জন্য তেমন ব্যস্ত ছিল না, ব্যস্ত ছিল বেঁচে থাকবার জন্য; আর তখন সমস্ত সমাজের এতে সক্রিয় সহযোগিতা ছিল বলে কাউকে কুম্ভীপাকের ভয় দেখানোর প্রয়োজন হত না।

খাঁটি ব্রাহ্মণ্য, এই কথাটা বোঝাবার জন্য যেমন ঐ পুরাণখ্যাত নামগুলি জুড়ে দেওয়া হয়েছে, তেমনি যজুঃ ও সামবেদের কিছু অনুষ্ঠান ও মন্ত্রও রয়েছে পৌরাণিক ব্রতে; এরা বেদের মহিমা পায় নি, আবার লৌকিক ব্রতের সারল্যও পায় নি। এতে বেদ বা ব্রত কোনটারই প্রাণস্পন্দন নেই। বেদে সমস্ত আর্যজাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা-চিন্তা, কামনা-বাসনা ইত্যাদির স্পন্দন অনুভব করা যায়; আর লৌকিক ব্রতে প্রাক্-আর্য জাতির চিন্তা-ভাবনা, কামনা-কল্পনার পরিচয় আছে, কারণ এ-গুলি বাংলাদেশের একেবারে মাটির কাছের জিনিস।

* পঞ্চানন তর্করত্ন ও বীরেশ্বর কাব্যতীর্থ, ব্রতমালাবিধান, বঙ্গবাসী সংস্করণ।

পৌরাণিক ব্রতের দুটি অংশ—সামান্যকাণ্ড ও ব্রতকথা। আর লৌকিক ব্রতে থাকে : (১) আহরণ, অর্থাৎ বিশেষ ব্রতটির জন্য যে জিনিষগুলি দরকার সেগুলি জোগাড় করা ; (২) আচরণ, যে ব্রতের যে আলপনা সেটি আঁকা, গাছের ডাল পোঁতা, পুকুর তৈরী করা ইত্যাদি ; (৩) ছড়া, এ-গুলিকে বলা যেতে পারে এদের মন্ত্র, আলপনার একটি বিশেষ প্রতিচ্ছবিকে ছুঁয়ে থাকতে হবে হাতের ফুল দিয়ে, এবং সেই ছুঁয়ে থাকা অবস্থাতে বিশেষ প্রতিচ্ছবি সম্পর্কিত ছড়াটি বলতে হবে। মাঘমণ্ডল ব্রতের ছাতার প্রতিচ্ছবিতে ফুল ধরে বলা হল :

মুই পুজি গুড়ির ছাতি,
মর লাগি থাকউক সোনার ছাতি।

(৪) ব্রতকথা বা শুধু 'কথা', ব্রতের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাহিনী।

অবশ্য সব ব্রতে এই চারটি অঙ্গই যে থাকে এমন নয়। কমও থাকে।

লৌকিক ব্রতকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এটা শুধু ম্যাজিক মাত্র নয়, শুধু ধর্ম বা উৎসবও নয়, এটা একটা মিশ্র ধরণের আর্ট-ও বটে ; ব্রতের মধ্যে বীজ অবস্থায় আছে চিত্রকলা, সাহিত্য, সঙ্গীত, এমন কি নৃত্য পর্যন্ত ; যতদিন এরা নাবালক ছিল ততদিন এক যৌথপরিবারে এরা বড় হয়েছে, সবাই মিলে-মিশে এক অভিভাবকত্বে বসবাস করেছে, বড় হওয়ার পর এক ঘরে সবার ঠাঁই হওয়া সম্ভব ছিল না, তাই নিজেদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এরা স্বতন্ত্র হয়েছে। লৌকিক ব্রতে এরা অপরিহার্য। অনুষ্ঠানের অঙ্গ এগুলি। পৌরাণিক ব্রতে তা নয়। পৌরাণিক ব্রতে আলপনা যা হোক দিলেই হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে, না দিলেও হয়, কারণ আলপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানের কোন্ যোগ নেই, কেবল অলংকরণের জন্যই এর দরকার। মন্দিরগাত্র কারুকার্যখচিত হোক, বা একেবারে কারুকার্য-হীন হোক মন্দির-বিগ্রহের পূজা ঠিকই হয়। কিন্তু সোনার ছাতির কামনা থাকলে 'গুড়ি'-র (চালগুঁড়োর অর্থাৎ পিটুলির) ছাতি আঁকতেই হবে লৌকিক ব্রতে।

তেমনি লৌকিক ব্রতে ছড়া না হ'লে চলে না, সেটিই মন্ত্র। কিন্তু পৌরাণিক ব্রতের পুরাণ থেকে মন্ত্র ধার নিয়েছে, তাই ছড়া তার পক্ষে অপরিহার্য নয়।

পৌরাণিক ব্রতের মন্ত্র সংস্কৃত—সে-গুলি পড়ে দেবার জন্যে আসে

পুরোহিত। লৌকিক ব্রতের মন্ত্র বা ছড়া বাংলা—একেবারে মেয়েলি বাংলা, সবটাই বলে মেয়েরা, তারাই পুরোহিত।

লোকসমাজ ব্রাহ্মণ্যভাব দ্বারা প্রভাবিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরাও লোকানুষ্ঠানের কিছু কিছু যায়গায় প্রবেশ করেছে! তা সত্ত্বেও লোক-সমাজের বহু অনুষ্ঠানে তাদের ডাক পড়ল না, প্রবেশাধিকার পেল না তারা। কিন্তু অনুষ্ঠানগুলি লোকসমাজে এমনভাবে মিশে আছে যে তাকে স্বীকার না করেও উপায় নেই, তাই প্রবেশদ্বারের বাইরে দাঁড়িয়েই গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিয়ে 'শুদ্ধ' করে নিতে বাধ্য হলেন শাস্ত্রকারেরা বললেন, 'দেশানুশিষ্টং কুলধর্মমগ্র্যং, সগোত্রধর্মং নহি সংত্যজেচ্চ' (—ব্যাসদেব)। স্মার্ত রঘুনন্দন মুনি-ঋষির বাক্য-প্রমাণ না পেয়ে মেয়েদের অনেক ব্রত-আচার-অনুষ্ঠানকে 'যোষিৎব্যবহারসিদ্ধা' বলে মেনে নিয়েছেন।

লৌকিক ব্রতের একটা বিশেষ সামাজিক দিক আছে। ব্রতিনী যেন এখানে একা নয়, সমস্ত সমাজই তার সঙ্গে মিশে রয়েছে। তার কামনাও যেন শুধু নিজের কামনা নয়, গোটা সমাজের কণ্ঠস্বর তার মধ্যে। লৌকিক ব্রত করার বিধি অনেকে মিলে; পৌরাণিক ব্রতে একজনের নামে সংকল্প করা হয়। কিন্তু এখানে যেন সকলেরই সংকল্প। সংকল্পের মধ্যে একটা স্বার্থপরতা আছে—ব্রতের ফলটা আর কারুর নয়, শুধু আমার—এই ভাবটা রয়েছে সংকল্পের আড়ালে; সংকল্প করাবেনও ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, অর্থাৎ তাঁকে দক্ষিণা-দানে তুষ্ট করবার সামর্থ্য যার আছে সেই পৌরাণিক ব্রতের অধিকারী। লৌকিক ব্রতের এমন বাধা নেই। বনের ফুল আর একটু চাল-গোলা যোগাড় করতে পারলেই হল, তাহলেই নারীকুল দল বেঁধে গলা মিলিয়ে সমাজের মঙ্গল-কামনায় গান গেয়ে উঠতে পারে। লৌকিক ব্রতের দুই প্রধান কামনা শস্য ও সন্তান—অনগ্রসর কৃষিসমাজের দুই মৌলিক কামনা। পৌরাণিক ব্রতের কামনা বৈকুণ্ঠলোক; যেখানে বৈকুণ্ঠলোক ছেড়ে পার্থিব কামনাও কিছু আছে, সেখানেও অনুষ্ঠান ব্যক্তিগত প্রার্থনা-উপাসনার চেয়ে বেশী কিছু নয়। কিন্তু লৌকিক ব্রতে তার ছড়ার মধ্যে সামাজিক কামনা আজ নানা প্রবাহে কিছুটা মুছে গেলেও তার অনুষ্ঠানের সামাজিক রূপ আজও বিদ্যমান। একত্রিতভাবে করা হয় তো বটেই, তা ছাড়া ব্রতের স্থানটিও লক্ষ্য করবার মত। লৌকিক ব্রত করা হয় সাধারণত উঠানে, বা নদীতীরে, বা এই ধরণের খোলা যায়গায়, যেখানে প্রবেশের পথ

অবারিত, উদার আকাশের ছত্র-ছায়ায় সেই অনুষ্ঠান ; পৌরাণিক ব্রতের স্থান গৃহাভ্যন্তরে, সেখানে প্রবেশ-পথ সংকুচিত, সেখানে চার দেওয়ালের সীমা বড় সংকীর্ণ—সবার ঠাঁই হয় না ; লৌকিক ব্রতের চার দেওয়াল এ-দিকে মিশেছে গিয়ে দিগন্তের বুকে। একটি ব্যাপার একজনের মধ্যে বন্দী, আর একটি অনেকের মধ্যে রয়েছে ছড়িয়ে।

লৌকিক ব্রতের জন্ম যে সমাজে, সে সমাজ ছিল দৃঢ়সংবদ্ধ (integrated)। গোটা সমাজটাই যেন এক সঙ্গে চলে-ফেরে, হাসে-কাঁদে ; জীবন-মরণ সবার এক সূত্রে বাঁধা। তখনকার অনুষ্ঠান দশের প্রাণে প্রাণ পেয়েছিল। পরে ধীরে ধীরে সমাজ সেই সংহতি হারাতে আরম্ভ করেছে, সামাজিক উৎসব ছেড়ে ব্যক্তিক উপাসনা ও প্রার্থনা তখন প্রাধান্য পেতে সুরু করেছে। তাছাড়াও পৌরাণিক ব্রত উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া জিনিস, আর লৌকিক ব্রতের জন্ম এ দেশের মাটির অন্তঃস্থল থেকে মানুষের জীবনের মধ্যে থেকে।

লৌকিক ব্রতের তুলনায় পৌরাণিক ব্রতের জনপ্রিয়তাও খুব কম। উপরের চাপে এ মাটিকে স্পর্শ করেছে বটে, কিন্তু মাটির মধ্যে শিকড় চালিয়ে দিয়ে প্রাণরস বা দৃঢ় ভিত্তি কোনটাই পায় নি।

আগেই বলেছি, লৌকিক ব্রতের অনুষ্ঠানটা মোটামুটি সামাজিক থাকলেও, ছড়ায় ঢুকেছে কিছুটা আমি-আমি ভাব। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাঘমণ্ডল ব্রতে আমরা 'শত বইন'-এর সাক্ষাৎ পাব :

আয় লো শত বইন জলে রে যাই ;
জলে রে যাইয়া লো ঝাম্পাটি খেলাই।

কিংবা,

খাও খাও লাউল গোটা চারি ভাত ;
আমরা শত বইনে ফেলাম-নে পাত।

অনেক যায়গায় 'আমরা' বলেই কামনাটা বলা হচ্ছে :

আমরা পূজা করি পিঠালির কুটুই,
আমাগো হয় যেন সোনার কুটুই।

পূর্ববঙ্গের তারাব্রতের ষোল (বহু অর্থে, আক্ষরিক অর্থে নয়) 'বতি'র দেখা পাওয়া যাবে :

ষোল ষোল বতির হাতে ষোল সরা দিয়া,
মোরা যাই ইন্দ্রপুরীর নাটুয়া হইয়া।

এ ধরণের উদাহরণ আরো অনেক জড় করে দেওয়া যায়।

দুটো দিকের এই মিশ্রণে বিস্মিত হবার কিছু নেই ; এর মধ্যে রয়েছে—দৃঢ়সংবদ্ধ সমাজের মানস-কামনা এবং আলগা-হয়ে-আসা সমাজের (পুরো Disintegrated নয়, সেটা সামন্ততান্ত্রিক সমাজে হয় নি, হয়েছে শিল্পকেন্দ্রিক ধনবাদী যুগের সমাজে) ব্যক্তিক প্রার্থনা-উপাসনা, এই দুই প্রান্তিক পর্যায়ের অন্তবর্তীকালীন পথযাত্রার স্বাক্ষর। দাঁড়ি-পাল্লায় তুললে অবশ্য লৌকিক ব্রতের সামাজিক দিকটা এখনও ভারী হবে।

যেমন ওরাওঁদের ধানচারা পোঁতবার আগের উৎসব 'হরিআরি' অর্থাৎ সবুজের উৎসব। এটি হবার আগে কেউ ধানচারা পুঁততে পারে না। অনেকে অবশ্য উৎসবের দু'একদিন পরে নিজেরা ব্যক্তিগত 'হরিআরি' করে। আগে করার নিয়ম নেই। একদিন সম্পত্তি বলতে ছিল শুধু সামাজিক সম্পত্তি—তাই মানুষের কামনাও ছিল সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদ-বৃদ্ধি, এবং তারই জন্যে প্রজাবৃদ্ধি ; ক্রমে সমাজের কাঠামো দাঁড়ালো ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে ভিত্তি করে, তার কামনাও হ'ল ব্যক্তিক। কিন্তু পুরো ব্যক্তিক পর্যায়ে পৌঁছতে সময় লেগেছে ; এখানে দেখছি সামাজিক দিক ক্ষয়ে যেতে সুরু করেছে, আর ব্যক্তিক দিক একটু একটু করে মাথা তুলছে—ঠিক আমাদের লৌকিক ব্রতেরই মত। তবে মাথাটা একেবারে উত্তুঙ্গ নয়, সমাজের প্রাধান্য তখনও বাহাল—এই সময়কার ছাপ পড়েছে আমাদের ব্রতেও।

ইয়োরোপীয় কৃষকদের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'মে-পোল'-এও ছোট ছোট 'মে-বৃক্ষ' এনে বসানো হয় সব বাড়ির দরজার সামনে আর একটা বড় 'মে-বৃক্ষ' বসানো হয় গ্রামের মধ্যেখানে। *

॥ দুই ॥

উপরের আলোচনাটি ব্রত-আলোচনার ভূমিকা।

এ সম্পর্কে আরো দুটি-একটি প্রশ্ন আছে ; সে-গুলিকে আমাদের এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। প্রশ্নগুলি এই ঃ

—সমাজে ম্যাজিকের উৎপত্তি যে ধর্মের আগে হয়েছে তার প্রমাণ কি ?

—ব্রত ও ব্রাত্যে কি কোন সম্পর্ক আছে ?

—ব্রত মেয়েদের একচেটিয়া কেন ?

একে একে প্রশ্নগুলি নেওয়া যাক্।

---

* ফ্রেজার, দি গোল্ডেন ব ও প° ঃ ১২৩।

প্রথম প্রশ্ন।

ম্যাজিকের মূলে মনের ভাবানুষঙ্গের ক্ষমতা। এ ক্ষমতা অতি-অপরিণত মনেও দেখা যায়। এমন কি, পশু-প্রাণীর মধ্যেও সাদৃশ্য বোঝা, এবং সেটাকে কাজে লাগাবার ক্ষমতা বর্তমান। কিন্তু তাদের পক্ষে নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক দৃশ্যের অন্তরালে কোন অদৃশ্য শক্তিমান প্রাণীর কল্পনা সম্ভব নয়। এর জন্য অধিক চিন্তাশক্তির প্রয়োজন।

এই মতবাদ হাতে-কলমে পরীক্ষিত ও সমর্থিত হয়েছে আদিম অধিবাসীদের জীবন থেকে। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা আদিমতম—মানুষের জ্ঞানের পরিধি আজ পর্যন্ত যতটুকু সেই হিসেব অনুসারে। এই আদিমতম মানুষদের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই;—তাদের বসবাস ঈশ্বরের রাজত্বের বাইরে, তারা ঈশ্বরকে সেলাম করে না, পূজা-প্রার্থনা-বলিদান কিছুই দেয় না, ঈশ্বরের কোন খবরই তাদের মস্তিষ্কে নেই। কিন্তু ম্যাজিকের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান তাদের মধ্যে ব্যাপক।১

মানব-সংস্কৃতির বস্তুগত দিকে যেমন একটা প্রস্তর-যুগ রয়েছে, তেমনি তার মনীষার (intellect) দিকে রয়েছে একটা ম্যাজিক যুগ।

ম্যাজিকের নেতিবাচক দিকটাকে বিকশিত করল ধর্ম, আর ইতিবাচক দিকটাকে বিজ্ঞান। দীর্ঘকাল এ দুটো এক সঙ্গে মিশে ছিল অভিন্নভাবে। আদি-বিজ্ঞানীরা সকলেই পুরোহিত; তাদের বিজ্ঞানের জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়ে ছিল ম্যাজিকের চিন্তাধারায়।

পুরোহিতের হাতে সমস্ত অধিবাসীদের মঙ্গলের একটা দায়িত্ব থাকত; ধর্মের প্রথম যুগে এই পুরোহিতকে সবাই পূজা করত, ঈশ্বরকে নয়; ঈশ্বরের মত একটা অপ্রত্যক্ষ অদৃশ্য অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌ট্‌ জিনিষ তাদের কল্পনায় আসত না, চোখের সামনের জলজ্যান্ত ঈশ্বর পুরোহিতকে তারা বুঝত। প্রথম যুগে পুরোহিত ও ভগবানকে ভাবা হত অভিন্ন, পরবর্তীকালে পুরোহিতরা ভগবানের অবতার বা পৃথিবীতে ভগবানের প্রতিনিধি হিসাবে পূজা পেতেন। নানা বস্তু, খাদ্য-সম্ভার ইত্যাদি দিয়ে তুষ্ট করা হত পুরোহিতকে; দেবতাকেও তাই করা হয়।২ দেবতা ও পুরোহিতের অভিন্নত্বের প্রচুর

---

১ ঐ পৃষ্ঠা ৫৫।

২ Thompson An Essay on Religion, P. 10.

চিহ্ন 'অসভ্য' সমাজগুলিতে আজও বর্তমান আছে ; আমরা আজও ব্রাহ্মণকে দান-ধ্যান করে বা খাইয়ে ভাবি দেবতা তুষ্ট হলেন।

পুরোহিত ও ঈশ্বরের হরিহরাত্মা-অবস্থা ঘুচে পরস্পর যখন বিশ্লিষ্ট হতে আরম্ভ করল, তখন গোড়ার দিকে পুরোহিতের চরিত্রবৈশিষ্ট্যগুলিই ঈশ্বরে আরোপিত হল ; অনুন্নত সমাজের অপশক্তিমান (malevolent) দেবতা-পরিকল্পনার মূলে এই পুরোহিতদের গুণাবলীর কিছুটা অভাব আছে। মনে রাখতে হবে যে এ পুরোহিত শিখাগ্রে পুষ্প-সম্বলিত, কুশতৃণ, ভুল-সংস্কৃত-পড়া, ছাঁদা-বাঁধা আজকের টুলো পণ্ডিত বা ভট্চায বামুন নয়, সে একাধারে ঐন্দ্রজালিক, পুরোহিত ও গোষ্ঠিপতি।

তখনকার দেবতার অবশ্য অপশক্তিমান রূপ হবার আরো অকটা বড় কারণ আছে। সে যুগে মানুষ তখনও প্রকৃতিকে জয় করে উঠতে পারে নি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সামনে সে তখন অসহায়. প্রকৃতি তখন তার কাছে নির্দয়, হিংস্র ; প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা দেবতারাও হলেন তাই, কারণ প্রাকৃতিক বিরুদ্ধতা তো তাঁদেরই চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ।

পরে প্রকৃতি যখন সদয় হয়েছে, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা দেবতাদের চরিত্রও ক্রমে সদয় হিসাবে কল্পিত হয়েছে। এই দুই ধারার মিশ্রণ প্রায় সব প্রাক-আর্য দেবদেবীতে লক্ষ্য করা যায়।

॥ তিন ॥

দ্বিতীয় প্রশ্ন—ব্রত ও ব্রাত্য প্রসঙ্গে। শব্দ দুটোর ধ্বনি-সাদৃশ্য আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু দুটোর মধ্যে মূলত সামাজিক দিক দিয়ে কি কোন সম্পর্ক ছিল ?

এই সম্পর্কে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন, 'আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যাঁহাদের বলিয়াছে 'ব্রাত্য' বা পতিত তাঁহারা কি ব্রতধর্ম পালন করিতেন বলিয়াই ব্রাত্য বলিয়াই অভিহিত হইয়াছেন এবং সেইজন্যই কি আর্যরা তাঁহাদের পতিত বলিয়া গণ্য করিতেন ? বোধহয় তাহাই।' এ প্রসঙ্গে ডঃ রায় আরো বলেছেন, 'ঋগেদীয় আর্যরা ছিলেন যজ্ঞধর্মী আর্যদের বাহিরে যাঁহারা ব্রতধর্ম

পালন করিতেন, ব্রতের গুহ্য যাদুশক্তি বা ম্যাজিক বিশ্বাস করিতেন তাঁহারাই হয়তো ছিলেন ব্রাত্য।'১

ডঃ রায় 'ব্রত' শব্দটি কেবলমাত্র অনার্যদের অনুষ্ঠানেই আরোপ করেছেন। কিন্তু ব্রত তো আর্যদেরও ছিল (দু' জাতের ব্রতে মৌলিক পার্থক্য অবশ্য ছিল)। দুটোরই সাধারণ নাম একটা—ব্রত; এবং এ শব্দটা নিঃসন্দেহে আর্য-ভাষা সম্ভূত; আর্য-ভাষা গ্রহণ করবার আগ অনার্যদের হয়তো এর আলাদা নাম ছিল, পরে আর্যদের দেওয়া নামটিই চলে গেছে। সুতরাং ব্রত করত বলেই ব্রাত্য বলা হত এ কথা বলা চলে কি? তাহলে তো আর্যরাও তার মধ্যে অন্তর্ভূত হয়ে যায়।

পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে২ ব্রতের সংজ্ঞা দিয়েছেন 'ব্রিয়তে ইতি অনেন' অর্থাৎ ব্রত দ্বারা নির্বাচন করা হয়; কি করণীয় কি গ্রহণীয় কি গ্রহণীয় এটি বাছাই করাই ব্রত। পতঞ্জলি ব্রতকে গ্রহণ করেছেন 'বিনয়' বা 'নিয়ম' অর্থে। এই ব্রত (একে বলা যাক 'নিয়ম-ব্রত') আর্যদের মধ্যে ছিল, তারা এদেশে এসে এখানকার লোকের আচার-আচরণ দেখল অন্যরকম, এদের তারা ডাকল 'অন্যব্রত' বলে।৩ অন্যব্রত কথাটাই প্রমাণ করে যে আর্যদের এক ধরণের ব্রত ছিল।

(এখানে মনে রাখতে হবে যে এই নিয়ম-ব্রত ও পৌরাণিক ব্রত এক নয়। নিয়ম-ব্রত আর্যদের মধ্যে ছিল, তারা এদেশে এসে দেখল লৌকিক ব্রত—যা ম্যাজিক ও ধর্মের সংমিশ্রিত (magico-religious) সামাজিক অনুষ্ঠান এবং যাতে কামনাটা অনুকরণাত্মক ক্রিয়ায়, চিত্রে, গীতে, ছড়ায়, নৃত্যে ইত্যাদির মধ্যে বেশ দেখা যায়। এই লৌকিক ব্রতের জনপ্রিয়তাকে লক্ষ্য ক'রে শাস্ত্রকাররা তার অনুকরণে হিন্দু দেবদেবীকে জনপ্রিয় করবার জন্য যে নকল ব্রত গড়লেন তাকে বলেছি পৌরাণিক ব্রত।)

ব্রাত্য-প্রসঙ্গে আরও দু'একজনের মতামত নেওয়া যাক—দেখা যাক তাঁরা কি বলেন।

ডঃ সুকুমার সেন পাটনায় তাঁর এক সম্প্রতি-দত্ত অভিভাষণে বলেছেন যে, যে দু' দল আর্য ভারতে প্রাচীনকালে এসেছিল তার প্রথম দলটিই ব্রাত্য-আর্য।

১ ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃঃ ৫৮২।

২ মাধব শাস্ত্রী ভাণ্ডারী, পতঞ্জলি-মহাভাষ্য, পৃঃ ২৩।

৩ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত, পৃঃ ৯।

এরা পরবর্তী দলটির চাপে কোণঠাসা হ'য়ে ভারতের পূর্বাঞ্চলকে আশ্রয় করেছিল। এদের আচার-ব্যহার পরবর্তী আর্যদের থেকে কিছুটা পৃথক ছিল। এদের ভাষার জন্যেই পূর্বী প্রাকৃত কিছুটা বেশী পুরাতন অন্য প্রাকৃতের চেয়ে। এই পূর্বাঞ্চল থেকেই ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী যে সব ধর্মমতের আবির্ভাব হয়েছিল, তার মূলেও এদের প্রভাব আছে। ব্রাত্য কথাটি এসেছে ব্রাত (সম্প্রদায়, গোষ্ঠি বা **community**) থেকে। ব্রাত্য-আর্যরা ছিল খুব গণতান্ত্রিক—তাদের সমাজ চলত ব্রাত-ভিত্তিতে। ব্রাহ্মণ্য-আর্যদের সমাজ চলত গ্রাম-ভিত্তিতে তাই এরা গ্রাম্য বা গ্রামীণ, আর ওরা ব্রাত্য।

ব্রাত্য-প্রসঙ্গে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত হচ্ছে, 'বিহার অঞ্চলে যে সব আর্যেরা প্রথম এসে বসবাস করে, তারা ঘরবাসী কৃষাণ-জাতীয় ছিল না, তারা ছিল যাযাবর বা ভবঘুরে, তারা তাদের ঘোড়া-গরু-ছাগল-ভেড়া নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াত, পশ্চিমা ঘরবাসী চাষী আর্যেরা তাদের নাম দিয়েছিল 'ব্রাত্য'। তারা অবশ্য আর্যভাষা ব'লত,...আর তাদের ধর্মও ছিল বৈদিক ধর্ম থেকে আলাদা—খুব সম্ভব তারা শিবের উপাসনা করত, তারা বৈদিক যাগযজ্ঞ হোম অগ্নিপূজা ইত্যাদি করত না, আর ব্রাহ্মণ-পুরোহিতকেও মানত না। বেদমার্গী পশ্চিমা আর্যেরা এই সব কারণে তাদের অবজ্ঞা করত, আর ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে তাদের সম্বন্ধে নানান নিন্দার কথা লিখে গিয়েছে। বৈদিক আর্যেরা এদের শুদ্ধি করে বেদমার্গী ক'রে নিতে খুব ;—যে অনুষ্ঠানের দ্বারা এরা বৈদিক দীক্ষা নিত, সে অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'ব্রাত্য-স্তোম'। খুব সম্ভব এই ব্রাত্যরা অনার্য দ্রাবিড় লোকদের সঙ্গে কতকটা মিশে গিয়েছিল, সে যুগে জাতিভেদের এত কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না, আর ব্রাত্য-আর্যরা মধ্যদেশীয় আর্যদের দ্বারা স্বীকৃত বর্ণভেদ মানতই না।.....আর এটা খুবই সম্ভব যে, তারা বৈদিক ধর্ম গ্রহণ ক'রলেও, সে ধর্ম তাদের মধ্যে তেমন দৃঢ় হ'তে পারে নি।'*

এঁদের মতের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। এঁরা ব্রাত্যকে ব্রতের সঙ্গে সম্পর্কিত করেন নি।

সুনীতিবাবু এদের বলেছেন 'ভরঘুরে'। ব্রতের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে এর সঙ্গে কৃষি-জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ; সুতরাং যারা 'ঘরবাসী কৃষাণ-জাতীয়' নয়, তাদের যাযাবর জীবনে ব্রতের উদ্ভব হওয়া খুব স্বাভাবিক নয়।

*ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, পৃঃ ৪৫-৪৬।

ব্রাত্য সম্পর্কে নানা উৎস থেকে আর যে খবর পাওয়া যাচ্ছে, তা খুবই গোলমেলে এবং তার সঙ্গে কোন ক্ষেত্রেই ব্রতের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

অথর্ব-বেদের পঞ্চদশ কাণ্ডে ব্রাত্যের অনেক প্রশংসা আছে। কিন্তু এ ব্রাত্য হয়তো ব্রাত্য জাতির সঙ্গে এক নয়, কারণ এখানে পরম এক ব্রাত্যের কথা বলা হ'য়েছে। প্রশ্নোপনিষদেও এই রকম দেখা যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন (১।৩৭-৩৮)—ব্রাহ্মণের ষোলো বছর, ক্ষত্রিয়ের বাইশ বছর ও বৈশ্যের চব্বিশ বছরই উপনয়ন সংস্কারের চরম কাল। উক্ত কালের পর উপনয়ন সংস্কার না হ'লে তারা সাবিত্রী পতিত হ'ল বলে 'ব্রাত্য' এবং পতিত হ'ল। এদের 'ব্রাত্য স্তোম' নামক যজ্ঞ না ক'রলে আর কোন ধর্মেই অধিকার থাকবে না।

বশিষ্ঠ (১১), পারস্কর (২।৫।৪০), আপস্তম্ব (১।২।২৯)—এঁরা বলেছেন —ব্রাত্যদের উপনয়ন করাবে না, অধ্যয়ন করাবে না, যাজন ক'রবে না, বিবাহ করবে না, তাদের কাছে যাবে না, ইত্যাদি। অর্থাৎ একঘরে ক'রে রাখবার বিধান দিয়েছেন এঁরা।

মনু ব্রাত্যদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন (১০।২০)—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সবর্ণা স্ত্রীতে যে যে পুত্র উৎপাদন করে, তারা যদি উপনয়ন-সংস্কার-রহিত হয়, তবে তাদের 'ব্রাত্য' এই নামে অভিহিত করবে।

উপর্যুক্ত শাস্ত্রকারদের বক্তব্যের সঙ্গে সুনীতিবাবুর মতের কিছুটা মিল আছে; তিনিও বলেছেন, ব্রাত্য আর্যেরা ব্রাহ্মণ-পুরোহিতকে মানত না এবং বর্ণভেদও মানত না।

আপস্তম্ব বলেছেন (১।১।২৮)—পিতামহের কাল থেকে যারা ব্রাত্য হ'য়ে আসছে (অর্থাৎ তিন পুরুষ ধ'রে), ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ তাদের ব্রহ্মবধী বলে নির্দেশ করেছেন।

এই নির্দেশ কি কোন ব্রাহ্মণ-ব্রাত্য সংঘর্ষের স্মৃতি বহন ক'রছে? অবশ্য বলা হয়েছে যে ব্রহ্মহত্যা না করলেও যে ব্রহ্মঘ্ন বলা হয় তা শুধু ব্রাত্যদের উপর ব্রহ্মহত্যার মত পাপ চাপিয়ে দেবার জন্য। আর এই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তও নির্দিষ্ট হয়েছ তুষানলাদিত মৃত্যু। অবশ্য স্বর্ণ বা ধেনু ইত্যাদি ব্রাহ্মণকে দান করেও প্রায়শ্চিত্ত করা যেতে পারে।

মনু বলেন (১০।২১-২৪)—ব্রাত্য-ব্রাহ্মণ থেকে যে পুত্র জন্মে সে হয়

অতিনিকৃষ্ট ভূর্জকণ্টক জাতি, উক্ত ভূর্জকণ্টক জাতিকেই কোন কোন দেশে আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ, শৈশ বলে থাকে; ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়ের পুত্রেরা হয় ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খশ, দ্রবিড় ইত্যাদি; ব্রাত্যবৈশ্যের পুত্রেরা হয় সুধন্বাচার্য, কারুষ, বিজন্মা, মৈত্র, সাত্বত ইত্যাদি।

মনু ব'লছেন, ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়েরা দ্রবিড় হ'য়ে যায়; সুনীতিবাবু বলেছেন, 'খুব সম্ভব এই ব্রাত্যরা অনার্য দ্রাবিড় লোকদের সঙ্গে কতকটা মিশে গিয়েছিল।' এইটুকু মিল দেখে যতটুকু আশার কারণ আছে, তার থেকে বেশী আছে হতাশ হবার কারণ মনুর এই আলোচনায়। তিনি এখানে 'জাতির' নামগুলি একেবারে নির্বিচারে বসিয়ে দিয়েছেন; পেশাগত (যথা, করণ), দেশগত (যথা, আবন্ত্য), জাতিগত (যথা, দ্রাবিড়) ইত্যাদি নানা দিকের শ্রেণী এর মধ্যে ঢুকিয়ে সব তালগোল পাকিয়ে দিয়েছেন; ফলে ইতিহাসের দিক দিয়ে এর মূল্য বিশেষ কিছু নেই ব'ললেই চলে।

অবশ্য কেউই ব্রতকে ব্রাত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করেন নি।

ব্রাত্যদের সম্পর্কে গবেষণা এখনও করবার আছে। সেই গবেষণায় যদি ব্রতের সঙ্গে ব্রাত্য সম্পর্কিত হয়, তবে সেই তথ্যের ভিত্তিতেই সেটা স্বীকৃতি পেতে পারে, নচেৎ নয়।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় নিজেও বলেছেন, 'ব্রতের সঙ্গে ব্রাত্যদের সম্বন্ধ কোন অকাট্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠা করা কঠিন, তবে এই অনুমান একেবারে অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক নাও হইতে পারে।'*

এ প্রসঙ্গে ডঃ নীহারবঞ্জন রায় বলেছেন যে ব্রত এবং 'বরণ' দুটো শব্দেরই মূল বৃ ধাতু, উভয় অনুষ্ঠানেই ম্যাজিকের বিশ্বাস আছে, উভয় অনুষ্ঠানই মুখ্যত মেয়েদের।

এতে কিন্তু ব্রতের সঙ্গে ব্রাত্যের সম্পর্ক নিরূপিত হয় নি।

॥ চার ॥

তৃতীয় প্রশ্ন—ব্রতে মেয়েদের একাধিপত্য কেন? ব্রতের উদ্ভবের দিকে লক্ষ্য রেখে এর উত্তর খুঁজতে হবে।

---

*বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃঃ ৫৮২।

নতুন-কৃষি-শেখা মানুষ বিজ্ঞান জানত না ব'লে শস্য ও সন্তান প্রাপ্তির ব্যাপারে অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে তাকে জীবন যাপন ক'রতে হ'ত। নতুন-কৃষি-শেখা মানব-সমাজের এই দুটোই মূল কামনা। কৃষি আবিষ্কারের আগে মানুষকে যাযাবর জীবন যাপন ক'রতে হ'ত; তখনও শস্য উৎপাদনের কৌশল সে আবিষ্কার করতে পারে নি; শিকার, পশুপালন ও ফলমূল-আহরণ তখন তার কাজ; মুখ্যত সে সংগ্রাহক তখন, উৎপাদক নয়; এই সময় শস্য বৃদ্ধির কামনায় কোন অনুষ্ঠান করা তার পক্ষে অসম্ভব—এ ভাবনা তখন তার মাথায় আসবারই কথা নয়; আর যাযাবর জীবনে সন্তান তো একটি বোঝা-বিশেষ—সহজ চলাচলের বাধা ও অকর্মণ্য হ'য়েও খাদ্যভুক। কিন্তু কৃষি-সমাজে সন্তান কৃষিকাজের সহায়ক!

সন্তান-ধারণে নারীই সক্ষম, এবং শস্য উৎপাদনের প্রথম আবিষ্কারকও খুব সম্ভবত নারী। যে সব মনীষী প্রাচীন সমাজ সম্বন্ধে গবেষণা ক'রেছেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই মত যে কৃষিকাজ নারীর আবিষ্কার। নারী তার গৃহের (তা সে যে ধরণের গৃহই হোক না কেন) আশেপাশে মাটির মধ্যে ফলমূল সঞ্চিত করে রাখবার চেষ্টার ভেতর থেকেই কৃষি আবিষ্কার ক'রেছে। (যে ফলমূল মাটির তলা থেকে খুঁড়ে বার করা হয় তার নাম খন্দ, আমাদের দেশে যে লক্ষ্মী পূজা প্রচলিত তাকেও বহু অঞ্চলে প্রবীণেরা বলেন খন্দপূজা; থেকেও মনে হয় যে লক্ষ্মী মানুষের কাছে তাঁর ধান্যমূর্তির আগেই বোধহয় খন্দমূর্তিতে দেখা দিয়েছিলেন।) প্রথমে ছোটখাটভাবে কৃষিকাজ (বাগান-ক্ষেত বা garden-tillage জাতীয়) মেয়েরাই আরম্ভ করেছিল, পরে পুরুষেরা সেটা গ্রহণ ক'রেছে।

"আফ্রিকার জুলুদের বর্ণনায় ক্রিগ্ বলছেন, আজকের দিনে ওই নিয়মটি (অর্থাৎ কৃষিকাজ মেয়েদেরই হবে) ইয়োরোপীয় সভ্যতার প্রভাবের ফলে বহুলাংশে শিথিল হ'য়েছে; বলদ-জোড়া লাঙলের ব্যবহার শুরু হওয়ার দরুন চাষের কাজ পুরোপুরি পুরুষদেরই হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে, কেননা মেয়েরা পশুকে ব্যবহার করতে পারে না।

'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অব্ রিলিজন্ অ্যাণ্ড্ এথিক্স্'এও কৃষি-আবিষ্কার প্রসঙ্গে স্বীকার করা হ'য়েছে এ আবিষ্কার পুরুষেরা করে নি—মেয়েরাই করেছিল: 'ট্রাইবের পুরুষেরা যখন বনজঙ্গলে শিকারে নিযুক্ত, বা যুদ্ধে রত' মেয়েরা তখন শিশুদের নিয়ে বাস-ভূমির আশপাশে ছুঁচোলো কাঠের টুকরো

পাথরের কুড়ুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তেই কৃষিকাজ আবিষ্কার ক'রেছিল। এই কৃষিকাজের রীতিমত উন্নতি হবার আগে পর্যন্ত কাজের দায়িত্বটা মেয়েদের হাত থেকে পুরুষের হাতে যায় নি।' নজির হিসাবে লেখক দেখাচ্ছেন, মধ্য-ব্রেজিলে কৃষিকাজ যে মেয়েরাই আবিষ্কার করেছিল সে-কথা স্টেইনেন্ ইতিপূর্বেই প্রমাণ করেছেন। এবং জেন্ হ্যারিসনের লেখা থেকে উদ্ধৃতির সাহায্যে দেখানো হয়েছে, আমেরিকার আদিবাসীদের একটি কুসংস্কারের মধ্যে ওই স্মৃতিটিরই পরিচয় পাওয়া যায় যে, কৃষিকাজ শুরুতে শুধুমাত্র মেয়েলি ব্যাপারই ছিল। ওদের ধারণায় মেয়েরা ভুট্টা বুনলে এক-এক বৃন্তে তিন-তিন ভুট্টা হয়। কেন হয়? কেননা মেয়েরা জানে কেমন করে ফলবতী হওয়া যায়। শুধু তারাই জানে গাছও কি করে ফলের জন্ম দেবে।

"রবার্ট ব্রিফল্ট্ একের পর এক উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছেন, মেয়েরাই যে কৃষিকাজ আবিষ্কার করেছিল তার স্মৃতি নানান দেশের আদিম মানুষের নানা উপকথায় আজো টিঁকে রয়েছে। চেরেকি জাতির লোকেরা এখনও বিশ্বাস করে, পৃথিবীর প্রথম নারীই বনের মধ্যে শস্য আবিষ্কার করেছিল, মারা যাবার সময় সেই নারী নির্দেশ দিয়ে যায় যে, মাটির উপর দিয়ে তার শবদেহ টেনে নিয়ে বেড়াতে হবে—জমি সেই শবদেহের স্পর্শে শস্য-শ্যামল হয়ে উঠবে। চেইয়েন্সদের মধ্যেও বিশ্বাস যে, একজন মেয়েই প্রথম শস্য আবিষ্কার করেছিল। ব্রেজিলে টুপিস্দের উপকথায় আছে, একটি কুমারী মেয়ে একবার অন্তঃসত্ত্বা হয়; তার গর্ভজাত শিশুটির মৃতদেহ থেকেই পৃথিবীর প্রথম শস্য জন্মায়। আফ্রিকার দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে নানা আদিবাসীদেরও বিশ্বাস, শস্য আবিষ্কার করেছিল পৃথিবীর এক আদি নারী।

"এই জাতীয় উপকথার ইঙ্গিতকে নিশ্চয়ই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।..."[১]

ব্রিফল্ট্ কৃষি সম্পর্কে বলেছেন যে, এটা ছিল 'Provinces of Woman'।[২]

B. O. R. Ehrenfelsতাঁর 'মাদার-রাইট ইন্ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে পর্যাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন যে, ভারতবর্ষেও কৃষিকাজ নারীর আবিষ্কার।

কৃষি-আবিষ্কার সমাজের অগ্রগতির পথে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ কৃষি-প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নানা পরিবর্তন ও বিভিন্ন নতুন জিনিসের

১ পরিচয়, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬২, পৃঃ ১৯৮-৯৯।

২ The Mothers, Abridged, Ed 1959, P, 207

উদ্ভব হ'ল। সমাজের উপর কৃষির সামগ্রিক প্রভাবের আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক; তবে এই সময়েই সমাজে জাদুবিশ্বাস সম্পর্কিত চেতনা ও অনুষ্ঠান ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে তাতে সন্দেহ নেই।

পশুপালনের তুলনায় কৃষিকাজ জিনিসটা অনেক শক্ত। পশু তার নিজের তাগিদেই চ'রে বেড়ায় ও সংখ্যায় বাড়ে। চারণক্ষেত্র থাকলে এ ব্যাপারে মানুষের আর বিশেষ মাথা ঘামাবার কিছু নেই। কিন্তু কৃষির কার্যশৃংখল অনেক দুরূহ, সময়-সাপেক্ষ, এবং অ-বৈজ্ঞানিকের কাছে ভয়াবহ রকমের অনিশ্চিত; জমি তৈরী করা ও বীজ বোনা থেকে ফসল পাকা পর্যন্ত মানুষকে, মানসিক স্থৈর্যের ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হয়। বীজ থেকে ফলের পথ-পরিক্রমার বিজ্ঞান যার কাছে অজ্ঞাত, তার কাছে এ বড় শক্ত পরীক্ষা—বিশেষ ক'রে এই অনিশ্চিত বিষয়ের সাফল্যের উপর তার জীবন-মরণ নির্ভর করেছে। এই ফসল ফলিয়ে তোলার তাগিদে সে ফসল ফলাবার, বৃষ্টি আনবার জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করবার নকল অনুষ্ঠান করত—যে-কৃত্রিম অনুষ্ঠান বাস্তব সাফল্য আনবে বলে তার ধারণা ছিল।

কৃষি-সমাজেই যে জাদু-বিশ্বাসের প্রসার—এ মন্তব্যের সমর্থনে একটি উদাহরণের উল্লেখ করছি:

'অসভ্য মানুষদের মধ্যে সর্বত্রই দেখা যায় অন্যান্য কাজের তুলনায় কৃষিকাজকে কেন্দ্র করেই জাদুবিশ্বাস ও জাদুবিশ্বাসগত অনুষ্ঠানের উপর নির্ভরতা সবচেয়ে বেশী। পিউব্‌লো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে খ্রীষ্টান পাদ্রীরা নানাভাবে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেও এই অসভ্য মানুষগুলির মূল বিশ্বাস একটুও টলাতে পারে নি, অথচ এ-বিশ্বাস চুরমার হয়ে যেতে লাগল যখন ইয়োরোপীয়রা সে-দেশে গিয়ে চাষবাস শুরু করল। ইয়োরেপীয়দের কৃষিকাজ দেখে ওদের বিশ্বাস এ-ভাবে চুরমার হয়ে যেতে লাগল কেন? কেননা, ওরা দেখল কোনো রকম জাদু-অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর না করেই ইয়োরোপীয়রা ফসল ফলাতে পারছে এবং সে-ফসল গুণ বা পরিমাণ কোনো দিক থেকেই নিকৃষ্ট নয়। তাই খ্রীষ্টান পাদ্রীরা হাজার বক্তৃতা দিয়েও তাদের মনের যে-বিশ্বাস টলাতে পারে নি, ইয়োরোপীয়দের কৃষিকাজ-পরিদর্শন সে-বিশ্বাসকে উৎপাটিত করতে পারল। পিউব্‌লো-ইণ্ডিয়ানদের এই কাহিনীটি থেকেই অনুমান করা যায়, পিছিয়ে-পড়ে-থাকা মানুষদের মনে,—এবং অতএব এগিয়ে আসা মানুষদের পিছনে-ফেলে-আসা পর্যায়েও,—কৃষিকাজ কত

গভীরভাবে জাদুবিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত এবং জাদুবিশ্বাসগত অনুষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল। অবশ্য ব্রিফল্ট শুধুমাত্র এই দৃষ্টান্তটির উপরই নির্ভর করেন নি। আরো বহু তথ্য সংগ্রহ করে দেখাচ্ছেন, পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ের মানুষদের কাজে জাদুবিশ্বাসের অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে কৃষিকাজ একান্তই অসম্ভব।.....রবার্ট ব্রিফল্ট বলছেন, মেয়েরাই কৃষিকাজ করত, ফলে স্বভাবতই জমির উর্বরতাবৃদ্ধির কামনায় জাদু-অনুষ্ঠান ও ধর্মানুষ্ঠানগুলি মেয়েদেরই এক্তিয়ারে ছিল।' ১ টমসন-ও বলেছেন, গোড়ায় কৃষি-আবিষ্কর্ত্রী হিসাবে জাদু-অনুষ্ঠান প্রধানত মেয়েরা করত।২

সন্তান-জনিকা হিসাবে নারী উর্বরতার প্রতীক ব'লে বিবেচিত হ'য়েছে, সেটাও কৃষি-ম্যাজিক-অনুষ্ঠানে নারীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ।

আমাদের দেশের ব্রতও এই ধরণের জাদু-অনুষ্ঠান।

জমির উর্বরতা-বৃদ্ধির জাদু-অনুষ্ঠান মোটামুটিভাবে বলতে গেলে দু' রকমের। এক, ক্ষুদ্র (miniature) ভাবে মাটিকে সবুজ সম্পদে ভরে তোলা; যেমন আমাদের তোষলা ব্রত, গোবরের গুলি পাকিয়ে তাইতে সবুজ দূর্বাঘাস রোপণ করে দেওয়া হয়, আর ছড়িয়ে দেওয়া হয় তুঁষ-কুঁড়ো ইত্যাদি। ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের এই সাফল্য বৃহত্তর ক্ষেত্রেও এক নিগূঢ় জাদুশক্তির সাহায্যে প্রভাব বিস্তার ক'রবে, এই হচ্ছে বিশ্বাস।

দ্বিতীয় ধরণের অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত—বিশ্বের প্রায় সর্বত্র। জমির উর্বরতা বৃদ্ধির এই অনুষ্ঠানগুলি ছিল মানুষের বংশবৃদ্ধির বা নবজাতকের উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপের অনুকৃতি। সমাজের স্ত্রী-প্রধানের যৌন-জীবনকে দেখা হ'ত ঐন্দ্রজালিক আচার-অনুষ্ঠান হিসাবে। পৃথিবী যাতে সন্তানসম্ভবা হয় তারই জন্যে যেন স্ত্রী-প্রধান গর্ভধারণ করতেন।৩ (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ব্রতের সঙ্গে যে-সব দেবতা জড়িয়ে-মিশিয়ে গিয়েছেন তাঁদের বেশীর ভাগই স্ত্রী-দেবতা।) ওঁরাওদের সরহুল উৎসবের শেষে প্রতি বৎসর পাহান (প্রধান) ও পাহানাইনের (প্রধানের স্ত্রী) 'বিবাহ' দেওয়া হয়; তাদের বিশ্বাস এতে পৃথিবী ফলবতী হবে।

সন্তান-উৎপাদন ও শস্য-উৎপাদন দুই-ই উৎপাদন; অতএব দুইয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে, এক আরকে প্রভাবিত করে, একটি ফললে আর একটিও

---

১ পরিচয়, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬২, পৃঃ ২০৭, ২১৩।

২ Thomson, An Essay on Religion, p. 11.

৩ ঐ, পৃঃ ১১।

ফলবে এই হ'চ্ছে আদি মানুষের যুক্তি। নারীর আছে সন্তান-ধারণের বিশেষ ক্ষমতা, অতএব শস্য ফলাবার ক্ষমতাও তার আছে (বিশেষত, তার হাতেই যখন মাটির প্রথম ফসল ফলেছে)।

ব্যাভারিয়া ও অস্ট্রিয়ার কৃষকরা মনে করে যে বৃক্ষের প্রথম ফলটি সন্তানবতী রমণীকে দিলে ফলন ভাল হবে। ওরিনোকো-র ইণ্ডিয়ান্‌রা বীজ বপন করায় ছেলে-কোলে নারীদের দিয়ে; একজন পাদরী এর কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তারা ব'লেছিল, 'Father, you don't understand these things .....you know that woman are accustomed to bear children and that we men are not. When the women sow, the stalk of the maize bears two or three ears the root of the yucca yields two or three basketfuls, and everything multiplies in proportion. Now why is that? Simply because the women know how to bring forth, and know how to know make the seed which they sow bring forth also. Let them sow then; we men don't know as much about it as they do.'১

সুমাত্রায়ও ধান বোনা হয় মেয়েদের দিয়ে। গ্রীক ও রোমানরা শস্য-লাভের চেষ্টায় জমিতে গর্ভবতী রমণীদের বলি দান ক'রত।২

ভারতবর্ষে হোসঙ্গাবাদে আনুষ্ঠানিক হলকর্ষণের দিন কৃষকদের সঙ্গে দেখা করেন জমিদারের কন্যা অথবা ভগ্নী এবং তাদের গমের পিঠে খেতে দেন; এটাও অনুষ্ঠানের অঙ্গ।৩ পাঞ্জাবে প্রথম বীজ-বোনার দিন মেয়েরা ক্ষেতের কিষাণদের মিষ্ট-অন্ন খেতে দেয় এবং তার পর দিন হার প'রে মেয়েরা ক্ষেতের মধ্য দিয়ে হাঁটে ও টেকোতে একটা সুতো জড়াতে থাকে।৪

এ ছাড়াও কৃষির পক্ষে অপরিহার্য বৃষ্টিকে আহ্বান ক'রে যে সমস্ত ম্যাজিক-অনুষ্ঠান চলিত ছিল, তাতেও মেয়েদের যথেষ্ট আধিপত্য ছিল; এ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বে যে উদাহরণগুলি দিয়েছি তাতেই এর প্রমাণ মিলবে। এখানে আরো দু' একটি দেশী উদাহরণের উল্লেখ করছি।

---

১ The Golden Bough, p. 28.

২ ঐ, পৃঃ ২৮

৩ ক্রুক, পৃঃ ৩৭২

৪ ঐ পৃঃ, ৩৮১।

উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলায় ১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময়, অনাবৃষ্টিকে তাড়িয়ে ফসল ফলিয়ে তোলবার চেষ্টায় মেয়েরা দলবদ্ধভাবে রাত্রে নগ্নগাত্রে লাঙল নিয়ে ক্ষেতে আনুষ্ঠানিক ভাবে হলকর্ষণ করেছিল।১

উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলার চুণার যখন দীর্ঘস্থায়ী অনাবৃষ্টির কবলে, তখন একদিন (২৪শে জুলাই, ১৮৯২) রাত্রে তিনজন কৃষক-রমণী নগ্নগাত্রে ক্ষেতে গেল দুইজন জোয়ালটা বলদের মত কাঁধে লাগাবার পর বাকী তৃতীয়জন লাঙল চালাতে লাগল।২

উত্তরবঙ্গে অনাবৃষ্টি তীব্র হ'লে রাজবংশী মেয়েরা নগ্নগাত্রে নৃত্য করত তাদের বৃষ্টি দেবতা 'হুতুমদেব'-এর সামনে।৩

খুব সম্প্রতিকালের একজন প্রত্যক্ষদর্শী বাংলাদেশের এই নগ্ন-নারী-নৃত্যের একটি বর্ণনা দিয়েছেন।৪

আমাদের দেশে ঘরের বৌকে বলা হয় ঘরের 'লক্ষ্মী'; বৌ সন্তানবতী হবে, ফলে পরিবারের মৃত্তিকাও হবে শস্যবতী, খুব সম্ভব এই ধারণার বশেই বৌকে মূর্তিমতী লক্ষ্মী বলে মনে করা হয়। আবার উলটো দিকে বন্ধ্যা বধূ হচ্ছে অলক্ষ্মী, সমাজ তাকে দেখে নীচু দৃষ্টিতে. সামাজিক অধিকারও তার কম অবিবাহিত যুবকের টাকা থাকলেও আমরা তাকে বলি 'লক্ষ্মীছাড়া'। স্ত্রী-ভাগ্যে ধন আসে এ বিশ্বাস আজও আমাদের আছে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, (সন্তান-সংক্রান্ত তো বটেই), প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শস্য-সংক্রান্ত ম্যাজিক-অনুষ্ঠানে মেয়েদের একাধিপত্য ছিল। ব্রতও এই ধরণেরই অনুষ্ঠান।

ক্রমে কৃষি যখন পুরুষের হাতে চলে গেল, তখন কৃষি-সংক্রান্ত ম্যাজিক-অনুষ্ঠানও অন্তত কিছুটা অন্যান্য দেশে পুরুষের কাছে হস্তান্তরিত হল। কিন্তু আমাদের দেশে তা হয় নি; কৃষি পুরুষের হাতে গেছে, কিন্তু

---

১ ঐ, পৃঃ ৪১।

২ ঐ, পৃঃ ৪৩।

৩ Sarat Chandra Mitra, 'On the Silaris or Hiralis of Eastern Bengal', Journal of the Department of Letters., Vol. XV, P, 13.

৪ দেশ, ৮ আশ্বিন, ১৩৬১। পরিশিষ্টের উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

অনুষ্ঠানগুলি হাত-বদল হয় নি। পুরুষ কৃষি গ্রহণ করল, কিন্তু মৃত্তিকার উৎপাদনী-শক্তির বিজ্ঞান তখনও তার অজ্ঞাত, ঐ অনুষ্ঠানের অবলুপ্তি ঘটল না, আর পুরুষ তা মেয়েদের হাতে রাখাই নিরাপদ মনে করল। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেশে তথা প্রাচ্যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার চূড়ান্ত বিকাশ হয়েছিল। সে ব্যবস্থা ক্রমে ভেঙে পড়েছে নানা কারণে, কিন্তু তার ধ্বংসাবশেষ আজো জায়গায় জায়গায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে; ব্রতে মেয়েদের একাধিপত্য হয়তো এমনি একটি স্মৃতি-স্তম্ভ। বিভিন্ন সমাজ-শক্তির প্রভাবে এবং নানা স্মার্তের নানা ধমকানিতে পুরুষের জীবনের ও বিশ্বাসের অদলবদল ঘটেছে, ভাঙচুর হয়েছে, কিন্তু নারীসমাজ মানব-জীবনের আদি-স্মৃতিকে আজও বহন করে।

(অবশ্য নারীও এই স্মৃতিকে আর বেশী দিন বহন ক'রবে না। কারণ, আজ আর আমাদের সমাজ প্রকৃতির দাক্ষিণ্য-নির্ভর কৃষি-সমাজ মাত্র নয়; বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি তার প্রখর, প্রকৃতিকে জয় করবার নানা কলাকৌশল তার হাতে, সমাজের ভারকেন্দ্র কৃষিক্ষেত্র থেকে শিল্প-ক্ষেত্রে অপসরণোন্মুখ। এই সামাজিক-পারিপার্শ্বিক ব্রত লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ও যাবে তাতে সন্দেহ নেই।)

অনগ্রসর কৃষি-সমাজে দুই মূল কামনা—শস্য ও সন্তান; একে কেন্দ্র করেই ব্রতানুষ্ঠানের উৎপত্তি। পরে সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নানা কামনা যুক্ত হয়েছে এর সঙ্গে, নতুন ব্রত তৈরী হয়েছে নতুন কামনার সাফল্য আনবার জন্যে; নতুনদের সামনে মেয়েরা তাদের অন্দর মহলের দরজা বন্ধ করে দেয় নি; অন্তঃপুরের স্নেহ-সিঞ্চনে নবজাতকেরা লালিত হয়েছে।

ব্রত করবার সময় মেয়েরা অভিভাবকদের কোন অনুমতি নেয় না; সত্যি কথা বলতে কি, বাড়ির কর্তারা জানতেই পারে না মেয়েরা কখন কি ব্রত করে। অথচ আশ্চর্য, মনু বলছেন যে অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত মেয়েদের ব্রত পালনে অধিকার নেই।১ তিনি বলেছেন, কুমারী কন্যা পিতার বিবাহিতারা স্বামীর, বিধবারা পুত্রের অনুমতি নিয়ে যেন ব্রত করে! স্মার্তপ্রবরের এই নির্দেশ মান্য করবার বিশেষ কোন উৎসাহ মেয়েদের মধ্যে লক্ষিত হয় না। মনুর জন্মের আগে থেকে ব্রত তাদের জীবনের সঙ্গে মিশে রয়েছে, মনুর নির্দেশ তারা জানেও না, মানেও না।

১ মনুসংহিতা (বঙ্গবাসী সংস্করণ,) পৃঃ ১৪৪।

ছেলেরা করে এমন ব্রত দু'একটি অবশ্য পাওয়া যাচ্ছে (এগুলি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন ও অঞ্চলবিশেষের হ'তে পারে)—যেমন, কুলাইর ব্রত। বাঘের হাত থেকে গরু-বাছুর যাতে রক্ষা পায় সেই কামনায় রাখাল-ছেলেরা করে ব্রত। অবশ্য এর অনুষ্ঠানের সঙ্গে সাধারণ মেয়েলি ব্রতের অনুষ্ঠানেরও কিছু হেরফের আছে। যেমন, এ ব্রতে আলপনার দরকার হয় না, ফুল ধরে ছড়া বলবারও দরকার নেই। অবশ্য সব মেয়েলি ব্রতেও আলপনা নেই; সুতরাং মাত্র এই অঙ্গ-হীনতার অজুহাতেই কুলাইকে ব্রতের চৌহদ্দির বাইরে দাঁড় করিয়ে জাতিচ্যুত বা অন্ত্যজ করে রাখা সম্ভব নয়।

॥ পাঁচ ॥

পূর্বে আলোচিত দুই ধরণের প্রজনন-শক্তির ঘনিষ্ট সম্পর্ক সম্বন্ধে আর একটু বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সন্তান-প্রজননশক্তির দ্বারা শস্য-উৎপাদনী শক্তিকে প্রভাবিত করবার চেষ্টায় কি ধরণের অনুষ্ঠান হত তার কিছুটা আভাস দিয়েছি। এই ধরণের কর্মকাণ্ডে কিছুটা যৌন-স্বেচ্ছাচারের স্থানও ছিল অনেক জাতির মধ্যে। এটাকে তারা খারাপ চোখে দেখত না, বরং প্রয়োজন মনে করত। আমাদের দেশে ওরাওঁদের সরহুল উৎসবে এর স্থান আছে—পৃথিবীকে ফলবতী করবার চেষ্টায়।১ ওরাওঁ ভাষায় সরহুলের অন্য নাম 'খদ্‌দি' বা 'খেকেলবেঞ্জা', যার অর্থ পৃথিবীর বিবাহ।

ক্রমে এই সম্পর্কটা আর একমুখী রইল না, পারস্পরিক হ'য়ে দাঁড়াল অর্থাৎ শস্য-উৎপাদনী শক্তিরও সন্তান-প্রজনন শক্তির উপর প্রভাব আছে এই বিশ্বাসের জন্ম হ'ল। কোন শক্তিরই প্রকৃত বিজ্ঞান তখন মানুষের ছিল না।

তাই, বৃক্ষের প্রভাবে নারী গর্ভবতী হ'তে পারে, এই বিশ্বাস বহু আদিম জাতির মধ্যেই আছে। মাওরি-দের তুহো (Tuhoe) কৌমের বন্ধ্যা নারী সন্তানলাভের আশায় একটি বিশেষ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে।২ ব্যাভারিয়ার বহু স্থানে নবদম্পতির গৃহে সবুজ শাখা এবং পল্লব-গুচ্ছে ঝুলিয়ে সাজিয়ে রাখবার প্রথা আছে; যে গৃহে স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা সে গৃহকে বাদ দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে

১ Oraon Religion and Customs, পৃঃ ২১৬,১৯৩।
২ The Golden Bough পৃঃ ১১৯।

লোকে বলে যে স্বামীই 'মে-গুচ্ছ' সাজিয়েছে। দক্ষিণ স্লাভোনিয়ান বন্ধ্যা নারী সন্তান-লাভের আশায় 'সেণ্ট জর্জের দিবস'-এর আগে একটি স-ফল বৃক্ষের উপর একটি নতুন সেমিজ রেখে দেয়, পরদিন ভোরে সূর্যোদয়ের আগে সে সেমিজটা পরীক্ষা করে দেখে, যদি জামাটার উপর দিয়ে কোন জীবন্ত প্রাণীর চলবার ছাপ সে লক্ষ্য করে, তবে খুশী হয়ে সে সেমিজটা পরে, কারণ আগামী এক বছরের মধ্যেই সে ঐ গাছটির মত স-ফল হবে। কারা-কিরঘিজদের বন্ধ্যা নারী সন্তান লাভের আশায় একটা নির্জন আপেল গাছের তলায় গড়াগড়ি দেয়।১

অনুরূপ বিশ্বাস আমাদের দেশেও আছে। আমাদের উপকথায় কত বন্ধ্যার যে ফল-মূল-লতা-পাতার সাহায্যে সন্তান হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ফুলকর ব্রতের (পরে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য) ব্রতকথায় কুমারী মেয়ের নাভিতে ফুল বেলপাতা লাগায় সে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল। আমাদের দেশের অনেক জায়গায় বন্ধ্যা বেরিা সন্তানলাভের আশায় গাছের ডালে ঢিল বেঁধে রাখে—এই ঢিল-রূপী নকল ফলের প্রভাবে তাদের সন্তান হবে, এই হচ্ছে তাদের বিশ্বাস।

মানুষ ফলের আকাঙ্ক্ষায় গাছ-পালার বিয়েও দিত—যেন তারা একটি মানুষ, বিয়ের পর তাদের সন্তান হবে অর্থাৎ সফল ফলবে। এমন কি পুরাকালে অনেক দেশের লোক কোন্ গাছটি পুরুষ, কোনটি নারী, তাও বলে দিতে পারত। সে স্বর্ণযুগ হয়তো গত, কিন্তু এখনও আমাদের দেশের অনেক জায়গায় নতুন আমগাছের শ্বয়ে (তেঁতুল বা ঐ ধরণের গাছের সঙ্গে) না দিয়ে তার ফল খাওয়া হয় না। ওরাওঁরা ফলের গাছের, এবং বছরের প্রথম ধান-চারা রোপণের সময় ধানচারাগুলির বিবাহ দেয়। 'ক্রিস্ট্‌মাস্ ঈভ'-এ জার্মাণ কৃষকরা গাছে ফল ফলাবার জন্য খড়ের দড়ি দিয়ে দুটো গাছ এক সঙ্গে বেঁধে তাদের বিয়ে দেয়। আমাদের দেশের 'অ্যাচরা ব্রতে'ও কলা ও কুলগাছ একসঙ্গে বেঁধে তারপর মাটিতে পুঁতে ছড়া বলতে হয়। এর মূলেও গাছের বিবাহ দেওয়ার অনুষ্ঠান রয়েছে কি? প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এ ব্রত মেয়েরা করে ভাল স্বামী পাওয়ার জন্য অর্থাৎ সন্তানজনন-শক্তি বৃদ্ধির কামনায় এই ব্রত।

মোলুক্কাস্-এ (Moluccas) যখন গাছে ফুল ধরে, তখন সেখানে

১ ঐ, পৃঃ ১১৯-১২০।

কোনরকম গোলমাল বা শব্দ করা বারণ, কারণ ওতে গাছ ভয়ে অকালে খারাপভাবে 'প্রসব' করতে পারে। অ্যামবোনো-তে (Amboyna) যখন ধানের শীষ ধরে তখন বলা হয় যে 'গর্ভ' হয়েছে এবং 'গর্ভ' নষ্ট হবার আশংকায় সেখানে কোনরকম শব্দ করা নিষেধ।*

গাছের (এবং ফুলের) আর এক রকম 'বিয়ে' আছে, যাকে পুরোদস্তুর 'অসবর্ণ' বিয়ে' বলা চলে। এ বিয়ে গাছে (বা ফুলে) ও মানুষে। অবিবাহিত ওরাওঁ যুবককে যদি কোন বিধবাকে বিয়ে করতে হয়, তবে প্রথমে একটি ফুলকে 'বিয়ে' করে নিতে হবে তার, তার পরে 'দ্বিতীয় স্ত্রী' হিসেবে বিধবাটিকে গ্রহণ করতে পারবে।১ নিম্ন হিমালয় অঞ্চলে যদি কেউ তৃতীয়বার বিয়ে করতে চায়, তবে তাকে আগে একটি আকন্দ গাছ বিয়ে করে নিতে হবে।২ পাঞ্জাবের কোনো লোককে তৃতীয়বার বিয়ে করবার আগে একটি বাবুল বা আক্ গাছকে বিয়ে করে নিহত হয়।৩ গুজরাটে জাতিবিশেষের বয়স্কা কন্যার বিয়ে বাপ মা যখন দিয়ে উঠতে পারে না, তখন গুচ্ছ ফুলের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হয়; পরের দিন শুকিয়ে যাবার আগেই সেই ফুলগুচ্ছকে পাতকুয়োর জলে ফেলে দেওয়া হয় এবং গতকালের কনে সিঁদুর মুছে বৈধব্য গ্রহণ করে।৪ মুণ্ডারিদের বরবধূ বিয়ের আগেই যথাক্রমে আমগাছ ও মহুয়া গাছকে বিয়ে করে নেয়; সিঁদুর-পরানো, আলিঙ্গন, গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা ইত্যাদি হচ্ছে এ বিয়ের অনুষ্ঠান।৫ কুমী বরও বিয়ের দিন সকালে আগে একটি আমগাছকে বিয়ে করে, এবং পরে কনে মহুয়া গাছকে। নেপালের নেওয়ার মেয়েদের ছোটবেলায় একটি বেল-ফুলের সঙ্গে বিয়ে হয়; বিয়ের পর বেলটি কোন পবিত্র নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।৬ বাংলাদেশের রউতিয়াদের মধ্যেও বিয়ের আগে আমগাছকে বিয়ে

---

* ঐ, পৃঃ ১১৫।

১ Oraon Religion and Customs, পৃঃ ১৭০।

২ Sarat Chandra Mitra, 'On Secrecy and Silence in North Indian Agricultural Ceremonie,', Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol XIII, 1917.

৩ ক্রুক, পৃঃ ২৫৮।

৪ ঐ, ২৫৯।

৫ ঐ, ২৫৯।

৬ ঐ, পৃঃ ২৬০।

করে নেবার প্রথা আছে।১ বাংলার অনেক অঞ্চলে তৃতীয়বার বিবাহ করতে হলে বরকে আগে একটি গাছ বিয়ে করে নিতে হয়।

এই 'অসবর্ণ' বিয়ে'র মূলে টোটোমিজ্‌ম্‌ সম্পর্কিত কারণ ছাড়াও আছে দুই প্রকার উৎপাদনী শক্তির অভিন্নতা সম্পর্কে বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের ছাপ আমাদের দেশের অনেক দেব-দেবী, ব্রত-পূজা ও আচার-অনুষ্ঠানে পড়েছে।

উড়িষ্যার বৃন্দাবতী আসলে গাছপালার দেবী, কিন্তু তার কাছে প্রার্থনা জানালে সন্তান-কামনার আর্জিও তিনি মঞ্জুর করেন।২ মানুষকে খাদ্য-বস্ত্র যোগাবার ভার উড়িষ্যার কর্মা দেবতার, কিন্তু সন্তান-কামনায়ও মেয়েরা কর্মা-পূজার দিন উপবাস করে।৩ করম পূজার সময় ওরাওঁ মেয়েরা 'করম-ঝুড়ি'তে নানা প্রকারের শস্যের সঙ্গে সন্তানের প্রতিনিধি হিসাবে শশাও রাখে।৪ দিল্লী অঞ্চলের ভুঁইয়া বা খেতপালের (অযোধ্যায় ইনি দেবী, নাম ভুঁইয়া রাণী) পূজা করা হয় ফসল ঘরে তোল্‌বার সময়, বিবাহকালে এবং ছেলে হলে; মায়েরা রবিবারে বাচ্ছাদের ভুঁইয়ার থানে নিয়ে যায়।৫

বাংলাদেশেও মৈমনসিংহ জেলায় ক্ষেত্র (ক্ষ্যাত্তর) বত করা হয় সন্তানের মঙ্গল-কামনায়।

গারসীকে অনেক অঞ্চলে বলা হয় ধানগাছের সাধ খাওয়ার উৎসব।

তুলা সংক্রান্তিকে উড়িষ্যায় বলা হয় গর্ভণা সংক্রান্তি, কারণ ধানগাছ তখন শস্য-গর্ভা হয়।

অম্বুবাচীর কথা আগেই উল্লেখ করেছি। বাংলাদেশে ৭ই আষাঢ় থেকে তিন দিন ও উড়িষ্যায় জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তি থেকে তিন দিন অম্বুবাচী —পৃথিবীর ঋতুকাল অর্থাৎ নববর্ষাসমাগমে পৃথিবীর শস্য সম্ভাবনা জেগে ওঠে। আসামেও এই উপলক্ষ্যে কামাখ্যার মেলা হয়। কামাখ্যা নামের ব্যাখা হিসেবে ঐতিহাসিক রাজমোহন নাথের মতটি স্মরণযোগ্য।

---

১ Risley, ribes and Castes of Bengal. Vol, II. P. 201.

২ Kunjabehari Das, A study of Orissan Folklore, পৃঃ ৪৭।

৩ ঐ, পৃঃ ৫৩।

৪ Oraon Religion and Customs., পৃঃ ২৪২-২৪৩।

৫ ক্রুক্‌, পৃঃ ৬৫।

'কামাখ্যা পাহাড়ের···প্রস্রবণ···। সেই ধারা হোতো প্রবল এবং ভিতরের স্তরে haematite (খনিজ রক্তাভ ধাতু)-এর সংস্পর্শে এসে সেই জলের ধারা হোত লাল।...খাসিয়াদের সরল বিশ্বাস হলো ধরিত্রী ঋতুমতী হয়েছেন, তার প্রমাণ ঐ প্রস্রবণ—কা-মেই-খা, মায়ের জলের ধারা।'১

উড়িষ্যায়ও অম্বুবাচী বেশ বড় উৎসব, সেখানে এর নাম রজ-উৎসব। এই সময় পৃথিবীর গায়ে কোন রকম আঘাত দিতে নেই—হলকর্ষণ বীজবপন ভূখনন নিষিদ্ধ।২ উড়িষ্যায় এর পর পৃথিবীকে (অর্থাৎ মহালক্ষ্মীকে) শুচি-স্নান করানো হয়।

ভীলরা বীজ বোনবার আগে খেতের মাটিতে বা পাথরে সিঁদুর দেয়, অর্থাৎ মাটি যেন রজস্বলা হল।

আমাদের শিব একদিকে বৃষবাহন ও শস্যবর্ধক, অপর দিকে তিনি লিঙ্গমূর্তি। শিবের গাজনের সময় ছড়া গাওয়া হয়, তাতে তাঁকে চাষবাস করতে দেখা যায়, শূন্যপুরাণেও শিবকে দেখি তিনি তাঁর প্রধান সহকারী ভীমকে নিয়ে চাষের কাজে ব্যস্ত। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যেও শিব বিশ্বকর্মাকে দিয়ে তাঁর হাতের ত্রিশূল ভাঙিয়ে জোয়াল, কোদাল, ফাল এই সব চাষের সরঞ্জাম তৈরী করিয়ে নিয়েছেন। আবার অন্যদিকে মন্দিরে মন্দিরে তাঁর লিঙ্গমূর্তি; ভাল স্বামীর কামনায় মেয়েরা আজও শিবপূজা করে।

শুধু বাংলা দেশে নয়, ভারতের অন্য অংশেও শিবের এই দ্বি-রূপী মূর্তির সাক্ষাৎ মেলে। কাংড়া জেলায় মেয়েরা বৈশাখ মাসে যে 'রলী কা মেলা' করে, সেখানে শিব ও পার্বতীর ক্ষুদ্র মৃৎ-মূর্তি বসানো হয় দশ দিনের সঞ্চিত দূর্বাঘাসে-প্রোথিত বৃক্ষশাখার উপরে। এত যায়গা থাকতে শিবকে ঘাস ও বৃক্ষশাখায় বসানোতে বোঝা যাচ্ছে যে পূর্বে শিব গাছপালা ইত্যাদিরই দেবতা ছিলেন, যদিও এখন বলা হয় যে মেয়েরা 'রলী কা মেলা'-য় অংশ গ্রহণ করে, বাংলার শিবপূজারিণীদের মতই ভাল বরের কামনায়।৩

উপরের উদাহরণগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সন্তানের জন্ম ও ফসলের জন্ম

---

১ দেশ, ৮ শ্রাবণ, ১৩৬১।

২ বিস্তৃত আলোচনা ও শাস্ত্রীয় খুঁটিনাটির জন্য চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর—'অম্বুবাচী বা চাষের ছুটি' (প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৫২) দ্রষ্টব্য।

৩ The Golben Bough পৃঃ ৩২০।

এই দুয়ের মধ্যে একটা যোগ আছে বলে প্রাচীন মানুষেরা মনে করত, এবং একটির দ্বারা অপরটিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করত।

সন্তানের জন্ম দেখে তারা অভ্যস্ত ছিল, ক্রমে ফল-ফসলের জন্ম সম্বন্ধে যখন বিশেষভাবে অবহিত হল, তখন সন্তান-জন্মের মত করে অন্যবিধ উৎপাদনটিকেও তারা বুঝতে চাইল। ফসলের জন্মটাকে মানুষ ঠিক-ঠিক সন্তানের জন্মের সঙ্গে মিলিয়ে নিল। তখনকার মানুষের নানা অনুষ্ঠানে নারীর ফলপ্রসূতা ও প্রকৃতির ফলপ্রসূতা মিশে গেল; একটির সম্পর্কিত অনুষ্ঠান অপরটিকেও প্রভাবিত করবে এই বিশ্বাসে তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠান সৃষ্টি করেছে।

এই দু' ধরণের প্রজননশক্তিকে যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মনে করা হ'ত তার প্রমাণ অন্য দিক থেকেও কিছু কিছু পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলছেন যে আদিমকালের নিড়ানি পুরুষের জননাঙ্গের অনুরূপ ছিল। ভাষাতাত্ত্বিকরা বলছেন, লাঙ্গল শব্দের উৎপত্তি খুব সম্ভবত লিঙ্গ শব্দ থেকে।

প্রত্নতাত্ত্বিকদের এই অনুমান আমাদের বক্তব্যের পরিপোষক।

রবীন্দ্রদর্শন ঃ সমাজ ও কাল

অশোক মুস্তাফি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অতীতমুখিতা বর্জন করে বিশ্বপ্রেমের দিকে একটা সুনিশ্চিত ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। 'গোরার' মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। সামন্ততান্ত্রিক গোরার নিতান্ত মানবিক পরিণতির মধ্যে সেটি স্পষ্ট প্রকাশিত। এই সময় কবির স্বাজাত্যবোধ বিশ্বমানবিকতার সংস্পর্শে এসে সুস্থ এবং পরিশুদ্ধ হ'লো। কবির চিন্তার মধ্যেও একটা সমন্বয়ের ধারা লক্ষ্য করি। এই সমন্বয় উপনিষদের দৃষ্টি এবং বিজ্ঞানভিত্তিক দার্শনিকতার, প্রাচীন ও নবীনের। 'বলাকা'য় কবি জড় এবং চৈতন্যের সংঘর্ষের অবসান ঘটালেন সুনিশ্চিতভাবে, সামন্ততন্ত্র থেকে শিল্পতন্ত্রে সামাজিক ব্যবস্থার অব্যবহিত পরিণতি ও তার ফল এ সময়ে লক্ষ্য করা গেছে। 'অচলায়তনে' প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ভাবগত মিলনের একটি ছবি ফুটে ওঠে। 'রক্তকরবী' এবং 'মুক্তধারা'য় 'অচলায়তনে'র সাঙ্কেতিকতা ততটা খুঁজে পাই না। বরং শেষোক্ত দু'টি রূপক নাট্য বাস্তবতার দ্বারা গভীরভাবে চিহ্নিত। 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'তে কবি জড়তার বিরুদ্ধে উপনিষদ আশ্রিত অতীতের বিরুদ্ধে এবং যান্ত্রিকতার ধনতান্ত্রিক রূপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেছেন, ঐতিহ্যবাদী জীবনদর্শনকে জীর্ণ বসনের মত ত্যাগ করে কবি নূতন গোষ্ঠী চেতনার জয়গান ক'রেছেন। ব্যক্তি এবং সমাজের সম্পর্ক পারস্পারিকতা এবং আত্মিকতার ভিত্তিতে নূতন করে প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস এই সময় কবি পেয়েছেন। সহজ সৃষ্টিশীল প্রেমময় আত্মিক সম্পর্ক মানুষের সামাজিক জীবনকে একটি নূতন প্রাণস্পর্শ দেবে এই আশাই কবি পোষণ করতেন। 'মুক্তধারা'য় তাই ইউরোপের এই নব্য যান্ত্রিক জীবনদর্শনকে বীতশ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে স্বাগত জানাবার জন্যে কবির অনুশোচনার একটা প্রকাশও এখানে লক্ষ্যণীয়।

বিজ্ঞান পূজার অন্তরালে ইউরোপের নগ্ন হিংসাত্মক ধনবাদী রূপটির চেহারা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট দেখলেন। তাঁর ধনঞ্জয় বৈরাগী একটি মুক্ত অহিংস প্রাণেরই প্রতীক। ধর্মাশ্রয়ী মানুষের প্রাণশক্তিকে রবীন্দ্রনাথ রূপক নাট্যগুলিতে দাঁড় করিয়েছেন যন্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে। সমাজ গঠনের নূতন আর্থিক ভিত্তির দাবী স্বীকৃতি পেয়েছে তাঁর 'রক্তকরবী'তে। একটা বৈপ্লবিক সমাজ-চেতনার অভিব্যক্তি এই রূপক নাট্যে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আমেরিকা ও রাশিয়া ভ্রমণ করে রবীন্দ্রনাথ ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের আভ্যন্তরীণ সঙ্কট স্পষ্ট উপলব্ধি ক'রেছিলেন। 'রক্তকরবী'তে ভবিষ্যৎ সমাজের কোন একটি বিশেষ পরিকল্পনা দিতে অসমর্থ হ'লেও 'কবি যন্ত্রের বিরুদ্ধে ধর্ম' প্রকৃতি ও প্রাণের উদ্বোধন ঘটিয়েছেন। এই রূপক নাট্যে-সঙ্ঘ নেতৃত্ব, গণশক্তির উদ্ভব, সামাজিক পরিবর্তনে জনগণের সচেতন অংশগ্রহণ প্রভৃতি আধুনিক রাজনৈতিক জীবনের লক্ষণগুলি স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। তিনটি সাঙ্কেতিক নাটকে কৃষিপ্রধান সমাজবিন্যাসে প্রেমের শক্তি ও প্রাণের প্রবাহ সার্থক রূপ পেয়েছে। ব্রাহ্মণ্য শক্তি, ক্ষাত্র্যশক্তি ও বৈশ্যশক্তির বিরুদ্ধে যে আক্রমণ রূপক নাট্যগুলিতে দেখি, তা আসলে পণ্যোৎপাদক বিভেদধর্মী সভ্যতার বিরুদ্ধেই। আত্মার স্বতঃস্ফূর্ততা, সজীবতা এবং মানুষের সৃষ্টিশীলতার ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য কবি অবশ্য এখানে কোন সামাজিক ক্রমের অনুসরণ করেন নি। ব্যক্তিসত্তার এই নূতন স্বীকৃতিতে রবীন্দ্রনাথ সমাজ অধিকারের প্রশ্নটি তোলেন নি। তাঁর ইতিহাস নিজস্ব স্বাভাবিক গতিতে নিজেকে রচনা করে চ'লেছে।

বিংশশতাব্দীর প্রথম দশক থেকে অতীতমুখিতা বর্জন করে কবি বিশ্ব-বোধের মধ্যে বিশ্বপ্রেমের মধ্যে সমস্ত দ্বিধাকে বিসর্জন ক'রলেন। এটা তাঁর স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক গোরার নিতান্ত মানবিক পরিণতির মধ্যে স্বাজাত্যবাদের সংগে বিশ্বমানবিকতার একটা সুস্থ মিলন ঘ'টলো। প্রায় এই সময় থেকেই কবির চিন্তার মধ্যে আমরা একটা সমন্বয় লক্ষ্য করি। 'বলাকা'য় এই সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভংগীর একটা সহজ প্রকাশ ঘ'টেছে। ঐতিহ্যবাদী জীবনদর্শনকে পিছনে ফেলে এখন থেকে রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে চ'লেছেন। 'মুক্তধারা'য় ইউরোপের নব্য যান্ত্রিক জীবনদর্শনের বিরুদ্ধে তাঁর চরম অবিশ্বাস সার্থক রূপ পেয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে মিথ্যাই তিনি মানব সমাজের মুক্তিলগ্ন ব'লে মনে ক'রেছিলেন, এই বোধ তাঁর মনে দানা বাঁধতে থাকে।

ইউরোপের হীন, হিংস্র এবং মানবিক মূল্য বিবর্জিত রূপটি তাঁর কাছে ক্রমশই উদ্ঘাটিত হ'তে লাগলো। মানুষের ধর্ম—আসলে তার মূল্যজ্ঞান; সেইজন্য ধর্মাশ্রয়ী মানুষের প্রাণ আপন স্বাভাবিক গতিতে বিশ্বাসী। এই সত্যটি বোঝাতে গিয়ে কবি কোনখানে বলেছেন। "আধুনিক সমস্যা ব'লে কোন পদার্থ নেই, মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের।" সেইজন্য হয়ত কোন ভাব বা আইডিয়া দিয়ে বস্তুকেও বা ব্যবহারিক মানবিক সম্পর্ককেও রূপান্তরিত করা যায় এমন। বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের মনে জায়গা করে নিয়েছিল। কোন বিশেষ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়, মনুষ্যত্বের অবমাননার বিরুদ্ধেই কবি বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রেছেন। আসলে, সভ্যতার সঙ্কট কোন উৎপাদন সম্পর্কজনিত কোনো সঙ্কট নয় মূলতঃ আত্মার সঙ্কট। প্রকৃত সমস্যা রাজনীতিতে নয়, সমাজনীতি ও সামাজিক ব্যবহারে প্রথিত। বস্তুর অতীতে বিহ্বল শিল্পসভ্যতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের জেহাদ নিতান্তই প্রাসঙ্গিক। সামাজিক সমস্যা কবির কাছে সব সময় ব্যক্তিক এবং আত্মিক সমস্যার চেহারা নিয়েছে। তাঁর রূপক নাটকগুলিতে, বিশেষ ক'রে 'মুক্তধারায়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অন্ন-বস্ত্র সম্পর্কিত আর্তির বিশেষ কোন প্রকাশ নেই। দুঃখবেদনার ঊর্ধ্বে উঠে তাকে জয় করাই ধনঞ্জয় বৈরাগীর ধর্ম, এইটিই আমাদের বিশ্বাস ক'রতে হয়। রবীন্দ্রনাথ হয়ত' কোন সমাজদর্শন নয়—বরং একটা জীবনবেদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর প্রায় সব লেখাতেই কোথায় একটা কালনিরপেক্ষতা আছে। কেননা তাঁর মতে মানুষের বর্জ্য'ন শুধু অর্থনৈতিক নয়, নানাবিধ। কবি তো স্পষ্ট ভাষায় এক জায়গায় ব'লেছেন "মানুষের মুক্তির ক্ষেত্র হ'চ্ছে ভাবের ক্ষেত্র।" আর একটা কথা, কোন দেশের এমনকি তাঁর নিজের দেশের ভৌগলিক সত্তার সম্বন্ধে তিনি সজাগ ছিলেন না। দেশ ছিলো তাঁর কাছে আইডিয়ার সামিল। মানুষ নয়, অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনের জীর্ণ মানুষ নয়, একটি অখণ্ড মানবিক সত্তাই ছিলো তাঁর কাছে মুখ্য। তাঁর ভাবদর্শনে কোন সীমায়িত ভূখণ্ড অযথা জায়গা জোড়ে নি। সেইজন্য স্বাধীনতা ব'লতে কবি সামাজিক বিন্যাসের রদবদলের কথা চিন্তা করেন নি। অন্তর্নিহিত অমর আত্মার বিকাশই তাঁর কাছে স্বাধীনতার নামান্তর ব'লে মনে হ'য়েছিলো। প্রথম মহাযুদ্ধের হিংস্রতা এবং নৈরাশ্যের মধ্যে তাই কবি আত্মার একটি গভীর সঙ্কট লক্ষ্য ক'রেছেন। ইউরোপের সৃষ্টিশীলতা সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস শিথিল হ'তে থাকে, অপর দিকে

আত্মানুসন্ধানী কবি মানবিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে Andrews সাহেবকে লেখা চিঠিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। স্পষ্ট বোঝা যেতে থাকে যে কবির কালচেতনা কালাতীত এবং একটি সূক্ষ্ম মানবিকতাবাদের দ্বারা চিহ্নিত। রবীন্দ্রনাথের মানসদর্শনে মানুষের যে পরিণতির কথা ইঙ্গিতে বলা হ'য়েছে তা আপনাতে নয়, মহত্তর কোন কিছুতে। তাঁর নির্বস্তুক সামাজিক চিন্তাধারার একটি নমুনা উপস্থাপিত করা যেতে পারে—"মানুষ যেহেতু মানুষ এই হেতু, বস্তুর দ্বারা সে বাঁচে না। সত্যের দ্বারাই সে বাঁচে" (স্বাধিকার প্রমত্ত, ১৩২৪)। কবির দার্শনিক বিশ্বাস এবং সামাজিক বোধ একটি নৈর্ব্যক্তিক জীবনসাধনায় একাকার হ'য়ে গেছে। অন্যত্র কবি ব'লেছেন, "চিত্তরাজ্যে যেখানে বুদ্ধিকে মানি, সেখানে আমার স্বরাজ; সেখানে আমি নিজেকে মানি, অথচ সেই মানার মধ্যে সর্বদেশের ও চিরকালের মানবচিত্তকে মানা আছে।" ১৯১৮-১৯ শে জার্মানীর নির্যাতিত প্রগতিবাদী শিল্পীদের স্বপক্ষে রঁ্যলা ও আঁরি বারবুসের সংগে ভারতের তরফ থেকে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী উভয়েই স্বাক্ষর ক'রেছিলেন। পৃথিবীর মানবিক স্বাধীনতার ইতিহাসে এটি একটি মূল্যবান দলিল। মিস্ মেও এবং উইল ডুরান্টের পুস্তক সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মন্তব্যগুলি জাতীয়তাবাদ এবং মানবিকতাবাদের মধ্যে একটি নিশ্চিত সেতু রচনা করে। ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে পরিবর্তীকালে কবির নিন্দাবাদ একই সংগে কবির কালচেতনা এবং দার্শনিক মানবিকতাবাদের পরিচায়ক। কোন বিশেষ রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে যে কবির অভিযোগ ছিলো এমন নয়। মানুষের আত্মাকে যেখানেই তিনি সঙ্কুচিত হ'তে দেখেছেন, সেখানেই নীরবতা রক্ষা করা তাঁর পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য হ'য়ে পড়েছে। এসবের মধ্যে যা একটি মহৎ রূপ নিয়ে দেখা যায় তা হ'চ্ছে রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ সংবেদনশীলতা। হয়ত' বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসেরও একটা আত্মিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াইলেন ঐতিহ্যবাদী রূপে। তাঁর জাতীয়তাবাদ ব'লে যদি কোন কিছু থাকে তাহ'লে তা তাঁর ঐতিহ্যবাদ এবং যুক্তিবাদেরই যুগ্ম ফল। এই যুক্তিবাদের সঙ্গে তাঁর দেশ প্রেমের অচ্ছেদ্য যোগ আমরা লক্ষ্য করি পাবনা সম্মেলনে কবির একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যে; "দেশকে আমরা করেছি দ্বেষ।" বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির মধ্যে নীতিটাকেই বড় করে দেখেছিলেন। দেশপ্রেমের নামে যে

শূন্যগর্ভ দম্ভ এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায় তাতে দেশকে ছোট করা হয় এইটিই তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন। তিনি জনগণের ছিলেন, কিন্তু জনতার নয়, এটা ভালো করে বোঝবার সময় এসেছে। হিন্দুমেলা ও স্বদেশী আন্দোলনে যে বাণী তিনি প্রচার করলেন তা ঐক্যের এবং মুখ্যতঃ মৈত্রীর। তাঁর "কথা ও কাহিনী" মারাঠা, শিখ ও রাজপুত জাগরণকে কেন্দ্র ক'রেই রচিত। "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় বুদ্ধিবাদী কবি ভারতের দারিদ্র, অজ্ঞতা ও সামাজিক বিভেদের অবসান ঘটাবার জন্য আকুল আবেদন জানিয়েছেন। সামাজিক বিভেদে দীন জাতির প্রকৃত মুক্তি নিছক রাজনৈতিক স্বাধীনতায় নয়, এ কথা কবি মনে প্রাণে বিশ্বাস ক'রতেন। রাশিয়ায় গিয়ে এ সত্যটি তিনি অনেকাংশেই হৃদয়ঙ্গম ক'রেছেন। গ্রাম সংস্কার, সমবায় নীতি এবং কৃষকদের ভাগ্যের উন্নতি বিধান প্রভৃতির উপর এই কারণেই তিনি জোর দিয়েছিলেন। জাতির বুদ্ধির সুস্থতা সম্বন্ধে মাঝে মাঝে তাঁর মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে এবং শিক্ষার মাধ্যমে নূতন গোষ্ঠি চেতনা সৃষ্টি করার জন্য তিনি বিশ্বভারতীর সৃষ্টি করেছেন, সর্বার্থসাধক শিক্ষার মধ্য দিয়ে জনচিত্তের উদ্বোধন ঘটানোর মহৎ অভিপ্রায় তাঁকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তৎপর রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ যেহেতু মামুলি যে সেই হেতু নিতান্ত ভারতীয় নয়। জাতির প্রতিরূপ হিসেবে তিনি ব্যক্তিকে প্রণাম জানিয়েছেন। এখানে হেগেলের জাতীয়তাবাদের সংগে তাঁর বুদ্ধিগত অথচ আত্মিক জাতীয়তাবাদের মেরুপ্রমাণ প্রভেদ। কবি বিশ্বাস ক'রতেন যে যান্ত্রিক উদ্দেশ্যে জাতীয় সংগঠনের পেছনে আছে এক ধরনের নৈতিক রিক্ততা। জাতীয়তাবাদকে পশ্চিমী অর্থে গ্রহণ ক'রলেও পশ্চিমের জাতীয়তাবাদকে অর্থাৎ তার পরীক্ষাকে তিনি পূর্ণ সমর্থন জানাতে পারেন নি। শক্তি ও লোভের মধ্য দিয়ে সম্প্রদায়ের সত্যকার সংহতি আসে না, এটা তাঁর বিশ্বাসের বস্তু ছিলো। যেখানে আত্মার পরাভব ঘটে সেখানে জাতীয়তাবাদ একটা বিকারে পর্যবসিত হ'য়েছে। মনুষ্যত্ব বিরোধী যে জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে তিনি চীন, জাপান ও ভারতকে সাবধান করেছিলেন, তাঁর নিজের ভাষায় সেই জাতীয়তাবাদের চেহারা হ'চ্ছে এই, "The orgnized self-interest of a whole people where it is least human and least spriritral" (matioralisn P. 9) রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে হিংসার প্রয়োগ কবির কাছে যে নিন্দনীয় ছিলো, তা ভারতীয় সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে তাঁর

বীতরাগ থেকেই স্পষ্ট প্রমাণ হয়। অপর দিকে তাঁর ধনঞ্জয় বৈরাগী প্রায় গান্ধীবাদী অহিংসারই প্রতীক। কবি সৃষ্টিশীল নীতি প্রধান ব্যক্তিত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা তাঁর 'ন্যাশানালিজম' নামক পুস্তকে বহুবার ব'লেছেন। সৃষ্টিধর্মী মানবসত্তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ শক্তি ও সম্পদের পথে নয়। সর্বপ্রকার আত্মিক বন্ধন মোচনে এটা কবি তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। পশ্চিমের বিরুদ্ধে তাঁর মুখ্য অভিযোগ ছিলো এই যে পশ্চিমের বুদ্ধি ও আত্মা বিপরীতধর্মী। আত্মিক স্বাধীনতার সঙ্কোচন সর্বত্রই—এমনকি সাম্যবাদী রাশিয়াতেও কবির নিন্দাভাজন হ'য়েছে। 'রাশিয়ার চিঠি'তে তিনি স্পষ্ট ভাষায় মানুষের মুক্ত আত্মার এই সূক্ষ্ম সঙ্কোচনের প্রতিবাদ করেছেন—But manhood cast in a mould can never last" (Russiar Chithi-p. 6), রাশিয়ার অর্থনৈতিক বণ্টনপ্রথা শ্রীনিকেতনে কবি একদা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অর্থনৈতিক উৎকর্ষের বদলে আত্মার দাসত্বকে কখনও তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি। আমেরিকার কাছে কবির প্রত্যাশা ছিলো প্রায় হেগেলীয়। পশ্চিমী সভ্যতাকে প্রাচ্যের কাছে ব্যাখ্যা করার মহান দায়িত্ব আমেরিকা স্বীকার করে নি। বরং স্বীয় কার্যকলাপের মধ্য তার অপব্যাখ্যাই করেছে, এ অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের হ'য়েছিলো আমেরিকা সফরের পর। পশ্চিমী সভ্যতার ব্যাধি জাপানকে সংক্রামিত করেছিলো এবং যথাসময়ে কবি জাপানকে বিনাশের পথ থেকে সরে দাঁড়াতে অনুরোধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভংগির সমর্থন আমরা জাপানী কবি নগুচির লেখা এবং চিঠিপত্রে পাই। কবির মতে প্রাচ্যের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান এবং আচার আচরণের উদ্দেশ্য নিছক একটি রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষা নয়। এই-গুলির সংগে প্রাচ্যের মানুষের আত্মার একটা যোগ আছে সে কথাটি রবীন্দ্রনাথ আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। পৃথিবীতে যে নূতন আত্মিক সামঞ্জস্য বিধান হবে তা ভারতবর্ষের মাধ্যমেই হবে, তাঁর Religion of an Artist প্রবন্ধে কবি এই আশা পোষণ করেছিলেন। কেননা ভারত সত্যের জন্য দুঃখ ভোগ করতে পারে। "ভারততীর্থ" কবিতায় আমাদের দৃষ্টিকে পূর্বমুখী ক'রবার, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসাধন ক'রবার কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্য ভংগিতে ব'লেছেন। ভারতের রাষ্ট্রীয় সাধনার সংগে একটি পরিশুদ্ধ জীবনসাধনার যোগ আছে বা থাকবে তাঁর রচনা রাজি থেকে তা আমরা জানতে পারি। জীবনের প্রথম পর্যায়ে দেশীয় স্বদেশ-সেবীদের

অহমিকা সম্বন্ধে কবির একটা গোপন বিরক্তি ছিলো। সেই সংগে সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সত্ত্বেও ইংরাজ-চরিত্রের প্রতি তাঁর আস্থা ছিলো অবিচলিত। সেটা এই কারণে যে ইংরাজী সততা, ন্যায় বিচার এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের নীতি তাঁর কাছে ভারতবর্ষীয়দের অনুকরণযোগ্য ব'লে মনে হ'য়েছিলো। "সন্দীপে"র চরিত্রে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের স্বরূপটি ধরা পড়েছে—যেখানে মোহ-ই প্রধান, বুদ্ধি নয়। 'চতুরঙ্গে' নব্য হিন্দুসমাজের অসাড় ভাবপ্রবণতার কথা তিনি উল্লেখ ক'রেছেন। "গোরা" চরিত্রের মধ্যে পাই। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর ধনতন্ত্রবাদের ফ্যাসীবাদে পরিণতিতে কবির ইংরাজ-চরিত্রের উপর সমস্ত বিশ্বাস অবলুপ্ত হ'লো। শক্তি ও কল্যাণর যে সংযোগ স্থাপন ইংরাজের কাছে তিনি আশা ক'রেছিলেন তা নিরাশায় পর্যবসিত হ'লো। ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্কের এই বিবর্তনের জীবন্ত সাক্ষী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং এই বিবর্তন লক্ষ্য ক'রলে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসবোধের নিশ্চিত পরিচয় পাওয়া যায়।

আত্মশক্তির উদ্বোধনের মধ্য দিয়েই কবি জনশক্তির জাগরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। চিত্তের শুদ্ধি এবং বুদ্ধির কৌলিন্য ছিলো তাঁর কাছে বড়; এখনকার ময়দানের রাজনীতি বা আইন-সভার রাজনীতির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রচ্ছন্ন ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্য ছিলো। দেশবাসীদের চিত্তভূমিতে একটা ঐক্যের বিশ্বাস এবং পরিশুদ্ধ, আবেগবর্জিত বুদ্ধির প্রসার ছিলো তাঁর রাজনীতি সাধনার মূল সুর। দেশের মর্মস্থল ছিলো তাঁর সাধনার ক্ষেত্র। জাতীয়তাবাদ থেকে মানবিকতাবাদে রবীন্দ্রনাথের যে সহজ এবং অনায়াস পদক্ষেপ তার কারণ তাঁর সমাজ-বোধ ও দার্শনিক বিশ্বাস একটি বিমিশ্র মানবিকতাবাদী রূপ নিয়েছিলো। দ্বন্দ্ব নয়, মিলনের মধ্যেই তিনি মানুষের কল্যাণের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর 'বিশু পাগলা' যে স্বাধীন আত্মার প্রতীক, শুভ বুদ্ধির মধ্যে দিয়ে সেই আত্মার মুক্তি ক'রতে তিনি চেয়েছিলেন। কেন জানি না, কবি বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয় চরিত্রের রূপান্তর ছাড়া ভারতের সমাজ ব্যবস্থার রূপান্তর অসম্ভব এবং অসম্পূর্ণ।

'লড়াই'-এর মূল প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসীবাদের ক্রম প্রসারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ ক'রেছেন। ভারতের বে-সরকারী দূত হিসাবে শান্তি ও কল্যাণের, অন্য কথায় সর্বমানবীয় ঐক্যের বাণী তিনি আমেরিকা, ইউরোপ সর্বত্র প্রচার করেছেন। তাঁর মানুষ বিশেষভাবে কোন অঞ্চলের নয়, কোন দেশ, সমাজ

ব্যবস্থা বা মতবাদের নয়। সে মানুষ, একটি নির্বিশেষ মানুষ—যে বুদ্ধি, শক্তি ও কল্যাণের মধ্যে একটি সুসম সামঞ্জস্য বিধানে তৎপর। তাঁর রাষ্ট্র একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র নয়, যদিও অরবিন্দের মত তিনি জাতি ও রাষ্ট্রের তফাৎ করেন নি। তাঁর রাষ্ট্র একটি আদর্শ রাষ্ট্র, যেখানে আত্মার পূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়ে প্রতিবেশীদের মধ্যে একটি সহজ মানবিক সৌহৃদ্য গড়ে ওঠে। চরিত্রের শুদ্ধি যে তাঁর কাছে কত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো "বিদ্যাসাগর রচিতে" তার ভূয়সী প্রমাণ মেলে। স্বাতন্ত্র্যকে বর্জন ক'রে—সে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যই হোক বা জাতিগত স্বাতন্ত্র্যই হোক—কবি মানুষের ধর্ম প্রচার করেন নি। "স্বাতন্ত্র্যের পরিণাম" নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন "স্বাতন্ত্র্যেও পূর্ণতা লাভ কবির এবং মিলনেও নিজেকে পূর্ণভাবে সমর্পণ কবির, ইহা হইলেই মানুষের সার্থকতা ঘটে।" শেষের দশ বছরের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের স্বাজাত্য-বোধ এবং বিশ্বাত্ম-বোধ একাকার হ'য়ে গেছে। তাঁর "ঐকতান" এবং 'শিশুতীর্থ' কবিতায় দেশের সাধারণ মানুষের জন্য যে সহমর্মিতা এবং সভ্যতার দুঃসহ পরিণামে যে আর্তি প্রকাশ পেয়েছে তা সত্যই বিরল। দেশের মানুষের ছোট ছোট সুখ দুঃখের কথা তাঁর "পোষ্টমাষ্টার"। "সমাপ্তি", "অতিথি" এবং "শাস্তি" প্রমুখ গল্পে যেন জীবন্ত রূপ নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যুগধর্মিতার আর কি প্রমাণ উপস্থাপিত করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ একাধারে যুগস্রষ্টা এবং যুগের সৃষ্টি। ভারতের সামাজিক ক্ষেত্রে একদিকে তিনি দার্শনিক, অপরদিকে প্রয়োগকর্তা। শেষ কথা, রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক কবি নন, তিনি মুখ্যত কবি। তাঁর রাজনৈতিক মতামত নিয়ে কোন রাজনৈতিক বাক্‌বিতণ্ডার অবতারণা করার অর্থ হ'লো তাঁর আত্মার প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা। আজকের ক্লিষ্ট এবং বিভ্রান্ত পৃথিবী রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু লেখা থেকে এখনও প্রেরণা পেতে পারে, দিক্‌দর্শন পেতে পারে। কেননা, আজকের সঙ্কট মস্তিষ্কের এবং হৃদয়ের, উভয়তই।

আধুনিক ফরাসী কবিতা

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে থিওফিল গোতিয়ের ফরাসী কবিতাকে রোমাণ্টিকতার কবল থেকে মুক্ত করে কলাকৈবল্যতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করবার যে প্রয়াস পান, লেকঁৎ দ্য লিলের নেতৃত্বে পার্নেসীয় আন্দোলন সে প্রয়াসকে এক বলিষ্ঠতার পরিণতি দান করে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর ফ্লুয়ার দ্য ম্যা'কে একটি বিশুদ্ধ শিল্পসৃষ্টি বলে ঘোষণা করলেও রোমাণ্টিকতা বা কলাকৈরণ্যতত্ত্ব কোনটিকেই কাব্যরীতি হিসাবে পুরোপুরি-ভাবে গ্রহণ করেন নি বোদলেয়ার। বোদলেয়ারের কাব্যকলা যে অভিনব রীতিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে, সেই রীতিই ফরাসী সাহিত্যেকে একটি নূতন গতি পথের সন্ধান দেয় এবং এই গতিপথই কালক্রমে আধুনিকতার খাতে পর্যবসিত হয়। বস্তুতঃ বোদলেয়ারকে শুধু ফরাসী সাহিত্য নয়, সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যের মধ্যে সর্বপ্রথম আধুনিক কবি বলা যেতে পারে। সার্থক প্রতীকী শব্দচিত্র রচনানৈপুণ্যে, আদর্শ বস্তুনিষ্ঠায়, আবেগ ও অভিজ্ঞতার স্বচ্ছ আলোতে জগৎ ও জীবনকে নূতন করে দেখার আকুতিতে বোদলেয়ার শুধু সর্বপ্রথম নন সর্বপ্রধান আধুনিক কবিরূপে বিশ্বে আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী, আজও অমিতপ্রভব।

অথচ আধুনিক হয়েও আধুনিকতার সবচেয়ে বড় অভিশাপ থেকে তিনি মুক্ত। দুর্বোধ্য ভাব ও ভাষার যে অসংলগ্ন জটিলতার অভিশাপ এক কুঞ্চকুটিল ছায়াবিস্তারের দ্বারা সমগ্র বিশ্বের আধুনিক কাব্যের মহিমাকে ম্লান করে রেখেছে অনেকখানি, সে অভিশাপ বোদলেয়ারের কাব্যকে স্পর্শ করতে পারে নি। ফরাসী কাব্যের ইতিহাসে বোদলেয়ারই হচ্ছেন শেষ সহজবোধ্য কবি। অতিসূক্ষ্ম এক অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য চেতনা ও নিবিড় ঐক্যবোধের দ্বারা যে জগৎ তাঁর কাব্যে সৃষ্টি করেছিলেন বোদলেয়ার, মানুষের বোধি ও বুদ্ধির অগম্য ছিল না সে জগৎ। সে জগৎ একদিকে যেমন ছিল অতৃপ্ত কামনায় চিরচঞ্চল, আর একদিকে

তেমনি না পাওয়ার বেদনায় বিষাদগম্ভীর, আবেগানুভূতির গভীরতায় যেমন উষ্ণ, স্থিতধী প্রজ্ঞায় তেমনি শান্ত স্নিগ্ধ, উগ্র কামচেতনায় যেমন অন্ধকার তেমনি আবার শান্ত প্রেমের দীপ্তিতে ভাস্বর। এই সব পরস্পর-বিরোধী গুণের আশ্চর্য সমন্বয়ে ও ভাষার সহকারী শক্তি দিয়ে গঠিত সে জগৎ এমনি এক সহজবোধ্য উদারতার আশ্রয়ে ধন্য ছিল যার ফলে তারকালোত্তীর্ণ আবেদনের গভীরে সকল যুগের সকল মানুষের রসবোধই স্বচ্ছন্দে অবগাহন করে তৃপ্ত হবে সব সময়। রচনার প্রায় একশো বছর পরে আজও তাঁর **'Un Voyage a' Cythere** কবিতা পড়তে পড়তে আমাদের অন্তর আলোক পিপাসায় উন্মত্ত কোন পাখির মত যুক্তির গান গেয়ে গেয়ে শান্ত সমুদ্রের উপর সেই আশ্চর্য মায়াবী দ্বীপে উড়ে যেতে চায় যেখানে প্রাচীন কামদেবতা ভেনাসের প্রেতাত্মা সারা সমুদ্রের উপর সুবাস ছড়িয়ে এক কামার্ত বেদনায় বিধুর করে তোলে সকলের চিত্তকে। Le Bijous' কবিতায় মৃদু প্রদীপালোকে উদ্ভাসিত রত্নভূষিতা যে উলংগ নায়িকার শাশ্বত রূপ তিনি বর্ণনা করেছেন, তা কি সকল যুগের সকল পুরুষের আত্মিক প্রশান্তিকে নিঃশেষে কেড়ে নিয়ে তাকে উন্নতির পাহাড় থেকে পাপের গহ্বরে নিক্ষেপ করে না। 'Le Voyage' কবিতায় মানবাত্মার শাশ্বত গতিশীলতাকেই এক মনোরম কাব্যরূপ দিয়েছেন তিনি। কী অদ্ভুত সেই গন্তব্যস্থল, সেখানে লক্ষ্য কখনো স্থির হয়ে থাকে না; যেখানে অক্লান্ত ও অন্তহীন আশার তাড়নায় মানুষও যত এগিয়ে চলে, লক্ষ্যস্থলও তত এগিয়ে চলতে থাকে সামনের দিকে। এমনি করে দেখা যায়, বোদলেয়ারের যে কাব্যজগৎ সেখানে আলোছায়ার দ্বন্দ্ব-মধুর ক্রিয়াচঞ্চলতায় চিরধূসর এক গোধূলিলগ্ন বিরাজিত, সেখানে শান্ত নিরুচ্চার এক বেদনার স্নিগ্ধচ্ছায় আবরণ খরদ্যুতি সৌন্দর্যের ও আনন্দের সমস্ত প্রখরতাকে এক রহস্যময় মাধুর্যে মণ্ডিত করে রেখেছে। বোদলেয়ার বিশ্বাস করতেন, যে কোন সৌন্দর্য ও আনন্দ-চেতনার সংগে রহস্য ও বিষাদ আছে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। তিনি বলেছেন:

Le mystire Le regret sont aussi des caracteres du Beau.

রহস্য ও বিষাদ হচ্ছে সৌন্দর্যের দুটি বিশেষ গুণ। যা কিছু সুন্দর তাই রহস্যময়, তাই বিষাদময়। কোনরূপ অতিপ্রাকৃতের সাহায্য না

নিয়ে কেবলমাত্র প্রাকৃত বস্তুকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করে ও ভাষার যাদুকরী শক্তিকে সম্বল করে কাব্যের মধ্যে রহস্য সৃষ্টির এই ক্ষমতার দিক থেকে বোদলেয়ার একমাত্র অষ্টাদশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জার্মান কবি শিলারের সংগে তুলনীয়। মানুষ একমাত্র সুবিবেচনা ও প্রজ্ঞাপ্রসূত শৃংখলাবোধের দ্বারা তার অন্তঃস্থ ও বহিস্থ প্রতিকূল শক্তিগুলিকে পরাভূত করে তবে সে নূতন নূতন সার্থক সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তার আত্মার জয় ঘোষণা করতে পারবে—শিলার তার **'Das Lied von der Glocke'** কবিতায় মানবজীবন সম্পর্কিত এই সত্যটিকে কয়েকটি প্রতীকী ভাববস্তুর দ্বারা অতি সুন্দরভাবে রহস্যামিত করে রূপ দান করেছেন। অবশ্য শিলারের এই শক্তিমত্তাকে স্বীকার করেও একথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে শিলার তার কোন কবিতায় যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বোদলেয়ারের মত কোন অতিসূক্ষ্ম সৌন্দর্যচেতনা ও ভাবময় বেদনাকে বাস্তব প্রকাশ করায় চিত্রিত করে যেতে পারেন নি।

রহস্যময়তার এক ছায়া ছায়া অন্ধকার বোদলেয়ায়ের কাব্য গদ্যকে আলতোভাবে জড়িয়ে থাকলেও সে অন্ধকার সূচিভেদ্য হয়ে তাঁর কাব্যকে দুর্বোধ্য করে তোলে নি কোথাও। তার কারণ যে সব বস্তুকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করতেন তিনি, অনুভূতির নিবিড়তা ও চিন্তার সরসতা দিয়ে সেই সব বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তাগুলিকে গলিয়ে তার কবিতার ভাববস্তুর সংগে এমন আশ্চর্যভাবে মিলিয়ে দিতেন যে প্রতীকগুলিকে কখনো অপরিচিত ও মূল ভাবকল্পনা হতে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয় না কখনো! কিন্তু বোদলেয়ারের এই শক্তিমত্তা পরবর্তীকালের কবিদের মধ্যে সার্থকভাবে সঞ্চারিত হয় নি। বরং উত্তরকালে তাঁর এই কাব্যাদর্শ সমস্ত সরল সহজবোধ্য ও মহিমার উজ্জ্বলতা হারিয়ে এক অন্ধ প্রতীকপ্রিয়তায় —**mythomania** পর্যবসিত হতে থাকে ক্রমশঃ।

বোদলেয়ারের পর উনিশ শতকের পর ফরাসী কবিতার ক্ষেত্রে আর যে দুইজন শক্তিমান কবির নাম উল্লেখ সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন স্তেফান ম্যালার্মে ও আর্তুর র‍্যাঁবো। শক্তিমান অথচ ভয়ানকভাবে দুর্বোধ্য রীতির দ্বারা বিশ্বের বহু আধুনিক কবি প্রভাবিত হয়েছে। ম্যালার্মে বিশ্বাস করতেন, পৃথিবীতে একমাত্র সুন্দরই হচ্ছে সত্য এবং এই সুন্দরের একমাত্র সার্থক ও সর্বাত্মক বিকাশ ঘটে কাব্যে।

তাঁর বিশ্বাসের কথা তিনি পঁচিশ বছর বয়সে তাঁর বন্ধুকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন। তাঁর মতে কাব্যের কাজ হচ্ছে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য, আত্মিক পবিত্রতা প্রভৃতি কতকগুলি নির্বিশেষ ভাবকে মূর্ত করে তোলা। তিনি মনে করতেন, বস্তু যখন কোন রূপের মধ্যে বিশোধিত হয় তখন তার নির্বিশেষ সামান্য সত্তার অনন্তই ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারেন না। তাঁর বিশ্বাস, বস্তুর নির্বিশেষ সত্তাই একমাত্র সত্য, সুন্দর ও অবিসংবাদিতভাবে বিশুদ্ধ। এই নির্বিশেষ বস্তুসত্তা ও ভাবসত্তাকে যথোচিত প্রকাশ করাই কাব্যের একমাত্র লক্ষ্য হলেও সে লক্ষ্যে পৌঁছতে কাব্য কোনদিনই পারবে না, কারণ ভাষা ছাড়া কাব্যের তার কোন শক্তি নেই এবং ভাষা যত শক্তিশালীই হোক না কখনই কোনভাব বা অনুভূতিকে পুরোপুরিভাবে প্রকাশ করতে পারে না। তাই ম্যালার্মে বলেছেন ঃ

Tont chose sacree et qui vent demeurer sacree s'envepoppe de mystere.

যদি কোন জিনিষ আপন বিশুদ্ধতাকে বজায় রাখতে চায় তবে তাকে রহস্যময় হতে হবে। কী প্রকৃতি জগতে কী যে সত্য পরিপূর্ণভাবে বিশুদ্ধ ও সুন্দর তা চিরকালই ভাষার অতীত তীরে কুহেলি-ঘন অপরিচয়ের এক বিরাট রহস্যজাল বিস্তার করে দাঁড়িয়ে থাকে ; সে সত্য চিরকালই অপরিমেয়ভাবে গভীর, অচিন্তনীয়ভাবে বিরাট, অনির্বচনীয়ভাবে প্রচ্ছন্ন ও ইন্দ্রিয়াতীতভাবে নিরাকার। কিন্তু যা ভাষার অতীত, সেই সেই নিরিন্দ্রিয় নির্বিশেষ সত্যকে ভাষা দিয়ে, তাঁর কাব্যে সব সময় বাঁধতে যেতেন বলেই ভাব ও ভাষার এক অপরিহার্য দ্বন্দ্বে ম্যালার্মের কবিতা এতখানি ঊর্মিমুখর, এক কষ্টার্জিত প্রয়াসের প্রবলতায় এখন উদ্বেগ, দুর্বোধ্যতায় এরূপ অদ্বিতীয়। ভাষার যাদুকরী শক্তিতে বিশ্বাসী হলেও তাঁর নির্বিশেষ ভাবসত্তা বা বস্তুর বিশুদ্ধ সামান্য সত্তাকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণভাবে ব্যক্ত করবার যত কোন ভাষা কখনো খুঁজে পান নি ম্যালার্মে। তাই তাঁর কবিতার মধ্যে দেখা যায়, তিনি যা বলতে, চেয়েছেন তা ঠিক ব্যক্ত হয় নি, যা এর মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে তা তিনি ঠিক বলতে আমার মনে হয় Bris Marine ও Don du poeme কবিতা দুটি ম্যালার্মের অন্য সব কবিতা হতে শ্রেষ্ঠ এবং দুই একটি জায়গায় কোন কোন প্রতীক কিছুটা দুর্বোধ্য বলে মনে হলেও মোটের উপর কবিতা দুটি অপেক্ষাকৃত

সহজবোধ্য। এই দুটি কবিতার মর্মকথার মধ্যে ম্যালার্মের কবিধর্মের একটি বিশেষ দিক সবচেয়ে বেশী প্রতিফলিত হয়েছে। **Bris Marine** বা 'সমুদ্র বাতাস' কবিতায়ও যে কবিসত্তা পাখি হয়ে সফেন সমুদ্র ও সুনীল আকাশ পিপাসায় মত্ত হয়ে সাজানো বাগান ও পৃথিবীর সব সুখ-শান্তি ত্যাগ করে দূর-দিগন্তের পথে উধাও হয়ে যেতে চেয়েছে **Don du poeme** বা 'কবিতার দান' কবিতায় সেই পাখিই সহসা ক্লান্ত ভগ্নপক্ষ ও রক্তাপ্লুত দেহে একটি নবজাত শিশুর মত এক অপরিসীম নিঃস্বতা ও সহায়তায় মাটির পৃথিবীর কোলে লুটিয়ে পড়েছে এবং এই মাটির পৃথিবীকেই ধাত্রী বলে স্বীকার করে তার আকাশ পিপাসাকে নিবৃত্ত করবার জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা করেছে। একদিকে আকাশবাণী নির্বিশেষ ভাবকল্পনা আর অন্যদিকে মাটির পৃথিবীর প্রতি এক প্রয়োজনগত আসক্তি—এই দুই পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবধারার দোটানাটানিতে ম্যালার্মের কবিতা অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

র‍্যাঁবোর ভাবকল্প না কিন্তু ম্যালার্মের মত নির্বিশেষ বা অশরীরী ছিল না। এক তীক্ষ্ণ সমাজচেতনা ও ইতিহাসচেতনা র‍্যাঁবোর কবিসত্তার সংগে সূক্ষ্মভাবে মিশ্রিত হয়ে তাঁর ভাবকল্পনাকে এমন এক বাস্তব ভিত্তিভূমি দান করেছিল, যার ফলে তাঁর বক্তব্য অনেকখানি স্পষ্ট ও ভাববস্তু এক সহজবোধ্য স্বচ্ছতায় হৃদয়সংবেদ্য হয়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছিল। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও প্রথাবদ্ধ সংস্কারের প্রতি এক বৈপ্লবিক বিতৃষ্ণা সমস্ত কাব্যপ্রেরণার মূলে রস সঞ্চারের দ্বারা সৃষ্টির আবেগকে অস্বাভাবিক রকমের বেগবান করে তুলেছিল র‍্যাঁবোর। কিন্তু ভাঙ্গবার যে পরিমাণ শক্তি ছিল র‍্যাঁবোর, গতবার শক্তি সে পরিমাণ ছিল না। তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে মনে হয়, নিজেরি হাতে সব কিছুকে ভেঙ্গে চুড়ে ধ্বংস করে ফেলবার পর এক অপসৃয়মান পৃথিবীর অন্ধকার মহাশূন্যতায় দাঁড়িয়ে অক্ষম আবেগে ক্ষতবিক্ষত একটি আত্মা যেন নূতন কিছু সৃষ্টি করবার জন্য বুকফাটা যন্ত্রণায় ছটফট করছে। কিন্তু সত্যি-সত্যিই যে কিছু সৃষ্টি করে উঠতে পারছে না। পুরোণ পৃথিবীকে ভেঙ্গে ফেললেও বৃহত্তর কোন নতুন পৃথিবীর ছবি যার দৃষ্টির সীমার মধ্যে এখনো স্পষ্ট হয়ে উঠেনি।

Pes Premieres Commumions' কবিতায় র‍্যাঁবো গ্রামের চার্চে

দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্ট জর্জরিত গ্রামবাসীদের ধর্মোপাসনার অর্থহীনতার প্রতি এক সুস্পষ্ট ইংগিত দান করেছেন। এই উপাসনাকে তিনি অর্থহীন প্রলাপ বলে কতকগুলি প্রতীকের মাধ্যমে এর সমস্ত গুরুত্বকে অস্বীকার করেছেন। "Qu' est-ce qour nous, mon coeur, gme les uapreg de sang" কবিতায় কবি যুদ্ধের বিভীষিকায় ও কলুষিত অজস্র মানুষের রক্তপাতে কলংকিত সভ্যতার উপর সমস্ত আস্থা হারিয়ে সাম্রাজ্য সাধারণতন্ত্র, উপনিবেশ সমস্ত কিছুর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছেন। বর্তমান মানব-সভ্যতার এই শোচনীয় হীনতা ও অপরিপূর্ণতায় নিবিড় অস্বস্তি অনুভব করে নূতনতর ও উজ্জ্বলতর সভ্যতায় সমৃদ্ধ এক মহত্তর ও বৃহত্তর জগৎ ও জীবনের জন্য কতদূর ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন তিনি, তা matin কবিতায় সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

When shall we go beyond the shores and mountains to hail the firth of a new labour, new wisdom flight of tyrants and demons, the erd of superstition, to worship—the first time!—Christmas on earth?

ব্যগ্র প্রতীক্ষায় সেই দিনের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছেন রাঁবো যেদিন আমরা সকলে পর্বত ও সমুদ্র বেষ্টিত এই পৃথিবীর সীমাকে অতিক্রম করে নূতন জ্ঞান ও শ্রমের শক্তিতে সার্থক সমস্ত অত্যাচার, অবিচার ও কুসংস্কার হতে যুক্ত এক নূতন পৃথিবীকে বরণ করে নিতে পারবো এবং যেদিন খৃষ্টের সত্যিকারের আবির্ভাব ঘটবে এই পৃথিবীতে। কিন্তু নূতন পৃথিবীর ধারনা খুব স্পষ্ট নয় রাঁবোর। তাই পুরোণ পৃথিবীর প্রতি বিতৃষ্ণার আবেগ যতখানি প্রকট হয়ে উঠেছে রাঁবোর কাব্যে, নূতন পৃথিবীর চেহারাটা ঠিক ততখানি স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

॥ ২ ॥

ভাব ও ভাষার দিক থেকে বোদলেয়ার ম্যালার্মে ও রাঁবো-আদর্শের যে এক অতি ভাস্বর পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন উনিশ শতকে, সুরিয়ালিজম ও দাদাইজম প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ বিশশতকের শুরু থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত অন্তবর্তীকালীন উল্লেখযোগ্য কোন কবি ওই পরিমণ্ডলের বাইরে নূতন কেনে আদর্শের আলোক মণ্ডল গড়ে

তুলতে সক্ষম হয় নি। বরং বিগত শতকের ওই আদর্শের আলোকমণ্ডলটিকেই সকলে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথের উপর দিয়ে প্রদক্ষিণ করতে থাকেন। এই যুগের কবিগণের মধ্যে যাঁরা পূর্বসূরীদের প্রতিভার আলো থেকে কিছু ঋণ গ্রহণ করা সত্ত্বেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অনেকখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠতে সমর্থ হন তাঁদের মধ্যে পল ক্লোদেল, পল ভ্যালেরী এবং সাঁজা পার্সের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের কারোরই অবশ্য বোদলেয়ারের মত নূতন জগৎ গড়ে তোলবার গঠনমূলক কল্পনাশক্তি বা রাঁবোর মত পুরোন জগৎকে ভেঙ্গে ফেলবার দুরন্ত ও বলিষ্ঠ মনোবল ছিল না। কিন্তু এঁরা প্রত্যেকেই আংশিকনৈপুণ্য, প্রতীকপ্রিয়তা ও ভাষার যাদুকরী শক্তিতে সুগভীর বিশ্বাসের সার্থক উত্তরাধিকার পূর্বসূরীদের কাছ থেকে সরাসরিভাবে লাভ করেছিলেন। তবে যে সব দার্শনিক প্রত্যয়কে অবলম্বন করে তাঁদের আপন আপন কবিতার ভাববস্তুগুলি গড়ে উঠেছিল, সেই সব প্রত্যয়ের দিক থেকে তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন স্বতন্ত্র ও মৌলিক। যাঁরা মনে করেন, রাঁবোর ইতিহাস চেতনা হতে ক্লোদেলের ক্যাথলিকপ্রীতি (যদিও ক্লোদেল নিজেও তাই মনে করতেন) ও ম্যালার্মের উগ্র আত্ম-কেন্দ্রিকতা হতে ভ্যালেরীর নার্সিসিজম্ উদ্ভূত, তাঁদের ধারণাগুলিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে সেগুলির ভিত্তিমূলে কোন যুক্তিসিদ্ধ তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

ক্লোদেলের ক্যাথালিকপ্রীতি এক বিশুদ্ধ ধর্মানুভূতি নয়। এক নিবিড় বিশ্বসৌন্দর্যানুভূতিই ক্রমান্বয়ে তার ধর্মানুভূতি ও ঈশ্বরানুভূতির মধ্যে সার্থক পরিণতি লাভ করে। এই বিশ্বসৃষ্টির বিরাটত্বে বিস্মিত ও সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ ক্লোদেল নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই স্রষ্টাকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেন। ক্লোদেলের ঈশ্বর হচ্ছেন এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা, এক পরম শিল্পী অনন্ত স্বাধীনতা ও অফুরন্ত শক্তির প্রতীক। তাই তাঁর একমাত্র বাসনা ঈশ্বরের রাজ্যে গিয়ে সালোক্য মুক্তি লাভ করা।

Mon desir est d'etre le rassembleur de de terre de Dien

আমার মনে হয়, ক্লোদেলের সমস্ত কবিতার মধ্যে একমাত্র Contique du Rhone কবিতায় তাঁর ভাবগত বক্তব্যটি সবচেয়ে বেশী পরিস্ফুট হয়েছে।

স্বর্গের চূড়া থেকে নেমে আসাও সুউচ্চ পর্বতের তুষারশুভ্র বক্ষ পান করে বেঁচে থাকা রোন নদী সেই তরলায়িত প্রাণশক্তির প্রতীক। যা সমস্ত মানুষের শিরায় শিরায় অফুরন্ত রক্তরস সঞ্চারিত করে তাদের বাঁচিয়ে রাখে। দূর দিগন্তে আকাশের এক প্রান্তসীমায় মিশে গিয়ে রোন নদী সেই স্বর্গলোকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যেখানে ঈশ্বর মাথায় অপরিসীম পুণ্যের মূর্ত প্রতীক এক, শুচিশুভ্র মুকুট পরে সব কিছুর ঊর্ধ্বে বসে আছেন, দূর মেঘ লোকের অন্তরালে যেখানে চারিদিকে অজস্র পাহাড় দিয়ে ঘেরাও ভাইন গাছের মেদুর ছাওয়ায় ঢাকা শান্ত শীতল এক বিশাল বনভূমির সবুজ ঘাসের জাজিম-পাতা বুকের উপর দিয়ে কত শত নির্ঝরিণী নাইতে নাইতে বয়ে যায়, যেখানে কত নাম-না-জানা ফুল আপনা হতে ফুটে ওঠে, যেখানকার মাটি অফুরন্ত ও অনায়াসলভ্য সোনার ফসলের অনন্ত সম্ভাবনায় সতত সমৃদ্ধ।

ইংরাজ কবি ব্রাউনিং-এর মত দয়িত-দয়িতার কান্তাপ্রেমের মধ্যে ঈশ্বর প্রেমের মহত্তর উপলব্ধিতে বিশ্বাসী ছিলেন না ক্লোদেল। বরং তিনি ভাবতেন, এই প্রেম ঈশ্বর লাভের পথে একান্ত অন্তরায় হয়ে ওঠে। ঈশ্বর প্রেমে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত একটি আত্মা কিভাবে সহসা স্বার্থের মোহে নারীপ্রেমকে জীবনে সবচেয়ে বড় বলে মনে করে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যায় আবার অবশেষে নিজের ভুল বুঝতে পেরে কি করে নিরিড় অনুশোচনায় ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সঁপে দেয় তার কথা Partage de Midi নাটকে বড় সুন্দর করে বলেছেন ক্লোদেল। ক্লোদেলের ক্যাথলিক ধর্মনিষ্ঠা কিন্তু তাঁর কাব্যে প্রকট হয়ে কাব্যের রসহানি করেনি কোথাও ; বরং তা তাঁর বিভিন্ন কাব্যে ও নাটকে এক মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্যের সংগে সুমধুর গীতিময়তার আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়ে তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকে এক অতুলনীয় মহত্তের মর্যাদা দান করেছে। ম্যালার্মের মহাশূন্যে উড্ডীয়মান ও অবসন্ন নির্বিশেষ ভাব কল্পনাকে ভ্যালেরী বিশেষিত করে তাকে এক আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ় ভিত্তিভূমি দান করেন। ভ্যালেরীর উগ্র আত্মকেন্দ্রিকতার মধ্যে ফ্রয়েডের Narcissism ও দর্শনের Solipsism বা আত্মসর্বস্বতাবাদের যথেষ্ট প্রতিফলন পড়লেও তার উপর অনেকখানি নিজস্ব সুর সংযোজিত করেছেন ভ্যালেরী। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নিজের উপলব্ধির কথা বলতে গিয়ে এক জায়গায় ভ্যালেরী বলেছেন :

But I, Narcissus beloved, am curious of my own essence alone; any other has only a heart of mystery for me, any other is but absence.

আত্মপ্রেমে মুগ্ধ ও আত্মার সুরভিতে মত্ত আমি—যেন কোন এক নার্সিসাস; আমার এই আত্মার সীমার বাইরে আর সব কিছুই মিথ্যা! আমি ছাড়া আর যা কিছু আছে তা নিবিড় আঁধারে রহস্যময়, তা শূন্যতায় নাস্তিগর্ভ। কিন্তু ভ্যালেরীর এই আত্মকেন্দ্রিয়তা নিছক ফ্রয়েডীয় আত্মরতি নয়। আপন আত্মার সুগভীরে প্রবেশ করে ভ্যালেরী যেন অফুরন্ত জীবনী শক্তির প্রতীক বিশ্বমানবাত্মার কনিষ্ঠ রূপটিকেই প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। তাই আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে নম্রভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ঋজুশীর্ষ যে তালগাছ প্রতিদিন সূর্যকে বরণ করে নেয় ও বিদায় দেয়, যে দুঃখে বাতাসের মধ্য দিয়ে অভিযোগ করে, কিন্তু একেবারে ভেঙ্গে পড়ে না, যার কাণ্ডের মধ্যে অবিচল ধৈর্যের সুরে বাঁধা অজস্র অনু পরমাণু রসাল ফল সৃষ্টির জন্য নীরব প্রস্তুতিতে নিয়ত স্পন্দমান সেই তালগাছকে বলিষ্ঠ মানবাত্মার প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছেন। Le Pythie কবিতায় পাইথনের অগ্নিস্রাবী ভয়ংকর নিঃশ্বাসের মধ্যে আশাহত মানবাত্মার অবরুদ্ধ বেদনাই যেন ফুঁসে ফুঁসে গর্জন করে উঠেছে। দূর আকাশের পথে ছবার গতিতে উড়ে যেতে চাইছে যুক্তি-কামী যে আত্মা, তাকে নিজের চক কুটিল দেহের সর্পিল বন্ধনে বেঁধে রাখতে না পাইথন। ভাবোপোযোগী ভাষার গাম্ভীর্য সৃষ্টি ও শব্দের ধ্বনিময়তার প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি রাখলেও কতকগুলি জায়গায় প্রতীক প্রয়োগের মধ্যে জটিলতাকে কাটিয়ে উঠে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারেন নি ভ্যালেরী। ক্লোদেলের মত তাঁর সব প্রতীক স্বচ্ছ ও সহজবোধ্য হয়ে উঠতে পারেন নি সব জায়গায়।

প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পর দেশের বিক্ষুব্ধ মানসিক আবহাওয়ায় সুযোগে শান্তিকামী সুপারভিয়েন কবি হিসাবে বেশ কিছু খ্যাতি অর্জন করলেও তাঁর কবিতায় আধ্যাত্মিক অতৃপ্তির সংগে বিশ্বজগতের সর্বত্র শান্ত নিবিড় এক আশ্রয়ের ব্যাকুল সন্ধান ছাড়া আর কোন গভীরতর বা নূতনতর সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। সমস্ত পৃথিবী ঘুরে তিনি কোথাও ঈশ্বরের পদচিহ্ন খুঁজে পান নি পেয়েছেন শুধু বেদনার বোঝাভার।

Sans dieu কবিতায় তাই দেখি, রাত্রির সঘন কুয়াশায় শ্বাসরুদ্ধ ও অন্ধকার পৃথিবী ছেড়ে কবি নক্ষত্রের অনন্ত আলোয় নিজেকে আলোকিত করবার জন্য আকাশের মহাশূন্যতার মাঝখানে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করেছেন।

র‍্যাঁবোর যে ইতিহাস চেতনা ক্লোদেলের মনের উদাস দিগন্তটারে আলতোভাবে ছুঁয়ে যায়, সে চেতনা একমাত্র সাঁজা পার্সে মধ্যে স্থায়ী-ভাবে বাসা বাঁধে। তাঁর কবিজীবনের প্রথম থিকে এই চেতনার দ্বারা প্রভাবিত পার্সে। পরিণামদর্শী র‍্যাঁবোর দূরদৃষ্টির তিনি সার্থক উত্তরাধি-কারী। প্রথম মহাযুদ্ধের দ্বারা ইউরোপীয় সমাজ ও সভ্যতা ক্ষতবিক্ষত হবার পূর্বেই মানব সভ্যতার অপরিপূর্ণতার প্রতি পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন পার্সে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ Eloges তাঁর যে তীব্র শৈশবপ্রীতি দেখা যায় তার মধ্যে এই সচেতনতাই বিশেষ-ভাবে সোচ্চার না হয়ে উঠলেও শান্তভাবে অভিব্যক্ত। একমাত্র র‍্যাঁবো ছাড়া বোদলেয়ার হতে সুরু করে বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত সমস্ত কবির মধ্যে ভাগার সুললিত অবয়ব ও কল্পনার রঙ রস দিয়ে কাব্যের মধ্যে যে অভিনব জগৎসৃষ্টির যে এক প্রবণতা দেখা যায়, তার আশ্চর্য ব্যতিক্রম পাওয়া যায়, পার্সের মধ্যে। ভাব ও ভাষা দিয়ে কাব্যের মধ্যে নূতন কোন জগৎ সৃষ্টির চেষ্টা না করে তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা এই বর্তমানের বাস্তব জগৎকেই চুল চিরে বিচার করে দেখবার প্রয়াস পান পার্সে।

র‍্যাঁবোর ইতিহাস চেতনার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হলেও শুধু বর্তমানের প্রতি গভীর বিতৃষ্ণার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে সে চেতনাকে নিঃশেষিত করেন নি পার্সে। বরং তার সংগে আদিম অতীত ও গতীশীল ভবিষ্যৎকে যুক্ত করে সে চেতনাকে এক সুদূর প্রসারী সম্পূর্ণতা দান করেন। Eloges কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত একাধিক কবিতায় শৈশবের প্রতি তাঁর যে প্রবল প্রত্যাবৃত্তি বাসনা প্রকাশিত হয়েছে, তাকে কিন্তু তাঁর অতীতাশ্রয়ী পলাতক মনোবৃত্তির পরিচায়ক বলে মনে করলে ভুল করা হবে।

Enfance mon amour ! is n'est que de ceder···

যে প্রিয় শৈশবের মধ্যে কবি এমনিভাবে নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দিয়েছেন, যে শৈশব তাঁর কাছে আদিম অকৃত্রিম সরলতা ও সজীবতারই

প্রতীক। তা যদি না হত, তাহলে যে সজীব সোনালি সকালে সমস্ত বস্তু তাদের স্বাভাবিক কঠোরতা হারিয়ে কোমল ও কমনীয় হবার জন্য প্রার্থনা করছে সেই সকালে শৈশবকে উঠে আসবার জন্য আহ্বান জানাতেন না।

Childhood, my love! It is morning; there are things imploring sweet as the harted of song, sweet as the shame trembling on the lips, things spoken in profile, things sweet and imploring like the sweetest voice of the male, if he agree to incline his harsh soul towards the woman's inclining...

আদিম সরলতার প্রতীক শৈশবের প্রতি কবির এই ব্যাকুলতার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে, এ ব্যাকুলতা এক সূক্ষ্ম ইতিহাস চেতনারই ফল এবং এক বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে কূটনৈতিক কাজের জন্য বিদেশে জীবন-যাপনের ফলে অরেও গভীর হয়ে ওঠে এই ব্যাকুলতা।

প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের পর প্রকাশিত Anabase কাব্যগ্রন্থে পার্সের বক্তব্য সুস্পষ্টতা ও বলিষ্ঠতা লাভ করে এবং তাঁর প্রতিভার যথার্থ স্ফুরণ ঘটে। Eloges এর খণ্ড খণ্ড প্রতীকী রূপকল্পতান Anabase-তে এসে এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে সুসংবদ্ধ হয়ে অসংলগ্ন ভাববস্তুগুলিকে স্বচ্ছ সংহত ও এক গভীরার্থক দ্যোতনায় উজ্জ্বল করে তোলে। Anabase-তে প্রথম জগৎ ও জীবন সম্পর্কে প্রবল হয়ে ওঠে পার্সের সত্যসন্ধিৎসা। জগতে বস্তুর যে প্রচলিত ও প্রথাসিদ্ধ রূপকে আমরা অপ্রতিবাদে মেনে নিই, সেই রূপই বিপুল প্রশ্নের এক বিহ্বল কুণ্ডলী পাকিয়ে তোলে পার্সের মনে।

My soul is full of falsehood, like sea nimble strong beneath the appeal of eloquence! The strong smell surrounds me. And doubt arises as to the reality of things.

এক তীক্ষ্ণ চেতনার ছুরি দিয়ে বস্তুর প্রতীয়মান রূপকে চিরে চিরে তার প্রকৃত মর্ম সত্যকে উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছেন পার্সে। বলিষ্ঠ আত্মপ্রচারের অন্তরালে আত্মার অন্তর্নিহিত মিথ্যা ও অসাড়তাটুকুকে ধরে ফেলতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় নি তার। পার্সে দেখলেন আজকের জগতে

মানুষ যে জীবনকে সভ্য ও সত্য বলে মেনে নিয়েছে, আসলে তা বিকৃত এবং মিথ্যা। এক উগ্র কামনায় অন্ধ ও উন্মত্ত হয়ে মানুষ এক সভ্যতা ধ্বংস করে আর এক সভ্যতা সৃষ্টি করে চলেছে। মানব-জগতে আদর্শ বলতে কিছু নেই। প্রকৃতির বিশুদ্ধ নিসর্গ সৌন্দর্যের মধ্যেও কবি মানুষের বিকৃত জীবনের অশুভ আভাস খুঁজে পেয়োছন। শান্ত নির্জন দুপুরের ঝিঁ ঝিঁ ডাক লম্বা লম্বা যেমন গাছের ছায় ঘেরা যে ঢল সমুদ্রের উপকূলের দিকে নেমে গেছে, সেখানে গিয়ে সমুদ্রের জলে মানুষেরই দুর্বল চিত্তের গরল-নীল কামনার বিপুল বিস্তারকেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার শুভ্রধৌত পোশাক কোন এক কামার্ত পুরুষের অবৈধ লালসার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তাঁকে। বন্যগোলাপের বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের মধ্যে কামনার কীট ছাড়া আর কোন মহিমা খুঁজে পান নাই। জ্ঞানীর অন্তরের মধ্যেও সন্ধান পেয়েছেন হিংসার।

কিন্তু পার্সের মতে মানব-সভ্যতার অন্তর্নিহিত বিকৃতি ও শোচনীয় অপরিপূর্ণতার মধ্যে নিরাশ হবার যথেষ্ট কারণ থাকলেও বিষাদে মুহ্যমান হবার কোন কারণ নেই। আশা-নিরাশা ও পরস্পরবিরোধী কতকগুলি গুণের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মানবাত্মা ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। তাঁর মুখের উপর দিয়ে উড়ে চলা এক বিরাট পাখির সচল ছায়ার মধ্যে মানব-জীবনের গতিশীল স্বরূপটিকেই যেন প্রত্যক্ষ করেছেন পার্সে। তিনি বলেছেন—

Raise up a people of mirrors over the river's channel house, et them make appeal to the succession of Centuries! Raise up stones to my same, raise up stores to the silence, and to guard these places the Canrbries of green brouge or immense nigluags.

সমস্ত মানুষকে অবারিত গতিতে শতাব্দীর সংগে তাল মিলিয়ে চলতে হবে; সমস্ত জড়বস্তুকে করায়ত্ত করে প্রকৃতিকে জয় করে বিজয়ী বীরের মত এগিয়ে যেতে হবে জীবনের প্রশস্ত রাজপথে।

বোদলেয়ার হতে ফরাসী কাব্যে আধুনিকতার সুরু হলেও র‍্যাঁবো এবং পার্সে ছাড়া প্রাক মহাযুদ্ধের যুগ পর্যন্ত সকল কবির কবিতাতেই রোমান্টিকতার কিছুটা আমেজ মেশানো আছে। এই সকল কবির একাধিক কবিতায় 'আকাশ', 'সমুদ্র' 'স্বর্গ', 'পাখি' প্রভৃতি শব্দ চিত্রগুলি

ব্যবহৃত হয়েছে এবং আকাশ, সমুদ্র, ও স্বর্গের দিকে মানবত্যার উৎক্রমনের মধ্য দিয়ে রোমাণ্টিকতার একটি প্রচ্ছন্ন সুর বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে। পার্সের কবিতার মধ্যেও মহত্ত্ব ও গতির কথা আছে এবং তিনি তাঁর কাব্যে কারবার 'ardre' বা গাছ, 'Chevans' বা ঘোড়া 'ciel' বা আকাশ প্রভৃতি প্রতীকগুলি ব্যবহার করেন এবং এই প্রতীকগুলি যথাক্রমে বিবর্তন অপ্রগতি ও বহত্তের দ্যোতক, কেমন opeur বা গন্ধ চেতনার প্রতীক এবং matin বা সকালবেলা শৈশবের প্রতীক। কিন্তু পার্সে যে গতির কথা বলেছেন তার অর্থ এই জগৎ ও জীবন ছেড়ে মহাজীবনের পথে উৎক্রমণ নয়, সে গতির অর্থ হলো এই জগতেরই মধ্যে সমস্ত পারিপার্শ্বিকতাকে জয় করে জীবনের পথে নির্ভীক অগ্রগমন। পার্সের কবিতা সমস্ত রকমের রোমাণ্টিকতা হতে মুক্ত বিশুদ্ধ বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। তাঁর Eloges কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত "J'ai aimean chavel" কবিতাটি এই বাস্তবতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্তরূপে পরিগণিত হতে পারে। কবি একবার একটি ঘোড়াকে ভালবেসেছিলেন। ঘোড়াটা যখন ছুটত তখন তার গা দিয়ে ঘাম ঝড়ত আর ঠিক তখনি তাকে খুব সুন্দর দেখাত। মাঝে মাঝে সে তার ঈশ্বরের পানে তার ব্রোঞ্জের মত মাথাটা তুলে বলত। মানুষ কিসের জোরে এতবড় হয়েছে একথা সে-ই সবচেয়ে ভাল জানে। এতখানি আত্মনিরপেক্ষ হয়ে একটিমাত্র প্রতীকী চিত্রের মাধ্যমে শ্রম, সাধনা, শোষণ প্রভৃতি যে সব গুণগুলির উপর মানব সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত সেগুলির নিখুঁত বিশ্লেষণের দ্বারা এত স্বল্প কথায় মানব সভ্যতার যথার্থ মর্ম সত্যটির উদ্ঘাটন করতে পার্সে ছাড়া আর কোন আধুনিক ফরাসী কবি পেরেছেন বলে মনে হয় না। পার্সের Vents ও Amars নামে কাব্যগ্রন্থটিতে মানব জীবনের অগ্রগতির কথাই আরও স্পষ্ট ও ঘনিষ্ঠভাবে রূপায়িত হয়েছে। পার্সের সমস্ত কবিতা গদ্যছন্দে রচিত নলেও অতি বিনম্বিত অথচ নিয়মিত ধ্বনিস্পন্দন, চিন্তার অনন্যসাধারণ গাম্ভীর্য ও নূতন নূতন শব্দ চয়নের দ্বারা তিনি এই গদ্যছন্দকে এক অতুলনীয় আভিজাত্য ও মহত্ত্ব দান করেছেন।

॥ ৩ ॥

প্রথম মহাযুদ্ধের বিভীষিকা ও তার সুদূরপ্রসারী পরিণাম ফরাসীদের

তরুণ চিন্তাশীলদের মনের উপর যে জটিল প্রতিক্রিয়া ও বিচিত্র সংক্ষোভের সৃষ্টি করে, তার ফলে তারা তাদের সমগ্র পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধেই এক প্রবল আধ্যাত্মিক প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। মানব-সভ্যতার শোচনীয় ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে সমস্ত রকমের প্রচলিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে শিক্ষিত তরুণের দল। এই প্রতিবাদ ও বিদ্রোহই 'দাদাইজ্‌ম' ও 'সুর্‌রিয়ালিজ্‌ম্‌'এর মধ্যে ভাবমূর্তি পরিগ্রহ করে।

যে প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা ও সংগতির দ্বারা আমরা প্রতিটি বস্তুকে বিধৃত দেখি, দাদাইজ্‌মের মূল কথা হলো সেগুলিকে অস্বীকার করা। দাদাইজ্‌মের মতে সুন্দর কি, অসুন্দর কি আমি কে? প্রভৃতি মৌল প্রশ্নগুলির উত্তর জানা সম্ভব নয়। তবুও দাদাইজ্‌ম কিন্তু পুরোপুরিভাবে অজ্ঞেয়তত্ত্বে বিশ্বাসী নয়। দাদাইজ্‌মের মূল বক্তব্য হলো এই যে, মূলগতভাবে প্রতিটি বস্তুসত্তা এক আদিম অসংগতিতে ভরা। সংগতি, শৃঙ্খলা, তত্ত্বগত-ঐক্য প্রভৃতি বস্তুর যে সব অন্তর্নিহিত গুণাবলীর কথা আমরা বলে থাকি, সেগুলি তার বস্তুগত সত্য নয়; সেগুলি আকারগত সত্য অর্থাৎ পরিণতির পথে প্রতিটি বস্তুকে পারি-পার্শ্বিকতার সংগে যে অপরিহার্য দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হতে হয়, সেই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই বস্তু ঐসব অস্থায়ী গুণগুলি লাভ করে থাকে। পীয়ের রেভারেদি তাঁর Galaries কবিতায় দাদাইজ্‌মের বক্তব্যটি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করেছেন।

The whole of life is at stake constantly. We pass beside the void elegantly without falling, but sometimes something in us makes us tremble, and the world no longer exists.

চারিদিকে শূন্যতার বুক চিরে চলে গেছে জীবনের ক্ষুরধার বিপদসংকুল পথ। আমরা অতি সতর্কতার সংগে এই পথের উপর দিয়ে চলেছি; কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের স্বাভাবিক অপরিপূর্ণতাবশতঃ আমরা এমন এক একটি ভুল করে বসি, যার ফলে আমাদের সমগ্র জীবনের ভিত্তিমূলক পর্যন্ত কেঁপে ওঠে এবং সংগে সংগে এক নিঃসীম মহাশূন্যতায় বিলীন হয়ে যায় সমগ্র জগৎ। ত্রিস্তাঁ জারা কর্তৃক দাদাইজ্‌ম প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় জুরিখে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে এবং জারা ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে আসার সংগে সংগে তা ফরাসী দেশে প্রসার লাভ করে।

কিন্তু ক্রমশঃ জারা ও আঁদ্রে ব্রেতোঁর মধ্যে আদর্শগত বিরোধ প্রবল আকার ধারণ করে এবং এই বিরোধের পূর্ণ সুযোগ নিয়েই সুররিয়ালিজ্‌ম নামক পৃথক একটি মতবাদের আবির্ভাব ঘটে। ব্রেতোঁর মানসিক দৃঢ়তা ও যুক্তির বলিষ্ঠতার সামনে জারার হীন ও নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে শীঘ্র এবং এই দ্বন্দ্বে জারার মতবাদ যে অনুপাতে ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে উঠতে থাকে, ব্রেতোঁর সুররিয়ালিজ্‌ম ঠিক সেই অনুপাতে সবল হয়ে ওঠে সমগ্র ফরাসী চিন্তার ক্ষেত্রে এক ব্যাপক প্রভুত্ব বিস্তার করতে থাকে। অথচ এই দ্বন্দ্বের কোন প্রয়োজনই ছিল না। একই আদর্শগত বিদ্রোহের ভাববস্তু হতে প্রাণরস সংগ্রহ করে জন্মলাভের পর এই দুইটি মতবাদ দুটি পৃথক গতিপথকে বেছে না নিয়ে একই খাতে প্রবাহিত হতে পারত। কিন্তু সে যাই হোক, ফরাসী চিন্তার ক্ষেত্রে সুররিয়ালিজ্‌মের আবেদন যে অধিকতর গভীর ও সুদূরপ্রসারী এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হতে ফরাসী দেশে কাব্যকে শুধু আনন্দ ও সৌন্দর্যের দৌত্যগিরি হতে মুক্ত করে তত্ত্বগত এক উচ্চতর মূল্যস্তরে অধিষ্ঠিত করবার যে প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়, সে প্রয়াস সুররিয়ালিজ্‌মের মধ্যেই সর্বাত্মক সার্থকতা লাভ করে। উপরিপৃষ্ঠের আপাত সংগতিও শান্তভাবের অন্তরালে যে অপূর্ণতা, আদিম অসংগতি ও অস্থির চঞ্চলতার দ্বারা প্রতিটি বস্তু কম্পমান দাদাইজ্‌মের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি সেইখানে গিয়েই ক্ষান্ত ও সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু সেই আদিম অসংগতি ও অপূর্ণতা হতে পরিপূর্ণ মুক্তিলাভের জন্য বস্তু ও ব্যক্তির অন্তরাত্মার মধ্যে এক স্বাধীন ইচ্ছা ও মুক্তির আবেগ সম্ভাবিত করেছে সুররিয়ালিজ্‌ম।

Le surrealisme n'est pas an moyen d'expression nouvean on plus facile, ni meme une metaphysique de la poesie. It est un moyen de liberation totale de l'esprit et de tout ce qui lui ressemble.

সুররিয়ালিজ্‌ম কোন কাব্যতত্ত্ব বা কাব্যের কোন অভিনব বা অপেক্ষাকৃত সহজ প্রকাশ রীতি নয়; সুররিয়ালিজ্‌ম হচ্ছে মানবাত্মা ও তার সমগোত্রীয় সব কিছুর পরিপূর্ণ যুক্তির আদর্শ। লুই আরাগঁও বলেছেন, সুররিয়ালিজ্‌ম হচ্ছে স্বীকৃত একটি প্রেরণা। শিল্পের প্রাণ হচ্ছে সংগতি এবং সমগ্রতা বা ঐক্য; তাই দাদাইজ্‌ম এই ঐক্য ও সংগতিতে বিশ্বাস করে

না বলে শিল্প সৃষ্টির তাৎপর্যকেও স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু সুররিয়ালিজ্‌মের একান্ত বিশ্বাস শিল্পসৃষ্টির ফলেই এক বিশুদ্ধ মুক্তি-চেতনার মধ্যে মানবাত্মা নবজন্ম লাভ করে। শিল্পসৃষ্টির দ্বারা মানবাত্মার নবজন্মলাভের জন্য ভাষার যাদুকারী শক্তির উপর নির্ভর না করে কল্পনা-শক্তির উপর নির্ভরশীল হওয়ারই পক্ষপাতী ছিল সুররিয়ালিজ্‌ম।

কিন্তু সুররিয়ালিজ্‌মের একটি বড় ত্রুটি হলো, বাস্তবকে পরিহার করে কল্পনার উপর অত্যধিক নির্ভর করা আত্মার পরিপূর্ণ মুক্তি একটি নির্বিশেষ ধ্যান-ধারণা যা কেবল কাল্পনিক শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রেই সম্ভব। ব্রেতোঁ তাই দুঃখ করে বলেছিলেন, ভবিষ্যতে কোন কবি এসে ঠিক কর্ম ও কল্পনার এই শোচনীয় ব্যবস্থানটি অতিক্রম করবে।

The poet to come will surmount the depressing idea of the irreparable divorce between action and dream.

কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্রেতোঁর আশা সফল হয়নি। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোন কবি এসে সুররিয়ালিজে্‌মের অন্তর্গত কর্ম ও কল্পনার এই অনতি-ক্রম্য ব্যবধানটিকে অতিক্রম করেন নি। বরং পল এলুয়ার, লুই আরাগঁ প্রভৃতি শক্তিশালী কবিগণ সুররিয়ালিষ্টরূপে তাঁদের কবি-জীবন শুরু করেও পরে এই ব্যবধানটিকে অতিক্রম করতে না পেরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যভুক্ত হন। হয়ত কাব্যের জগতে যে ব্যবধান অনতিক্রম্যরূপে প্রতীয়মান হয়েছিল তাঁদের কাছে, কল্পনা হতে কর্মের জগতে এসে একমাত্র কর্ম দিয়ে সে ব্যবধানকে লুপ্ত ক'রে দিতে চেয়ে-ছিলেন তাঁরা। সুররিয়ালিজমের এই স্বভাবগত ত্রুটি ও অপূর্ণতার প্রতি পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন ব্রেতোঁ। তাই তিনি এই অপূর্ণতাকে ঢাকবার জন্য তাঁর ভাবশিষ্যদের চিন্তার ঐক্য ও যুক্তিবোধের অবদমন, যথেচ্ছ প্রতীকপ্রয়োগ, খণ্ড খণ্ড কবিচেতনার বিকিরণ প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে স্বাধীনতা দান করেন। ফলে সুররিয়ালিজ্‌মের আদর্শ পুরোপুরি বজায় রেখে কোন কবি সার্থক একটি কবিতা শিখতে পারেন নি। প্রধানতঃ সুররিয়ালিষ্টরূপে যে সব কবি পরিচিত, তাঁদের কবিতার আংগিকের মধ্যে আমরা পাই এক অহেতুক গীতিময়তার রস এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে পাই এক আধ্যাত্মিক অতৃপ্তি ও ক্ষণভংগুর চিত্তাবস্তার পরিপ্রেক্ষিতে মুহূর্তের জন্য জগৎ ও জীবনকে প্রত্যক্ষ করবার প্রবণতা।

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক এই যে, 'সুররিয়ালিজ্‌ম' আন্দোলনের নেতা ব্রেতোঁ দাদাইজ্‌মের প্রভাব হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারেন নি। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা **Tout Paradis n'est pas perdu**-তে যেখানে তিনি শান্ত সমুদ্রকূলে তুষারাচ্ছন্ন পর্বতশিখরের সানুদেশে ওত পাতা অন্তঃস্থলে কৃষ্ণকায় গলিত লাভার তপ্ত কুটির বিস্তার দেখেছেন সে অংশটি নিঃসন্দেহে তাঁর উপর দাদাইজ্‌মের প্রভাবের পরিচয় দান করে। তাছাড়া অহেতুক ও অস্বচ্ছ প্রতীকপ্রয়োগের দ্বারা তার অনেক কবিতাকে অনাবশ্যকভাবে জটিল ও দুর্বোধ্য করে তুলেছেন ব্রেতোঁ। লুই আরাগঁ কিন্তু তাঁর **'Complainte pour l'orgue de la nouvelle barbarie'' ও 'Richard II Quarante'** শীর্ষক কবিতা দুটিতে সুররিয়ালিজ্‌মের আদর্শ অনেকখানি অক্ষুণ্ণ রেখে নিজের কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পেরেছেন। প্রথম কবিতায় যুদ্ধের বিভীষিকা ও বর্বরতার পটভূমিকায় অসহায় ও আর্ত সৈন্যদলের ব্যথাহত কাতর অনুযোগের মধ্য দিয়ে বন্দী মানবাত্মার মুক্তি কামনাকেই ব্যঞ্জিত করে তুলেছেন তিনি এবং দ্বিতীয় কবিতায় যেহেতু জীবনে বেঁচে থাকা মানে চাতুরীর খেলা এবং যেহেতু বাতাস সমস্ত চোখের জল শুকিয়ে দিতে পারে না সেইহেতু ভাগ্যবিড়ম্বিত রিচার্ডের মনে আপনার বলতে যা কিছু সব ত্যাগ করে কেবলমাত্র দুখের রাজা হয়ে বেঁচে থাকবার যে এক সকরুণ বাসনা জেগেছে তার মধ্যে মানুষের আধ্যাত্মিক অতৃপ্তি ও এই অতৃপ্তিজনিত এক নিগূঢ় ভাবময় বেদনাকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন যা সুররিয়ালিজমের অন্যতম আদর্শগত বৈশিষ্ট্য।

এ-যুগের অন্যতম শক্তিশালী কবি পল এলুয়ারের কাব্যে কিন্তু সুররিয়ালিজমের কোন আদর্শকে প্রতিফলিত দেখতে পাই না। মনে হয়, শুধুমাত্র নর-নারীর আদিম আসক্তিকে সকাম অনুরাগের বিচিত্র কারুকার্য সহযোগে চিত্রিত করার মধ্যেই এলুয়ারের সমস্ত শক্তি সীমাবদ্ধ ও নিঃশেষিত। এ-যুগের চিন্তা ও মানসিক আবহাওয়ায় কবিমন পুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যে কবি যুগানুবর্তিতা হতে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে মুক্ত রাখতে সমর্থ হন তিনি হচ্ছেন জ্যাক প্রেভর। সুররিয়ালিজমের আদর্শে কোনরূপে দীক্ষিত না হয়ে তিনি উন্নত ধরনের কলাকৌশল, সূক্ষ্ম সমাজচেতনা ও সুললিত ভাব-প্রবণতার দিক থেকে প্রভূত শক্তিমত্তার পরিচয় দেন। মা যোজা বুনছে, বাবা ব্যবসা করছে এবং ছেলে যুদ্ধে গেছে—**Familiale** কবিতায় এই

ধরনের একটি জীবন্ত পারিবারিক চিত্রের মাধ্যমে এক বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে পারিবারিক ঐতিহ্য গড়ে ওঠে তা পরিস্ফুট করবার প্রায়াস পেয়েছেন প্রেভর। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছে, নিরবচ্ছিন্ন শোক দুঃখের প্রতীক এবং এই দুঃখ বিপর্যয়ের এক রক্তকরুণ পটভূমিকায় দুটি নরনারীর মিলন ও আকস্মিক বিচ্ছেদকে কাব্যিক ভাবানুভূতির দ্বারা কতখানি মধুর ও বেদনাদায়ক করে তোলা যেতে পারে তাঁর **Barbara** কবিতাটি তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হয়ে থাকবে।

ফরাসী কাব্যের ইতিহাসে সুররিয়ালিজ্‌ম একটি আদর্শ হিসাবে কতদূর সার্থক সে কথা বিচার করবার আগে আর একজন সার্থক সুররিয়ালিষ্ট কবির নাম করতে হয়। তিনি হলেন রেনে শ্যর যিনি দূর গ্রামাঞ্চলে গিয়ে প্রকৃতিক শোভা ও কৃষকদের জীবনযাত্রা হতে কবিতার উপাদান সংগ্রহ করেন। রেনে শ্যরের কবিতা তাই অবারিত প্রান্তরের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নির্মল হাওয়ার মত সহজ ও স্বচ্ছ; স্বচ্ছন্দপ্রবহমান নদী জলধারার মতই সচল ও সাবলীল। তাঁর মত গ্রাম্য পরিবেশকে সার্থকভাবে কাব্যে কাজে লাগাতে পৃথিবীর খুব কম আধুনিক কবি পেরেছেন। জার্মান কবি মেরিয়া রিল্‌কে যেমন তাঁর 'Liebes-Lied' কবিতার শান্ত নক্ষত্র ও ভীষণ ঝড়, চেনা-অচেনা, ভয়ংকর ও সুন্দর—সমস্ত বস্তু মধ্যে এক সহজ সত্যকে খুঁজে পেয়েছেন ও তাঁর বিনাসর্তে প্রশস্তি গেয়েছেন; তেমনি রেনে শ্যরও প্রকৃতির স্থাবর জংগম প্রতিটি বস্তুকেই বিশেষ তাৎপর্যে মণ্ডিত দেখে তাদের সহজভাবে মেনে নিয়েছেন। তাই ঝড়ের পূর্বাভাষ তাঁকে আসন্ন বিপদের প্রতি সতর্ক করে দেয়, তুষারশুভ্র পর্বতশৃংগ তাঁকে কিভাবে হিমশীতল দুঃখে জমাট বোধ মুখ বুজে মৃত্যুকে বরণ করতে হয় তা শিক্ষা দেয়; নদীর অশান্ত গতিবেগ তাঁর ও দেশবাসীর মধ্যে অফুরন্ত গতির ও শক্তির আবেগ সঞ্চারিত করে

River with heart never destroyed is this mad world of prison keep us friendly and violent to the horizon's bees.

হে নদী তোমার অপরাজেয় আত্মা পৃথীবির এই বন্দীশালায় চারিদিকের বিপদের মাঝখানে আমাদের দৃঢ় শান্ত করে তোল। 'La Sorgue' কবিতার নদীর কাছে এই আবেদনের মধ্যে তাঁর মূল বক্তব্যটিকেই যেন সুন্দর করে ব্যক্ত করেছেন রেনে শ্যর। এক বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় ও

জীবন সম্পর্কে এক উন্নত ধরণের মূল্যবোধের জন্যই আধুনিক ফরাসী কবিতার উপর রেনে শ্যরের প্রভাব অপরিসীম।

॥ ৪ ॥

বর্তমান শতকের পর হতে ফরাসী কবিতার ক্ষেত্র হতে সুররিয়ালিজ্‌মের স্তিমিতপ্রায় স্রোতটি সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হয়ে গেলে ফরাসী কবিতা সহসা তার সমস্ত গীতিময়তা মেদুরতা হারিয়ে এক নীরস কাঠিন্যে রূঢ় হয়ে উঠে। যন্ত্রসভ্যতার ক্রমপ্রসারণশীল জড় অস্তিত্বের প্রভাব বিশ্বের অন্যান্য দেশের অতি-আধুনিক কবিদের মত ফরাসী কবিদের পরিমার্জিত চিন্তাশীলতার উপর জটিল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তার উপর শূন্যবাদ, অস্তিত্ববাদ প্রভৃতির বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের বিপরীতমুখী প্রভাবের ঘাত-প্রতিঘাত কোন একটি বিশেষ কাব্যাদর্শকে অনুসরণ করবার পথে প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। অতি আধুনিক ফরাসী কবিদের মধ্যে আঁদ্রে ফ্রেনাদ, রেনে গ্যী কাদ্‌ ও ইভে বনফয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যদিও এঁদের কারুরই কবি-প্রতিভা এক প্রবল ভাবদ্বন্দ্বজনিত দোদুল্যমান মনের কুয়াশাচ্ছন্ন সংশয়কে কাটিয়ে উঠে এক স্থির প্রতিশ্রুতির আলোতে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে নি।

এই ভাবদ্বন্দ্বের রূপটি সবচেয়ে আঁদ্রে ফ্রেনাদের কবিতায় বেশী প্রকটিত দেখতে পাই। তাঁর কবিতা পড়লে বুঝতে দেরী হয় না তিনি জাঁ পল সার্তরের অস্তিত্ববাদ ও আলবেয়ার কাম্যুর শূন্যবাদের দ্বারা এই একই সংগে প্রভাবিত হয়েছেন; অথচ দুটির একটিকে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর **Fraternite** কবিতায় এক জায়গায় তিনি বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধন হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিঃসংগ একাকীত্বকে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বুঝতে পেরেছেন যুগোপযোগী করে জীবনকে পুনর্গঠিত করতে হলে এই বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। ফলে যার থেকে তিনি দূরে পালিয়ে যেতে চেয়েছেন তাকেই আবার আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছেন। একই সময়ে একটি জিনিষকে গ্রহণ ও বর্জনের ফলে তাঁর ভাববস্তুতে যে বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে তাতে তাঁর প্রকাশভঙ্গী জটিল হয়ে উঠেছে অনেকখানি। আর একটি কবিতায় কিন্তু নৈরাশ্যকে জীবনে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন

তিনি বলেছেন, এখনও প্রত্যুষের সোনালি স্বাক্ষর ফুটে ওঠে নি পৃথিবীতে, এখনও সেদিন আসে নি যেদিন আলোয় ঝলমল করে উঠবে সমগ্র পৃথিবী।

অকালমৃত্যুর ফলে রেনে গ্যাঁ কাদ্‌র প্রতিভা পরিণতি লাভ করবার আগেই আত্মলোপ করতে বাধ্য হয়েছে। তবু তিনি তাঁর প্রকাশিত একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় সে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যেতে পেরেছেন। প্রধানতঃ কাদ্‌ হচ্ছেন শূন্যবাদী। মানুষ কোথা হতে কোথায় ছুটে চলেছে তা সে জানে না। আমরা একটি ও শূন্য লক্ষ্যস্থল হতে আর একটি শূন্য লক্ষ্যের দিকে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছি মানুষের সমস্ত জীবনটা যেন এক দীর্ঘ রেলপথ এবং তার মাঝে এক একটি আদর্শের লক্ষ্যস্থল হচ্ছে এক একটি স্টেশন। কিন্তু স্টেশন গুলি বৃথাই যাত্রীদের আকর্ষণ করে আসছে, কারণ স্টেশনে কোন যাত্রীই বেশীক্ষণ থাকে না। রেনে শ্যরের যত কাদ্‌রও কোন কোন কবিতায় পল্লীগন্ধিতার মিষ্টি আভাস পাওয়া যায়। **Source de vie** কবিতার প্রসঙ্গে দূর পল্লীর গভীর কোন এক নদীতীরে সুরভিত পদ্মবনের যে ছবি এঁকেছেন তা সত্যিই মনোহর। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ মধ্যেই এক উগ্র প্রতীকপ্রিয়তা তাঁকে পেয়ে বসেছে। ষাঁড়, নীল ব্লাউজ, 'আকাশের লাল ডিম' প্রভৃতি প্রতীকগুলির অসার্থক প্রয়োগ কবিতাটির রসহানি করেছে। তবে **Poeme d'amour a' Helene** নামক প্রেমের কবিতাটিতে অতিশয় সরল এক ভাবপ্রবণতার পরিচয় দিয়েছেন কাদ্‌ এবং এই সরল ভাবপ্রবণতা তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কোন দার্শনিক তত্ত্ব বা আদর্শ নিয়ে মাথা ঘামান নি ইভে বনফয়। তবু কেন যে রূপকল্পনার মধ্যে অখণ্ডতা ও ভাববস্তু পরিবেশনে স্বচ্ছতা আনতে পারেন নি। তিনি, তা সত্যিই আমার বুদ্ধির অতীত। তবু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, **Doure parle** কবিতায় অবারিত অশ্রুধারাকে শুকিয়ে দেবার জন্য তাঁর গ্রীষ্মের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনার মধ্যে তাঁর এক আশ্চর্য সুন্দর কবি মনের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর সাধারণতঃ জটিল কবি-মানসের রহস্যময় মেঘজাল ছিন্ন করে এক অনবদ্য শক্তির এই বিদ্যুৎ বিকাশ সত্যিই আমাদের চমক লাগিয়ে দেয় এবং সংগে সংগে আমরা আশা করতে বাধ্য হই যে, সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি হতে একে একে মুক্ত হয়ে তিনি সাম্প্রতিককালের ফরাসী কবিতাকে এক উজ্জ্বলতর ও মহত্তর পরিণতি দান করবেন।

গুপ্ত-কবি ও বাংলার নবজাগৃতি

অরুণ সান্যাল

ঊনবিংশ শতাব্দীর চারণকবি ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। কবি নয়—কবিওয়ালা, কবিওয়ালা নয়ত কি! পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "বলিতে গেলে শিক্ষা যাহাকে বলে ঈশ্বরচন্দ্র তাহার কিছুই পান নাই। ইংরাজী শিক্ষা তো হইলই না, বাংলাও নিজে পড়িয়া যাহা শিখিলেন তাহাই একমাত্র সম্বল হইল।" কিন্তু এই সামান্য সম্বলটুকু নিয়ে তিনি যে অসামান্য সৃষ্টি করেছিলেন—তার পরিচয় রেখে গেছেন বাংলা সাহিত্যের সার্থক স্রষ্টা বঙ্কিম। "যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছিলেন, এমন খাঁটি বাংলায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃত-জনিত কোন বিকার নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল, সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাংলা ঈশ্বরগুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই—আর লিখিবার সম্ভাবনাও নাই। কেবল ভাষা নহে, ভাবও তাই। ঈশ্বরগুপ্ত দেশী-কথা, দেশী-ভাব প্রকাশ করেন। তাঁর কবিতায় কেলাকাফুল নাই।" আবার কবি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "তাঁর কবিতার অপেক্ষা তিনি অনেক বড় ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কবিতায় নাই। যাহারা বিশেষ প্রতিভাশালী তাঁহারা প্রায় আপন আপন সময়ের অগ্রবর্তী। ঈশ্বর গুপ্তও আপন সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন।" ছিলেন বলেই একদিকে কবিওয়ালাদের গোত্রভুক্ত হয়েও আধুনিক কালের বঙ্কিম দীনবন্ধু দ্বারকানাথের মন্ত্রগুরুর আসন অলঙ্কৃত করতে পেরেছিলেন। এ কি কম গৌরবের কথা। প্রাচীনপন্থী ঈশ্বরগুপ্ত, যাঁর আদর্শ ছিল দীর্ঘ মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যের শেষ সার্থক কবি ভারতচন্দ্র, যিনি ছিলেন কবিওয়ালাদের বংশধর, তিনি হঠাৎ পরবর্তীর পথে আত্মপ্রকাশ করলেন, যে প্রকাশ কেবলমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। এ প্রকাশ যুগচেতনাকে আশ্রয় করেছিল বলেই কোন নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে ঘুরপাক

খান নি। এই যুগচেতনাই তাঁকে আধুনিক বাংলা কাব্যের উদ্‌গাতার আসনে বসিয়েছে। কবির নব-যুগ-চেতনা পেয়েছে যোগ্য অভিনন্দন। বলা বাহুল্য ঈশ্বর কবির এই নব-চেতনার মধ্যেই রেনেসাঁসী চিন্তার ঐশ্বর্য আভাষিত হয়ে উঠেছিল!

প্রাবন্ধিক বিনয় ঘোষ তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ "বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ" গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, কয়েকটি কারণ তিনি বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন তাদের মধ্যে একটি হল, "উনিশ শতকের মধ্যাহ্নকাল বিদ্যাসাগর জীবনেরও মধ্যাহ্নকাল। বাংলার রেনেসাঁস আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষে বিদ্যাসাগরের স্থান। তার মধ্যগগনে তিনি দীপ্যমান। প্রথমপর্বের জোয়ারের অতিবেগ এবং পরবর্তীকালের ভাঁটার ঘোলাটে মন্দ স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে দুয়েরই অতিমাত্রতা অতিক্রম করে, বিদ্যাসাগরই প্রথম, কর্মের ও চিন্তার ক্ষেত্রে, এ দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের বাস্তব-ভিত রচনা করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাই তাঁর কর্মধারা, আদর্শনীতি ও চিন্তাধারার মধ্যে বাংলার নবজাগরণের মূল সুরটি যে ভাবে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল তেমন আর কারো মধ্যে হয় নি। এই কারণেই বিদ্যাসাগরের জীবন-বৃত্তান্ত বাংলার নব-জাগরণের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বলে মনে হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এ ভূমিকা যতখানি গৌরবের, ততখানি গৌরবের অধিকারী না হলেও, বিদ্যাসাগরের মত রেনেসাঁস আন্দোলনের তরঙ্গ শীর্ষে তার স্থান না হলেও, কবি-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে রেনেসাঁস আন্দোলনের তরঙ্গ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন সেটা কম মর্যাদার নয়। সেতুবন্ধে কাঠবেড়ালীর ভূমিকা কি নেহাতই সামান্য! এখন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও শ্লেষের বিকাশ যদি ব্যক্তিত্ব-প্রধান সামাজিক পরিবেশে সম্ভব হয়—যা রেনেসাঁসী আন্দোলনের পরিণাম তবে আমরা ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাতেই সেই প্রখর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীব্র কষাঘাত লক্ষ্য করেছি। এ প্রবন্ধে আমি রেনেসাঁসী আন্দোলনের ফলে আমাদের সাহিত্যে যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের স্রোত বয়েছিল, যার অভিপ্রকাশ দেখেছি ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায়, মাইকেল-দীনবন্ধুর নাটকে, আর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে কালীপ্রসন্নের সমগ্র রচনায়—সেই তরঙ্গ-স্রোতে ঈশ্বরগুপ্তের ভূমিকাটুকুই আলোচনা করব।

॥ ২ ॥

রেনেসাঁসের পটভূমিতে এ আলোচনাকে রাখতে হলে রেনেসাঁস সম্পর্কে আমাদের ধারণা করা উচিত। সাধারণত চোদ্দ শতাব্দীর শুরু থেকে সতের শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত প্রায় তিনশো বছরের এই বিরাট কালপরিধিকেই ইউরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁসের সন তারিখ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। "গেবার, কুয়াজ প্রমুখ কোন কোন ঐতিহাসিক ত' রেনেসাঁসের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্রেফ্ অস্বীকার করেছেন।" আমরাও রেনেসাঁসের এই সন তারিখ নিয়ে মাথা ঘামাব না কারণ আমরা রেনেসাঁসের অন্তরলক্ষণ সম্পর্কে যতখানি কৌতূহলী, সালতামামিতে ততক্ষণ উৎসাহিত নই। সুতরাং আলোচনাটা স্বরূপ লক্ষণের।

রেনেসাঁস বলতে কি বুঝি—এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যদি আমরা এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার দ্বারস্থ হই তবে তাদের ভাষায় উত্তর পাই : The Renaissance or Renascence is a term used to indicate a wellknown but indefinite space of time and a certain phase in the development of Europe. On the one hand it denotes the transition from the period of history which we call the middle ages to that which we call modern. On the other hand it implies those changes in the intellectual and moral attitude of the Western nations by which the transition was characterized. If we insist upon the literal and etymological meaning of the word, the Renaissance was a Re-birth.

সুতরাং এটা স্পষ্ট হল যে রেনেসাঁস সাধারণভাবে নবজাগরণ—যে জাগরণ কেবল একটি নির্দিষ্টাভিমুখী নয়, যা সর্বাভিমুখী। পুরাতনের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ সামাজিক সুষুপ্তির ঘোর কাটিয়ে গতানুগতিক আচার প্রতিপালনের নির্জীবতা কাটিয়ে, অন্ধকার দূর করে জন্ম দিয়েছিল নব মানবতাবোধের। আপন চিন্তারাজ্য থেকে হারিয়ে যাওয়া মানুষ ফিরে পেয়েছিল স্বাধিকার। "মানুষের এই নবচেতনাকেই ইতিহাসে বলা হয় নবজাগরণ বা রেনেসাঁস।

ইতিহাসের তথ্যানুযায়ী এই রেনেসাঁসের প্রথম সূত্রপাত হয় ইটালীতে বিশেষতঃ ফ্লোরেন্সে। এই প্রসঙ্গে আলোচনা পাই এনসাইক্লোপিডিয়াতে,

though Italy came late into the realm of literature, her action was destined to be decisive and alternative by the introduction of a new spirit a farmer and more positive grasp on life and art. These qualities she owed to her material prosperity to her freedom from feudalism, to her secularized church her commercial nobility, her political independence in a fedaration of small states. এই "new spirit," ইটালীতে নবজাগরণের "Spirit."

আমাদের যোগ কিন্তু ইটালীর রেনেসাঁসের সঙ্গে ঘটে নি, ঘটেছে ঊনিশ শতকে রেনেসাঁস—উত্তর ইউরোপের সঙ্গে। এবং এই যোগ আমাদের সমাজ জীবনে সাংস্কৃতিক জীবনে এনেছে রূপান্তর। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, "১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খৃঃ পর্যন্ত বিংশতিবর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই কালের মধ্যে কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষা বিভাগ সকল দিকেই নবযুগের প্রবর্তন হইয়াছিল।" তবে সঙ্গে সঙ্গে একথা স্মরণ রাখাও দরকার যে এ নব যুগের পদার্পণ ঘটেছিল নগর-কেন্দ্রিক জীবনে—গ্রামীণ পরিমণ্ডলে নয়, কারণ মধ্যযুগের গ্রাম্য জীবনকেন্দ্র ঊনিশ শতকে স্থানান্তরিত হয়েছিল শহরে। বিশেষভাবে কলিকাতাই হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগৃতির জন্মভূমি। তাই প্রাবন্ধিক বিনয় ঘোষ লিখেছেন, "ফ্লোরেন্সে যদি আধুনিক নবযুগের ইউরোপের প্রোটোটাইপ হয়, তা হলে বাংলা দেশের কোলকাতা শহরকেও নিঃসন্দেহে নবযুগের ভারতের ফ্লোরেন্স বলা যেতে পারে।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের রেনেসাঁসী চিন্তার সংস্পর্শে এসে আমাদের চিন্তায় যে আলোড়ন এসেছিল তার প্রমাণ আছে তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের নানামুখী ধারায়। আছে সমাজ সংস্কার শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টার মধ্যে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রহসনে, আর কবিতায়। আছে তরুণ ডিরোজিওর বিপ্লবী চেতনায়, রামমোহনের সংগ্রাম, বিদ্যাসাগরের মহা-সাধনায়। ব্যবহার ও ভাবের জগতের যুগপৎ বন্ধন মুক্তির এই প্রবণতাই আমাদের সার্থক নবজাগৃতির প্রস্তুতিপর্ব। একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন, "যদিও এই প্রবণতার প্রথম প্রত্যক্ষ ফল মহাত্মা রামমোহন রায়, তবু বীজের ফল রূপ ধারণের পূর্বে ইতিহাস নিহিত আছে ঊনিশ শতকের জন্ম মুহূর্ত হতে।" কারণ ঊনিশ শতাব্দীর প্রথমপর্বে কোলকাতায় যে যুগান্তকারী

ঘটনা ঘটেছিল সেটি হচ্ছে, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা। "বাংলায় প্রতীচ্য প্রভাবিত জীবন-চেতনার উদ্ভব, বিকাশ এবং প্রথম সার্থক প্রতিক্রিয়া রচনায় হিন্দু কলেজের কীর্তি একক এবং অদ্বিতীয়। বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে হিন্দু কলেজের এই দান নব্য বঙ্গযুগ নামে ঘোষিত? রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "The Hindu College, which was established in 1871 effected a revolution in the ideas of the young Hindus of the days," এই হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে যে দিকটি সব চাইতে স্পষ্ট লক্ষিত হয়ে উঠেছিল সেটি হচ্ছে আত্মচেতনা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ। এবং এ কথা বলা অসঙ্গত নয় যে এই ব্যক্তিত্ববোধ রেনেসাঁসেরই দান। অনেকগুলি দানের মধ্যে কেউ কেউ এটিকে নবজাগৃতির শ্রেষ্ঠ ফসল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। একজন প্রাবন্ধিকের বক্তব্য উদ্ধৃত করে দেখান যায় এই স্বাতন্ত্র্যবোধ কেমন করে আত্মপ্রকাশ করেছিল এমন কি পোষাক পরিপাট্যের মধ্যেও এ ইয়ং বেঙ্গল দলের প্রত্যেকেই এক একজন unique individual হতে চেয়েছিলেন। এই প্রচেষ্টা যে চোদ্দ শতাব্দীর শেষে ইটালীতেও হয়েছিল সেকথা লিপিবদ্ধ করেছেন রেনেসাঁসের ইতিহাস রচয়িতা বুর্খাট। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই নবচেতনা হারিয়ে গিয়েছিল এদের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে ফলে এরা গিয়েছিলেন হারিয়ে কিন্তু হারায় নি নবজাগ্রত জীবনবোধের প্রবর্তনা। নবজাগরণের এই প্রবণতার আত্মপ্রকাশ সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—বঙ্গ সাহিত্যেও তার অভিপ্রকাশ লক্ষণীয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রেনেসাঁসী চিন্তাধারা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক ঘোষ লিখেছেন…"সবচেয়ে বিস্ময়কর হল, সামাজিক আলোচনা সাহিত্যে পরিব্যপ্ত তাঁর পরিহাসপটুতা, প্রখর বিদ্রূপ ও শ্লেষবোধ …এই বিদ্রূপ ও বিকাশ ব্যক্তিত্ব প্রধান সামাজিক পরিবেশেই সম্ভব। অর্থাৎ প্রখর স্বাতন্ত্র্যবোধ থেকেই সমাজ ও সাহিত্যে শ্লেষ পরিহাস ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বিকাশ হয়েছে। জেকের বুর্খাট তাঁর ইটালীর রেনেসাঁসের ইতিহাস-গ্রন্থে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্বন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন… but wit could not be on independent element in life till its appropriata victim, the developod individual with porsonal pretensions, had appoarod. সুতরাং একথা বলা অন্যায় নয় যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে ব্যঙ্গ উৎসমুখ খুলে গিয়েছিল—যা স্বভাবতই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধের আলোকে রচনার উজ্জ্বল—সেই রচনাধারার গোমুখী ছিল রেনেসাঁসী চিন্তা। এই ব্যঙ্গ সরল

রচনার গদ্যরূপ পাই ভবানীচরণ থেকে কালীপ্রসন্নের রচনা ধারায়—আর পদ্যরূপ পাই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনায়, সময়ের বিচারে যা উল্লিখিত পদ্যধারার পূর্বসূরী। হয়ত পুরোপুরি সচেতন ভাবে নয়, তবুও একথা অনস্বীকার্য যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনায় আমরা রেনেসাঁসী ঐতিহ্যের এই দিকটি আভাষিত হতে দেখেছি।

॥ ৩ ॥

যদিও আধুনিক বাংলা কাব্যের সার্থক মুক্তি ঘটেছিল মাইকেল মধুসূদনের প্রতিভাদীপ্ত কাব্যসম্ভারে, তবুও এ-কথা যথার্থ যে এই আধুনিকতার প্রস্তুতি-পর্ব ছিল—উনিশ শতকের প্রথম পর্যায়ে। এই প্রথম পর্যায়ে—যে পর্যায়ে সার্থক কাব্যসৃষ্টি হয়ত সম্ভব হয় নি, কিন্তু সংঘাতপুষ্ট—নবীনামুখী জীবনোৎকণ্ঠার পরিচয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, আধুনিকতার প্রস্তুতি নিঃসন্দেহে শুরু হয়েছিল। এবং প্রথম পর্যায়ের এই "প্রস্তুতির ইতিহাস একক ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত।" ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্রের ভাষায় বলা যায়, "No renowned poet appeared in Bengal in the first half of the present century and Iswar Chandra (Gupta) was the reigning king of the literary world in his days." এই তথ্যটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তাই ঈশ্বরগুপ্ত আধুনিক কাব্য-সুরধনীর ভগীরথ। আধুনিকতার যাত্রা পথের প্রথম পথিক।

গুপ্তকবি স্বভাবে কবি, কর্মে সাংবাদিক। একজন ঐতিহাসিক কবির প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "এই তথ্য থেকে আলোচ্য কবিতাধারার মৌল প্রকৃতি নির্ণীত হতে পারে বলে মনে করি।.....অবিমিশ্র তথ্যানুসন্ধিৎসা, সমকালীন জীবন সম্বন্ধে পুংখানুপুংখ বস্তুনিষ্ঠ কৌতূহল এবং অব্যবহিত কালের জীবন মূল্যবোধ সম্বন্ধে সদাসচেতন উৎকণ্ঠা সার্থক সাংবাদিকের প্রতিভার মৌল উপাদান রচনা করে থাকে। সুস্থির স্থায়িত্বের চেয়ে বলবান গতিশীলতা, অতলস্পর্শ গভীরতার চেয়ে শীর্ষচারী ব্যাপ্তিই সাংবাদিকতার ধর্ম।" এই সাংবাদিকতার ধর্ম বেশ খানিকটা পরিমাণে তাঁর কাব্যধর্মকে প্রভাবান্বিত করেছিল বলেই যথার্থ উন্নত স্তরের কাব্য সৃষ্টি তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কিন্তু যেদিকটি সুন্দরভাবে তাঁর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল সেটি হচ্ছে সেই যুগের দ্বৈত সত্তার

আবেগ চঞ্চলতা। একদিকে পুরোনোকে বাঁচিয়ে রাখার আগ্রহ আর একদিকে নতুনকে আহ্বান করার আনন্দ—এ দুয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গুপ্ত-কবির জাগ্রত চৈতন্য প্রখর ব্যক্তিত্ব সঞ্জাত। আর এ ব্যক্তিত্ব আধুনিকতারই প্রাণপুরুষ।

প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ঈশ্বরচন্দ্রের পারিবারিক জীবনের পরিবেশ তার জীবনের ভঙ্গিকে অনেকখানি পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে দিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। একদিকে বিমাতার বিতৃষ্ণা অন্যদিকে ব্যর্থ বিবাহিত জীবনের সঙ্গে সমাজের অত্যাচার আর আর্থিক অস্বচ্ছলতা যুক্ত হয়ে তাঁর মনোভঙ্গিকে এমনভাবে নিয়মিত করেছিল, যার ফলে জীবন সম্পর্কে একটি সহজ স্বাভাবিক এবং নিটোল মূল্যবোধ গড়ে ওঠে নি, কিন্তু গড়ে উঠেছিল একটা স্পর্শকাতর চেতনা। যে চেতনায় ধরা পড়ত সমসাময়িক কালের সমস্ত কদর্যতা সমস্ত অসংলগ্নতা। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় সব রকমের মেকির বিরুদ্ধে এই ব্যক্তিত্ব প্রবল প্রতিরোধ রচনা করতে চেয়েছে আশৈশব। সন্তান সত্ত্বেও বিপত্নীকের পূর্ণবিবাহের মাধ্যমে দেহলোলুপতার নিকট পিতৃত্বের যে রূঢ় পরাভব ও লজ্জাকরতা প্রচ্ছন্ন ছিল, ঈশ্বরগুপ্তের শিশু ব্যক্তিত্ব তাকে আক্রমণ করেছিল কেবল কল দিয়েই নয়—নিজের অভিজ্ঞতার সকল শক্তি দিয়ে। পিতামহের স্তোকবাক্যের উত্তরে তিনি বলেছিলেন,—"হাঁ তুমি আর একটা বিয়ে করে যেমন বাবাকে দেখছ, বাবা তেমনি আমাদের দেখবেন।" শৈশব অবস্থা থেকেই জীবন সম্পর্কে যাঁর এই তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে—তার দৃষ্টিভঙ্গি যে আত্মপ্রকাশের অবলম্বন হিসেবে, প্রখর ব্যক্তিত্ব সঞ্জাত ব্যঙ্গাশ্রিত রচনা গ্রহণ করবে তাতে আর আশ্চর্য কি! ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেও আমরা নানা প্রতিকূল জীবন-স্রোত সাঁতরে পার হতে দেখি। কিন্তু দুই ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে তফাৎ এই, একজন দুঃখকে অতিক্রম করেছেন—অস্বীকার করেই দুঃখজয়ের বাণী-বন্দনা করেছেন, জীবনকে ব্যক্তিত্বময় করে গড়ে তুলেছেন আর একজন তা অতিক্রম করতে পারে নি বলেই জীবন সম্পর্কে একটা বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ না করে সে দৃষ্টিকে করেছেন তির্যক ব্যঙ্গাশ্রিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা উচ্চারণ না করা অন্যায় হবে যে এ দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে তিনি শুধু সমাজের ভাঙ্গনই ধরান নি—সংস্কারও করেছেন, করতে চেয়েছেন। মধ্যযুগের গোষ্ঠী কেন্দ্রিক চেতনা অতিক্রম করে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন-বোধের দ্বারাই তা

সম্ভব হয়েছে। হয়ত একথা ঠিক তাঁর এ প্রচেষ্টা যতখানি সাংবাদিকের মত হয়েছে, ততখানি শিল্পীর মত হয় নি কিন্তু তাতে ব্যক্তিত্ববোধের অভাব ছিল না। রেনেসাঁসকালের ইটালীর দুজন সাহিত্য শিল্পীর সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বিদেশী ঐতিহাসিক যে মন্তব্য করেছেন, "It is apparent to an the students of Machiavelli and Guicuardini, the profoundest analysts of their age, the bitterest satarist of its vices, but inflected with its incapacity for moral goodness. তা যেন বেশ খানিকটা পরিমাণে আমাদের গুপ্ত-কবি সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তাই বলেছি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রেনেসাঁস অন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষে অবস্থান না করলেও তরঙ্গ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন—একথা অনস্বীকার্য।

॥ ৪ ॥

শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বরগুপ্তের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন "নূতন ও পুরাতনের সংঘর্ষে যেখানে পথ বিপর্যয় ঘটিয়াছে ঠিক সেইখানেই তিনি আপনাকে মাইলষ্টোনের মত মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত রাখিয়া বিরাজ করিতেছেন।" যখন পরস্পর বিরোধী আদর্শের সংঘাত বাংলার নবযুগের জন্ম যন্ত্রণার ইঙ্গিত দিচ্ছে, তখন অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই নানা জটিল সমস্যার অভিঘাত সৃষ্টি হয়েছে—যা সমস্ত সচেতন সামাজিক মানুষকেই করে তুলেছে চিন্তিত। প্রত্যেকটি আত্মসচেতন স্পর্শকাতর ব্যক্তিত্বই এই জটিল গ্রন্থি-মোচনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। সে কালের অনেক সাময়িক পত্রিকাতেই এই যুগযন্ত্রণার ছায়াপাত ঘটেছে। গুপ্ত-কবির সংবাদ প্রভাকরেও এ ছায়া-পাত দুর্লক্ষ্য নয় এবং দুর্লক্ষ্য নয় কবি সম্পাদকের আন্তরিক প্রচেষ্টা, যে প্রচেষ্টার মধ্যে একদিকে পাই অতীতের নব মূল্যায়নের দুরন্ত চেষ্টা আর এক দিকে পাই নূতনকে, তরুণকে সানন্দ অভিনন্দিত করার অকৃত্রিম আন্তরিকতা। বলা বাহুল্য নবজাগৃতির এইগুলি মৌল লক্ষণ। এই সময় সাংবাদিক ঈশ্বরচন্দ্র প্রাণান্ত পরিশ্রম করে, আমাদের দেশের প্রায় বিলুপ্ত সাহিত্য-সম্ভার —যা রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র আর কবিওয়ালাদের স্বভাব কবিত্বের সার্থক পুনরুদ্ধার করে প্রকাশ করেছিলেন সংবাদ প্রভাকর-এ এবং প্রকাশ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "প্রাচীন কবি। আমরা বহুকালাবধি নিয়ত নিবার চেষ্টা ও প্রচুর প্রযত্নে প্রকার পরিশ্রম পুরঃসর এ পর্যন্ত যাহা সংগ্রহ করিয়াছি তাহার

অধিকাংশ পত্রস্থ করিয়াছি, ক্রমে করিতেছি এবং ক্রমে ক্রমে আরও প্রকাশ করিব, কিছুই গোপন রাখিব না। যে উপায়ে হউক যত পাইব ততই মুদ্রিত করিব।" কি প্রচণ্ড আবেগ কি গভীর আন্তরিকতা। এই আবেগ আন্তরিকতা ছিল বলেই তো তিনি তাঁর কালকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে দিতে পেরেছেন। কারণ অতীতকে অস্বীকার করে বর্তমান প্রতিষ্ঠা পায় না তাই একজন ইংরেজ লেখক মন্তব্য করেছেন, "Each period inherits from its predecessors ideas and tendencies of the past ; and this, to a degree that was sometimes been forgotten, is notably true of Renascence time."

এই জন্ম নবযুগের জন্ম যন্ত্রণার কালে অনেকেই বিপরীতধর্মী ভাব-সংঘাতের মধ্যেই চেয়েছিলেন জীবনের ভার সমতার উৎস অনুসন্ধান করতে, সে চেষ্টার মধ্যে ছিল গাম্ভীর্য—ছিল সুমিতবোধ কিন্তু আর একদল ছিলেন যারা সমাজ-জীবনে ভাব সমতার অভাব লক্ষ্য করে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেই হোক আর সমাজ-জীবনেই হোক—সামঞ্জস্য যখন নষ্ট হয়ে যায়—তখনই তা হয়ে ওঠে সমালোচনার বস্তু। সে সমালোচনা কেউ কেউ করেন সহজ ভাবে কেউ কেউ করেন তির্যক ব্যঙ্গাশ্রিত ভাবে—তাই কোথাও তাদের বক্তব্য ব্যঙ্গতীব্র কোথাও কৌতুকচপল। কিন্তু এই ব্যঙ্গ-কটাক্ষের পেছনে যে মনটি ক্রিয়াশীল নিঃসন্দেহে সে মনটি যুক্তিবাদী মন। সে মন আবেগ নির্ভর নয়। ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যঙ্গের মধ্যেও কোথাও বিদ্বেষ নেই যা আছে তা একটি যুক্তিবাদী মনের যুক্তিসহ বিচারশীলতা যা রেনেসাঁসী ঐতিহ্যের দান। ইংরেজ লেখকরাও ইটালীয়ান হিউম্যানিষ্টদের কাছ থেকে যে সম্পদগুলি আহরণ করেছিলেন তাদের মধ্যে "reasoned judgement" অন্যতম।

এই যুক্তিবাদী মনের অধিকারী ছিলেন বলেই মধ্যযুগের গতানুগতিক অন্ধ আবেগ অস্বীকার করে, প্রচলিত বিশ্বাসের বন্ধন মুক্ত হয়ে গুপ্ত-কবি প্রশ্ন করেছেন তাঁর নির্গুণ ঈশ্বরকে।

"কাতর কিংকর আমি, তোমার সন্তান
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান ॥
বার বার ডাকিতেছি কোথা ভগবান।
একবার তাতে তুমি নাহি দাও কান ॥

হায় হায় কর কার, ঘটিল কি জ্বালা
জগতের পিতা হয়ে, তুমি হলে কালা ॥

* * *

চারিদিকে আপনার পরিবার যারা।
অনিবার কবকায় করিতেছে তারা ॥
তুমি যদি অন্ধ হয়ে, চক্ষু বুজে রবে।

মধ্যযুগের অন্ধ-সংস্কার নয়, আধুনিক যুগের যুক্তিবাদী বিচার-বুদ্ধি এ প্রশ্ন তুলেছে। ইটালীর হিউম্যানিষ্টের এই যুক্তিই ছিল "the recognised instrument of inquiry in all fields of thought the Renascence period.

যে যুক্তিবাদী মন নির্গুন ঈশ্বরের ক্ষমতার সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে, সেই মন যখন আমাদের দেশের লোকেদের নূতনত্বের মদিরা পান করে উন্মত্ত হতে দেখেছে, তখন তাতে ব্যঙ্গ তীব্র কটাক্ষ করে তাদের সচেতন করে তোলারই চেষ্টা করেছে। ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে এসে আমাদের দেশের যুবকরা বিশেষত হিন্দু কলেজের ছেলেরা যখন—বিচার নয়—অন্ধ উন্মত্ত আবেগ নির্ভর করে দেশের শিক্ষা-দীক্ষা, প্রাচীন ঐতিহ্য জলাঞ্জলি দিয়ে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে সুরু করল, যখন তারা পৈতে পুড়িয়ে গোমাংস খাওয়াই শ্রেয় মনে করল, তখন সেই বিচার বুদ্ধিহীন অতিমাত্রতাকে আঘাত করতেই গুপ্ত-কবির কলম থেকে ব্যঙ্গ কবিতার উৎসার ঘটেছে, তাই ইংরাজী নববর্ষে যখন আমাদের যুবক-যুবতীরা সাহেব-বিবি সেজে মদের গেলাস হাতে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে তখন কবি ব্যঙ্গ করেছেন।

"ধন্যরে বোতল বাসি, ধন্য লাল জল।
ধন্য ধন্য বিলাতের, সভ্যতার বল ॥
দিশি কৃষ্ণ মানিনাকো, ঋষি কৃষ্ণ জয়।
মেরিদাতা মেরিসুত বেরি গুড বয় ॥
ঈশ্বর পরম প্রেম স্পর্শ করে যাকে।
ধর্মাধর্ম ভেদাভেদ জ্ঞান নাহি থাকে ॥
যা থাকে কপালে ভাই টেবিলেতে খাব।
ডুবিয়া ডবের টবে, চ্যাপেলেতে যাব।"

এ কবিতা থেকে এটুকু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে এখানে কোন যুক্তি নেই

বিচার নেই—আছে নেহাতই উন্মাদনা। এক ধর্ম ত্যাগ করে যদি আর এক ধর্মই গ্রহণ করতে হয় তবে তা করতে হবে বিচার করে বিবেচনা করে। অন্ধ আবেগে নয়। কিন্তু কোথাও ছিল না এই বিচারক্ষম যুক্তিবাদ। তাই কবির কটাক্ষ কশাঘাতে করেছে এই অতিমাত্রতাকে। এখন কেউ যদি একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন ঈশ্বর গুপ্তের এ রচনার মধ্যে নূতনকে সহ্য করার অক্ষমতাই প্রকাশিত হয়েছে—তবে সে বক্তব্য শুনতে নারাজ। একজন ঐতিহাসিক বলেছেন, "মনে রাখতে হবে, দূরযানিতা মাত্রই অগ্রগতি নয়, কেন্দ্র বদ্ধতা মাত্রই নয় স্থানুত্ব।"

যে কবি দেশের মানুষকে কটাক্ষ করে সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন, সে কবি বিদেশী রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ভীত নয়, দেশের প্রতি অসীম দরদ থাকলে তবেই তা সম্ভব। তাই তাঁর "নীলকর" কবিতায় একদিকে যেমন বিদেশীর প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন অন্যদিকে তেমনি হীনবীর্য দেশবাসীর প্রতিও পরম দুঃখের সঙ্গে কটাক্ষ করেছেন :

"হোলে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্তা, ঘটে সর্বনাশ।
কাল সাপ কি কোন কালে, দয়াতে ভেকে পালে,
টপাটপ অমনি করে গ্রাস।
বাঙালী তোমার কেনা, একথা জানে কেনা?
হয়েছি বির কেলে দাস।
করি শুভ অভিলাষ।
তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু
শিখিনি শিং বাঁকানো,
কেবল খাব খোল, বিচিলি ঘাস।
যেন রাঙ্গা আমলা। তুলে সামলা;
গামলা ভাঙে না
আমরা ভুষি খেলে বাঁচব না।"

বাঙালীর এই হীন বীর্যতা সম্পর্কে এমন সচেতন হওয়ার পেছনে সেই একই মনক্রিয়াশীল যে মন প্রশ্ন করতে পারে, যে মন বিচার করতে পারে, যে মন-সমালোচক—যুক্তিবাদী সমালোচক। যে মন Tom Payne's Age of Reason" এর অনুবাদ প্রকাশ করতে সাহায্য করেছিল। বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক জে, ডব্লু, এইচ এ্যাটকিন্স তাঁর সুবিখ্যাত English

Literarny Criticism The Renascence" গ্রন্থে ইংলণ্ডের রেনেসাঁস বা নবজাগৃতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, That the period was one of general enlightment in which a flood of new ideas came in with tne New Learning accompained by a revival of men's powers, a fresh vision of things and a new spirit of enterprise and initiatine, all this and much else besides were characteristic of Renascence period, and all alike were calculated to inspire a lively regard tor literature, as well as a new critical attitude towards it, এ মন্তব্য পুরোপুরি না হলেও অনেকখানি পরিমাণেই যে ঈশ্বরগুপ্ত ও তাঁর প্রচেষ্টা সম্পর্কে সত্য—তাতে কোন সন্দেহ নেই। আলোচনা এখানে শেষ করলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, সুতরাং গুপ্ত-কবির ত্রুটির দিকটুকুও স্মরণ করা উচিত! একথা ঠিক গুপ্ত-কবি সর্ব বিষয়েই খোলা মন নিয়ে এগিয়ে আসতে পারেন নি কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর খানিকটা রক্ষণশীল মন সে ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করেছিল—যদিও এই রক্ষণশীল মন যে পরিবর্তনের শুভ সম্ভাবনা পূর্ণ ছিল এবং পরিবর্তিত হতে শুরু করেছিল—সে তথ্য পরিবেশন করেছেন অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত তাঁর সম্পাদিত "কবি জীবনীতে"—"১৮৩৮ খৃঃ থেকেই ঈশ্বর গুপ্তের মতবাদের পরিবর্তন হতে থাকে বলে অনুমান করি।...ঈশ্বরগুপ্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধনী সভার সঙ্গে জড়িত হলেন! তাঁর গোঁড়ামির মনোভাবটি পরিবর্তিত হতে থাকে এবং নতুন যুগের নতুন ভাব ধারাকে কিছু গ্রহণ করেন। যুগসন্ধির অস্থির চিত্ততার মধ্যে সব কিছুই অভ্রান্ত হবে এ আশা করা অন্যায়, ইতিহাসের সর্বত্রই কিছু কিছু ভ্রান্তির ইঙ্গিত আছে, এ সত্য ঈশ্বর গুপ্তের ক্ষেত্রেও যতখানি সত্য অন্যদের সম্পর্কেও ততখানিই সত্য। তাই ইংরেজী রেনেসাঁসের বিবরণে দেখি... It was In fact of those periods of enlightment, in which the minds of men, conscious of new powers, become kneely interested in matters intellectual social and political, enthusiastic also in applying a newly acquired critical spirit to all departments of thought. And not least significant were the inquiries into literary questions, which despite the primary educational motive, dispite also

the mistakes and excesses inevitable at this date represented a new phase in critical history."

তাই আগের কথার পুনরুক্তি করেই বলতে চাই ঈশ্বর গুপ্ত রেনেসাঁস আন্দোলনের তরঙ্গ-শীর্ষে অবস্থান না করলেও—সে তরঙ্গ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন—এইখানেই গুপ্ত-কবি তার উত্তর কালের অভিনন্দনযোগ্য।

১। সাহিত্য সাধক চরিত মালা (প্রথম খণ্ড) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।
২। সংবাদপত্রে সেকালের কথা শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
৩। বাংলা সাময়িক পত্র " " "
৪। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবি-জীবনী—অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত।
৫। ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য—নিরঞ্জন চক্রবর্তী
৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড)—ডঃ সুকুমার সেন
৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম খণ্ড)—শ্রীভূদেব চৌধুরী
৮। বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ—শ্রীবিনয় ঘোষ
৯। সাহিত্য-চিন্তা—শ্রীশিবনারায়ণ রায়
১০। English/riteraly Criticism : The Renascence e/e —J.W.H. Atkins
১১। Encyclo/edica Britanica.

উপন্যাস-শিল্প প্রসঙ্গে

আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে

[এই শতাব্দীর বিশিষ্ট লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের অকস্মাৎ মৃত্যু সমগ্র সাহিত্য জগৎকে বিমূঢ় করেছে। তাঁর কৃতিকে স্মরণ করে এই অনুবাদটি প্রকাশিত হলো। মৃত্যুর কিছুদিন আগে প্যারিস্ রিভ্যু পত্রের সম্পাদক জর্জ প্লিম্টন্ তাঁর সংগে দেখা করতে যান কিউবায়। হেমিংওয়ে তখন কিউবার রাজধানী হাভানার শহরতলীতে নিজের ছোট বাড়ীতে থাকতেন এবং লেখাপড়ার কাজ করতেন। প্লিমটনের সংগে তাঁর যে কথোপকথন হয়, এখানে তার খানিকটা পাওয়া যাবে। এফ্ এন, এস্-বার্তা প্রেরক প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে এই খবর পাঠিয়েছেন ; গত ১৬ই জুলাই তারিখে হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড পত্রিকায় এই কথোপকথন প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেছেনঃ আনন্দ দে।—সম্পাদক]

প্লিমটনের প্রশ্ন। লেখার প্রক্রিয়া-পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলবেন দয়া করে? আপনি কখন লেখেন? খুব একটা বাঁধাবাঁধি সময়-সূচী মেনে চলেন কি।

হেমিংওয়ের উত্তর। আমি যখন কোন উপন্যাস বা গল্পলেখা নিয়ে পড়ি তখন প্রতিদিন সকালে সূর্যের আলো দেখা যাওয়ার সংগে সংগে লিখতে বসি। তখন কেউ বিরক্ত করার থাকে না ; ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় লেখা আরম্ভ করা যায়, এবং লেখার সময়ে রোদ পোহানো যায়। যা লিখেছ তা আবার পড়তে পারো তখন, তার পরে কলম বন্ধ করে থাকতে পারো কিছুক্ষণের জন্যে পরবর্তী ঘটনা কী রকম হবে তা ভাববার জন্যে। আবার লিখে যেতে পারো ততোক্ষণ পর্যন্ত যতোক্ষণ না তুমি সেই জায়গায় এসে পড়ো যখন পরবর্তীর ঘটনার জন্যে কাহিনী মোড় ফেরে, তখন তুমি থাম্লে, সারাদিন ঐ নিয়ে ভাবলে আবার পরের দিনে সুরু করলে। ধরো, আরম্ভ করেছ ছ'টায় সকালে,

দুপুর পর্যন্ত চল্‌লো লেখা, তার আগেও শেষ হতে পারে। যখন থাম্‌লে তখন দেখলে তুমি একেবারেই রিক্ত হয়ে গেছো; কিংবা শূন্য নয়, রিক্ত নয়, বরং পূর্ণ যেমন পূর্ণ থাকো কাউকে ভালোবাসার কথা বলার সময়ে। তারপরে আর কিছুই তোমায় আহত করে না, কিছুই ঘটে না; কিছুই না মানে যে কোনও জিনিষ ঘটতে পারে পরের দিন তোমার লিখতে বসার আগে পর্যন্ত, পরের দিনের জন্যে এই প্রতীক্ষা এ অতিক্রম করা বেশ কঠিন।

প্রশ্ন। আচ্ছা, লেখা ছেড়ে যখন অনত্র নিবদ্ধ থাকেন তখন মনে যে সব কল্পনা পরিকল্পনা আসে সেগুলো কি মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেন সহজে?

—নিশ্চয়ই। তবে তার জন্যে মানসিক শৃঙ্খলার প্রয়োজন; আর শৃঙ্খলা আয়ত্ত করতে হয়। আয়ত্ত কর্‌তেই হবে বৈকি।

প্রশ্ন। একই লেখা কতোবার সংশোধন করেন?

—সেটা অবস্থা, বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। আমি "ফেয়ার ওয়েল টু, থার্মসে"র শেষটুকু, শেষ পাতাটি ঊনচল্লিশবার সংশোধন না করে খুশি হইনি।

প্রশ্ন। ভালো লিখতে গেলে কি আবেগের স্থৈর্য প্রয়োজন? একবার আপনি আমায় বলেছিলেন, আপনি তখনই ভালো লিখতে পারেন যখন আপনি প্রেমে পড়েন। কথাটা একটু সবিস্তারে বলবেন কি?

—কী অদ্ভুত প্রশ্ন। তবে চেষ্টা করলেই পুরো নম্বর দেওয়া যেতে পারে। তুমি যখন খুশি লিখতে পারো যদি লোকে তোমায় বিরক্ত না করে, তোমাকে নিঃসঙ্গ থাকতে দেয় বা তুমি যদি এ ব্যাপারে খানিকটা নিষ্করুণ হতে পারো। তবে সেইটেই সময় করা লেখাই সব চেয়ে ভালো লেখা হবে যখন তুমি প্রেমে পড়ে আছো। এখন দুটো ব্যাপার যদি এক হয় তাহলে আর ব্যাখ্যার দরকার নেই।

প্রশ্ন। আপনার মতে হবু লেখকদের সবচেয়ে উপযুক্ত পাঠ কী নেওয়া উচিত?

—বল্‌তে পারি, হবু লেখক লেখা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার মনে করে দড়িতে ঝুলতে বেরিয়ে পড়ুক। তারপরে তার দড়ি কেটে দেওয়া হোক, তখন সে তার নিজ শক্তিতে সারা জীবন লিখে চলুক। অন্তত

গলায় দড়ি দেওয়ার গল্প দিয়ে সুরু করতে পারবে।

প্রশ্ন। আচ্ছা, একজন লেখকের পক্ষে সাহিত্যিক প্রেরণার জন্যে অন্যান্য লেখকদের সংসর্গ কোন প্রয়োজন বলে কি আপনি মনে করেন?

—নিশ্চয়ই।

প্রশ্ন। এ শতকের দ্বিতীয় দশকের প্যারিস্ সহরের লেখক শিল্পীদের মধ্যে তেমন কোন group feeling আপনি দেখেছেন কি?

—না। কোন group feeling ছিল না। আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে শ্রদ্ধা করতাম। আমি অনেক চিত্রশিল্প কে শ্রদ্ধা করতাম, কেউ কেউ আমারই সমবয়সী, কেউ কেউ বয়সে বড়ো—গ্রিস্, পিকাসো, ব্রাক, মোনেট তখনও বেঁচে ছিলেন। কিছু কিছু লেখককেও শ্রদ্ধা করতাম—জয়েস, এজরা, ষ্টেইন্—

প্রশ্ন। মনে হয় শেষ দিকে লেখক-সাহিত্যিকদের সংসর্গ আপনি এড়িয়ে চলেছেন। কেন?

—সে খানিকটা জটিল ব্যাপার। তুমি যতো লেখা নিয়ে ব্যস্ত হবে ততোই নিঃসংগ হয়ে পড়বে। অনেক পুরোনো প্রিয় বন্ধুর মৃত্যু ঘটলো; অনেকে সরে গেলো দূরে। কদাচিৎ তাদের সংগে তোমার দেখা হয়, কিন্তু তুমি লিখে চলেছ, এবং আগের মতো তেমনই সংযোগ রয়েছে যেন সেই পুরোনো দিনে কাফে-ক্যাবারাতে দেখা হওয়ার মতো। কখনও কখনও মজার বা নির্মল আনন্দদায়ক অশ্লীল, দায়িত্বজ্ঞানহীন চিঠি তুমি লেখো, আর সেগুলো প্রায় সামনা-সামনি কথা বলার মতোই। কিন্তু তুমি আরও নিঃসংগ, কারণ নিঃসংগ হলেই ত তুমি লিখবে, এবং চিরকালই লেখার সময়ই কম, তাই যদি তুমি অপব্যয় করো, তাহলে সে হবে এমনই একটা পাপ যার আর কোন ক্ষমা নেই।

প্রশ্ন। কে কে আপনার সাহিত্যিক পূর্বসূরী, কার কার কাছ থেকে আপনি গ্রহণ করেছেন বেশি?

—মার্ক টোয়েন, ফেলবেয়ার, স্তাঁদাল, বাক্, তুর্গেনিভ, তলস্তয়, ডস্তয়ভস্কি, শেকভ, এণ্ড্রু মারভেল, জন ডান্, মোপাসাঁ, মহাপ্রাণ কিপলিং, থোরো, কাপ্তেন ম্যারিয়াট্, সেক্সপীয়ার, মোজার্ট, কেভেডো, দান্তে, ভার্জিল, টিন টোরেন্তো, হিরোনেমাস্ বস্, ব্রুখেল,

পাতিনিয়ের, গয়া, জিয়োট্টো, সেজানে, ভ্যান্ গগ্, গগাঁ, সাঁহুয়ান্ দ্য লা ক্রুজ, গঁগোরা—প্রত্যেকের নাম বলতে গেলে গোটা দিন লেগে যাবে। তার মানে হবে যাঁরা আমার জীবন ও রচনার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছেন তাঁদের নাম স্মরণ করার বদলে আমি দাবি করে বস্‌ছি সেই বিদগ্ধতার যা আমার আদৌ নেই। এটা একটা পুরোনো নির্বোধ প্রশ্ন নয়, এটা খুব ভালো গাম্ভীর্য মণ্ডিত প্রশ্ন, এবং এতে বিবেকের পরীক্ষা দরকার। আমি চিত্রশিল্পীদের উল্লেখ করেছি, কারণ কেমন করে লিখতে হয় তা আমি লেখকদের কাছ থেকে শিখেছি আবার তাদের কাছ থেকেও শিখেছি। তুমি বল্‌তে পারো, সেটা কেমন? তাহলে সে কথায় আর একটা গোটা দিন লাগবে। আমি মনে করি সংগীত রচয়িতাদের কাছ থেকেও শেখার আছে। ঐকতানের গবেষণা থেকেও শেখার আছে।

প্রশ্ন। যাঁদের নাম করলেন তাঁদের কারো লেখা, উদাহরণ স্বরূপ মার্ক টোয়েনের লেখা একবার পড়ার পরে ফের পড়ে দেখেছেন কি?

—দুই বা তিন বছর অপেক্ষা করে মার্কটোয়েনের বই পড়া যায়। তোমার ভলোই মনে আছে, আমি সেক্সপীয়রের কোন কোন লেখা প্রত্যেক বছর পড়ি; "লীয়র" পড়ি সব সময়ে। ওই নাটক তুমি পড়লেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

প্রশ্ন। আপনার উপন্যাসে প্রতীকীকতা আছে বলে স্বীকার করেন কি?

মনে হয় সমালোচকরা যখন খুঁজে পাচ্ছেন তখন নিশ্চয়ই আছে। কিছু যদি মনে না করো তবে বলি, এ ধরনের আলোচনা আমার পছন্দসই নয়, এ ধরনের প্রশ্নও ভালো লাগে না, কী লিখেছি সে কথা ব্যাখ্যা কর্‌তে বলার চেয়ে বই লেখা, গল্প লেখা অনেক কঠিন কাজ। তাহলে অবশ্য ব্যাখ্যাতাদের ভাত মারা যায়। যদি পাঁচ-ছ' জন বা তার বেশি সমালোচক কোন কথা বলে যেতে থাকেন তাহলে আমি তাদের ব্যাপারে নাক গলাবো কেন। পড়ার আনন্দেই আমার লেখাপড়া। এছাড়া যদি কিছু পাও তবে সেইটিই হবে মাপকাঠি তুমি পড়ার আগে কী মন নিয়ে এসেছিলে।

প্রশ্ন। কলা কৌশল বা রূপদক্ষতার প্রশ্নগুলো বাস্তবিকই বিরক্তিকর।

—বুদ্ধি সমৃদ্ধ প্রশ্ন আনন্দ দায়কও নয়, বিরক্তিকরও নয়। যদিও

জানি লেখক কী ভাবে লেখেন আমি এটা বিশ্বাস করি সে সম্বন্ধে লেখকের আলোচনা করা ভালো নয়। তিনি লেখেন চোখ দিয়ে পড়ার জন্যে, ব্যাখ্যা বা আলোচনার প্রয়োজন নেই। এটা তুমি নিশ্চয়ই জানো, কোন লেখা প্রথমবারে পড়ায় পরে যা জানা গেল তার চেয়ে অনেক বেশি জিনিষ সেই লেখায় থেকে যায়। লেখকের কাজ নয় তার লেখা ব্যাখ্যা করার বা রচনা রূপ দুর্গম দেশে পর্যটনের জন্যে পথপ্রদর্শকের দরকার নেই।

প্রশ্ন। আপনার মনে ছোটগল্প সম্পর্কে পুরো ধারণা কী? গল্প লেখার কাজে যখন নিযুক্ত থাকেন তখন বিষয়বস্তু ঘটনাসংস্থান বা চরিত্র কি বদ্‌লে টদ্‌লে যায় লেখনীর গতিমুখে।

—কখনও কখন গল্পটা পুরোই জানা থাকে। কখনও কখনও গল্প তৈরী করতে কর্‌তে কলম এগোয়, তখন শেষ সম্বন্ধে কোন ধারণাই থাকে না। বল্‌তে বল্‌তে সবই বদ্‌লায়। কখনও কখনও এতো আস্তে বল্‌তে হয় যে, মনে হয় গল্প যেন এগুচ্ছে না। কিন্তু পরিবর্তন সব সময়েই হয়, সব সময়েই গল্প গতিমান।

প্রশ্ন। সবশেষে, কটা আসল কথা, একজন সৃজনশীল লেখক হিসাবে শিল্পের আসল কাজটি কি। বস্তু জগতের ঘটনা না দিয়ে, বস্তু জগতের আভাস কেবল দেন কেন?

—ওতে বিভ্রান্তির কী আছে। যে সব ঘটনা ঘটছে, এবং যে সব জিনিষ তুমি জানো বা যে সব তুমি জানতে পারো না, সে সব থেকে তুমি এমন কিছু তৈরী কর্‌তে পারো যা বস্তুর আভাস নয়, যা সত্যের চেয়েও পূর্ণতর, সত্যতর, তুমিই তাকে জীবন্ত করে তুলেছ; আর তুমি যদি যথাযথ করে থাকতে পারো তাহলে তুমি তোমার সৃষ্টিকে অমরত্ব দান করলে। তাই ত' তুমি লেখো, আর কোনো কারণে লেখো না। আর তবে কী কারণে লেখো যা কেউ জানে না?

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য : ছন্দ-তাল-মান-লয়

বার্ণিক রায়

রবীন্দ্রনাথের গানে গদ্য ছন্দের ব্যবহার দেখে অনেকে পুলকিত হয়ে ওঠেন। এই বিষয়জনিত পুলকের অন্তরালে তাঁদের ভারতীয় শাস্ত্র-সংগীত, সংস্কৃত গান ও বাংলা গানের ঐতিহ্য সম্বন্ধে বিস্ফার অজ্ঞতা রয়েছে। সংস্কৃতে এমন অনেক গান আছে, যাকে কোন প্রকারেই মাত্রা মিলিয়ে যথাযথ পড়া যায় না, এক অর্বাচীন সংস্কৃতেই প্রকৃতপক্ষে অন্ত্যমিল এসেছে। মধ্যযুগে হিন্দি গানে ছন্দের ব্যবহার আদৌ ছিল না, প্রাণ সঞ্জীবিত হয়ে উঠতো স্পন্দিত বাণীর হিল্লোলিত মর্মরিত বিন্যাসে। বাংলা পাঁচালীর এমন অনেক গান আছে, যাকে ছন্দ বলা যায় না। অন্ত্যমিল তাদের মধ্যে থাকলেও সেটা প্রকৃতপক্ষে কবিতার ছন্দ নয়। ইংরাজী ভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের জন্যই গদ্য ছন্দে একটা বৈশিষ্ট্য টেনে বুনে দেখানো যেতে পারে, সুলিভ্যানের অপেরার গানগুলি বিশ্লেষণ করলেই এ কথার তাৎপর্য বোঝা যাবে। ছন্দের যাথার্থ্য ও সুরের সামঞ্জস্য এবং সব তাল ছন্দের যুক্ত ত্রিবেণী একমাত্র পদাবলীতেই সার্থক ভাবে পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণব পদাবলীকে ছন্দের বিশিষ্ট ঢংএর মধ্যে ফেলেও অনায়াসে আবৃত্তি করা যায়, আবার তাকে যথেচ্ছ সুরে বসিয়ে সুরানুযায়ী তালে রূপ দেওয়া যায়। যদিও কবিতার আবৃত্তি ছন্দ এবং সুরের তালের ছন্দ এক নয়। ভাগনারের গীতিনাট্যের ছন্দ বিশ্লেষণ করলেও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন প্রকার ছন্দধ্বনি স্পট হয়ে ওঠে। Trochaic, Iambic, Dactylic, Logaoedic Cretic, Choriambic, Ionic, Dochmiac প্রভৃতি ছন্দ ধ্বনি নানা ভারের উত্থান-পতনে আন্দোলিত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের ছন্দ বিশ্লেষণ করলে এমনি সুস্পষ্ট কোন ছন্দের অর্থাৎ কবিতাধর্মী ছন্দের দেখা পেতে পারি কিনা তা আলোচিতব্য। আমার বিশ্বাস গীতিনাট্যের ছন্দ বিশ্লেষণ করলে গদ্য ছন্দ, ছড়ার ছন্দ, মাত্রাবৃত্ত ছন্দ, মুক্তক পয়ারের রূপ আমরা এর মধ্যে এটি পূর্ণভাবে পেতে পারি। যে-গদ্য ছন্দের জন্যে রবীন্দ্রনাথকে গীতাঞ্জলির

ইংরাজী যুগে পেরিয়ে লিপিকার সংকোচ বাধাকে সরিয়ে পুনশ্চে পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে, তা রবীন্দ্রনাথ অজ্ঞাত অচেতন মন নিয়ে গীতিনাট্যেই সমাধা করেছেন বাংলা কথকতার ধারায় করেছেন। তথাকথিত গাইয়েদের ও নৃত্যনাট্য উন্মাদ আমোদীদের চাঞ্চল্যে এর প্রকৃত স্বরূপঢাকা পড়ে গেছে। যদিও রবীন্দ্রনাথের সাবধানী আমাদের এ পথে সতর্ক করে। গানের কথাকে কবিতার মত পড়া যায় না সত্যি। এতে প্রচলিত রীতি-সম্মত ছন্দের পুনরাবর্তন মনের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ধ্বনি সামঞ্জস্য আসতে পারে না। কিন্তু এর মধ্যে যদি কবিতার মর্মধ্বনি রণিত হয়ে ওঠে, তাহলে সুরের টানে অপূর্ণতা টুকু পূর্ণতর রূপ লাভ করে। এবং প্রচলিত রীতি না থাকলেও ভাব ও ভাষার সুরময় বাণী প্রচলিত রীতিতেই তাকে প্রতিষ্ঠা করে।

সখী, আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না
কিসেরই পিয়াসে কোথা যে যাবে সে, পথ জানে না।

একে মাত্রিক ছন্দে অনায়াসে পাঠ করা যায়।

সখী ! আঁধারে একেলা। ঘরে মন মানে। না
কি সেরই পিয়াসে। কোথা যে যাবে সে। পথ জানে না।

'কিসেরই পিয়াসে' 'ই' যেমন লঘু উচ্চারিত হলো উচ্চারণ-সৌকর্যের জন্যে, পথ জানে না'র 'না' তেমনি দীর্ঘ উচ্চারিত হলো। পরের পংক্তি দুটি তো পুরোপুরি মাত্রিক—

ঝরো ঝরো নীরে। নিবিড় তিমিরে সজল সমীরে। গো
কেন কার বাণী। কভু কানে আনে। কভু কানে আনে না।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ আলোচনা করতে হলে এ সত্য মূলসূত্র মনে রাখা আবশ্যিক যে কথ্যভঙ্গিকে রবীন্দ্রনাথ কোথাও বিচলিত করেন নি; করেন নি বলেই কথ্যভঙ্গির আবেগ উচ্ছ্বাস অনুযায়ী হ্রস্বদীর্ঘ স্বর বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন প্রকারে হয়ে থাকে। এবং বাংলা ভাষার সঙ্গে যার হৃদ্য পরিচয় ঘনিষ্ঠতর, তার অন্তরে গীতবিতানের গানগুলির প্রকৃত ছন্দ পরিচয় সুস্পষ্টরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। খুব সূক্ষ্ম বিচারে আধমাত্রা সিকিমাত্রার প্রভেদ হয়তো সুরের জন্যে ঘটতে পারে, কিন্তু তাহলে সুরের প্রভাবেই একটা স্থানে গিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে। একথা বারংবার স্বীকার্য যে গানের সুরে খেমটা বা দাদরার তাল চন্দ যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে, কবিতার আবৃত্তিধর্মিতার দিক থেকে বিচার

করলে তাকে চারমাত্রার ছন্দ না বলে উপায় নেই। ৩+৩ দাদরার তাল ছন্দ চারমাত্রায় যে প্রয়োগ হলো এর একমাত্র কারণ ছন্দের চটুলতার জন্যে।

বাল্মীকি-প্রতিভা কালমৃগয়া গীতিনাট্যে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রভাব বিকাশ হয় নি। এ ক্ষেত্রে গানের সুরে যেমন তাঁর ব্যক্তিত্ব নিশ্চিহ্ন, তেমনি অপরদিকে, ছন্দ ও তালে তেমনি কিছু নতুনত্ব ররীন্দ্রনাথ দেখতে পারেন নি। ফলে এই দুটি গীতিনাট্যের ভাষা ও ছন্দ তালচ্ছন্দে বিচার করাই একান্ত বিধেয়। কিন্তু তথাপি মাঝে মাঝে কবিতার সুরচ্ছন্দ গানের তালচ্ছন্দে মিতালি ঘটিয়েছে। পোস্ত তালের সঙ্গে 'কে এলো আজি ঘোর নিশীথে' মিশ্র মল্লারের গানটির কবিতার ছন্দ আলোচনা করলেই ধরা পড়বে। কী দোষ করেছি তোমার ছ' মাত্রায় অনায়াসে গড়া যায়। বলো বলো পিতা | কোথা সে গিয়েছে | কোথা সে ভাইটি | মম কোন কান | নে পড়লে কোন অসুবিধার সৃষ্টি করে না। চারমাত্রিকই ৪+৪+৪+৪ ভাগে কাওয়ালিতে মিশেছে। এবং ঝোঁক অনুসারেও এদের কাব্যে বহুপ্রকার সংস্কৃত ইংরাজী প্রভাবের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। পরবর্তীকালের বিভিন্ন গানে তৃণক তোটর পঙ্ক চামর প্রভৃতি ছন্দ-সচেতন অভ্যস্ততার জন্যে এসেছে, কালমৃগয়া ও বাল্মীকি প্রতিভায় তৃণকের চকিত প্রকাশ আনন্দ পুলকিত করে তোলে, কূলে কূলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদু বায় এবং কেবা রাজা কার রাজ্য মোরা কি জানি প্রভৃতি তৃণকের ভাষা বিন্যাস আভাসে ফুটে ওঠে, এবং একে চারমাত্রায়ও সুন্দরভাবে পড়া যায়। রবীন্দ্রনাথের তোটক ছন্দের প্রভাব যে কতখানি চারমাত্রার ব্যবহারই তাকে প্রকাশ করে। 'সুকুমার' শিশু সে যে স্নেহের বাছারে—একে এই ছন্দে পড়লে কোন অসুবিধা হয় না। এমনি আরো উদাহরণ তোলা যেতে পারে,

শোক তাপ | দূরে গেল
মার্জনা | করিনু তো | রে।

কাওয়ালি তালের ৪+৪+৪+৪ এর সঙ্গে কবিতার বাকছন্দ সুর অপূর্বভাবে মিলেছে।

ক্ষমা করো | মোরে, তাত | আমি যে পা | তকী ঘোর

বনে বনে | সবে মিলে | চলো হো | চলো হো।

'পাতকী'তে অনেকে বা ছন্দে বিপরীত হিসাবে গণ্য করতে পারেন, কিন্তু আকাশ সজল সখীর উচ্চারণ করবার সময় 'আ' উচ্চারণ তবে পরে কাশ বলি, স-জল স-খীর এভাবেই প্রয়াস তিন অক্ষরের শব্দ উচ্চারিত হয়, এতে তেমন পাঠের কোন অসুবিধা সৃষ্টি হয় না।

ছড়ার ছন্দ ৩+৩ খেমটা ছন্দে চমৎকার মিশেছে।

প্রাণ নিয়ে তো | সট্‌কেছি রে
ওরে বর‍্যা | কর্‌বি এখন | কি।

অথবা—

ঠাকুর মশায় | দেরি না সয় |
তোমার আশায় | সবাই বসে |

কিংবা—

কাজ কি খেয়ে | 'তোফা আছি
আমায় কেউ-না | খেলেই বাঁচি
শিকার করতে | যায় কে মরতে
চলিয়ে দেবে | বরা মোষে |

'কেউ না' স্বতন্ত্রভাবে কেউ পড়ে না, ঝোঁকের জন্যেই 'কেউ-না' এক সঙ্গে পড়তে হয়। 'চুঁসিয়ে' উচ্চারণের জন্যে 'চুস্‌য়ে' পড়তে হয়।

গোলে মালে | ফাঁক তালে | সট্‌কেছি কে | মন |
চুপ্‌সে গেল | ফাপা ভুঁড়ি | শংকাতে ত | খন |
ছাড়বো না ভাই | ছাড়ব না ভাই |
এমন শিকার | ছাড়ব না |
হাতের কাছে | অম্‌নি এলী অম্‌নি যাবে |
রাজাটা | খেপেছে রে | তার কথা আর | মানব না |

'রাজাটা' 'মানব' তিন মাত্রা মনে হলেও সাড়ে তিন মাত্রা।

রাজা মহারাজা কে জানে গানটি পুরোপুরি গদ্যছন্দ বলতে বাঁধে। রাজাধিরাজ বক'ন্দাজ কাজ শখের ব্যবহারের জন্য মিলের ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পরে দ্বিতীয় দৃশ্যের গানটি একেবারে গদ্য, কোন ছন্দ নেই। সুতরাং গদ্যছন্দ এখানে নেই। কিন্তু বাল্মীকির,

অহো আস্পর্ধা একি তোদের নরাধম
তোদের কারেও চাহিনে আর, আর আর নারে
দূর দূর আমারে আর ছুঁসনে
এ সব কাজ আর না এ পাপ আর না
আর না আর না ত্রাহি—সব ছাড়িনু।

কথ্যভঙ্গির সঙ্গে মনের বিতৃষ্ণা কথায় চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে। 'ছাড়িনু' কাব্য প্রভাবের জন্য এনেছি, পরবর্তীকালে সংস্কার একেবারে বর্জন করেছিলেন। কিন্তু সর্বত্রই যে একই রীতি সমগ্রভাবে একটি গানের মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। কি বলিনু আমি গানটি বিশৃংখল বিন্যাসে তবু প্রথম দিকে নিম্নরূপ ভাগ করে পড়া যায়।

কি বলিনু আমি | একি সুললিত | বাণী রে
কিছু না জানি | কেমনে যে আমি | প্রকাশিনু দেব | ভাষা
এমন কথা | কেমনে শিখিনু | রে
পুলকে পুরিল | মন প্রাণ | মধু বরষিল | শ্রবণে

কিন্তু পরেই ঘোর অন্ধকার মাঝে একি জ্যোতির্ভাষ আর পড়া যায় না আগের মত। মধ্যযুগীয় কানে শোনা-পয়ারের ছন্দ সরস্বতীর আশীর্বাদ বাণীতে প্রকাশ পেয়েছে।

অধীর হইয়া সিন্ধু কাঁদিবে চরণ তলে।
চারিদিকে দিক্ বধূ আকুল নয়ন জলে।

তবে বাল্মীকি-প্রতিভায় এমন অনেক গান আছে যাকে বাক্‌ছন্দের কোনটার মধ্যেই ধরা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তালছন্দ দেবার সময়ও এটা সর্বদা মনে রেখেছেন যে গানের বাণী যাতে বিকৃত না হয়। প্রাচীন বা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গানে তাল ছন্দে সুরের প্রয়োগ এমন দেখা যায়—এবং কিছুকাল আগেও দেখা গেছে যে 'সংকুল বনে'র সুর সংকু তো ষোলমাত্রা হয়ে গেল কিন্তু ল আর এল না। রবীন্দ্রনাথ ঐক্ষেত্রে বাক্‌ছন্দের সঙ্গে তালছন্দের সংস্পর্শ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। প্রথমেই বলেছি বাল্মীকি-প্রতিভা কালমৃগয়া রবীন্দ্র প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশের লগ্নে ভূমিষ্ঠ হয় নি। কিন্তু পরবর্তীকালের গানে বাক্‌ছন্দ তেমন ক্ষুণ্ণ হয় নি। একটি সুরের ছন্দদোলা কবিতার মতই বারংবার অন্দোলিত হতে যাবে।

ওই সাগরের | ঢেউয়ে ঢেউয়ে | বাজল ভেরী | বাজল ভেরী |
কখন আমার | খুলবে দুয়ার | নাইকো দেরি | নাইকো দেরি |

অথবা—

ও চাঁদ।
চোখের জলে | লাগল জোয়ার | দুখের পারাবারে |

কিংবা—

মনে রবে | কি না রবে | আমারে—সে আমার | মনে নাই |
ক্ষণে ক্ষণে | আসি তব | দুয়ারে | অকারণে | গান গাই |
চলে যায় দিন | যতক্ষণ আছি | পথে যেতে যদি | আসি কাছাকাছি |
তোমার মুখের | চকিত সুখের | হাসি দেখিতে যে | চাই

চার ও ছয় মাত্রা চমৎকার একটি আন্দোলন সৃষ্টি করেছে। এই সুসমঞ্জস্য ধ্বনিই সুরহীন বাণীকে গানের অসীম সুর সংকেতে ইঙ্গিতময় করে তোলে। আপনা থেকেই সুরহীন অব্যক্ত অথচ স্বোচ্চারিত গান জেগে ওঠে।

মায়ার খেলা গীতিনাট্য রচনা কালে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা তাঁর স্বরূপ প্রকাশের বস্তুভূমিক ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে। মানসী ও সোনার তরী কাব্যের যুগের কবিতার মর্মস্পর্শী হৃদয়ানুভূতির সঙ্গে ছন্দধ্বনি ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। পরিপূর্ণতা না হোক, সার্থক সৃষ্টির উৎসমূলে কাব্যের ধ্বনি পাখা ধাবিত হয়েছে। মায়ার খেলা গীতিনাট্য কাব্য বা নাটক হিসাবে আলোচনা না করেও সুরের ক্রম অনুসারে বিচার করলেই এর নাটকীয়তা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব, বৈপরীত্য ও বিরোধ দুই স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই গানের সুরের সঙ্গে তবলার তালগুলিও ভাবধ্বনি ছন্দের নাটকীয় প্রকাশকে সুন্দরতর করে তুলেছে। সব শুদ্ধ একাত্তরটি গান আছে। এ গানের সুরগুলি যথাক্রমে ঃ মোরা জলে স্থলে—পিলু একতালা। পথহারা তুমি পথিক—ইমন কল্যাণ একতালা। জীবনের আজ কি প্রথম—মিশ্রবাহার কাওয়ালি। কাছে আছে দেখিতে—কাফী খেমটা। যেমন দখিন বায়ু—মিশ্রবাহার কাওয়ালি। মনের মত কারে কাফী—খেমটা। আমার পরাণ যাহা—মিশ্র কালংড়া কাওয়ালি। কাছে আছে দেখিতে—কাফী খেমটা। সখি সে গেল কোথায়—বেহাগ—খেমটা। দেলো সখি দে—দেশ কাওয়ালি। সখি বহে গেল বেলা—মিশ্র ভূপালী একতালা। ওলো রেখে দে সখি—খাম্বাজ একতালা। প্রেমের ফাঁদ পাতা—জিলফ ঝাপতাল। যেওনা

যেওনা ফিরে—ছায়ানট ঝাঁপতাল। কে ভাবে আমি কভু—বসন্তবাহার কাওয়ালি। এসেছি গো এসেছি—পিলু খেমটা। ওকে বলে সখী—বেহাগ খেমটা। প্রেমের ফাঁদ পাতা—জিলফ রূপক। মিছে ঘুরি এ জগতে—বেলাবলী ঢিমে তেতালা। সখা আপন মন নিয়ে—ভৈরবী রূপক। আমি জেনে শুনে—মল্লার রূপক। ভাল বেসে যদি—কাফী কাওয়ালি। দেখো চেয়ে দেখো ঐ—বেহাগড়া ঝাঁপতাল। সুখে আছি সুখে আছি—মিশ্র ঝিঁঝিট। ভাল বেসে দুঃখ সেও সুখ—মুলতান একতালা। ঐ কে গো হেসে চায়— হাম্বীর কাওয়ালি। দূরে দাঁড়ায়ে আছে—মিশ্র রায় কেশী তাল ফেরতা। প্রেম পাশে ধরা পড়েছে—কালংড়া খেমটা। ওগো দেখি আঁখি—মিশ্র সুরট একতালা। ওকে বলো না বলো না—ঝিঁঝিট কাওয়ালি। প্রেম পাশে ধরা পড়েছে—কালংড়া খেমটা। দিবস রজনী আমি—মিশ্র সিন্ধু একতালা। সখী সাধ করে—বাহার ফেরতা। আমি হৃদয়ের কথা—মিশ্র সিন্ধু একতালা। নিমেষের তরে শরমে—সিন্ধু কাওয়ালি। ওগো সখী দেখি—পিকু আড় খেমটা। এতো খেলা নয় খেলা—সরফর্দা কাওয়ালি। সে জন কে সখী—মিশ্র দেশ খেমটা। ঐ মধুর সুখ জাগে—মিশ্র ভৈরবী একতালা। তারে কেমনে ধরিবে—মিশ্র ভেরোঁ কাওয়ালি। সকল হৃদয় দিয়ে—মিশ্র কানাড়া ঢিমে তেতালা। তুমি কে গো—কেদারা খেমটা। তবে সুখে থাকো—বেহাগ কাওয়ালি। নিষের তরে—সিন্ধু কাওয়ালি। সেই শান্তি ভবন ভুবন—কাফি কাওয়ালি। কাছে ছিলে দূরে—আলাইয়া আড় খেমটা। দেখ সখা ভুল করে—ককুভ কাওয়ালি। ভুল করেছিনু ললিত বসন্ত কাওয়ালি। অলি বার বার—মিশ্র দেশ খেমটা। ঐ কে আমায় ফিরে—পূরবী কাওয়ালি। বিদায় করেছ যারে— কানাড়া যৎ। আমি চলে এনু বলে—পূরবী কাওয়ালি। না বুঝে কারে তুমি—ভূপালি কাওয়ালি। আমি কারেও বুঝিনে—বেহাগ আড়ঠেকা। প্রভাত হইল নিশি—বিভাস আড়ঠেকা। মধুনিশি পূর্ণিমার—কানাড়া যৎ। এস এস বসন্ত ধরাতলে—মিশ্র বসন্ত রূপক। মধুর বসন্ত এসেছে—সাহানা তেতাল। আজি আঁখি জুড়াল—মিশ্র সুলতান কাওয়ালি। একি স্বপ্ন একি মায়া—বেহাগ কাওয়ালি। আহা আজি এ বসন্তে—মিশ্র ঝিঁঝিট। আমি তো বুঝেছি সব—ঝিঁঝিট ঝাঁপতাল। এতদিন বুঝি নাই গৌর সারং যৎ। চাঁদ হাসে হাসে—সোহনী খেমটা। আর কেন আর কেন—ভেরবী আড়ঠেকা। এ ভাঙা মুখের—মিশ্র

খট ঝাঁপতাল। যদি কেহ নাহি চায়—রামকেলি কাওয়ালি। দুখের মিলন টুটিবার নয়—টোড়া ঝাঁপতাল। কেন এলি রে—ভৈরবী ঝাঁপতাল। এরা সুখের লাগি চাহে—মিশ্র বিভাগ একতালা।

মায়ার খেলায় রাগরাগিণী যত সুন্দর ও বিচিত্রতর সম্ভারে প্রয়োগ করা হয়েছে, তালের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তেমন কিছু করেন নি। মায়ার খেলায় রবীন্দ্রব্যক্তিত্ব সুস্পষ্ট হলেও রাগরাগিণীর যথেচ্ছ মিশ্রণ পরবর্তীকালে ঘটেছে। কিন্তু রাগরাগিণীকে নাটকীয় সুরে প্রয়োগ করার ক্ষমতাই এখানকার মূল প্রশ্ন। এই নাটকীয়তায় ঘটনা ও কাহিনী আছে। ঋতুনাট্যের মত বিকাশমুখী নয়, নৃত্যনাট্যের মত স্বরূপ প্রকাশধর্মী নয়। তালের দিকে কাওয়ালি ব্যবহৃত হয়েছে বাইশটি গানে, খেমটা বারটি গানে, একতালা ন'টি গানে, যৎ চারবার ঝাঁপতাল সাতবার, আড়ঠেকা তিনবার, আড় খেমটা দুবার, ঢিমে তেতালা দুবার, তেতাল, তাল ফেরতা ফেরতা একবার করে ব্যবহার করা হয়েছে। তালের পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথ প্রায় চল্লিশ বছরের পর করেছেন, এবং সামান্য কয়েকটি গান ছাড়া রূপকড়া নবতাল, নবঝম্পক, একাদশী ব্যবহার করেন নি, কিন্তু আঠারো মাত্রার তাল প্রয়োগ উত্তর জীবনে বারংবার ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মায়ার খেলায় সুর বা তালের কোন চরম পরীক্ষা করেন নি। কিন্তু তালের বিচারে দেখা যায়, কাওয়ালিকেই রবীন্দ্রনাথ গম্ভীর সুরের গানে ও গভীর আর্তির সুরে ব্যবহার করেছেন বেশি। ছন্দকে চঞ্চল নৃত্যে উন্মুখর করবার জন্যে ৩+৩ খেমটা তালের ছন্দ ব্যবহার করেছেন। একতালকে দ্রুত মধ্য বিলম্বিত নানা স্তরে বিভিন্ন মাত্রায় প্রয়োগ করা যায় বলেই তারও ব্যবহার কম নয়। আসলে তালের মাত্রা সুখের ছন্দ দোলার ওপর নির্ভরশীল। সেই সুরগুলির মনোভাবের মধ্যেই তালের ব্যবহার নিহিত রয়েছে। যৎ সাধারণত উচ্চাঙ্গ সংগীতের মধ্যে অনেকটা শ্রেষ্ঠ। গুরু গম্ভীর গানে। বিলম্বিত সুরে মতের গম্ভীর চাল চমৎকার। এখন দেখা যাক তালের মাত্রার সঙ্গে বাকছন্দের মাত্রা বা ছন্দস্পন্দ কতখানি একত্র মিলেছে, না একেবারেই পৃথক হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের ও তালের মাত্রার আলোচনায় একথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় যে স্বরলিপি করবার সময় এক একটি গানকে সুনির্দিষ্ট তালের মাত্রায় আবদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু এমন মাত্রা সুনির্দিষ্টতা রবীন্দ্রনাথের গানে সর্বদা আশাপ্রদ ও ফলপ্রদ নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বাধীন মুক্তপ্রবণতা বদ্ধ হয়ে যায়, এবং তালের সূক্ষ্মকাজ-

গুলিও এর মধ্যে ধরা পড়ে না, সুর যে পড়ে না সে তো সহজেই অনুমেয়। সুরের গুরু পরম্পরা শিক্ষাই এখানে বিধেয়। গীতিনাট্যের ক্ষেত্রে উপরোক্ত তালের হের-ফের হয় নি এমন কথা জোর করে কেউ বলতে পারেন না। তবে সুরের ভাব লোক অনুযায়ী তাল তার আজ্ঞাবহ দাসের মত পেছনে যাত্রা করেছে। রবীন্দ্রনাথ সংগীতের মুক্তি প্রবন্ধে তালের মাত্রা মানবার অনুশাসনকে ধিক্কার দিয়ে লয়ের আবশ্যিকতা স্বীকার করেছেন। সুতরাং গীতিনাট্যের গানগুলি বিচার করবার সময় তালের এই লয়-টুকুই অনুশীলন ও অনুধাবণযোগ্য। এই লয় মানটুকু ঠিক হলেই তালের প্রয়োগ ব্যবস্থা যথার্থ হয়েছে স্বীকার করে নিতে হবে। ওই লয়-টুকুই সুরের বিহিতছন্দ। এই কারণেই উত্তর ভারতীয় হিন্দুস্থানী সংগীতের কৌশলী তাল মাত্রার নির্দিষ্টতা রবীন্দ্রসংগীতে চলে না। আরো একটা কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে, উত্তর ভারতীয় তালের ছন্দে যত মাত্রা আছে, আমাদের মনের ভাব লোকের হৃদয় দুয়ারে আরো কত বিচিত্র ছন্দ দোলা সূক্ষ্ম আঘাতে কাজ করে। এই হৃদয়ের সূক্ষ্ম ছন্দ মাত্রার দোলাকে তালের মাত্রার নির্দিষ্টতার থেকে লয়ই সম্ভব করে তুলতে পারে। রবীন্দ্রসংগীতে এই বিচিত্র মাত্রার দোলা তাই লয়ে প্রকাশমান, স্বরলিপির নির্দিষ্টতায় তা পর্যুবসিত নয়।

রবীন্দ্রনাথ কাওয়ালি ব্যবহার করেছেন বেশি, এর কারণ তোটক বা চার মাত্রার ছন্দের প্রতি, অন্তত গানে, তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিল। মায়ার খেলার গীতিনাট্যের কাওয়ালির ৪+৪+৪+৪ এর ষোল মাত্রা এবং বাক্‌ছন্দের চার মাত্রা অনেক জায়গায়, যৌগপদ্য ঘটিয়েছে। প্রমদার কে ডাকে গানটি কাওয়ালি তালে, বাক্‌ছন্দ চার মাত্রা ধরলে কোন অসুবিধা হয় না।

কে ডাকে | আমি কভু | ফিরে নাহি | চাই
কত ফুল | ফুটে উঠে | কত ফুল | যায় টুটে।
আমি শুধু। বহে চলে। যাই

এর সঙ্গে ঢিমে তেতলার গানের বাক্‌ছন্দও তুলনীয়

মিছে ঘুরি। এ জগতে। কিসের পা। কে
মনের বা। সনা যত। মনেই থা। কে

কিন্তু সর্ব এই যে এমনভাবে মিলেছে তা নয়, বাক্‌ছন্দের মাত্রা ও তালের মাত্রা একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে। কিন্তু কথ্যভঙ্গি অটুট

রয়েছে। নিম্নোক্ত গানটি যদিও দশ মাত্রার ঝাঁপতালে, তথাপি ছ'মাত্রার কাব্যছন্দ চমৎকার

দুখের মিলন। টুটিবার নয়।
নাহি আর ভয়। নাহি সংশয়।
নয়ন সলিলে। সে হাসি ফুটে গো।
রয় তাহা। চিরদিন রয়।

মধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে, বসন্ত কথাটিকে ব্যতিক্রম বা সুরের লয়ে ধরলে ছ'মাথার ছন্দ ধরলে এতে কোন ব্যত্যয় হয় না। যৎ তালের আট মাত্রার সঙ্গে কানাড়া রাগের এই গানটির বাক্‌ছন্দ চমৎকার ঐক্যলাভ করেছে। ২+২ ভাগটি সুরের জন্যে, কিন্তু আটকে ২+২ করে পড়লে একটা ভাব মূর্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিদায় করেছ যারে। নয়ন জলে
এখন ফিরাবে তারে। কিসের ছলে গো
আজি মধু সমীরণে। নিশীথে কুসুমবনে
তারে কি পড়েছে মনে। বকুল তলে

অথচ অন্যত্র চারকে ছ'মাত্রার ৩+৩ তালে ভাগ করেছেন সুরের উন্মুখরতার জন্যে।

অলি। বার বার। ফিরে যায়।
অলি। বার বার। ফিরে আসে।

অথচ দশ মাত্রার ঝাঁপতাল বাক্‌স্পন্দের সঙ্গে একত্র মিশেছে ;

কেন এলিরে | ভাল বাসিলি | ভালবাসা পে | লি নে

যদিও এর পরে আর তেমন বাক্‌ছন্দ নেই, কিন্তু লয়ের সুর মিলিয়ে পড়লে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে রূপকের সাত মাত্রা কাব্যের বাক্‌ছন্দের সাত মাত্রার সঙ্গে চমৎকার ঐকতান ধ্বনিত করেছে ;

সখা | আপন মন নিয়ে | কাঁদিয়ে মরি
পরের মন নিয়ে | কি হবে।

আড় খেমটা একতালা, ঢিমে তেতালা তেতাল প্রভৃতি গানের তালে যে সূক্ষ্ম কারুকার্য অনিবার্য-তা মায়ার খেলার গানের মধ্যে চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে। সমস্ত তালগুলি বিচার করলে সে যুগে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব চমৎকার বোঝা যায়। দীর্ঘ বিলম্বিত প্রবহমান সুরের তালের ছন্দে মনের গভীরতর আকৃতি

প্রকাশের জন্য তিনি গম্ভীরী ঠাটের তাল প্রয়োগ করেছেন। এই প্রয়োগে তাঁর কবিচিত্তের ভাবলোকই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

এই তালের গানগুলিকে যতই দ্রুত ব্যবহার করে নাচের উপযোগী করি না কেন, তাতে কিছুতেই এই ছন্দস্পন্দ ও সুরদোলা আসবে না। ঐ মধুর সুখ জাগে গানটি মিশ্র ভৈরবীতে, একতালা ব্যবহার করা হয়েছে। একতালাকে দ্রুত মধ্য বিলম্বিত লয়ে ১২, ২৪, ৪৮ মাত্রায় ব্যবহার করতে পারি, ১২ মাত্রায় দ্রুত ব্যবহার করে যদি নাচের উপযোগী করি, তাহলে মিশ্র ভৈরবীর ঐ শান্ত গম্ভীর প্রবহমান সুর মাধুর্য থাকে কি না—সে বিষয়ে অধিকতর দৃষ্টিপাত করা কর্তব্য। এ ভাবে প্রত্যেক তাল সম্বন্ধেই সেই একই প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। বিশেষ করে আমি পরেও বুঝিনে বেহাগ সুরে আড়াঠেকার তাল কি ভাবে নৃত্যের উপযোগী করা যাবে। বিশ্বছন্দের অন্তরের স্পন্দযোগেই এই লয়ের নিয়মিত পদক্ষেপ অনুধাবনীয়, নৃত্যের রূপ-মূর্তিতে নয়। গীতিনাট্যকে নৃত্যে রূপান্তর করবার পূর্বে এই সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া স্বাভাবিক।

মায়ার খেলা গীতিনাট্যে মিলহীন মাত্রাবৃত্ত চমৎকার দেখতে পাওয়া যায়। গানের তাল কাব্যের ছন্দের সঙ্গে একত্র মেলে না বটে, কিন্তু তবু রবীন্দ্রনাথের নিয়মিত মাত্রাবিহীন গানেও লয়ের টান একটা ছন্দস্পন্দ জাগিয়ে তোলে, যার ফলে অনায়াসে এর পাঠ্যস্বাদ কান ও মনকে যুগপৎ ভুলিয়ে দেয়।

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে'

ই. এম. ফর্ষ্টার

[ই. এম. ফর্ষ্টারের Abinger Harvest নামক বইয়ের দুটি প্রবন্ধের অনুবাদ এ-দুটি। বলা বাহুল্য, ফর্ষ্টার ইংরাজী তর্জমা পড়ে লিখেছেন। প্রবন্ধদ্বয়ের রচনাকাল যথাক্রমে ১৯১৯, ১৯১৪। অনুবাদ করেছেন বাসব সরকার। সম্পাদক]

যখন রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাশালী কোন লেখক বলেন—

Passion is beautiful and pure—pure as the lily that comes out of the slimy soil ; it rises superior to its defilement and needs no Pears' soap to wash it clean.১

তখন তিনি মনকে টানার মতোই কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করেন।' এই কথাটি মোটেই আকর্ষণীয় নয়—বরং একে 'বাবু' সুলভ উক্তি বলা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো রবীন্দ্রনাথ, যাঁর আকর্ষণ এতো বেশি, একথায় তিনি কি বলতে চান? তিনি কি নাটকীয় হতে চান এবং সেই কারণেই তাঁর সৃষ্ট কোন 'বাবু' চরিত্রকে যথাযথ ইংরেজী কথা যুগিয়ে যাচ্ছেন, কিম্বা এটা তাঁর কোন শ্লেষাত্মক কথা, নাকি মূল রচনার বাক্য বিন্যাসের, অলংকরণের ভাষান্তরে ঘটেছে অপমৃত্যু, অথবা এটা একটি নিছক পরীক্ষামূলক রচনা না হলে কেনই বা একের পর এক এতো নিম্নরুচির সমাবেশ ঘটবে। অথচ রচনার মূল কথাটি অত্যন্ত সুন্দর আর খুব সুন্দর ভাবেই তা বলা হয়েছে ঃ

"While the day is bright and the world in the pursuit of its numberless tasks crowds around, then it seems as if my life wants nothing else. But when the colours of the sky fade away and the blinds are drawn down over the windows of heaven, then my heart tells me that evening falls just for

the purpose of shutting out the world, to mark the time when the darkness must be filled with the One—that work alone can not be the truth of life, that work is not the be all and the end all of man, for man is not simply a serf —even though the serfdom be of the True and the Good."২

কিন্তু যখন এই মূল কথাটিকে ক্রমপরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখানে ভাবের বর্ণচ্ছটায় দেখা দিয়েছে অসঙ্গতি, তখন মনে হয় বৈপরীত্য ততোটা ঘরের সঙ্গে বাইরের নয়, যতোটা হলো সুরুচির সঙ্গে নিম্নরুচির। ঘর এখানে আসলে আবাস নয়, সেটা হলো অসীমের ধ্যানের জন্যে নিভৃত আশ্রয়। আর বাহির—সেটা অসংখ্য কাজের পরিধি নয়, বরং একটা সাময়িক আবাস যেখানে প্রেমের অভিনয় করা হয় রহস্যময়তা বা দেশ প্রেমের মুখোসের অন্তরালে। ঘটনার পরিবেশ আর সময় হলো স্বদেশী আন্দোলনের বাংলা দেশ, যেখানে একদিন একটা ডাকাতি হলো ছ'হাজার টাকার জন্যে। কেমন করে কখন, কারা নিয়ে গেল এতো টাকা সিন্দুক ভেঙে? রবীন্দ্রনাথ তার যথার্থ কারণ দেখাতে পারেন নি মোটেই। হে মুক্তি, নির্বাণ, এ সাধনা তোমার জন্যে নয়। বরং আবেগহীন সহজ কথায় এটাই জানা যায় যে কোন এক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে স্বামীর কাছ থেকে টাকাটা চুরি করেছে তার স্ত্রী আর সেই টাকাটাই অপব্যয় করেছে এক তরুণ শিভাল্‌রি-প্রিয়, প্রণয়প্রবণ নীতিহীন বাবু ফলতঃ আরেকজন বাবু, ক্ষাত্রধর্মী, তাকে প্রাণ দিতে হয়। ট্রাজেডিকে লেখক নিপুণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন, কিন্তু তার উদ্দেশ্য-বিহীনতা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই কারণে যে, বৈপরীত্যের সমাবেশ লেখক যেমনভাবে চেয়েছেন ঠিক তেমনভাবে ঘটে নি। তিনি চেয়েছিলেন যে এই স্ত্রী ঘর ছাড়বে বাহিরের বিপুল বিশ্বের আকর্ষণে, তার নিদারুণ প্রেমে, যা শত পঙ্কিলতা সত্ত্বেও দুর্নিবার। কিন্তু সে ঘর ছাড়লো এক পশ্চিম কেনসিংটোনিয়ন বাবুর প্রেরণায় যে তাকে ডাকে "মক্ষিরাণী" কিম্বা আবেগময় মুহূর্তে শুধু "মক্ষি" বলে। রচনার সাবলীলতা রূপকের সূক্ষ্ম কারুকার্য এবং মহৎ দৃষ্টি-ভঙ্গি যা রবীন্দ্র-রচনার সহজ গুণ, তার মাঝেও এই কদর্যতার ছাপ প্রকট হয়ে আছে। সন্দেহ নেই এটা বহিরঙ্গের কথা, অপ্রয়োজনের কথা, কিন্তু

তবুও এরা আছে, তাই মনে হয় তিনি সেই সব জিনিষ নিয়ে পরীক্ষা করেছেন যার সহজাত দোষ-গুণের সীমা তাঁর ভালো জানা নেই।

পরীক্ষামূলক রচনা তিনি লিখবেন কেন? প্রশ্নটা কঠিন কিন্তু লাভজনক। চিত্রা বা গীতাঞ্জলির সাফল্যের পর কেন তিনি সাহিত্যে সেই চরিত্র, সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে চান, পশ্চিমের লেখকরা যার একঘেয়েমি থেকে মুক্তির পথ খুঁজছে। হয়তো উত্তরটা এই যে বাঙ্গালীরা অসাধারণ জাত। ভারতীয় উপদ্বীপে তারা সবচেয়ে বেশি আধুনিক এবং মানসিক গঠনে সবচেয়ে রোমান্স্-প্রবণ। চেষ্টায় তাদের দ্বিধা নেই, ব্যর্থতা তাদের হতোদ্যম করে না। কারণ তারা জানতে চায় সারা দুনিয়াটাকে। এক যুগের মধ্যে তারা গড়ে তুলেছে রবীন্দ্রনাথ আর জগদীশচন্দ্রের মত দুই পথিকৃতকে। যে জাতির মানসে এটা সম্ভব, তারা কখনো শান্ত সমাহিত জীবন-যাপন করতে পারে না। যেমন বিজ্ঞানে, তেমনই সাহিত্যে তারা পশ্চিমের যুগলব্ধ সাফল্যের চর্যা সুরু করেছে—যদি আরো কোন নতুন কাজে তাদের লাগানো যায়। আমরা আশা করবো যে তরুণ লেখকরা যেন এই "ঘরে-বাইরে"র পরীক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে আরো স্বচ্ছন্দ কোন মাধ্যম বেছে নেন।

১। প্রবৃত্তিই সুন্দর, প্রবৃত্তিই নির্মল, যেমন নির্মল ভুইচাঁপাফুল যে কথায় কথার স্নানের ঘরে ভিনোলিয়া সাবান মাখতে ছোটে না।

২। দিনের আলো যখন প্রখর থাকে তখন সংসার তার অজস্র কাজ নিয়ে চারিদিকে ভীড় করে দাঁড়ায়; তখন মনে হয়, জীবনে এ ছাড়া আর কিছুরই দরকার নেই। কিন্তু যখন আকাশ ম্লান হয়ে আসে যখন স্বর্গের জানালা থেকে মর্ত্যের উপর পর্দা নেমে আসতে থাকে, তখন আমার মন বলে, জগতে সন্ধ্যা আসে সমস্ত সংসারটাকে আড়াল করবার জন্যেই; এখন কেবল একের সঙ্গে অনন্ত আকাশটাকে ভরে তুলবে...সত্য নয় একথা কখনোই সত্য নয় যে কেবল মাত্র কাজই মানুষের আদি অন্ত। মানুষ একান্তই মজুর নয়, হোক না সে সত্যের মজুরি, ধর্মের মজুরি।

রবীন্দ্রনাথের "চিত্রা"

ই এম ফষ্টার

শুধু শ্রদ্ধা নিবেদনের চেয়ে কোন কিছু শোনা অনেক শ্রেয়, যদিও এতোটা জনপ্রিয় নয়। এর জন্যে প্রয়োজন শান্ত পরিবেশের এবং কণ্ঠ যদি এ্যাপোলোর হয় তাহলে শ্রবণের আবশ্যিক হলো সৌন্দর্যবোধ। এটা সর্বত্রই সুদুর্লভ, আর লণ্ডনের সংস্কৃতি জগতে প্রায় অজ্ঞাত যেখানে বাইরে কোলাহল আর অন্তরে মূক নীরবতা। লণ্ডনের পুরুষ এবং তার চেয়েও বেশি নারী, মনযোগের চেয়ে পুজাতে বেশি পারঙ্গম। এতে গড়ে ওঠে খুশির উজ্জ্বলতা আর শেষ পর্যন্ত এটা কম ক্লান্তিকরও বটে। এর মধ্যে উৎসাহ আছে প্রচ্ছন্ন ভাবে যার প্রয়োজন আমাদের সকলের কাছেই সুনিশ্চিত। এখানে আছে উন্নতি, আছে ব্যপ্তি। ফলতঃ শহর লণ্ডন হয়ে উঠেছে উত্তেজনার পীঠস্থান, যেখানে ক্ষণস্থায়ী উন্মাদনা মনকে টেনে নিয়ে যায় জ্বরে ধরা মানুষের মতো চরমের দিকে। আর জ্বর ছেড়ে গেলে নেমে আসে অবসাদ। এখানে দুটি উত্তেজনাকর পরিবেশের মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই। শ্রদ্ধার অর্ঘ নিবেদিত হয় দ্রুততালে এক বেদী থেকে অন্য বেদীতে তাই এমিল রাইখ্‌কে অর্ঘ নিবেদনের রেশ কাটতে না কাটতেই তা নেমে এলো অতুলনীয় ধারায় রবীন্দ্রনাথের দিকে।

বর্তমান সমালোচক এই হিস্টিরিয়ার কবলায়িত না হয়ে পড়ার ভান করলেও, সেও আছে এদেরই মধ্যে মিশে, তাই গত দু'বছরের এই অর্থহীন কোলাহলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত কথাগুলিকে অনুধাবন করা হয়ে দাঁড়িয়েছে কষ্টকর। রবীন্দ্রনাথ সুলেখক। এ-কথাটুকুতে সকলেরই মতৈক্য থাকা উচিত। কিন্তু কতোটা ভালো? এর কোন জবাব দেওয়া যাবে না যতদিন না এই অর্ঘ নিবেদনের পালা আর তার অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার রেশ শেষ হয়ে যায়, যতদিন না এই পুজার ধূলি ধূসরতার, জঞ্জালের বিলীয়মান রেশকে ছাপিয়ে ওঠে সুন্দরের বাণী।

বরং এখন আমাদের সামনে আছে "চিত্রা" ন'টী দৃশ্যের এক রূপকথার

নাটক। এর মধ্যে কি চূড়ান্ত বিচারের মত দেওয়ার মতো কোন ইংগিত আছে? রবীন্দ্রোচ্ছ্বাসের অনেক আগে এটা লেখা, ভারতের গ্রামের মানুষদের অভিনয়ের জন্যে।

কাহিনীটা হলো এই ঃ রাজকুমারী চিত্রা, দেহে ও পোষাকে তার পরুষতা হঠাৎ ভালোবাসলো ব্রহ্মচারী অর্জুনকে, তাকে জয় করার জন্যে সে দেবতার কাছে বর চাইলো নারীর রূপলাবণ্য। দেবানুগ্রহে লাভ করলো সে মাত্র এক বছরের জন্যে। বর্ষকাল শেষ হয়ে এলো। চিত্রা অর্জুনকে জানালো যে দেহ সুষমাকে সে ভালোবেসেছে সেটা শুধু মায়া। কারণ রাজনন্দিনী চিত্রা কুরূপা। অর্জুন বলেছিল প্রত্যুত্তরে "প্রিয়তমে আমার জীবন পূর্ণ হয়ে উঠেছে," তার মন ফিরে এলো মায়া থেকে বাস্তবের রূঢ়তায়। সমস্ত কাহিনী ভাষা পেয়েছে নিখুঁত নৈপুণ্যে আর সুষমায়। পুষ্পের কোমলতায় ভরা এর ঘটনাগুলি, যার বাক্য-বিন্যাসে বিচ্ছুরিত হয়েছে তার সৌরভ। কিন্তু এর "গভীরে আরো কিছু" আছে, যার জন্যে ফুটে ওঠে পূজার্থীর আকুলতা। রূপক এখানে চলেছে চুপিসারে সবার পিছনে। কিন্তু তার এ চলা সব সময়ে অনার্য সুলভ নয়। পার্থিব আর অপার্থিবের মধ্যে যে বিরোধ যে বিরোধ ফুটে ওঠে সম্ভোগ আর কাজের মধ্যে, দাম্পত্য-জীবনের যে সুখ, থাকে যদিও কেবল মাত্র লাভ করা যায় রূপ আর যৌবনের সীমানায়, তারা জানে কেমন করে বাঁচতে হয় এদেরও অবসানে—চিত্রার জীবনে মূর্ত হয়েছে এই তিন ছবি ক্রমান্বয়ে একের পর এক। প্রতীকতায় এই নাটকের যে কোন ক্ষতিই হয় নি তা সত্যি। রূপক চুপিসারে চলে যতোটা খুসী নিজের পঙ্গুতাকে প্রকট করতে পারে, রবীন্দ্রনাথে তাদের প্রকাশ সব সময়েই সেই ধাঁচের। যুঁই ফুলের কুঞ্জ থেকে অর্দ্ধস্ফুট কানাকানির শব্দই পাঠকের আনন্দকে বাড়িয়ে দেয়। সেই রূপককে যদি কেউ টেনে নিয়ে আসে তার অবকাশের আবাস থেকে এবং ঘোষণা করতে চায় যে এদেরও প্রয়োজন আছে, তাতে পরিবেশটাই হয়ে ওঠে বর্বরোচিত, সেখানে লেখকের সম্মান বাড়ে না। রবীন্দ্রনাথ কবি, তাই অন্য কোন কবির মতোই, তাঁর প্রয়োজন হয় এমন এক বনিয়াদ গঠনের যেখানে সুন্দরের অভিব্যক্তি হবে স্বপ্রকাশ এবং তিনি ভারতীয় কবি বলেই তাঁর সমধর্মী ইংরেজ কবিকুলের চেয়ে অতি সহজেই তাঁর উপজীব্য খুঁজে নেন সাধারণ ধারণার সীমানায়। এটাই হলো শেষ কথা। তিনি দ্রষ্টা নন,

ভাবুক নন। নীট্‌শে হুইটম্যান, বা অন্য কেউ যাঁদের সংগে তাঁর সাদৃশ্য মাঝে মাঝে চোখে পড়ে, তিনি তাঁদের সমগোত্রীয় নন। "চিত্রা" পড়ে এ ছাড়া অন্য কোন মত দেওয়া বোধহয় সম্ভব নয়।

কবিতাও তাঁর কঠিন দুর্বোধ্য নয়। এতে বিরাটত্বের ইঙ্গিত থাকলেও পাঠকের ভাব লোকে যাত্রা হয় শান্ত, সে পৌঁছে যায় এমন কোন স্থানে আনন্দ কুঞ্জে যেখানে সব কিছুই সুন্দর, সুষম ও শ্রদ্ধাশীল এবং আন্তরিকতার বাতাসেও তার ভেসে আসে চম্পক সৌরভ। এই আনন্দ কুঞ্জে মানুষের আনাগোনা পুষ্পের মতো ভারহীন। তারা সংযতবাক। যেমন :

"I felt like a flower, which has but a few fleeting hours to listen to all the humming flatteries of the woodlands, and then must lower its eyes from the sky, bend its head, and at a breath give itself up to the dust without a cry, thus ending the short story of a perfect moment that has neither past nor future."১

এ কুঞ্জের আবাসিকরা নম্র, যুক্তিআগ্রহী। নিজেদের সম্পর্কে তাদের সুউচ্চ দাবী নেই, নেই অপরের ঔদ্ধত্যে বা শ্রেষ্ঠত্বে কোন সমালোচনা।

"Take to your home what is abiding and strong, Leave the little wild flower where it was born ; leave it beautifully to die at the day's end among all fading blossoms and decaying leaves. Do not take it to your palace hall to fling it on the stony floor which knows no pity for things that fade and are forgotten."২

হয়তো এই অপূর্ব বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের নিজেরই কথা। ঋষিত্বের কোন দাবী যদি তাঁর থেকেও থাকে, তবু তার সঙ্গে তাঁর ভক্তদের কোন সাদৃশ্য নেই। তিনি জানেন কেমন করে শুনতে হয়, সেই জানাকে লণ্ডনের এই কোলাহল উত্যক্ত করতে পারে, কিন্তু বিভ্রান্ত করতে পারে না।

১। যেন আমি ধরাতলে
একদিন উঠেছি ফুটিয়া, অরণ্যের
পিতৃ-মাতৃহীন ফুল ; শুধু এক বেলা
পরমায়ু, তারি মাঝে শুনে নিতে হবে
ভ্রমর গুঞ্জন নীতি, বন্ বনান্তের
আনন্দ মর্মর ; পরে নীলাম্বর হতে
ধীরে নামাইয়া আঁখি, নুমাইয়া গ্রীবা,
টুটিয়া লুটিয়া যাব বায়ু স্পর্শ ভরে
ক্রন্দন বিহীন, মাঝখানে ফুরাইবে
কুসুম কাহিনীখানি আদি অন্ত হারা।

২। ···বোলো না গৃহের কথা।
গৃহ চির বরষের ; নিত্য যাহা তাই
গৃহে নিয়ে যেয়ো। অরণ্যের ফুল যবে
শুকাইবে, গৃহে কোথা ফেলে দিবে তারে।
অনাদরে পাষাণের মাঝে ? তার চেয়ে
অরণ্যের অন্তঃপুরে নিত্য নিত্য যেথা
মরিছে অঙ্কুর, পড়েছি পল্লবরাশি···
···দিনান্তে আমার খেলা
সাঙ্গ হলে ঝরিব সেথায়।

প্রবন্ধ পত্রিকা

ঃ শ্রাবণ সংখ্যার সম্ভাব্য সূচী ঃ

॥ দর্শন ॥

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ঃ মার্কস্‌বাদ—তত্ত্ব ও প্রয়োগ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং

॥ সাহিত্য ॥

সুধাংশু ঘোষ ঃ গ্রেহাম গ্রীণের সাম্প্রতিক উপন্যাস

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ নতুন দৃষ্টিতে হেমিংওয়ে

॥ পুনর্মুদ্রণ ॥

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ঃ দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ

॥ গ্রন্থপ্রসঙ্গ ॥

মৃণাল ভদ্র ঃ রবীন্দ্রনাথ

॥ বিজ্ঞান ॥

হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঃ প্রাচীন ভারতের রসায়ন

॥ অর্থনীতি ॥

হীরেন দত্ত ঃ ইয়োরোপীয় 'কমন মার্কেট'

॥ প্রতি সংখ্যা একটাকা ॥

শ্রাবণ

LIBRARY
UNIVERSITY

প্রবন্ধ পত্রিকা

১৩৬৮, শ্রাবণ (১৮৮৩ শকাব্দ)
দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

সূচীপত্র

প্রফুল্লচন্দ্র রায়	১—২	অপ্রকাশিত পত্র
প্রফুল্লচন্দ্র রায়	৩—১১	প্রাচীন হিন্দুদিগের রসায়ন-শাস্ত্র-জ্ঞান
ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ	২১—১৬	আচার্য স্মৃতি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭—১৮	অভিনন্দন
মহম্মদ শহীদুল্লাহ	১৯—২৩	পুণ্যস্মৃতি
প্রফুল্লচন্দ্র রায়	২৪—২৮	রবীন্দ্রনাথ
হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	২৯—৫৭	প্রাচীন ভারতীয় রসায়ন :
সুধাংশু ঘোষ	৫৮—৬৪	গ্রেহাম গ্রীণের সাম্প্রতিক উপন্যাস
	৯৭—৯৮	
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৬৫—৮৩	মার্কসবাদে তত্ত্ব ও প্রয়োগ
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৪—৯০	মনোবিদ ইয়ুং
মৃণালকান্তি ভদ্র	৯১—৯৪	রবীন্দ্র-আলোচনা
জগন্নাথ গুপ্ত	৯৫—৯৬	সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ-পরিচয়
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়	৯৯—১১১	'নৈবেদ্য'

সম্পাদক

রামেন্দু দত্ত চিত্তরঞ্জন ঘোষ

প্রবন্ধ পত্রিকা

শারদীয়া সংখ্যা সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হবে

॥ সম্ভাব্য সূচী ॥

॥ পত্র ॥

রাজশেখর বসু : অপ্রকাশিত পত্র

(বাংলা বানান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে এই পত্রে)

॥ সাহিত্য ॥

যদুনাথ সরকার : রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প

হরপ্রসাদ মিত্র : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

রথীন্দ্রনাথ রায় : রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনা

কৃষ্ণ ধর : রবীন্দ্রনাথ—পশ্চিমের জানালায়

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত : ইংরাজী একাংক

তরুণ সান্যাল : জীবনানন্দের শেষ বই

এবং

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দেবীপদ ভট্টাচার্য

॥ দর্শন ॥

মৃণালকান্তি ভদ্র : জাঁ-পল সার্ত্র—অস্তিবাদ ও স্বাধীনতা

॥ চিত্র ॥

উইলিয়ম আর্চার : রবীন্দ্রনাথের ছবি

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় : কালীঘাটের পট

॥ শিক্ষা ॥

গৌতম চট্টোপাধ্যায় : শিক্ষা-প্রসঙ্গ

॥ লোক-সংস্কৃতি ॥

ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : বাঙ্গালী সংস্কৃতি

॥ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ॥

বাসব সরকার : নিরপেক্ষতার রাজনীতি

॥ সঙ্গীত ॥

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ : সঙ্গীত প্রসঙ্গ

এজেন্টদের এখনই অর্ডার দিতে অনুরোধ জানান হচ্ছে

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বার টাকা। যান্মাসিক ছয় টাকা।

শারদীয় সংখ্যা—দুই টাকা

কার্যালয় : ২০, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৫ ঃঃ ফোন—৫৫-৪৪২৫

অপ্রকাশিত পত্র

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

(১)

[শ্রীযুক্তা সতী ঘোষকে লিখিত.]

Memo 22/7

সেদিন বিনা নোটিশে অর্থাৎ Surprise Visit দিয়া তোমার ওখানে ৬টা লেবু আর দুই রকম গজা ও কুলের চাট্‌নী লইয়া আসিয়াছিলাম। আর Notice দিয়া গেলে না জানি কত কি পাইতাম। আজ এক বোতল চাট্‌নি পাঠাইতেছি। ইহা আমাকে একজন উপহার দিয়াছিল। কিন্তু আমার কুলের চাট্‌নীই ভাল লাগে। আশা করি তোমাদের নিকট ইহার কদর হইবে।

শ্রীপ্রঃ

(২)

[শ্রীযুক্তা সতী ঘোষকে লিখিত]

Calcutta
28/11/40

Dr. B. N. Ghosh being of very shy disposition has puzzled many as to how he won his bride ! The explanation lies below :

"In Be'l | mont is' | a la' | dy rich' | ly left ;
And she' | is fai'r, | and, fai'r | er, that than wo'rd.
Of wo'nd | rous vi'r | tues: S o'me | times fro'm | her ey'es
I di'd | rceei've | fair spee'ch | less me's | sage's."

I. 1. 161-164
Merchant of Venice.

লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা ডঃ শ্রীসতী ঘোষের সৌজন্যে পত্র দুটি প্রাপ্ত। দ্বিতীয় পত্রে উল্লিখিত ডাঃ বি, এন, ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পালিত অধ্যাপক ও ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীযুক্তা সতী ঘোষের স্বামী। ছন্দোলিপি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কৃত।

Calcutta
28/11/40

Dr. B. N. Ghosh. being of very shy disposition has puzzled many as to how he won his bride? The explanation lies below:

In Bél/mont ís/ a lá/dy rích/ly léft;
And shé/ is fáir,/ and, fáir/er thán/ that wórd,
Of wónd/rous vír/tues: sóme/times from/ her éyes
I díd/ receíve/ fair spéech/less més/sages"

(I. 1. 161–164)
merchant of venice

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের হস্তলিপি

পুনর্মুদ্রণ

প্রাচীন হিন্দুদিগের রসায়ন-শাস্ত্র-জ্ঞান

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

[Indian Chemical Societyর সভাপতি কর্তৃক কাশী হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়-গৃহে প্রদত্ত প্রথমানুষ্ঠিক অভিভাষণের সারাংশ। প্রফুল্লকুমার বসু এম্, এস্-সি কর্তৃক অনূদিত।]

বেল্‌জিয়মনিবাসী গব্‌লেট্ ডি' আলভিয়ালা (Goblet d' Alviella) নামক একজন বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ যথার্থই বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ এক বৈচিত্র্যময় দেশ। এখানকার প্রাচীন কীর্ত্তি ও শিল্প আমাদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত ও মুগ্ধ করে। ভারতের সাহিত্য ও অতুলনীয় নাটকাবলী, উপনিষদ্ ও গীতার গভীর ও মহান্ দার্শনিক তত্ত্বগুলি অনেক দিন পূর্বেই পাশ্চাত্ত্য জগতের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। এই ভারতবর্ষেই পাটি-গণিত, বীজগণিত প্রভৃতি অঙ্ক শাস্ত্রের জন্ম হইয়াছে। সাধারণ লোকের ধারণা যে, সংখ্যা-লিখনপ্রণালী আরবদিগের সৃষ্টি; কিন্তু বস্তুতঃ ইহা হিন্দু-মস্তিষ্ক-প্রসূত। মোক্ষমূলর বলেন, যদি ভারতবর্ষ য়ুরোপকে সংখ্যা-বিজ্ঞান দান করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত, তবে ভারতবর্ষের নিকট য়ুরোপের ঋণ অপরিশোধনীয় হইত।১

১ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিজ্ঞ সংস্কৃতাধ্যাপক বলিয়াছেন, "বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখিলেও ভারতের নিকট য়ুরোপের ঋণ যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ যে সংখ্যা-শাস্ত্র এখন সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা ভারতীয়রা আবিষ্কার করেন। এই-সংখ্যা-বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া যে দশমিক প্রণালীর উদ্ভব হয়, তাহা অঙ্কশাস্ত্র ও মানব-সভ্যতাকে উন্নতির পথে অনেক দূর টানিয়া লইয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে

প্রাচীন আসিরিয়া, ব্যাবিলন, মিশর প্রভৃতি দেশসমূহ তাহাদের স্মৃতি-স্তম্ভ এবং পাথর বা অগ্নিদগ্ধ মাটীর ফলকের উপর ক্ষোদাই করা চিত্র-লিপির ভিতর আজিও অমর হইয়া আছে। সাহিত্য ও দর্শনের ভিতর প্রাচীন রোম ও গ্রীসের প্রাণের স্পন্দন আজও পাওয়া যায়, কিন্তু, গৌতম বুদ্ধের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এই দুই হাজার পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে হিন্দুজাতির যৎসামান্য পরিবর্তন হইয়াছে।

শাক্য মুনি বুঝিয়াছিলেন যে, যদি কোন প্রকারে হিন্দুধর্ম্মের দুর্গ-প্রাকার একবার ধ্বংস করিতে পারেন, তবে সমগ্র ভারত তাঁহার নব মতাবলম্বী হইবে। অবশ্য এক সময়ে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য যে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সারনাথের প্রত্নতত্ত্ব অনুশীলন করিলে সহজেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষণশীলতা এত অদ্ভুত যে, দূরদর্শী ও বিচক্ষণ পর্য্যটক পিয়ার লোতি (Pierre Loti) পর্য্যন্ত বিস্ময়াভিভূত হইয়াছেন। আজকাল কোন পাশ্চাত্য পরিদর্শক আনুষ্ঠানিক হিন্দুদিগের গঙ্গাস্নান ও নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদি অবলোকন করিলে সহজেই অনুমান করিবেন যে, পাশ্চাত্য জাতির সংঘর্ষে আসিয়া হিন্দুদিগের কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। দুই হাজার পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্বপুরুষরা যে ভাবে জীবন-যাপন করিতেন, হিন্দুরা আজও ঠিক সেই ভাবেই তাহাদের দিন অতিবাহিত করিতেছে। কবি সত্য সত্যই বলিয়াছেন :—

> "The East bowed low before the blast
> Impatient, deep disdain,
> She let the legions thunder past
> And plunged in thought again."

হিন্দুরা অতিশয় চিন্তাশীল সত্য—মনোবিজ্ঞানের দুর্ব্বোধ্য সূক্ষ্ম মীমাংসাগুলি লইয়া ব্যস্ত, তথাপি প্রাচীন ভারতে জড়-বিজ্ঞান-চর্চ্চার অভাব ছিল না। বৈশেশিকদর্শনে পরমাণুবাদ সর্বজনবিদিত গ্রীক্ দার্শনিক আনাক্সাগোরাস্ (Anaxagoras) ও এম্‌পেদোক্লীস (Empedocles) প্রভৃতির

ভারতবাসীরা আরবদিগকে অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন—পরে আরবগণই এই বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহের শিক্ষক হয়। সুতরাং যদিও সংখ্যাশাস্ত্রের সহিত আরবদিগের নাম বিজড়িত—প্রকৃতপক্ষে ইহা ভারতবর্ষের দান।"—
Macdonnell's History of Sanskrit Literature, p 434.

বহু পূর্বে ইহার সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিবার মত সময় নাই। রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেও হিন্দুদিগের যে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণমূলক কার্যের প্রয়োজনীয়তা যে তাঁহার সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গে আজ কিছু বলিব। রসেন্দ্র-চিন্তামণি নামক প্রামাণিক গ্রন্থের রচয়িতা চুণ্ডক-নাথ অথবা রামচন্দ্র বলিয়াছেন—

অশ্রৌষং বহুবিদুষাং মুখাদপশ্যং
শাস্ত্রেষু স্থিতমকৃতং ন তল্লিখামি।
যৎ কর্ম ব্যরচয়মগ্রতো গুরূণাং
প্রৌঢ়াণাং..... ॥
অধ্যাপয়ন্তি যদি দর্শয়িতুং ক্ষমন্তে
সুতেন্দ্র কর্মগুরবো গুরবস্ত এব।
শিষ্যাস্তু এব রচয়ন্তি গুরোঃ পুরো যে
তেষাং পুনস্তদভয়াভিনয়ং ভজন্তে ॥

অর্থাৎ যাঁহারা শিক্ষণীয় বিষয়গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখাইতে পারেন, তাঁহারই প্রকৃত আচার্য। যে সমস্ত শিষ্য এই সকল পরীক্ষা-পদ্ধতি শিক্ষা করিয়া তাহা পুনরায় সুসাধন করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত শিষ্য—ইহা ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্র অভিনেতা মাত্র।

চুণ্ডকনাথ আবার রসার্ণব নামক প্রামাণিক গ্রন্থের নিকট ঋণী। এই পুস্তকে ঊর্ধ্বপাতন ও তির্যকপাতন-প্রণালী এবং তদুপযুক্ত যন্ত্রাদির বিশদ্ বিবরণ আছে। সুদক্ষ রাসায়নিক নাগার্জুন এই সমস্ত প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতীয় রাসায়নিকেরা সকলেই এই জন্য ইহাকে বিলক্ষণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। ১ নাগার্জুন-সম্পাদিত পারদ বিশুদ্ধ করিবার একটি উপায় বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

মিশ্রিতৌ চেতগে ন্যগবঙ্গৌ বিক্রয়হেতুনা।
তাভ্যাং স্যাৎ কৃত্রিমো দোষস্তন্মুক্তিঃ পাতনত্রয়াৎ ॥

অর্থাৎ অসাধু ব্যবসায়ীরা পারদের সহিত সীসা ও রাং মিশ্রিত করে; ক্রমান্বয়ে তিনবার তির্যক্পাতন করিলে এই বিজাতীয় ধাতুগুলি বিদূরিত হয়।

---

১ তির্যক্পাতনমিত্যুক্তং সিদ্ধৈর্নাগার্জুনাদিভিঃ ॥
ইতি রসেন্দ্রচিন্তামণিঃ।

ধাতু দগ্ধ করিয়ার সময় অগ্নিশিখার বর্ণ দেখিয়া ধাতু সনাক্ত করিবার পদ্ধতি রসার্ণবে বিবৃত আছে। তাম্র নীলবর্ণ, রাং ধূম্রবর্ণ এবং সীসা প্রায় বর্ণহীন অগ্নিশিখা সৃষ্টি করে। এত পূর্ববর্তী সময়ে ধাতু পরীক্ষা করিবার এইরূপ সুন্দর ও সহজ পদ্ধতি অন্যদেশে জানা ছিল না।২

ধাতুনিষ্কাশন-বিদ্যায় হিন্দুদিগের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা যথেষ্ট বেশী ছিল। দিল্লীর কুতবমিনারের নিকট লৌহস্তম্ভই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।৩

প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থাদিতে সুবর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, সীসক ও রাং (tin) এই ছয়টি ধাতুর উল্লেখ দেখা যায়। য়ুরোপের ইতিহাসে পারাসেল্‌সাসের গ্রন্থে (১৪ অঃ—১৫৪১ খৃঃ অঃ) একটি সপ্তম ধাতুর সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখা যায়। ইহাকে তিনি "zincken" নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং উহাকে অবিশুদ্ধ বা কৃত্রিম ধাতু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে আর বেশী কিছু জানিবার উপায় নাই।

---

২ কার্‌দাঁ (খৃঃ অঃ ১৫০১-১৫৭৬) সর্বপ্রথমে লক্ষ্য করেন যে, ধাতু-ভেদে আলোক-শিখার বর্ণ বিভিন্ন হয়। Hoefer—Histoire de Chimie Ed. 1869 Vol. 11. p. 95.

৩ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এই স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করিলে (এই অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হয়) আমরা এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার উপলব্ধি করি, হিন্দুরা এই যুগে এত বড় লৌহখণ্ড ঢালাই করিয়াছেন, যাহা য়ুরোপে কয়েক বৎসর পূর্বেও সম্ভব হয় নাই। কয়েক শতাব্দী পরেও কনারকের মন্দির নির্মাণে বড় বড় লৌহদণ্ড ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, হিন্দুরা লৌহের ব্যবহার সম্বন্ধে পরবর্তী কাল অপেক্ষা এই সময়েই অধিকতর পারদর্শী ছিলেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চৌদ্দ শত বৎসর ধরিয়া বাতাস ও জল লাগিয়াও ঐ স্তম্ভের উপর মরিচা পড়ে নাই, স্তম্ভগাত্রের লিপিগুলি আজও নূতন ক্ষোদিত বলিয়া মনে হয়।

এই স্তম্ভটি যে বিশুদ্ধ লৌহ দ্বারা নির্মিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। Genl Cunningham ডাঃ মারে দ্বারা এক টুক্‌রা বিশ্লেষণ করাইয়াছিলেন এবং অন্য এক টুক্‌রা স্থানীয় School of Minesএ ডাঃ পার্‌সি পরীক্ষা করিয়াছেন। উভয়েরই মতে ইহা বিশুদ্ধ ও নমনীয় লৌহ-গঠিত।—Fergusson's History of Indian and Eastern Architecture Ed. 1899, p. 508.

লাইবেভিয়স্ সর্বপ্রথমে দস্তার স্বাভাবিক ধর্মের অনেক নির্ভুল বর্ণনা করেন। ইহা সে রসক (Calamine) নামক খনিজ পদার্থ হইতে পাওয়া যায়, তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি লিখিয়াছেন যে, Calaim নামে একপ্রকার রাং (tin) ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইহা ডাচ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মারফত হল্যাণ্ডে যায় এবং তাঁহার হস্তগত হয়।

রসক হইতে দস্তা নিষ্কাশন করিবার বিবরণগুলি রসর্ণব এবং রসরত্নসমুচ্চয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত আছে। রসকের সহিত হরিদ্রা, লবণ, রজন, ভূষা ও সোহাগা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া মুচির ভিতর আবদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুকাইবে। একটি সচ্ছিদ্র শরা দ্বারা মুচির মুখ আবৃত করিবে। একটি হাঁড়ি মাটীর ভিতর প্রোথিত করিয়া তাহার অর্দ্ধেক জলে পূর্ণ করিবে। তৎপরে ঐ মুচিটি উল্টাভাবে হাঁড়ির উপর সংস্থাপিত করিয়া কয়লার আগুনে জোরে পোড়াইবে। দস্তা (জগদ) বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া শীতল জলের সংস্পর্শে আসিলে রঙ্গের (রাং) ন্যায় আভাযুক্ত হইয়া জমিয়া যাইবে। যখন জ্বালার (অগ্নিশিখা) বর্ণ নীল হইতে সাদা হইবে, তখন উত্তাপ বন্ধ করিতে হইবে। *

দস্তা-নিষ্কাশন করিবার এই বিশদ্ বিবরণটি আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রের যে কোন পাঠ্য পুস্তকের ভিতর অবিকল উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ইহা অন্তর্ধূম-বিপাচন-প্রণালীবিশেষ। ধাতু-নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় প্রায়ই এক প্রকার নীলাভ অগ্নিশিখা-দেখা যায়; কার্বন্ মনক্সাইড্ পুড়িলে এইরূপ হইয়া থাকে। অবশ্য প্রাচীন হিন্দুরা জানিতেন না যে, কার্বন্ মনক্সাইড হইতে এই নীল

---

* হরিদ্রাত্রিফলারালসিন্ধুভূমৈঃ সটঙ্কণৈঃ।
সারদ্রুকৈরশ্চ পাদাংশৈঃ সাম্লৈঃ সম্মর্দ্য খর্পরম্ ॥
লিপ্তং বৃন্তাকমূষায়াং শোষয়িত্বা নিরুধ্য চ।
মূষাং মূষোপরি ন্যস্তখর্পরং প্রথমেত্ততঃ॥
খর্পরে প্রহ্বতে জ্বালা ভবেন্নীলা সিতা যদি।
তদা সন্দংশতো মূষাং ধৃত্বা কৃত্বা ত্বধোমুখীম্।
শনৈরাস্ফালয়েদ্ভূমৌ যথা নালং ন ভজ্যতে।
রঙ্গাভং পতিতং সত্বং সমাদায় নিয়োজয়েৎ ॥

—ইতি রসরত্নসমুচ্চয়।

অগ্নিশিখার উৎপত্তি হয়, কিন্তু তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি যে কত বেশী ছিল, ইহা হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়।

প্রাচীন হিন্দুরা যবক্ষার১ (potassium carbonate) ও সর্জ্জিকাক্ষারের (sodium carbonate) মধ্যে পার্থক্য কি তাহা জানিতেন। হিন্দুদিগের প্রাচীন গ্রন্থ সুশ্রুত-সংহিতায় ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। চরক-সংহিতা ও সুশ্রুত-সংহিতা আয়ুর্ব্বেদ-সম্বন্ধীয় দুইখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। চরক-সংহিতায় প্রধানতঃ কায়-চিকিৎসা এবং সুশ্রুতা-সংহিতায় অস্ত্রচিকিৎসার কথা বিবৃত আছে। সুশ্রুত-সংহিতায় দুই প্রকার ক্ষারের উল্লেখ দেখা যায়, তীক্ষ্ণক্ষার ও মৃদুক্ষার। বাল্যকালে দেখিয়াছি, কলাগাছের ছাই দ্বারা ধোপারা কাপড় পরিষ্কার করিত। ইহার কারণ এই যে, উহাতে যথেষ্ট যবক্ষার বিদ্যমান। সুশ্রুত-সংহিতায় অনেক স্থলজ উদ্ভিদের উল্লেখ আছে, উদয়চন্দ্র দত্তের ভৈষজ্যতত্ত্বে (Materia Medica of the Hindus) এই সব উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়াছে। সুশ্রুত বলেন, "শুভদিনে কলাগাছ প্রভৃতি পোড়াইবে, পরে ঐ ছাই লৌহপাত্রে জল দ্বারা সিদ্ধ করিবে এবং তৎপরে বহু ভাঁজযুক্ত কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে।"

এইরূপে মৃদুক্ষার পাওয়া যায়। আপনারা সকলেই জানেন, কি কি রাসায়নিক পরিবর্ত্তন এই প্রক্রিয়াতে সংঘটিত হয়। ইহার পর তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুত প্রণালী আছে। ইহা খাঁটি বিজ্ঞানসম্মত। "নানা প্রকার ঘুটিং পাথর ও ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া উত্তমরূপে পোড়াইবে এবং পরে তাহাতে জল দিবে। পরে এই চূর্ণের সহিত মৃদুক্ষারের জল মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করিবে এবং লৌহ-হাতা দ্বারা আলোড়িত করিবে।"

ষোড়শ কি সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে য়ুরোপের ইতিহাসে এরূপ বিবরণ পাওয়া যায় না। এই তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুত প্রণালী যে কোন আধুনিক পাঠ্য-পুস্তকের ভিতর আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ঐ গ্রন্থে আরও লিখিত আছে যে, লৌহপাত্রে মুখ বন্ধ করিয়া এই ক্ষার রাখিতে হইবে।

১ বড়ই আক্ষেপের বিষয়, পরলোকগত অক্ষয়কুমার দত্ত ভুলক্রমে সোরাকে যবক্ষার অভিহিত করিয়াছেন এবং তদনুসারে নাইট্রোজেন নামক গ্যাস যবক্ষারজান নামে তখনও বাঙ্গালা-সাহিত্যে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে যবক্ষার যব+ক্ষার; প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদে যবের পাকা শীষ দগ্ধ করিয়া ঐ ক্ষার প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে।

আয়সে কুম্ভে সংবৃতমুখং নিদধ্যাৎ।

সুশ্রুত অবশ্য জানিতেন না যে, কার্বন্ ডাইঅক্সাইড্ যাহাতে তীক্ষ্ণ-ক্ষারের সংস্পর্শে না আইসে, তাহা লক্ষ্য রাখা দরকার, কিন্তু সেই যুগের বৈদ্যরা ভূয়োদর্শন দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন যে এরূপ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে ক্ষারের তীক্ষ্ণতা বিনষ্ট হয়। আজকাল আমরা রজত-পাত্রে বা লৌহপাত্রে তীক্ষ্ণক্ষার রাখিয়া থাকি। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে, সুশ্রুত শুধু ক্ষারের প্রস্তুত ও রক্ষাপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, পরন্তু তীক্ষ্ণক্ষার ও মৃদুক্ষারে পার্থক্য স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

ডেভি সর্ব্বপ্রথমে এই তীক্ষ্ণক্ষার হইতে পোটাশিয়ম্ ধাতু আবিষ্কার করেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রাচীন রাসায়নিকেরা যবক্ষার ও সর্জ্জিকাক্ষারের প্রভেদ জানিতেন না। কিন্তু ইহা ভুল; আয়ুর্ব্বেদে এই উভয় বস্তুর পার্থক্য অতি সুন্দরভাবে বিবৃত আছে।

সুশ্রুত ও জোসেফ্ ব্ল্যাকের মধ্যে দুই হাজার বৎসর ব্যবধান। ব্ল্যাক্ এডিন্‌বরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. ডি, ছিলেন। তাঁহার Doctorateএর প্রবন্ধে (১৭৫৫ খৃং অব্দ) তিনি সর্ব্বপ্রথমে তীক্ষ্ণ ও মৃদুক্ষারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি দেখাইলেন, ম্যাগ্‌নেশিয়ম্ কার্বনেট্ অগ্নিতে অধিক উত্তপ্ত করিলে উহার ওজন কমিয়া যায় এবং উহা হইতে এক প্রকার বায়ু নির্গত হয়। এই বায়ুকে তিনি "fixed air" বা আবদ্ধ বায়ু [১] নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্ল্যাক্ তাঁহার পরীক্ষায় তুলাদণ্ড ব্যবহার করিয়াছিলেন। সার উইলিয়ম রাম্‌সে তাঁহার কৃত Life of Black নামক গ্রন্থে বলিতেছেন—"ঘুটিঃ পাথরকে অগ্নিতে পোড়াইলে চূণ হয় এবং সেই জন্য চূণ তীক্ষ্ণতা বা দাহিকাশক্তি লাভ করে।" ব্ল্যাকের প্রবন্ধ বৈজ্ঞানিক জগতে এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করে।

মসিয়ে বারথেলো'র অনুপ্রেরণায় আমি হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসে (History of Hindu Chemistry) রচনায় প্রবৃত্ত হই। ইনি আমার গ্রন্থ-সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, "হিন্দুরা সম্ভবতঃ এই রাসায়নিক প্রণালীটি পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে শিখিয়াছে" (Journal des Savants, Jan, 1903' pp 34); কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য আছে। চক্রপাণি

১) লেখক-কৃত "নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি" (সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী নঃ ১৯) ৪২-৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গৌড়ের রাজা নরপালের (১০৫০ খৃঃ অঃ) রাজবৈদ্য ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থে তিনি এই প্রক্রিয়াটি অবিকলসুশ্রুত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাগ্‌ভট্‌কৃত একখানি আরও পুরাতন পুস্তকেও (অষ্টাঙ্গহৃদয়) ঐরূপ লিখিত আছে।

"মিলন্দা পাঞ্‌হো" নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে আমি একটি সুন্দর অংশ লক্ষ্য করিয়াছি। এই গ্রন্থ অনুমান খৃঃ পূঃ ১৪০ সালে রচিত। অধ্যাপক রিস্‌ ডেভিস্‌ নিম্নলিখিতভাবে অনুবাদ করিয়াছেন; "যখন প্রদাহ কমিয়াছে এবং ক্ষতস্থান শুষ্কপ্রায় হইয়াছে, তখন যদি কেহ ছুরিকা দ্বারা ঐ স্থান বিদ্ধ করে এবং তীক্ষ্ণক্ষার দ্বারা পোড়াইয়া দেয় এবং তাহার পর ক্ষার-জল দ্বারা ধৌত করিবার ব্যবস্থা করে.....হে রাজন্‌, আপনি বলুন বৈদ্য যদি এইরূপে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া তীক্ষ্ণক্ষার দ্বারা পোড়াইয়া দেয়, তবে তাহা কি নির্দ্দয়তার পরিচায়ক হইবে না?"[১]

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ব্ল্যাক্‌ স্বাধীনভাবেই প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, মৃদুক্ষারের মধ্যে কার্‌বন ডাইঅক্সাইড্‌ আছে সুশ্রুত এ সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করিতে পারেন নাই।

হিন্দু ভৈষজ্যতত্ত্বে পুরাকাল হইতে ধাতব পদার্থাদির ব্যবহারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, য়ুরোপে পারা-সেল্‌সাস্‌ সর্ব্ব-প্রথমে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ধাতব ঔষধাদির ব্যবহার প্রচলন করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে বৃন্দ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে কি তাহারও পূর্ব্বে ঔষধরূপে কজ্জলীর ব্যবস্থা করেন। কজ্জলী তৈয়ারী করিবার বিস্তৃত বিবরণ চক্রপাণি তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। য়ুরোপে কজ্জলী প্রস্তুতপ্রণালী খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কেহ জানিতেন না।

অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। আরবীয়েরা য়ুরোপে যে চিকিৎসা-বিদ্যার পরিবর্ত্তন করেন, তাহা হিন্দুদিগের নিকট হইতে গৃহীত। Ex Oriente Lux অর্থাৎ প্রাচী হইতে প্রতীচীতে আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ হইয়াছে। বিখ্যাত ফরাসী রাসায়নিকের সুসঙ্গত ভাষাতেই আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি,—"য়ুরোপে আবার নবজাগরণের যুগ আগত। ভারতের

---

[১] Sacred Books of the East, Vol, 35 p 168

গভীর জ্ঞান ও গ্রীসের অসাধারণ ধীশক্তির প্রভাবে য়ুরোপের যে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল—দুই হাজার বৎসর পরে য়ুরোপ আবার সেই অবস্থাতেই আসিয়াছে।"১

১ শুল্কৌ সমানৌ রসগন্ধকৌ
সম্মর্দ্দ্য কজ্জলাভন্তু কুর্য্যাৎ পাত্রে দৃঢ়াশ্রয়ে।
রসপর্পটিকা খ্যাতা নিবদ্ধা চক্রপাণিনা ॥

১ First, Faraday, Lecture, Chemical Society of London, June 17, 1869

আচার্য-স্মৃতি

ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ কথিত

চিত্তরঞ্জন ঘোষ অনুলিখিত

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছাত্র ছিলেন। শ্রীঘোষের দাদা ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষও আচার্য রায়ের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। সেই সূত্রে ঘোষ পরিবারের সকলের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা ছিল আচার্য রায়ের। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁর স্মৃতি থেকে বলেছেন নিচের কথাগুলি, এবং অনুলিখন করেছেন চিত্তরঞ্জন ঘোষ। —সম্পাদক]

অনেক দিনের অনেক কথা ছড়িয়ে আছে। কিন্তু গুছিয়ে বলতে গেলে খেই হারিয়ে যায়। এই এখন যা বলছি তাও ঐ রকমই হবে।

আমি হয়তো আচার্যদেবকে তেমন করে জানিও না, যেমন জানতেন আমার দাদা (জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ)। উনি দীর্ঘকাল আচার্যদেবের সান্নিধ্য পেয়েছেন। আমি অতটা পাই নি।

একদম প্রথম কবে ওঁকে দেখলাম তাই ভাবছি। তখন আমি বেশ ছোট। স্কুলে পড়ি—দেশে। গরমের ছুটিতে এসেছি কোলকাতায়—দাদার কাছে। দাদা তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। সালটা ১৯১২। আচার্য ইংলণ্ড ও ইউরোপ পরিভ্রমণ করে ফিরেছেন। সেদিন এসে পৌঁছবেন হাওড়া ষ্টেশনে। দাদা, নীলরতন ধর এঁরা সব গেলেন ষ্টেশনে। আমিও সেই সঙ্গে ভিড়ে গেলাম। আচার্যকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করবার সময় ওঁর ছাত্রদের বিপুল উল্লাস এখনও মনে আছে। শেষে উনি গাড়ীতে উঠলে ছাত্ররা ঘোড়া ছেড়ে নিজেরাই টানতে টানতে ওঁকে নিয়ে এল। মনে আছে, যখন বড়বাজারের মধ্যে দিয়ে আসছি, ওখানকার লোক তাজ্জব। এমন দৃশ্য তারা দেখে নি। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করল 'উনি কে? ওদের ভেতর থেকেই প্রবীণরা বলল, 'ছাত্রবাবুদের রাজা'।

তা রাজাই ছিলেন উনি—ছাত্রদের মধ্যে। ছাত্র-অন্ত প্রাণ ছিল। তাঁর রোজগারের সবই দিয়ে গিয়েছেন ছাত্রদের জন্যে, বিজ্ঞান-সাধনার উন্নতির জন্যে। ছাত্ররা একটু কিছু ভাল করলে শিশুর মত খুশী হতেন, গর্ব বোধ করতেন। মুখেও বলতেন, 'ছাত্রের কাছে পরাজয়ই সব চেয়ে বড় গৌরব।'

গড়ের মাঠে রোজ বিকেলে হাওয়া খেতে যেতেন, বেড়িয়ে এসে বসতেন আফগান-যুদ্ধ-খ্যাত লর্ড রবার্টস্-এর ষ্ট্যাচুর তলায়। ছাত্ররা থাকত সঙ্গে। উপেন সেন, গিরিশ বোস, সত্যানন্দ বোস, সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জি, দেবপ্রসাদ ঘোষ এঁরা সব। দেবপ্রসাদ ঘোষের ছিল দারুণ স্মরণশক্তি। তাই আচার্য ওঁকে বলতেন 'গেজেট'। বলতেন, 'কি হে গেজেট, আজকের কী খবর বল তো।' আটটা সওয়া আটটা নাগাদ ফেরা হোতো।

বাবুগিরি একেবারে দেখতে পারতেন না। কারুর টেরি কাটা দেখলেই চুল নষ্ট করে দিতেন, চুলের মুঠি ধরে টানতেন। জামা-কাপড়ে সৌখীনতার ছাপ দেখলে চটে যেতেন কিল-চাপড় মারতেন, বলতেন, 'বাবু হয়ে কী কাজ হবে! খাটতে হবে।'

খাওয়ার ব্যাপারেও তাই। কাউকে লুচি খেতে দেখলে চটে যেতেন, বলতেন, 'বাবুগিরির কি দরকার। মুড়ি খেতে পারো না?'

তখন বেঙ্গল কেমিকেলের অফিস সার্কুলার রোডে। সায়েন্স্ কলেজের পাশে এখন যেখানে আঁটুলদের দোকান ঐখানে। নীলরতন একদিন ওঁর জন্য আঙুর কিনে নিয়ে এসেছেন। আড়াই টাকা করে সের আড়াই সের। আচার্য তো তা দেখে আগুন।

নিজের জীবনযাত্রা ছিল একেবারে সাধারণ। একটা গাড়ী ছিল—ওটার খরচ বাদ দিলে মাসে ওঁর নিজের খরচ ৭০।৭৫ টাকাও লাগত কিনা সন্দেহ। ছাত্রদের বাবদ অবশ্য একটা খরচ বরাবরই বরাদ্দ ছিল। কিছু ছাত্র সব সময়ই তাঁর কাছে থেকে পড়াশুনো করত।

সকাল নটা সাড়ে নটার সময় লেবরেটরীতে চলে আসতেন। উঁচু একটা টুল ছিল—সেইটেতে বসতেন। লাঞ্চের আগে পর্যন্ত ওখানেই ছাত্রদের কাজের তদারক করতেন। পরিষ্কার কাজ চাইতেন। ছেঁড়া কাগজ কোথাও ছড়ানো থাকবে না, গ্যাস কেউ অন্যমনস্কভাবে খুলে রেখে চলে যেতে পারবে না, কাজের যন্ত্রপাতি এবং যেখানে কাজ করবে তা থাকতে হবে ঝকঝকে।

ওঁর নিজের স্বাস্থ্য একটু খারাপই ছিল। অল্প বয়স থেকেই পেটের ট্রাবল ছিল। সেই জন্য ছাত্রদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর ছিল খুব। সন্ধ্যেয় বেড়িয়ে ফিরে যদি দেখতেন কোন ছাত্র লেবরেটরীতে কাজ করছে বা পড়ছে, তাহলে বকতেন তাদের। বলতেন, 'স্বাস্থ্যটা গেলে আর পড়েশুনে কি হবে! কাল থেকে আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবি।'

কোনো নিমন্ত্রণে গেলে নিজে বিশেষ কিছু খেতেন না। কিন্তু সঙ্গে দিয়ে দিতে চাইলে বলতেন, 'হ্যাঁ, দিয়ে দাও। ছেলেরা খাবে।' ছেলেরা, অর্থাৎ ছাত্ররা। এমন অবশ্য অনেকবার হয়েছে যে খাবার এনে রেখে দিয়েছেন, এবং নানা কাজের ভিড়ে তা ছাত্রদের দিতে ভুলে গেছেন। তারপর সেগুলো আধপচা হয়ে উঠলে মনে পড়েছে, তখন অপ্রস্তুত অবস্থায় সেগুলো বার করে দিয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছেন, 'নে, খা'।

বাচ্ছা ছেলে-মেয়েদের খুব ভালবাসতেন। মাষ্টার বা বাপ-মা কেউ বাচ্ছাদের মারলে ভীষণ ক্ষুব্ধ হতেন। আমার এক ভাইঝির একজন মাষ্টার মশাই ছিলেন—তিনি খুব কড়া। ভাইঝিটি ছিল খুব দুষ্ট—সে মাষ্টারমশাইকে জব্দ করবার জন্য একদিন 'পান-দাদুর কাছে গিয়ে নালিশ করল। আমাদের বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা আচার্যকে 'পান দাদু' বলত; শেষ বয়সে উনি পান ছেঁচে খেতেন। তাই 'পান-ছেঁচা দাদু' আরো ছোট করে 'পান দাদু'।

ভাইঝিটি গিয়ে বলল, 'পান দাদু' আমাদের মাষ্টার মশাই আমাদের মারেন।

'মারে! ছেলেপুলের গায়ে হাত তোলে। এতো আচ্ছা মাষ্টার! আচ্ছা মাষ্টার এলে তুই আমায় একদিন ডেকে দিবি।'

পরে একদিন মাষ্টার মশাই আসতেই খবর চলে গেল 'পান-দাদু'র কাছে। পান-দাদুও দ্রুত এসে হাজির। কিন্তু মাষ্টার মশাইকে দেখে উনি ছাত্র প্রহার সংক্রান্ত ব্যাপারটা ভুলে গেলেন। এই মাষ্টার মশাইটি ছিলেন একটু সৌখিন প্রকৃতির লোক। টেরি কাটতেন সুন্দর করে। জামা কাপড়েও বেশ পরিপাটি ছিলেন। সিল্কের জামা পড়তেন। গন্ধদ্রব্য মাখতেও কার্পণ্য করতেন না। সেই দেখে আচার্য ক্ষেপে গেলেন। তার চুল ঘেঁটে নষ্ট করে চুলের মুটি ধরে খুব এক চোট টানলেন। তারপর কিল চাপড়, ঘুষি, এবং মুখে বকুনি, খুব সৌখীন হয়েছিস! বাবু হয়েছিস। বাবুগিরি করা হচ্ছে। গায়ে খাটতে হবে, বুঝেছিস। আর ছাত্রছাত্রীরা তোর কাছ থেকে কী শিখবে। বাবুগিরি শিখবে যে। ওদের যে বাবু বানিয়েছিস সেটা বুঝতে পারিস না।'

মাষ্টার মশাইকে প্রহার খেতে দেখে তার ছাত্রী বিশেষ খুশী হয়েছিল, শুনেছি, মাষ্টার মশাইও নাকি বিশেষ অখুশী হন নি।

বন্যার সময় দেখেছি তাঁর আর এক চেহারা। শুধু মানবিক দিক থেকে লোকজনের দুর্দশায় অভিভূত নন, কর্মে ও সংগঠনে এক নতুন পরিচয় তিনি আমাদের সামনে রেখেছিলেন। খুব সিষ্টেমেটিক ছিলেন। সব কাজেই। রিলিফের কাজেও বন্যার রিলিফের জন্য সায়েন্স্ কলেজের মাঠে ক্যাম্প হয়েছিল। ওখানে সব চাল, কাপড়, টাকা আসত। সঙ্গে সঙ্গে তা জমা করে লিখে নেওয়া হোতো। তারপর প্রয়োজন অনুসার বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বিতরণ করা হোতো। তারও রেকর্ড থাকত। নিয়মিত এ সব জমা-বিতরণের হিসেব বেরোত।

যে সব বাঙ্গালীরা ব্যবসা বা ইন্ডাষ্ট্রিতে হাত দিত, তারা ওঁর মর্য্যাল সাপোর্ট তো বটেই অন্যান্য সাহায্যও পেত। আলামোহন দাস, নলিনী সরকার এঁদের উৎসাহ দিতেন খুব।

ইন্ডাষ্ট্রির দিকে ঝোঁক ছিল বলে চরকা পছন্দ করতেন না গোড়ায়। পরে গান্ধীজীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে চরকা ব্যাপারটা গ্রহণ করেন। এটিকে উনি নিয়েছিলেন বেকার-পীড়িত ভারতের অবসর-কালীন রোজগারের একটা উপায় হিসেবে। নিজে রোজ চরকা কাটতেন এক ঘণ্টা করে। বাইরে গেলেও চরকা নিয়ে যেতেন—সেখানে এক ঘণ্টা চরকায় সুতো কাটতেন।

'চা-পান না বিষ-পান' বলতেনও, লিখেও গেছেন। কিন্তু নিজে সকালে এক কাপ চা খেতেন। অবশ্য দুধ বেশী দিয়ে নিতেন। এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে বলতেন, 'আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। অন্যে যাতে এই কু-অভ্যাসের হাতে না পড়ে তারই জন্যে বলি'।

বেঙ্গল কেমিক্যাল যখন প্রথম ম্যাগ-সাল্ফ আর যোয়ানের আরক তৈরী করলে, আচার্য স্বয়ং গাড়ী করে জিনিষ পৌঁছে দিতেন বি, কে, পালের দোকানে।

ক্যাপিটাল পঞ্চাশ হাজার হয়ে যাবার পরে কোম্পানীটিকে 'লিমিটেড' করে দেন।

সালফিউরিক অ্যাসিডের লেড্-চেম্বার প্ল্যাণ্ট ওঁরা নিজেরাই প্লান করেছিলেন। পরশুরাম (রাজশেখর বসু) এ ব্যাপারে খুবই সাহায্য করেছিলেন, প্ল্যানে অগ্রণীর ভূমিকা তাঁরই।

আচার্যদেবের ইচ্ছে ছিল বেঙ্গল কেমিক্যালের লভ্যাংশ দিয়ে ওখানেই একটি আধুনিক উন্নত রিসার্চ সেণ্টার করেন। কিন্তু এই ইচ্ছা তাঁর সফল হয় নি। বেঙ্গল কেমিক্যালের ডিরেক্টরদের অনেকের মত হয় নি। এই মতবিরোধ এবং গবেষণা-কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা—শেষ জীবনে তাঁর গভীর দুঃখের কারণ ছিল।

বিজ্ঞান-কলেজের গবেষণা-কেন্দ্র অবশ্য তাঁর দান ও উৎসাহেই এত ভাল করে গড়ে উঠেছে।

শেষ জীবনে খাদি-প্রতিষ্ঠানেও যথেষ্ট দান করে গিয়েছেন।

মারকিউরাস নাইট্রাইট তৈরীর বিশেষ পদ্ধতি তাঁর উদ্ভাবন। অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট তৈরীর ব্যাপারেও উনি স্পেশালাইজ করেছিলেন। অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট তৈরীর সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে যে ও বস্তুটা এক্সপ্লোসিভ্। এই অসুবিধা সত্ত্বেও উনি ওটা তৈরীর বিশেষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। শেষ জীবনে গবেষণা করেছেন প্লাটিনাম নিয়ে—অরগানো-মেটালিক কম্পাউণ্ড নিয়ে।

মুখস্ত বিদ্যা সহ্য করতে পারতেন না। ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানের তৃষ্ণা জাগাতে পারতেন উনি। আগ্রহ জাগাতে পারতেন। ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করতে পারতেন—খুব ইন্‌স্‌পায়ারিং ছিলেন। ছাত্রতৈরীর ক্ষেত্রে ওঁর সাফল্যও খুব। বিজ্ঞানীদের গোটা একটা জেনারেশন তৈরী করে দিয়ে গেছেন। আজ ভারতের প্রায় সর্বত্রই বিজ্ঞান কেন্দ্রে ওঁর ছাত্র।

এই তো। আরো যা স্মৃতি আছে আচার্য সম্পর্কে তা নিতান্তই ব্যক্তিগত। সে থাক।

অভিনন্দন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Uttarayan,
Santiniketan,
Bengal.

[আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সত্তর বছর বয়সের জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কবির এই অভিনন্দন।]

আমরা দুজনে সহযাত্রী।

কালের তরীতে আমরা প্রায় একঘাটে এসে পৌঁছেচি। কর্মের ব্রতেও বিধাতা আমাদের কিছু মিল ঘটিয়েছেন।

আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই, যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন, কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেন নি, নিজেকে দিয়েছেন, সে দানের প্রভাবে সে নিজেকেই পেয়েছে।

বাস্তব জগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন, কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তার গুহাস্থিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি।

সংসারে জ্ঞানতপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়া প্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়।

উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক তিনি বললেন, আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে

সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনও সম্ভবপর হোত না।

এই যে আত্মদানমূলক সৃষ্টিশক্তি এ দৈবীশক্তি। আচার্যের এই শক্তির মহিমা জরাগ্রস্ত হবে না। তরুণের হৃদয়ে হৃদয়ে নব নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির মধ্য দিয়ে তা দূরকালে প্রসারিত হবে। দুঃসাধ্য অধ্যবসায় জয় করবে নব নব জ্ঞানের সম্পদ। আচার্য নিজের জয়কীর্তি নিজে স্থাপন করেছেন উত্তমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর নিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে।

আমরাও তাঁর জয়ধ্বনি করি।

জন্ম-শতবর্ষপূর্তি স্মারকগ্রন্থের সম্পাদকমণ্ডলীর সৌজন্যে।

পুণ্যস্মৃতি

মহম্মদ শহীদুল্লাহ

চার দশক আগেকার কথা। ইংরাজী ১৯১৯ সাল। কলিকাতা মহানগরীর বুকে আপার সারকুলার রোডের এক বিশাল অট্টালিকা। তারই ছোট্ট এক কামরায় বাস করেন শীর্ণকায় এক বৃদ্ধ। মাথার চুলগুলি ছোট ছোট করে ছাঁটা। মুখমণ্ডল কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফে ভর্তি। সাদাসিধে বেশভূষা, তেমনি চেহারা, আর ঠিক তেমনি স্বভাব। বাহ্যিক আড়ম্বর বা জাঁকজমক তাঁর জীবনে কখনও স্থান পায় নি। ঘরের আসবাব পত্র আরও সাধারণ। একখানা ছোট চৌকি (দড়ির খাটিয়া) আর দুটো ছোট ছোট কাঠের আলমারী; তাও একেবারে আজেবাজে কেরোসিন কাঠের তৈরী। বৃদ্ধের জীবন ইতিহাসে বিশ্রাম ও বাবুগিরি বলে কোন কথা লেখা ছিল না। তবুও দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে পাঁচ কি ছ'ঘণ্টা অবসর মিলতো তাও কাটাতে হত দড়ির খাটিয়ায়। কাঠের দুটো আলমারীতে থাকতো সারা সপ্তাহের খোরাক। চিড়ে, মুড়ি, গুড়, নারকেলের সন্দেশ অথবা এমনি ধরণের ঘরে তৈরী একেবারে আটপৌরে কোন খাবার।

সপ্তাহের শেষের দিকে শনি-রবিবারের মধ্যে ডাক বিভাগ ও লোক মারফৎ বর্মা থেকে সুরু করে পাঠান অঞ্চল, নানা জায়গা থেকে খবর এসে যেত। তাছাড়া, অনেক সময় ভারতের বাইরে থেকেও খবর আসতো। যেমন যেমন নানা প্রকার খাবারে ভরে উঠতো ছোট্ট কাটের দুটো আলমারী তেমনি বৃদ্ধের মনও ভরে উঠতো খুশীতে। হা কপাল! রবিবার হলেই—একজোড়া বিরাট গোঁফের অধিকারী—গোঁফ জোড়ার অনুপাতে দেহটাও তেমনি, ইনি শুধু গোঁফের মালিক ছিলেন না। যেমনি গোঁফজোড়া, তেমনি দেহ, তেমনি বিদ্যা আর ঠিক তেমনি ছিল তাঁর মনের বিরাটত্ব। তাছাড়া, সবচেয়ে মজার জিনিষ ছিল তাঁর খাবার বহর। দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে তিনি একাই সাবাড় করে দিতে পারতেন পুরো দুটো আলমারীর চিঁড়ে, গুড়, মুড়ি, সন্দেশ। বৃদ্ধের ঘরের পাশে ছিল আরো দুটি স্বল্প-পরিসর কামরা। সেখানে থাকতেন কয়েকটি ছাত্র। এঁরা দরিদ্র ছিলেন এবং ঐ

বৃদ্ধের সরাসরি তত্ত্বাবধানে থেকে তাঁরই কাছে লেখাপড়া শিখতেন। বৃদ্ধের কাছে লক্ষ্মী সরস্বতী দুজনাই বাঁধা পড়েছিলেন। অবশ্য এ কথা বললে একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না যে, বৃদ্ধের আজীবন সাধনা ছিল এক হাতে লক্ষ্মী আর হাতে সরস্বতী বিলিয়ে যাওয়া। কুড়িয়ে নাও যে যত পার।

একদিন একটা বড় মজার ব্যাপার ঘটেছিল বৃদ্ধের পাশের কামরায়। পাশের কামরার ছাত্র কয়টি কলেজ থেকে ফিরে এসে যে যার জামা কাপড় ছাড়তে ব্যস্ত। প্রায় সবারই জামাকাপড় ছাড়া হয়ে গেছে। হঠাৎ তাদেরই ঘরের মধ্যে কোন মানুষের একটা গোঁ-গোঁ শব্দে সবাই চমকে উঠলো। ব্যাপার কি? মনে হচ্ছে কে যেন একটা বিপদে পড়ে বেশ কষ্ট পাচ্ছে। হয়তো কিছুতেই বিপদ-মুক্ত হতে পারছে না। তাই এই কাতরানি। সবাই উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে, দেখে তাদেরই একজনার গায়ের জামা কেন জানি আজ আর খুলতে চাইছে না।

এ দৃশ্য দেখে বাকী ছাত্র কয়টির আর আনন্দ ধরে না। বিনা পয়সায় ঘরে বসে বহুদিন বাদে এমন সুন্দর সার্কাস দেখা হচ্ছে। বেচারীর দুঃখে সমবেদনা জানানো ত দূরের কথা, এরা আনন্দে হেসেই কুটিকুটি।

এমনি সময় ব্যাপার দেখতে, বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন বৃদ্ধ। কিশোর বয়সী কয়টি ছাত্র তাদের সহপাঠিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারলো না—তাই এগিয়ে এলেন বৃদ্ধ বিপদগ্রস্থ ছেলেটিকে বিপদমুক্ত করতে। দেখেই বৃদ্ধ বুঝলেন ব্যাপারটা অত্যন্ত ঘোরালো। এখন কি উপায়ে গায়ের জামা খোলা যাবে? যে দর্জি জামা তৈরী করেছে সে কি বোকা! সামনের দিকে কয়েকটি বোতাম লাগিয়ে রেখেছে। যতবার জামা খোলো আর পরো ততবার বেতাম খোলো আর লাগাও। এত কি সব কাজের কথা মনে রাখা সম্ভব। আর সময়ই বা কোথায় এত। তাও এই বয়সে। বয়স বাড়লে হয়ত চিন্তা করা যাবে ওসব কথা। বৃদ্ধ ছাত্রটির সার্টের সামনের দিকের বোতাম কয়টি খুলে দিয়ে পিট চাপড়ে সহাস্যে বললেন, 'আস্তে একটা দার্শনিক নিগ্রে মুস্কিলে পড়েছি।'

আজ আর কেন—একবার পরিচয় করিয়ে দিই। শীর্ণকায় বৃদ্ধ ছিলেন আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। মস্ত বড় গোঁফ জোড়ার মালিক ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। দার্শনিক! ছাত্রটি ছিলেন মানিকগঞ্জের অধিবাসী, ঢাকার জুবিলী স্কুলের ছাত্র বিজ্ঞানবিদ ডক্টর

মেঘনাদ সাহা। বাকী ছাত্র কয়টি হলেন—ডক্টর জ্ঞান ঘোষ, ডক্টর জ্ঞান মুখার্জি, শ্রীচারুচন্দ্র মুখার্জি ও শ্রীরাসবিহারী দাস। এঁদের দানের কথা সর্বজনবিদিত।

ছেলেবেলায় লোকমুখে শুনেছিলাম "লক্ষ মুদ্রা মূল্যে ডাঃ পি, সি, রায়ের মাথা বিক্রী হয়ে গেছে।" এই ছোট্ট গ্রাম্য কথাটির তাৎপর্য ঠিক তখন বুঝতে পারি নি। সেবারে বৈশাখে যখন শুনতে পেলাম প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ডাঃ রায় কিছুদিনের অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে স্বগ্রামে আসছেন, তখন আগে থেকেই তৈরী হতে শুরু করলাম তাঁকে দেখবার জন্য। বিশেষভাবে, তাঁর মাথা দেখতে হবে। কি ধরণের তৈরী, না জানি কত বড় সে মাথা, যা দু'দশ টাকা নয় একেবারে লক্ষ টাকায় বিক্রী হল।

ডাঃ রায়ের চেহারা-ছবি, আচার ব্যবহার, চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে একটা কল্পনা করে রেখেছিলাম। যদি আমার কল্পনা পুরোপুরি সত্য না হয়, তাবুও হয়তো অধিকাংশ সত্য হবে। কিন্তু আমার সে কল্পনা শেষ পর্যন্ত একবিন্দুও সত্য হয় নি। তাই প্রথমে বিশ্বাস করতে পারি নাই নিজের চোখ নিজের কানকে। কল্পনার আংশিক সত্য হওয়া তদূরের কথা—একেবারে বিপরীত। ভেবেছিলাম হয়তো দেখতে পাব হ্যাট, কোট-প্যাণ্ট-পরা এক সাহেব। তার পরিবর্তে দেখতে পেলাম এক অতি শীর্ণ, দীর্ঘকায়, শান্তশিষ্ট প্রশান্ত বৃদ্ধকে।

মুখময় কাঁচা-পাকা দাড়ি গোঁফে ভর্তি, গায়ে খদ্দরের ফতুয়া, পরণে মোটা সুতোর একখানা ধুতি, তাও হাঁটু ঢেকেছে মাত্র। পায়ে তালতলার চটি। চেহারা থেকে শুরু করে অশন-বসন, আহার বিহার, চাল-চলন, কথা-বার্তা কিছুতেই তাঁর সাহেবীয়ানার বাবুগিরির চিহ্ন নাই। খটখট করে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন বৃদ্ধ তাঁরই প্রিয় শিষ্য তৎকালীন কপিলমুনি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাস মহাশয়ের কাঁধে ভর দিয়ে। বিদ্যা বুদ্ধি, সামর্থ্যে যাঁর দেরের প্রতি অনু-পরমানু উজ্জ্বল, তাঁর আবার কিসের প্রয়োজন বাহ্যিক অলঙ্কারের?

তাঁর কাছে জাতি, ধর্ম, ইতর, ভদ্র, দেশ, কাল বা পাত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। দরিদ্রের জন্য তাঁর লক্ষ্মী-ভাণ্ডারের দ্বার সব সময়ে উন্মুক্ত ছিল। ১৯২১ সালে দক্ষিণ খুলনার দুর্ভিক্ষ ও ১৯২২ সালে মধ্য ও উত্তর বঙ্গের বন্যায় তাঁর সাহায্য বা দানের ফিরিস্তি দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

বাঙ্গালী-জাতির কিসে উন্নতি হবে, কেমন করে তারা স্বাধীন হবে, শিক্ষিত হবে এই ছিল তাঁর আজীবন সাধনা।

প্রতিবছর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসাধিককাল অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে স্বগ্রাম বাড়ুলীতে কাটাতেন। তাঁর সখের মধ্যে ছিল—প্রতিদিন বৈকালে নৌকা ভ্রমণে যাওয়া। জনসাধারণ ও তাঁর নৌকা ভ্রমণের মধ্যে একটু পার্থক্য ছিল। নৌকায় চড়ে তিনি নিজেই দাঁড় টানতেন। জরাজীর্ণ বৃদ্ধের দেহে ছিল বল; দেহের বল অপেক্ষা মনের বলই ছিল তাঁর বেশী। আর সেই মনের বলের জোরেই তিনি এমনি ধরণের কঠিন কাজ সমাধা করতে পারতেন। প্রতিদিন এমনি করে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কপোতাক্ষ' নদীতে নিজে দাঁড় টেনে নৌকা বিহারে বের হতেন। একদিন হঠাৎ কালবৈশাখীর ঝড় উঠলো সালকিয়ার কাছে। ঝড়ের বেগ সামলাতে না পেরে নৌকা ডুবলো। তার সঙ্গে পড়লেন ডাঃ রায় জলে। অনাথ নাথ রায় নামে একটি যুবক আচার্য রায়ের একখানা পা ধরে তাড়াতাড়ি তাঁকে ডাঙ্গায় তুললো।

১৯২১ সালের দক্ষিণ খুলনার দুর্ভিক্ষের কথা সর্বজনবিদিত। দেশময় হাহাকার। লোকের পেটে ভাত নাই পড়নে নাই কাপড়, দেহ কঙ্কালসার। অনাহারে অর্ধাহারে মানুষ তিলে তিলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। গাছে ফল নাই, এমনকি অনেক গাছের পাতাও নাই। খাল বিল শুষ্ক। মাছ সিদ্ধ করে যে খাবে লোকে তারও উপায় নাই। এমন দিনে তৎকালীন সরকারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাতে অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে খুলনার কালেক্টর ফোকাস (L, R. Faucas) নামীয় একজন ইংরেজ আই, সি, এস-কে তদন্তের রিপোর্ট কি হবে পূর্বাহ্ণে তা শিখিয়ে পড়িয়ে তদন্ত করতে পাঠান। নদী পথে যেতে যেতে কেওড়া নামক একপ্রকার জংলী ফলভর্তি গাছ দেখে তিনি পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী তদন্তের ফলাফল সরকারকে জানান—'গাছে ফল ফুল ও পাতা ভর্তি অতএব দুর্ভিক্ষের প্রশ্ন ওঠে না।'

তার ফলে বৃদ্ধ বয়সে ডাঃ রায়কে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে বের হতে হয়। যখন তিনি আশাশুনি নামক স্থানে চাল, ডাল, কাপড় বিতরণ করছিলেন সেই সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হয় ফকাসের। তীব্রকণ্ঠে তিনি রিপোর্টের বিরোধিতা করাতে ফকাস বলেছিলেন 'কি করতে পারি স্যার, আমার ওপর এমনি হুকুম

আছে। ডাঃ রায় জিজ্ঞাসা করলেন, why have you reported like that.' উত্তরে ফকাস বলেন—'what can I do sir' if it is the policy of the Govt, এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ আশাকরি শ্রদ্ধেয় চারুবাবু দিয়েছেন। তাঁহার ন্যায় অক্লান্ত কর্মী বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষে অতীব বিরল ছিল। এই দুর্ভিক্ষে তাঁহার অবশ্য আচার্যদেবের প্রেরণার অবদান সর্বাপেক্ষা অধিক—তিনি বম্বে হইতে বহু অর্থ ও বস্ত্রাদি সংগ্রহ করেন।

জন্ম শতবর্ষপূর্তি স্মারক গ্রন্থের সম্পাদকমণ্ডলীর সৌজন্যে।

রবীন্দ্রনাথ

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

[জয়ন্তী উৎসর্গ (রবীন্দ্র পরিচয় সভা কর্তৃক প্রকাশিত—১৩৩৮) গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল এই প্রবন্ধটি। —সম্পাদক।]

রবীন্দ্র জয়ন্তী বাংলার পরম গৌরব। এই অকাল-মৃত্যুর দেশে রবীন্দ্রনাথ যে আজও বাঁচিয়া রহিয়া তাঁহার গানের সুধাবর্ষণ করিতেছেন, ইহা ভগবানের একটি শুভ অনুগ্রহ। আমাদের আনন্দ তাঁহার পরমায়ু আরও সুদীর্ঘ হউক; ইহাই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা।

রবীন্দ্রনাথ কবি। আমি রাসায়নিক হইলেও অরসিক। আমার সহিত পরিচয় তাঁহার রসলোকের নয়, তাঁহার ব্যক্তিত্বের। রবীন্দ্রনাথকে মানুষ হিসাবে আমি শ্রদ্ধা করি, তাঁহার লেখা পড়িয়া আনন্দে অভিভূত হই। সমালোচক আমি নই। সে স্পর্ধাও নাই, তথাপি এই কবির প্রতি আমার সকল শ্রদ্ধা আজ হৃদয়ে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে।

মনে হয়, বাংলাদেশের যে কি সম্পদ রবীন্দ্রনাথ তাহা বিদেশী কেহ বুঝিবেন না। কৈশোর হইতে আজ পর্যন্ত। এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ বাংলার আসরে কাব্যগান গাহিতেছেন। বাংলার পথে ঘাটে, হাটে মাঠে এমন কি সুদূর নিভৃত পল্লীর ঘরে-প্রাঙ্গণে তাঁহার গানের সুর বাজিয়া উঠিতেছে। বাংলার চাষার ছেলেমেয়েরাও রবীন্দ্রনাথের গান গায়। তাহাদের অধিকাংশই কবির নাম পর্যন্ত শুনে নাই; তাহারা জানে না এ গান কাহার লেখা, কি ইহার সুর, কি-ই বা ইহার তাল-মান; কিন্তু তাহাদের কণ্ঠে কণ্ঠে সে গান অতি সহজে আপনা-আপনি ধ্বনিয়া উঠে। আনন্দের আবেগ আসিলেই তাহারা রবীন্দ্রনাথের গান ধরে।

রবীন্দ্রনাথের গান ও গীতি কবিতা বাঙ্গালীর প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে; বাংলার ভাবধারাকে এক নূতন রসে কোমল করিয়া সমাজের

চতুর্দিকেই এক নূতন সৌন্দর্য আনিয়া দিয়াছে। বাংলার নাড়ীর স্পন্দনে তাহার সুরে তাল শোনা যায়। আজ আমরা রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়া বাংলাদেশের কথা কল্পনাও করিতে পারি না।

ইহার কারণ অনেকগুলি। প্রথমত রবীন্দ্রনাথ খাঁটি বাঙ্গালী কবি। রবীন্দ্রনাথের যে সত্যকার কবি-মূর্তি, তাহা সেই বাংলার বৈষ্ণব কবিরই প্রতিচ্ছবি। জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস যে কবিগান রাধাকৃষ্ণের সেই যমুনা-পুলিনের অনন্ত প্রেমলীলার গান গাহিয়া গিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদেরই ভাবে-রসে পরিপুষ্ট; সেইজন্য তাঁহার প্রেম ও ধর্ম বিষয়ক সঙ্গীতগুলিতে বৈষ্ণব ভাব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

বাংলার এই নিগূঢ় রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আর একটি নূতন সুর বাজাইয়াছেন। তাহা হইল, বাংলা দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা। তাঁহার কাব্যে বাংলার আকাশ-মাটি, জল-বাতাস, বাংলার পল্লীর সরল সুন্দর ছবিগুলি এমন স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তাহার আর তুলনা নাই। বাঙ্গালী ঘরের অতি তুচ্ছ সুখ-দুঃখ, হাসি কান্নার কথাগুলি তাঁহার ভাষায় এমন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, সে সাধারণ দরিদ্র বাঙ্গালীও তাঁহাকে অনায়াসে নিজেদেরই একজন মনে করিয়া লয়; কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। সম্ভ্রান্ত ধনীগৃহে রবীন্দ্রনাথ লালিত। কিন্তু ঐশ্বর্যের সকল অভিমান ব্যর্থ করিয়া পল্লী জীবনের সঙ্গে এই যে অন্তরের সহজ নিবিড় আত্মীয়তা, ইহা তাঁহার গল্পগুচ্ছের পাতায় পাতায় সৌরভের মত ভরিয়া আছে। বঙ্গমাতার গভীর প্রেম তাই তিনি গাহিয়াছিলেন—

আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ,
তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।

আর—

'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম, মাগো, তোমায় ভালবেসে।'

মনে হয় যে, সারা বঙ্গসাহিত্য একদা লোপ পাইলেও এই গানগুলি কখনও বাঙ্গালীর কণ্ঠ হইতে লোপ পাইবে না।

রবীন্দ্রনাথের দেশ-প্রীতি এইখানেই শেষ নয়। বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তিনি যেমন পিককণ্ঠ, বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধেও তেমনি তিনি মেঘমন্দ্রস্বরে গান গাহিয়াছেন। সে-গান কর্মের উদ্দীপনায় তেজস্বী, নির্ভীক, সাহসী। ১৯০৫ সালে বাংলাদেশ আলোড়ন করিয়া যে-দিন স্বদেশী আন্দোলনের ডঙ্কা নির্ঘোষে বাজিয়া উঠিল সেদিন রবীন্দ্রনাথই সকলের আগে ভাবাবিষ্ট হইয়া, সেই উত্তেজনা-স্পন্দনকে এক শঙ্কাহরণ ওজস্বী জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত করিয়াছিলেন। বাংলার স্বাদেশিকতার বহ্নিশিখার পাশে সে-দিন তিনি যে উদাত্ত বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, তাহাই বাংলার কর্মের পিছনে ছিল শ্রদ্ধা, জাতীয়তার পিছনে ছিল মধুর দেশভক্তি, আর নব্য বস্তুবাদের পিছনে মেলিয়া ধরিল উদার আদর্শবাদ। যে-দিন সরকারী নিষেধের রক্তচক্ষু অবহেলা করিয়া বাংলায় রাখীবন্ধনের পুণ্যযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল, সে-দিন তিনিই তাহার স্বস্ত্যয়ন করিলেন—

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান!

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন ভারতীয় জাতীয়তার কর্মযোগ সাধন করিয়াছিলেন, বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষের জীবনে যেমন আমরা পাই তার জ্ঞানযোগ, ববীন্দ্রনাথের সাধনায় আমরা তেমনি পাই দেশপ্রীতির ভক্তিযোগ।

কয়েক বৎসর না যাইতেই স্বদেশী আন্দোলনের তপোবনের আড়ালে সহসা বিপ্লবের বিষধর ভুজঙ্গ ফণা বিস্তার করিল। সে-দিন রবীন্দ্রনাথই আবার দেশবাসীকে সাবধান করিয়া বলিলেন,—এই শ্বাপদক্রীড়া ভারতীয় সাধনার বহির্ভূত, এ ক্রীড়ায় কল্যাণ নাই। দেশকে সত্য ও শান্তির পথে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য তিনি আবার লেখনী ধরিলেন। সে-দিন রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে আমরা যে ওজস্বী গদ্যভাষায় রচনাগুলি পাইলাম, তাহা বুঝি রবীন্দ্রকেও চকিতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। আমার বিশ্বাস, আজিকার প্রত্যেক দেশ-হিতৈষী যুবক-যুবতী যদি দৈনিক সংবাদপত্রের আবর্জনা ফেলিয়া রবীন্দ্রনাথের তখনকার লেখা 'স্বদেশ', 'সমাজ', 'সমূহ', ও 'রাজাপ্রজা' এবং

বিশেষতঃ 'স্বদেশী-সমাজ', 'দেশনায়ক', 'সমস্যা', 'পথ ও পাওয়া' প্রভৃতি নিবন্ধগুলি অধ্যয়ন করেন ত' রাজনৈতিক জীবনে অনেক উপকার পাইবেন।

কিন্তু জাতীয় জাগরণের ঝঞ্ঝাবর্তে ভাবাদর্শ কোথায় উড়িয়া যায়, মানুষ যুক্তি-তর্ক হারাইয়া ফেলে। সে জন্য রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ-ই স্বদেশী উগ্র কর্মস্রোত হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন অনুভব করিয়া বুঝিলেন, কবি কেবল জাগরণী গান গাহিতে পারেন, বিপুল কর্মতরীর কাণ্ডারী হওয়া তাঁহার সাধ্য নহে। কর্ম-সাগরের তরঙ্গ-ভঙ্গে তাঁহার আসন নয়, তাঁহার আত্মা শুধু আকাশের ধ্রুবনক্ষত্রের মতো ঊর্ধ্বলোক হইতে রশ্মিপাত করিবে। অতএব দেশের অবস্থা পরিবর্তনে তাঁহার পূর্বের আশায় আঘাত লাগিল। তিনি দূরে সরিয়া এইবার তাঁহার সাধনার তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত করিলেন। সংকীর্ণমনা কুটিল দেশপ্রেম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন আন্তর্জাতিক সখ্যের বাণী মানবজাতির ঐক্য-সদ্ভাবের মূলমন্ত্র, বিশ্বপ্রেমের বার্তা। ইহারই ফলে শান্তিনিকেতনের ক্ষুদ্র শিক্ষালয়টি দিনে দিনে এক সার্বভৌম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইল। সেই শান্তিনিকেতনে আজ প্রাচী-প্রতীচীর সৃষ্টি-কলার মিলন-ক্ষেত্র, সর্বদেশের মনীষীবৃন্দের সংগমতীর্থ। এইখানে রবীন্দ্রনাথ জগতের শিক্ষাগুরু এবং এইখানের কাব্যলোকে তিনি গীতাঞ্জলির কবি। তাঁহার ভাব-মধুর বিশ্ব-প্রীতির গীতিকাব্য তাই অতি সহজেই পাশ্চাত্ত্য সভ্য জগতের মনোহরণ করিল। ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যের জন্য নোবেল প্রাইজ লাভ করিলেন। যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলার চারণ-কবি, ভারতীয় জাতীয়তার উদ্‌গাতা, তিনি হইলেন বিশ্বমানবের মিলন-যজ্ঞের ঋষি।

অশ্চর্যের বিষয়, তাঁহার এই বিশ্বপ্রেম ঘোষণার ঠিক পর বৎসরেই পৃথিবী-ব্যাপী মহাসমরের প্রচণ্ড অগ্ন্যুদ্গার আরম্ভ হইল। জাতির পর জাতি সেই প্রলয়কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া পুড়িতে লাগিল। পাঁচ বৎসর ধরিয়া নরহত্যার তাণ্ডব-লীলার পর আবার জাতিসমূহ দুঃসহ ক্লান্তি ও অবসাদে ভার্সেলের সন্ধি দ্বারা কোন মতে একটা জোড়া-তালি দেওয়া শান্তির আয়োজন করিল। ঐ বিগত মহাযুদ্ধে যে স্বার্থান্ধ আত্মম্ভরী উদ্ধত জাতীয়তাবাদ লক্ষঝম্ফ করিয়া আপনার অসম্ভবতায় আপনি আছাড় খাইয়া মরিল, তাহারি বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বে বাংলাদেশে সতর্কতার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। সেইজন্যেই রণশ্রান্ত

অবসন্ন জগতে তাঁহার সখ্য শান্তি মৈত্রীর বাণী মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায় সাগ্রহে সমাদৃত হইল। এবং য়ুরোপ ও আমেরিকায় যে-দিন এই প্রাচ্য ঋষি তাঁহার আশা প্রেম বিশ্বাসের মন্ত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন, সে-দিন, সে-দেশের নরনারী তাঁহাকে সাদরে সম্বর্ধনা করিলেন।

আর, আমরা তাঁহার স্বদেশবাসীর দল, আনন্দে গৌরবে মাতিয়া উঠিলাম যে, আমাদেরই কবি রবীন্দ্রনাথ, যাঁহার সঙ্গীতে এ-দেশের লক্ষ লক্ষ স্ত্রী-পুরুষ ছেলে মেয়ে মাতোয়ারা হইয়াছে, যাঁহার বৈতালিক গীতে জাগিয়া এজাতি দেশকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে, তিনিই অবশেষে সমগ্র সভ্য দেশের ঘরে ঘরে পূজিত হইলেন। বিশ্বপ্রেমের হোতারূপে তাঁহার আবির্ভাব;—ইতিহাসের অনন্ত আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলে তাঁহার স্থান চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া গেল। আমাদের সে-দিনের সে-আনন্দের কথা আমাদেরই প্রাচ্য ভাষায় বলিতে হয়—কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা। আর সেই আনন্দ আজিও আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া আছে। ভাবিতেছি দেশের এই অসহায় দুর্ভাগ্যের দিনেও ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাস-জননী ভারভূমি রবীন্দ্রনাথের মতো আর একটি বরপুত্র লাভ করিয়াছেন। আজিকার এই উৎসব-ক্ষণে এই আনন্দই আমার একমাত্র সম্বল। অতএব আর্য-ঋষিদের সেই প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণই আমার শেষ কথা—

জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ

জন্ম-শতবর্ষপূর্তি স্মারক-গ্রন্থের সম্পাদকমণ্ডলীর সৌজন্যে।

প্রাচীন ভারতীয় রসায়ন : কালনির্ণয়

হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতবর্ষের দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত চর্চা নিয়ে এ পর্যন্ত অনেক আলোচনা হয়েছে। এই সমস্ত বিষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের অবদানও আজ সর্বজনস্বীকৃত। প্রাচীন ভারতে রসায়ন বিদ্যার চর্চা সম্পর্কে গবেষণা, এ পর্যন্ত এ দেশে বা বিদেশে অতি অল্পই হয়েছে। এবং তার চেয়ে আক্ষেপের ব্যাপার, এই আলোচনা সঠিক সত্যের সন্ধান তো দেয়ই নি, বরং সমস্ত বিষয়টিকে আরো ঘোলাটে করে দিয়েছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে A History of Hindu Chemistryর প্রথম খণ্ড এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করে এই বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। সুতরাং পথিকৃতের সম্মান তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য। কিন্তু একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে বহু পরিশ্রম সত্বেও এই বইখানি প্রাচীন ভারতীয় রসায়ন চর্চার সময় তথা অর্জিত জ্ঞানের নির্দেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর কারণ ছিল দ্বিবিধ। প্রথম কারণ হল্ঃ তাঁকে বহু অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল, ফলে তাঁর তথ্য সংগ্রহ অপর্যাপ্ত ও অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল। প্রাচীন রাসায়নিকদের রচিত পুরাতন, জরাজীর্ণ পাণ্ডুলিপির খুব সামান্য অংশই তাঁর হাতে পৌঁছেছিল। তাছাড়া ভারতীয় সভ্যতা সত্য সত্যই কত পুরাতন সে সম্পর্কে সেই সময় পর্যন্ত অন্যান্যদের মত তারও সঠিক ধারণা ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, হরাপ্পা এবং মহেন-জো-দারোর সভ্যতা তখন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত ছিল। মহেন-জো-দারো এবং হরাপ্পায় রসায়নের চর্চা হয়েছিল, বাস্তব ক্ষেত্রে ধাতু নিষ্কাষণ, ধাতু ঢালাই মূর্তি ও পাত্রাদি নির্মাণে রসায়ন বিদ্যার প্রয়োগ হয়েছিল, এসবই আজ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে। প্রাচীন সিন্ধু-উপত্যকা সভ্যতা তখন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত থাকায় সেখানকার রাসায়নিক গবেষণা সম্পর্কে ১৯০২ বা ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তথ্যাদি সংগ্রহ করা আচার্য রায়ের সভ্যতার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মাত্র ১৯২৮ সালে সিন্ধু-উপত্যকার কথা

জানা গেছে। দ্বিতীয় কারণ এবং সুনিশ্চিতভাবে সেটাই প্রধান কারণ বলে মনে করা চলে যে, সমসাময়িক কালের ইউরোপীয়দের প্রচারে তিনি বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। সে যুগের ইউরোপীয়রা কোন ক্রমেই বিশ্বাস করতেন না যে ভারতীয় সভ্যতা যথেষ্ট প্রাচীন। ইউরোপে যেহেতু পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে রসায়ন বিদ্যা বৈজ্ঞানিক রূপ নেয় নি সুতরাং প্রাচীন ভারতবর্ষে ও বৈজ্ঞানিক রসায়নচর্চা অসম্ভব—এই ছিল তাদের ধারণা ও প্রচার। মনেপ্রাণে জাতীয়তাবাদী হওয়া সত্ত্বেও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে প্রতিপদেই হিসাব করতে হয়েছিল প্রাচীন ভারতের রাসায়নিক গবেষণার কাল নির্দেশে কতটা প্রাচীনত্ব দাবী করলে ইউরোপ আমাদের অবিশ্বাস করবে না।

এ কথা কোনক্রমেই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে আমরা ছিলাম বিজিত জাতি। ইউরোপের স্বীকৃতির উপর আমাদের জীবন মরণ, খ্যাতি প্রতিষ্ঠা সব কিছুই নির্ভর করত। আন্তরিকভাবে স্বদেশপ্রেমিক হওয়া সত্ত্বেও সে যুগের কোন মনীষীর পক্ষেই সম্পূর্ণভাবে এই মনোভাবের ঊর্ধ্বে ওঠা সম্ভব ছিল না। আচার্য রায়ও তা পারেন নি। কিন্তু তৎকালীন অবস্থার কথা মনে রাখলে এর জন্য তাঁকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। ইউরোপের উপর নির্ভরতা ছিল আমাদের সে যুগের মজ্জাগত ব্যাধি। আর ঠিক এই কারণেই তথ্য নির্ভরতা তাঁকে ত্যাগ করতে হয়েছিল।

আগেই বলেছি, তাঁর তথ্য সংগ্রহ সম্পূর্ণ ও পর্যাপ্ত হয়নি। তবু স্বীকার করতেই হবে, যে তথ্যগুলি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তার সাহায্যেই অক্লেশে তিনি প্রমান করতে পারতেন যে History of Hindu Chemistryর প্রথম বা দ্বিতীয় খণ্ডে ভারতীয় রসায়ন চর্চার সূত্রপাতের যে সময় তিনি নির্দেশ করেছেন সে সময় অন্তত তার থেকে কয়েক সহস্র বছর পেছিয়ে নেওয়া চলে। কিন্তু পরমুখাপেক্ষিতার জন্য তিনি তা পারেন নি।

প্রথম খণ্ড History of Hindu Chemistry-তে তিনি ভারতীয় রসায়ন চর্চার সূত্রপাতের সময় নির্দেশ করে যা বলেছেন দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় তিনি নিজেই তার প্রতিবাদ করেছেন, "It was with diffidence and hesitation that I Placed the remotest limit of alchemical Tantras in the 12th Century A. D. It now transpires that this date is due to be pushed back by several Centuries. (১)

(১) History of Hindu Chemistry. Vol II. preface—Page B.

অর্থাৎ প্রথম খণ্ডে ভারতীয় রসায়নী বিদ্যার উদ্ভবের সর্বশেষ কাল নির্দেশ করা হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে, দ্বিতীয়খণ্ডে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র নিজেই সে সময়কে আরো কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে ভারতীয় রসায়ন বিদ্যার প্রাচীনত্ব কিছু বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রকৃতসত্যের সন্ধান মেলে নি। আচার্য রায় এক ভ্রান্তি থেকে তার এক ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন। প্রকৃত ব্যাপার হল, ভারতে রসায়ন চর্চার সূত্রপাত খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর কয়েক শ' বছর আগেকার ঘটনা নয়,—কয়েক সহস্র বছর আগেকার ঘটনা।

প্রাচীন রসায়ন শাস্ত্রের আর একজন খ্যাতনামা গবেষক H. E. Stapleton তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ Chemistry in Iraq and Persia in the tenth century A. D,(২) প্রবন্ধে পারস্যের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান রাসায়নিক আর-রাজীর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আর-রাজী দশম শতকের প্রথম পাদে মারা যান। তিনি গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে, রসায়ন সম্পর্কে আর-রাজীর আলোচনা এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর **History of Hindu Chemistry**-তে যে সমস্ত তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন তার মধ্যে এক আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। এ থেকে Stapleton সিদ্ধান্ত করেছেন, **"that the earlier and possibly autochthonous system of Indian alchemy based almost entirely on the use of vegetable juices was superseded sometime between 500 and 1000 A. D, by a system of external origin which was primarily based on the use of mercury.** অর্থাৎ Stapleton সাহেবের মত হল, ষষ্ঠ শতকের আগে ভারতের ক্ষেম বিদ্যা (alchemy) গাছ গাছরার রসের ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, ষষ্ঠ থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে ভারতে পারদ প্রভৃতির ব্যবহার প্রচলিত হয়। ঐ প্রবন্ধে তিনি আরো বলেছেন যে ভারতবর্ষে ধাতব (metallic) বা অজৈব (Inorganic) রসায়ন বিদ্যার চর্চা হল ঐ বিদেশী প্রভাবেরই ফল। Stapleton অবশ্য স্বীকার করেছেন ভারতীয়রা অনেক পূর্ব থেকেই উদ্ভিজ্জ রসায়নের (Vegetable Chemistry) সঙ্গে পরিচিত ছিল। তারা ঔষধ তৈয়ারীর ক্ষেত্রেও সফলভাবে এ বিদ্যার প্রয়োগ করত। চরক এবং সুশ্রুত উভয়েই বহু পুরাতন এবং তাঁদের রচনার সঙ্গে আর-রাজীর পরিচয় ছিল। কেবল ক্ষেমবিদ্যা ও খনিজ রসায়নের

(২) Memoirs of Asiatic Society of Bengal Vol VIII. No-6.

(mineral chemistry) ক্ষেত্রে আর-রাজীর নিকট ভারতীয়রা ঋণী। তাঁর মতে, আর-রাজী এবং তার পূর্ববর্তী কয়েকজনের অর্জিত বিদ্যা থেকে ভারতীয়দের রসায়নচর্চার সূত্রপাত।

Stapleton সাহেবকে এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তগুলির জন্য ততটা দোষ দেওয়া যায় না। কারণ ভারতীয় রসায়ন শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব গবেষণা কিছু ছিল না। ভারতীয় রসায়ন সম্পর্কে তিনি আচার্য রায়ের গবেষণাকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে সমস্ত তথ্য তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের History of Hindu chemistry থেকে সংগ্রহ করেছেন। আচার্য রায়ের মতানুসারে 'খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে নাগার্জুন বিরচিত 'রসরত্নাকর'ই হল ধাতব রসায়ন সম্পর্কে প্রথম ভারতীয় গ্রন্থ।'

আচার্য রায়ের এই কালনির্দেশ যদি অভ্রান্ত হয় তবে Stapleton সাহেবের মন্তব্যকে যথার্থ বলেই স্বীকার করতে হবে। কারণ, নবম শতাব্দীর শেষ দিকে আর রাজীর মত বিখ্যাত রাসায়নিকের আবির্ভাব পারস্যে হয়েছিল। তারও আগে আরো কয়েকজন অপেক্ষাকৃত গৌণ রাসায়নিক আরব ও পারস্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের গবেষণার সঙ্গে ভারতীয় রাসায়নিকদের গবেষণার প্রভূত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই সাদৃশ্য এত প্রকট যে একপক্ষ অন্য পক্ষের নিকট ঋণী, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না। যদি ব্যাপারটি এমনই হয়, রস রত্নাকর প্রথম প্রামাণ্য ভারতীয় রসায়ন গ্রন্থ এবং যার রচয়িতা দশম শতকে জীবিত ছিলেন তা হলে মুসলমানদের কাছে রসায়নে ভারতের ঋণ স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার ঠিক এর বিপরীত।

১) বিখ্যাত রাসায়নিক নাগার্জুন খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন ২) 'রসরত্নাকর' গ্রন্থখানি দশম শতকে রচিত হয়েছিল।৩) ধাতব রসায়ণ সম্পর্কে তার আগে আর কোন প্রামান্য গ্রন্থ ভারতবর্ষে রচিত হয় নি। (৪) নাগার্জুনই যথার্থ বিচারে প্রথম ভারতীয় রাসায়নিক, (৫) ভারতবর্ষে ধাতব-রসায়নচর্চা বিদেশী প্রভাবের ফল। (৬) পাঁচশ থেকে হাজার খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে পারদের ব্যবহারের সূত্রপাত প্রভৃতি যতগুলি সিদ্ধান্ত আচার্য রায় ও Stapeleton সাহেব করেছেন তার প্রত্যেকটি ভুল এবং রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তির ব্যাপারে ঋণের একটা সম্পর্ক আরব-পারস্যের সঙ্গে

ভারতবর্ষের গড়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু সে সম্পর্কটা অধমর্ণের সম্পর্ক নয়, উত্তমর্ণের সম্পর্ক। আরব বা পারস্যের প্রভাবে ভারতে নয়, ভারতীয় প্রভাবেই ঐ সব দেশে উদ্ভিজ রসায়নের মতই ধাতব রসায়ন চর্চারও সূত্রপাত।

এ্যালকেমি থেকে কেমিস্ট্রির উৎপত্তি হয়েছিল ইউরোপে কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য রকম। এ্যালকেমি বা ক্ষেমবিদ্যার চর্চা এদেশে ছিল না এমন নয়। পৃথিবীর কোন দেশই বোধ হয় প্রাচীনকালে এ্যালকেমির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারে নি। সব দেশেই এ্যালকেমির মূল প্রেরণা হল দুটি। প্রথমটি হল অমরত্ব লাভ এবং দ্বিতীয়টি হল অজস্র সম্পদের অধিকারী হওয়া। মানব জীবনের এই দুটি শাশ্বত কামনাই প্রতি দেশের এ্যালকেমি চর্চার মূলে রয়েছে। ওদেশে যেমন Elixir of life-র উদ্ভাবন প্রয়াস দেখা যায়, এদেশে তেমনি দেখা যায় 'মৃত সঞ্জীবনীর' প্রচেষ্টা। অনন্ত সম্পদের অধিকারী হওয়ার জন্য কৃত্রিম স্বর্ণ নির্মাণই হল সব চেয়ে প্রশস্ত পথ। দুটি শাশ্বত আকাঙ্খাকে অবলম্বন করে সব দেশের এ্যালকেমিস্টরা ঐ একই কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তা হলেও ইউরোপের সঙ্গে এই দুটি বিষয়ে ভারতের পার্থক্য আছে। সব চেয়ে বড় পার্থক্য হল, ভারতীয়দের আধ্যাত্মিক চেতনা প্রথমটি অর্থাৎ অমরত্ব লাভের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মোক্ষ, মুক্তি, নির্বাণ প্রভৃতি সমস্ত ধারণাগুলিই চিরায়ু হওয়ার বিপক্ষে যায়। পার্থিব অমরত্ব লাভ অপেক্ষা মোক্ষলাভই সে যুগের ভারতীয়দের কাছে কাম্য ছিল। তা ছাড়া গীতা প্রভৃতিতে যে ভাবে আত্মার অমরত্ব ঘোষিত হয়েছে তারপর জীর্ণ বাসরূপ দেহকে চিরস্থায়ী করতেও খুব বেশী আগ্রহ বোধহয় এদেশেবাসীর ছিল না। জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসের ভেতর দিয়ে তাদের অমরতলাভের শাশ্বত কামনা অনেক পরিমাণে পরিতৃপ্ত হত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আর ঠিক এই কারণে ইউরোপে অমরত্বলাভের ঔষধ আবিষ্কারের জন্য যে আগ্রহ দেখা গেছে, রাজা রাজরা প্রভৃতি সমাজের উচ্চস্তরের মানুষরা যে ভাবে তার পেছনে অর্থ ও শক্তি ব্যয় করেছেন, এদেশে সেরকম নজীর কদাচিতই পাওয়া যায়। সমাজের নীচুস্তরে অবশ্য এ প্রচেষ্টা কিছু বেশী পরিমাণে হয়েছিল কিন্তু তাও তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। সত্য কথা বলতে কি, মানুষ চিরায়ু হতে পারে, এ বিশ্বাস ভারতীয়দের ছিল না। 'অমর' শব্দটি শতায়ু

অর্থে ব্যবহৃত হত। বেদের একটি শ্লোকেও সোমলতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "এই ব্যক্তিকে আমরা অমৃতের শক্তি পান করিতে দিতেছি, এতদ্ব্যতীত সে যাহাতে শতায়ু হয় তাহার ঔষধ প্রস্তুত করা হইয়াছে।"১

অন্য দেশের এ্যালকেমিষ্টদের সঙ্গে ভারতীয় এ্যালকেমিষ্টদের দ্বিতীয় পার্থক্য হল : ভারতীয় এ্যালকেমিষ্টরা দাবী করেছেন তারা রাসায়নিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম স্বর্ণ নির্মাণ করতে পারেন। ওদেশের সঙ্গে এ ব্যাপারে এটাই হল মূল পার্থক্য। ওদেশে যারা এ্যালকেমি-বিদ্যার চর্চা করেছেন, তাদের কেউই ধাপ্পাবাজী স্তরের উর্দ্ধে দাঁড়িয়ে কৃত্রিম সুবর্ণ নির্মাণ পদ্ধতি জ্ঞাত করান নি। অর্থাৎ গুপ্তবিদ্যার বাইরে এটাকে প্রকাশ্য জ্ঞানের মর্যাদা তারা দেন নি। "কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ নির্মাণ করা যায় এবং এটি একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি"—শুধু এই দাবীই যে ভারতীয় রাসায়নিকরা করেছেন তাই নয়, অজস্র গ্রন্থে তারা সেই পদ্ধতিগুলিও লিপিবদ্ধ করে গেছেন।২

---

১ লক্ষ্য করবার বিষয় হল, অমৃতের শক্তি পান করার পরও চিরায়ু হওয়া দূরে থাক শতায়ু হওয়া যায় না। শতায়ু হওয়ার জন্য অন্য ঔষধ প্রয়োজন। এখানে অমরত্বের কল্পনা আদৌ নেই।

২ ভারতীয় রাসায়নিকরা কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ নির্মাণ করতে জানতেন কিনা, অথবা তারা সত্য সত্যই ত সম্ভব করতে পেরেছিলেন কিনা, এটা আমার আলোচ্য বিষয় নয়। আমার বক্তব্য, আলবেরুনী যেভাবে বলেছেন, ভারতবর্ষে "আলকিমির অনুরাগীরা কিন্তু এ সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য গোপন রাখিতে প্রয়াস পান এবং নিজ সম্প্রদায়ের লোক ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত ইহার আলোচনায় পর্যন্ত সংকুচিত হন।"—তা সত্য নয়, বা মাত্র আলবেরুণীর যুগেই সত্য ছিল। মাত্র সাত বছরের ভারত অবস্থানের মধ্যে ভারতীয় এ্যাল-কেমীর সঙ্গে আলবেরুনীর যথার্থ সংযোগ ঘটে নি বলে আমার ধারণা। আলবেরুনী যাই বলে থাকুন না কেন, বিদ্যাটি আদৌ গুপ্ত বিদ্যা ছিল না। এ বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ তার সাক্ষ্য হিসাবে আজও বিরাজিত। তাদের নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে স্বর্ণ নির্মাণ সম্ভব কিনা সে বিষয়ে পরীক্ষার পরেই চূড়ান্ত রায় দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এই প্রবন্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে তাদের নির্দিষ্ট পদ্ধতিগুলি আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। আমি রাসায়নিক নই, যে কোন রাসায়নিক ঐ পদ্ধতি অনুযায়ী পরীক্ষা করে দেখতে পারেন কোন ফল লাভ হয় কি না।

এক কথায় আমি বলতে চাই, অ্যালকেমি থেকে ভারতে কেমিস্ট্রির উৎপত্তি হয় নি। আলবেরুনীও স্বীকার করেছেন, 'হিন্দুগণ এই আলকেমি সম্বন্ধে অসম্ভব রকম উৎসাহী নন।—আলকেমির অনুরূপ তাহাদের আর একটি নিজস্ব বিশেষ শাস্ত্র আছে, ইহাকে বলা হয় রসায়ন।'১

ভারতে এ্যালকেমির চর্চা যত না হয়েছে রাসায়নিক বিদ্যা বা কেমিস্ট্রির চর্চা হয়েছে তারচেয়ে অনেক বেশী। এবং এই রসায়ন বিদ্যা গড়ে উঠেছিল পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে। এ দেশের চিকিৎসা বিদ্যা এবং রসায়ন একে অপরের সহায়ক হিসাবে গড়ে উঠেছিল প্রথম থেকেই, একথা বললে একটুও অত্যুক্তি করা হবে না। তাই ভারতীয় রসায়ন বিদ্যার ইতিহাস খুঁজতে হলে যেমন প্রত্নতাত্ত্বিক ধাতব দ্রব্য মৃৎ ও অন্যান্য পাত্রাদি বিশ্লেষণ করতে হবে তেমনি জানতে হবে ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস।

অতি প্রাচীন যুগ থেকেই ভারতীয় চিকিৎসা বিদ্যা প্রধান চারিটি খাতে বিভক্ত হয়ে যায় ঃ ১) পারদ ও ধাতু ২) উদ্ভিজ্জ ঔষধপত্র ৩) মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড় ফুঁক, তুকতাক এবং ৪) শল্য বিদ্যা। এর মধ্যে দ্বিতীয় বিভাগ অর্থাৎ উদ্ভিজ ঔষধপত্রের (ভেষজ) সঙ্গে আধুনিক যুগের লোকেরা সর্বাধিক পরিচিত। কিন্তু তা থেকে এ সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, দ্বিতীয় বিভাগটিই সর্বাধিক প্রাচীন অথবা সর্বাধিক নবীন। চরক যেমন দ্বিতীয় ধারার সর্বাধিক খ্যাতিমান প্রবক্তা, সুশ্রুত তেমনি চতুর্থ ধারার, অথর্ব বেদের মধ্যেও তৃতীয়

ব্যক্তিগত ভাবে আমার ধারণা তাঁদের দাবী খুব অযথার্থ ছিল না। একমাত্র পারদকেই তারা স্বর্ণে পরিণত করার দাবী করেছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকরাও ঠিক এই দাবী করেছেন। পারদ ও স্বর্ণের পারমানবিক ওজনের মধ্যে সামান্যই পার্থক্য। প্রথমটি ২০০·৬ এবং দ্বিতীয়টি ১৯৭·২। মেণ্ডেলীফের 'পিরিয়ডিক টেবল'এ পারদ এবং স্বর্ণের স্থান পাশাপাশি নির্দিষ্ট আছে। যতদূর জানি, জার্মাণীর গবেষণাগারে পারদকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। বহু ব্যয়সাধ্য বলে এই উপায়ে স্বর্ণ সেখানে প্রস্তুত করা হচ্ছে না।

১) চিকিৎসা বিদ্যার একটি শাখাও রসায়ন নামে অভিহিত হত।

ধারার অজস্র নিদর্শন রয়েছে আর প্রথম ধারাটিই হল আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়, সুতরাং বিস্তৃত ভাবেই তার আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

চরক এবং সুশ্রুতকে আমাদের দেশের কোন কোন মনীষী চিকিৎসা বিদ্যার জনক বলে মনে করে থাকেন। এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য তাঁদের জনপ্রিয়তা যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হয়ে এ যুগে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু তাঁদেরকেই প্রাচীনতম চিকিৎসা-বিজ্ঞানী বলে ভাবলে ভুল করা হবে। চরককে কণিষ্কের সমসাময়িক বলে মনে করা হয়ে থাকে * (খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) কিন্তু এর সপক্ষে কোনো জোরালো প্রমাণ নেই। বিশেষ করে যখন দেখা যাচ্ছে পাণিনির ব্যাকরণে চরক কথাটির অর্থ চরকাদি সম্প্রদায় বলে নির্দেশ করা হয়েছে।(১) সেক্ষেত্রে একথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে রাজা কণিষ্কের সভাবৈদ্য কোন একজন চরক থেকে থাকতে পারেন কিন্তু চরক সংহিতা তাঁর রচনা নয়। চরক সংহিতার ভাষা ও রচনা-রীতির বিশ্লেষণ করলে তাঁকে আরো প্রাচীন বলে মনে হয়। চরক সংহিতার ভাষা ও রচনারীতির সংগে রামায়ণ বা মহাভারতের চেয়ে অনেক বেশী মিল বেদের ভাষা ও রচনারীতির। যদি ধরেও নেওয়া হয় রামায়ণ ও মহাভারত গুপ্ত যুগে (৩২০ খৃষ্টাব্দ—৫৭১ খৃষ্টাব্দ) চতুর্থ বা পঞ্চম শতকে (২) বর্তমান রূপ লাভ করেছিল এবং ঋগ্বেদ অন্তত খৃষ্ট

---

* প্রসিদ্ধ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ অধ্যাপক সিলভা লেভি চীনা ত্রিপিটকে চরক নামে জনৈক চিকিৎসা ব্যবসায়ীর উল্লেখে দেখতে পেয়েছেন। ইনি শক বংশীয় নৃপতি কণিষ্কের গুরু।

(১) চরকের চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসারে যারা চিকিৎসা করতেন তারাই চরক নামে খ্যাত হতেন এই কারণে পাণিনি চরক অর্থে চরক সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। ঠিক একই ভাবে ধন্বন্তরি অর্থে কোন একজন ধন্বন্তরিকে নির্দিষ্ট করে বোঝাতো না। কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরি প্রবর্তিত শল্য বিদ্যা যারা আয়ত্ত করেছিলেন তারা ধন্বন্তরি নামে খ্যাত হয়েছেন। ধন্বন্তরি অর্থেও ধন্বন্তরি (Surgeon) সম্প্রদায় বোঝাত।

(২) এই প্রবন্ধের সন তারিখ সংগ্রহে The History and Culture of the Indian People by R. C. Mazumdar & A. D. Pusalkar এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

পূর্ব পনের শতকে রচিত হয়েছিল, তা হলে বোধহয় অনুমান করা অসংগত হবে না যে চরক সংহিতা বুদ্ধ জন্মাবার বেশ কয়েক শ বছর আগে রচিত হয়েছিল।

হিন্দু রসায়নী বিদ্যা গ্রন্থে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও চরককে বুদ্ধ পূর্ব যুগের লোক বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পাণিনির সময় নিয়ে তবু না হয় কিছু মতভেদ আছে, মৌর্য অথবা সুঙ্গ কোন যুগের লোক তিনি বলা কঠিন (আনুমানিক খৃষ্ট পূর্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতক)। কিন্তু পতঞ্জলি যে খৃষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন যে বিষয়ে বিশেষ মতভেদ নেই। এই পতঞ্জলি চরক সংহিতার টীকা প্রণয়ন করেছিলেন।১ বলা বাহুল্য, মূল রচনার সঙ্গে সঙ্গেই বা অদূরকাল পরে টীকা রচনার প্রয়োজন হয় না। মূল এবং ভাষ্যের মাঝে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান সচরাচর থেকে থাকে।

চরক সংহিতাকার সে সময়েইজন্মগ্রহণ করে থাকুন না কেন, তাঁকে কিন্তু কোন ক্রমেই প্রথম চিকিৎসা শাস্ত্র প্রণেতা বলা যায় না। চরক প্রকৃতপক্ষে একজন সংকলন কর্তা। চরকের পূর্ববর্তী কয়েকজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী অর্থাৎ অগ্নিবেশ, ক্ষারপানি, জাতুকর্ণ, পরাশর, ভেল এবং হারীতের রচনার উল্লেখ চরক করেছেন। উল্লেখিত অন্যান্যদের রচনাবলীর কোন নিদর্শন এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি সত্য কিন্তু একখানি ভেল সংহিতার আবিষ্কার নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দ্বিতীয় শাখার ক্ষেত্রেও চরকই প্রথম ঐতিহাসিক চরিত্র নন।

চরক নিজেও অগ্নিবেশকে অসাধারণ ধীমান বলে উল্লেখ করে তাঁর কাছে নিজের ঋণ স্বীকার করেছেন। তা ছাড়া চরক সংহিতার পাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে, এটির কোন ব্যক্তি বিশেষের মূল রচনা হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষা একটি সম্মেলনের বিবরণী হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র চরককে বুদ্ধ পূর্ববর্তী বলে মনে করেছেন।২ নির্দিষ্ট ভাবে সন তারিখ

১) পাতঞ্জল-মহাভাষ্য-চরক প্রতি সংস্কৃতৈঃ।
মনোবাককায়দোষানাং হর্ত্রেঽপিপতয়ে নম ॥
চক্রপাণি প্রণীত আয়ুর্বেদ দীপিকা থেকে উদ্ধৃত।
নাগেশভট্ট 'লঘুমঞ্জুষা' গ্রন্থে লিখেছেন,
আপ্তোনাম অনুভবেন বস্তুতত্ত্বস্য কার্ৎস্ন্যেন নিশ্চয়বান।
রাগাদিবশাদপি নান্যথাবাদী যঃ স ইতি চরকে পতঞ্জলী ॥

২) হিন্দু রসায়ণী বিদ্যা—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

নির্দেশ না করলেও চরক যে অন্তত পক্ষে খৃষ্ট পূর্ব সপ্তম শতকের লোক আচার্য রায় তা ঘোষণা করেছেন। চরক আরো পূর্ববর্তীও হতে পারেন। সে যাই হোক, চরক পূর্ববর্তী হারীত, ভেল, পরাশর, জাতুকর্ণ, ক্ষারপাণি ও অগ্নিবেশ প্রমুখ দিকপাল চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের (উদ্ভিজ্জ রাসায়নিক) অস্থিত্ব কি এই কথাই ঘোষণা করে না যে চিকিৎসার বিজ্ঞানের এই শাখাটির সূত্রপাত খৃষ্ট জন্মাবার দুহাজার বছর পূর্বে হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।

চরকের পরবর্তী সুশ্রুত। সম্ভবত বেশ কয়েক শতাব্দী পরের। মহাভারতে সুশ্রুতের পরিষ্কার উল্লেখ আছে। বিশ্বামিত্র মুনির পুত্র সুশ্রুত কাশীরাজ দিবোদাসের কাছে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন এবং নিজ নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। মহাভারতে যথেষ্ট নজীর আছে যা থেকে বলা চলে চিকিৎসা বিজ্ঞানী শল্যশাস্ত্র বিশারদ সুশ্রুত এবং মহাভারতে উল্লিখিত সুশ্রুত একই ব্যক্তি। ১)

চরক এবং সুশ্রুত উভয়ের কেউই চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রথম শাখা (ধাতু বিদ্যা ও পারদ) সম্পর্কে আলোচনা করেন নি। চরক ও সুশ্রুত উভয়েই জৈব রসায়ন, এবং সুশ্রুত বিশেষভাবে শল্য বিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করে গেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা মনে করবার কারণ নেই যে ওঁরা ধাতু ও খনিজের ঔষধিক প্রয়োগ সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন। ঔষধে ধাতু ও আকরের প্রয়োগ সম্পর্কে উভয়েরই যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। চরকে অবশ্য কোথাও পারদের উল্লেখ নেই (২) কিন্তু সুশ্রুতে তাও আছে। তার চেয়ে বড় ঘটনা ভেল সংহিতায় (যা কিছুকাল মাত্র আগে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং চরক ও সুশ্রুত উভয়েই যার কাছে ঋণী) ধাতব ঔষধের ব্যবহার উল্লিখিত আছে।

নানা কারণে, বিশেষত উদ্ভিজ্জ ঔষধপত্র প্রস্তুতীকরণে স্বল্প ব্যয় এবং স্বল্প শ্রমের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে এই

---

১) সর্বশেষ হলেও মহাভারত বর্তমান রূপ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে লাভ করেছে। এই কারণে সুশ্রুতকেও খৃষ্ট পূর্ববর্তী বলে মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে।

২) চরক সংহিতায় তুঁতে. হীরাকস, মনঃশিলা, হরিতাল, গন্ধক প্রভৃতির সাহায্যে ঔষধ তৈয়ারীর প্রণালী বর্ণিত আছে। রৌপ্য স্বর্ণ ও লৌহ দ্বারা এক বলবর্ধক ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবস্থাও চরকে প্রদত্ত হয়েছে।

শাখাটিই বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্য শাখাগুলি কোন সময়েই একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি।

ভেল, চরক, সুশ্রুত এরা কেউই ধাতব রসায়ন বিভাগের চিকিৎসক ছিলেন না, তা সত্ত্বেও এরা ধাতুর ব্যবহারের উল্লেখ করে গেছেন। তাদের সমসাময়িক কালে ধাতব রসায়নের (metalic chemistry) যথেষ্ট চর্চা না থাকলে ঔষধে ধাতু ব্যবহারের এ রকম পর্যাপ্ত উল্লেখ (Ready Reference) কখনই সম্ভব নয়।

ভারতীয় রসায়ন বিদ্যার এই ইতিহাস যদি সংগ্রহ করতে হয় তবে পুরাণ এবং আয়ুর্বেদের লুপ্ত প্রায় পুঁথিগুলির স্মরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি নেই। রসরত্নসমুচ্চয় গ্রন্থে (রচনাকাল সম্ভবত দ্বাদশ শতাব্দী। আচার্য রায়ের মতে আনুমানিক ১৩০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৪৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী) রাসায়নিক ও রসায়ন শাস্ত্রকারদের নামের এক সুবৃহৎ ধারাবাহিক তালিকা রয়েছে। গ্রন্থকার বাগভট নিজে বলেছেন তৎ প্রণীত রসরত্নসমুচ্চয় গ্রন্থখানি প্রকৃতই একখানি সংকলন গ্রন্থ এবং যাদের নাম তিনি করেছেন তাদের এবং অপর কয়েকজন গৌণ রাসায়নিকের গবেষণা তিনি সংকলন করছেন। প্রথমে তিনি সাতাশ জন, যারা একাধারে রাসায়নিক (সিদ্ধ *) এবং রসশাস্ত্র প্রণেতা, তাদের নাম করেছেন। এই নামগুলি হল ঃ

আদিমশ্চন্দ্রসেনশ্চ লঙ্কেশশ্চ বিশারদ ঃ।
কপালী মত্ত মাণ্ডবী ভাস্কর শূরসেনক ঃ॥

---

* 'সিদ্ধ' অর্থে শুধু যোগী বা মুক্ত পুরুষই বোঝায় না। রসসিদ্ধ কথাটি সংক্ষেপে 'সিদ্ধ' হয়েছে। সুশ্রুতে 'রস' কথাটি গাছ গাছরার 'কাথ' হিসাবে ব্যবহৃত হলেও ধাতব রাসায়নিকরা রস অর্থে পারদ বোঝাতেন।

পারদো রসরাজশ্চ রসেন্দ্রশ্চ মহারসঃ।
জীবশ্চ শিববীর্যঞ্চ রসঃ সূতঃ শিবাহ্যয়ঃ॥

'রসসিদ্ধ' অর্থে পারদের ব্যবহারে যারা পারদর্শী। সংক্ষেপে 'সিদ্ধ'। রাসায়নিক-এর প্রতিশব্দ রূপে 'সিদ্ধ' শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে।

রত্নকোষশ্চ শম্ভুশ্চ সাত্যিকী নরবাহন ঃ ।
ইন্দ্রদো গোমুখশ্চৈব কম্বলির্ব্যারীরেব চ ॥
নাগার্জ্জুন সুরানন্দোনাগবোধিযশোধন ঃ ।
খণ্ডকাপালিকোব্রহ্মা গোবিন্দো লম্বকোহরি ঃ ॥
সপ্তবিংশতি সংখ্যাকা রসসিদ্ধি প্রদায়কা ঃ ।
রসাঙ্কুশোভৈরবশ্চ নন্দী স্বচ্ছন্দভৈরব ॥
মন্থানভৈরবশ্চৈব কাকচণ্ডীশ্বর স্তথা ।
বাসুদেব ঋষ্যশৃঙ্গ ক্রিয়াতন্ত্রসমুচ্চয়ী ॥
রসেন্দ্র তিলকোযোগী ভালুকী মৈথিলাহ্বয় ।
মহাদেবো নরেন্দ্রশ্চ বাসুদেবা হরীশ্বর ॥
এতেষাং ক্রিয়তেঽনেষাং তন্ত্রান্যালোক্য সংগ্রহ ।
রসানাময় সিদ্ধানাং চিকিৎসার্থোপযোগিনাম ॥১

১। আদিম* ২। চন্দ্রসেন ৩। লঙ্কাধিপতি রাবণ ৪। লঙ্কেশ্বর ঘাতক রামচন্দ্র ৫। কপালী ৬। মত্ত ৭। মাণ্ডব্য ৮। ভাস্কর ৯। শূরসেন ১০। রত্নকোষ ১১। শম্ভু ১২। সাত্যিকী ১৩। নরবাহন ১৪। ইন্দ্রদ ১৫। গোমুখ ১৬। কম্বলী ১৭। ব্যারী ১৮। নাগার্জ্জুন ১৯। সুরনন্দ ২০। নাগবোধি ২১। যশোধন ২২। খণ্ড ২৩। কাপালিক ২৪। ব্রাহ্ম ২৫। গোবিন্দ ২৬। লম্বক এবং ২৭। হরি।

দ্বিতীয় দলে যে নামগুলি করা হয়েছে সেগুলি রাসায়নিকদের নাম নয়, রসায়ন গ্রন্থ সংকলকের নাম। এরা হলেন ঃ ১। রসাঙ্কুশ ২। ভৈরব ৩। নন্দী ৪। স্বচ্ছন্দ-ভৈরব ৫। মন্থান ভৈরব ৬। কাক-চণ্ডীশ্বর ৭। বাসুদেব ৮। ঋষ্যশৃঙ্গ ৯। ক্রিয়াতন্ত্র সমুচ্চয় ১০। রসেন্দ্র তিলক ১১। যোগী ১২। ভালুকী ১৩। মিথিলা ১৪। মহাদেব ১৫। নরেন্দ্র ১৬। রত্নাকর এবং ১৭। হরীশ্বর।

রসরত্নসমুচ্চয়ের রচয়িতা বাগভট দাবী করেছেন উপরোক্ত প্রত্যেকটি গ্রন্থকারের রচনার তিনি সাহায্য নিয়েছেন। যদি তাঁর এই দাবী সত্য হয়, (সত্য

---

১ রসরত্নসমুচ্চয়-এর প্রথম অধ্যায়, শ্লোক ২ থেকে ৮। রসোৎপত্তি অংশ থেকে উদ্ধৃত।

*। কোন কোন পুঁথিতে আগম শব্দটি আদিম শব্দের পরিবর্তে রয়েছে।

না ভাববার কোন কারণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।) তবে স্বীকার করতেই হবে গত আট শত বছরে উপরোক্ত রাসায়নিকদের অনেক গ্রন্থই কালের করাল গ্রাসে লুপ্ত হয়ে গেছে। এবং ভারতীয় রসায়নের আনুপূর্বিক ইতিহাস আর রচিত হবার সম্ভাবনা নেই। কালোত্তীর্ণ হয়ে আমাদের যুগ পর্যন্ত যে যৎসামান্য তথ্য এসে পৌঁছেছে তার সাহায্যেই দুস্তর সমুদ্রে ভেলা ভাসাতে হবে।

সিদ্ধ বা রাসায়নিকদের মধ্যে আদিম হলেন সর্ব প্রাচীন। তা সত্বেও অন্তত রসরত্নসমুচ্চয় প্রণেতা বাগভটের যুগ পর্যন্ত তাঁর রচনাবলী লুপ্ত হয়ে যায় নি। বাগভট স্বয়ং তাঁর রচনাবলী পাঠ করেছেন বলে দাবী জানিয়েছেন। তাঁর খ্যাতি ভারতবর্ষের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল এমন একাধিক প্রমাণ রয়েছে। Stapleton সাহেব বলেছেন যে, সাবিয়ানদের মধ্যে এ বিশ্বাস বলবৎ ছিল যে ক্ষেমবিদ্যা (Science of Alchemy) ঈশ্বর সর্বপ্রথম সিথ আদিমামকে (Adimum, The Shith) শিখিয়ে ছিলেন।* সিথ্ আদিমাম এবং সিদ্ধ আদিম একই ব্যক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। ভারতীয়রাও আদিমকে প্রথম সিদ্ধ বা রাসায়নিকের মর্যাদা দেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই ভারতীয়দের সঙ্গে সাবিয়ানদের সাংস্কৃতিক সংযোগ ছিল এবং সিদ্ধ আদিমের নামের সঙ্গে পরিচিত হওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। ভরদ্বাজের সময়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চিকিৎসা সম্মেলনে বল্ক রাজ্য থেকে কঙ্কায়ন এসেছিলেন এ কথা চরক সংহিতায় উল্লিখিত রয়েছে। রামায়ণ মহাভারতের যুগেও কান্দাহার, বল্ক, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশের সংগে ভারতের যোগযোগের কথা সর্বজনস্বীকৃত। এই পটভূমিকায় সাবিয়ানদের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করা কঠিন।

এই আদিম সম্ভবত শুক্রাচার্যের শিষ্য ছিলেন।১ এই শুক্রাচার্য

---

* পৃষ্ঠা ৩৯৯। Chemistry of Iraq & Persia.

১) শুক্রাচার্যের অন্য নাম উষানাশ। Stapleton বলেছেন আদিমাম অখনুখ-এর শিষ্য। মুখের ভাষায় বহুক্ষেত্রে স এর উচ্চারণ খ এর মত হয় তাই উষানাশকে অখনুখ ভাববার কারণ আছে।

মৃত সঞ্জীবনীর আবিষ্কারক বলে প্রসিদ্ধ। (১) শুক্রাচার্য পারদের ব্যবহার জানতেন (২) আর জানতেন অমর হওয়ার উপায়। (৩) এ সত্ত্বেও শুক্রাচার্য ভারতীয় রাসায়নিক রূপে স্বীকৃতি পাননি। তার কারণ হল, যদিও তিনি আর্য ও ব্রাহ্মণ বংশজাত তবু তিনি অসুরদের গুরু। (৪) অসুররা আর্য ছিল না। অনার্যদের গুরু বলেই সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম রাসায়নিক শুক্রাচার্যের উল্লেখ ভারতীয় রসায়নশাস্ত্রের কোথাও দেখা যায় না।

বাগভট উল্লিখিত দ্বিতীয় জন হলেন চন্দ্রসেন। দিল্লীর কুতব মিনারের অদূরে যে অত্যাশ্চর্য লৌহস্তম্ভটি আজও বিদ্যমান এটি তাঁর অতুলনীয় কীর্তি বলে মনে করা হয়। কত শতাব্দী আগে এটি নির্মিত হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলার উপায় নেই। আনুমানিকভাবে এটির বয়স হল অন্তত চার হাজার বছর। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রিয় ছাত্র প্রিয়দারঞ্জন রায় বলেছেন, সম্ভবত এটি পুষ্করণের (রাজপুতানা) রাজা চন্দ্রবর্ধনের রাজত্বকালে চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমে নির্মিত হয়েছে।(৫) এই বক্তব্যের স্বপক্ষে একটিও প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঐ লৌহস্তম্ভটির গায়ে খোদিত রয়েছে "রাজা চন্দ্র কর্তৃক বিষ্ণুপদ পর্বতে প্রতিষ্ঠিত।" ইতিহাস ঘেঁটে রাজপুতনায় একজন চন্দ্রবর্ধনকে আবিষ্কার করা যায় বটে কিন্তু প্রমাণ করা যায় না যে তিনিই ঐ লৌহ স্তম্ভটির নির্মাতা। কারণ এ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে

---

১) মৃত সঞ্জীবনী বা Elixir of Life—প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস অন্বেষণ করলে দেখা যায় প্রতিদেশেই কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ নির্মাণ এবং অমরত্ব লাভের চেষ্টা এ্যালকেমি বিদ্যায় কমবেশী প্রেরণা জুগিয়েছে।

২) শুক্রাচার্যের দেহ পারদ নির্মিত এইভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

৩) 'অমর' বলতে সে যুগে চিরকালীন দেহ ধারণ বোঝাত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বেদে বলা হয়েছে অমর দেবতারাও মৃত্যু, জরা ও রোগের অধীন। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে, অমর অর্থে চিরজীবী নয়, দীর্ঘায়ু।

৪) এ্যাসেরিয়ার অধিবাসী নাও হতে পারে তবে নিঃসন্দেহে অসুররা ছিল অভারতীয়।

৫) History of Chemistry in Ancient and Medieval India পৃষ্ঠা ৯৯।

সব থেকে বড় প্রমাণ হল ঐ স্তম্ভটি। ঐ স্তম্ভটিতে পরিষ্কার ভাবে উৎকীর্ণ রয়েছে 'চন্দ্রসেন কর্তৃক বিষ্ণুপদ পর্বতে প্রতিষ্ঠিত' কথাটি। বিষ্ণুপদ পর্বত দিল্লী, রাজপুতানা বা মথুরা কোথাও নেই। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও প্রিয়দারঞ্জন উভয়েই আরো অনুমান করেছেন দ্বিতীয় অনঙ্গপাল যখন দিল্লী নগরী পুনর্গঠন করেন (আনুমানিক ১০৫০ খৃষ্টাব্দে) তখন এটি দিল্লীতে নীত হয়।(১)

প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভারতীয় পুরাণ-ইতিহাসে রাজা চন্দ্রের নাম অসংখ্য বার উল্লেখিত হয়েছে।(২) ইনি যুধিষ্ঠিরাদির পূর্বপুরুষ এবং চন্দ্র বংশের প্রতিষ্ঠাতা।(৩) নিজ বিজয়কীর্তি ঘোষণা করবার জন্য গয়ার বিষ্ণুপদ পর্বতে (গয়ায় বিষ্ণুপদ পর্বত আজো ঐ নামেই খ্যাত এবং সারা ভারতে আর কোথাও বিষ্ণুপদ পর্বত নেই।) এটি প্রতিষ্ঠা করেন। মনে হয়, পরবর্তীকালে যখন তার উত্তরপুরুষরা (চন্দ্রবংশ) দিল্লী বা হস্তিনাপুরে রাজধানী স্থাপন করেন তখন তাদের কোনো একজন অতি সযত্নে তাঁদের পূর্বপুরুষের এই অক্ষয় কীর্তিটি অটুট অবস্থায় দিল্লীতে স্থানান্তরিত করেন। এই স্থানান্তর কার্য যে অতি যত্নের সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই, কারণ এই স্থানান্তরে স্তম্ভটি আদৌ ক্ষতিগ্রস্থ হয় নি। এই ঘটনাটিও অনঙ্গপালের স্তম্ভটি লুণ্ঠনের বিপক্ষে সাক্ষী দেয়। 'দস্যুতার ক্ষেত্রে স্তম্ভটির ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক। স্তম্ভটি যে পূর্বে দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল না, এ বিষয়ে সকলে একমত। মথুরা অথবা গয়া

(১) ঐ, পৃষ্ঠা ৯৯।

(২) চন্দ্রসেন থেকে চন্দ্র বংশের উৎপত্তি। যুধিষ্ঠিরের ৩২৩ম পূর্বপুরুষ ইনি। এই হিসাবে যুধিষ্ঠিরের জন্মের আনুমানিক ৮০০ বছর আগে তাঁর রাজত্ব কাল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাল তথা যুধিষ্ঠিরাদির সময় নির্দেশ পরবর্তী অংশে করা হয়েছে।

(৩) ইংরাজি অনুবাদে চন্দ্রবংশ **lunar Dynasty** তে পরিণত হয়েছে। তার ফলে মনে হয়, আকাশের চন্দ্রই বুঝি এই বংশের আদিপুরুষ। ফলে, ইতিহাসের যোগসূত্র হারিয়ে যায়। চন্দ্রসেন, অর্থাৎ রাজা চন্দ্র (সেনা শব্দের দুটি অর্থ হয় রাজা ও যোদ্ধা। এক্ষেত্রে রাজা অর্থই প্রযুক্ত হবে।) চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁকে আকাশের চন্দ্র বলে মনে করা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। তিনি আমাদের মতই মানুষ।

স্তম্ভটি যেখানেই নির্মিত হয়ে থাকুক না কেন, প্রাচীন ভারতের রসায়ন চর্চা উন্নতির কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল এই স্তম্ভটি তার জলন্ত প্রমাণ। চার হাজার বছর আগেরই হোক, বা ষোল শ বছর (শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন-রায়ের মতানুসারে) আগেরই হোক এই স্তম্ভ নির্মাণ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। স্তম্ভটি ২৪ ফিট লম্বা, নীচের দিকে ব্যাসের পরিমাণ ১৬·৪ ইঞ্চি। ক্রমে সরু হয়ে উপরে উঠে গেছে। একেবারে উপরে এটির ব্যাস ১২ ইঞ্চি। শীর্ষদেশে ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি অংশে কারুকার্য ক্ষোদিত রয়েছে। স্তম্ভটির আনুমানিক ওজন হল প্রায় ১৬০ মন। পরীক্ষা করে দেখা গেছে স্তম্ভটি নির্মাণে কোন প্রকার এ্যালয় (Alloy) ব্যবহৃত হয়নি। বিশুদ্ধ লোহা খনি থেকে সংগ্রহ করা অসম্ভব ব্যাপার। Hadfield পরীক্ষা করে দেখেছেন বিশুদ্ধ লোহার আপেক্ষিক গুরুত্বের (৭·৮৪) প্রায় কাছাকাছি এর আপেক্ষিক গুরুত্ব (৭·৮১)। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এর শতকরা ৯৯·৭২ ভাগ লোহা, কার্বণ ০·০৮ ভাগ, সিলিকন, ০·৮৬ ভাগ, গন্ধক ০·০০৬, ফসফরাস ০·১১৪ ভাগ এবং ম্যাঙ্গানিজ নেই।(১) ম্যাঙ্গানিজের অস্তিত্বই নেই, এটা খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ ব্যাপার। তাছাড়া গন্ধকের অস্তিত্বও প্রায় নেই বললেই চলে। আধুনিক রাসায়নিকদের মতে, এই ঘটনাগুলি তখনই সম্ভব যদি কাঠকয়লার অল্প আগুনে (!) এটির নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এর পরের প্রশ্ন হল, লোহার পরিশুদ্ধি করণ। খনি থেকে এত শুদ্ধ লোহা পাওয়া সম্ভব নয়, তবে কেমন করে এটির নির্মাণ কার্য সম্ভব হল ?

সবচেয়ে বড় কথা স্মরণাতীত কাল থেকে উন্মুক্ত পরিবেশে থাকা সত্ত্বেও এটিতে বিন্দুমাত্র মরচে ধরেনি। মরচে-বিহীন শেফিল্ড ইস্পাতের মত এটি চির অম্লান। ম্যাঙ্গানিজ, কার্বন এবং গন্ধকের প্রায় অনুপস্থিতি এবং তুলনায় ফসফরাসের অতিরিক্ত উপস্থিতি মরচে না ধরার পক্ষে কিছুটা সহায়তা করেছে সন্দেহ নেই. কিন্তু এটা কখনই শেষ কথা নয়। এটি একমাত্র তখনই সম্ভব হতে পারে যদি সম্পূর্ণ স্তম্ভটির উপরের স্তরটি পাতলা মাগনেটিক অক্সাইড দ্বারা আবরিত থাকে। স্তম্ভটি নির্মাণে এই কৌশল অবলম্বিত হয়েছিল। উত্তপ্ত লোহাকে বারংবার বিভিন্ন লবণ (সল্ট), ক্ষার

(১) Journal of the Iron and Steel Industries।

(alkali) ও জৈব পদার্থ (organic subestance) ডুবিয়ে মরচে প্রতিরোধ করার কৌশল ভারতীয় রাসায়নিকরা জানতেন।*

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এ স্তম্ভটি হল ভারতীয় ধাতব বিদ্যা ও ভারতীয় শ্রমিকদের ইঞ্জিনীয়ারিং দক্ষতার অতুলনীয় নিদর্শন। তারা অনুমান করেছেন, অন্তত ৩২০টি বিভক্ত অংশ (প্রতিটি অংশের ওজন আনুমানিক আধ মন) ওয়েল্ডিং-এর সাহায্যে জুড়ে এই স্তম্ভটি নির্মাণ করা হয়েছে। স্তম্ভটির গায়ে ওয়েল্ডিং-এর কোন চিহ্ন নেই, তবু তাদের এ রকম অনুমানের কারণ হল, "সেই আদিযুগের চুল্লীতে একসঙ্গে এত বড় স্তম্ভ নির্মাণ এক অসম্ভব ব্যাপার।"

তাদের এই মন্তব্যটিই হল প্রাচীন ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং, ধাতব বিদ্যা তথা রসায়ন বিদ্যার উৎকর্ষের সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি।

বাগভট রাসায়নিক হিসাবে এরপর নাম উল্লেখ করেছেন লঙ্কেশ্বর রাবণ এবং লঙ্কেশ্বর ঘাতক রামচন্দ্রের। এ দুটি নামের উল্লেখ সাধারণ পাঠকের কাছে কিছুটা বিভ্রান্তিকর বলে বোধ হতে পারে। মনে হতে পারে, বাগভট অবতার রামচন্দ্রকে সর্বগুণান্বিত রূপে চিত্রিত করবার জন্যই সম্ভবত রামচন্দ্রের নাম উল্লেখ করেছেন। এর উত্তরে বলা যেতে পারে, ভারতীয় পুরাণ বা মহাকাব্যে একমাত্র রামচন্দ্রই অবতার রূপে কীর্তিত নন। আরও অনেক অবতার রয়েছেন। তাদের কেউই বাগ্‌ভটের দ্বারা রাসায়নিকরূপে (সিদ্ধ) বন্দিত নন এমন কি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও নন। রামচন্দ্র যথার্থ রাসায়নিক বলেই বাগভটের কাছ থেকে ঐ মর্যাদা পেয়েছেন, যেমন পেয়েছেন বহুনিন্দিত রাবণ। রামচন্দ্র এবং রাবণের নামোল্লেখে বিভ্রান্তির কোন কারণই নেই বরং এক হিসাবে আনন্দের কারণ রয়েছে। রামচন্দ্র এবং রাবণের নামোল্লেখ করায় ভারতীয় রসায়ন চর্চার সময় নির্দেশ করার পথ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে।

রামায়ণ ও মহাভারত, উভয়ই কাব্য এবং এর কাহিনী বহুলাংশে পল্লবিত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ভারতীয় অষ্টাদশ পুরাণও বহু অলৌকিক কাহিনীর আবরণে এমনভাবে আবৃত যে তা থেকে সত্য ইতিহাস

---

* পরবর্তী অধ্যায়ে এই পদ্ধতিগুলির বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

আবিষ্কার করা সহজ নয়। এ সত্ত্বেও একথা মানতেই হবে, যত পল্লবিতই হোক না কেন, রামায়ণ এবং মহাভারতের কেন্দ্রীয় দুটি ঘটনা, অর্থাৎ লঙ্কা-বিজয় এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, ঐতিহাসিক ভাবেও সত্য। প্রথমে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথাই ধরা যাক, মহাভারতের মধ্যেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাল নির্দেশ করা রয়েছে, ভীষ্মের মৃত্যু প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

দৃষ্টেয়া প্রাপ্তোস্মি কৌন্তেয় মহামাত্যো যুধিষ্ঠির।
পরিবৃত্তৌ হি ভগবান সহস্রাংশু দিবাকর।
অষ্ট পঞ্চাশতং রাত্র শমানস্য দ্যমে গতঃ।
মাঘোহয়ং সমন্তপ্রাপ্তৌ মাসঃ সৌমেঃ যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগ শেষ পক্ষীয়ং শুক্লা ভবিতুমর্হতি ॥*

ভারত যুদ্ধের দশমদিনে ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান হন। উপরের শ্লোক থেকে বোঝা যায়, তিনি আরো আটান্ন দিন শরশয্যায় শায়িত ছিলেন এবং উনষাট দিনে দেহত্যাগ করেন। উপরোক্ত শ্লোকে বলা হয়েছে সৌর মাঘ মাসের শুল্কা অষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে ঠিক মধ্যাহ্নকালে ভীষ্মের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে সূর্যের দক্ষিণায়ণ গতি বন্ধ হয়ে উত্তর দিকে যাত্রা সুরু হয়েছে এবং মাঘ মাসের তিন চতুর্থাংশ তখনও অনতিবাহিত রয়েছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্বেও উল্লিখিত রয়েছে ভীষ্ম আটান্নদিন শরশয্যায় শায়িত থাকার পর দেহত্যাগ করেছিলেন।

উপরের শ্লোক থেকে ভারতযুদ্ধের বছরে উত্তরায়ণ সুরু হবার তারিখটি আমরা পাই। মাঘ মাসের শুক্লাঅষ্টমী এখন পর্যন্ত ভীষ্ম অষ্টমী নামেই খ্যাত হয়ে আসছে এবং ভীষ্ম যে মাঘ মাসের অষ্টমদিনের দ্বিপ্রহরে শুক্লাষ্টমী তিথিতে দেহত্যাগ করেছিলেন এবং ভারতযুদ্ধের সুরু ও ভীষ্মের মৃত্যুর মধ্যে ৬৮ দিনের ব্যবধান ছিল একথা মনে করবার কারণ রয়েছে। যেহেতু মাঘ মাসের পূর্ববর্তী দুটি সৌর মাস (পুষ্যা এবং মার্গশীর্ষ) কোন বছরেই একত্রে ৫৯ দিনের বেশী হতে পারে না। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে অমাবস্যায় কার্তিক সংক্রান্তিতে যুদ্ধ সুরু হয় (মহাভারতে উল্লেখ আছে অমাবস্যার দিনে ভারত যুদ্ধ সুরু হয়েছিল)। উপরোক্ত তথ্যগুলিকে অবলম্বন করে একটি জটিল গাণিতিক ও জ্যোতিষিক হিসাব করে মহাভারতের যুদ্ধের কাল নির্ণয় এখানেই করা যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু এই দুরুহ কাজটি

* শান্তি পর্ব, ৪৬ অধ্যায় ১ থেকে ৪ শ্লোক।

ইতিপূর্বেই লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ও অন্যান্য কোন কোন মনীষী সম্পন্ন করেছেন সুতরাং ভারত যুদ্ধের কাল নির্ণয়ে তাদের মতামত গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং এ, ডি, পুশলকার সম্পাদিত গ্রন্থেও আনুমানিক খৃঃ পূর্ব ১৪০০ অব্দকে ভারত যুদ্ধের কাল বলে নির্দেশ করা হয়েছে এবং তাদের মতে লঙ্কাবিজয় ঘটেছিল আরো কয়েকশ বছর আগে অর্থাৎ অন্ততপক্ষে খৃঃ পূর্ব ১৯৫০ অব্দের পরে নয়।(১) 'পুরাণ প্রবেশ' গ্রন্থে শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু ১৪১৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দকে ভারত যুদ্ধের কাল রূপে নির্দিষ্ট করেছেন এবং রামচন্দ্রের জন্মকাল রূপে খৃষ্ট পূর্ব ২১১৪ অব্দ নির্দিষ্ট হয়েছে।(২)

(১) The History and Culture of the Indian People—Vedic Age, উপরোক্ত মত স্বয়ং এ, ডি, পুশলকার ব্যক্ত করেছেন।

(২) শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু পর্যায় গণনার আশ্রয় নিয়েছেন। এ ছাড়া তিনি বায়ুপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণের সহায়তা গ্রহণ করেছেন। মহারাজ নন্দ ঐতিহাসিক চরিত্র। নন্দের রাজ্যাভিষেক কাল খৃষ্ট পূর্ব ৪৩১ অব্দ। বিষ্ণুপুরাণে রাজা পরীক্ষিত ও মহাপদ্ম নন্দর মধ্যবর্তী কাল এই ভাবে বর্ণিত রয়েছে ঃ—

যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্
এতদবর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম ॥

বিষ্ণুপুরাণ। বঙ্গবাসী সংস্করণ ২৪।৩২

অর্থাৎ উভয়ের মধ্যবর্তীকাল এক হাজার পনের বছর। ভারত যুদ্ধের সময় অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিত গর্ভস্থ ছিলেন। তার জন্মের কয়েক মাস পূর্বে ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। গিরীন্দ্রশেখর বসু এই কারণে ১৪১৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দকে ভারত যুদ্ধের কালরূপে নির্দেশ করেছেন। ইক্ষাকু বংশীয় শেষ রাজা বৃহদ্বল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত হন। ইনি রামচন্দ্রের উত্তরপুরুষ। উভয়ের মধ্যে পর্যায় বিচার করে গিরীন্দ্রশেখর বসু উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই বিচার সম্পূর্ণ নির্ভুল নাও হতে পারে, তবে আনুমানিক কাল নিশ্চিত ভাবেই পাওয়া যায়। গিরীন্দ্রশেখর বসুর মতে রামচন্দ্র এখন থেকে ৪০৭৬ বছর আগে জীবিত ছিল। রামচন্দ্র অপেক্ষা রাবণ বয়সে কিছু বড় ছিলেন, কিন্তু উভয়েই সমসাময়িক। পর্যায় বিচার করে রাজা চন্দ্র বা চন্দ্রসেনকে

রাবণ বা রামের জন্মসময় সম্পর্কে কিছু মতভেদের অবকাশ থাকলেও তাদের উভয়েই যে অসাধারণ রাসায়নিক ছিলেন এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। সে যুগের শ্রেষ্ঠ শাসক, রাজনীতিজ্ঞ রাক্ষসরাজ রাবণ অনার্য বলেই আর্য কবির দ্বারা নিন্দিত হয়েছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের কাছে তিনি পরমবন্দিত। আয়ুর্বেদে এখনও যে সব ঔষধ ব্যবহৃত হয় তার অনেকগুলির উদ্ভাবক রাবণ। তা ছাড়া ঔষধে প্রথম ধাতুর ব্যবহার রাবণের অতুল কীর্তি। পারদের প্রয়োগও সর্বপ্রথম রাবণই করেছেন। 'মদনানন্দ মোদক' নামে আয়ুর্বেদোক্ত যে উত্তেজকটির প্রচলন আজো রয়েছে রাবণই সেটির উদ্ভাবনকর্তা। গন্ধক, পারদ এবং অভ্র সহযোগে এই ঔষধটি প্রস্তুত হয়। প্রতাপ লঙ্কেশ্বর রস এবং লঙ্কাদ্বীপেশ্বর রস প্রভৃতি বহুখ্যাত আয়ুর্বেদীয় ঔষধগুলিরও আবিষ্কর্তা রাবণ। এই ঔষধগুলির প্রত্যেকটিতে ভস্মীকৃত পারদ, অভ্র, গন্ধক ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন ঔষধে হরিতাল ও মনঃশিলার ব্যবহারও দেখা যায়। রাবণ যে শুধু পারদের ব্যবহার জানতেন তাই নয়, পারদ ভস্ম করার পদ্ধতিও অবগত ছিলেন।* এই ঔষধগুলি কুষ্ঠরোগ নিরাময়ক। কালের করাল গ্রাস অতিক্রম করে রাবণের একখানি বই আজো বেঁচে রয়েছে। বইখানির নাম অর্কপ্রকাশ। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বইখানি অর্বাচীন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। গ্রন্থে অর্কপ্রকাশ ফিরিঙ্গি রোগের উল্লেখ দেখে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন

আনুমানিক ২২৭০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের বলে ধারণা করা যেতে পারে। যুধিষ্ঠিরের ৩২তম উর্দ্ধতন পুরুষ এই চন্দ্রসেন। ভারত যুদ্ধের সময় যুধিষ্ঠিরের বয়সে ৪৬ বলে উল্লিখিত হয়েছে। প্রতি পর্যায়ে বয়সের অন্তর ২৫ বলে গণনা করলে চন্দ্রসেনকে ১৪১৬+৮৪৬=২২৬২ খৃষ্ট-পূর্বাব্দের বলে অনুমান করা চলে। এই কারণে, লৌহস্তম্ভের নির্মাণ অন্তত চার হাজার বছর পূর্বের বলে অনুমান করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। বাগভট চন্দ্রসেনকে রাবণ এবং রামের চেয়ে প্রাচীন বলে মনে করতেন। এই ঘটনাও উপরোক্ত অনুমানের স্বপক্ষেই যায়। ঋক্ বেদ অন্তত খৃষ্ট পূর্ব দেড় হাজার বছরের পুরাতন। রাম প্রভৃতির উল্লেখ তাতে না থাকলেও চন্দ্র, তৎপুত্র বুধ এবং পৌত্র পুরূরবার উল্লেখ তাতে আছে। চন্দ্রসেনকে রাবণ এবং রামের পূর্ববর্তী হিসাবে বাগভট সঠিক ভাবেই নির্দেশ করেছেন, এ হল তার আর এক প্রমাণ।

* দ্রষ্টব্য···নিত্যনাথ।

অর্কপ্রকাশ গ্রন্থে ফিরিঙ্গি রোগের উল্লেখ দেখে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের আগমনের পরবর্তী যুগে, সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দী পরবর্তী যুগে রচিত এটি একটি অর্বাচীন গ্রন্থ। সঙ্গে সঙ্গে এ সিদ্ধান্তও করা হয়েছে, 'অর্ক' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে আরবী 'আরক' শব্দ থেকে।

আক্ষেপের ব্যাপার, এ যুগের অনেকেই মনে করে থাকেন, সিফিলিস বা ফিরিঙ্গি রোগটি ইউরোপীয়দের আমদানী। অতীত ভারতবর্ষে 'সিফিলিস' রোগ ছিল না এ কথা মনে করলে দেশকে ভালবাসা হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ হওয়া যায় না। 'সিফিলিস' অতীত ভারতবর্ষে প্রিয়ঙ্গ রোগ নামে পরিচিত ছিল (প্রিয়ঃ অঙ্গ রোগ)। ১ চরক এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থে সিফিলিসের উল্লেখ নেই কিন্তু গণোরিয়া বা উপদংশের উল্লেখ আছে। এ থেকে অনেকে সিদ্ধান্ত করেছেন, প্রাচীন ভারতে সিফিলিস ব্যাধি ছিল না। চরকাদি গ্রন্থে সিফিলিসের উল্লেখ না থাকার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করতে হবে। সে কারণ আর যাই হোক,সিফিলিস রোগের অস্তিত্ব না থাকা তার কারণ নয়।

চরকাদি গ্রন্থে সিফিলিস রোগের উল্লেখ না থাকার আর একটি সম্ভাব্য কারণ রয়েছে। সে কারণটি হল, (২)চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে চারটি বিভাগের উল্লেখ পূর্বে করেছি, তার মধ্যে দ্বিতীয় অর্থাৎ ভেষজ চিকিৎসায় প্রিয়ঙ্গ রোগ এবং উপদংশ রোগ উপশমের জন্য একই চিকিৎসা বিধি অনুসৃত হত। তাছাড়া সিফিলিস ও গণোরিয়ার মধ্যে উৎপত্তি ও সংক্রমণ ইত্যাদি ব্যাপার কতকগুলি আপাত ঐক্য থাকায় দুটি নামের ব্যবহার ক্রমে লুপ্ত হয়ে আসে এবং উপদংশ নামে উভয় ব্যাধিই পরিচিত হতে থাকে। কিন্তু অন্য নামটি একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি।

১) রসজলনিধি—৫ম খণ্ড ভূমিকা পৃষ্ঠা ২১।

২) এমন হতে পারে, চরক হয়ত সিফিলিস রোগের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না অথবা সিফিলিস ও গণোরিয়ার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারেন নি। চরক সর্বক্ষেত্রেই নির্ভুল ছিলেন এ কথা মনে করবার কারণ নেই। চরক সংহিতার মধ্যেই তার বহু প্রমাণ রয়েছে। চরক মানব-দেহে অস্থি-র সংখ্যা ৩৬০ বলে নির্দেশ করেছিলেন। পরবর্তী যুগে এটি অসত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

শুধু অর্কপ্রকাশে নয়, 'ভাবপ্রকাশ', (যা সন্দেহাতীত ভাবে প্রাক-ইউরোপীয় যুগে রচিত, তাতেও এই রোগের উল্লেখ আছে।

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায়, সিফিলিস রোগ ইউরোপ থেকে আমদানী, তা হলে প্রশ্ন থাকে, ঐ রোগের নাম ফিরিঙ্গি রোগ হবে কেন। ইউরোপীয়দের মধ্যে শুধু ফ্রেঞ্চ বা ফরাসীরাই প্রথমে এদেশে ফিরিঙ্গি নামে খ্যাত হয়েছিল।* অনেক পরে শব্দটির অর্থবিস্তার ঘটে তখন ইউরোপীয় মাত্রকেই ফিরিঙ্গি বলা হয়। ফরাসীরা প্রথমে ভারতে আসে নি। পর্তুগীজ ও ইংরাজেরা এদেশে অনেক আগে এবং প্রচুর সংখ্যায় এসেছে এবং তাদের মধ্যে সিফিলিস রোগও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল কিন্তু তাদের নামে নামকরণ হল না কেন রোগটির? হতভাগ্য ফরাসীরা কেন অভিযুক্ত হল? এর চেয়ে একথা মনে করা কি অনেক সহজ নয়, প্রিয়ঙ্গ রোগটি চলতি উচ্চারণে বিশেষ করে ইউরোপীয়দের এদেশে আসার পর (যাদের মধ্যে ফিরিঙ্গি বা ফ্রেঞ্চরাও রয়েছে) তাদের মধ্যে ঐ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখে এবং প্রিয়ঙ্গ ও ফিরিঙ্গি শব্দ দুটির ধ্বনি সামীপ্যের জন্য প্রিয়ঙ্গ কথাটি ফিরিঙ্গিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অশিক্ষিত অনুলেখকের (copiest) গুণেও এটি ঘটে থাকতে পারে।

'অর্কপ্রকাশ' গ্রন্থে ফিরিঙ্গি রোগের উল্লেখ দেখে আচার্য রায় সমগ্রভাবে গ্রন্থখানির প্রাচীনত্বকেই নস্যাৎ করে দিয়েছেন। যদি এমনও হয় যে এদেশে ঐ রোগটি আধুনিক, তাতেও বইটির প্রাচীনত্ব অস্বীকৃত হতে পারে কি? এ কথা কারও অজানা নয় যে, প্রায় সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যেই কিছু কিছু প্রক্ষেপ ঘটেছে। রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, ঋতুসংহার কোনটিই বা তার ব্যতিক্রম? প্রক্ষেপ ঘটেছে শুধু এই কারণে নিশ্চয়ই আমরা বইগুলির প্রাচীনত্বে সংশয় পোষণ করি না। যথাসম্ভব প্রক্ষেপগুলি বর্জনের চেষ্টা করে থাকি। 'ভাবপ্রকাশ' এবং 'অর্কপ্রকাশ' প্রভৃতি গ্রন্থ যদি একইভাবে কিছু প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, যদি আধুনিক ফিরিঙ্গি রোগের বৃত্তান্ত তাতে সংযোজিত হয়েই থাকে, তৎক্ষণাৎ কি বইখানি আধুনিক হয়ে যাবে?

গবেষক কি এই প্রক্ষেপগুলি খুঁজে বার করে নেবেন অথবা প্রক্ষেপের নজীর তুলে প্রাচীনত্বকে অগ্রাহ্য করবেন? 'অর্ক' কথাটির উৎপত্তি আরবী আরক থেকে (যেন বিশুদ্ধ সংস্কৃতে 'অর্ক' যার অর্থ সূর্য, বলে কোন কথা নেই)

* ফ্রেঞ্চ—ফেরঙ্গ—ফিরিঙ্গি

এ সিদ্ধান্তও সমান অস্থিরতার পরিচায়ক। আচার্য রায় যদি মনে রাখতেন, মধ্যযুগের ভারতে রাবণ মোটেই বন্দিত ছিলেন না এবং নিজের নাম গোপন করে রাবণের নামে পুস্তক প্রণয়নে সে যুগে সামান্যই লাভের সম্ভাবনা তা হলে সম্ভবত বইখানির ভাগ্যে আর একটু সযত্ন বিচার ঘটত।

ভারতীয় রসায়ন গগনের এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হলেন অযোধ্যাপতি দশরথ পুত্র শ্রীরামচন্দ্র। চৌদ্দ বৎসর বনবাসকালে দণ্ডকারণ্যের মুনিদের কাছে তার রসায়ন শাস্ত্রে দীক্ষা। তাঁরাই ওর নামকরণ করেছিলেন দণ্ডকনাথ বা দণ্ডকারণ্যের অধীশ্বর। এইখানেই তিনি রসায়ন ও ক্ষেমবিদ্যায় শিক্ষিত হন। যাদের কাছে তিনি শিক্ষালাভ করেন তাদের মধ্যে প্রধান দুজন হলেন সিদ্ধ কলানাথ ও সিদ্ধ লক্ষ্মীশ্বর। 'সিদ্ধ' শব্দটির অর্থ শুধু যোগী নয়, রাসায়নিকও বটে। এই রাসায়নিক-রাজার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান 'রামরাজ্য' গ্রন্থখানি।১

আশ্চর্যের ব্যাপার **History of Hindu Chemistry**র কোথাও আচার্য রায় এই গ্রন্থখানির উল্লেখ করেন নি। মনে হয়, এই গ্রন্থখানির অস্তিত্বের কথা তাঁর অজ্ঞাত ছিল। বইখানির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে থাকুক বা না থাকুক 'রসরত্নসমুচ্চয়' ও 'ভাবপ্রকাশ' গ্রন্থে 'রামরাজ্যে'র প্রসঙ্গ রয়েছে। এ রকম ক্ষেত্রে গ্রন্থখানি সম্পর্কে আচার্য রায়ের একান্ত নৈঃশব্দ্য বিস্ময়কর। প্রাচীন হিন্দু রসায়ন বিদ্যার অধিকাংশই এই গ্রন্থখানির অবদান। বইখানির মৌলিকতা ও রচয়িতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয়েরও অবকাশ নেই নাগার্জুনের 'রসরত্নাকরে'র চেয়ে গ্রন্থখানি অনেক প্রাচীন। 'রামরাজ্য' গ্রন্থখানির মঙ্গলাচরণে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যিনি কলানাথ ও লক্ষ্মীশ্বরের কাছে রসবিদ্যা শিক্ষা করেছেন সেই সূর্যবংশ সম্ভূত দশরথ পুত্র অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র এই গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থেরই অন্যত্র রয়েছে "নিজকৃত সুবর্ণ রচিত পত্নীবিগ্রহ ঃ"।* রামায়ণেও এই স্বর্ণ সীতা নির্মাণের কাহিনী পাওয়া যায়। 'রামরাজ্য' গ্রন্থে স্বর্ণ নিষ্কাশন, পরিশুদ্ধিকরণ প্রভৃতির বিষয় বিস্তৃত

১ এই গ্রন্থখানির একটি অতি জীর্ণ অনুলিপি আমাদের পারিবারিক সংগ্রহশালায় দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষিত ছিল। সম্ভবত পাণ্ডুলিপিখানি এখন রাজবৈদ্য কবিরাজ ডক্টর প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়ের কাছে রয়েছে।

* 'ভাবপ্রকাশ' গ্রন্থেও এই পংক্তিটি রামরাজ্য থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এর আগের কোন কোন গ্রন্থে স্বর্ণের উল্লেখ আছে কিন্তু খনি থেকে নিষ্কাশিত স্বর্ণ বা কোন ধাতু পরিশুদ্ধিকরণের আলোচনা নেই।*

আগেই বলা হয়েছে, এই বইখানির সঙ্গে সম্ভবত আচার্য রায়ের পরিচয় ঘটে নি। কিন্তু রসরত্নসমুচ্চয় ও ভাবপ্রকাশ এই উভয় গ্রন্থের সঙ্গেই তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। এই দুটি বই-ই 'রামরাজ্য' বইখানিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। রামরাজ্য থেকে ভাবপ্রকাশে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

সত্যোঽনুভূতোযোগীন্দ্রৈঃ ক্রমোঽয়ং লৌহমারণে।
কথ্যতে রামরাজেন কৌতুহলধিয়াঽধুনা ॥১

অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন রাজা রামচন্দ্র যোগীদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন—ইতিহাসে, পুরাণে কোথাও তার কোন নজীর পাওয়া যায় না।

এই রামচন্দ্রই আর একখানি বিখ্যাত রাসায়নিক গ্রন্থ 'রসেন্দ্র-

---

* ঋগ্বেদে উল্লিখিত আছে ইন্দ্র এবং মরুৎগণ (পবনের ৪৯ জন সেনাপতি) —অশ্বারোহী, উষ্ণীষ ও বর্মধারী ছিলেন। এই বর্ম ধাতব। ঋক। ৭ম। ২৫। ৩। ৫॥ ৫৩। ৪॥ ৫। ৫৪। ১১॥ ৫। ৫৪। ৬॥ ৮। ৭। ২৫॥ ৮। ২০। ২২॥ জাম্বু নদ (সম্ভবত কাশ্মীরের জম্বু নদী) থেকে এই স্বর্ণ সংগৃহীত হতো।

অশ্বিনীকুমারদ্বয় বিশপলার পায়ে অস্ত্রোপচার করে কৃত্রিম লোহা পদ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এই লোহা অর্থে লৌহ নাও হতে পারে লোহা অর্থ সে যুগে Hard metal বোঝাত। টিন, সীসা, তামা, লৌহ রূপা পঞ্চবিধ ধাতু লোহা নামে আখ্যাত ছিল।

চন্দ্র সেন ধাতু নিষ্কাশণের কৌশল নিশ্চয়ই জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু তার কোন রচনা পাওয়া যায় না।

রাবণও সম্ভবত স্বর্ণের ব্যবহার জানতেন। স্বর্ণলঙ্কাপুরী শব্দটি অর্থ-দ্যোতক কিন্তু ঔষধের ক্ষেত্রে স্বর্ণের প্রয়োগ করেন নি। এবং অর্কপ্রকাশ গ্রন্থে ধাতু বা স্বর্ণ নিষ্কাশনের কোন আলোচনা নেই। খনিজ স্বর্ণের উল্লেখ রামচন্দ্রই প্রথম করেছেন।

১ অর্থ—ধাতু ভস্ম করবার পদ্ধতি রাজা রাম কৌতুহল প্রবশত যোগীদের নিকট থেকে শিক্ষা করেছিলেন।

'চিন্তামনির' প্রণেতা। আচার্য রায় এই বইখানির উল্লেখ করে বলেছেন,"I came accross two different kinds of manuscripts, some of which ascribe the authorship to Ramachandra where as the rest of them to Dhundukanath, disciple of Kalanath" ১কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার দুই ধরণের পাণ্ডুলিপিতে দুটি নামের উল্লেখ থাকা সত্বেও রামচন্দ্র যে বইখানির প্রণেতা হতে পারেন সে সম্ভাবনাকে আচার্য রায় আদৌ আমল দেন নি। বইখানির রচয়িতারূপে তিনি অজ্ঞাত কুলশীল ঢুণ্ঢুকনাথকে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু কে এই ঢুণ্ঢুকনাথ? ভারতীয় ইতিহাসে, পুরাণে, কাব্যে, রসায়নের ইতিহাসে কোথাও কি তাঁর সাক্ষাৎ মেলে। কোনো পরিচয়, বিন্দুমাত্র নামোল্লেখ পর্যন্ত কি পাওয়া যায় কোনখানে? রসেন্দ্র-চিন্তামনির মত গ্রন্থ এক অকল্পনীয় প্রতিভার স্বাক্ষর। গ্রন্থখানির প্রণেতা রামচন্দ্র বা ঢুণ্ঢুকনাথ (!) যেই হোন না কেন, যিনি সে যুগে বসে বলতে পারেন ঃ

"অশ্রৌষং বহুবিদুষাং মুখাদপশ্যং
শাস্ত্রেষু স্থিতম কৃতম ন তল্লিখানি।
যৎকর্ম ব্যরচয়মগ্রতো গুরূনাং
প্রৌঢ়ানাং··· ॥
অধ্যাপয়ন্তি যদি দর্শয়তুম ক্ষমন্তে
সুতেন্দ্র কর্মগুরবো গুরবস্ত এব।
শিষ্যাস্তু এব রচয়ন্তি গুরো পুরো যে
তেষাং পুনস্তদভয়াভিনয়ং ভজন্তে ॥

তাঁর মতো অলোকসামান্য প্রতিভা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল—এও কি সম্ভব? ভারতবাসী জাতি হিসাবে আত্মবিস্মৃত কিন্তু তাদেরও ইতিহাসে এরকম আর দ্বিতীয় একটি নজীরও আছে কি?

আচার্য রায় রাসায়নিক রূপে রামচন্দ্রকে স্বীকার করতে রাজী নন। কারণ তাকে স্বীকৃতি দিলে বৌদ্ধ তান্ত্রিকরাই এদেশে এ্যালকেমি তথা রসায়ন বিদ্যার উদ্ভাবক তাঁর এই অনুমানভূমি (hypothesis) নাকচ হয়ে যায়। আচার্য রায় সিদ্ধান্ত করেছেন রসেন্দ্রচিন্তামনি গ্রন্থখানি ঢুণ্ঢুকনাথের রচিত এবং এই গ্রন্থখানি শম্ভুর 'রসার্ণব' গ্রন্থের নিকট ঋণী।২ শম্ভু

১ ভূমিকা—History of Hindu Chemistry—IInd. Vol.

২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও গ্রন্থাবলী, পৃষ্ঠ ১৭১।

আবার নাগার্জুনের রসরত্নকর গ্রন্থ থেকে হুবহু নকল করেছেন সুতরাং বইখানি চতুর্দশ শতকের পূর্বে রচিত নয়।

চুণ্চুকনাথের কর্মকাল যদি চতুর্দশ শতকে হয় তবে প্রশ্ন জাগে তার মত বিরাট প্রতিভা এত অল্প সময়ের মধ্যে কেন সম্পূর্ণ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল। তার কোন জবাব দেবার চেষ্টা আচার্য রায় করেন নি। চুণ্চুকনাথের পরিচয় কি? তার উত্তরে আচার্য রায়ের মতানুগামীরা জানিয়েছেন তিনি একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু।১ চুণ্চুকনাথ যদি বৌদ্ধ ভিক্ষুই হবেন তবে তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে হিন্দু দেবদেবীর প্রশস্তি কেন আর কেনই বা সমগ্র গ্রন্থে কোথাও বুদ্ধ বা বৌদ্ধবাদের উল্লেখ পর্যন্ত নেই? স্বয়ং নাগার্জুন পর্যন্ত বুদ্ধের স্তুতি করে গেছেন তার রসরত্নাকরে। চুণ্চুকনাথ শুধু তার ব্যতিক্রম হয়েই রয়ে গেলেন না হিন্দু দেবদেবীদের প্রশংসাও করে গেলেন, এর পরেও তাঁকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বলে মনে করা একটু অসুবিধার নয় কি?

কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে একটু মোহমুক্ত মন এবং চোখ নিয়ে দেখলে স্বচ্ছন্দেই বোঝা যায় সামান্য লিপিপ্রমাদে এভাবে বিব্রত হওয়া অযৌক্তিক। লিপিকরের প্রমাদবশত তাঁর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিতে দণ্ডকনাথ চুণ্চুকনাথ হয়েছেন। এ ধরণের ঘটনা প্রায় সমস্ত প্রাচীন পুঁথিতেই ঘটেছে। তাছাড়া 'চুণ্চুকনাথ' বা রামচন্দ্র 'রসেন্দ্রচিন্তামণি'তে নিজেকে কলানাথের শিষ্য বলে পরিচয় দিয়েছেন। রামচন্দ্র তাঁর অপর গ্রন্থ 'রামরাজ্যে' নিজেকে কলানাথের শিষ্য বলে পরিচিত করেছেন। রামচন্দ্র এবং দণ্ডকনাথ বা চুণ্চুকনাথ একই ব্যক্তি—এতগুলি প্রমাণের পর এ দাবী করা নিশ্চয়ই অসঙ্গত হবে না।

আচার্য রায় এ বইখানিকেও আর্বাচীন যুগের গ্রন্থ বলে ঘোষণা করেছেন। কোন বই প্রাচীন, কোন বই অর্বাচীন তার প্রমাণ পুস্তকের মধ্যেই নিহিত থাকে। ভাষা, রচনারীতি প্রভৃতির বিশ্লেষণ এই জন্যই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 'অর্কপ্রকাশ' গ্রন্থে ফিরিঙ্গি শব্দের উল্লেখে যেমন সেটিকে আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর বলে ধারণা করেছেন আচার্য রায়, রসেন্দ্র চিন্তামনিতে নাগার্জুন নিত্যনাথ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক রাসায়নিকদের

---

* প্রবাসী ১৩৩৪, 'রসজলনিধি পুস্তকের ভূমিকার উপর আলোচনা।'

নামোল্লেখ দেখে বইটির অর্বাচীনত্ব সম্পর্কে তাঁর আর সন্দেহ থাকে নি। কিন্তু এরকম দ্রুত সিদ্ধান্ত গবেষকের অকর্তব্য। গ্রন্থখানির দিকে এটুকু মনোযোগ দিলেই দেখা যাবে এই গ্রন্থখানি প্রকৃতপক্ষে দুজন লেখকের রচনার স্বাক্ষর বহন করছে। একজন মূল লেখক, অপর জন ভাষ্যকার। মূলের রচয়িতা যিনি, তিনি আদ্যোপান্ত ছন্দে রচনা করে গেছেন। আর ব্যাখ্যাকার সর্বত্র গদ্য ব্যবহার করেছেন। শ্লোকগুলির ভাষা অতি প্রাচীন। শ্লোকের কোন অংশে নাগার্জুন নিত্যানন্দ প্রভৃতির উল্লেখ নেই। ব্যাখ্যাকার যখন গদ্যে বলছেন তখনই ঐ সব নাম পাওয়া যাচ্ছে। আচার্য রায় সমস্ত পাণ্ডুলিপিখানি একজন মাত্র লেখকের বলে ধরে নেওয়াতেই এই বিপত্তির উৎপত্তি ঘটেছে। নাগার্জুন নিত্যানন্দ এমন কি চক্রপাণির নামোল্লেখ দেখে খুব স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয় বইখানি চতুর্দশ শতকের পূর্বে রচিত নয়। আচার্য রায়কে সত্যই এর জন্য খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু শ্লোকগুলির ভাষা রচনারীতি ছাড়াও, বক্তব্য বিষয় বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়; রসেন্দ্রচিন্তামনি সুনিশ্চিতভাবেই বহু পুরাতন গ্রন্থ—ধাতব রসায়ন সম্পর্কে এত পূর্ণাঙ্গ ও এত প্রাচীন আর দ্বিতীয় কোন গ্রন্থ এ যুগ পর্যন্ত পৌঁছায়নি। গ্রন্থের মধ্যেও তার প্রমাণ রয়েছে ঃ রসেন্দ্রচিন্তামনিতে নববিধ লৌহের উল্লেখ আছে। এই নয় প্রকারের লৌহ আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালের রসায়ন গ্রন্থে তিন ধরণের লৌহের উল্লেখ রয়েছে।১

পঞ্চম থেকে সপ্তদশ পর্যন্ত যে নামগুলি বাগ্‌ভট করেছেন তাদের মধ্যে এক শম্ভু ছাড়া আর সকলের সম্পর্কেই আমাদের জ্ঞান সামান্য। শম্ভু সম্পর্কে

১ এমন হতে পারে যে যুগে সত্য সত্যই নয় ধরণের লৌহ পাওয়া যেত, আজ আর সেগুলি পাওয়া যায় না। অথবা এ সম্ভাবনাও রয়েছে, চরক যেমন মানবদেহের অস্থি সংখ্যা নির্ণয়ে ভুল করেছেন, রামচন্দ্রও তেমনি কোন কোন ধাতুকে ভ্রমক্রমে লৌহ বলে মনে করেছেন। যাই ঘটে থাকুক না কেন, নববিধ লৌহের উল্লেখ এই বইখানিকে অন্যান্য রসায়ন গ্রন্থ থেকে স্বাতন্ত্র্য ও প্রাচীনত্বে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে।

পরে আলোচনা করছি। নাগার্জুন ও শম্ভু সম্পর্কে আলোচনা একত্রে হওয়া প্রয়োজন। তার আগে অন্যান্যদের সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে তা উল্লেখ করছি।

কপালী ছিলেন রসরাজ-মহাদধি গ্রন্থের প্রণেতা। গ্রন্থখানি এ যুগে পাওয়া যায় না। সিদ্ধ নিত্যনাথের 'রসরত্নাকর' ১ গ্রন্থে ঐ গ্রন্থটির উল্লেখ আছে। নিত্যনাথ 'স্বর্গ-বৈদ্য কপালীর' রচনাবলীর সহায়তা গ্রহণের কথা স্বীকার করেছেন।

মত্ত সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

মাণ্ডব্য যে একজন উচ্চুদরের রাসায়নিক ছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর অবশ্য কোন রচনাই এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। পুরাণে যুধিষ্ঠিরের সভা-বৈদ্য মাণ্ডব্যের নামোল্লেখ আছে। উভয়ে যদি একই ব্যক্তি হন, তবে মোটামুটিভাবে তার অবস্থান কাল ভারত যুদ্ধের (খৃঃ পূ ১৪১৬ অব্দ) সমসাময়িক হয়ে দাঁড়ায়। যুধিষ্ঠিরের সভাবৈদ্য হোন বা না হোন মাণ্ডব্য যে নাগার্জুনের পূর্ববর্তী তা নিশ্চিতভাবেই জানা গেছে। নাগার্জুন তাঁর রসরত্নাকর গ্রন্থে মাণ্ডব্যের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন।

ভাস্কর রসেন্দ্রভাস্কর গ্রন্থের প্রণেতা। তার সম্পর্কে শুধু এইটুকুই জানা যায়। রসেন্দ্র ভাস্কর গ্রন্থখানি কোথাও পাওয়া যায় নি।

রত্নঘোষ সম্পর্কেও কিছু জানা যায় নি। রসরত্নাকরে নাগার্জুন শিষ্য রত্নকোষের উল্লেখ আছে, রত্নঘোষ ও রত্নকোষ এক ব্যক্তি নন।

তালিকায় বাগ্‌ভট যাদের দ্বাদশ থেকে ষোড়শ স্থান দিয়েছেন তাদের সম্পর্কেও কিছু জানা যায় না। সপ্তদশ অর্থাৎ ব্যারী সম্পর্কে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, মনি মুক্তা রত্ন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর গবেষণা সীমাবদ্ধ ছিল। এই নামে একজন বৈয়াকরণিকও প্রাচীন ভারতে ছিলেন। তিনি এবং এই রাসায়নিক অভিন্ন ব্যক্তি কি না, বলা কঠিন।

১ 'রস রত্নাকর' নামে দুখানি গ্রন্থ আছে একটি নিত্যনাথের রচনা অপরটি নাগার্জুনের।

কালানুক্রমিক বিচারে শম্ভুকে বাগভট একাদশতম এবং নাগার্জুনকে অষ্টাদশতম বলে উল্লেখ করেছেন। তবু এই দুজনের আলোচনা একত্রে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এরা দু'জনেই ছিলেন দিকপাল রাসায়নিক। এদের দু'জনের গ্রন্থই কালোত্তীর্ণ হয়ে আমাদের যুগে পৌঁছেছে। ভারতের রসায়ন চর্চার সুবর্ণ যুগ বলে যদি কিছু থেকে থাকে সে হল শম্ভু এবং নাগার্জুনের মধ্যবর্তী যুগ। প্রাগৈতিহাসিক যুগের রামচন্দ্র প্রণীত রসেন্দ্রচিন্তামনি ও রামরাজ্য বই দুখানি বাদ দিলে শম্ভু বিরচিত 'রসার্ণব' এবং নাগার্জুন রচিত রসরত্নাকরের তুল্য গ্রন্থ সমগ্র ভারতীয় রসায়নে আর নেই।*

(ক্রমশঃ)

---

* রসার্ণব ও রসরত্নাকরে ভারতীয় রসায়ন কোন সুউচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হয়েছিল, পরবর্তী অধ্যায়ে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। তার পূর্বে তাঁদের কালনির্দেশের চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রেহাম গ্রীণের সাম্প্রতিক উপন্যাস

সুধাংশু ঘোষ

প্রায় তের বছর আগে 'দি হার্ট অব দি ম্যাটার' প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে গ্রেহাম গ্রীণ জীবিত ইংরেজ লেখকদের প্রথম সারিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। গত এক দশকের মধ্যে সমকালীন ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে অনেক বার উচ্চারিত হয়েছে গ্রীণের নাম। অবশ্য মাঝে মাঝে ই. এম. ফরস্টারকে তাঁর ওপরেই স্থান দেওয়া হয়েছে। তবে ফরস্টারের নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে 'হয়ত' কথাটি বারে বারে এসেছে এবং গ্রীণের ক্ষেত্রে যা বলিষ্ঠ ঘোষণা, ফরস্টারের বেলায় তা বিনীত দ্বিধান্বিত মৃদু কণ্ঠ। লেখকের জনপ্রিয়তা পণ্যের মত উৎপাদনের ক্ষমতা যাঁদের করায়ত্ত প্রধানত আমেরিকার এমন সাহিত্য সমালোচকরা এর জন্য দায়ী। অন্তত ১৯৪৮ সালে 'দি হার্ট অব দি ম্যাটার' ও ১৯৫৫ সালে 'দি কোয়ায়েট আমেরিকান' প্রকাশের মধ্যবর্তী অবকাশে গ্রেহাম গ্রীণ আমেরিকার সাপ্তাহিকের পুস্তক পরিচয়ে এবং এমন কি সাহিত্য পত্রিকার প্রবন্ধে 'মহান' শিল্পীরূপে সানন্দে স্বীকৃত। তার কোন একটিমাত্র উপন্যাসকে 'মহান্' আখ্যা দিতে প্রচ্ছন্ন সঙ্কোচ লক্ষ্য করা গেলেও সামগ্রিকভাবে তাঁর উপন্যাসগুলি মহান শিল্পকর্মের সোচ্চার অভিনন্দন পেয়েছে।

অতি জনপ্রিয় লেখকের কোথাও কিছু গল্প আছে—এই প্রচলিত উক্তির সঙ্গে বিদগ্ধ সমালোচক মহলে গ্রীণের বিপুল সাহিত্যিক খ্যাতির সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অথচ তাঁর জনপ্রিয়তার নানাবিধ কারণের একটি পরিচ্ছন্ন তালিকা তৈরি করা কত সহজ। ইংরেজ লেখকদের মধ্যে য়ুরোপ মহাদেশে তাঁর বইয়ের বিক্রী সব থেকে বেশি। তাঁর গল্পের কাঠামো নিয়ে বারটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। এ পর্যন্ত হিন্দি ও হিব্রুসহ তেইশটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর বই। তাঁর সাহিত্যকীর্তি বিষয়ে ইতিমধ্যে তিনখানি ইংরেজি, দুখানি ফরাসী ও একখানি জার্মান সমালোচনা গ্রন্থ রচিত হয়েছে বিভিন্ন আত্মকেন্দ্রিক আলোচনায় তিনি বারংবার ব্যর্থতার প্রতি তাঁর গভীর

অন্তর্মনের প্রশ্রয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন, অথচ তাঁর লেখক-জীবন একটি পূর্ব নির্দিষ্ট সফলতার বিন্দুতে পৌঁছানর কঠোর সাধনায় মগ্ন। যে লেখক শুরুতেই প্রতিদিন অন্তত পাঁচশ'টি শব্দ লেখার এবং হাতের বইটি বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলে সাড়ে সাতশ'টি শব্দ রচনার প্রতিজ্ঞা নিয়ে তাঁর মায়াবী টেবিলে বসেছেন, তাঁর অন্তর্মনের ব্যর্থতা-প্রীতি সহজবোধ্য নয়। যে লেখক তিরিশ বছরে এগারখানি উপন্যাস, সাতখানি 'সুখপাঠ্য রহস্যোপন্যাস', তিনখানি নাটক, দুখানি ভ্রমণ কাহিনী, দুখানি ছোটগল্পের, একখানি প্রবন্ধের ও একখানি কবিতার সংকলন উপহার দিয়েছেন এবং এ-ছাড়া সাংবাদিকতার সঙ্গে সঙ্গে শিশুসাহিত্য ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন, ব্যর্থতার বিমূর্ত ভাবনা সহজে তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুষঙ্গ হয় না, বরং সাফল্য একান্ত শরীরী হয়ে দেখা দেয়।

গ্রীণের শিল্পকর্ম থেকে তাঁর ধর্মীয় দর্শন বিষয়ে যাঁরা বেশি উৎসাহী তাঁরা তাঁদের বাদ-প্রতিবাদ প্রকাশে বিস্ময়করভাবে ক্লান্তিহীন। ক্যাথলিকরা তাঁর জন্য গর্বিত, আবার নিরীশ্বরবাদীরা তাঁকে আত্মীয় বলতে উচ্চকণ্ঠ। তাঁর উপন্যাসে গ্লানিকীর্ণ পুঁজিবাদী সমাজের প্রতি নির্মম আঘাত আবিষ্কারের উৎসাহ বিরল দৃষ্টান্ত নয়, আবার অস্তিত্ববাদীরা মাঝে মাঝে তাঁকে তাঁদের শিবিরের বলে দাবি করেন। লক্ষ লক্ষ সাধারণ পাঠক তাঁর উপন্যাসের কাহিনীর অনিবার্য টানে মুগ্ধ। মজা এই, লেখক হিসেবে তাঁর দুটি ব্যক্তিত্ব এমনই স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ যে তিরিশ বছর ধরে তিনি একসঙ্গে গভীর উপন্যাস ও সুখপাঠ্য রহস্যোপন্যাস একটানা লিখে এসেছেন। তাঁর এই দুই জাতের রচনা পরস্পরকে স্পর্শ করে কি না, এবং করলে তা কতটা, এ প্রশ্ন সঙ্গত কারণেই উঠতে পারে।

'এ বার্ণট-আউট কেস' গ্রীণের সর্বশেষ উপন্যাস। তিরিশের দশকের প্রত্যন্তে প্রকাশিত 'ব্রাইটল রক'-এর সময় থেকে যে ভাবনা তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তাঁর সর্বশেষ উপন্যাসে তারই নতুন বিন্যাস। সুতরাং এই উপন্যাসটির আলোচনায় তাঁর প্রথম পর্বের প্রস্তাবনা অথবা প্রতিশ্রুতির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রাসঙ্গিক।

লণ্ডনের কাছাকাছি বার্কহ্যাম্পস্টেডের বিখ্যাত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ছটি সন্তানের মধ্যে গ্রেহাম গ্রীণ চতুর্থ। বার্কহ্যাম্পস্টেডের কৃপণ পরিমিতির ঈষৎ স্বচ্ছ অন্ধকার তিনি অনেক পিছনে ফেলে এসেছেন;

তাঁর বয়েস এখন সাতান্ন; তিনি এখন মেফেয়ারের বনেদী পাড়ার সুন্দর সর্বাধুনিক একটি ফ্ল্যাটের বিলাসী বাসিন্দা। অথচ মনে হয়, তাঁর মানস-চর্চার বৃত্ত, তাঁর চেতনার গণ্ডী শৈশবেই চড়া রঙের দাগ কেটে তাঁর বাকী জীবনের জন্য আঁকা হয়ে গিয়েছিল। তখন তাঁর বাড়ি আর স্কুল দুটো স্বতন্ত্র জগত ছিল। সেই দুই জগতের স্বাতন্ত্র্য বাঁচিয়ে রেখেছিল একটিমাত্র কপাট, যা তাঁকে শনি-রবিবারে খুলতে হত। দুই দেশের সীমান্তে যাঁর বাস তাঁর দিনযাপন অস্থির হবেই। তাঁর স্কুলের জগতে পাথরের সিঁড়ি আর ফাটা ঘণ্টার কর্কশ ধ্বনিতে শঙ্কা ও ঘৃণার সঙ্গে পরিচিত হলেন। বয়স্ক ও কিশোর চরিত্রে সেই প্রথম দেখলেন মৌল পাপের অস্তিত্ব। নরকের সান্নিধ্য পেলেন শৈশবেই, এবং যেন চিরকালের মত তাঁর মন তৈরি হয়ে গেল। স্বর্গের নিরবয়ব ভাবনা অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস তাঁর মনে স্থান পেল, কারণ হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা ও পাপ-ক্রমাকীর্ণ নরক তাঁর মন জুড়ে বসেছে। তিনি বুঝলেন, নিখাদ পাপে যে পৃথিবী পূর্ণ সেখানে নিখাদ পুণ্য আর কখনও দেখা দেবে না। কল্যাণ একবার মাত্র মানুষের দেহ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল, আর কখনও আসবে না, কিন্তু পাপের জন্য পৃথিবীর দ্বার সব সময় খোলা। মানুষের প্রকৃতি কাল ও সাদা নয়, কাল ও ধূসর। চোদ্দ বছর বয়সে ম্যার্জোরি বওয়েনের উপন্যাস 'দি ভাইপার অব মিলান'-এ ভেরোনা ও মিলানের নৃপতিদের নৃশংস হানা-হানির বীভৎস কাহিনীতে মগ্ন গ্রীণ আরও বুঝলেন, সাফল্যের মধ্যেই চরম বিপর্যয়ের বীজ নিহিত। সাফল্য যখন মৃদুভাবেও কাউকে স্পর্শ করেছে, তখনই সে জানবে, ব্যর্থতা আর বেশি দূরে থাকবে না। তিনি বারে বারে বলতে চেয়েছেন, যে শৈশব অতীতে অবসিত তাতেই পাপের বীজ ছিল; সেই শৈশব আর ফিরবে না, কিন্তু সেই বীজ বিশাল বৃক্ষে পরিণত।

বিস্ময়ের কথা, কৈশোরেই তিনি ক্লান্তি, ক্লান্তি, অপরিসীম শূন্যতার অন্ধকারে ডুব দিয়েছেন। লণ্ডনের মনস্তত্ত্ববিদের কাছে তাঁকে চিকিৎসার জন্য পাঠান হয়েছে। সেখানে কয়েক মাস 'খুব সুখে' থেকে নাকি সুস্থ হয়ে ফিরেছেন। অথচ নানাবিধ বিষ, পরিত্যক্ত পুকুর, রিভলভার ইত্যাদির সহায়তায় অনেকবার আত্মহত্যার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। শূন্যতা-বোধ থেকে মুক্তির জন্য তাঁর এই চেষ্টা, কিন্তু পরে বুঝবেন, এই চেষ্টা তাঁকে সামান্য উত্তেজনারও স্বাদ দেয় না।

অক্সফোর্ডে ছাত্রজীবনে নেহাত মামুলি রোমান্টিক কবিতার একটি সংকলন প্রকাশ অথবা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান ও অল্পদিনের মধ্যে পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ এমন কিছু বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঘটনা নয়। কিন্তু 'জার্নি উইদাউট ম্যাপস্' (১৯৩৬) গ্রন্থে বর্ণিত তাঁর প্রথম সাইবেরিয়ার গভীর অভ্যন্তরাঞ্চল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর শৈশব-কৈশোরের জীবন দৃষ্টির সঙ্গে চিরকালের মত সম্পৃক্ত হয়ে গেল। বস্তুত আফ্রিকার আদিম নগ্ন স্বেদাক্ত অন্ধকার তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসে কম বেশি উপস্থিত। আফ্রিকার অন্ধকার থেকে এমন একটি বোধ তাঁর হৃদয়ে উৎসারিত যে, অতিপ্রাকৃত কোন ছায়াশরীরে পাপের অকল্যাণের প্রতিভাস দেখার আতঙ্কিত বিস্মিত আদিম প্রবণতা যেদিন সভ্য নাগরিকের মনে আর স্থান পায় নি, সেদিন থেকেই সে অত্যন্ত মূল্যবান কিছু হারিয়েছে। অকল্যাণের অতি প্রাকৃত ছায়াশরীরের তুলনায় মানবিক অসাধুতা বড় বেশি ছোট, সংকীর্ণ।

গ্রীণ তাঁর 'ব্রাইটন রক' (১৯৩৮) উপন্যাসটিতে প্রথম ঈশ্বর ও মানুষের সম্পর্কের প্রশ্নটিকে তীক্ষ্ণমুখ করে তোলেন। এবং সেই প্রথম বিদগ্ধ সমালোচকরা তাঁর উপন্যাস আলোচনার প্রেরণা বোধ করেন। উপন্যাসটির অতি তরুণ নায়ক পিংকী অপরিমেয় নৃশংসতার একটি জীবন্ত মূর্তি। আবার সে এক করুণ বিষাদান্তিক নাটকেরও নায়ক। মনে হয়, পিংকীর মত পাপী অল্পের জন্য পুণ্যের পথ হারিয়েছে বলেই পাপের পথে এসেছে। তার পাপে লিপ্ত হওয়ার, যন্ত্রণার উপলব্ধির অসাধারণ ক্ষমতা তার ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভবের তীব্রতার মাপকাঠি। গ্রীণ যেন বলতে চান, যারা অপেক্ষাকৃত কম পাপী, ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের প্রেমের সম্পর্ক তীব্র হয় না। মাঝে মাঝে এমনও মনে হয়, ধর্ম যেন একটি বিকৃত, জীবন-নিঃশেষকারী জীবন-বিরোধী আবেগ। বইটিতে পিংকীর পাপ, তার নৃশংসতা এক আতঙ্কিত করুণার সুরে বর্ণিত। তার চরিত্রে দেখা যায়, পাপে ডুব দিয়ে নরকের অস্তিত্ব উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে এসেছে ঈশ্বরের সান্নিধ্য-চেতনা। বইটির অপর প্রধান চরিত্র ইডার এই পৃথিবীতেই ন্যায়বিচারের জন্য মধ্যবিত্ত ব্যগ্রতা লেখকের সহানুভূতি পায় নি।

এক মদ্যপ যাজক 'দি পাওয়ার অ্যাণ্ড দি গ্লোরি' (১৯৪০) উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র। পাপের দুঃসহ ভার নিয়ে সে একদিকে শিকার সন্ধানী

পুলিশ আর একদিকে ঈশ্বরের অপরিমেয় করুণা পিছনে রেখে উধাও হবে। তাবাস্কোর ভয়ংকর নির্জন পথে তার পলায়ন মুক্তির পথের দুর্লঙ্ঘ্য খাড়াই ভেঙে আত্মার যাত্রার রূপকের মত। সে যে কাপুরুষ, মদ্যপ, অবৈধ সন্তানের পিতা, সে যে যাজকতার যোগ্য নয়—তার এই বেদনার্দ্র চেতনা অত্যন্ত তীব্র। পিংকীর মত পাপে ডুব দিয়ে, যন্ত্রণায় পুড়ে, সে ঈশ্বরের সান্নিধ্যের যে উত্তাপ পেল, আগে অপেক্ষাকৃত পবিত্র জীবনে তা কখনও পায় নি।

বইটি সম্বন্ধে ক্যাথলিক সমালোচকরা সাধারণত এর বেশি আর কিছু বলেন না। কিন্তু আরও কথা থেকে যায়। উপন্যাসটির পটভূমি তাবাস্কো এ কালের পৃথিবীর ঈশ্বরের স্পর্শহীন এক বিবর্ণ প্রতিমা। গ্রীণ এ পর্যন্ত তাঁর সবগুলি উপন্যাসে হয়ত দশটির বেশি জায়গায় প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা করেন নি, কিন্তু পাপের, বিশেষ করে যৌন পাপের, সৌন্দর্য বর্ণনার দৃষ্টান্ত এই বইটিতে ও অন্যান্য উপন্যাসে অজস্র। লেখকের সূক্ষ্ম মানসচর্চার দীপ্তিতে হয়ত ঈশ্বরের ভাবনা উজ্জ্বল, তবু তার সঙ্গে ঈশ্বর বিমুখতার সংঘাত এতই তীব্র যে বইটির বক্তব্যের চেহারা ক্যাথালিক সমালোচকদের মত কয়েকটি মাত্র সরল রেখায় আঁকার চেষ্টা বাতুল কল্পনা মনে হবে।

এ দেশে অনেকের বিশ্বাস 'দি হার্ট অব দি ম্যাটার' (১৯৪৮) গ্রেহাম গ্রীণের সব থেকে মূল্যবান সাহিত্য কর্ম। এই উপন্যাসটির নায়ক মেজর স্কোবীর জটিল চরিত্র বিষয়ে অজস্র পরস্পর-বিরোধী অভিমত প্রকাশিত হয়েছে। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে যে মাটিতে স্কোবী দৃঢ়সংবদ্ধ পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল, অসাধারণ করুণার বন্যায় তাতে প্রথমে গভীর ফাটল ধরল, তারপর ভেঙে ভেঙে স্রোতে ভেসে নিঃশেষ হয়ে গেল। যারা আঘাত পেলে কেঁদে ওঠে তাদের প্রতি স্কোবীর বাধাবন্ধনহীন করুণা তার আত্ম-করুণার মুখোস। এই সর্বগ্রাসী করুণা স্কোবীকে প্রায় ঈশ্বরের ভূমিকায় নামিয়েছে, এবং এর মধ্যেই তার ভয়ংকর পরিণতির বীজ নিহিত। গ্রীণ বারে বারে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এই করুণা এই পৃথিবীর চরম পাপ। ঈশ্বরের প্রতি আঘাতের প্রতিক্রিয়া স্বেচ্ছাচার হয় না, তাই মানবিক করুণায় আর্দ্র মনে ঈশ্বরকে অপমান করার নজির বিরল নয়। স্কোবীর সারা জীবনের আচরণ ঈশ্বর প্রেমের এক দুর্নিরীক্ষ্য কেন্দ্র বিন্দু থেকে উৎসারিত—এমন অভিমত প্রকাশের উৎসাহে কমতি নেই, কিন্তু 'দি হার্ট

অ্যব দি ম্যাটার' গ্রীণের প্রথম উপন্যাস, যেখানে ঈশ্বর-বিমুখতা স্পষ্ট তন্ময় বাগভঙ্গিতে উপস্থাপিত।

১৯৫১ সালে প্রকাশিত 'দি এণ্ড অব দি অ্যাফেয়ার' উপন্যাসটির দুটি অংশের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। প্রথমাংশ ঘটনা নির্ভর উৎকণ্ঠাপূর্ণ কাহিনী। বোবা অন্ধকারের মত বুক চেপে ধরা ঈর্ষা প্রথমাংশের যৌন আবেগ। দ্বিতীয়াংশ ইন্দ্রিয়সম্ভোগে লিপ্ত একটি কেন্দ্রীয় চরিত্রের পবিত্রতায় উত্তীর্ণ হওয়ার কাহিনী। এই ঘটনাশ্রয়ী কাহিনীর লাগাম যে মুহূর্তে এক অতিপ্রাকৃত শক্তির হাতে সমর্পিত হল, তখন থেকেই শিল্প কর্ম হিসেবে বইটি ব্যর্থ। অথচ গ্রীণের উপন্যাসে ঈশ্বর ও মানুষের সম্পর্কের প্রশ্নটিকে তীক্ষ্ণমুখ করার সমস্যা বিবেচনায় এই বইটিতে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। 'এ ব্যর্ণট আউট কেস'—এ যেমন শূন্যতা বোধ সব থেকে বেশি ইন্দ্রিয়-সংবেদ্য, এই বইটিতে তেমন মানুষ ও ঈশ্বরের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের চেহারা সব থেকে বেশি স্পষ্ট। ঈশ্বরের কূটকৌশলী অপ্রতিরোধ্য নিষ্ঠুরতা এই প্রবল জিদ্বিধায় চিহ্নিত।

'দি কোয়ায়েট আমেরিকান' (১৯৫৫) প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকান গ্রীণ-অনুরাগী সাহিত্য সমালোচক মহলে ক্ষোভের ঝড় উঠেছিল। ঠিক ক্ষোভ নয়, যেন অভিমান। কোন কোন সমালোচক বইটিকে মার্কিন-বিরোধী উপন্যাস আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের আশঙ্কা ছিল, এই বইটি বামপন্থীদের উৎসাহিত করবে। উৎসাহ অনেকে বোধ করেছিলেন। অবশ্য উৎসাহিত হবার কোন যুক্তি ছিল না। যুদ্ধবিক্ষত ইন্দোচীন বইটির প্রেক্ষিত। লণ্ডন 'টাইমস'-এর প্রতিনিধি হিসেবে গ্রীণ সেখানে গিয়েছিলেন। বইটির মার্কিন চরিত্র হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ গ্রাজুয়েট। হো কি জিপ ও ফরাসী ঔপনিবেশিক শক্তির মধ্যবর্তী শূন্যের অঙ্ক মিলিয়ে দেবার জন্য একটি থার্ড ফোর্স সৃষ্টি করা তার উদ্দেশ্য। তার পাশে উপস্থিত এক ইংরেজ সাংবাদিক, যার কণ্ঠে গ্রীণের নিজের ক্লান্ত স্বর। গ্রীণ যেন বলতে চান, ঔপনিবেশিকতার ব্যাপারে আমেরিকানরা অনভিজ্ঞ। সুতরাং ইন্দোচীনের বিষয়টি অভিজ্ঞ ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। বইটিতে কমিউনিজমের প্রতি লেখকের সহানুভূতির সুরের অস্তিত্বের যুক্তি ধোপে টেঁকে না। একটি হত্যাকাণ্ডের

রহস্য এমনভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছায়াপাত করে যে, গ্রীণের রহস্যোপন্যাসের স্বাদ বইটিতে যথেষ্ট মেলে।

'ব্রাইটন রক' থেকে 'দি কোয়ায়েট অ্যামেরিকান' পর্যন্ত গ্রেহাম গ্রীণের প্রত্যেকটি উপন্যাসের দুটি উপজীব্য। একটি অপরিমেয় ক্লান্তি ও শূন্যতা-বোধ, অপরটি মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক। তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'এবার্ণট্ আউট কেস' ও এই দুটি পুরণো বিষয়ের নতুন রূপায়ণ। সেই কুষ্ঠরোগীকে 'বার্ণট্ আউট কেস' বলা হয় যে রোগমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে কোন্ কোন অঙ্গের ভার থেকেও মুক্ত। ডিও গ্র্যাটিয়াস তেমন এক রোগমুক্ত কঙ্গোবাসী। উপন্যাসটির নায়ক কয়ারীর রোগ শরীরের নয়, আত্মার। এক কুষ্ঠাশ্রমের সান্নিধ্যে এসে কয়ারী সেই আত্মিক রোগ থেকে মুক্ত হল ডিও গ্র্যাটিয়াসের মত।

কয়ারী এক সময় ছিল গীর্জার খ্যাতিমান স্থপতি, এবং বহু নারীকে ভালবাসার খ্যাতি ও অখ্যাতি তার ছিল। একদিন তার শূন্যতাবোধ এত তীব্র হল যে যন্ত্রণার অনুভবও সে হারাল, যেমন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত শরীরের অংশ-বিশেষের অনুভব শক্তি থাকে না। যে রোগ তাকে শূণ্যতায় মগ্ন করল তা সাফল্য। কয়ারী বুঝল, সে তার কাজ ভালবাসে না, কোন নারীকে সে ভালবাসে না। দুঃসহ ক্লান্তির আর ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসের ভার নিয়ে সে সভ্য পৃথিবীর সফলতার অন্ধকার পার হয়ে আশ্রয় নিল আফ্রিকার আদিম অন্ধকারে। গভীরতর অন্ধকারে ডুবতে সে ব্যগ্র, কিন্তু কঙ্গোর আদিম অরণ্যবেষ্টিত এক কুষ্ঠাশ্রম ছাড়িয়ে তার সামনে আর পথ ছিল না।

কুষ্ঠ হাসপাতালের নিরীশ্বরবাদী চিকিৎসক কলিন তাকে সহজে গ্রহণ করল। কয়ারী তার পেশা, তার ক্যাথলিক ধর্ম, তার জীবন, সব ত্যাগ করেছে। সে কিছু অনুভব করে না, তার কোন বাসনা নেই, সে হাসতে ভুলেছে। সে শূন্যতার এক ইন্দ্রিয়সংবেদ্য অবয়ব।

এক ভয়ঙ্কর অন্ধকার রাত্রিতে গভীর নির্জন অরণ্যে আতঙ্কে মুমূর্ষু গ্র্যাটিয়াসের বিকৃত জ্বরতপ্ত শরীর সর্বাঙ্গ দিয়ে স্পর্শ করে কয়ারীর আকস্মিকভাবে মনে হল, তার যেন প্রয়োজন আছে, তার মানবসম্বন্ধের গ্রন্থি একেবারে ছিঁড়ে যায় নি। এবং নিজের অস্তিত্বের ভারবহন যখন তার কাছে এসে সহজ হয়ে এসেছে, তখনই ঈশ্বর ও মানুষের সম্পর্কের মধ্যবর্তী অবকাশে যে সব নির্বোধ আত্মশ্লাঘায় স্ফীত তাদের মত এক কারখানার

(৯৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মার্কসবাদে তত্ত্ব ও প্রয়োগ

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

[মার্কসবাদ সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা তুলেছেন তরুণ অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। এ সম্পর্কে আমরা পাঠকদের কাছ থেকে মতামত আহ্বান করছি। শ্রীচট্টোপাধ্যায় 'লোকায়ত দর্শনে'র লেখক নন।

—সম্পাদক।]

মার্কসবাদী দর্শনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে ঐক্য সংরক্ষণ। ঐক্য সংরক্ষণের ব্যাপারে অবশ্য দর্শনের দলীয় বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেওয়া চলবে না। মার্কসবাদকে যাঁরা সংস্কার করতে চেয়েছেন কিংবা যাঁরা এই পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন তাঁদের সমালোচনা করতে গিয়ে উল্লিখিত মৌলিক নীতি দুটির উপর সাম্প্রতিককালে প্রভূত গুরুত্ব আরোপিত হচ্ছে। আমি আলোচ্য প্রবন্ধে মার্কসবাদী দর্শনে তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগের ঐক্য এবং দলীয় বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ নীতির আলোচনা ক'রে দেখাবার চেষ্টা করব যে দ্বিতীয় নীতিটি (দলীয় বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ) প্রথম নীতিটির (তত্ত্ব প্রয়োগ ঐক্য) তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দুটি দিককেই বিকৃত করেছে। বিতর্ক-মূলক আলোচনা ব'লে মার্কসবাদী বক্তব্য আমি মার্কসবাদের অনুকূল প্রবক্তা ও সরকারী ভাষ্যের উপরই প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করব ;—মার্কসবাদের প্রতিকূল সমালোচকগণ এ-প্রসংগে কী বলেন তা আমি সর্বপ্রযত্নে পরিহার করব। অবশ্য সে-ক্ষেত্রেও উদ্ধৃত বক্তব্যকে প্রসংগভ্রষ্ট করার সমালোচনা উঠবে হয়ত।

মার্কসের ভাষায়, নিছক তত্ত্ব আত্মবাদী (self-enclosed), বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কভ্রষ্ট। দর্শনকে বা তত্ত্বকে আত্মপরিচয় লাভ করতে হ'লে বাস্তবে মূর্ত (actualised) হতে হবে। আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র ও ধ্যান-ধারণার পরিমণ্ডল এই মূর্তনের পথে অন্তরায়। আত্ম-চ্যুতি (self-alienation) সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আত্মচ্যুতির প্রকৃষ্ট পরিচয় সর্বহারা শ্রেণী, রাষ্ট্রীয়

ক্ষেত্রে আত্মচ্যুতির অকাট্য প্রমাণ আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া রাষ্ট্র ; আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এই আত্মচ্যুতি রূপ পেয়েছে ধর্মে, ধর্মাশ্রয়ী একটি কাল্পনিক বিশ্বচৈতন্যে।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজের এই সামগ্রিক আত্মবন্দীত্ব বা আত্মচ্যুতি থেকে তত্ত্বকে রক্ষা করতে হলে, মার্কস বলেন, তাকে ইচ্ছাচালিত ক'রে নিতে হবে কর্মের, প্রয়োগের বাস্তব ক্ষেত্রে। তাঁর ভাষায় :

'It is a psychological law, that once the theoretical spirit has been liberated it turns to practical energy, emerging as will from Amenthes' kingdom of shades and rounding upon the independently existing world of reality (Karl Marx : Die Frushchriften, ed, S. Landshut, Stuttgart 1953, p. 16)

হেগেলের বক্তব্য, তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগের বিরোধ নিষ্পত্তি হয় দার্শনিক জ্ঞানে, মার্কস গ্রহণ করেন না। তিনি মনে করেন, তত্ত্ব প্রয়োগে উত্তীর্ণ হয় এবং বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। তত্ত্ব প্রয়োগ-ভিত্তিতে গঠিত। কিন্তু ভিত্তির আত্মচ্যুত রূপ সম্বন্ধে অস্ফুট চৈতন্য স্বীয় সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য আবার প্রয়োগের দিকে এগিয়ে যায়। অস্ফুট তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রয়োগিক বাস্তবে প্রস্ফুট হয়। তত্ত্ব-প্রয়োগের এই দ্বান্দ্বিক বৈপরীত্য বিশ্বপ্রকৃতির সামগ্রিক বৈপরীত্যের একটি অবিচ্ছেদ্য রূপ। ইতিহাসের পথ তত্ত্ব-প্রয়োগের অগ্রগামী ও সৃষ্টিশীল দ্বন্দ্ব-পরিকীর্ণ। চিন্তামুখী, ধর্মানুরাগী, চৈতন্যমগ্ন মানুষ তার মহত্তম সম্ভব আত্মপরিচয় খুঁজে পায় শ্রেণীহীন সমাজের বাস্তবে, প্রয়োগে।

হেগেল ভাবতেন : খণ্ড ভাব অখণ্ড ভাবে মুক্তি পায়, প্রয়োগের অসম্পূর্ণতা দূর হয় অনপেক্ষ ভাবের সর্বগ্রাসী বা সর্বমিলনান্তক তত্ত্বে। বলা বাহুল্য, মার্কস এ-বক্তব্য অগ্রাহ্য করেন। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে, রাষ্ট্রে খণ্ডিত-ভাবে হলেও যৌক্তিক বাস্তবতা বলতে কিছু আছে ; প্রয়োগবিদ বা তাত্ত্বিককে সেই খণ্ডিত বাস্তবতাকেই আপাততঃ গ্রহণ করতে হবে ; তাকে ঘোষণা করতে হবে যে এই বাস্তব খণ্ডিত, বিকৃত, এই ঘোষণা বিকৃত ও খণ্ডিত বাস্তবের মধ্যেই আদর্শ বাস্তব গঠনের স্বপক্ষে বাস্তব কর্ম ও বাস্তবমুখী তত্ত্ব সৃষ্টিতে উৎসাহ যোগাবে। বাস্তব জগৎকে, তার মানুষকে সাম্প্রতিক বাস্তবের বিকৃত সম্পর্কে অবহিত করতে হবে ; তাকে শোনাতে হবে কোন্

বাস্তব পন্থায় এই বিকৃত বাস্তবকে আদর্শ বাস্তবে রূপান্তরিত করা যায়। যে আদর্শের স্বপ্নে মানুষ এই বিকৃত বাস্তবেই স্বপ্নমগ্ন কর্মের মধ্য দিয়ে সেই আদর্শের দিকে তাকে ঠেলে দিতে হবে। 'It will then appear that the world has long been dreaming of something which it only needs to become aware of in order to possess it in reality ? (ঐ, রুগেকে লেখা মার্কসের চিঠি ৯।১৮৪৩)।

মার্কসবাদী বক্তব্য ইতিহাস-প্রসংগে ক্রোচের বক্তব্যের সংগে তুলনা করলে আরো স্পষ্ট হবে। ক্রোচে বলেন : what constitutes history may be thus described : it is the act of comprehending and understanding induced by the requirements of practical life. The requirements cannot be satisfied by recourse to action unless first of all the phantoms and doubts and shadows have been dispelled···by an act of thought. বিশুদ্ধ চিন্তার সার্বভৌমত্বে ক্রোচের আস্থা হেগেলীয়। বাস্তব জীবনের প্রকৃত চাহিদাগুলিকে বিশুদ্ধ চিন্তা দ্বারা বোঝা অসম্ভব, মার্কসবাদী বলেন, তাদের জানতে হবে প্রয়োগ থেকে, বাস্তব থেকে। ঐতিহাসিক সত্য কখনোই পূর্ণাঙ্গ নয়,—বর্ধমান, দ্বান্দ্বিক। সকল প্রকার সত্যই নির্ণয় করতে হবে প্রকৃতির নিয়ম দ্বারা, সামাজিক প্রয়োগ দ্বারা,—চিন্তা দ্বারা সত্যাসত্য নির্ণয় করলে তা বিমূর্ত এবং খণ্ডিতভাবেই নির্ণীত হতে বাধ্য। লেনিন বলেন : From living intuition to abstract thought, and from thence to practice—that is the dialectical road to knowledge of the truth, to knowledge of objective reality. (Philosophical Note books) লেনিনের বক্তব্য আরো স্পষ্ট ক'রে এম্, এন্, রুটকেভিচ বলছেন : Practice is the foundation of the entire knowledge-process from begining to end. (R. M. Rutkevich : Praktika—osnova poxnaniya i kriteriy istiny, Moscow 1952) রুটকেভিচের বক্তব্যের যৌক্তিকতা নির্ভর করছে চিন্তার সামাজিক স্বরূপের উপর। ব্যক্তির মস্তিষ্কে যে চিন্তা হচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বব্যাপী এক সামাজিক চিন্তার ঐতিহাসিক গতির অংশমাত্র। তাঁর ভাষায় : Unlike methaphysical materialism, dialectical

materialism views the individual act of thought in any of the innumerable human heads as a particle of the historical process of knowledge embracing the world as a whole, in which this particle is organically incorporated. (ঐ)। ব্যক্তির চিন্তাও তাহলে দেখা হচ্ছে ব্যক্তির একার নয়। চিন্তা যেহেতু সামাজিক-ঐতিহাসিক সেই হেতু সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তন দ্বারা চিন্তার ধারাও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

নিয়ন্ত্রণ যখন অবশ্যম্ভাবী তখন মার্কস গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন আদর্শ নিয়ন্ত্রণের উপর। আদর্শ নিয়ন্ত্রণের জন্য দ্বিবিধ অস্ত্র : বিষয়গত (material) ও বুদ্ধিগত (intellectual)। তিনি লিখেছেন : '…philosophy finds in the proletariat its material weapons…the proletariat find in philosophy its intellectual weapons, and as soon as the lighting of thought has penetrated into the flaccid popular soil, the elevation of Germans into men will be accomplished' (Die Fruhschriften P. 253) জার্মানদের ক্ষেত্রে মার্কসের প্রত্যাশা যথেষ্ট পূর্ণ না হলেও সোভিয়েট দেশে তা পূর্ণ হবার পথে। আত্মচ্যুত সমাজ আত্ম-প্রতিষ্ঠ হতে চাইলে ভাববাদী দর্শন এবং ধর্মে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ও বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ, অ-সামাজিক ও অনৈতিহাসিক চিন্তায় তার যে বিকৃত প্রতিচিত্র ফুটে উঠেছে তাকে অবিশ্বাস করতে হবে, বাস্তব কর্ম দ্বারা ভাঙতে হবে। কেন যে প্রতিচিত্র বিকৃত হয় তা ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে। এখন মূল সমস্যা হল : আদর্শ সমাজ কিভাবে গড়তে হবে? শ্রেণীবিভক্ত সমাজের মুমূর্ষু তত্ত্বগুলিকে বাস্তবের আঘাতে ভাঙতে হবে, পুরনো ও তাত্ত্বিক সমালোচনার অস্ত্রগুলোকে অস্ত্রের সমালোচনায় চূর্ণ করতে হবে। ব্যষ্টির চিন্তার স্থলে সমষ্টি চিন্তাকে, ব্যক্তির বাস্তব অভিজ্ঞতার স্থলে সমষ্টির বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সমধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কম্যুনিষ্ট পার্টির মূল্য এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে বুঝবার চেষ্টা করা হলে স্পষ্টতর হতে পারে।

স্তালিন এই প্রসংগে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য :

Theory is the experience of the working-class movement in all countries taken in its general aspect. Of course, theory becomes purposeless if it is not connected with revolutionary

practice, just as practice gropes in the dark if its path is not illumined by revolutionary theory. (Foundations of Leninism P. 31, Moscow—1954).

স্তালিনের এই বক্তব্য আসলে লেনিনের পুরাতন উক্তিরই অনুগামী : Without a revolutionary theory there can be no revolutionary movement'. তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্পর্কে মার্কস, লেনিন ও স্তালিনের বক্তব্যের মধ্যে মৌল-ঐক্য নিঃসন্দেহেই আছে ; কিন্তু কিছু কিছু পার্থক্যও আছে যা সযত্নে লক্ষ্য করবার মতো।

মার্কসের তুলনায় লেনিনই এ কথা স্পষ্টতরভাবে ঘোষণা করেছেন যে, সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চৈতন্য জাগানোর জন্য বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। একক শক্তি দ্বারা সর্বহারাশ্রেণী শুধু ট্রেড য়ুনিয়ন চৈতন্যই জাগাতে পারে ; বৃহত্তর সমাজতান্ত্রিক চৈতন্য জাগাতে হলে সর্বহারাশ্রেণীকে বুর্জোয়া শ্রেণীর জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি সম্বন্ধে যে সব তত্ত্ব খাড়া করেছেন তা সযত্নে অধ্যয়ন করতে হবে। সামাজিক অবস্থার দিক থেকে দেখলে মার্কস ও এঙ্গেল্‌সও বুর্জোয়া শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি ছিলেন। (লেনিনের What is to be Done : দ্রষ্টব্য)। সর্বহারা শ্রেণীর সমাজ-চৈতন্য যে স্বয়ম্ভু নয়, তার আদর্শতত্ত্ব (ideology) যে অন্যান্য শ্রেণীর ধ্যানধারণা নিরপেক্ষ নয় সে-কথা আইওভচুক, রুটকেভিচ প্রমুখ (১) একাধিক আধুনিক সোভিয়েট তাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ স্পষ্টকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। নিজ শ্রেণীর বাইরে থেকেও এই যে সমাজ-তান্ত্রিক তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্পর্কে কিছু কিছু গ্রহণ করবার কথা বলা হচ্ছে তা থেকে দুটি বিষয় যুক্তিসংগতভাবে ধরে নেয়া যায় : (এক) সমাজতন্ত্রের সংগে সংগতিশীল হলে সর্বহারার পক্ষে শ্রেণী-বহির্ভূত কিছু গ্রহণে আপত্তি নেই ; (দুই) সর্বহারা শ্রেণীর বাইরেও সমাজতান্ত্রিক আদর্শতত্ত্বের উপাদান বর্তমান। একাধিক প্রসংগে মার্কস এ-কথা উল্লেখ করে গেছেন ; করাই স্বাভাবিক। কারণ, মার্কসবাদ বৃন্তহীন পুষ্প নয়, ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও প্রয়োগের পদ্ধতি। কিন্তু এই প্রসংগে মূল কথা হল : সর্বহারা শ্রেণীর বাইরে থেকে সমাজতান্ত্রিক চৈতন্য সৃষ্টির সহায়ক উপাদানসমূহ গ্রহণ করবে তা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়ও সম্ভব হবে না, স্বতঃস্ফূর্তভাবেও সম্ভব হবে না। সেই বৈপ্লবিক কর্ম সমাধা করবার

জন্য প্রয়োজন সর্বহারাদের বৈপ্লবিক দল। সোভিয়েট দেশে এই বৈপ্লবিক কর্ম করেছে এবং এখনো করছে কম্যুনিষ্ট পার্টি।

কম্যুনিষ্ট পার্টির সাংগঠনিক শক্তির ফলেই জনগণকে সংহত করবার প্রগতিশীল তত্ত্বগুলি বাস্তবে রূপ পায়। কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বেই পার্টি-বহির্ভূত ভাবধারাগুলি পার্টির তত্ত্বে ও প্রয়োগে যথোপযুক্তরূপে গৃহীত হয়। এই বৈপ্লবিক কর্ম সম্পন্ন করবার জন্য পার্টিকে একটি অত্যন্ত গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। যে-সব দেশে এখনো কম্যুনিষ্ট দলের হাতে সরকার পরিচালনা করবার দায়িত্ব অর্পিত হয়নি সেই সব দেশের সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দিকে সর্বহারা শ্রেণীর অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে হলে পার্টি-বহির্ভূত সমাজতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিগুলির সংগে কতটা সহযোগিতা করা যায় তা নির্ণয় করা ও তদনুরূপ কার্য করার দুরূহ দায়িত্ব পার্টিকে নিতে হচ্ছে। যে-সব দেশে কম্যুনিষ্ট শাসন ইতঃমধ্যেই প্রবর্তিত হয়েছে সেখানেও পার্টির দায়িত্ব কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেসে স্তালিন ঘোষণা করেন: পার্টি-নীতির অনুসরণে সাধু প্রস্তাব গ্রহণ ও ঘোষণা করলেই কর্তব্য সমাধা হয় না; তা শুধু প্রারম্ভিক ব্যাপার। শুধু বিজয়ের ইচ্ছাজ্ঞাপক বিজয় নয়। সঠিক রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণের পর সবটাই নির্ভর করে সাংগঠনিক কাজের উপর, এমনকি রাজনৈতিক নীতির ভাগ্যও—জয় বা ব্যর্থতা—নির্ভর করে সংগঠনের উপর।

মার্কস চেয়েছিলেন আত্মচ্যুত স্বপ্নময়ী পৃথিবীকে স্বপ্নমুক্ত ক'রে বিষয়াশ্রয়ী আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠা করতে। সেই প্রতিষ্ঠায় পার্টি-ভূমিকার গুরুত্ব মার্কসের তুলনায় স্পষ্টতররূপে বুঝেছিলেন লেনিন। সাংগঠনিক ব্যাপারে, (অন্যান্য দিনের কথা বলছি না) মার্কস ও লেনিনের তুলনায় অধিক অভিজ্ঞ স্তালিন মর্মে-মর্মে বুঝেছিলেন সর্বহারা শ্রেণীকে সাম্যবাদী বিশ্বাসে অবিচল ও ঐক্যবদ্ধ রেখে' জাগ্রত করা কত কঠিন কাজ! এর জন্য প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ চাই অলঙ্ঘনীয় শৃংখলাবদ্ধ সুগঠিত দল, যে দলের অধিক শিক্ষিত বুদ্ধিমানদের উপরও সদাসতর্ক নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিতদের মধ্যে জাগাতে হবে উচ্চতর নেতৃত্বের প্রতি অনুগত্য ও আস্থা।

পার্টির এই কৃতিত্বের ফলেই যুদ্ধোত্তরকালে সোভিয়েটের অভূতপূর্ব উন্নতি

সম্ভব হয়েছে। রুট্‌কেভিচ্‌-এর ভাষায় : In its world—historical significance, the latest victory of the Soviet people—the considereble over-fulfilment of the post-war FIve Year Plan for reconstruction and development of the national economy—represents a material incarnation of the ideas of Marxist—Leninism and a living testimony to the mighty role played by revolutionary theory.

পার্টির নেতৃত্বেই সর্বহারা শ্রেণীকে সংগঠিত ও সম্মিলিত হয়ে আত্মবিবর্তনের পথে অগ্রসর হতে হবে। এই পথে তাত্ত্বিক সাহায্য দেবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। আলেকজাণ্ড্রভের ভাষায় : Dialectical materialism is able to provide a theoretical generalization, not only of past facts, but also of the present, and even to foresee the future in a scientific manner. লেনিন বহু পূর্বেই বলেছিলেন, বৈপ্লবিক কাজ বৈপ্লবিক দল না হলে সম্ভব হয় না। বিপ্লবকে সম্ভব ও সার্থক করতে হলে দলকে শুধু তত্ত্ব-সমৃদ্ধ হলেই চলবে না ঐ তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ ক'রে তার সত্যাসত্য নির্ণয় করতে হবে, প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তাকে পরিবর্ধন, ঐতিহাসিক ও সামাজিক করে তুলতে হবে। তত্ত্বের এই প্রায়োগিক উন্মুক্তিই মার্কসবাদকে সৃজনশীল করে রেখেছে। স্তালিন বলেন :

Marxism does not reconize invariable conclusions and formulas, obligatory for all epochs and periods. Marxism is the enemy of all dogmatism. (Marxism and Problems of Linguistics.)

প্রয়োগ থেকে তত্ত্বকে বিচ্ছিন্ন করবার অভিযোগ প্রধানতঃ আনীত হয়েছে গণতান্ত্রিক সমাজবাদীদের বিরুদ্ধে। কথিত হয় নিজেদের রাজনৈতিক সুবিধাবাদকে সমর্থন করবার জন্য তারা মার্কসবাদকে একটি অপরিবর্তনীয় 'ডগমা'য় রূপান্তরিত করে নিয়েছেন। এই অভিযোগ এককালে অবশ্য মেনশেভিকদের বিরুদ্ধেও তোলা হয়েছিল।

কিন্তু ক্রুশ্চেভ বিংশ কংগ্রেসেও সোভিয়েট দেশের সাম্প্রতিক আদর্শ-তাত্ত্বিক কাজকর্মের ধারা আলোচনা প্রসংগে বলছেন : The main shortcoming at present is that it is largely divorced from the practice

of communist construction। স্তালিন সমালোচনা করেছিলেন dogmatist এবং talmudistদের। ক্রুশ্চেভের সমালোচনা অনেকটাই স্তালিনের অনুরূপ ; তবে তিনি একটি নতুন কথা বলছেন যে, dogmatism এবং talmudism-এর সংগে আরেকটি ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়,—Personality Cult। শেষোক্ত ত্রুটির ফলে মার্কসবাদী ঐতিহাসিক তত্ত্বে জনগণের অবদানের মূল্য যথার্থ স্বীকৃতি পায়নি এবং সামাজিক প্রগতিতে অতিমানবীয় ব্যক্তিত্বের অবদানকে অধিকতর মূল্যবানরূপে চিত্রিত করা হয়েছে।

ক্রুশ্চেভের আবির্ভাবের পর মার্কসীয় তত্ত্বের জগতে কিছু কিছু বরণীয় পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে বলে তত্ত্ব থেকে প্রয়োগকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা কখনোই সমর্থিত হচ্ছে না। রাসেল প্রমুখ কতিপয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ মনে করেন, কম্যুনিষ্ট প্রয়োগের সংগে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের কোনো অচ্ছেদ্য বন্ধনই নেই (The Theory and Practice of Bolshevism দ্রষ্টব্য)। এই জাতীয় বক্তব্যের কোনো মার্কবাদী সমর্থনের কথা আমার জানা নেই। তবে মার্কসবাদী তত্ত্ব থেকে কিছু কিছু ব্যত্যয় বা বিচ্যুতি কোনো কোনো অকম্যুনিষ্ট দেশের রাষ্ট্রনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে নীরবে অনুমোদিত হচ্ছে বা সাময়িকভাবে বিশেষ কারণবশতঃ মেনে নেয়া হচ্ছে। হয় পরিণামে এই ব্যত্যয় বা বিচ্যুতিগুলিকে দূর করতে হবে কিংবা সৃজনশীল মার্কসবাদকে আরো আত্মপ্রসার ক'রে ওদের গ্রহণ করতে হবে এবং তত্ত্বকে তদনুরূপ পরিবর্তিত করতে হবে।

ক্রুশ্চেভ মার্কসবাদের যে উদার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তাতে রাজনৈতিক সহাবস্থান রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই আবদ্ধ,—আদর্শতত্ত্বের (ideology) ক্ষেত্রে এই নীতিকে সম্প্রসারিত করা ঠিক হবে না। তাঁর ভাষায় ঃ

It does not at all follow from the fact that we stand for peaceful coexistence and economic competition with capitalism that the struggle against bourgeois, against the survivals of capitalism in the minds of men, can be relaxed. (Pravda 15. 2. 1956)

ধনতান্ত্রিক শিবিরে না হোক, সমাজতান্ত্রিক শিবিরে ইদানীংকালে গুরুতর পরিবর্তন ও প্রগতি দেখা দেওয়ার সহাবস্থান নীতি তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ

করা সম্ভব হয়েছে। ক্রুশ্চেভের বলেন, সহাবস্থান আমাদের কৌশল (tactics) নয়, আদর্শও (ideology) নয়,—গুরুত্বপূর্ণ নীতি (serious policy)।

মার্কসবাদ নীতির মূল্য নির্ণীত হয় প্রয়োগ-ক্ষেত্রে, বিশুদ্ধ চিন্তায় নয়। নীতি ও তত্ত্বের চূড়ান্ত নির্ণায়ক প্রয়োগ। প্রয়োগ মানে ব্যষ্টির নয়, সমষ্টির প্রয়োগ,—কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন সুশৃংখল জনসমষ্টির প্রয়োগ।

মার্কসবাদে তত্ত্ব ও প্রয়োগের সম্বন্ধ কি এবং তার তাৎপর্যই বা কি তা স্পষ্টভাবে বুঝবার জন্য মার্কসবাদী দর্শনের দলীয় বৈশিষ্ট্য (partisan character) বুঝতে হবে। সোভিয়েটে বস্তুবাদী দর্শনের দলীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়। পিটার স্ট্রুভের সমালোচনা প্রসংগে লেনিন বলেছিলেন: Materialism includes, so to speak, partisanship, in that it enjoins the direct and open adoption of the standpoint of a definite social group in any judgment of events. গণতান্ত্রিক সমাজবাদী স্ট্রুভে মার্কসবাদী দর্শনের সমালোচনা-প্রসংগে বলেছিলেন, দর্শনের দলীয় বৈশিষ্ট্য থাকবে এ-শ্রেণীর কথা বলার কোনো অর্থ হয় না। বার্ডিয়ায়েভেরও এই বক্তব্য ছিল। ষ্ট্রুভে, বার্ডিয়েভ বা অন্যান্য বুর্জোয়াপন্থী সমালোচনার উত্তরে সাম্প্রতিক কালে এ্যালেকজাণ্ড্রভ তাঁর Dialekticheskу materialism গ্রন্থে লিখছেন:

A non-party, neutral philosophy, indifferent to the interest of this or that class, does not exist and cannot do so, so long as there are clases and class-struggle। যাঁরা মনে করেন দর্শন একটি বিষয়নিষ্ঠ (objective) বৈজ্ঞানিক বিষয় এবং, সেই দিক থেকে বিচার করলে আলেকজাণ্ড্রভের বক্তব্য ঠিক নয় তাঁদের শুধু এটুকুই এখন আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে, আলেকজাণ্ড্রভের বক্তব্য মার্কসবাদের মূলনীতির সংগে সংগতিশীল। অর্থাৎ, ইতিহাস ও সমাজ-চরিত্র যদি শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণী-সংগ্রাম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় তা হলে যে-কোনো দার্শনিকের চিন্তাই তাঁর শ্রেণী স্বার্থের পরিচায়ক হওয়ার কথা। সামাজিক-ঐতিহাসিক গতিভংগি সম্পর্কে সচেতন মার্কস্‌বাদী এই গভীর সত্যটি মনে রাখেন ও স্বীকার করেন। কিন্তু বুর্জোয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিরা, এ-কথা স্বীকার করতে অনিচ্ছুক কিংবা অনবহিত। তাঁর হেতুও মার্কসবাদীর কাছে স্পষ্ট। বুর্জোয়াদের প্রধান কর্ম শোষণ;

সেই নগ্ন সত্যকে গোপন, কিংবা সমর্থন করাই বুর্জোয়া তাত্ত্বিকের কর্তব্য। তাছাড়া শ্রেণী স্বার্থে প্রভাবিত বুর্জোয়া তাত্ত্বিক পৃথিবীর বিষয়ীগত (subjective), ব্যাবর্তিত (inverted) এবং বিকৃত চিত্র অংকন করে থাকেন। শ্রেণী-স্বার্থের বিরোধী হবে ব'লে বুর্জোয়া তাত্ত্বিক পৃথিবীর, সমাজের এবং ইতিহাসের বিষয়গত (objective) সত্য প্রকাশে অনিচ্ছুক। শ্রেণী-স্বার্থকে সেবা করার প্রচ্ছন্ন বা প্রকট বিষয়ীগত ইচ্ছাই বুর্জোয়া তাত্ত্বিকের বিষয়গত ব্যাখ্যাকে বিকৃত ও অবৈজ্ঞানিক করে তোলে। মার্কসের একটি কথাকে অনুসরণ ক'রে লিওনেভ বলেন, বুর্জোয়া তাত্ত্বিকগণ ইতিহাস-চিন্তায় কল্পনা-প্রবণ, বর্তমানের সম্মুখীন হতে দ্বিধাগ্রস্ত এবং ভবিষ্যৎ-চিন্তায় ভীত।

সর্বহারা শ্রেণীর বিষয়ীগত (subjective) চৈতন্য, ইচ্ছা, কর্ম-প্রবণতা প্রভৃতি সবই বিষয়মুখী। এই শ্রেণীচৈতন্য ইতিহাস, সমাজ ও পৃথিবী অবিকৃত। কারণ, সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থ (যে স্বার্থের বোধ সর্বহারাদের নিয়ন্ত্রণ করছে) তা বিষয়ভিত্তিক ও বিভিন্ন সমাজ-বিজ্ঞানের বিষয়মুখী নিয়মের সংগে সংগতিশীল। সর্বহারা শ্রেণীর চৈতন্যেই বাস্তব জগৎ সর্বোত্তম বিষয়-মুখিতা সহ প্রকাশিত। আলেকজাণ্ড্রভ বলেন : Present-day social life develops by virtue of objective laws. independent of the human will ; and develops in the direction of an inevitable collapse of the old, capitalist society and the victory of the new, communist society.....The ciass-interests of the working-class not only do not conflict wilh the objective laws of social development, but completly coincide with them.

স্তালিন যুগের পর দলানুগামিতা নীতির ব্যাখ্যায় কিঞ্চিৎ ঔদার্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিরা বিজ্ঞানের যে-সব প্রতিক্রিয়াশীল ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তার তীব্র সমালোচনা করতে হবে বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক তাদের মূল্যসম্পন্ন বক্তব্য ও আবিষ্কারগুলোকে সযত্নে পরীক্ষা করতে হবে এবং গ্রহনীয় হ'লে গ্রহণ করতে হবে। (Voprosy filosofia, ১৯৫৫, ২ পৃঃ ৬. দ্রষ্টব্য)। পোলাণ্ড এবং হাঙ্গেরীর ঘটনাবলীর পর দলানুগামী নীতির ব্যাখ্যায় আরো ঔদার্য পরিস্ফুট। (Voprosy filosofia, ১৯৫৬, ৬, পৃঃ ৩-১০ দ্রষ্টব্য)।

এই ঔদার্য সত্ত্বেও মার্কসবাদী চিন্তায় দলের গুরুত্ব কমেনি। তত্ত্বের ও

প্রয়োগের চূড়ান্ত বিচারক সংগ্রামী সর্বহারার দলই। সোভিয়েট দেশে কম্যুনিষ্ট পার্টি ও তার কেন্দ্রীয় কমিটির উপর শুধু তত্ত্ব প্রণয়নেরই নয় তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করার দায়িত্বও ন্যস্ত। তার কারণ, পার্টি কংগ্রেস ও কনফারেন্স গুলিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ 'মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগেরই শুধু শ্রেষ্ঠ উদাহরণ নয়, মার্কসবাদী তত্ত্বের সৃজনধর্মী অগ্রগামিতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।'

* * * *

প্রবন্ধের উল্লিখিত অংশ, আমার অশিক্ষা ও অনিবার্য অক্ষমতার কথা বাদ দিয়ে, যতটা সম্ভব মার্কসবাদী ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকেই উত্থাপন করার চেষ্টা করেছি। সেইজন্যও বটে, সম্ভাব্য সমালোচনার জন্যও বটে, পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে তত্ত্ব বা দর্শনের দলানুগামী স্বরূপ সম্পর্কে উল্লিখিত বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে প্রখ্যাতনামা মার্কসবাদী ব্যক্তিদের বক্তব্য অনুসরণ করেই উত্থাপন করেছি। তাছাড়া আমি যে সোভিয়েট দেশের মার্কসবাদীদের বক্তব্যের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছি তার কারণ, আমার ধারনা মার্কসবাদ সামগ্রিকভাবে বিচার করলে সোভিয়েট দেশেই অন্যান্য কমুনিষ্ট দেশেই তুলনায় অধিক সুষ্ঠু ও সার্থকরূপে রূপায়িত হচ্ছে। আমার এই ধারণা অবশ্য খুবই বিতর্কের বিষয়। তবে সে-বিতর্ক যেহেতু এই প্রবন্ধের আলোচ্য নয় আমি সে-প্রসংগে এখানে মৌন। প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশটি, অর্থাৎ, উল্লিখিত বক্তব্যের কয়েকটি তাৎপর্য বিশ্লেষণের অংশটি আমি মার্কসবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল সম্যলোচকের দৃষ্টিভংগী-সহকারে উত্থাপন করছি এবং মুখ্যতঃ নিবেদন করছি মার্কসবাদের ধীরোদার ছাত্রের নিকট।

(২)

মার্কসবাদে তত্ত্ব এ প্রয়োগের সম্বন্ধ এবং মার্কসবাদী তত্ত্ব বা দর্শনের দলানুগামী স্বরূপের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করবার পূর্বে বিশ্লেষণের সুবিধার্থে উল্লিখিত বক্তব্যের সারাংশ কটি নির্ণয়বাক্যে (Propositon) স্পষ্টভাবে মনে রাখা কর্তব্য ঃ

(ক) শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও সামগ্রিকতায় যে

আত্মচ্যুতি স্পষ্ট, তত্ত্ব ও প্রয়োগের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা তারই অনিবার্য স্বীকৃতি।

(খ) বিচ্ছিন্ন তত্ত্ব ও প্রয়োগকে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ঐকবদ্ধ করতে হবে।

(গ) প্রয়োগ তত্ত্বের-ভিত্তিও বটে, নির্ণায়কও (criterion) বটে।

(ঘ) ব্যক্তির মস্তিষ্কে যে চিন্তা হয় তা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বব্যাপী এক সামাজিক চিন্তার ঐতিহাসিক গতির অংশমাত্র।

(ঙ) তত্ত্ব ও প্রয়োগ স্বভাবতইঃ (spontaneously) ঐক্যবদ্ধ হয় না, তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে হয়।

(চ), (খ) ও (ঘ) ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে তত্ত্বের থেকে প্রয়োগের গুরুত্ব বেশী এবং

(ছ) ব্যষ্টি চিন্তা ও প্রয়োগের তুলনায় সমষ্টি চিন্তা ও প্রয়োগের গুরুত্ব বেশী।

(জ) অসংহত সমষ্টির চিন্তা ও প্রয়োগ সংহতি লাভ করে বৈপ্লবিক ও যথার্থ মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বাধীনে।

(ঝ) পার্টি বা দলের চিন্তা ও প্রয়োগ দলীয় (partisan) হওয়া উচিত এবং

(ঞ) তা হতে বাধ্য।

(ট) অন্যান্য সকল দল ও শ্রেণীর তুলনায় কম্যুনিষ্ট পার্টির বিষয়ীগত (subjective) জগৎ সর্বাধিক বিষয়গত (objective) ও বৈজ্ঞানিক।

(ঠ) কম্যুনিষ্ট পার্টির সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়েই তত্ত্ব ও প্রয়োগের আদর্শ ঐক্য সংরক্ষিত হয় এবং সেইজন্য

(ড) আদর্শ কম্যুনিষ্টের উচিত 'তত্ত্ব ও প্রয়োগ' এবং 'দলের দলীয় নীতি' সম্পর্কে পার্টির অলঙ্ঘনীয় শৃংখলা-অনুসারে পার্টির বক্তব্যই গ্রহণ করা।

* * * *

যদি শ্রেণী বিভক্ত সমাজ আত্মচ্যুত (ক) হয় এবং প্রত্যেক তত্ত্বেই তাত্ত্বিকের শ্রেণীস্বার্থ প্রতিফলিত হয় (ঞ) তাহলে অন্ততঃ সামাজিক ক্ষেত্রে বিষয়স্বরূপ ও বিষয়ীচৈতন্যের মধ্যে একটি ন্যূনতম আকৃতিগত (structural) ও কর্মগত (function) ঐক্য থাকতে বাধ্য। সে-ঐক্য থাকলে 'তত্ত্ব ও

প্রয়োগে স্বভাবতঃই ঐক্যবদ্ধ হয় না' (ঙ) বলার সাধারণ কোন অর্থ থাকে না। সেক্ষেত্রে একটি বিশেষ অর্থ থাকতে পারে, আর তা হল এই : তত্ত্ব ও প্রয়োগে স্বভাবতঃই যে ঐক্য থাকে তা আদর্শ নয়; সে-ঐক্যে বাস্তব জগৎ বিকৃত-ভাবে প্রতিফলিত। বাস্তব সত্যের বিকার দূর ক'রে তত্ত্বের সংগে তাকে আদর্শভাবে ঐক্যবদ্ধ করার যোগ্যতা সর্বাপেক্ষা বেশী হল কমুনিষ্ট পার্টির (জ)। কারণ এই পার্টির বিষয়ীচৈতন্যে বিষয়স্বরূপ অবিকৃত ও আদর্শ বিধৃত (ট) (ঠ) (ড)।

উপরিউক্ত ঘোষণাগুলি অনেকটাই তাত্ত্বিক হয়ে যায় যদি বাস্তবের সংগে মিলিয়ে দেখা যায়। বিভিন্ন দেশের কমুনিষ্ট পার্টি অনেক সময় গুরুতর ভুল-ভ্রান্তি করেছে; ফলে পরবর্তীকালে সে সব তত্ত্বকে নাকচ করতে হয়েছে; তত্ত্বানুগামী কার্যক্রমও বাতিল করতে হয়েছে। যে-পর্যন্ত ভ্রান্ত তত্ত্বগুলি ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব কর্তৃক বাতিল ব'লে ঘোষিত হয়নি সে-পর্যন্ত কিন্তু ঐ তত্ত্ব ও কার্যক্রম সমূহ অভ্রান্ত ব'লেই বিবেচিত হত; যাঁরা এই ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন হয় তাঁদের পার্টি থেকে যেতে হয়েছে কিংবা ক্ষমতাচ্যুত হ'য়ে পার্টির মধ্যে নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় থেকে যেতে হয়েছে। আমার এই বক্তব্যের স্বপক্ষে বহু দেশের কমুনিষ্ট পার্টির ও বিশ্ব কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাস থেকে বহু অধ্যায় উদ্ধার ক'রে দেখান সম্ভব। কিন্তু তা হবে আর একটি পূর্ণাংগ প্রবন্ধের ব্যাপার। আপাততঃ আমি এটুকুই বলি : যে-পর্যন্ত দলের তত্ত্বে দলীয়তার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপিত হবে (ঝ); এবং যে পর্যন্ত কম্যুনিষ্ট দলের বাস্তব জ্ঞানকে সর্বাধিক সত্য (ট) কম্যুনিষ্ট দলের সিদ্ধান্তেই তত্ত্ব ও বাস্তব সম্মিলিত হয় (ঠ) ও দলের অলঙ্ঘনীয় শৃংখলা বিনাপ্রশ্নে অনুসরণীয় (ড) প্রভৃতি নীতিগুলি আপ্তবাক্যরূপে অনুসৃত হবে ততদিন পর্যন্ত পুরনো ভুল-ভ্রান্তিগুলির পুনরাবির্ভাবের আশংকা থেকেই যাচ্ছে।

গুরুতরভাবে পার্টির নীতি, কার্যক্রম ও নেতৃত্বে পরিবর্তনের পূর্বে পার্টির অভ্যন্তরে যে-সব সমালোচনা ও প্রতিবাদ ধুমায়িত হতে থাকে তাদের যথার্থ স্বীকৃতি ও মূল্য নির্ণয় না করেই পার্টি-শৃংখলার নামে সে-সব চেপে দেয়া হয়। যে-সব সমালোচনা ও প্রতিবাদের হেতু গভীরভাবে ঐতিহাসিক ও বিষয়নিষ্ঠ তাদের দীর্ঘকাল চেপে রাখা সর্বদা সম্ভব হয় না। ফলে কখনো কখনো কোনো

কোনো দেশের পার্টির নেতৃত্বে, ও প্রয়োগে গুরুতর পরিবর্তন দেখা দেয়। ফলে পদাবনতি থেকে মৃত্যুদণ্ড বহু কিছুই ঘটতে পারে। পার্টির অভ্যন্তরে ও অন্যত্র যে-সব বিষয় ও বিষয়ীগত পরিবর্তন দেখা দেয় তা পার্টির তত্ত্বে ও প্রয়োগে প্রতিফলিত না হলে সে দায়িত্ব নেতৃত্বের এবং তা দ্বারা বাস্তব ক্ষেত্রে তত্ত্ব ও প্রয়োগের অনৈক্যই সূচনা করে।

বলা যেতে পারে কম্যুনিষ্ট পার্টির অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্তমান। যে গণতন্ত্র কেন্দ্রানুগ (democratic centralism)। তত্ত্বে যা কেন্দ্রানুগ গণতন্ত্র ব'লে বর্ণিত হয় বাস্তবে তা গণতন্ত্রহীন কেন্দ্রানুগত্যেই পরিসমাপ্ত। তার কারণ খুব বাস্তব। গণতন্ত্রের নামে অত্যধিক মতভেদকে পার্টির মধ্যে স্বীকৃতি দিলে পার্টির ঐক্য ও শক্তির নিজস্ব কোনো মূল্য নেই; বাস্তব অস্বীকার ক'রে ঐক্য রক্ষা অবৈজ্ঞানিক। ন্যায্য বিরোধিতাকে শক্তিখর্বকারক ব'লে শ্বাসরুদ্ধ করা মারাত্মক। বুর্জোয়া সমাজের কর্ণধার ও চিন্তাশীলদের বিরুদ্ধে যে-সব সমালোচনা মার্কসবাদীরা তুলে থাকেন বিপথগামী বহু মার্কসবাদীর বিরুদ্ধে সেই সমালোচনা বহুলাংশে প্রযোজ্য।

দলীয় ঐক্যরক্ষার ব্যাপারে দলীয় নেতৃত্বের উপর যে-গুরুত্ব আরোপিত হয়, তত্ত্ব হিসাবে তার মূল্য যাই হোক, বাস্তবে তা দলীয় নেতার নেতৃত্বেই পর্যবসিত হয়। অর্থাৎ, তত্ত্বে যা থাকে দলের নেতৃত্ব বাস্তবে তা হয়ে দাঁড়ায় দলনেতার নেতৃত্বে কিংবা দলনেতা ও তার গোষ্ঠির নেতৃত্ব। এক্ষেত্রেও বাস্তব তত্ত্বে ঐক্য নেই। কারণ খানিকটা বাস্তবিক, খানিকটা তাত্ত্বিক। ব্যষ্টির চিন্তা ও কর্মের তুলনায় সমষ্টির, (ছ) বিশেষতঃ কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বাধীনে সমষ্টির (জ) উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপন তত্ত্ব হিসাবে যতই গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুগামী মনে হোক না কেন বাস্তবে এর ফলে দলনেতার স্কন্ধে অত্যধিক দায়িত্ব পড়ে যায়। দলের তান্ত্রিক, ও বাস্তবিক নেতৃত্ব তাকেই দিতে হত; বিরূপ সমালোচনা ও বিরোধী কর্ম দমন করে পার্টির ঐক্যরক্ষা এবং, সর্বোপরি, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দলকে আদর্শ লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার দুরূহ দায়িত্ব তারই। যার দায়িত্ব এত বেশী ও গভীর তাকে ক্ষমতাও দিতে হবে।

মূল সমস্যা এখানেই। পার্টির নেতা ও (বা) প্রলেটারিয়েট ডিক্টেটরের হাতে ক্ষমতা দেবার সময় তত্ত্বের দিক থেকে বলা হয় 'নেতার হাতে নয় পার্টির নেতার হাতে, ডিক্টেটরের হাতে নয় প্রলেটারিয়েটের ডিক্টেটরের

হাতে ক্ষমতা দেয়া হচ্ছে' কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ক্ষমতা যায় নেতার হাতে, ডিক্টেটরের হাতে।

'ব্যষ্টির চিন্তা ও কর্ম সমষ্টিতে এবং অসংহত, সমষ্টির চিন্তা ও কর্ম কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন সমষ্টিতে সংহত, ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হচ্ছে (জ)'—এই যুক্তি থেকে এক পা এগুলে বলা যায় 'অভিজ্ঞতা ও আচরণ, বাস্তব ও তত্ত্বে সম্মিলিত বা ঐক্যবদ্ধ হয় কম্যুনিষ্ট পার্টিতে' এবং দু' পা এগুলে বলা যায় 'কমুনিষ্ট পার্টির চিন্তা ও তত্ত্ব আদর্শভাবে ঐক্যরূপ পেয়েছে (পার্টির) নেতার ব্যক্তিতে।' তত্ত্বহিসাবে শেষ-কথাটি বলা না হলেও বাস্তবে যে তা অনুসৃত হয়েছে তা এখন বহুবিদিত। ভবিষ্যতেও যে এমনটি আর হবে না তত্ত্বে তার প্রমাণ লঘু, বাস্তবে লঘুতর।

সমাজের অনৈক্য বা ও স্বাধীনতা দূর করার জন্য, সমাজের দ্রুত বৈষয়িক উন্নতির জন্য সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক শক্তিকে সংহত ও কেন্দ্রীভূত করা অনিবার্য। শক্তিকে সংহত এবং ও কেন্দ্রীভূত করবার প্রয়োজনীয়তা তত্ত্ব-হিসাবে মার্কসবাদে স্বীকৃত ও বাস্তবেও অনুসৃত। সোভিয়েট শাসনতন্ত্রে কম্যুনিষ্ট পার্টির ভূমিকার সহিত ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকার পার্টিগুলির ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনা করলেই বিষয়টি স্পষ্টতর হতে পারে। কিন্তু তা এখানে নিষ্প্রয়োজন। যে দেশের নিয়ন্ত্রিত সমাজশক্তি কোনো একটি মাত্র পার্টির নেতৃত্বে রাষ্ট্রশক্তি পরিচালনা করছে এবং দেশের জনগণকে বৈষয়িক উন্নতির পথে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছে সেই দেশের রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি যে কত কেন্দ্রীভূত তা সহজেই অনুমেয়। সোভিয়েট শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত হবার যে তাত্ত্বিক স্বীকৃতি রয়েছে তার গুরুত্ব পার্টির বাস্তব কর্মপদ্ধতির দ্বারা বহুলাংশেই লুপ্ত ; যে-অংশে লুপ্ত নয় তা রাজনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতির সংঘর্ষ যতটা এড়ানো সম্ভব হয়েছে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ততটাই উন্নতি সম্ভব হয়েছে এবং একাধিক অঞ্চলের ও বিষয়ের উন্নতি বিস্ময়কর। তথাপি মূল অর্থনৈতিক রাজনৈতিক কেন্দ্রীভূত করার সমস্যা বাস্তবে থেকেই যাচ্ছে। বিপুল দায়িত্ব অর্পিত হবে যে নেতার স্কন্ধে বিশাল ক্ষমতাও তাকে দিতে হবে। তত্ত্বের বা শাসনতন্ত্রের দিক থেকে যে-ক্ষমতা সীমাবদ্ধ সংগঠন (Organisation) সমাজাচার (institution) এবং, সর্বোপরি, প্রয়োগের (practice) দিকে তা নিরংকুশ হতে বাধা নেই

সংগঠনে, সমাজাচারে ও প্রয়োগে যে পদের শক্তি নিরংকুশ সেই পদের অধিকারী যদি তবুও নিরংকুশ ক্ষমতা গ্রহণ ও প্রয়োগ না করেন তবে তা তাঁর নিতান্তই ব্যক্তিগত চারিত্রিক মাহাত্ম্যের পরিচায়ক। কিন্তু এইপ্রকার একটি গুরুতর সমস্যা কোনো ব্যক্তির—তা তিনি যতই মহৎ হোন না কেন—চারিত্রিক মাহাত্ম্য দ্বারা সমাধান করা সম্ভব হতে পারে না। এর সমাধান-সূত্র তত্ত্ব ও বিশেষ করে বাস্তবে সন্ধান করতে হবে। নেতাকে নিরংকুশ করা বিপজ্জনক, দলকে সার্বভৌম ক'রে তার নেতৃত্বে বিচিত্র সমাজকে আবদ্ধ করে ফেলা পরিণামে ক্ষতিকর; এর ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা—বিশেষত' যেখানে মুক্তবুদ্ধির প্রকাশ কল্পনা ও জল্পনার (speculation) অবকাশ আছে—বাহ্যত হতে বাধ্য।

মার্কসবাদ যে এইসব অবাঞ্ছিত তাৎপর্যের সংগে জড়িয়ে পড়েছে তার কারণ বর্তমানে প্রধানতঃ বাস্তবিক (practical) তবে কিয়দংশ তাত্ত্বিক ও বটে। ব্যক্তির ধ্যানধারণার সামাজিক ও বিষয়গত পটভূমি বোঝাতে গিয়ে যখন মার্কসবাদী বলেন, 'ব্যক্তির মস্তিষ্কে যে চিন্তা হয় তা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বব্যাপী এক সামাজিক চিন্তার ঐতিহাসিক গতির অংশমাত্র' (খ) তখন দর্শনের ছাত্র-মাত্রই অনুভব করেন হেগেলের পরাতত্ত্ব (Metapysics) বা ইতিহাসতত্ত্ব (Historiography) থেকে এই উক্তির ভাষা ও ভাব বেশী দূর নয়। সমষ্টি বা সমগ্রের তুলনায় ব্যষ্টিকে খর্ব ক'রে এমনি করেই একদিন নৈতিক স্বাধীনতার পূজারী হেগেল,ও তাঁর উত্তরসাধকগণ সমগ্রতাবাদী(totalitarian) রাজনীতির স্বাধীনতা নানা বন্যার বাঁধ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। ভাববাদী দর্শনের রাজ-নৈতিক উত্তরাধিকার যে বস্তুবাদী দর্শনের পূজারীদের হাতে গিয়েছে তা কিছু আকস্মিক ও অকল্পনীয় নয়। ব্যষ্টিমহিমা খর্বের এই পরিণাম অনিবার্য। ব্যক্তি-পূজার নিন্দা করে সজ্ঞানে হয়তো আমরা স্তালিনেরই সমালোচনা করি কিন্তু প্রকারান্তরে এই সমালোচনা হেগেল ও তার একার্থে শিষ্য মার্কসকেও স্পষ্ট করে। এক জল্পনা-মূলক সমগ্রতায় হেগেল ও মার্কস ব্যষ্টিকে নিক্ষেপ করেন এবং তার মূল্য খর্ব করেন। লক্, হিউম এ্যাক্টন ও টকোয়েভিলের উদারনৈতিক ও অভিজ্ঞানবাদী ব্যষ্টিবাদ আধুনিক অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে আমরা গ্রহণ করতে না পারি, কিন্তু তাঁদের বক্তব্যের একটি মৌলনীতি আমরা গ্রহণ করতে পারি ঃ সমগ্রতাকে অবহেলা করলে চলবে না, সে কথা

সত্য, তবে সমগ্রকে বাস্তবে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝতে হলে ব্যষ্টির মধ্য দিয়েই বুঝতে হবে। সমগ্রতার মধ্য দিয়েই ব্যষ্টিকে বুঝতে গেলে হয় সে হেগেলের পূর্ণ ব্রহ্মে বিলীন হবে কিংবা ঐক্যবাদী সমাজের শক্তি পেষণে বিকৃত হবে। সে-ক্ষেত্রে আবার পূর্ণ ব্রহ্মবাদের কিংবা ব্যক্তিপূজার সমালোচনা অবশ্যম্ভাবী। সমগ্রতায়ই আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা রূপ পাবে, কিন্তু রূপায়িত হবে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন মানুষের মধ্য দিয়ে। ব্যষ্টি মানুষের কর্ম ও ধ্যানধারণার মধ্য দিয়েই সমগ্রকে, সমষ্টিকে বাস্তবে বুঝতে হবে;—অন্যথায় সমষ্টিকে বুঝবার চেষ্টা জল্পনামূলক (Speculative) এবং নিছক তাত্ত্বিক্ হতে বাধ্য।

তত্ত্ব যদি জল্পনামূলক বা বাস্তব সম্পর্ক-বর্জিত হয় তাহলে সে-তত্ত্বকে সহজেই দল বা দলের নামে নেতা নিজের সুবিধার্থে উল্টে নিতে পারে। তত্ত্বকে সত্যসন্ধী করতে হলে তাকে অভিজ্ঞানমুখী রাখতে হবে। প্রয়োগকে সুবিধাবাদীর ইচ্ছায় সমর্পণ করতে যদি আমরা না চাই তাহলে তত্ত্বের বন্ধন তাকে স্বীকার করাতে বাধ্য হবে। একক অভিজ্ঞতা বা প্রয়োগ দ্বারা যেমন তত্ত্বের সত্যাসত্য নির্ণীত হয় না তেমনি জল্পনামূলক এক সমষ্টির অভিজ্ঞতা বা প্রয়োগ দ্বারাও তত্ত্বের সত্যাসত্য নির্ণীত হয় না। তাছাড়া কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন সর্বহারা শ্রেণীর অভিজ্ঞতায় সত্য অধিকতর পরিস্ফুট হয়,—এ জাতীয় বক্তব্য আপ্তবাক্যরূপে গ্রহণ করা বিপজ্জনক। অল্প-অল্প করে আস্তে-আস্তে হলেও ব্যক্তির প্রয়োগ ও অভিজ্ঞতাই আমাদের কাছে সমগ্র অভিজ্ঞেয় জগতের, সমাজের স্বরূপ ও নিয়ম বৈজ্ঞানিকভাবে উন্মোচিত করছে। বিশ্বব্যাপী এক সম্বোধি (intuition) দ্বারা কিংবা সর্বগ্রাসী এক সামাজিক ঐতিহাসিক চৈতন্য-গতির ডগমা দ্বারা জটিল ও বিচিত্র বাস্তব সমস্যাদির সমাধান-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য এবং এ সব দৃষ্টিভংগী বিজ্ঞান বিরোধী ধর্মানুগ।

ব্যক্তিকে বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠিতে কেন্দ্রীভূত বিপুল রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং ঐ একই রাজনীতিতে দীক্ষিত সামরিক কাহিনীর যুগ্ম সংহতি তত্ত্ব থেকে প্রয়োগকে বিচ্ছিন্ন করার মানসিক প্রবণতার পথ উন্মুক্ত করেই রেখেছিল। এই বিচ্ছিন্নতাকামী প্রবণতা তাত্ত্বিক সমর্থন লাভ করছে দলের দলীয় (partisan) দর্শন থেকে। ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠিতে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে

যখন বিভিন্ন সংগঠন ও দেশাচার (institution) প্রভাবিত করতে পারে না, শাসনতন্ত্রের তাত্ত্বিক বিধিনিষেধ বাস্তবে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম ঠিক তখনই যদি দলীয় শৃংখলার নামে গণতন্ত্রহীন কেন্দ্রানুগত্য সেই শক্তিকে উৎসাহিত করে এবং তদুপরি, দলীয় দর্শনের নীতি দ্বারা সেই শক্তিকে নিরঙ্কুশ ক'রে তোলে তাহলে তত্ত্ব থেকে প্রয়োগকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার বাস্তব objective ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তারপর সেই ব্যবস্থাকে কোনো শক্তিশালী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠী কাজে লাগাবে কি লাগাবে না তা, অন্ততঃ কিছুকালের জন্য, তার ব্যক্তিগত বুদ্ধি, ইচ্ছা বা দয়ার উপর নির্ভর করতে থাকে। দয়া বা ইচ্ছার প্রসংগ না হয় বাদই দিলুম, কিন্তু ব্যষ্টির বুদ্ধির উপরেই বা কেন সমষ্টির কল্যাণ-অকল্যাণের এমন নিরংকুশভাবে নির্ভরশীল হবে? বাস্তববাদী, বিষয়-নিষ্ঠ, সমাজতান্ত্রিক সমাজের সম্মুখে এই প্রশ্নের উপস্থিতিই তত্ত্ব থেকে যে বাস্তব বিচ্ছিন্ন হচ্ছে তার অন্যতম প্রমাণ। হেগেলের তত্ত্বে রাজব্যক্তিতে যে অবাস্তব, অবৈজ্ঞানিক এবং বিপজ্জনক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল সেই গুরুত্বই কি গুরুতর ভ্রান্তিবশতঃ প্রকারান্তরে সাম্প্রতিক কালের ব্যক্তিপূজায় (cult of personality) পুনরাবৃত্ত হয় নি? তত্ত্বমুখী হেগেল তত্ত্ব দ্বারা বাস্তবকে বিকৃত করেছেন; বাস্তবমুখী মার্কসবাদী বাস্তবের নামে তত্ত্বকে বিকৃত করছে। হেগেল দাবী করেছিলেন বিজ্ঞানপন্থী তাঁর দর্শনেই বিষয়-বিষয়ীর (subject-object) দ্বন্দ্ব দূর হয় ও তত্ত্ব-প্রয়োগ বৈপরীত্যের সদ্ব্যাখ্যা হয়; এবং এ-আত্মপ্রসাদও তিনি লাভ করেছিলেন যে যে-বিজ্ঞান-বিরোধী কাণ্টীয় জ্ঞানতত্ত্ব (Kantian epistemology) থেকে তিনি বিজ্ঞানকে রক্ষা করছেন। দর্শন-রাজ্যে হেগেল আজ প্রায়-মৃত; কাণ্টীয় মন্ময়তারই (subjectivism) রূপান্তরই আজ দার্শনিকদের বরেণ্য। মার্কসবাদীরা দাবী করেন যে মার্কসবাদী দলের মন্ময় মনীষাতে বস্তুজগৎ বাস্তবধর্ম রক্ষা ক'রে উপস্থিত, সেই দলের প্রয়োগের মধ্য দিয়েই বাস্তব মনীষা বর্ধিত, সংস্কৃত ও অগ্রগামী হচ্ছে। তত্ত্বের দিক থেকে বাস্তবকে অবহেলা করলে যে-পরিণামে পৌছুবার আশংকা থাকে বাস্তবের দিক থেকে তত্ত্বকে অবহেলা করলে অন্য পথ হলেও সেই পরিণামে পৌছুবার আশংকাই থাকে। যে-অর্থে হেগেলের রাষ্ট্রবাদ (Stateism) নাৎসীবাদে রূপ পেয়েছিল, আমার ধারণা, ইতিহাসের এত শিক্ষার পর, সেই অর্থে কোনো কম্যুনিষ্ট দেশে মার্কসবাদ দেখা দেবে না। তবু, অতন্দ্র প্রহরার প্রহর অতিক্রান্ত

এই অলস বিশ্বাসে আমার আস্থা নেই। যে-ভাবেই হোক না কেন বাস্তব ও তত্ত্বকে বিচ্ছিন্ন করা তত্ত্বের দিকে ভুল, বাস্তবের দিকে ভুল, বাস্তবের দিকে মারাত্মক, বাস্তব ও তত্ত্বের ঐক্যে মার্কসবাদী তত্ত্বে স্বীকৃত; কিন্তু বাস্তবে অনুপস্থিত কিম্বা অনুপস্থিত হবার বাস্তব পথ উন্মুক্ত।

আমার বক্তব্যের পূর্ব-প্রকল্পগুলির (assumption) যৌক্তিকতা ও বাস্তবানুগত্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে; তা তোলা হোক্। আমি তা' অভ্যর্থনা করব। তবু এই তত্ত্বের তাত্ত্বিক আলোচনা হোক। তাতে আমি তো ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হবই; উপরন্তু মার্কসবাদী দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ অনালোচিত সমস্যার উপরও আলোকসম্পাত করা হবে।

মনোবিদ ইয়ুং

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ফ্রয়েড, ইয়ুং, অ্যাডলার—স্তরীয় মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে তিন দিকপাল। ফ্রয়েড এবং অ্যাডলার অনেক আগেই গত হয়েছেন। ইয়ুং গত ৬ই জুন ৮৫ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করলেন। এই দীর্ঘ জীবন ইয়ুং কাটিয়েছেন মানুষের মনের রহস্য ভেদ করতে। সে বিষয়ে তিনি কতদূর কৃতকার্য হয়েছেন সে বিচার করবেন ভবিষ্যতের মনোবিজ্ঞানীরা। তবে মনোবিজ্ঞানের মত একটি শিশু-বিজ্ঞানকে তাঁর গবেষণার দ্বারা তিনি যে প্রচুর নতুন তত্ত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ করেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সুইজার্ল্যাণ্ডে তাঁর জন্ম। সেখানেই বেল সহরে তিনি শিক্ষালাভ করেন। সেখান থেকে ভেষজ বিজ্ঞানে স্নাতক হবার পর ১৯০০ সালে জুরিখে এক মানসিক হাসপাতালে মনোচিকিৎসক হিসাবে কাজ আরম্ভ করেন। ১৯০০ থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত এখানে বিখ্যাত মনোবিদ্ ব্লুলারের সহযোগিতায় গবেষণা করেন। এই গবেষণার ফল, শব্দ অনুষঙ্গ অভীক্ষা (Word Association Test)। এই অভীক্ষা দ্বারা মনের গভীরস্থ গ্যুঢ়ৈষার (Complex) সন্ধান মেলে। এই গবেষণার ফলে তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়েই তিনি ফ্রয়েডের মনোবৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি সম্বন্ধেও বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ১৯০৭ সালে ফ্রয়েডের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ ঘটে। এর পর কয়েক বৎসর ফ্রয়েডীয় সম্প্রদায়ের সহিত তিনি সহযোগিতা করেন। ১৯১১ সালে তিনি আন্তর্জাতিক মনঃসমীক্ষা সমিতির (International Psycho-analytic Society) প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

এরপর থেকে ফ্রয়েডের সাথে শুরু হয় তাঁর মতান্তর। ১৯১২ সালে তাঁর 'The Psychology of the Unconscious' নামক গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গেই এই মতান্তর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯১৩ সালে তিনি ফ্রয়েডীয়

মনঃসমীক্ষণ সম্প্রদায়ের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং নিজের মতানুযায়ী 'Analytical Psychology' নামক এক নতুন মনোবিদ্যা গঠনে উদ্যোগী হন। মনোবিদ্যাবিষয়ক তাঁর প্রধান মতগুলি সম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

মন ঃ ফ্রয়েড আবিষ্কার করেন, মন এবং চেতনা সমব্যাপক নয়। মন চেতনা অপেক্ষা বেশী ব্যাপক। চেতনা মনের একটি গুণ মাত্র। মনে এ-গুণ থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। অর্থাৎ অবচেতন বা নির্জ্ঞান মন আছে। শুধু আছে নয়, এই নির্জ্ঞান মনই আসলে প্রধান। সংজ্ঞান মন নির্জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত। মনের $\frac{৯}{১০}$ ভাগ নির্জ্ঞান ও $\frac{১}{১০}$ ভাগ সংজ্ঞান। এই নির্জ্ঞান মন ব্যক্তির চরিত্র গঠনে বিশেষ প্রভাবশীল।

ইয়ুং নির্জ্ঞান মন ও মানলেনই অধিকন্তু তাকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করলেন। তিনি নির্জ্ঞানকে গভীরতা ও গুরুত্বের দিক থেকে দুইভাগে ভাগ করেন ঃ ব্যক্তি নির্জ্ঞান (Personal Unconscious) ও সমষ্টি নির্জ্ঞান (Collective Unconscious) বা জাতি নির্জ্ঞান (Racial Uncoscious)। ব্যক্তি নির্জ্ঞান ব্যক্তির একান্তভাবেই নিজলব্ধ মানসসত্তা। আর জাতি নির্জ্ঞান জাতির কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সর্বমানুষের সাধারণ মানসসত্তা। ব্যক্তি নির্জ্ঞানের সামগ্রী বিভিন্ন মানুষে স্বতন্ত্র। ব্যক্তি নির্জ্ঞানে থাকে বিভিন্ন অবদমিত ইচ্ছা ও গূঢ়ৈষা। সেই ইচ্ছা ও গূঢ়ৈষার রকম ও তারতম্য ব্যক্তি-মনের গঠন ও পরিবেশের প্রভাব অনুযায়ী বিভিন্ন হতে বাধ্য। শিশুর বিভিন্ন ইচ্ছা ও আবেগ বিভিন্ন পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করে। সেই ইচ্ছা ও চাহিদা সামাজিক অনুশাসনের দরুণ সংজ্ঞানে টিঁকে থাকতে পারে না। শিশুকে সে-গুলির অধিকাংশই অবদমন করতে হয়। সেই অবদমিত ইচ্ছা, আবেগ ও আবেগজাতি ধারণা ব্যক্তি নির্জ্ঞানে বাস করে। এ ছাড়াও প্রতি মানুষের অতীত অভিজ্ঞতা স্মৃতিরূপে ব্যক্তি নির্জ্ঞানেই বর্তমান থাকে।

জাতি নির্জ্ঞান, নির্জ্ঞান মনের গভীরতর স্তর। এই জাতি নির্জ্ঞান থেকেই সংজ্ঞান (Consciousness) ও ব্যক্তি নির্জ্ঞানের উদ্ভব। জাতি নির্জ্ঞান গতিময় প্রকৃতি (dynamic)। যদিও প্রতি ব্যক্তির মধ্যেই তা বর্তমান তবু তা কোন ব্যক্তিরই নিজস্ব নয়। জাতি নির্জ্ঞান আসলে সমগ্র মানবজাতির

অর্জিত সাধারণী মানসসত্তা। এই নির্জ্ঞানে থাকে সহজ প্রবৃত্তি (Instincts) ও কতকগুলি আদি-মানস-প্রকার (archetypes) এ-গুলি আসলে আদিম মানুষের বিভিন্ন বিষয়, ঘটনা ও পরিবেশকে কেন্দ্র করে তার যা অভিজ্ঞতা তারই সাধারণ নমুনা। সূর্যের উদয় ও অস্ত, ঋতু পরিবর্তন, স্ত্রী, পুরুষ, জন্ম, মৃত্যু, জয়, পরাজয় প্রভৃতি জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ দিককে তারা যেভাবে উপলব্ধি করেছে, সেই উপলব্ধির রকমই অস্পষ্ট সামান্য ধারণা হিসাবে সকলের জাতি নির্জ্ঞানে বিদ্যমান। এই আদি-মানস-প্রকারগুলি নানা মূর্তরূপ ধরে বিভিন্ন দেশের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পুরাবৃত্ত (myth) ও রূপকথায় প্রকাশিত। স্বপ্নের মধ্যেও কখন কখন এদের আবির্ভাব ঘটে। আমাদের বিভিন্ন সংস্কার, বিশ্বাস ও বাধানিষেধের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনেও এদের দেখা মেলে। ভূত, প্রেত, দত্যি, দানা, পরী, জুজু, ডাইনী ও তুকতাকের প্রতি ভয় ও আসক্তির—সেই আদিম মানসতারই (archaic mentality) পরিচয় দেয়। সাহিত্য, চিত্র, ও ভাস্কর্য প্রভৃতি চারুশিল্পের মধ্যেও জাতি নির্জ্ঞানের আদি ধারণাগুলির আবির্ভাব ঘটে। ইয়ুং-এর মতে 'মাতৃকা' (Great Mother) জাতি নির্জ্ঞানের অন্যতম প্রধান আদি মানস-প্রকার (archetype)। বিভিন্ন দেশের শিল্পসৃষ্টিতে এর আবির্ভাব ঘটেছে। গর্কীর 'মাদার', তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' এবং রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের 'মা' সর্বকালীন মানুষের সাধারণ মাতৃ-অভিজ্ঞতারই শিল্পরূপে মূর্ত প্রকাশ বলা চলে!

মানসিক শ্রেণী : ইয়ুং তাঁর 'Psychological Types' গ্রন্থে স্বভাবের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মানুষের রকম নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। .এই স্বভাব নির্ভর করে লিবিডো বা মনঃশক্তির গতির উপর। লিবিডো বহির্জগতে বস্তুর প্রতি ধাবিত হতে পারে অথবা বহির্জগত থেকে সরে এসে ব্যক্তির নিজের উপরও স্থাপিত হতে পারে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে ব্যক্তি হবে বহির্বৃত, (Extrovert) ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তি হবে অন্তর্বৃত (Introvert)। বহির্বৃতের আসক্তি হবে বস্তুজগতের প্রতি। তারা সমাজে, মেলামেশা, বন্ধুত্ব, হৈ চৈ পছন্দ করবে। বস্তুজগতের নানা বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া, তাদের প্রকৃতি নির্ধারণ ও কাজে লাগান প্রভৃতি বিষয়ে সচেষ্ট হবে। এরা সাধারণতঃ উৎসাহী ও আশাবাদী। আর অন্তর্বৃতের আকর্ষণ

অন্তর্জগতের প্রতি। তারা সমাজের গোলমালের চেয়ে নিজের জগতের মধ্যে বাস করতে বেশী পছন্দ করবে। বস্তুর চেয়ে ভাবনায় মধ্যে থাকতে আনন্দ পাবে। পুরাপুরি নৈরাশ্যবাদী না হলেও সকল বিষয়কে একটু সন্দেহের চোখে দেখার প্রবণতা থাকবে।

ইয়ুং অবশ্য বলেন, অন্তর্বৃত ও বহির্বৃতের মধ্যে কোনও চরম সীমারেখা টানা যায় না। অর্থাৎ উভয়ই চরম রকম। সাধারণ মানুষ একান্তভাবে এর কোনটিই নয়, অধিকাংশ মানুষই এই দুই চরম রকমের এক মাঝামাঝি অবস্থা। অর্থাৎ সকলের মধ্যেই বহির্মুখিতা ও অন্তর্মুখিতা উভয়ই বর্তমান। তাই সাধারণ সকল মানুষকে উভবৃত (Ambivert) বলা চলে। তবে এও দেখা যায় যে কারও মধ্যে একটির চেয়ে অপর ভাবটির প্রাধান্য। তখন সেই প্রাধান্য অনুযায়ী আমরা সাধারণভাবে কাউকে বহির্বৃত ও কাউকে অন্তর্বৃত বলে থাকি।

লিবিডো-ভিত্তিক এই বিভাগ ছাড়াও ইয়ুং মানসিক ক্রিয়ার (Mental function) প্রাধান্য অনুযায়ী মানুষকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। সে বিভাগ হল: (১) চিন্তা প্রবণ (Thinking Type), (২) অনুভূতি প্রবণ (Feeling Type), (৩) সংবেদন প্রবণ (Sensing Type) ও (৩) অন্তর্দৃষ্টি প্রবণ (Intuitive Type)। এইভাবে মানষিক ক্রিয়ার প্রাধান্য অনুযায়ী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়।

লিবিডো: ফ্রয়েডের মতে লিবিডো হল কামশক্তি। এবং এই কামের স্বরূপ অতিব্যাপক। অ্যাডলার লিবিডো বলতে বোঝেন, ক্ষমতাস্পৃহা (Will to Power)। ইয়ুং কামশক্তি এবং ক্ষমতাস্পৃহা উভয়কেই গ্রহণ করে লিবিডোকে আরও ব্যাপক রূপ দেন। লিবিডো তাঁর কাছে নির্বিশেষ মনঃশক্তি (Psychic energy), কোন বিশেষ শক্তি নয়। এই সাধারণ মনঃশক্তির মধ্যে ফ্রয়েডের কামশক্তি এবং অ্যাডলারের ক্ষমতাস্পৃহা ছাড়াও জীবনসেবী অন্যান্য শক্তিও বর্তমান। ইয়ুং-এর এই নির্বিশেষ মনঃশক্তি যেন বার্গসঁর Elan Vital এবং সোপেনহাওয়ারের 'Will to live'-এর সমগোত্রীয়। ইয়ুং পদার্থ বিজ্ঞানের শক্তির (energy) সহিত মনঃশক্তির তুলনা করেছেন। পদার্থ বিজ্ঞানের শক্তি তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হলেও তা মূলতঃ একই শক্তি। তেমনি এই মনঃশক্তি কখনও

কাম, কখনও ক্ষমতাস্পৃহা, কখনও বা অন্যরূপে প্রকাশিত হয়েও একই মনঃশক্তি।

নিউরোসিস্ঃ মানসিক ব্যাধি সম্বন্ধে ফ্রয়েডের মত হল, ব্যাধির মূলে শৈশবের যৌনইচ্ছার বিশৃঙ্খলাই ক্রিয়াশীল। কাজেই ব্যাধির কারণ রোগীর অতীত জীবনে নিহিত। সেই অতীত শৈশব নির্জ্ঞানে প্রভাব বিস্তার করে মানসিক বিপর্যয় ঘটায়। ব্যক্তিকে সুস্থ করতে হলে এই অবদমিত অতৃপ্ত ইচ্ছাগুলিকে সংজ্ঞানে এনে কল্পনায় তাদের ভোগ তৃপ্তি আবশ্যক। ইয়ুং-এর মতে, মানসিক ব্যাধির কারণের জন্যে কেবল অতীতের উপর নির্ভর করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। রোগীর বর্তমান সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানের সমস্যা সমাধান করতে না পারার জন্যেই মানসিক বৈকল্যের আবির্ভাব। তিনি মনে করেন, অনেক ব্যক্তির পক্ষেই শৈশবের ইচ্ছাগুলির সামঞ্জস্যমূলক ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। তারা নির্জ্ঞানে এই প্রক্ষোভজ আলোড়ন (emotional disturbance) নিয়েই বেড়ে উঠতে পারে অথচ ভবিষ্যতে তাদের নিউরোসিস্ নাও দেখা দিতে পারে। নিউরোসিস্ তখনই দেখা দেবে যখন প্রাপ্ত বয়সে ঐরূপ ব্যক্তি বিশেষ কোন বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হয় এবং সেই বাস্তবকে আয়ত্তে আনতে যথেষ্ট শক্তির প্রয়োজন হয়। ব্যক্তির মধ্যে ঐ প্রয়োজনীয় শক্তির প্রাচুর্য না থাকার জন্যে সে বাস্তব থেকে মানসিকভাবে পলায়ন করে এবং শিশুর মত এলোমেলো ব্যবহার করতে থাকে। এমনি অবস্থায় নিউরোসিস্ দেখা দেয়, আবার দেখা যায়, যদি এই বাস্তব সমস্যার দৈবাৎ কোন সমাধান হয়ে যায় তাহলে ব্যক্তি সহজেই নিউরোসিস্ মুক্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং বর্তমান বাস্তবের কাছে পরাভবই নিউরোসিসের প্রকৃত কারণ। কাজেই রোগমুক্ত করতে হলে কেবল অতীতের অবদমিত বাসনাগুলি নির্জ্ঞান থেকে মুক্ত করলেই হবে না। তার জন্যে প্রয়োজন রোগীকে বর্তমানের প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য দেওয়া। রোগী যাতে বর্তমানকে সাফল্যের সহিত আয়ত্তে আনতে পারে তার জন্যে সর্বোতভাবে তাকে মানসিক উপকরণ জোগান দেওয়াই চিকিৎসার লক্ষ্য হওয়া উচিত।

স্বপ্নঃ ফ্রয়েডের মত ইয়ুংও স্বপ্নকে মনোবিষয়ক সত্য আবিষ্কারের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেন। ফ্রয়েডের মত তিনিও মনে করেন, স্বপ্ন নির্জ্ঞান

মনের সৃষ্ট এবং স্বপ্নে নির্জ্ঞান মন প্রতীকের (Symbols) সাহায্যে কথা বলে। কাজেই স্বপ্নের অর্থ বুঝতে হলে প্রতীকের অর্থ উদ্ধার করা প্রয়োজন। এই প্রচেষ্টাকেই সাধারণভাবে স্বপ্ন ব্যাখ্যা (Dream Interpretation) বলা হয়।

কিন্তু ইয়ুং-এর স্বপ্নব্যাখ্যা পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য ফ্রয়েড থেকে স্বতন্ত্র। ইয়ুং-এর মতে, ফ্রয়েডের পদ্ধতি বিশ্লেষাত্মক (Analytic) ও তাঁর নিজের পদ্ধতি সংশ্লেষাত্মক (Synthetic)। ফ্রয়েডের মতে স্বপ্নে অতীতের অবদমিত ইচ্ছাগুলির গোপনে ভোগতৃপ্তি ঘটে। তাই স্বপ্নকে নানা অংশে ভাগ করে, তাদের মুখস খুলে গুপ্ত ইচ্ছাকে খুঁজে বার করাই স্বপ্ন ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য। এরূপ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে ব্যক্তির অতৃপ্ত ও অবদমিত বাসনাগুলির পরিচয় পাওয়া যায়।

ইয়ুং মনে করেন, অবদমিত ইচ্ছার গোপন ভোগ বা অতীতের পুনরাবৃত্তিই স্বপ্নের একমাত্র পরিচয় নয়। স্বপ্নে অতীত ছাড়াও বর্তমান এবং ভবিষ্যতও দেখা যায়। বর্তমানে ব্যক্তি বাস্তব সমস্যাকে কি দৃষ্টিতে দেখছে, স্বপ্নে তার ইঙ্গিত থাকে। এই ইঙ্গিত বুঝে সংজ্ঞান যুক্তি বিচার দ্বারা প্রয়োজন মত সেই দৃষ্টিভঙ্গীকে বদলান ব্যক্তিত্বের পক্ষে লাভজনক। তাছাড়া ব্যক্তিত্ব ভবিষ্যতে কোন পথে যেতে চাইছে, সে ইঙ্গিতও স্বপ্নে অনেক সময় দেখা দেয়। সেই ইঙ্গিত বুঝে ব্যক্তিত্বকে নির্জ্ঞানের অভিলষিত পথে চালনা করতে পারলে তা ব্যক্তিকে সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে পারে। কাজেই খণ্ড, ছিন্ন করে না দেখে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এক সমগ্রদৃষ্টি নিয়ে স্বপ্নকে বিচার করাই শ্রেয়।

ইয়ুং মনে করেন ; স্বপ্নের প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য আছে। 'স্বপ্নমূলতঃ এই'—এমনি কোন নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা স্বপ্নের উপর চাপান যেতে পারে না। কতগুলি স্বপ্নে অবশ্যই অতৃপ্ত বাসনার ভোগতৃপ্তি ঘটে। আবার অনেক স্বপ্নে ভবিষ্যতের বিপদ-আপদের নির্দেশও পাওয়া যায়। এমনও দেখা যায়, একই স্বপ্ন পরিবারের সকলেই অন্যের অজ্ঞাতে দেখে থাকে। আবার অনেক সময় শিশুরা বাবা-মার সাংসারিক সমস্যা যা তাদের কাছ থেকে গোপন করে রাখা হয়েছে, সে সম্বন্ধেও স্বপ্ন দেখে থাকে। কতকগুলি স্বপ্ন আবার ব্যক্তি বিষয়ক (Personal Dream) ও কতকগুলি সমষ্টি বিষয়ক (Collective Dream)

ব্যক্তিবিষয়ক স্বপ্ন, স্বপ্নদ্রষ্টার ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও দৈনন্দিন ঘটনা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়। ব্যক্তিনির্জ্ঞান থেকে এরূপ স্বপ্নের উৎপত্তি। জাতিনির্জ্ঞান থেকে যে স্বপ্নের উৎপত্তি তা' হল সমষ্টি বিষয়ক স্বপ্ন। এরূপ ক্ষেত্রে দ্রষ্টা এক নির্দিষ্ট ব্যক্তি হলেও সমগ্র জাতি বা গোষ্ঠিকে কেন্দ্র করেই স্বপ্নের বিষয় রচিত হয়। যেমন শোনা যায়, প্রাচীনকালে রাজারা সমগ্রজাতির ভালোমন্দ বিষয়ে স্বপ্ন দেখতেন এবং স্বপ্নের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। ইয়ুং মনে করেন, বর্তমানকালে আমাদের কাছে এরূপ ব্যাপার আজগুবি মনে হলেও এরূপ সমষ্টি বিষয়ক স্বপ্ন অসম্ভব কিছু নয়। জাতি নির্জ্ঞান থেকে এরূপ স্বপ্নের উদ্ভব সম্ভব।

মনোবিষয়ক এই সকল সাধারণ তথ্য পরিবেশন ছাড়াও, এই তথ্যগুলি সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে ইয়ুং তাও নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, কলা ইত্যাদি সাংস্কৃতিক উপাদানগুলিতে মনোবিষয়ক সাধারণ তথ্যগুলি কিভাবে ক্রিয়াশীল তা আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় ইয়ুং প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। বিভিন্ন দেশ ঘুরে, আদিবাসীদের মধ্যে গিয়ে তাদের রূপকথা, পুরাবৃত্ত ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের (Rituals) বিবরণ সংগ্রহ করে তার মধ্যে জাতিনির্জ্ঞানের প্রভাব নির্ণয়ের চেষ্টা, তাঁর অদম্য জ্ঞানপিপাসার পরিচায়ক। এই ব্যাপারে তিনি প্রাচ্যের ধর্ম ও দর্শনের প্রতিও বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। চীনদেশের তাও (Taoism) সম্প্রদায়ের একটি যৌগিক প্রক্রিয়া তিনি বিশেষভাবে অনুধাবন করে তার অন্তর্নিহিত মনস্তাত্ত্বিক সত্য নিরূপণের চেষ্টা করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার ফল 'Secret of the Golden Flower' নামক গ্রন্থ। এ গ্রন্থ তিনি প্রখ্যাত চীনাবিদ্ উইলহেল্‌মের সাথে যৌথভাবে প্রণয়ণ করেন। এ ছাড়াও তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বহু ধর্মের অন্তর্গত প্রতীক, চিত্র, মণ্ডলাঙ্কন (Mandala) ও মুদ্রার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কয়েক বৎসর আগে তাঁর Flying Saucer নামক গ্রন্থে তিনি বর্তমান সময়ে বিভিন্ন দেশে 'উড়ন চাকতী' দর্শনের এক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন। তাঁর মতে 'উড়ন চাকতী' এক দৃশ্যমান পুরাবৃত্ত (Visual Myth)। মানুষের মনে আদিমকাল থেকে যে পুরাবৃত্ত রচনার প্রবণতা রয়েছে তারই প্রভাবে বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক পরিবেশে, বৈজ্ঞানিক বিষয় নির্ভর করে রচিত হয়েছে ঐ দৃশ্যমান পুরাবৃত্ত-উড়নচাকতী।

রবীন্দ্র-আলোচনা

মৃণালকান্তি ভদ্র

গ্রন্থ দুখানিই * সংকলন এবং রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত। প্রথমটি তরুণ অধ্যাপক ও চিন্তাশীলদের মৌলিক রচনায় সমৃদ্ধ এবং দ্বিতীয়টি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দেশে-বিদেশে জ্ঞানী ও গুণীরা বিভিন্ন ভাষায় যে সমস্ত সশ্রদ্ধ আলোচনা করেছেন, সেগুলির সযত্ন অনুবাদ। শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সংকলন ও পুস্তকের ভীড়ে বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন এ-রকম দুটি সুরুচিপূর্ণ সংকলন প্রস্তুত করবার জন্য সম্পাদকেরা আমাদের কাছে ধন্যবাদার্হ।

"রবীন্দ্রনাথ: মনন ও শিল্প" গ্রন্থে এমন অনেক রচনা আছে যা দৃষ্টিভংগীর দিক দিয়ে সম্পূর্ণ নূতনত্ব অর্থে অনেক সময় অদ্ভুত কিছু এবং চমক্-লাগান কোন্ কথা। কিন্তু এই সংকলনে প্রবন্ধকারেরা অনেক নূতন কথা বললেও সেগুলির উদ্দেশ্যে শুধু কিছুক্ষণের জন্য চমক লাগান নয়। এই সমস্ত প্রবন্ধে লেখকরা তাদের যুক্তিপরম্পরায় যে বক্তব্য উপস্থিত করেছেন তার একটু অপ্রত্যাশিত হলেও অগ্রহণীয় নয়। প্রসঙ্গতঃ, অশ্রুকুমার সিকদারের 'রবীন্দ্রনাথের সনেট' প্রবন্ধটি উল্লেখ করা যেতে পারে। লেখকের প্রধান বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত সনেট কবিতাগুলি সনেটের লক্ষণ অনুযায়ী সনেটের পদবাচ্য নয়, সেগুলিকে কেবল মাত্র চতুর্দশপদী বলা যেতে পারে, শোনা মাত্র আমাদের এতকালের বিশ্বাসে ধাক্কা লাগে। আমাদের ধারণা ছিল, বাংলা কাব্য-জগতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম সনেটের প্রবর্তন

---

* (১) রবীন্দ্রনাথ: মনন ও শিল্প—সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত:
অচলায়তন প্রকাশনী।

(২) দেশে বিদেশে রবীন্দ্রনাথ—সম্পাদনা : কমলাপতি দে ও
বাসব সরকার।
বসু প্রকাশনী।

করেন, তারপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসামান্য প্রতিভাবলে তাকে আরও উন্নত করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথের সনেট সম্বন্ধে অন্যান্য যে সমস্ত আলোচনা আছে, সে সমস্ত জায়গায় একটা উদ্দামময় ভক্তিই তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাগুলির বিচারের প্রধান বাহন হয়েছে। ফলে এই কবিতাগুলি সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা থেকে গেছে। শ্রীসিকদার সনেটের ইতিহাস, তার বিভিন্ন পর্বে যে দ্বন্দ্ব ও শেষ পর্বে যে সমন্বয় আছে, সনেটের দেহে যে গীতি কবিতাকে এক দৃঢ় পিনদ্ধ কাঠামোয় নিজেকে সংকুচিত করতে হয়—এ সমস্ত কিছু পুংখানুপুংখ আলোচনা করে দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ গীতিপ্রবাহের তরঙ্গে আন্দোলিত হয়েছেন, যে যন্ত্রণা-সংঘাতের মধ্য দিয়ে সনেটের উত্তরণ, তা তাঁর গীতি-প্রাবল্য ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। দু'একটি কবিতায় হয়ত তিনি কিছুটা সাফল্য লাভ করেছেন, কিন্তু সেখানেও হয়ত ব্যাকরণগত বিচ্যুতি আছে। শ্রীসিকদারের এই প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের সনেট সম্বন্ধে আমাদের সত্যই নূতন করে ভাবায়।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে, যা যুক্তির দিক থেকে আমাদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে তাহোল শ্রীশঙ্খ ঘোষের "রবীন্দ্রনাথের নাটকের গান।" নাটকে গানের প্রয়োগ নাট্য-গতির প্রয়োজন না হলে গান হিসাবে তা মর্মস্পর্শী হলেও নাটকের দিক থেকে তার আবেদন ব্যর্থ। শ্রীঘোষের মতে রবীন্দ্রনাথ বহু নাটকে অবান্তর গান প্রয়োগ করেছেন, গান অনেক জায়গায় সংলাপের ব্যাখ্যা হয়েছে, কোথাও বা কেবল মাত্র নাটকের অংগসজ্জার উপকরণ হিসাবে কাজ করেছে। শ্রীঘোষের আলোচনায় মনে হয়, এই রকম বহু অপ্রয়োজনীয় গান বর্জন করলে রবীন্দ্রনাটক আরও সুন্দরভাবে রসের দিক থেকে ঘনীভূত হতে পারত। তার এ বক্তব্যের বিরোধিতা না করেও যে প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে, তাহোল, আমরা কি তাহলে অনেক সুন্দর গান হারাতুম না?

তৃতীয় আর একটি মাত্র প্রবন্ধের উল্লেখ করব, তা হোল, উজ্জ্বল মজুমদারের "রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা।" লেখক গদ্যকবিতা প্রসঙ্গে বলতে চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ গদ্য কবিতায় এমন কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি, যা পদ্য কবিতায় অর্জন করা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। লেখক কিছু উদাহরণ তুলেছেন, যদিও আমার মনে হয়, সেগুলি যথেষ্ট নয়। আমার মনে হয়,

গদ্য-কবিতা রবীন্দ্রনাথের একটা সাময়িক খেয়াল নয়। একটা বিশেষ কোন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে কবি যা বলতে চেয়েছেন, তা হয়ত পদ্য-ছন্দে বলা সম্ভব নয়। কাব্যের ইতিহাসে দেখা গেছে, বিশেষ বিশেষ যুগে কাব্যের আঙ্গিক বদলেছে। বিগত শতাব্দীতে মহাকাব্যের আঙ্গিকে কাব্য লেখা সম্ভব ছিল, কিন্তু আজআর তা সম্ভব নয়। বরীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতার ইতিহাসে জানা যায়, জালিয়ানাওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর শোনার পর তিনি 'লিপিকা'র লেখা নিয়ে মকস করেছেন। তারপর 'পুনশ্চ' 'পরিশেষ' এমন একটা যুগে লেখা, যখন সমস্ত পৃথিবীতে একটা যুদ্ধ-ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসের পর্ব চলেছে; দেশে দেশে মানুষের দুর্গতি চরমে পৌচাচ্ছে আর আমাদের দেশে সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন লাঞ্ছিত হচ্ছে। সমস্ত মিলিয়ে, চারদিকে একটা অমিলের আবহাওয়া। এ ছাড়া, কবির মানস-পরিবেশে সমস্ত ছন্দোহীন জগত এমন একটা বিশেষ যশ পাচ্ছিল, যাকে হয়ত মিলে প্রকাশ করা চলে না। অবশ্য লেখক বলবেন, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনে গদ্য-কবিতা ও পদ্য-কবিতার পালা-বদল চলেছে। তার কি করে ব্যাখ্যা করা যায়? আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের মন অত্যন্ত মিলনে উৎসুখ এবং মিলই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রীতি। তবু পৃথিবীর দ্বন্দ্ব, সংঘাত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা তাঁকে বিচলিত করেছে এবং সেগুলিকে প্রকাশের জন্য গদ্য-কবিতাকেই তিনি উপযুক্ত বাহন মনে করেছেন। আর একটা কথা এ প্রসঙ্গে মনে হচ্ছে, ইংরাজী কবিতাও মিলের পর্ব ঘুচেছে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে। এখন গদ্য-কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সার্থক হয়েছেন কিনা সে বিচার আমার আয়ত্তের বাইরে, তবে আমি মনে করি, গদ্য-কবিতা কবির কাব্য-জীবনের বিশেষ পর্বের ভাব-প্রকাশের জন্য অত্যাবশ্যক ছিল।

অন্যান্য রচনার মধ্যে হীরেন চক্রবর্তীর "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনীতিক" ও "আধুনিক নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রনাথ" পর্যায়ে সুধীর চক্রবর্তীর লেখা উল্লেখ্য। পরিশেষে একটি প্রশ্ন—"রবীন্দ্রনাথ, মনন ও শিল্পে" রবীন্দ্র-প্রতিভার সমস্ত দিকে আলোকপাতের চেষ্টা করেছেন সম্পাদক, কিন্তু দর্শনের জগতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান সম্বন্ধে নীরব কেন? দেবীপদ ভট্টাচার্য রচিত "রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ ও শিশুচিত্ত" এ প্রসঙ্গে অসম্পূর্ণ রচনা।

দ্বিতীয় সংকলন গ্রন্থে সম্পাদকদ্বয় 'পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রবীন্দ্র-প্রতিভার

উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলিকে আহরণ করেছেন।' বহু লেখাতে হয়ত শুধু লেখকের উচ্ছ্বাসময় উক্তি আছে, কিন্তু আবার বহু প্রবন্ধে রয়েছে যেখানে রবীন্দ্রনাথকে বিদেশীর দৃষ্টিতে সম্যক উপলব্ধি করবার প্রচেষ্টা রয়েছে। দেশের যে সমস্ত বিভিন্ন লেখা সংকলিত হয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি রচনা সত্যই তাৎপর্যপূর্ণ। এ থেকে আমরা জানতে পারি, কবির সহযোগী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ই তাঁকে প্রথম বিশ্বকবি বলে অভিনন্দিত করেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রচনার প্রথম যুগে তাঁর সম্বন্ধে কি রকম সমালোচনা তারও পরিচয় পাওয়া যায় দুটি লেখায়। রবীন্দ্রকাব্য আলোচনার ইতিহাসে এ লেখাগুলির মূল্য সন্দেহাতীত।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পান এবং এই সময় তাঁকে ইয়োরোপীয় জনসমাজে পরিচিত করান এজরা পাউণ্ড। সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মের কবি হয়েও তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সংগীত-মাধুর্য উপলব্ধি করেছিলেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের তফাৎ সত্ত্বেও, তাঁর মধ্যে একজন মহাকবির সন্ধান পেয়েছিলেন। এজরা পাউণ্ডের এ প্রসঙ্গে একটি লেখা সংকলনটির গৌরব বাড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে আঁরি বিদোর একটি লেখা আছে, যা কবির ছবির দুর্বোধ্যতাকে আমাদের কাছে সরল করতে চেষ্টা করেছে। সাধারণতঃ কবির ছবি সম্বন্ধে দেখা যায় বিভিন্ন মত এবং নানাবিধ মতের মধ্যে আমরা দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ি। সেদিক দিয়ে এ রচনা সাধারণ বুদ্ধিকে রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে সত্যকার ধারণা দিয়েছে বলে মনে হয়। ডঃ হাইনজ্‌ মোদে 'রাজা' নাটক সম্বন্ধে অনেক নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন এবং 'রাজা' নাটকের তত্ত্বের দিক উপলব্ধি করতে এ রচনা সহায়তা করবে বলেই আমরা বিশ্বাস। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে আছে বহু স্মৃতি কথা যার মধ্যে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো (বিজয়া) ও তান্‌-য়ুন-শানর রচনা আমাদের হৃদয়কে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। এরকম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সমাবেশ আমাদের স্বদেশেও রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রতি আমরা দেখাতে পারি নি। সমস্ত সংকলনে পাকিস্তানের আজিজুল হাকিমের লেখাটি বেসুর বাজে। সম্পাদকদ্বয় এটি বর্জন করলে পারতেন। খুঁজলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধানত লেখা নিশ্চয়ই পাওয়া যেত।

সম্পাদক কমলাপতি দের তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ সত্যই প্রশংসার যোগ্য। দেশ-বিদেশে রবীন্দ্রনাথ প্রচুর সম্মান পেয়েছেন সত্য, কিন্তু অপমান ও গ্লানিও তাঁকে কুড়োতে হয়েছে যথেষ্ট। বিশ্বখ্যাতির উত্তরণের ইতিহাসে সে দুঃখ-বহনের কাহিনী আমাদের অনেকের কাছেই অজানা। এদিকে লেখক আমাদের দৃষ্টিকে সচেতন করেছেন। অনুবাদগুলি সাবলীল ও আন্তরিক। তবে কোথাও উদ্ভট শব্দ-প্রয়োগে একটু ঝোঁক দেখা গেল।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ-পরিচয়

জগন্নাথ গুপ্ত

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চা ঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

বিজ্ঞান জগতে প্রাচীন হিন্দু এবং প্রাচীন গ্রীক জাতির মধ্যে কার মৌলিকত্ব কতখানি তা বলা শক্ত, তবে লেখক কিছু ঐতিহাসিক তথ্য সংকলন করে দেখিয়েছেন যে হিন্দুজাতির অবদান সামান্য নয়, এবং তা সম্বন্ধে আরও তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন আছে। দৃশ্যমান জগতের মূল তত্ত্ব জানার ইচ্ছা এবং যুক্তিমূলক মনোবৃত্তি বহু প্রাচীন কালাবধি ভারতে ছিল। জ্যোতিষে তার উজ্জ্বল পরিচয়। জ্যামিতি ও পাটিগণিতে বৈদিক যুগ হ'তেই তাঁরা নানা সূত্রাদি আবিষ্কার করেন, পরে বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতিও তাঁদের গবেষণায় স্থান পায়। বৌদ্ধ যুগে আয়ুর্বেদ ও শল্যচিকিৎসার অদ্ভুত উন্নতির প্রমাণ পাওয়া যায়। রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যা তখন আয়ুর্বেদশাস্ত্রের অল্পবিস্তর অন্তর্গত ছিল। আলোক-বিজ্ঞান, ধাতুবিদ্যা, মণিকবিদ্যাতেও তাঁরা নূতন নূতন তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। বিশেষজ্ঞ দলের দ্বারা এই সকল আবিষ্কারের যথার্থ মূল্য ও মৌলিকত্ব নির্ণীত হওয়া উচিত।

রাশি-বিজ্ঞানের কথা ঃ শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার বসু

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে গণিত সম্বন্ধে এইখানি দ্বিতীয় বই, প্রথমখানি ডক্টর গণবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণিতের রাজ্য।' রাশি-বিজ্ঞান পুর্ণেন্দুবাবুর রাজ্য বললে ভুল বলা হয় না। রাশি-বিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্ত্ব ও কৌশলগুলি লেখক সযত্নে বুঝিয়েছেন। গণিতের সংকেতাদি থাকলেও কিছু ধারণা হয়। অংশক চয়ন পদ্ধতি, সহগতি ও নির্ভরণ সম্বন্ধে লেখকের প্রকাশভঙ্গী প্রাঞ্জল। দুঃখের বিষয় রাশি-বিজ্ঞানের পরিভাষা দুরূহ (যথা Mode মানে ভূনিষ্টক)। অগত্যা লেখককে বইখানির শেষে শাস্ত্রীয় পরিভাষার একটি পরিশিষ্ট জুড়তে হয়েছে।

রসায়ন ও সভ্যতা ঃ শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

বইখানিতে অধ্যাপক রায় খুবই সংক্ষেপে রসায়নের ঐতিহাসিক অগ্রগতির পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান রসায়ন কিভাবে খাদ্য ও মানব-সভ্যতার অন্যান্য কাঁচামাল উৎপাদন করতে সমর্থ তার নানা উদাহরণ দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় রসায়নের যুগকে লেখক ভাবী যুগের সঙ্গে যুক্ত ক'রে একটা ভাবী সমৃদ্ধির যুগের আভাসচিত্র দিতে চেষ্টা করেছেন। উপসংহারে সেই শাশ্বত সত্যটি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, কোনও পরিমাণ খাদ্য শক্তি ও সম্পদই মানুষের যথেষ্ট হবে না যদি ইষ্ট কি কল্যাণ কি তা সে ভুলে যায়।

অ্যান্টিবায়োটিক ঃ শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

একরকম বলা চলে যে বর্তমান অ্যান্টিবায়োটিকের যুগ ১৯২৯ সালে পেনিসিলিন আবিষ্কারের সাথে আরম্ভ হয়েছে। গত ত্রিশ বছরে যে অপরিমেয় অনুসন্ধান এবং অক্লান্ত পরিশ্রম এই জাতীয় ভেষজের জন্য করা হয়েছে, তার অল্পই আজও সাফল্য গৌরবে মণ্ডিত, তবু যেটুকু সফল হয়েছে তাতেই চিকিৎসাজগতে যুগান্তর এনেছে। বইখানিতে পেনিসিলিন ও ষ্ট্রেপটোমাইসিন ব্যবহার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা, ক্লোরোমাইসিটিন অরিওমাইসিন টেরামাইসিন ব্যবহার সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। পরিশেষে পিম্প্রী পেনিসিলিন ফ্যাক্টরির ইতিহাস এবং সেখানকার পেনিসিলিন প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা ক'রে উদীয়মান লেখক তাঁর সুখপাঠ্য বইখানির আকর্ষণ বাড়িয়েছেন।

চারখানি গ্রন্থই বিশ্বভারতী প্রকাশিত।

(৬৪ পৃষ্ঠার পর)

ম্যানেজার রাইকোর আর এক সাংবাদিক পার্কিন্‌সান এগিয়ে এল তার মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে।

রাইকারের স্ত্রী মারী তার ঘৃণ্য স্বামী ও আফ্রিকা থেকে দূরে যাবার আশায় এবং কয়ারীর হাতে নিজেকে সমর্পণের দমিত বাসনার আঘাতে অস্থির হয়ে এক নির্মম মিথ্যে রটাল। মারী ঘোষণা করল, সে কয়ারীর সন্তানের জননী। রাইকারের রিভলভারের গুলীতে মরল কয়ারী, কিন্তু কয়েকটি প্রশ্ন রেখে গেল। মরবার ঠিক আগের মুহূর্তে তার কাঠ থেকে একটা এসেছিল ডাক্তার কলিনের কাছে যা হাসির শব্দের মত। কথা ফুরিয়ে যাবার আগে কয়ারী বলেছিল, 'এ বড় অদ্ভুত, আর তা না হলে···।' তার এই অসমাপ্ত উক্তি ক্যাথালিকরা সানন্দে এই ভাবে পূর্ণাঙ্গ করেছেন— 'এ বড় অদ্ভুত, আর তা না হলে ঈশ্বর আছেন।' কয়ারীর এই শেষ অসমাপ্ত উক্তিটিকে এইভাবে সম্পূর্ণতা দেওয়া অযৌক্তিক এমন কথাও যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা সহজ নয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বে কয়ারীর অবিশ্বাসের দুঃসহ ভার কি ঈশ্বরের অস্তিত্বই প্রমাণ করে না? তা না হলে তার অবিশ্বাসের ভার এমন দুঃসহ কেন? এই ধরণের প্রশ্ন গ্রীণ সচেতন প্রচেষ্টায় পাঠকের মনে সঞ্চারিত করেছেন।

প্যাস্কাল, ফ্রয়েড ও বোদ্‌লেয়ারের ভাবনা 'এ বার্ণ্‌ট্‌ আউট কেস' বইটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইতস্ততঃ বিতত। মানুষের নিজের দুঃসহ দুর্দশার বেদনার্দ্র অনুভবের তীব্রতা তার মহত্বের মাপকাঠি। মৌল পাপ কূটকৌশলী প্রযত্নে প্রচ্ছন্ন রাখাই সভ্যতার একমাত্র ভূমিকা।

বইটির প্রথমাংশ অসাধারণ, কিন্তু দ্বিতীয়াংশ নেহাত সাধারণ। দ্বিতীয়াংশে স্বামী-স্ত্রী প্রেমিকের ত্রিকোণ দ্বন্দ্ব ও তার পরিণতি মামুলী উপন্যাসের নকসায় নিখুঁতভাবে সম্পৃক্ত এবং চমক দেবার প্রবণতা থেকে উৎসারিত। বস্তুত গ্রেহাম গ্রীণের গভীর উপন্যাস ও সুখপাঠ্য রহস্যোপন্যাস বিভিন্ন বিন্দুতে পরস্পরকে স্পর্শ করে। শুধু রহস্যোপন্যাসে মন্তব্য স্বল্প, চরিত্রের বিকাশ কম, ঘটনা বেশি এবং ঝোঁক সুখাবহ পরিণতির দিকে। কিন্তু লেখকের মানসচর্চার ব্যাপ্তি দুই জাতের উপন্যাসেই পূর্ণ নির্দিষ্ট, কৈশোরেই চিরদিনের ফল অনেক সময় তাঁর উপন্যাস মহৎ শিল্পকীর্তি মনে হয় না, মনে হয় সুদক্ষ শিল্পকর্ম। জন্ম নির্ণীত; দুই জাতের উপন্যাসে জীবনদৃষ্টি

মূলগত ভাবে অভিন্ন! ফলে অনেক সময় তাঁর উপন্যাস মহৎ শিল্প-কীর্তি মনে হয় না, মনে হয় সুদক্ষ শিল্পকর্ম। দুই জাতের কাহিনী-বয়নে অংশ বিশেষ অসম্ভাব্যতা ও কষ্টকল্পনার প্রশ্রয় রয়েছে। যেমন এ 'বার্নট আউট কেস' এ কয়ারীর স্থপতি হিসেবে প্রায় বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা, যা অসম্ভাবনীয়।

বলা বাহুল্য, গত তিন দশকে য়ুরোপে, এ দেশেও, উপন্যাসের আঙ্গিক নিয়ে নানা পরীক্ষা হয়েছে। বিভিন্ন উপন্যাসকারের জানা নতুন রীতির, উপস্থাপনার পটুত্বের অজস্র উপহার পাঠকরা পেয়েছেন। গ্রেহাম গ্রীনের কোন নতুন রীতির সচেতন প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় না; তিনি সামগ্রিকভাবে প্রচলিত রীতির অনুসারী। তবে তাঁর মিতভাষিতা বিস্ময়কর, তাঁর উপমা-প্রয়োগ গভীরভাবে নাড়া দেয়। আর অসহ্য দুঃখের কথা কান্নার সুরে না বলা যদি আধুনিক হয়, গ্রেহাম গ্রীন আধুনিক।

তাঁর গভীর উপন্যাসগুলিতে যে জীবনদৃষ্টি প্রতিভাত, একটি বৃত্তের সঙ্গে তার নিখুঁত তুলনা চলে। অবশ্য মনে রাখতে হবে, যে লেখক তাঁর জীবনদৃষ্টির প্রতিভাসে একটি নিখুঁত বৃত্ত রচনায় মগ্ন তিনি যে বিন্দুতে শুরু করেছেন সেখানেই আবার ফিরে আসছেন বার্কহ্যাম্পস্টেড থেকে মোক্ষয়ারে এই সাতান্ন বছর বয়সেও গ্রীনের মানসচর্চা সেই মৌল পাপ, ক্লান্তি ও শূন্যতাবোধ, মানুষ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধের বৃত্তে সম্পৃক্ত। সেই বৃত্তের চড়া রঙের ডৌল বলিষ্ঠ পায়ে পার হয়ে, অন্য কোন নতুন দিগন্তে পৌঁছনর যন্ত্রটায় তাঁর ভাবনা কাঁপছে না।

'নৈবেদ্য'

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

[ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি 'নৈবেদ্য'র একটি সমালোচনা ইংরাজীতে লিখেছিলেন The Twentieth Century পত্রিকায়—নরহরি দাস ছদ্মনামে। এখানে তার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হোলো। প্রবন্ধটি সংগ্রহ ও অনুবাদ করেছেন শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়। তাঁর মন্তব্য পাদটীকায় দেওয়া হোলো। ব্রহ্মবান্ধব—জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রবন্ধটি প্রকাশ করা হোলো। —সম্পাদক]

নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে হিন্দু-মানসের এক নতুন শক্তির স্বরূপ ধরা পড়েছে। ভক্তিমূলক এই একশত গীতি-কবিতার কোথাও ভারতবর্ষে প্রচলিত কোন ধর্মমতের কোন প্রভাব পড়ে নি। তবুও এ-কথা স্বীকার করতে হবে, এদের ভিতর ধ্বনিত হয়েছে সুপ্রাচীন ও সার্বজনীন অদ্বৈতবাদের সুর—যে সুর বিশেষ ভাবে হিন্দুজীবনাদর্শের সুর। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা এবং শ্লথ উদাসীনতার যুগে এই সুর বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

নৈবেদ্য ধর্মবিশ্বাসের কাব্য, কিন্তু ধর্মতত্ত্ব নয়। ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তি-তর্কের দ্বারা কণ্টকিত হলে শিল্প হারিয়ে ফেলে তার সমস্ত গৌরব। সমুন্নতির দিক হতে Paradise Lost সম্ভবতঃ তুলনাবিহীন, কিন্তু নৈষ্ঠিক ধর্মমত প্রতিপাদনের দিক হতে এ প্রয়াস একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গেছে। দান্তের Divine Commedia-কে এ-সব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় নি। এ কাব্যের প্রাণ বিয়েট্রিস্। স্বর্গ-নরক, প্রেতলোক, পাপ, পুণ্য, বিচার প্রভৃতি বিষয়ে খৃষ্টধর্মের মতবাদ এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, কিন্তু এর ভিতর নেই কোন ভগ্ন প্রচার-প্রবণতা। পুষ্পিতা বিয়েট্রিসের যৌবনলাবণ্য ও সৌন্দর্য সব কিছুর উপর এক সম্মোহন জাল বিস্তার করেছে, এবং তার অপরূপ চরিত্র-মাধুর্য সমস্ত খণ্ডতাকে দিয়েছে ঐক্য। কালিদাসের কুমারসম্ভবে দেবদেবী আছে, কিন্তু তার দ্বারা কাব্য-সৌন্দর্য কিছুমাত্র খণ্ডিত হয় নি। স্বর্গের

দেবদেবীকে তিনি মর্ত্যের মানবমানবী রূপেই অঙ্কিত করেছেন। নৈবেদ্যকে প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী বলা যেতে পারে। কিন্তু এই কবিতাগুলির সুর স্বতঃই মানব-হৃদয়ে ঝংকৃত হয়ে উঠে। আনন্দ ও বেদনা, সংগ্রাম ও সফলতা, বিশ্বব্যাপী প্রেম, জাতীয় আশা ও আকাঙ্ক্ষা, অপরিচিতের সহিত পরিচয়ের যে কামনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানব-হৃদয় হ'তে উৎসারিত হয় তাকেই কবি এ-গ্রন্থে দেবতার পায় অঞ্জলি দিয়েছেন।

যদিও ধর্মতত্ত্ব নয়, তবু ধর্মপিপাসু মানুষের কাছে এ কাব্যগ্রন্থ আনন্দের নির্ঝর। সমগ্র গ্রন্থে ধর্মতত্ত্বের কোন অসংগতি নেই; এর অদ্বৈতবাদ আগাগোড়া সুসম্বদ্ধ। খৃষ্টান, মুসলমান অথবা হিন্দুর দেবালয়ে এই গীতি-শতক বিনাদ্বিধায় আবৃত্তি অথবা গান করা যেতে পারে। এই গানগুলি মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি এবং সে জন্য তাদের আবেদন সার্বজনীন।

এই কাব্যগ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনার সময় এখনও আসে নি। সীমার মধ্য দিয়েই অসীমের সংগে মিলন সাধনের মহান আদর্শ এ-গ্রন্থের মূল সুর। কয়েকটি কবিতার বিশ্লেষণমূলক আলোচনা সেই আদর্শ অনুধাবন করতে হয়ত সাহায্য করবে।

অনেকের ধারণা নৈবেদ্যে কবি প্রচলিত পথ ত্যাগ করে এক সম্পূর্ণ নতুন পথ ধরে অগ্রসর হয়েছেন। এ-কথা সত্য যে, তাঁর পূর্ববর্তী রচনায় কোন সুস্পষ্ট ধর্মতত্ত্ব নেই। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যায়, কবি আগাগোড়াই সংগ্রাম করে চলেছেন আত্ম-বন্ধন ও আত্মীয়-পরিজনের বন্ধন ভেংগে ফেলে সকলের সংগে মিলিত হবার জন্য। এমন কি অতৃপ্ত ভালবাসার গভীর মর্মবেদনার মধ্যেও আমরা দেখতে পাই তিনি বিশ্বব্যাপী কল্যাণকে ব্যাকুল হয়ে কামনা করেছেন। পড়ুন—

শোন বঁধু শোন, আমি করুণারে ভালবাসি
সে যদি না থাকে তবে ধূলিময় রূপরাশি।
তোমারে যে পূজা করি, তোমারে যে দিই ফুল
ভালবাসি বলে যেন কখনো করোনা ভুল।
যে-জন দেবতা মোর কোথা সে আছে না জানি
তুমি ত কেবল তার পাষাণ-প্রতিমা খানি।

এবং বিচার করে দেখুন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতীকের মধ্য দিয়েই তিনি ইন্দ্রিয়াতীত সত্যকে চেয়েছেন কিনা।

আবার 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় আমরা নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি কয়টি দেখতে পাই—

জগৎ দেখিতে হইব বাহির
আজিকে করেছি মনে,
দেখিব না আর নিজেরি স্বপন
বসিয়া গুহার কোণে!
আমি—ঢালিব করুণা ধারা
আমি—ভাঙিব পাষাণ-কারা
আমি—জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা!

এই ছত্র কয়টির মধ্যে দেখতে পাই প্রকৃতি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়—প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকবার ব্যাকুলতা। 'পূর্ণিমা' নামক মরমী কবিতায় দেখি কম্পিত আবেগের লাভাপ্রবাহ—

অনন্ত রজনী শুধু
ডুবে যাই, নিভে যাই
মরে যাই অসীম মধুরে,
বিন্দু হতে বিন্দু হয়ে
মিলায়ে মিশায়ে যাই
অন্তরের সুদূর-সুদূরে।

এর মধ্যে ধরা পড়েছে অসীম-অনন্তের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবার গভীর আকুলতা।

আমি পূর্ববর্তী রচনা হতেই কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছি। কবির অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বদেবতার ধারণা ক্রমশঃ হয়েছে গভীর এবং নৈবেদ্য এসে তা হয়েছে পূর্ণ বিকশিত—

প্রভাতে যখন শঙ্খ উঠেছিল বাজি'
তোমার প্রাঙ্গণ তলে,—ভরি লয়ে সাজি

চলেছিল নরনারী তেয়াগিয়া ঘর
নবীন শিশিরসিক্ত গুঞ্জন মুখর
স্নিগ্ধ বনপথ দিয়ে। আমি অন্য মনে
যখন পল্লবপুঞ্জ ছায়াপুঞ্জ বনে
ছিনু শুয়ে তৃণাস্তীর্ণ তরঙ্গিণী তীরে
বিহঙ্গের কলগীতে সুমন্দ-সমীরে
আমি যাই নাই দেব তোমার পূজায়,
চেয়ে দেখি নাই পথে কারা চলে যায় !
আজ ভাবি ভাল হয়েছিল মোর ভুল,
তখন কুসুমগুলি আছিল মুকুল,—
হের তারা সারাদিনে ফুটিতেছে আজি
অপরাহ্নে ভরিলাম এ পূজার সাজি।

এই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে কবি কী করে ধীরে ধীরে নিজের অজ্ঞাতসারে নিসর্গ-প্রেমের মধ্য দিয়ে নিসর্গ-দেবতার পূজায় এসে পৌঁছেছেন।

নৈবেদ্যে আমরা অনন্তের আভাস ধর্মতত্ত্বের মধ্য দিয়ে পাই না, আমরা তার আভাস পাই গভীর আবেগ, পরম ব্যাকুলতা এবং অনির্দেশ্য যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে। পরস্পর-বিরোধী আদর্শ-সংঘাতের যুগে ধর্মতত্ত্বের মধ্য দিয়ে ইন্দ্রিয়াতীতকে উপলব্ধি করা খুবই কঠিন। বাস্তব-জীবনের রঙ্গমঞ্চ হতে, সংশয় ভ্রান্তি ও অসত্যের অন্ধকারে সত্য ও শিবের ব্যর্থ-সন্ধানের বেদনা থেকে নিরালম্ব তত্ত্বের দিকে মানুষের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করা সহজ নয়। কিন্তু যখন কোন মহান ঋষি দ্রুত পলায়মান অনিত্য জগতের নিষ্ঠুর বন্ধন পীড়নের মধ্যে পরম ঐক্যের সন্ধান পান এবং তাঁর অভিজ্ঞতার আলো নিয়ে তিনি সহযাত্রীদের কাছে উপস্থিত হন, তখন বেদনাপীড়িত হৃদয় তাতে সহজে সাড়া দেয়। নৈবেদ্যের কবি এমন একজন মানুষ যিনি অ-দেখাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি লিখেছেন—

না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি।
অর্থের শেষ পাই না, তবুও
বুঝেছি তোমার বাণী।

নিশ্বাসে মোর নিমেষের পাতে।
চেতনা বেদনা ভাবনা থামাতে,
কে দেয় সর্বশরীরে ও মনে
তব সংবাদ আনি।
না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি।
তব রাজত্ব লোক হ'তে লোকে
যে বারতা আমি পেয়েছি পলকে,
হৃদি মাঝে যবে হেরেছি তোমার
বিশ্বের রাজধানী।
না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি।

অনন্তের সহিত প্রত্যক্ষ এবং ব্যক্তিগত সম্বন্ধই নৈবেদ্যের প্রধান সুর। কেউ কেউ বলেন যেহেতু অসীম ও অনন্তের ধারণা সহজসাধ্য নয়, সেই জন্য যারা অধ্যাত্ম সাধনায় বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পারেন নি, তাদের পক্ষে সসীম দেবতার উপাসনাই প্রশস্ত। অনন্ত কি সত্যই ধারণার অতীত? যদি তাই হয় তো বলতে হবে যুক্তি অর্থহীন। অনন্তের অনুভূতিই হলো যুক্তির প্রভাত। যুক্তির আরম্ভ এবং পরিণাম হলো বিশ্বব্যাপী নিঃসীম সত্তার অনুভূতি। যুক্তিনিষ্ঠার ফলেই অনন্তের ধারণা হয় সম্ভব। ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের সঙ্গে মানুষের অন্তরতম পরিচয় ঘটে না যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যকে জানবার জন্য তার বুদ্ধি আলোকিত না হয় অথবা মঙ্গলকর কর্তব্য সম্পাদনের জন্যও তার হৃদয় দীপ্ত হয়ে না ওঠে। আমার এবং আমার স্রষ্টার মধ্যে কোন বাধাই থাকতে পারে না। কবি ভগবানের মুখোমুখী হ'য়ে দাঁড়াবার গৌরবময় অধিকার লাভ করেছেন। এই অধিকারকে তিনি সব চেয়ে দুর্লভ বলে মনে করেন। নৈবেদ্যের প্রথম কবিতায় কবি নিজেকেই ভগবানের চরণে নিবেদন করেছেন—

প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে,
করি জোড়কর হে ভুবনেশ্বর
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে,

তোমার অপার আকাশের তলে
বিজনে বিরলে হে—
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

মৌলিক ভাবের দিক হতে নৈবেদ্যের কবিতাগুলিকে চার শ্রেণীতে ফেলা চলে: (১) এক থেকে একের দিকে অভিগমন, (২) মানুষের ভিতর ভগবানের উপলব্ধি, (৩) ভগবান সকল জাতির ভাগ্যবিধাতা এবং (৪) ভগবানই সর্বকর্মের নিয়ন্ত্রী।

যারা অধ্যাত্ম-পথের পথিক তাদের জীবনে যখন চরম মুহূর্ত উপস্থিত হয়, তখন সর্ব-গ্লানি রহিত সেই এক, যিনি সোদরহীন, তিনি মানবাত্মাকে নির্জনে আহ্বান জানালে মানবাত্মা যে ভাবে সাড়া দেয়—তাকে আন্তরিক বেদনার সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে নীচের ছত্র কয়টিতে। এই বেদনার আন্তরিকতা হতাশ মানুষকেও উদ্দীপ্ত না করে পারে না—

মহারাজ, ক্ষণেক দর্শন দিতে হবে
তোমার নির্জনধামে। সেথা ডেকে ল'বে
সমস্ত আলোক হ'তে তোমার আলোতে
আমারে একাকী,—সর্ব সুখ দুঃখ হ'তে,
সর্ব সঙ্গ হ'তে, সমস্ত এ বসুধার
কর্মবন্ধ হ'তে। দেব-মন্দিরে তোমার
পশিয়াছি পৃথিবীর সর্বযাত্রীসনে,
দ্বার মুক্ত ছিল যবে আরতির ক্ষণে।
দীপাবলী নিবাইয়া চ'লে যাবে যবে
নানা পথে নানা ঘরে পূজকেরা সবে,
দ্বার রুদ্ধ হ'য়ে যাবে,—শান্ত অন্ধকার
আমারে মিলায়ে দিবে চরণে তোমার।
একখানি জীবনের প্রদীপ তুলিয়া
তোমারে হেরিব একা ভুবন ভুলিয়া।

নির্জনে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ কাম্য হ'লেও কবি এই পৃথিবীকে ভগবানের প্রেম ও তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য উপলব্ধির প্রতিবন্ধক বলে মনে করেন না। তিনি সকলকেই তার সঙ্গে বাস করবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং প্রার্থনা

করেছেন, তাঁদের সহিত তাঁর সম্বন্ধ যেন তাঁকে উন্নততর প্রেম ও পূজার পথে নিয়ে যায়—

যারা কাছে আছে তা'রা কাছে থাক্,
তা'রা তো পাবে না জানিতে
তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ
আমার হৃদয় খানিতে।

যারা কথা বলে তাহারা বলুক্,
আমি কাহাকেও করি না বিমুখ,
তারা নাহি জানে ভরা আছে প্রাণ
তব অকথিত বাণীতে।

নীরবে নিয়ত রয়েছ আমার
নীরব হৃদয়খানিতে।

কবি আরও এগিয়ে গেছেন এবং আরও গভীরে প্রবেশ করেছেন। তিনি স্বর্গরাজ্যের আনন্দও কামনা করেন না, যদি সেই আনন্দ লাভ করবার জন্য তাঁকে সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য অস্বীকার করতে হয়, যদি মানুষের দুঃখ ও বেদনার প্রতি তাঁকে হতে হয় উদাসীন। নিরীহ মানুষ যখন দুঃখ পায়, সেই দুঃখের বেদনা ভগবানেরই বুকে এসে আঘাত করে। ভগবান তাঁর প্রেম ও করুণার মধ্য দিয়ে দুঃখ ভোগ করেন। অপরের অপরাধের জন্য যারা দুঃখ ভোগ করে, তাদের দুঃখের শরিক হলে, তাদের প্রতি প্রেম ও করুণা প্রদর্শন করলে, বিধবা ও অনাথের দুর্বল ও অত্যাচারিতের বেদনা-ভার লাঘব করা হয়—অধঃপতিত মানবাত্মার প্রতি করুণা প্রদর্শনের জন্য ভগবানের কাছে আবেদন জানানো হয়। সুতরাং কবি বলেছেন—

আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ
দুঃখেরি সাথে দুঃখেরি ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুকতি।

দুঃখ হবে মোর মাথার মাণিক
সাথে যদি দাও ভকতি
যত দিতে চাও কাজ দিয়ো, যদি
তোমারে না দাও ভুলিতে,—
অন্তর যদি জড়াতে না দাও
জাল-জঞ্জালগুলিতে।
বাঁধিয়ো আমায় যত খুসি ডোরে
মুক্ত রাখিয়ো তোমা পানে মোরে,
ধুলায় রাখিয়ো, পবিত্র করে'
তোমার চরণধূলিতে।
ভুলায়ে রাখিয়ো সংসার তলে,
তোমারে দিও না ভুলিতে।

আমরা যখন দুঃখ এড়াতে চাই এবং সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করি, তখন সন্ন্যাস গ্রহণের নামে সংসার পরিত্যাগ করা হবে একটা মারাত্মক রকমের ভুল। কবি যথার্থই অশান্তি, বেদনা ও আঘাতের মধ্য দিয়ে মুক্তি চেয়েছেন। যদিও সমস্ত পার্থিব বৈচিত্র্যের মূলে রয়েছে সেই পরম ঐক্য, তবুও আজ পরমপিতার সন্তানগণ অনৈক্য, দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের শিকারে পরিণত হয়েছে। আত্মত্যাগ, দুঃখ-বরণ ও প্রেমের বাণী নিয়ে লুব্ধ ও স্বার্থপর মানুষের সহিত মোকাবিলা করতে না পারলে ঐক্য স্থাপন আজ আর সম্ভব হবে না। আমি আশা করি কবি যথাসময়ে তাঁর নিজস্ব ঐন্দ্রজালিক সুরে আরও গান রচনা করবেন, অবসাদ হতে দেশবাসীকে মুক্ত করবেন, অপরের বেদনাভার বহন করতে তাদের করেন অনুপ্রাণিত।

ভগবান সকল জাতিরই ভাগ্যবিধাতা। এই বিষয়ের উপর লেখা কয়েকটি কবিতায় কবি বিস্ময়কর সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। এই বিষয়টি আমাদের সতর্ক মনোযোগ দাবী করে। ভবিষ্যৎ ভারতের গৌরব পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বনিয়াদের উপর গড়ে উঠবে, কবি তা কল্পনা করেন নি। কবির চোখে আধুনিক সভ্যতার চাকচিক্য নৈশালোক মাত্র—প্রভাতের অরুণ-কিরণপাত নয়। নীচের ছত্র কয়টিতে কবির দৃষ্টিভঙ্গী অপরূপ ভাবে ফুটে উঠেছে—

আজি নিশার আকাশ
যে আদর্শে রচিয়াছে আলোকের মালা,

সাজায়েছে আপনার অন্ধকার-থালা
ধরিয়াছে ধরিত্রীর মাথার উপর
সে আদর্শ প্রভাতের নহে, মহেশ্বর।
জাগিয়া উঠিবে প্রাচী যে অরুণালোকে
সে কিরণ নাই আজি নিশীথের চোখে।

আবিলতাযুক্ত প্রাচীন হিন্দু-ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে ভারতের জাতীয়-জীবনকে মহীয়ান করে গড়ে তোলা হলো কবির আদর্শ, বাহ্য-গড়নে যদি এখানে-ওখানে সামান্য কিছু পাশ্চাত্ত্য প্রভাব থাকে তো তাতে কবির আপত্তি নেই।

সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে পরিপূর্ণরূপে ভগবানের উপলব্ধি করাই হলো নৈবেদ্যের চরম আদর্শ—

তব প্রেমে ধন্য তুমি করেছ আমারে
প্রিয়তম। তবু শুধু মাধুর্য মাঝারে
চাহি না নিমগ্ন করে রাখিতে হৃদয়।
আপনি যেথায় ধরা দিলে, স্নেহময়
বিচিত্র সৌন্দর্য-ডোরে, কত স্নেহে প্রেমে
কতরূপে—সেথা আমি রহিব না থেমে
তোমার প্রণয়-অভিমানে। চিত্তে মোর
জড়ায়ে বাঁধিব নাকো সন্তোষের ডোর!
আমার অতীত তুমি যেথা, সেইখানে
অন্তরাত্মা ধায় নিত্য অনন্তের টানে
সকল বন্ধন মাঝে,—যেথায় উদার
অন্তহীন শান্তি আর মুক্তির বিস্তার।
তোমার মাধুর্য যেন বেঁধে নাহি রাখে,
তব ঐশ্বর্যের পানে টানে সে আমাকে।

এই কবিতায় নিরালম্ব ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রাচীন বৈদান্তিক আকুলতা কার না চোখে পড়বে? মানুষ বিচিত্র সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে ভূমাকে উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু তাঁর করুণাধারা জীব-জগতের সহিত তাঁর সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে পাওয়া যায় না—তাঁকে পাওয়া যায় অন্তহীন গভীরতার বিস্তারের ভিতর যেখানে সব বৈচিত্র্য এসে ধরা দেয় নিবিড়

ঐক্যবোধের মধ্যে। ভারতবর্ষ এই আদর্শ হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, তাই সে আজ অধঃপতিত। রবীন্দ্রনাথের আবার উপনিষদের পুরানো গান গেয়েছেন নতুন সুরে; আমাদের দেশবাসীর কণ্ঠে এ গান যেন বিধাতার আশীর্বাদ লাভ করবার জন্য মন্দ্রিত হয়। আসুন, আমরা কবির সুরে সুর মিলিয়ে বলি—

যেথা দূর তুমি
সেথা আত্মা হারাইয়া সর্ব তট-ভূমি
তোমার নিঃসীমা মাঝে পূর্ণানন্দ ভরে
আপনারে নিঃশেষিয়া সমর্পণ করে।
কাছে তুমি কর্মতট আত্মা তটিনীর,
দূরে তুমি শান্তিসিন্ধু অনন্ত গভীর।

স্বর্গে মৃত্যুহীন সমাজ গড়ে উঠেছে, এই সমাজে মানুষের সহিত মানুষের পরিপূর্ণ মিলন সাধিত হবে। এই সমাজের কোন পূর্বাভাস আমরা নৈবেদ্যে পাই না, কিন্তু মৃত্যু যে অ-জানাকে জানবার পথে একটা পদক্ষেপ মাত্র সে কথা এ গ্রন্থে জোরের সঙ্গেই ঘোষণা করা হয়েছে—

মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর! আজি তার তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে!
সংসারে বিদায় দিতে আঁখি ছল ছলি '
জীবন আকড়ি' ধরি আপনার বলি '
দুই ভুজে! ওরে মূঢ়, জীবন সংসার
কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার
জনম-মুহূর্ত হতে তোমার অজ্ঞাতে,
তোমার ইচ্ছার পূর্বে? মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্তে চেনার মত! জীবন আমার
এত ভালবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়
মৃত্যুরে এমনি ভালবাসিব নিশ্চয়,
স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে!

মাত্র একশত গীতি-কবিতার ভিতর অনন্তের সহিত মানবাত্মার মিলনের মহান

আদর্শ সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হবে এ আশা আমরা করতে পারি না। কবির স্বচ্ছ মানস-দর্পণে আমরা অনন্তের আভাস পেয়েছি, এর ফলে অনন্ত জীবন সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল হয়েছে উদ্দীপ্ত!

কবি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে উদ্ভাসিত, তবু তিনি একটা শূন্যতা ও শুষ্কতার বেদনায় অধীর হয়ে পরম করুণাময়ের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছেন—

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি, অতি দীর্ঘকাল
হে ইন্দ্র, হৃদয়ে মম! দিক্-চক্রবাল
ভয়ঙ্কর শূন্য হেরি, নাহি কোনখানে
সরল সজল রেখা,—কেহ নাহি আনে
নব বারি বর্ষণের শ্যামল সংবাদ!
যদি ইচ্ছা হয়, দেব, আন বজ্রনাদ
প্রলয়-মুখর হিংস্র ঝটিকার সাথে!
পলে পলে বিদ্যুতের বক্র করাঘাতে
সচকিত কর মোর দিগ্ দিগন্তর!
সংহর সংহর, প্রভো, নিস্তব্ধ প্রখর
এই রুদ্র, এই ব্যাপ্ত, এ নিঃশব্দ দাহ,
নিঃসহ নৈরাশ্য তাপ! চাহ নাথ চাহ
জননী যেমন চাহে সজল নয়নে,
পিতার ক্রোধের দিনে, সন্তানের পানে!

আমার এ মানসের কানন কাঙাল
শীর্ণ শুষ্ক বাহু মেলি বহু দীর্ঘকাল
আছে ক্রুদ্ধ ঊর্ধ্বপানে চাহি! ওহে নাথ,
এ রুদ্র মধ্যাহ্ন মাঝে কবে অকস্মাৎ
পথিক পবন কোন্ দূর হতে এসে
ব্যগ্র শাখা-প্রশাখার চক্ষের নিমেষে
কানে কানে রটাইবে আনন্দ মর্মর,
প্রতীক্ষায় পুলকিয়া বন-বনান্তর!
গম্ভীর মাভৈঃ মন্ত্র কোথা হতে বহে

তোমার প্রসাদপুঞ্জ ঘন সমারোহে
ফেলিবে আচ্ছন্ন করি নিবিড়চ্ছায়ায়।
তার পরে বিপুল বর্ষণ! তারপরে
পরদিন প্রভাতের সৌম্য রবিকরে
রিক্ত মালঞ্চের মাঝে পূজা পুষ্পরাশি
নাহি জানি কোথা হতে উঠিবে বিকাশি।

এই প্রার্থনা কী করুণ, কী গভীর ও মর্মস্পর্শী। ইহা পাষাণহৃদয়কে বিগলিত করে দেয়, সপ্রমাণ করে মানুষ কত অকিঞ্চিৎকর। নৈবেদ্য ভক্তির সহিত পরাজ্ঞানের পরিপূর্ণ মিলন ঘটেছে। এই পরাজ্ঞানের আলোকপাতেই মানব-জীবনের গূঢ় সম্বন্ধটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি ভাগবত আলোকে উজ্জ্বল মুক্তার মতো দীপ্যমান—

আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো।
সব দুঃখ শোক সার্থক হোক্
লভিয়া তোমারি আলো।

কোণে কোণে যত লুকান আঁধার
মরুক ধন্য হয়ে,
তোমারি পুণ্য আলোকে বসিয়া
প্রিয়জনে বাসি ভালো।
আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো।

পরশমণির প্রদীপ তোমার
অচপল তার জ্যোতি,
সোনা করে নিক্ পলকে আমার
সব কলঙ্ক কালো।
আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো।

আমি যত দীপ জ্বালি, শুধু তার
জ্বালা আর শুধু কালী,
আমার ঘরের দুয়ারে শিয়রে
তোমারি কিরণ ঢালো।
আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো।

কবির প্রার্থনা সফল হোক, তিনি যেন ভগবানের মুখনিঃসৃত জ্যোতিঃপুঞ্জ আরও বেশী করে লাভ করেন।

[১৯০১, ৪ জুলাই নৈবেদ্য প্রকাশিত হয়। জুলাই মাসেরই **The Twentieth Century** পত্রিকায় নরহরিদাস এই ছদ্মনামে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থের এক দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। রবীন্দ্রনাথ "আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা" শীর্ষক রচনায় (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪০) এই সমালোচনা সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমার নৈবেদ্যের কবিতা-গুলি প্রকাশ হচ্ছিল তার কিছুকাল পূর্বে। এই কবিতাগুলি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁর সম্পাদিত **Twentieth Century** পত্রিকায় এই রচনাগুলির যে প্রশংসা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন, সেকালে সে রকম উদার প্রশংসা আমি আর কোথাও পাই নি। বস্তুত এর অনেককাল পরে এই সকল কবিতার কিছু অংশ এবং খেয়া ও গীতাঞ্জলি থেকে এই জাতীয় কবিতার অনুবাদের যোগে যে সম্মান পেয়েছিলেম, তিনি আমাকে সেই রকম অকুণ্ঠিত সম্মান দিয়েছিলেন সেই সময়েই।" ১৩৪১ সনে প্রকাশিত 'চার-অধ্যায়' উপন্যাসের ভূমিকায় কবি লিখেছেন, "একদা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় যখন **Twentieth Century** মাসিকপত্রের সম্পাদনে নিযুক্ত, তখন সেই পত্রে তিনি আমার নূতন প্রকাশিত নৈবেদ্য গ্রন্থের এক সমালোচনা লেখেন। তৎপূর্বে আমার কোন কাব্যের এমন অকুণ্ঠিত প্রশংসাবাদ কোথাও দেখি নি।"

উপাধ্যায়ের সমালোচনাটি বিশেষ মূল্যবান। **Twentieth Century** দুষ্প্রাপ্য। এখানে সমালোচনার বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো।

—কালিদাস মুখোপাধ্যায়]

আহারের পর দিনে দু'বার..

সব ঋতুতে স্বাস্থ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী,, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

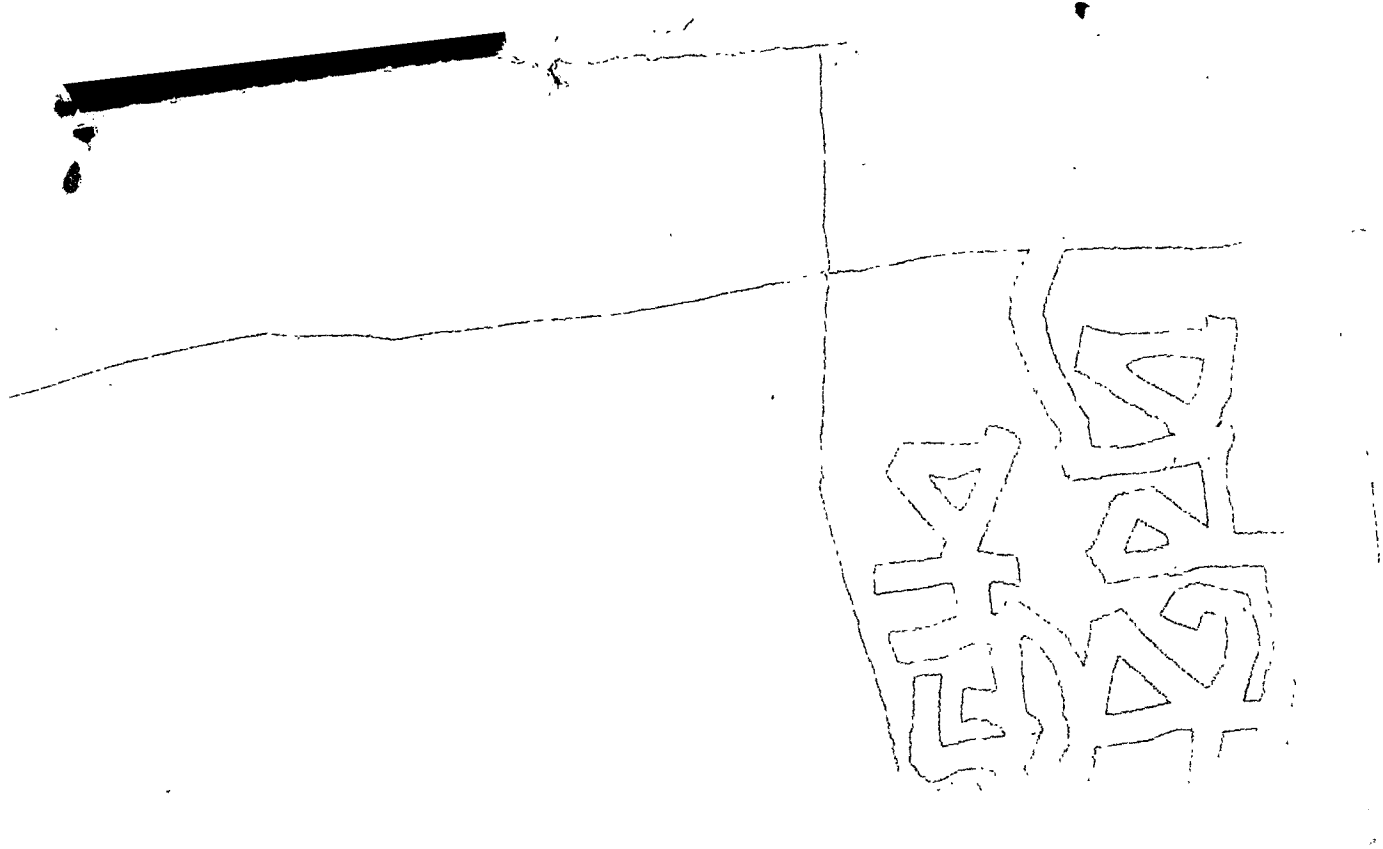

প্রবন্ধ পত্রিকা

শারদীয় ১৩৬৮,
(১৮৮৩ শকাব্দ)

সূচীপত্র

রাজশেখর বসু	১—৩	অপ্রকাশিত পত্র
যদুনাথ সরকার	৩—১২	বাবু রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প
শশিভূষণ দাশগুপ্ত	১৩—২০	আধুনিক জগৎ ও হিন্দুধর্ম
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২১—২৪	ভারতে জৈনধর্ম
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	২৫—২৮	সঙ্গীতের ভাষা
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	২৯—৩৫	আর্নেস্ট হেমিংওয়ে
ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৩৬—৫২	পশ্চিমবঙ্গে জাতিভেদ প্রথা
রথীন্দ্রনাথ রায়	৫৩—৬৬	রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি'
আবুল ফজল	৬৭—৭৯	জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ
সত্যজিৎ রায়	৮০—৯১	ইতালীয় ফিল্ম
কৃষ্ণ ধর	৯২—১১০	রবীন্দ্রনাথ : পশ্চিমের জানালায়
রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত	১০২—১০৬	ইংরাজী একাংক
সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৭—১১৫	কালীঘাটের পট
আদিত্য ওহদেদার	১১৬—১২৫	অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ
বাসব সরকার	১২৬—১৪০	নিরপেক্ষবাদের রাজনীতি
মৃণালকান্তি ভদ্র	১৪১—১৬০	জাঁ পল্ সার্ত্র : অস্তিবাদ ও স্বাধীনতা
উলিয়াম আর্চার	১৬১—১৬৩	রবীন্দ্রনাথের ছবি
তরুণ সান্যাল	১৬৪—১৭৬	হে নক্ষত্রবীথি
শান্তি সিংহ রায়	১৭৭—১৮১	রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা'
জে, বি, এস, হলডেন্	১৮২—১৮৫	মানবপ্রকৃতির পরিবর্তন কি সম্ভব
রেভারেণ্ড আঁতোয়া	১৮৬—১৯২	আমার রবীন্দ্রনাথ

সম্পাদক রাথীন্দ্রনাথ/রথীন্দ্রনাথ ঘোষ

কার্যালয় : ২০, গ্রে স্ট্রীট। ফোন : ৫৫-৪৪২৫ কলিকাতা-৫

দাম দুই টাকা

প্রবন্ধ পত্রিকা

কার্তিক সংখ্যার সম্ভাব্য সূচী

॥ সাহিত্য ॥

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় : হেমিংওয়ে

দেবব্রত চক্রবর্তী : প্রকল্পনা ও বিকল্পনা

সৈয়দ আলি আহসান : 'মেঘনাদ বধে'র চিত্রকল্প

॥ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ॥

অচ্যুৎ গোস্বামী : রাষ্ট্র ও স্বাধীনতা

॥ ইতিহাস ॥

হারাণচন্দ্র নিয়োগী : প্রাচীন প্রাচ্যে ইতিহাস চর্চা

॥ সমাজতত্ত্ব ॥

সরোজ গঙ্গোপাধ্যায় : বৈদিক সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম

॥ দর্শন ॥

মৃণালকান্তি ভদ্র : সার্ত্র—অস্তিবাদের দর্শন

এ ছাড়া থাকবে গ্রন্থ-সমালোচনা ও পুনর্মুদ্রণ

দাম এক টাকা

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা

অপ্রকাশিত পত্র

রাজশেখর বসু

৩০বি, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৫ই জুলাই ১৯৩৩

[শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষকে লিখিত]

সবিনয় নিবেদন

আপনার ১৬ই আষাঢ়ের চিঠি পাইয়া অতিশয় সুখী হইলাম। বানান সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আপনার প্রশ্নের উত্তর যথাসাধ্য দিতেছি।—

চলন্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হইতেছে। প্রায় অর্দ্ধেক ছাপা হইয়া গিয়াছে, বাকী বোধহয় পূজার পরেই শেষ হইবে। আপনি যে সকল ত্রুটি দেখাইবেন তাহার সকলগুলির আর শোধনের উপায় নাই।

বাংলা বানানের পদ্ধতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র, সুনীতিকুমার এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে আমি কথা কহিয়াছি। সমস্ত শব্দের বানান সম্বন্ধে কাহারও নির্দ্ধারিত মত নাই, তবে সকলেই স্বীকার করেন যে একটা ব্যবস্থা হওয়া খুব দরকার। কতকগুলি শব্দের বানান সম্বন্ধে ইঁহাদের নিজ নিজ মত আছে। কোনো কোনো বিষয়ে ইঁহারা একমত, কিন্তু মতভেদও বিস্তর আছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চেষ্টায় সহজেই বানান স্থিরীকৃত হইতে পারে ইহা আমারও বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ সেই চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু শেষ অবধি কিছু হইবে কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে।

চলন্তিকা আরম্ভ করিবার পূর্বে আমি বানানের পদ্ধতি নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার উপায় এই।—কতকগুলি বাংলা শব্দের ফর্দ্দ তৈয়ার করি। প্রায় চল্লিশজন সুশিক্ষিত প্রবীণ ও নবীন লেখকের সহিত একে একে দেখা করি। আমি ফর্দ্দ হইতে এক-একটি শব্দ পড়ি এবং শ্রোতাকে তাহা

বানান করিতে বলি। প্রথমেই সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম—সঙ্গতি-অসঙ্গতির বিচার না করিয়া যে বানান মনে আসিবে তৎক্ষণাৎ বলিতে হইবে। আমার উদ্দেশ্য—লেখকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নির্দ্ধারণ এবং যে বানান অধিকতম ভোট পায় তাহা অবলম্বন করিয়া বানানের সাধারণ সূত্র গঠন। এই পরীক্ষার ফলে অনেক বানানের সামঞ্জস্য পাইয়াছিলাম, যথা ই-কারান্ত ও ঈ-কারান্ত শব্দের। কিন্তু কতকগুলি শব্দে, বিশেষতঃ যাহার মূল সংস্কৃত শব্দে উ বা ণ আছে, এত অসামঞ্জস্য দেখা গেল যে ভোট দ্বারা সূত্র নির্ণয় সম্ভব হইল না। অগত্যা রবীন্দ্রনাথ ও যোগেশচন্দ্রের মত লইলাম। উভয়েই বাংলা শব্দে ঊ ণ যথাসম্ভব বর্জ্জন করিতে চান। আমি অভিধানে যে বানান দিয়াছি তাহার অধিকাংশই উল্লিখিত দুই উপায়ে নির্ণীত। অবশিষ্ট শব্দে আমার রুচিসঙ্গত বানানকে প্রাধান্য দিয়াছি। নূতন সংস্করণে কোনো কোনো শব্দের বানান বদলাইয়াছি। আপনি যে 'কোম্পানী' দেখিয়াছেন তাহা ভুল, 'কোম্পানি' হওয়া উচিত ছিল।

'জয়ন্তী'—২য় সংস্করণে দিয়াছি।

'অভিলাস, ঊর্দ্ধ' দি নাই, কারণ প্রয়োগ বিরল, সকল সংস্কৃত অভিধানে নাই। কিন্তু এখন মনে হইতেছে 'ঊর্দ্ধ' দেওয়া উচিত ছিল, বানান সরল করার পক্ষে কিঞ্চিৎ সাহায্য হইত।

'ওঁছা' দি নাই, ভোটে 'ওঁচা' দাঁড়াইয়াছে।

'অগ্নিদগ্ধা, শয়তা (?), হিবাচী (?)' দি নাই। সম্বরা অর্থে 'সম্ভার' শুনি নাই, বোধহয় প্রাদেশিক।

'পুত্র' দিব। 'পুত্র' প্রয়োগসিদ্ধ কিন্তু ব্যাকরণসম্মত নয়।

'গোয়েন্দা'।—মূল অর্থ জানি না। বাংলা অর্থ দিয়াছি। 'কথ্য' অর্থে কথনীয় এবং যাহা কহা হয়। 'কথিত'=যাহা কহা হইয়াছে। অতএব 'কথিত ভাষা'র চেয়ে 'কথ্যভাষা' ভাল মনে হয়। কিন্তু 'চলিত ভাষা' কথ্য ভাষা নয়। 'সাধু' ও 'চলিত' দুইটিই লেখ্য বা লৈখিক ভাষা।

'পরীক্ষা প্রার্থনীয়'।—যেন ইংরেজী নকল, trial solicited। এরূপ প্রয়োগ খুব চলিতেছে, কাজেই শিষ্ট না বলিয়া উপায় নাই।

Cat-এর a র উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য একটি নূতন স্বরবর্ণ ও তাহার যোজ্য রূপ হইলে ভাল হয়। রবীন্দ্রনাথ ও যোগেশচন্দ্র দুজনেরই এই মত। আমি

প্রস্তাব করিয়াছি— এ্যক্ট (act, hat = এ্যাট্.হ্যাট্)। রবীন্দ্রনাথ এই দুই চিহ্ন পছন্দ করিয়াছেন। কিন্তু নূতন বর্ণ যেমনই হউক চালাইতে সময় লাগিবে। আমার মতে ততদিন 'অ্যা ্যা' চিহ্ন দ্বারা কাজ চলিতে পরে। 'অ্যা' বর্ণমালায় নাই; য-ফলা + আ-কার = Catএর a তুল্য নয়। দুইটিই কৃত্রিম, কিন্তু অনেকে প্রয়োগ করেন সেজন্য পরিচিত। হিন্দীতে এই উদ্দেশ্যে ঐ-কার চলিতেছে—hat = হ্যাট

আমি 'এমন এত কেমন খেলা' ইত্যাদি শব্দে এ-কার বজায় রাখিতেই চাই, রবীন্দ্রনাথের চিহ্নও চাই না। শব্দের উচ্চারণ সর্বত্র বানান-অনুযায়ী হইবে এমন দুরাশা করি না। কেবল বৈদেশিক শব্দে এবং বিশেষ প্রয়োজনে কয়েকটি বাংলা শব্দে 'অ্যা ্যা' লিখিতে চাই, যথা, 'অ্যাক্ট, ফ্যাশন, অ্যাঁ, ছ্যা'।

ণ্ট ণ্ঠ ও ণ্ঢ।—ণ স্থানে ন করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যুক্তাক্ষরের অংশকে ইচ্ছামত ণ বা ন মনে করা যাইতে পারে। আমরা লিখি 'রুগ্ন, ভগ্ন', কিন্তু বানান রুগ্‌ণ, ভগ্‌ন।

বাংলা শব্দের 'শতৃ' ণত্ব ও সন্ধির বিধি দেওয়ার সময় এখনও আসে নাই। যদি ইউনিভার্সিটি বা রবীন্দ্রনাথাদি পণ্ডিতগণ বানান-পদ্ধতি স্থির করেন তবেই সূত্র রচনা সম্ভব হইবে।

আপনি চলন্তিকার জন্য যে নোট লিখিয়াছিলেন তাহা যদি খুঁজিয়া পান অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। যদি কলিকাতায় আসেন তবে দেখা হইলে আনন্দিত হইব।

শ্রীশংখ ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট গল্প

যদুনাথ সরকার

[১৮৯৪ সালে রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পের সংকলন "ছোট গল্প" প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ থেকে ১৮৯২ সালের মধ্যে রচিত দশটি গল্প এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তদানীন্তন ইডেন হিন্দু হস্টেলের ছাত্রদের উদ্যোগে 'সুহৃদ' নামে একটি দ্বিভাষিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। পরবর্তীকালে বাংলা দেশের জনজীবনে প্রভূত কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন, এমন এক তরুণ লেখকগোষ্ঠী ছিলেন এই পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন মানকুমারী বসু, রজনীকান্ত সেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, জলধর সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, যদুনাথ সরকার।

রবীন্দ্রনাথের এই ছোট গল্প সংকলনটির এদেশে বোধ হয় প্রথম সমালোচনা প্রকাশিত হয় 'সুহৃদ' পত্রিকায় প্রথম বর্ষে ১৮৯৪ সালে। সমালোচক যদুনাথ সরকার তখন চব্বিশ বছরের তরুণ যুবক। তরুণ যদুনাথের মন্তব্যের অনেকাংশ আধুনিক সমালোচকদের রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনার পথিকৃৎ বলে মনে হবে। মূল ইংরাজী প্রবন্ধটি যথাযথ শিরোনামায় (Babu Rabindranath Tagore's Short Stories) শ্রীপুলিনবিহারী সেন বিস্মৃতির অতল থেকে উদ্ধার করে রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষে দেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের ২রা জুলাই ১৯৬১'র রবিবাসরীয় ক্রোড়পত্রে এটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এই সুযোগ আমরা সংশ্লিষ্ট সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এখানে এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ দেওয়া হলো। অনুবাদ করেছেন—বাসব সরকার।—সম্পাদক]

আমাদের সমকালের ভারত আমাদের মহান্ পিতৃপিতামহের ভারতের তুলনায় অনেক পৃথক। পরিবর্তনের ঢেউ বারবার আঘাত করেছে, ভারতের জীবনে ধীরে ধীরে রূপান্তর ঘটেছে, তার শুধু অক্ষয় রয়ে গেছে গ্রানাইট পাথরের মতো হিন্দুত্বের শক্ত বনিয়াদ। সামাজিক সংগঠনের রূপান্তর ঘটেছে এতো বেশি যে আজ যদি আমাদের অশরীরী পিতৃপিতামহরা ফিরে আসেন তাঁদের বহু স্মৃতি-বিজড়িত জন্ম-মৃত্যুর শাসনসীমিত লীলাভূমিতে, তা'হলে গভীর ব্যথার আবেগে

মনে হবে তাঁদের এ কোন বিদেশ। কিন্তু আধুনিক ভারতীয় জীবনের বাইরের দিকের আলোচনা, এ প্রবন্ধের উপজীব্য নয়। এই দিকের আলোচনা বিশেষতঃ রাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক মিঃ কটনের 'নিউ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এর উপজীব্য এটাও বিচার করা নয় যে পশ্চিমের বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানের আলো ভারতীয় মণীষায় প্রভাব বিস্তার করেছে কতখানি। আমাদের লক্ষ্য হলো, সমকালের সমাজের পরিবর্তিত চিন্তাধারা ও পরিবেশ, ভারতের আত্মিক জীবনকে প্রভাবিত করেছে কতখানি তারই বিচার করা। আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো যে সমাজের এই পরিবর্তিত অবস্থা—আমাদের কাছের মানুষ যারা, যাদের মধ্যে আমরা বাস করি, তাদের কাজ ও অনুভূতিতে কতটা প্রতিফলিত হয়েছে।

॥ এক ॥

পশ্চিম আমাদের দিয়েছে তার জ্ঞানের ভাণ্ডার। কিন্তু জ্ঞানকে অবিমিশ্র আশীর্বাদ মনে করায় বাধা আছে। সময় সময় তা'তো অভিশাপ হয়েও দাঁড়াতে পারে। জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় আমাদের মনে যে দুঃখ-চেতনা জাগরিত হয়, কিম্বা আশা-আকাঙ্খার সূচনা হয়, হয়তো সেই দুঃখ বিদূরিত করা সম্ভব নয় কিম্বা সে আশা ফলবতী হবে না। সুতরাং এ-কথা জোর করে বলার সুযোগ নেই যে একালে মানুষের জ্ঞানের পরিধি যতো বেড়েছে, জীবনে সুখের স্বাদও বেড়েছে ততটা। বস্তুতঃ আধুনিক একটা মতাদর্শের সমর্থকরা (তার প্রধান প্রধান প্রবক্তরা ছিলেন স্যার অ্যালফ্রেড লিয়াল ও সেই মনোরম গল্প লেখিকা শ্রীমতী ফ্লোরা অ্যানী স্টলে) এতদূর পর্যন্ত বলতে প্রস্তুত যে জ্ঞান জীবনে সুখের চেয়ে দুঃখের পরিমাণকেই বাড়িয়েছে বেশি। অ্যাভেঞ্জালিস্টদের কাল্পনিকতাকে অনুসরণ করে এদের শোকোচ্ছ্বাস ক্লান্তিহীনভাবে শুধু এ-কথাই বলে চলে। সে পাশ্চাত্ত্য বিত্তার জোরালো মদকে প্রাচ্যের জীবনের আধারে ধরে রাখতে গেলে ফল হবে এই যে একদিকে যেমন আধারই যাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে, অন্যদিকে সেই চিন্তার ধারাও হয়ে পড়বে বিক্ষিপ্ত।

এ-কথা আমরা বলি না যে আমাদের প্রাচীন জীবন ধারায় কোন কষ্ট ছিল না, ছিল না কোন দুঃখ। দুঃখ সেখানে নিশ্চয়ই ছিল—সে দুঃখের ঐতিহ্য অমাদের সন্তানদের জীবনের অঙ্গীভূত। কিন্তু যেহেতু মানুষের বুদ্ধিগত সচেতনতা সেকালে

ছিল নিম্নমানের তাই দুঃখবোধ তখন এতো তীব্র হতে পারে নি। সেটির ধারণা ছিল অনেক অস্পষ্ট কোন অন্তরের উদ্বেলতা, যেন কোন রূপহীন সৃষ্টির একটি ভোঁতা অনুভূতি। তা'ছাড়া মানুষের মনকে শান্ত রাখার জন্যে আর দু'টো প্রকরণের ছিল ব্যাপক বিস্তার, যথা নিয়তিবাদ এবং ধার্মিকতা। প্রাচ্য জীবন-ধারায় অন্ধ নিয়তির অমোঘত্বের দোহাই দিয়ে সমাজের অসাম্য। দুঃখ-সুখের বিরোধকে প্রশমিত করা, ব্যাখ্যা করার রেওয়াজ প্রবাদে রূপান্তরিত হয়েছে। দেবতার সজীব অস্তিত্বে বিশ্বাস জীবন চেতনাকেই করে তোলে রহস্যময় যেখানে যুক্তির সার্বভৌমত্ব অস্বীকৃত। মরজগতে জীবনের দুঃখময় অস্তিত্বের প্রতিষেধক চিন্তা হিসেবে প্রচারিত হয় পরলোকে অপার শান্তির সম্ভাবনা। মানুষের সুখদুঃখ দোলায়িত সীমিত জীবন, ব্রহ্মকে জানার, তাঁকে উপলব্ধির জন্যে তাঁর প্রদর্শিত পথের সাধনায় নিয়োজিত উৎসারিত মহাজীবনের কাছে নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

প্রাচীন জীবনধারা অনেক সুসংবদ্ধ ছিল। সেকালের মানবিক সম্পর্ক ছিল অনেক সুষমামণ্ডিত। সামাজিক পরিবেশ প্রতিটি মানুষের স্থান ছিল নির্দিষ্ট। তাকে স্বেচ্ছায় অতিক্রম করা যেমন একদিকে ছিল ব্যক্তি মানুষের সাধ্যাতীত, তেমনি অন্যদিকে এই সামাজিক নির্দিষ্ট পরিমণ্ডল, মানুষের পারস্পরিক স্নেহ-প্রীতির সম্পর্কে বাধা সৃষ্টি করে নি মোটেই। এর স্থানুত্ব সম্পর্ক যা রক্ষণশীলতার সহজাত। এই পরিবেশের মধ্যে মানুষ সমব্যথীর সহানুভূতিতে তাহারা বঞ্চিত হয়।

কিন্তু আধুনিক জীবনধারার লক্ষ্য হলো পার্থিব সফলতা তাই গতি তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর কোন চিরায়ত অভ্যাস নেই। নেই কোন অভ্যস্ত মেজাজ, কারণ অভ্যাসকে, মেজাজকে গড়তে গেলে যে সমকালের তাগিদকে উপেক্ষা করার ধৈর্য দরকার, তা এর নেই। (অবিশ্যি আমার এ-কথাগুলো তাদেরই লক্ষ্য করে বলা, সমাজে যারা সবচেয়ে সক্রিয়, সবচেয়ে সফলকাম। জানি সমাজে এরা ছাড়া আরো কিছু সুন্দর কিন্তু দুর্বল মনের মানুষ আছে যারা সমকালের জীবনধারায় নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে নি।) এখানে দয়া নেই দাক্ষিণ্য নেই, কারণ চিন্তা করার অন্যের দুঃখে দরদী হওয়ার এখানে অবকাশ কম। এখানে ঘটনার পরিবেশের আকস্মিক পরিবর্তন, অনভ্যস্ত তরুণ হৃদয়ের কোমলতাকে মথিত করে দারুণ যন্ত্রণায়। মানুষে মানুষে যে সহমর্মিতা অপরিচিত পরিবেশে নবাগতকে আপন করে নেয় তার এখানে একান্ত অভাব। এই নতুন রীতির

পীঠস্থান হলো, এ যুগের সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদান, 'প্রাসাদ নগরী' কলকাতা—সেখানকার জনারণ্যে অপরিচিত মানুষ অনুভব করে, জনশূন্য প্রান্তরের চেয়ে বেশি নিঃসঙ্গতা। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছোট গল্পে'র থেকে দুটি উদাহরণ দিলে এই বক্তব্য আরো পরিস্ফুট হবে। ছোট্ট ছেলে ফটিক (দশ সংখ্যক গল্প) গ্রামের খেলার সাথী আর অবাধ মুক্ত আকাশের নীচের বিস্তীর্ণ মাঠের জীবনকে পিছনে ফেলে এলো শহর কলকাতায়। কিন্তু এখানে তাকে ভালোবাসার কেউ নেই, তার জন্যে ভাবনা চিন্তা করার কেউ নেই, এবং আবহাওয়ার সীমাহীন, স্নেহহীন তাচ্ছিল্যের মধ্যে তার অন্তরাত্মার শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হলো। আবার দেখা যায় উলাপুরের 'পোস্টমাস্টার' ডাকঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে নিঃসঙ্গতায় অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে; ঘরের বাইরে সেখানে কতো লোক, কতো মানুষ, তবু সে কারো সঙ্গে মিশতে পারে না। তারা ভিন্ন মনের মানুষ, দুটো স্বতন্ত্র শ্রেণী, যাদের সঙ্গে পারস্পরিক সমবেদনা স্বতঃউৎসারিত হয় না। আধুনিক জ্ঞান, চেতনা, অন্য যে কোন কালের চেয়ে এ-কালে, সংস্কৃতিবান ও গ্রাম্য জীবনধারার মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিভেদ সৃষ্টি করেছে।

সমকালীন জীবনের দুটি বৈশিষ্ট্য আছে: প্রথমত এযুগে নতুন অনেক যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়েছে আর দ্বিতীয়তঃ নতুন জ্ঞানের নিরিখে পুরানো যন্ত্রণার অনুভূতির তীব্রতা ও ব্যাপকতা আরো বেড়েছে। আধুনিক যুগচেতনাই এই দুই অ-সমকালীন যন্ত্রণাবোধের সামগ্রিক স্বরূপকে আরো তীব্র এবং আরো ব্যাপক করে তুলেছে। শেষোক্ত যন্ত্রণাবোধের কথাই ধরা যাক: রতনের অন্তরের সমস্ত কামনা-বাসনা (তৃতীয় গল্পে) পোস্টমাস্টারের চরিত্রকে আশ্রয় করে বিকশিত হতে চাইছে। কিন্তু তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারলো না। প্রাচীন চেতনার যুগে সে (পোস্টমাস্টার) এই আকর্ষণকে মনে করতো হয় একজন পরিচারিকার স্বাভাবিক কর্তব্যবোধ এবং তাকে সহজে ভুলে যেতে পারতো, আর নয়তো অবৈধ সংসর্গে তার দুরন্ত, পাশব কামনা চরিতার্থ করতো। কিন্তু জাগতিক চেতনায়, পরিবেশে তারা দুজনেই এই আকর্ষণের স্বরূপটিকে চিনতে ভুল করে নি—হয়তো সেই বোধ কারো মনে বেশি করো মনে কম প্রকট এই যা। বোধ, সচেতনতা, আবেগের প্রকৃতি নির্ণয়, যন্ত্রণার এই

মানসিক অনুভূতি, এরাই সমগ্র ভাবে দুঃখের তীব্রতাকে বাড়িয়ে তোলে, বিদায়ের মুহূর্তে ট্র্যাজেডিকে চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

॥ দুই ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের সমাজে এই নতুন চেতনার যন্ত্রণার ব্যাখ্যাতা। এ-কথা হয়তো আপাত-বিরোধ-সম্পন্ন বলে মনে হবে, কিন্তু আমরা সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারি, যে কবিতার চেয়ে, কাব্যের চেয়ে, তাঁর ছোট গল্পগুলি বেঁচে থাকবে আরো অনেকদিন বেশি। কারণ এরা হলো জীবনের সমগ্রতার ব্যাপকতার সত্যতর অবস্থারও পরিচয়ের, যা কবিতায় ফুটে ওঠে নি—সেখানে শুধু পাই খণ্ডিত জীবনের অসম্পূর্ণ ছবি।

তাঁর কাব্য-কবিতার বিষয় প্রায়শই হলো মানুষের প্রেমময়তার আবেগস্পন্দিত নারীসুলভ অভিব্যক্তি। এই আবেগস্পন্দিত অভিব্যক্তিকে সাহায্য করছে চন্দ্রালোক (যাকে কবি 'চাঁদের হাসি' বলতে ভালোবাসেন), ফুলের মুকুট, মৃদু পশ্চিমা বাতাস, বিহঙ্গের কলকাকলি ; আর রোদনশ্রান্তা নারীর আধফোলা চোখের অবিরাম ধারা, কিম্বা ব্যথিত হৃদয়ের করুণ দীর্ঘশ্বাস যার কোন সম্ভাব্য কারণ বোঝা ভার—সংক্ষেপে সেই সব কার্যকারণের উপকরণ যা অসুস্থ আবেগপ্রবণতার লক্ষণাক্রান্ত এবং প্রচুর জীবনীশক্তির অভাবসঞ্জাত। এ কাব্যের নায়করা প্রায়ই সেই ধরণের "প্রেমিক যে তার প্রিয়ার বঙ্কিম ভ্রূর জন্যে বিষাদময় সনেট লেখে", কিম্বা যার নায়িকারা হলো "আকাশলীনা, পরী লিলিয়ান"।

কিন্তু জীবনের সবটাই তো শুধু সূর্যের আলোভরা নয় (না, না, ভুল হয়ে গেছে চাঁদের আলো বলা ঠিক হবে—আমাদের কবিরা সূর্যের আলোকে ঘৃণা করেন, তাঁরা এর চেয়ে বটগাছের ছায়ায় বসে বাঁশী বাজানো অনেক পছন্দ করেন,)। জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়—অন্ততঃ আধুনিক কালে তো নয়ই। মৃদু মন্দ পশ্চিমা বাতাস বইলেও সবার জন্যে বয় না, আর সব সময়ে তো বয়ই না। এমনদিন তো আসে তখন দুর্যোগের দ্রুত সঞ্চারমান কালো মেঘ মাথার উপর ভেঙে পড়ে দারুণ আক্রোশে, যখন বাতাস গর্জে ওঠে থেকে থেকে, যখন সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে শুরু হয় নিরন্তর সংগ্রাম। তখন চাঁদ ভয়ে তার মুখ ঢাকে, মৃদু পশ্চিমা বাতাস ঝড়ের গর্জনে পলায়নপর হয়, বিহঙ্গে কলকাকলি স্তব্ধ হয়ে

যায়, অবিরাম ধারা বর্ষণে পুষ্পদল বৃন্তচ্যুত হয়ে লুটিয়ে পড়ে পথের ধূলায়, আর একে এলে নিদারুণ প্রকৃতি খসিয়ে দের পাতা, উপড়ে ফেলে তাদের সমূলে। আত্মার এই মত্ত অবস্থা ঝড় তুফানের মতো দারুণ দুর্যোগের ছবি, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সম্পূর্ণ অবহেলিত; শুধু তাই নয় এমন কি সেই সব ক্রমসঞ্চারমান যন্ত্রণার আপাত-প্রাবল্যহীন শক্তি যা মানুষ অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সহনীয় করে রাখলেও, যেগুলি ধীরে ধীরে মনের মৃত্যু ঘটায়, সেগুলিও তিনি স্বীকার করতে চান নি। সন্দেহ নেই এই নিষ্ঠুর সত্যকে আবেগমণ্ডিত কাব্যোচ্ছ্বাসের ব্যঞ্জনায় ধরতে গেলে, তা জীবনে উপহাসের মতো মনে হবে। তাই আমরা মনে করি যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনেকটা হাল্কা খেলনার মতো, সুন্দর অথচ অকিঞ্চিৎকর, যা মনের অবকাশের মুহূর্তগুলিকে উজ্জ্বল করতে পারে, কিন্তু যাকে বাস্তবের কঠোর নিরিখে দূরে সরিয়ে রাখতে হবেই। সুতরাং এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য যে জীবনের সত্য পরিচয় উপস্থিত করতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য কবিতা ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু জীবনের, বিশেষত আধুনিক জীবনের সত্য পরিচয় রবীন্দ্রনাথই দিয়েছেন তাঁর ছোট গল্পে, যেখানে তাঁর সফলতার সমকক্ষ আমাদের সাহিত্যে অনুপস্থিত। এর জন্যে যে আঙ্গিক তিনি বেছে নিয়েছেন তা যেমন যথাযথ তেমনই সুন্দর। ছোট গল্পের মৌলিক চরমোৎকর্ষ (ফরাসী) রবীন্দ্রনাথ বাংলার ভাষায় বিস্ময়কর সাফল্যের সঙ্গে, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলেছেন, যেখানে সুন্দরের রূপবর্ণননায় তাঁর বৈশিষ্ট্য আছে অব্যাহত। এখানে আমরা তাঁর রচনশৈলীর কোন সমালোচনা করবো না—যদিও জানি এর মধ্যে এমন অনেক বর্ণনা আছে যা একেবারে বেদাগ হীরে, নিখুঁত গদ্যে প্রকাশিত কবিতা, যা হয়তো কেবল মাত্র কোন পরিশীলিত কাব্যশিল্পের পক্ষে রচনা করা সম্ভব। কোথাও কোথাও এর এমনই কোন বাক্য আছে, এমনই হয়তো কোন শব্দ সংযোজন ঘটেছে, যার বিস্ময়কর ব্যঞ্জনা, নাটকীয়তা পাঠকের চোখের সামনে একটা সম্পূর্ণ দৃশ্যকে উপস্থিত করে। এ প্রবন্ধের উপজীব্য হলো রবীন্দ্র-রচনার সে জাতীয় বিশ্লেষণ করা যে তিনি জীবন ব্যাখ্যাতার ভূমিকায় নেমেছেন, তাঁর রচনার মধ্যে সেই মতাদর্শের অনুসন্ধান করা যা প্রচার করতে তিনি সচেষ্ট।

॥ তিন ॥

সমকালের বাষ্প ও বিদ্যুৎশক্তির প্রভাবে সমাজজীবন এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। যারা এর জ্বরের ক্রমবর্দ্ধমান তাপমাত্রার মতো দ্রুত ব্যস্ততার সঙ্গে তাল মিশিয়ে চলতে পারে না, যারা গতির আবেগ থেকে সরে দাঁড়িয়ে সহানুভূতি ভালোবাসার কথা বলে, যারা এর স্বার্থপরতার নির্লজ্জ দ্বন্দ্ব দেখে সংকুচিত হয়ে থাকে, এককথায় যারা দুর্বল, যারা নম্র বিনয়ী, এ যুগের জীবনে তাদের কোন ঠাঁই নেই। সমকাল নির্মমভাবে তাদের সরিয়ে দিয়েছে তার পথ থেকে। অপ্রয়োজনের বোঝার মতো একালের চোখে তারা জীবনের ব্যর্থতায় কলঙ্কিত। তারা হলো আধুনিক যুগের বলি। দয়া এখানে অপরাধ। পার্থিব সুখের নিরন্তর সংগ্রামে, দয়ালু প্রকৃতি কিম্বা সাদাসিধে স্বভাবের মানুষকে এ যুগ ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে এক কোণে, কিম্বা পদদলিত মুমূর্ষু করে এগিয়ে যাচ্ছে তার ঈপ্সিত পথে।

কিন্তু যুগের জয়যাত্রার পথপার্শ্বে নিরাশা-কোণে এখনও অনেক সেই সব ছোট নম্র গোলাপী ফুলের দল ফোটে, যারা প্রশংসার দাবী রাখে না, লড়াই করে না খ্যাতির জয়মাল্যের লোভে। জগতে সম্মানের উঁচু আসনটির লোভে অখ্যাত, অবজ্ঞাত কোণ থেকে বাইরে বেড়িয়ে আসার আগ্রহ তাদের নেই। সেই একান্ত পরিবেশে একাই থাকতে চায় তারা বাধাহীন হয়ে, আর চায় একটু ভালোবাসার স্পর্শ। প্রকৃতির নিবিড় সজীবতার আশ্রয়ে তারা শুধু জীবনের আনন্দের অকারণে উল্লসিত, সেখানে সূর্যের কিরণে স্নান করে তাদের দিন কাটে, আর জীবন ছন্দিত হয় চিন্তাহীন হৃদয়স্পন্দনে। ঘাসের বনে স্বাচ্ছন্দ্যচারী ভীরু কাঠবিড়ালীর মতোই সহজ তাদের জীবন, যা সামান্যে প্রতিকূলতায় সচকিত হয়ে খোঁজে গাছের নিরাপদ আশ্রয়। আর মানুষের পাশব প্রভৃতির নির্মম আঘাত তাই বোধ হয় নেমে আসে এদের উপর নানা ছদ্ম আবরণে। যেখান থেকে কোন নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে পালাবার পথ তাদের নেই।

একালের অভিযাত্রী সমাজের পায়ে আছে লোহার জুতো, তাই তার চলার আবেগে পথের ধারের ফুলের দল কেবলই নিষ্পেষিত হয়। সে এদের বোঝে না, কিন্তু নিপীড়ন করতেও ছাড়ে না। সমস্ত তাদের শান্ত নিরীহ জীবনধারাকে সহ্য করতে অপারগ। তাই তার চোখে এদের প্রাণবান জীবনের আনন্দ অপরাধ

বলে মনে হয়, তার নিয়মের নিগড়ে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে চায় এদের স্বাভাবিকতা।

এই ছোট গল্পগুলির মধ্যে লেখক আধুনিক জীবনের যন্ত্রণার কয়েকটি চিত্র তুলে ধরেছেন। প্রথমেই চোখে পড়ে দ্বিতীয় গল্পের 'অদম্য' বৌটির কথা। কি নিষ্ঠুর দুঃখময় সত্যের ছবিই না লেখক আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। প্রাচীন জীবনধারায় শাশুড়ী ঠাকরুণের হাতে লাঞ্ছনা এবং সময় সময় আধুনিকা বোনদের তুলনায় তাদের কষ্ট কতটা বেশী—যখন দেখি একালে তারাই হৃদয়হীনা, অর্থগৃধ্নু, শাশুড়ী ঠাকরুণদের স্নেহহীন আচরণতার বিষাক্ত ব্যঙ্গোক্তিতে নিয়ত ক্ষতবিক্ষত। এ ধরণের কিছু নারী চরিত্র আর ঘরপাগল ছেলেটির কথা বাদ দিলে আমরা দেখি এমন কতকগুলি হৃদয়ের প্রকাশ যারা পরস্পরকে আঁকড়ে থাকতে চায় নিবিড় আগ্রহে অন্যকে আঘাত না করে শুধু নিজেদের সুখের আশ্রয়ে। কিন্তু সমস্ত পৃথিবী যেন তাদের মাঝে এসে দাঁড়ায় অনিবার্য বিচ্ছেদের দাবী নিয়ে। (তৃতীয় ষষ্ঠ, পঞ্চদশ সংখ্যক গল্প দ্রষ্টব্য।)

আধুনিক জীবন যন্ত্রণার কবলায়িত মানুষদের সম্ভবত তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে—প্রথমত হয়তো এর নিদারুণ জ্বালায় শেষ হয় অনেকের জীবন, যারা হেরে যায় আর তলিয়ে যায় কালপ্রবাহে, দ্বিতীয়ত হয়তো অনেকেরই উন্নত স্বকীয়তার ঘটে অপমৃত্যু, মনের সজীবতা স্বাভাবিকতাকে খাপ খাইয়ে নিতে হয় চলতি নিয়মের শৃঙ্খলে। হয়তো উমার (সপ্তম গল্প) বিধিলিপি ছিল তাই। সম্ভবত সে বেঁচেছিল শুধু।

'Old and formal, fitted to her petty part,
With a hoard of worldly maxims preaching
down a daughter-in-laws heart."

হয়ে। তৃতীয়ত হয়তো আরেকদল এই জীবন যন্ত্রণার আগুনে সংগ্রাম করে পরিশুদ্ধ পরিশীলিত হয়ে উন্নীত হয় মহত্তর কোন জীবনে। কিন্তু এই মহাত্মারা সর্বত্রই সুদুর্লভ বাংলা দেশে তো বটেই।

লেখকের সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর সুন্দরের শিল্পী পরিচয়। সুইনবার্নের মতো ইনিও মনে করেন যে আর্টের সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক ধ্রুব নয়, ফলতঃ আর্টের মধ্যে নীতিবাক্যে অনুপ্রবেশ ঘটালে তার সঙ্গে একে জুড়ে দিলে, আর্টের স্বরূপই ক্ষুণ্ন হয়। তবুও আমরা একথা বলতে পারি যে, এই

গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে নৈতিক আদর্শের হদিস পেতে খুব দেরী হয় না। কারণ (অর্থাৎ প্রকৃতই সুন্দর) তা সৎও বটে। এবং জীবনের এই সত্য চিত্রনের মধ্যে নৈতিক মূল্যবান অবশ্যই থাকবে অনিবার্যভাবে।

লেখকের বক্তব্য যতোটা আমরা বুঝেছি তা হলো এই : বাঁচা এবং অন্যকে বাঁচতে দেওয়া এটাই জীবনে একমাত্র ধ্রুব। প্রকৃতির নির্মল স্বাধীন প্রকাশকে বিনষ্ট করা সঙ্গত নয়। যেন পৃথিবীতে সেই পরিবেশই থাকে সেখানে ছোট ফুলের বাঁচার দাবী নিষ্পেষিত না হয়ে অবশ্য গ্রাহ্য—তারা কারো দুঃখের বোঝাকে ভারী না করে, ভগবানের সৃষ্টির পরম সৌন্দর্যকেই মূর্ত করে তোলে। তাহলে ঘাসের বনে নিরীহ ভীরু কাঠবিড়ালী নির্ভয়ে স্বাচ্ছন্দ্যচারী হবে, প্রজাপতিরা পারবে।

'Flutter though life's little day
In Natures varying colours drest—'

ঘুরে বেড়াতে। তাহলে সূর্যের প্রশান্ত ঔদার্য সব ছেলেমেয়েরা পাবে মনের বিস্তৃতি। না'হলে স্বর্গের আলো আর অমৃতের ধারা এ দুঃখের পৃথিবীতে কোনদিন নেমে আসবে না। তাই তাহলে স্নেহ দিয়ে, প্রেম দিয়ে তাকে করে তুলতে হবে সঞ্জীবিত, যেন সেখানে তারা পায় এক মরমী মনের দরদী হাতের স্পর্শ। তাদেরই রক্ষা করতে হবে নিষ্ঠুর পৃথিবীর করাল স্পর্শ থেকে, তার লোভের, যন্ত্রণার, তিক্ততার কলুষ থেকে।

রবীন্দ্রনাথের এই গল্প সংকলনটি 'ছোট গল্প' নামে প্রকাশিত হয় ১৫ই ফাল্গুন, ১৩০০ সাল (১৮৯৪ খ্রীঃ)। যে গল্পগুলি এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয় সেগুলি হলো : (১) রাজপথের কথা, (২) দেনাপাওনা, (৩) পোস্টমাস্টার (৪) রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, (৫) তারাপ্রসন্নের কীর্তি, (৬) ব্যবধান (৭) খাতা, (৮) সম্পাদক, (৯) একরাত্রি, (১০) ছুটি, (১১) দান-প্রতিদান, (১২) কাবুলিওয়ালা, (১৩) সমস্যাপূরণ, (১৪) গিন্নী, (১৫) রীতিমতো নভেল।

আধুনিক জগৎ ও হিন্দুধর্ম্ম

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

[রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌ষ্টিটিউট অব কালচারের উদ্যোগে 'The Impact of the Great Religions on the Modern World' এ বিষয়ে একটি আলোচনা সভা হয়। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন এম. জেড. সিদ্দিকি, পিয়ের ফালোঁ, এফ্‌ ব্রীদ্‌ এবং শশিভূষণ দাশগুপ্ত। শ্রীদাশগুপ্তের এই ইংরাজী ভাষণটির মৃণাল ভদ্র কৃত অনুবাদ প্রকাশ করা হোলো। —সম্পাদক]

"বর্তমান জগতে হিন্দুধর্মের প্রভাব" সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া কয়েক সপ্তাহ আগে এই বক্তৃতা-মঞ্চে আমি হিন্দুধর্ম আজকের ভারতের ব্যক্তি ও সমাজকে কিভাবে গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করিতেছে, সে বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলাম। হিন্দুধর্মের যে উপাদানগুলি সকল কালের মানুষের কাছে গ্রহণ-যোগ্য হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস, তাহারও আলোচনা করিয়াছিলাম। এই দুইটি দিক সম্বন্ধে সেই সময়ে যাহা বলিয়াছিলাম, আজ তাই বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব।

প্রথম প্রশ্নের আলোচনা করিতে গিয়া আজকের সামাজিক মানুষের উপরে আমাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করা যাক। সাধারণ লোকের কাছে হিন্দুধর্ম আজ কী বিশেষ রূপে প্রচলিত? এ প্রশ্নের উত্তর: "পুরানো বিশ্বাস এবং সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত বা তার দ্বারা অনুপ্রাণিত আচার ও অনুষ্ঠানের রূপে।" এই উত্তরই সাধারণত আমরা পাইয়া থাকি এবং বহুদিন ধরিয়া আমরা ইহার সঙ্গে পরিচিত। এই ধারণা খণ্ডন করা আমার উদ্দেশ্য নয়, যদিও আমার এ ধারণাকে অসত্য ও অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়। বরং আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দুদের যে মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছে আমি তার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। এই মনোভাবের মহৎ ধর্মীয় তাৎপর্য আমার কাছে মূল্যবান মনে হয়।

দেবত্বের স্পর্শ

যাদুর কার্যকারিতার জন্য যে সব আচার ও রীতি-নীতি মানার প্রয়োজন হয়, তার সম্পর্কে আদিম বিশ্বাস সমাজে আজও অপ্রচলিত, এমন কথা প্রমাণের চেষ্টা আমি করিব না। দেব-দেবীর আকারে বিভিন্ন ধরণের অতিপ্রাকৃত অস্তিত্বে বিশ্বাস নাই তাও আমি বলি না, কিংবা দেব-দেবী সম্পর্কে প্রাণবাদ (animism) এবং মানব-কল্পনা-বাদ (anthropomorphism) এবং সেই সমস্ত ঘিরিয়া যে আচার-আচরণ, আর প্রভাব আজ নাই, তাহাও বলতেছি না। বিভিন্ন আদিম বিশ্বাস ও অদ্ভুত ধারণা, এবং অন্যদিকে, প্রকৃত অধ্যাত্ম-আগ্রহ একদিকে যা মানুষের মনে সহজাত,—এই দুয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় জনচেতনায় যে আকস্মিক উপাদানের উদ্ভব ঘটিতেছে, আমি তাহার উল্লেখ করিতে চাই। জীবনের সমস্ত দিক দেবত্বের স্পর্শে মহান হইয়া ওঠে যে মনোভাবে, তাহার কথাই আমি বলিতেছি। "ঈশ্বর" কথাটি ব্যবহার না করিয়া আমি ইচ্ছা করিয়া "দেবত্ব" (Divinity) ব্যবহার করিয়াছি, কারণ সাধারণভাবে, হিন্দুরা দেবত্বের ধারণায় অপৌরুষের অসীম সর্বাধিক সত্তাকে বোঝে, ব্যক্তি-ঈশ্বরকে বোঝে না। "দেবত্ব" বলিতে আমরা শাশ্বত সত্য, অসীম সৌন্দর্য, অমোঘ কল্যাণ এবং পরম শান্তি বুঝি। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যা কিছু দেখা হয় তাই দেবত্বের স্পর্শ লাভ করে এবং কোন কিছু দেবত্বের স্পর্শ পাইলে পরিবর্তিত ও পরিশুদ্ধ, ঊর্ধ্বায়িত (sublimation) হইয়া ওঠে।

এই ঊর্ধ্বায়ন বলিতে আমরা কি বুঝি? যা কিছু আমাদের স্বার্থকেন্দ্রিক করিয়া তোলে এবং ইন্দ্রিয়-উপভোগে ভীষণভাবে আসক্ত করে, তাই আমাদের নিম্ন ও ক্ষুদ্র করিয়া তোলে। যা-কিছু এই ক্ষুদ্রতার বন্ধন হইতে আমাদের মুক্তি দেয়, এবং পরিপূর্ণ ভাবে না হইলেও, অন্ততঃ এক মুহূর্তের জন্য অনন্ত বিশ্বজীবন, পরম ও অসীম শান্তির সন্ধান দেয় তাই আমাদের মহৎ ও পবিত্র করিয়া তোলে। অতএব, ক্ষুদ্রতার নিম্নস্তর হইতে মহত্ত্বের উচ্চস্তরে উপনীত হওয়াও অসীমের স্পর্শে মহত্ত্ব লাভ করাই ঊর্ধ্বায়ন। কোন বস্তু বা ঘটনা, আচার, উৎসব বা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বায়নের অর্থ হইল ব্যক্তিচিত্তে এই ঊর্ধ্বগতি সৃষ্টির ক্ষমতা। আসল কথা হইল, আচার অনুষ্ঠানে একটি সংযত মনোভাব গড়িয়া উঠিল এবং সেই অনুযায়ী ক্রিয়া-কর্ম সম্পন্ন করিলে, সেই কর্মপদ্ধতি আমার মনরে উপর শুভ

প্রতিক্রিয়া করে এবং যে মনোভাব প্রথমে গ্রহণ করা হয়, তা আরও দৃঢ় হইয়া ওঠে।

আমি ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া ব্যবহারিক জীবনের উপাদানগুলিকে দেবত্ব-মহিমা দান করিবার হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা করিতেছিলাম। পরিষ্কার ভাবে বলিতে গেলে, আমি একটি ছোট গৃহ-উৎসবের কথা উল্লেখ করিতে পারি, এই উৎসব শস্য তোলার উৎসব, চলতি জীবনে যাকে "নবান্ন উৎসব" বলা হয়। একজন হিন্দু গৃহকর্তা শস্য কাটিয়া এবং গোলায় তুলিয়া কতকগুলি অনুষ্ঠান না করিয়া শস্য ভোগ করিবে না। সেগুলি হইল, ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা, বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি হিসাবে প্রকাশিত আধ্যাত্মিক শক্তির আধার দেবতাদের প্রশস্তি উচ্চারণ করা, পিতৃ-পুরুষদের জলদান করা এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, পশু-পক্ষীদের খাদ্য ও পানীয় দান করা এবং আত্মীয়-স্বজন-প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণে পরিতৃপ্ত করা। এই উৎসব সামাজিক চেতনাকে কিভাবে প্রভাবিত করে? সমাজের একজন সাধারণ মানুষও ইহার ফলে মনে করে, জৈবিক তাগিদে জীবন-যাপনে, খাদ্য উৎপাদনের প্রচেষ্টায় এবং সেই খাদ্যের দ্বারা শরীর পালনে—সে তাহার ব্যক্তিজীবন লইয়া একা নয়। সমাজের আর সকলের সঙ্গে শুধু সে আত্মীয়তা অনুভব করে তা নয়, চারপাশের পশু-পক্ষীদের সঙ্গে সে নৈকট্য বোধ করে। প্রাকৃতিক শক্তি ঈশ্বরের আদেশে তাহাকে স্বাস্থ্য ও সম্পদ দিয়াছে, তাহাদের সঙ্গেও সে একাত্মতা অনুভব করে। ইহাকেই আমি নিম্নস্তরের কুৎসিৎ গণ্ডী হইতে মুক্তি বলে মনে করি এবং এই মুক্তি ধর্মীয় জীবন-যাপন হিসাবে তাৎপর্যময়।

হিন্দুদের মধ্যে একটি জনপ্রিয় এবং বহুল-বিস্তৃত উৎসব হোলির কথা বলা যাইতে পারে। হোলি প্রথমে ছিল বসন্ত-উৎসব এবং যৌন-কামনার কিছুটা মুক্তিও ঘটিত এ-উৎসবে। কিন্তু হিন্দুরা চিরকিশোর রাখাল বালক আর তার প্রণয়িনী গোপবালার আধ্যাত্মিক লীলার কাহিনীর সঙ্গে এই বসন্ত-উৎসবকে এক করিয়া লইয়াছে। এই এক করার পিছনে যে প্রেরণা আছে, যাহাকে আদি বাসনা গোপন করার সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা বলিয়া কেন মনে করা হয়, বরং আমরা একে স্থূল কামনার মুক্তিদান ও বিশুদ্ধির মাধ্যমে ঊর্ধ্বায়ন বলিয়া ভাবিতে পারি। কেবল উৎসব ও অনুষ্ঠানেই নয়, হিন্দুদের বহু পুরাণ ও উপকথায় দেবতা ও মানুষকে এক করার এই বৈশিষ্ট্য উপস্থিত দেখা যায়। ইহার ফলে, দেবতাকে

মাটীর মানুষের স্তরে নামানো হয় নাই বরং সময় সময়, ব্যক্তি জীবনে ও সামাজিক জীবনে মানুষ দেবতার স্তরে উন্নীত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই দৃষ্টিভঙ্গী পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ককে এমনভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, যে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ত্যাগ করার প্রবৃত্তি পরাভূত হইয়াছে। ব্যক্তি-জীবনের বাৎসল্য শিশুপুত্রকে ভগবান কৃষ্ণ অথবা কন্যাকে আদরিণী উমা রূপে দেখার বাস্তব মনোভঙ্গির ফলে এ সম্পর্ক আরও মধুর ও পবিত্র হইরা উঠিয়াছে। শিব-পার্বতী, রাম-সীতা অথবা কৃষ্ণ-রাধা প্রভৃতি দেবদম্পতীর আদর্শে দাম্পত্য-জীবন কল্পিত এবং পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। এই জাগতিক ধারণার উপর জোর দেওয়ার ফলে হিন্দু আদর্শ স্থূল প্রবৃত্তিগুলিকে পরিবর্তন করিতে পারিয়াছে, এবং ত্যাগ ও কঠোর অবদমনের আদর্শকে দূর করিয়াছে। এই পরিবর্তনের সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে বর্তমানকালে অবচেতন ও অচেতন—চেতন-মনে কি গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং কিভাবে তাহারা আমাদের সমগ্র জীবন গঠনে প্রভাব বিস্তার করে, তা আজ সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু হিন্দুধর্ম সমান জোরের সঙ্গে সত্য তথ্যের নির্দেশ দিয়া বলিতে পারে যে চেতন-মনে এমন শক্তি সঞ্চার করা সম্ভব যা সমস্ত অবচেতন ও অচেতন অংশকে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত করিতে সক্ষম।

মানুষের নৈতিক প্রকৃতি

কিন্তু আমাদের ধর্মের প্রাচীন উৎসব ও অনুষ্ঠানের প্রভাব এবং সামাজিক চেতনায় পুরাণ ও উপকথার প্রভাব উল্লেখযোগ্য হইলেও বর্তমান জগতে হিন্দু ধর্মের প্রভাব প্রসঙ্গে খুব বেশি প্রাধান্য দেওয়া যায় না। তাছাড়া, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে আমাদের ধর্মে অনুষ্ঠানের দ্রুত পরিবর্তন হইতেছে। যে প্রধান ধারণা হিন্দুদের ধর্মজীবনেকে এতকাল পোষণ করিয়া আসিয়াছে এবং আজও করিতেছে, তাহা হইল ধর্মের আদর্শ,—মানুষের নৈতিক স্বরূপের প্রতি বিশ্বাসে যা প্রতিষ্ঠিত এবং যে বিশ্বাস মানুষের ইতিহাসে প্রগতির আদর্শের অবলম্বন।

দ্বান্দিক বস্তুবাদের ঐতিহাসিকগণও মানুষের প্রগতির আদর্শে বিশ্বাস করে; এ কথা বিশ্বাস করে, কারণ মানুষের প্রগতির জাগতিক প্রতিষ্ঠায় তাহারা সন্তুষ্ট। কিন্তু এ কি করিয়া সম্ভব যে, সামাজিক বিবর্তন দ্বারা সৃষ্ট অন্ধ শক্তি আবার

সামাজিক অগ্রগতি ঘটায়, জগতের গতিকে প্রগতির দিকে লইয়া যায়,—প্রগতি অর্থে যেখানে মানুষের পরম কল্যাণের সহায়ক একমাত্র আদর্শ সমাজকে বোঝায়। এই প্রতীপ (thesis) ও বিপ্রতীপের (anti-thesis) দ্বন্দ্ব কেন শেষ পর্যন্ত বিবর্তন এবং প্রগতির মধ্যে একটা উচ্চতর সমন্বয় ঘটাইবে, কেনই বা সমাধান-সম্ভাবনা-রহিত দ্বন্দ্বের দুঃখময় সঙ্কট ঘটাইবে না? ঐতিহাসিকেরা কি জন্য জীবনের অগ্রগতিতে পিছনের পদক্ষেপগুলিকে মানুষের বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী সম্মুখের পদক্ষেপের সাময়িক রূপ বলিয়া মনে করেন? এ প্রশ্নের উত্তর মানুষের নৈতিক স্বরূপে বিশ্বাসের মধ্যে মিলিতে পারে, সে বিশ্বাস ধর্মবিশ্বাস হইতে পারে কিংবা অবাদিত (uncontradicted) অভিজ্ঞতা থেকে আরোহানুমান (induction) হইতে পারে।

মানুষের নৈতিক স্বরূপ সম্পর্কে বিশ্বাস সব দেশে, সকল পরিবেশে, সব কালে শেষ পর্যন্ত ন্যায়ের জয়ে বিশ্বাসের যৌক্তিকতাকে ব্যাখ্যা করে। ইহা আমাদের আশাবাদের অটল ভিত্তি। মানুষের নৈতিক স্বরূপের অবলম্বন কি? হিন্দুরা উত্তরে বলিবে, মানুষের নৈতিক চরিত্রের মূলে মানুষের শাশ্বত আধ্যাত্মিক প্রকৃতি। হিন্দুদের কাছে নৈতিক আদর্শ হইতেছে শাশ্বত আদর্শ, যা আমাদের পার্থিব জীবনকে উন্নীত করে—পৃথিবী এবং সমগ্র বিশ্বজগতকে উন্নীত করে। এ-গুলির প্রকৃতি পরিবর্তনশীল নয়, সামাজিক বিবর্তন এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে এ-গুলি ঘটে না, প্রাকৃতিক এবং মানবিক নিয়মকে লইয়া এগুলি বিশ্বনিয়ম!

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম মহাযুদ্ধের পরে মানুষের ইতিহাস, বিশেষত ইউরোপের ইতিহাসের বাস্তব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মানুষ জাতির এক বিষণ্ণ ছবি তিনি আঁকিয়াছেন, যে মানুষ দেহে ও মনে ভগ্ন, ভগ্ন প্রতঙ্গের অপেক্ষা ভগ্ন বিশ্বাসের যন্ত্রণায় যে ক্লিষ্ট। তবু কবি তাঁহার আধ্যাত্মিক আশাবাদ ঘোষণা করিয়াছেন এবং সাহসের সঙ্গে বলিয়াছেন, মানুষের মূলগত নৈতিক প্রকৃতিতে বিশ্বাস হারানো পাপ, আর মানুষের নৈতিক প্রকৃতি তার আধ্যাত্মিক প্রকৃতির একটি বিশেষ দিক।

বেদান্তের আকর্ষণ

আমাদের ধর্মের চিন্তাধারাও বিশেষ কর্মপদ্ধতি যা অন্য ধর্মের লোকদের আকর্ষণ করে, তার বিশেষত্ব উল্লেখ করার জন্য আমার কাছে অনুরোধ

আসিয়াছে। অন্য ধর্মের দার্শনিক ও ধর্মীয় আলোচনা এবং বিদেশী বন্ধুদের কথাবার্তা হইতে আমার ধারণা হইয়াছে যে হিন্দুদের দুইটি বিশেষত্ব অন্য ধর্মের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আকর্ষণ করিতেছে। এই দুইটি হইতেছে ধর্মীয় চিন্তাধারার দিক হইতে বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ এবং ধর্মীয় আচরণের দিক হইতে যোগ ও তন্ত্র।

অদ্বৈত বেদান্ত হিন্দুধর্মের একটি বিশেষ মৌলিক চিন্তাধারা বলিয়া মনে হইয়াছে। দ্বৈত উপাদানগুলি এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত ভক্তিমূলক দিনগুলি বিদেশী পণ্ডিতদের বিশেষ আকর্ষণ করে না. যদি তাহাদের মধ্যে বিশেষ 'মিষ্টিক' উপাদান কিছু না থাকে। কিন্তু বেদান্তের নির্ভীক ঘোষণা, মানুষ ও ব্রহ্ম অভিন্ন ও এক,—তাদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে, কারণ এর ফলে ধর্মীয় চেতনায় এক আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং তাহা হইতে ভাল বা মন্দ প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

আমার নিজস্ব ধারণা হয়ত ভুল হইতে পারে, তবু মনে হয়, অহিন্দু চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ-আদর্শ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, কারণ ইহাতে বাইরের কোন কর্তৃত্বের কাছে বিনীত আত্ম-নিবেদন এবং সভয় ভক্তি স্বীকার করিতে হয় না। কিন্তু নিজের উচ্চ সত্তার কাছে স্বীয় নিম্ন সত্তার নতি স্বীকার করিতে হয়। এই উচ্চ সত্তাই সত্য সত্তা এখানে ব্যক্তি-আত্মা অসীম দীপ্তি ও শান্তির মধ্যে নিজের সত্য খুঁজিয়া পায়।

বর্তমান যুগে ধর্মের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা হইল এই যে উচ্চ কোন শক্তিকে মঙ্গলময় সর্বশক্তিমান বলিয়া কল্পনা করিয়া তাহার কাছে মানুষের অধীনতার উপর জোর দেওয়া হয় এবং তা একটি ঘৃণিত দাস মনোভাবকে সৃষ্টি করে, উৎসাহিত করে এবং বাড়াইয়া তোলে, এই মনোভাব সমস্ত মানুষের কাছে অপমানকর। আমি বিস্মিত হই এই কথা ভাবিয়া যে কি করিয়া বেদান্তের বিরুদ্ধে এই সমালোচনা করা যাইতে পারে, কারণ এই আদর্শে মঙ্গলময় সর্বশক্তিমানের ধারণা দূরে থাক, ব্যক্তি-দেবতার কল্পনাও করা হয় না। সুতরাং যদি কোন সমর্পণের কথা থাকে, তাহা হইলে আত্মার উজ্জ্বলরূপের কাছে মিথ্যা ধারণার আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পণ কখনও দাস-মনোভাব সৃষ্টি করে না, বরং মহত্ত্ব ও মুক্তির গৌরবময় মনোভাবের পর্যায়ে আমাদের উন্নীত করে। আমরা যে যুগে বাস করি, সে যুগে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়,

কিন্তু বেদান্ত-আদর্শ এই গণতান্ত্রিক চেতনার বিরোধী নয়। ব্যক্তিমানুষের পরিপূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ অর্থ উপলব্ধিতে গণতন্ত্র কখনও খর্ব হয় না। যদি কোন বিধাতা আমাদের নৈতিক জীবনের মূল্য রক্ষা করে এমন কোন নীতির সাহায্যে জগৎকে বিশেষ আদর্শে রূপায়িত করিতে চান, তাহা হইলে তাহা বেদান্তের আদর্শে উপলব্ধি করিতে হইবে, বুঝিতে হইবে যে কিছুই বাহিরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, সমস্ত নীতি 'আমার' প্রকৃতির সত্য হইতে উদ্ভূত।

শান্তি লাভের শৃঙ্খলা

যোগ ও তন্ত্র দুই বিভিন্ন দিক হইতে আকর্ষণ করে। যাঁহারা বিশেষ সংবাদ রাখেন না এবং অল্পস্বল্প পড়িয়াছেন, যোগ তাঁহাদের কাছে অলৌকিক প্রক্রিয়া বলিয়া আকর্ষণীয় এবং তন্ত্র দুর্বোধ্য যৌন-উপাদানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত বলিয়া আগ্রহের সঞ্চার করে। যাঁহারা বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন, যোগ তাঁহাদের কাছে এক বিশেষ আবেদন বহন করে, কারণ আধ্যাত্মিক কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রে মনকে এক কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলা মানিতে হয় এবং মানসিক শক্তির সাহায্যে বিভিন্ন শুদ্ধি ও শৃঙ্খলার পদ্ধতি ততক্ষণ সফল হইয়া উঠিতে পারে না, যতক্ষণ না সমগ্র জৈবিক জীবনের অন্তর্গত প্রাণশক্তি সুসমঞ্জস হইয়া ওঠে। চিত্তের এই শান্তি ও সামঞ্জস্য লাভ না হইলে মন অগ্রগতির পথে প্রতি পদক্ষেপে ব্যাহত হইবে। জড় বস্তুর মধ্যে যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে তা মনকে সব সময় পার্থিব স্তরের দিকে, জৈবিক প্রবৃত্তি ও স্থূল কামনার দিকে আকর্ষণ করিবে। যে সব প্রকৃতি দৈহিক ও জৈবিক নিয়মের অধীন, তাহা যেন —আমাদের মানসিক প্রচেষ্টা যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার দিকে লইয়া যায়, তাহার বিপরীত দিকে না লইয়া যায়। যোগ প্রথম দুইটিকে যুক্ত করে এবং পরম সত্যের আলো ও শান্তির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সমগ্র অস্তিত্বকে প্রস্তুত করে এবং শেষে পরম সত্যের সঙ্গে অস্তিত্বকে অভিন্ন করিয়া তোলে।

এই প্রসঙ্গে তন্ত্রের মত যোগের সমতুল্য এবং সত্য লাভ করিবার জন্য দেহকে ইহা উপযোগী আধার করিয়া তোলে। তন্ত্র মানব দেহকে বিশ্বের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ বলিয়া মনে করে—দেহভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড এবং সেই হিসাবে ইহা সমস্ত ব্যক্ত বিশ্বের সত্যের আধার। দেহের ছয়টি প্রধান স্নায়ুকেন্দ্রেও পাঁচটি প্রাকৃতিক উপাদানকে (পঞ্চভূতকে) পাঁচটি অভিজ্ঞতার স্তরে আবিষ্কার করা হয়। পরম সত্যের

শান্তি ও আলো দ্বারা উজ্জ্বল ও শক্তিসম্পন্ন ক্রিয়াপদ্ধতির সাহায্যে এগুলিকে বিশুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। কেবলমাত্র তখনই দেহ, মন ও আত্মা মিলিয়া সমগ্র অস্তিত্বের রূপান্তর ঘটিতে পারে। অস্তিত্বের এই পরিপূর্ণ রূপান্তরের উপরে হিন্দুধর্মের গুরুত্ব প্রদান বর্তমান জগতের চিন্তাশীল একটি অংশের কাছে আকর্ষণীয় বলিয়া মনে হইয়াছে।

সত্য বিশ্বজনীন

শেষ প্রশ্ন হইতে পারে, নিজের বিশ্বাসকে বিসর্জন না দিয়া অপরের বিশ্বাস উপলব্ধি করা কি করিয়া সম্ভব। তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, সহানুভূতিশীল আগ্রহ দ্বারা তাহা সম্ভব। শুধু বোঝাপড়ার 'আগ্রহ'-এর উপরেই এখানে জোর দেওয়া হইতেছে না, "সহানুভূতিশীল" শব্দের উপরও সমান জোর দেওয়া হইতেছে। সহানুভূতির পূর্বসর্ত আত্ম-অভেদ (self-identification)। ধর্মের জগতে সহানুভূতিশীল বোঝাপড়া বিশ্বজনীন মানবের ধারণায় সাম্য ও ঐক্য অনুভব না করিয়া সম্ভব নয়। "ভগবদ্ অনুগৃহীত" জাতির ধারণা ত্যাগ করিতে হইবে এবং সত্য লাভ করিবার কোন পূর্বনির্দিষ্ট প্রণালী বা সর্ত দূর করিতে হইবে। আকাশে সূর্যের দীপ্তি অপেক্ষা সত্যের দীপ্তি আরও উজ্জ্বল। সত্য বিভিন্ন ঐতিহাসিক পরিবেশে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জাতির কাছে প্রকাশিত হইতে পারে, কিন্তু সত্যের অবাধ অধিকারে বিশেষ কোন মত প্রধান নয়। শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সব পরিবেশে এক—তাহা না হইলে, ইহার সার্বিক রূপ ক্ষুণ্ণ হইবে এবং দেশ-কালের পরিবর্তনের নিয়মের অধীন হইয়া পড়িবে। পৃথক পৃথক দিক হইতে লাভ করা হয় বলিয়াই কোন বিষয়ও যে পৃথক হইবে এমন নয়। বিশেষ কোন মতের জন্য পক্ষপাতিত্ব নানা কারণের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, যথা—বংশধারা, পরিবেশ, দীর্ঘ অভ্যাস এবং বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ধরণের প্রবণতা। কিন্তু সহানুভূতিশীল আগ্রহ আমাদের বুঝাইয়া দেয় যে, কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। একজন ধার্মিক খ্রীষ্টান খ্রীষ্টে বিশ্বাস না করিয়া মুক্তি পাইতে পারে না, কিন্তু তা কখনও একজন হিন্দুকে, যীশুখ্রীষ্টের নীতিতে বিশ্বাস করিতে বাধা দিতে পারে না, বস্তুতঃ তাঁহাদের বিশ্বাস খ্রীষ্টানের মত না হইলেও কোন এক ধরণের বিশ্বাস বটে এবং সার্বিক সত্তার সঙ্গে মানুষ ও জগতের

সম্পর্ক বিচারেই এ বিশ্বাস জন্ম লইতে পারে। দ্রষ্টারা (Prophet) যদি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র হন এবং তাঁহাদের কাছে বিভিন্ন যুগে সত্য প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের সকল যুগে সমস্ত বিশ্বে শ্রদ্ধা করা উচিত। প্রথাবদ্ধ চিন্তার পথ ত্যাগ করিতে প্রস্তুতি, তুচ্ছ পার্থক্যগুলিকে মানাইয়া লইবার ইচ্ছা, এবং সর্বোপরি মানুষের সাম্যকে স্বীকার করিবার সাহস এবং জন্মের পরিবেশ ও কালের আকস্মিক ঘটনার সম্পর্করহিত সত্যে তাহার সমান অধিকার মানুষকে আরও সহিষ্ণুতা ও উপলব্ধির ক্ষমতা দান করিবে। বেদের এই উক্তি বারবার উচ্চারণ করিয়াও যেন আমাদের ক্লান্তি না আসে, "সত্য এক কিন্তু পণ্ডিতেরা বহুভাবে তাহার ব্যাখ্যা করেন।"

ভারতে জৈনধর্ম

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতে হিন্দুধর্মের পাশাপাশি আর যে ধর্মমতগুলি উদ্ভূত হয়েছিল—যেমন জৈন ও বৌদ্ধধর্ম—তাদের পারস্পরিক সম্পর্কটি খুব কৌতূহলোদ্দীপক। ভারতে মৌর্যবংশীয় ও বাঙলায় পাল রাজাদের সময় বৌদ্ধধর্ম রাজধর্মের মর্যাদা লাভ করেছিল ও হিন্দুধর্মের সঙ্গে তার তখনও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কখনও বা উদার সহনশীলতা ও সমন্বয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তুলনায় জৈনধর্ম ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করতে পারে নি। ওর প্রভাব ক্ষুদ্র জনপদ বা লোক-গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমায়িত ছিল। তথাপি আশ্চর্যের বিষয় এই যে প্রত্যেকটি ধর্মের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সুপরিকল্পিত দর্শনতত্ত্ব ও মোক্ষপদ্ধতি, আচার-আদর্শ বিধিবদ্ধ হয়েছিল। হয়ত হিন্দুদর্শনের প্রভাব বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের উপর সহজেই অনুভব করা যায়; কিন্তু ভারতীয় মনীষা প্রতিটি ধর্মের আদর্শ ও সাধন প্রণালী অনুযায়ী এক একটি দার্শনিক মতবাদ ও জীবনচর্চার নির্দেশ অতি সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি ও তত্ত্বদর্শিতার সহিত সুস্পষ্টভাবে স্থির করেছিল। হিন্দুধর্মের ঈশ্বর-কেন্দ্রিক তত্ত্বচিন্তার সহিত তুলনায় বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উল্লেখহীন, আত্মানুশীলনমূলক জীবনসাধনার চিন্তাধারা ও আচার-অনুষ্ঠানগত পার্থক্যটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে উদাহৃত হয়েছে। ঈশ্বরের উপর নির্ভর না করেও, ভগবৎ-উপলব্ধি ও ভক্তিপ্রেরণাকে প্রধান স্থান না দিয়েও উচ্চ আদর্শ-নিয়ন্ত্রিত, ত্যাগ-বৈরাগ্যপূত, জনকল্যাণে উৎসর্গীকৃত জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যে সম্পূর্ণ সম্ভব—বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম তা প্রমাণ করেছে।

যখন দর্শন-আলোচনা বিশুদ্ধ জ্ঞানানুশীলনের আদর্শ থেকে খানিকটা সরে এসে বাস্তবজীবনের প্রেরণারূপে গৃহীত হ'ল তখন লোকাচারে ও জীবন নীতির প্রয়োগে এই তিনটি ধর্মের তাত্ত্বিক বিভেদ এক ব্যবহারিক সমীকরণের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে পড়ল। বিশেষতঃ আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির প্রত্যন্ত-প্রদেশস্থিত ও মিশ্র-জাতি-অধ্যুষিত বাঙলা দেশে এই মিশ্রণ-ক্রিয়া এমন বেমালুম ভাবে ঘটে যে অধুনা-

প্রচলিত নানা রীতি-নীতি ও সমাজপ্রথার মধ্যে ও বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অলক্ষিত প্রভাব আবিষ্কার করা মোটেই বিচিত্র নয়। প্রাচীন যুগে বাঙলা দেশের বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল; হয়ত প্রাকৃত জনসাধারণের অধিকাংশই সে যুগে হিন্দুধর্মাবলম্বী বা বৈদিক আচারনিষ্ঠ ছিল না। যখন পালরাজাদের হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও সমদর্শিতার ফলে ও সেন রাজবংশের নব-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুত্বের রাজসিক আড়ম্বরপূর্ণ পূজাবিধির আনুকূল্যে দেশে হিন্দু-ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'ল, তখনও অহিন্দু রীতিসংস্কারের উপরেই হিন্দুত্বের ক্ষীণ প্রলেপ তাৎকালিক হিন্দুকে চিহ্নিত করেছিল। বিশেষতঃ অপ্রাকৃত বিশ্বাস, ভূত-প্রেত-ডাকিনী তন্ত্রে আস্থা, নানারূপ অভিচারক্রিয়ার প্রচলন, তন্ত্রের বীভৎস অনুষ্ঠান—এ সবই মনে হয় আদৌ অহিন্দু উৎস থেকে উদ্ভূত হয়ে পরে হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হয়। আধুনিক যুগেও হিন্দুদের জটিল আচার-আচরণের মধ্যে কত সংখ্যক বৈদিক সমর্থনহীন, বিশুদ্ধ হিন্দু ক্রিয়াকাণ্ড বহির্ভূত ও প্রতিবেশী ধর্ম হ'তে অজ্ঞাতসারে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তার সঠিক নির্ধারণ খুব দুরূহ।

এই সমীকরণ-প্রক্রিয়া যে বহু পূর্ব হতেই আরম্ভ হয়েছিল তার প্রমাণ দুষ্প্রাপ্য নয়। চর্যাপদে হিন্দু যোগসাধনা, পরমতত্ত্ব উপলব্ধি ও যাগযজ্ঞ প্রভৃতির নিরর্থকতার প্রতি ব্যঙ্গ-মিশ্রিত কটাক্ষ আছে। তবে চর্যাকারদের উপদিষ্ট সাধন প্রণালী যে মূলতঃ হিন্দু সাধনা পদ্ধতি থেকে ভিন্ন, সেরূপ ধারণা কিন্তু জন্মে না। তাঁদের তাত্ত্বিক পরিভাষা পৃথক, কিন্তু এদের পেছনকার সত্যোপলব্ধি হয়ত অভিন্ন। হিন্দুধর্মে ঈশ্বর-উপলব্ধিই পরমপ্রাপ্তি; বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে অবতার-কল্প মহর্ষি-নির্দিষ্ট পথ অবলম্বনেই ঈশ্বর নিরপেক্ষ আত্মজ্ঞান ও উৎসাদিত-প্রবৃত্তি, বিষয়-মোহমুক্ত, নির্বিকল্প জীবন সাধনায় স্থিরত্বলাভ। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এ দশাবতারের মধ্যে বুদ্ধদেবের অন্তর্ভুক্তি কবির অসাধারণ উদারতার চিহ্ন নয়। যুগমানসেরই সমন্বয় প্রয়াসের অভিব্যক্তি। অবশ্য মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে তীব্র বিরোধের ইঙ্গিতেরও অসদ্ভাব নাই, তবে ইহা হয়ত ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের গোঁড়ামি, জনসাধারণের মনোভাবের দ্যোতক নয়। শঙ্করাচার্য বৌদ্ধদের প্রতি যে চোখা-চোখা, তীব্র ঘৃণাব্যঞ্জক অভিধান প্রয়োগ করেছেন তা ঠিক সাম্যভাবের নিদর্শন নয়; আবার তাঁর চেয়ে যাঁরা বেশী গোঁড়া তাঁরাও তাঁকে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ আখ্যায় বিদ্রূপ করেছেন। কোন একজন লেখক জৈনদের সম্বন্ধে এমন চরম অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছেন যে, তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য কোন

হিন্দুর আজীবক-মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ করেছেন। তবে মনে হয় যে. এই সমস্ত উচ্ছ্বাস সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের শান্ত নদীর উপর সাময়িক তুফান মাত্র।

হিন্দুধর্মের সঙ্গে তুলনায় বৌদ্ধ, বিশেষতঃ জৈন ধর্মে, মৈত্রী করুণা অহিংসা ত্যাগ ক্ষমা প্রভৃতি মানব প্রকৃতির সাত্ত্বিক গুণগুলির উপর খুব বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। হিন্দুধর্ম ভক্তিবাদ ও ঈশ্বরানুগত্যের প্রতি প্রাধান্য আরোপ করেছে বলে এই সমস্ত গুণকে আনুষঙ্গিক বলে মনে করেছে। অন্তরে ভগবচ্চেতনা জাগ্রত হলে এদের স্বতোবিকাশ ঘটবে; তাঁকে পেলেই যখন সব পাওয়া যাবে তখন এদের স্বতন্ত্র অনুশীলনের বিশেষ প্রয়োজন কি? অবশ্য এই প্রত্যাশা যে সব সময় পূর্ণ হয়েছে তা' নয়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ঈশ্বর-নিরপেক্ষ ভাব পোষণ করে বলেই এই মানবিক ভাবচর্চা ও আত্মানুশীলনের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। হিন্দুধর্মের মধ্যে ত্যাগ, বৈরাগ্য প্রভৃতির যে প্রশস্তি ঘোষণা করা হয়েছে তা অনেকাংশে অপরধর্ম প্রভাবিত। আমাদের সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাস হিন্দু-ধর্মাদর্শের নাম ব্যবহার করলেও প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের কৃচ্ছ্রসাধন ও আতিশয্যের চিহ্নাঙ্কিত। "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়", রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি বোধহয় হিন্দুধর্মেরই মূলকথা। বৈষ্ণব সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্মের মুণ্ডিত মস্তক ও গেরুয়া আঙরাখা গ্রহণ করেছে, কিন্তু এই বহিরাবরণের তলে রসোচ্ছল প্রেমের অনুরাগরঞ্জিত অন্তর্বাসে তাদের অবেগস্পন্দিত হৃদয়টিকে আচ্ছাদন করেছে। বৈষ্ণব সাধক জীবনের রসকে ভগবানে সমর্পণ করে, রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমলীলা মাধুরীতে অভিষিক্ত করে আস্বাদন করে, ভগবানের বেনামীতে শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর হৃদয়বৃত্তিগুলির অনুশীলন করে, মায়া-মমতার পাকে পাকে ভগবানকে শুদ্ধ জড়িয়ে ধরে। এইরূপ জীবনসাধনা সংসার-বিমুখ হলেও সংসার-রসে নিষিক্ত। শাক্তেরাও বিশ্বের মূলীভূত মাতৃশক্তিকে পারিবারিক মমতাবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত করে হৃদয়াবেগকে পুষ্টই করেছে, উপবাসশীর্ণ করে নি। জৈনধর্ম বিশেষতঃ দয়া, নির্লোভতা, অহিংসা প্রভৃতির অনুশীলনের জন্য অত্যন্ত খুঁটিনাটি বিধিনিষেধ রচনা করেছে ও এদের জীবনচর্যার প্রধান উপাদানের মর্যাদা দিয়েছে। আমরা যেখানে প্রদীপ জেলে প্রতিমার আরতি করেছি ও তাঁর মুখের উপর ওর উজ্জ্বল আলোকশিখা নিক্ষেপ করেছি, জৈনসাধক সেখানে অন্তরে দীপ জেলে একে সযত্নে সমস্ত বহির্বিক্ষেপের বায়ুপ্রবাহ থেকে রক্ষা করেছেন ও প্রশান্ত আত্মসমীক্ষার উদ্দেশ্যে একে ব্যবহার করেছেন। বরং পরবর্তীযুগে বৌদ্ধধর্ম

হিন্দুর মূর্তিশিল্প, ভক্তিসাধনা ও অলৌকিক বিশ্বাস গ্রহণ করে প্রবলতর হিন্দুধর্মের মধ্যে আত্মবিলুপ্তি ঘটিয়েছে। কিন্তু জৈনধর্ম অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েও নিজ আদর্শ ও রীতি-আচার অবিকৃত রেখেছে ও নিজের জীবনাদর্শের স্বাতন্ত্র্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। জৈন উৎসবগুলিতে নিজ চিরনির্দিষ্ট পন্থা অবিচল আছে ও অন্য ধর্মের উৎসব অনুষ্ঠানের সংমিশ্রণ ঘটায়নি। জৈন ধর্মের এই অক্ষুণ্ণ আদর্শানুস্থিতি ভারতের ধর্মবৈচিত্র্য রক্ষার সহায়ক হয়েছে।

কিছুদিন পূর্বে জৈনধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য এক মহৎ ধর্মসম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল। এর ফলে জৈনধর্ম সম্বন্ধে আমাদের কিছু কৌতূহল জেগেছে, কিছুটা জ্ঞানবৃদ্ধিও হয়েছে। এর শ্রেষ্ঠ রীতি-নীতি ও আচার ব্যবহার যাতে ভারতীয় জনসাধারণের ধর্মবোধ ও জীবনচর্চার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়, সেদিকে লক্ষ্য করলে আমাদের সামাজিক আচরণের মানের অনেক উন্নতি হবে। এর দর্শনতত্ত্ব ও শীলাচারের সঙ্গে পরিচিত হলে আমাদের মধ্যে কি জাতীয় জৈন প্রভাব অজ্ঞাতসারে ক্রিয়াশীল আছে সে সম্বন্ধেও একটা সুস্পষ্ট ধারণা হতে পারবে। জৈনতত্ত্বে বিশেষজ্ঞপ্রধান পণ্ডিত শ্রীপুরণচাঁদ শ্যামসুখা জৈনধর্ম সম্বন্ধে বাঙলা ও ইংরেজিতে অনেকগুলি প্রামাণ্য ও সুলিখিতগ্রন্থপ্রণয়ন করে আমাদের জ্ঞানপিপাসা পরিতৃপ্ত করতে প্রচুর সহায়তা করেছেন। এই মূল্যবান কাজের জন্য তিনি প্রত্যেক সংস্কৃতি অনুরাগী বাঙালীর বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাবার জন্য সম্প্রতি যে স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন হচ্ছে সেটি প্রকাশিত হলে জৈন সংস্কৃতি ও জীবননিষ্ঠা সম্বন্ধে আমরা অনেক বেশী জ্ঞান অর্জন করতে পারব। এই জ্ঞানপ্রবীণ ধর্মতত্ত্ববিৎ মনীষীকে সম্মান দেখিয়ে আমরা একটি অবশ্য পরিশোধ্য ঋণ পরিশোধ করছি। আমি সকলের সঙ্গে এক হয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি।

সঙ্গীত ও তার ভাষা

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমাবেশে সঙ্গীত এই অভিধান ও অর্থের নিদর্শন পাই খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতকের সূচনায়। শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত-রত্নাকরেই মনে হয় স্পষ্টভাবে "ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে" শব্দগুলির উল্লেখ দেখতে পাই। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে খ্রীষ্টীয় ১৩ শতকের আগে 'সঙ্গীত' এই শব্দ বা পরিভাষা তার অন্তরার্থ নিয়ে ছিল না। 'সঙ্গীত' শব্দের উল্লেখ রামায়ণ-মহাভারতে এবং খ্রীষ্টীয় শতকের নাট্য-শাস্ত্রেও পাওয়া যায় এবং অন্যান্য সঙ্গীতগ্রন্থে পৃথক পৃথকভাবে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের উল্লেখও পাওয়া যায়, কিন্তু তিনটি সমবেত রূপ 'সঙ্গীত'—সম্ + গীত এ'ধরণের উক্তি স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। নাট্যশাস্ত্রে গান্ধর্বশ্রেণী গান তথা গান্ধর্বের পরিচয় দিতে গিয়ে মুনি ভরত বলেছেন—'স্বরতালপদাশ্রয়ম্', অর্থাৎ গান্ধর্বগান স্বর + তাল + পদ এই তিনটির আশ্রয় বা 'স্বরতালপদাত্মকম্'—স্বর, তাল ও পদেরই অভিন্ন রূপ। কিন্তু নৃত্য, গীত ও বাদ্য এবং স্বর, তাল ও পদ এরা ঠিক একার্থক নয়, বরং ভরত নিজেই স্বর, তাল ও পদ বলতে কি বোঝায় নাট্যশাস্ত্রে তার পরিচয় দিয়েছনে। তবে গান্ধর্বের পরিচয়ে ভরত "গান্ধর্বং ত্রিবিধং বিদ্যাৎ" এ'অর্থকেই বিশেষভাবে মেনে নিয়েছেন।

গান্ধর্ব, গান, মার্গ, দেশী এ'সমস্তই 'সঙ্গীত'-শব্দের অন্তর্ভুক্ত। 'পদ' শব্দটি প্রাচীন ও নবীন এই উভয় সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্রে গান্ধর্বের পরিচয়ে ভরত পদের অর্থ করেছেন ব্যঞ্জনাদি স্বর, সন্ধি, বিভক্ত, ছন্দ, বৃত্ত প্রভৃতি। কিন্তু রামায়ণাদি মহাপুরাণে, সংস্কৃত কাব্য ও নাটকে এবং পরবর্তী সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে 'পদ' গীত বা গানের বোধক অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। সাহিত্যে হয়তো পদ অর্থ (—অর্থ-প্রকাশকং 'পদম্') এবং সঙ্গীতে গানের প্রকাশক হিসাবে 'পদ' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। মঙ্গলপদ, চর্যাপদ, মহাজনপদ, ধ্রুবপদ প্রভৃতি শব্দে পদ 'গান' বা গীতিরই বোধক,—যদিও গান ও গীতি শব্দ-দুটির মধ্যেও অর্থের কিছুটা পার্থক্য দেখা

যায়। সঙ্গীতে পদ অর্থে আবার অংশ ও ভাগেরও ('ধাতু') বোধক—যেমন গীতিপদ। মোটকথা পদ অর্থে অনেক সাহিত্যে ও বিশেষ কোরে বৈষ্ণব-সাহিত্যে 'গান'-কেই বোঝানো হয়েছে।

আগেই বলেছি যে 'পদ' গান বা গীতিই বোঝাক কিন্তু তা 'সঙ্গীত' এই ব্যাপক শব্দের অন্তর্গত। নাট্যশাস্ত্রের 'স্বর-তাল-পদাশ্রয়ম্'-শব্দে পদের অর্থ ভিন্ন হোলেও 'পদ' কিন্তু গান্ধর্বগীতিশ্রেণী বা গান্ধর্বগণের অন্তর্ভুক্ত।

এখন সঙ্গীতের ভাষা কি তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। বিষয়টি কিন্তু বেশ জটিল ও বাদানুবাদসম্পৃক্ত, কেননা অন্তত ভারতীয় সঙ্গীত রাগবস্তুকে নিয়েই সার্থক ও প্রাণবান। রাগ স্বরের সমবেত মূর্তি এবং স্বরও শ্রুতির মিলিত রূপ। তবে প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রীদের অভিমতে শ্রুতি সূক্ষ্ম হোলেও তা স্বর, কেননা 'স্বর'-পর্যায়ভুক্ত অথবা জাতিভুক্ত না হোলে তার স্বর সৃষ্টি করার যোগ্যতা বা সামর্থ্য থাকতো না। শ্রুতি স্বরানুসঙ্গী বোলে স্বর একদিক থেকে বিশেষ্য এবং শ্রুতি বিশেষণ। বিশেষ্য-বিশেষণ-সম্বন্ধ ছাড়া কার্য-কারণসম্বন্ধও স্বীকৃত। মোটকথা যেদিক দিয়েই হোক শ্রুতি যে স্বর—তবে সূক্ষ্ম এ'বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নেই। কিন্তু শ্রুতি সূক্ষ্মস্বর কিনা এ'নিয়েও মত-মতান্তরের অন্ত নেই।

এবার আমাদের আসল আলোচ্য বিষয়েই আসা যাক্। সঙ্গীতের ভাষা কি? সঙ্গীতের ভাষা আমরা মোটামুটি তিন রকমভাবে দেখতে পারি: (১) সঙ্গীতের ভাষা শাশ্বত আনন্দের আকর এবং পরমপুরুষ বা পরমাত্মা সঙ্গীতে তিনি শব্দব্রহ্ম; (২) রাগ ও রাগের অপার্থিব রস ও ভাব এবং তার অনুভূতি; (৩) স্বর ও সাহিত্যের সমন্বিত অর্থ, ভার ও প্রকৃতি। (১) প্রথম, সাঙ্গীতিক ভাষা সঙ্গীতের চরমলক্ষ্য; (২) দ্বিতীয়, সঙ্গীতে রাগ, তার স্বরের লীলায়ণ, বিস্তৃতি ও রসমাধুর্য এবং (৩) তৃতীয়, রাগের সঙ্গে সাহিত্য তথা কথার যে মৈত্রীভাব তার অর্থ ও রস-গ্রহণ। সাধারণত দ্বিতীয় ও বিশেষভাবে তৃতীয় পর্যায়ের ভাষাই সকলের কাছে প্রিয় ও বোধগম্য। অবশ্য দ্বিতীয় পর্যায়টি বেশী কোরে গ্রহণ করেন সঙ্গীতসমাজে প্রাচীনপন্থীরা এবং তৃতীয়টি গ্রহণ করেন নব্য-সঙ্গীতসাধক ও সঙ্গীতসেবীদের সঙ্গে সর্বসাধারণ। তবে প্রথম পর্যায়টি গ্রহণ করে সঙ্গীতের যথার্থ সাধক ও অনুশীলক।

সঙ্গীতের দ্বিতীয় পর্যায়ের যাঁরা সমর্থক তাঁদের কথারই অবতারণা করি প্রথমে। সঙ্গীতের তথা রাগের অনুশীলনে কথা বা সাহিত্যের চাহিদাকে যাঁরা গৌণ মনে

করেন; তাঁরা বলেন নিরালার যেমন একটি নিজস্ব ভাষা আছে, সুর তথা রাগেরও তেমনি। প্রতিটি স্বরের ও সমবেত স্বরমূর্তি রাগের রূপের সঙ্গে সঙ্গে রস ও ভাবমূর্তির সন্দর্শন ও উপলব্ধজনিত আনন্দ লাভকেই রসিক প্রাচীনপন্থীরা সঙ্গীত-সাধনার কাম্য বলেন। তাঁদের মতে সঙ্গীতের ভাষাই তাই,—রাগরূপের অতীন্দ্রিয় দর্শন ও স্পর্শন। অবশ্য রাগমূর্তির উপাদান স্বর ও লীলায়ণভঙ্গী ইন্দ্রিয়ের গোচর এবং তাঁরা বলেন এই ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুই যখন অতীন্দ্রিয় আনন্দের শিহরণ ও শাশ্বত পুলক জাগায় তখনই সঙ্গীতে ভাষা হয় মুখর ও সার্থক। তাঁদের মতে সাহিত্য সুরের ভাষা যোগাতে অক্ষম আর যতটুকু জোগায় তা পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে জড়িত সুতরাং অপার্থিবের কোন সন্ধান দিতে পারে না, কিন্তু সুর তথা রাগের রহস্যময়ী ভাষাই প্রাণের খোরাক!

কিন্তু নব্যপন্থী ও সর্বসাধারণের যুক্তির মূল্যও কম নয়। তাঁরা বলেন ভাষার সৃষ্টি সমাজবাসী মানুষ করেছে তার পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের জন্য মূক বা বোবা কথা বলতে পারে না, কিন্তু তাহলেও ভাবপ্রকাশের জন্য সে Symbolic Language বা সাংকেতিক ভাষার আশ্রয় নেয়। ভাষা ভাবের বাহক যাকে ইংরাজীতে আমরা বলতে পারি Sign বা Symbol। Symbol বা প্রতীক বা প্রতিকৃতি যা অজানা তাকে জানায় আর অজানাকে জানিয়ে দেয় বলেই symbol প্রতীক। ভাষাও তাই। সঙ্গীতের, সুরের বা রাগের একটি নিজস্ব ভাষা আছে সত্য, কিন্তু সে ভাষা সকলের কাছে বোধ্য বা পরিজ্ঞাত নয়, আর তারি জন্য তাকে জানার ও বোঝার জন্য দরকার হয় ভাষার তথা সাহিত্যের মাধ্যমে, সাহিত্য চিরদিনই সুরের অনুগামী ও সহচর। সুরের স্বচ্ছন্দগতির প্রতিবন্ধক তা কোনদিনই নয়। কবিগুরুর ভাষায় সুর ও কথা হোল একই আকাশচারী বিহঙ্গমের দুই পক্ষ, একটিকে ছেড়ে অপরটির গতি হয় পঙ্গু। সঙ্গীতের সুরকে সাধারণের বোধ্য করার জন্য কথা বা সাহিত্যের দরকার আর তারি জন্য সঙ্গীতের আসল ভাষা অতীন্দ্রিয় আনন্দলোক স্পর্শ করালেও ব্যবহারিকভাবে রাগ তথা সুর ও কথার মিথুনরূপই স্বীকার্য। তাহলে কথা দাঁড়ালো আমাদের সঙ্গীতের ভাষা প্রধানতঃ তিন রকম এবং সাধারণের দরবারে তা সুর ও কথার মিশ্রণ রূপ।

এখন এখানেই বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য সার্থক হয় কিনা তাহা বিবেচনার যোগ্য। সুরের বা রাগের একটা সার্থকতা ও অর্থ আছে, আবার কথা তথা ভাষারও একটা সার্থকতা ও কার্যকারিতা আছে এবং দুয়ের মিশ্রণে হয়তো

সঙ্গীতের নিজস্ব ভাষার একটা অর্থসঙ্গতি সম্ভব। কিন্তু মরমী সঙ্গীতদর্শীর কাছে সঙ্গীতের ভাষা অনেকটা প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের সঙ্গীতসেবীদের দৃষ্টির মতো। সুর তথা রাগের একটি নিজস্ব গোপন ভাষা আছে এবং সে ভাষা মানুষের জীবনের গূঢ়তম ভাষা যা জীবন-মরণের সমস্যার সমাধান ও শাশ্বত শান্তির আশ্বাস এবং সঙ্গে সঙ্গে পরমতত্ত্ব আত্মার কল্যাণময় আশীর্বাদ। তাই ভারতের আত্মদর্শী মনীষীরা সঙ্গীতকে শুধুই সুরের কাঠামো বলেন নি। তাঁরা তাদের ধ্যানশ্লোক ও মূর্তি কল্পনা করেছেন ভাবসমৃদ্ধ মন ও দৃষ্টি নিয়ে। তাঁরা বলেন ভারতীয় সঙ্গীতের রাগ প্রাণবান ও সচল ; রাগের আলাপে ভাবের ও প্রাণের আদানপ্রদান করে রাগ-রাগিণীরা সাধনসিদ্ধ শিল্পীদের সঙ্গে, জীবনকে করে মধুময় ও দুঃখময় সংসারেও চির-আনন্দময়। তাই সঙ্গীতের ভাষা কেবলি সুর নয় বা সাহিত্য-নয়, অথবা সুর ও সাহিত্যের মিথুনরূপ নয়, তাদেরও অতিক্রান্ত রসময় ভাব ও জ্ঞান, বা তার অনুভূতি। ভারতীয় সঙ্গীতের ভাষা তাই শিল্পী ও সুরসেবীকে করে মানুষের ওপরেও অতিমানুষও, দেয় অনন্ত সুরের ব্যঞ্জনা ও আনে অন্তরে বন্ধনমুক্তির কল্যাণময়ী কামনা।

আর্নেস্ট হেমিংওয়েঃ মৃত্যুজন্ত্রনা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

"I was trying to learn to write, commencing with the simplest things, and one of the simplest things is violent death. It has none the complications of death by disease, or so-called natural death, or the death of a friend or someone you loved or have hated, but it ts death nevertheless, one of the subjects that a man may write of."

স্প্যানীশ বুলফাইটিং সম্পর্কে লেখা বিশাল বই 'ডেথ ইন্ দি আফটারনুনে' সাহিত্য রচনার মৌল প্রেরণা সম্পর্কে এই হল আর্নেস্ট হেমিংওয়ের কথা। যে মৃত্যু ভয়ঙ্কর এবং প্রচণ্ড—যাকে বলা যেতে পারে উলঙ্গ বিশুদ্ধ মৃত্যু, তারই রূপ তিনি জীবনে প্রধানভাবে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। বিভিন্ন যুদ্ধের রণাঙ্গন থেকে পশু মানুষের রক্ত ঝরা মাদ্রিদ রিঙে তাই বারবার তাঁর পরিক্রমা। বাষট্টি বৎসর বয়েসে নিজের বন্দুকের গুলিতে দুর্ঘটনায় বা আত্মহত্যায় হেমিংওয়ে কি সেই বিশুদ্ধ উলঙ্গ মৃত্যুকেই চু চোখ ভরে দেখে গেলেন ?

স্বয়ং হেমিংওয়ে ছাড়া এ প্রশ্নের উত্তর আর কেউ দিতে পারবে না। এবং হেমিংওয়ের কাছ থেকে সে উত্তর আমরা কেউ আর কোনো দিনই পাব না।

সাহিত্যিক হিসেবে হেমিংওয়ের কৃতিত্ব ঈর্ষা করবার মতো। 'দি সান অল্সো রাইজেজ্' নামে রোম্যান্টিক গল্পটি থেকে আরম্ভ করে 'দি ওল্ডম্যান অ্যাণ্ড্ দি সী'র মতো অসামান্য সৃষ্টিটি পর্যন্ত তিনি প্রায় নিরবচ্ছিন্ন জনপ্রিয়তা ভোগ করে গেছেন। 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্ম্স্', 'গ্রীন হিল্স অব আফ্রিকা', 'দি ফিফ্থ্ কলাম' কিংবা 'ফর হুম দি বেল টোল্স' খ্যাতি এবং অর্থের অপরিমেয় উপচার সাজিয়ে এনেছে তাঁর কাছে। পুলিটজার প্রাইজ পেয়েছেন, 'দি ওল্ড্ম্যান অ্যাণ্ড দি সী' সর্বদেশের সাহিত্যিকের কাঙ্ক্ষিত নোবেল পুরস্কার

এনে দিয়েছে তাঁর হাতে। লেখকরূপে হেমিংওয়ের মতো ভাগ্যবান পৃথিবীতে খুব বেশি নেই।

শিল্পরীতিতে হেমিংওয়ে ছিলেন গারট্রুড্ ষ্টীনের শিষ্য। আর এই গারট্রুড্ ষ্টীনই তাঁকে প্রথম আকর্ষণ করেছিলেন বুলফাইটিঙের অভিমুখে। অর্থাৎ রূপকলায় এবং সাহিত্যবিবেকে এই মহিলাই চেতন বা অচেতন ভাবে হেমিংওয়ের পরিণাম যেন নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। আশ্চর্য এই প্রভাব—অপূর্ব এই ভাগ্যনির্দেশ।

'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস্'-কিংবা 'ফর হুম দি বেল টোলস্' অপরিসীম অর্থসৌভাগ্য বয়ে এনেছে হেমিংওয়ের জন্যে। কিন্তু মূলত হেমিংওয়ে ঔপন্যাসিক হিসেবে খুব স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব নন। যুদ্ধ এবং মানবতার সম্পর্ক নির্ণয়ে মহত্তম উপন্যাস রচনার গৌরব দাবি করবেন এরিখ্ মারিয়া রেমার্ক, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস 'দি নেকেড্ অ্যাণ্ড্ দি ডেড্'-এ বৃহত্তর শিল্প-সার্থকতার দাবি জানাবেন নরমান মেলার, এরেনবুর্গের 'দি ফল অফ্ পারী' অথবা জাঁ পল সার্ত্রের ত্রি-গ্রন্থের তৃতীয় 'আয়রণ ইন্ দি সোল্' প্রৌঢ়তর প্রতিভায় উজ্জ্বল। উপন্যাস রচনায় আমেরিকা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খুব বেশি গৌরব দাবী করতে পারে না; তবু ড্রেইজারের 'সিসটার ক্যারী' আছে, আপটন সিন্‌ক্লেয়ারের 'অয়েল' আছে, সিনক্লেয়ার লুইয়ের 'ব্যাবিট' কিংবা 'অ্যারোস্মিথ' আছে, ডস প্যাসোজ বা হাওয়ার্ড ফাস্টও স্মরণীয়। ঔপন্যাসিক হেমিংওয়েকে এঁদের সমপর্যায়ী বলা কঠিন। তাঁর 'দি ওলড্ ম্যান অ্যাণ্ড দি সী' পড়তে পড়তে হারম্যান মেলভিলের 'মবি ডিক'কে অপরিহার্যভাবেই মনে পড়বে। হেমিংওয়ের সূক্ষ্ম সৌকুমার্য, তাঁর সুদীর্ঘ অনুশীলিত শিল্পকুশলতায় মন মুগ্ধ হবে বারবার, একটি আশ্চর্য নিপুণ ছোটগল্প পড়বার তৃপ্তিতে পাঠক স্নিগ্ধ হয়ে উঠবেন, কিন্তু 'মবি ডিকে'র বিশালতা—তার মহিমান্বিত বিপুল ঐশ্বর্য হেমিংওয়ের লেখাটিতে পাওয়া যাবে না।

'মবি ডিকে'র প্রেক্ষাভূমিতে কিউবার সমুদ্র-ধীবরের কাহিনীটি তুলে ধরলেই শিল্পী হেমিংওয়ের যথার্থ সত্তাটি সাহিত্য পাঠকের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়। আমাদের এই বাংলাদেশের মতো আমেরিকাতেও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফসল ছোট গল্প। মার্কিনী প্রতিভা কেন ছোট গল্প রচনাতেই একান্ত স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, বহুকাল আগেই তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে একটি সত্য সিদ্ধান্তে

পৌঁছেছিলেন জেম্‌স ফেনিমোর কুপার। তিনি বলেছিলেন এই নবজাত দেশ এবং জাতি কোনো বিরাট ঐতিহ্যের অধিকারী নয়; রহস্যময় প্রাচীন প্রাসাদ, রাজবংশের উত্থান-পতন—নানা অধ্যায়ে অধ্যায়ে পর্বে পর্বে ইতিহাসের বিচিত্র রেখাঙ্কন, নিরবধি কালের অসংখ্য দ্বন্দ্বমুখরতা ইয়োরোপে উপন্যাসের যে মহতোমহীয়ান লীলাভূমি রচনা করে রেখেছে, তার দুর্লভ উত্তরাধিকার থেকে আমেরিকা বঞ্চিত। তাই দৈনন্দিনতার আশ্রয়ে, পরিচিত নর-নারীর ছোটখাটো আন্তর ও বহির্দ্বন্দ্বে ছোটগল্পেই মার্কিনী লেখকের স্বাভাবিক প্রতিভার উৎসার। এ কালের আমেরিকা সম্পর্কে এ সিদ্ধান্তের সত্যতা সম্পূর্ণ স্বীকার্য নয়, কিন্তু ক্রমিক অনুবর্তনের ফলে আজ আমেরিকাতে ছোট গল্পের শৈল্পিক সিদ্ধি যে সম্পূর্ণ অর্জিত হয়েছে, এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে। পো এবং হথর্ণে এই সগৌরব সূচনা। ব্রেটহর্টে—হেন্‌রি জেম্‌সে এর দীপ্ত বিকাশ এবং হেমিংওয়েতে এসে এর সর্বোজ্জ্বল উদ্ভাসন। ঔপন্যাসিক হেমিংওয়ের পরিচয় যা-ই হোক, এ যুগের তিনি শ্রেষ্ঠ ছোট-গল্প লেখক।

গল্প লেখক হিসেবে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হেমিংওয়ের স্টাইল। অপূর্ব দ্যোতনাময় গভীর ভাষা, সূক্ষ্ম ইঙ্গিত, নিগূঢ় ব্যঞ্জনা। ব্যক্তিমানুষ হেমিংওয়ের অভিজ্ঞতার সীমা নেই। সৈনিক এবং রিপোর্টার রূপে যুদ্ধের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়, স্পেনের রক্তক্ষয়ী বুল-ফাইটে তাঁর সপ্রেম উপস্থিতি, শিকারীর বন্দুক হাতে আফ্রিকার গহন অরণ্যে তাঁর বিচরণ, ইয়োরোপের অন্যতম মর্মকেন্দ্র পারীর সঙ্গে তাঁর আত্মার আত্মীয়তা, কিউবায় সুদীর্ঘ বসবাসের ফলে স্থানীয় জালিক জীবনের সঙ্গে তাঁর ঘন সান্নিধ্য। এই অভিজ্ঞতার বিপুল সঞ্চয়কে তিনি বিধৃত করেছেন গার্ট্রুড ষ্টীন এবং জন ডস্‌-প্যাসোজ প্রমুখ বুদ্ধিবাদীদের মার্জিত মনন ও পরিশীলতা কলারীতির সূত্রে। তাই যে-কোনো ধরণের ছোট গল্পেই তাঁর স্বচ্ছন্দবিহার। 'ফিফ্‌টি গ্র্যাণ্ড' কিংবা 'দি কিলার্স' জাতীয় দুর্বৃত্ত-প্রধান ভায়োলেণ্ট্‌ গল্পে, 'দি লাইট্‌ অব্‌ দি ওয়ার্ল্ড'র তিন গণিকার সাংকেতিকতায়, 'দি সান অল্‌সো রাইজেজ্‌'-এর রোমান্টিক্‌ মাধুর্যে, 'দি স্নোজ্‌ অব কিলিমঞ্জারোর' অপরূপ মৃত্যু-জল্পনায় অথবা 'মেন উইদাউট্‌ উয়োমেনের' কতগুলি গল্পের সূক্ষ্মতম ব্যঞ্জনায় (যেমন 'দি ব্যাবাল স্টোরি')—সর্বক্ষেত্রের তাঁর যেমন বিস্ময়কর তেম্‌নি ঈর্ষাযোগ্য সফলতা।

ঠিক পূর্ববর্তী যুগে আন্তন চেকভ (কিছু পরিমাণে মপাসাঁ এবং হেন্‌রী

জেম্‌স-ও) পৃথিবীর সমস্ত দেশের গল্প লেখকদের ওপরে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। আধুনিককালে এই কৃতিত্ব হেমিংওয়ের। অন্তত পঁচিশ বৎসর পৃথিবীর গল্পরাজ্যে অসপত্ন সিংহাসন ভোগ করেছেন তিনি। অসংখ্য লেখক তাঁর গল্পরীতিকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন সার্থক ও ব্যর্থরূপে, আর এই অনুকরণ প্রয়াস দেখে সকৌতুকে প্রশ্ন করেছেন সমালোচক মরিস বোডিন ঃ "The interest of such technical finangling is primarily statistical : How many Hemmingway stories were written last year by writers other than Hemmingway ?"

প্রচণ্ড মৃত্যুর বিশুদ্ধ রূপ হেমিংওয়েকে যুদ্ধক্ষেত্রে ডাক পাঠিয়েছে, বুলফাই-টিঙের পর রক্তাক্ত পিকাডোর, গ্র্যানেরোর মুমূর্ষু দেহ তাঁর স্নায়ুকে উত্তেজিত করেছে, আফ্রিকার অরণ্যে রাইফেল হাতে হেমিংওয়ে নিজের স্নায়ুচক্রে আদিমতার তরঙ্গ গর্জন শুনেছেন। কিন্তু এই কি হেমিংওয়ের শিল্প-বিবেক ? এর অতিরিক্ত কি কিছুই নেই ?

যে বলিষ্ঠ প্রবল জীবনের মধ্যে, রুদ্র মৃত্যুর দ্বারা রোমাঞ্চিত হয়ে হেমিংওয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন, সেখানে আর যাই থাক—মনুষ্যত্ব সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। সেই শ্রদ্ধার আরতি স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের আশ্রয়ে লেখা তাঁর 'ফর হুম দি বেল টোল্‌স্।' প্রাইমো-ডি-রিভেরার পতনের পর স্পেনের রাজনৈতিক আকাশে ঝড়ের কালো মেঘ ঘনিয়ে এল। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত গণতান্ত্রিক সাম্যবাদী শক্তির সঙ্গে হিট্‌লার এবং মুসোলিনীর পক্ষপুটাশ্রয়ী ফাসিস্ট্ ফ্রাঙ্কোর সংগ্রাম চলল। এই গণতান্ত্রিক শক্তির সহায়তার জন্য পৃথিবীর নানাদেশ থেকে যে ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড্ স্পেনে গিয়েছিল—সেই সৈনিকদের মধ্যে র‍্যাল্‌ফ্ ফক্স, ক্রিস্টোফার কড-ওয়েল, জাঁ পল্ সার্ত্র এবং আর্নেস্ট হেমিংওয়ে প্রমুখ কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবাদী। সেই যুদ্ধে হেমিংওয়ে কেবল নিজেকেই নিয়োগ করেন নি, প্রচুর অস্ত্র দিয়েও সাহায্য ক'রেছিলেন গণতান্ত্রিক বাহিনীকে। তবুও স্পেনের বুকে ফ্রাঙ্কোর সামরিক শাসন কায়েমী হয়ে আসন পাতল আর আমৃত্যু হেমিংওয়ে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত ঘৃণা বহন ক'রে গেলেন। কিউবায় কাস্ত্রোর সাম্যবাদী শক্তির প্রতিষ্ঠা তাই হেমিংওয়ের অন্তরের অভিনন্দন থেকে বঞ্চিত হয় নি। সারা পৃথিবীর প্রগতিশীল মানুষ এই ফ্যাসিবিরোধী মানবতাবাদী শিল্পীকে চিরকাল কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে।

তবু শেষ পর্যন্ত এ কথা কিছুতেই ভোলা যায়না যে হেমিংওয়ের শিল্পলোকে মৃত্যুই তাঁর জীবন দেবতা। এই মৃত্যুর মহিম মূর্তি তাঁর অধ্যাত্ম দিগন্তের ধ্রুব-তারা। তাঁর নিজের কথায় ঃ All stories, if continued far enough, end in death, and he is no storyteller who would keep that from you." যে মানুষ একচারী—স্ত্রী-পুত্র-সংসারের মধ্যে নিস্তরঙ্গ স্তিমিত যার জীবন, বৈচিত্র্যের বুকে—প্রচণ্ডতার ভেতরে যে অপরিব্যাপ্ত, তার মৃত্যুই সব চাইতে করুণ। "There is no lonlier man in death, except the suicide, than that man who has lived many years with a good wife and then outlived her."

বাষট্টি বৎসর বয়সে আজ হেমিংওয়ে কি স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের মধ্যে সেই একচারিতার নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা অনুভব করছিলেন? তাই কি নিজের হাতেই সেই দুঃসহ নৈঃশব্দ্যের উপরে তিনি যবনিকা টেনে দিয়েছেন?

'দি স্নোজ অফ কিলিমঞ্জারো' গল্পটিতে আফ্রিকার অরণ্য ছায়ায় একটি সবুজ তাঁবুর ভেতরে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে লেখক হ্যারী। তার বিচিত্র উদ্দাম জীবনে কাউকে সে ভালোবাসেনি, কোনো রাত্রির সঙ্গিনীকে পরদিন প্রভাতে মনে রাখেনি সে। তবু আফ্রিকার এই বিবিক্ত পরিবেশে ধীরে ধীরে একটি নারী তাকে নিঃশব্দ স্নেহজালে জড়িয়ে ফেলছে—তার মুক্ত নির্মম জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে আনছে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আর একচারিতার খাতে। হ্যারীর অসহ্য মনে হয়। অর্ধজাগরের মধ্যে সেই সব তুষারাচ্ছন্ন রাত্রি দিনের স্মৃতি তার চেতনায় জেগে ওঠে—যেখানে তার বেপরোয়া পদচিহ্নগুলি ফুটে উঠেছে আর মিলিয়ে গেছে নবীনতর তুষার-বর্ষণে।

তারপর এলো মৃত্যু। অন্তিম স্বপ্নে হ্যারী দেখতে পেলো বন্ধু কম্পটন তার ছোট বিমানটিতে করে তাকে নিয়ে যেতে এসেছে। সে বিমানে মাত্র একজনেরই জায়গা হয়! পড়ে রইল হেলেন, পড়ে রইল আফ্রিকান বনভূমিতে ছোট ছোট সবুজ তাঁবুগুলি—তাকে নিয়ে কম্পটনের বিমান আকাশে উঠল। কিন্তু বিমান এ কোন্‌দিকে চলেছে? হ্যারী ভাবল, এ তো পথ নয়। এমন সময় চালক কম্পটন হেসে মুখ ফেরালো তার দিকে, আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে দিগন্ত জুড়ে অবিশ্বাস্য শুভ্রতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিলিমঞ্জারোর তুষার শিখর—যার পশ্চিম চূড়ার নাম মাসাই ভাষায় 'ঈশ্বরের আবাস।' 'Then he knew that

there was where he was going'—আর কম্পটন সেই তুষারাচ্ছন্ন মৃত্যুলোকের দূত !

আজ হেমিংওয়েও কি উনিশ হাজার সাতশো দশ ফুট ওপরে মৃত্যুর তুহিন চূড়োয় যাত্রা করেছেন—যেখানে একটা হিংস্র চিতাবাঘের দেহ কোন্ দুর্বোধ রহস্যে অনন্তকাল ধরে বরফের মধ্যে স্থির স্তব্ধ হয়ে আছে? আর কে সেই বৈমানিক যে সেই একক যাত্রায় মৃত্যুলোকে নিয়ে চলেছে তাঁকে? স্পেনের বুলফাইটিঙে নিহত জোসেলিতো? ম্যানুয়েল গ্রানেরো?

এ প্রশ্নের উত্তর একমাত্র হেমিংওয়েই দিতে পারেন।

আর হেমিংওয়ের কাছ থেকে সে উত্তর কোনোদিনই পাওয়া যাবে না।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে জাতিভেদ প্রথা ঃ পরিবর্তমান মূল্য ও সামাজিক গঠন

ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

জাতিভেদপ্রথায় কাজ, সম্পদ আর সুখের সমস্যা আলোচনার আগে বিভিন্ন জাতির সম্পর্কের কিছু তথ্য নির্ধারণ করা দরকার। জনসাধারণের জীবনের ঐ প্রয়োজনীয় উপকরণ সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীও জানা দরকার। অধ্যাপক গ্যাড্‌গিল গ্রামীন সমাজের কাঠামো পর্যালোচনা করার কথা বলেছেন, এবং জনসাধারণ ও দলনেতাদের সমস্ত কাজের পিছনে কি উদ্দেশ্য কাজ করছে, তাও যে জানা দরকার, সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পরিবার নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে গ্রামীণ সমাজের মনোভাব কি, তাও জানা দরকার। খাদ্য উৎপাদনের ফলাফল ভূমি ব্যবস্থা আইনের উপর কি প্রতিক্রিয়া করে, তার প্রসঙ্গে অধ্যাপক জোভেনেলে, রাজকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, ভারতে রায়তেরা কোথাও কোথাও জমির মালিক হলেও বেশিভাগ ক্ষেত্রে জমির মালিকরা কৃষকে পরিণত হচ্ছে। এই প্রবন্ধে সম্মেলনের সামনে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য রাখার চেষ্টা হবে এবং কিছু কিছু সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

১। আগেকার তুলনায় এখনকার জাতিগঠন, জাতির অন্তর্গত লোকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রথমে বিচার করা হবে। বর্তমান লেখক চল্লিশ বৎসর আগে বাংলার জাতিসমূহের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তাছাড়া, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিদর্শন উপলক্ষ্যে জাতিগোষ্ঠি এবং জাতির অন্তর্গত লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক লক্ষ্য করেছেন। শহর অঞ্চলে, বিশেষ করে কোলকাতায় বিরাট পরিবর্তন হয়েছে এবং গ্রাম অঞ্চলে কোলকাতার মত শহরের প্রভাব এত বেশি যে সাধারণত গ্রামের পরিবর্তন শহর অঞ্চলের ধারণার উপর নির্ভর করে ব্যাখা করা হয়। কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

বাংলা দেশে পঞ্চাশ বছর আগে সমাজের উচ্চ পদাধিকার বংশ-কৌলিন্যের

জোরে ব্রাহ্মণদের দখলে ছিল। নীচু জাতির ব্রাহ্মণ অথবা জ্যোতিষীর কাজ করতেন, এমন ব্রাহ্মণ পদাধিকারে ছোট ছিলেন। জাতিভেদের পরবর্তী স্তরে ছিলেন কায়স্থ ও বৈদ্য, এবং আর একটু নীচুতে, কিন্তু একই বড় শ্রেণীর মধ্যে ছিল কামার, গন্ধবণিক, এবং সদ্‌গোপ। এদের জল চল্‌ত, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা এদের অন্নগ্রহণ করত না, তবে এরা ব্রাহ্মণেরা কাছ থেকে অন্ন ও জল দুইই গ্রহণ করত। আরো নীচুতে যে সব জাতি ছিল, তাদের জল চল্‌ত না। কিছু ছিল অচ্ছুৎ। কিছু কিছু এমন ছিল যাদের ছোঁয়া অশুদ্ধ বলে গণ্য হোত না। প্রথম দলে ছিল, ছুতোর, সেকরা; দ্বিতীয় দলে ছিল নমশূদ্র, বাগ্‌দী, মালো প্রভৃতি।

কিন্তু এত স্তর ভাগ থাকলেও, বিবাহের ভোজে বড় জাতিগুলির সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হোত। সমস্ত গ্রামকে একটা সমাজ হিসাবে ধরা হোত, যদিও তার মধ্যে অনেক ভাগ ছিল। গ্রামের প্রচলিত উৎসবগুলিতে সমস্ত গৃহস্থই নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ দিত, কেউ টাকা দিত, আর কেউবা কাজ করে দিত। গ্রামের জমিদার বা বড়লোক তার পুকুরে মাছ ধরলে উঁচু সম্প্রদায়ের মাথাদের কাছে সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী মাছ পাঠাতেন। নীচু সম্প্রদায়ও একেবারে বঞ্চিত হোত না। ভোজ-সভায় জাতির শ্রেষ্ঠত্ব অনুযায়ী আগে বা পরে আসন পাবার অধিকার বিবেচিত হোত। ব্রাহ্মণ আর উঁচু শ্রেণীর লোকদের একদিন খাওয়ান হোত, আর সম্ভব হলে নীচু শ্রেণীদের অন্যদিন খাওয়ান হোত, না হলে বেশ দূরে তাদের বসতে দেওয়া হোত। ব্রাহ্মণদের অন্য উঁচু শ্রেণীদের থেকে আলাদা খেতে দেওয়া হলেও, এদের সবাইকে ঘরে বা ঢাকা বারান্দায় বসতে দেওয়া হোত। বাগ্‌দী শ্রেণীর লোকদের খোলা উঠানে বস্‌তে দেওয়া হোত। পঞ্চাশ বছর আগে কোলকাতায় গৃহস্থ-বিবাহ উপলক্ষ্যে সবশ্রেণীর আত্মীয় এবং বন্ধু-বান্ধবদের (তারা সমশ্রেণীর লোক নাও হতে পারত) নিমন্ত্রণ করতেন। অচ্ছুৎদের নিমন্ত্রণ করা হোত না, কারণ গ্রামের পাড়ায় বা সহরের অঞ্চলে এরা বাস করত না। গোঁড়া বাড়ীতে তাদের নিমন্ত্রণ হওয়া সম্ভব ছিল না, কারণ তাদের উচ্ছিষ্ট পাতা উঁচু শ্রেণীর কেউ ফেলতে চাইত না। গ্রামে ভোজের অবশিষ্ট যা ফেলা যেত, মেথররা কুড়িয়ে নিয়ে যেত। শহরে ভোজের ক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণদের আগে খেতে ডাকা হোত, পরে ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য উঁচু শ্রেণীদের। তাদের আলাদা ঘরে, কিংবা ছাতে মেরাপ

বেঁধে পংক্তিতে বেশ একটু তফাতে বসিয়ে দেওয়া হোত। গ্রামের খড়ের চালের ঘরে ছাতে খাওয়ান সম্ভব ছিল না, তাই ঘরে খেতে দেওয়া হোত। সাধারণ সামাজিক অনুষ্ঠানে জাতির মর্যাদা অনুযায়ী আসন দেওয়া হোত। নীচু শ্রেণীর লোকদের ব্রাহ্মণ বা উঁচু শ্রেণীর লোকেরা বসতে আসন দিত না, তবে ধরে নেওয়া হোত তারা মাটীতে বসবে। ব্রাহ্মণেতর উঁচু শ্রেণীকে একটু খারাপ আসন দেওয়া হোত।

বর্তমান শতাব্দীর রাজনৈতিক আন্দোলন শহর অঞ্চলে জাতি কাঠামোয় পরিবর্তন এনেছে গ্রাম অঞ্চলেও তার ঢেউ এসে লেগেছে।

কোলকাতায় শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে গান্ধীজির অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলনে খুব সাড়া পড়ে গেল। আগেকার বিপ্লবী আন্দোলনে, ১৯২০-২১ সালের অসহযোগে আন্দোলনে যারা যোগ দিয়েছিলেন, তারা বিভিন্ন জাতির ছিলেন। ফলে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। গান্ধীজির আন্দোলনে নীচু জাতির অনেকে অংশ গ্রহণ করছিল। মেদিনীপুর জেলায় এই আন্দোলন বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল। এই জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে তিনশ কংগ্রেস সমিতি বেআইনী বলে ঘোষিত হয়েছিল। যে সমস্ত জেলা হিন্দুপ্রধান এবং যা নিয়ে এখন পশ্চিমবঙ্গ গঠিত সে সব জায়গায় আন্দোলন বেশি হয়েছিল এবং মুসলমান-প্রধান জেলায় কম হয়েছিল। কংগ্রেসে যখন সমস্ত জাতির লোক অল্প কিছু চাঁদা দিয়ে সভ্য হবার অধিকার পেল, স্বাধীনতা আন্দোলন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সাম্যের দাবী ঘোষণা করল, তখন নীচু শ্রেণীর লোকেরা এই দাবী জানাল যে, সামাজিক জীবনেও তাদের সমান অধিকার দিতে হবে। কংগ্রেস শিবির ও অফিসগুলিতে জাতিভেদ অনেকটা দূর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভোজসভায় পংক্তিভেদ দূর করার নেতৃত্ব কোলকাতা থেকেই প্রথম এল। শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলাদেশের বিপ্লবীরা দুর্গাপূজার অষ্টমীতে তরবারি খেলা, লাঠি ছোরা খেলা প্রভৃতি শরীর-চর্চার অনুষ্ঠান করত। দুর্গাপূজা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব। আশ্বিন (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতে আরম্ভ হয়ে দশমী পর্যন্ত এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। অষ্টমী তিথিতে ব্রত পালন ও সমাধা করা হয় এবং দশমীতে সকলের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়, এমন কি শত্রুও তাতে বাদ পড়ে না। শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যভাগে

পাড়ার সকলে একসঙ্গে দুর্গাপূজার ব্যবস্থা করতে আরম্ভ করল। এ ধরনের পূজা গ্রামের বারোয়ারী পূজার মত, যাতে সকল জাতি অংশ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু বারোয়ারী পূজায় প্রসাদ এবং ভোগ বিতরণের বেলায় জাতির পার্থক্য বিচার করা হোত। কোলকতার সর্বজনীন পূজায় সব জাতির লোক একসঙ্গে বসে রাঁধা ভাত ডালের ভোগ খেত। কংগ্রেস অফিসেও সকলে দুবেলা একসঙ্গে আহার করত। লেখক জানেন, মেদিনীপুর জেলায় এক জায়গায় বাগ্‌দীরা উঁচু শ্রেণীর সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজনের জন্য আন্দোলন করেছিল। তবে আলোচনার পরে তারা জানায়, উঁচুশ্রেণীর লোকরা তাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে না বসলে তাদের আপত্তি নেই। কিন্তু তাদের ঢাকা বারান্দায় বা ঘরে খেতে দিতে হবে। কয়েক বছর এ আন্দোলন চলে এবং বাগ্‌দীরা সে বছরগুলি গ্রামের উৎসব বর্জন করেছিল। পরে তাদের দাবী মানা হয়, তবে তাদের অন্যদিনে বা অন্য সময় খাওয়ান হোত।

পংক্তি ভোজনের এই আন্দোলনের জন্য স্বাধীনতার পরে গ্রামের বিভিন্ন জাতিসম্পর্ক কি রকম দাঁড়িয়েছে তা পরীক্ষা করা প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে। কোলকাতায় কোন অনুসন্ধান করা হয় নি, কারণ সেখানে নিমন্ত্রিত সকলকে একই হল ঘরে আসনে বা চেয়ার টেবিলে খেতে দেওয়ার প্রথা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ বা উঁচু শ্রেণীদের আলাদা ব্যবস্থার কথা শোনা যায় না। যদি কোন গোঁড়া অতিথি এই ব্যবস্থা পছন্দ না করেন, তা হলে তাকে আলাদা ঘরে খেতে দেওয়া হয়। কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গের ২৪টি গ্রামে এ সম্বন্ধে সযত্ন অনুসন্ধান করেছেন। টাকার অসুবিধার জন্য উত্তর অঞ্চলের জেলাগুলিতে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পর ৪০টি মহকুমায় ৫০০ গ্রামে এলোমেলো নমুনা সংগ্রহের ভিত্তিতে অনুসন্ধান করা হয়েছে। সবশুদ্ধ ১৮০০০ পরিবার দেখা হয়েছে। অর্থাভাবের জন্য ভালভাবে অনুসন্ধান করার কাজ ২৪টি গ্রামে করা হয়েছে। এই গ্রামগুলি পশ্চিম বঙ্গের আটটি জেলার ১৩টি মহকুমায় অবস্থিত। দৈনন্দিন জীবনে এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে গৃহকর্তা যখন ছোট ছিলেন তখন জাতি-সম্পর্ক কিরকম ছিল এবং বর্তমানে কিরকম দাঁড়িয়েছে, সে সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করা হয়েছে। যে সব প্রশ্ন আগেকার অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে উত্তরের দিক থেকে জটিল বলে মনে হয়েছে, সেগুলি ভেঙ্গে সরল করা হয়েছে।

প্রত্যেক পরিবার কতটা জমি চাষ করে, পরিবারের গঠন কেমন ইত্যাদি ছাড়া গ্রামে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতির মর্যাদা সম্বন্ধে প্রত্যেক গৃহকর্তার নিকট একটা অনুসন্ধান করা হয়েছিল। তিনটে বড় ভাগ করা হয়েছিল যথা (ক) উঁচু জাতি (খ) ব্রাহ্মণেতর জলচল জাতি এবং (গ) অচ্ছুৎ জাতি। প্রশ্ন ছিল, এ তিন শ্রেণীর লোকেরা বাড়ীতে এলে কি রকম আসন দেওয়া হয়, বা গৃহকর্তা অন্য বাড়ীতে গেলে কি রকম অভ্যর্থনা পায়। বিবাহ উপলক্ষ্যে বস্‌বার এবং খাওয়াবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাও করা হয়েছিল। বিবাহের পরিবর্তনশীল নিয়ম সম্পর্কে মতামত চাওয়া হয়েছিল এবং এ প্রশ্নও করা হয়েছিল, গৃহকর্তার অর্থ সাহায্য দরকার হলে কে টাকা দেয়।

জাতি সম্পর্কের তথ্যে যে ক, খ, গ ভাগ করা হয়েছিল, তাতে কিছু কিছু বড় পরিবর্তন সত্ত্বেও বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মিল ছিল। দৈনন্দিন সামাজিক সম্পর্কে খ বিভাগের জলচল শ্রেণীকে সমান আসন দেওয়া হোত এবং তারা প্রধান প্রধান বাগ্দীদের সমান আসন দিত। কিছু গ্রামে কিন্তু ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত, অথবা ক্ষত্রিয়রা গ শ্রেণীর লোকদের এই রকম আসন দিত না। খ শ্রেণীর লোকেরা ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে একটু নীচু আসন পেত, এবং ব্রাহ্মণেরা তাদের বাড়ীতে উঁচু আসন পাবে, এইটাই রীতি। নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে কোন গ্রামে দেখা গেল, বাগদীরা ও খ শ্রেণীর লোকেরা বারান্দায় বসতে পেত, তবে তাদের খাওয়ানোর সময় ছিল অন্য। যেখানে উঁচু জাতের লোক সংখ্যায় বেশি, সেখানে কিন্তু বাগ্‌দীরা এ সুযোগ পেত না। পাঁচটি গ্রামের ক্ষেত্রে জানা গেছে যে বাগদীদের উঠানে খেতে দেওয়া হয়েছে। ছ'টি গ্রামে দেখা গেছে, উঁচু জাতির লোকেরা বিবাহ উপলক্ষ্যে গ শ্রেণীর লোকদের নিমন্ত্রণ করে না, এবং তাদের মধ্যে বাগ্‌দীরাও পড়ে। এটা হওয়া সম্ভব, বাগ্‌দীরা উঠানে খেতে চায় না, আর উঁচু জাতির লোকেরাও তাদের দাবী মেনে নিতে রাজী নয়। দুটি গ্রামে মাহিষ্যদের বারান্দায় খেতে দেওয়ার কথা জানা গেছে। গত পঞ্চাশ বছর মাহিষ্যদের উঁচু বিভাগে ধরা হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে কিন্তু ব্রাহ্মণদের ঘরের ভিতর খেতে দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে এ প্রথা জলচল জাতিরা সমস্ত গ্রামেই মেনে থাকে। এইসব তথ্য থেকে মনে রাখা দরকার, রোজকার সামাজিক জীবনে জাতিভেদ কমে এলেও উৎসব-অনুষ্ঠানে মানা হয়ে থাকে। আগেকার দিনে বহুযুগের

সামাজিক অসাম্যকে মেনে নেওয়ার অভ্যাস গ্রামের একতা ও সহযোগিতাকে একরকম বজায় রাখত। ভারতীয় সংবিধানে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক সাম্য দান করার নীতি ঠিক পথ নিশ্চয়ই। কিন্তু পুরাতন অভ্যাসের ধারা এবং গ্রামের পুরাতন কাঠামো এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। দেশের আইন দ্বারা সমর্থিত সাম্যের বোধ নীচু জাতির মধ্যে উঁচু শ্রেণীর সামাজিক ভেদের বিরুদ্ধে অসন্তোষকে বাড়িয়ে তুলেছে। এই অসন্তোষের ফলে যে সামাজিক শক্তি বিকশিত হবে তা গ্রামের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতায় শেষ পর্যন্ত ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজ্য বিধানসভা এবং লোকসভার নির্বাচনে এরকম জাতিগত দ্বন্দ্ব দেখা গেছে। গ্রামের উৎসব অনুষ্ঠানেও এই মনোভাব বিরোধ সৃষ্টি করছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আধা-আত্মনির্ভর গ্রামে আধুনিক শিল্পের সংঘাতে এবং কৃষির বাণিজ্যিক রূপান্তরে জাতিগত সম্পর্ক দূর হয়েছে। গ্রামের বিভিন্ন জাতির সাধারণ প্রয়োজনের চেতনার ভিত্তিতে একটি নতুন অর্থনৈতিক সহযোগিতা গড়ে উঠেছে। কিন্তু বিঘ্নসৃষ্টিকারী সামাজিক শক্তিগুলির জন্য গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতা কোন স্থায়ী বন্ধন সৃষ্টি করতে পারবে না।

২। দুবার অনুসন্ধানে উঁচু বর্ণের এবং নীচু বর্ণের অর্থনৈতিক জীবনের যে চেহারা পাওয়া গেছে, তাই আলোচনা করা যেতে পারে। জমিই প্রধান আয়ের উৎস বলে ১৯৩৯ এবং ১৯৫৬-৫৮তে জমি বণ্টনের পরিমাণ কি ছিল, তার একটা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভরণপোষণের জন্য ন্যূনতম পরিমাণ হচ্ছে দুই একর, আর ন্যূনতম অর্থনৈতিক পরিমাণ হচ্ছে পাঁচ একর। নির্দেশ-পঞ্জীতে তাই বণ্টন ০—২ একর, ২+ থেকে ৫ একর এবং ৫+ থেকে অধিকতর পরিমাণ, এইভাবে দেখান হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভাগ চাষ করা হয় বলে যতটা জমি চাষ করা হয় তার হিসাব নিয়ে তাকে অর্ধেক ভাগ করা হয়েছে। আসলে চাষের খরচের সঙ্গে মোট উৎপাদনের সম্পর্ক বিচার করে এটা দুই-পঞ্চমাংশ থেকে একের তিনভাগ হওয়া উচিত। তবে, আধাআধি ভাগে ফসলের হিসাব হয় বলে এই রকম একটা মোটামুটি হিসাব করা হয়েছে। নির্দেশ-পঞ্জীতে মুসলমানরা যে জমি ভোগ করে, তা একসঙ্গে এবং আলাদা করে দেখান হয়েছে, যদিও তারা বর্ণ-সমাজের মধ্যে পড়ে না। জমিবণ্টন তাদের জীবনে প্রভাব-বিস্তার করেছে বলে এটা করা হয়েছে।

নির্দেশ-পঞ্জী ১ : সমস্ত শ্রেণীর জন্য জমি বণ্টনের পরিমাণ : পরিবারের সংখ্যা ও শতকরা হিসাব—

সময়	০—২ একর		২+৫ একর		৫+থেকে অধিক পরিমাণ		যোগফল
	নং	%	নং	%	নং	%	
১৯৩৯	৬৩২	৭৫·২	১৩৩	১৫·৮	৭৫	৯·০	৮৪০
১৯৫৬-৫৮	৪৯৪	৬২·৮	১৭৩	২২·০	১২০	১৫·২	৭৮৭

জমির পরিমাণের দিক থেকে তিনটে বড় ভাগ থেকে দেখা যাচ্ছে পরিবারের শতকরা অনুপাতে বেশ পরিবর্তন ঘটেছে। ভরণপোষণের জন্য ন্যূনতম জমির পরিমাণের ক্ষেত্রে শতকরা ৭৫·২% থেকে পরিবারের সংখ্যা ৬২·৮% তে দাঁড়িয়েছে। দুই একর জমির থেকে অধিক পরিমাণের ক্ষেত্রে ২৪·৮% থেকে ৩৭·২% বেড়েছে। ব্রাহ্মণ এবং উঁচু বর্ণের জমি বণ্টনের হিসাব এক সঙ্গে দুনম্বর নির্দেশ-পঞ্জীতে দেওয়া হয়েছে, গ বর্ণের হিসাব তিন নম্বরে এবং মুসলমানদের হিসাব চার নম্বরে দেওয়া হয়েছে। দু নম্বর এবং চার নম্বর থেকে বোঝা যাচ্ছে উঁচু বর্ণ এবং মুসলমানেরা জমির পরিমাণের দিক থেকে ১৯৩৯ সালে অনেক ভাল অবস্থায় ছিল। ব্রাহ্মণ এবং উঁচু বর্ণের লোকেদের ৩৩·৫% দু একরের বেশি জমি ভোগ করত, মুসলমানদের মধ্যে ৩২·৬% এই অবস্থায় ছিল, কিন্তু নীচু শ্রেণীর মাত্র ৬·৯% এই সুবিধা ভোগ করত। ১৯৫৬-৫৮ সালে উঁচু শ্রেণী ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে ৫০·১% এবং মুসলমানদের ৪৭·০% বেশি জমি ভোগ করত, নীচু শ্রেণীর কেবলমাত্র ১৩·৩% দু একরের বেশি জমি চাষ করত। নীচু শ্রেণীর একটা অংশ জমির উপর নির্ভর করত না, তারা মাছ ধরত। তবে মাছ ধরার ব্যাপারে তাদের খুব বেশি নিরাপত্তা ছিল না। সাম্প্রতিক জমিদারি এবং ভাগ চাষের আইনে ভাগচাষী এবং রায়তদের কিছু সুবিধা হলেও, মাছ ধরার ক্ষেত্রে অনুরূপ কোন আইন হয়নি। আগেকার রিপোর্টে একথা বলা হয়েছে যে জেলেদের অবস্থা চাষীদের থেকে অনেক খারাপ এবং ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে চাষী, ক্ষেতমজুর এবং কারিগরী শিল্পীদের থেকে তারা বেশি কষ্ট পেয়েছে। যে সম্প্রদায় বাঙ্গালীর খাদ্যের বেশি পরিমাণ প্রোটিন জোগায়, দুঃসময়ে নির্ভর করবার মত কোন সম্বলই যে তাদের থাকে না, একথাও তাতে বলা হয়েছে।

নির্দেশ-পঞ্জী ২ঃ ব্রাহ্মণ এবং উঁচু বর্ণের জমিবণ্টনের পরিমাণঃ পরিবারের সংখ্যা ও শতকরা হিসাব—

সময়	০—২ একর		২+থেকে ৫ একর		৫+থেকে অধিক		পরিমাণ	যোগফল
	নং	%	নং	%	নং	%		
১৯৩৯	৩১৯	৬৬·৫	৯৭	২০·২	৬৪	১৩·৩		৪৮০
১৯৫৬-৫৮	২২৫	৪৯·৯	১২৯	২৮·৬	৯৭	২১·৫		৪৫১

নির্দেশ-পঞ্জী ৩ঃ নীচু বর্ণের জমি বণ্টনের পরিমাণঃ পরিবারের সংখ্যা ও শতকরা হিসাব—

সময়	০—২ একর		২+থেকে ৫ একর		৫+থেকে অধিক		পরিমাণ	যোগফল
	নং	%	নং	%	নং	%		
১৯৩৯	২৫৫	৯৩·১	১৬	৫·৮	৩	১·১		২৭৪
১৯৫৬-৫৮	২৩৪	৮৬·৭	২৬	৯·৬	১০	৩·৭		২৭০

নির্দেশ-পঞ্জী ৪ঃ মুসলমানদের জমি বণ্টনের পরিমাণঃ পরিবারের সংখ্যা ও শতকরা হিসাব—

সময়	০—২ একর		২+ থেকে ৫ একর		৫+থেকে অধিক		পরিমাণ	যোগফল
	নং	%	নং	%	নং	%		
১৯৩৯	৫৮	৬৭·৪	২০	২৩·৩	৮	৯·৩		৮৬
১৯৫৬-৫৮	৩৫	৫৩·০	১৮	২৭·৩	১৩	১৯·৭		৬৬

গ্রামে বিভিন্ন বর্ণের পেশা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেও দেখা যায় নীচু বর্ণের অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হয়েছে। ১৯৩৯ সালে এই সমস্ত গ্রামে উঁচু বর্ণের ৪৫০টি পরিবার নিজের জমি চাষ করে বা ভাগ চাষ ক্ষেতমজুরের বা কাজ করে জীবিকানির্বাহ করত। ১৯৫৬-৫৮ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬৬ হয়, যদিও সামগ্রিক নমুনা পরীক্ষায় ৭% হ্রাস লক্ষিত হয়। সুতরাং আনুপাতিক ভাবে বৃদ্ধি আরও বেশি ছিল। এই সংখ্যার মধ্যে ১৯৩৯ সালে ২১৪টি পরিবারের প্রধান অবলম্বন ছিল নিজেদের জমি চাষ, ১৯৫৬—৫৮ সালে এই সংখ্যা বেড়ে ২৯২ হয়, ভাগচাষ ৬০ থেকে ৪০এ নামে, ক্ষেতমজুরী হ্রাস পায় ৯৬ থেকে ৩০ এ। নীচু শ্রেণীতে ১৯৩৯ সালে চাষ এবং ভাগচাষের সংখ্যা ছিল ৫২ এবং ৩২ পরিবার; কিন্তু ১০৫৬-৫৮ সালে সংখ্যাগুলি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩২ এবং ৫১। মুসলমানদের ক্ষেত্রে ১৯৩৯ সালে সংখ্যা ছিল ৩২ এবং ২ এবং

১৯৫৬-৫৮ সালে দাঁড়ায় ৪১ এবং ৪। উঁচু বর্ণের লোকের চাষের দিক থেকে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করেছে এবং মুসলমানদের ক্ষেত্রেও কথাটা সত্য। কিন্তু নীচু বর্ণের গ্রামে চাষের ক্ষেত্রে অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়েছে।

নির্দেশ-পঞ্জী ৫ ঃ বিভিন্ন বর্ণের পরিবারের পেশা ও তাদের সংখ্যা—

সম্প্রদায়	বৎসর	প্রধানতঃ চাষ	প্রধানতঃ ভাগচাষ
ব্রাহ্মণ ও উঁচুবর্ণ	১৯৩৯	২১৪	৬০
	১৯৫৬-৫৮	২৯২	৪১
নীচু বর্ণ	১৯৩৯	৫২	৩২
	১৯৫৬-৫৮	৩২	৫১
মুসলমান	১৯৩৯	৩২	২
	১৯৫৬-৫৮	৪১	৪

উপরের তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, ভূমি আইনে সাম্প্রতিক পরিবর্তন থ শ্রেণী থেকে উঁচু বর্ণের ক্ষেত্রে জমি বণ্টনের অসাম্য অনেকটা দূর করে অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছে। কিন্তু এ ধরনের উন্নতি নীচু বর্ণের ক্ষেত্রে আসেনি। শতকরা হিসাবে যে বিভাগের পরিবারেরা বেশি জমি ভোগ করছে, আনুপাতিক ভাবে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হলেও সামগ্রিকভাবে সংখ্যা বাড়েনি। জনসমষ্টির বেশির ভাগেরই দু একর জমি নেই। অনেক জায়গায় ভাগচাষীরা যে সমস্ত জমির মালিকরা নিজেরা চাষ করে না তাদের জমি দীর্ঘকাল ধরে চাষ করছে। তারা সেখানে জমির উপর রায়তী সত্ব লাভে চেষ্টা করেছে। কিন্তু ভাগচাষে কোন লেখাপড়া থাকে না বলে তাদের এ প্রচেষ্টা সফল হয়নি। বরং অনেক জায়গায় ভাগচাষের ব্যবস্থা বহু বছর ধরে বলবৎ থাকা সত্ত্বেও জমি থেকে বিতাড়নের ঘটনা ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গের ভূমি রাজস্বের মন্ত্রী ১৭ই নভেম্বর, ১৯৬০ সালে একটি প্রশ্নের উত্তরে বিধানসভায় জানান, দশ হাজার মামলার মধ্যে ১৮০০র বেশি ক্ষেত্রে জমি থেকে বহিষ্কার ঘটেছে। এর মধ্যে বড় বড় মামলার উল্লেখ করা হয়নি, কারণ সেগুলি এখনও অমীমাংসিত। তাছাড়া, গরীব লোকেরা অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে মামলায় লড়াই করতে অক্ষম। স্বাধীনতার পরে ভূমি আইনের পরিবর্তনের ফলে উঁচু এবং নীচু বর্ণের মধ্যে বিরোধ বেড়ে গেছে। বর্ণভেদ এবং নানা বৈষম্যে এই আইনগত পরিবর্তন শক্তি জুগিয়েছে। অন্যদিকে, যাদের দু একরের

বেশি জমি আছে এবং যারা পাঁচ একরের বেশি জমি ভোগ করে, খাদ্য উৎপাদনের বৃদ্ধিতে তারা সহায়তা করতে পেরেছে, কারণ উন্নত কৃষি পদ্ধতি এবং সার প্রদানের অর্থ সংগ্রহ করতে তারা সক্ষম।

৩। বিভিন্ন বর্ণস্তরের পরিবারের গঠন ও রূপ এবার আলোচনা করা হবে। পরিবারের রূপ সম্পর্কে—'সরল' এবং 'বিস্তৃত' কথা দুইটি সুপরিচিত। তৃতীয় আর একটা রূপ হতে পারে যাকে আমরা 'মাধ্যমিক' বলতে পারি, যেখানে আসল পরিবারের লোক ছাড়া কিছু আত্মীয়স্বজন আছে। এটাকে 'বিস্তৃত' পরিবারের ভগ্নদশা বলা যেতে পারে, কারণ 'সরল' পরিবারগুলিতে ভাঙ্গবার মুখে কোথাও কিছু কিছু বাড়তি লোকজন থেকে যাচ্ছে। পরিবারের বিভিন্নরূপ ১৯৩৯ সাল এবং ১৯৫৬-৫৮ সালে, কেমন ছিল, তা ৫ নম্বর নির্দেশ পঞ্জীতে দেওয়া হয়েছে।

১৭-১৯ বছরের ব্যবধানে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা, দেশভাগ ইত্যাদির ফলে গ্রামের আকারে পরিবর্তন এসেছে!

নির্দেশ-পঞ্জী ৬ : পরিবারের কাঠামো—

সম্প্রদায়	বৎসর	সরল	মাধ্যমিক	বিস্তৃত	যোগফল
ব্রাহ্মণ এবং উঁচুবর্ণ	১৯৩৯	২৭০	৭০	১৩০	৪৭০
	১৯৫৬-৫৮	২১৮	৯১	১২৪	৪৩৩
নীচু বর্ণ	১৯৩৯	১৫৭	৬১	৭৫	২৯৩
	১৯৫৬-৫৮	১৪২	৫৬	৫৮	২৫৬
মুসলমান	১৯৩৯	৫৮	১১	১৫	৮৪
	১৯৫৬-৫৮	৩৩	১১	১৯	৬৩

১৯৩৯ সালে পরীক্ষিত পরিবারের সংখ্যা = ৮৪৭

১৯৫৬-৫৮ সালে পরীক্ষিত পরিবারের সংখ্যা = ৭৫২

নির্দেশ-পঞ্জী ৭ : গঠনগত ভিত্তিতে পরিবারের সংখ্যা—

সম্প্রদায়		সরল	মাধ্যমিক	বিস্তৃত
ব্রাহ্মণ ও উঁচু বর্ণ	প্রত্যাশিত	২৪৯	৬৪	১২০
	বাস্তব	২১৮	৯১	১২৪
নীচু বর্ণ	প্রত্যাশিত	১৩৭	৫৩	৬৬
	বাস্তব	১৪২	৫৬	৫৮

একই অংশকে বিভিন্ন গ্রামে পরীক্ষা করে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। কোন পরিবর্তন না হলে ১৯৫৬-৫৮ সালে ৭ নম্বর নির্দেশপঞ্জীতে প্রত্যাশিত সংখ্যাই দেখতে পেতাম। পূর্বে আমি এক প্রবন্ধে (বাংলার পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন) আমি দেখিয়েছি ১৮৮১ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯২১ সাল পর্যন্ত মধ্য এবং পশ্চিমবঙ্গে পরিবারের কাঠামো ৫·৬ থেকে ৪·৭ অর্থাৎ ১৬% হ্রাস পেয়েছে। সাধারণভাবে বড় পরিবারগুলিকে ভেঙ্গে ছোট করার প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত সমগ্র কর্ষিত ভূমির শতকরা একভাগ বিক্রী হয়েছে, কিন্তু ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় বিক্রীর পরিমাণ বেড়ে শতকরা তিনভাগ হয়। স্বাধীনতার পরে জমি বন্দোবস্ত আইনের উন্নতি এবং অন্যান্য কল্যাণকর ব্যবস্থায় কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। জমি বণ্টনের ব্যবস্থায় পরিবর্তনের কথা আগেই বলা হয়েছে। পরিবারের কাঠামোয় পরিবর্তনেও একই ভাবে এসেছে। ব্রাহ্মণ এবং উঁচু বর্ণের পরিবারের সরল কাঠামোর সংখ্যা হ্রাস পেয়ে মাধ্যমিক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিস্তৃত পরিবারের সংখ্যা বিশেষ বাড়েনি। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে এবং ১৯৪৪ সালের দুর্ভিক্ষ তথ্য-অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দেখা গেছে খাদ্য সংগ্রহ কষ্টকর হয়ে উঠলে মাধ্যমিক পরিবারে যারা বাড়তি লোক তারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে। শেষে খাদ্য সংগ্রহ আরও কষ্টকর হলে সরল পরিবারেও ভাঙ্গন ধরেছে। বড় আকারের পরিবারের বিপরীত নিয়ম দেখা গেছে। বাড়তি লোকজনকে পরিবারে থাকতে দেখা গেছে, কারণ মাধ্যমিক পরিবারের দর্শন পাওয়া যাচ্ছে। তবে বিস্তৃত পরিবারের ভাঙ্গন বিশেষ কমেনি। দুটো কারণ এর পিছনে থাকতে পারে :—(ক) আর্থিক অবস্থা এমন উন্নত হয় যে বিস্তৃত পরিবারকে ভাল ভাবে টিঁকিয়ে রাখা যায়। (খ) বিস্তৃত পরিবারের শিক্ষিত সভ্যদের কাছে জমি-চাষ ছাড়া আয়ের অন্য পথ খোলা থাকায় অন্যদের সঙ্গে আয়ে পার্থক্য হতে থাকে এবং তারা পৃথকভাবে বাস করতে চায়। ব্রাহ্মণ এবং উঁচু বর্ণের পরিবারে উচ্চ শিক্ষার বৃদ্ধি এবং একই পরিবারে বাস করার পুরানো ঐতিহ্যের হ্রাস দ্বিতীয় কারণকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে। এক সঙ্গে বাস করার বিরুদ্ধে এই কারণ একটা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগিয়ে তোলে এবং পুরাতন ধরণে সকলের আয়কে একত্রীকরণেরও বিরোধী মনোভাব এতে

রয়েছে। নীচু বর্ণের ক্ষেত্রে জমির ব্যবস্থায় বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি। সরল পরিবার বা মাধ্যমিক পরিবারের ক্ষেত্রে পরিবর্তনও বিশেষ কিছু নেই। বরং মাধ্যমিক পরিবারের প্রত্যাশিত সংখ্যা অনেক কম। এ থেকে বোঝা যায় নীচু বর্ণের অর্থনৈতিক অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। আগে উঁচু এবং নীচু বর্ণের মধ্যে বিরোধের কারণ হিসাবে সামাজিক উপাদানের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রভেদ থেকেই এই উপাদানগুলি শক্তি সঞ্চয় করেছে।

৪। বিবহিতা নারীদের বিভিন্ন বয়সের সন্তান জন্মের সংখ্যা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সকল রকম বয়সে ১৯৩৯ সালে ১০৫৯ জন বিবাহিতা নারীর ২৮০৮ সন্তান পাওয়া যাচ্ছে। অথচ ১৯৫৬-৫৮ সালে কেবলমাত্র ৮৯৮ জন বিবাহিতা নারীর ৩০৯৪ সন্তানের সংখ্যা দেখা যাচ্ছে। সোজাসুজি তুলনা করা সম্ভব হচ্ছে না, কারণ দুটো সময়ে একই বয়সের বিবাহিতা নারীর সংখ্যায় অনেক প্রভেদ আছে। নীচের নির্দেশ-পঞ্জীতে তিন রকম সামাজিক বিভাগের বিভিন্ন বয়সের বিবাহিতা নারী এবং তাদের সন্তানের সংখ্যা দেখান হচ্ছে।

নির্দেশ-পঞ্জী ৮ : বয়স অনুযায়ী ব্রাহ্মণ এবং উঁচু বর্ণের মাতা—

বয়স বিভাগ		২৫ পর্যন্ত	২৫+থেকে ৩৫	৩৫+থেকে বেশি	যোগফল
১৯৩৯	শিশু	৫৬৪	৬১৮	৪১৫	১৫৯৭
	বিবাহিতা নারী	৩১৩	১৭৫	৯৭	৫৮৫
১৯৫৬-৫৮	শিশু	৩৯৮	৫২৯	১০৪৮	১৯৭৫
	বিবাহিতা নারী	২০৩	১৬৬	২৬২	৫১৩

একথা বলা যেতে পারে বহু নারীরই অনুসন্ধানের প্রথমকালে ১৬ বছরের আগে বিবাহ এবং সন্তান হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয়কালে সেই সংখ্যা মাত্র দুটিতে দাঁড়িয়েছে। মনে হয়, বিবাহের বয়স্ বেড়ে গেছে এবং তার ফলে অল্প বয়সে সন্তানের সংখ্যাও কমে গেছে।

কিন্তু নীচু বর্ণের ক্ষেত্রে ১৬ বছরে সন্তানের সংখ্যা দ্বিতীয় বারেও যথেষ্ট বেশি। এ থেকে মনে হয়, অল্প বয়সে বিবাহ তখনও তাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে।

নির্দেশ-পঞ্জী ৯ : নীচু বর্ণ—

		২৫ পর্যন্ত	২৫+ থেকে ৩৫	৩৫+ থেকে বেশি	যোগফল
১৯৩৯	শিশু	৩৩৯	৩২৬	২০৩	৮৬৮
	বিবাহিতা নারী	২১৮	১০৩	৫৫	৩৭৬
১৯৫৬-৫৮	শিশু	১৬৮	২১৫	৪০৬	৭৮৯
	বিবাহিতা নারী	৮৪	৭২	১১১	২৬৭

নির্দেশ-পঞ্জী ১০ ঃ মুসলমান—

		২৫ পর্যন্ত	২৫+থেকে ৩৫	৩৫+থেকে বেশি	যোগফল
১৯৩৯	শিশু	১০৫	৮৫	৫৩	২৪৩
	বিবাহিতা নারী	৫৬	২৭	১৫	৯৮
১৯৫৬-৫৮	শিশু	৯২	৮৯	১৪৯	৩৩০
	বিবাহিতা নারী	৪৪	২১	৩৫	১০০

এই তিন ধরণের সামাজিক বিভাগের বৈশিষ্ট্য হোল যে দ্বিতীয়বার অনুসন্ধানের কালে স্বামী জীবিত, এরকম ৩৫ বছরের বেশি বয়সের বহু বিবাহিতা নারী রয়েছে। পরিবেশের স্বাস্থ্যকর উন্নতিতে এবং চিকিৎসা ও প্রসূতির পরিচর্যায় উন্নতির ফলে শিশু মৃত্যু ও প্রসূতি মৃত্যু অনেক কমে গেছে। স্বামী ও স্ত্রী সন্তান-সন্ততি নিয়ে অনেকদিন বাস করছে। দম্পতির ক্ষেত্রে মাতার বিভিন্ন বয়সে সন্তানের সংখ্যা নীচে দেওয়া হোল।

নির্দেশ-পঞ্জী ১১ ঃ ব্রাহ্মণ এবং উঁচু বর্ণ—

মাতার বয়স অনুযায়ী সন্তান সংখ্যার গড়পড়তা

সময়	২৫ পর্যন্ত	২৫+থেকে ৩৫	৩৫+থেকে বেশি
১৯৩৯	১·৮	৩·৫	৪·৩
১৯৫৬-৫৮	১·৯৬	৩·১৯	৪·০

জন্মের হার কমেছে বলে মনে হয়, কিন্তু মাতা ও পিতার দীর্ঘ জীবনের দিক থেকে তা কম গুরুতর। আগে সন্তান প্রজনন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বহু নারী হয়ত বিধবা অবস্থায় জীবন কাটাত (কারণ গ্রামীন সমাজে বিধবার পুনর্বিবাহ বিশেষ ঘটে না) অধুনা মৃত্যুহার কমে গেছে, কিন্তু তবু একই বয়সের মাতাদের সন্তান আগের থেকে কম হচ্ছে, মনে হয়।

নির্দেশ-পঞ্জী ১২ ঃ নীচু বর্ণ—

মাতার বয়স অনুযায়ী সন্তান সংখ্যার গড়পড়তা—

সময়	২৫ পর্যন্ত	২৫+থেকে ৩৫	৩৫+থেকে বেশি
১৯৩৯	১·৫৬	৩·১৬	৩·৭
১৯৫৬-৫৮	২·০	৩·০	৩·৬৬

নীচু বর্ণের ক্ষেত্রে জন্মের হারে অতটা হ্রাস ঘটেনি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে শিক্ষার স্তর ব্রাহ্মণ এবং উঁচু বর্ণের মধ্যে উন্নত হলে জন্মের হারে তা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেনি।

নির্দেশ-পঞ্জী ১৩ ঃ মুসলমান—

মাতার বয়স অনুযায়ী সন্তান সংখ্যার গড়পড়তা—

সময়	২৫ পর্যন্ত	২৫+থেকে ৩৫	৩৫+থেকে বেশি
১৯৩৯	১·৯	৩·১	৩·৫৩
১৯৫৬-৫৮	২·১	৪·২	৪·২

হিন্দুদের ক্ষেত্রে জন্মের হারে হ্রাস হলেও মুসলমানদের ক্ষেত্রে তা নয়। এর কারণ, গ্রামাঞ্চলে হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ হয় না। তাছাড়া নীচু বর্ণ এবং উঁচু বর্ণের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান অনেক বেশি, কারণ কন্যার পিতাকে বিবাহের সময় কন্যাপণ দিতে হয়। যথেষ্ট টাকা সংগ্রহের জন্য পুরুষের পক্ষে তাড়াতাড়ি বিবাহ করা সম্ভব হয় না, কিন্তু কন্যার বয়স অল্পই থাকে, কারণ ঋতুমতী' হবার আগে বিবাহ হলে অল্প অর্থেই কন্যা পাওয়া যায়। 'তবে উঁচু বর্ণের মধ্যে 'কন্যাপণ' দিতে রাজী না হওয়ার মনোভাব এখন দেখা যাচ্ছে এবং বহু জায়গায় সম্ভব হলে বরপণ বা যৌতুকের দাবী করা হয়ে থাকে। এই ব্যাপারে কোলকাতার উত্তরে অবস্থিত চটকলগুলির শ্রমিকদের পরিবারে ২৫০০ বিবাহের নমুনা থেকে একটা বিস্তারিত অনুসন্ধান করা হয়েছিল। এই সব শ্রমিকদের অর্ধেক চাষী পরিবার থেকে এসেছে। তিন পুরুষের ক্ষেত্রে ১৫০০ বিবাহ বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে (১৮৯০ থেকে ১৯২০, ১৯২১ থেকে ১৯৩৬, ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৯) বরপক্ষকে টাকা দেবার পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিলাভ করেছে। যে সব বাঙ্গালী হিন্দু এই সব কারখানায় দক্ষ শ্রমিকের কাজ করে, একমাত্র তাঁতশিল্পের ক্ষেত্র ছাড়া, আর সব জায়গায় তারা উঁচু বর্ণ থেকে এসেছে। তাদের মধ্যে কন্যাপণ দেওয়া প্রথম কাল থেকে দ্বিতীয়কালে ২৮·১% থেকে ১১·৪% কমেছে, আর বরপণ নেওয়া

একই কালে ৫৬·২% থেকে ৭৪·৬% বেড়েছে। ১৯৫৬-৫৮ সালে যে ২৪টি গ্রাম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, সেখানে সকলেই 'কন্যাপণ' দেওয়ার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছে। ব্রাহ্মণেরা কন্যাপণ দেয় না বরং বিবাহের সময় যৌতুক পেয়ে থাকে, এই ঘটনাই তাদের অনুপ্রাণিত করে থাকবে। ঠিক বাস্তব ঘটনাটা কি এক্ষেত্রে জানা সম্ভব ছিল না, কারণ কোন পরিবারই ব্রাহ্মণের এই আদর্শ থেকে নিজেদের বিচ্যুত করার কথা স্বীকার করতে চায় না।

গত শতাব্দীর শেষে সরকারী রিপোর্টে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহের উৎসব-অনুষ্ঠানের খবর প্রকাশিত হয়েছিল। তিন শ্রেণীর বর্ণের মধ্যে এই সমস্ত তথ্যে বেশ পার্থক্য দেখা যায়। তবু ব্রাহ্মণের আদর্শকে আয়ত্ত করবার মনোভাব সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। ১৯২৭-২৮ সালে বর্তমান লেখক বাংলার এই তিন বর্ণ সম্পর্কে উপরোক্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছিল। তিনি দেখতে পান, ব্রাহ্মণের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করবার প্রচেষ্টায় তিন শ্রেণীর মধ্যে অনেক পার্থক্য দূর হয়ে গিয়েছিল। মেদিনীপুরের এক অঞ্চলে সাম্প্রতিক-কালে জি, চট্টোপাধ্যায় যে পর্যবেক্ষণ করেছেন তাতে দেখা গেছে, এই প্রচেষ্টা সাধারণভাবে প্রায় সফল হয়ে এসেছে, যদিও বিস্তারিতভাবে সর্বত্র হয়ত হয়নি। অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে এবং সামাজিক দিকে অবস্থা উন্নত হওয়ায় গ্রামের উঁচু বর্ণগুলি মিলে একটা সমগোত্রীয় শ্রেণীতে পরিণত হতে চলেছে। এর ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা সম্মিলিত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই মনোভাব আগেই দেখা গেছে।

জমির মালিকানা-স্বত্ব পরিবর্তনও ব্রাহ্মণ এবং উঁচু বর্ণের মধ্যে যারা পাঁচ একরের বেশি জমি ভোগ করে, তাদের অবস্থাকে উন্নত করেছে। উল্লিখিত ২৪টি গ্রামে ১৯৫৬-৫৮ সালে মোট ২২৩০ একরের মধ্যে ১১৫৭ একর এই শ্রেণীর কৃষকদের দখলে ছিল। আগেকার যুগে অনুপাত মোট জমির দুই পঞ্চমাংশের কম ছিল। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গণ্ডীর এই সঙ্ঘবদ্ধতা জনসাধারণের একটি অংশের জন্য খাদ্য উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক উন্নতির বৃদ্ধি করলেও অন্য একটি শ্রেণী দারিদ্র্য-পীড়িত হওয়ায় তাদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাবে এবং পরিকল্পনা দুর্বল হয়ে পড়বে। এই শ্রেণীর পক্ষে, কারখানায় দিনমজুরী করা এবং কৃষক-সমবায় সমিতিতে যোগদান করা ছাড়া কোন উপায় নেই। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং এই ধরণের প্রচেষ্টা গ্রামসমূহে

এই সব সমিতি গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। কিন্তু এই সব কাজে অত্যাবশ্যকীয় একটি জিনিষ অবহেলা করা হচ্ছে। এই সমস্ত প্রচেষ্টার সঙ্গে বাধ্যতামূলক সর্বজনীন প্রাথমিক বা প্রাথমিকোত্তর শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা করকার। গত শতাব্দীর প্রথম দিকে ডেনমার্কের অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট বোঝা গেছে, কৃষি-ব্যবস্থায় উন্নতিমূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং সমবায় সমিতি গড়ে তোলা সফল করতে হলে গ্রামের জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের মনকে গড়ে তোলা দরকার।

দৈনন্দিন জীবনে এবং সামাজিক উপলক্ষ্যে বর্ণবৈষম্য দূর করার উপায় হোল শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নতি। এ সমস্ত পদ্ধতির দ্বারা অবশ্য একটি সমস্যার সমাধান হবে না। তা হচ্ছে বর্ধমান জনসংখ্যা। সম্প্রতি একটি উপজাতির জনসমষ্টি পর্যবেক্ষণ করে লেখক দেখিয়েছেন শিক্ষার মোটামুটি বিস্তার পরিবার-পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রচারকে সম্ভব করবে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই সরল মানুষগুলি, যেমন সাঁওতালরা মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সমবায় শস্যভাণ্ডার স্থাপন করেছে। যেসব জায়গায় জমির পরিমাণ পাঁচ একরের বেশি, সেসব জায়গায় তারা বড় বড় বাড়ী (যদিও মাটীর বাড়ী) তৈরী করে। বাংলাদেশে কয়েক হাজার সাঁওতাল গ্রাম পর্যবেক্ষণ করে এ তথ্য পাওয়া গেছে। এই তথ্যে জানা গেছে সাঁওতালরা স্থানীয় শিক্ষিত হিন্দুদের অনেক লক্ষণ আয়ত্ত করার চেষ্টা করে, যদিও যে সম্প্রদায় তাদের শোষণ করে, তাদের তারা খুবই ঘৃণা করে। কিন্তু এই সব সাঁওতাল গ্রামগুলিতে শিক্ষার হার শতকরা ২০%। কিন্তু এই শিক্ষার হার জন্মহারের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করেনি। গ্রামের উঁচু বর্ণ এবং নীচু বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা নেই। নিরক্ষর শ্রেণী এ সম্পর্কে কোনও উপায়ের কথা জানে না, আর শিক্ষিত সম্প্রদায় এসব জিনিষ ভাল চোখে দেখে না। সরল সাঁওতালরা যাদের শ্রদ্ধা করে এবং অনেকাংশে অনুসরণ করে, তাদের মধ্যে পরিবার-পরিকল্পনার কোন চিহ্ন দেখতে পায় না। এই সমস্যার সমাধান করতে হলে শিক্ষিত এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত শ্রেণীর মধ্যে প্রথমে পরিবার-পরিকল্পনার প্রচার-কার্য চালাতে হবে এবং এ ব্যাপারে তাদের মনকে গড়ে তুলতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এই তিনটি পন্থাই প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়ঃ (১) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং কিছু

পরিমাণে প্রাথমিকোত্তর শিক্ষা, (২) ভূমিহীন কৃষকদের শিল্পে কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা এবং স্বল্প উৎপাদকের সমবায় সমিতি এবং (৩) গ্রামের তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে পরিবার পরিকল্পনায় শিক্ষিত করা।

একথা বোঝা যাচ্ছে যে এই কাজগুলি খুব অল্প সময়ের মধ্যে করতে হবে যাতে উৎপাদনের বৃদ্ধি হয়ে অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হয় এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী সকলের পক্ষে সুলভ্য হয়। এই লক্ষ্যে পৌছাতে পারলে জনসাধারণ জীবনধারণের উন্নত মানকে বজায় রাখার জন্য পরিবার নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন বুঝতে পারবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য উৎপাদন, বণ্টন এবং উপভোগের ক্ষেত্রে কতকগুলি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। এই নিয়ন্ত্রণের ফলে স্বাধীনতা ব্যাহত হয়। আবার, স্বাধীন অবস্থায় স্বাতন্ত্র্য এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা দীর্ঘমেয়াদী উন্নতির জন্য প্রয়োজন। জাতীয় উন্নতির স্বাতন্ত্র্য পরিহার করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলে সচেতন থাকে, এবং যারা এই সমস্ত বিষয়ে জড়িত তারা যদি স্বেচ্ছায় স্বাতন্ত্র্য বর্জন করতে রাজী থাকে তাহলে নেতৃত্বের প্রতি মানসিক বশ্যতার বিপদ থাকে না। এই চেতনার সঙ্গে যদি উপযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিকল্পনার উন্নতি পরীক্ষা করার নিঃস্বার্থ ব্যবস্থা থাকে, তাহলে কোন শ্রেণীস্বার্থের প্রতি বা দলের প্রতি আনুগত্যের বিপদ থাকবে না, এবং একনায়কত্ব গ'ড়ে ওঠারও সম্ভাবনা থাকবে না। এক্ষেত্রে, যাঁরা সমাজের শীর্ষে এবং ক্ষমতায় আসীন রয়েছেন, তাঁরা স্বচ্ছ চিন্তা, পরিকল্পনা-গুলির যুক্তিসঙ্গত রূপায়ণ, সততা এবং কর্তব্যের প্রতি অনুরাগের একটি কর্ম আদর্শ দেশের জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে পারেন।*

---

* গোখেল ইন্‌ষ্টিটিউট অব্‌ পলিটিক্স অ্যাণ্ড ইকনমিক্স জানুয়ারী ২১-২৮, ১৯৬১তে 'পাথস্‌ টু ইকনমিক গ্রোথ' শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক আলোচনার ব্যবস্থা করেন। লেখক সেই আলোচনায় "Changing Values and Social Patterns in Caste Society in West Bengal Villages" নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বর্তমান প্রবন্ধটি সেই ইংরাজী প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা।

রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি'

রথীন্দ্রনাথ রায়

'চোখের বালি' (১৯০২) উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের ক্ষেত্রে নূতন ধারা প্রবর্তন করেছেন। 'রাজর্ষি' ও 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাস দুটিতে রবীন্দ্রনাথের শিল্পবৈশিষ্ট্যের কোনো ছাপ পড়ে নি, এ কথা সঙ্গত নয়। তবু এ কথা অনায়াসেই বলা যায় যে, কবির এই দুটি অপরিণত কাহিনী বঙ্কিম-যুগের রোমান্সরঞ্জিত চন্দ্রাতপের ছায়ায় রচিত। 'চোখের বালি'তেই উপন্যাসক্ষেত্রে কবি সর্বপ্রথম তাঁর স্বক্ষেত্র আবিষ্কার করেছেন। 'চোখের বালি' রচনার প্রায় ছ' বছর পর 'নৌকাডুবি' (১৯০৬) প্রকাশিত হয়। 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' ও পরবর্তী উপন্যাস 'গোরা'-র মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক না, কয়েকটি বিষয়ে মিল আছে। এই সময়ে যে-সব সমস্যা কবিচিত্তকে আলোড়িত করেছিল, তাকে তিনি নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। এই উপন্যাসত্রয়ীতে তিনি বাংলা উপন্যাসের মোড় ফিরিয়ে দিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে একবার মাত্র পিছনে হটতে দেখা যায়। এই বিস্ময়কর ব্যতিক্রম হলো নৌকাডুবি। 'চোখের বালি'তে কবি যে অন্তর্মুখী দৃষ্টি ও তীব্র বিশ্লেষণের সঙ্গে সমস্যাকে বিচার করে দুঃসাহসিকতার সঙ্গে অগ্রসর হয়েছেন, 'নৌকাডুবি'তে তার চিহ্নমাত্রও নেই। 'চোখের বালি'র পরিণতি যাই হোক না কেন, প্রেমের জটিলাবর্ত চিত্রণে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতায় রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে নূতন পথরচনা করেছেন। 'নৌকাডুবি'তে সেই তীব্রোজ্জ্বল দীপ্তি নেই, নির্ধারিত গণ্ডী লঙ্ঘনের বলিষ্ঠ প্রচেষ্টাও সেখানে অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই ব্যতিক্রমটি আশ্চর্য বলেই মনে হয়। 'চোখের বালি'র পরিণতির মধ্যে দুর্বলতা পরিস্ফুট। কবি নিজেও এ সম্পর্কে কুণ্ঠিত ছিলেন।[১] কিন্তু 'সস্তা

১। "চোখের বালি বেরোবার অনতিকাল পর থেকেই তার সমাপ্তিটা নিয়ে আমি মনে-মনে অনুতাপ করে এসেছি। নিন্দার দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্ত

দামের মনোরঞ্জনী প্রলেপ ব্যবহার করার 'দুষ্কর্ম' শুধু 'চোখের বালি'র মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না, 'নৌকাডুবি' পর্যন্তও গড়িয়েছিল।

'চোখের বালি'তে যে সাহসিকতা ছিল, 'নৌকাডুবি'তে তার লেশমাত্রও নেই। প্রথম থেকেই তিনি প্রচলিত সংস্কার ও নীতিজ্ঞানকে মেনে নিয়েছেন। নিষিদ্ধ প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণ ও কবিকথিত 'নির্মম সাহিত্যে'র রাগরক্ত বহ্নিশিখাও এখানে জ্বলে ওঠে নি। 'চোখের বালি'তে যার সূচনা করেছেন, তার পূর্ণতর পরিণতিই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু 'নৌকাডুবি'তে কবি পূর্ববর্তী পথ ছেড়ে দিয়ে অত্যন্ত সতর্কভাবে প্রচলিত সংস্কার, নীতি ও সমাজশাসনকে মেনে নিয়েছেন। কবির এই বিশিষ্ট মানসিকতার ছাঁচে চরিত্রগুলিই রচিত হয়েছে। রমেশ, নলিনাক্ষ, কমলা, হেমনলিনী—কোনো চরিত্রেই সংস্কার ও সমাজবিধি লঙ্ঘনের ক্ষীণতম প্রচেষ্টাও নেই। মহেন্দ্র-আশা-বিহারী-বিদোদিনীর চতুষ্কোণ সমস্যা যে বহ্ন্যুৎসবের সৃষ্টি করেছে, তার নিরুত্তাপ ভস্মাবশেষও এখানে অনুপস্থিত। এর কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। তখনকার দিনে এই জাতীয় 'নির্মম সাহিত্য' নিঃসন্দেহে অকুণ্ঠ অভিনন্দন পায় নি। 'চোখের বালি'র শেষদিকে যুগরুচি তৃপ্ত করার জন্য 'সুলভ মনোরঞ্জনী' প্রলেপ দিতে হয়েছে, কিন্তু এইখানেই নিষিদ্ধ এলাকায় পদক্ষেপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হলো না, 'নৌকাডুবি'তেও তার জের চললো।

নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার অনেকখানি অংশই নিজের রচনা দিয়ে কবিকে পূরণ করতে হ'ত। 'চোখের বালি' স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির আনন্দে লিখেছিলেন, 'নৌকাডুবি'র পিছনে ছিল মাসিক পত্রিকার তাগিদ।[২]

হওয়া উচিত। মাসিকপত্র অনেক সময় লেখকদের অসতর্ক করে দেয়, লেখায় সস্তা দামের মনোরঞ্জনী প্রলেপ ব্যবহার করবার দিকে ঝোঁক আসে। এই দুষ্কর্ম করেছি, কিন্তু তাতে ফল পাইনি, পাঠকরা যথেষ্ট চোখ রাঙিয়েছিল।"··· কবিতা, আশ্বিন ১৩৫২।

২। "নৌকাডুবি উপন্যাস লেখকের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের রচনা নয়, মাসিক পত্রের তাগাদায় মাসের পর মাস বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্নভাবে লেখা।···যে বৎসর নৌকাডুবি 'বঙ্গদর্শনে' ছাপা হইতে আরম্ভ হয়, সেই বৎসর সম্পাদকের হাতে ক্রমশ-প্রকাশ্য উপন্যাস আর ছিল না।···অন্তরের প্রেরণায় আর প্রয়োজনের তাড়নায় রচনার মধ্যে পার্থক্য কিছু আশ্চর্যের কথা নয়!"

—রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা (১ম সং) : ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, পৃ ৪১৫

রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্বীকার করেছেন যে 'নৌকাডুবি' রচনার পিছনে ছিল 'প্রকাশকের ফরমাশ': "প্রকাশক জানতে চেয়েছেন নৌকাডুবি লিখতে গেলুম কী জন্যে। এ-সব কথা দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। বাইরের খবরটা দেওয়া যেতে পারে, সে হল প্রকাশকের তাগিদ।...প্রকাশকের ফরমাশকে প্রেরণা বললে বেশি বলা হয়। অথচ তা ছাড়া বলব কী? গল্পটায় পেয়ে বসা আর প্রকাশক পেয়ে বসা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। বলাবাহুল্য ভিতরের দিকে গল্পের তাড়া ছিল না। গল্প লেখার পেয়াদা যখন দরজা ছাড়ে না তখন দায়ে পড়ে ভাবতে হল কী লিখি।" ৩

অন্তরের সমর্থন না থাকার জন্য 'নৌকাডুবি'তে কবিহৃদয়ের সেই বৈদ্যুতিক স্পর্শ নেই, যা এক সময় 'চোখের বালি'কে প্রাণচঞ্চল করে তুলেছিল। আর একটি প্রসঙ্গও এখানে উল্লেখযোগ্য। 'চোখের বালি'তে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-পর্বের ছত্রছায়া অতিক্রম করে এক নূতন পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। পরবর্তী উপন্যাস 'নৌকাডুবি'তে তিনি আবার গতযুগের কলাকৌশলের মধ্যেই আত্মসমর্পণ করেছেন। উপন্যাসটি একটি আকস্মিক বিপর্যয়ের উপরে রচিত হয়েছে। আকস্মিক বিপর্যয়ের জের সহজে মেটে নি। সুদীর্ঘ উপন্যাসটির বহু বঙ্কিম-ঘটনাবৃত্ত এই দৈব-দুর্ঘটনার বন্ধুর পথ দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। এর সূচনায় আছে দৈব দুর্ঘটন, আর উপসংহারে আছে আকস্মিকতা। লেখকের রোমান্স-প্রবণতা অপ্রত্যাশিত ঘটনাবলীর অসমতল পথ বয়ে অগ্রসর হয়েছে। উনিশ শতকীয় জটিল ও ঘোরালো প্লটের মোহজালকে এখন পর্যন্তও যে কবি সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারেন নি, 'নৌকাডুবি'-ই তার প্রমাণ। বক্তব্য-দুর্বল রোমাঞ্চকর প্লটসর্বস্ব উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাসের বৃত্তপথে কবি আর একবার পদসঞ্চার করেছেন।

॥ ২ ॥

'নৌকাডুবি' উপন্যাসের বিরুদ্ধে আর যত অভিযোগই করা যাক না কেন, নামকরণের মধ্যে সামান্যতম অসঙ্গতিও নেই। প্রবল ঝড়ে বরযাত্রী ও বর-কনের নৌকাডুবির দুর্ঘটনা কাহিনীর ভিত্তি। কমলা-রহস্য উদ্‌ঘাটন

৩। 'নৌকাডুবি'-র 'সূচনা', রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড।

করতে রমেশের দীর্ঘ তিনমাস সময় লাগা একটু অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ঘটনাটিকে যতদূর সম্ভব সম্ভাব্য ও যুক্তিসঙ্গত করে তোলার চেষ্টা করেছেন। রমেশ নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিতার নির্দেশে বিবাহ করেছিল এবং "বিবাহকালে রমেশ ঠিকমত মন্ত্র আবৃত্তি করিল না, শুভদৃষ্টির সময় চোখ বুজিয়া রহিল, বাসরঘরের হাস্যোৎপাত নীরবে নতমুখে সহ্য করিল, রাত্রে শয্যাপ্রান্তে পাশ ফিরিয়া রহিল, প্রত্যুষে বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।" কিন্তু কবির এই যুক্তিকে কমলা-রহস্য উদ্‌ঘাটনের পক্ষে যথেষ্ট বিচারসহ বলে মনে হয় না—অন্ততঃ তিনমাস পর্যন্ত এই রহস্যজাল দীর্ঘায়িত করার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না। ঘটনাটিকে অনাবশ্যকভাবে জটিল করে তোলার জন্য রমেশও অনেকাংশ দায়ী। রমেশের দ্বিধাগ্রস্ততা কমলা-রহস্যকে জটিলতর করে তুলেছে। রমেশ মনে মনে নিজের মতো করে সমস্যার গ্রন্থিমোচন করতে চেয়েছিল: "রমেশ প্রত্যুষে উঠিয়া ময়দানের নির্জন রাস্তায় পদচারণ করিতে করিতে স্থির করিল, বিবাহের পর সে কমলা সম্বন্ধে হেমনলিনীকে সমস্ত ঘটনা আগাগোড়া বিস্তারিত করিয়া বলিবে। তাহার পরে কমলাকেও সমস্ত কথা বলিবার অবকাশ হইবে। এইরূপ সকল পক্ষে বোঝাপড়া হইয়া গেলে কমলা স্বচ্ছন্দে বন্ধুভাবে হেমনলিনীর সঙ্গেই বাস করিতে পারিবে। দেশে ইহা লইয়া নানা কথা উঠিতে পারে, ইহাই মনে করিয়া সে হাজারিবাগ গিয়া প্র্যাকটিস করিবে স্থির করিয়াছে।" (ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ)

হেমনলিনীর সঙ্গে বিবাহের আগে রমেশ কেন যে কমলা-রহস্য উদ্‌ঘাটনের কোনো আগ্রহ প্রকাশ করে নি, তা দুর্বোধ্য। হয়তো তার দ্বিধাগ্রস্ততাই এর কারণ। এই দুর্বলতার রন্ধ্রপথ দিয়েই শনি প্রবেশ করেছে—অক্ষয়ের হীন চক্রান্ত সফল হয়েছে। রমেশ যদি কমলা-রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করত, তা হলে অক্ষয়ের গোয়েন্দাগিরির কোনো সুযোগই থাকত না। কিন্তু 'নৌকাডুবি'তে কোনো বক্তব্য ছিল না। তাই এত সহজে রহস্যের সমাধান হলে মাসিক পত্রিকার সাতাশ মাসের (বৈশাখ ১৩১০—আষাঢ় ১৩১২) ক্ষুধা মেটানো সহজ হতো না। কমলার কাছেও রমেশ সহজে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেছে। ষ্টীমার যাত্রার সময় যথেষ্ট অবকাশ ছিল। গাজিপুরে চক্রবর্তী খুড়োর বাড়িতেও অনায়াসে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করা

চলতো। কিন্তু সেখানেও লেখক আকস্মিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। হেমনলিনীকে রমেশ কমলার সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে যে চিঠি লিখেছিল, রমেশের অনবধানতায় সে চিঠি কোথায় গড়িয়ে পড়েছিল! সেই চিঠি পানের মোড়ক হয়ে কমলার হাতেই এসে পড়ল! এখানে আর এক আকস্মিকতা!

নলিনাক্ষ-কমলার মিলন আরো আকস্মিক। এর জন্য কাহিনীর কোনো চরিত্রেরই মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। নবীনকালীর বাড়িতে নলিনাক্ষ সম্পর্কে কমলার নবজাগ্রত কৌতূহল এবং প্রেম-ভক্তির অভিব্যক্তিকেও কিঞ্চিৎ আকস্মিক বলেই মনে হয়। মীরাট যাত্রার পথে মোগলসরাই স্টেশনে উমেশের সঙ্গে কমলার আকস্মিক সাক্ষাৎ, চক্রবর্তীখুড়োর সঙ্গে পুনর্মিলন, ক্ষেমঙ্করীর স্নেহে নলিনাক্ষের গৃহে আশ্রয় লাভ, যোগেনের সঙ্গে রমেশের কাশীতে আগমন ও তার পরবর্তী ঘটনাগুলি যেমন বিদ্যুৎগতি, তেমনি অতি-নাটক লক্ষণাক্রান্ত। উপন্যাসের দুই-তৃতীয়াংশ কাহিনী মন্থরগতিতে অগ্রসর হয়েছে, কোনো কোনো অংশ অনাবশ্যক দীর্ঘ করা হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসের শেষাংশে দ্রুত পরিসমাপ্তির চিহ্ন সুপরিস্ফুট। এতে কাহিনীর ভারসাম্য ক্ষুণ্ন হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাসে রোমাঞ্চকর ঘটনা ও গোয়েন্দা কাহিনীসুলভ শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ার অভাব ছিলনা। বঙ্কিম-অনুবর্তী ও রবীন্দ্র-প্রভাবের পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের রচনায় তার প্রচুর দৃষ্টান্ত মিলবে। রমেশের অপরাধ প্রমাণ করার জন্য অক্ষয়ের আচরণ সুলভ গোয়েন্দা কাহিনীর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কলকাতা থেকে গোয়ালন্দের স্টীমারঘাট পর্যন্ত অক্ষয় রমেশ ও কমলাকে যে ভাবে অনুসরণ করেছে, তার মধ্যে গোলাগুলি খুন-জখম না থাকলেও উত্তেজনার অভাব নেই। জীবনে আকস্মিক বিপর্যয় ঘটতে পারে —মাছের কাঁটা গলায় বিঁধেও মানুষের মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু একটি সুদীর্ঘ উপন্যাসের আগাগোড়াই যদি এই আকস্মিকতার সুযোগ নিয়ে গড়ে ওঠে, তা হলে তা শিল্পাংশে দুর্বল হয়ে পড়ে। ডেসডিমোনার রুমাল হারানোর ব্যাপার কিম্বা রোমিও জুলিয়েটের কাহিনী বিন্যাসের মধ্যেও 'অ্যাক্সিডেন্ট' আছে। কিন্তু নাটক বা উপন্যাসের মধ্যে মাত্রাতিরিক্তরূপে আকস্মিকতার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত নয়। শেকসপীয়রের নাটক সম্পর্কে উক্ত প্রসঙ্গের আলোচনা করতে গিয়ে ব্রাড্‌লি যা বলেছেন তা উল্লেখযোগ্য "On the other hand any large admission of chance into the tragic

sequence would certainly weaken, and might destroy, the sense of causal connection of character, deed and catastrophe. And Shakespeare really uses it very sparingly. "[4]

উপন্যাসটির নায়ক রমেশ। হেমনলিনী ও কমলা—উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। 'চোখের বালি'-উপন্যাসের মহেন্দ্র ও বিহারীর সঙ্গে তার কোনো মিলই নেই। মহেন্দ্রকেই তো রমেশের বিপরীত মেরুর অধিবাসী বলা যায়। রমেশ সুভদ্র, সংযত, কর্তব্যপরায়ণ ও সহৃদয়। কিন্তু এই চরিত্রটির মধ্যে কোনো বন্ধুরতা বা জটিল ঘূর্ণ্যাবর্ত নেই—চরিত্রের কোনো অংশকেই সেখানে গভীর রেখায় আঁকা হয় নি। কোনদিনই সে নিজের ব্যক্তিত্বকে অতিমাত্রায় প্রয়োগ করে নি। জীবনের চূড়ান্ত পরীক্ষার দিনেও তার চিত্ততলে যেমন গভীর আলোড়ন লক্ষ্য করা যায় না, তেমনি আকস্মিক বিপর্যয় তাকে তেমন বিমূঢ় করতেও পারে নি। রমেশ বিদ্রোহী নয়, অবস্থা-বিপর্যয়কে সে শিরোধার্য করে নিতে পারে। এমন কি এক সময় হেমনলিনীকে পাওয়ার আশা জলাঞ্জলি দিয়ে কমলাকে সে পত্নীরূপে গ্রহণ করতেও চেয়েছে ঃ

"ঝড়জলের পর সেদিন রাত্রে জোৎস্না পরিষ্কার হইয়া ফুটিয়াছে। রমেশ ডেকের কেদারায় বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, 'এমন করিয়া আর চলিবে না। ক্রমেই বিদ্রোহী কমলাকে লইয়া জীবনের সমস্যা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠিবে। এমন করিয়া কাছে থাকিয়া দূরত্ব রক্ষা করা দুরূহ। এবারে হাল ছাড়িয়া দিব। কমলা আমার স্ত্রী—আমি তো উহাকে স্ত্রী বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। মন্ত্র পড়া হয় নাই বলিয়াই কোনো সংকোচ করা অন্যায়। যমরাজ যেদিন কমলাকে বধূরূপে আমার পার্শ্বে আনিয়া দিয়া নির্জন সৈকত-দ্বীপে স্বয়ং গ্রন্থিবন্ধন করিয়া দিয়াছেন—তাঁহার মতো এমন পুরোহিত জগতে কোথায় আছে!' (নৌকাডুবি, ৩০)

হেমনলিনী ও কমলা—যে দুইজন নারী রমেশের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত হয়েছিল, তারাই তার জীবনকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছিল। পাশা-পাশি বাড়ীর নির্জন ছাদের অনুকূল অবকাশ, অন্নদাবাবুর চায়ের টেবিলে নিত্য উপস্থিতি রমেশের সঙ্গে হেমনলিনীর সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠতর করে তুলেছিল।

4 Shakespearean Tragedy (1941) page 15.

এই ঘনিষ্ঠতা যে এক সময় বিবাহবন্ধনে পরিণত হবে, এ বিষয়ে তার কোনো সংশয় ছিল না। এমন কি সে তার পিতাকেও এ বিষয়ের আভাস দেয়। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিবাহ ও দৈবদুর্বিপাকের পর যখন আকস্মিকভাবে হতচেতনা কমলার সঙ্গে তার দেখা হলো, তখনো পত্নী হিসেবে তাকে গ্রহণ করতে কোনো বাধা হয় নি, হেমের প্রতি তার কোনো প্রণয়াকর্ষণের পরিচয়ও পাওয়া যায় নি। এই গ্রাম্য বধূটিকে ঘিরেই সে তার কল্পনার স্বর্গ রচনা করেছে: "সে এই বালিকার মধ্যে কল্পনার দ্বারা তার ভবিষ্যৎ গৃহলক্ষ্মীকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। সেই উপায়ে তাহার স্ত্রী একই কালে বালিকা বধূ, তরুণী প্রেয়সী এবং সন্তানদিগের অপ্রগল্‌ভা মাতারূপে তাহার ধ্যাননেত্রের সম্মুখে বিচিত্রভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।" (নৌকাডুবি, ৪)

তিনমাস পরে রমেশ কমলার প্রকৃত পরিচয় পেয়েছে। কিন্তু এই তিন-মাসের মধ্যে হেমনলিনীকে না পাওয়ার জন্যে কি রমেশের মনে কোনো বেদনাবোধই ছিল না? কমলা যে পরস্ত্রী, এই প্রমাণ পাওয়ার পর হেমনলিনীর কাছে সে 'পূর্বের অধিকার' পাবে কি না, এই কথা চিন্তা করেছে। রমেশ চরিত্রের প্রেমানুভূতির মধ্যে তীব্রতার অভাব আছে। তাই তার দোলাচল চিত্তের এক একটি সিদ্ধান্ত সুবিধাবাদীর দর্শন বলে মনে হয়। আসল কথা এ দুর্বলতা তার প্রেমানুভূতির নয়, ব্যক্তিত্বের। রমেশের সংযত ও অনুচ্ছ্বসিত প্রেমের প্রকাশের মধ্যে কোনো অনিয়ন্ত্রিত হৃদয়াবেগ উদ্বেলিত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে নানাভাবে তার নবজাগ্রত প্রেমানুভূতির স্পন্দন অলক্ষিত নয়। হারমোনিয়াম বাজানো উপলক্ষ্য করে দু'জনের সম্পর্ক নিবিড়তর হয়ে উঠেছে। কবি রমেশ ও হেমনলিনীর সম্পর্ককে স্নিগ্ধ ও মৃদুরেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন: "রমেশের আর কথা বাহির হইল না, তাহার চোখের প্রান্তে জল দেখা দিল। তখন হেমনলিনী তাহার স্নিগ্ধকরুণ দুই চক্ষু তুলিয়া রমেশের মুখের দিকে স্থির করিয়া রাখিল। তাহার পরে সহসা বিগলিত অশ্রুধারা হেমনলিনীর দুই কপোল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই নিভৃত বাতায়নতলে দুইজনের মধ্যে একটি বাক্যবিহীন শান্তি ও সান্ত্বনার স্বর্গখণ্ড সৃজিত হইয়া গেল।"

স্টীমার যাত্রার দীর্ঘ অবকাশে রমেশের সূক্ষ্ম ও পরিবর্তনশীল মনোভাবকে কবি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসের এই অংশটিই

সবচেয়ে জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক। কর্তব্যবোধ, নীতিজ্ঞান ও সুকোমল প্রেমানুভূতির বিচিত্র সংঘাতে রমেশ চরিত্রটি এই অংশে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের শেষ দিকে যখন কমলা-সমস্যার সমাধান হলো, তখন বেদনাহত রমেশের বিড়ম্বিত জীবন সহানুভূতি আকর্ষণ করে। হেমনলিনীর কাছে রমেশ কমলা সম্পর্কিত যে চিঠি লিখেছিলো, তাতে তার বেদনাতুর হৃদয়ের একটি স্নিগ্ধ সুকুমার স্পর্শ আছে। হেমনলিনীকে সে লিখেছে : "সংসারে যে-দুটি রমণীকে আমি হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিয়াছি তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হইবার সাধ্য আমার নাই।"—রমেশের এই চিঠির মধ্যে কোনো চিত্তবিক্ষোভ নেই—এক দাহহীন প্রশান্ত বেদনায় তার হৃদয় ভরে উঠেছে। সংযম ও কর্তব্যবুদ্ধি তার প্রেমকে শান্ত মধুর করে তুলেছে। হেমনলিনী ও কমলা—কারো কাছেই সে নিজেকে প্রবল ও পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে নি। কর্তব্যবুদ্ধি ও নীতিজ্ঞান সেখানে বাধা দিয়েছে। এইখানেই রমেশ চরিত্রের ট্রাজেডির বীজ নিহিত আছে। আগাগোড়া সে এই বেদনাকে বহন করে চলেছে। রমেশ চরিত্রে 'গোরা'-র বিনয়ের একটি আভাস পাওয়া যায়।

হেমনলিনী চরিত্রকে গভীর রেখায় আঁকা হয় নি, তীক্ষ্ণ-দীপ্ত বিশ্লেষণের সাহায্যেও তার হৃদয়ের গভীর অন্তঃপুর আলোকিত করা হয় নি। কিন্তু এই অভিজাতরুচি, অবাকপটু, শান্ত-সংযত চরিত্রটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হেমনলিনী বাংলা সাহিত্যের নূতন নায়িকা। বঙ্কিমচন্দ্রের ও বঙ্কিমযুগের লেখকদের উপন্যাসে এই শ্রেণীর নায়িকার আভাস মাত্রও ছিল না। এর আগে স্ত্রীশিক্ষার অভাবাত্মক দিকটির বিদ্রূপাত্মক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে সত্য, কিন্তু তার যে একটি সৌকুমার্য ও সুসঙ্গতিও দিক আছে, তা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে সর্বপ্রথম উদ্‌ঘাটিত হলো।[৫] হেমনলিনীর চরিত্রে কোনো

৫। "ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষে', তারক গাঙ্গুলি 'স্বর্ণলতা'য় ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু 'মডেল ভগিনী' গ্রন্থে ব্রাহ্মসমাজের অভাবাত্মক দিকের অতিরঞ্জিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা'য় ব্রাহ্মসমাজের সমালোচনা আছে সত্য, কিন্তু তিনি অভাবাত্মক দিকটিই কেবল দেখান নাই, সমাজের প্রতি সুবিচারেরও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন।"

—রবীন্দ্রজীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—পৃঃ ৬৫।

রূঢ়তা বা আতিশয্য নেই। তার প্রেমের মধ্যেও একটি শান্ত-সমাহিত বিরল মাধুর্য আছে। কবি, হেমনলিনীর যে ছবি এঁকেছেন, তাতেই তার চরিত্র ব্যঞ্জিত হয়েছে :

"রমেশ একেবারে তাহার পার্শ্বে যাইতে কুণ্ঠিত হইল। পশ্চাৎ হইতে কিছুক্ষণের জন্য স্থির দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল। শরতের অপরাহ্ন-আলোকে ঐ বাতায়ন-বর্তিনী স্তব্ধ মূর্তিটি রমেশের মনে একটি চিরস্থায়ী ছবি আঁকিয়া দিল। ঐ সুকুমার কপোলের একটি অংশ, ঐ সযত্নরচিত কবরীর ভঙ্গি, ঐ গ্রীবার উপরে কোমলবিরল কেশগুলি, তাহার নীচে সোনার হারের একটুখানি আভাস, বাম স্কন্ধ হইতে লম্বিত অঞ্চলের বঙ্কিমপ্রান্ত, সমস্তই রেখায় রেখায় তাহার পীড়িত চিত্তের মধ্যে যেন কাটিয়া বসিয়া গেল।" (নৌকাডুবি, ১৪)

অক্ষয়ের চক্রান্তে যখন রমেশ ও কমলার সম্পর্ক প্রকাশিত হলো, তখন হেমনলিনী ব্যথায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছে কিন্তু রমেশের উপর সে অভিমান করে নি। অক্ষয়ের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল না, তবুও সে তাকে আঘাত করে নি। রমেশের প্রতি তার ভালোবাসা যে কত গভীর, তা নলিনাক্ষের সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া থেকে জানা যায়। নলিনাক্ষকে সে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু ভালোবাসে রমেশকেই। তাই নলিনাক্ষের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে তার মনে হয়েছে : "কিন্তু যখনি বিবাহের প্রস্তাবে তাহাকে তাহার হৃদয়ের গভীরতম দেশের আশ্রয়সূত্র হইতে টানিয়া আনিতে চাহে তখনি সে বুঝিতে পারে, সে বন্ধন কী কঠিন! তাহাকে কেহ ছিন্ন করিতে আসিলেই হেমনলিনীর সমস্ত মন ব্যাকুল হইয়া সেই বন্ধনকে দ্বিগুণবলে আঁকড়িয়া ধরিতে চেষ্টা করে।" হেমনলিনীর চরিত্রের চারদিকে একটি সুকোমল মাধুর্য আছে, কিন্তু সহনশীলতা ও সংযম তার চরিত্রে দৃঢ়তা সঞ্চার করেছে। এই দৃঢ়তা ও উত্তেজনাহীন মনোধর্মই তাকে চরম আঘাতের মুহূর্তে অবিচলিত রেখেছে। কিন্তু হেমনলিনী চরিত্রকে পূর্ণাঙ্গ চরিত্র বলা যায় না। কেবল পিতার সঙ্গে স্নেহ-বাৎসল্য সম্পর্কটি ছাড়া, তার চরিত্রের অনেকখানি অংশই যেন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। কিন্তু হেমনলিনী রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যতের নায়িকাদের পূর্বাভাস। এই চরিত্রেরই পূর্ণাঙ্গ রূপ সুচরিতা, লাবণ্য ও

কুমুর মধ্যেও এই চরিত্রের অনেকখানি উপকরণ আছে। সুতরাং এই চরিত্রের ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

'নৌকাডুবি' উপন্যাসের সবচেয়ে জীবন্ত চরিত্র কমলা। এই চরিত্র অঙ্কনে ঔপন্যাসিকের সুনিপুণ বিশ্লেষণ ও কার্যকারণ সম্পর্কের গ্রন্থন দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হেমনলিনীর চরিত্রকে লঘুস্পর্শ অস্পষ্ট রেখায় আঁকা হয়েছে—তার অনেকখানি অংশ অস্ফুট, খানিকটা অনুমান ও কল্পনার সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কমলা চরিত্র অঙ্কনে এর বিপরীত পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়েছে। এখানে রেখাগুলি শুধু যে স্পষ্ট, তাই নয়, কবিকল্পনার বিচিত্র বর্ণসম্পাতও ঘটেছে। জীবনের বিচিত্র ঘটনাবৃত্ত তার চরিত্রে যে পরিবর্তন ও রূপান্তরের সৃষ্টি করেছে তার সহজ ও বাস্তবনিষ্ঠ বর্ণনা উপন্যাসটির সম্পদ। কমলা চরিত্রের ক্রমপরিণতি, তার ক্রমবর্ধিত প্রণয়াবেগ, গৃহিণীপনার মধ্যে আপন অধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি ছোটখাটো ঘটনা কমলা চরিত্রের অন্তর্দেশ আলোকিত করেছে। স্টীমারের জীবনযাত্রার মধ্যেই কমলা অনুভব করেছে রমেশের সঙ্গে তার কোথায় যেন একটি ব্যবধান আছে—যাকে সে অবলম্বন করতে চায়, সে তার যথার্থ "নির্ভরস্থল" নয় :

"কমলা কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না, তাহার মনের মধ্যে কী একটা গূঢ় বেদনা পীড়ন করিতেছে। শরৎকালের এই শিশিরাম্বরা ঊষা কেন আজ তাহার আনন্দমূর্তি উদ্‌ঘাটন করিতেছে না? কেন একটা অশ্রুজলের আবেগ বালিকার বুকের ভিতর হইতে কণ্ঠ বাহিয়া চোখের কাছে বার বার আকুল হইয়া উঠিতেছে? তাহার শ্বশুর নাই, শাশুড়ী নাই, সঙ্গিনী নাই, স্বজন পরিজন কেহই নাই, এ কথা কাল তো তাহার মনে ছিল না—ইতিমধ্যে কী ঘটিয়াছে যাহাতে আজ তাহার মনে হইতেছে, একলা রমেশ তাহার সম্পূর্ণ নির্ভরস্থল নহে? কেন মনে হইতেছে, এই বিশ্বভুবন অত্যন্ত বৃহৎ এবং সে বালিকা অত্যন্ত ক্ষুদ্র?"—(নৌকাডুবি, ২৭)

এই সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে কমলার শূন্যতার বেদনা ও বিদ্রোহের অন্তর্জ্বালাকে সার্থকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তার উচ্ছ্বসিত প্রণয়াবেগ স্বাভাবিক পথে চরিতার্থ হয় নি, তাই তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। যেখানে নির্ভরতাও নেই অথচ স্বাধীনতাও নেই, সেখানে তার সঙ্কট চরমে উঠেছে। দুপাশে শস্যক্ষেত্রের মাঝখান দিয়ে গ্রাম্য পথে বধূরা জল নিয়ে

ঘরে ফিরে যায়।—"ঘর বলিতেই তাহার প্রাণ যেন বুকের বাহিরে ছুটিয়া আসিতে চাহিল। একটুখানি মাত্র ঘর—কিন্তু সে ঘর কোথায়! শূন্য তীর ধু ধু করিতেছে, প্রকাণ্ড আকাশ দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যন্ত স্তব্ধ। অনাবশ্যক আকাশ, অনাবশ্যক পৃথিবী—ক্ষুদ্র বালিকার পক্ষে এই অন্তহীন বিশালতা অপরিসীম অনাবশ্যক—কেবল তাহার একটি মাত্র ঘরের প্রয়োজন ছিল।"

কমলার এই চূড়ান্ত চিত্ত-সঙ্কটের মুহূর্তে চক্রবর্তীখুড়োর আবির্ভাব হয়েছে। খুড়োর সদানন্দময় চরিত্রটি এই অস্বস্তিকর শ্বাসরোধকারী অবস্থার মধ্যে মুক্ত বায়ু সঞ্চারিত করেছে। গাজিপুরে শৈলজার সাহচর্যে কমলা তার অভাবকে আরও ভালভাবে উপলব্ধি করেছে: "শৈলজার বলিবার ঢের কথা আছে, কিন্তু কমলার বলিবার কিছুই নাই।···কমলা এতদিন এই শূন্যতা স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার অবকাশ পায় নাই; হৃদয়ের মধ্যে অভাব অনুভব করিয়াছে, মাঝে মাঝে বিদ্রোহভাবও উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার চেহারাটা তাহার চোখে ফুটিয়া ওঠে নাই। বন্ধুত্বের প্রথম আরম্ভেই শৈলজা যখন তাহার স্বামীর কথা বলিতে আরম্ভ করিল—যে সুরে শৈলজার হৃদয়ের সব তারগুলি বাঁধা রহিয়াছে, আঙুল পড়িবামাত্র যখন সেই সুরে বাজিয়া উঠিল, তখন কমলা দেখিল, কমলার হৃদয় হইতে এ সুরের কোনো ঝংকার দিবার নাই; স্বামীর কথা সে কী বলিবে, বলিবার বিষয়ই বা কী আছে। আগ্রহই বা কোথায়!"—এ পর্যন্ত কমলা চরিত্রের বিশ্লেষণের মধ্যে কোনো ফাঁক নেই।

কিন্তু কমলা চরিত্রের শেষদিকে সেই উজ্জ্বল বিশ্লেষণ অনুপস্থিত। হৃদয়ে যে প্রচণ্ড আলোড়ন ও তীব্র বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়েছিল তা হেমনলিনীর কাছে লিখিত রমেশের চিঠিতে নূতন পথ ধরেছে। নবজাগ্রত কমলার অশান্ত হৃদয় যে কিরূপে এক মুহূর্তে একজন অদেখা ও অচেনা ব্যক্তিকে তার প্রীতি ভক্তি সমস্ত কিছু উজাড় করে দেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলো, তার কোনো কার্যকারণ সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের মনেও এ প্রশ্ন জেগে ছিল। তিনি বলেছেন: "এর চরম সাইকোলজির প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, স্বামীর সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে-সংস্কার আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে তার মূল এত গভীর কিনা যাতে অজ্ঞান-জনিত প্রথম ভালোবাসাকে ধিক্কারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে। কিন্তু এ সব প্রশ্নের

সার্বজনীন উত্তর সম্ভব নয়। কোনো একজন বিশেষ মেয়ের মনে সমাজের চিরকালীন সংস্কার দুর্নিবার রূপে এমন প্রবল হওয়া অসম্ভব যাতে অপরিচিত স্বামীর সংবাদমাত্রই সকল বন্ধন ছিঁড়ে তার দিকে ছুটে যেতে পারে।" ৬

কবির এই যুক্তিটিকে যথেষ্ট বিচারসহ মনে হয় না। কমলার মধ্যে 'সংস্কারের দুর্নিবার রূপ' থাকা কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু স্বামী মনে করে যার সঙ্গে দীর্ঘকাল কাটিয়েছে, যার অনাসক্তি তার মধ্যে প্রবল বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছে, স্বামী-রহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পরে সেই পূর্ববর্তী জীবনের কোনো আকর্ষণই কি সে অনুভব করে নি? এতদিনের আন্তরিক সম্পর্কটিকে কি এক মুহূর্তের 'জলগণ্ডুষ অঞ্জলি' দিয়ে কি ধুয়ে-মুছে ফেলা সম্ভব? নলিনাক্ষকে কমলা কখনো চোখে দেখে নি, তার কথাও কারো মুখে শোনে নি, অথচ "নলিনাক্ষ এই নামটি তাহার মনের মধ্যে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল; এই নামটি তাহার সমস্ত বুকের ভিতরটা যেন ভরিয়া তুলিল।" নলিনাক্ষ সম্পর্কে তার এই অনুভূতিকে কি 'সংস্কার' সংজ্ঞা দিলেই সব সমস্যার মীমাংসা হয়? কমলা চরিত্রকে এ পর্যন্ত নিপুণ বিশ্লেষণের সাহায্যেই আঁকা হয়েছিল, কিন্তু আকস্মিকভাবে তার চরিত্রের সঙ্গতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের শেষ রশ্মিটুকুও পাতিব্রত্যের মধ্যে লুপ্ত হয়েছে। এইভাবে একটি জীবন্ত চরিত্র নিষ্ক্রিয় পুতুলে পরিণত হয়েছে।

॥ ৫ ॥

নলিনাক্ষকে রক্তমাংসের মানুষ বলেই মনে হয় না। তাকে অসাধারণ করে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু আসলে সে ধর্মপ্রচারক ও আদর্শবাদী বক্তা ছাড়া আর কিছুই নয়। তার অন্তর্জীবনের কোনো পরিচয় এখানে উদ্‌ঘাটিত হয় নি। এতকাল কেন যে সে তার বিচিত্র বিবাহবৃত্তান্ত গোপন রেখেছিল, তা অনুমান করা কঠিন। নৌকাডুবির অপ্রধান চরিত্রটি অনেক বেশী উজ্জ্বল। সবচেয়ে ভালো ফুটেছে অন্নদাবাবুর চরিত্র। স্নিগ্ধতায়, বাৎসল্যে, করুণায় ও ঔদার্যে এই চরিত্রটি অপরূপ হয়ে উঠেছে। চক্রবর্তীখুড়ো ও শৈল উপন্যাসটির গুমোট আবহাওয়াকে সহজ ও কৌতুক-সমুজ্জ্বল করে তুলেছে।

৬। নৌকাডুবির 'সূচনা': রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড।

রবীন্দ্রনাথ 'নৌকাডুবি'র অপরিণতি ও দুর্বলতার কথা স্বীকার করেছেন, কিন্তু তার সঙ্গে সসঙ্কোচে একটি দাবীও রেখেছেন: "কেবল বলব গল্পের মধ্যে যে-অংশে বর্ণনায় এবং বেদনায় কবিত্বের স্পর্শ লেগেছে সেটাতে যদি রসের অপচয় না ঘটে থাকে তা হলে নৌকাডুবি থেকে সেই অংশে হয়তো কবির খ্যাতি কিছু কিছু বাঁচিয়ে রাখতে পারে।" [৭] নৌকাডুবি সম্পর্কে কবির এই মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। আকস্মিকতার অপঘাতে কাহিনীটি নিঃসন্দেহে দুর্বল ও রোমান্সলক্ষণাক্রান্ত, কিন্তু 'বর্ণনায় ও বেদনায়' কবিত্বের স্পর্শকে অস্বীকার করা যায় না। কবিত্বের লাবণ্য ও সুচিক্কণ গদ্যরীতি কবির এই দুর্বল রচনাটির মধ্যেও অনুপস্থিত নয়। প্রকৃতির বর্ণনায় ও মানব হৃদয়ের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় 'নৌকাডুবি'র অংশবিশেষ কবির নিপুণ কলাকৌশলের পরিচয় দেয়:

"শ্রান্ত হৃদয় যখন রোদন বন্ধ করিল, তখন চন্দ্র অস্ত গেছে। অন্ধকারের মধ্য দিয়া এই নির্জন ধরাখণ্ড অদ্ভুত স্বপ্নের মতো বোধ হইল। বালুচরের অপরিস্ফুট শুভ্রতা প্রেতলোকের মতো পাণ্ডুবর্ণ। নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে নদী অজগর সর্পের চিক্কন কৃষ্ণচর্মের মতো স্থানে স্থানে ঝিক ঝিক করিতেছে।" (নৌকাডুবি, ৩)

দৈবাহত দুটি নরনারীর নির্জন-পরিত্যক্ত জীবনের প্রারম্ভলগ্নে যে নির্মম পরিহাস জড়িত ছিল, তা ভীষণ রমণীয় দুটি অসাধারণ উপমায় অভিব্যক্ত হয়েছে। স্টীমারে কমলার অচরিতার্থ প্রণয়াবেগের প্রবলতাকে কবি বিশ্ব-প্রকৃতির উন্মত্ত প্রণয়লীলার সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত করেছেন। "এই পাগল রাত্রি, এই আকুল আকাশের দিকে চাহিয়া, কমলার বুকের ভিতরটা যে দুলিতে লাগিল তাহা ভয়ে কি আনন্দে নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। এই প্রলয়ের মধ্যে যে একটা বাধাহীন শক্তি, একটা বন্ধনহীন স্বাধীনতা আছে, তাহা যেন কমলার হৃদয়ের মধ্যে একটা সুপ্ত সঙ্গিনীকে জাগাইয়া তুলিল। কিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তাহার উত্তর কি এই ঝড়ের গর্জনের মধ্যে পাওয়া যায়? না, তাহা কমলার হৃদয়াবেগের মতো অব্যক্ত। একটা কোন্ অনির্দিষ্ট অমূর্ত মিথ্যার, স্বপ্নের, অন্ধকারের জাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসিবার জন্য

৭। নৌকাডুবির 'সূচনা', রবীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড)

আকাশ-পাতালে এই মাতামাতি, এই রোষগর্জিত ক্রন্দন।" (নৌকাডুবি, ২৯)

স্টীমার যাত্রার দৃশ্যগুলিতে কবি ও ঔপন্যাসিক হাত মিলিয়েছেন। দুই তীরের মুক্ত প্রকৃতি, দিন-রাত্রির আলোছায়া, সূর্যোদয় ওসূর্যাস্তের বর্ণসমারোহ মেঘ-জ্যোৎস্নার লীলা-বৈচিত্র্য রমেশ ও কমলার সম্পর্ককে ক্রমশ জটিল করে তুলেছে। 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্যায়) পত্রিকার পর্বটি রবীন্দ্রগদ্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট লগ্ন। কবিতার তুলনায় এই পর্বে গদ্যরচনার প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। শুধু গদ্যরচনার প্রাচুর্যই নয়, বৈচিত্র্যও কম নয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষ্য করে কবির রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলীও প্রধানত এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই আত্মপ্রকাশ করে। প্রাচীন ও সমকালীন সাহিত্যের সমালোচনা, লঘুগুরু নানা প্রবন্ধ, ধর্মনৈতিক প্রবন্ধাবলী এই যুগের গদ্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে 'চোখের বালি,' 'নৌকাডুবি'র মধ্যে দিয়েও কবি উপন্যাসের ক্ষেত্রে নূতন ধারা প্রবর্তন করলেন। এ যুগে কবির গদ্যরীতি ধার ও ভার দুদিক থেকেই বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। 'নৌকাডুবির' গদ্যরীতিরই চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছে 'গোরা' (১৯১০) ও 'জীবনস্মৃতি'-র (১৯১২) গদ্যরীতির মধ্যে। 'নৌকাডুবি'-তে কবি এই রীতির অনেক অনেকগুলি ধাপ অতিক্রম করেছেন।

'নৌকাডুবি' শিল্পাংশে দুর্বল হলেও এর একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। পরবর্তীকালের মহৎ উপন্যাস 'গোরা'র অনেকগুলি উপাদান ও উপকরণ এখানে লক্ষ্য করা যায়। মাসিক পত্রের তৃষ্ণা মেটাতে গিয়ে কবিকে দীর্ঘবিলম্বিত কাহিনী রচনা করতে হয়েছিল, কিন্তু এই কাহিনীর মধ্যেই অনাগতকালের এক মহৎ সম্ভাবনার বীজ লুকিয়েছিল। 'নৌকাডুবি'তে' ব্রাহ্মসমাজের যে নাতিদীর্ঘ পটভূমি আছে, সেখানে উক্ত সমাজের তেমন দীর্ঘ বিশ্লেষণ নেই। 'গোরা'-য় ব্রাহ্মসমাজের চিত্রটি দীর্ঘতর ও বিশ্লেষণাত্মক। অক্ষয়ের সঙ্গে পানুবাবুর আত্মিক সম্পর্ক আছে। হেমনলিনীর বিবাহ ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে ললিতার অনুরূপ ঘটনার কিছু সম্পর্ক আছে। হেমনলিনীকে তেমন সুচরিতার পূর্বাভাস বলা যায়, তেমনি ক্ষেমঙ্করীকেও হরিভাবিনীর পূর্বাভাস বলা যায়। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের মধ্যে যেন কবি অজ্ঞাতসারেই পরবর্তী উপন্যাসের কিছু কিছু খসড়া তৈরী করেছেন। এইখানেই 'নৌকাডুবি'র ঐতিহাসিক তাৎপর্য।

দু'জন আধুনিক কবি ঃ জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

আবুল ফজল

অবিমিশ্র কবি বললে যা বুঝায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন্দ্রনাথ হচ্ছেন তাই। জীবনানন্দ আগেই পরলোকগত, সম্প্রতি সুধীন্দ্রনাথও গতায়ু। দেখে কিছুটা আশ্চর্য লাগে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে এ দু'জন কবি মৃত্যুর পরই বেশী করে স্মরণীয় হয়ে উঠেছেন। মৃত্যুর পর কোন মানুষকে স্মরণ করার কারণ, নিঃসন্দেহে তাঁর সাধনা ও অবদানের বিশিষ্টতারই প্রমাণ। স্লো সাইকেল রেসের মতো লেখার ক্ষেত্রেও যদি মন্থর গতির কোন প্রতিযোগিতা থাকতো তাতে এঁরা নিশ্চিত প্রথম ও দ্বিতীয় হতেন। সম্ভবতঃ জীবনানন্দ দাশই হতেন প্রথম!

কবি হিসেবে এ দু'জনের বিশিষ্টতা অনস্বীকার্য কিন্তু দু'জনের কেউ-ই অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এ বললে তা হবে অতিরঞ্জন। এঁদের সাধনা ছিল অকৃত্রিম, একনিষ্ঠ ও সুগভীর, কিন্তু প্রতিভা ছিল সীমিত। শিল্পী হিসেবে এঁরা নিপুণ কিন্তু বিচিত্র নন। এঁদের রচনা গভীর কিন্তু ব্যাপ্তিহীন। এঁদের সুর ও স্বর ছিল অনন্য ও স্বতন্ত্র। প্রধান কবিদের বেলায় যে রকম সুর ও স্বরবৈচিত্র্য দেখা যায় তা এঁদের রচনায় অনুপস্থিত। অপ্রধান হলেও এঁদের গৌরবে এঁরা বিশিষ্ট, চরিত্রে ও ব্যক্তিত্বে এঁরা স্বতন্ত্র—কারো সঙ্গে নন্ 'এক মানসে লীন।' এঁরা দশের সহিত এক নন্। তাই এঁদের রচনায় রয়েছে একটা আলাদা স্বাদ। তবে সেই স্বাদ উপভোগ করতে হলে হতে হবে Connoisseur।

এঁরা ছিলেন বিশেষ করে ও একান্তভাবে কবি। জীবিকার জন্য যে পেশাই এঁরা অবলম্বন করুন না কেন আদতে মন-মেজাজ-ধ্যান-ধারণায় এঁরা নিছক কবি ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। এঁদের পাণ্ডিত্য এঁদের কবিতারই অঙ্গ, তারই প্রস্তুতি পর্ব। হয়ত বা উপাদান-ক্ষেত্র।

কোন ইজম্ নয়, কোন প্রচার-প্রচারণা নয়, কোন দর্শন বা আদর্শও

নয়—শুধু কবিতা। শুধু কবিতাই লিখেছেন এঁরা। সব চেয়ে প্রশংসার কথা কবিতায় এঁরা সংযতবাকের চূড়ান্ত। উভয়ে গদ্য লিখেছেন খুব কম। যা লিখেছেন তা-ও তাঁদের কবিতার মতই সংহত ও বাগবাহুল্য-বর্জিত।

সমসাময়িক বিষয়ে-ও যখন এঁদের মানস হয়েছে আলোড়িত এবং সেই সম্বন্ধেও যখন কথা বলতে চেয়েছেন এঁরা, তা-ও কবিতার রসে জারিয়ে নিয়ে তবেই বলেছেন। ফলে তা কথাকে ডিঙিয়ে হয়েছে কবিতা। এর বিপরীত দৃষ্টান্ত নজরুল ও সুকান্তের অনেক কবিতা। যাতে কবিতাকে ছাড়িয়ে কথা হয়েছে প্রধান ও উচ্চরোল। এসব কবিতার আকর্ষণ একমাত্র কথাতেই সীমাবদ্ধ কিন্তু দাশ ও দত্ত কবির কবিতার প্রধান আকর্ষণ তার কবিত্ব। কথা এখানে গৌণ।

যাঁদের কাছে কবিতা শুধু কবিতার জন্যই প্রিয়—জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁদের প্রিয় কবি এবং থাকবেন অনেক দিন প্রিয়। কথা যতো সহজবোধ্য কবিতা ততো নয়। ফলে সুকবি ও সুকবিতার রসোপলব্ধি বিলম্বিত হতে বাধ্য। অনেককে তার জন্য মৃত্যুর পরও বহুকাল অপেক্ষা করে থাকতে হয়।

কবিতার এই সর্বব্যাপী দুর্দিনেও বিশিষ্ট কবি যে নেই তা নয় কিন্তু সেই বিশিষ্ট কবিদের মধ্যেও সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন সবিশেষ। যেমন সবিশেষ ছিলেন জীবনানন্দ দাশ। উভয়ে বিশিষ্ট অর্থাৎ নিজস্ব সুর ও আঙ্গিকের ছিলেন সাধক আর উভয়ের সেই সাধনার একনিষ্ঠ একাগ্রতায় আমৃত্যু কখনো ছেদ পড়েনি। কিন্তু বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে তাঁদের নিজেদের মধ্যে ব্যবধান ছিল প্রায় সুমেরু কুমেরু। আর দু'য়ের কেউ-ই ছিলেন না জনতার কবি, তাঁরা ছিলেন একান্তভাবে নির্জনতার—বিরল অবসর মুহূর্তে একা একা উপভোগের কবি। তবে সুধীন দত্তের কবিতা অধিকতর উপভোগ্য যদি সঙ্গে থাকে একজন সাকী, আধুনিক পরিভাষায় বান্ধবী! জীবনানন্দ দাশের কবিতার বেলায় তারও দরকার নেই। তা বিরল মনে গুণ গুণ করে পড়ার ও অনুভব করারই কবিতা। একটা শান্ত-সুন্দর নির্মল অনুভূতির পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেই তিনি থেমে পড়েন। কোথাও ব্যবহার করেন নি বাড়তি বা ফালতু শব্দ একটিও। কবিতায় থামা বা থামতে জানা কবির জন্য যে কতবড় মৌলিক গুণ তার প্রমাণ জীবনানন্দের কবিতা।

সুধীন দত্তের কবিতা প্রসঙ্গে সাকীর উল্লেখে কেউ কেউ বিস্মিত হতে পারেন। কারণ আমাদের অনেক পাঠকই যে সব কবির রচনা দুরূহ ও শক্ত তাঁদের অনায়াসে মিষ্টিক ও দার্শনিক ভেবে বসেন। সুধীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে দুরূহ ও শক্ত কিন্তু তিনি ঐ দু'য়ের কোনটিই ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রেমের কবি, লিখেছেনও বেশীর ভাগ প্রেমের কবিতা। এমন কি বিদেশী সাহিত্য থেকেও যে সব কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন তারও অধিকাংশই প্রেমের কবিতা। তাঁর অধিকাংশ প্রেমের কবিতাই রসের দিক দিয়ে প্রায় ওমর খৈয়ামী। শুধু ভাষা ও আঙ্গিকটাই আধুনিক। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক দার্শনিক পণ্ডিতের ছেলে হয়েও সুধীন দত্তের কবিতায় দেহাতীত প্রেম স্থান পায়নি। তবে তাঁর পিতা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত শুধু বৈদান্তিক ছিলেন না। বৈষ্ণব সাহিত্যেও ছিলেন সুপণ্ডিত। দার্শনিক পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বৈষ্ণবীয় লীলার সংমিশ্রণ ঘটলে যে সুফসল ফলতে পারে তার এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সুধীন দত্তের কবিতা। বৈষ্ণব সাহিত্যের ললিত-কোমল মাধুর্যকে তাঁর ক্লাসিক পাণ্ডিত্য দিয়েছে এক সংহত-সংযত কাঠিন্য। এই কাঠিন্য সৌবর্ণেয়।

ক্রোচের মতে উক্তি ও উপলব্ধির একাত্মতাই রসোত্তীর্ণ কবিতা। এ বিষয়ে আধুনিক বাংলা কাব্যে জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন্দ্রনাথ অনন্য। তাই এঁরা এক একটা কবিতা, এমন কি জুৎসই এক একটা শব্দের পেছনেও তার সন্ধানে অকল্পনীয় দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছেন। তাঁরা যা প্রকাশ করতে চেয়েছেন তাকে তাঁদের উপলব্ধির তাদাত্ম্য করতে অথবা উপলব্ধিকে যথাযথ ও তাঁদের মনের মতো উক্তিতে পরিণত করতে এ সময় ব্যয় করাকে তাঁরা অপব্যয় মনে করেননি। বলা বাহুল্য, আধুনিক বাংলা কবিদের মধ্যে এঁরা দু'জন পরিমাণের চেয়ে গুণকে মূল্য দিতেন বেশী। তাই এঁদের রচনা সংখ্যায় পরিমিত কিন্তু গুণে অপরিমিত।

জীবনানন্দ সহজ, সরল ও পরিচিত শব্দ ও ছন্দে গড়ে তুলেছেন তাঁর কাব্য জগৎ। সেই জগৎ কিছুটা আলো-আঁধারী। তার কিছু দেখা যায় তো অনেকটা দেখা যায় না, কিছু বুঝা যায় তো অনেক কিছু থেকে যায় অবোধ্য। টি, এস, এলিয়ট বলেছেন, অনেক ভালো কবিতাই তিনি প্রথম পাঠে বুঝতে পারেননি। এমন কি অনেক কবিতা শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ বহুবার পাঠের পরও তাঁর কাছে থেকে গেছে দুর্বোধ্য। অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠ কবিতা সব সময় যে দু'য়ে দু'য়ে চারের

মতো অসন্দিগ্ধ অর্থ প্রকাশ করে তা নয়। তাই অর্থের বোধগম্যতা কখনো কবিতা বিচারের একমাত্র ও নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি বলে গ্রাহ্য হতে পারে না। পাঠকদের মনে একটা পরিবেশ ও অনুভূতির অনুরণন সৃষ্টি করতে পারলে কবিতা সহজেই অর্থ-সীমা ডিঙিয়ে যেতে পারে। গদ্য অর্থের শিকলে বাঁধা পড়েই ভালো গদ্য হয় আর কবিতা অর্থ-সীমা ছাড়িয়েই হয়ে ওঠে ভালো কবিতা। জীবনানন্দের কবিতাও তাই। শব্দ দিয়ে তিনি ছবি এঁকেছেন আর সেই ছবি চাক্ষুষ হয়ে ওঠে পাঠকের মনের সামনে। তাঁর তুলির আগা অতি সরু ও অত্যন্ত মিহি। কিন্তু আঁকা ছবিটি সুস্পষ্ট! শিল্পী হিসেবে তাঁর এই এক অদ্ভুত সাফল্য। ছবি ও অনুভূতির পরশ পেয়ে যাঁরা খুশী নন্, তেমন অর্থ-খোর পাঠক তাঁর কবিতায় পদে পদে হোঁচট খাবেন বই কি।

জীবনানন্দ ছিলেন পূর্ব-বাংলার মানুষ। এ খবর যাঁদের অজানা, আমার বিশ্বাস তাঁর কবিতা পাঠের পর, তাঁদের কাছেও এ খবর আর অজানা থাকবে না। তাঁর কবিতায় এখানকার প্রকৃতি এত বেশী ছায়া ফেলেছে যে, স্থূলবুদ্ধি পাঠকের দৃষ্টিও তা এড়াবার কথা নয়। পূর্ব-বাংলায় খাল-বিল ধান-পাটের একটা শ্যামল রূপ, তার একটা সুঘ্রাণ যেন তাঁর কবিতার গায়ে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এখানকার সুপরিচিত প্রকৃতির প্রতীক দিয়ে অনুভূতির যে অনুরণন তিনি সৃষ্টি করেছেন, তা যে শুধু অনুভব্য তা নয়, তা যেন হাত দিয়ে ছোঁওয়া যায়, যায় স্পর্শ করা। কথা দিয়ে, ন্যূনতম কথা দিয়ে এই যাদু সৃষ্টিতে জীবনানন্দ দাশ অনন্য ও অদ্বিতীয়। তাঁর প্রত্যেকটি কবিতা যেন এক এক মুঠো তাজা শ্যামল সুকোমল অনুভূতি। তাঁর যে কোন কবিতা থেকেই দৃষ্টান্ত নেওয়া যায়:

আমি যদি হতাম বনহংস,
বনহংসী হতে যদি তুমি;
কোন এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে
ছিপছিপে শরের ভিতর
এক নিরালা নীড়ে;
তাহলে আজ এই ফাল্গুনের রাতে
ঝাউয়ের শাখার পেছনে চাঁদ উঠতে দেখে
আমরা নিম্নভূমির জলের গন্ধ ছেড়ে

আকাশের রুপালী শস্যের ভিতর গা ভাসিয়ে দিতাম—
তোমার পাখনায় আমার পালক, আমার পাখায় তোমার রক্তের স্পন্দন—
নীল আকাশের খই ক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো অজস্র তারা,
শিরীষ বনের সবুজ রোমশ নীড়ে
সোনার ডিমের মতো
ফাল্গুনের চাঁদ।

॥ আমি যদি হতাম ॥

অথবা

কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা ;
কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস—তেমনি সুঘ্রাণ—
হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে !
আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে চোখে ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।

॥ ঘাস ॥

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে দেখেছেন নিরাসক্ত চিত্তে, দূর থেকে তার সৌন্দর্যে তিনি হয়েছেন মুগ্ধ। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় তার সৌন্দর্য্যানুভূতি বিবর্তনবাদের সঙ্গে মিশে এক অপূর্ব আবেগে রূপান্তরিত হয়েছে কাব্যলোকে। যেমন :

মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীন ভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণ-মাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধ'রে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে। সেই জন্ম-পূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী-পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মতো

জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।

॥ সমুদ্রের প্রতি ॥

এই কবিতা একই সঙ্গে জ্ঞান (বিবর্তনের জ্ঞান) ও আবেগের সংমিশ্রণ। কিন্তু জীবনানন্দের মতো তিনি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে যান নি। জীবনানন্দের প্রকৃতি-প্রেম তাঁর অনুভূতির অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ যেখানে জ্ঞানে ও আবেগে অপূর্ব, সেখানে জীবনানন্দ অনুভূতিতে তন্ময়। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও জীবনানন্দের বরং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সঙ্গে মিল অনেক বেশী। অবশ্য ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো তিনি প্রকৃতির কাছে পাঠ নিতে ছুটে যান নি। কারণ তাঁর কাছে শিক্ষার চেয়েও অনুভূতির স্বাদ অধিকতর লোভনীয়।

জীবনানন্দের লেখায় কোথাও কঠিন বা অপরিচিত শব্দের ব্যবহার নেই—ব্যবহার করার প্রয়োজনই বোধ করেননি তিনি। চির পরিচিত সহজ সরল শব্দে নিজের চেনা জগতের ছবি দিয়ে কবি নিজের উপলব্ধিকে দিয়েছেন অভিব্যক্তি। এমন সহজ কথা দিয়ে নিজের অনুভূতিকে রূপ দেওয়া খাস পশ্চিম বঙ্গের অতিমাত্রায় বিদগ্ধ-চিত্ত সুধীন দত্তের কাছে আশা করাই বৃথা। এটা সুধীন দত্তের পক্ষে নিন্দার কথা নয়, বরং তিনি যদি তাঁর আজন্মলব্ধ ও স্বোপার্জিত মানস-পরিমণ্ডল ছেড়ে জীবনানন্দের মতো সহজ হতে চেষ্টা করতেন তা হলে নির্ঘাত নিষ্ফল হতেন। তেমনি জীবনানন্দও যদি তাঁর আজন্মের মানস-পরিমণ্ডল ছেড়ে সুধীন্দ্রনাথ হতে চাইতেন তা হলে তিনি না হতেন সুধীন দত্ত না হতেন জীবনানন্দ। সত্যিকার শিল্পীরা নিজের জগৎ ও নিজের সীমাকে কখনো ভুল করেন না।

চাঁদের আলোকে 'রুপালী শস্য' বলে যে রূপকল্প সৃষ্টি, পূর্ব-বাংলার স্বাভাবিক পরিবেশ ও আবহাওয়ায় মানুষ না হলে, তা কবির কলমে এমন অবলীলাক্রমে আসত কিনা সন্দেহ। তাঁর রচনার আর এক বিশেষ গুণ তাঁর আশ্চর্য তন্ময়তা। জীবনানন্দ নিজের অনুভূতি ও রূপকল্পে নিজে তন্ময় হয়ে তাঁর পাঠককেও করে তোলেন তন্ময়। এ যেন ধ্বনি দিয়ে স্বপ্ন রচনা।

কবি ভাষা ও শব্দ প্রয়োগের বেলায় কোথাও কঠিন হতে চেষ্টা করেননি। বরং মনে হয় তিনি কি করে সহজ করে নিজের মনের কথাকে প্রকাশ করবেন সারাজীবন সেই সাধনাই করেছেন। এমন কি নিজের অনুভূতির কাছে সহজ

ও খাঁটি হতে গিয়ে তিনি পূর্ব-বাংলার খাস গ্রাম্য শব্দকেও কবিতায় স্থান দিতে দ্বিধা করেননি। যেমন :

হিমের রাতে শরীর 'উম্' রাখবার জন্য দেশোয়ালীরা
সারারাত মাঠে আগুন জেলেছে—
মোরগ ফুলের মতো লাল আগুন ;
শুকনো অশ্বত্থ পাতা দুমড়ে এখনো আগুন জ্বলছে তাদের ;
সূর্যের আলোয় তার রঙ কুঙ্কুমের মতো নেই আর ;
হয়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।
সকালের আলোয় টলমল শিশিরে চারিদিকের বন ও আকাশ
ময়ূরের সবুজ নীল ডানার মতো ঝিলমিল করছে।

॥ শিকার ॥

'Imagery' সম্বন্ধে এলিয়টের এই মন্তব্য স্মরণীয় : 'It comes from the whole of his sensitive life since early childhood.' শৈশব থেকে 'উম্' শব্দ কবির মনে যে Sensitiveness সৃষ্টি করেছিল তাই তাঁর উপলব্ধির অঙ্গ হয়ে পড়েছে। ফলে তাঁর অভিব্যক্তিরও। এ তাঁর অধীত বা অর্জিত কল্পরূপ নয়। 'উম্' পূর্ব-বাংলার একেবারে খাস শব্দ। পশ্চিম বঙ্গের কবিরা, পূর্ব বঙ্গেরও অনেক অভিজাত ও তমদ্দুন-বিলাসী কবি এই আটপৌরে শব্দটাকে তাঁদের কবিতায় স্থান দিতে বোধকরি হাজার বার দ্বিধা করতেন। অবশ্য ইচ্ছা করে, গায়ে পড়ে স্থান দেওয়ার কথা আমি বলছি না। শব্দ কবির অনুভূতি ও রূপকল্পের স্বাভাবিক বাহন। সেই বাহন উদ্দেশ্যমূলক হলে তা ব্যর্থ ও স্বাভাবিকতা হারাতে বাধ্য। ইচ্ছা করে বা কোন সচেতন প্রচেষ্টার ফলে 'উম্' শব্দের এখানে আমদানি হয়নি। কবি-চিত্তের স্বাভাবিক বাহন হয়েই শব্দটা এখানে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। এ শব্দের যথাযথ অনুবাদ বিশুদ্ধ বাংলায় সম্ভব কিনা জানি না, হলেও তাতে কবির অভিব্যক্তি পঙ্গু হয়ে পড়তো। তাঁর উপলব্ধি হতো খণ্ডিত।

শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে যে কোন সংস্কার বা Prejudice কবির জন্য মারাত্মক। এই সংস্কার যে কবির মনে আছে ধরে নিতে হবে তিনি তাঁর কবিত্বের উপরে সংস্কারকেই দিয়ে থাকেন বড় স্থান। নজরুল যখন অসঙ্কোচে তাঁর কবিতায়—'লা শরীক আল্লাহ্' ব্যবহার করেছিলেন, তখন তা তিনি ইচ্ছা করে

ভাষায় আরবী শব্দ ঢোকাবার মতলব নিয়ে করেন নি। তাঁর কবি-ধর্মের তাগিদেই করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি যখন 'খেয়াপারের তরণী' নামক কবিতা লিখছিলেন তখন তা তাঁর সেই মুহূর্তের অনুভূতি উপলব্ধির অঙ্গ বা বাহন হয়েই তাঁর মনে ও কলমে এসে গিয়েছিল। ঠেকানোর কোন উপায় ছিল না। ও ছাড়া দ্বিতীয় রূপকল্প তাঁর মনে স্থান পায়নি তখন, সেই মুহূর্তে। কারণ আশৈশব ঐ ভাব ও তার ঐ প্রকাশ তাঁর মনের সঙ্গে এক ও একাত্ম হয়ে বিরাজ করছিল। ঐ আরবী উক্তির বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়া নজরুলের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না, কিন্তু করলে তাঁর সেই মুহূর্তের কবি-ধর্ম যে শুধু ব্যর্থ হত তা নয়, কবিতাটিও হয়ে পড়ত শোচনীয়রূপে দুর্বল, হারিয়ে বসত তার অনিবার্য আবেদন আর থাকতো না তাতে এখনকার মতো ছন্দের অনির্বচনীয় দোলা। কবিকে হতে হয় সব রকম Prejudice-মুক্ত। আমাদের সাহিত্যে নজরুল এর এক মহৎ দৃষ্টান্ত। আমার মনে হয় নজরুলের সাফল্যের বড় কারণ এটি। এমন সর্ব-সংস্কার-মুক্ত মন কদাচিৎ দেখা যায়। কী ভাবে, কী ভাষায় কোথাও তিনি কোন সংস্কারের শিকার হন নি। এ না হলে এত কম সাধনা নিয়ে এতখানি সাফল্য (কবি হিসেবে) তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হত না। তাঁর কবিতার আবেদনও হত না এতখানি ব্যাপক।

কবিতা যে আজ কঠিন ও দুরূহ হয়ে উঠেছে এ অভিযোগ পৃথিবীব্যাপী। এই প্রসঙ্গে এ যুগের দুরূহতম কবি এলিয়টের মন্তব্য হচ্ছে : অনেক কবিতা এ কারণে কঠিন মনে হয় যে কবিরা এখন হাতে রেখে কথা বলেন। প্রকাশ করেন না অনেক কিছুই, ইচ্ছা করেই অনেক কিছু ছেড়ে ছেড়ে যান। তাঁরা যা ছেড়ে যান পাঠক তা পূরণ করে নেবেন বা নিতে পারবেন এই ভরসায়। পাঠকের মনকেও দিতে হবে কল্পনা করবার তথা ভাববার সুযোগ, উড়বার অধিকার। কবি নিজেই যদি সব কিছু খোলসা করে দেন তা হলে পাঠকের মন হয়ে পড়ে বেকার। আজকের দিনের কবিরা চান না তেমন অলস পাঠক।

জীবনানন্দ দাশের কবিতার কাঠিন্য হচ্ছে এলিয়ট-বর্ণিত এই কাঠিন্য। তিনি তাঁর কবিতার লাইনে লাইনে অনেক শূন্যস্থান রেখে যান। তা পূরণ করে নেওয়ার দায়িত্ব পাঠকের। কল্পনার সংকীর্ণতা ও অপ্রসার অভিজ্ঞতা যাঁদের একমাত্র সম্বল জীবনানন্দ-শ্রেণীর কবিরা তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য হতে বাধ্য। অভিজ্ঞতা মানে সাহিত্যের অভিজ্ঞতা। আর আজকের দিনে সাহিত্য মানে বিশ্ব-সাহিত্য।

॥ দুই ॥

"কাব্যের ইতিহাস তার টেকনিকের ইতিহাস"। আরাগঁ'র এ উক্তি জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত উভয়ের বেলায় খাটে। নিজস্ব টেকনিকের জন্যই এঁদের কবিতা স্মরণীয় ও বিশিষ্ট। না হয় এঁরা কোন নূতন কথা বা নূতন বাণী প্রচার করেননি—করেননি নূতন কোন সুরের বা ছন্দের প্রবর্তন। কিন্তু এঁদের টেক্‌নিকই এঁদের কবিতা অর্থাৎ কবিতার বিশেষত্ব। তবে সেই টেক্‌নিক একমাত্র সুধী পাঠকের জন্য। সাধারণের জন্য নয় মোটেও—এঁরা সাধারণের কবি নন। এঁরা নির্বাচিত পাঠক-গোষ্ঠির কবি। বলেছি এঁরা দু'জনেই দুরূহ কবি—তবে জীবনানন্দ দাশের কবিতা এলিয়ট-বর্ণিত কারণেই দুরূহ আর সুধীন্দ্রনাথ দুরূহ হচ্ছেন শব্দে ও ভাবে। তবুও সুধীন্দ্রনাথ যতখানি সহজবোধ্য, জীবনানন্দ দাস ততখানি নন। যদিও জীবনানন্দ দাস পাঠকের অজানা বা অপরিচিত শব্দ ব্যবহার করেননি একটিও। শব্দ চয়নে ও সন্ধানে সুধীন্দ্রনাথ এ যুগের মাইকেল। শব্দার্থ না জেনে কোন কোন ক্ষেত্রে মাইকেলের অর্থোদ্ধার যেমন অসম্ভব তেমনি সুধীন দত্তেরও। অধিকাংশ পাঠকেই অর্থ খোঁজেন তাই অধিকাংশ পাঠকের কাছে তিনি ও জীবনানন্দ দাস থেকে যান অবোধ্য। ফলে এ দু'জনের কেউ-ই লোক-প্রিয় তথা পপুলার কবি নন।

নাচে যেমন মুদ্রা আধুনিক কবিতায় তেমনি প্রতীক। মুদ্রার সঙ্গে পরিচয় ছাড়া নাচ দেখতে গেলে যেমন শুধু নট-নটীর দেহ-ভঙ্গী আর মুখাবয়ব দেখেই খুশী থাকতে হয়, তেমনি প্রতীকের সংগে পরিচয় ছাড়া আধুনিক কবিতা পাঠও তোতাপাখীয় হতে বাধ্য। জীবনানন্দ জাতীয় কবিদের নিয়ে সাধারণ পাঠকের এই বিপদ। ভালো অভিধানের সাহায্যে সুধীন্দ্রনাথকে এক রকম আয়ত্তে আনা যায় অর্থাৎ তাঁর কবিতার অর্থ-লোকে প্রবেশ করা সহজ হয়। অভিধান না দেখলে আমি নিজেই কি জানতাম—মাবুক মানে ঝাউগাছ, অনিকেত মানে গৃহহীন বা বাস্তহারা, অবাচী মানে দক্ষিণ দিক, অলাত মানে জ্বলন্ত অঙ্গার অথবা সুষির কাকে বলে? প্রথম প্রথম যখন পড়তে ও পড়াতে গেছি মাইকেলকে নিয়েও আমার এই বিপদ ঘটেছিল। কোন কোন সত্যিকার কবিকে বুঝতে হলে এই ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই। সুধীন্দ্রনাথ বা আধুনিক অন্য কবিদের মধ্যে ভাবের যে জটিলতা তা সমাধানের ভার ব্যক্তি-পাঠকের উপর। কবিকে যেমন

এক একটা কবিতা লিখতে প্রচুর ভাবতে হয়েছে, তেমনি পাঠককেও সেই কবিতা বুঝতে হলে কিছু না কিছু ভাবতে হবেই। আজকের দিনে যেমন ব্যাপক ও গভীর প্রস্তুতি ছাড়া কোন ভালো কবিতা লেখা সম্ভব নয় তেমনি পাঠকের পক্ষেও ব্যাপক প্রস্তুতি ছাড়া আধুনিক কাব্যের মর্মে প্রবেশ অসম্ভব। প্রস্তুতি আজ কবি ও পাঠক উভয়ের জন্যই অপরিহার্য।

আজ সাহিত্যের ঐতিহ্য মানে শুধু নিজে দেশের ভৌগোলিক সীমার ঐতিহ্য মনে করলে ভুল করা হবে। আজ ঐতিহ্যের সীমা সারা সভ্যজগৎ···সবদেশের সাহিত্য ও মননশীলতার ঐতিহ্যই আধুনিক কবি ও সাহিত্যশিল্পীর ঐতিহ্য। সুধীন্দ্রনাথ এই ঐতিহ্যের সঙ্গে পুরোপুরি পরিচিত হয়ে তবেই কবিতা লেখায় হাত দিয়েছিলেন। একথা সত্য কবিতার জন্য প্রাথমিক শর্ত আবেগ, কিন্তু শুধু প্রেরণা ও আবেগসর্বস্ব কবিতার দিন আজ বিগত। শুধু আবেগ কবিকে কোন লক্ষ্যেই পৌঁছাতে পারে না। আবেগকে নিয়ন্ত্রিত ও সংযত করার জন্য চাই মনের শাসন, সুধীন্দ্রনাথের ভাষায় কবির 'স্বায়ত্তশাসন'। এই স্বায়ত্ত-শাসনের অভাবের ফলে অসামান্য প্রতিভার অধিকারী হয়েও নজরুলের অনেক কবিতা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। ভাব ও কথা সংহতরূপ নিতে পারে নি। নজরুল-প্রতিভার সব চেয়ে শোচনীয় দিক হচ্ছে এটি।

এমার্সন বলেছেন: 'Talent alone does not make a writer, there must be a man behind the book', প্রায় সব বিশিষ্ট কবিদের রচনা সম্বন্ধেই একথা সত্য। এঁদের অর্থাৎ বিশিষ্ট কবিদের প্রতিটি রচনায় কবি-মনের ব্যক্তিত্ব এত বেশী দীপ্যমান যে রচনার গায়ে কবির নাম থাকা না থাকা অবান্তর। অসতর্ক পাঠকদেরও এঁদের রচনা চিনে নিতে ভুল হয় না। সুধীন্দ্রনাথও তেমনি অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কবি। তাঁর প্রতিটি রচনার পেছনেই কবিকে অনুভব করা যায়, যায় দেখা। ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাঁর ব্যক্তিত্ব এমনি সুস্পষ্ট।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' সম্পাদক হিসেবে। এ ক্ষেত্রে তিনি যে যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা অতুলনীয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে কয়টি সাহিত্য পত্রিকা এক একটি বিশিষ্ট অবদান ও ঐতিহ্য রেখে অকালে অন্তর্ধান করেছে তার মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'পরিচয়' অন্যতম।

'সবুজপত্র' ছিল পুরোপুরি ব্যক্তি-কেন্দ্রিক, 'কল্লোল' ছিল গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক। আভিজাত্য, সৌন্দর্য ও উদারতা ছিল 'সবুজপত্রের' বিশেষত্ব। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর প্রধান দৃষ্টিভংগী ছিল আধুনিকতা তথা প্রগতিবাদ। এর মানে এ নয় যে 'সবুজপত্রে' প্রমথ চৌধুরীর বা তাঁর মতের লেখা ছাড়া অন্য লেখা ছাপা হত না বা 'কল্লোলে' ওঁদের গোষ্ঠীর বাইরের লেখা স্থান পেত না। এই পত্রিকার কর্ণধারেরা সাহিত্যের মান ও মাপকাঠি সম্বন্ধে অত্যন্ত ওয়াকিবহাল ও সচেতন ছিলেন। কাজেই গোষ্ঠীর বাইরের ভালো লেখাও পত্রস্থ করতে তাঁরা কোনদিন দ্বিধা করেন নি। জসীমউদ্দীনকে কোন অর্থেই 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখক বলা যায় না এবং তাঁর সুবিখ্যাত 'কবর' কবিতাও কোনদিক দিয়েই আধুনিকতা বা প্রগতিবাদের আওতায় পড়ে না। তবুও ঐ কবিতা প্রথম ছাপা হয়েছিল 'কল্লোলের' পৃষ্ঠায়। ঐ কবিতার স্মৃতির সঙ্গে অকৃত্রিম আবেগ মিশে যে অপূর্ব রূপকল্পের সৃষ্টি হয়েছে তা যে কোন সাহিত্যরসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। তাই 'কল্লোল'-সম্পাদকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, এ রকম ক্ষেত্রে মানুষ সহজেই গোষ্ঠী বা 'স্কুলের' কথা ভুলে যায়। রসোত্তীর্ণ রচনার এ হচ্ছে বাহাদুরী—এ রকম রচনা সব সীমা ও গণ্ডীকে ভেঙ্গে ভাসিয়ে একাকার করে দেয়। 'কবর' নিঃসন্দেহে তেমন একটি রচনা এবং সাহিত্যে জসীমউদ্দীনের প্রথম কীর্তিস্তম্ভ।

'পরিচয়ের'ও যে গোষ্ঠী ছিল না তা নয়, তবে তা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক বা কোন বিশেষ দৃষ্টিভংগীগত ছিল না। 'পরিচয়' ছিল উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ও পাণ্ডিত্যের আম্-দরবার। তার একটা ব্রত ছিল বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় করে দেওয়া। এ বিষয়ে পরিচয়ের 'পুস্তক-পরিচয়' ছিল আদর্শ এবং এযাবৎ অনতিক্রান্ত। ঐ 'পরিচয়' যেমন ছিল ব্যাপক তেমনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, গল্প-উপন্যাস, কাব্য, প্রত্নতত্ত্ব সব কিছুর প্রতি পরিচয়ের একটি উদার দৃষ্টি ও অসামান্য গুণগ্রাহিতা ছিল। এর পেছনে ছিল নিশ্চয়ই সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথের রুচিবোধ ও ব্যক্তিত্ব। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সুধীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'পরিচয়' পাণ্ডিত্য, উদারতা ও রসবোধের এক স্মরণীয় ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছে।

সুধীন্দ্রনাথের 'অর্কেস্ট্রা' নামক বিখ্যাত কবিতাটি প্রথমে 'পরিচয়েই' ছাপা হয়েছিল। কিন্তু পরে যখন ঐ কবিতাটি তাঁর ঐ নামের কবিতা-গ্রন্থে ছাপা

হয় তখন তাতে তিনি মাজাঘষা ও কোন কোন স্তবকের কোন কোন পঙক্তিতে কিছু কিছু রদবদল করেছেন। তাতে কবিতাটির সামগ্রিক উন্নতি ঘটেছে কিনা তা আমি বলতে পারব না। কবিতার গঠনতত্ত্বে যাঁরা বিশেষজ্ঞ একমাত্র তাঁরাই বলতে পারবেন। আমি নিতান্তই পাঠকমাত্র, কবি ও কবিতা সম্বন্ধে আমার যা কিছু মন্তব্য তা পাঠক হিসাবেই।

প্রথম মুদ্রিত পাঠে কবিতাটির শেষ স্তবক ছিল নিম্নরূপ ঃ

অকস্মাৎ স্বপ্ন গেল টুটে। দেখিনু সরমে চাহি
জনশূন্য রঙ্গালয়ে নিবে গেছে সমস্ত দেউটি,
নিস্তব্ধ সকল যন্ত্র। মঞ্চপরে যবনিকা ঢাকা।
অলক্ষ্যে কখন পার্শ্ব হতে প্রেমিক প্রেমিকা চলে
গেছে অমৃত সঙ্কেতে। শান্তি—শান্তি—শান্তি চারিধারে!
কেবল অন্তর মোর দীর্ণ হয় ক্ষুব্ধ হাহাকারে।

(পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৩৯)

বইতে ছাপার সময় এই স্তবকের তিন জায়গায় তিনি পরিবর্তন করেছেন। প্রথম পঙক্তির শেষ পর্বকে বদলে করেছেন ঃ 'দেখিলাম ত্রস্ত চোখে', দ্বিতীয় পঙক্তির 'নিবে গেছে'-কে করেছেন 'নির্বাপিত' আর শেষ লাইনের 'দীর্ণ হয়' স্থলে করেছেন 'উত্তরঙ্গ'। এই ভাবে অপেক্ষাকৃত সহজ ও প্রাকৃত শব্দকে বাদ দিয়ে তার জায়গায় সংস্কৃত মূল শব্দ বসিয়ে তিনি কি তাঁর স্বাভাবিক পরিমণ্ডলে ফিরে যেতে চেয়েছেন? যাই হোক কবিতাটি অপরূপ। নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। ছন্দের বৈচিত্র্যে, শব্দচয়নের নৈপুণ্যে, সর্বোপরি ভাষা ও ভাবের গাম্ভীর্যে নিছক প্রেমের কবিতা যে রসের এতখানি ঊর্ধ্বলোকে পৌঁছতে পারে তার এমন নজির খুব বেশী নেই। এইটি সপ্তস্বরা বীণা।

সংযতবাক কবি কত অল্প কথায় গভীর হৃদয়ানুভূতিকে রূপ দিয়েছেন নিচের স্তবকে ঃ

সাতসমুদ্র পেরিয়ে, চারণ বায়ু
অচিন ভাষায় করছে কথকতা ;
ঝঙ্কারে তার মুখর মোদের স্নায়ু ;
জিহ্বা অবাক, নয়ন বলে কথা। (অর্কেস্ট্রা ৭৫ পৃঃ)

'চারণ' শব্দটির ব্যবহার যে শুধু চমৎকার ও যথাযথ হয়েছে তা নয়, হয়েছে

অত্যন্ত অর্থপূর্ণ ও অভিনব। রচনায় শব্দ প্রয়োগের অভিনবত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকা ও জানা শুধু কবির কেন যে কোন লেখকের একটি মহৎ গুণ। এর ফলে মুহূর্তে রচনার আটপৌরত্ব যায় ঘুচে এবং হয়ে ওঠে তা ব্যঞ্জনামুখর। ঐ কবিতা থেকে আরো কিছু অংশ নিচে উদ্ধৃত হল ঃ

দক্ষিণ বায়ু আসি নির্ঝরিণী কানে
ভনিল কোন্ কথা, তা শুধু সেই জানে।
সহসা সে-সুমনা হয়েছে বিবসনা,
অশীল নটীপনা জেগেছে প্রাণে প্রাণে।
কহিল সমীরণ কী কথা কানে কানে ?
অচল শিলাবুকে উন্মাদিনী নাচে;
স্ফুরিত তনুলতা, বুঝি না, কারে যাচে।
মেঘলা কটিতটে চমকে ছায়ানটে
নূপুরে জাদু রটে ; কবরী উড়ে পাছে।
স্তব্ধ মেঘে যেন সৌদামিনী নাচে !
সে যেন মায়ামৃগী, বিতরি কস্তুরী,
পাগল বায়ু-সনে খেলিছে লুকোচুরি !
কখনো বনছায়া ঢাকে সে-বরকায়া ;
কভু সে-পীত মায়া আলোরই কারিকুরি।
অপ্সরীতে প্যানে খেলে কি লুকোচুরি ?

(অর্কেস্ট্রা পৃঃ ৭২)

নির্ঝরিণীর বুকে বসন্ত-বায়ু তুলেছে হিল্লোল, তার উপর নবোদিত সূর্যের রশ্মিজাল সৃষ্টি করেছে আলোছায়ার ভেল্কি—তারি চিত্র ও রূপকল্প সুনির্বাচিত শব্দে, ছন্দে ও সুরে অনুরণিত হয়ে উঠেছে উদ্ধৃতাংশে। শেষ লাইনে দেশী ও বিদেশী পুরাণ মিশে ও তার সার্থক প্রয়োগের ফলে এক অবিস্মরণীয় দ্যোতনার সৃষ্টি করেছে।

ইংরেজিতে crown শব্দটির বিভিন্ন প্রয়োগ দেখা যায়। কখনো বিশেষ্য, কখনো ক্রিয়া, কখনো বা বিশেষণ হিসেবেও তার ব্যবহার ঘটে। কিন্তু তার বাংলা প্রতিশব্দ 'মুকুট' সাধারণত বিশেষ্য হিসেবেই শুধু ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়া কি বিশেষণ হিসাবে এর ব্যবহার সাধারণত দেখা যায় না। সুধীন্দ্রনাথ কিন্তু একাধিক

স্থানে তা করেছেন এবং তাঁর ব্যবহার কিছুমাত্র অর্থহীন বা বেমানান হয়নি। ব্যাকরণের সীমা রক্ষা করে নূতন নূতন শব্দ গঠন ও শব্দের নূতন প্রয়োগ একমাত্র প্রতিভাবান কবিদের পক্ষেই সহজসাধ্য। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রের মত বাংলা সাহিত্যে এ ক্ষেত্রেও মাইকেল অগ্রণী।

গভীর আবেশে নিমীলিয়া আসে চোখের পাতা।
বিধির আশিষ্ মুকুটিত করে যুগল মাথা॥

(অর্কেস্ট্রা পৃঃ ৮২)

ঊষার কনকচ্ছটা ঊষসীরে মুকুটিত করে।

(প্রতিধ্বনি পৃঃ ৩৪)

আশ্চর্য, সমসাময়িক তথা 'অস্থায়ী' বিষয় নিয়ে কবিতা শুধু নজরুল কি সুভাষ মুখোপাধ্যায় লেখেননি। কাব্যের ধ্রুপদী মানে বিশ্বাসী খাঁটি ক্লাসিকেল-মনা সুধীন দত্তও লিখেছেন। তাঁর 'সংবর্ত' নামক কাব্য গ্রন্থের প্রায় সব কবিতাই সাময়িক বিষয়ের উপরই লেখা। দাঙ্গা ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা বলেই বোধকরি এই গ্রন্থের নামকরন হয়েছে 'সংবর্ত' যার মানে ধ্বংস বা মহাপ্রলয়। (অবশ্য অভিধান দেখেই এই অর্থ আমি জেনেছি!) এ গ্রন্থের বহু কবিতায় ও নানা স্তবকে দাঙ্গা ও যুদ্ধের এক নিদারুণ পরিচয় রয়েছে ঃ

অপমৃত ভগবান। অস্তাচলে রক্তাক্ত অঙ্গার ;
অরাজক চরাচরে প্রত্ন প্রতিহিংসার প্রতুল ঃ
অতিদৈব বিবর্তনে মনুষ্যই যেহেতু অতুল,
তাই সে আত্মহা আজ, তার ধর্ম আত্মীয় সংহার।

(সংবর্ত, জাতক (১) ২৯ পৃঃ)

অথচ প্রত্যহ শুনি চার্চিলের স্বেচ্ছাচার বিনা
অসাধ্য সাম্রাজ্য রক্ষা, অব্যর্থ প্রলয়,
এবং যে-ব্যক্তিস্বত্ব সভ্যতার সম্মত আশ্রয়,
তারও অব্যাহতি নেই অপঘাত থেকে ঃ
একা হিটলারে নিন্দা সাধে আজ বাধে কি বিবেকে ?

(ঐ ৩২ পৃঃ)

(শেষাংশ ১৪১ পৃষ্ঠায়)

আমার দেখা কয়েকটি ইতালীয় ফিল্‌ম্‌

সত্যজিৎ রায়

[প্রবন্ধটি সত্যজিৎ রায় লেখেন বছর দশেক আগে ক্যালকাটা ফিল্‌ম্‌ সোসাইটি বুলেটিনে (১নং)। ইংরাজী নাম, Some Italian Films I have Seen। শ্রীরায় আমাদের কাছে জানিয়েছেন যে গত দশ বছরে ইতালীয় ফিল্‌মের যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটে গিয়েছে, সুতরাং ইতিহাসের দিক থেকেই প্রবন্ধটি পড়া বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধটির অনুবাদ করেছেন সুবীর মিত্র। —সম্পাদক]

বিদেশে গিয়ে ইতালীয় ছবি যে-কটি দেখে আসবার সুযোগ ঘটেছে আমার, আমাদের এই সিনেমা-বুলেটিনে তার আলোচনায় সে-সবের মধ্যেকার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোই আপাতত তুলে ধরবার চেষ্টা করা যাক। Neo-realist স্কুল চলচ্চিত্রের কতোটা-কী উৎকর্ষ আনতে পেরেছেন তার সম্পূর্ণ মূল্যায়ন অবিশ্যি এখনো সম্ভব নয় আমার পক্ষে, কেন না এঁদের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কয়েকখানা ছবিই আমার দেখার সুযোগ ঘটেনি—বিশেষ ক'রে লুইজি জাম্পা, পিয়েত্রো জার্মি আর মারিও সোদালতির ছবিগুলি এবং রবার্তো রোসেলিনির সেরা ছবিগুলিই আমার দেখা হয়নি। তাহ'লেও যে-সব ছবি দেখা হ'য়েছে আমার, তার থেকে ইতালীয় চলচ্চিত্র-জগতের মোটামুটি একটা ধারণা ক'রে নেওয়া অসম্ভব হবে না কিছু।

ইতালীয় ছবির মধ্যে একেবারে প্রথমেই জুটে গেলো আমার ভাগ্যে ভিত্তোরিও দ্য সাইকার 'বাইসাইক্‌ল্‌ থিভ্‌স্‌'। দুর্ভাগ্যই ব'লতে হবে আর কি। কেন না এটি এমন একখানা ছবি যার সম্বন্ধে রেনে ক্লেয়ার বলেছেন: 'গত তিরিশ বছরের মধ্যে এটি নিঃসন্দেহে শীর্ষস্থানীয় ছবি'; এই ছবিটি চলচ্চিত্রে এমন একটি অভূতপূর্ব মান তুলে ধ'রতে পারলো যেখানে খুব কম ছবিই এপর্যন্ত পৌঁছতে চেয়েছে, কিন্তু পেরে উঠলো শুধু এই একটিই। এর ঠিক পরেই গ্যয়সিপ্পি দ্য সান্তিসের 'বিটার রাইস' দেখতে গিয়ে ছবিটাকে এমনি হৈ-হৈ রৈ-রৈ ছ্যাবলামিতে ঠাসা মনে হোলো আমার যা কিছুতেই মার্জনা করা যায়

না। 'স্ট্রম্‌বোলি' ছাড়া (রোসেলিনির মতে এ-ছবিটা হলিউডের কু-প্রভাবে ব্যাধিগ্রস্ত) এই 'বিটার-রাইস'-ই Neo-realist স্কুলের একমাত্র ছবি যা ভারতীয়েরা দেখবার সুযোগ পেয়েছ এ-পর্যন্ত। কিন্তু এ-ছবিটি যদি আমাদের দেশের বিদগ্ধ সমাজকে খুশি ক'রতে না পেরে থাকে তাহ'লে তাতে অবাক হবার কিছু নেই ; কেন না ডকুমেণ্টারি ছবি তোলার দিকে যথেষ্ট ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও দ্য সান্তিস আসলে একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পী ; বাহ্যিক চাকচিক্য আর কায়দাকানুনে যতো তাঁর ব্যুৎপত্তি, সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান তত প্রখর নয়। যান্ত্রিক শিল্পনৈপুণ্যে সত্যিই হাত আছে এঁর কিন্তু এদিক থেকেও তাঁকে চেকোশ্লোভাকিয়ার ওটাকার ভাভরা-র সংগে তুলনা করা যাবে না, কেন না, ক্যামেরার ওপর যে-দখল দ্য সান্তিসের সেটা ভাববারও আছে, অথচ ভাভরার ক্যামেরা-নৈপুণ্যে কখনোই ছবির প্রধান অংগ কাহিনী মাৎ হ'য়ে যায় না, যেটা প্রায়শই দেখা গেছে দ্য সান্তিসের বেলায়। অর্থাৎ কাহিনীকে শিল্প-রূপ দেবার জন্যেই ভাভরার ক্যামেরা ব্যবহার, কিন্তু তাই ব'লে ক্যামেরার কসরতে কাহিনীর বিকৃতি ঘটে না তাঁর হাতে। দ্য সান্তিস তাঁর আগেকার ছবি Caccia Tragica (Tragic Pursuit)-র মধ্যে সামাজিক পরিবেশ আর মন-ধাঁধানো অতিনাটকীয় ঘটনাবলীর মধ্যে অপরূপ এক সংমিশ্রণ ঘটাতে গিয়ে, আরো বেশি ব্যর্থ হ'য়েছেন, অবিশ্যি রুচির বিকৃতি তাঁর এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম।

অ্যালবার্তো লাত্তুয়াদার ছবিগুলিতে দেখা যায় নানান্ বিরুদ্ধ শক্তির এক আশ্চর্য সংঘাত, সনাতনপন্থীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে তিনি নির্মম কঠিন। তাঁর Senza Pieta (Without Pity)-র মধ্যে দেখেছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক দুঃসাহসিক কাহিনী—একটি নিগ্রো G. I.র সঙ্গে একটি ইতালীয় মেয়ের প্রেম—অজস্র চরিত্রে আর ঘটনায় ঠাসা ছবিখানা। এঁরই Il Mulino del Po (The Mill on the Po) ছবিখানা Neo-realist পরিচালকদের বিশেষ একটি সময়কে নিয়ে তোলা স্বল্পসংখ্যক কয়েকখানা ছবির অন্যতম—লাত্তুয়াদার প্রতিভার এটিও একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। উনিশ শতকের একটি কৃষক-বিদ্রোহ মূর্ত ক'রে তুলতে লাত্তুয়াদার উত্তুংগ সব ক্লোজ-আপ আর বিস্তীর্ণ বিশাল লং-শট্ গুলি দেখে মনে পড়ে যায় জন ফোর্ডের কথা—বাস্তবিক কী বিচিত্র সে সমারোহ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ-ছবিতে মোদ্দা কাহিনীটিই ক্রমশ

এমনি জটিল ও প্যাঁচালো হ'য়ে গেছে যে শেষের দিকটাতে ভাল করে কিছু আর বুঝতেই পারা যায় না, চারদিক থেকে উৎকেন্দ্রিক নানা রকম সব ব্যাপার একসংগে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বইখানিকে শেষ ক'রে দিয়েছে, আর তাই Il Mulino আলোকচিত্রের দিক থেকে এমন নয়নাভিরাম ও সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'য়ে গেছে।

রেনাতো ক্যাস্তেলানি কিন্তু ছ সান্তিস আর লাত্তুয়াদাকে ছাড়িয়ে গেছেন; গতানুগতিকতা থেকে সর্বাংগীনভাবে পুরোপুরি সাফল্যের সংগে যেভাবে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন ক্যাস্তেলানি, অন্য দুজন তার অনেকটাই পেরে ওঠেননি। এই এই তরুণ পরিচালকটির শিল্পনিষ্ঠার অসাধারণত্ব হোলো তাঁর শিল্প-রীতির স্বচ্ছতায়। ইংলণ্ড বা আমেরিকায় এঁর এই শিল্পরীতির তুলনা মেলা ভার, কাহিনীবিন্যাসে, চরিত্রবিশ্লেষণে আর ক্যামেরার ব্যবহারে এঁর নৈপুণ্য ও ঐশ্বর্যময়তার যে একত্র প্রকাশ তা সত্যিই দুর্লভ। কাহিনীর বিচিত্রতা অথচ সাবলীলতা, নাটকীয় পরিবেশ আর পরিস্থিতির দ্বন্দ্বসংঘাতময় পরিণতি—এই শিল্পরীতিতে আশ্চর্য সার্থকতায় মণ্ডিত। লক্ষ্য করবার বিষয় যে এ-রীতি সম্পূর্ণ এক নতুন ধরনের বর্ণনাত্মক রীতি। ক্যাস্তেলানির ছবিগুলিতে ঘটনাপুঞ্জ যেরকম উনপঞ্চাশ বায়ুর তীব্রতায় ছুটতে আরম্ভ করে তাতে ছবির সমস্ত ইংগিত-ইশারা বুঝে নিতে দস্তুরমতো হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। বুদ্ধির রাশ একটু আলগা হ'য়ে গেছে কি আর রক্ষা নেই, সমস্ত খেই হারিয়ে যাবে। কিন্তু কাহিনী যেখানে নিজস্ব গতি আর নিশানা হারিয়ে ফেলে, যেমন ফেলেছে তাঁর Sotto il Sole di Romoe ছবিতে, সেখানে ক্যাস্তেলানির দুর্বার বেগ স্তিমিত। ছবিতে সেখানে বেশ একটু রসিয়ে রসিয়ে বিষয়টা উপভোগ ক'রবার ইচ্ছে জাগে সেখানে হয়তো ক্যাস্তেলানি এমনি দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় তীব্রতায় ছুটে চলেছেন যে তাতে রসের ব্যাঘাত ঘটে, এবং এমনি ক্ষেত্রে বহিরংগ জাঁকজমকই হ'য়ে ওঠে প্রকট। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্প-নিদর্শন E' Primavera এ-দোষ থেকে মুক্ত। এখানে ক্যাস্তেলানির প্রতিভার অনন্যসাধারণত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এ-ছবি দেখতে দেখতে মনে হয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তিই যেন আছে তাঁর।

ক্যাস্তেলানির প্রধান বৈশিষ্ট্য নিহিত দ্বন্দ্বসংঘাতময় জীবনের তীব্র দ্রুত পট-পরিবর্তনের মধ্যেই, আর লুচিনো ভাইকোন্তির বৈশিষ্ট্য ধীর অচঞ্চল পটবিক্ষেপে।

তাঁর La Terra Trema (The Earth Trembles) বইখানায় দেখি সিসিলির এক জেলে পরিবার শোষণ আর দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে তিলে তিলে ক্ষয় পেয়ে যাচ্ছে। এই বইখানাকে অসাধারণ কিছু করে তুলবার জন্যে কাঠ-খড় পোড়ানো হ'য়েছে কম নয়। সম্পূর্ণ ছবিখানাই ভাইকোন্তি সিসিলির একটি গ্রামের মধ্যেই নিবদ্ধ রেখেছেন, আর এমনকি সেই গ্রামের মধ্যে থেকেই তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রী বেছে নিয়ে ছবি তুলেছেন। মূল ছবিখানা ছিলো তিন ঘণ্টারও বেশি সময়ের, আর লণ্ডনে ছবিখানার যে সংস্করণ দেখলাম আমি, সেটাতে মূলকে কেটে দুখানা ক'রে দেয়া হয়েছে, কিন্তু আমার মনে হোলো করা হয়েছে ছ'খানা। ভাইকোন্তির পরিকল্পনা যেরকম সুদূরপ্রসারী, তাঁর শক্তিও যদি তেমনি হোতো, তবে ছবিখানা আদর্শস্থানীয় কিছু হ'য়ে উঠতে পারত। কিন্তু হয়ে উঠেছে যা তাতে La Terra Trema যন্ত্রণাদায়ক একটি ব্যাপার হ'য়ে উঠেছে। হযবরল শিল্পরীতির এক বিপুল প্রচেষ্টার মধ্যে একটি অচিন্তিতপূর্ব শিল্পকর্ম যে কীভাবে ব্যর্থ হ'য়ে যেতে পারে, এ ছবিখানি তার একটি অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত। সব চাইতে খাপছাড়া ব্যাপার হ'য়ে উঠেছে এই যে ছবিখানার গ্রাম্য পরিবেশ-পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে কাহিনীর উপযোগী ক'রে বিশেষভাবে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেওয়া মানুষগুলি একেবারেই যেন খামখেয়ালী। পরিচালকের উৎকট অতি-বাস্তব শিল্পরীতিই (Naturalism) এর জন্যে দায়ী। এই কৃত্রিমতা আরো প্রকট হয়ে ওঠে সংকীর্ণ একটি পরিসরের মধ্যে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুটিও তুলে ধরবার জন্যে ভাইকোন্তির উদ্‌গ্রতার মধ্যে। তাছাড়া, ধীর বিলম্বিত চালে ছবির গতি ধ'রে রাখবার প্রচেষ্টার জন্যে তাঁর এক একটা দৃশ্যপট কী ক্লান্তিকর দীর্ঘ মনে হয়। এক একটা দৃশ্যের অন্তর্নিহিত ইংগিত ধ'রে ফেলবার পরেও যখন সেই দৃশ্যটি ভাসতে থাকে দর্শকের চোখের সামনে দীর্ঘকাল ধরে, তখন অনুভূতির উৎস রুদ্ধ হ'য়ে যেতে বাধ্য, মুহূর্তের পর মুহূর্ত ফাঁকা মন নিয়ে তখন ঝিমোতে হয় দর্শককে অথবা নির্বিকল্প দৃশ্যপটগুলির তত্ত্বগত নির্গলিতার্থ খুঁজে খুঁজে বের ক'রবার প্রচেষ্টায় হাঁপিয়ে উঠতে হয়, যদিও এ-সম্বন্ধে পরিচালকের উদ্দেশ্য ছিলো অন্যবিধ। ধীর বিলম্বিত চালটাই ছবির পক্ষে তাই ব'লে হানিকর নয় কিছু। নাচ গান বা অন্যান্য যে সব কলাশিল্পকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ ক'রতে হয়, সে-সব শিল্পে যেমন ধীর বিলম্বিত চালের অবকাশ আছে, চলচ্চিত্রের বেলাতেও সেটা আছে। কিন্তু তার জন্যে, একজন

Bach রচনা করবেন একটি Sarabande,* আবার তাকে সার্থক ক'রে তুলতে পারবেন একজন Casals তবে তো। ড্রেয়ার আর আইজেনস্টাইনের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির দীর্ঘ মন্থর অনুচ্ছেদগুলি দৃশ্যত অতো মনোমুগ্ধকর আর সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র আংশিকভাবেই মূর্ত হ'য়ে উঠতে পেরেছে : প্রকৃতপক্ষে একটি সার্থক শিল্পকর্ম তাকেই ব'লতে পারি যেখানে তার রূপায়ণে তার বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট অথচ ভাবগ্রাহী হ'য়ে ফুটে উঠবে, যেখানে তার আংগিকের মধ্যে ভাব-পরম্পরায় কোনোরকম বাধা পেতে হবে না। ফরাসী পরিচালক জর্জি রওকেয়ার কৃষক জীবন নিয়ে তাঁর ডকুমেণ্টারী ছবি Farrebique তুলতে গিয়ে প্রাকৃতজনকে দিয়ে ছবিতে অভিনয় করানোর অসুবিধাগুলি আর ছবিকে ভাবগ্রাহী ক'রে তুলবার প্রয়োজনীয়তা যে কী তা মর্মে মর্মে বুঝে নিতে পেরেছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে ব্যর্থ হ'য়েছেন ভাইকোন্তি। যদি না হ'তেন, La Terra Trema-কে আমরা অন্যরকম দেখতাম।

যুদ্ধোত্তর ইতালীয় চলচ্চিত্রকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে পারলেন যিনি তাঁর নাম রবার্তো রোসেলিনি। তাঁর দু'খানা ছবি Paisa এবং The Miracle দেখবার সুযোগ পাইনি আমি। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে কটি কথা বলা যায় তাছাড়া আর কিছু বলব না আমি। তাঁর Open City সম্পর্কে যে রকম আশা পোষণ করা হ'য়েছিল সে আশা সম্পূর্ণভাবে সার্থক হ'য়ে উঠতে পারেনি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত নাটকীয়তা আর জাঁকজমক এসে গেছে ছবিখানির মধ্যে। তা হ'লেও একেবারে মৌলিক গুণগুলির অভাব দেখা যায়নি ছবিটিতে, তা দেখা গেলে Open City রোসেলিনির মাথার একটা ধারণা মাত্রই থেকে যেত। রবার্ট ফ্ল্যাহার্টি বলেছিলেন : যদি তোমার একটি ক্যামেরা থাকে আর তাই দিয়ে তুমি একটি বই করতে চাও, আর সে বইয়ে যদি অনেক ছবি তুলতে হয় তবে সে বইকে সার্থকভাবে শিল্পমণ্ডিত ক'রে তুলবার জন্যে তোমার যা দরকার সে হচ্ছে ভাবগ্রাহিতা, অনুভূতি। এই অনুভূতির শিল্পায়ণে হয়তো কিছু কায়িক পরিশ্রম হবেই কিন্তু এ পরিশ্রম যে কোনো শিল্প-কর্মেই আছে। আবার এই শিল্পকর্মে সেই শিল্পরীতিই বাঞ্ছনীয় যা আঙ্গিক আর বিষয়বস্তুর ঐক্য সম্পর্কের মধ্য দিয়ে শিল্পের উদ্দেশ্যকে পরিস্ফুট ক'রতে সাহায্য করে। এ-কথা স্বীকার্য যে, যে সামাজিক বিশৃংখলার মধ্যে Open Cityর

* বিলম্বিত লয়ে স্পেন দেশীয় এক ধরনের গীতসমন্বিত নাচের নাম।

উদ্ভব, তার প্রত্যক্ষ প্রভাবই কিছু কিছু বইটির মধ্যে আছে। কিন্তু এ-কথাও মনে না হ'য়েই পারে না যে, ছবিখানার এলোমেলো কাহিনী, কাহিনীর পরম্পরায় যে যুক্তিহীনতা অত্যন্ত প্রকট, তার জন্যে দায়ী যন্ত্রপাতির অভাব ততটা নয়, যতটা রোসেলিনির প্রতিভার সৃজনশীল শক্তির অভাব। সম্ভবত তাঁর শক্তি সম্যক প্রকাশ পাবার অবকাশ পায় Paisa-র অন্তর্গত ছোটো ছোটো কাহিনীর মতো কাহিনীগুলির মধ্যে, চল্লিশ মিনিটের ছবি Miracleএর মতো ছবির মধ্যে। আংগিকের ক্ষেত্রে বিশৃংখলাই তাঁর ছবিগুলির প্রধান ত্রুটি—নয়তো Open City-র মধ্যে যে কাহিনী আছে তা গতানুগতিক অতিনাটকীয় কাহিনীর মতোই মোটামুটি দৃঢ়সংবদ্ধ। অভিনেতাদের অভিনয় সম্পর্কেও রোসেলিনীর নজর যথেষ্ট তীক্ষ্ণ নয়। Open City-র মধ্যেকার বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ধরনধারন বেখাপ্পারকম বুড়োটে, নাটকীয় মুহূর্তগুলি যেখানেই ঘন হ'য়ে এসছে সেখানেই ম্যাগনানি বা আলদো ফাব্রিজির মতো ওস্তাদ পেশাদারী অভিনেত্রী অভিনেতারা থিয়েটার করা শুরু ক'রে দিয়েছেন। এমনি পেশাদারী অভিনয়ের ওপরে তাঁর মাত্রাহীন নির্ভরশীলতার চূড়ান্ত একটি দৃষ্টান্ত পেয়েছি তাঁর La Voce Umana (The Human Voice) দেখতে গিয়ে। একটি Cocteau নাটক থেকে ছবিখানা তোলা হয়েছে। এর মধ্যে পুরো পঁয়তাল্লিশটি মিনিট ধরে অ্যানা ম্যাগনানি একাই একেশ্বরী হ'য়ে রইলেন পর্দা জুড়ে, টেলিফোনের ওপরেই তিনি পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধ'রে একাই কথা বললেন তাঁর প্রেমাস্পদের কাছে, তাঁর প্রেমাস্পদ যেন তাঁকে অকূল দরিয়ায় ভাসিয়ে না দেন এই প্রার্থনা জানালেন। নায়িকার প্রত্যেকটি বেদনা ম্যাগনানি একটার পর একটা দীর্ঘ take-এর মধ্য দিয়ে মূর্ত ক'রে তুললেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের একটু অস্বস্তি লাগতে থাকে এই ভেবে যে এ অভিনয় তো তিনি বন্ধুদের কল্যাণার্থে থিয়েটরের মঞ্চের ওপর (সেখানে close up এর ব্যবস্থা থাকবে না) একটি ড্রয়িংরুমের মধ্যে বসে ঠিক এমনি 'আর্টিষ্টিক' সাফল্যের সংগেই ক'রতে পারতেন!

সেই ১৯৩২ সালেই মারিও ক্যামেরিনি তাঁর Gli Uomini che Mascalzonia (All Men Are Like That) মধ্যে যে প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, আজকের Neo-realist পরিচালকদের মধ্যে সেটা সাধারণভাবে চলছে আজ। Gli Uomini চমৎকার একটি রোমান্টিক কমেডি, কিন্তু বাস্তব ঘটনা সংস্থানের ওপর এর ভিত্তি বলে হলিউডের ছবির থেকে এর জাত আলাদা

—আবার ঠিক ঐ কারণেই ছবিটি হৃদয়গ্রাহী নয়নাভিরাম হ'য়ে উঠতে পেরেছে, ছবিটির গতি বাধাহীন হ'তে পেরেছে। ১৯৪৮এ ক্যামেরিনি Molti Sogni per le Strade (Many Dreams Along The Street) নামে যে ছবিখানি তুললেন, তার মধ্যে দেখা গেলো তাঁর পূর্বতন শিল্পরীতিরই পুনর্বিকাশ, এবার বিশেষ পার্থক্যের মধ্যে দেখা গেলো, তাঁর কমেডির কাহিনীর মধ্যে সামাজিক জটিল দ্বন্দ্বসংঘাতের চেহারা এসে গেছে, যার ফলে নাটকীয় পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে। Molti Sogni এমন একখানি ছবি যার কাহিনী শুরু হয়েছে সহজ সাধারণ একটি পরিস্থিতির মধ্যে, সেই পরিস্থিতির থেকে নানান্‌ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলো ক্রমশ—ঠিক এই জাতীয় কাহিনীর শিল্পকর্মে শীর্ষস্থানীয় ইতালীয় পরিচালকদের এমনি সহজ স্বাভাবিক একটা দক্ষতা দেখা যায় যে আশ্চর্য হ'তে হয়। এই ধরনের আর একখানা ছবির উল্লেখ করা যেতে পারে—আলেসান্দ্রো ব্লাসেত্তির Quattro Passi Fra Le Nuvole (Four Steps in the Clouds), ছবিখানা ১৯৪২-এর, আর তাই প্রকৃতপক্ষে এ-ছবিখানা প্রাক্‌ Neo-realist যুগের। পেশাদারী অভিনেতারা এর মধ্যে অভিনয় ক'রেছেন। এর নায়ক একজন ভ্রাম্যমান বোকা-হাবা ফেরিওয়ালা, তার বউটি অত্যন্ত প্রবলা। একবার ঘুরতে ঘুরতে এক শহরতলীতে তার সংগে সাক্ষাৎ একটি তরুণীর। তরুণীর একটি ছেলে হ'য়েছে দেখা গেলো কিন্তু যে প্রেমিকটির দায়িত্বে সেটা ঘটেছে সেই প্রেমিকপ্রবর মেয়েটাকে ছেড়ে উধাও হয়েছেন। তরুণীটির সমস্যা দাঁড়িয়েছে এই যে এ-অবস্থায় এখন সে কী ক'রে তার রক্ষণশীল চাষী বাপ-মার ঘরে ফিরে যাবে। হ'তে হ'তে পরিস্থিতি এমনি দাঁড়িয়ে গেলো যে ফিরিওয়ালাটি মেয়েটির ওপর মায়াপরবশ হ'য়ে পড়ল আর তাইতে সে ঠিক ক'রে ফেললে যে সে-ই মেয়েটিকে তার বাপ-মার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে বলবে যে সে-ই মেয়েটিকে বিয়ে ক'রেছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে চমৎকার এক কৌতুক ঘনিয়ে এলো সমস্ত পরিস্থিতির মধ্যে। কিছুটা সময় পর্যন্ত রহস্যটা চললো বেশ, কিন্তু মেয়েটির বাপ এসে পড়তেই সব গেলো ফাঁস হ'য়ে, মানুষটি এতই রক্ষণশীল যে তিনি জেরার ওপর জেরা ক'রে ব্যাপারটা ঠিক আঁচ ক'রে ফেললেন। কিন্তু শেষ রক্ষা এই যে এর পরেও সাংঘাতিক কোনো দুর্যোগ ঘটলো না, ফেরিওয়ালাটি উদ্‌ভ্রান্ত বাক্‌বৈদগ্ধ্যে এমনি সব যুক্তিজাল বিস্তার ক'রলো যে তার পরে সত্যি সত্যি আর পাষাণ হয়ে থাকা যায়না। স্বভাবতই তখন আবার মিলমিশ হ'য়ে

গেলো সকলের সংগে। সকলের ভাগ্যই বেশ সুপ্রসন্ন হ'য়ে এলো, কেবল আমাদের নায়কটির ভাগ্য ছাড়া। বেচারী ইতিমধ্যে মেয়েটিকে একটু গভীর-ভাবেই ভালোবেসে ফেলেছে—কিন্তু আহা, কী নিষ্ঠুর পরিহাস! বেচারীকে আবার ফিরে যেতে হবে তার সেই দজ্জাল গিন্নীটির ঝক্কি পোয়াতেই—আবার তাকে পুনর্মূষিক হ'তেই হবে। Quattro Passi এমনই এক ধরনের কাহিনী যার সাফল্য বা ব্যর্থতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে তার রূপায়ণের ওপর। ব্লাসেত্তির হাতে প'ড়ে এ-কাহিনী অত্যন্ত মনমাতানো পরিহাসমূলক এক অকৃত্রিম হাসি-খুশিভরা ছবি হ'য়ে উঠতে পেরেছে।

ক্যামেরিনি আর ব্লাসেত্তির মতো ভিত্তোরিও দ্য সাইকাও ইতালীয় সিনেমার একজন বিশেষ ব্যক্তি। এ-পথে অভিনেতা হিসেবেই তাঁর প্রথম পদক্ষেপ; তিরিশ সাল থেকে শুরু ক'রে পুরো দশটি বছর প্রচুর খ্যাতি কুড়োলেন তিনি, চল্লিশ সালে পরিচালনার কাজে আসবার পরেও নিজের অভিনয় ছাড়লেন না দ্য সাইকা। তাঁর প্রথম তিনখানা ছবি ইতালীর বাইরে আসেনি কখনো। চতুর্থ ছবি I Bambini Ci Guarodan (The Children Are Watching Us) প্রাক্-Neo-realist যুগের এবং Quattro Passiর সমকালীন। ব্লাসেত্তির ছবিতেও যেমন, এখানেও পেশাদারী অভিনেতারা হাজির—কিন্তু এ ছবিতে যেভাবে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাঙন দেখানো হ'য়েছে, দাম্পত্য তিক্ততার মধ্য দিয়ে পরিবারের মধ্যে যে দুর্যোগের ঘনঘটা আর তার শোচনীয় পরিণামের প্রকাশ এ-ছবিটিতে তা কিন্তু ব্লাসেত্তির ছবিতে দেখা যায়নি। সম্পূর্ণ বিষয়টা চোখের সামনে খুলে ধরে প্রতিটি জিনিসের চুলচেরা বিশ্লেষণ ক'রেছেন দ্য সাইকা—স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তিক্ত কটু সম্পর্ক, তার মধ্যে মেয়েটির আর একজনের ওপর আসক্তি; স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ; নতুন প্রেমাস্পদের সংগে মেয়েটির প্রগাঢ় প্রণয়ের অধ্যায়; স্বামীর সংগে মেয়েটির পাকাপাকিভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদ; আর পরিণতিতে স্বামীর আত্মহত্যা। আর এর সব কিছুর মধ্যেই জেগে রয়েছে সমস্ত ঘটনার এক নির্বাক সাক্ষী—ওদের চার বছরের ছেলেটি—কখনো সে বাক্যহারা, কখনো আতংকে শিউরে উঠছে আবার কখনো বা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে সে। ১৯৪৬এ তোলা Shoeshine দেখে যাঁরা ভেবেছিলেন এইটিই দ্য সাইকার প্রথম উল্লেখযোগ্য সাফল্য, তাঁরা এই I Bambini Ci Guardano দেখে চমকে উঠলেন। Shoeshine ছবিখানা Open Cityর

ঠিক পরে পরেই বেরোয়, সংবর্ধনার পরিমাণও উভয়ের ক্ষেত্রে একই হোলো, তবে Shoeshine সম্বন্ধে লোকের আগ্রহ বেশি যুক্তিযুক্ত বলা চলে। Open Cityতে যে ধরনের সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হ'য়েছে, এ-ছবিটিতেও তাই-ই করা হোলো, কিন্তু Open Cityর খাপছাড়া এলোমেলো ধরনের চিহ্নও নেই Shoeshineএ। অভিনেতাদের দিয়ে সুষ্ঠু অভিনয় করিয়ে নেবার অসাধারণ দক্ষতা আর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সম্বন্ধে নির্ভুল বোধশক্তি দ্য সাইকার এমনিই যে তার ফলে তাঁর ছবিতে ছবির যান্ত্রিক ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো—যেমন নিকৃষ্ট ধরনের filmstock, অসন্তোষজনক Processing, কথাবার্তার ত্রুটিপূর্ণ Post-synchronisation ইত্যাদি ব্যাপারগুলো ঢাকা প'ড়ে যায়। এই অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি দ্য সাইকার কখনোই লোপ না পেলেও Shoeshine শিল্পকর্ম হিসেবে I Bambiniর চেয়ে খাটো। আর এর পরেই আমরা পেলাম তাঁর ভাস্বর সৃষ্টি, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি Bicycle Thieves।

সিজারি জাভাত্তিনির একটি রচনা থেকে দ্য সাইকার এই Bicycle Thieves। ১৯৪৮এ তুললেন তিনি ছবিটি। এর পরে আরো কয়েকটি ছবি জাভাত্তিনির রচনাকে নিয়ে তৈরী হ'য়েছে, এবং তাইতে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হ'য়েছে যে সাম্প্রতিককালের চলচ্চিত্র লেখকদের মধ্যে ইনি একজন বিশিষ্ট লেখক। এঁর প্রতিভার চরিত্র বিশ্লেষণ ক'রলে দেখা যাবে যে সামাজিক আর মানবিক রীতিনীতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আছে তাঁর তীক্ষ্ণ বোধশক্তি আর সেই সংগে পর পর ঘটনার প্রবাহে গ'ড়ে তোলা তাঁর কাহিনী এমনি আকর্ষণীয় হ'য়ে ওঠে নব্বই এবং মিনিটের একটি ছবির মধ্যে ব্যবহারিক দিক থেকে তা এমনই খাপ খেয়ে যায় যে তার ফলেই চলচ্চিত্রের দিক থেকে এ-রকম কাহিনী এত আদরণীয় হ'য়ে উঠতে পেরেছে। এঁর কাহিনীগুলি অত্যন্ত সরল প্রকৃতির আর সেই জন্য সেগুলোকে ঐশ্বর্যশালী ক'রে তুলবার যথেষ্ট সুযোগ থেকে যায়; ফলত অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং বিশ্বাসযোগ্য পরিস্থিতি, চরিত্র, ঘটনা-পরম্পরায় সম্পূর্ণ ব্যাপারটা এঁর কাহিনীগুলিতে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হ'য়ে ওঠে দর্শকের কাছে। এই ধরনের কাহিনী নিয়ে এ পর্যন্ত আমরা যতো ছবি পেয়েছি তার মধ্যে Bicycle Thieves সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনী ব'লে মনে হয়। কাহিনীর রূপায়ণও হ'য়েছে যথাযথ; আর এমনি সর্বজনগ্রাহ্য রীতিতে সেটা করা হ'য়েছে যার ফলে ছবিটি বিশ্বজনীন সমাদর পাচ্ছে। আর সে সমাদরের বহর এমনই যে একদিকে

আমেরিকার Life পত্রিকা এবং আর এক দিকে Soviet Literature পত্রিকায় গ্রেগরি আলেকজান্দ্রভ ছবিখানি সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছেন সমপরিমাণেই, দুদিক থেকেই ছবিখানিকে একেবারে আদর্শস্থানীয় ব'লে স্বীকার ক'রে নেয়া হ'য়েছে। ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় ছবিখানি বহুদিন ধ'রে চলেছে, আর তাইতে এইটে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হ'য়ে গেছে যে সাম্প্রতিককালের অত্যন্ত জনপ্রিয় ছবিগুলির মধ্যেই এর স্থান, এবং সে স্থান অত্যন্ত বিশিষ্ট।

মূলত, Bicycle Thieves-এর কাহিনীর প্রকৃতি পৌরাণিক ধাঁচের—পলায়নপর কোনো কিছুর জন্যে পশ্চাদ্ধাবন, অনুসন্ধান-তৎপরতা—এক্ষেত্রে দেখি, সেই অনুসন্ধান শুরু হোলো একটি অপহৃত সাইকেলের জন্যে, এমনি একটি লোকের সে সাইকেল, যার অন্নসংস্থানের একমাত্র অবলম্বন এই সাইকেল এবং সেটি চুরি যাবার অর্থ একটি সম্পূর্ণ পরিবারের অনাহার, মৃত্যু। অন্যান্য কাহিনীর বেলাতেও যেমন, এই মূল কাহিনীটিকে নানাবিধ অলংকরণে রূপায়িত করে তুলবার অসংখ্য পথ বেছে নেওয়া সম্ভব, অবিশ্যি পরিচালকের রুচি অনুযায়ীই হ'য়ে উঠবে সেটা —জাভাত্তিনি আর ত্ত সাইকা যে পথ বেছে নিলেন' তাতে আমাদের কাছে লভ্য হ'য়ে উঠলো সহানুভূতি-সহমর্মিতা, হাসি-ঠাট্টা, রোমাঞ্চ-উত্তেজনা ; আমরা পেলাম তাতে সামাজিক অন্যায়-অত্যাচারের সুতীব্র সমালোচনা ; আমরা পেলাম সেখানে পুলিশী-বর্বতার বিরুদ্ধে, ধর্মের গোঁসাইদের বিরুদ্ধে, গণিকাবৃত্তির বিরুদ্ধে, আর গণকঠাকুরদের শয়তানির বিরুদ্ধে স্পষ্ট কঠিন ধিক্কার। মজুরশ্রেণীর সত্যিকারের সামাজিক চেহারাটা ফুটে উঠেছে ছবিখানার মধ্যে নিখুঁত বাস্তব রূপায়ণের মধ্যে ; পিতা-পুত্রের সম্পর্কের এমন একটি অনুভূতিময় রূপ মূর্ত হ'য়ে উঠেছে বইটিতে যা আমাদের অভিভূত করে ফেলে ; আরো আশ্চর্যের বিষয়, সাইকেলটা যে চুরি ক'রেছিলো, সেই চোরের ওপরও পরোক্ষভাবে আমাদের একটা সহানুভূতি এসে যায় যেন কেমন ক'রে ; আর, সর্বোপরি, এই সর্বনাশা সামাজিক অব্যবস্থা-অত্যাচারের মধ্যে যে-শোচনীয় হাহাকার আর হতাশা উদ্বেল হ'য়ে উঠে সব কিছু নিলে, তা সত্যিই বিস্ময়কর। এদিক থেকে ছবিখানা চার্লস চ্যাপলিনের Monsieur Verdoux-র সগোত্র।

Bicycle Thieves এর মধ্যে চলচ্চিত্রের সার্থক আংগিক উপকরণের, চলচ্চিত্রের প্রকৃত 'সত্য ও তথ্য'-এর যেন এক আশ্চর্য পুনরাবিষ্কার ঘটলো। এ বিষয়ে ত্ত সাইকা চ্যাপলিনের কাছে তাঁর ঋণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'রেছেন।

আমাদের ভারতীয় চলচ্চিত্র-কর্তাদের এখান থেকে অনেক কিছু শেখবার আছে, —ছবিখানার কাহিনীর সরল সহজ চেহারা অথচ তার শাশ্বত সার্বিক আকর্ষণ, যে শিল্প-রীতিতে ছবিখানার রূপায়ণ তার উপযোগিতা, কেমন ক'রে এমন একটা ছবি এত অল্প খরচার মধ্যে তোলা সম্ভবপর হোলো—এই সব শিক্ষা আমাদের ভারতীয় প্রযোজক-পরিচালকেরা এ ছবি থেকে নিতে পারেন।

আমাদের পরিচালকদের অনুভূতি ও চেতনা যে এত দীন ও নিঃস্ব তার কারণ তাঁরা চলচ্চিত্রের সার্থকতা খুঁজেছেন অন্ধের মতো একটা 'টেকনিক' গ'ড়ে তুলবার দিকেই। এটা তাঁরা ভুলে যান যে সর্বসাধারণকে নিয়েই যখন চলচ্চিত্রের কারবার তখন চলচ্চিত্রের সর্বোত্তম সার্থকতা হবে সুস্থ সবল জীবন-বোধের মধ্যেই, বাস্তব জীবনেরই নানা ক্ষেত্র থেকে রস আহরণ করে পুষ্ট ক'রে তুলতে হবে তার কাহিনী। মেকী অবাস্তব একটা কাহিনীকে ছদ্ম, কপট একটা আংগিকের খোলসে ঢেকে 'টেকনিক্যাল' জারিজুরির যতোই বহ্বারম্ভ করা যাক না কেন, ক্রিয়াটা লঘু না হয়েই পারে না। সুতরাং ভারতীয় চলচ্চিত্র-কর্তাদের জীবন-বোধে উদ্বুদ্ধ হ'তে হবে, বাস্তব-বোধে চেতনাবান হ'তে হবে। এবং আদর্শ হিসেবে তাঁদের বেছে নিতে হবে De Sicaর আদর্শকে, DeMilleর নয়॥

রবীন্দ্রনাথ ঃ পশ্চিমের জানালায়

কৃষ্ণ ধর

ব্রুটাস একজন মাননীয় ব্যক্তি ঃ সীজারের অন্ধভক্ত নই আমি, কিন্তু ব্রুটাসও নই। অথচ ব্রুটাস মাননীয় ব্যক্তি, তাঁর কথার বিরোধিতা করি কী ক'রে? রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী স্মৃতিতর্পণের সানন্দ অনুষ্ঠানে ব্রুটাস সুলভ আচরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী, অধুনা ইয়োরো-মার্কিন জগতে খ্যাতিমান শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু! বুদ্ধদেববাবু একজন মাননীয় ব্যক্তি। তিনি বিদ্বান ও ইংরেজী ভাষায় লিখতে পারেন। শততম জয়ন্তী উৎসবে তিনি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশ্যে চৌখস ইংরেজী ভাষাতেই তিলাঞ্জলি অর্পণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের বিপুল সাহিত্য রচনার বিস্তৃত ক্ষেত্রে ইয়োরোপীয় লেখকদের প্রভাব ছিল কি না, এ নিয়েই শ্রীযুক্ত বসুর একটি প্রবন্ধে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। আলোচনায় এমন অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের রচনা যদিও মেজাজে ও আঙ্গিকে, বাংলা ভাষায় রচিত 'ইয়োরোপীয়' সাহিত্য, এই মহান স্রষ্টা ইয়োরোপীয় সাহিত্য কী পরিমাণ পাঠ করেছিলেন তা জানা সম্ভব নয়। এর কারণ, তিনি বলছেন, রবীন্দ্রনাথের রচনায় অন্য লেখকের রচনার উল্লেখ অপরিমিত। যখন তিনি উল্লেখ করেছেনও, কালিদাস ও বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতিই ছিল তাঁর পক্ষপাতবেশী। ইংরেজ কবিদের মধ্যে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, শেলী ও কীটসের বাইরে, সুপ্রচুর ও সুপ্রশংস উল্লেখ রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিরল। শেষের দিকের রচনায় তিনি ইবসেন ও জন ডান-এর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন এবং সম্ভবতঃ তা তরুণ প্রজন্মের মুখের দিকে তাকিয়েই।

আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্পর্কে এ ধরণের সরল সিদ্ধান্ত সত্য আবিষ্কারের পক্ষে সহায়ক নয়। ইয়োরোপীয় লেখকদের জীবনীতে, পত্রসাহিত্যে, ডায়েরীর পাতায় তাঁদের মনোধর্মের পরিণতির সুষ্ঠু পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত বসু আক্ষেপ করছেন যে রবীন্দ্রনাথের জীবনীর উপকরণ এত কম যে তাঁর পঠন-জগতের একটা পুরো চেহারা এ থেকে আগ্রহী

পাঠকরা অনুমান করতে পারছেন না। কিন্তু এতে অনুভবী পাঠকের কী অসুবিধা হ'তে পারে তা আমার বোধগম্য নয়। যে-কোনো সৎ সাহিত্যিকই নিজের উপলব্ধি ও বোধের জগতকে বিস্তৃততর ও গভীরতর করবার জন্য ট্রাডিশনের দ্বারস্থ হ'ন। এবং সেই ট্র্যাডিশন প্রথমতঃ নিজের দেশ ও সাহিত্যের। পরবর্তী অধ্যায়ে তা বিশ্বমানবের দ্বার পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। রবীন্দ্রনাথের রচনায় সংস্কৃত সাহিত্য ও কালিদাসের কাব্যের বারংবার উল্লেখের কারণ এই যে তিনি আমাদের দেশের এই চিরায়ত সাহিত্যেই নিজের বিস্ময়ের জগতকে, আনন্দের অনুভূতিকে বিশেষভাবে আবিষ্কার করেছিলেন। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৎ ও আন্তরিক স্রষ্টা, তাঁর পক্ষে নিজের চেতনার জাগরণের উৎসটিকে লোকচক্ষুর অন্তরাল করে রাখা সম্ভব হয়নি। শুধুমাত্র চাতুর্য কিংবা তরুণ প্রজন্মের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি কোনোদিনই অপঠিত ইউয়োরোপীয় লেখকদের রচনার উল্লেখ করেন নি। তা ছাড়া, ইউয়োরোপীয় সাহিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বচ্ছন্দ পদচারণা সীমায়িত ছিল ভাষার পাঁচিলে। ইংরেজী ছাড়া অন্য ইউয়োরোপীয় ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি গভীর ছিল না। ইংরেজী ভাষার হাত ধরেই তিনি ফরাসী, জর্মন এবং প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের মহৎ স্রষ্টাদের অমর রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। যাঁদের রচনা পড়ে তিনি আনন্দ পেয়েছেন, অনুপ্রাণিত হয়েছেন, তাঁদের কথা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন। যাঁরা মনে করেন যে ইংরেজী সাহিত্যের রোমান্টিক ত্রয়ী, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী ও কীট্‌সের কবিতা ছাড়া অন্য কোনো কবির কবিতা রবীন্দ্রনাথকে দোলা দিতে পারে নি, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। 'বর্ষশেষ' কবিতার সঙ্গে শেলীর 'ওড্ টু দি ওয়েস্ট উইণ্ড'কবিতার সাদৃশ্য অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু একে 'সরাসরি ধার' বলে স্বীকার করতে স্বভাবতঃই আমাদের দ্বিধা হ'বে। কারণ রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-জগতের বিস্তৃতির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা একথা কিছুতেই মানতে রাজী হবেন না যে 'বর্ষশেষে'র প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নয়। তবুও এই ধরণের প্রক্ষিপ্ত দু' একটি কবিতার ভাব সাদৃশ্য দিয়ে এমন সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ রোমান্টিকদের কবিতা-দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় বিদেশী লেখকদের উদ্ধৃতি কম। উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি কোনোদিনই নিজের বক্তব্যকে বোঝাতে চাননি। যখন উদ্ধৃতির প্রয়োজন

হয়েছে, তিনি সংস্কৃতের দ্বারস্থ হয়েছেন। এটাই ভারতীয় কবির পক্ষে স্বাভাবিক। যেমন ইয়োরোপীয় লেখকদের রচনায়, গ্রীক ও লাতিনের উল্লেখ যতটা থাকে, ইংরেজী বা রুশ সাহিত্যের উদ্ধৃতি স্বভাবতঃই সে পরিমাণে কম। ইংরেজী সাহিত্যের মহৎস্রষ্টা সেক্সপীয়রকে রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করতেন না বলে, শ্রীযুক্ত বসু যে মন্তব্য করেছেন, তাও আমার কাছে খণ্ডিত-সত্য বলে মনে হয়েছে। সেক্সপীয়রের রচনা রবীন্দ্রনাথকে কিশোর বয়স থেকেই অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি স্বয়ং 'ম্যাকবেথ' নাটকের অনুবাদও করেছিলেন। এ ছাড়াও, সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনায়, তিনি সেক্সপীয়র সম্পর্কে বহুবার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলছেন: 'সেক্সপীয়রের কাব্যের কেন্দ্রস্থলেও একটি অমূর্ত ভাবশরীরী সেক্সপীয়রকে পাওয়া যায় যেখান থেকে তাঁর জীবনের সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস বিরাগ অনুরাগ বিশ্বাস অভিজ্ঞতা সহজ জ্যোতির মতো চতুর্দিকে বিচিত্র শিখায় বিবিধ বর্ণে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে; সেখান থেকে ইয়াগোর প্রতি বিদ্বেষ, ওথেলোর প্রতি অনুকম্পা, ডেসডিমোনার প্রতি প্রীতি, ফলষ্টাফের প্রতি সকৌতুক সখ্য, লিয়ারের প্রতি সসম্ভ্রম করুণা, কর্ডেলিয়ার প্রতি সুগভীর স্নেহ সেক্সপীয়রের মানবহৃদয়কে চিরদিনের জন্য ব্যক্ত ও বিকীর্ণ করছে।' অন্যত্র তিনি বলছেন: 'সেক্সপীয়র মানবচরিত্রের চিত্রশালার দ্বারোদ্ঘাটন করে দিয়েছেন, সেখানে যুগে যুগে লোকের ভিড় জমা হবে।' রবীন্দ্রনাথের এই মরমী উক্তি থেকে এমন মনে করবার কোনো কারণ দেখি না যে তিনি সেক্সপীয়র পাঠ করলেও, তাঁর রচনা পছন্দ করতেন না। বরং তিনি অনেক ক্ষেত্রেই সেক্সপীয়র সম্পর্কে ছিলেন উচ্ছ্বসিত। তিনি বলেছেন: 'সেক্সপীয়রে আমরা চিরকালের মানুষ এবং আসল মানুষটিকে পাই, কেবল মুখের মানুষটি নয়। মানুষকে একেবারে তার শেষ পর্যন্ত আলোড়িত করে সেক্সপীয়র তার সমস্ত মনুষ্যত্বকে অবারিত করে দিয়েছেন। তার অশ্রুজল চোখের প্রান্তে ঈষৎ বিগলিত হয়ে রুমালের প্রান্তে শুষ্ক হচ্ছে না, তার হাসি ওষ্ঠাধরকে ঈষৎ উদ্ভিন্ন করে কেবল মুক্তাদন্তগুলিকে মাত্র বিকাশ করছে না—কিন্তু বিদীর্ণ প্রকৃতির নির্ঝরের মতো অবাধে ঝরে আসছে, উচ্ছ্বসিত প্রকৃতির ক্রীড়াশীল উৎসের মতো প্রমোদে ফেটে পড়ছে। তার মধ্যে একটা উচ্চ দর্শনশিখর আছে যেখান থেকে মানবপ্রকৃতির সর্বাপেক্ষা ব্যাপক দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়।'

ফরাসী সাহিত্যের যুগান্তকারী কবিদের উল্লেখ অবশ্য রবীন্দ্ররচনাতে খুব বেশী নেই। কিন্তু দু'জন ফরাসী বুদ্ধিজীবী মনীষীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরের সমধর্মিতা ছিল—রোলাঁ ও বের্গসঁ। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল ইংরেজী তর্জমার মধ্য দিয়ে। ফরাসী কবি গোতিয়ের রচিত 'মাদ্‌মোয়াজেল দ্য মোপ্যাঁ' রবীন্দ্রনাথের ভাল লাগেনি। তিনি বলেছেন যে এই গ্রন্থটিতে 'হৃদয় অধিকক্ষণ বাস করতে পারে না—রুদ্ধশ্বাস হয়ে তাড়াতাড়ি উপরে বেরিয়ে এসে যখন আমাদের প্রতিদিনের শ্যামল তৃণক্ষেত্র প্রতিদিনের সূর্যালোক, প্রতিদিনের হাসিমুখগুলি দেখতে পাই তখনই বুঝতে পারি সৌন্দর্য এই তো আমাদের চারিদিকে, সৌন্দর্য এই তো আমাদের প্রতিদিনের ভালোবাসার মধ্যে।' এই গ্রন্থে সাহিত্য-সত্যের স্বল্পতাই রবীন্দ্রনাথকে গোতিয়ের সম্পর্কে বিরূপ করে তুলেছিল। অথচ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যে 'পুষ্পপল্লব নদীনির্ঝর পর্বত-প্রান্তর সর্বত্রই নব নব সৌন্দর্য উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠছে।' শ্রীযুক্ত বসু বলছেন, রবীন্দ্রনাথ বিদেশী কোন কবির কবিতা ভালবাসতেন সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই। এর কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে তিনি একবারও তাঁর সমসাময়িক অথবা অনতি পূর্ববর্তী 'নতুন ও প্রামান্য কবি'দের কথা বলেন নি ঃ বোদলেয়ার অথবা সুইনবর্ণ, ভার্লেন অথবা মালার্মে, ভ্যালেরী অথবা রিলকে। এর থেকে কি আমরা এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারি যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য রুচি সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা করা দুষ্কর? আজকে যাদের 'প্রামাণ্য কবি' বলছি, রবীন্দ্রনাথের যুগে ইয়োরোপীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে ভিন্নতর প্রামাণিকতা যে ছিল না, সেকথা আজকের মন নিয়ে বিশ্লেষণ করলে সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের ওপর অবিচারই করা হ'বে। অথচ এই সমালোচকরাই বলছেন যে এই কবিদের রচনা পাঠ না করেও রবীন্দ্রনাথের মতো একজন মহৎ শিল্পীর পক্ষে তাঁদের কবিধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। সেক্‌স্‌পীয়র তো জনশ্রুতি থেকেই পাশ্চাত্যের প্রাচীন কাহিনী ও রেণেসাঁসের মর্মকথা আত্মসাৎ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বেলাতেই বা তা সম্ভব হ'বে না কেন? এই বক্তব্যের নিহিতার্থ নিয়ে সরল-ভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের রচনা নিজে পাঠ না করে, লোকমুখে শুনে তাঁদের কাব্যাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তবে কি সাময়িক পত্রে গ্রন্থ সমালোচনায় তাঁদের কবিতার সমালোচনা ও উদ্ধৃতি পড়েই

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা ফরাসী কবিতার মেজাজে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল? শ্রীযুক্ত বসু গম্ভীরভাবে বলেছেন, হ্যাঁ, তাই। রবীন্দ্রনাথের মতো কবির পক্ষে এইরূপ পল্লবগ্রাহিতা অসম্ভব বলেই আমি মনে করি। কাব্যের তর্জমা তিনি পছন্দ না করলেও ইয়োরোপীয় সাহিত্য তিনি প্রচুর পাঠ করেছিলেন। তাঁর সাহিত্য আলোচনায় এর উল্লেখও তিনি করেছেন। ইলিয়াড, অডিসি, ইংলণ্ডের আর্থার কাহিনী, এমন কি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার সাগা সাহিত্যের চিরায়ত সত্যটুকু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় নি। দান্তের কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান ছিল সুগভীর। তিনি এক জায়গায় বলেছেন, 'দান্তের কাব্যে দান্তের জীবন জড়িত হইয়া আছে, উভয়কে একত্রে পাঠ করিলে জীবন এবং কাব্যের মর্যাদা বেশী করিয়া দেখা যায়।' এমন কথা মনে করা অন্যায় যে দান্তের কাব্য ও জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ পরিচয় না পেয়েই রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করেছিলেন।

জর্মন ভাষা আয়ত্ত না হলেও রবীন্দ্রনাথ জর্মনীর সাহিত্য পড়েছিলেন। কোনো মহৎ শিল্পীর পক্ষেই কেবলমাত্র নিজের দেশের সাহিত্যিক উত্তরাধিকার নিয়ে তৃপ্ত থাকা সম্ভব নয়। এক জায়গায় তিনি জর্মনীর জাতিচরিত্র আলোচনায় বলেছেন, 'জর্মনীতে যখন লেসিং, গ্যটে, শিলর, হাইনে, হেগেল, কাণ্ট, হুমবোল্ড, সাহিত্যের অমরাবতী সৃজন করিয়াছিল, তখন জর্মনীর বাণিজ্যতরী, রণতরী ঝড়ের মেঘের মতো পাল ফুলাইয়া পৃথিবী আচ্ছন্ন করিতে ছুটে নাই।' গ্যটে, শিলর ও হাইনে, এই মহান জর্মনত্রয়ীর রচনার সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। কিন্তু আমি মনে করি না যে 'ক্ষণিকার' উজ্জ্বল আধুনিক মননের কবিতাগুলি হাইনে-র দ্বারা প্রভাবিত।

আরেকটি গুরুতর মন্তব্য শ্রীযুক্ত বসু করেছেন যে ইয়োরোপের প্রধান কাব্যধারার প্রতি রবীন্দ্রনাথের মতো একজন সংবেদনশীল কবির নির্লিপ্ততার কারণ কি? এটা কি সত্যিই নির্লিপ্ততা? তিনি সন্দেহ করছেন যে আসলে পাশ্চাত্য সাহিত্যধারার প্রতি রবীন্দ্রনাথের নির্লিপ্ততা তো ছিলই না, বরং তাঁর আগ্রহ ছিল বেশী। অথচ নিজের দেশের রাজনৈতিক পরাধীনতার জন্য তিনি ইয়োরোপের প্রতি তাঁর সপ্রশংস আগ্রহের কথা গোপন করে রেখেছিলেন। প্রত্যেক বিবেকবান পাঠকেরই এই সন্দেহ প্রতিবাদযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর হৃদয় জয় করবার জন্য কখনই চাতুর্যের বা কপটতার আশ্রয় নেননি। তা হলে তিনি বাংলার অগ্নিক্ষরা বিপ্লবী চেতনার যুগে নির্ভীক লেখনীতে 'চার অধ্যায়'

লিখতেন না। বৃটিশের রক্ত চক্ষু কিংবা উগ্র স্বদেশিয়ান কোনোটাই রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সত্য উপলব্ধি থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। ইয়োরোপের প্রাণধর্মকে তিনি সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করেছেন। কিন্তু তার সংকীর্ণ বৈষয়িকতার প্রতি তিনি ছিলেন বিরূপ। ইয়োরোপীয় চিন্তার বিশ্বজনীনতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অন্তরের সমর্থন কীরূপ গভীর ছিল তা এই উদ্ধৃতি থেকে পাঠকদের হৃদয়ঙ্গম হ'বে। তিনি বলছেনঃ 'আমরা যখন ইংরেজী সাহিত্যের সংশ্রবে আসি তখন সেটা ছিল ওদের প্রসারণের যুগ। ইয়োরোপে ফরাসাবিপ্লব মানুষের চিত্তকে যে নাড়া দিয়েছিল সে ছিল বেড়া-ভাঙবার নাড়া। এই জন্যে দেখতে দেখতে তখন সাহিত্যের আতিথেয়তা প্রকাশ পেয়েছিল বিশ্বজনীনরূপে। সে যেন রসসৃষ্টির যজ্ঞ। তার মধ্যে সকল দেশেরই আগন্তুক অবাধে আনন্দ ভোগের অধিকার পায়। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, ঠিক সেই সময়েই ইয়োরোপের আহ্বান আমাদের কানে এসে পৌঁছুল—তার মধ্যে সর্বমানবের মুক্তির বাণী। আমাদের তো সাড়া দিতে দেরী হয় নি। সেই আনন্দে আমাদেরও মনে নবসৃষ্টির প্রেরণা এল।'

ইয়োরোপের প্রতি এই অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের কার্পণ্য ছিল না কোনোদিন। ইয়োরোপীয় সাহিত্যের সর্বজনীন আবেদন সম্পর্কেও তিনিই আমাদের প্রথম সচেতন করেছিলেন। কিন্তু ইয়োরোপের চিত্ত বিকৃতি যখন ঘটল, পাশ্চাত্ত্যের হৃদয়ে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েও, রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্টভাষায় করলেন তার নিন্দা। তিনি বললেন, 'তারপর থেকে য়ুরোপের চিত্ত কঠোরভাবে সংকুচিত হয়ে আসছে—প্রত্যেক দেশই আপন দরজার আগলের সংখ্যা বাড়াতে ব্যাপৃত। পরস্পরের বিরুদ্ধে যে সংশয়, যে নিষেধ প্রবল হয়ে উঠছে তার চেয়ে অসভ্যতার লক্ষণ আমি তো আর কিছু দেখি নে। রাষ্ট্রতন্ত্রে একদিন য়ুরোপকে জনসাধারণের মুক্তিসাধনার তপোভূমি বলেই জানতুম—অকস্মাৎ দেখতে পাই সমস্ত যাচ্ছে বিপর্যস্ত হয়ে।' অতএব আমরা একথা বলতে পারি না যে ইয়োরোপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভালোলাগা ও মন্দলাগা ছিল অবিমিশ্র। তিনি তাঁর এই মনোভাবকে দেশের রাজনৈতিক পরাধীনতার জন্য গোপনও করে রাখতে চান নি। শ্রীযুক্ত বসুর এই উক্তি উদ্ধৃত অযৌক্তিক এবং ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর ভ্রান্ত দৃষ্টির পরিচায়ক।

রবীন্দ্রনাথের রচনা বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম ইয়োরোপীয় সাহিত্য, শ্রীবসুর এই ধরণের উক্তিও আমার কাছে খুবই অস্পষ্ট, অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অহংকৃত মনে

হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বমানবিকতাকে সাহিত্যের নানা আঙ্গিকে বড় ক'রে দেখিয়েছেন তা শুধুমাত্র ইয়োরোপীয় ভাবধারার ফল নয়। সর্বকালের, সকল দেশেরই শাশ্বত আদর্শ মানুষের চিত্তের বন্ধনমুক্তি। এবং ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথ সেই মানবমুক্তিরই উদ্গাতা। ইয়োরোপীয় পাঠক ও সমালোচকরা, অপর পক্ষে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রাচ্যের মর্মবাণীই আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর রচনাকে ইয়োরোপায় রচনার সমধর্মী মনে হয় নি তাঁদের

সম্প্রতি একজন বৃটিশ সমালোচক লিখেছেন, 'ইংলণ্ডে আমাদের নিজেদের সাহিত্যিক ঐতিহ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান নিয়ে অনেক প্রশ্ন ওঠে। এর থেকে অনেক অসঙ্গত আলোচনারও সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কখনও বিচলিত হন নি। তিনি উভয় বিশ্বের মনের মানুষ হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন।' আমাদের সমালোচকরা এখন রবীন্দ্রনাথের রচনাকে ইয়োরোপীয় আখ্যা দিয়ে যে প্রকরণগত উৎকর্ষ দেখাতে চাইছেন, ইয়োরোপের সমালোচকরা কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে দেখতেন ঠিক তার বিপরীত দৃষ্টিতে। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কিংবা অনতি-পূর্ববর্তী ফরাসী কাব্যধারার সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন কিনা, শ্রীবসুর এমন প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। অথচ এমন সিদ্ধান্ত করা বাস্তবিকই বিস্ময়কর যে শার্ল বোদলেয়রের একটি কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতার আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। বোদলেয়রের কবিধর্মের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যবধান দুই বিপরীত মেরুবিন্দুর মতো। ফরাসী সাহিত্যের শক্তিমান শিল্পী জাঁ পল সার্ত্র সম্প্রতি বোদলেয়রের সমগ্র কাব্য সাধনার অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করে বলেছেন, 'মনে হয় বোদলেয়র এক দানবিক খেলায় মগ্ন। তিনি তাঁর চারদিকে মিথ্যা বিদ্রোহ, মিথ্যা যন্ত্রণা, মিথ্যা বিশ্বাস ও মিথ্যা আবেগের তাসের ঘর তৈরী করেছিলেন।' রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক বিদ্রোহে যে গভীর প্রশান্তি ও হৃদয়বাসনার অনন্ত আকুলতা ছিল, বোদলেয়রের অতৃপ্ততা, আসঙ্গলিপ্সা এবং অনির্দেশ্য গতিশীলতার চরিত্র তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

বোদলেয়র 'দি ভয়েজ' কবিতায় বলেছেন ঃ

'But the true travellers are only those who depart for the sake of departing ; with hearts light as balloons, they never

avoid their destiny and always say: Let us go !- without knowing why.' (ইংরেজী গদ্যানুবাদ)।

রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় তিনি কখনই এই অনির্দেশ্য গতিশীলতাকে চরম বলে গ্রহণ করেন নি। তিনি চলেছেন কিন্তু চলার মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্নও করেছেন :

আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী ?
বলো, কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী।

নিরুদ্দেশ যাত্রার সোনার তরণীর নারী একজন বিদেশিনী এবং তিনি চলেছেন পশ্চিমের দিকে, এ থেকে যদি সাহিত্য-পারঙ্গম শ্রীবসু মনে করেন যে পাশ্চাত্ত্যের ভাব-সিন্ধুতেই রবীন্দ্রনাথ পাড়ি জমিয়েছিলেন, তাহ'লে বলতে হয়, এটা কাব্যের ভৌগোলিক বিশ্লেষণ ছাড়া আর কিছু নয়। পশ্চিমের জানালা রবীন্দ্রনাথ খুলে রেখেছিলেন এ কথা মানি, কিন্তু পশ্চিমেই তাঁর 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', এই বিদেশিনীই পশ্চিমের সাহিত্যের প্রতীক এবং পশ্চিমের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের প্রচ্ছন্ন ঋণ স্বীকার, এ-কথা পাশ্চাত্ত্যের অলজ্জিত অনুচর ব্যতীত আর কারো পক্ষে, শততম রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবের মধ্যে বিদেশে প্রচার করা সম্ভব ছিল না।

শ্রীযুক্ত বসুর যে প্রবন্ধটি নিয়ে এই আলোচনার সূত্রপাত, তিনি এটি ইংরেজী ভাষায়, প্যারিসের একটি দ্বিভাষিক সাময়িক পত্র 'টু সিটিজ'-এ প্রকাশ করেন। এ নিয়ে ইতিমধ্যে বাংলা দেশে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। যদিও প্রবন্ধটি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, লেখকের শ্রদ্ধা কিংবা পরিশ্রম, কোনোটারই স্বাক্ষর নেই, তবুও সৎ বাঙালী পাঠকরা এতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং সে ক্ষোভ, বুদ্ধদেববাবু স্বীকার না করলেও, যথার্থ। যুগান্তর পত্রিকায় 'মল্লিনাথ' যখন প্রথম এই প্রবন্ধের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন, শ্রীযুক্ত বসু সে সময়ে মার্কিনীদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় ছিলেন। এই আলোচনায় বাংলাদেশের অনেক সৎ ও বিবেকবান সাহিত্যসাধক যোগ দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য এখানে আর পুনরুক্তি করছি না। শ্রীযুক্ত বসু বিদেশ সফর শেষ করে এসে বাংলাদেশের বাজার-চলতি সাপ্তাহিক পত্রে এই বিতর্কের একটি

জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য উক্ত পত্রিকার সম্পাদক এ বিষয়ে ভিন্ন মতাবলম্বীদের বক্তব্য প্রকাশে অনিচ্ছাও জানিয়ে দিয়েছেন। ফলে বুদ্ধদেববাবুর আর এক দফা অসতর্ক ও অযৌক্তিক মন্তব্যের প্রতিবাদ সেই পত্রিকায় স্থান পাওয়ার সুযোগ রইল না।

বুদ্ধদেববাবু উক্ত জবাবী প্রবন্ধেও বাংলাদেশের পাঠকদের ইংরেজী এবং বাংলা ভাষার জ্ঞান সম্পর্কেও কটাক্ষ করেছেন। বুদ্ধদেববাবুর ইংরেজী অধিকাংশ বাঙ্গালি পাঠকের কাছে 'দুর্গম' হ'বে বলে তিনি মনে করেছেন। অবশ্য অধিকাংশ বাঙ্গালি পাঠকই খাস ইংরেজদের রচনা ইংরেজীতে পড়ে এবং আয়ত্ত করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছেন। যদিচ ইদানীংকলে শুনেছি সহরতলীর বিশ্ববিদ্যালয়ে একমাত্র মাতৃভাষার জ্ঞান সম্বল করেই তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। আমরা সেই সৌভাগ্যবানদের ঈর্ষা করি না। আমরা শুধুমাত্র মাতৃভাষাতেই সন্তুষ্ট রয়েছি। তবে বুদ্ধদেববাবুর অহংকার শুধুমাত্র তাঁর ইংরেজীজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি এমন কথাও বলেছেন, 'আমি যে বাংলা লিখি তা অত্যন্ত বেশি সরল না হলেও শিক্ষিত বাঙালি পাঠকের বোধগম্য হবে ব'লে আশা করা যায়।' তাঁর আশা (ধন্য আশা কুহকিনী !) হয়তো অপূর্ণ থাকেনি। তাঁর ইংরেজী-ভাঙা বাংলা গদ্যের পাঠকসংখ্যা নগণ্য হলেও, একেবারে নিষ্পাঠক তো তিনি ন'ন।

তাঁর ইংরেজী প্রবন্ধেই পাঠকরা আপত্তি জানিয়েছেন, বাংলাভাষায় তিনি যে প্রবন্ধ লিখেছেন তার সঙ্গে ইংরেজী প্রবন্ধের ভাবসাদৃশ্য থাকলেও, ইংরেজী ভাষা ব্যবহার, সম্ভবতঃ বিদেশী ভাষা বলেই, তিনি অসতর্ক অশালীনতার পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নতুন চিন্তার অধিকার নিশ্চয়ই প্রত্যেকের আছে, বুদ্ধদেববাবুরও। কিন্তু সাড়ে তিন পাতার প্রবন্ধে, আপ্তবাক্যের আড়ালে, এমনভাবে রবীন্দ্র সাহিত্যের বিচার একটা বড়ো রকমের দুর্ঘটনা। বুদ্ধদেব-বাবুর ইংরেজী প্রবন্ধটি পাঠ না করলে, আমার মাতৃভূমির লেখকদের সম্পর্কে এমন শোকাবহ অভিজ্ঞতা হতো না। নতুবা কী করে একজন পঞ্চাশের বয়ঃসীমা পেরোনো কবির পক্ষে এমন উক্তি, তাও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে করা সম্ভব ঃ

I am by no means suggesting that he knew the European Masters more intensively than he said was the case.···Shakespeare digested the whole of the Western

antiquities and Renaissance merely through hearsay. Why should not that have happened with Tagore !

[কী আশ্চর্য যুক্তি ? সেক্সপীয়র জনরব শুনে পাশ্চাত্য পুরাকালকে আত্মসাৎ করেছিলেন। অতএব রবীন্দ্রনাথ, নিজে না পড়লেও, বুদ্ধদেববাবুদের মতোই, হয়তো জনশ্রুতির কাঁধে ভর করেই পশ্চিমী সাহিত্য ক্ষেত্রে বিচরণ করতে গিয়েছিলেন। শ্রীযুত বসু বলছেন :

We can never be sure that he did not know those poets of France who in his youth were recreating European poetry. Scantily perhaps, scrapily parhaps, perhaps through quotations or reviews in magazines—.

[এই উদ্ধৃত উক্তির বিচারের ভার বাংলাদেশের পাঠকরাই গ্রহণ করছেন। এ নিয়ে আর বেশি আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে এই ধরণের লেখকদের মনে রাখা উচিত, শুধু ভঙ্গি দিয়ে মন ভোলাবার দিন আর নেই। উত্তরতিরিশে যা মানাত, উত্তরপঞ্চাশে তা আত্মগ্লানির নিন্দাপঙ্কেই সর্ববিদ্যাপারদর্শী লেখককে নিমজ্জিত করবে।]

ইংরাজী একাঙ্ক

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

একাঙ্কিকাকে একটি বিশেষ অর্থে ইংরেজী মঞ্চের সুয়োরাণী বলা যেতে পারে। রাজা যখন দুয়োরাণী পূর্ণাঙ্গ নাটককে নিয়ে মগ্ন তখন বেচারী সুয়োরাণী কুঁড়েঘরে লোকচক্ষুর আড়ালে দুর্দশার ভারে বিব্রত। কিন্তু রূপকথার প্রথম অংশ যদি সত্য হয়ে থাকে তবে পরিশেষেও তা মিথ্যে নয়। অনাদর ও অবহেলার ছায়া অতিক্রম করে অবশেষে ইংরেজী মঞ্চের রাজা Noel Coward স্বয়ং এগিয়ে এসে সুয়োরাণীকে তার প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। Noel Coward-এর Tonight at 8-30 (একাধিক একাঙ্কিকার একত্রিত পরিবেশন) পেশাদার মঞ্চেও রাতের পর রাত দর্শক দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছে। যাই হোক একথা ভাবা অবশ্য ঠিক হবে না যে ব্রিটিশ মঞ্চ ঊর্ধ্ববাহু হয়ে একাঙ্কিকার অভ্যুত্থানের অপেক্ষা করছে ; সেই সমাদর এখনও অজ্ঞাত।

ঊনবিংশ শতকে ইংল্যাণ্ডে প্রচুর একাঙ্কিকা লেখা হয়েছে। Curtain raiser হিসাবে একাঙ্কিকা বহুল প্রচলিত ছিল। এছাড়া নামজাদা অভিনেতা তাদের কলাকৌশলের গবেষণাগার রূপে ব্যবহার করত একাঙ্কিকাকে। আবার পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখার আগে অনেক নাট্যকারই তাঁদের হাত পাকাতেন একাঙ্কিকা লিখে। এই ধরণের নানান বিচিত্র ইচ্ছের ফলে একাঙ্কিকার সংখ্যা বাড়ছিল প্রচুর। কিন্তু যেহেতু কোন সময়েই সাহিত্যিক প্রেরণা একাঙ্কিকা সৃষ্টির উৎস ছিল না সেই কারণে ঊনবিংশ শতকের অধিকাংশ একাঙ্কিকাই আজ সাহিত্য-পদবাচ্য নয়।

বিংশ শতকে ইংল্যাণ্ডে বহু অ্যামেচার নাট্যসংস্থা জন্ম নিল। প্রতিষ্ঠিত অনেক নাট্যকারও এগিয়ে এলেন তাদের সৃজনী শক্তিকে এদিকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে। ফলে ইতিমধ্যেই ইংল্যাণ্ডে একাঙ্কিকা সাহিত্য যথেষ্ট প্রশ্রয় পেয়েছে। অবশ্য Noel Coward ছাড়া আর কেউই পেশাদার রঙ্গমঞ্চে একাঙ্কিকাকে স্থান দিতে পারেননি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি সত্য বিস্ময়কর।

ফ্রান্সে ইতিমধ্যেও পেশাদার মঞ্চ একাঙ্কিকার কদর বুঝতে পেরেছে। প্রায়শই দেখা যায় যে Jules Romain প্রমুখ নাট্যকারদের পূর্ণাঙ্গ নাটকের সঙ্গে একই দিনে একাঙ্কিকাও অভিনীত হচ্ছে পেশাদার মঞ্চে। ফ্রান্সে এইরকম ঘটনা ঘটলে ইংল্যাণ্ডে কেন তা ঘটবে না সে প্রশ্ন সত্যিই বিস্ময়কর।

বহুবিধ কারণে একাঙ্কিকার আবেদন বহুমুখী। একাঙ্কিকার পক্ষেই সম্ভব পাঁচ মিনিটের হাস্যকৌতুক উপস্থাপিত করা আবার একাঙ্কিকাতেই সম্ভব। Miss Julie-র মত ৮০ মিনিটের জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিষয়কেও নাট্যরূপ দেওয়া এই ধরনের নানাবিধ সম্ভাবনার জন্যই একাঙ্কিকার আবেদনের সীমানা পূর্ণাঙ্গ নাটকের তুলনায় বহুতর দিকে বিস্তৃত।

ষ্ট্রেট প্লে

এখন প্রশ্ন হচ্ছে একাঙ্কিকা লেখার টেকনিক কি? চরিত্রায়ণের রীতি পূর্ণাঙ্গ নাটকের রীতির সঙ্গে মূলতঃ এক! সংলাপ রচনার ক্ষেত্রেও পার্থক্য নেই বললেও চলে। তাহলে পার্থক্য কোথায়?

পার্থক্য নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গীতে। একাঙ্কিকা নাটিকা আর যাই হোক পূর্ণাঙ্গ নাটকের সঙ্কোচন নয়। দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যই এই স্বাতন্ত্র্যের কারণ। পূর্ণাঙ্গ নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা দূরপাল্লার জাহাজ-যাত্রীর মত। সে তার গন্তব্য জানে, কিন্তু পথে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা শুরুতেই তার জানা নেই। অপর দিকে যিনি একাংকিকা লিখবেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ট্রেনের ডেইলি প্যাসেঞ্জারের মত। গন্তব্যও তার জানা এবং কোন ষ্টেশনের পর কোন ষ্টেশন কোথায় গাড়ী কতক্ষণ থামবে এই সমস্ত তথ্যই তার মুখস্থ। অর্থাৎ একাংকিকা লেখার সময় নাট্যকারের মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠা প্রয়োজন যে ঠিক কোন বাঁধা পথে তাঁকে এগোতে হবে। এই বাঁধা রাস্তার আশে-পাশে মাঠ-নালা, খাল-বিল, কোন কিছুই তার দৃষ্টিকে অন্যমুখী করতে পারবে না।

একাংকিকা লেখার প্রথম প্রয়োজন আবহাওয়া সৃষ্টি করার জন্য সময় স্বল্পতা। একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকে আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য ১০, ১৫, এমন কি ২০ মিনিট সময়ও নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আধঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের একাঙ্কিকার ক্ষেত্রে দু'তিন মিনিটের বেশী নেওয়া অসম্ভব। Synge-এর

Riders to the Sea-তে আবহাওয়া সৃষ্টির কাজে সময় সংকোচন লক্ষণীয়। পর্দা ওঠার পর সেকেণ্ড বিশেক স্টেজ খালি থাকছে। ইতিমধ্যে দর্শকের নজরে পড়ছে মাছধরার জাল, থলি, ছিপ ইত্যাদি। তারপরেই—ক্যাথলিন আর নোরার কথোপকথন ঃ—

নোরা ঃ মা কি করছে ?

ক্যাথলিন ঃ হয়ত ঘুমোচ্ছে। অবিশ্যি ঘুমোনো যদি স্বাভাবিক হয়। ভগবান ওকে আশীর্ব্বাদ করুন! বেচারী!

—শুধুমাত্র আবহাওয়াই সৃষ্টি করছে না, নাটিকাটির tragic বিষয়বস্তুর জন্যও আমাদের মনকে প্রস্তুত করছে এবং এই সবের জন্য সময় লাগছে বড়জোর মিনিট দেড়েক। নাটিকাটির বিষয়বস্তু Maurya-র পাঁচ ছেলের একে একে সমুদ্রের অতলে সমাধি! কিন্তু অ্যাকশন নিম্নগ্রাম থেকে ধীরে ধীরে ক্ল্যাইম্যাকস্-এ পৌছচ্ছে না। পুরো নাটিকাটিই দাঁড়িয়ে আছে ক্লাইম্যাকস্-এর উপর। সমস্ত ঘটনাটিই যেন retrospective projection। একাঙ্কিকাতে কাহিনী বৈচিত্র্য থাকতে পারে কিন্তু ট্রিটমেণ্টের জটিলতা কোনমতেই কাম্য নয়। পাঁচটি সন্তানের মৃত্যু এই নাটিকার বিষয়বস্তু হতে পারে। কিন্তু একমাত্র Bortic-এর মৃত্যুই উপস্থাপিত করা হয়েছে। অন্য দুর্ঘটনার কথা প্রসঙ্গক্রমে আমাদের জানানো হচ্ছে। বহু ঘটনাকে কেন্দ্র করে একাঙ্কিকা গড়ে উঠতে পারে কিন্তু প্রত্যেকটি ঘটনাকে রূপায়িত করা যে শুধুমাত্র নিষ্প্রয়োজন তাই নয় বাহুল্যও বটে।

ষ্ট্রেট প্লে-র ক্ষেত্রে Synge-এর Riders to the Sea অতুলনীয় অবদান। এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে Coward, Milne, Houghton, Lady Gregory এবং আরও অনেকেই একাঙ্কিকার এই বিশেষ দিকটিকে যথেষ্ট আকর্ষণীয় করে তুলেছেন।

ফ্যাণ্টাসী

আর একটি দিকে একাঙ্কিকা বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এই আঙ্গিককে আমরা ফ্যাণ্টাসী আখ্যা দিতে পারি। এখানে নাট্যকারের বিশেষ সুবিধে এই যে তাকে বাস্তবসচেতন থাকতে হচ্ছে না। কিন্তু অন্যদিকে fantastic

treatment-এর ব্যাপারে তাকে সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে কল্পলোকের জগৎকে বিশ্বাস্য করে তোলার গুরুভার তার উপর ন্যস্ত। কল্পনায় রাঙানো একাঙ্কিকার জগৎকে বিস্তৃত করার প্রধান কৃতিত্ব Lord Dunsanny এবং Sladen-Smith-এর।

পোয়েটিক প্লে

কাব্যিক একাঙ্কিকায় গদ্যের বদলে পদ্যকে মাধ্যম বেছে নেওয়ার দায়িত্ব নাট্যকার শুরু থেকেই বাস্তবের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। এই স্বাধীনতার ফলে বস্তুজগতের সাধারণ প্রতিবিম্বনের দায়িত্ব তাঁর নেই। স্বভাবতই গভীরতর ভাব প্রকাশের সুযোগ অন্যান্যের চেয়ে তাঁর অনেক বেশী। আবার ভাব জগৎকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলার ক্ষমতাও তাঁর পক্ষে অপরিহার্য। কাব্যিক একাঙ্কিকাকে জনপ্রিয় করার মূল উদ্যোক্তা Drinkwater, Masefield W. B. Yeats এবং আরও অনেকে।

Brevity is the soul of wit—একাঙ্কিকার আয়তন-স্বল্পতা এই নীতি অনুসরণ করে নিজের ঐশ্বর্যকে বাড়িয়েছে। প্রায় যে কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে কৌতুক-একাঙ্কিকা লেখা যেতে পারে। কালা কান থেকে শুরু করে সমাজ নেতার বিকৃতি—যে কোন বিষয়ই কৌতুকের রঙে ঝলমল করে উঠতে পারে। আবার নিজের জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে অভিনেতার পক্ষে হাস্যকর হওয়া অপেক্ষাকৃতভাবে সহজ। এবং কৌতুক-একাঙ্কিকার বিশেষ জনপ্রিয়তার কারণও এই। এই বিশেষ জনপ্রিয়তার ফলে কৌতুকের ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে নিজেদের কৌতুককর করে তুলেছেন বহু অক্ষম। কিন্তু অক্ষমতার ঢেউ ছাপিয়ে উঠেছে A. Theov, J. Romain, N. Coward প্রমুখ মহান শিল্পীর অবদানের ঐশ্বর্য।

হরর প্লে

একাঙ্কিকার স্বল্প আয়তন যেমন কৌতুককে বিশেষ সমৃদ্ধ করেছে, ভীতি, রহস্য ও অতিপ্রাকৃত রসের ক্ষেত্রেও তাই। W. W Jacobs-এর Monkey's Paw নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে এই বিশেষ দিকটিতেও একাঙ্কিকার সম্ভাবনা থাকে।

বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক—দু'দিকেই একাঙ্কিকার সম্ভাবনার অসীম। স্বভাবতই পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনও বিশেষ অনুভূত হয় নি। তবুও পূর্ণাঙ্গ নাটকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কেউ কেউ এগিয়ে এসেছেন নতুন পরীক্ষার চেষ্টা নিয়ে। Clifford Bax-এর Prelude and Fugue নাটিকাটি এই দিক দিয়ে বিশেষ উল্লেখ্য। উচ্চস্বরে নিজেদের মনের গভীরতম চিন্তাকে আউড়ে চলেছে দু'টি চরিত্র পরস্পরের অজান্তে এবং সম্ভবত নিজেদেরও অজান্তে। এই টেকনিকই Eugine O'neill এর Strange Interlude-এও গৃহীত। মাপা ছকে বাঁধা রাস্তায় হাঁপিয়ে উঠে। W. B. Yeats এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। অভিজাত জাপানের 'নো-প্লে টেকনিক'কে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে আমদানী করে নতুন ছাঁচে ঢেলেছেন Yeats.

একথা অনস্বীকার্য যে একাঙ্কিকার স্থান বর্তমান নাট্য জগতে তার পূর্ণাঙ্গ অগ্রজার নীচে। কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি না করেও বলা যেতে পারে যে শক্তিশালী নাট্যকারদের মনোযোগ থাকলে এবং ক্রমবর্ধমান অ্যামেচার নাট্য আন্দোলন বর্তমান গতিতে এগিয়ে চললে অদূর ভবিষ্যতেই এমন দিন আসবে যখন একাঙ্কিকার আসন পূর্ণাঙ্গ নাটকের চেয়ে নীচুতে থাকবে না।

কালীঘাটের পট : তৎকালীন সমাজ ও আধুনিক মূল্যায়ন

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতির জগতে যে নতুন চিন্তার আলোড়ন এসেছিল, তার স্নায়ুকেন্দ্র ছিল কলকাতা। আর এর আওতাতেই বাংলা সাহিত্য নবকলেবর পরিগ্রহ করে ব্যাপক বিস্তৃতির পথে যাত্রা শুরু করে। এ কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই যে সে যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার-আন্দোলন এবং সাহিত্য-রচনা—উভয়ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তদানীন্তন মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, ইংরেজী শিক্ষার গুণে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির ভাবধারা যাঁদের চিন্তার শিরা-উপশিরায় গিয়ে প্রবেশ করেছিল, ঐতিহ্যকে যাঁরা যুক্তির মানদণ্ডে বসিয়ে তার নতুন ব্যাখ্যায় ব্রতী হয়েছিলেন। নিত্য-নতুন-চিন্তাপুষ্ট এই সব আন্দোলনের ঝড়ে কলকাতার হাওয়া-বাতাস যখন কম্পিত, তখন এই কলকাতারই বুকের উপর একেবারে স্বতন্ত্র আর এক জাতীয় মানুষ এক ভিন্ন সংস্কৃতির চর্চায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন। যে সব কবি গান ও পাঁচালী শুনতে সে যুগের কলকাতার লোক ভেঙে পড়ত, তাতে সমসাময়িক সামাজিক আন্দোলনের বা কোম্পানির শাসনে দুরবস্থার উল্লেখ থাকলেও কবিওয়ালারা মূলতঃ বিচ্ছিন্ন ছিলেন তদানীন্তন চিন্তানায়কদের জগত থেকে। এঁদের শিল্পকর্মের পরিণতি বাংলাদেশের গ্রামের প্রাচীন কবির লড়াই, যাত্রাগান ইত্যাদির ধারা বেয়ে। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার সহুরে হাওয়ায় কবিগানের গ্রাম্য-ভোল কিছুটা পাল্‌টে গেছল। যাই হোক, গত শতাব্দীর বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীদের সাহিত্যিক অবদানের সামাজিক মূল্য বিচারের বাগ্‌বিতণ্ডায়, আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি সে যুগের এই লোকশিল্পের কথা—যার আদিপর্ব গ্রামের সঙ্গে জড়িত হ'লেও, সহুরে জীবনযাত্রার পরিবর্তনগুলিতে সাড়া দিয়ে যে একটা নতুন ধরণের শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছিল। এই সহরকেন্দ্রিক নতুন লোকশিল্পেরই সমগোত্রীয় তদানীন্তন কালীঘাটের পট। কবিগান বা পাঁচালীর মত, এরও উৎস ছিল প্রাচীন গ্রাম্য পট-আকার ঐতিহ্যে। বুদ্ধি-

জীবীদের চিন্তাজগতের থেকে দূরে বসেও, কালীঘাটের পটুয়ারা তৎকালীন কলকাতার সামাজিক জীবনকে তাঁদের পটে অক্ষয় করে রেখে গেছেন। ফলে ফলে ঐতিহ্যাশ্রয়ী প্রাচীন-পট ও নব্য কলকাতার লোকশিল্পীর আঁকা পট, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক—সবদিক থেকেই হ'ল আলাদা। কবিগান ও পাঁচালীর নিরক্ষর অশিক্ষিত শ্রোতারাই কালীঘাটের পটের একমাত্র খরিদ্দার ছিল। কবিওয়ালারা এদিক থেকে সৌভাগ্যবান ছিলেন, তাঁদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সে যুগের অর্থশালী বাবু সম্প্রদায়, যার ফলে অবশ্য শিল্পীদের ভরণ-পোষণের সমস্যা মিটলেও তাদের শিল্পকর্ম 'বাবু' মুখাপেক্ষী হতে গিয়ে একধরণের 'ডেকাডেন্ট' সংস্কৃতির কবলে গিয়ে পড়েছিল। অপরপক্ষে কালীঘাটের পটে অনেক বেশী স্বাধীনচেতা হয়েও, দরিদ্র জনসাধারণকেই একমাত্র পৃষ্ঠপোষক পেয়ে, দুর্নাম ওলীওগ্রাফ-এর সঙ্গে লড়াই করতে করতে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হ'ল। ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার লোকশিল্পের শিল্পীক সম্ভাবনা তাই অচিরেই বিলুপ্ত হয়েছিল!

কালীঘাটের বর্তমান মন্দিরটি স্থাপিত হয় ১৮০৯ সালে, প্রাচীন কলকাতার জমিদারবংশ সাবর্ণ চৌধুরীদের উত্তরাধিকারী সন্তোষ রায়ের অর্থানুকুল্যে। এর কিছুকাল পরে আশেপাশে হাটবাজারের প্রচলন হয়। তীর্থযাত্রীদের ক্রমবর্ধমান ভীড়ের উৎসাহেই দোকান পাটের সূত্রপাত। অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পটুয়ারা এসেও তাদের বসতি গড়ে। কি ক'রে তীর্থযাত্রীদের জন্য স্বল্প-মূল্যে দেব-দেবীদের ও পরে সমসাময়িক ঘটনার ছবি এঁকে বিক্রী করা হ'ত, কি ভাবে বৌবাজার আর্ট-স্টুডিওতে প্রস্তুত ছবি ও জর্মান ওলীওগ্রাফের প্রকোপে প'ড়ে এ শতাব্দীর শুরুতেই তাদের পট আঁকার পরিসমাপ্তি ঘটল—এ ইতিহাস ইতিপূর্বে বহু প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হ'য়েছে। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। কালীঘাটের শিল্পীদের সমাজসচেতনতা তঁদের ছবির তুলির টানে মূর্ত। এ সমাজসচেতনতা তাঁদের পূর্বপুরুষ পটুয়াদের কাছ থেকে অর্জিত জনসংযোগের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। গ্রাম্য পটে শ্রীকৃষ্ণকে আঁকা হোত সাধারণ গ্রামবাসীর কল্পনার সঙ্গে তার চেনা পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে। সহরে এসে, কাগজের বুকে, স্বল্প রং-কালির ছোঁয়ায়, পট আরও ঘনিষ্ঠ হ'য়ে স'রে এলো জনসাধারণের কাছে। সহুরে জীবনযাত্রার দৈনিক ঘটনা, পরিচিত মানুষ নতুন নায়কের স্থান দখল করল। বিনা চেষ্টায়, একেবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তদানীন্তক সমাজ যে-ভাবে কালীঘাটের

পটে উঠে এসেছিল, তার নেপথ্যে শিল্পীদের তীক্ষ্ণ সমাজবোধের পরিচয় মেলে। মনে রাখা দরকার যে কালীঘাটের পটে নিছক বিবরণীর বৈচিত্র্যহীনতা নেই; অঙ্কনশৈলীতে একটা বিশেষ মেজাজ, একটা দৃষ্টিভঙ্গী ফুটে উঠছে। তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সুরটা বেশ স্পষ্ট। শুধু 'বাবু' সম্প্রদায় নয়, স্বসমাজভুক্ত ভণ্ডরাও উপহাসের হাত থেকে রেহাই পাই নি! এই সব কারণেই কালীঘাটের পটুয়াদের সমাজচেতনতার একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তদানীন্তন সমাজসংস্কারক বুদ্ধিজীবীদের পৃষ্ঠপোষকতা যদি তাঁরা লাভ করতেন তাহলে হয়তো বাংলাদেশে একটা নতুন শিল্পকলার সূত্রপাত হ'তে পারত। কিন্তু এ কষ্টকল্পনা মাত্র। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর সহরকেন্দ্রিক বাঙ্গালী সাহিত্যিক বা সংস্কৃতিবিদ্‌দের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির যোগাযোগ ছিল তা বললেই হয়, দুটি স্বতন্ত্র ধারার মধ্যে সেতুকল্প ছিলেন একমাত্র গুপ্ত-কবি। এবং পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথের আনুকূল্যেই লোকসংস্কৃতি ও বুদ্ধি-প্রধান সাহিত্যিক সমাজের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং সে যুগে পাশ্চাত্ত্যের বাস্তবানুকরণধর্মী তৈলচিত্র দর্শনে অভ্যস্ত শিক্ষিত শিল্প-রসজ্ঞদের কাছ থেকে কালীঘাটের বাস্তব-বিকৃত ছন্দ-প্রধান পটের যথোচিত গুণাবধারণ আশা করাটা অন্যায়। তাঁরা পাশ্চাত্ত্য তৈলচিত্রের গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাস্কর্যের বা দরবারি শিল্পের মূল্যায়ণে উৎসাহিত হ'য়েছিলেও ঠিকই, কিন্তু গ্রাম্য লোকসংস্কৃতির প্রতি একটা সাংস্কৃতিক কুসংস্কারের ভাব থেকে গিয়েছিল। এটা দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও, এই ধরণের মনোভাবটা অবশ্যম্ভাবী ছিল; সে যুগের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের হোতাদের শ্রেণীচরিত্রের সঙ্গে এটা জড়িত। তদানীন্তন একজন শিল্প-সমালোচকের বক্তব্যের মধ্যেই লোকশিল্পের প্রতি এই উন্নাসিকতাটা ধরা পড়ে।

"...কালিদাস প্রভৃতির নাটকের তুলনায় এখনকার যাত্রা নাটক যেরূপ, ঐ সময়ের চিত্র-রচনার তুলনায় বর্তমান প্রচলিত পটচিত্রও সেইরূপ দিব্যশ্রী প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব এদেশে শকুন্তলা, মালতীমাধব প্রভৃতি নাটক সকল সমূলে উন্মূলিত হইয়া তাহার স্থানে যাত্রা প্রভৃতি সামান্য গীতনাটক অবলীলাক্রমে রাজত্ব করিয়া আসিতেছে, সেদেশের পুরাকালের কবিত্বসূচক চিত্রলেখার স্থানে যে এক্ষণকার নির্জীব ও কিম্ভূত চিত্ররচনা সকল পদার্পণ করিতে সাহসী হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?"—(সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্যজাতির শিল্প চাতুরি—শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমানী।)

আজকে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে দেখলে, কালীঘাটের পটের সমসাময়িক জনপ্রিয়তার কারণ ও আধুনিক শিল্পের ক্ষেত্রে তার আলোচনার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে দীনবন্ধু মিত্রের বিদ্রূপাত্মক নাটক, কালীপ্রসন্ন সিংহের সামাজিক নক্সা এবং ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গাত্মক কবিতার পরিপূরক কালীঘাটের পট। "হুতোম প্যাঁচার নক্সা"য় যে হঠাৎ অবতার, বারবনিতা, চড়ক-পার্বনের সন্ন্যাসীরা ভীড় করে রয়েছে, তাদেরই দেখতে পাই কালীঘাটের পটে। একটি বহু-ব্যবহৃত motif হ'চ্ছে; কলকাতার "বাবু"—ঊনবিংশ শতাব্দীর সহুরে জীবনের একটি বিশিষ্ট অবদান। মাথায় তরঙ্গায়িত বাবরি চুল, পরিধানে ফিনফিনে কালাপেড়ে ধুতি, চুনট করা উড়ানী ও পায়ে পুরু বগলস সমন্বিত কালো জুতো। কখনও বাবু বীণা বাজাচ্ছেন, কখনও বাবু বাড়ির বাইরে যাবেন স্ফূর্তি করতে, নিরাভরণা ক্রন্দনরতা স্ত্রী পায়ের কাছে লুটিয়ে, আবার কখনও বাবু তাঁর প্রেয়সীর সঙ্গে মদ্যপান রত। দীনবন্ধুর "সধবার একাদশী"কে যেন চিত্রিত করা হয়েছে। পটে অঙ্কিত নায়িকারাও সে যুগের পরিচিত মানুষ। বীণা-বাদিকার ফুল হাতে প্রসাধনরতা মহিলাদের ছবিরই বোধহয় সবচেয়ে দাবি ছিল। আসলে সমকালীন সম্পন্ন মধ্যবিত্ত সমাজের দুর্নীতি ও ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে পটুয়াদের বিদ্রূপ তুলির টানে প্রকাশ পেয়েছিল। কেবল অল্প-ইংরেজী-শিক্ষিত সৌখীন বাবু ও তাদের মোসাহেবেরাই পটুয়াদের উপহাসাস্পদ ছিল না, নিজেদের সমাজভুক্ত বৈষ্ণব সাধুরাও এ উপহাসের শিকার হয়েছিল। স্ফীতোদর হাতে-জপের-মালা মুণ্ডিত-মস্তক, আবার তার উপর একটি কাল-পাখীর অবস্থিতি—সব মিলিয়ে ভণ্ডামির আবহাওয়াটা সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। অবশ্য-বিদ্রূপটা আরও সূক্ষ্মভাবে চাবুক মারে আর একটি ছবিতে—একটি বিড়াল মুখে মাছ নিয়ে চেয়ে রয়েছে; তার কপালে চন্দনের তিলক, গলায় তুলসীর মালা। মাইকেলের "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ"র মেজাজের সঙ্গে মিল পাওয়াটা দুরূহ নয়। বা আরও কাছাকাছি হয়তো সমসাময়িক কবিওয়ালা এণ্টনি ফিরিঙ্গির গানের কলিটি ঃ

"তোমরা পয়সা পেলে, হেসে খেলে,
সাদায় কর ভালো।
তোমাদের গোঁসাই চেয়ে আমি বলি
কসাই তবু ফালো ॥

এ ছাড়াও সমসাময়িক ঘটনা যা মানুষের মনে রেখাপাত করত, পথে ঘাটে যা নিয়ে আলোচনা হ'ত, তারও ছবি পাই কালীঘাটের পটে। শ্যামাকান্তর সঙ্গে বাঘের লড়াই নিয়ে একাধিক ছবি আঁকা হয়েছে। এই ধরনের তীক্ষ্ণ সমাজ-সচেতনতা ও বিদ্রূপের বলিষ্ঠ কায়দা, কালীঘাটের পটকে তদানীন্তন জনসাধারণের কাছে এত আদরণীয় ক'রে তুলেছিল ; সস্তায় দেব-দেবীর ছবি পাওয়ার সুবিধা ছাড়াও পরিচিত দৃশ্য জগতের সরস চিত্রন উপভোগ করার একটা স্বাভাবিক আনন্দ ছিল। একদিকে এই ব্যাপক জন-সংযোগ আর অন্যদিকে মধ্যবিত্ত সমাজের লাম্পট্য-ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে ধিক্কার—এই দৃষ্টি বৈশিষ্ট্যের জোরে কালীঘাটের পট-শিল্প তৎকালীন মননশীল সাহিত্যিক-সমাজের উপেক্ষিত কিন্তু সত্যপরায়ণ সম্পূরক ব'লে দাবি ক'রতে পারে। পদস্খলন মাঝে মাঝে ঘটেছে, সেটা শিক্ষার অভাব-প্রসূত, যুক্তি-তর্ক দিয়ে নতুনকে যাচাই ক'রে নেবার অক্ষমতাজনিত। তাই দেখতে পাওয়া যায়, ঝোঁক্‌টা কখনও কখনও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিরুদ্ধে গিয়ে পড়েছে। ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজের সব কিছুই উপহাসের যোগ্য ব'লে বিবেচিত হয়েছে অমেক সময়। শিক্ষিত সমাজের বিচক্ষণ পরিচালনা যদি তাঁরা পেতেন, তাহলে হয়তো দৃষ্টিভঙ্গিটা অনেক স্বচ্ছ হ'য়ে উঠত।

কোন এক আধুনিক সমালোচক আক্ষেপ করেছেন, 'কালীঘাটের পট হোগার্থ বা দ্যমিয়ের ছবির মত সূক্ষ্ম আঘাতে রূপায়িত হয় নি। মৃন্ময়, প্রাণহীন পুতুলের সংসারের আখ্যান হ'য়ে গেল। আসলে বিদ্রূপ বা শ্লেষের প্রকাশভঙ্গি যে সব দেশে সব যুগেই একই ধরণের হবে, এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। কালীঘাটের পটের চরিত্ররা যে স্থূলভাবে অঙ্কিত হয়েছে, গোলগাল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিন্যাসে, তার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে প্রাচীন গ্রাম্য পটে আর পটুয়া চিত্রকরদের ছবি আঁকার উপকরণের পুঁজির মধ্যে। প্রথমত মনে রাখতে হবে, কালীঘাটের পটের আঁকবার ধাঁচ বহুলাংশে পুরোন পটাশ্রয়ী। শ্রীকৃষ্ণের জীবনীর বিবরণ-সংবলিত জড়ান পটে ফিগারগুলি সবসময়ই গোলাকৃতি ; স্থূল হাত-পা। রেখা টেনে, একটা রংএ 'আউট লাইন'টিকে ভরিয়ে দেওয়া হোত ! ফলে ছবিগুলি হোত 'ফ্ল্যাট', কোন ঘনত্ব থাকত না। কলকাতার পটুয়ারা যখন কাগজে আঁকতে শুরু করলেন এই প্রচলিত রীতিটি কিন্তুটা রূপান্তরিত হ'ল। ফিগারের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সীমারেখায় ছায়া বা 'শেডিং' দেওয়া হ'তে লাগল ; ফলে আষে যে ফিগারশলোকে চ্যাপটা মনে হ'ত, এবার তাদের দেহের ঘনত্ব ও

মণ্ডলাকৃতির আভাস পাওয়া গেল, ইংরেজীতে যাকে বলা হ'য়ে থাকে volume। সুতরাং জড়ানপটের পুরোন স্থূল চরিত্রগুলি এবার আরও স্ফীত হ'য়ে কাগজ থেকে বেরিয়ে রইল! 'শেডিং' দিয়ে ঘনত্ব দেখানোর এট রীতিতে কতখানি সমসাময়িক ইংরেজ শিল্পীদের প্রভাব পড়েছে, কতখানি পটুয়াদের প্রতিমা গড়ার প্রভাব রয়েছে, সে চুলচেরা আলোচনার মধ্যে না গিয়ে, একটা কথা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে। কালীঘাটের পটের ফিগারে স্ফীত ভাবটা, পটুয়াদের বিদ্রূপের উদ্দেশ্যটাকে আরও সফল ক'রেছে। সামাজিক অবক্ষয়ের একমাত্র প্রতিনিধি হতাশা বা কৃশতা নয়। ধন-গৌরবের স্ফীতাবস্থা, অতি-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্রয়, আমাদের নির্লজ্জ আস্ফালন—এ সবই 'ডেকাডেনসের' অব্যর্থ চিহ্ন। উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় একদিকে যেমন নতুন চিন্তার জোয়ারে একটা প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী সমাজ সৃষ্টি হ'চ্ছিল, অন্যদিকে পুরোন সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী চিন্তার অবশিষ্টাংশ ইংরাজি শিক্ষার সুযোগে প্রাপ্ত নকলবিসি স্বভাবের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে, ধনবৃদ্ধি ও উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল। এরই বিরুদ্ধে বিদ্রূপের বাণ পরিচালনা করেছিলেন দীনবন্ধু-মাইকেল-কালীপ্রসন্ন ও কালীঘাটের পটুয়ারা। স্বভাবতই এই হঠাৎ অবতার, ভুঁইফোড় স্থূল শ্রেণীর চিত্রায়ণে, স্ফীত গোলগাল ফিগারের প্রচলনই যথার্থ। অন্তঃসারশূন্যতার প্রতীকধর্মী রূপায়ণ। আর তাছাড়া মনে হয়, ভারতীয় শিল্পে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সব-সময়ই স্থূল দেহের সঙ্গে জড়িত। মোটা স্ফীতোদর বামনের মূর্তি প্রাচীন ভাস্কর্যে প্রায়সই দেখা যায়।

কালীঘাটের পটুয়াদের অঙ্কনশৈলী প্রসঙ্গে আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার। আগেই বলেছি স্বল্পমূল্যে তীর্থযাত্রীদের ছবি বিক্রী করার উদ্দেশ্যে কালীঘাটের পটের জন্ম। চিত্রকরদের উপকরণও ছিল যৎসামান্য—কাগজ, একটা তুলি আর দু'একটি রং। অল্প সময়ে, অল্প মাল-মসলা দিয়ে ছবি আঁকার প্রয়োজনীয়তা ছিল। এই মিতব্যয়িতার ছাপ তাদের ছবিতে খুব স্পষ্ট। দু-একটা রেখার টানে একটা ফিগার-রচিত হ'তে দেখা যায়। মনে হয় তুলির ডগায় কালি থাকতে থাকতে 'আউট লাইন'টা এঁকে ফেলতে হ'ত। সাবলীল রেখার সাহায্যে মূর্তি রচনা করাটা খুব কষ্টসাধ্য ছিল না, কারণ বহুপুরুষাগত পট আকার স্বভার তাঁদের মজ্জার মধ্যে নিহিত ছিল। কিন্তু নতুনত্ব এলো পটভূমি সৃষ্টির কায়দায়, কাপড়ের ভাঁজ-আকবার পদ্ধতিতে! জড়ানপটে এই সব ক্ষেত্রে নিখুঁত আলংকারিক কায়দায় শাড়ির পাড়, মাথার পাগড়ি, গাছের ডাল-পালা

আঁকা হ'ত। কালীঘাটের পটে সময়ের ও উপকরণের স্বল্পতাহেতু, শুধুমাত্র রেখা ও রং এর আভাসে কাজ সেরে দিতে হ'ল। নায়িকা বালিশে হেলান দিয়ে ব'সে, শিল্পী পাশ থেকে শুধু বালিশের একটি কোণ দেখিয়েই ক্ষান্ত ; দু-তিনটি রেখা পর পর বসিয়ে বালিশের ওয়াড়ের ভাঁজ দেখান হ'য়েছে। রেখার এইরকম পরিমিতিতে এত আশ্চর্য সুন্দর এফেক্ট সৃষ্টি করার উদাহরণ শিল্পের ইতিহাস বিরল। নায়িকার পরিধেয় শাড়ি আঁকার পদ্ধতিটিও লক্ষণীয়। কাগজের সাদা জমিটা আস্ত রেখে, মেয়েটির দেহের অনাবৃত অংশতে প্রথমে মেটে লাল রং বসিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। তারপর ছবির সাদা জায়গাটাকে শাড়ির আভাসে রূপান্তরিত করার চেষ্টা ; প্রয়োজনীয় স্থানে চওড়া কালো রং এর টান দিয়ে পাড় তৈরী হ'ল ; এবার সাদা অংশে তুলির আবছা দু-একটি দাগ ফেলে, ভাঁজের আভাস দিলেই, কালোপেড়ে শাড়ি পরিহিতা সুন্দরীর দেহাবয়ব তৈরী হ'য়ে গেল। কালীঘাটের পটের এই সব নায়িকাদের দেহের স্থূলত্ব লক্ষণীয়। প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের বৃহদায়তন গুরুভার নারীমূর্তির আদর্শেই যেন এরা চিত্রিত হ'য়েছে। যে গোলাকৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সন্নিবেশ 'বাবুদের' চিত্রায়ণে ব্যঙ্গের হাতিয়ার হ'য়েছিল, নারীদেহের অঙ্কনে সেই 'ফর্ম' এক অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্যের প্রকাশপথ হ'য়ে দাঁড়াল। বহু-প্রচারিত 'নিদ্রিতা' ছবিটি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য ; নারীদেহের সীমারেখার আনত ভঙ্গীর সুষমা প্রকাশে, সোজা অনমনীয় কোণ (angle)-কে একেবারে বর্জন করে, শুধুমাত্র বক্ররেখা (curve)-র সাহায্য নেওয়া হ'য়েছে। রেখার পরিচালনাতেও এমন একটা সতেজ গতি রয়েছে যে চিত্রকর ছবির কোন অংশ থেকে তুলির টান শুরু করেছিলেন, এবং কোথায় শেষ করেছেন, তার সীমারেখা গতির আবর্তনে হারিয়ে গেছে।

বস্তুতঃ কালীঘাটের পটে স্থূলাকৃতির প্রতি ঝোঁকের দরুণ, আনত বক্ররেখা বা 'কার্ভ'এর প্রাধান্য ; কোণ বা angle প্রায় অনুপস্থিত। কালীঘাটের আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য এইখানেই। এই ধরনের আঙ্গিকের ক্রমবিকাশের পিছনে উপস্থিত কারণের উল্লেখ আগেই করেছি। লোকশিল্পে বিশেষ ধরনের অঙ্কন-শৈলীর বিবর্তনের শুরুতে থাকে এক-ই ছাঁচে বারবার আঁকার রেওয়াজ। পুনরাবৃত্তির ফলে প্রথম যুগের পূর্ণাঙ্গ সবিশেষ বর্ণনার প্রয়োজনটা আস্তে আস্তে ফুরিয়ে যায় ; তার বদলে সোজাপথে বাহুল্য-বর্জিতরূপে পুরোন ছবিটাই অল্প সময়ে আঁকা হ'তে থাকে। ক্রমে এই ছবিটাই ছাঁচ বা আদর্শে পরিণত হয় ;

পরবর্তী ছবি এরই কায়দায় আঁকা হয়। কায়দাটা 'ফর্মিউলা' হ'য়ে দাঁড়ায়। যেমন কালীঘাটের পটে মানুষের হাত আঁকার পদ্ধতির একটা সূত্র ছিল। প্রথমে বৃত্তের আকারে একটা মুঠো আঁকা হ'ত; তারপর তারই মধ্যে প্রয়োজনানুসারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাঁচটা দাগ ব'সিয়ে দেওয়া হ'ত, আঙ্গুল দেখাবার জন্য। মেয়েদের ছবিতে, স্তনাগ্রভাগের উপর দিয়ে বাঁকাভাবে তুলির একটা মোটা টান দিলেই, শাড়ীর আঁচলের 'এফেক্ট' তৈরী হ'ত। পুরুষের চুল আঁকার জন্যও বাঁধাধরা সূত্র ছিল: কপালের দু'পাশ ঘিরে কালো রংএর প্রলেপ; তারপর কানের পিছনদিকে শিং-এর আকৃতিতে আরও দুটো পোঁচ, বাবরি চুলের ঢেউ দেখানোর উদ্দেশ্যে। এইভাবে বাহুল্য-বর্জিত সরল প্যাটার্নের উদ্ভব হ'য়েছিল, যার ভিত্তিতে আঁকা মানবদেহের চিত্র অসম্ভব গতিশীল ও প্রকাশক্ষম হ'য়ে উঠল।

এ শতাব্দীর শুরুতেই কালীঘাটের শিল্প-নৈপুণ্যের ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু তার মূল্যায়ন বোধহয় আজও শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে নি। আধুনিক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করে অনেকে কালীঘাটের পটকে 'কিউবিজ্‌মের' পূর্বসূরী, বা Leger-এর ছবির সমান্তরাল ব'লে দাবী ক'রেছেন। 'ফর্মিউলা'র ছাঁচ আঁকার পদ্ধতিতে হয়তো কিছু সাযুজ্য থেকে থাকবে। কিন্তু angle-প্রধান কিউবিস্ট্ চিত্রে মানুষের মুখ বা দেহ থেকে 'স্টিল্‌লাইফ' যেমন অনেক বেশী স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, কালীঘাটের পটের পেলব বাঁকা রেখা ঠিক তেমনি ভাবেই নিসর্গ চিত্রের পরিবর্তে মানব দেহে ও মুখাবয়বকেই সানন্দে আমন্ত্রণ জানায়। আর Leger তাঁর অঙ্কনশৈলী পালটেছেন বহুবার। এ শতকের দ্বিতীয় দশকে তিনি যে স্টাইলের ছবি এঁকেছেন তাঁর সঙ্গে কালীঘাটের পটের গোলাকৃতি 'ফর্মের' মিল চোখে পড়ে। কিন্তু Leger-এর চিত্রে 'ফিগারগুলি' স্থাণু পুতুলের মত; অপরপক্ষে কালীঘাটের ছবিতে রেখার গতিতে রয়েছে বিচিত্র ছন্দ। এ ছাড়াও মনে রাখা দরকার যে Leger ও কিউবিস্ট্‌দের ফর্ম নির্বাচনের পিছনে ছিল বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি-নির্ভরশীল দৃষ্টিভঙ্গি, সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে তাল রেখে, শ্রমশিল্প জগতের বিষয়বস্তুর আকারকে চিত্রকলায় স্থান দেবার প্রচেষ্টা। কালীঘাটের পটুয়াদের আঙ্গিকের উদ্ভাবনীশক্তি, পূর্বপুরুষদের সংস্কারের অবদান ও ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার সামাজিক আবহাওয়ার জল-হাওয়ায় তৈরী।

সে যাই হোক, মনে হয় কালীঘাটের পটের অঙ্কনশৈলীর সম্ভাবনা আজও ফুরোয় নি। রূপে একে পরিবর্ধিত করার পথ রয়েছে; ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগও বহু-বিস্তৃত, বর্তমান বাংলাদেশের সামাজিক পরিবেশে। রুচিহীনতার প্রকোপ, আর অশিক্ষিত ধনিক শ্রেণীর আত্মপরিতুষ্টির নির্লজ্জ দম্ভপ্রকাশকে নির্মমভাবে আঘাত ক'রতে হলে প্রয়োজন কালীঘাটের পটের মত বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গি। পটের প্রকাশশৈলীকে রূপান্তরিত ও পরিবর্ধিত করে ব্যঙ্গ চিত্রের নতুন আঙ্গিক সৃষ্টি করার সম্ভাবনা কতখানি বাস্তব, আধুনিক চিত্রকরেরা তা অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন।

অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ

আদিত্য ওহদেদার

ইংরেজি অনুবাদের মধ্য দিয়েই সমগ্র বিশ্বে রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রসার লাভ করেছে। ইংরেজি ছাড়া অন্য বিদেশী ভাষায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে অনুবাদ করা হয়েছে তা ইংরেজি অনুবাদ থেকেই। এবং কবি যে নোবেল প্রাইজ লাভ করেন তার মূলেও ইংরেজি অনুবাদ। সুতরাং বিদেশে রবীন্দ্রনাথের কবি-খ্যাতি প্রতিষ্ঠা পায় অনুবাদ মারফৎ।

কিন্তু অনুবাদই আবার বিদেশে রবীন্দ্রনাথের কবি-খ্যাতিকে ম্লান করেছে। অনুবাদকে অবলম্বন করে বিদেশে কবি-খ্যাতির এই ওঠা-পড়ার আলোচনাই হল বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের বিষয়।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রথম অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ নিজেই। প্রথম যৌবনে কবি যখন গাজীপুরে 'মানসী'র কবিতাগুলি লিখছিলেন, তখন একদিন সেখানকার সিভিল সার্জেন সাহেব কবির লেখা শুনতে চান। কবি তাঁকে মানসীর কয়েকটি কবিতা মুখে মুখে অনুবাদ করে শোনান। কিছু কিছু অনুবাদ লিখিতও হয়েছিল, যেমন অধুনা আবিষ্কৃত 'নিষ্ফল কামনা'র অনুবাদ। (রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড দ্রঃ)। এরপর অনেক দিন বাদে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুবাদের কাজ কিছুটা করেন অজিতকুমার চক্রবর্তী ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। অজিত চক্রবর্তী যখন বিলেতে যান (১৯১০) তখন সেখানে তিনি কবির কবিতা অনুবাদ করে বিদেশী বন্ধুমহলে শোনান, এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর মুগ্ধতা দেখে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন এবং কবিকে জানান যে তাঁর রচনার অনুবাদ প্রয়োজন। জগদীশচন্দ্র তাঁর বিলাত বাসকালে (১৯০১) কবির কয়েকটি গল্প, বিশেষ করে 'ছুটি' গল্পটি, মুখে মুখে অনুবাদ ক'রে তাঁর বিশিষ্ট বন্ধুদের যখন শোনান তখন তাঁরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে গল্পগুলির মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট রস বর্তমান এবং বিদেশীদের পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা খুবই সহজ। তিনি তাই কবিকে বিশেষভাবে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে তিনি কবির ছোট গল্পের একটা অনুবাদ-চয়নিকা বার করবেন। তাছাড়া, জগদীশচন্দ্র কবিবন্ধু ও সুরসিক পণ্ডিত লোকেন পালিতকে কবির কবিতা

অনুবাদ করতে অনুরোধ করেন। এই উদ্যোগপর্ব সম্বন্ধে কবি যে খুব উৎসাহ বোধ করেছিলেন তা মনে হয় না। কারণ কবি জগদীশচন্দ্রকে লেখেন, "আমার রচনা-লক্ষ্মীকে তুমি জগৎ-সমক্ষে বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছ—কিন্তু তাহার বাঙ্গলা-ভাষা-বস্ত্রখানি টানিয়া লইলে দ্রৌপদীর মতো সভা সমক্ষে তাহার অপমান হইবে না? সাহিত্যের ঐ বড় মুস্কিল—ভাষার অন্তঃপুরে আত্মীয়-পরিজনের কাছে সে যে ভাবে প্রকাশমান, বাহিরে টানিয়া আনিতে গেলেই তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়।" কিন্তু বিশেষ উৎসাহ না থাকলেও কবি যে একেবারে তাঁর সাহিত্যের অনুবাদ নিষিদ্ধ করেছিলেন তা নয়। জগদীশচন্দ্রকে লেখা তাঁর ঐ চিঠিতেই তিনি জানিয়েছিলেন যে তাঁর অচির-প্রকাশিতব্য গল্পগুচ্ছের দ্বিতীয় খণ্ডটি তিনি জগদীশচন্দ্রকে পাঠিয়ে দেবেন যাতে অনুবাদের জন্য রচনা নির্বাচন করতে সুবিধা হয়।

কিন্তু এই উদ্যোগপর্বের শেষরক্ষা হয় নি। কবির কোনো গল্প বা কবিতা অনুবাদ করা শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে নি।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রথম প্রকাশিত অনুবাদ কিন্তু ইংরেজি ভাষায় হয় নি। এ অনুবাদ হয় হিন্দিতে ১৯০১ সালে। এবং অনূদিত রচনাটি হল 'মুক্তির উপায়' গল্প।

ইংরেজিতে প্রথম প্রকাশিত অনুবাদ হল 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্প। ১৯১০ সালে মডার্ণ রিভিউ-তে পান্নালাল বসু অনুবাদ করেন। তারপর ১৯১১ সালে মডার্ণ রিভিউ পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয় কবির কবিতা। এই অনুবাদে সহযোগিতা করেন আনন্দ কুমারস্বামী। কুমারস্বামীর সঙ্গে যুগ্মনামে বার হয় অজিতকুমার কৃত একটি কবিতার অনুবাদ (শিশু কাব্যগ্রন্থের 'জন্মকথা' কবিতা) এবং রবীন্দ্রনাথের নিজের একটি অনুবাদ ('বিদায়' কবিতা)। ১৯১১ সাল থেকে কবির বিলাতযাত্রার পূর্ব পর্যন্ত (১৯১২ মে) মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে প্রায় প্রতি সংখ্যায় কবির রচনার অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। এই অনুবাদ-কার্যে সকলের অগ্রণী ছিলেন যদুনাথ সরকার। যদুনাথ অনুবাদ করেন কবির প্রবন্ধ রচনা থেকে। অন্য কয়েকজন অনুবাদ করেন কয়েকটি গল্প ও কবিতা। এই অনুবাদকদের মধ্যে লোকেন পালিত ও সিস্টার নিবেদিতার নাম উল্লেখযোগ্য। লোকেন পালিত দুটি কবিতা ও সিস্টার নিবেদিতা 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি অনুবাদ করেন।

* * * * *

প্রত্যেক ঘটনা তা সে যত বৃহৎই হোক, তার একটা নিমিত্ত থাকে যাকে আপাতুচ্ছ বলে মনে হয়। বিদেশে রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি তথা নোবেল পুরস্কার লাভের বিরাট ঘটনার পেছনে নিমিত্ত হয়ে আছে একটি আপাতুচ্ছ ব্যাপার। তা হল সিস্টার নিবেদিতা-কৃত 'কাবুলিওয়ালা'র অনুবাদ। বাস্তবিক এই অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর কবিজীবনের ঘটনাবলী অনুধাবন করলে এ কথা স্বীকার করতেই হয়।

১৯১২ সালের জানুয়ারি মাসে 'কাবুলিওয়ালা' অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদ চোখে পড়ল বিলেতের প্রখ্যাত শিল্পী উইলিয়াম রোদেনস্টাইনের। রোদেনস্টাইন ১৯১০ সালে ভারতে আসেন এবং জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কবির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, এবং কবির সঙ্গে তাঁর কিছুটা পরিচয় গড়ে ওঠে। কাবুলিওয়ালার অনুবাদ পড়ে রোদেনস্টাইন এত মুগ্ধ হন যে তিনি জোড়াসাঁকোয় চিঠি লিখে জানতে চাইলেন কবির অন্যান্য গল্প বা রচনা কোথায় পাওয়া যাবে। উত্তরে অজিত চক্রবর্তীর অনুবাদ করা কবির কয়েকটি কবিতা তাঁকে পাঠানো হয়। এই কবিতাগুলির অনুবাদ পড়ে রোদেনস্টাইন আরো মুগ্ধ হলেন। এদের মিস্টিক আবেদন তাঁকে অভিভূত করল। এই সময় তাঁর সঙ্গে নববিধান সমাজের প্রমথলাল সেন এবং দার্শনিক ব্রজেন্দ্রলাল শীলের পরিচয় হয়। তিনি তাঁদেরকে অনুরোধ করলেন তাঁরা যেন রবীন্দ্রনাথকে বিলেতে আসতে লেখেন।

১৯১২ সালে মে মাসে কবি বিলাত যাত্রা করলেন। যাত্রা করার কথা ছিল কিছু আগে, কিন্তু সে-সময় যাত্রার দিন কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং শিলাইদহে বিশ্রাম নিতে যান। এ প্রসঙ্গে কবি এক পত্রে লিখেছেন, "…শিলাইদহে বিশ্রাম করতে গেলুম কিন্তু মস্তিষ্ক ষোল আনা সবল না থাকলে একেবারে বিশ্রাম করবার মতো জোর পাওয়া যায় না, তাই অগত্যা মনটাকে শান্ত রাখবার জন্যে একটা অনাবশ্যক কাজ হাতে নেওয়া গেল। কোমর বেঁধে কিছু লেখবার মতো বল আমার ছিল না। সেই জন্যে ঐ গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি নিয়ে একটি একটি ক'রে ইংরেজিতে তর্জমা করতে বসে গেলুম। যদি বলিস কাহিল শরীরে এমনতর দুঃসাহসের কথা মনে জন্মাল কেন—কিন্তু আমি বাহাদুরি করবার দুরাশায় এ কাজে লাগিনি। আর একদিন যে ভাবের হাওয়ায় মনের মধ্যে রসের উৎসব জেগে উঠেছিল, সেইটিকে আর একবার আর এক ভাষার ভিতর দিয়ে মনের মধ্যে

উদ্ভাবিত করে নেবার জন্যে কেমন একটা তাগিদ এল। একটি ছোট্ট খাতা ভরে এল। এইটি পকেটে করে নিয়ে জাহাজে চড়লুম। পকেটে করে নেবার মানে হচ্ছে এই যে, ভাবলুম, সমুদ্রের মধ্যে মনটি যখন উস্‌খুস্‌ করে উঠবে তখন ডেক চেয়ারে হেলান দিয়ে আবার একটি দুটি করে তর্জমা করতে বসব। ঘটলও তাই। এক খাতা ছাপিয়ে আর এক খাতায় পৌঁছন গেল।"

এই তর্জমাই বিদেশের দিগন্তে রবীন্দ্রপ্রতিভাদ্যুতি যে-ভাবে উদ্ভাসিত করল তা যেন vini vici vidi—'এলুম, দেখলুম, জয় করলুম' এর মতো। রোদেনস্টাইন দেখতে চাইলেন কবির রচনা। কবি দিলেন তাঁকে তাঁর তর্জমাগুলি, রোদেনষ্টাইন শ্রদ্ধান্বিত বিস্ময়ে সে পাণ্ডুলিপি দেখালেন কবি ইয়েট্‌সকে। ইয়েটস তার বিস্ময় ও আনন্দ নিজের মধ্যেই সীমিত রাখলেন না। তিনি একটি সান্ধ্য আসরের আয়োজন করে বিশিষ্ট সাহিত্য-রসিকদের সামনে নিজে আবৃত্তি করে গেলেন গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি। ইয়েটস-বন্ধু স্টার্জ মূর (Thomas Sturge Moore) যিনি ছিলেন একাধারে খ্যাতিমান কবি ও লণ্ডন রয়েল সোসাইটির সভ্য, রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব প্রচার কার্যে নিরলসভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন। পর বৎসরই কবি লাভ করলেন নোবেল প্রাইজ।

ইংরেজি গীতাঞ্জলি সম্পর্কে আমাদের দেশে দুটো ধারণা প্রচলিত। একটি ধারণা হল এই যে গীতাঞ্জলির ইংরেজি এণ্ড্রুস অথবা ইয়েট্‌সের। অন্য ধারণা হল, এর ইংরেজি সবটাই রবীন্দ্রনাথের, একটা কথাও কেউ পরিবর্তন করে নি। ১৩১৯ সালে প্রবাসীতে একটি খবরে জানানো হয় যে রবীন্দ্রনাথ যখন ইয়েট্‌সকে গীতাঞ্জলির ইংরেজি মার্জিত করবার জন্যে অনুরোধ করেন, তখন ইয়েট্‌স নাকি, বলেন, 'এই অনুবাদের কোনো কথা বদল করে মার্জিত করে তুলতে পারা যায় যদি কেউ এমন কথা বলে তবে সে সাহিত্য কী তা জানে না।' প্রভাতবাবুর রবীন্দ্রজীবনীতেও এই উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। জানি না ইয়েট্‌স সত্যি এমন কথা বলেছিলেন কিনা, কিংবা উচ্ছ্বাসবশে এমন উক্তি করেও থাকবেন, কিন্তু আসলে গীতাঞ্জলির ইংরেজি ইয়েট্‌স কর্তৃক কিছু কিছু মার্জিত হয়। তার প্রমাণ আছে রবীন্দ্রনাথেরই এক চিঠিতে। কবি রোদেনস্টাইনকে লেখেন, "Then came those delightful days when I worked with Yeats and I am sure the magic of his pen helped my English to attain quality of permanency. It was not all neccesary for my

own that I should find my place in the history of your literature. It was an accident for which you were also responsible and possibly most of all, Yeats."

এই প্রসঙ্গে ষ্টার্জ মূরকে লেখা ইয়েট্‌সের একটা চিঠি উল্লেখযোগ্য বলে বোধ করি। চিঠিটি এই—

My dear Sturge Moore,

No, I am sorry but I prefer my own versions. I have made one change ; for 'sky' in **The Source** is either a misprint or something put in by * * I brought both versions to Lady Gregory and told her I did not know which was yours and which mine. She said both (the poem was **The Source**) were bad, though 'buds of enchantment' less good than 'poppy buds', but 'coyly open' impossible, and finally said the version in print was the best. She was emphatic against the changes in **On the Sea Shore** but in that case she knew they were not my changes. I took a great deal of trouble with these poems and used the words 'buds of enchantment' which I dislike because the flowers in Bengali are connected with an Indian fairy tale which is the association Tagore wanted. I do not want to alter anything now when I have forgotten the reason I had when working over these poems. I have left one change, that on page 19.

Yours ever,
W. B. Yeats.

এই পত্রে উল্লিখিত **The Source** (শিশুর উৎসর্গ পত্র) হল ইংরেজি গীতাঞ্জলির ৬১ সংখ্যক কবিতা, এবং **On the Sea Shore** (শিশুর খোকা কবিতা) হল ৬০ সংখ্যক কবিতা।

ইয়েট্‌সের এ চিঠির উত্তরে ষ্টার্জ মূর কোনো পত্র ডাকে ছেড়েছিলেন কিনা

জানা যায় নি। তবে এ চিঠির পেছনে ষ্টাজ মূর যা লিখে রেখেছিলেন তা হল এই—

My dear Yeats,

You strain at gnats and swallow camels. What Tagore and I so object to in the versions you call 'yours' is the use of 'flits' which means nothing, being quite wrong, and the arrangements of the phrases, which is absurdly un-English and clumsy. I thought you would notice these things at once and jump at them but you only worry over a phrase which can have no harmony while it is set in a dislocated sentence. However it is too late to convert your blindness.

Yours ever,

T. S. Moore

ইয়েট্‌স-মূর পত্রালাপ থেকে এটুকু জানা যাচ্ছে যে গীতাঞ্জলির ইংরেজি নিয়ে বই বেরুবার আগে ইয়েট্‌স বেশ কিছু মাথা ঘামিয়েছেন। এবং তাঁর সঙ্গে আরো কয়েকজন।

কিন্তু তাই বলে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি বহুধা পরিমার্জিত হয়েছিল, তা নয়। কারণ রোদেনষ্টাইন লিখে গেছেন, I know that it was said in India that the success of **Gitanjali** was largely owing to Yeats's re-writing of Tagore's English. That this is false can easily be proved. The original of **Gitanjali** in English and in Bengali is in my possession. Yeats did here and there slight changes but the main text was printed as it came from Tagore's hands.

রোদেনষ্টাইনের কথার যাথার্থ্য বিশেষভাবে প্রমাণিত হয় একটি ব্যাপারে। বিখ্যাত ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রিজেস (Robert Bridges) তাঁর **The Spirit of Man** (1916) নামক কাব্য-সংকলনের জন্যে গীতাঞ্জলির একটী কবিতা গ্রহণ করেন এবং তার ইংরেজি কিছুটা রদ-বদল করেন। এই কবিতাটি ইংরেজি গীতাঞ্জলির ৬৭ সংখ্যক রচনা (নৈবেদ্য-র ৮১ সংখ্যক কবিতা: "একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়') ব্রিজেস-কৃত ইংরেজি যে গীতাঞ্জলির

ইংরেজির চেয়ে উন্নত হয়েছিল তা বোঝা যায় যখন দেখি যে ১৯৩৬ সালে ইয়েট্‌স **Oxford Book of Modern Verse** নামে যে কাব্য-চয়ন সম্পাদিত করেন তাতে তিনি গীতাঞ্জলির কবিতা হিসেবে ব্রিজেস্‌-কৃত পাঠই গ্রহণ করেন। এই কবিতার আদি ইংরেজিতে ইয়েট্‌সের যদি তেমন হাত পড়ত, তাহলে নিশ্চয় তিনি ব্রিজেস-কৃত পাঠ গ্রহণ করতেন না।

গীতাঞ্জলির ঐ কবিতাটিকে সামান্য পরিমার্জিত করতে ব্রিজেসকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। রোদেনষ্টাইন যখন কবিকে ব্রিজেসের অনুরোধ জানান তখন কবি তাঁকে জবাব দেন, "But since I have got my fame as an English writer, I feel extreme reluctance in accepting alternations in my English poems by any of your writers." অবশ্য শেষ পর্যন্ত কবি ব্রিজেসকে অনুমতি দেন।

ইংরেজি গীতাঞ্জলির জন্যে বিদেশে কবির খ্যাতি সত্যই উত্তুঙ্গ হয়ে ওঠে। অতি অল্পকালের মধ্যে সংস্করণ ছাপা হয় এই বইয়ের।

কিন্তু কবির এই খ্যাতি শীঘ্রই ম্লান হয়ে আসে। এবং বেশ দুঃখজনক সে পরিণতি। কিছুদিন আগে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে ইয়েট্‌সের জীবন ও আলোচনা প্রসঙ্গে একজন খ্যাতিমান সমালোচক বলেছেন যে "Eventually Tagore proved a disappointment to his admirers in England as he grew prolix and revealed a want of English style." (Ellmann : The Identity of Yeats, 1954)

এমন কি যে ইয়েট্‌স ছিলেন রবীন্দ্র-খ্যাতির মূলে, তিনিও এক সময় রোদেনষ্টাইনকে লেখেন, "Damn Tagore···becausc he thougt it more important to see and know English than to be a great poet, he brought out sentimental rubbish and wrecked his reputation. Tagore does not know English, no Indian knows English. Nobody can write with music and style in a language not learned in childhood and ever since the language of his thought···ইয়েট্‌স্ চিঠিতেই লিখেছেন,"I shall return to the question of Tagore but not yet—I shall return to it because he has published, in recent [years], and in English, prose books of great

beauty and these books have been ignored because of the eclipse of his reputation as a poet." সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি লেখার ক্ষমতা যে যথেষ্ট ছিল এ কথাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। আসলে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি ও গদ্যের ইংরেজির মধ্যে রীতিমত পার্থক্য আছে, অন্তত ইংরেজী যাঁদের মাতৃভাষা তাঁদের কাছে তা ধরা পড়েছে!

এবং সম্প্রতি হ্যালাম টেনিসন এ প্রসঙ্গে বলেছেনঃ "Tagore's literary reputation, which had grown ever more bright and iridescent as it expanded, suddenly burst and vanishd into thin air. Today no publisher will risk a new English edition of his work or attempt to repair the damage done by the mutilated and inaccurate renderigns put out by the poet himself." (The Listener, May 11, 1961)

এখন প্রশ্ন, বিদেশে রবীন্দ্রনাথের কবি খ্যাতির এই অবলুপ্তির কারণ কী? হ্যালাম টেনিসন তাঁর লেখায় কারণও জানিয়েছেন। ইংরেজি গীতাঞ্জলির একরাশ সংস্করণ বার হল, এবং কবি নোবেল প্রাইজ ও নাইটহুড্ পেলেন। এই বিরাট সাফল্যের ফলে বিলিতি প্রকাশকরা কবিকে জোর তাগিদ দিতে থাকে নতুন নতুন বইয়ের জন্যে। কবিও সে তাগিদ মেটাতে থাকেন তাঁর নিজের তাগিদ মেটাবার জন্যে—বিশ্বভারতীর তহবিলে টাকা তুলবার প্রয়োজনে। সুতরাং গীতাঞ্জলির পর যে-সব অনুবাদ কবি করেছেন তা খুবই তাড়াহুড়োর মধ্যে ঘটেছে, এবং স্বাভাবিক কারণেই সে অনুবাদ উচ্চাঙ্গের হয় নি। তাছাড়া, সব অনুবাদই গীতাঞ্জলির ধাঁচে করা হয় বলে তাদের মধ্যে একঘেয়েমির সুর এসে গেছে। তার ওপর, কবি মূল বাংলায় যা আছে ইংরেজি করার সময় মূলের অনেক কথা বাদ দিয়েছেন, তাতে ফল মোটেই ভালো হয় নি। উদাহরণ স্বরূপ টেনিসন সাহেব বলেছেন যে "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য" কবিতার শেষ দুলাইন বাদ পড়েছে ইংরেজি অনুবাদে, এবং তাতে বাংলা কবিতার তীব্র আবেদন অনুবাদে ধরা পড়ে নি। আর একটা দৃষ্টান্তে জানিয়েছেন ইংরেজি অনুবাদে বহু ক্ষেত্রে মূলের সুন্দর সহজ সরল ভাষা ও ভাব অনাবশ্যকভাবে গুরুগম্ভীর করা হয়েছে। 'জানি গো'

দিন যাবে এদিন যাবে' গানটি মূল সুরের সঙ্গে তাল রেখে নিজের অনুবাদ দিয়ে তার পাশে রেখেছেন কবি-কৃত অনুবাদ যা কি **Fruit Gathering** গ্রন্থে পাওয়া যায়। তুলনায় আমরাও বুঝতে পারি কবির অনুবাদ অথবা রচনা কতখানি দুর্বল।

অবশ্য হ্যালাম টেনিসন যা বলেছেন সে কথা আরো বিশদ ও স্পষ্ট ক'রে অনেক আগে—সেই ১৯২১ সালে—টমসন সাহেব তাঁর **Rabindranath Tagore ; his life and work** গ্রন্থে বলে গেছেন। তিনিও উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন কবি কীভাবে অনুবাদের মধ্যে মূলের অঙ্গহানি ঘটিয়েছেন যার ফলে অনুবাদ প্রায় রসহীন ঠেকে। তিনি চিত্রার 'সুখ' কবিতার একটী ছন্দে-বদ্ধ অনুবাদ নিজে করেছেন, এবং তার পাশে রেখেছেন Lover's Gift-এর ৫১ সংখ্যক কবিতায় কবি যা দিয়েছেন। মূল অত বড় কবিতার সামান্য একটু অংশ ইংরেজিতে দেওয়া হয়েছে। এবং টমসনের মতে প্রকাশকের তাগাদায় লিখতে গিয়ে কবির মনে একটা অবহেলার ভাব এসে যায়। 'যা হয় কিছু দিলেই যথেষ্ট'—এমন মনোভাব নিয়ে যেন ইংরেজ পাঠকদের কাছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি কাব্য-রচনার টুকরোগুলো ছুঁড়ে দিয়েছেন !

মোট কথা, যাঁদের জন্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন, তাঁদের কাছে সে অনুবাদের আবেদন কোনো স্থায়ী রেখাপাত করে নি। এবং শেষ পর্যন্ত বিদেশে রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি রীতিমত ক্ষুণ্ণ হয়েছে। নিছক কবিকর্মের জন্যে কবি বিদেশে যে অতি সামান্যই স্বীকৃতি পেয়েছেন তা অরন্‌সন (Aronson) রচিত Rabindranath Through Western Eyes বইটি পড়লেও জানা যায়।

অবশ্য অনুবাদে মূল কবিতার রস ফুটিয়ে তোলা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কবি নিজেই একদা বলেছিলেন, ভাবের ভাষায় অনুবাদ চলে না। ভোলতেয়রও বলেছেন, কবিতার অনুবাদ অসম্ভব যেমন সঙ্গীতের অনুবাদ অভাবনীয়। কিন্তু গ্যেটে অনুবাদ কার্যকে অমন নস্যাৎ করেন নি। তাঁর মতে, অনুবাদক হলেন এমন একজন যিনি এক অবগুণ্ঠিত সৌন্দর্যের সামনে আমাদের নিয়ে যান এবং সে সৌন্দর্যকে জানবার জন্যে আমাদেরকে উদ্‌গ্রীব করে তোলেন।' অনুবাদের সার্থকতা এইখানে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদে যদি তাঁর কাব্য-সৌন্দর্যকে কৌতূহল জাগাবার মত অবগুণ্ঠিত করতে পারতেন তাহলেই কাজ

হত। কিন্তু তিনি তা করতে পারেন নি। তবে ইংরেজি গীতাঞ্জলিকে ব্যতিক্রম বলতে হবে; এবং সেই কারণেই এই বই সমাদৃত হয়। কবি যদি ইংরেজি গীতাঞ্জলির পর আর কোনো কাব্য অনুবাদ প্রকাশ না করতেন তাহলেই বোধহয় যা হওয়া উচিত ছিল, তাই হোত। অর্থাৎ, বিদেশীরা বাংলাভাষা শিখে রবীন্দ্রকাব্যের স্বাদ গ্রহণ করতে তাগিদ পেতেন, এবং তাঁদের কেউ কেউ মূল বাংলা থেকে এমন উপযুক্তভাবে অনুবাদ করতেন যা তাঁদের দেশবাসীর কাছে আদরণীয় বলে স্বীকৃত হোত।

কিন্তু হয়নি বলেই যে হ'তে পারে না এমন নয়। কবির রচনা থেকে সুনির্বাচিত কবিতা সম্ভারের বিদেশী পাঠকের গ্রহণযোগ্য অনুবাদ যাতে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় সে ব্যবস্থার দিকে আমরা দৃষ্টি দিতে পারি। এবং তাতে রবীন্দ্রনাথের কবি-খ্যাতি বিদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

নিরপেক্ষবাদের রাজনীতি

বাসব সরকার

নিরপেক্ষবাদ সমকালীন পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিভাষায় একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এক যুগেরও বেশি আগে, জন্মলগ্নে যে সমালোচনার কঠোরতা, প্রতিকূলতা, এর নিত্যসঙ্গী ছিল, তা আজ বহুলাংশে আত্মসমালোচনায় মুখর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে, দুই বিরুদ্ধ শক্তি শিবিরের মতাদর্শের মধ্যে, কোন বিশিষ্ট তৃতীয় চিন্তা বা স্বতন্ত্রচিন্তার সুযোগ আছে, একথা সেদিন প্রায় অভাবনীয় ছিল। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে এবং বিশ্বরাজনীতির টানাপোড়েনের পরোক্ষ প্রভাবে, নিরপেক্ষবাদ বিশুদ্ধ চিন্তার জগৎ থেকে বাস্তবের সীমানায় একটা বিশেষ দাবী নিয়ে বিকাশলাভ করেছে। এই বাস্তব সত্যকে অনেক রাজনৈতিক ভাষ্যকার তাই তৃতীয় শিবির নামে অভিহিত করতে তৎপর। কিন্তু নিরপেক্ষবাদের কার্যকারণ এবং তাৎপর্য বিচার করলে একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তৃতীয় শিবিরের চিন্তা হয় অর্বাচীন সুলভ চাপল্য নয়তো বিভ্রান্তিকর অপব্যাখ্যা মাত্র।

॥ এক ॥

নিরপেক্ষবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ বা পুঁজিবাদের মতো কোন রাষ্ট্রিক মতাদর্শ নয়। প্রত্যক্ষভাবে সমাজব্যবস্থার কোন গুণগত পরিবর্তনের সামান্যতম প্রচেষ্টাও এর সাধ্যাতীত। সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের ধারাকে, বিশ্বরাজনীতির কুক্ষিগত না করে, দেশের আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের স্বাভাবিক প্রবণতাকে তার একমাত্র নিয়ামকের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করাই, নিরপেক্ষবাদের পরোক্ষ উদ্দেশ্য। নিরপেক্ষবাদের রাজনৈতিক তাৎপর্য ও গুরুত্বের সার্থক মূল্যায়ন একমাত্র এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই সম্ভব। বিশ্বরাজনীতির যে পরিবেশে, নিরপেক্ষবাদের উদ্ভব হয়েছে, সেটি বিশ্লেষণ করলে একথা আরো স্পষ্ট হবে।

নিরপেক্ষবাদ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতির দুই শিবিরের

দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়ায় জন্মলাভ করেছে। এই সময়ের রাজনীতিতে দুটি ধারা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ইতিহাসের ভাস্কো-ডা-গামা পর্বের অবসান এবং দ্বিতীয়ত ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের পর নোতুন চেতনায় সমৃদ্ধ সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে পুঁজিবাদের আদর্শগত বিরোধের বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক তাৎপর্যের সূচনা।

১৯৪৫ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে ঔপনিবেশিক জগতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের চরম পরিণতিলাভ এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তি বিশ্বরাজনীতির একটা অন্যতম ঘটনা। জাতীয় আন্দোলনের অভিজ্ঞতা পুষ্ট, এশিয়ার সদ্যমুক্ত রাষ্ট্রগুলির নেতৃবৃন্দের চোখে সেদিন সাম্রাজ্যবাদের বিভীষিকা অত্যন্ত প্রকট। সন্দেহ নেই ভারতে এই ধারণার বিস্তার ঘটেছিল সবচেয়ে বেশি। ভারতের মুক্তি আন্দোলন অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে সফলতা লাভ করলেও, তার ভৌগোলিক অবস্থানের রাজনৈতিক গুরুত্ব, সদ্যমুক্ত এশিয়ার ঔপনিবেশিক জগতের ভবিষ্যৎ রাজনীতিকে যে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করবে, এ-সম্বন্ধে তার নেতৃবৃন্দ সজাগ ছিলেন। দুই শিবিরের মধ্যে কোন একটির প্রতি পক্ষপাতের প্রতিক্রিয়ায়, এশিয়ার সদ্যমুক্ত দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে বিঘ্নিত হবে, সে সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিল স্পষ্ট।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার এক বছরের মধ্যেই, পূর্ব পশ্চিমের সামরিক মৈত্রী ও রাজনৈতিক সম্পর্কে ভাঙ্গনের রেশ দেখা দেয় পুরানো আদর্শগত বিরোধের প্রয়োজনে। পশ্চিম দুনিয়ার নেতৃবৃন্দ যে কোনদিনই সোভিয়েত সমাজকে সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না, যে মনোভাব ফ্যাসিবাদের তোষণ নীতির মধ্যে তিরিশের দশকে বহুবার প্রমাণিত হয়েছে, তারই অনিবার্য প্রকাশ সুরু হলো মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। মহাযুদ্ধকালীন সামরিক মৈত্রী যে আদর্শগত বিরোধকে সাময়িক ভাবে স্থগিত রেখেছিল, তার প্রয়োজন তখন শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুধু ফ্যাসিবাদকেই ধ্বংস করেনি, পশ্চিম দুনিয়ার কূটনীতিকেও পরাস্ত করেছিল, তাকে যুদ্ধপূর্ব কালের লক্ষ্যভ্রষ্ট করে। তিরিশের দশকে ইঙ্গ-ফরাসী কূটনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল হিটলার তোষণ দ্বারা, পুঁজিবাদের সাধারণ শত্রু সোভিয়েত রাষ্ট্রের পতন ত্বরান্বিত করা। ফলত হিটলারের Lebensrum (Living space) বা বাঁচার মতো যথেষ্ট স্থান দাবীর কার্যকারিতাকে ইঙ্গ-ফরাসী কূটনীতি, তাঁর (Drang nach osten—Drive towards the East)

বা পূর্বমুখী প্রসারের নীতির সমার্থক করে তুলতে সাহায্য করেছিল প্রচুর। উদ্দেশ্য ছিল শক্তিমত্ত হিটলারকে সোভিয়েত সমাজের গঠনমূলক কার্যক্রমের সূচনাতেই আঘাত করতে প্ররোচিত করে, ফ্যাসিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ দুটিকেই দুর্বল করা, যার ফলে পুঁজিবাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ হবে। সোভিয়েতের কূটনৈতিক তৎপরতায় শুধু সে উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়নি, ফ্যাসিবাদের ধ্বংস সাধনে তার ভূমিকাকেও দিতে হয়েছে রাজনৈতিক স্বীকৃতি। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, সোভিয়েত বিরোধিতা শুরু হ'লো সেই পুরানো নীতিরই ধারা-বাহিকতা বজায় রাখার উদ্দেশে।

॥ দুই ॥

১৯৪৬ সালের ৫ই মার্চ আমেরিকার ফুলটন শহরে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের উপস্থিতিতে পশ্চিম দুনিয়ার অন্যতম কূটনীতিবিদ্, যুদ্ধকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইনস্টোন চার্চিল একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন। মহাযুদ্ধোত্তর কালের বিশ্বরাজনীতি, এই বক্তৃতার দ্বারা সর্বাংশে প্রভাবিত। তিনি ঘোষণা করেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে বহুখ্যাত লালফৌজের নেতৃত্বে পূর্ব ইউরোপে ফ্যাসিবাদের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে, প্রাক্তন রাজতন্ত্রেরও অবসান ঘটেছে। সোভিয়েত প্রভাব এখন সেখানে সুবিস্তৃত। ফলে পশ্চিম দুনিয়ার আদর্শ সেখানে তার সনাতন ভূমিকা থেকে অপসারিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সমগ্র ইউরোপ বিশেষত পূর্ব ইউরোপে এই সোভিয়েত প্রাধান্য আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভার-সাম্যকে বিপর্যস্ত করতে চলেছে। সোভিয়েত প্রভাবিত অঞ্চল ও পশ্চিম দুনিয়ার মধ্যে নেমে এসেছে একটি লৌহ যবনিকা—From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic an iron curtain has descended across the continent-এর প্রতিকারের জন্যে, শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে প্রয়োজন এক নোতুন নীতির, যা বিপদের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সজাগ থাকবে, সামরিক, রাজনৈতিক সমস্ত প্রয়োজনে। সেই নোতুন নীতির প্রকরণ ব্যাখ্যায় তিনি ঘোষণা করলেন :

"If the Western democracies stand together in strict adherence to the principles of the United Nations Charter, their influence for furthering those principles will be immense,

and no one is likely to molest them. ..... If the population of the English speaking Commonwealth be added to that of the United States, with all that such co-operation implies in the air, on the sea, and in science and industry···there will be an overwhelming assurance of security. Fraternal association requires not only growing friendship and mutual understanding between our two vast but kindred systems of society, but the continuance of the intimate relations between our military advisers. ..... It should carry with it a continuance of the present facilities of all naval and air force bases in the possession of the either country all over the world."

মিঃ চার্চিলের এই বক্তৃতার তাৎপর্য যেমন পশ্চিম দুনিয়ায় আলোচিত ও অনুসৃত হতে বিলম্ব হয়নি, তেমনই যাদের বিরুদ্ধে, এই যুদ্ধকালীন মৈত্রী পর্বের অবসান ঘোষণার আহ্বান, সেই সোভিয়েত দেশেও তার প্রতিক্রিয়া শুরু হতে সময় লাগেনি। সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান মঃ ষ্টালিন প্রাভ্‌দা পত্রিকায় এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে ১৩ই মার্চ ১৯৪৬ তারিখে মন্তব্য করলেন :

"Mr. Churchill's speech was a dangerous act, calculated to sow seeds of dissent and hinder collaboration among the Allied nations. It has harmed the cause of peace and security. Mr. Cnurchill has now adopted the position of a warmonger. Mr. Churchill and his friends bear a striking resemblance to Hitler and his friends. Hitler started the work of warmongering by proclaiming a racial theory···Mr. Churchill also started his campaign of warmongering with a racial theory, asserting that English speaking nations are the only nations of full value, and must rule over the remaining nations of the world."

ফুলটুন বক্তৃতা প্রমাণ করলো যে পশ্চিম দুনিয়ার মতে বিশ্বশান্তি ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি জোটের রাজনৈতিক ও সামরিক সংহতির ভিত্তিতেই রক্ষিত হতে পারে

যা সোভিয়েতের শক্তির সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারবে। মিত্রপক্ষের মধ্যে সামরিক শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার আহ্বানের তাৎপর্য, সোভিয়েতের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল করে দিল যে পুঁজিবাদী দুনিয়ার মনোভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত করতে পারেনি। মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই এই সামরিক জোট সৃষ্টির আহ্বান তাই গড়ে তুললো যুদ্ধোত্তর কালের বৃহত্তম সমস্যা—পরস্পর বিরোধী দুই শিবিরের তত্ত্ব। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে যখন মিত্রপক্ষের মৈত্রীতে এই ভাঙ্গনের পূর্ব চলেছে, তখন এশিয়ার দেশে দেশে চলেছে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বহুমুখী সংগ্রাম। স্বভাবতই দুই শিবির তত্ত্ব একদিকে যেমন প্ররোচিত করলো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের ভিত্তিতে পরাধীন দেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে সোভিয়েতের আদর্শগত প্রভাব প্রতিহত করার জন্যে, অন্যদিকে তেমনই তা উপনিবেশের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পরবর্তী কালের সমস্যাকে প্রকট করে তুললো। সন্দেহ নেই যে, সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তাদের ঔপনিবেশিক নীতি সমানভাবে সঙ্গতিপূর্ণ করেনি। কিন্তু যে বৃটিশ কূটনীতি দুই শিবির তত্ত্বের প্রবক্তা, তার বিচার বিশ্লেষণে এই ধারণাই অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ভারতে বৃটিশ ক্যাবিনেট মিশনের আগমন ও আপোষে ক্ষমতা হস্তান্তরের নীতি বিঘোষিত হয় ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে। ক্যাবিনেট মিশনের ভারতযাত্রার উদ্দেশ্য সরকারীভাবে ঘোষিত হওয়ার পর, ইংলণ্ডের কোন কোন সংবাদপত্র মন্তব্য করেছিল: 'The Cabinet Mission was sent to India by Moscow.' এশিয়ার মুক্তি আন্দোলনের সাফল্য যে বহুলাংশে পশ্চিম দুনিয়ার এই যুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক কৌশলের প্রয়োগ বিধিকে অন্ততঃ এশিয়াতে ব্যর্থ করে দিয়েছিল, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ নিরপেক্ষবাদের উদ্ভব।

॥ তিন ॥

নিরপেক্ষবাদ (Neutralism) এবং নিরপেক্ষতা (Neutrality) সমার্থক নয়। নিরপেক্ষবাদ প্রধানতঃ রাজনৈতিক চিন্তা, তার সামরিক তাৎপর্য থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। সামরিক শক্তির প্রাধান্য বিচারে নিরপেক্ষবাদের যথার্থ বিচার্য নয়। কিন্তু নিরপেক্ষতা প্রধানতঃ সামরিক চিন্তা, যার মূল্যায়ন নির্ভর করে বিভিন্ন সামরিক শক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েনে কোনো একটি রাষ্ট্রের সামরিক অ-নির্ভরতা।

প্রায়ই নিরপেক্ষতা প্রতিযোগী কোন এক রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সামরিক চাপকে অপর কোন রাষ্ট্র বা অন্য গোষ্ঠীর সীমানা হতে দূরে সরিয়ে রাখে আঞ্চলিক বা মহাদেশীয় রাজনীতির ভারসাম্য অবিকৃত রাখার স্বার্থে। অর্থাৎ সামরিকভাবে বিভিন্ন শক্তি ভোটের মধ্যে সম-দূরত্ব (equi-distance) বজায় রাখে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে ভারত, মিশর, ঘানা ইত্যাদি রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে বিশিষ্ট নিরপেক্ষ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে পেরেছে নিশ্চয়ই তা ইউরোপের নিরপেক্ষতার ঐতিহ্য সমন্বিত সুইজারল্যাণ্ড বা অস্ট্রীয়া বা সুইডেনের সমগোত্রীয় নয়। শেষোক্ত রাষ্ট্রগুলির নিরপেক্ষতা প্রধানতঃ ইউরোপের মহাদেশীয় রাজনীতি-ভিত্তিক, কোন আদর্শগত ঐতিহ্যের দাবী তারা করতে পারে না। গত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সুইজারল্যাণ্ড রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এবং এই শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের সোভিয়েত-মার্কিন রাজনৈতিক প্রভাবের বিপরীতমুখী আবর্তে অস্ট্রীয়ার স্বাধীনতা লাভের কাহিনী তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

নিরপেক্ষবাদের প্রধানতঃ রাজনীতি-ভিত্তিক গুরুত্বের যথার্থ সেই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চিন্তার মূল লক্ষ্য ও ক্রমবিবর্তনের ধারার নিরিখেই একমাত্র বিচার্য্য। সাম্প্রতিক কালের বেলগ্রেড নিরপেক্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্বে কায়রোতে বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। সম্মেলনের আমন্ত্রণলিপি কোন কোন দেশে প্রেরিত হবে সে প্রসঙ্গের আলোচনায় অনেক প্রতিনিধি সৌদি আরব বা মরক্কোর পরিবর্তে মালয়, আয়ার বা সুইডেনের নাম উল্লেখ করেন। কারণ এঁদের বক্তব্য ছিল সৌদি আরব বা মরক্কোতে যখন মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রয়েছে, তখন সেই সমস্ত দেশকে প্রকৃত অর্থে নিরপেক্ষ বলা সঙ্গত নয়। কিন্তু কায়রো সম্মেলনের সংখ্যাগরিষ্ঠ মত হলো যে নিরপেক্ষ সম্মেলনে শুধু সেই সমস্ত দেশকেই আমন্ত্রণ জানানো হবে, যাদের বৈদেশিক নীতি দুই শিবির তত্ত্বের প্রভাবমুক্ত থাকতে সচেষ্ট, যারা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোন সমস্যার পূর্বাপর সম্পর্কযুক্ত ঘটনার বিচারে তৎপর কোন পক্ষপাতদুষ্ট প্রভাবিত চিন্তায় প্রয়াসী নয়, এবং যাদের জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তিতে, প্রসারে এই ধারাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই সব দেশে সামরিক ঘাঁটির অস্তিত্ব আভ্যন্তরীণ রাজনীতির কোন প্রাক্তন দুর্বলতার অবকাশে গঠিত। তারা মোটেই তাদের অনুসৃত নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়! একথা অনস্বীকার্য যে সৌদি-আরবে অথবা মরোক্কোয় মার্কিন সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত হয় এমন এক সময়ে যখন মরোক্কোর প্রকৃত ভাগ্যনিয়ন্তা ছিল ফরাসী

সাম্রাজ্যবাদ এবং মধ্যপ্রাচ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে সৌদি আরবের তৈল সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারে ইবন সাউদ (প্রাক্তন রাজা) ও আমেরিকার স্বার্থ একসূত্রে গ্রথিত। কিন্তু পঞ্চাশের দশকে এশিয়া আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনের ব্যাপকতা এই অঞ্চলের সমগ্র রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যে পরিবর্তন এনেছে তার মধ্যে মরোক্কো ও সৌদি আরবের ভূমিকা সামান্য নয়। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সামরিক ঘাঁটির অস্তিত্ব তাদের সমকালের রাজনীতিকে দুই শিবির তত্ত্বের চিন্তাধারার উৎসাহী অংশীদার করে তুলতে পারেনি। তাই নয়, সমকালীন কোন সমস্যাতেও তাদের কোনশক্তি জোটের প্রতি পরোক্ষ সামরিক নির্ভরতা বা মুখাপেক্ষী মনোভাব প্রকাশিত হয়নি।

কিন্তু তত্ত্বগত রাজনীতির উৎকর্ষের নিরিখে রাষ্ট্রিক সার্বভৌমত্ব এ কালের পৃথিবীতে একমাত্র বৃহৎ শক্তির জীবনধারা ছাড়া অন্য যে কোন দেশের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। আন্তর্জাতিক রাজনীতি-সম্পর্কে সন্দেহ নেই, প্রাক্তন যে কোন যুগের মতোই একালেও, চরম নিয়ামকের ভূমিকায় দাঁড়িযে আছে সামরিক শক্তি। সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে নিরপেক্ষতার যে মূল্যই থাক না কেন, নিরপেক্ষবাদের গুরুত্ব কোথায়? এ প্রশ্ন আরো তীব্র কিন্তু একটু স্বতন্ত্রভাবে, উত্থাপিত হয়েছে যেখানে নিরপেক্ষবাদের প্রতি কটাক্ষ করতেও বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল কোন সংযম বা কুণ্ঠার পরিচয় দেন নি।

পশ্চিম দুনিয়ার রাজনৈতিক সমালোচকদের মতে নিরপেক্ষবাদের সমর্থক রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও বৈদেশিক নীতির মধ্যে সচেতন পার্থক্য এতো বেশি যে তাদের ম্যাকিয়াভেলীর মন্ত্রশিষ্য বলতে কোন বাধা নেই। কারণ তাদের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির মূল ধারাটী প্রায়শই সোভিয়েত প্রদর্শিত সামাজিক তথা অর্থনৈতিক আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির পরিপন্থী। কিন্তু এই উদাহরণ বোধহয় দুর্লভ নয় যে আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যারা তথাকথিত মুক্ত দুনিয়ার মতাদর্শের চরম অনুগামী আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তারাই আবার তার কঠোরতম সমালোচক। অথচ এ সত্য রাজনীতিতত্ত্বের প্রাথমিক বস্তু হিসেবে স্বীকৃত যে, কোন দেশের বৈদেশিক নীতি তার আভ্যন্তরীণ নীতিরই আন্তর্জাতিক প্রতিফলন মাত্র। সুতরাং এই ধারণা থেকে নিরপেক্ষবাদের যে সমস্ত পশ্চিমী ভাষ্য সৃষ্টি হয়েছে তারই পরিচয় মেলে ডালেস প্রমুখ মুক্ত দুনিয়ার আদর্শ-বাদীদের মন্তব্যে যে, নিরপেক্ষবাদ নীতিবিগর্হিত, স্বার্থ-দুষ্ট অনগ্রসর দেশের দুই শিবিরের বাস্তবতায়,

দ্বিপক্ষীয় সুবিধালাভের চরম অপকৌশল মাত্র। নিরপেক্ষবাদের বিচারে, তাই দীর্ঘদিন এই পশ্চিমী মাপকাঠির আদর্শকে ধ্রুবজ্ঞান করা হতো সর্বত্র। নিরপেক্ষবাদের জন্মকালীন আদর্শ ও বাস্তব অবস্থার আলোচনাতেই এর জবাব মিলতে পারে।

॥ চার ॥

নিরপেক্ষবাদের সূত্রপাত ভারতে। কোন বিশিষ্ট রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক আদর্শমুক্ত রাষ্ট্রদের মধ্যে ভারতই প্রথম একদিকে ঔপনিবেশিকতার অনিবার্য অবসানের ইঙ্গিতময় মহাযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি ও অন্যদিকে দুই শিবির তত্ত্বের দ্বন্দ্বের বা স্নায়ু-যুদ্ধের প্রাথমিক পর্য্যায়ে, সুস্পষ্ট বৈদেশিক নীতি নির্দ্ধারণের তাগিদ অনুভব করে। যে কালে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি দুই শিবির তত্ত্বের প্রবক্তা হিসেবে ঔপনিবেশিকতা কায়েম রাখতে তৎপর, সেকালে যে কোন দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের একমাত্র সার্থক লক্ষ্য হলো সর্বতোভাবে স্নায়ুযুদ্ধের প্রভাবমুক্ত থেকে নবলব্ধ স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করা। অন্যথায় কোন শিবিরের প্রতি সামান্য পক্ষপাতের ইঙ্গিতেই সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া এই নবলব্ধ স্বাধীনতাকে বিপর্যস্ত করতে দ্বিধা করবে না। সাম্প্রতিক কালের কংগো সমস্যা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সমাজতন্ত্রী দুনিয়ার প্রচণ্ড সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের যুগে, ১৯৬০ সালে কংগোয় সাম্রাজ্যবাদ যে স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়েছে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ সালে, আমেরিকার তুলনামূলক সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের যুগে, ঔপনিবেশিকতার প্রকাশ যে আরো ভয়াবহ, আরো নৃশংস হবে তাতে সেদিন কোন সন্দেহ ছিলনা। ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদের ১৯৪৯ সালে ইন্দোনেশিয়া পুনরাধিকারের জঘন্য ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ তার যথেষ্ট প্রমাণ দেয়। স্বভাবতই ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ১৯৪৭-১৯৫০ সালে বনিয়াদ গঠনের যুগে অত্যন্ত সঠিক ভাবেই ধারণা করতে পেরেছিল, তার এক মাত্র লক্ষ্য কি হতে পারে। সন্দেহ নেই কাশ্মীর সমস্যার আন্তর্জাতিক চরিত্রটিও অনেকাংশে এই ধারণাকে সুগঠিত করতে সাহায্য করেছে!

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির প্রাথমিক লক্ষ্য হলো তাই সামরিক তাৎপর্য নিহিত সমস্ত সম্পর্ক মুক্ত থাকা বা দুই বিরোধী মহাশক্তির জোটের মধ্যে সম-দূরত্ব বজায় রাখা। অর্থাৎ সেদিন নিরপেক্ষতার সঙ্গে নিরপেক্ষবাদের, এই বিচারে সম্পূর্ণ সঙ্গতি ছিল। কিন্তু পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্ব বা তাৎপর্য এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। ১৯৪৯ সালে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর প্রথম আমেরিকা সফরের সময়ে মার্কিণ কংগ্রেসের এক যৌথ সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা, এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

এশিয়ার ঔপনিবেশিক জগতে সাম্প্রতিক কালের সাম্রাজ্যবাদী নীতির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন : "Where freedom is menaced and justice threatened, India can not be and shall not be neutral." এই ঘোষণায় দ্বিধাহীনভাবে যে কথা বলা হয়েছে তা সার্থকভাবে নিরপেক্ষবাদের কথা।

এই ধারাকে অনুসরণ করে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি কয়েকটি বিশেষ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, সুগঠিত হতে থাকে, যার প্রতিটি আদর্শই এ দশকেও নিরপেক্ষবাদের সুচিন্তিত নীতি হিসেবে স্বীকৃত। সেগুলি হলো প্রথমত এবং প্রধানত সমস্ত পরস্পরবিরোধী আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সামরিক-সম্পর্ক-মুক্ত থাকা ফলতঃ তৃতীয় শিবিরের চিন্তা নিরপেক্ষবাদের সহজাত হতে পারে না। কারণ সামরিক অর্থে নিরপেক্ষ তৃতীয় শিবির গঠন আন্তর্জাতিক রাজনীতির দ্বিপক্ষীয় দ্বন্দ্বে একটা স্বতন্ত্র স্বার্থ বিশিষ্ট তৃতীয় পক্ষের সৃষ্টি করে জটিলতাকেই বাড়িয়ে তুলবে মাত্র, কোন সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ দেখাতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ নিরপেক্ষবাদের লক্ষ্য হলো বিশ্বব্যাপী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের আদর্শে সর্বাঙ্গীন একাত্মিকতা স্থাপন করা অর্থাৎ সক্রিয় সমর্থন করা। তৃতীয়তঃ প্রাক্তন উপনিবেশের মানুষদের প্রতি যেখানে বর্ণবৈষম্যের প্রাচীর তুলে তাদের মানবিক অধিকারকে ব্যাহত করা হয়েছে, তার সর্বাত্মক বিরোধিতা করা। চতুর্থতঃ বিশ্বরাজনীতিতে শক্তি-ভিত্তিক রাষ্ট্রীকমর্য্যাদার স্বীকৃত নীতির পরিবর্তে সর্ব জাতির, সামরিক-শক্তি-নির্বিশেষে সমমর্যাদা ও অধিকার স্থাপন করা। এবং শেষতঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্কে পশ্চিম দুনিয়ার একচ্ছত্র প্রত্যক্ষ এবং এবং পরোক্ষ প্রভাবের অবসান করা।

এই স্বীকৃত লক্ষ্যের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য যে নিরপেক্ষবাদের মধ্যে একদিকে যেমন আছে সামরিক সম্পর্ক-রহিত স্বাধিকার প্রধান অস্তিত্ব রক্ষার তীব্র আগ্রহ (non-involvment) অন্যদিকে তেমনি জোরালো হয়ে আছে সমজাতীয় স্বার্থ রক্ষারও দৃঢ় সংকল্প (involvement)। এই দুটী ধারা পরস্পর-বিরোধী তো নয়ই বরং প্রকৃত অর্থে একে অন্যের পরিপূরক। নিরপেক্ষবাদ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বব্যাপী সার্বিক কল্যাণে, সমস্বার্থের সম্প্রসারণে যে পরিমাণে আগ্রহশীল এরই বিপরীতমুখী নীতির প্রতি ঠিক সেই পরিমাণেই বীতস্পৃহ। পঞ্চাশের দশকে এই দুই ধারার পরিপোষক যে কোন ঘটনায় তার কার্যকারিতার প্রমাণ হয়েছে বহুবার।

॥ পাঁচ ॥

বৈদেশিক নীতিতে নিরপেক্ষবাদের বিশিষ্ট চিন্তার ধারাটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কে দুই শিবিরের মধ্যেই একটী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণার উদ্ভব করেছে। একথা অনস্বীকার্য যে পশ্চিম দুনিয়া বা মুক্ত দুনিয়ার প্রধান অংশের আন্তর্জাতিক স্বার্থ প্রধানতঃ সাম্রাজ্যবাদী। স্বভাবতই পশ্চিম দুনিয়ার সঙ্গে নিরপেক্ষবাদী রাষ্ট্রগুলির বিরোধ, অনিবার্য স্বার্থগত বিরোধ। উপনিবেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে প্রতিহত করতে না পারলে পরিণামে তারই সর্বনাশ। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বিশ্ব-রাজনীতি একটী সত্যকে প্রকট করে তুলেছিল যে উপনিবেশের উপর পশ্চিমের রাজনৈতিক প্রভুত্ব টিঁকিয়ে রাখা কোন মতেই সম্ভব নয়। সুতরাং অধিকার কায়েম রাখার তাগিদে এবং উপনিবেশের অনগ্রসরতার প্রয়োজন সৃষ্টি হলো পরোক্ষ প্রভাব বজায় রাখার কৌশল, যার অপর নাম অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ। আমেরিকা তার অসীম সম্পদ নিয়ে যে ভাবে পশ্চিম দুনিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে, এই নোতুন সাম্রাজ্যবাদী কৌশলে তার ভূমিকা সে কারণেই মুখ্য হয়ে দাঁড়াল। আমেরিকার এই ভূমিকা কোথাও সক্রিয় এবং প্রত্যক্ষ, কোথাও স্বয়ংক্রিয় এবং কোথাও বা পরোক্ষ। এশিয়া আফ্রিকার ঔপনিবেশিক জগতে আমেরিকা পশ্চিম দুনিয়ার অবিসম্বাদী নেতা হিসেবে কোথাও নিষ্ক্রিয় নয়। এই ভূমিকা আমেরিকাকে স্বীয় প্রয়োজনে গ্রহণ করতে হয়েছে, সে প্রয়োজন হলো প্রথমতঃ অর্থনৈতিক এবং দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক।

এ প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা না করে শুধু এই কথা স্মরণীয় যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অসীম ক্ষয়ক্ষতি, অতলান্তিকের অপর পারে আমেরিকার উৎপাদন ব্যবস্থাকে মোটেই স্পর্শ করতে পারেনি তার নিরাপদ দূরত্বের জন্যে। যুদ্ধের অবসানে তার উৎপাদনের পরিমাণ সীমিত করা সম্ভব ছিল না, জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে। তারই বাণিজ্যিক স্বার্থে প্রয়োজন বিদেশে অর্থনৈতিক বাজারের, যেখানে আমেরিকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে অব্যাহত। এশিয়া-আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পশ্চিম ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের চাপে পিছু হঠতে বাধ্য হলে, আমেরিকার অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের ঘটল সুবর্ণ সুযোগ। তা ছাড়া এই সমস্ত অঞ্চলের রণনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন কাঁচামালের অফুরন্ত সম্পদ করায়ত্ত করার লোভও ছিল এরই পাশাপাশি। উদাহরণতঃ উল্লেখ্য হলো মধ্য প্রাচ্যে আইসেনহাওয়ার নীতি।

আর রাজনৈতিক প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুভূত হলো এশিয়া-আফ্রিকার সঙ্গে সমাজতন্ত্রী দুনিয়ার ভৌগোলিক নৈকট্যের বাস্তবতায়। ১৯৪৮ সালে গৃহীত সোভিয়েত দুনিয়ার সীমান্ত সীমিত রাখার নীতি (Truman Doctrine) আমেরিকার এই রাজনৈতিক প্রয়োজনের ইঙ্গিত দেয়। সুতরাং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এই দুই যৌথ প্রয়োজনের তাগিদে এশিয়া-আফ্রিকার রাজনীতিতে আমরিকার সক্রিয় বা প্রত্যক্ষ ভূমিকা দেখা গেল মধ্য প্রাচ্যের তুরস্ক, ইরান, ও সৌদি আরবে, স্বয়ংক্রিয় রূপ দেখা গেল লেবানন আর কংগোয় আর পরোক্ষ ভূমিকা প্রায় সর্বত্র। দুই শতাব্দীর পরাধীনতার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এশিয়া-আফ্রিকার সাধারণ মানুষদের কাছে আমেরিকার এই ভূমিকার স্বরূপ প্রকটিত হতে দেরী হয়নি। অর্থনৈতিক সাহায্যের পরিমাণ ও দ্রুততা (যদিও তাঁবেদের রাষ্ট্রগুলির প্রাপ্ত সাহায্যের পরিমাণ তুলনীয় নয়) কোন কিছুর মাধ্যমেই তার স্বরূপটি ঢেকে রাখা যায়নি। তার সবচেয়ে বড়ো কারণ সোভিয়েত দুনিয়ার এই কালেই এশিয়া-আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলন ও সদ্যমুক্ত দেশগুলির প্রতি অনুসৃত নীতি।

॥ ছয় ॥

এশিয়া-আফ্রিকার দেশে দেশে সোভিয়েতের রাষ্ট্রিক আদর্শ সম্পর্কে শাসক শক্তির প্রতিকূলতা যথেষ্ট ব্যাপক হলেও, একথা সর্বজনস্বীকৃত যে বৈদেশিক নীতির তুলনামূলক বিচারে সোভিয়েত রাষ্ট্র সবচেয়ে জনপ্রিয়। সোভিয়েতের সাম্রাজ্য-বাদবিরোধী অবিচল নীতি, বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব, পশ্চিম দুনিয়ার আধিপত্য খর্ব করে জাতিতে জাতিতে সমমর্যাদার ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহ, এবং পরাধীন দেশের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন, তাকে এশিয়া-আফ্রিকার রাজনীতিতে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা দিয়েছে। সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির এই লক্ষ্যগুলি যে প্রধানত এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের অনুসৃত নীতির সমগোত্রীয়, সেই ধারণাও, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সোভিয়েত ও এই অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে লক্ষ্যগত ঐক্যের ভিত্তি দৃঢ়তর করেছে।

সোভিয়েত-মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতির এশিয়া-আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে বিচার পদ্ধতি ও তাদের ভূমিকাকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করার উপরই নিরপেক্ষ-বাদের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য নির্ভর করে। সেই ধারণা মূলতঃ status quo চিন্তা প্রসূত। ধনতান্ত্রিক মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের status quo চিন্তা স্থিতাবস্থার সমগোত্রীয়, অর্থাৎ যেমনটি আছে ঠিক তেমনই থাক। সোভিয়েতের ধারণা অনুযায়ী status

quoর অর্থ যেমন আছে তেমনই নয়, আভ্যন্তরীণ শক্তি সমূহের ঘাত প্রতিঘাতের দ্বন্দ্বে যে কোন দেশের রাজনীতি, পরিবর্তিত অবস্থায় যে নোতুন রূপ নেবে তাই। স্বভাবতই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে এই পরিপ্রেক্ষিতে এশিয়া-আফ্রিকার দেশে দেশে প্রগতির পরিপন্থী হিসেবেই ধারণা করা স্বাভাবিক। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্পর্কে যারা অবহিত নয়, তাদের মনে হয় আমেরিকার শাসনতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে যে মানবতন্ত্রী মতবাদ একদা স্বীকৃত হয়েছিল, আজকের আমেরিকা তার থেকে বহুদূরে সরে এসেছে, অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের মানবভিত্তিক রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে সচেতন না হওয়া সত্ত্বেও, বিশুদ্ধ বাস্তবতার নিরিখে একথাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে এশিয়া-আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনের সমস্ত পর্য্যায়ে সোভিয়েতের সমাজতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থা তাদের অকৃত্রিম বন্ধু।

একথা অনস্বীকার্য যে সোভিয়েতের অকুণ্ঠ সমর্থন স্বতোৎসারিত না হলে নিরপেক্ষবাদের আন্তর্জাতিক ভূমিকা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া কষ্টসাধ্য ছিল। পঞ্চাশের দশকে পশ্চিম দুনিয়ায় ব্যাপক ডালেস নীতির প্রকোপে এ ধারণাই বদ্ধমূল ছিল যে —those who are not with us are against us. কোরিয়া যুদ্ধের সুরু থেকে, জাতিসংঘে চীন সমস্যা আলোচনার বিভিন্ন পর্বে, সুয়েজ সমস্যায়, ইরাকে, লেবাননে, মরোক্কো, আলজেরিয়া, টিউনিসিয়ায় এবং সাম্প্রতিক কালের কংগো, লাওসে, এই ধারণা বহুবার বহুভাবে প্রকাশিত হয়েছে। নিরপেক্ষবাদের মূল ভূমিকা যে জাতীয় স্বার্থেই যুদ্ধবিরোধী ও শান্তির স্বপক্ষে প্রযুক্ত, এই বাস্তব সত্য, সোভিয়েত ও সমাজতন্ত্রী দুনিয়া ছাড়া অন্য কোথাও সন্দেহাতীত ভাবে গৃহীত হয়নি। অবশ্যই সমাজতন্ত্রী দুনিয়ার মধ্যেও সর্বত্র, নিরপেক্ষবাদ সমানভাবে সমাদৃত হয়নি, বিশেষত সেই সমস্ত অঞ্চলে যাদের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নীতি নির্দ্ধারণের মাপকাঠি বাস্তব অবস্থার চেয়েও অনেকাংশে তত্ত্বচিন্তায় বেশি নির্ভরশীল। স্বভাবতই বিশ্বরাজনীতিতে নিরপেক্ষবাদের মূল্যায়নে তাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত। সন্দেহ নেই যে নিরপেক্ষবাদী বিভিন্ন দেশের জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি প্রধানতঃ ধনতান্ত্রিক, বৈষম্যমূলক এবং শাসক শক্তির আনুকূল্যেই সেই অবস্থা বর্তমান। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিরপেক্ষবাদকে অনেকেরই উদ্দেশ্যমূলক মনে হতে পারে। কিন্তু যেকথা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটী হলো নিরপেক্ষবাদী দেশের পররাষ্ট্র নীতি জাতীয় অর্থনীতি তথা আভ্যন্তরীণ অবস্থার যথাযথ প্রতিফলন নয়। কারণ ক্ষুদ্র, সামরিক শক্তিতে দুর্বল, পৃথিবীর বহুরাষ্ট্র শুধু মাত্র জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রয়োজনে

এবং যুদ্ধের ভয়াবহতা হতে পরিত্রাণ পাওয়ার আন্তরিক আগ্রহেই, অভ্যান্তরীণ অবস্থার গুণগত পরিবর্তন না করে বা পরিবর্তনের বিরোধিতা করেও, নিরপেক্ষবাদী হয়েছে। ফলতঃ শুধু এশিয়া-আফ্রিকা নয়, পৃথিবীর অন্য অঞ্চলেও এমন কি সুদূর লাতিন আমেরিকায় নিরপেক্ষবাদ পররাষ্ট্রনীতির একটী স্বীকৃত লক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হচ্ছে। বর্তমানের বিশ্বরাজনীতিতে এ অবস্থা সম্ভব, সত্য ও একান্ত বাস্তব।

॥ সাত ॥

বেলগ্রেড নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনের পূর্বে এবং পরে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এ ধারণার স্বপক্ষে প্রভূত প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। বার্লিন সমস্যা, দুই জার্মানীর সমস্যা, সোভিয়েতের আণবিক বোমার পরীক্ষা আরম্ভের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বিষয়ে পশ্চিম দুনিয়ার আশা ছিল নিরপেক্ষ সম্মেলন সুস্পষ্টভাবে পশ্চিমকে সমর্থন ও তীব্রভাবে সোভিয়েতের সমালোচনা করবে। কিন্তু কার্যতঃ বেলগ্রেড সম্মেলন বার্লিনে ও দুই জার্মানী সমস্যার বাস্তব অবস্থা বিচারে যে মত প্রকাশ করেছে তাতে পশ্চিমের নীতিকে সমর্থনের কোন লক্ষণই নেই। সোভিয়েতের পরীক্ষা-মূলক আণবিক বিস্ফোরণে উদ্বেগ প্রকাশ করেও সম্মেলন সোভিয়েত নীতির বিরূপ সমালোচনা করেনি বরং শান্তির স্বার্থে দুই বৃহৎ শক্তিকে আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্যে অনুরোধ করেছে। অন্যদিকে যথেষ্ট সংযমের সঙ্গে হলেও ঔপনিবেশিকবাদের বিরুদ্ধে তার তীব্র কঠোর মন্তব্য, পশ্চিম দুনিয়ার চোখে সম্পূর্ণ পশ্চিম-বিরোধী ও সোভিয়েতপন্থী বলে মনে হয়েছে। যার ফলে আমেরিকার সংবাদপত্রে এবং দায়িত্বশীল মহলে নিরপেক্ষবাদের বিরুদ্ধে মন্তব্য ও আমেরিকার বৈদেশিক অর্থনৈতিক সাহায্য নীতি পরিবর্তনের কথাও অনেকে ইঙ্গিত করেছেন।

নিরপেক্ষবাদী দেশগুলি অনুন্নত ও অনগ্রসর। জাতীয় অর্থনীতির ব্যাপক উন্নয়নের তাগিদ তাদের অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু সেই উন্নয়নের প্রাথমিক স্তর শুধু দেশীয় পুঁজির সাহায্যে সম্ভব নয়। বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন তাদের সকলেরই। যুদ্ধের প্রস্তুতিতে সমরাস্ত্র নির্মাণের প্রচেষ্টায় বৈদেশিক সাহায্যের আশা সুদূর পরাহত। বিশ্বশান্তির সার্থক পরিবেশ ছাড়া এই প্রয়োজন মিটবার কোন সম্ভবনা নেই। এ পর্যন্ত যে পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য তারা লাভ করেছে —পূর্ব বা পশ্চিম বা দুয়েরই কাছে, বা অপর্যাপ্ত নয়। কিন্তু কোন এক শক্তি শিবিরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ অন্য শিবিরে

তার প্রতিক্রিয়া সঙ্গত ভাবেই বিপজ্জনক হবে। তাই বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ও বিশ্বশান্তির আদর্শে উদ্দেশ্যগত মিল থাকলেও সম্পূর্ণ সোভিয়েত সাহায্য গ্রহণ তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অন্যদিকে আমেরিকার সাহায্য দান প্রধানতঃ সর্তসাপেক্ষ —সে সর্ত কোথাও স্বপ্রকাশ কোথাও বা সহজেই অনুমেয়। তারই চরম প্রমাণ পাওয়া গেলে বেলগ্রেড্ সম্মেলনের পরে নিউইয়র্ক হেরাল ট্রিবিউন তাই মন্তব্য করেছে যে the uncommitted leaders have adopted the Khruschev line যেমন উল্লেখ্য হলো : "Billions of dollars of foreign aid and military assistance we have lavished on Jugoslavia's Tito, India's Nehru, Ghana's Nkrumah and Inoonesia's Sukarno, to say nothing of Laos and Brazil, is largely an exercise in cutting our own throat" সুতরাং এখন থেকে লক্ষ্য হবে পশ্চিম দুনিয়ার প্রকৃত বন্ধুকে সেই বিচারেই খয়রাতি করা। অন্যথায় তার স্বার্থই বিনষ্ট হবে। যথা : "Henceforth the United States must adopt a new policy on foreign aid. Generous aid and military assistance for our friends and allies, yes ; for neutralists, no. It is now clear that every dolar of foreign aid that goes from the U. S. to the neutralists is a contribution to our own doom." এবং এই প্রতিক্রিয়ার ভরসা হ'লো যে : "A reappraisal of non-alignment here might prompt a reappraisal by the non-commited countries of their own position. This has become overdue in the changing, military and political situation."

এই মন্তব্য সপ্রমাণ করে এশিয়া-আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির কাছে, জাতীয় জীবনের যে ক্ষেত্রে বৈদেশিক নীতির গুরুত্ব কতো বেশি।

॥ আট ॥

বিশ্বরাজনীতির এই পরিপ্রেক্ষিতেই, নিরপেক্ষবাদের আন্তর্জাতিক ভূমিকা বিচার করতে হবে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের তিনভাগের একভাগ আজ নিরপেক্ষবাদী। সুতরাং বিশ্বরাজনীতিতে নিরপেক্ষবাদ একটি ব্যতিক্রম নয়, বরং একটি স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট চিন্তা। যদিও একথা স্বীকার করতে হবে যে নিরপেক্ষ-

বাদীদের মধ্যেও উদ্দেশ্যগত বিচারে চূড়ান্ত ঐক্য নেই। বরং তাদের মধ্যে তিনটি পৃথক সত্তার অস্তিত্ব দেখা যায়, যারা পরস্পরবিরোধী না হয়েও বিশিষ্ট। প্রথমতঃ একটু রক্ষণশীল নিরপেক্ষবাদীরা, যাঁরা শুধু দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে সামরিক অর্থে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলাতেই বেশি আগ্রহী, কিন্তু কোন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করে, নিরপেক্ষবাদের আন্তর্জাতিক ভূমিকাকে গুরুত্বময় করে তোলার সম্পূর্ণ বিরোধী। এই মতের সার্থকদের চোখে নিরপেক্ষতা ও নিরপেক্ষবাদ প্রায় সমর্থক। সুতরাং এই ধারণাকে প্রায় দক্ষিণপন্থী নিরপেক্ষবাদী বলা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত মধ্যপন্থী নিরপেক্ষবাদী যাঁরা সক্রিয়ভাবেই তাঁদের রাজনৈতিক ধারণাকে প্রয়োগ করতে চান বিশ্বরাজনীতির নানা সমস্যায়। কিন্তু কোন দীর্ঘ মেয়াদী, সুপরিকল্পিত-কর্মপদ্ধতি গ্রহণ ও তার ব্যাপক প্রয়োগ প্রচেষ্টায় সক্রিয় অংশ গ্রহণে এরা অনাগ্রহী। কারণ, আশংকা তাতে এই যে সেই সক্রিয়তার আবরণে তৃতীয় শিবিরের ধারণা আরো জোরদার হয়ে উঠবে যা বিশ্বরাজনীতিতে নিরপেক্ষবাদের ভূমিকাকে সীমিত করে দেবে। তৃতীয়তঃ হলো চরমপন্থী নিরপেক্ষবাদীরা, যাঁরা, বিশ্বরাজনীতির যে কোন সমস্যাতেই সক্রিয় অংশ গ্রহণে আগ্রহশীল। যাঁরা আন্তরিক ভাবেই বিশ্বাস করেন যে নিরপেক্ষবাদীদের আন্তর্জাতিক সমস্যায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ শুধু অনিবার্য নয়, একান্ত প্রয়োজনও।

বিশ্লেষণের এই ধারণায় বলা যেতে পারে সিংহল, ব্রাহ্মদেশ, আফগানিস্থান ইত্যাদি রাষ্ট্র রক্ষণশীল নিরপেক্ষবাদী, ভারত মধ্যপন্থী এবং ঘানা, মিশর ও যুগোশ্লাভিয়া চরমপন্থী। কিন্তু প্রসঙ্গতঃ একথাও স্মরণীয় যে এই বিশ্লেষণের ধারাটি স্থিরনির্দিষ্ট নয়। সমস্যার গুরুত্ব, ব্যাপকতার ভিত্তিতে নিরপেক্ষবাদীরা সার্বিক ঐক্য গড়ে তুলতে যে সক্ষম, গত দশকের বহু ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে বহুবার।

নিরপেক্ষবাদের আন্তর্জাতিক ভূমিকার সম্ভাবনার বিচারে তাই একথা বলা যায় যে দুই শিবিরের দ্বন্দ্বের মধ্যে, যেকোন সমস্যার প্রাসঙ্গিক মূল্যায়ন এবং শান্তিকামী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নীতিগত সার্বিক ঐক্য স্থাপন করে, মানুষের স্বপক্ষে তার অনলস প্রচেষ্টাই হবে এর রাজনৈতিক লক্ষ্য। সমকালের পৃথিবীতে বোধহয় অন্য কোন পথ, কোন পক্ষাবলম্বন না করে, আর খোলা নেই।

(৮০ পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু তারা
প্রাচীর, পরিখা, রক্ষী, গুপ্তচর ঘেরা প্রাসাদেও
উন্নিদ্র যেহেতু, তাই ভগ্নসেতু নদীতে নদীতে,
মরু নগরে নগরে।

o o o

অর্থাৎ কৃতান্ত আজ
ব্যক্ত সর্ব ঘটে ; এবং প্রৌঢ়ের কেন, সকলেরই
কর্তব্য যেমন অরণ্যে রোদন, তেমনই সম্প্রতি
সাধ্য লোকালয়ে সে-বৃথা বিলাপ।

(ঐঃ ৪৩ পৃঃ)

আমি বিংশ শতাব্দীর
সমান বয়সী ; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে ; বীর
নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে
নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।

(ঐ ঃ ৪৫ পৃঃ)

এই সর্বব্যাপী বিনাশের সামনে মানুষের সব রকম আস্থাই আজ অবলুপ্ত। অতীত আর ভবিষ্যতের উপর নেই তার বিশ্বাস। বর্তমান ত ভেঙ্গে চুরমার। আদর্শচ্যুত জীবনবিমুখ মানুষের আজ এক অসহায় ত্রিশঙ্কু দশা। সংযতবাক্ ও গম্ভীর-কণ্ঠ সুধীন দত্ত মানুষের এই ত্রিশঙ্কু দশারই করুণ ছবি এঁকেছেন 'সংবর্তে'র বিভিন্ন কবিতায়।

কবিতা হচ্ছে শব্দ, ছন্দ ও ভাবের সমন্বয়। এই সমন্বয় সাধন করতে হলে স্বেচ্ছাচারী হলে চলে না। সব ব্যাপারের মতো লেখায় সংযমও শিক্ষণীয় ও দীর্ঘ অভ্যাস-সাপেক্ষ। কবির এই 'স্বায়ত্তশাসন' আয়ত্তের জন্য সুধীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল সাধনা করেছেন। পৃথিবীর তাবৎ মহৎ কবির কবিতার অধ্যয়ন ত বটেই তার উপর অনেক ভালো ও দুরূহ কবিতা অনুবাদ করে হাত পাকিয়েছেন। বহুকাল ধরে এইভাবে মহৎ কবিদের টেকনিক আয়ত্ত করতে যথেষ্ট একনিষ্ঠার

পরিচয় দিয়েছেন। কবিরা যখন অনুবাদে হাত দেন তখন তাঁরা শুধু অর্থ বা ভাবের জন্য অনুবাদ করেন না। মহত্তর প্রতিভার অধিকারী কবিদের টেক্‌নিক ও রচনা রীতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া, তার পরীক্ষা-নিরীক্ষাও থাকে তাঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে পশ্চিম বঙ্গের প্রতিভাবান ও সিদ্ধহস্ত প্রায় সব আধুনিক কবিই কিছু না কিছু অনুবাদে হাত দিয়েছেন। পূর্ব-পাকিস্তানে কবির কোন অভাব নেই বরং সংখ্যানুপাতে তাঁরাই বোধ করি বেশী হবেন, তবুও দেখে আশ্চর্য হতে হয় এঁদের কেউ-ই ধারাবাহিক ভাবে ও নিষ্ঠার সঙ্গে অনুবাদে হাত দেননি (অবশ্য কারো কারো মনে এমন অদ্ভুত ধারণা থাকাও বিচিত্র নয় যে এ করলে তাঁরা তাঁদের মৌলিকতা হারিয়ে বসবেন।) ফলে বিদেশী প্রাচীন কি আধুনিক কোন কাব্যেরই অনুবাদ হয়নি পূর্ব-পাকিস্থানে। এ-ও আমাদের সাহিত্যের আর একটা দুর্বলতার দিক।

সুধীন্দ্রনাথ ইংরেজি, ফরাসী ও জার্মান থেকে অনেকগুলো কবিতা অনুবাদ করেছেন। তাঁর 'প্রতিধ্বনি' বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য অনুবাদ গ্রন্থ। সংখ্যার দিক্ দিয়ে তিনি শেক্সপিয়রের সনেটই বেশী করে অনুবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন 'আত্মশাসন আয়ত্তের জন্যই তিনি অনুবাদ কাজে হাত দিয়েছিলেন।' আত্মশাসনের জন্য সনেট যে সর্বোত্তম তাতে সন্দেহ নেই। ভাব, ভাষা ও ছন্দের সংযত ও সংহত কাঠিন্য ছাড়া উৎকৃষ্ট সনেট হতে পারে না। যে কোন কবির জন্য এই গুণগুলি অনুকরণীয়। তবে মনে হয় অনুবাদে সুধীন্দ্রনাথ মূলের প্রতি তেমন নিষ্ঠা দেখাননি। এই প্রসঙ্গে তিনি অবশ্য বলেছেন: "...ভাব ও ভাষার অবিচ্ছেদ্য সমীকরণই যে কবির একমাত্র কর্তব্য, এ সত্যে পৌঁছতে আমার অর্ধেক জীবন কেটে গেলেও, অপরীক্ষিত আত্মবিশ্বাসের প্রথম যুগেই আমি বুঝেছিলুম যে বঙ্গানুবাদ যখন বাঙালীদেরই পাঠ্য তখন তার বিচারে বঙ্গীয় আদর্শের বিধি-নিষেধ অকার্য।" তবুও প্রশ্ন থেকে যায় পাঠকের সন্তুষ্টির জন্য মূল লেখককে বদল করার অধিকার অনুবাদকের আছে কিনা? এতে মূল লেখককে কিছুটা বিকৃত করা হয় না কি?

শেক্সপিয়রের ত্রিশ নম্বর সনেটের শেষ দুই পঙক্তি হচ্ছে:

> But if the while I think on thee, dear friend,
> All losses are restored, and sorrows end.

সুধীন্দ্রনাথ এই দুই লাইনের অনুবাদ করেছেন এই ভাবে :

কিন্তু যদি দৈবক্রমে মনে পড়ে তখন তোমায়,
তবে, বন্ধু, কষ্ট কাটে। সব ক্ষতি লাভে লয় পায়॥

এখানে if the while-এর অনুবাদ 'দৈবক্রমে' দূর কল্পনা বলেই আমার ধারণা। আমার বিশ্বাস শেষ পঙক্তির অনুবাদ আরো দুর্বল ও তাতে অর্থসঙ্গতি হয়েছে ক্ষুণ্ণ। 'কষ্ট কাটে'র দ্বারা 'All losses are restored' অথবা 'ক্ষতি' দিয়ে 'Sorrow'র অর্থ কিছুতেই পূরণ হয় না। মোট কথা সুধীন্দ্রনাথের অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রেই স্বাধীন ও মুক্ত। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর অনুবাদ তাঁর মূল রচনার মতোই হয়েছে উপভোগ্য। যেমন হাইনের 'গোধূলি'। তার প্রথম স্তবকটি এখানে উদ্ধৃত হলো :

মাঝি-মাল্লার বৈকালী সভা :
আকাশ, বাতাস গোধূলি মাখে :
তার পাশে ব'সে, বাহিরে তাকাই,
যেখানে সিন্ধু অসীমে ডাকে॥

এ সব রচনা অনুবাদ বলে বুঝবার উপায় নেই। কোন কোন স্তবকে এদেশীয় চিত্রকল্প ও উপমা এমন ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে পাঠক বুঝতেই পারবে না এ কবিতার সঙ্গে বিদেশের তথা বিদেশী কাব্য-ঐতিহ্যের কোন সম্পর্ক আছে। যেমন এই কবিতাটির পঞ্চম স্তবক :

স্রোতে প্রতিভাত লক্ষ মণিক,
মত্তমলয় বকুল বনে
গঙ্গার তীরে সৌম্যপুরুষ
সমাধিলগ্ন পদ্মাসনে॥

শব্দগত অনুবাদে বিশ্বাসী না হয়েও অনুবাদে মূল রচনার অর্থ-সীমাকে ইচ্ছা মতো ডিঙিয়ে যাওয়া আমি কাম্য ও মূল লেখকদের প্রতি সুবিচার বলে মনে করি না। সুধীন্দ্রনাথের বহু অনুবাদের গায়ে অনুবাদের লক্ষণ নিশ্চিহ্ন। মূল ভাবের গায়ে হাত না পড়লেও এটাকে নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় বলতে হবে। ফিটজারল্ড্ থেকে আরম্ভ করে অনেকেই এই করে এসেছেন তাতে সন্দেহ নেই। তবুও অনুবাদের ক্ষেত্রে এই রীতি শ্রদ্ধেয় কি না এ বিষয় আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অনুবাদকের কৃতিত্ব পরীক্ষা করে দেখার চেয়েও মূল লেখকের সঙ্গে তথা

তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচয় করাই অনুবাদ পাঠকের লক্ষ্য থাকে বেশী করে। তাই আমি বিকৃত, খণ্ডিত বা পরিবর্দ্ধিত অনুবাদের পক্ষপাতী নই। সুধীন্দ্রনাথের সব অনুবাদ মিলিয়ে দেখার সুযোগ আমার হয়নি। জার্মেন ও ফরাসী কবিতা মিলিয়ে দেখার যোগ্যতাই আমার নেই কিন্তু শেক্সপিয়রের যে কয়টা সনেট মিলিয়ে দেখেছি তাতে মনে হয়েছে সুধীন্দ্রনাথ অনুবাদেও তাঁর নিজস্ব টেকনিক ও রচনারীতি অনুসরণ করতে গিয়ে মূলকে কোথাও কোথাও ছাড়িয়ে গেছেন, ফলে কোথাও মূলের অর্থ-সঙ্কোচন, কোথাও বা অর্থ-ব্যাপ্তি ঘটেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলা শব্দের অর্থ-সংকীর্ণতাও অবশ্য তার জন্য দায়ী। যেমন ইংরেজী 'Sorrow' শব্দের যতখানি অর্থ-ব্যাপ্তি তার প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলা দুঃখ, ক্ষতি বা শোক এককভাবে ততখানি অর্থ-ব্যাপ্তি ঘটাতে পারে না।

অন্য সব ক্ষেত্রের মতো আজ আমরা সাহিত্যেও যেন বিশেষজ্ঞের যুগে এসে পড়েছি। বিশেষজ্ঞ না হলে আজ যেমন ভালো কবি হওয়া যায় না তেমনি হওয়া যায় না সৎ পাঠক তথা সমঝদার পাঠক। এ যুগের কবিদের মধ্যে সেরা বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন টি, এস, এলিয়ট। আর কে না জানে বিশেষজ্ঞ না হলে তাঁর কবিতার মর্মে প্রবেশ কি রকম দুঃসাধ্য। আমি আমার এই আলোচনার কয়েক জায়গায় এলিয়টের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করেছি তার কারণ জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত উভয়েই এলিয়টের সমধর্মা কবি। বিশেষ করে ঐতিহ্য-সচেতনতার দিক থেকে। বাংলা কবিতার ঐতিহ্য, পাঠক যার সঙ্গে চিরপরিচিত—তার থেকে এঁদের কবিতা কিছুটা নয়, অনেকটাই ভিন্নতর। তাই এঁদের কবিতা বুঝতে, এখন শুধু বাংলা কবিতার ঐতিহ্য-পরিচিত, সব ক্ষেত্রে হালে পানি পাচ্ছে না। এখন তাবৎ সভ্য দেশের কবিতার ঐতিহ্য আমাদের কাব্যে অনুপ্রবেশ করেছে। হালের এই আন্তর্জাতিক ঐতিহ্য যতদিন না আমাদের মনমানসে ও রক্তে প্রবেশ করে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যে পরিণত হচ্ছে ততদিন আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ থেকে যাবেই। অবনীন্দ্রনাথ যখন পশ্চিমী শিল্পরীতি ছেড়ে ভারতীয় তথা মোগল চিত্র-কলা পদ্ধতিতে ছবি আঁকতে শুরু করেন, তখনো এমনতরো অভিযোগ উঠেছিল। শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ কিছু এমন নতুন কথা নয়। কিন্তু শিল্পী ও কবির পক্ষে এই অভিযোগের একমাত্র উত্তর হচ্ছে: এগিয়ে চল, এগিয়ে চল! চরৈবেতি, চরৈবেতি।

পূর্ববঙ্গের বিশিষ্ট মাসিক সমকাল (ভাদ্র ১৩৬৭) থেকে।

সার্ত্রের দর্শন ঃ অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা

মৃণালকান্তি ভদ্র

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ অস্তিবাদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। যুক্তির যান্ত্রিকতা আমাদের জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং হেগেল যুক্তি শৃঙ্খলাবদ্ধ যে জগতের রূপ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাতে মানুষের জীবনের স্বকীয় অনুভূতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। স্পিনোজার বিরুদ্ধে যে যুক্তি প্রয়োগ করা হয়, যে মানুষের স্বাধীনতাকে তিনি মিথ্যা মায়ায় রূপান্তরিত করেছিলেন, হেগেলের বিরুদ্ধেও সেই যুক্তি দেওয়া চলে। তিনিও বল্‌তে চেয়েছেন, ব্যক্তি-মানুষ সার্বিক সত্তার প্রকাশ, সুতরাং সত্যকারের স্বাধীনতা সার্বিক সত্তারই আছে, মানুষের নেই। কিরকেগার্ড হেগেলের এই মতবাদকে মনে করেছেন যুক্তির যান্ত্রিকতা। হেগেলের এই যুক্তি-বদ্ধ মানুষকে দূরে সরিয়ে ব্যক্তি মানুষের স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপকে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি আগ্রহী ছিলেন। তিনি বলেছেন, মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই রচনা করে এবং স্বাধীনতা-চেতনাকে বাদ দিয়ে মানুষের স্বরূপ বোঝা যাবে না। হাইডেগার দুই স্তরের মানব-জীবনের কথা বলেছেন। আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবন নিয়ম-শৃঙ্খলায় বদ্ধ। তাই হোল আমাদেই অপ্রকৃত (inauthentic) অস্তিত্ব। এবং এই অস্তিত্বে আমরা কেবলমাত্র সাধারণ 'একজন', এই অস্তিত্বে আমার প্রকৃত পরিচয় নেই। কিন্তু যখন জীবনের কোন সমস্যার সম্মুখীন হই, উদ্বেগের শিহরণ অনুভব করি, তখন রোজকার পরিচিত মুখোস দূরে সরে যায়। আমরা আমাদের প্রকৃত অস্তিত্বের (authentic exispence) স্বরূপ উপলব্ধি করি এবং সেই মুহূর্তে আমাদের স্বাধীনতা প্রতিভাত হয়। তখনই মনে হয়, জীবনে যা কিছু করতে চাই, সব কিছুর জন্য দায়িত্ব আমার। যে সমস্ত বিভিন্ন পথ আমার সামনে রয়েছে, তার যে কোন একটিকে গ্রহণ করবার স্বাধীনতা আমার আছে। কিন্তু স্বাধীনতা আর অস্তিত্ব মিশে একাকার হয়েছে সার্ত্রের দর্শনে। তিনি হাইডেগারের মত একথা বলেন নি, একটি বিশেষ অবস্থায় আমাদের স্বাধীনতা-চেতনা অনুভব হয়। তিনি বরং বলেছেন,

অস্তিত্বের প্রথম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ স্বাধীন। মানুষের অস্তিত্ব আর স্বাধীনতা দুই-ই এক, কেননা স্বাধীনতা আছে বলেই এই জাতের রূপ সম্ভব। জগৎ এমনিতে জড়, কিন্তু তাতে যে পরিবর্তন হচ্ছে, তা মানুষের দ্বারা। মানুষ সেই পরিবর্তনকে সাধিত করতে পারছে, কারণ তার ব্যক্তিগত রূপ হচ্ছে পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। পরিবর্তনের ক্ষমতার মূলে রয়েছে তার স্বাধীনতা, তাই মানুষের অস্তিত্ব এবং স্বাধীনতা অভিন্ন। সার্ত্র তাই বলেছেন, "Iam condemned to be free, This means that no limits to my freedon can be found except freedom itself or if you prefer, that we are not free to cease being free." অন্যত্র বলেছেন, "Man cannot be sometimes slave and sometimes free, he is wholly and for ever free or he is not free at all." সার্তের দর্শনে স্বাধীনতার স্বরূপ আলোচনা করতে হলে প্রথমেই মানুষের অস্তিত্বের অবতারণা করতে হবে। তাই প্রথমে আমরা সার্ত্র কি-ভাবে অস্তিত্বের বিশ্লেষণ করেছেন তার আলোচনা করে, তারপর সেই অস্তিত্বও স্বাধীনতার কি সম্পর্ক তাই দেখাবার চেষ্টা করব।

সার্ত্র তাঁর প্রথম উপন্যাস Nausea তে প্রথম মানুষের-অস্তিত্বের করুণ ও হতাশার দিকটা তুলে ধরেন। অনেকে মনে করেন, এই উপন্যাসে তিনি মানুষের অস্তিত্বের অর্থহীনতা ও অসারতা ঘোষণা করেন, কারণ পৃথিবীর বস্তুকুণ্ডের মত অনড়, অচল মানুষ নয়। তবুও জীবনের কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছে না এই উপন্যাসের নায়ক, কিন্তু তার অস্তিত্বই আবার তার কাছে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ। এই জগতের মানুষ নিজের অস্তিত্বের উপর দাঁড়িয়ে এমন একটা কিছু আগে থেকে ঠিক করতে পারে না, যা তার জীবনকে অর্থ-মণ্ডিত করে তুলবে। মানুষ যা স্থির করেছে, তা সে নিজের স্বাধীন চিন্তায় করেছে কিন্তু কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় জীবনকে বাঁধা যায় না কারণ যা সে স্থির করেছে, তা সফল হবে এমনকোন কথা নেই। তাই অস্তিত্ব নিয়ে অহরহ দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ। Roquentin বলছে "I exist. Its sweet, so sickly sweet so slow. Sweet, soft sweetness," কিন্তু আবার এই অস্তিত্ব থেকে সে মুক্তিলাভ করতে পারছে না। জগতের বস্তুতে অর্থ আরোপ করে মানুষ তাকে নিজের করে নেয়। কিন্তু যখন এই সব অর্থ থেকে মুক্ত করে জগতের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায়, তখন দেখা যায়, জগৎ হচ্ছে "Soft and

monstrous masses. disorderly and bare in a terrifying and obscene nakedness" এইভাবে জগৎ ও মানুষ দুই-ই অর্থহীন অস্তিত্বের বোঝা নিয়ে বেড়াচ্ছে। অস্তিত্বের এই নৈরাশ্যের দিকই সার্ত্র তার প্রথম উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ফিলিপ থডি বলেছেন, সার্তের মতে "Man has no destiny or privileged position and not even the consciousness which he has of himself. None save him from the universal absurdity of all things" অস্তিত্বের এই বিষণ্ণ দিকের কথা সার্ত্র তাঁর অন্যান্য সমস্ত বইতে উল্লেখ করেছেন। তবে Nauseaতে ব্যক্তির অর্থহীন অস্তিত্বের অনুভূতি যত প্রবল, তাঁর বিরাট দার্শনিক গ্রন্থ Being and Nothingness এ তত প্রবল নয়। অবশ্য সেখানেও আছে, চেতনা স্বাধীন হলেও মানুষের অস্তিত্বের এমন একটি দিক আছে, যা তার দেহের দিক, তার জন্য অস্তিত্ব সার্বভৌম হতে পারছে না। দেহের অস্তিত্ব আমার দ্বারা হতে পারে না, অথচ দেহের সমস্ত কার্যাবলীর দায়িত্ব আমার দেহই অস্তিত্বকে বস্তু-সদৃশ করে তুলেছে। ফলে দেহের সংস্পর্শে অস্তিত্বের জুগুপ্সা আমাদের ক্লিন্ন করে। সার্ত্রের কথায় "A dull and inescapabale nausea perpetually reveals my body to my consciousness" কিন্তু Nauseaতে সার্ত্র অস্তিত্বের যে অর্থহীন দিক তুলে ধরেছেন, তাই শেষ কথা নয়। পৃথিবীতে কেন আমরা জন্ম গ্রহণ করি, কেনই বা অন্য সব বস্তু পৃথিবীতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে, তার হয়ত সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু অস্তিত্বের পরে নিজের জীবনকে গড়ে তোলার দায়িত্ব মানুষের নিজের, বস্তুময় পৃথিবীকে মানুষ নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। এবং সেখানে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাই অস্তিত্বের অর্থহীনতাকে অতিক্রম করে মানুষ কতখানি তার নিজের জীবন গড়ে তুলতে পারে, সেই আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। Being and Nothingness প্রধানতঃ তারই বিশ্লেষণ।

সমগ্র সত্তাকে সার্ত্র দু'ভাগে ভাগ করেছেন—চেতনা এবং জড় এবং বিশেষ ভাবে এদের অভিহিত করেছেন for-itself ও in-itself নামে। মানুষ নিজের চেতনা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ এবং এদিক দিয়ে সার্ত্র দেকার্তকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু তিনি আরও একটু এগিয়েছেন এবং বলতে চেয়েছেন, শুধু চেতনা কখনই সম্ভব নয়। চেতনা অর্থই হোল কোন

কিছুর জন্য চেতনা। অতএব, চেতনার উপলব্ধিতে সমগ্র সত্তার দুটো দিকের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। মানুষের অস্তিত্ব চেতনা থেকে অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং অস্তিত্ব বুঝতে হলে চেতনাকে ভালভাবে উপলব্ধি করা দরকার। আমাদের চেতনায় আমরা বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হই। এখন এই বস্তু কি? সার্ত বলছেন, বস্তুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল বস্তু শুধু আছে, বস্তু সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় কিছুই নয়, কারণ ক্রিয়া বা কাজের তাৎপর্য মানুষের সম্পর্কে বোঝা যায়। বস্তু আপনা আপনিতে পরিপূর্ণ, এর মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই, কেননা পরিবর্তন আসতে পারে কোন চেতনার দ্বারা। সুতরাং বস্তু স্বয়ং সম্পূর্ণ, বা in-itself এবং বস্তুর এই পরিচয় হচ্ছে, সত্তার একটি ভাগ। অপর ভাগ হচ্ছে চেতনা, কিন্তু বস্তুর বেলায় সার্ত্র যেমন একটি অস্তি-বাচক সংজ্ঞা দিতে পেরেছেন, চেতনার বেলায় তা পারছেন না। তিনি বলছেন, চেতনার সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হোল চেতনা বস্তু নয়। বস্তুর কোন পরিবর্তন নেই, নিজের আয়তনে পূর্ণ বস্তুর কোন সম্ভাবনা নেই। তাই বস্তু হচ্ছে "uncreated, whithout reason for being, without any relation whit another being, being-in-itself is de trop eternity কিন্তু চেতনার সম্ভাবনা অপরিমিত, চেতনা আপনার মধ্যে নিবদ্ধ থাকতে পারছেনা। চেতনাকে সার্ত্র তাই বলছেন, যা আসল রূপ নয়, চেতনা তাই, আবার প্রতিমুহূর্তে চেতনাকে আমরা যা দেখছি, চেতনা তা নয়। সেই জন্য চেতনা সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত উক্তি "consciousness is what it is not and not what it is" চেতনাকে নিজের সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে এবং যতক্ষণ সেই সম্ভাবনা পরিপূর্ণতা লাভ করছেন, ততক্ষণ চেতনার আসল রূপ প্রকাশিত হচ্ছেনা। অতএব চেতনা যা, তা নয়। আবার, প্রতিমুহূর্তে চেতনার যে রূপ পাচ্ছি, তা চেতনার সত্যকার রূপ নয় বলে, চেতনা তাই নয়, যা চেতনা বলতে বোঝায়। চেতনা সম্বন্ধে সার্তের এই বক্তব্য হেয়ালির মত শোনালেও, আসলে তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তাহোল, চেতনা নিজের সম্ভাবনাকে লাভ করে তবে সার্থকতা লাভ করতে পারে। জীবনের পরম উদ্দেশ্যের দিকেই চেতনার অগ্রগতি। রোজকার চেতনায় সে উদ্দেশ্য অনায়ত্ত বলে, চেতনাকে অর্থহীন বলে মনে হয়। কিন্তু তাই বলে চেতনা চুপ করে বসে নেই। স্বীয় উদ্দেশ্যকে লাভ করার জন্য নিরন্তর তার অভিযাত্রা।

মানুষের অস্তিত্বের মূলমন্ত্র হচ্ছে নেতি (Nothingness)। আমরা যখন জগতে কোন বস্তুকে অস্তিত্বহীন বলে ভাবি, তখন তার অনস্তিত্বের মূলে রয়েছে আমাদের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী। একটি বস্তু নেই অর্থ, কোন মানুষ বা ব্যক্তি কি তার মধ্যে নেই এবং কি হলে সেই বস্তু পরিপূর্ণ হতে পারে, সেই দৃষ্টি থেকে দেখে। ধরা যাক, একজন লোককে আমি খুঁজতে গেছি এবং যেখানে তাকে খুঁজছি সেখানে সে নেই। এই লোকটির একটি বিশেষ জায়গায় অস্তিত্বহীনতা আমার উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। পৃথিবীতে অনেক বস্তুই হয়ত অস্তিত্বহীন হতে পারে, কিন্তু মানবিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত না হলে কেউ সব অস্তিত্বহীনতার তাৎপর্য আমরা বুঝতে পারিনে অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে সেগুলি বিমূর্ত ধারণা হয়ে পড়ে। কিন্তু অস্তিত্বহীনতা বিমূর্ত নয়, বা নেহাৎ ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। সার্ত্র বলছেন, পিয়েরকে যখন আমি কাফেতে খুঁজছি এবং দেখতে পাচ্ছিনা, তখন তার অস্তিত্বহীনতা সম্বন্ধে আমার উপলব্ধি হচ্ছে। অতএব, অস্তিত্বহীনতা বাস্তব। কিন্তু ব্যক্তি তার বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া এই অস্তিত্বহীনতাকে আবিষ্কার করতে পারছেনা। তাই, ব্যক্তি বাস্তব জগতে অস্তিত্বহীনতাকে আমদানী করছে। কিন্তু তাই বলে, অস্তিত্বহীনতা অবাস্তব নয়। এইভাবে সার্ত্র দেখাচ্ছেন, ব্যক্তি-চেতনা জগতে বস্তুর অস্তিত্বহীনতার ভিত্তি, কিন্তু সেই ঘটনা বাস্তব জগতে ঘটছে বলে তা যথার্থ। সার্ত্র বলছেন, "But, to be exact, I myself expected to see Pierre to happen as a real event concerning this cafe. Itis objective that I have discovered this absence and it presents itself as a synthetic relationship between Pierre and the setting in which I am lookingfor him" অস্তিত্বহীনতার এই ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যাচ্ছে, চেতনাই সত্তার জগতে নেতিকে আনয়ন করছে। এবং যেহেতু চেতনা সত্তার জগতের অংশ, এই জন্য সার্ত্র বলছেন, নেতিই পরিবর্তনের হেতু, আর পরিবর্তন সত্তার অন্তরে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। অনেক দার্শনিক, সত্তাকে অপরিবর্তনীয় বলে মনে করেন, আবার অনেক সত্তাকে পরিবর্তনশীল হিসাবে দেখেন। কিন্তু সার্ত্র অপরিবর্তনীয়ের মূলে হচ্ছে চেতনার নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য। প্রথমে চেতনার যে বৈশিষ্ট্য আমরা আলোচনা করছি, তাতে দেখান হয়েছে, চেতনা নেতিমূলক। চেতনার এই নেতিতত্ত্ব সার্ত্রের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী।

চেতনা কেন নেতিমূলক? না, চেতনার বৈশিষ্ট্য প্রশ্নের দিক দিয়ে বোঝা যেতে পারে। আমাকে যখন কোন প্রশ্ন করা হচ্ছে, তখন তার সঙ্গে একটি প্রত্যাশা থাকে এবং সব সময় সেই প্রত্যাশার বিপরীত সম্বন্ধে আশঙ্কা থাকে। অর্থাৎ যা, উত্তর, তা না হয়ে উত্তর অন্য কিছু হতে পারে। এইভাবে প্রতিমুহূর্তে চেতনার সামনে রয়েছে অসীম সম্ভবনা, এবং তার কোন একটি সত্য হতে পারে। অতএব, চেতনার এই প্রশ্ন-উত্তরের ভূমিকা থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারছি, চেতনা নেতিবাচক। এই নেতিবিশিষ্টতার জন্যই বাস্তব জগতে অস্তিত্বহীনতা আসতে পারছে। অতএব, চেতনা বা আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দুটি বিশিষ্টতা জানা গেল (১) চেতনা নেতিমূলক, (২) নেতিমূলক বলেই বাস্তব জগতে প্রত্যাশার ভিত্তিতে বস্তুর অস্তিহীনতা ঘটাতে পারছে।

চেতনা নিজেই নেতিবাচক বলে জগতে বস্তুর অভাবের কারণ হচ্ছে। সার্ত বলেছেন, "The being by which nothingness comes to the world must be its own nothingness" এখন চেতনার নিজস্ব এই অনস্তিত্ব কি? সাত্রে'র মতে, চেতনা কোন মুহূর্তে স্থির নেই। জন্ম-মুহূর্ত থেকেই চেতনার একটি পরম উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্যক সিদ্ধ করবার জন্য চেতনা এগিয়ে চলেছে। এই কারণে, বর্তমান চেতনা অতীত থেকে নিজেকে পৃথক করছে অবশ্য একেবারে পৃথক হতে পারে না, কারণ অতীত চেতনাকে বন্ধনমুক্ত করেই বর্তমানের চেতনা উদ্ভব হচ্ছে। আমি অতীতে যা ছিলাম, তা একেবারে আমার বর্তমান থেকে আলাদা হতে পারে না, কারণ আমার অতীত জীবনের ঘটনা আমাকে এখনও প্রভাবিত করছে। সেইজন্য বলা যায়, অতীতকে অতিক্রম করে বর্তমানের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে আমরা এগিয়ে যাই। অতীতের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ চেতনার বিশিষ্টতা, অতীতকে ধ্বংস করেই বর্তমানের আবির্ভাব। এই অতীতকে ধ্বংস করবার কাজে চেতনা নিজের স্বাধীনতা অনুভব করে। চেতনার সম্বন্ধে এতক্ষণ যে নেতিবাচক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার অবসান ঘটে এই স্বাধীনতার অনুভূতিতে। স্বাধীনতার অনুভূতির মধ্য দিয়েই চেতনা আপনার অস্তিত্ব অনুভব করে।

সাত্র' বলছেন, "Itis in anguish that man gets the consciousness of freedom" এই anguish বা উদ্বেগ কি? সাত্র' একে ভীতি বলতে

রাজী নন, কেননা ভয়ে বাইরের বস্তু আমাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করছো আমার সামনে যদি একটি বাঘ এসে উপস্থিত হয় এবং আমার পালানোর কোন পথ না থাকে, তাহলে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়, তাই হচ্ছে ভয়। এখানে কোন কর্মপদ্ধতি স্থির করতে আমার স্বাধীনতার প্রয়োজন হচ্ছেনা। আমি যে পরিবেশে রয়েছি, তা আমার সহযোগিতা ছাড়াই বাইরের বস্তুর দ্বারা পরিবর্তিত হচ্ছে কিন্তু পরিবেশ এমন হতে পারে, যে আমার কিছু করবার স্বাধীনতা আছে, অথচ যা আমি করছি তার উপর বা আমার নিজের উপর আমি আস্থা স্থাপন করতে পারছি না, এ রকম ঘটনা ঘট্‌লে তাকে সার্ত্র উদ্বেগের অবস্থা বল্‌তে রাজী আছেন। ধরা যাক, একটা সরু পথ দিয়ে আমি খাড়াই পাহাড়ে উঠ্‌ছি। পথের দুপাশে কোন রেলিং নেই, যার ফলে পতন থেকে আত্মরক্ষা করা যেতে পারে। যে কোন মুহূর্তে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। এই ভয়ের সাম্‌নে আমার নিজেকে অক্ষম মনে হচ্ছে, কিন্তু এই ভয় থেকে উদ্ধার পাবার জন্য আমি কতকগুলি কাজ করতে পারি, যেমন সাবধানে চলতে পারি পাথরে যাতে, হোঁচট্ না খাই তার জন্য সেদিকে দৃষ্টি রাখ্‌তে পারি। এই কাজগুলি আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু এই কাজগুলি আমি করতে পারবই এমন কোন নিশ্চয়তা নেই অতএব, এগুলি সম্ভবনা মাত্র। বাস্তব জগতে একটি পদার্থকে আঘাত করলে সে তার ভার ও আয়তন অনুযায়ী অপর পদার্থকে কি ভাবে আঘাত করবে, এটা নিশ্চিতভাবে জানা যায়। কিন্তু চেতনার বেলায় স্বাধীনতা থাকার জন্য প্রতি মুহূর্তেই অনিশ্চয়তা আছে। তাই আমি যেমন ঐ কাজগুলির উৎপত্তিস্থল, আবার তেমনি তাদের বিনাশও ঘটতে পারে। এই অবস্থা হোল উদ্বেগ এবং যেহেতু আমি কোনো একটি বিশেষ কাজ করতে মানা করতে পারি, সেইজন্য উদ্বেগের মাধ্যমেই স্বাধীনতা অনুভূত হচ্ছে। আমাকে বাঁচাতে পারে এমন কোন নিশ্চিত ঘটনাও যেমন নেই, তেমনি আমাকে বিনষ্ট করবেই, এমন কোন ঘটনাও নেই। এই অনিশ্চয়তাই আমার স্বাধীনতা।

প্রশ্ন হতে পারে, স্বাধীনতা যদি চেতনার অচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য হয় এবং এই স্বাধীনতার অনুভূতি উদ্বেগের মধ্য দিয়ে হয়, তাহলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সব সময় এই উদ্বেগ অনুভব করিনা কেন? উত্তরে বলা যেতে পারে, প্রতিদিনকার জীবনে আমাদের চেতনা থাকে বহির্মুখী

এবং বিশেষ একটি মুহূর্তের উদ্দেশ্যের সংশ্লিষ্ট থাকে। সেই বিশেষ উদ্দেশ্য আমাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু, চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা সকল সময় সচেতন থাকি না। ফলে বিশেষ উদ্দেশ্যকে বাইরের বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করে দেখি এবং আপাতদৃষ্টিতে সেই বিশেষ উদ্দেশ্য আমাদের গভীরভাবে নাড়া দেয় না বলে উদ্বেগ অনুভব করি না। বহির্মুখী চেতনার জন্যও আমাদের চেতনাকে অনেকটা নিশ্চিত মনে হয় এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীও হয় বাস্তবযুগ। যেমন, এই লাইনটা লেখা এটি আমার বর্তমান ক্ষণের উদ্দেশ্য এবং এখানে লাইনের প্রথম কথাটি লাইনের শেষ নিয়ন্ত্রিত করছে। এখানে আমার উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্বন্ধে খুব একটা অনিশ্চয়তা নেই। কিন্তু এই লাইনটি আমার এই প্রবন্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং প্রবন্ধের সঙ্গে আমার গবেষণার গভীর সম্পর্ক আছে। তার সঙ্গে আবার আমার জীবনের সফলতার জড়িত। এখন এই প্রবন্ধ শেষ হবে কিনা বলা শক্ত, গবেষণার ক্ষেত্রেও অনিশ্চয়তা এবং জীবনে সফলতার কথা আরও অনিশ্রিত। এইভাবে, প্রতিটি মুহূর্তের কাজকে জীবনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দেখলে উদ্বেগ ধরা পড়বে। প্রথমেই উদ্বেগ ধরা পড়ছে না, কিন্তু যতক্ষণ না উদ্বেগ অনুভব করছি, ততক্ষণ নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারছি না, কেননা উদ্বেগের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতা প্রকাশিত হচ্ছে। সেইজন্য, বলা যেতে পারে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা আপাতদৃষ্টিতে উদ্বেগ শূন্য এবং স্বাধীনতাচেতনাহীন। কিন্তু যখনই জীবনে সমস্যা আসে, কি করতে হবে স্থির করতে হবে এবং যা স্থির করব, তার সম্বন্ধে আশঙ্কা থাকে, তখনই আমাদের সত্যকার রূপ উপলব্ধি করা যায়। এইজন্য সার্ত বলেছেন, "In anguish, I apprehend myself at once as totally free and as not being able to derive the world except as coming from myself,"

চেতনা বা আমাদের অস্তিত্বের একটি বিশিষ্টতা হোল, আমাদের সামাজিক অস্তিত্বকে আমাদের সঙ্গে একাত্ম করার চেষ্টা করি; কিন্তু পেরে উঠিনা। সার্ত্র একজন হোটেল পরিচারকের উদাহরণ তুলে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, যে, এই লোকটি একজন আদর্শ পরিচারক হয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই আদর্শকে পুরোপুরি আয়ত্ত করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন ভাবে একটি জড়বস্তু সম্পূর্ণ জড়বস্তু হয়ে উঠতে পারে, ঠিক

তেমন ভাবে একজন মানুষের পক্ষে তার সামাজিক পদ-মর্যাদার সঙ্গে এক হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। মানুষের কাছে তার সামাজিক পদ-মর্যাদা তার বাইরে অবস্থিত এবং সে সর্বদাই চেষ্টা করছে সেই অবস্থায় নিজেকে উন্নীত করতে। কিন্তু পরিপূর্ণভাবে সেই পদ-মর্যাদা তার আয়ত্ত হলে, তার প্রকৃতিও হয়ে উঠবে অপরিবর্তনীয়। এইজন্য আমরা যা হতে চাই, তা হতে পারছি না, কেননা যা হতে চাই, তা যেই হয়ে যাব, ঠিক তখনই আমাদের পরিবর্তন রুদ্ধ হবে। সেই কারণে হোটেল পরিচারকের পক্ষে আদর্শ পরিচারক হওয়া হয়ে উঠছেনা। আমাদের তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন পরিচারক হওয়ার কাজগুলি নিয়ে খেলা করছে। সার্ত্র বলছেন, "The waiter in the cafe plays with his condition in order to realise it," কিন্তু সে নিজের মনে জানে, তার একটি ব্যক্তিসত্তা আছে, যা তাকে তার আদর্শে পুরোপুরি পৌছাতে দিচ্ছে না। কিন্তু আর একদিক দিয়ে দেখলে, সে হোটেল পরিচারক ছাড়া আর কিছু নয়, কেননা এই বিশেষ পরিচয়েই সে পরিচিত। অথচ আমরা এও দেখেছি, সে হোটেল-পরিচারকও হতে পারছে না। এই অবস্থাকে সার্ত্র বলছেন চেতনার একটি বিশিষ্টতা যা থেকে দেখা যাচ্ছে, চেতনা যে অবস্থায় আছে, তাকে অতিক্রম করাই তার প্রকৃতি। কিন্তু অনেক সময় আমরা অস্তিত্বের এই মৌলিক গুণ ভুলে যাই। আমরা আমাদের সমাজের বিশিষ্ট পদাধিকারের সঙ্গে নিজেকে এক করে ফেলি। এই একাত্মতার ফলে আমরা যান্ত্রিক হয়ে পড়ি, আমাদের সঙ্গে জড়বস্তুর কোন পার্থক্য থাকে না। আমরা যে বহু সময় নিজেকে জড়বস্তু সদৃশ বলে মনে করি, তার একটি কারণ হোল এই। চেতনাকে অচেতন পদার্থের সঙ্গে এক করে দেখা সেই জন্য সার্ত্রের মতে মিথ্যা বিশ্বাসের একটি নিদর্শন।

চেতনার প্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে সার্ত্র বলছেন, চেতনার সম্বন্ধে একথা বলা যায়না, যে, জড়বস্তুর মত এ অপরিবর্তনীয়। জড়বস্তু সম্বন্ধে বলা যায় ক সব সময়েই ক, কিন্তু চেতনার সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। চেতনা কখনও নিজের সঙ্গে এক নয়। কোন একটি অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে চেতনাকে বুঝতে হলে চেতনা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্য করে বুঝতে হচ্ছে। অভিজ্ঞতাটি চেতনার দ্বারা অনুধাবন করছি বলে দুটির মধ্যে পার্থক্য এসে যাচ্ছে। সেই জন্য অভিজ্ঞতার চেতনা

সম্বন্ধে অভিন্নতা কল্পনা করা যাচ্ছে না। অবশ্য এক সত্তার অধীন বলে তাদের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্তমান।

সাধারণ অভিজ্ঞতায়, চেতনার সম্পর্কে আত্মা ও ব্যক্তি দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়। সার্ত বলছেন, আত্মা হচ্ছে ব্যক্তির আদর্শ, চেতনা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত। কতকগুলি অতীত অভিজ্ঞতার সমষ্টি নিয়ে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে চেতনার যে বিশিষ্ট রূপ তাই হোল ব্যক্তি। কিন্তু এই ব্যক্তিকে আত্মা বলতে সার্ত্র রাজী নন, কেননা ব্যক্তি হিসাবে চেতনা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে, তা'ত অতীতে পর্যবসিত হয়ে যাচ্ছে। তার ফলে তা জড়বস্তু-পিণ্ডের মত অনড়, অনড় হয়ে পড়ছে। তার মধ্যে চেতনার মৌলিক গুণ থাকছে না। কিন্তু প্রতিমুহূর্তে এগিয়ে যাচ্ছে এক আদর্শকে রূপায়িত করতে। এই আদর্শ হচ্ছে আত্মা। অতএব, আত্মা হিসাবে চেতনাকে বুঝতে হলে সার্ত্রের মতে আদর্শের ভিত্তিতে বুঝতে হবে। এখানে সার্ত্রের সঙ্গে প্রচলিত দর্শনের পার্থক্য ধরা পড়ছে, কারণ সেখানে আত্মা বলতে চেতনার অন্তরশায়ী অপরিবর্তনীয় কোন সত্তাকে বোঝায়। এই অপরিবর্তনীয় তত্ত্বে সার্ত্রের আপত্তি। চেতনার সদা-পরিবর্তনশীল প্রকৃতি সত্ত্বেও তাকে দেহের ও পরিবেশের ওপর নির্ভর করতে হয়। চেতনা কেন একটি বিশেষ দেহকে আশ্রয় করে আছে কিংবা কেন একটি বিশেষ পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করেছে, তার কোন উত্তর নেই। এই কারণে চেতনার অস্তিত্বকে জগতনির্ভর বলে মনে হয় এবং এর প্রকৃতিতে এমন কিছু থেকে যাচ্ছে যার উৎপত্তির জন্য চেতনা নিজে দায়ী নয়। আমার নিজের অস্তিত্বের কারণ আমি নই, এই উপলব্ধি আমার অন্তরে একটা অস্থিরতার সৃষ্টি করে। হাইডেগার মনে করেন, এই অস্থিরতা এক ধরনের অপরাধ অনুভূতি নিয়ে আসে। কিন্তু সার্তের মতে, অপরাধের অনুভূতি নেই, বরং নিজের অস্তিত্ব যে অযৌক্তিক, এই কথাটাই মনে হয়।

চেতনা জগতকে নিজের সঙ্গে পৃথক করে স্বীয় অস্তিত্ব ঘোষণা করে। তাই চেতনার মধ্যে এমন কিছু নেই, যার সঙ্গে একাত্ম হওয়া সম্ভব। অথচ এই জগতের সমস্ত বস্তু চেতনাকে আবদ্ধ করছে। এই জগতের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা সঙ্গতি খোঁজাই চেতনার উদ্দেশ্য। জগৎ চেতনা থেকে আলাদা, তাই চেতনার মধ্যে

জগতের ব্যাখ্যা নেই। এমন অবস্থা যদি হয়, যে, চেতনা জগতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে জগতের ও নিজের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারে, তাহলেই চেতনার আদর্শ আয়ত্ত হয়। এই জন্য চেতনার পরম লক্ষ্য হচ্ছে জগতের সঙ্গে একাত্ম হওয়া। এমনভাবে সে একাত্ম হবে, যাতে জগতের সব কিছুর ব্যাখ্যা সে নিজের অন্তর থেকে পাবে। এরকম একটা অবস্থা হয়ত সম্ভব নয়, কিন্তু এই হচ্ছে মানবজীবনের পরম লক্ষ্য। সার্ত একে, এক ধরনের সমগ্রতা বলছেন। এই সমগ্রতাকে আমরা পেতে পারি স্বাধীনতার সাহায্যে।

আগেই বলা হয়েছে, আত্মা হচ্ছে ব্যক্তি-চেতনার পরম আদর্শ। আমরা আদর্শটা কি তাও জেনেছি। তাহলে বলা যেতে পারে, সমস্ত জগতকে অতিক্রম করে জগতকে চেতনার সঙ্গে যুক্ত করতে পারলেই আত্মাকে লাভ করা যাবে। সমস্ত জগতকে আমরা নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করি। সুতরাং চেতনার সঙ্গে বাস্তব জগতের পদার্থের একটা ব্যবহারিক সম্পর্ক আছে। তাছাড়া, চেতনা ও বস্তু পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই চেতনা বস্তুরাজ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একাত্ম হতে পারলে তবেই চেতনার পরম পূর্ণতা লাভ। চেতনা তার নিজের ইতিহাসে অতীতকে অতিক্রম করে বর্তমানের মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়। এই যাওয়ার পিছনে রয়েছে চেতনার উদ্বেগ, যাওয়া সম্ভব হয় স্বাধীনতার সাহায্যে। তাই, চেতনা স্বাধীনতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। চেতনা সম্পর্কে আমরা যে আলোচনা করেছি, তা থেকে একথা স্পষ্ট হয়েছে, যে, চেতনা তার সদা-পরিবর্তনশীল প্রকৃতির জন্যই স্বাধীন। পরিবর্তন চেতনা থেকে আসছে, অতএব পরিবর্তনের ক্ষমতাও চেতনার আছে। এই ক্ষমতাই স্বাধীনতা।

নিজেকে বস্তু জগৎ থেকে পৃথক করে চেতনার জগতে আবির্ভাব এবং সেই বস্তু-জগতের সঙ্গে একাত্ম হওয়াই তার সাধনা। চেতনা শুধু যে বাস্তব জগতকে অতিক্রম করে তার সঙ্গে এক হতে চায় তা নয়, নিজের কাজের দ্বারা বাস্তব জগতের পরিবর্তন সাধন করে। সেই জন্য চেতনার কর্মপদ্ধতি আমাদের আলোচনা করা দরকার। প্রত্যেক কাজই হচ্ছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, কোনও কিছুর অভাব আছে বলেই কাজের দ্বারা আমরা সে অভাব মেটাতে চাই। কিন্তু এই উদ্দেশ্য আমার অতীত জীবন থেকে

আসছে না। বরং অতীতকে ধ্বংস করে, সামনে একটি আদর্শ রেখে তবেই চেতনা কাজ করে। তাই, আমার স্বাধীনতাই সমস্ত কাজের মূলে, কেননা যা আমি এ পর্যন্ত হয়েছি তাকে অস্বীকার করে ভবিষ্যতের দিকে নিজেকে নিয়ে যাওয়াই আমার স্বাধীনতা। শ্রমিক তখনই দাসত্বশৃঙ্খল থেকে মুক্তি কামনা করে, যখন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা তার সামনে থাকে। কাজের প্রেরণা উদ্দেশ্য থেকেই আসে। কোন কিছু থেকে ভয় পেয়ে আমি যখন কাজ করি, তখন আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে আমি ভয়ের দ্বারা চালিত হয়েছি, কিন্তু আসলে যা আমি হারাতে ভয় পাচ্ছি, তাই আমার কাজের উদ্দেশ্য। তাকে যাতে আয়ত্তে আনা যায় তারই জন্য আমার চেষ্টা। যে গতির সাহায্যে ভবিষ্যতের দিকে চেতনা এগিয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে উদ্দেশ্য, প্রেরণা আর কাজ এক হয়ে আছে। এই সামগ্রিক কর্ম-গতিই হচ্ছে স্বাধীনতা, কিন্তু স্বাধীনতা চেতনার কোন গুণ নয়, চেতনাই স্বাধীনতা। মানুষের প্রকৃতিই হচ্ছে বস্তু-জগতের বন্ধন এড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া। মানুষের চেতনায় এমন কিছু নেই, যার সাহায্যে বস্তুর মত একে নির্দিষ্ট করে ধরা যায়। তাই বলা হচ্ছে, চেতনার ক্ষেত্রে অস্তিত্বই তার প্রকৃতি নির্ধারণ করে। কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় চেতনাকে বাঁধা যায়না বলেই চেতনা স্বাধীন।

চেতনার এই স্বাধীনতা কখনও কখনও আমাদের কাছে আবৃত থাকতে পারে। আমরা মনে করতে পারি উদ্দেশ্য বা পরিবেশ আমাদের নিয়ন্ত্রিত করছে। কিংবা, আমাদের প্রকৃতিই এমন যে, নির্দিষ্ট কর্ম সম্ভব এবং সকল মানুষের ক্ষেত্রে একই রকম ব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু সার্ত্র মনে করেন, জীবন আর চেতনা হচ্ছে যা হয়েছে, যা অতীত যা নির্দিষ্ট তা থেকে বিচ্ছিন্নতা। এই যে অবিরাম গতি তাই উদ্দেশ্য ও প্রেরণাকে সৃষ্টি করছে। চেতনা কোন নির্দিষ্ট অস্তিত্ব নয়, চেতনা অবিরাম কর্ম। স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাই সার্ত্র বলছেন, "Thus freedom is not a being; it is the being of a man—i. e, his nothingness of being,"

উদ্দেশ্য এবং প্রেরণা যেমন আমাদের চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করেনা তেমনি ইচ্ছা ও আবেগও চেতনা নিজের গতির মাধ্যমে সৃষ্টি করে এই গুণগুলি স্বাধীনতাকে প্রকাশ করে, স্বাধীনতা এদের অধীন নয়।

ইচ্ছা আবেগের চেয়ে বেশী স্বাধীন নয়, কারণ চেতনা নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী উদ্দেশ্য সৃষ্টি করে নিয়ে ইচ্ছাকে সেইদিকে প্রয়োগ করে। চেতনা যে নিজেকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আমরা একে আত্মস্থাপনা বলতে পারি। এই আত্মস্থাপনা সম্বন্ধে, নিজের মনে যে আলোচনা হয়, ইচ্ছা তারই একটি রূপ। এই আলোচনা করবার সার্থকতা আমার যা করি তার একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেওয়া। ইচ্ছার সফল হওয়ার মধ্যে একটা আত্মতৃপ্তি আছে, যা আমরা করতে চাই তাই করার মধ্যে চেতনার পরম উদ্দেশ্যের উপর ইচ্ছাকে নির্ভর করতে দেখা যাচ্ছে।

চেতনার আসল রূপ সর্বদা উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া, তাই চেতনা অর্থ উদ্দেশ্যের স্বাধীনতা। অতীতকে অস্বীকার করে, জগতকে অতিক্রম করাই চেতনার আদর্শ। এই জগতকে অতিক্রম করা নানাভাবে হতে পারে। যে-ভাবে আমি জগতকে অতিক্রম করতে চাই তারই সাহায্যে তার সঙ্গে আমি এক হতে পারি। দেহের আনন্দের সঙ্গে এক হয়ে আমি জগতকে অস্বীকার করতে পারি, কিংবা দেহের সংযম অভ্যাস করেও জগত থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারি। আমি হয়ত অতীতের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারি, কিংবা কোন মানসিক বিকৃতির মধ্যে জীবন কাটাতে পারি। যে-ভাবেই আমি জীবন কাটাই না কেন, সমস্তই পরম উদ্দেশ্যের সঙ্গে জড়িত। জীবনে যে কাজই আমি করিনা কেন, চেতনার পরম উদ্দেশ্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক মনে রেখে তবে তাকে বিচার করতে হবে।

এইভাবে, সার্ত্র একটি অস্তিবাদী মনোবিশ্লেষণের সন্ধান পেয়েছেন। এই মনোবিশ্লেষণের নীতি ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ফ্রয়েডের মতে, মানসিক কার্য-কারণবাদের দ্বারা মানুষের মনের বিশ্লেষণ করতে হবে। পরিবেশের চাপে মানুষের মনে যে সমস্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাই তার মনকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু সার্ত বলতে চান, মানসিক ঘটনাকে তার পূর্ববর্তী ঘটনা দিয়ে ব্যাখ্যা করলে চলবে না। প্রত্যেকটি কাজ বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে যুক্ত করে শেষ পর্যন্ত সামগ্রিক ব্যক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। আমার মধ্যে যে হীনভাব গড়ে ওঠে এটা পরিবেশ এবং অতীত অভিজ্ঞতার যৌথক্রিয়া নয়। হীন মনো-

ভাব আমি নিজে বেছে নিয়েছি। এই ভাবে আমি নিজেকে অন্যের সামনে উপস্থিত করতে চাই। প্রত্যেকটি কাজের সঙ্গে আমার ব্যক্তি-স্বাধীনতা যুক্ত। যে স্বাধীনতার দ্বারা আমি নিজেকে অবিরত গড়ে তুলছি, তাই আমার মৌলিক কর্ম-পদ্ধতি। এই কর্ম-পদ্ধতির চেতনাই আমার চেতনা, আমার অস্তিত্ব। চেতনায় আমি জগৎ এবং বর্তমান থেকে আলাদা হয়ে তাদের সঙ্গে যুক্ত হবার চেষ্টা করছি। তাই এই কাজ ও আমার চেতনা এক। আমার কোন পূর্বব-নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই, তাই আমার জীবনের কর্ম-পদ্ধতি নির্বাচনের ভিতর দিয়েই জগতকে আমার মনের আয়নায় ধরবার চেষ্টা করি। প্রতিটি বস্তুর মূল্য, আমার জীবনে সকল বস্তুর ভূমিকা, আমার সঙ্গে জগতের সম্পর্ক, সমস্তই আমার কর্ম-পদ্ধতি নির্বাচন, আমার চরম উদ্দেশ্যের আলোকে উপলব্ধি করতে হবে।

কিন্তু যে কর্ম-পন্থা পরম বা চরম উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে স্থির করা হয়েছে, তাও সুনির্দিষ্ট নয়, কারণ তাও বদলাতে পারে। চেতনার এই ভীতি রয়েছে, যা স্থির করা হয়েছে, তাও পরিবর্তন হতে পারে। এর কারণ চেতনার স্বাধীনতা। যে কর্ম-পদ্ধতি আমি বেছে নিয়েছি, তার সার্বভৌম কর্তা আমি, তবু তার পরিবর্তন সম্ভব। এই কারণে, চেতনা সকল সময় ভীত, সন্ত্রস্ত। কিন্তু সার্ত বলছেন, চেতনার এই পরিবর্তন সব সময় সম্ভব হলেও জগতের যে অর্থ আমি গ্রহণ করেছি, যে কর্ম-পদ্ধতি আমার বর্তমানকে অর্থ দিয়েছে, তার পরিবর্তন দুঃসাধ্য বলেই, চেতনার মৌলিক উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয় না।

সার্ত্র বলেছেন, সাধারণ মানুষ মনে করে আমাদের স্বাধীনতা প্রতিপদে ব্যাহত হচ্ছে। তাঁর কথায় "The decisive argument which is employed by commonsensc against freedom consists in reminding us of impotence. Far from being able to modify our situation at our whim. we seem tobe unable to change ourselves. I am not "free" either to escape the lot of my class, of my nation, of my family or even to build up my own power or my fortune or to conquer my most insignificant appetites or habits" কিন্তু সার্ত্রের কাছে স্বাধীনতা উদ্দেশ্য সাধনের সম্ভাবনা নয়, বরং একজন নিজের উদ্দেশ্য নিজেই স্থির

করছে, এই অর্থে সার্ত স্বাধীনতা প্রয়োগ করছেন। মানুষ কি উদ্দেশ্য নিয়ে জীবনযাপন করবে এবং তার জন্য কি কি কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করবে, স্বাধীনতা বলতে সার্ত্র এই উদ্দেশ ও কর্মপদ্ধতি নির্বাচন বোঝেন। স্বাধীনতা শুধু একটা ইচ্ছা বা আশা নয়, কাজ চালিত করার মধ্যেই স্বাধীনতার অস্তিত্ব। স্বাধীনতা কোন একটা অভাববোধ এবং তা থেকে নূতন সৃষ্টি নাও হতে পারে।

আমার পরিবেশ আমার বস্তুগত দিক কিন্তু এই বস্তুর অবস্থা আমার বন্ধন কি সুযোগ তার বিচার আমার উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে। আমার অতীত সম্বন্ধেও সেই কথা, বর্তমান উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার অর্থ অন্যরকম হতে পারে। আমি নিজেই পরিবেশ, আমার অতীতকে নিয়ে একটি নতুন ঘটনাসংস্থান তৈয়েরী করি এবং এই প্রস্তুতির জন্যই আমি স্বাধীন। জগতে আমার অস্তিত্বের বিপদ আসতে পারে প্রতিবেশীর কাছে থেকে, কারণ তার কাছে আমি বস্তুসদৃশ। আমার অস্তিত্বের একটা দিক অন্ততঃ তার কাছে প্রকাশিত যেখানে আমি অসহায়। অতএব প্রতিবেশীর স্বাধীন সত্তা আমার স্বাধীনতার পরিপন্থী মনে হতে পারে। সেখানেও সার্ত বলেছেন, অন্ততঃ আমার সমস্ত পরিবেশ অন্যের স্বাধীনতার দ্বারা সীমিত হোক, এটা ত চাইতে পারি। তাহলেই আমার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। মৃত্যুও ত স্বাধীনতাকে খর্ব করছে, এমন মনে হোতে পারে। সে সম্পর্কে সার্ত বলছেন, মৃত্যু আমার বাস্তব দিকের একটা অংশ। জন্মের মত মৃত্যুও একটি ঘটনা। আমি মৃত্যুর জন্য স্বাধীন, একথা বলেন হাইডেগার, কিন্তু সার্ত বলছেন, আমি স্বাধীন ব্যক্তি হিসাবেই মরি। আমি মৃত্যুকে আমার ব্যক্তিত্বের দুর্বোধ্য সীমা বলে বেছে নিতে পারি, যেমন অন্যের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নিয়েছি। এই স্বাধীনতা কিন্তু দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। আমার যে পরিবেশ আমি রচনা করেছি তার জন্য আমি দায়ী, যদিও আমার কারণ বা উৎপত্তিস্থল আমি নই। কিন্তু উদ্দেশ্য-গুলি আমার, আর তারই ভিত্তিতে পরিবেশ রচনা বলে, তার সমস্ত দায়িত্ব আমার। এমন কি, আমার যুগে যে যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে তারও দায়িত্ব আমার। তাই সার্ত্র বলেছেন, "If I am mobilised in a war, this war is my war...I deserve it first, because I could always get out of it by suicide or by desertion. If therefore I

have preferred war to death or to dishonour, everything takes place as if I bore the responsibility for this war.·····Thus, totally free, undistinguishable from the period I have chosen to be the meaning as profoundly responsible for the war as if I had myself declared it, unable to live without integrating it in my situation, engaging myself in it and stamping it with my seal, I must be without remorse or regrets as I am without excuse, for from the instant of my upsurge into being, I carry the weight of the world by myself alone without anything or any person being able to lighten it," প্রত্যেক মানুষ নিজের পরিবেশ রচনা করে সমস্ত যুগের সঙ্গে জড়িত, তাই তার যুগের সব কিছুর জন্য দায়িত্ব। সার্তের এখনও পর্যন্ত শেষ নাটক The Loser Wins-এর নায়ক নিজেকে তার শতাব্দীর পাপের জন্য দায়ী ভাবছে এবং যে যুদ্ধ, বিভীষিকা বর্তমান শতাব্দীতে মানুষের জীবনকে অভিশপ্ত করে তুলছে, তার জন্য আত্মগ্লানিতে ভুগছে।

সার্ত্রে'র স্বাধীনতার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত হতাশা আর উদ্বেগ জড়িত; কারণ স্বাধীনতা অর্থ শুধু উদ্দেশ্যের দিক থেকে জগতকে নির্বাচিত করা। কিন্তু যে কর্ম-পদ্ধতি নেওয়া হচ্ছে, তা সফল হবে এমন কোন কথা নেই। তাই ফিলিপ থডি তাঁর সার্ত্রে'র আলোচনার শেষে বলেছেন, "It is the very urgency of pessimism which both constitutes Sartre's originality as a thinker and creates the extra-ordinary difficulty which he has always encountered in looking for positive solutions"

রবীন্দ্রনাথের ছবি

ডব্লু, জি, আর্চার

[চিত্রকর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বহু মনীষী আলোচনা করেছেন। ইংরেজ শিল্প-সমালোচক উইলিয়াম জি, আর্চারের আলোচনা সে হিসেবে এ প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান সংযোজন। রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক 'নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় ৫ই মে তারিখের সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী প্রতিমা সরকার।

—সম্পাদক।]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন প্রথম ছবি আঁকা সুরু করলেন তখন তাঁর বয়স হয়েছে ৬৭। দীর্ঘদিন ধরে পাণ্ডুলিপির পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে তাঁর মনে একটা গর্ববোধ ছিল, ফলতঃ কবিতার কাটকুটের মধ্যে ছবির অশরীরী উপস্থিতিকে তিনি আমল দেন নি মোটেই। কালি কলম ছিল তাঁর সহজ স্বাভাবিক মাধ্যম কিন্তু ১৯২৮ সালে তাঁর মন ঝুঁকলো হঠাৎ নানা রঙের কালির দিকে। কিছু দিন পরেই তার সঙ্গে যুক্ত হলো রঙীন পেন্‌সিল, রঙীন চক্ আর নানা জাতের নানা রঙ। ছবি আঁকার শেষের দিকে তাঁর রচনায় দেখা গেল বিশ্ব প্রকৃতির নানা খেয়ালের সঙ্গে অস্পষ্ট সাদৃশ্য। মূর্ত হয়ে উঠ্‌ল অভাবনীয় দৈত্যাকৃতি কিছু জীব, ভীষণ-দর্শন পাখি, কুণ্ডলী পাকানো সাপের মতো এক ধরণের প্রাণী, এবং মানুষ আর আধা-মানুষের মুখ আর দেহভঙ্গি।

১৯২৮ সালে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস "লাষ্ট পোয়েম"(শেষের কবিতা) থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিলে এদের অন্তর্নিহিত ভাবটি পরিস্ফুট হবে। যথা :

"From the new literary dictator we expect creations, straight and sharp—like thorns, like arrows, like spear-heads. Not like fragile flowers, but like the lightning flash and pain of neuralgia, piercing and angular like a Gothic church, not rounded like a mosque dome ; not-complacent but aggressive ; even though they be crude like a jute mill or a Government secretariat." ১

এখানে কবিতা সম্পর্কে তাঁর উক্তি ব্যাঙ্গাত্মক ; কিন্তু এই জোরালো দাবীর সঙ্গে এটাও যুক্ত হওয়া সঙ্গত তা হলো তাঁর ছবির কোথাও বর্বর, আড়ষ্ট, বিকৃত রূপ, কিম্বা সোচ্চার আত্ম-প্রত্যয় বা শোকাবহ কিম্বা গম্ভীর উদাত্ত কল্পনা। তাঁর করাল দংষ্ট্রা দৈত্যাকৃতি কোন ছবি, কিম্বা কোন লুব্ধ মনের প্রকাশের পিছনে সঙ্গতভাবেই লক্ষ্য করা যায় ভারতের ক্রমবর্ধমান জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে কবির সাড়া, বিদেশী শাসনের প্রতি একটা প্রকট অসহিষ্ণুতা, সমস্ত বাধাকে তুচ্ছ করার একটা অদম্য আহ্বান, একটা নতুন ধরণের মুক্তি চেতনা।

১৯৪১ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই চিত্র রচনা চলেছিল প্রভূত পরিমাণে। ধীরে ধীরে তাঁর লক্ষ্য হয়ে উঠ্‌ল অচেতনকে, পরিহার করা কোন পরিবেশের ঘটনার রূপায়ণকে বর্জন করা বা প্রাচীন চিত্রাবলীর পুনর্ব্যাখ্যা করা অথবা বাস্তব জীবনকে চিত্রিত করা।

বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের যে ইচ্ছা তিনি পোষণ করতেন, এক-মাত্র যা জাতীয়তার সীমাকে অতিক্রম করতে পারে, সেটাই আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলায় তাঁর ভূমিকাকে বুঝতে সাহায্য করে। ১৯২৮ সালেই এটা স্পষ্ট হয় যে অবনীন্দ্রনাথ ও ই, বি, হ্যাভেলের যৌথ প্রচেষ্টায় যে নয়া-বাংলা বা ক্যালকাটা স্কুলের শিল্পরীতি গড়ে ওঠে তা, ভারতীয় চিত্রকলাকে সঞ্জীবিত করতে পারে নি। তাঁদের কার্যক্রমের যে লক্ষ্য ছিল বৃটিশ শিল্পরীতি থেকে ভারতীয় বিশেষত মোগল শিল্পরীতিতে ফিরে যাওয়া—সমকালীন ভারতীয় ধারণার সঙ্গে তার সঙ্গতি ছিল না। এমন কি কুমারস্বামীর মতো ভারতীয় জাতীয়তার অন্যতম প্রবক্তাও প্রসঙ্গত মন্তব্য করেছিলেন যে এগুলি "প্রায়শই চেতনার দিক দিয়ে উচ্ছ্বাসময়, রচনার দিক দিয়ে দুর্বল, এবং রঙের বাহারে বিষাদক্লিষ্ট," এবং তিনি বক্তব্য শেষ করেছেন এ কথা বলে যে "ভারতের কাছে সারা বিশ্বের দাবী কখনো এ হতে পারে না।"

রবীন্দ্রনাথের চোখে প্রাচীন ভারতীয় রীতির অনুকরণ বা কৃত্রিম ভাবে ভারতীয়ত্ব বজায় রাখার প্রচেষ্টা, অত্যন্ত ভুল বলে প্রতীয়মান হয়েছিল ; তিনি তাই দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন নোতুন, ভিন্ন একটা নীতির দিকে যা সমস্যার প্রকৃত সমাধান করতে পারে। ১৯৩৫ সালে তিনি বলেছিলেন ঃ

"আমরা যখন ভারতীয় চিত্রকলার কথা বলি, তখন তার মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে এমন কতগুলি সত্য যা ভারতীয় ঐতিহ্য ও ধ্যানধারণা থেকে উদ্ভূত।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমাদের জানা দরকার যে মানুষের সংস্কৃতিতে কোন জাতিভেদের চরম বিধিনিষেধ নেই, বরং তাদের মধ্যে এ শক্তিই নিয়ত উৎসারিত যা পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে সৃষ্টি করে নোতুন বৈচিত্রকে, যুগের পর যুগ এই ধারা চলেছে অব্যাহত, মানুষের মনস্তত্ত্বে যে সুগভীর ঐক্যবোধ আছে, এটা সেই তত্ত্বকেই সপ্রমাণ করে।..... আমাদের সভ্যতার পক্ষে এটা একটা সৌভাগ্যের কথা বলতেই হবে যে সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার সঙ্গম যে-কালে চলেছিল তখন পেশাদার শিল্প সমালোচকদের এতো আধিক্য ঘটেনি এবং শিল্পীদেরও নিয়ত অনুপ্রেরণার সাযুজ্য বিচারে শ্রেণীবিভাগের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়নি। অক্লান্তভাবে আমাদের শিল্পীদের কেউ সেই সাদা সত্য কথাটা মনে করিয়ে দেয় নি যে তাঁরা ভারতীয়, ফলতঃ তাঁরা স্বাধীনভাবে, বিদেশের কাছে ঋণ গ্রহণ করলেও, নিজেদের ভারতীয়ত্ব বজায় রাখতে পেরেছিলেন।"

এখানে যে কথা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ অদম্যভাবে তারই চর্চা করেছেন। ভারতীয় চিত্রকলায় তাঁর উত্তরসূরীরা তাঁর এ নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন যে ভারতীয় শিল্পীরা যেন শুধু ভারতীয়ত্বের মধ্যেই নিজেদের নিবদ্ধ না রাখেন, যেন ভারতী তাঁদের কাছে অনন্যা না হয়ে, সারা বিশ্বের পটভূমিকায় উদ্ভাসিত হয়। তাঁদের সাহসী হতে হবে, হতে হবে স্বীয় চেতনায় দীপ্ত। আর এই বৈশিষ্ট্যের সমাবেশেই তাঁর চিত্ররচনা লাভ করেছে তাদের শক্তি, সজীবতা। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা প্রমাণ করে তাঁর বাণী সেদিন কতো সম্ভবনাময় ছিল।

১। নতুন প্রেসিডেণ্টের কাছে চাই কড়া লাইনের খাড়া লাইনের রচনা—তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো, ফুলের মতো নয়; বিদ্যুতের রেখার মতো, ন্যুর‍্যাল্‌জিয়ার ব্যথার মতো, খোঁচাওয়ালা, কোণওয়ালা, গথিক গির্জের ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়; এমন কি, যদি চটকল, পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট বিলডিঙের আদলে হয় ক্ষতি নেই।

হে নক্ষত্রবীথি

তরুণ সান্যাল

কবিতার সংজ্ঞা নিয়ে যদিও বিতর্কের অন্ত নেই, তবু 'The heightened colour of words, the conscious grace, the unwonted variety and gamut in utterence' প্রভৃতি চিহ্নের সহায়তায় কবিতা চেনা গেলেও হৃদয়ের ওপরে কোন স্পর্শ সহসা "lights up whole roads and tenements of experience poorly mapped, pefuctorily visited, apprehended but dimly by us before'—এ প্রশ্ন স্বভাবতই এসে পড়ে। কোন সত্য কবির সত্য, কবিতার সত্য এ প্রশ্নও জাগরিত হয়। কোলেরিজের নিকটে কবিতা হয় memorable speech, কিন্তু memorabale কেন এ-কথাও ভাবতে হয়। ডে লুইস কবিতার সত্যতাকে বিচার করবেন operative জ্ঞানে, কেননা সেই সত্য আমাদের জীবনে এমন রসবোধের কারণ হবে যার ফলে কাণ্টের মতানুযায়ী জীবনে অগ্রগমণ ঘটবে। এবং সেই রসঘন 'furtherencc of life'-এর বোধকে যদি কবিতার সত্য জ্ঞান করি, তবে তার বিষয় নানা সংজ্ঞাও এসে পড়ে। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ বলতেন 'কবিতা ও জীবন একই জিনিসের দুরকম উৎসারণ; জীবন বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি তার ভিতর বাস্তব নামে আমরা সাধারণত যা জানি তা রয়েছে, কিন্তু এই অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবনের দিকে তাকিয়ে কবির কল্পনা-প্রতিভা কিংবা মানুষের ইমাজিনেশন সম্পূর্ণ ভাবে তৃপ্তি হয় না, কিন্তু কবিতা সৃষ্টি করে কবির বিবেক সান্ত্বনা পায়, তার কল্পনা মনীষা শান্তি বোধ করে, পাঠকের ইমাজিনেশন তৃপ্তি পায়। কিন্তু সাধারণ বাস্তব বলতে আমরা যা বুঝি তার সম্পূর্ণ পুনর্গঠন তবুও কাব্যের ভিতর থাকে না, আমরা এক নতুন প্রদেশে প্রবেশ করেছি।' সৃষ্টির ভিতর এমন সব অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়, 'যে মনে হয় ঐ সমস্ত জিনিসই অনেক দিন থেকে প্রতিফলিত হয়ে কোথায় যেন ছিল···এই সবের অপরূপ উদ্গীরণের ভিতরে এসে হৃদয়ে অনুভূতির জন্ম হয়···এবং সেই প্রতিফলিত

অনুচ্চারিত দেশ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে ওঠে যেন; এই বস্তু ও সুরের পরিণয় শুধু নয়, কোনো কোনো মানুষের কল্পনা-মনীষার ভিতর তাদের একাত্মতা ঘটে—কাব্য জন্ম লাভ করে।' (কবিতার কথা-পৃষ্ঠা ১৫) "মহাবিশ্বলোকের ইশারায় উৎসারিত সময় চেতনা" জীবনানন্দ দাশের "কাব্যে একটি সঙ্গতি সাধক অপরিহার্য সত্যের মতো,…"

মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর আস্থাশীল, জীবনব্রহ্মাণ্ডের শুদ্ধ রূপায়ণে কবিতা রচনায় ব্রতী জীবনানন্দ দাশ আমাদের দেশে অদ্যাপিও অনাবিষ্কৃত। ডক্টরেট উপাধি প্রার্থিনী গবেষকের নিকটে তিনি 'এক বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত কবি,' "এমনকি মৌখিক ভাষায় প্রচলিত তৎসম শব্দেরও ব্যবহারজাত মালিন্য ঘুচিয়ে তাতে' কাব্যের স্পন্দন আনয়নকারী কবি বলে তিনি সমবয়সী কবির নিকটে শ্রদ্ধেয়, অথবা অন্য কোন সুপরিচিত বামাবর্তের কবির নিকটে "সময়হীনতার শাদা কাপড় দিয়ে সময়ের আপাদমস্তক তিনি ঢেকে দেন। কালের কাছ থেকে হরণ করে নেন গতি।"

লোকান্তরিত কবি জীবনানন্দ দাশের সদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'বেলা অবেলা কালবেলা' ইতিমধ্যে পাঠকমহলে বহুল আলোচিত জটলা সৃষ্টি করেনি, এখন বাংলা দেশ 'দুই শহরের' বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে বড়ই ব্যস্ত।

আমাদের দেশে কবিতা লেখার ঐতিহ্য-নিরূপিত পথের বাইরে যাওয়ার বিপদ আছে। ত্রিশের কবিদের প্রায় সকলেই এখন রবীন্দ্র কাব্যের ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। হয়ত এটাই তাঁদের নিকটে প্রত্যাশিত ছিল। কোনও বয়সী কবি ডায়েলেকটিসসিদ্ধ মনীষা গহনে তৎপর, কেউ সভ্যতার শূন্যতায় কৃত্রিম মালিন্যে আশ্রয়া—বোদলেয়ার বিলাসী, কেউ সুদূর প্রবাসী—সকলেরই নিজের জগত আছে, কারও বা সংগঠিত স্তাবকমণ্ডলী আছে, কেউ প্রবাসী বলে হৃদয়ে মমতা সঞ্চার করান, হয়ত এমন কেউ ছিলেন, যাঁকে মান্দারীন বলে মধ্যবিত্ত জীবনযাপনের ক্লিষ্ট-তাকে বড় করে তুলি—এ সকলের বাইরে,—রেডিয়ো, পুরস্কার, আমেরিকা, মান্দরীনত্ব, বৈপ্লবিক আদর্শবাদিতা—সব কিছুর বাইরে, শুধু একজনই ছিলেন, তিনিই জীবনানন্দ দাশ। যাঁকে দলে টানতে অসমর্থ ছিল কন্‌গ্রেস অব কলচরল ফ্রীডম, শ্লোগান লেখাতে অসমর্থ ছিল রাজনৈতিক বাম।

মূলতঃ জীবনানন্দ মৃত্যুজ্ঞানী, এবং সেই অর্থে পুনরুত্থানের বিশ্বাসে দীপ্যমান। ডায়নিশাস-মীথের পিছনে যেমন পুনরুত্থানের আয়োজন গ্রেল-উপকথার গভীরে যেমন সম্ভাব্য বীজায়ণ, জীবনানন্দের কবিতা সেইমৃত্যু জ্ঞানের গভীরে পৌঁছে চিরায়ত জীবনোত্থানের বিশ্বাসে ভাস্বর। মন্ত্রের গুণ যেমন শ্রোতা বা উচ্চারণকারীকে আবিষ্ট করা, জীবনানন্দ দাশ তাঁর প্রতীক, চিত্রকল্প, মীথের জগতে পাঠককে নিবিষ্ট রেখে ক্রমশঃ মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে—মহাপৃথিবীর নক্ষত্রবীথির দিকে, মহাব্রহ্মাণ্ডের পরম ঐক্যের দিকে নিয়ে যান। আমাদের বেদনাঘন স্বভাবকুটিল বৈষম্যের ভুবনে জীবন, নিসর্গ ও ব্রহ্মাণ্ডের ইতিমধ্যে ভঙ্গ হয়ে যাওয়া ঐক্যকে শোকার্তের মত মনে রেখে রোমান্টিক বাসনায় তিনি অলোকজগৎ নির্মাণ করেছিলেন। পরম সত্যের মত বিশ্বাস রাখতে হয়েছিল প্রেমের প্রতি, ঠিক বীজায়নের মীথের নারীর মত পরিপূর্ণ বিকাশের প্রতি, সৌন্দর্য এবং লক্ষ্যের সমীকরণে মহিলা নয়, মানবী নয়, মেয়ে নয়, একেবারে অন্য শব্দ, সেই বিশিষ্ট বিমূর্ত নারী—তাঁর নিকটে বিচ্ছিন্নতাকে সূত্রে বেঁধে দেবার ধ্রুবতার প্রতীক হয়ে এসেছিল।

জীবনানন্দের হেমন্ত রহস্যময় এবং বিষণ্ণ, সুতরাং সেই সিম্বলিষ্ট অর্থে সুন্দর! সুন্দরকে বিষন্নতা ও রহস্যময়তার এক মৌলে ধারণ তাঁর প্রতীকধর্মী কবিতার মূল বৈশিষ্ট্য। হরিণ, ময়াল, কুয়াসা প্রভৃতি শব্দ তাঁর নিকটে চিত্রকে মূল্য দিতে ব্যবহৃত হয় না, বরং তারা প্রতীক; মানুষের কোনও বিশেষ সময়ে স্থায়ী অনুভবের রূপ তারা, তাদের বিকাশের পথে, প্রকাশের লক্ষ্যে জীবনানন্দ অন্ধকার থেকে আলোয়, হতাশা থেকে বিশ্বাসে পৌঁছে গেলেন। জীবনানন্দ দাশ 'বেলা অবেলা কালবেলায়' এ যুগের অতি আশ্চর্য কবিকৃতি বিকাশ করলেন।

জীবনানন্দ দাশ লোকান্তরিত হবার আগে ও পরে কতরকম কথা শুনেছি বিভিন্ন মহলে। যিনি সময়ের যথার্থ মূল্যে যাদের অতি নিকটে ছিলেন, তাঁরা তাঁকে না বুঝে কতই না ব্যঙ্গে চিহ্নিত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'প্রাচীনকালের গৌড়ীয় শুঁড়িখানায় থাকতো একরকম চিহ্ন, সেই চিহ্ন দেখে ভেতরে ঢুকতেন সেকালের পান-রসিকেরা। জীবনানন্দের কবিতায় দুর্বোধ্য সঙ্কেত অনেকটা সেই চিহ্নের মত। ভেতরে ঢুকলে

নেশাগ্রস্থ হওয়া যায়। তখন বেলেব খোলায় পৃথিবীকে মনে হয় তালগোল পাকানো বস্তুপিণ্ডের এক অসংবদ্ধ প্রলাপ;…আক্রান্ত মানুষের শেষ আশ্রয় প্রকৃতির নির্জন গুহা।" বনলতা সেন প্রসঙ্গে অতি প্রসিদ্ধ জনৈক বামাবর্তের কবির উদ্ধৃত উক্তি জীবনানন্দকে খাটো করেনি, বরং জীবনানন্দ দাশ যে অনেক বড়, তার প্রমাণ রেখে গেলেন তিনি বেলা অবেলা কালবেলায়। তিনি একথা লিখেছিলেন:

সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র রাত্রি সিন্ধু-রীতি মানুষের বিষয় হৃদয়
জয় অস্তসূর্য জয়, অলখ অরুণোদয় জয়

অথচ উল্লিখিত কবিসমালোচক লিখেছেন "মৃত্যু…আশায় প্রলুব্ধ করে মন্ত্র-মুগ্ধের মতো জীবনকে টেনে নিয়ে যায় বধ্যভূমির দিকে।…কিন্তু সে রক্তপাত আততায়ীকে ধিক্কার দেয় না, দেবতার সামনে বলিদানের মত…এই মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দেবার মধ্যে থাকে ক্লীবের সান্ত্বনা। (পরিচয় শ্রাবণ। ১৩৬০)" কিন্তু জীবনানন্দ দাশ শোনালেন:

আমার এ-জীবনের মৃত অরণ্যেরা বুঝি বলে:
কেন যাও পৃথিবীর রৌদ্র কোলাহলে
.....
মৃত্যুই অনন্ত শান্তি হয়ে
অন্তহীন অন্ধকারে আছে
লীন সব অরণ্যের কাছে।
আমি তবু বলি:
এখনও যে-কটা দিন বেঁচে আছি সূর্যে সূর্যে চলি,
দেখা যাক পৃথিবীর ঘাস
সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর
নিষ্পেষিত মনুষ্যত্বার
আধারের থেকে আনে কী করে যে মহানীলাকাশ,
ভাবা যাক—ভাবা যাক—
ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি

ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মত শত-শত
শত জলঝর্ণার ধ্বনি।

অথচ আরও একজন বাঙালী কবি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পরে লিখেছিলেন "যদি তিনি নিজের ভাবনা চিন্তাকে আরও সচেতনভাবে সংগঠিত করতে পারতেন এবং তাঁর স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তি শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকত, জীবনানন্দ দাশ হয়তো রবীন্দ্রোত্তর যুগের একজন মহৎ কবি হতেন। হয়ে আছেন···এক মহৎ সম্ভাবনার খণ্ডিত সিদ্ধি।' আমি জানিনা ঐ কবি সমালোচক রবীন্দ্রোত্তর যুগের মহৎ কবিতা বলতে রাজনৈতিক রণধ্বনিকে দলনিয়ন্ত্রিত সচেতনতায়-সংগঠিত স্ফূর্তি মনে করেন কিনা। কিন্তু জীবনানন্দ দাশের মত সচেতন কবি আর কত জন ছিলেন?

প্রতীক

'বেলা অবেলা কালবেলা' কাব্য গ্রন্থটির নাম জীবনানন্দ দাশ তাঁর জীবতকালেই রেখে যান। বেলা অবেলা বলতে আমাদের সময়ের সব মুহূর্ত, সব ব্যর্থ দিন সব সফল মুহূর্তকে বোঝায়। কাল বেলা বোঝাতে বোঝায় ক্রান্তিচিহ্নিত সৌর প্রয়াণ, সূর্যের সময় এক তিথি থেকে অপর তিথিতে পৌঁছতে যখন বিষম সময়ে এসে পড়েছে। আমরাও তো বেলা অবেলায় এবং কালবেলায়, অথবা বেলা অবেলা কাল বেলায় জীবন প্রস্থানে রয়েছি, কাব্য গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলির পরম্পরা, প্রকাশের বক্তব্য অনুযায়ী কালানুক্রম রক্ষা না করলেও ঐ তিনটি শব্দের গভীরতম মূল্যে তারা বিধৃত। কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৩৪—১৯৫০। বলা যেতে পারে আমাদের পৃথিবীতে বীভৎস নাৎসীবাদের উত্থানের কাল হতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী স্নায়ুযুদ্ধ ক্লান্ত সময় পর্যন্ত কবিতাগুলির রচনাকাল।

কবিতাগুলির চরিত্র মূলতঃ আন্তর্জাতিক, লক্ষ্যও আন্তর্জাতিক মানুষ। বহুবার প্রশ্ন করা হয়েছে, ত্রিশের আধুনিক কবিতায় দেশের বিভিন্ন কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত আন্দোলনে যোগ দেয়নি কেন? একদা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও লিখেছিলেন যে, দেশে যখন তরুণেরা রক্তদানে ব্যস্ত, বিশেষভাবে জীবনানন্দ তখন কেন হেমন্তের ধূসর জগতের অন্ধকারে পরিভ্রমণে মগ্ন? এর জবাব দেবার হয়তো অনেক পন্থা আছে। তবু মনে পড়ে ত্রিশের আইন অমান্য আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা, আর মনে পড়ে ভারতের ব্যস্ত রাজনৈতিক

আন্দোলন কখনই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। যাদের উপরে আমাদের দেশের উনিশ শতকের রেনেসাঁস সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব ছিল না, তাঁরাই অদ্ভুত ধর্মের ঘোঁটপাকানো যুক্তিহীনতার আবর্তে ভারতের রাজনৈতিকে, অধঃপতনে টানছিলেন। '১৯২২, ১৭-২০শে আগষ্ট দিলীপ রায়কে রলাঁ বললেন, মহাত্মা গান্ধী Francis of Assis-এর মত একজন বড় ঋষি, লিও তলস্তয়ের মত নন। গান্ধী তাঁর মত একজন আন্তর্জাতিকতাবাদী নন, তিনি হচ্ছেন একজন "Idealist nationalist who wants his nation to be the greater by spiritual force (Indee, পৃ ২৯) [প্রমোদ সেনগুপ্ত]" বিদেশী কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতায় শিক্ষিত, ব্রাহ্মপরিবারে জাত বরিশালের নিসর্গ পৃথিবীর পরিচিত মানুষ জীবনানন্দ দাশগুপ্তের সামনে দুটি পথ ছিল, এক, তথাকথিত যুক্তিহীন রাজনীতিচর্চা, নজরুল প্রভৃতি যার অশিক্ষিত বলি, অথবা সাম্যবাদী চিন্তায় চিন্তিত ডায়েলেকটিস নিয়ন্ত্রিত দর্শনে আশ্রয় নেওয়া;—কিন্তু জীবনানন্দ দাশের বাহিরের পৃথিবীর জ্ঞান তথাকথিত যুক্তিহীনতার দিকে ঠেলে দেয়নি, তেমনি তৎকালে অসংগঠিত মার্কসবাদী গোষ্ঠিরাও কবিদের নিকটে তাঁদের পন্থা রাখেননি। বিষ্ণু দে নিজেই বোধহয় তার পাঠ নিয়েছিলেন, জীবনানন্দ দাশ তাঁর বৃহৎ চোখ তুলে নরমাংসাশী দলাদলী, যুদ্ধপ্রস্তুতি দেখছিলেন। তিনি মৃত্যুর পরেও পুনর্জন্ম প্রত্যাশা করেছিলেন।

জীবনানন্দ দাশের কবিতার প্রতীকগুলির উপরে তাই সময় আশ্চর্য-ভাবে চিহ্ন রেখেছে। বেলা অবেলা কালবেলায় 'নারী' শব্দটিকে বহুবার পাওয়া যাবে। জীবনানন্দের নিকটে নারী একটি চিরায়ত অস্তিত্বের বিমূর্ত মূর্তি, প্রেমের উদ্দেশ্য, এবং সৃষ্টিধারণের জন্য দায়ী। মহিলা বা মেয়ে বা অন্যান্য স্ত্রী-বাচক শব্দগুলিকে তিনি অন্য অর্থে প্রয়োগ-করেছেন। "জীবনানন্দ দাশ যখন লেখেন—

তোমার মতন এক মহিলার কাছে

... ...

তখন 'মহিলা' শব্দ 'নারীর' নামান্তর মাত্র থাকে না, তাতে সমকালীন বিভাব জেগে ওঠে, আমরা অনুভব করি এই শ্লোকের উদ্দিষ্টা সেই আধুনিকাদের একজন, বক্তারা যাঁদের 'ভদ্রমহিলাগণ' বলে সম্বোধন করে থাকেন…।" বুদ্ধদেব বসু (মেঘদূত : পৃ : ৯)। বুঝিবা, তিনি সত্যতা,

বসুন্ধরা বা জীবন ও ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্যকেই 'নারী' শব্দে অঙ্কিত করেছেন, সম্বোধনে 'নারি' ব্যবহার করেছেন। নারা শব্দটিকে বিভিন্ন অনুসঙ্গে ব্যবহার করা সত্ত্বেও ঐক্যপ্রস্থানে বিশিষ্ট অর্থ লক্ষ্য করা যায়। সেই অর্থে 'নারীর' ব্যঞ্জনা স্থায়ী, সুতরাং নারী শব্দটি একটি প্রতীক বা সিম্বল। কয়েকটি উদ্ধৃতিতে অর্থ অনেক স্পষ্ট হবে।

ক। সমস্ত ক্লান্ত হতাহত গৃহবলিভূকদের রক্তে
মলিন ইতিহাসের অন্তর ধুয়ে চেনা হাতের মতন ঃ
যাকে আবহমান ভালোবেসেছি সেই নারীর।

খ। তবুও তোমায় জেনেছি, নারি, ইতিহাসের
শেষে এসে ; মানব প্রতিভার
রূঢ়তা ও নিষ্ফলতার অধম অন্ধকারে
মানবকে নয়, নারি, শুধু তোমাকে ভালোবেসে
বুঝেছি নিখিল বিষ কী রকম মধুর হতে পারে।

গ। চারি দিকে সৃজনের অন্ধকার রয়ে গেছে, নারি,
অবতীর্ণ শরীরের অনুভূতি ছাড়া আর ভালো
কোথাও দ্বিতীয় সূর্য নেই।

ঘ। গভীর রৌদ্রে সীমান্তের এই ঢেউ—অতিবেল সাগর, নারি, সাদা হতে হতে নীলাভ হয় ; প্রেমের বিসার মহীয়সি, ঠিক এ-রকম আধা নীলের মত, জ্যোতির মত··· ইত্যাদি ইত্যাদি

কিন্তু এই চিরন্তনী পৃথিবীতে আছে কিনা, কবিরও জানা ছিল না, তাই "তুমি যে-এ পৃথিবীতে রয়ে গেছ | আমাকে বলেনি কেউ। | কোথাও জলকে ঘিরে পৃথিবীর অফুরান জল | রয়ে গেছে···।" কিন্তু আমাদের পৃথিবীতে এতকাল সেই শুশ্রূষার প্রতীক নারীকে নিয়ে কতই হেলা ফেলা। ক্ল্যাসিকাল যুগের সৈন্যবাহিনীর শিবিরে "মাতাল সেনানায়করা | মদকে নারীর মত ব্যবহার করছে, | নারীকে জলের মতো," যেখানে "শুধু বাতাস উড়ে আসছে | স্খলিত নিহত মনুষ্যত্বের শেষ সীমানাকে | সময় সেতুলোকে বিলীন করে দেবার জন্যে, | উচ্ছ্রিত শববাহকের মূর্তিতে।" কবি এই নারীকে তো মহীয়সি বলে আহ্বান করেছিলেন, ভেবেছিলেন 'তোমাকে আমেরিকার কংগ্রেস-ভবনে দেখতে চেয়েছিলাম, কিংবা ভারতের ; | অথবা ক্রেমলিনে কি বেতসতন্বী সূর্য শিখার

কোনো স্থান আছে। যার মানে পবিত্রতা শান্তি শক্তি শুভ্রতা। সকলের জন্যে।...কোন রাষ্ট্র কি নেই আজ আর। কোন নগরী নেই। সৃষ্টির মরালীকে যা বহন ক'রে চলেছে মধু বাতাসে। নক্ষত্র—লোক থেকে লোকান্তরে! (সময়ের তীরে)" মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্যে অবশেষে বলেন "হয়তো-বা মানবের সমাজের শেষ পরিণতি গ্লানি নয়। হয় তো বা মৃত্যু নেই, প্রেম আছে, মানুষের অগ্রসর আছে, আমরা আজকে এই বড় শতকের। মানুষেরা সে আলোর পরিধির ভিতরে পড়েছি। আমাদের মৃত্যু হয়ে গেলে এই অনিমেষ আলোর বলয়। মানবীয় সময়কে হৃদয়ে সফল-কাম সত্য হতে বলে। জেগে রবে....." অথচ সেই নারী, যে ইতিহাস, সেই

"এক নারীর মতন,
জীবন ঘুমিয়ে আছে, তবু তার আঁকা বাঁকা অস্পষ্ট শরীর
নিশির ডাকের শব্দ শুনে বেবিলনে পথে নেমে
উজ্জয়িনী গ্রীসে রেনেসাঁসে রুষে আধোজেগে, তবু,
হৃদয়ে বিকিয়ে গিয়ে ঘুমায়েছে আর একবার
নির্জন হ্রদের পারে জেনিভার পপলারর ভিড়ে
লোকার্ণো হ্বোসাই মিউনিখ অতলন্তের চার্টারে
ইউ-এন-ওয়ের ভিড়ে আশা দীপ্তি ক্লান্তি বাধা ব্যাসকূট বিষ—
আরো ঘুম—রয়ে গেছে হৃদয়ের—জীবনের।...নারী,
(পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে)

এই নিদ্রামগ্ন সময়ের ইতিহাস নারী, মানুষের সর্বব্যাপ্ত কল্যাণে এখন সেই "রাতের স্রোতে মিশে থেকে সময়ের হাতে দীর্ঘতম। রাত্রির মতন কেঁপে মাঝে মাঝে বুদ্ধ যোক্রাতেস। কনফুচ লেনিন গ্যেটে হোল্ডেরলিন রবীন্দ্রের রোলে। আলোকিত হতে চায়,। তথাপি

"—বেলজেনের সব-চেয়ে বেশি অন্ধকার
নিচে আরো নিচে নিচে টেনে নিয়ে যেতে চায় তাকে';
পৃথিবীর সমুদ্রের নীলিমায় দীপ্ত হয়ে ওঠে
তবুও, ফেণার ঝর্ণা,—রৌদ্র প্রদীপ্ত হয়,—মানুষের মন
সহসা আকাশ পথে বন হংসী-পাখীর বর্ণালি..."।

জীবনানন্দ কোন কবিতার সত্য আজীবন ধরে বোঝাতে চেয়েছেন, তার মানে তখন বোঝা যায়। বোঝা যায়, আমাদের পৃথিবীতে, যেখানে জনমানব

মনুষ্যত্বহীনতায় মৃত, যেখানে, যার মনুষ্যত্ব উদ্বোধন না করে শতাব্দীগুলি কেবল অত্যাচারের প্লাবন বহে এনেছে, সেই চাষী,

'সে যেন প্রস্তর খণ্ড স্থির
নড়িতেছে পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তের সাথে ;
পুরাতন ছাতকুড়ো ঘ্রাণ দিয়ে
নবীন মাটির ঢেউ মাড়াতে মাড়াতে।
তুমি কি প্রভাতে জাগ ?
সন্ধ্যায় ফিরে যাও ঘরে ?
আস্তীর্ণ শতাব্দী বহে যায়নি কি
তোমার মৃত্তিকাঘন মাথার উপরে ?

ক্রমশঃ আমাদের শাশ্বতী নারী, আমাদের জীবনের সেই বিভিন্ন পরিচিত মানুষ; চাষী প্রভৃতি ; সেই অনুভবগুলি, প্রেম, শ্রদ্ধা ভালোবাসা আজ পৃথিবীতে অতি করুণ যন্ত্রণার হৃদয়হীন শাসনে পিষ্ট। তাই সেই শাসনের সৈন্যবাহিনী যুদ্ধপ্রস্তুতিতে চরম আঘাত হানতে চায়,

"ফ্যাক্টরীর সিটি এসে ডাকে যদি
ট্রেন কামানের শব্দ হয়,
লরিতে বোঝাই করা হিংস্র মানবিকী
অথচ অহিংস নৃত্য মৃতদের ভিড়
উদ্দাম বিভবে যদি রাজপথ ভেঙ্গে চলে যায়,
ওরা যদি কালোবাজারের মোহে মাতে,
নারী মূল্যে অন্ন বিক্রি করে,
মানুষের দাম যদি জল আহা,
বহমান ইতিহাস মরু কণিকার
পিপাসা মিটাতে... ..."

তখন মানুষ কি নিয়ে বাঁচবে, কবি তবু বিশ্বাস হারাবেন না,

'নবীন নবীন জনজাতকের কল্লোলের ফেনশীষো ভেসে
আর একবার এসে এখানে দাঁড়াব।
যা হয়েছে—যা হতেছে—এখন যা শুভ্র ঋণ হবে
সে বিরাট অগ্নিশিল্প কবে এসে আমাদের ক্রোড়ে করে লবে।"

(মৃত্যু স্বপ্ন সঙ্কল্প)

তাই, জীবনানন্দের কবিতায় মানুষের পুনরুত্থানের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। মেগাটন পরমাণবিক বোমার ভবিষ্যত ভেবে তিনি মানুষের ভবিষ্যতে সন্দীহান হয়েছিলেন। তাঁর নিকটে আমরা জেনেছিলাম, ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি | ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মত শত-শত | শত জল ঝর্ণার ধ্বনি।"

৩। জীবনানন্দ দাশ যদিও প্রতীকাশ্রয়ী কবি, তথাপি তাঁর কবিতায় অঙ্গ প্রসাধনে অনিবার্য ভাবে এসেছে চিত্রকল্পের প্রাবল্য। তাঁর কবিতা চিত্ররূপময় একথা আমরা আগেই জেনেছিলাম। বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন 'তাঁর কাব্য বর্ণনা বহুল, তাঁর বর্ণনা চিত্রবহুল এবং তাঁর চিত্র বর্ণবহুল।'

জীবনানন্দ দাশ কখনই টি, ই, হিউমের মতাদর্শানুযায়ী 'hard, dry, classical' কবিতার মতাদর্শ গ্রহণ করেন নি। যদিও হিউম বিশশতকের গোড়াতেই 'Imagist আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন। এজরা পাউণ্ডের মতানুযায়ী কবিতার মূল বিষয়ের মধ্যে logopoeia, imagism এবং Melopoeia অন্যতম প্রধান দিক! আমরা হিউমের মত অতটা বাড়াবাড়ি করে নাও যদি বলি রোমান্টিক কবিবৃন্দ "in the least element of beauty···a total intuition of the whole world" প্রত্যাশা করতেন, তবুও বলতে দ্বিধা নেই জীবনানন্দ দাশের বিষয় বস্তুর objective correlative হিসাবেই এসেছে বর্ণনা, এবং বর্ণনাকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দেবার জন্যে, কবির হৃদয়ের ভার লাঘব করবার জন্য ইমেজ প্রয়োজন হয়েছে, যা "presents an intetllectual and emotional complex in an instant of time'···। বেলা অবেলা কালবেলার বহু কবিতায় অবশ্যই বর্ণনার বাহুল্য আছে, তবু ইমেজের সহায়তায় তাৎক্ষণিক মুক্তি (sudden liberation) আমাদের— কবির সত্যতার নিকটে পৌঁছিয়ে দেয়। তবে জীবনানন্দ দাশ অধিক চিত্র ব্যবহার করেন, চিত্রকল্পের প্রতি কখনও কখনও তাঁর অমনোনিবেশও লক্ষ্য করা যায়। বিষয় বস্তুর সঙ্গে চিত্রের সহধর্মিতাগত Correspondence— এ-ক্ষেত্রে আমাদের নিকটে কবিতার গভীরে প্রবেশ করার প্রধান পন্থা। এবং বর্ণনা বাহুল্য থাকা সত্বেও "It is only when you get these fresh metaphors and epithet employed that you get this vivid conviction which constitutes the purely aesthetic emotion that can be got from imagery.' জীবনানন্দ দাশ অজস্র methephor

উপমা, image, এবং picture-এর সহায়তায় কাব্য সত্যের নিকটে আমাদের পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক ঃ—

১। প্রতিটি প্রাণ অন্ধকারে নিজের আত্মবোধের দ্বীপের মতো—
কি এক বিরাট অবক্ষয়ের মানব সাগরে।

২। সারাটি দিন মীনরৌদ্র মুখর জলের স্বর—

৩। উঁচু গাছের ধূসর হায় চাঁদ নাকি সে পাখি...
বসে আছে এই প্রকৃতির পলকে নিবিড় হয়ে—

৪। সকালে শিশিরকণা যে রকম ঘাসে
অচিরে মননশীল হয়ে তবু সূর্যে আবার
মৃত্যু মুখে নিয়ে পরদিন ফিরে আসে।

৫। না মরে অমর যারা তাহাদের স্বর্গীয় কাপড়
কোঁচকায়ে পৃথিবীর মসৃণ গিলা

৬। চুলের ভিতরে উঁচু পাহাড়ের কুসুম বাতাস

৭। নদীর ভিতরে জলে তলতা বাঁশের
প্রতিবিম্বের মতন নিখুঁত

৮। তুষার ধূসর ঘুম খাবে তারা মেরুসমুদ্রের মত অনন্ত ব্যাদানে

৯। কত সব ধূসর বাড়ির
আমলকী পল্লবের ফাঁক দিয়ে নক্ষত্রের ভিড়
পৃথিবীর তীরে-তীরে ধূসরিম মহিলার নিকট সন্নত
দাঁড়ায়ে রয়েছে কত মানবের বাষ্পাকুল প্রতীকের মতো—

১০। শুভ্র অপলক সব শঙ্খের মতন
আমাদের শরীরের সিন্ধু তীর।

১১। ও কার গরুর গাড়ি রয়ে গেছে ঘাসে ঐ পাখা মেলে ফড়িঙের মত

১২। আঁকা-বাঁকা শিং ছুঁয়ে তাদের মেরুণ গোধুলির
মেঘগুলি লেগে আছে... ইত্যাদি ইত্যাদি।

শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও জীবনানন্দ এ ক্ষেত্রেও প্রায় ফিউচারিষ্টদের মত। যেমন শব্দ প্রয়োজন হয়েছে, অতি উক্ত পথচারীর শব্দের মত ঘষা শব্দ, নির্ভেজাল শব্দকোষগন্ধী শব্দ, সকল ধরনের শব্দ, এমন কি ইংরাজি অভিব্যক্তি সহ অভারতীয় নামবাচক বিশেষ্য পাওয়া যেতে পারে। শব্দগত ছ্যুৎমার্গের ঊর্ধ্বে জীবনানন্দ দাশ মানুষের সক্রিয় কার্যকলাপের অতিসাধারণ শব্দকে

অসাধারণত্বের মর্যাদা দিয়েছেন। তাই কবিকে হিউমের ভাষায় সব সময়েই শব্দ ব্যবহারে সচেতন থাকতে হয়েছে "the concentrated state of mind, the grip over one-self which is necessary in the actual expression of what one see." কেননা কবিতা "first chooses fresh epithets and fresh metaphors, not so much because they are new···but because the old cease to convey a physical thing and become abstract contours,' এ-জন্য জীবনানন্দ দাশ আমাদের পরিচিত জগতের অপরিচিত শুদ্ধ মানুষ—যার 'গানের আলোয় আমরা ভুবন খানি'র সহজেই স্বাদ পাই।

জীবনানন্দের কবিতার ছন্দ প্রবাহিত পয়ারের অনর্গলতার মধ্যে প্রায়সই অসীম। সূর্য, রৌদ্র প্রভৃতি শব্দকে তিনি তিন মাত্রা সচরাচর ধরেন, কিন্তু পূর্ণ দুই মাত্রা, অথচ উদ্বাহ চার মাত্রায়। এই ভাবে যুগ্মশব্দের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রা ধরা লক্ষ্য করা যায়। অথচ ঐ একই শব্দকে অন্যমাত্রার বদলে ফেলে মাত্রাবৃত্তেও প্রয়োগ করেন। তথাপি ধূসর পাণ্ডুলিপির ছন্দ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু যা বলেছিলেন 'বেলা অবেলা কালবেলায়' সেই উক্তি অনেক খানি গ্রাহ্য কবিতাগুলি "পয়ার জাতীয় ছন্দে—বেশিরভাগ অসম মাত্রা, ···ছন্দ মন্থর, যে ইচ্ছে করে ভাঙা, ভাঙা অসমান ও পালিশ-না-করা, এ ছন্দ সোম-সোম-ঘুরে-ঘুরে চলে, ঘুমে-ভরা সুর, স্বপ্নে-ভরা, শিশির-কোমল,···" শ্রীযুক্তা দীপ্তি ত্রিপাঠী যথার্থই লক্ষ্য করেছেন "জীবনানন্দের ছন্দের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্নতা। তার কবিতায় কলাকৌশলের অভাব নেই···মিল, অনুপ্রাস, পুনরুক্তিতে যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে।"

৪। জীবনানন্দ দাশের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থে কবিকে আরও নতুন করে চেনা গেল। কিন্তু তাঁর অপ্রকাশিত কবিতার সংখ্যা শুনেছি কম নয়। তাঁর জীবিতাবস্থায় মুদ্রিত বহু কবিতাই মুদ্রিত পুস্তকাকারে পাওয়া যায় না। শ্রীঅশোকানন্দ দাশ আমাদের সঙ্গে সংক্রান্তির যুগসন্ধিতে বেলা-অবেলা কালবেলা প্রকাশ করে আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। বইটির মুদ্রণ, অঙ্গসজ্জা এবং প্রচ্ছদপট উচ্চরুচি বহন করে। প্রকাশকের বক্তব্য অনুযায়ী কবির জীবিতকালে প্রকাশিত প্রায় সব কটি কবিতাই পরে কবি কর্তৃক কমবেশি পরিমার্জিত হয়েছিল।' কবির সেই অবিনাশী উক্তি।

'আশা নিরাশার থেকে মানুষের সংগ্রামের জন্মজন্মান্তর···প্রিয়দের
প্রাণে তবু অবিনাশ, তমোনাশ আভা নিয়ে এসে স্বাভাবিক মনে হয়ঃ
উর ময় লণ্ডনের আলো ক্রেমলিনে না থেমে অভিজ্ঞভাবে চলে যায়
প্রিয়তর দেশে'

মনে রেখে, আমরা কবি জীবনানন্দ দাশের মানুষের সুখী ও শান্তির ভবিষ্যত মনে রেখে উচ্চারণ করতে ভরসা পাই মন্ত্রের মত ঃ

হে পাবক, অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে
তোমার পবিত্র অগ্নি জলে।
অমামরী নিশি যদি সৃজনের শেষ কথা হয়,
আর তার প্রতিবিম্ব হয় যদি মানব হৃদয়,
তবুও আবার জ্যোতি সৃষ্টির নিবিড় মনোবলে
জ্বলে ওঠে সময়ের আকাশের পৃথিবীর মনে ;
বুঝেছি ভোরের বেলা রোদে নীলিমায়,
আঁধার অরব রাতে অগণন জ্যোতিষ্ক শিখায় ;
মহাবিশ্ব একদিন তমিস্রার মত হয়ে গেলে
মুখে যা বলনি, নারি, মনে যা ভেবেছ তার প্রতি
লক্ষ্য রেখে অন্ধকার শক্তি অগ্নি সুবর্ণের মতো
দেহ হবে মন হবে—তুমি হবে সে সবের জ্যোতি।

আমাদের দেশে উক্তি প্রত্যুক্তির অবিচারের জগতকে নির্বাসিত কবি জীবনানন্দ দাশের পূর্ণতর বিচার ও মূল্যায়নের প্রতীক্ষা করি।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা'

শান্তি সিংহরায়

প্রসঙ্গটি বহুশ্রুত। এর আলোচনাও কম হয় নি। স্বয়ং কবি বহু পত্রে ও প্রবন্ধে এই বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। এই সম্পর্কে লেখা কবিতাও একাধিক। এবং বহু কবিতায় ও গানে এই প্রসঙ্গ বারে বারে এসে পড়েছে। এই সব কবিতা ও গান উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয় রসানুভূতির প্রমাণ দেওয়া হয়। এবং রবীন্দ্রনাথ যে অমর্ত্যপ্রেমিক মিষ্টিক কবি সেই সম্পর্কেও একটা সিদ্ধান্ত করা হয়। তাই পুরাতন হলেও এ প্রসঙ্গটি নিয়ে আরও আলোচনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি।

কাব্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে কবিমনে রহস্যবোধের একটা গৌরবময় ভূমিকা আছে। কাব্যসৃষ্টির আনন্দে ও বিস্ময়ে আদি কবি যেমন এর স্বরূপ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তেমনি জিজ্ঞাসা আজও কবিদের কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্চারিত হয়। কাব্যের মত একটি অপূর্ব বস্তু নির্মাণ করবার মত প্রতিভাকে বোঝবার ও জানবার কৌতূহল অত্যন্ত স্বাভাবিক। সৌন্দর্যপ্রবণ রোমাণ্টিক কবিচিত্তে এই কৌতূহল আরও অদম্য। এই কৌতূহল থেকেই রবীন্দ্রচিত্তের জীবনদেবতা-জিজ্ঞাসা।

একেবারে অচলিত রবীন্দ্র-রচনাবলী বাদ দিয়ে 'সন্ধ্যা সংগীতে' কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিস্ময় ব্যক্ত হয়েছে। তবে সে বিস্ময় কাব্যকলা সম্পর্কেই বেশি। সন্ধ্যাসংগীতে কবি 'ইচ্ছা করিয়া নহে কিন্তু স্বভাবতই' বিহারীলালের তিনমাত্রার ছন্দের শাসন থেকে মুক্ত হলেন। তাই কবির বিস্ময়। কিন্তু প্রভাতসংগীতের বিস্ময় অন্য প্রকার। বিশ্বের বিচিত্রসুন্দর রূপের প্রতি দুবাহু বাড়িয়ে কবি তাকে আলিংগন করলেন। এবং বললেন যে, প্রাণের পরে রবির কর কেমন করে প্রবেশ করল তা তিনি বুঝতে পারছেন না। তাঁর হৃদয় দুয়ার কেমন করে খুলে গেল এবং জগৎ এসে সেখানে কেন ও কিভাবে কোলাকুলি করল তাও কবি বুঝতে পারছেন না। এই রহস্য সম্পর্কে কবির জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। আরও কিছু পরে কয়েকটি কবিতায়

(অন্তর্যামী, জীবনদেবতা, মানসসুন্দরী প্রভৃতি) এবং ১৩১১ সালের একটি প্রবন্ধে (আত্ম-পরিচয় গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ) এই সম্পর্কে কিছু বক্তব্য পরিবেষণ করেছেন। পরে আরও করেছেন। এক নজরে সেগুলি দেখা যাক্।

রবীন্দ্রনাথের মতে তিনি যে কবিতা লিখ্ছেন সে এক আকস্মিক ব্যাপার এবং এ-ব্যাপারে তাঁর কোন হাত নেই। তিনি বলেছেন 'আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই—এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম তখন মনে করিয়াছি, আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে'। অর্থাৎ কবি বলতে চাইছেন যে কে যেন তাঁর চোখে সুন্দরের কাজল পরিয়ে দিয়েছে বলেই তিনি পৃথিবীকে সুন্দর দেখছেন এবং কোন এক অদৃশ্য শক্তি তাঁকে দিয়ে বিচিত্রসুন্দরের বাঙ্ময়ী মূর্তি রচনা করিয়ে নিচ্ছে। কবি এ সম্পর্কে নিজেই আরও বলেছেন যে তাঁর মধ্যে একটা 'গূঢ় চৈতন্যের' আলো জ্বললেই তিনি নিজেকে বিশ্বের বহুবৈচিত্র্যের সঙ্গে এক করে দেখতে পারেন। এবং এই দেখাকেই কবি সমগ্রভাবে দেখা বলেছেন। 'নিজের ভিতরকার এই প্রাণময় রহস্যের কথা' প্রসঙ্গে কবি আরও বলেছেন যে কেবল কবিতা লেখার ব্যাপারেই এঁর কর্তৃত্ব শেষ হয় নি। সেই সঙ্গে সঙ্গে কবি এটাও দেখেছেন যে তিনিই কবির জীবনের 'সমস্ত সুখ-দুঃখ ও তাহার যোগ-বিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে' গেঁথে রাখছেন। কবি এই কথা বলতে বলতেই আরও একটা কথা বলেছেন। কথাটি শুনতে সাদাসিধে কিন্তু বেশ তাৎপর্যময়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে আমরা সকলেই সাংসারিক, জীবনের একটা ছোট্ট পরিধির মধ্যেই বিচরণ করতে চাই। কিন্তু সেই সংসার জীবন থেকে এক অদৃশ্য শক্তি—এক নিগূঢ় কামনা আমাদের প্রকৃতি জগতের দুর্গম সুন্দরের অভিসারে বারে বারে টেনে নিয়ে যায়। এরই ফলে জীবনে একটা পরিপূর্ণতা আসে। জীবনের এই পরিপূর্ণতা যিনি সম্পাদন করেন তিনিই রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা। এই জীবন দেবতার কল্যাণেই রবীন্দ্রনাথের ইহজীবনই কেবল ধন্য হয় নি তিনি একটা চিরন্তন জীবনও অর্জন করেছেন। কবির বিশ্বাস যে 'অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন

করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেই জন্য এই জগতের তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি, সেইজন্য এত বড় রহস্যময় প্রকাণ্ড জগতকে অনাত্মীয় বলিয়া মনে হয় না··· আমার স্বাতন্ত্র্যগর্ব নাই, বিশ্বের সহিত আমার কোন বিচ্ছেদ স্বীকার করি না। রবীন্দ্রনাথ কেন, কোন প্রকৃতিপ্রেমিক কবিই এই বিচ্ছেদ স্বীকার করেন না। জীবনদেবতা সম্পর্কে এসব ব্যাখ্যা পরিণত বয়সের। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের কোন কোন ঘটনায় এই ভাবনার অঙ্কুরোদ্গম লক্ষ্য করা যায়। উপনয়নের পর যখন গায়ন্ত্রীমন্ত্র জপ করতেন তখন সেই মন্ত্রের কয়েকটি কথা (ভূর্ভুবঃ স্বঃ) তাঁর মনটাকে প্রসারিত করে দিত। কখনও কখনও এই মন্ত্র জপ করতে করতে তাঁর দুচোখ বেয়ে জল পড়ত। কবির অন্তরের অন্তঃপুরে তখন যা ঘটত স্পষ্ট ভাষায় তিনি তা বলতে পারেন নি বটে তবে এটা বোঝা যায় যে এই মন্ত্র থেকেই তিনি বিশেষ করে বিশ্বের প্রতি নিজের কৌতূহল বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। 'বাহিরের ঘটনা, বাহিরের জীবনের সমস্ত চিন্তা ও আবেগের গভীর অন্তরালে যে মানুষটা বসিয়া আছে' সেই জীবনদেবতার আবির্ভাব কেবল কাব্যেই নয়—জীবনের মর্মমূলেও লক্ষ্য করা যায়।

এত কথার পরেও একটা কথা ওঠে যে এই জীবনদেবতা কি কোন শাস্ত্রীয় দেবভক্তির কাব্যাভিব্যক্তি? এ সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ চমৎকারভাবে বলেছেন "আমি যখন জন্মেছিলুম তখন আমাদের সমাজের যে-সকল প্রথার মধ্যে অর্থের চেয়ে অভ্যাস প্রবল তার গতায়ু অতীতের প্রাচীরবেষ্টন ছিল না আমাদের ঘরের চারিদিকে। বাড়ীতে পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত পূজার দালান শূন্য পড়েছিল, তার ব্যবহার পদ্ধতির অভিজ্ঞতা আমার ছিল না।···এ কথা বলার তাৎপর্য এই যে, জন্মকাল থেকে আমার যে প্রাণরূপ রচিত হয়ে উঠেছে তার উপর কোন জীর্ণ যুগের শাস্ত্রীয় অবলেপন ঘটেনি। তার রূপকারকে আপন নবীন সৃষ্টিকার্যে প্রাচীন অনুশাসনের উদ্যত তর্জনীর প্রতি সর্বদা সতর্ক লক্ষ্য রাখতে হয়নি। জীবনদেবতা যে কোন ধর্মীয় দেবতা নয় তা বোঝার জন্যে কবির এই উক্তিই যথেষ্ট বলে মনে করি।

তবে একটা প্রশ্ন মনে জাগে। আত্মপরিচয়ের বিভিন্ন রচনায় জীবনদেবতা তত্ত্ব দিয়ে আলোচনাই কি এই সম্পর্কে কবির শেষ বক্তব্য? এবং এই বক্তব্যই কি আমাদের পক্ষে নির্বিচারে গ্রহণীয়? একটু জিনিষ কিন্তু লক্ষ্য করতে

হবে। বিশ্বের সংগে একাত্মতার কথা বলতে বলতে কবি কেবলই জল স্থল অন্তরীক্ষের কথাই বলেছেন। তা থেকে মনে হয় কবির প্রশ্ন যেন প্রকৃতি প্রেমের স্বরূপ সম্পর্কেই। জীবনের যে অখণ্ড পরিণামের কথা বলেছেন তার মধ্যে কি কেবল প্রকৃতিহৃদয়ই স্পন্দিত হবে না মানবহৃদয়েও স্পন্দন শোনা যাবে? কবির বিস্ময়ের মূলে রয়েচে প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ। মানুষের হাসি কান্না কেন তাকে করে ও মনে বিচিত্র অনুভূতির জাগায়—এ নিয়ে কিন্তু বিশেষ কোন বিস্ময় নেই। এর অর্থ মোটেই এই নয় যে রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধে মানুষের কোন ভূমিকা নেই। বরং তার ঠিক বিপরীত। মানবের অপরাজেয় মহিমা একটু বেশি করেই তিনি বলেছেন। কথাটা হচ্ছে মানুষের সংগে তাঁর বিচিত্র সম্পর্ক থেকে তাঁর মনে যে সমস্ত অনুভূতি জাগে, সেগুলি যেন তিনি বুঝতে পারছেন। তাই সে সম্পর্কে কোন রহস্যবোধও নেই—জিজ্ঞাসাও যেন নেই। প্রকৃতি জগতের আভাস ইংগিত কেন তার মনে বিচিত্র সংগীতের সৃষ্টি করে—তাই নিয়ে কবির কত বিস্মিত প্রশ্ন!

রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার আলোচনায় জীবনদেবতার স্বরূপ কখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নি। কবির জীবনে জীবনদেবতার প্রভাবের কথাই বিশেষ করে আলোচিত হয়েছে। সেই প্রভাব, অর্থাৎ জীবনদেবতা কবির জীবনে কি কি কাজ করেন, জীবনের কি রূপান্তর ভাবান্তর ঘটান সেগুলি বিশ্লেষণ জীবনদেবতার স্বরূপ হয়ত কিছুটা উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। এই আলোচনার একেবারেই গোড়াতেই এ বিশ্লেষণ একবার দাখিল করেছি। আবার করছি।

প্রথমত—জীবনদেবতা কবিকে বিশ্বের বহুবৈচিত্র্যের সংগে এক করে দেন। কবি বলতে চান, এই পৃথিবীর সৌন্দর্য যে কবিকে আকৃষ্ট করেছে, বিমুগ্ধ করেছে এবং এর সংগে কবি-কল্পনার নিবিড় মিতালি ঘটেছে—তা এই জীবনদেবতারই অদৃশ্য প্রভাবে। জৈব প্রয়োজনের স্থূল তাগাদা বোধগম্য কিন্তু বিশ্বভুবনের মোহিনীমায়া কোন গোপনপথে মানব দুয়ারে এসে হাজির হয়, এই রহস্যটার একটা নামকরণ করলেন কবি। আদিম মানুষ থেকে আরম্ভ করে তার আধুনিকতম বংশধরের মনে পৃথিবীর ঋতুরঙ্গ, দিবারাত্রির নানা প্রহরে বিচিত্র রূপরঙ্গ এবং জলস্থলের বিচিত্রসৌন্দর্য নানা অনুভূতির সঞ্চার করেছে। কবি ও শিল্পীরা এই অনুভূতির রূপরচনা করেন বলেই এঁদের মনে একটা জিজ্ঞাসা জাগে। সেই জিজ্ঞাসার উত্তরই রবীন্দ্রনাথ

দিয়েছেন জীবনদেবতা নামে। কবির প্রতিভাই কবিকে সৌন্দর্যব্যাকুল করে—কবির প্রতিভাই তাঁকে বিশ্বপ্রকৃতির অনুরাগী করে তোলে। এই প্রতিভাই কবির জীবনদেবতা। দ্বিতীয়ত—রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখগুলি স্বতন্ত্রভাবে না রেখে এক অখণ্ড তাৎপর্যের অন্তর্ভূত করেছেন। সুখদুঃখ, ভালমন্দকে আলাদা করে না দেখে সব অভিজ্ঞতাকে এক করেই একটা পরিপূর্ণ জীবনবোধ রবীন্দ্রনাথের গড়ে উঠেছিল। যার অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে সে কথা রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠকদের অজানা নয়। রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে এই পরিপূর্ণতার বোধ রবীন্দ্রনাথ অর্জন করেছিলেন জীবনদেবতার কল্যাণে। কিন্তু এ তথ্যও সুবিদিত যে ভালমন্দকে এক করে দেখবার মত যে মনটা তাঁর গড়ে উঠেছিল তার পেছনে আছে পারিবারিক শিক্ষাদীক্ষা ও অভ্যাসকে ভিত্তি করে জীবন সম্পর্কে একটা স্বরচিত বা স্বোপার্জিত সংজ্ঞা। এগুলিই তাঁর জীবনদেবতার আরেক পরিচয়। তৃতীয়ত—কবি বলেছেন যে কবি—ইহকালের নয়, চিরকালের সামগ্রী। অর্থাৎ কবির এই বিশ্বাস ছিল যে সৃষ্টির প্রথম থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত একটা প্রাণের লীলা চলছে। তারই বিচিত্র প্রকাশ জগতের দিকে দিকে—জড়ে ও জীবনে এবং কবির নিজের জীবনেও। যা কেবল দু দণ্ডেই ক্ষয়ে যায় না চিরকালের সঙ্গে নিজের এই নিবিড় আত্মীয়সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন জীবনদেবতা। জগত ও জীবন গঠনে যে একটা বিবর্তন নিয়ত চলছে সেই সম্পর্কে বিজ্ঞানসুলভ সচেতনার সবিস্ময় নামকরণ হয়েছে জীবনদেবতায়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার এই পরিচয় কোথাও কোথাও স্পষ্টতর। কবিকণ্ঠে যখন শুনি যে—

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে
জ্বলে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর',
সুন্দর হল সে।
তুমি বলবে, এ যে তত্ত্বকথা, এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য।

তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না যে কবি শেষ পর্যন্ত জীবনদেবতার স্বরূপ বুঝতে পেরেছেন। এবং আমাদেরও বুঝতে অসুবিধে হয় না যে কবিচিত্তই জীবনদেবতা।

মানবপ্রকৃতির পরিবর্তন কি সম্ভব?

জে. বি. এস. হলডেন

[জীববিজ্ঞানী হলডেন লণ্ডনের সুবিখ্যাত 'ডেলি ওয়ার্কার' কাগজের নিয়মিত লেখক ছিলেন কিছুকাল আগে। সমকালীন সমাজের বিভিন্ন প্রশ্নে তাঁর বৈজ্ঞানিক মন আলোড়িত হোতো। বর্তমান প্রবন্ধটি : Can we change human nature?" তারই এক নিদর্শন। পূর্বোক্ত অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী দীপ্তি সরকার। —সম্পাদক।]

'আমরা কি ক্রমেই আমাদের নীতিবোধ হারাচ্ছি?'—এই বিষয়ে সম্প্রতি একটা বক্তৃতা দেবার পর একজন আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'মানবপ্রকৃতির পরিবর্তন কি সম্ভব?' এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই, কারণ আমি জানি না যে 'মানবপ্রকৃতি' বলতে ঠিক কী বোঝায়। কিন্তু যদি প্রশ্নটাকে আমরা আরো ধরাছোঁয়ার মধ্যে আনি, বলি, 'লোকে যা করতে চায়, তা কি কেউ বদলে দিতে পারে?'—এর উত্তর নিঃসন্দেহে হবে—হ্যাঁ। এক ধরনের সমাজে প্রতিযোগিতার মনোভাব খুব জোরালো, যদিও তা কোথাও অর্থের জন্য, কোথাও খ্যাতির জন্য, কোথাও বা নরক-যন্ত্রণা এড়াবার জন্যে। অন্য কোনো সমাজে হয়তো সহযোগিতার মনোভাব অনুরূপ জোরালো। লোকে সেখানে সকলের সঙ্গে এবং সকলের জন্যেই কাজ করতে চায়, কাউকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেবার ইচ্ছেতে নয়। খুব সম্ভবত এ দুয়ের মিলনই কাম্য, যেখানে সবাই চাইবে কাজের হতে, কিন্তু অন্যের চেয়ে বেশি কাজের হতে পারলে খুশীই বোধ করবে।

কোনো বৈজ্ঞানিকের মনে এই ধরনের কোনো প্রশ্ন জাগলে তিনি প্রাণী

কোন ক্রমেই তারা যে জাতের ইঁদুরের সঙ্গে একত্রে থেকেছে, তাদের মারেনি। বরং তারা এদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেছে। 'খ' শ্রেণীর কুড়ির মধ্যে নয়টি ছানা ইঁদুর মেরেছে। তারা বড়ো জাতের চেয়ে ছোট জাতের নেংটি ইঁদুর মেরেছে। যদি কখনো বড়ো জাতের কোনো ইঁদুর তারা মেরেও থাকে তবু তারাও সাধারণতঃ নেংটি ইঁদুরই বেশি। কিন্তু শিকারে ছানাগুলির অর্দ্ধেকেরও কম এই ব্যতিক্রম দেখিয়েছে।

'গ' শ্রেণীর একুশটির মধ্যে আঠারোটি ছানাই শিকারী হয়ে উঠেছে। আর যে জাতের ইঁদুর তারা তাদের মায়েদের শিকার করতে দেখেছে, তারাও সাধারণত সেই জাতের ইঁদুরই মেরেছে প্রথম। খাদ্যের কোন প্রভাবে এদের ওপর পড়েনি। প্রতিটি শ্রেণীর অর্দ্ধেক ছানাকে মাংস খাওয়ানো হোতো, বাকী অর্দ্ধেক নয়। কিন্তু মাংস-ভুক্‌দের মধ্যে হত্যাপ্রবণতা মোটেই বেশি দেখা যায়নি, কেবল এইটুকু ছাড়া, যে ইঁদুর তারা মারতো প্রায়ই তাদের তার খেয়ে ফেলতো। আর পরীক্ষার বারো ঘণ্টার মধ্যে না খেতে পাওয়া এবং সদ্য খাইয়ে আনা বিড়াল ছানাদের আচরণে কোন পার্থক্যই দেখা যায়নি। শিকারের কোন অভিজ্ঞতা না থাকলে ক্ষুধা কোন বিড়ালছানাকে হিংস্র করে তুলতে পারেনি।

পরীক্ষা চলতে লাগল। 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর অহিংস বিড়াল ছানাদের আরো দুমাস সময় দেওয়া হল যখন তারা দেখতে পেতো অন্য বেড়ালরা বড়ো জাতের কিংবা নেংটী ইঁদুর শিকার করছে। 'খ' শ্রেণীর এগারোটির মধ্যে নয়টির স্বভব এই 'প্রচারে' বদলে গেল, কিন্তু 'ক' শ্রেণীর পনেরোটির মধ্যে যারা কোন না কোন জাতের ইঁদুরের সঙ্গে একত্রে থেকেছে, মাত্র একটিরই স্বভাব পরিবর্তন হোলো।

বেড়ালছানাগুলির মধ্যে যে জন্মগত পার্থক্য আছে, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। মিঃ কুয়ো যদি 'গ' শ্রেণীর তিনটি অহিংস ছানাদের বংশবৃদ্ধির সুযোগ দিতেন এবং তারপর তাদের মধ্য থেকে যারা মায়েদের শিকার করতে দেখেও শিকারী হোয়ে উঠ্‌ল না এমন সব ছানাদের বাছাই কোরতেন তাহলে, বা তিনি এমন এক জাতের বিড়াল শ্রেণী নির্বাচন করতে পারতেন যারা কখনো ইঁদুর শিকার করে না। অনুরূপভাবেই বলা যায় যে, 'ক' শ্রেণীর হিংস্র ছানাদের দিয়ে তিনি এক জাতের ভয়ানক হিংস্র বিড়াল গড়ে তুলতে পারতেন। এ ধরণের শ্রেণী গঠন অধস্তন দশম ছানাদের বেলায় সম্ভব

জগৎ থেকে প্রচুর তথ্য পেতে পারেন। প্রাণীদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা চলে, এবং মাকে বা গুরুমশাইকে খুশী করবার জন্যে তাদের খুব আগ্রহ থাকবার কথা নয়। তাই এ ধরনের পরীক্ষা থেকে স্পষ্টতর উত্তর পাওয়া সম্ভব।

এই জাতীয় পরীক্ষার পক্ষে বিড়াল বেশ উপযোগী ; যেহেতু, কুকুরের চেয়ে বিড়ালকে কোনো কিছু শেখানো শক্ত এবং পুরস্কার বা তিরস্কার তার মনে বিশেষ কোনো দাগ রাখে না। আমি এখন যে পরীক্ষার কথা বলছি সেটি করেছিলেন হ্যাংচৌ (Hangchow) বিশ্ববিদ্যালয়ের জিং ইয়াং কুয়ো (Zing Yang Kuo)। তাঁর অন্বিষ্ট ছিল : 'ইঁদুর মারা কি বিড়ালের প্রকৃতিগত ?' তিনি তিন শ্রেণীতে ভাগ করে মোট ৫৯টি বিড়ালছানার উপর পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। 'ক' শ্রেণীর প্রতিটি ছানাকে এক সপ্তাহ বয়সের সময় থেকে ইঁদুরের সঙ্গে রাখা হোতো, তবে মায়ের দুধ না ছাড়া পর্যন্ত সেটা প্রায় এক পক্ষ কাল, তাদের রাতে মায়ের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোতো। 'খ' শ্রেণীর বিড়াল ছানাদের মায়ের দুধ ছাড়ার পর থেকে নিঃসঙ্গ ভাবে আটক রাখা হোতো। অবিশ্যি মাঝে মাঝে পরীক্ষার জন্যে এর ব্যতিক্রম হোতো, সে কথা পরে বলা হচ্ছে। 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর ছানারা কখনো তাদের মায়েদের ইঁদুর শিকার দেখতে পেতো না। 'গ' শ্রেণীর ছানারা সবসময়ে তাদের মায়েদের সঙ্গেই থাকতো। প্রতি চারদিন অন্তর তারা দেখতে পেতো তাদের মায়েরা হয় সাদা ইঁদুর, নয়তো সাধারণ ইঁদুর কিম্বা লাফানো নেংটী ইঁদুর শিকার করছে। শিকার করা ইঁদুর মায়েদের খেতে দেওয়া হোতো না। আর মায়েরা কেবল কোন এক জাতেরই ইঁদুর শিকার করতে পারতো।

এক সপ্তাহ বয়সের পর থেকে প্রতিটি বিড়াল ছানাকে নিয়ে এক ধরণের পরীক্ষা করা হোতো প্রতি চতুর্থ দিনে। ছানাটিকে প্রথমে আধঘণ্টার জন্যে খাঁচায় রাখা হোতো একটা সাদা ইঁদুরের সঙ্গে, তারপরে বড়ো জাতের কোন ইঁদুরের সঙ্গে এবং সবশেষে লাফানো নেংটি ইঁদুরের সঙ্গে। এই পরীক্ষা চালানো হোতো ক্রমান্বয়ে যত দিন না ছানাটি হয় অনেক ইঁদুর মারছে, নয়তো তার বয়স চার মাস হচ্ছে।

পরীক্ষার ফল যা পাওয়া গেছে, তা সর্তহীন ভাবেই সিদ্ধান্তসূচক। 'ক' শ্রেণীর আঠারোটির মধ্যে মাত্র তিনটি ছানাই কেবল ইঁদুর মেরেছে। কিন্তু

[redacted]তো অথবা কয়েক হাজার স্তর অতিক্রম করে হোত, তা আমার জানা নেই কিন্তু গোলমেলে অবস্থার বিহ্বলতা কাটিয়ে বেড়িয়ে আসতে পারে, এমন যোগ্যতাসম্পন্ন ইঁদুর শ্রেণী গড়ে তুলতে অধস্তন দশটি স্তরের পৃথকীকরণই যথেষ্ট।

তা স্বত্বেও এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে বিড়াল ছানাদের মধ্যে জন্মগত কোন পার্থক্য থাকলেও, যার প্রভাব সবচেয়ে বেশি কার্যকরী সেটি হলো শিক্ষা মানুষের বেলায় এটা যে সত্যি, সে কথা নৃতত্ব যথেষ্ট জোরের সঙ্গেই বলে। অবিশ্যি মানুষের বেলায় নীতি ও উদাহরণের প্রভাবটিও স্বীকার্য। আমি কিন্তু আর আর লোকের মতো, এদের খুব মূল্য আছে বলে মনে করি না। উদাহরণত, যে সময় অভিভাবক ছোটদের সঙ্গে খুব সুন্দর ব্যবহার করেন আর যারা করেন না, এ দুই আচরণের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলে তা বোঝা যাবে। যাই হোক, এটি সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত মত, কোন সংখ্যাতাত্বিক বনিয়াদ এর নেই।

কুয়োর পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন জন কোহেন। "মানব-প্রকৃতি, যুদ্ধ ও সমাজ" এই নামে তাঁর একটি বই বেরিয়েছে এর বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি। খুব সুন্দরভাবে সুরু করেও "কোন্ ধরণের সমাজ সংগঠন যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যায় ?" এই মৌলিক প্রশ্নটিকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেন নি। এই প্রশ্নের মার্কসবাদী জবাব ভুল; এ ধরণের বিশ্বাস মিঃ কোহেনের থাকতে পারে। কিন্তু মার্কসীয় মতকে উপেক্ষা করে তিনি মার্কসবাদীদের স্বমতে আনতে পারবেন না। তা সত্ত্বেও বিড়ালছানাদের এই কাহিনী থেকে কুয়ো তাঁর সিদ্ধান্তের পক্ষেই প্রমাণ পেয়েছেন যে মানব প্রকৃতিতে যুদ্ধেচ্ছা একটা বদ্ধমূল অপরিহার্য ধারণা নয়। যদি বাস্তবধর্মী আচরণই আমাদের কাম্য হয়, তাহলে এই সিদ্ধান্তের পরের ধাপটি হবে সেটি দেখানো যে যুদ্ধের মূল কারণগুলি কোন্ জাতের। শ্রেষ্ঠ জাতিতত্ত্বের বা ধর্মতত্ত্বের প্রেরণায় অনুষ্ঠিত যুদ্ধেরও আসল কারণ হোলো প্রধানত অর্থনৈতিক। তখন আমাদের একান্ত ভাবে সচেষ্ট হোতে হবে যুদ্ধের এই অর্থনৈতিক কারণগুলি নির্মূল করার কাজে।

আমার রবীন্দ্রনাথ

রেভারেণ্ড আর আতোয়াঁ

অনেক বড় বড় পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথের দর্শন আলোচনা করেছেন এবং সাধারণত যা হয়ে থাকে, তাঁদের সেই মহৎ কর্তব্য সম্পন্ন করতে গিয়ে নিজেদের দর্শন আলোচনা করবার সুযোগ পেয়েছেন। অন্যেরা রবীন্দ্রনাথকে একজন বড় সাধক হিসাবে দেখেছেন। কিন্তু ভক্তিসাধনার যেটুকু আমি জানি, তা থেকে বলা যায় সাধক তাঁর সমস্ত চিত্ত দিয়ে সম্পূর্ণ, বৈরাগ্যের কঠোর পবিত্রতাকে গ্রহণ করেন এবং এই কারণে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এদের এই গম্ভীর আলোচনা আমি মানতে রাজী নই। নোবেল পুরস্কার পাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ মহৎ কবি, এই মহত্ত্বের ধারণাও বাইরের বিচারপ্রসূত বলে আমার কাছে ঠিক মনে হয়না। সবশেষে, পণ্ডিতেরা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের বিকাশ অনুধাবন করার চেষ্টা করে বাংলা ভাষায় তাঁর অদ্বিতীয় আসন এবং বাংলা ভাষার ভাগ্য নির্মাণে তার ভূমিকা নির্ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এদের আমি শ্রদ্ধা করি এবং এদের রচনা থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্তে মূল্যবান কিছু সংযোজন করতে আমি অক্ষম।

এবার আমার নিজস্ব মত প্রকাশের পালা। আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের অর্থ প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ "গীতবিতানে" প্রকাশিত তাঁর গীতি সংকলন। এখানেই আমি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি কারণ এখানে আমি এমন একজনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা অনুভব করি যিনি "মানুষের ধর্ম" সম্পর্কে দুর্বোধ্য তত্ত্ব না লিখেও গভীরভাবে ধর্মানুভূতিশীল। তাঁর সঙ্গীত রচনার ইতিহাস আমি জানিনা, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে সমস্ত ভাবের সঙ্গে গানগুলিকে মেলান যায়, তা ইতিহাস দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তা ছাড়া, কোন্ গান অল্প বয়সে লেখা, আর কোন্ গান পরিণত বয়সে লেখা, তাতে কিছু এসে যায়না। তারপরে, গানগুলির সুর তাঁর রচনা এবং তাঁর গানে, কথার সঙ্গে সুরের এক অপূর্ব মিলন

ঘটেছে। গীতিময়তার চরম প্রকাশ তাঁর গানে এবং তা ইতালীয় গীতিনাট্যের বেহিসেবী কসরৎকে বহু পিছনে ফেলে যায়। প্রেরণার এক দুর্লভ ঐক্য তাঁর সংগীত—যার মধ্যে ছন্দ, সুর এবং কথা একই উৎস থেকে প্রবাহিত। যে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি ও প্রেমের, আলো ও আনন্দের, ঈশ্বর ও মানুষের, দেশাত্মবোধ এবং স্বাধীনতার, একাকিত্ব ও দুঃখের গায়ক, তিনিই আমার রবীন্দ্রনাথ।

তবু যে সমস্ত ভাবের ধারায় রবীন্দ্রনাথ আমাদের আমন্ত্রণ জানান, তার মধ্যে কয়েকটি আমার প্রিয়। রোমাণ্টিক কবিদের মত দৃশ্যমান জগতের অপরূপ সৃষ্টিতে এক সর্বব্যাপী ঈশ্বর-অনুভূতিতে তিনি বিশ্বাসী, ঈশ্বরের সৌন্দর্য ও আনন্দের বিশ্বময় রাগিনীতে তিনি উচ্ছ্বসিত উল্লাস অনুভব করেন, তবু রবীন্দ্রনাথ বিস্ময় ও আকাঙ্ক্ষায় এমন গভীর মুহূর্ত উপলব্ধি করেছেন, যখন তাঁর মনে হয়েছে, ঈশ্বর সমস্ত অনুভূতির অতীত। অজানা এই রহস্যময় ঈশ্বর আমাদের অনধিগম্য আলোর প্রকাশে আমাদের হৃদয়ের মহৎ শূন্যতাকে উদ্ভাসিত করেন এবং আমাদের অন্তরে ঈশ্বর সাক্ষাতের আশাকে জাগিয়ে তোলেন ঃ

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে ॥
বাতাস বহে মরি মরি, আর বেঁধে রেখোনা তরী,
এসো এসো পার হয়ে হৃদয় মাঝারে ॥
···কবে নিয়ে আমার বাঁশী বাজাবে গো আপনি আসি
আনন্দময় নীরব রাতের নিবিড় আঁধারে ॥

(গীতবিতান ১ম খণ্ড, ১৯)

বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-অনুভূতি দুই কোটিতে আন্দোলিত। প্রথমটিকে, ঈশ্বরকে জগৎলীনভাবে অনুভব করা—বলা যেতে পারে। দ্বিতীয়টি, মানুষের দিক থেকে ঈশ্বরের জগত-অতিক্রান্ত রূপ। সব সময় এদুটো ভাবকে পরিষ্কার বোঝা যায় না, তারা একই সংগে বর্তমান এবং এর ফলে কতকগুলি গানে একটি দুর্লভ আনন্দের দোলা মেলে। তবু সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, জগৎ-লীন ভাবের প্রকাশ, কবি প্রকৃতির চিত্ররূপের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং এই প্রকাশে তিনি এক সহজ আনন্দ এবং প্রকৃতির সংগে এক হওয়ার স্বচ্ছন্দ অনুভূতি

লাভ করেছেন। দ্বিতীয় ভাব, জগত-অতিক্রান্ত ভাব, একটু গম্ভীর এবং সংযত পরিবেশে প্রকাশিত, এবং এই ভাবে, প্রাকৃতিক চিত্ররূপ হয় নেই, না হয় খুব কম। মনে হয়, জগৎ-অতিক্রান্ত ঈশ্বরের সম্মুখে কবি এই পরিচিত জগতে আগন্তুকের মত অনুভব করেছেন এবং বিরহের বেদনার সঙ্গে তাঁর অনুভূতিতে অক্ষমতা ও অযোগ্যতার মনোভাব মিশেছে।

রবীন্দ্রনাথকে অনেকেই আনন্দের কবি বলে বর্ণনা করেছেন, তাই প্রথম মনোভাব সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু বলব না। প্রকৃতিকে তিনি মায়ের মত ভালবাসেন আর তিনি শিশুর মত স্নেহের উত্তাপ কামনা করেন। রাত্রি তাঁকে তার নরম বাহুর আলিঙ্গনে আবরিত করে নিঃসঙ্গতাকে ভোলাতে পারে। যখন কিছুই তার থাকেনা, সবকিছুই রাত্রির হয়ে যায়, তখন নিঃসঙ্গতা দূরে সরে যায়।

সন্ধ্যা হল গো—ওমা সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো।
অতল কালো স্নেহের মাঝে ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ করো॥
আমায় ঘিরি আমায় চুমি কেবল তুমি, কেবল তুমি।—
আমার বলে যা আছে মা, তোমার করে সকল হরো॥
(গীতবিতান ১ম খণ্ড, ১৬০)

যে আলোর উৎসবে বিশ্ব উজ্জ্বল, তারই ভিতর দিয়ে প্রকৃতি তার কাছে দিব্য-জীবনের প্রাচুর্য প্রকাশ করেছে। ঈশ্বরের সৃষ্টির মাঝে মানুষ মাটির প্রদীপের মত আলো জ্বালানর প্রতীক্ষায় অধীর, ঈশ্বরের নিশ্বাস স্পর্শ পাবার জন্য আকুল। মুক্তির বাণী বহন করে আনা একটি কণ্ঠস্বর কবি শুনতে পান, যে মুক্তি সমস্ত শূন্যতাকে পূর্ণ করে জীবনকে ধন্য করে তুলবে।

অরূপ তোমার বাণী
অঙ্গে আমার চিত্তে আমার মুক্তি দিক সে আনি।
নিত্যকালের উৎসব তব বিশ্বের দীপালিকা
আমি শুধু তারি মাটির প্রদীপ, জ্বালাও তাহার শিখা॥
…তেমনি আমার প্রাণের কেন্দ্রে নিশ্বাস দাও পুরে,
শূন্য তাহার পূর্ণ করিয়া ধন্য করুক সুরে…
(গীতবিতান ১ম খণ্ড, ৯)

মুখে সুরের প্রবাহ এবং উজ্জ্বল আনন্দ বিশ্বকে সঞ্জীবিত করে, তা থেকে

স্মৃতির দুর্লভক্ষণে আত্মা রহস্যময় দূরত্বে এক প্রাণময় ঈশ্বরকে অনুভব করে। বিরহের অনুভূতি থেকে মিলনের আকাঙ্ক্ষা জন্মে, কিন্তু বস্তু আর চারিদিক পরিব্যাপ্ত এক অস্পষ্ট সৌন্দর্য নয় এক আপনজন যার প্রেম যেমন অপরূপ, প্রেমের দাবীও তেমনি।

ঈশ্বর যখন আর অস্পষ্ট নন, বরং এক প্রাণময় পুরুষ যাঁর সান্নিধ্য অনায়াসলভ্য, আমাদের উপরে যাঁর দাবী অসীম, তখন মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যভাব চলে যায়, এবং আত্ম-সৃষ্ট আধ্যাত্মিক আরাম ও আত্মশুদ্ধি এবং নিস্পৃহতার আহ্বানের মধ্যে সংঘাত বেদনাময় দ্বিধা সৃষ্টি করে, যার ফলে নিজের মধ্যেই বিবাদ সুরু হয়। নিজের ভ্রান্ত ধারণাকে ত্যাগ করার মত মনোবল না থাকলেও অন্তরে মানুষ অনুভব করে, বাইবেলে বর্ণিত ধনী-পুত্রের মতই তার দিকে প্রসারিত দিব্য-হস্তকে লাভ করতে সে ব্যর্থ হয়েছে।

জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই,
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।
মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই,
চাহিতে গেলে মরি লাজে॥
জানি হে তুমি মম জীবনে শ্রেয়োতম,
এমন ধন আর নাহি যে তোমা-সম,
তবু যা ভাঙা চোরা ঘরেতে আছে পোরা
ফেলিতে পারিনা যে॥
…আমার ভালো তাই চাহিতে যবে যাই
ভয় যে আসে মনোমাঝে॥

(গীতবিতান ১ম খণ্ড, ১৮২)

অথবা আবার,

ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়,
…তবু জানো মন তোমারে চায়॥
…ছাড়িতে পারিনি অহংকারে
ঘুরে মরি শিরে বহিয়া তারে,
ছাড়িতে পারিলে বাঁচি যে হায়
তুমি জানো মন তোমারে চায়॥
যা আছে আমার সকলই কবে

নিজ হাতে তুমি তুলিয়া লবে—
সব ছেড়ে সব পাব তোমায়
মনে মনে মন তোমারে চায় ॥

(গীতবিতান ১ম খণ্ড, ১১৮)

ঈশ্বরের আহ্বান জীবনে বার বার আসে, কিন্তু মানুষ তার মনস্থির করতে পারেনা। জীবন হয়ে ওঠে বেচা-কেনা, দেওয়া-নেওয়ার খেলা। ধৈর্যের সঙ্গে ঈশ্বর সেই মুহূর্তের জন্য প্রতীক্ষা করেন যখন নীরব রাত্রির নির্জনতায় আত্মা তাঁর সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হবে। তিনি শূন্য হাতে আসেন। আত্মা নিজের শূন্যতা এবং দ্বিধার অহংকার উপলব্ধি করে জানতে পারে, কেবল একটি জিনিষেরই মূল্য আছে তা হোল পরিপূর্ণভাবে ভক্তি-নম্র আত্ম-সমর্পণ।

আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে আসবে যদি শূন্য হাতে
আমি তাইতে কি ভয় মানি।
জানি জানি, বন্ধু জানি—
তোমার আছে তো হাতখানি ॥
চাওয়া-পাওয়ার পথে পথে দিন কেটেছে কোনোমতে,
এখন সময় হল তোমার কাছে আপনাকে দিই আমি ॥
...জীবন দোলায় দুলে দুলে আপনাকে ছিলেম ভুলে,
এখন জীবন মরণ দুদিক দিয়ে নেবে আমায় টানি।

(গীতবিতান ১ম খণ্ড, ২০২)

আত্মসমর্পণ শুধু একদিনের জন্যে হলে চলবেনা, প্রতি মুহূর্তে এই মনোভাবকে বজায় রাখতে হবে। দীর্ঘ দিনের শেষে ক্লান্তি আসতে পারে, কিন্তু যিনি আমাদের মাঝে আসছেন তাঁকে যতই জানি, ততই উপলব্ধি করি তাঁর প্রেম কত সহিষ্ণু, তাঁর ক্ষমা কত শক্তিমান, আমাদের জন্য তিনি কি সজাগ গভীর উদ্বেগ অনুভব করেন।

ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু,
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু ॥
এই যে হিয়া থরোথরো কাঁপে আজি এমনতরো ।।
এই বেদনা ক্ষমা করো, ক্ষমা করো প্রভু ।।
এই দীনতা ক্ষমা করো প্রভু।

পিছন পানে তাকাই যদি কভু ॥
দিনের তাপে রৌদ্র জ্বালায় শুকায় মালা পূজার থালায়,
সেই ম্লানতা ক্ষমা করো, ক্ষমা করো প্রভু ॥

(গীতবিতান ১ম খণ্ড, ১৫৭)

ঈশ্বরের আহ্বান যারা শোনেনি, কিংবা শুনেও যারা অবহেলা করে তারা দীনতাকে ঘৃণা করে। তাদের কাছে আত্ম-পর্যাপ্তিতেই মানুষের মহত্ত্ব। কিন্তু যিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে নিজের সত্যকার রূপকে খুঁজে পেয়েছেন, তিনি দীনতার বোধে বিষণ্ণ হন না। বরং আনন্দের সঙ্গে তিনি স্বীকার করেন, ঊর্ধ্ব থেকেই তার শক্তি আসবে এবং যিনি তাকে নিস্পৃহতা এবং আত্ম-সমর্পণের জন্য আহ্বান করেছেন, তিনিই আধ্যাত্মিক শক্তি এবং সহিষ্ণুতার উৎস।

বল দাও মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোর শকতি
সকল হৃদয় লুটায়ে তোমারে করিতে প্রণতি—
সরল সুপথে ভ্রমিতে, সব অপকার ক্ষমিতে,
সকল গর্ব দমিতে, খর্ব করিতে কুমতি ॥
হৃদয়ে তোমারে বুঝিতে জীবনে তোমারে পূজিতে,
তোমার মাঝারে খুঁজিতে চিত্তের চিরবসতি।
...বচন মনের অতীতে ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে,
সুখে দুখে লাভে ক্ষতিতে শুনিতে তোমার ভারতী ॥

(গীতবিতান ১ম খণ্ড, ১১০)

ঈশ্বরের কর্মে সকল দ্বিধা, সকল বাধা দূর হয়ে যায়। এক নব আনন্দ মনকে ভরে তোলে, এ আনন্দ আত্ম-মুক্তির আনন্দ। প্রকৃতির সঙ্গে এক হওয়ার রোমাণ্টিক আনন্দ থেকে এ অনেক বড়। কারণ আত্ম-বিস্মৃতি থেকে এ আনন্দের জন্ম, যার ফলে দিব্য-জীবন আবির্ভাবের দরজা উন্মুক্ত হয়। এক সামগ্রিক ঐক্যের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া থেকে এ আলাদা, এ আনন্দ আত্ম-ত্যাগের ফল, যার মধ্যে খৃষ্টের কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়ঃ আমার জন্য যে আত্মত্যাগ করবে, সেই আত্মাকে খুঁজে পাবে।"

আমারে যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি—
আমার যত বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী
আমার চোখের চেয়ে দেখা, আমার কানের শোনা,

আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা—
সব দিতে হবে ॥
…আমার বলে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে
তোমার করে দেব তখন তারা আমার হবে—
সব দিতে হবে ॥

(গীতবিতান ১ম খণ্ড, ৪৮২)

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই জীবনের পূর্ণ অর্থ, তার সমস্ত বেদনা, সমস্ত পরীক্ষা এবং মৃত্যু উপলব্ধি করা যায়। রবীন্দ্রনাথের গানের সহজ ভাব অতুলনীয়, তাঁর গানে ও কবিতায় রহস্যময় অথচ প্রেমময় ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে আত্ম-নিবেদনের সংযত শান্তি ফুটে উঠেছে।

দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক
তবে তাই হোক
মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক
তবে তাই হোক ॥
পূজার প্রদীপে তব জ্বলে যদি মম দীপ্ত শোক।
তবে তাই হোক।
অশ্রু আঁখি-পরে যদি ফুটে ওঠে তব স্নেহ চোখ
তবে তাই হোক ॥

বিংশ শতাব্দীতে, ১৯০১ সালের জুলাই মাসে স্বামী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় "নৈবেদ্য" কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নতুন দিক-পরিবর্তন বলে ঘোষণা করেন। যে গান কটি উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে "নৈবেদ্যে"র কবিতার সঙ্গে প্রেরণার দিক দিয়ে তারা সমগোত্রীয়। নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ আরও অনেক মহৎ কবিতা, গান, অপূর্ব ছোট গল্প, উপন্যাস এবং প্রবন্ধ রচনা করেছেন যা তাঁকে অমর করে রাখবে। এই দীন প্রশস্তি কবির উদ্দেশে আমার কৃতজ্ঞতার নিদর্শন, কারণ দিব্য কামনার পলাতক মুহূর্তে তিনি ঈশ্বরের রহস্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা দিয়েছেন।

না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি।
অর্থের শেষ পাইনা, তবুও
বুঝেছি তোমার বাণী ॥

তরুণ সংঘ পাঠাগারের রবীন্দ্র স্মারক সংকলনে প্রকাশিত The Tagore of My Choice-এর অনুবাদ করেছেন মৃণাল ভদ্র।

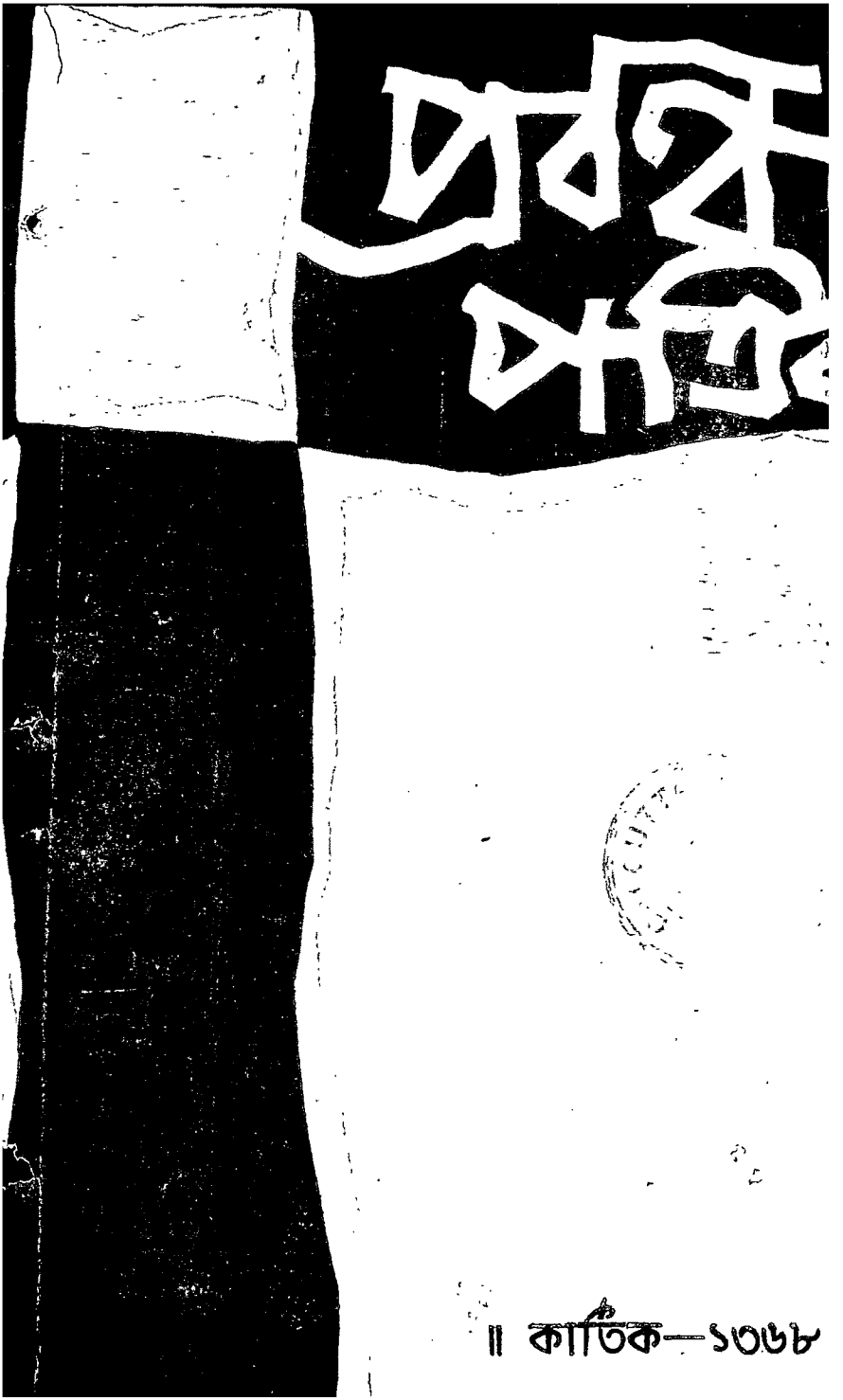
॥ কার্তিক—১৩৬৮

প্রবন্ধ পত্রিকা

কার্তিক ১৩৬৮
(৮৮৩ শকাব্দ)

সূচীপত্র

অচ্যুত গোস্বামী	১—২৯	রাষ্ট্র ও স্বাধীনতা
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০—৫৩	হেমিংওয়ে
দেবব্রত চক্রবর্তী	৫৪—৬৯	প্রকল্পনা ও বিকল্পনা
হারাণচন্দ্র নিয়োগী	৭০—৭৩	প্রাচীন প্রাচ্যে ইতিহাস চর্চা
অনিমেষ পাল	৭৪—৮৩	সাধু ভাষার প্রসঙ্গে
গুরুদাস ভট্টাচার্য	৮১—৯৬	বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ
সৈয়দ আলী আহসান	৯৭—১১৬	মেঘনাদবধ কাব্যে উপমা

দাম এক টাকা

আহারের পর
দিনে দু'বার..

সব ঋতুতে
স্বাস্থ্য লাভের
শ্রেষ্ঠ উপায়

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

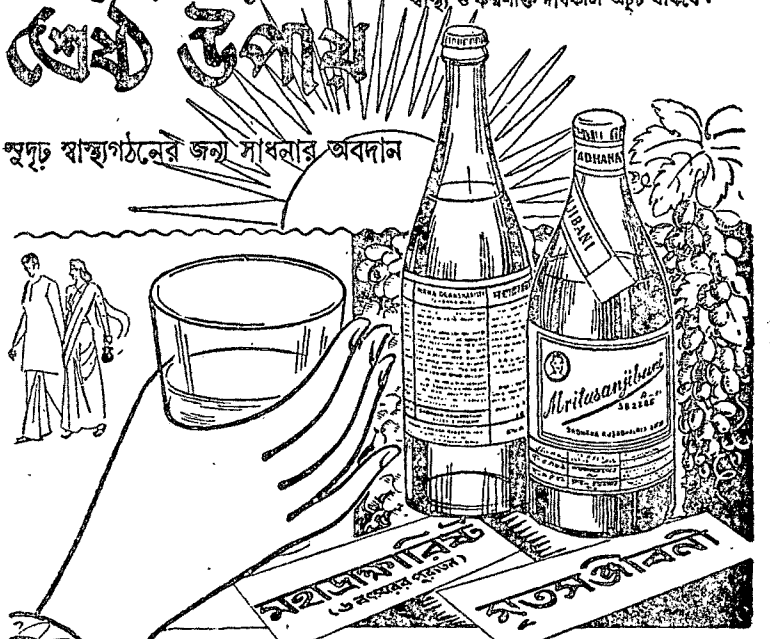

সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৩৭

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

আলোচনা

রাষ্ট্র ও স্বাধীনতা

অচ্যুত গোস্বামী

[লেখক এখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্পর্কে কতগুলি প্রশ্ন তুলেছেন। এটি আলোচনার জন্য প্রকাশ করা হোলো। পাঠকদের মতামত আহ্বান করছি আমরা এ বিষয়ে। —সম্পাদক]

একটি অত্যন্ত বিতর্কমূলক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে বসে অনুমান করছি আমার খাপছাড়া মতামতের সঙ্গে অনেকেরই মত-পার্থক্য ঘটবে। যাঁরা অপরের প্রবন্ধের মধ্যে নিজেদের মতের প্রতিধ্বনি দেখতে না পেলে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করেন, তাঁরা এ-প্রবন্ধটি না পড়লে ঠকবেন না। বরং খানিকটা মানসিক অস্বস্তির দায় থেকে অব্যাহতি পাবেন।

তথ্য থেকে সুরু করে তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হওয়ার পদ্ধতিই আমি এ প্রবন্ধে অনুসরণ করেছি। গণতান্ত্রিক সংবিধানে ব্যক্তির মৌলিক অধিকার বলতে যে জিনিসগুলি স্বীকৃত বিভিন্ন দেশে প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের কী অবস্থা দাঁড়িয়েছে, সেইটেই আমার প্রথম বিচার্য বিষয়। পরিসরের স্বল্পতার কথা মনে রেখে আমি উদ্ধৃতি বা প্রমাণাদি উপস্থিত করতে চেষ্টা করি নি। তবে যে-সব বই থেকে আমি উপাদান সংগ্রহ করেছি সেগুলো মোটামুটি ভাবে এ-দেশে সুপরিচিত। আমার আলোচনায় শিল্প-সাহিত্যের প্রসঙ্গটা একটু বেশী এসেছে ; তার কারণ বোধ করি সাহিত্যের প্রতি আমার ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বের মনোভাব। সোভিয়েট রাশিয়ায় মৌলিক অধিকারের প্রশ্নটি একটু স্বতন্ত্র। সেজন্য ও-দেশের আলোচনায় আমি সাহিত্যের প্রসঙ্গকেই প্রাধান্য দিয়েছি।

কমিউনিষ্ট দুনিয়া একমেবাদ্বিতীয়মের ভক্ত। বছরখানেক আগে বিভিন্ন দেশের চুরাশীটি কমিউনিষ্ট পার্টি মস্কোতে মিলিত হয়ে একটি সর্বসম্মত রাজনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। বলাবাহুল্য এই ধরণের ঐকমত স্বাভাবিক নয়, কৃত্রিম ; কিন্তু এই কৃত্রিমতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব অনুযায়ী যে-কোন দুটি সমজাতীয় জিনিসের মধ্যে কিছু না কিছু বিভিন্নতা থাকবেই। বিভিন্নতা প্রকৃতির নিয়ম ; ঐকমত প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে যাওয়া। সমাজে এক সঙ্গে বাস করার প্রয়োজনে অথবা কোন সাধারণ সঙ্কট দেখা দিলে

অনেক মানুষকে কিছু কিছু বিষয়ে একমত হতে হয়। ঐকমত মানেই আপোষ ; প্রত্যেককেই কিছু কিছু স্বকীয় চিন্তা বর্জন করে তবেই আপোষে পৌঁছা সম্ভবপর। কাজেই আপৎকালীন প্রয়োজনে ছাড়া ঐকমতের উপর জোর দেওয়ার অর্থ—প্রত্যেককে নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী বিকাশ লাভের পথে বাধা দেওয়া। এই ধরণের কৃত্রিম প্রক্রিয়াকে প্রতি পদে পদে গ্রহণ করার কী প্রয়োজন আছে আমি ঠিক বুঝি না।

আমার মনে হয় একত্ব স্থাপনের আগ্রহ একটি মূলতঃ ভাববাদী প্রবণতা। হেগেল যেমন রাষ্ট্রশক্তির উপর সার্বভৌম ক্ষমতা আরোপ করতে চেয়েছিলেন ; কমিউনিষ্ট দুনিয়ার একত্ব সাধনের প্রয়াসও তেমনি আসলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের উপর সার্বভৌম নেতৃত্ব আরোপ করতে চায়। এই প্রবণতার উৎস খুঁজে পাওয়া যায় একেশ্বরবাদী ধর্মমতগুলির মধ্যে। পৃথিবীতে মোটামুটি ভাবে দু'জাতের ধর্মমতের উদ্ভব হয়েছে—বহুদেবতাবাদী প্রকৃতি-পূজা-ভিত্তিক বা paganistic ধর্মমত এবং এক সার্বভৌম ঈশ্বরের ধারণা সম্বলিত ধর্মমত। প্রথমটি নিঃসন্দেহে প্রকৃতির নিয়মের কাছাকাছি। দ্বিতীয়টি মানবিক বুদ্ধির অধিকতর বিকাশের ফল এবং প্রকৃতির নিয়মের থেকে বহু দূরবর্তী। ফলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রকৃতি প্রতিশোধ নিয়েছে। খ্রীষ্টের ধর্ম বা মহম্মদের ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে রক্তস্নানের ভিতর দিয়ে এদের জয়-যাত্রা ঘটেছে। পক্ষান্তরে প্রকৃতি-পূজা-ভিত্তিক ধর্মমতগুলি মানুষকে সহনশীলতার শিক্ষা দিয়েছে, বিভিন্নতাকে স্বীকার করার প্রবণতার জন্ম দিয়েছে ; যেমন আমরা দেখতে পাই ভারতবর্ষে এবং প্রাচীন গ্রীসে। একবার মাত্র ভারতবর্ষে ধর্মের জন্য রক্তপাত ঘটেছিল। শঙ্করাচার্য একমেবাদ্বিতীয়মের তত্ত্ব প্রচার করার পর নবজাগ্রত হিন্দুগণ বৌদ্ধদের উপর অমানুষিক উৎপীড়ন চালিয়েছিল।

কাজেই আমি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাষ্ট্রের শান্তি নীতির যেমন অকুণ্ঠ সমর্থক ; তেমনি পৃথিবীর কমিউনিষ্ট মহলে তার সার্বভৌম নেতৃত্ব অর্জনের প্রয়াসকে সন্দেহের চোখে দেখি। তেমনি আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ক্রুশ্চেভ-প্রবর্তিত উদারতার নীতি নতুন আশার সমভার করে। যতদূর মনে হয় গত কয়েক বছরের মধ্যে সোভিয়েট সমাজ জীবনে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অবশ্য এই পরিবর্তনের প্রকৃত পরিচয় এখনো অনেকখানি পরিমাণে অনুমান সাপেক্ষ।

সোভিয়েট দেশের চতুস্পার্শস্থ লৌহ-যবনিকা এখন অপসৃত হয়ে থাকলে ও-দেশের প্রকৃত তথ্যাদি এখনো জানা সহজ নয়। সরকারীভাবে প্রকাশিত যে কয়েকটি ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা এ দেশে আসে সেগুলোর মধ্যে ভাসা-ভাসা ভাবে কতকগুলো খবর থাকে মাত্র। বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য দেশে সোভিয়েট সম্পর্কে কিছু কিছু গবেষণামূলক পত্রিকা প্রকাশিত হয় বটে; কিন্তু সেগুলির উদ্দেশ্য সোভিয়েট-বিরোধী প্রচার করা। সে সব কাগজে কিছু কিছু মূল্যবান তথ্যাদি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে-সব তথ্যের মধ্যে কতটা অংশ নির্ভরযোগ্য অনুমান করা সহজ নয়। তেমনি প্রত্যক্ষদর্শীদের যে-সব বিবরণ আমাদের হাতে এসে পৌঁছে তাতে ও-দেশের সমাজের বড় জোর একটা বাহ্য রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। তাতে গভীরতার একান্ত অভাব।

সোভিয়েট দেশে সাম্প্রতিককালে অনেক নতুন ধরণের সাহিত্য প্রকাশিত হয়েছে। যদিও প্যাষ্টারন্যাক এবং ডুদিন্‌সেভের বই ও-দেশে প্রকাশিত হতে পারে নি বা পুনর্মুদ্রণের অনুমতি পায়নি, তথাপি অন্য অনেক বই প্রকাশের সুযোগ লাভ করেছে। এই সব সাহিত্যের মারফৎ বর্তমান সোভিয়েট মানসের গতি-প্রকৃতির খানিকটা আভাস পাওয়া সম্ভব। দুঃখের বিষয় ও দেশে প্রচুর পরিমাণে বই বছর বছর ছাপা হচ্ছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে খুব কম সংখ্যকই অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের দেশে এসে পৌঁছে। Nouy Mir নামক একটি পত্রিকা নতুন ধরণের পরীক্ষামূলক রচনাদি প্রকাশে অগ্রণী হয়েছে। এই এই পত্রিকায় কিছু কিছু ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছে যার বিষয়বস্তু কোনক্রমেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের আওতায় পড়ে না। বর্তমান প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। তবু দু' একটি রচনার উল্লেখ না করে পারছি না। এন ডুবভের 'The Difficult Test' নামক গল্পটির নায়ক আলিওসা তার আশে পাশে মিথ্যা ও প্রতারণা দেখতে পায়। তলে তলে ষড়যন্ত্র করে লোকে চাকরিতে প্রমোশন পাচ্ছে তা তার নজরে পড়ে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে তাকে চাকরি থেকে বিতাড়িত হতে হয়। সে তখন একটি প্রশ্নের জবাবের জন্য ঘুরতে বার হয়ে—'সত্য কি?' প্রশ্নটির জবাবে একজন বৃদ্ধ শ্রমিক তাকে বলে, 'যা কোন মানুষের কাছে সুবিধাজনক এবং লাভজনক তাই তার কাছে সত্য?' তবে কি সকলের জন্য সত্য বলে কিছু নেই?' আলিওসা জিজ্ঞেস করে। বৃদ্ধ শ্রমিক জবাবে বলে, আছে বৈকি। কিন্তু সে সত্যকেও প্রত্যেকেই

নিজের নিজের দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখে, আর সেই দেখাটাকেই একমাত্র সঠিক দেখা বলে মনে করে।' এমনি করে আলিওসা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করে এবং সর্বত্রই এমন সব জবাব পায় যে-গুলো সমাজ-তান্ত্রিক নৈতিকতা দিয়ে সমর্থন করা যায় না।

ভালবাসা, বিবাহ প্রভৃতি মূল্যগুলির পুনর্বিচার, যান্ত্রিক নাগরিক জীবনযাত্রার স্থূল জড়বাদের বিরুদ্ধে অনুভূতিপ্রবণ লেখকের প্রতিবাদ (যেমন প্যানকেরতের উপন্যাস In the Name of Young, জ্যাভিডভের The Love Affair of Engineer Isotov। আইসটোভ একজন ভাল টেকনিসিয়ান। জীবনটা তার কাছে খুব সরল ব্যাপার। ভাল বাড়ি, প্রচুর খাদ্য, একটি ভাল পত্নী এবং উপপত্নী এবং সেই সঙ্গে চাকরিতে উন্নতি—এইটুকুই তার জীবনের চরম লক্ষ্য) ব্যক্তিজীবনের সার্থকতা কিসে,—এই সব আত্মিক প্রশ্নগুলো কিছু কিছু তরুণ সোভিয়েট লেখকের কাছে প্রাধান্য পাচ্ছে। কাজাকভ এবং নাসিবিন নামক দুই তরুণ লেখক নতুন ধরণের চরিত্র এবং দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যা লিখেছেন তা সোভিয়েট দেশের বাইরেও যে কোন পাঠককে পরিতৃপ্ত করবে। কাজাকভের চরিত্রগুলি সোভিয়েট অর্থে খুব সামাজিক এবং আদর্শস্থানীয় নয়। তাঁর বিষয়বস্তুর মধ্যে মানুষের অস্তিত্বের নিঃসঙ্গতা বোধ প্রাধান্য পেয়েছে। 'অক্টারাস' গল্পটির নায়ক একটি অন্ধ কুকুর। পালক কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে সে একজন ডাক্তারের কাছে আশ্রয় পায়। কিন্তু সে স্নেহ-নীড় ত্যাগ করে একদিন সে পালিয়ে যায় এবং মারা যায়। অর্থাৎ জীবসত্তা যে শেষ পর্যন্ত নিঃসঙ্গ এবং এককতাই এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে। নাসিবিনের 'প্রেম' নামক একটি গল্পে নায়ক বাল্যকালে নিষ্পাপ নায়িকাকে ভালবাসত। পরবর্তীকালে নায়ক বিদেশ থেকে দেশে ফিরে এসে দেখল যে নায়িকা আর নিষ্কলুষ নেই। প্রেমে সে প্রতারিত হয়েছে এবং জীবনের প্রতি তিক্ততায় তার মন পূর্ণ। কিন্তু নায়ক অবাক হয়ে আবিষ্কার করল আগের সেই নিষ্কলঙ্ক নায়িকাকে নয়, বর্তমানের কলঙ্কিত নায়িকাকেই সে ভালবাসে। এখানে মানব-মনের রহস্যময়তাকেই প্রতিপন্ন করা হচ্ছে।

অবশ্য এই জাতীয় রচনা সংখ্যা খুব বেশী নয়। এখনো অধিকাংশ রচনাই সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন বা মহাযুদ্ধকে কেন্দ্র করে লেখা হ'চ্ছে। তথাপি এই পরিবর্তন খুব তাৎপর্যপূর্ণ। তাৎপর্যপূর্ণ নানান কারণে। প্রথমতঃ এই গল্পগুলো

সোভিয়েট দেশে লেখা না হয়ে অন্য যে কোন পাশ্চাত্ত্য দেশে লেখা হ'তে পারত। অর্থাৎ দ্রুত যান্ত্রিকীকরণ যে সব অবস্থা ও মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সোভিয়েট দেশ তা থেকে মুক্ত নয়। দ্বিতীয়তঃ লেখকদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক প্রকাশকে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে নিচ্ছেন। অবশ্য এ কথা ঠিক এই সব লেখকদের সোভিয়েট সমালোচকগণ যথেষ্ট সন্দেহের চোখে দেখেন। কাজাকভ 'নৈরাশ্যবাদী' লেখক বলে পরিচিত। ভ্লাডিমির টেন্দ্রিয়াকভ রচিত 'Three, Senen and Ace' নামক বইখানি খুব তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে, কারণ এই বইতে জুয়া খেলা, চুরি এবং খুনের বিবরণ আছে এবং একটিও positive চরিত্র নেই। বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও এই সব বইয়ের প্রকাশনায় যে বাধা দেওয়া হচ্ছে না—এটা একটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সোভিয়েট রাষ্ট্রে আগের তুলনায় এখন যে অনেক বেশী পরিমাণে স্বাধীনতার খোলা হাওয়া বইতে শুরু করেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বিরূপ সমালোচনার কারণ এই যে সাহিত্যনীতিতে কোন পরিবর্তন আসে নি। উপরে যে সব লেখার সমালোচনা করেছি, socialist realism-এর ভিত্তিতে সেগুলো নিঃসন্দেহে সমালোচনার যোগ্য। বস্তুতঃ সাহিত্যবস্তু দাবী করছে একটি নতুন সাহিত্য তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু তত্ত্বমূলক আলোচনার অভাব দেখে মনে হয় যে এদিকে শাসন রজ্জু এখনো শিথিল হয় নি।

তাছাড়া বর্তমান সোভিয়েট সাহিত্যে ব্যঙ্গাত্মক রচনার অভাব। কারণ ব্যঙ্গাত্মক রচনার দুইটি শর্ত আছে। প্রথমতঃ সমাজের সমালোচনার পাশাপাশি একটি positive বক্তব্য থাকা চাই। দ্বিতীয়তঃ, সোভিয়েট রাষ্ট্রকে নয়, সোভিয়েট রাষ্ট্র বিরোধিতাকে সমালোচনার বিষয়ীভূত করতে হবে। বলাবাহুল্য এই সব শর্তগুলো satire-এর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। অথচ এখানে কর্তৃপক্ষের দৃঢ়মুষ্টি আজও শিথিল হয় নি।

যাই হোক, সোভিয়েট রাষ্ট্রে মানব মনের বদ্ধ দরজা একটু একটু খুলবে। যখন কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করবেন যে এই স্বাধীনতার ফলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব একটুও বিপন্ন হচ্ছে না, তখন হয়তো রুদ্ধ কপাটে প্রবেশ পথ আরও একটু প্রশস্ত হবে।

এইভাবে সোভিয়েট ব্যবস্থায় স্বাধীনতার অভাব যাদের প্রচারের মূলমন্ত্র—stock in trade—তাঁদের একটু একটু খোঁজ নেওয়া যাক। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী কথা একটু বেশী বলেন এবং যখনই কথা বলেন তখনই সুযোগ না

থাকলেও সুযোগ করে নিয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রের মহিমা কীর্তন না করে ছাড়েন না। কিন্তু যাঁরাই একটু দেশ সম্বন্ধে চিন্তা করেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে এ-দেশ অতি দ্রুতবেগে একদলীয় একনায়কত্বের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। গণতন্ত্রের অস্তিত্বের মূল শর্ত হচ্ছে একাধিক প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন রাজনৈতিক দলের অবস্থিতি। কিন্তু কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বিরুদ্ধ দলগুলির সমবেত শক্তি শাসক পার্টির শক্তির পাঁচভাগের এক ভাগ মাত্র। অনেকে হয়ত বলবেন যে এই তারতম্যের কারণ বামপন্থী দলগুলির দুর্বলতা। দুর্বলতা যে আছে তা আমি অস্বীকার করছি না; কিন্তু বিরুদ্ধ দলগুলি যাতে স্বাভাবিক ভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে সেইজন্য শাসক পার্টির কিছু দায়িত্ব আছে। গণতন্ত্রের একটা মুখোস সামনে রেখে পৈত্রিক জমিদারীর মত বংশানুক্রমে দেশের শাসন ক্ষমতা ভোগ দখল করব এই মনোভাব নিয়ে যদি শাসক পার্টি অগ্রসর হয় তবে বিরুদ্ধ দলগুলির বিকাশ লাভে বাধা সৃষ্টি করার জন্য অনেক উপায়কে অবলম্বন করতে পারে। সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক কারণে কুড়িজন শিক্ষকের চাকরি গিয়েছে এ খবর কাগজে পড়ে অনেক লোক স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। তাঁরা বোধকরি জেনেও জানেন না যে প্রত্যেকটি সরকারী কর্মচারীর চাকুরীতে পাকা হওয়ার আগে পুলিশ রিপোর্টের প্রয়োজন হয়। সরকার কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে অধিকাংশ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানই আজকাল কোন কর্মচারীর রাজনৈতিক সংযোগ আছে এ কথা জানতে পারলে যথাবিহিত সম্মানের সঙ্গে তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানান। অর্থাৎ আমাদের দেশের গণতন্ত্রের নিয়ম এই যে কেউ যদি শাসক পার্টিতে যোগ দেন তবে তাঁর পাতে দইয়ের পর মিষ্টি পরিবেশিত হবে; আর কেউ যদি কোন বামপন্থী দলের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তবে তাঁর পেটে ছুঁচো ডন মারবে।

আমাদের দেশের ভোটাররা ভাল করেই জানেন যে যদি তাঁরা কোন বামপন্থী প্রার্থীকে নির্বাচিত করেন এবং যে দল ক্ষমতা লাভ করতে না পারে, তবে আগামী পাঁচ বছরের জন্য সরকারী আনুকূল্য তাঁদের এলাকার দিকে আসতে গিয়ে বারবার পথ হারিয়ে ফেলবে। অথচ এ পোড়া দেশে রাস্তা-ঘাট, ইস্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, টিউবওয়েল, কৃষি ঋণ প্রভৃতির জন্য আশু সাহায্যের প্রয়োজন এত বেশী থাকে যে ভোটারদের পক্ষে সরকারী বদান্যতাকে উপেক্ষা করা খুবই কষ্টের ব্যাপার।

তা হোক, তবু এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার না করে উপায় নেই যে ভারতীয় সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিকেরই রাজনৈতিক পার্টি গঠন করার অথবা পার্টিতে যোগ দেওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে।

প্রহসন রচয়িতা অমৃতলাল বসুকে রসরাজ বলা হত ; আমার মনে হয় এ উপাধিটি আমাদের শাসক পার্টির প্রাপ্য, কারণ তাঁরা যে গণতন্ত্ররূপ অপূর্ব প্রহসনটি রচনা করেছেন তার সঙ্গে তুলনা দেওয়া চলে পৃথিবীতে কোন দেশে এমন জিনিস রচিত হয় নি। রূপকের সাহায্যে যদি বলতে হয় তাহলে বলতে পারি—আমাদের দেশের স্বাধীনতার দরজাটা একেবারে পুরোপুরি খোলা ; কিন্তু কবাটের আড়ালে একটি বাঘ ঘাপটি মেরে বসে আছে ; কপাট পার হতে গেলেই বাঘের থাবায় প্রাণ হারানোর আশঙ্কা আছে।

এ দেশের পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলিই শুধু যে সোভিয়েট অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যর্থ অনুকরণ তাই নয় ; আমার আশঙ্কা আরও অনেক ক্ষেত্রে আমাদের রাষ্ট্রীয় ধুরন্ধরা সোভিয়েটের অনুকরণ করতে চেষ্টা করেন। সাহিত্য আকাদমী পুরস্কার সিনেমা সঙ্গীত প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার প্রভৃতি ব্যবস্থাগুলি সোভিয়েটের লেনিন প্রাইজ দেওয়ার প্রথা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছে বলেই আমার অনুমান। আপাতত মনে হয় এইসব পুরস্কারের উদ্দেশ্য শিল্প সাহিত্যকে উৎসাহ দান করা। কিন্তু যে সব বই গত কয়েক বছরে সাহিত্য আকাদমী বা রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছে সেগুলো পর্যালোচনা করলে মনে হবে কতকগুলো বিশেষ বিষয়বস্তুর উপর লেখা বই-ই সাধারণতঃ সরকারী আনুকূল্য লাভ করে থাকে। এ-সব বই এর সাহিত্যমূল্য নেই আমি তা বলছি না, কিন্তু আরও অনেক সাহিত্য-মূল্য-সম্পন্ন বই সরকারের কৃপা লাভে বঞ্চিত হয় শুধু এই জন্য যে সেগুলোর বিষয়বস্তু সরকারের কাছে অভিপ্রেত নয়। শুধু তাই নয় ; ভিতরের খবর যাঁরা জানেন তাঁরা বলবেন যে দেশে চাকুরি পেতে হলে যেমন আপিসে আপিসে ঘুরলেই চলে না, বাড়িতে বাড়িতেও ঘুরতে হয়, আকাদমী পুরস্কারের জন্যও তেমনি শুধু ভাল বই লিখলেই যথেষ্ট হয় না, ভাল ভাল লোকদের বাড়িও পায়ের ধূলো দিতে হয়। আজ পর্যন্ত যেমন কোন উচ্চগুণ-সম্পন্ন বামপন্থী নেতা পদ্মশ্রী পদ্মভূষণ এ-সব পান নি, তেমনি কোন যোগ্য বামপন্থী লেখক বা শিল্পী কোন রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন বলে আমি জানি না।

অনেকে বলবেন, সাহিত্য আকাদমী পুরস্কার যাই হোক, সেটা তো আর লেখকের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ নয়। এদেশে সিনেমার ক্ষেত্রে সেন্সর ব্যবস্থার কিছু কড়াকড়ি আছে কিন্তু প্রকাশিত বইয়ের ক্ষেত্রে সেন্সর যথেষ্ট উদার। সে-কথা আমি অস্বীকার করি না ; কিন্তু যে-দেশের লেখক ও শিল্পীকে আজীবন অর্ধাহারে বা অনাহারে কাল কাটাতে হয় তাঁদের কাছে রাষ্ট্রীয় সম্মান, যশ ও অর্থের সম্ভাবনা কি বিপুল প্রলোভন তা অনুমান করা মোটেই শক্ত নয়। স্বভাবতঃই তাঁরা ভাবেন স্বকীয় চিন্তাধারাকে একটু পাশ কাটিয়ে গেলে, অথবা মহৎ ব্যক্তিদের সামনে একটু মাথা নীচু করে দাঁড়ালে যদি সেই রহস্যময় দরজাটা খুলে যায় যার নাম সার্থকতা, তবে ক্ষতি কি? এই মনোভাব খুব উন্নত চরিত্রের লক্ষণ আমি তা বলছি না। কিন্তু গণতান্ত্রিক চেতনা এমন জিনিস নয় যা মানুষ মায়ের জঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে আপনা-আপনি শেখে। গণতন্ত্র শিক্ষার ব্যাপার, চর্চার ব্যাপার, তার জন্য দীর্ঘদিন ধরে ঐতিহ্য তৈরী করতে হয়। সমাজে অনুকুল আবহাওয়া তৈরী না করে শুধু সংবিধানে গোটা কয়েক ভাল ভাল কথা শিখে রাখলেই গণতন্ত্র হয় না। সে-সব কথার মূল্য বাল্য শিক্ষার নীতি কথার চেয়ে কিছুমাত্র বেশী নয়।

অবশ্য এ কথা ঠিক আমাদের দেশ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও বৈদেশিক শাসকের অধীনতা পেরিয়ে সবে স্বাধীন হয়েছে। এ-দেশে উচ্চতর গণতান্ত্রিক চেতনা আশা করা সঙ্গত নয়। গণতন্ত্রের আদর্শ যদি দেখতে হয় তবে আমাদের তাকাতে হবে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার দিকে। তবে এবার এই দুটি দেশের দিকে একটু নজর দেওয়া যাক।

আমি আমেরিকায় যে কুখ্যাত কুক্লুক্স ক্ল্যানের বর্বর অভিযান চলেছিল তার কথা উল্লেখ না-ই করলাম। এই কিছুদিন আগেও ম্যাকার্থির 'আন্-আমেরিকান'-দের বিতাড়ন করার নীতি সারা দেশে যে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল তার প্রসঙ্গও না-ই তুললাম। আমেরিকায় একটি ধর্মঘট হলেই যে অনায়াসে দু' চারশো শ্রমিককে গুলি করে মেরে ফেলা হয়, আমেরিকান শিল্পপতিরা যে নিয়মিত গুণ্ডার দল পোষেন এবং তাঁদের জয়যাত্রার পথ যে রক্তরঞ্জিত সে সব কথাও না হয় ইতিহাসের পাতায় অথবা আপটন্ সিনক্লেয়ার ডন্ প্যাসস্, স্টেইনবেক প্রভৃতি লেখকদের ইতিহাস-ভিত্তিক উপন্যাসের পাতাতেই লিপিবদ্ধ থাক। আমি ধরে নিচ্ছি যে আমেরিকান শাসক শক্তি এমন এক

ভূ-স্বর্গ তৈরি করেছেন যেখানে প্রত্যেক নাগরিকই শান্তিপূর্ণ ভাবে গণতান্ত্রিক জীবন-যাপন করতে সক্ষম। তা ধরে নিলেও আমরা যে চিত্রটি পাই তা ভয়াবহ। অগ্নিবর্ণ তরল লৌহ নিঃস্রাবী টাটা কারখানার অভ্যন্তরে যদি কেউ যান তবে তিনি সেই বিরাট দৈত্যের সামনে নিজেকে একান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে না করে পারেন না। সমগ্র আমেরিকাটি এমনি একটি প্রকাণ্ড কারখানা মাত্র। সাধারণ মানুষ নিজেকে সেই বিরাট কারখানার নাটবল্টু ছাড়া আর কিছু বলে মনে করতে পারে না। অতিরিক্ত স্পেশালাইজেশানের ফলে সমগ্র সামাজিক কর্মজ্ঞ বহু বিচ্ছিন্ন স্বয়ং-সম্পূর্ণ বিভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকটি বিভাগের সমস্যা আলাদা, সেখানে কে মানব-গোষ্ঠী কাজ করে তাদের সঙ্গে অপরাপর মানব-গোষ্ঠীর সমস্যাগত, চিন্তাধারাগত বা ব্যবহারিক কোন সম্পর্ক নেই। অর্থনৈতিক স্তরভেদ এত বেশী যে একটি বিভাগের মধ্যেও সমধর্মী ও সমমর্মী লোকের সংখ্যা নগণ্য। এই জটিল বহুমুখী জীবন-যাত্রার গাদাগাদি ঠাসাঠাসি ভীড়ের মধ্যেও ব্যক্তি মানুষ অনুভব করে সে নিঃসঙ্গ, একক ; তার চিন্তার ভাষা ও অপরের চিন্তার ভাষার মধ্যে কোন ঐক্যসূত্র নেই।

এই কর্তিত ঐক্যসূত্রকে পুনঃসংযুক্ত করার জন্য আছে বিরাট বিরাট সংবাদপত্র। এক একটি সংবাদপত্রের আয়তন যেমন প্রকাণ্ড তার প্রচার সংখ্যাও তেমনি দশ বিশ মিলিয়নের কম নয়। সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই ঘরে ঘরে চায়ের টেবিলে চা খাওয়ার চাটনি হিসাবে এক বা একাধিক সংবাদপত্র মজুদ থাকে। আধঘণ্টা সময়ের মধ্যে পত্রিকাগুলির পাতা উল্টিয়ে যাওয়ারও সময় থাকে না। নাগরিকরা যার যার রুচি অনুযায়ী কেউ-বা সিনেমার পৃষ্ঠা, কেউ-বা খেলার পৃষ্ঠা বের করে তার উপর চোখ বুলিয়ে নেয়। কিছু কিছু জমকালো বিজ্ঞাপনের দিকে তারা নজর দেয়, কারণ আমেরিকান নাগরিক বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস করে। কদাচিৎ কখনো হয়তো দু' চারটি রাজনৈতিক খবরের বড় বড় ক্যাপ্‌সন তাদের চোখে পড়ে যায়। এবং তারই সাহায্যে পত্রিকার মালিকরা জনসাধারণের যে ভাবে ভাবা উচিৎ বলে মনে করেন তারা সেই ভাবে ভাবতে সুরু করে। তারা জলের মত স্পষ্ট করে বুঝে ফেলে যে তাদের জীবনে মর্মবেদনার জন্য দায়ী সোভিয়েট রাশিয়া এবং কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোরা।

কিন্তু এ-সব আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে তাদের মাথা ঘামানোর কোন

আবশ্যকতা নেই ; স্বয়ং প্রেসিডেন্ট অভয় দিয়ে বলেছেন যে ঘরে যথেষ্ট অ্যাটম বম্ মজুদ আছে, এবং প্রেসিডেন্ট একটি পুরুষের মত পুরুষ। কাজেই মনকে কী ভাবে ব্যাপৃত করে রাখা যায় আমেরিকান নাগরিকের কাছে সেইটেই সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান অবশ্য খুব কঠিন নয়। সে জানে সে সভ্য ; এবং সভ্যতায় সে বিশ্বাস করে। অটোম্যাসনের প্রাসাদে আমেরিকার সভ্য জীবন এত জটিল আর বহুমুখী যে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা আর চিন্তার সাহায্যে তার কার্যকারণ নির্ণয় করা যায় না। পিঁপড়ের যদি চিন্তা করার মত মস্তিষ্ক থাকত, তাহলে তার কাছে মানব-জগৎ যেমন দুর্জ্ঞেয় আর রহস্যময় বলে মনে হত, আমেরিকান নাগরিকের কাছেও সভ্যসমাজ তেমনি জিনিস। কিন্তু সে জানে পণ্য হচ্ছে সভ্যতার প্রতীক। নিয়মিত কাজের ঘণ্টাগুলির পরে সে এই পণ্য কেনা ও দেখাতে অবসরের ঘণ্টাগুলো কাটিয়ে দিতে পারে। শুধু ব্যবহার্য পণ্যই পণ্য নয়। সিনেমা রেডিও টেলিভিসন অপেরা নগ্নিকা নৃত্যের স্টেজ বলনাচের আসর পান-ভোজনশালা—এ সবই পণ্য। পয়সার জোর থাকলে সে এই সব পণ্য বিক্রয় কেন্দ্রের ভিতরে ঢুকতে পারে ; পয়সার জোরের অভাব থাকলে সে এ সবের দরজায় দরজায় ঘুরে সময় কাটাতে পারে। অনেক রাত্রে বাড়ি ফেরার কথা মনে হলে সে হয়তো ভাবতে পারে যে বাড়িতে হয়তো স্ত্রী অন্য পুরুষের সঙ্গে প্রণয়লীলায় ব্যস্ত। তাতে অবশ্য তার কোন তাপ উত্তাপ নেই। কিন্তু এমন একটা দৃশ্য দেখলে তার পুরুষের অহঙ্কারে ঘা লাগবে। তাকে ঈর্ষাকাতরের অভিনয় করতে হবে এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হতে হবে। তার চেয়ে অনেক ভাল কোন পণ্যনারীর অঙ্কশায়ী হওয়া। পয়সার জোর থাকলে বলনাচের আসরে কোন পরস্ত্রীকেও আমন্ত্রণ করা যায়। সেখান থেকে পান-ভোজনশালা হয়ে কোন হোটেলের কামরা অবধি একেবারে সোজা রাস্তা।

এ চিত্র আমি বানিয়ে বানিয়ে বলছি না। এরিক ফ্রোম, বেন্ প্রভৃতি সমাজ-তাত্ত্বিকের আলোচনা, বা নরম্যান্ মেইলারের উপন্যাস পড়লে এ চিত্রের সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে। আমেরিকার নাগরিক চিন্তা করে না ; কারণ চিন্তা করতে গেলে সে ভয় পায়। তার অবস্থা অন্ধের হস্তীদর্শনের মতই হয়ে দাঁড়ায়। সে হয়তো কাজ করে কোন বিরাট কার্টেলের মধ্যে যার মালিকদের সে একবার চোখেও দেখতে পায় না। হয়তো সে ট্রেড্ ইউনিয়নের সভ্য ; কিন্তু তার ট্রেড

ইউনিয়নের মধ্যে পাঁচ মিলিয়ন কি দশ মিলিয়ন সভ্য আছে। কারখানার ম্যানেজারের দরজার মতই ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের দরজা তার কাছে দূরধিগম্য। তাদের চিন্তাধারা বা কর্মপদ্ধতির সঙ্গে তার কোন যোগ নেই, সে তাদের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। তাকে হয়তো এক আধবার ভোট দিতে বলা হয়, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীশীল প্রার্থীদের মধ্যে কাউকেই সে এমন ভালভাবে জানে না যাতে তার ভোট দেওয়ার সত্যই কোন অর্থ হয়।

ভাগ্যের জোরে যারা সমাজের কর্মকর্তাদের আসনে পৌঁছেছে তারা জানে যে কী তাদের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য হল এই দুর্লভ অর্থ ও ক্ষমতার আসনকে কায়েম রাখা। কিন্তু একজন সাধারণ নাগরিক জানে না যে কী তার জীবনের উদ্দেশ্য। তার চারদিকে শুধু শূন্যতা, শুধু অর্থহীন তাৎপর্যহীন অস্তিত্বের বোঝা বহন করা। অগত্যা সে বস্তুতে বিশ্বাস করে। অজস্র উপচীয়মান ঐশ্বর্যের যে ছিটে ফোঁটা সে লাভ করে আমাদের দেশের বিত্তবানের কাছেও তা পর্যাপ্ত। কিন্তু এই বিত্ত কি তার আত্মার মৃত্যুকে রোধ করতে পারে?

কোন বিরাট ভূমিকম্প বা টাইড্যাল ওয়েভ বা আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের সমান। যখন মানুষ পড়ে তখন তার মনে কী অনুভূতি হয়? সে অনুভব করে যে বিশাল অন্ধ অমিত শক্তিধর প্রাকৃতিক শক্তির কাছে সে একান্তই তুচ্ছ এবং অসহায়। এই তাণ্ডবের মধ্যে তার মরে যাওয়া বা বেঁচে থাকে দুই-ই নেহাৎ-ই আকস্মিক ঘটনা মাত্র। এবং সে মরে যাক বা বেঁচে থাকুক—এই অন্ধ প্রকৃতির কাছে সে দুটোই সমান ঘটনা। আমেরিকায় নাগরিক এমনি এক মানুষ সৃষ্ট ভূমিকম্পের মতই শক্তিশালী যন্ত্র জগতে বাস করে। মানুষ তাকে সৃষ্টি করেছে বটে, কিন্তু মানুষ তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে না। যন্ত্রশক্তি তার নিজস্ব নিয়মে চলে। এবং সে নিয়মের কাছে মানুষের জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। নিউইয়ার্স-ডের উৎসবে চারশো মানুষ প্রাণ হারায়, হাজার হাজার আহত হয়। কারণ মানুষ মরে যাওয়া আর বেঁচে থাকা একই কথা—এ দুয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। আমেরিকায় প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ খুন হয়, এরোপ্লেন রেস্, মোটর রেস, ওয়াটার স্কীপিং-এ হাজার হাজার খেলোয়ার প্রাণ দেয় রোমান গ্ল্যাডিয়েটরদের মত। কারণ, তাতে ক্ষতি কি? যেমন হাজার হাজার মানুষ মরছে, তেমনি হাজার হাজার মানুষ জন্মাচ্ছে।

আমেরিকার মানুষের মন বস্তু হয়ে গিয়েছে। জড়বাদের এই নগ্ন নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশের কাছে আশাকরি নিতান্ত গর্বস্ফীত জড়বাদীও লজ্জায় অধোবদন হবেন।

বলাবাহুল্য জড়বস্তুর কাছে স্বাধীনতা কোন প্রশ্ন নয়। এক টুকরো লোহাকে বাক্সে আটকিয়ে রাখা হয়েছে, কিংবা মাঠে ফেলে দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। তেমনি সাধারণ আমেরিকান নাগরিকের কাছে স্বাধীনতা কথাটা অর্থহীন হয়ে গিয়েছে। সে নিছক শরীর-কর্ম-সর্বস্ব জীব মাত্র। শারীরিক প্রয়োজন এবং সম্ভোগের দাবীগুলো মিটলেই সে খুশি। এই দাবী পুরোণের ব্যাপারে সাংঘাতিক তারতম্য আছে, কিন্তু কিছু দাবী সকলেরই মেটে। আমেরিকায় অনাহার নেই, একজন সাধারণ শ্রমিকও একখানা মোটর গাড়ির মালিক হতে পারে। যদিও হয়তো সেই মোটরখানা তাকে অপরিহার্য ভাবে দুর্ঘটনায় অপমৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকায় রাস্তার নিয়ম লঙ্ঘন করা এবং সেইজন্য প্রাণহানির ঘটনা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক। অবশ্য আমরাও ভাবতে পারি যে আমাদের একখানি মোটর গাড়ি হোক, এমন কি যদি তার জন্য এই শর্ত লিখে দিতে হয় যে দুই কি পাঁচ বছরের মধ্যে দুর্ঘটনায় প্রাণ দিতে হবে?

কিন্তু এ সব কথার মানে এই নয় যে আমেরিকায় চিন্তাশীল ব্যক্তির অভাব আছে। এই আজব দেশে মানুষ যেমন যুদ্ধে নয়, খেলাচ্ছলে অনায়াসে মরতে পারে, তেমনি তারা কারিগরি বিদ্যায় ও বিভিন্ন বিজ্ঞানের সাধনায় অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। এই নৈপুণ্যের পিছনে আছে স্বাধীনতা। আমেরিকায় ধৈর্য আর মেধা থাকলে শিক্ষালাভের অবাধ সুযোগ পাওয়া যায়। এমন কি অর্থাভাবও সব সময় গুরুতর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় না, কারণ পয়সা রোজগার করতে করতে পড়া যায়। গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যম এবং ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী ধারা নির্বাচনের অধিকার আমেরিকায় সবচেয়ে বেশী। কারণ এই ব্যাপারটা রাষ্ট্রের চেয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ও প্রফেসারদের উপর বেশী নির্ভর করে। এবং ও-দেশের ডিরেক্টর এবং প্রফেসারেরা সাধারণতঃ খুব উদার এবং গবেষকদের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে মূল্য দিয়ে থাকেন।

শিল্পী ও সাহিত্যিকদের আইনগত স্বাধীনতা প্রচুর। বিগত ত্রিশ কি চল্লিশ বছরের আমেরিকাক সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে তাতে বৈচিত্র্যের শেষ নেই। বিষয়বস্তুতে আঙ্গিকে, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নূতনত্ব সৃষ্টিতে আমেরিকা

ইউরোপের কোন দেশ থেকে পিছিয়ে নেই। বিশেষ করে বাস্তববাদী উপন্যাস—এমন কি পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা—আমেরিকায় যত বেশী প্রকাশিত হয়েছে ফ্রান্স বা ইংল্যাণ্ডে তা হয়েছে কি না সন্দেহ। আমেরিকান লেখককে কেউ নির্দেশ দেয় না, তাদের কার্যকলাপের উপর কেউ খবরদারী করছে না। তার মানে অবশ্য এই নয় যে আমেরিকার লেখকদের সামনে কোন বাধাই নেই। প্রথম বাধা জনসাধারণের রুচি। জনচিত্ত যত যান্ত্রিক হয়ে আসছে, স্থূল ইন্দ্রিয়জ সম্ভোগ যত বেশী পরিমাণে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে পরিগণিত হচ্ছে ততই সাহিত্যকেই এই রুচির পরিতৃপ্তির জগৎ বিষয়বস্তু গ্রহণ করতে হচ্ছে।

সমস্ত পত্রপত্রিকা এবং প্রকাশ ভবনগুলি বৃহৎ পুঁজির করায়ত্ত। স্বভাবতই তরুণ প্রতিভাবান লেখককে নতুন ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করে পরিচিত হতে হলে অনেক অন্ধগর্ব আর অর্বাচীনতার পায়ে তৈল মর্দন করে জীবনে অগ্রসর হতে হয়। অবশ্য এই ব্যবস্থা আমাদের দেশেও রয়েছে; রাশিয়াতে এখনো পরিবর্তন-ভীরু অর্বাচীনদের দাপট যথেষ্ট। কোন লেখকের বই যদি কোন প্রকাশক গ্রহণ করতে না চান, তবে অর্থ থাকলে তিনি নিজের খরচে সে বই প্রকাশ করতে পারেন। হাওয়ার্ড ফাস্ট লিখেছেন আমেরিকার সাতটি বৃহৎ প্রকাশ ভবন তাঁর স্পার্টাকাস বইখানা প্রকাশ করতে আপত্তি জানিয়েছিল। তাঁর ফলে বইখানা প্রকাশের দায়িত্ব তাঁকে নিজেকেই নিতে হয়েছিল, এবং কালক্রমে বইখানা একটি বেস্ট সেলারে পরিণত হয়। একজন লেখকের পক্ষে নিজে বই প্রকাশ করা সহজ নয়। প্রথমত, টাকার প্রশ্ন আছে; দ্বিতীয়তঃ, বই বিক্রি করার সময় সংগঠনের প্রশ্ন আছে। তথাপি এই স্বাধীনতার মূল্য কম নয়। রাশিয়ায় প্যাস্টারন্যাকের পক্ষে নিজের খরচে 'ডক্টরজিভাগো'-র প্রকাশ ব্যবস্থা করার কোন উপায় ছিল না।

আমেরিকান লেখকদের সামনে অবশ্য একটি ছোট্ট বাধা আছে। সমাজ-তন্ত্রবাদকে সমর্থন জানিয়ে তাঁরা কিছু না লিখলেই বুদ্ধিমানের কাজ করবেন। আইনের বাধা কিছু নেই। কিন্তু এই বিষয়টা আজকাল ফ্যাসান নয়। যা ফ্যাসান নয় তা লিখলে সমাদর পেতে দেরী হবে। তা ছাড়া অন্যরকম বিপদ আসতে কতক্ষণ? ম্যাকার্থির নীতি যে আবার পুনরুজ্জীবিত হবে না এ কথা কি জোর করে বলা যায়?

রাশিয়াতে কমিউনিজমকে সমর্থন না করে কিছু লেখা যায় না। আমেরিকাতে কমিউনিজম সমর্থন করলে অসুবিধার সম্ভাবনা আছে। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ দু'য়ের মধ্যে যথেষ্ট তফাৎ আছে ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হাত পা ছড়িয়ে বসার মত জায়গা পাওয়া যায়। একজন গোঁড়া কমিউনিস্ট হয়তো বলবেন, একমাত্র সত্য কথাটা বলার সুযোগ না থাকলে বা কম থাকলে, আর যত রকমের স্বাধীনতাই থাক তা ভুয়ো। কিন্তু নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে গেলে বলতেই হবে, একজন সাধারণ মানুষ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অনেক বেশী স্বাধীনতার অনুভূতি লাভ করবেন এবং স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত মনের একটা অনুভূতি ছাড়া আর কি ?

উপরে যেসব কথা বললাম এগুলো দৃশ্যত সত্য। দৃশ্যের আড়ালে অনেক অদৃশ্য জিনিস থাকে। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিসন প্রভৃতি বিপুল শক্তিধর প্রচার-যন্ত্রগুলি বৃহৎ পুঁজির কর্তৃত্বাধীন। এই সব প্রচার-যন্ত্রের শক্তি অতুলনীয় ; মানুষের মনকে তার অজ্ঞাতসারে বন্দী করা বা condition করার জন্য এই অস্ত্র অ্যাটম বম্বের মতই কার্যকরী। জনসাধারণের চিন্তাধারা অলক্ষিতে বৃহৎ পুঁজির ইচ্ছানুযায়ী পথে ধাবিত হচ্ছে আমেরিকায়। কোন প্রগতিশীল লেখক নতুন ভাবধারা হয়তো উপস্থিত করতে পারেন জনচিত্তের সামনে ; কিন্তু সেইভাবে পরিবর্তনের জন্য গণমানসকে প্রস্তুত করা তাঁর সাধ্যাতীত।

সেইজন্যই আমেরিকায় স্বাধীনতা আছে, কিন্তু স্বাধীনতাজনিত সন্তোষের অভাব দেখতে পাই সাংস্কৃতিক মহলে। অনেক আধুনিক লেখক গভীর নৈরাশ্য-পীড়িত। এই নৈরাশ্যের কারণ সামাজিক বৈষম্য, অসহায়তা, পক্ষপাতমূলক আচরণ এবং সর্বোপরি লক্ষ্যহীনতা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে সামাজিক বৈষম্য রাশিয়াতেও আছে। মার্কস্-কথিত অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ হয়তো রুশ দেশে নেই ; কারণ উৎপাদনের উপায়গুলি অধিকারে থাকার ফলে ব্যক্তি যে ব্যক্তির উপর শোষণ করার সুযোগ পায়, ও দেশে তা নেই। কিন্তু জীলাস যে 'New Class'-এর কথা বলেছেন তার অস্তিত্বকে আমি উড়িয়ে দিতে পারি না। জীবন-যাত্রার মাপ, ক্ষমতা, আভিজাত্য এবং সুযোগে যে বিপুল পরিমাণ তফাৎ সমাজে বর্তমান রয়েছে ; মনস্তাত্ত্বিক বিচারে বা মানুষের অন্তরকে পীড়িত না করে পারে না। রাশিয়াতে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা আছে বলে অসহায়তার

অনুভূতি কম; তবে পক্ষপাতমূলক আচরণ আছে। ব্যাপক জনসাধারণ সাম্যবাদে আস্থাশীল বলে, ও-দেশের লোক লক্ষ্যহীনতার অন্ধকারে ডুবে যায়নি। ভ্রমণবীর এড্‌গার স্নো রুশ দেশের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলতে গিয়ে একটা কথা বলেছিলেন যা আমার মনে লেগে রয়েছে। সামগ্রিকভাবে স্নো হয়তো রুশ সমাজের সমর্থক নন; কিন্তু ও দেশের দোষগুণ আলোচনা করে তিনি একটা জিনিস পেয়েছেন যা তাঁকে মুগ্ধ করেছে—unity of thought—বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে চিন্তা ও ভাবগত সামঞ্জস্য। এক অমিত শক্তিশালী সর্বাত্মক প্রচারযন্ত্রের সাহায্যে, বিরুদ্ধ চিন্তা ও কর্ম সবলে জনচিত্তের সম্মুখ থেকে উৎখাত করে এই চিন্তার ঐক্যের জন্ম দেওয়া হয়েছে।—এই বলপ্রয়োগের নীতিকে আমি সমর্থন করি না; এই নিষ্ঠুর এবং কৃত্রিম নীতি যে রুশ জনসাধারণের মনে কী গভীর মর্মবেদনা এবং ত্রাস সৃষ্টি করেছিল ডঃ জিভাগো বইতে তার কিছু পরিচয় আছে। রুশ নেতৃবৃন্দ যদি মার্কসের উপর আর একটু আস্থা স্থাপন করতে পারতেন তা হলে বোধ হয় তাঁরা বুঝতে পারতেন যে কোন্ জবরদস্তির প্রয়োজন হয় না, সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাই মানুষের মনকে ক্রমিক সুস্থতার পথে নিয়ে যায়।

কিন্তু unity of thought দরকার। সমাজে মানুষে মানুষে যত চিন্তার বিভিন্নতাই থাক, সকলের এক জায়গায় মিলিত হওয়ার জন্য চিন্তার একটা সাধারণ ভিত্তিভূমি দরকার। কোন ব্যক্তিবিশেষ এই ভিত্তিকেও হয়তো আক্রমণ করতে পারেন; কিন্তু ভিত্তি থাকলে তবেই তো তাকে আক্রমণ করা যায়। সমাজ মানসে compulsion এবং votetion-এর সমন্বয় ঘটে—কথাটা একজন বিখ্যাত জার্মান সমাজতাত্ত্বিক বলেছেন। উন্নততর সমাজে volition বা স্বেচ্ছামূলক কর্ম ও চিন্তার ক্রমশঃ বিস্তারলাভ ঘটে। কিন্তু compulsion কিছুটা থাকবেই। এই compulsion বা বাধ্যবাধকতা রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত হওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না। যে কোন সুস্থ সমাজ নিজের প্রয়োজনেই এ জিনিস ধীরে ধীরে গড়ে তোলে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যে বলেছিলেন—"Tune to the kindred point of heaven and home'—এ কথাটা খুব সত্য। শুধু স্বাধীনতা নয়, জীবনে বন্ধনেরও প্রয়োজন আছে।

আমি অনেক সময় অবাক হয়ে ভাবি যে পুঁজিতন্ত্র এবং যন্ত্র-জীবনের এত বিকাশ সত্ত্বেও কী করে ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে এই unity of thought বজায় আছে। তাদের রক্ষণশীলতা এবং আভিজাত্যপ্রীতিকে আমরা সমালোচনা

করতে পারি বটে ; কিন্তু এর ফলেই তাদের বিভিন্ন কাজের মধ্যে অদ্ভুত logic খুঁজে পাওয়া যায়। বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে, ইংল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টিতে একজনও সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তার কারণ বিরুদ্ধ প্রচারের দরুণ সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি অকারণ ভীতি নয়। একটা জায়গায় তারা স্থির হয়ে আছে ; কিছুতেই তারা দলীয় একনায়কত্বকে স্বীকার করবে না।

আমি বিস্মিত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এ কথা স্বীকার না করে পারি না যে ১৯৪৭ সালে বিনা রক্তপাতে ইংল্যাণ্ড ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়ে গিয়েছিল। মালয় এবং কেনিয়াতে তারা যা করেছিল, আলজিরিয়াতে ফরাসীরা যা করছে, তারা ভারতবর্ষেও অনায়াসে তা করতে পারত। সৈন্য বোঝাই যুদ্ধ-জাহাজ পাঠাতে পারত ; উড়ো জাহাজে করে গ্রামে গ্রামে বোমা ফেলতে পারত ; নগরে নগরে রক্তের স্রোত নতুন নতুন ভাগীরথী সৃষ্টি করতে পারত। এসব কিছুই তারা করেনি ; প্রকৃত ভদ্রলোকের মত তারা স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তর করে চলে গিয়েছে।

অনেকে নিশ্চয়ই বলবেন—ইংরাজরা parting kick হিসাবে দেশ বিভাগ করে দিয়ে গিয়েছে। যতদিন তারা এখানে ছিল—Divide and Rule-এর কৌশল তারা ছাড়েনি ; যাওয়ার সময়েও শেষবারের মত সেই নীতি প্রয়োগ করে গিয়েছে। এ-কথা সত্যি হলেও স্বীকার করা ভাল যে যা ছিল না ইংরাজরা তার সুযোগ নেয়নি, যা ছিল ওরা তারই সুযোগ নিয়েছে। হিন্দু মুসলমানে বিরোধ একটি ঐতিহাসিক সত্য। বহু-দেবতা-ভিত্তিক হিন্দুজাতি মুসলমানকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু একেশ্বর বাদী মুসলমান হিন্দুকে কিছুতেই স্বীকার করতে পারে না। যতদিন না ধর্মের খোলস থেকে মুক্ত হয়ে তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা জাগছে, ততদিন পর্যন্ত তারা হিন্দুকে স্বীকার করতে পারবে না। এবং রূপান্তর ঘটতে এখনো বিলম্ব আছে। কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্য ; এবং অপ্রিয় সত্যও জেনে রাখা ভাল।

এ-সব অবান্তর প্রসঙ্গ থেকে আবার নিজের আলোচনায় ফিরে আসি। য়ুরোপীয় ব্যক্তিমানস আজ যে নিজেকে বাস্তুচ্যুত বলে মনে করছে তার আরও একটা কারণ আছে। এই কারণটা ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, এমন কি খানিকটা পরিমাণে ভারতবর্ষ সম্পর্কেও সত্য হতে চলেছে। সমাজ জীবন আজ বহুমুখী হয়ে গিয়েছে। স্পেশালাইজেশানের ঝোঁক বৃদ্ধি পেতে পেতে আজ

এখন হয়েছে যে একমাত্র পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে 'একশ' জন বিজ্ঞানী একশ বিভিন্ন ধারায় গবেষণা করতে পারেন, এবং তাঁদের মধ্যে একজনের গবেষণার বিষয় অপরে কিছুই বুঝবেন না। এমনি করে চাকরি ও ব্যবসার ক্ষেত্রে যেমন আজ অনেক বিভাগ উপবিভাগ সৃষ্টি হয়েছে: তেমনি সাংস্কৃতিক জগৎটাও বহু শাখায় ভাগ হয়ে গিয়েছে। এইসব বিভিন্ন শাখার মধ্যে সাধারণ সমস্যা খুব কমই দেখা যায়। এবং নেহাৎ প্রয়োজন না ঘটলে এক শাখার লোক অপর শাখার সম্পর্কে কোন খোঁজ খবর নেন না। আমাদের দেশে তবু মাঝে মাঝে খাদ্য সমস্যা বা ভাষা সমস্যা বা সরকারের দুর্নীতির সমস্যা অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করে, এবং তখন দেশের প্রত্যেকটি লোক অনুভব করতে বাধ্য হয় যে সে এই দেশের লোক। কিন্তু উন্নততর দেশগুলিতে একমাত্র যুদ্ধ আর ইলেকশান ছাড়া কোন সাধারণ সমস্যা নেই। কিন্তু যুদ্ধ আর ইলেকশান দুই-ই হিমালয়-সদৃশ ধাপ্পা। জনসাধারণ তা নিয়ে বোকার মত ভাবতে পারে, কিন্তু তাদের কি ভাবে ভাবতে হবে তা উপর থেকে বড় কর্তারা প্রচারযন্ত্রের সাহায্যে ঠিক করে দেন। এবং সোভিয়েট রাশিয়াতেও ইলেকশান নেহাৎ-ই একটা নাম-মাত্র ব্যাপার। তার ফলে ব্যক্তি, কখনোই নিজের অন্তরে বিশ্বমানবকে উপলব্ধি করেন না, কখনোই বিশ্বমানবের সঙ্গে নিজের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক অনুভব করেন না। অথচ ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছেড়ে বৃহত্তর পরিমণ্ডলে নিজের মনকে ব্যাপ্ত করে দিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীনতা কথাটাই তার কাছে অবান্তর। বহুমুখী সমাজগুলিতে প্রত্যেকটি শাখাতেই কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে; এবং কাজ করতে পারলে খাওয়া-পরারও খুব একটা অসুবিধা ঘটে না। এই নিয়ে যে সন্তুষ্ট থাকতে পারে সে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন নয়। কিন্তু অধিকাংশ লোকের কাছেই সর্বজনীন কোন সমস্যা বা ভাবনা সামনে উপস্থিত না থাকার দরুণ, তারা শুধু যে স্বাধীন হতে পারছে না তাই নয়, স্বাধীনতার দাবী পর্যন্ত তাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাচ্ছে। এই জন্যই সোভিয়েট রাশিয়ায় অনেকগুলি মৌলিক অধিকার না থাকা সত্ত্বেও, অধিকাংশ লোকেই সে-জন্য খুব বিক্ষুব্ধ বোধ করছে না; অথবা আমেরিকায় কাগজকলমে বহু মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি থাকলেও সামান্য লোকেই সেগুলোর সদ্ব্যবহার

করার কথা নিয়ে মাথা ঘামায়। নিজের নিজের বিশেষ শাখায় কাজের যথেষ্ট সুযোগ থাকলেই অধিকাংশ লোক সন্তুষ্ট।

আমার তো মনে হয় উন্নততর দেশগুলিতে দু' চারটি রাজনৈতিক প্রশ্ন ছাড়া শিক্ষা-সাহিত্যই একমাত্র জিনিস যার সর্বজনীন আবেদন আছে। বিজ্ঞানী বিজ্ঞান-চর্চা করেন; সাধারণ লোক তার ফল ভোগ করেন—কিন্তু সেই বিজ্ঞানের ফলের মধ্যে বিজ্ঞানীকে তিনি দেখতে পান না। ইলেকট্রিক লাইটের মধ্যে কেউই ফ্যারাডেকে খুঁজে পান না। তার কারণ ইলেকট্রিসিটিটা বস্তু—মনের বাইরের জিনিস। শিক্ষা সাহিত্য বস্তু নয় বলেই, রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে গিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের সামীপ্য অনুভব করি। কাজেই শিক্ষা-সাহিত্যের বেদীতে লেখক বা শিল্পীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের, ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বমানবের, সাক্ষাৎকার ঘটে। কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেক ইঞ্জিনিয়ার এবং ডাক্তার এবং বিজ্ঞানী বলতে আরম্ভ করছেন—সাহিত্য আর শিল্প দুই-ই অথর্ব বৃদ্ধ; বুদ্ধি থাকলে অনেক আগেই তারা মরে যেতে পারত; নিজেরা বুদ্ধি করে মরতে পারছে না বলে ইনজেকশন দিয়ে ওদের মেরে ফেলা উচিত। আবার অন্য দিক দিয়ে শিল্প-সাহিত্যেও স্পেশালাইজেশান শুরু হ'য়েছে। আধুনিক কাব্য আর আধুনিক অ্যাবষ্ট্রাক্ট চিত্র বুঝতে হলে মোটা ফী দিয়ে নামকরা বিশেষজ্ঞকে ডেকে আনতে হয়।

আমার আশঙ্কা হচ্ছে উপরের আলোচনার মধ্যে একটা প্রশ্ন অস্পষ্টভাবে উঁকি ঝুঁকি মারছে—স্বাধীনতা কি? সত্যি বলতে কি—এ প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না। তবে এ সম্পর্কে যদ্দুর আমি ভেবেছি সে সম্পর্কে খানিকটা আভাস না দিয়েও এ-প্রবন্ধ শেষ করতে পারছি না।

কিন্তু এ-প্রশ্নের আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার আগে একটু প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। উপরে আমি সে সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করেছি। সেই আলোচনার থেকে নীচের সিদ্ধান্তগুলোতে পৌঁছানো সম্ভবপর:

প্রথমতঃ, অনেকে খুব জোর গলায় বলেন, কাজ পাওয়ার স্বাধীনতা একটা খুব বড় স্বাধীনতা। কথাটা ভুল। আসলে এটা কোন স্বাধীনতাই নয়, স্বাধীনতার শর্ত মাত্র। যে মানুষ অনাহারী, তার কাছে কোন স্বাধীনতারই কোন দাম নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা খেতে পরতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্বাধীন নই। তার মানে এই নয় যে খেতে পরতে পেলেই

আমরা স্বাধীন হয়ে গেলাম। অবশ্য পশুর ক্ষেত্রে আমরা এইটুকেই স্বাধীনতা বলতে পারি। পশু যদি খাওয়া ও আত্মরক্ষার অবাধ সুযোগ পায় তবেই সে স্বাধীন।

দ্বিতীয়তঃ, দেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার নাম দিয়ে যে অধিকার-গুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়—যেমন, বলা ও লেখার স্বাধীনতা, ধর্মমতের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক দল গঠনের স্বাধীনতা। এ-গুলোও আসলে স্বাধীনতা নয়; স্বাধীনতার শর্ত মাত্র। এই শর্তগুলো দুই ভাবে লঙ্ঘিত হতে পারে—কোন ব্যক্তি যখন এই আধিকারগুলোর সুযোগ পেতে চায়, তখন তার সামনে অনেক বাধা বিপত্তি উপস্থিত হয়। প্রায় প্রত্যেক দেশেই মৌলিক অধিকারগুলোর সুযোগ নেওয়াটা বেশ আয়াসসাধ্য ব্যাপার। আবার কাগজে কলমে কতকগুলো অধিকার থাকলেই হয় না; ব্যক্তির মনে সেগুলোকে যথাযথ সদ্ব্যবহার করার আগ্রহ ও উদ্যম থাকা দরকার। তা না থাকলে অধিকারগুলো অর্থহীন। আমাদের দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার আছে। কিন্তু ক'জন লোক প্রকৃত মননশীলতার সাহায্যে যোগ্য প্রার্থীকে তা নির্ধারণ করে তাঁকে ভোট দেন? যাঁরা তা দেন না, যাঁরা অন্যের প্রভাবের দ্বারা চালিত হন, তাঁদেরকে কি স্বাধীন বলব!

তা হলে স্বাধীনতা আসলে কি?

স্বাধীনতা ব্যক্তি-মনের একটা সক্রিয় অবস্থা—ব্যক্তি নিজের অন্তরে স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করেন। এমন মনের সামনে কোন প্রশ্ন উপস্থিত হলে সে তৎক্ষণাৎ চিন্তা ভাবনা করে, বইপত্তর পড়ে, অপরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করে একটা নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে চেষ্টা করে। এই সক্রিয় প্রয়াসের নাম স্বাধীনতা। অনেক মানুষ আছেন যাঁরা কর্মজগতে খুব সক্রিয়ঃ কিন্তু ভাবজগতে নিষ্ক্রিয়। তাঁরা স্বাধীন নয়। এমন কি অনেক বৈপ্লবিক পার্টিতে এমন সব সভ্য থাকেন যাঁরা রাতদিন পরিশ্রম করেন, কিন্তু যাঁরা চিন্তার ভারটাকে নেতাদের হাতেই ছেড়ে দিতে ভালবাসেন। তাঁরা হয়তো দেশের মানুষের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছেন; কিন্তু তাঁরা নিজেরা স্বাধীন নন।

স্বাধীনতা ব্যক্তির ব্যাপার। ব্যক্তিই স্বাধীন হতে পারে। সমষ্টির স্বাধীনতার কোন প্রশ্ন ওঠে না, কারণ ব্যক্তি-মনের বাইরে সমষ্টির কোন মন নেই। সমাজ-মানস বলে কোন মিষ্টিক সত্তার কোন অস্তিত্ব নেই।

সমাজমানস সমাজদেহের অন্তর্গত ব্যক্তিদের মনের সমষ্টি মাত্র। অথবা ব্যক্তিমানসের মধ্যে সমাজ-মানসের অস্তিত্বের একটা অনুভূতি আছে, তাকেও সমাজ-মানস বলতে পারি, এবং সেক্ষেত্রে সমাজ-মানস ব্যক্তিমনের অংশমাত্র। কাজেই ব্যক্তির স্বাধীনতাকে বাদ দিয়ে সমাজবদ্ধভাবে আমরা স্বাধীন হতে পারি এ-কথার কোন মানেই হয় না। অমুক দেশটা স্বাধীন—একথাটার একটা টেকনিক্যাল অর্থ আছে ; না হলে কথাটা অর্থহীন হয়ে যেত। পরাধীন ভারতবর্ষে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-গান্ধীজী প্রভৃতি মনীষীরা এসেছিলেন। তাঁরা স্বাধীন ছিলেন না এ-কথা কি আমরা বলতে পারি ?

সমাজ মানেই হচ্ছে বন্ধন, ব্যক্তি মানেই হচ্ছে স্বাধীনতা। সমাজে অনেক মানুষকে একসঙ্গে থাকতে হয় পরস্পরের স্বার্থের খাতিরে। এবং কতকগুলো নিয়ম বা Discipline মেনে চলতে হয়। ব্যক্তি নিজের গরজেই স্বেচ্ছায় এই বন্ধনকে স্বীকার করে নেয়। সভ্যতা কথাটার তাৎপর্য এইখানে যে সভ্য মানুষ সমাজের জন্য স্বার্থত্যাগ করার পর নিজের জন্য অনেকখানি সময় পায়, নিজের নিজস্ব চিন্তা ও অনুভূতিকে ছড়িয়ে দেওয়ার মত বিস্তীর্ণ মানসিক পরিমণ্ডল লাভ করে। Collective life বা সমষ্টিজীবন কথাটার অর্থই হল ব্যক্তির এই ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতাকে অপহরণ করা। এই সব আত্মপ্রতারণা-মূলক কথাগুলির মোহে আমরা যেন না ভুলি। কমিউন পরিকল্পনার মধ্যে ব্যক্তির কোন স্বাধীনতা থাকে না।

কথাটাকে আর একটু বিশদ করে বলি। প্রত্যেক মানুষের আবেগ অনুভূতি, চিন্তা, ভাবনা, সুখ, দুঃখ ব্যক্তিগত। প্রত্যেকের জীবন যাপন যার যার নিজস্ব ব্যাপার,—সেখানে অপরে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। আমার সুখ দুঃখ, আমার সৌভাগ্য মন্দভাগ্য আমাকেই বহন করতে হবে—every man must bear his own cross। এমন কি মা-ও ছেলের দুঃখের অংশ গ্রহণ করতে পারেন না ; বড়জোর তাঁকে খানিকটা আরাম দিতে চেষ্টা করতে পারেন। রত্নাকর দস্যুর গল্পটা আমরা জানি। রত্নাকরের পাপের ভাগ পরিবারে আর কেউ নিতে রাজী হয় নি। কারণ ভাগ নেওয়া যায় না। এই রূপকটির মধ্যে একটি গভীর সত্য আমরা লাভ করছি। অপরে কোন ভাল জিনিস খেলে তাতে আমার খাওয়া হয় না ; অপরে কোন সুন্দর দৃশ্য দেখলে তাতে আমার দেখা হয় না। কমিউনের প্রতিনিধি হয়ে দলপতি দেশভ্রমণে গেলে

তাতে দলপতির লাভ, অপরের কোন লাভ নেই। তিনি ফিরে এসে একটা খুব মনোজ্ঞ রিপোর্ট দিতে পারেন ; কিন্তু দেশভ্রমণের রিপোর্ট শোনার আনন্দ আর দেশভ্রমণ দুটো স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা।

তেমনি চিন্তা ভাবনা সম্পূর্ণ ব্যক্তির কাজ। Colletive thinking বা সমবেত চিন্তা বলে কোন জিনিসের অস্তিত্ব নেই। এ সব ভাবগত মিষ্টিসিজম আমাদের ত্যাগ করার সময় এসেছে। পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভিতর দিয়ে যার যার চিন্তাকে আমরা আরও শানিত করে নিতে পারি। কিন্তু দশটা মানুষ এক জায়গায় একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে বসলে দশটা মন মিলিত হয়ে একটা নতুন এককের জন্ম হল—এরকম অনুমান করা মিষ্টিসিজমকে প্রশ্রয় দেওয়া। দশজন মিলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তা আসলে কোন ব্যক্তির সিদ্ধান্ত। এই ধরণের প্রয়াসের সুবিধা এই যে তাতে ব্যক্তির দায়িত্ব হ্রাস পায়।

এক হাজার মানুষ যখন কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শোভাযাত্রায় মিলিত হয়, তখন ব্যক্তির চিন্তাশক্তি লোপ পায়। ব্যক্তির মনে এই অনুভূতি জাগে যে সে নিজের ব্যক্তিসত্তার চেয়ে বৃহত্তর একটি শক্তির দ্বারা চালিত হচ্ছে। এবং তার দায়িত্ববোধ লোপ পায়। সেইজন্য জনতা সাংঘাতিক সৎসাহস দেখাতে পারে, আবার জঘন্য নারকীয় বীভৎসতার পরিচয় দিতে পারে। একই ব্যক্তি এক ধরণের জনতার মধ্যে থেকে স্বাধীনতার সৈনিক হতে পারে, আবার অন্য-ধরণের জনতার মধ্যে থেকে দাঙ্গাহাঙ্গামা বা নারীধর্ষণ করতে পারে। সেটা নির্ভর করে দলপতির উপর। জনতার ইচ্ছা এবং প্রয়োজন বুঝে দলপতি তাদের পরিচালিত করেন না ; দলপতির ইচ্ছা এবং প্রয়োজন অনুসারেই জনতা চালিত হয়।

আমরা প্রচলিত কথায় অনেক সময় বলি—mass হচ্ছে ভেড়ার পাল। কথাটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শুধু কথাটা যখন আমরা বলি তখন নিজেদেরকে mass-এর থেকে আলাদা করে ভাবি। কিন্তু আমরাও মানে যথেষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিরাও যখন mass এর মধ্যে থাকি, তখন আমরাও ভেড়ার পালের সভ্য হয়ে যাই। আমাদের স্বাধীন বিচার ক্ষমতা লোপ পায়। এ বিষয়ে আমাদের মনে অনেক আত্মপ্রতারণামূলক ধারণা আছে। সেগুলো আজ পরিহার করার সময় এসেছে। mass সব সময় ব্যক্তির চেয়ে

নীচুস্তরের। mass এক বিপুল শক্তি অনেক সময় এই শক্তির সদ্ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু জনগণের নামে বিগলিতাশ্রু না হয়ে মনে রাখা ভাল যে জন-শক্তি বিবেক-বুদ্ধিহীন বিচার-বুদ্ধিহীন পশুশক্তি, এবং সেইজন্য বিপজ্জনক। তথাপি যতদিন পর্যন্ত সমাজে শোষণ ও অত্যাচার থাকবে ততদিন পর্যন্ত গণআন্দোলন ও পার্টিগঠনের প্রয়োজন অবশ্যই থাকবে। কারণ জনতাই শক্তি ও সাহসের উৎস ; মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে দুর্বল ও ভীরু। পিছনে জনতা আছে, এই চেতনাই ব্যক্তিকে শক্তি ও সাহস দেয়।

কাজেই কমিউন-জীবন হচ্ছে পশুর জীবন। কমিউন পরিকল্পনার মধ্যে একটি চেষ্টা থাকে ব্যক্তিকে যথাসম্ভব বেশী সময় দলের মধ্যে থাকতে বাধ্য করা। যাতে তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের চেতনা, স্বাধীন চিন্তার মনোভাব বেশী জাগ্রত না হয়। বস্তুতঃ যূথবদ্ধ মানুষ চিন্তাই করে না ; দলপতির চিন্তাই তার চিন্তা। এবং যে মানুষ অপরের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে চিন্তা করতে পারে না, সে মানুষ নয়, পশু জিনিসটা অবশ্য একটা সংজ্ঞার ব্যাপার—আমরা বলতে পারি, সভ্যতা হচ্ছে পশুত্বের দিকে ফিরে যাওয়া। সে ক্ষেত্রে মানতেই হবে যে কমিউন ব্যবস্থা অগ্রগতির পথে একটি "বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।"

বলা হয়, ব্যক্তির চেয়ে সমাজ বড়। কথাটাকে এমনভাবে বলা হয় যাতে চিন্তাগত mysticism প্রকাশ পায়। যেন, ব্যক্তির সমষ্টির বাইরে সমাজের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। যেন ব্যক্তির সুখের বাইরে সমাজ নামক এব্‌স্ট্রাক্সনটির একটা পৃথক সুখ আছে, এবং কল্পিত সুখটার জন্য ব্যক্তিকে স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। এই ধরণের মিষ্টিক কল্পনাকে যদি আমরা প্রশ্রয় না দিই, যদি ব্যক্তির সুখের সমষ্টিকেই সমাজের সুখ বলে গণ্য করি, তবে সমাজ ব্যক্তির চেয়ে বড় নয়। যেমন, একজন লোকের মৃত্যু একশ' জন লোকের মৃত্যুর চেয়ে গুণগত অর্থে বেশী শোকাবহ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ, দু'জন ব্যক্তি মিলে একটি বৃহত্তর জগৎ তৈরী হয় না, বা একশ' জন ব্যক্তি মিলে একশ' গুণ বৃহত্তর জগৎ সৃষ্টি হয় না। কাজেই একজনের মৃত্যুর শোকও যা, একশ' জনের মৃত্যুর শোকও তাই। এ-কথাটা সুখের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একজন লোকের সুখের তুলনায় একশ' জন লোকের সুখ একশ' গুণ বেশী নয়। বরং একজন লোকের সুখ আর একশ' জন লোকের সুখ সমান। এখানে ১=১০০। The more, the merrier কথাটির অর্থ এই নয় যে সংখ্যাধিক্যের

দরুণ সুখের যোগফল বাড়ল। কথাটার অর্থ এই যে সংখ্যাধিক্যের দরুণ ব্যক্তির মনে সুখানুভূতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল। সেই সমাজই আদর্শ সমাজ যে সমাজে যোগ্যতা অযোগ্যতা নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্ভব মূল্য দেওয়া হয়, যেখানে একজনের সুখকে গণ-সমষ্টির সুখের সম্ভব বলে গণ্য করা হয়। এইটেই সমাজতন্ত্রবাদী ফরমূলা—To each according to his necessity, from each according to his capacity—কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য।

ব্যক্তির নিজস্ব ব্যক্তিত্বকে বিকাশের সুযোগ না দিয়ে, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব কল্পনা অনুযায়ী সুখকে আয়ত্ত করার ব্যবস্থা না করে, এক কথায় ব্যক্তির জীবনের ব্যক্তিগত চরিতার্থতা অর্জনের উপর কোন রকম গুরুত্ব না দিয়ে, কমিউন ব্যবস্থার ব্যক্তিকে ছাঁচে-ঢালা মানুষে পরিণত করার চেষ্টা চলে। কার সুখের জন্য ? না, একটি মিষ্টিক সমাজ-সত্তার কল্পিত সুখের জন্য। এ সুখ কে দেখতে পায় ? যে বাইরে থেকে আসে সে দেখতে পায়। একজন বহিরাগত পর্যটকের কাছে সাজানো-গোছানো যন্ত্রের মত নিয়মানুবর্তী সুসমৃদ্ধ কমিউনের দৃশ্যটি নিঃসন্দেহে নয়নমুগ্ধকর। যেমন, সেই সৈন্যদলই সুন্দর যে সৈন্যদল ঝকঝকে তকতকে, অত্যন্ত নিয়মানুবর্তী, যে সৈন্যদলে প্রত্যেকটি সৈনিক নিজের ব্যক্তি সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়ে দলপতির নির্দেশের কাছে নিঃশেষে আত্মসমর্পন করতে পেরেছে। এই সৈন্যদল নিঃসন্দেহে সুন্দর, দলপতির দিক থেকে নিঃসন্দেহে কার্যকরী। কিন্তু যে সৈন্যরা এই সৈন্যদলে আছে, তাদের দিক থেকেও কি তাই বলা যায় ? মানুষের জীবনে যত বৃত্তি আছে তার মধ্যে সৈনিকবৃত্তি নিকৃষ্ট ; কারণ সৈনিক জীবনে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটে। আমরা কি সমস্ত সমাজকে সৈন্যদলে পরিণত করতে চাইব ? (পৃথিবীতে আজও হয়তো সৈনিকবৃত্তির আবশ্যকতা আছে ; কিন্তু জিনিসটাকে necessary evil তা স্বীকার করতে বাধা কি ?)

আগেই বলেছি স্বাধীনতা মনের সক্রিয়তা। শারীরিক স্বাধীনতা বলেও একটা কথা আছে বটে—কারণ যে মানুষকে ঘরে আটকিয়ে রাখা হয়েছে সে শারীরিক অর্থে স্বাধীন নয়।

কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা মনের। সেইজন্য বিপ্লবী আজীবন কারাগারে কাটালেও মুক্ত পুরুষ।

কিন্তু মনের উপর খবরদারী করার জন্য অনেকগুলো শক্তি মোতায়েন

আছে। মার্কস্ বলেছেন আমাদের মনোজগৎ সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয়। ফ্রয়েড বলেছেন আমাদের চিন্তা ভাবনা যৌন প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

মার্কসের কথা নিঃসন্দেহে সত্য ঃ কারণ জীবদেহের প্রথম কাজ দেহকে বাঁচিয়ে রাখা। পশুজীবনে সেইটেই একমাত্র কাজ। মানুষ কিন্তু দেহকে বাঁচিয়ে রাখার পর আরও কিছু করতে চায়; কিন্তু মানুষ সাংস্কৃতিক জীবনে যাই করতে চেষ্টা করুক, সে চেষ্টাকে অবশ্যই বেঁচে থাকার সমস্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ফ্রয়েডের কথার মধ্যেও গুরুত্ব আছে—কারণ যৌন বৃত্তি নিরোধ করে যে কী বিপত্তি ঘটে তার কিছু কিছু তত্ত্ব আমাদের জানা আছে।

এঙ্গেলস্-এর বিখ্যাত স্বাধীনতার সংজ্ঞাটি প্রসঙ্গত স্মরণ করছি—Freedom is the recognition of necessity। জীবনে যা অপরিহার্য তাকে স্বীকার করে নেওয়াই স্বাধীনতা। যদি কোন মানুষ বাধা না মেনে যথেচ্ছভাবে বিচরণ করবে ভেবে আগুনের ভিতর দিয়ে হাঁটতে যায় তবে সে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কাজেই তার এই ধরণের স্বাধীনতাস্পৃহাকে প্রশংসা করা যায় না। বরং সে যদি আগে থেকে জেনে নেয় কোথায় কোথায় যাওয়া বিপজ্জনক এবং সেগুলো এড়িয়ে চলে, তবে কার্যতঃ সে চলাফেরার অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে।

আধুনিক মানুষের সামনে দুটি প্রধান অপরিহার্যতা আছে। প্রথমতঃ, শ্রেণী সংগ্রামের ফলে একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় সমাজের অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটবে, এবং তার প্রথম পর্যায়ে প্রোলেটারিয়েট একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন তার নতুন অর্থনৈতিক ভিত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। এই ঐতিহাসিক অপরিহার্যতার বিরুদ্ধে মিথ্যা হাত-পা ছুঁড়ে নিরর্থক শক্তিক্ষয় না করে তাকে শান্তভাবে স্বীকার করে নেওয়াই ভাল। এই সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে নিয়ে দেখা যাবে জীবনকে প্রসারিত করার অনেক সুযোগ পাচ্ছি। এরই নাম স্বাধীনতা।

এঙ্গেল্‌স আজীবন সাধনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, এবং তাঁর এই সিদ্ধান্ত তখনকার প্রচলিত চিন্তাধারার বিপরীত ছিল। প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, অন্তরের কোন্ প্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এঙ্গেলস্ তাঁর আজীবনের কঠিন সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন? এর জবাব আমরা জানি না, অনুমান করতে পারি

মাত্র। অনুমান অনুমানই। তবু অনুমানের চেষ্টা দোষের কিছু নয়। এঙ্গেলসের সময়ে জীবজগতের বিবর্তনের ক্ষেত্রে ডারউইন কথিত struggle for exsistence এবং survival of the fittest—অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম এবং শ্রেষ্ঠতমের জয়লাভ—এই দুটি তত্ত্বই অপরিহার্য নিয়ম বলে স্বীকৃত ছিল। আমার মনে হয় জীবজগতের ক্ষেত্রে এই দুটি তত্ত্ব যে অন্ততঃ আংশিকভাবে সত্য একথা অস্বীকার করা যায় না। অপরিহার্যতাকে স্বীকার করে নেওয়াই যদি স্বাধীনতা তবে এঙ্গেলস্ কেন এই তত্ত্ব দুটিকে শান্তভাবে আত্মসমর্পণের মনোভাব নিয়ে স্বীকার করে নিলেন না? কেন তিনি সারাটা জীবন ব্যয় করলেন এই কথা চিন্তা করে যে কী করে এই দুটি তত্ত্বকে অস্বীকার করা যায়, অথবা কোন উচ্চতর সত্যের আবিষ্কারের ভিতর দিয়ে কী করে এই দুটি নিয়মকে অতিক্রম করা যায়? নিশ্চয়ই এই প্রয়াসের পিছনে তাঁর অন্তরের কোন প্রেরণা ছিল, এবং যে প্রেরণা হল মানুষের অন্তর্নিহিত ন্যায় এবং মানবিক বোধ। মানুষের ন্যায়-বোধ কখনোই এই ব্যবস্থা মেনে নিতে পারে না যে পৃথিবী শুধু যোগ্যতমের ভোগ্যা; পৃথিবীর অযোগ্যতম ব্যক্তির জন্য একটু জায়গা নির্দিষ্ট থাকুক এইটেই মানুষের অন্তরের দাবী। এঙ্গেলস্ নিশ্চয়ই এই অন্তরের দাবী দ্বারা পরিচালিত হয়ে সারা জীবন ধরে অনুসন্ধান করেছেন,-এবং উচ্চতর দ্বান্দ্বিক সত্য আবিষ্কার করে ডারুইন তত্ত্বের প্রতিকার খুঁজে পেয়েছেন। একটি নতুন অপরিহার্যতা আবিষ্কার করে তিনি পূর্বতন অপরিহার্যতাকে অতিক্রম করে গেছেন।

অর্থনৈতিক ভিত্তির দ্বারা মানুষের চিন্তা ভাবনা নিয়ন্ত্রিত হয়। শ্রেণীভুক্ত মানুষের চিন্তা শ্রেণী স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়। এ সব কথা যে সত্য তা আমাদের চারপাশের জীবনযাত্রায় প্রতিদিন আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু মার্কস্ এবং এঙ্গেলস্ কী করে তাঁদের শ্রেণী স্বার্থের বিপরীত চিন্তায় জীবনপাত করলেন? অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা স্বীকার করাই যদি স্বাধীনতা, তবে তাঁরা সেই স্বাধীনতাকে কেন হেলায় প্রত্যাখ্যান করলেন? বলা হয়, তাঁরা declassed হতে পেরেছিলেন। তা হলে কি declassed হতে পারাটাই, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারাটাই, স্বাধীনতার মূল কথা?

স্বাধীনতা একান্তভাবেই মানুষের মনের ব্যাপার। মনের বাইরে স্বাধীনতা কথাটাই অর্থহীন। কাজেই স্বাধীনতার সংজ্ঞা খুঁজতে হলে মানুষের মনের গতি প্রকৃতিকেই অনুসন্ধান করতে হবে। মার্কস্ এবং এঙ্গেলস্এর মানসপ্রবণতা

আমরা আলোচনা করলাম। শুধু মার্কস্ এবং এঙ্গেলস্ই কি declassed ছিলেন? মানবেতিহাসে যত মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে তাঁরা সবাই কি declassed ছিলেন না? জীবনের চৌহদ্দী মানুষকে যে সীমাবদ্ধতার জন্য আবদ্ধ রাখতে চায়, তাকে অতিক্রম করার সাধনাই মহামানবদের সাধনা। এবং তারই নাম স্বাধীনতা। আমরা কি কল্পনা করতে পারি যে বুদ্ধদেব তাঁর রাজকীয় ঐতিহ্যের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য দীর্ঘ সাধনার পর তাঁর অপরূপ মানবীয় দর্শন উপস্থিত করেছিলেন? এ কথা বিশ্বাস করা যায় যে কালিদাস বা আনন্দবর্ধন বা নিমাই, এরিস্টটল বা সেকস্পীয়র বা দান্তে, যা কিছু অপরূপকে সৃষ্টি করেছেন তা সবই শ্রেণীস্বার্থজাত? এরকম কথা বলার অর্থ মনুষ্যত্বকে অপমান করা। পৃথিবীতে যাঁদের আমরা নমস্য ব্যক্তি বলে মনে করি, তাঁরা সবাই অপরিহার্যতাকে অতিক্রম করার সাধনায় মগ্ন ছিলেন। কতটা তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন সেটা অবশ্য স্বতন্ত্র প্রশ্ন। এই মানুষের দলই হচ্ছেন স্বাধীনতার উদাহরণ।

তাহলে স্বাধীনতার মূল কথা হল অপরিহার্যতাকে অতিক্রম করে যাওয়া, বা সেই জন্য চেষ্টা করা। মানুষের চির স্বাধীন চির অতৃপ্ত আত্মা কোনদিন নিষেধ মানে নি, বাধাকে বাধা বলে গণ্য করেনি, সীমাবদ্ধতার কাছে বাধ্য মেষশাবকের মত আত্মসমর্পণ করেনি। যা অসম্ভব, যা অবাস্তব, মানুষের আত্মা চিরদিন তাই কামনা করেছে। এবং এই কামনার মধ্যেই তার স্বাধীনতা। স্বর্ণেতর ধাতু থেকে সোনা তৈরী করার অসম্ভব চেষ্টায় মানুষ যুগের পর যুগ ব্যয় করেছে, এবং সবশেষে রসায়নশাস্ত্রের জন্ম দিয়েছে। আজকে বাস্তবিকই স্বর্ণেতর ধাতু থেকে স্বর্ণ উৎপাদন করা সম্ভব। বাতাসের চেয়ে ভারী জিনিস বাতাসে ভাসতে পারে না এ কথা জেনেও মানব-সত্তা আকাশে চড়ার সঙ্কল্পকে ত্যাগ করেনি। অবশেষে আর একটি নিয়ম আবিষ্কার করে মানুষ এই নিয়মের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে গিয়াছে। বিজ্ঞানের সাধনাই তো আসলে প্রকৃতির অপরিহর্যতাকে জয় করার সাধনা। প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর কার্যকারণ সূত্র জানাতে এমনিতে মানুষের খুব আগ্রহের কারণ ছিল না। কিন্তু যেদিন মানুষ জেনেছে প্রকৃতির একটি নিয়মের সাহায্যে আর একটি নিয়মের বাধা জয় করা যায় সেদিন থেকে সমস্ত মানবজাতি বিজ্ঞানমুখী হয়ে উঠেছে।

অপরিহার্যতাকে অতিক্রম করে যাওয়াই শিল্প-সাহিত্যেরও সাধনা।

রোমান্টিক সাহিত্যিক বাস্তবে যে সুর নেই, যে রস নেই, যে রূপ নেই, কল্পনায় তাকে আয়ত্ত করার জন্য সচেষ্ট হন। বাস্তববাদী লেখক বা শিল্পী বাস্তবকে অস্বীকার করতে অনিচ্ছুক; কিন্তু যে বাস্তববাদীর শিক্ষা কর্মে ক্লিষ্ট ক্ষিপ্ত বাস্তবকেই অপরিহার্য বলে স্বীকার করে নেওয়ার প্রবণতা থাকে, সে শিক্ষা-কর্ম আমাদের যথেষ্ট পরিতৃপ্তি দিতে পারে না। বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়েও বাস্তবের পথেই বাস্তবকে অতিক্রম করে যাওয়ার সাধনার জন্যই বাস্তববাদী মহৎ।

বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, ধর্ম এবং সর্বশেষে রাজনীতি—এগুলো হচ্ছে আসলে অপরিহার্যতাকে অতিক্রম করে স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াসে মানুষের হাতিয়ার।

Freedom is the effort of man's active spirit to overcome the limits of necessity—আমি যদি স্বাধীনতার এই সংজ্ঞা দি, তবে তা আপাতদৃষ্টিতে এঙ্গেলসের সংজ্ঞার বিপরীত বলে মনে হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বিপরীত নয়, পরিপূরক। আগুনের একটি উদাহরণ দিয়ে আমি বলেছিলাম যে পথ চলার সময় কোথায় কোথায় যাওয়া বিপজ্জনক তা জেনে যদি পথ চলা যায় তবে আমরা চলা ফেরার সময় যাতে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা ভোগ করতে পারি। এ কথা নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত। আগুনকে স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক বলে মনে করে অসহিষ্ণু ভাবে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া মূঢ়তা, তার জন্য এ্যাম্বেস্টস্ আবিষ্কার করতে হয়। আকাশে ভাসব বলে পর্বতশৃঙ্গ থেকে শূন্যে ঝাঁপ দেওয়াও তেমন মূঢ়তা; তার জন্য এরোপ্লেন আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ভাল। অবশ্য স্বাধীনতা অর্জনের অসহ্য আবেগে যারা এমনি দুঃসাহসিকতার সঙ্গে মৃত্যুকে বরণ করেছেন, আমি তাঁদের শ্রদ্ধা করি। কারণ আপন অন্তরে স্বাধীনতার অসহ্য পুলক তাঁরা অনুভব করেছিলেন। সে যাই হোক, তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে স্বাধীনতার প্রথম ধাপ এঙ্গেলস্ বর্ণিত সংজ্ঞা, দ্বিতীয় ধাপ উপরে উল্লিখিত সংজ্ঞা।

সমাজতন্ত্রবাদ মানুষের স্বাধীন অন্তরের স্বাভাবিক দাবী। একনায়কত্ব তা নয়। একনায়কত্বকে আমরা যদি evil বলে জানি, তবে তা যদি ঐতিহাসিক অপরিহার্যতাও হয়, তথাপি মানুষের সক্রিয় সত্তা বিকল্প অপরিহার্যতা আবিষ্কার করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

আগেই বলেছি, স্বাধীনতা ব্যক্তির ব্যাপার, সমাজের ব্যাপার নয়। একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হাজার হাজার লোকের স্বাধীনতার কামনাকে পরিতৃপ্ত করে। একটি সার্থক শিল্পকর্মে তেমনি হাজার হাজার লোক তাদের আত্মার স্বাধীনতা অনুভব করতে পারে। তবু আমি বলব, স্বাধীনতা সমগ্রভাবে সমাজের ব্যাপার নয়, বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যেকটি ব্যক্তির ব্যাপার। ব্যক্তির স্বাধীনতা নেই, সমাজের স্বাধীনতা আছে—এটা একটা অসম্ভব কথা। সেই সমাজই শ্রেষ্ঠ যে সমাজে ব্যক্তি তার স্বাধীনতা অর্জনের সর্বাধিক সুযোগ পায়।

পৃথিবীর ইতিহাসে দু'বার এই ধরণের আদর্শ সমাজের আবির্ভাব ঘটেছিল,—একবার প্রাচীন ভারতবর্ষে, আর একবার প্রাচীন গ্রীসে। আধুনিক ইউরোপে অনেক সংগ্রাম, বহু রক্তপাতের ভিতর দিয়ে ব্যক্তি যে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তা প্রাচীনকালের সেই স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত নিজের প্রকৃতি সম্পর্কে অচেতন, স্বাধীনতার বিকাশের ছায়া মাত্র। প্রাচীন ভারতবর্ষ আমার model। এ কথা ঠিক, প্রাচীন ভারতের সামাজিক কাঠামো যথেষ্ট ঋজু ছিল। সমাজে বর্ণভেদ ছিল, মানুষের বৃত্তি বংশানুক্রমিক ছিল। তখনকার স্থিতিশীল উৎপাদন ব্যবস্থার যুগে এই ব্যবস্থাই স্বাভাবিক ছিল, যদিও জাতিতে জাতিতে যে সম্মানের পার্থক্য ছিল তা অবশ্যই আধুনিক মনকে পীড়িত করে। কিন্তু আধুনিক যুগের প্রাক্কালে যে দুর্ভেদ্য জাতিভেদের প্রাচীর আমরা দেখেছি, প্রাচীন ভারতে সে ঋজুতা ছিল না। বিশেষ করে একটি বর্ণ স্বেচ্ছাদারিদ্র বরণ করে নিয়েও শুধু মননশীলতার জন্য শ্রেষ্ঠ বর্ণের সম্মান পাচ্ছে অস্ত্রশক্তি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাহায্য ছাড়া এ ঘটনাটি আমার কাছে আশ্চর্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্বের যান্ত্রিক প্রয়োগ করে এ ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। তখনকার পশ্চাদ্বর্তী অর্থনৈতিক জীবনে এটা সম্ভব ছিল না যে সমস্ত লোক অল্প সময় জীবিকার জন্য কাজ করে, বাকী সময়টা মানসিক অনুশীলনের জন্য ব্যয় করবে। তাই এক অলিখিত শর্তে আবদ্ধ হয়ে তারা কিছু লোককে ভার দিয়েছিল মানবমনের স্বাধীনতার নিত্য-নূতন দিগন্ত আবিষ্কারের। জন্য সাহিত্য দর্শন ও ধর্ম—এই তিনটি ধারায় তখন মানুষের আত্মার স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াস প্রধানতঃ অগ্রসর হইয়াছে। সবচেয়ে বেশী ধর্ম এবং ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত দর্শন। কত যে ছোট বড় ধর্মাদর্শ গড়ে উঠেছে,

কত যে নিত্য নূতন সাধন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে, শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত কত যে দার্শনিক তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটেছে তার সীমা সংখ্যা নেই।

প্রাচীন ভারতীয় সাধকগণ দৈহিক বৃত্তিগুলির অপরিহার্যতাকে অতিক্রম করতে চেষ্টা করেছিলেন। আমার মনে হয় এইখানে তাঁদের একটু ভুল হয়েছিল; তাঁরা স্বাধীনতার এঙ্গেলস্ বর্ণিত প্রথম সূত্রটিকে অবজ্ঞা করে দ্বিতীয় সূত্রকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। তার ফলে তাঁদেরকে মিছিমিছি অনেক আত্মনিপীড়নের পথে যেতে হয়েছিল। আমার বিশ্বাস দৈহিক সীমাবদ্ধতা থেকে বা দেহসর্বস্বতা থেকে মনকে মুক্ত করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল দেহের দাবী-গুলোকে অকপটে স্বীকার করে নেওয়া। কিন্তু একমাত্র বুদ্ধদেব এবং নিমাই ছাড়া আর কেউ এ পরামর্শ দেন নি।

কিন্তু সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। একটি সমাজে কিছু মানুষ মানবাত্মার এক অসম্ভব মুক্তির কামনায় বিনা বাধায় বিনা প্ররোচনায় সম্পূর্ণ নিজস্ব নিয়মকে অনুসরণ করে সাধনা করবে বলে সারা সমাজ অধীর আগ্রহে আয়োজন করে রেখেছে— এ দৃশ্যটি আমার কাছে অপরূপ লাগে। আর জাতিভেদ ছিল সমাজজীবনে, উচ্চতর ধর্মচর্চায় বাস্তবিক কোন জাতিভেদ ছিল না। আজকে অবশ্য আমি ধর্মের পুনরুজ্জীবনের কথা ভাবছি না। ভাবছি, এমন কোন সামাজিক সংগঠন কি সম্ভব নয়, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব প্রতিভা এবং প্রবণতা অনুযায়ী আত্মিক স্বাধীনতা অর্জনে ব্যাপৃত হবে বলে সমগ্র সমাজ অধীর আগ্রহে আয়োজন করে বসে থাকবে?

হেমিংওয়ে

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ সমালোচনার ইতিহাস ॥

১৯২৯ এ "ফেয়ারওয়েল্ টু আর্মস্" প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হেমিংওয়ের স্বীকৃতির সূচনা। ১৯৩০-এ কোন এক সুসম্পাদিত ইংরেজি সাহিত্যপত্রে অধুনাকালের উপন্যাসের বিরুদ্ধে হাস্যরসিক জে' বি. মর্টনের জেহাদের জবাবে বিগত বর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ চারটি উপন্যাসের মধ্যে ঐ উপন্যাসটির নাম উল্লেখ ক'রে গ্রাহাম গ্রীন ব'ললেন, "গত বছরের বাকি ২,৯৯৬ উপন্যাসই যদি ভেজাল হয়, তবে এই চারটিই এখনও আরো কয়েক বছর উপন্যাসকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে।" ঐ প্রবন্ধের শেষেই গ্রীন আধুনিক উপন্যাসের মহত্ত্বের সাক্ষ্যস্বরূপ আটটি উপন্যাসের উল্লেখ ক'রেছেন। হেনরী জেম্স্-এর "সেন্স্ অফ্ দি পাস্ট," কন্রাড্-এর "অ্যারো অফ্ গোল্ড", জর্জ মুর্-এর "এলোয়া অ্যাণ্ড আবেলার্দ", লরেন্স্-এর "সান্স্ অ্যাণ্ড, লাভার্স্", হাক্সলী-র "দোজ্ ব্যারেন্ লীভ্স্", জয়েস্-এর "পোট্রেট্ অফ্ দি আর্টিস্ট্", ভার্জিনিয়া উল্ফ্-এর "মিসেস্ ড্যালোওয়ে"—এবং ঐ একই পংক্তিতে হেমিংওয়ের "ফিয়েস্টা"। পরের বছরই ঐ একই সাহিত্যপত্রের প্রতিনিধি লুইজি মর্গান্-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে মার্কিন উপন্যাসের তৎকালীন কথাগুরু সিংক্লেয়ার লিউইস্ বলেন্ "আমরা আমেরিকায় কী ক'রতে পারি, তার সবচেয়ে সেরা দৃষ্টান্ত টমাস্ উল্ফ্ ও আর্নেস্ট্ হেমিংওয়ে।" ১৯৩৪ সালে বহুমান্যভাজন উপন্যাসতাত্ত্বিক পেলহাম্ এড্গার "উপন্যাসের শিল্প" সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে হেমিংওয়ের কীর্তিকে যোগ্য স্বীকৃতির সম্মান দেন। এড্গার হেমিংওয়ে-র "অনুপ্রেরণাদত্ত জান্তবতা"র ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ ক'রেছেন, সঙ্গে সঙ্গেই ব'লেছেন। "এই, নির্মমতার পশ্চাতে বোধ হয় একটা সংস্কারক অভিলাষ আছে।" প্রথম দুটিমাত্র উপন্যাসের অভিজ্ঞতায় এড্গারের সিদ্ধান্ত, "তীক্ষ্ণ অনুভবের আঘাতে মনের ওপরতলার বিক্ষোভের রূপায়নে এ-হেন শক্তি জীবিত আর কারো নেই।"

স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গেই প্রভাব বিস্তার। ১৯৪০ সালেই জন্ লেম্যান্ লক্ষ্য

ক'রেছেন, ক্রিস্টফার ইশারউড্ এবং ওয়াল্টার অ্যালেনের উপন্যাসে হেমিংওয়ের প্রভাব। স্টাইন্‌বেক্, ক্যাল্‌ড্‌ওয়েল্, টেনেসি উইলিয়ম্‌স্ ও গ্রাহাম গ্রীনের কীর্তির পশ্চাতেও হেমিংওয়ের উপস্থিতি অনুভব করা যায়। স্বল্পখ্যাতরা সময়ে সময়ে সে-প্রভাবের স্রোতে ভেসে গেছেন।

সমালোচনার ইতিহাসে স্বীকৃতির পরের অধ্যায় ব্যাখ্যান ও মূল্যায়ন। চল্লিশের যুগে ক্রাচ্-এর মূল্যায়ন আজ বাতিল। তবু, প্রত্নতত্ত্বের আবেদনেই তাঁর ব্যাখ্যা আজও স্মরণ করা যায়ঃ হেমিংওয়ের সহজ শৈলী তাঁর জীবন-দর্শনের সরলতার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। তাঁর দৃষ্টিতে জীবন যেন সারত অর্থহীন ও সারত মূল্যহীন। অন্তত কখনও কখনও তিনি যেন বলতে চান, যৌনসঙ্গম ও হত্যার সাধ, এ দুটিমাত্র পশুপ্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধনের মুহূর্তবিশেষ ছাড়া গুরুভার শূন্যতার বোধ থেকে আর কখনও মুক্তি নেই। সেনানী, শিকারী ও বুলফাইটার 'বাঁচবার' বহু সুযোগে ধন্য—শুধু হত্যার সুযোগে ভাগ্যবান্ ব'লেই নয়, অশান্তিক্ষুব্ধ মৃত্যুর পরিবেশে যৌন অভিজ্ঞতা তীব্রতম ব'লেও।"

পঞ্চাশের যুগে হেমিংওয়ের সাহিত্যকর্মের বিচারে প্রাজ্ঞতর দৃষ্টি এসে পড়ে, ফিলিপ্ ইয়াং-এর কল্যাণে। হেমিংওয়ের জীবনদর্শনে জটিলতার মর্ম ইয়াং অনুভব ক'রেছেন। ইয়াং দেখেছেন, হেমিংওয়ের নায়ক আহত, তবু অপরাজেয় —কিন্তু আঘাতচিহ্ন কোনদিন মুছবে না। আঘাতের বেদনা থেকে শান্তি দেবার জন্য আছে হেমিংওয়ের নীতিপ্রবক্তা নায়ক। এই দ্বিতীয় জাতের নায়ক আত্মসম্মান ও সৎসাহসের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ক'রে পরাজয়ের মধ্যেও লড়াই করবার শিক্ষা মানুষকে পৌঁছে দেয়, সঙ্গে সঙ্গেই "ভারের পেষণে সার্থকতাপ্রাপ্তি"র মৌল নীতি ঘোষণা করে। "আঘাত, সমাজত্যাগ, ও নীতির ঘোষণা (এবং এই ত্রয়ীর কর্মানুগ বিন্যাস)—ছোটগল্পের বাইরে হেমিংওয়ের যাবতীয় গ্রাহ্য সাহিত্যকর্মের বিষয়ভূমি। "টু হ্যাভ্ অ্যাণ্ড হ্যাভ্ নট্"-এ নিঃসঙ্গ মানুষের অসহায়ত্বের স্বীকৃতির মধ্যেই তিনি পার্থিব সমাজে ফিরে আসেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধ তাঁকে ফিরিয়ে আনে অগণ্য মানুষের সমূহজীবনে—নৈরাশ্য থেকে তাঁকে মুক্তি দেয়। শেষ প্রকাশিত উপন্যাসের বৃদ্ধ নায়ক তাঁর নীতিপ্রবক্তা নায়কদের সেরা প্রতিভূ। বৃদ্ধ সান্টিয়াগোর সঙ্গেই হেমিংওয়ে-ও জীবন ও মানুষের সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ আস্থায় প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছেন।

মার্কাস্ কাল্‌লিফ্ ইয়াং-এর সিদ্ধান্তের মূল সুর গ্রহণ ক'রলেও তাঁর দৃষ্টির

অভিনবত্ব আছে। "হেমিংওয়ের কাছে জয়ের চেয়ে পরাজয় অনেক বেশি দামী।" নিশ্চিত পরাজয়ে যে-অগ্নিপরীক্ষার পরিণতি, সেই পরীক্ষায় পাশ ক'রতে পারলেই মানবজন্মের সার্থকতা। "মৃত্যুই, তাঁর কাছে, চূড়ান্ত পরীক্ষা।" সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষের সংকট থেকে তিনি গেছেন মানবমৈত্রীর সমাধানে, শেষে নিঃসঙ্গ মানুষের একাকী সংগ্রামের সফলতায় পরিণতি লাভ ক'রেছেন।

পশ্চিমী সমালোচকদের মধ্যে যাঁরা সাইকো-অ্যান্যালিটিক্ ঘরানার সুদক্ষ ওস্তাদ, তাঁরা অবশ্য "শেল্-শক্" তথা "ট্রমেটিক্ নিউরসিস্"-এর নামেই হেমিংওয়ের সাহিত্যকীর্তির যাবতীয় অর্থ আবিষ্কার ক'রে ফেলেছেন।

মার্কিন উপন্যাসকারদের মধ্যে আর্ণেস্ট্ হেমিংওয়ে-ই বর্তমানে সোভিয়েৎ ইউনিয়নে সবচেয়ে জনপ্রিয়। মার্কসীয় সাহিত্যসমালোচকদের মধ্যে হেমিংওয়ে-বিচারে ক্রিস্টফার কড্ওয়েল্-ই আদিপুরুষ। বার্ণার্ডশ-র পাশে প্রুস্ত, লরেন্স্, হাক্সলী ও গল্স্য়ার্দি-র সঙ্গে হেমিংওয়েকে দাঁড় করিয়ে কড্ওয়েল ব'লেছেন, এঁরা এঁদের যুগের স্বাভাবিক প্রতিভূ; বুর্জোয়া সংস্কৃতির আত্মমোহভঙ্গের ঘোষণা শুনিয়েও এঁরা এই সংস্কৃতিকে যথার্থভাবে উপলব্ধি ক'রে আরো-ভালো কিছুর জন্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ ক'রতে পারেন না। "এঁরা সর্বদাই নিজেদের স্বাধীনতাটুকুই বাঁচাতে ব্যস্ত। এঁরা ট্র্যাজিক্ নন, নিতান্তই প্যাথেটিক্, কারণ এঁরা অসহায়, অবস্থার চাপে নয়, নিজেদেরই মোহে।" যে স্পেনীয় যুদ্ধে কড্ওয়েল্-এর জীবনান্ত, সেই যুদ্ধেই হেমিংওয়ের পরিণতি-প্রাপ্তি। কড্ওয়েল্ যখন তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছেন, হেমিংওয়ের মহত্তম কীর্তি "ফর হুম্ দি বেল্ টোল্স্" তখনও দিনের আলো দেখেনি।

বছর খানেক পরেই ডক্টর স্নখোয়ার লিখেছেন, "লস্ট জেনারেশন্-এর সঙ্গে আত্মীয়তাস্থাপনে হেমিংওয়ে আর উৎসাহী নন। তিনি আজ খুঁজে পাচ্ছেন যে, সমাজচেতনা মানুষকে মহত্তর গভীরতা দান ক'রতে পারে।" মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তরকালে পরিণততর সমালোচনার গৌরব সোভিয়েৎ ইউনিয়নের আইভান কাশ্কীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যানেট্ রুবিন্স্টাইন্-এর প্রাপ্য। এ-ছাড়াও, এলেনা রোমানোভা-র সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধও উল্লেখযোগ্য।

কাশ্কীন্-এর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও শিল্পবোধ যে-কোন সাহিত্য পাঠকের শ্রদ্ধার বিষয়। কাশ্কীন প্রমাণ ক'রেছেন, মৃত্যুকে, একান্ত সত্য ও বাস্তব ব'লে স্বীকার

ক'রে নিয়ে হেমিংওয়ে-র নায়কেরা জীবনেরই গভীরতর উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন। তাই হেমিংওয়ে এবং তাঁর নায়কেরা "শেষ পর্যন্ত জীবিত, মৃত্যুর মধ্যেও জীবিত।" অবশ্য কাশ্‌কীন্ হেমিংওয়ের মধ্যে অন্তর্বিরোধও পেয়েছেন প্রচুর।

অ্যানেট্ রূবিন্‌স্টাইন্ হেমিংওয়ে-ঘোষিত মূল্যবোধগুলি আবিষ্কার ক'রে সেখানেই তাঁর সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। বস্তু ও প্রকাশের সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত হিসেবেও হেমিংওয়ের সাহিত্যকর্ম শ্রীমতী রূবিন্‌স্টাইন্-এর কাছে উল্লেখ্য। দোষ-ত্রুটিও তিনি কিছু কম দেখেন নি।

সমুদ্রপারের সমালোচকদের প্রসঙ্গান্তে বাংলাদেশে ফিরে ক্ষুব্ধ না হ'য়ে উপায় নেই। হেমিংওয়ে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ বাংলাভাষায় খুব কমই লেখা হ'য়েছে। অবশ্য, তাঁর মৃত্যুর পরে সহসা জানা গেল, এখানেও তাঁর গুণগ্রাহী আছেন। স্থানীয় পত্রপত্রিকায় যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের অধিকাংশই তত্ত্বে প্রবেশ করেন নি, তথ্য ও আপ্তবাক্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তত্ত্বে প্রবেশ ক'রেও অধ্যাপক পুরুষোত্তম লাল ও শ্রীগোপাল হালদার মান রেখেছেন। অসমর্থিত তত্ত্ব ও ভ্রান্ত তথ্যে শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটিই নিদারুণ শোচনীয়।

॥ মার্কিন সাহিত্যে হেমিংওয়ে ॥

"উপন্যাস রচনায় আমেরিকা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খুব বেশী গৌরব দাবী করতে পারে না; তবু ড্রেইজারের 'সিস্টার ক্যারী' আছে, আপটন সিন্‌ক্লেয়ারের 'অয়েল' আছে, সিন্‌ক্লেয়ার লুইয়ের 'ব্যাবিট' কিংবা 'অ্যারোস্মিথ' আছে, ডস্ প্যাসোজ বা হাওয়ার্ড ফাস্টও স্মরণীয়। ঔপন্যাসিক হেমিংওয়েকে এঁদের সমপর্যায়ী বলা কঠিন।"

নারায়ণবাবুর কথা। এক একটা দেশ ঐতিহাসিক কারণেই যুগবিশেষে কোন বিশেষ সাহিত্যরূপে সুষ্ঠু প্রকাশ পায়—অনেকটা সেই কারণেই সেই সৃষ্টি গৌরবধন্য হয়। গ্রীক ট্র্যাজেডি, রোমান স্যাটায়ার, এলিজাবেথীয় নাটক, মেটাফিজিকাল কবিতা, ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধের ফরাসী উপন্যাস ও দ্বিতীয়ার্ধের রুশ উপন্যাস দৃষ্টান্তরূপে সুপরিচিত। বিংশ শতাব্দীতে যদি ঐরূপ কোন জাতীয় সাহিত্যরূপের কথা ব'লতে হয়, তবে একমাত্র মার্কিন উপন্যাসের কথাই উল্লেখ করা চলে। একই যুগের সীমায় সিংক্লেয়ার লিইউইস্, আপটন্ সিংক্লেয়ার জ্যাক্ লণ্ডন, থিয়ডোর ড্রাইজার, স্টাইন্‌বেক্, ক্যাল্‌ড্‌ওয়েল্, ফক্‌নর, হেমিংওয়ে,

এতজন সার্থক ঔপন্যাসিকের একত্র সাধনাই মার্কিন উপন্যাসকে এই গৌরব এনে দিয়েছে। শুধু বাস্তবতার নবদিগন্ত উন্মোচনেই নয়, উপন্যাসের রূপবিবর্তনের ইতিহাসেও অন্তত হেমিংওয়ে ও ফক্‌নর্‌-এর অলোকসামান্য কীর্তি (পেলহাম্‌ এড্‌গার, ওয়াল্টার অ্যালেন্‌-এর মত খ্যাতিমান উপন্যাসতাত্ত্বিকদের স্বীকৃতি তো জ্ঞানীজন-সুবিদিত) মার্কিন উপন্যাসের গর্বের বিষয়।

১৯৩৭ সালেই টাইম্‌স্‌ লিট্‌রারি সাপলিমেণ্ট লিখছেন, "পারী যে যুগে সারা ইউরোপকে পথ দেখাত, সে যুগ বিগত। একা আমেরিকাই তার ড্রাইজার, সিংক্লেয়ার লিইউইস্‌, হেমিংওয়ে, ফক্‌নর্‌-কে নিয়ে, ভার উল্টে দিয়েছে।" উপন্যাস আলোচনায় এ স্বীকৃতি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ইতিপূর্বে চোখেই পড়েনি। সন্দেহ হয়, মার্কিন উপন্যাসের সঙ্গে নারায়ণবাবুর প্রত্যক্ষ পরিচয় যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ নয়। তাই যে-কটি উপন্যাসের নাম তিনি উল্লেখ ক'রেছেন, তার একটিও উক্ত ঔপন্যাসিকদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি নয়। ড্রাইজারের "দি অ্যামেরিকান ট্র্যাজেডি" (আইজেন্‌স্টাইন্‌ যার চিত্ররূপদানের পরিকল্পনা ক'রেছিলেন), লিইউইস্‌-এর "কিংস্‌ব্লাড রয়াল", আপটন্‌ সিংক্লেয়ার-এর "জাঙ্গল্‌" (ছেলেমানুষির অপরাধে "অয়েল" দায়িত্ববোধসম্পন্ন সাহিত্য সমালোচনার প্রদেশ থেকে নির্বাসিত), এইগুলিরই উল্লেখ স্বাভাবিক ও সমুচিত। একই পংক্তিতে হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর উল্লেখ যেমন অদ্ভুত (উপন্যাস সম্পর্কে প্রাজ্ঞ আলোচনায় ফাস্ট-এর উল্লেখ কোনদিন চোখে পড়েনি), ফক্‌নর্‌-এর অনুল্লেখ তেমনই বিস্ময়কর। স্টাইন্‌বেক্‌ ও ক্যাল্‌ডওয়েল্‌-এর অনুল্লেখও অবাক্‌ করে।

মার্কিন উপন্যাসের প্রথম যুগের ইতিহাস ইংলণ্ডের সমকালীন সাহিত্যের প্রভাবমুক্ত হবার কঠোর প্রকাশ। মার্কিন সাহিত্যে ওয়াশিংটন আর্ভিং, ফেনিমুর কুপার, এড্‌গার অ্যালান পো ও ন্যাথানিয়েল হথর্ণ কোন স্থান দাবী ক'রতে পারেন না। আমেরিকায় ব'সে এঁরা ইংলণ্ডের সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ ক'রেছেন। আমেরিকার জীবন, মানুষ, ও ভাষা এঁদের কাছে কোনদিনই সত্য হ'য়ে ওঠে নি। হেমিংওয়ের নালিশ, "ওঁরা সবাই ছিলেন খাঁটি ভদ্দরলোক, অন্তত তাই হওয়া ছিল ওঁদের সাধ। ওঁরা সকলেই বড় সম্ভ্রান্ত। তাই, দেশের লোক চিরকাল ধ'রে যে-সব কথা ব্যবহার ক'রছে, যে-সব কথা নিয়ে আমাদের ভাষা গড়ে উঠেছে, যে-সব কথা ওঁরা ব্যবহার ক'রতেন না। ওঁদের যে দেহ ব'লে কিছু আছে, তা মনেই হ'ত না। তবে ওঁদের মন ছিল—

সুন্দর, শুকনো, পরিষ্কার মনগুলো।" একই অভিযোগ ডি. এইচ. লরেন্স্-এর : "কথাটার জঘণ্যতম অর্থে কুপার ছিলেন 'ভদ্দরলোক'।" আমেরিকার মানুষ ও ভাষাকে অস্বীকার ক'রে এই "কলোনিয়ল্"রা কোন মহৎ কীর্তিই রচনা করতে পারেন নি (পো-র কবিতা বোদ্‌লেয়র্-মালার্মের স্যাঁবলিজম্ এর পশ্চাতে উপস্থিত ছিল, এটা উল্লেখযোগ্য হ'লেও বর্তমান আলোচনায় অবান্তর)।

বিষয়ে মেজাজে ভাষায় মার্কিন সাহিত্যের যথার্থ প্রতিষ্ঠা ওয়াল্ট্ হুইট্‌ম্যানের কবিতায়—মার্ক টোয়েনের উপন্যাস তারই পরের পদক্ষেপ। অন্তর্বিরোধ ও সংকটে ক্ষুব্ধ যে বাস্তবে মার্ক টোয়েন চোখ রাখলেন, তার মর্ম গ্রহণ উপন্যাসের মাধ্যমেই সম্ভব। একদিকে ক্রীতদাস প্রথার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আধা-ফিউডাল দক্ষিণ, অন্যদিকে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী পুঁজিবাদী উত্তর—এই দুই আমেরিকার বিরোধ, এবং এই বিরোধের পটভূমিতেই নিগ্রোবিদ্বেষ ও ক্যাশ্-নেক্সাস্-এর আত্মপ্রতিষ্ঠা—এই-ই হ'ল মার্ক টোয়েনের প্রসঙ্গভূমি। ছোট গল্পকে না ছাড়লেও উপন্যাসই হ'য়ে ওঠে টোয়েনের প্রিয় প্রকাশ—সেখানেই তাঁর গভীরতর ও সার্থকতর পরিচয়। সংকটের গভীরতম উপলব্ধিতে যে-ব্যাপ্তির বোধ, তাতেই ছোট গল্পের পরাজয় স্বীকার ও উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা।

মার্ক টোয়েনের সমাজচৈতন্যের উত্তরাধিকার মার্কিন সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হ'য়ে রইল। মার্কিন ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ে দ্রুত শিল্পায়নের মধ্যে দেশের সমাজসত্তায় যে অন্তর্বিরোধের প্রকাশ, উপন্যাসে তার প্রতিফলন স্টিভেন ক্রেন্, ফ্র্যাংক্ নরিস্, জ্যাক্ লণ্ডন ও থিয়ডোর ড্রাইজারে। ধনতন্ত্রে আমেরিকার প্রতিষ্ঠালাভের প্রয়াস-পর্বের প্রতিফলন আপটন সিংক্লেয়ারে। ধনতন্ত্রী আমেরিকার আত্মপ্রকাশ সিংক্লেয়ার লিইউইস্-এ। সমাজের রূপ বদ্‌লাচ্ছে—প্রত্যেক সমাজচেতন লেখকই নতুন দেশ ও নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'চ্ছেন, নতুন টোয়েন উপন্যাসের ব্যাপ্তিতেই শান্তি পায়। এই ভাবেই হথর্ণ-পো-ব্রেট হার্ট-এর ছোট গল্পের ক্ষীণ, কৃশ ঐতিহ্যের অন্তর্ধান।

হেমিংওয়ে আরম্ভ ক'রলেন ছোট গল্পেই। ডি. এইচ. লরেন্স্ ১৯২৭ সালেই লিখেছেন," 'ইন্ আওয়ার্ টাইম্' নামেই গল্পগ্রন্থ, আসলে তা নয়। একটি মানুষের কয়েকটি ছবিতে এটি একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাস।" বাল্যের অভিজ্ঞতা থেকে শুরু ক'রে শেষে মাঝে মাঝে ছোট গল্পে ফিরে এলেও হেমিংওয়ে-র গৌরব উপন্যাসেই। তবু, হেমিংওয়ের ছোট গল্প হয়ত অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজবোধ্য

ব'লেই এখনও মাঝে মাঝে তাঁর উপন্যাস-গল্পের তুলনামূলক বিচার চলে। কিন্তু, এ-ও তো স্পষ্ট, প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থেই ছোট গল্পকে গ্রহণ ক'রেই হেমিংওয়ে তাকে বর্জন ক'রেছেন।

সাহিত্যিক পূর্বসূরীদের নামের তালিকায় হেমিংওয়ে চিরকালই সর্বোচ্চে মার্ক টোয়েনের নাম রেখেছেন। হেমিংওয়ের সিদ্ধান্ত, "তাবৎ আধুনিক মার্কিন সাহিত্যই এসেছে মার্ক টোয়েনের 'হাক্‌লবেরি ফিন্' থেকে। ওটিই আমাদের সবচেয়ে সেরা বই। সব মার্কিনী লেখারই ঐ একই উৎস। ওর আগে কিছুই ছিল না। ওর পরে অত ভালো আর কিছু লেখা হয় নি।" টোয়েনের সমাজ বোধের সঙ্গে সঙ্গেই হেমিংওয়ে তাঁর ভাষার উত্তরাধিকার লাভ ক'রেছেন।

হেমিংওয়ের বিশিষ্ট রচনারীতির পশ্চাতে গার্টড্ স্টাইনের প্রভাবের কথা এককালে অনেক শোনা গেছে (বুদ্ধির জগতে চিরপশ্চাদ্‌পদী বাংলাদেশে অবশ্য আজও শোনা যাচ্ছে)। তাঁর রচনারীতির স্ট্যাকাটো চালের প্রথম উৎস হাক্ ফিন্-এর জবানবন্দী। দ্বিতীয় উৎস, জীবনের দিকে তাকানোর স্বকীয় ভঙ্গী। যুদ্ধক্ষেত্রের রুক্ষ সৈনিক স্বভাবতই স্বল্পভাষী, স্পষ্টবাদী, আত্মসংযত। লরেন্‌স্-এর ভাষায়, "এ-যেন একটা দেশলাই কাঠিতে আগুন ধরানো—উত্তেজনায় দৃপ্ত স্বল্পায়ু একটা সিগারেট—ব্যস্, তারপরেই সব শেষ।"

শব্দচয়নে ও বাক্যগঠনে মার্ক টোয়েনের শিক্ষা হেমিংওয়ে-র রচনায় কতটা গভীরভাবে প্রবেশ ক'রেছে, তার পরীক্ষা খুবই সহজ—"হাক্‌লবেরি ফিন্"-এর প্রথম অধ্যায় ও "ফর হুম দি বেল্ টোল্‌স্"-এর শেষ চার পৃষ্ঠা পাশাপাশি রাখলেই প্রমাণ মিলে যাবে। দ্রুতগতি, কথা বলার ঘরোয়া ঢঙ্ (অথচ আড্ডার ঢঙ নয়), অঙ্গসঞ্চালন ও চিন্তার এক অদ্ভুত যোগ, নৈঃসঙ্গ্য, নিগূঢ় মনের অনুপস্থিতি, পুঙ্খানুপুঙ্খের বিবৃতি—এই গুণগুলির মধ্যেই বৈশিষ্ট্য।

হেমিংওয়ের রচনারীতির আরেক বৈশিষ্ট্য—পুরুষালিভাব (কথাটা এখানে একটু বিশিষ্ট অর্থেই ব্যবহৃত, ইংরেজিতে ব'লব, 'ম্যাস্‌ক্যুলিনিটি')। সংযুক্ত বর্ণ ও একাক্ষর পদ ('মনোসিলেবিক্'), ভাষাতাত্ত্বিকদের বিচারে; পুরুষালি-ভাবের পরিচায়ক। "গ্রীন্ হিল্‌স্ অফ্ আফ্রিকা"র প্রথম পরিচ্ছেদে একশোটি শব্দের মধ্যে আশিটি মনোসিলেব্‌ল্ ও সাতাশটি সংযুক্ত বর্ণ পাওয়া যায়। দেহ সম্পর্কে অসঙ্কোচ ও সংযমের যে সমন্বয় হেমিংওয়ের রচনায় লক্ষ্যণীয়, তাও বিশেষভাবেই এই দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হেমিংওয়ে-র বিখ্যাত উপন্যাস-

গুলির মধ্যে একটিতেও নগ্নতার কোন চিত্র নেই। অথচ দেহের মায়াকেও তিনি অস্বীকার করেন না, একান্ত সত্য ব'লেই তাকে মেনে নেন, সহজভাবে মেনে নেন। একদিকে আর্স্কিন্ ক্যাল্ড্ওয়েল্-এর "গড্স্ লিট্ল্ একার্"-এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ডার্লিং জিল্-এর সেই কেলেঙ্কারীর বর্ণনা, সার্ত্র-এর "ইন্টিমেসি" পর্বের কোন কোন পরিস্থিতি, "অয়েল্"-এর সেই হাস্যকর দৌড়—অন্যদিকে সিংক্লেয়ার লিউইস্-এর "দি জব্" উপন্যাসে ব্যাব্সন্ ও উনা-র বিদায়ের সন্ধ্যায় উনার নীতিবাদী সঙ্কোচ—এই দুই চরম থেকেই হেমিংওয়ে সমান দূরত্ব রক্ষা ক'রেছেন। দেহকে কেন্দ্র না ক'রেও মৈথুনের বর্ণনা সম্ভব, তার সার্থকতম দৃষ্টান্ত লরেন্স্-এর "লেডি চ্যাটার্লিজ্ লাভার"-এ, সার্থক দৃষ্টান্ত "ফর হুম দি বেল টোল্স্"-এ। মৈথুনে শুধু দেহ নয়, মনও সাড়া দেয়—সেই মনের স্তরে বর্ণনাকে স্থাপন ক'রে, তারই মধ্যে দেহের সাড়ারও প্রতিফলন দেখেছেন লরেন্স্ ও হেমিংওয়ে।

হেমিংওয়ের অসঙ্কোচ সংযমের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত বোধ হয় "টু হ্যাভ্ অ্যাণ্ড্ হ্যাভ্ নট্"-এর তৃতীয় খণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদ। রিচার্ড গর্ডন স্ত্রীর কাছে শেষ বিদায় নিচ্ছেন: "সে দেখল তার মুখ, যে মুখ সে চিরকাল অত ভালো বেসেছিল, যে মুখ কান্নায় বিকৃত হ'ত না, তার কালো কোঁকড়া চুল, টেবিলের গায়ে সোয়েটারের নিচে উদ্ধত ক্ষুদ্র সংহত স্তনযুগ; সে দেখতে পেল না বাকি সেই অঞ্চলটা, যেটাকে সে অত ভালোবাসত, যেটাকে সে ভেবেছিল তৃপ্তি দিতে পেরেছে, অথচ আসলে কিছুই দিতে পারেনি—তার সবটাই টেবিলের আড়ালে। সে যখন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ও টেবিলের ওপার থেকে তার দিকে তাকিয়ে; ওর হাতের ওপর চিবুক; ও কাঁদছে।" এই বিশেষ জাতের কঠিন সংযম প্রাপ্তবয়সী পুরুষের চরিত্রগুণ।

উপন্যাসের কাহিনী থেকে উপন্যাসকারকে অপসারণ করার চেষ্টা আধুনিক উপন্যাসের পরীক্ষানিরীক্ষায় বিশেষ উল্লেখ্য অংশ নিয়েছে। কাহিনীর বিকাশে কাহিনীকারের বারম্বার অনুপ্রবেশ, সৌন্দর্যতত্ত্বের বিচারেই, দৌর্বল্য ব'লে মনে হ'য়েছে। হেমিংওয়ের উপন্যাসে কাহিনীকার অনুপস্থিত; লেখক কোন মন্তব্যই ক'রতে চান না। পাঠক কী অনুভব ক'রবেন, লেখক তার নির্দেশ দেবেন না। যা ঘ'টেছিল, শুধু সেইটুকু ব'লেই তিনি ক্ষান্ত; অনুভূতি পাঠকের মনে আপনা থেকেই রূপ নেবে; তার বর্ণনার আবশ্যকতা নেই। "ফেলারওয়েল্ টু আর্মস্"-এ

নায়কেরই কলমে প্রেয়সীর মৃত্যু বর্ণনা : "ওর একের পর এক হেমারেজ্ হ'ল। ওরা বন্ধ ক'রতে পারল না। আমি ঘরে গিয়ে ক্যাথারিনের সঙ্গে রইলাম। যতক্ষণ না ওর মৃত্যু হ'ল। সবটা সময়ই ও অচৈতন্য ছিল—ওর মৃত্যু আসতে দেরী হ'ল না।" হেনরীর মনে কী ঘ'টল, সেটা বলা হ'ল না। অথচ হেনরী ও ক্যাথারিনের মধ্যে যে সম্পর্ক, তার সবটাই আমরা জেনেছি—এখন ঐ ফাঁকটুকু আমরাই ভ'রে তুলতে পারি। আমাদের চেতনার যোগে লেখকের ক্ষীণতম ইঙ্গিত থেকে হেনরীর মনের যে ছবি রচিত হবে, তা' যে-কোন স্পষ্ট বিবৃতির চেয়ে ঢের বেশি অনেক গভীর তাৎপর্যে উজ্জ্বল। রেমার্কের "তিন বন্ধু"-র প্রেমোপাখ্যান "ফেয়ারওয়েল্ টু আর্মস্"-এর হেনরী-ক্যাথারিন কাহিনীর ছায়া। অথচ প্যাট্রিসিয়ার মৃত্যু বর্ণনা ও তার উপসংহারে প্রায় কিছুই অকথিত নেই। রেমার্কের ভাষ্য : "আলো। অসহ্য, কঠোর আলো। লোকজন। ডাক্তার। আমি ধীরে ধীরে হাত ছেড়ে দিলাম। প্যাট্-এর হাতটা প'ড়ে গেল। রক্ত। একটা বিকৃত, স্তব্ধশ্বাস মুখ। ক্লিষ্ট, স্থির চোখ। লালচে রেশমী চুল। আমি ডাকলাম : প্যাট্। প্যাট। এই প্রথম সে আমায় সাড়া দিল না।" তারপর : "আমি তার রক্ত ধুয়ে দিলাম। আমি যেন কাঠ। আমি তার চুল আঁচড়ে দিলাম। সে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল।..." মৃত্যুর বিশালতা বর্ণনার আতিশয্যে ধরা পড়ে না। মনে হয়, এই বর্ণনার মধ্যেই যেন এই মৃত্যুর আঘাতকে জানা হ'য়ে গেল, এ যেন এখানেই ফুরিয়ে গেল। বর্ণনাতীতকে বর্ণনার মধ্যে ধ'রতে গেলে তার জাত যায়, মান বাঁচে না। তাই প্রাঙ্-মৃত্যুর দীর্ঘ দারুণ বর্ণনা পেরিয়েও "ডক্টর ফাউস্টাস্"-এর মান্ লিখতে পারেন : "এড্রিয়ান্-এর শেষ প্রিয়জন শিশু প্রতিধ্বনি নেপোমুক শ্লেইডেওয়াইন্ বারো ঘণ্টা পর ঘুমিয়ে পড়ল। তার অভিভাবকেরা তার ছোট্ট কফিনটা নিয়ে গেলেন, বাড়ী নিয়ে গেলেন।" হোমরকে মনে পড়ে—হেক্টরের মৃত্যু—"কথা শেষ হ'ল। মৃত্যুর ছায়া তার উপর নেমে এল। অদৃষ্টের শোকে আকুল কান্নায় প্রাণচৈতন্য ও যৌবনের নীড় ছেড়ে তার আত্মা হেডিস্-এ উড়ে গেল।" তারপর "মহানুভব" আকিলিস্ শবদেহের বর্মসজ্জা ও অস্ত্রের ভার নিলেন। দেবতার অংশে যার জন্ম, সেই হেক্টরের মৃত্যুতেও বৃথা বিলাপ নেই, বিলাপে মৃত্যুর অসম্মান ব'লেই। মৃত্যুর এই গভীর বোধে হেমিংওয়ে পৌঁছেছিলেন। "টু হ্যাভ্ এ্যাণ্ড্ হ্যাভ্ নট"-এও হ্যারী মর্গানের মৃত্যুতে মারীর শোকে উচ্ছ্বাস নেই, কিছুটা বিস্ময় আর হয়তো

একটু দিশেহারা অসাড়ের প্রথম মার। নিকটজনের মৃত্যুর অত কাছে দাঁড়িয়ে তার ভার অনুভব করা যায় না। মারীর অদ্ভুত কান্নার উৎস অচৈতন্যে। তাতে ঘোর হাল্‌কা হয় না, আরো ঘন হ'য়ে ওঠে।

॥ একালের স্বরূপ, যুদ্ধ ও মৃত্যু ॥

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, ধ্বংস ও মৃত্যুই হেমিংওয়ের সারা জীবনের প্রসঙ্গক্ষেত্র। মৃত্যু যেন তাঁর আরাধ্য কৃষ্ণ, এ-জাতীয় ইঙ্গিত স্বভাবতই শোনা গেছে। তাঁর জীবনান্তের রহস্যটিকে আত্মহত্যা ব'লে জাহির ক'রেও কেউ কেউ নতুন যুক্তি রচনা ক'রেছেন। হেমিংওয়ের বিবৃতিই এ প্রসঙ্গে শেষ কথা: "কোন মানুষ যদি সারা জীবন ধ'রে মৃত্যুকেই খুঁজে থাকে, তবে কি সে তার ঈপ্সিতকে আরো আগেই খুঁজে পেত না? মৃত্যুর একান্ত সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে তার স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করা এক জিনিস; মৃত্যুকে খুঁজতে বেরনো একেবারে অন্য জিনিস। আমি যতদূর জানি, মৃত্যুকে খুঁজে পাওয়ার চেয়ে সহজ আর কিছুই নেই।"

তবে কেন এত যুদ্ধ, মৃত্যু, ধ্বংস? এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। যুদ্ধ ও দুর্ঘটনার সঙ্গে তাঁর জীবনে বারবার পরিচয়। একান্ত অন্তরঙ্গ, একান্ত শারীর সেই পরিচয়। দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশে তিনি ন' বার গুলী খেয়েছেন, মাথায় দু'বার, অন্তত পাঁচবার গুরুতর দুর্ঘটনায় প'ড়েছেন। নামে সাংবাদিক থাকলেও যুদ্ধে হেমিংওয়ে কোনদিন দর্শক থাকেননি। বিংশ শতকের যুদ্ধের এই বিশেষ অভিজ্ঞতা অন্য কোন কলাকারের জীবনে এসেছে ব'লে জানি না। মৃত্যুর ছায়া আর হয়তো একটু নৈরাশ্য তাঁর চেতনায় স্বভাবতই পরিব্যাপ্ত থেকেছে। পৃথিবীর মানুষ যখন শান্তির নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে বিশ্রামরত, হেমিংওয়ে-র চোখে তখনও যুদ্ধের ধোঁয়া। হেমিংওয়ে-র মনে হ'য়েছে, যুদ্ধ বিচ্ছিন্ন সাময়িক উত্তেজনামাত্র নয়—যুদ্ধ যেন সমকালীন ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কোন রাজনৈতিক দর্শনের চেতনা ছাড়াই হেমিংওয়ে তাঁর যুগের এই চরিত্র উপলব্ধি ক'রেছেন। জীবনের সর্বপ্রান্তেই তিনি দেখলেন যুদ্ধ, ধ্বংস ও মৃত্যু—রূপভেদ-রীতিভেদ-বর্ণভেদে প্রভেদ অবান্তর মনে হ'ল।

ইতালীয় রণাঙ্গনের অভিজ্ঞতা জীবনের প্রতীক হ'য়ে দাঁড়াল: হেনরী শুয়ে আছে অ্যাম্বুলেন্স্-এর মধ্যে, নিচের স্ট্রেচারে। "আমার গায়ে কি যেন ঝ'রে প'ড়ছে, প্রথমে ধীরে ধীরে, বেশ যেন কোন নিয়মের ধারায়, তারপর অবিরল

ধায়ায়। আমি ড্রাইভার-কে চেঁচিয়ে ডাকলাম। গাড়ী থামিয়ে তার আসনের পিছনের ঘুলঘুলি দিয়ে সে আমার দিকে তাকাল—'কি হ'ল আবার?' আমি ব'ললাম, 'ওপরের স্ট্রেচারের লোকটার হেমারেজ্ হ'য়েছে।' 'চুড়োটায় প্রায় পেঁাছে গেছি। আমি একা ও স্ট্রেচার বের ক'রতে পারব না'—গাড়ী আবার চ'লতে শুরু ক'রল। রক্তের সেই ধারা তখনও ঝ'রছে। আমি অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না, মাথার ওপরে ক্যান্‌ভাস্‌টার ঠিক কোথা থেকে রক্তটা প'ড়ছে। আমার গায়ে যাতে না পড়ে, তাই স'রে শোবার চেষ্টা ক'রলাম। সেই রক্তে ভিজে আমার শার্টটা তখন কেমন গরম আর আঠালো হ'য়ে উঠেছে।" কিছুক্ষণ পর: "ইংরেজ ড্রাইভার পিছন ফিরে জিজ্ঞেস ক'রল: 'লোকটার খবর কী?' আমি ব'ললাম, 'মনে হ'চ্ছে, মারা গেছে'।...গাড়ী ওপরে পেঁাছে গেল। ওরা ওপরের স্ট্রেচারটা বের ক'রে নিয়ে সেখানে আরেকটা ঢুকিয়ে দিল, আমরা আবার চ'ললাম।" মৃত্যুর সাক্ষাতে বর্ণনার এই মমত্বহীন হৃদয়হীনতা সৌখীন নৈরাশ্যবাদের পরিচায়ক নয়—এ-বর্ণনা যুদ্ধের নির্মম অমানুষিক নির্দয়তার প্রতীকায়ত্ত প্রতিফলন। যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবেশে অসংখ্য অনাত্মীয় সহযোগীর অগণিত পরিচয়বিলুপ্ত শবদেহের মধ্যে দাঁড়িয়ে চোখের জল শুকিয়ে যায়। অশান্তির শবদাহের মধ্যে এই-যে মৃত্যু, এ-মৃত্যুকে জানি না ব'লেই হয়ত হেমিংওয়ের ভাষায় বর্ণনার নির্মম হৃদয়হীনতায় আমাদের মন বারবার আহত হ'য়েছে।

চারিদিকে যখন একটা সমগ্র পৃথিবী ধ্ব'সে প'ড়ছে, অসংখ্য মানুষ মৃত্যুর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন করুণা-মমতা-মাখা সেই নিদারুণ দুর্ঘটনাকে উপহাস ক'রবে। "'পবিত্র', 'গৌরবময়', 'আত্মত্যাগ', 'বৃথা'—এ কথাগুলো শুনলে চিরকালই আমি বিরক্ত হই। কথাগুলো...অনেক শুনেছি, কিন্তু কোথায়ও পবিত্র কিছু দেখিনি, যা দেখেছি তাতে কোন গৌরব ছিল না।...গৌরব, মর্যাদা, বীর্য—বস্তুবিচ্ছিন্ন কথাগুলো যেন অশ্লীল, তার চেয়ে ঢের দামী গ্রামগুলোর বাস্তব নাম, রাস্তার নম্বর, নদীর বাম, রেজিমেণ্টের নম্বর, আর তারিখগুলো।" এই যুদ্ধক্ষেত্র যেন বৃহত্তর পৃথিবীর, সমকালীন পশ্চিমী সমাজের ছায়া। তাই লরেন্‌সের "লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার"-এ প্রায় একই সুর: "কনি-র মনে হয়, ঐ বড় বড় কথাগুলো তার যুগে সব বাতিল হ'য়ে গেছে: প্রেম, আনন্দ, সুখ, সংসার, মাতা, পিতা, স্বামী ঐ সব বড় বড় কথাগুলো একদিন জীবন্ত চৈতন্যময়

ছিল, আজ অর্ধমৃত, দিনে দিনে নতুন ক'রে ম'রছে। কিন্তু টাকা? ওখানে হয়ত একথা খাটবে না। টাকা সব সময়েই চাই। টাকা, তোমাকে পেতেই হবে। বাকি সবই, না হ'লেও চ'লবে। শুধু টাকা কর, টাকা!" "ফেয়ারওয়েল টু আর্মস্" লিখতে ব'সে হেমিংওয়ে কি লরেন্স্-এর কণ্ঠস্বর স্মরণ ক'রেছিলেন? উদ্ধৃতিদ্বয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বিস্ময়কর। উভয়কে মিলিয়ে প'ড়লে দুটি চিত্রই সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে।

তবু বাঁচতে হয়। নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে নিজের জীবননীতি রচনা কর। হেমিংওয়ের নায়ক শুধু ভেসে চলে না। নিয়ত বিপদের মধ্যেও হ্যারী মর্গান ও মারীর ঘনিষ্ঠ প্রেম। রাত্রির শয্যায় মারী বলে, "আমি যে কী পেয়েছি, ওরা তা জানে না। আমি যে কী পেয়েছি. ওরা তা কখনও জানবে না। আঃ, হ্যারী ঐ তো। আঃ; হানি আমার।" মারীর সপ্রেম সহানুভূতি, সমমর্মিতা অম্লান থাকে। নিজের কর্মের প্রতি রবার্ট জর্ডানের নিষ্ঠা ও আনুগত্য—এরই মধ্যে লড়াইয়ের হাতিয়ার।

এত যুদ্ধ, এত মৃত্যু—তার মধ্যেও হেমিংওয়ে নতুন মূল্যবোধ রচনা ক'রেছেন, তাতে অবিচল আস্থা রেখেছেন। ইন্দ্রিয়জ স্পর্শানুভূতির মূল্য তিনি বিশেষভাবে বুঝেছেন—ঘাসের ছোঁয়া, আগুনের গন্ধ, এক একটা একান্ত শারীর অনুভূতি তাঁর নায়কদের কাছে মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেও যেন একটা আশ্রয়ভূমির সন্ধান দিয়েছে। সাধারণ মানুষের অতিমানুষিক বীরত্ব তিনি দেখেছেন। এল্ সর্দো বা পিলার-এর অকুতোভয় বীর্য—যে-বীর্যে পিলার স্বামী পাবলোর সতর্কতার কাপুরুষতাকে উপহাস ক'রতে পারে, এমনকি সোজাসুজি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও দ্বিধাবোধ করে না—এ-বীর্য যুদ্ধক্ষেত্রেই, কেবল যুদ্ধক্ষেত্রেই, পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। হ্যারী মর্গান ভাঙা হাত নিয়ে আবার পাড়ি দেয়। সান্টিয়াগো বার্ধক্যের ভারকে প্রায় মিথ্যা মনে করে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই মানুয়েল গার্সিয়া নতুন বুলফাইট্-এর ঝুঁকি যেচে কাঁধে তুলে নেয়। ধ্বংসলীলার মধ্যে দাঁড়িয়েও মানুষে-মানুষে পরস্পরনির্ভর বন্ধুত্ব ও প্রেম গ'ড়ে ওঠে, হেমিংওয়ে তা জানেন—হেনরী ও রিনাল্দির বন্ধুত্ব, পিলারের স্নেহ, হেনরী ও ক্যাথারিনের প্রেম মহত্তর জীবনের আভাস। যুদ্ধের এই নরকে, বর্বরতার লীলাভূমিতে চিরন্তন মনুষ্যত্বের এই আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস ধ্বংসের মুখেই তীব্রতম হ'য়ে ওঠে। যার ধ্বংস নিশ্চিত, তাকে আরো শক্ত টানে আঁকড়ে রাখবার চেষ্টায় এই

মানবসম্পর্কের গভীরতাপ্রাপ্তি। যুদ্ধ ও সংগ্রাম থেকে স'রে গিয়ে সৌখীন দ্রষ্টার ভূমিকায় যে কলাবিদ্‌রা আসন নিয়েছেন, হেমিংওয়ে তাদের ক্ষমা করেন না। তাদের প্রেমের অভিনয়ে হেমিংওয়ে বিরক্ত হ'য়ে উঠেছেন—হ্যারী মর্গানও মারী মর্গানের প্রেমের পাশেই রিচার্ড গর্ডন ও তাঁর পত্নীর পারস্পরিক অবিশ্বাসে দাম্পত্য সঙ্কট। একদিকে জেক্ বার্নস্ ও ব্রেট্ অ্যাশ্‌লী, অন্যদিকে রবার্ট কোন্‌ও তাঁর প্রেয়সী—একদিকে অবিচ্ছেদ্য টান, অন্যদিকে বিচ্ছেদ ও অবিশ্বাস। রিচার্ড গর্ডন ও কোন্, উভয়েই "মিডিওক্‌র্" উপন্যাসকার। হেমিংওয়ে যেন আভাসে ব'লতে চান, এরা দু'জনেই জীবনে লড়তে পারে না ব'লেই, জনপ্রিয় সাহিত্যের নিরাপদ আশ্রয়ে আরাম খোঁজে। এরা দু'জনেই কত অক্ষম, কত অশক্ত, এদের দৃষ্টি কত দুর্বল—রিচার্ড গর্ডন কোন এক পথচারী নারীকে দেখেই তার চরিত্র কল্পনা ক'রে নেয়ঃ "স্বামীর আদরে শুরুতেই তার অনীহা—শুধু সন্তানের সাধ, অনায়াসের সাধ। স্বামীর লক্ষ্যে কোন সমর্থন নেই। যে যৌন-সঙ্গমে আজ তার বিরক্তি ধ'রে গেছে, তাতে প্রাণ আনার ব্যর্থ দুঃখদায়িক প্রয়াস। চমৎকার হবে অধ্যায়টা।" তারপরেই হেমিংওয়ে-র নির্দয় চাবুকের মার ঃ "রাস্তায় যাকে দেখেছিল, সে হ্যারী মর্গানের বউ মারী।" সাত অধ্যায় আগেই হ্যারী ও মারীর অন্তরঙ্গ নৈশলীলার প্রাণোজ্জল ছবি হেমিংওয়ে রচনা ক'রেছেন। আরো লক্ষ্যণীয়, এই দুই পলাতকেরই ব্যর্থ প্রেমের নায়িকার নাম ফরাসী ধাঁচের—ফরাসী দেশের সঙ্গে এই দায়িত্বহীন পলায়নবৃত্তির একটা যেন অদ্ভুত যোগ আছে (বোদ্‌লেয়র, মালার্মে ইত্যাদি কবিকুলই একদা এই পলায়নী রীতির দীক্ষাগুরু ছিলেন—১৮৯০ এর যুগের ইংরেজ কবিরা সেই "ফরাসী মেজাজে"র শিক্ষা আত্মসাৎ ক'রেছিলেন)।

হেমিংওয়ে-র যুদ্ধদর্শনের স্পষ্টতম প্রতিরূপ "ফর হুম্ দি বেল্ টোল্‌স্।" উপন্যাসের শুরুতেই সপ্তদশ শতকের ইংরেজ কবি জন্ ডান্-এর উদ্ধৃতি; "কোন মানুষ দ্বীপ নয়, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়। প্রত্যেক মানুষ মহাদেশের অংশ, স্থলদেশের অঙ্গ। সমুদ্র যদি মাটির একটা টুকরোও ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ইয়োরোপই তার দেহের পরিসর হারায়। তোমার বন্ধুর জমি যাক, তোমার নিজের জমি যাক, আর একটা শৈলান্তরীপই যাক, ক্ষতি সমানই। যে কোন মানুষের মৃত্যু আমাকেই খর্ব ক'রে দেয়—কেননা, আমি বিশাল

মানবসমাজেরই একজন। কার মৃত্যুতে ঘণ্টা বাজে, সে-প্রশ্ন ক'র না : ও-ঘণ্টা তোমারই মৃত্যুতে বাজছে।" এই চেতনা নিয়েই মার্কিন বুদ্ধিবাদী রবার্ট জর্ডানের স্পেনে আগমন, স্পেনীয় প্রজাতন্ত্রের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ। এই চেতনা নিয়েই স্পেনে এসেছিলেন কমিউনিস্ট্ বুদ্ধিবাদীরা—এই চেতনার দীক্ষায় ক্রিস্টফার কডওয়েল্, রাল্ফ ফক্স্, জলিয়ান বেল, জন্ কর্নফর্ড্-এর আত্মদান। স্পেনে যুদ্ধরত মার্কিন স্বেচ্ছাসেবকদের লিংকন্ ব্যাটালিয়নের পতাকায় চিত্রিত ঘণ্টা থেকেই হয়ত উপন্যাসের নামের প্রথম প্রেরণা। ডান্-এর সার্মনের ছত্র, লিংকন ব্যাটালিয়নের পতাকা, স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী সেনানীদের স্মৃতি—এই সব মিলিয়ে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে উপন্যাসটির ভিত্তিভূমি, তার পরিবেশ—মুক্তিযুদ্ধের স্বীকৃতি।

নরহত্যায় আন্সেল্মো-র রুচি নেই—"একটা মানুষ, যে আমাদেরই একজন, তাকে মারলে ভালো হয় না।" তবু আদর্শের জন্য যে যুদ্ধ, সে যুদ্ধে তার হাত কাঁপে না। সে বলে, "হ্যাঁ, আমি মানুষকে হত্যা ক'রেছি বহুবার—আরো বহুবার—ক'রব—কিন্তু আনন্দে নয়, হত্যাকে পাপ ব'লে জেনেই।" হেমিংওয়ে-র নায়ক অসংখ্য মৃত্যুর মধ্যেও জীবনকে শ্রদ্ধা করে। "আমি যা বিশ্বাস করি, তার জন্য এক বছর ধরে লড়াই ক'রলাম। আমরা যদি এখানে জিতে যাই, আমরা সর্বত্র জিতব। পৃথিবীটা বড় সুন্দর—এর জন্যে লড়াই ক'রে সুখ আছে। একে ছেড়ে যেতে আমি ঘৃণা করি।"—স্পেনের রণাঙ্গনে মৃত্যুপথযাত্রী রবার্ট জর্ডানের এই স্বগতোক্তি হেমিংওয়ের জীবনের ধ্যান ও দর্শন। আন্সেল্মো ও রবার্ট জর্ডানের চোখে যুদ্ধ ও মৃত্যুকে দেখলে জর্ডানেরই ভাষায় ব'লতে হয়, "কোন এক সত্য নয়, সবটাই সত্য।"

মারিয়া ও রবার্টের প্রেম, পিলার-এর সহজ স্বচ্ছন্দ আত্মীয়তা, এমন কি পাব্লোর নিরন্ত সন্দেহও চিরন্তন মানবধর্মের আত্মঘোষণা। মারিয়া অক্ষতযোনি নয়—ফ্যানিস্ট সৈনিকের ধর্ষণের স্মৃতি তার দিবারাত্রের লজ্জা। তার বিশ্বাস, রবার্টের সঙ্গে সঙ্গমে পাপের স্পর্শ কাটবে। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, পরিচয় দুদিনের—তবু গভীর প্রেম। যুদ্ধের মধ্যেও যে অদম্য বীর্য ও অম্লান মৈত্রীর রূপ হেমিংওয়ে বারম্বার লক্ষ্য ক'রেছেন, এ-প্রেমে তারই ভাস্বর স্বাক্ষর।

রবার্ট জর্ডানের মৃত্যুতে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি নয়। উপন্যাসের শেষ ছত্রে "বনের পাইন-কাঁটা-বিছানো মেঝেয় সে তার হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব ক'রছে"।

রবার্ট জর্ডানের মৃত্যু নিশ্চিত,—তবু হেমিংওয়ে বিশেষ কারণেই তার জীবনান্ত দেখান নি। জীবন-মৃত্যুর মধ্যে এই দোলাচলদশা যুদ্ধ ও মৃত্যুর প্রতীক। মৃত্যুর নিশ্চিত সম্ভাবনায় লেখক যুদ্ধে অনাস্থা জানিয়েছেন, অথচ সেই মৃত্যুকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখে আদর্শাশ্রয়ী সংগ্রামের মূল্য স্বীকার ক'রে নিয়েছেন, সংগ্রামী জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে আস্থা রেখেছেন। রবার্ট জর্ডানের মৃত্যু ঘ'টলে প্রমাণ হ'য়ে যেত, যুদ্ধ সর্বদা সর্বতো বর্জনীয়। অন্যদিকে জর্ডান সুস্থ জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'লে যুদ্ধের মহত্ত্বই প্রকারান্তরে স্বীকৃত হ'ত। হেমিংওয়ে উভয় সিদ্ধান্তই এড়িয়ে গেছেন। তাঁর বক্তব্য মতে, যুদ্ধ মহৎ নয়, তবু একান্তই রূঢ় সর্বব্যাপী বাস্তব। আদর্শের দাবিতে যুদ্ধ সময়ে সময়ে অপরিহার্য, অস্ত্রধারণই ধর্ম। উপরন্তু, যে-কোন সংহত আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় মানুষ জীবনকে নতুন ক'রে পায়; তখন যুদ্ধও মূল্যবহ হয়।

যুদ্ধান্তেও সমাজ, সংসার, দেশ ও জাতির অঙ্গে ক্ষতচিহ্নগুলো জ্ব'লতে থাকে। যুদ্ধের আঘাত হেমিংওয়ের শরীরে ছাপ রেখে গেছল।...সমাজ-সংসারের গায়ে সেই একই আঘাত। আহত মানুষগুলো যুদ্ধের স্মৃতির অভিশাপ থেকে মুক্তি পায় না। "ফিয়েস্টা" উপন্যাসের নায়ক জেক্ বার্ণস্ যুদ্ধক্ষেত্রের আঘাতে তার পুরুষত্ব বিসর্জন দিয়েছে। ব্রেট্-এর ভালোবাসা পেয়েও প্রেম তার জীবনে মিথ্যা। সে কেমন ক'রে যুদ্ধকে ভুলবে? "অ্যাক্রস্ দি রিভার" উপন্যাসের নায়ক কর্ণেল ক্যান্টওয়েল্ আয়নার দিকে তাকালেই ক্ষতচিহ্নে বিকৃত নিজের মুখ দেখে আঁৎকে ওঠে—আঘাতে জর্জরিত তার বীভৎস হাত দুটো কি-এক দুর্জ্ঞেয় মায়ায় কিশোরী প্রেয়সী রেনাটাকে টানে। ক্যান্টওয়েল কেমন ক'রে যুদ্ধকে ভুলবে? যন্ত্রণা, বঞ্চনা, ব্যর্থতা, আরো যন্ত্রণার গোলক ধাঁধায় যুদ্ধশেষের মানুষদের নিরন্ত পরিক্রমা—তবু যন্ত্রণার মধ্যেই আশা; সহানুভূতি, স্থিরতম প্রত্যয়ের পিলসুজ অম্লান থাকে।

"ফিয়েস্টা" উপন্যাসের হেমিংওয়ে তথাকথিত "লস্ট্ জেনারেশন্" বা নোঙরহারাদের প্রবক্তা নন। এলিয়টে ফাঁপা মানুষদের সঙ্গে এই উপন্যাসের মানুষগুলির আত্মীয়তা নিকট নয়। ক্যাকটাসের দেশের ফাঁপা মানুষেরা জানে: "এখানে সে চোখগুলি নেই, এখানে কোন চোখই নেই—মুমূর্ষু তারকাদের এই পাহাড়ী রাজ্যে, এই শূন্য উপত্যকায়, আমাদের হারানো সাম্রাজ্যের এই ভগ্ন জহ্নু-জানুতে।" "শোথস্ফীত এ নদীর বালুকা বেলায় জড়

হ'য়ে" এরা "একসঙ্গে পথ হাতড়ায়, কথা বলে না।" এরা "দৃষ্টিহীন"। জেক্ বার্নস্ কিংবা ব্রেট্ অ্যাশ্‌লীর দৃষ্টি কিন্তু সদাজাগ্রত। মদে চুর হ'য়ে তারা জীবনযন্ত্রণা ভোলে, কিন্তু নিজেদের ভোলাতে পারে না। তাই রাতভর উচ্ছৃঙ্খলতার পর ব্রেট্ দিবালোকের স্পষ্টতায় রূঢ় সত্যকে স্বীকার করে নেয়, জেক্-এর কাছে এসে দাঁড়ায়। রোমেরো, মাইক্, কাউণ্ট্—ব্রেট্ সবাইকে ছেড়ে ছেড়ে আসে, জেক্-এর কাছে এসে মাথা কোটে। ব্রেট্ বলে, "জেক্, আমরা একত্রে কত সুখে জীবনটা কাটাতে পারতাম।" জেক্ বলে, "হ্যাঁ, ভাবতেও কত ভালো লাগে, তাই না?" ব্যর্থতাকে মেনে নিয়ে তাকেই ঘিরে মোহিনী মরীচিকা রচনার বিলাসে এদের আস্থা নেই, ফাঁপা মানুষদের অনুসরণে কাঁটাগাছের চতুর্দিক-পরিক্রমণে এদের শান্তি নেই। যুদ্ধে আহত জর্জরিত বসুন্ধরার মাটিতে পা রেখে দাঁড়িয়ে যুদ্ধমুক্ত পরিবেশের সম্ভাবনা কল্পনা করে এরা সান্ত্বনা খোঁজে। ব্যর্থতার মধ্যেও, মৃত্যুর নিশ্চিতি জেনেও এরা ভালবাসে। জীবন কখনই কোন পরিবেশেই অর্থহীন নয়—এই প্রত্যয়ে হেমিংওয়ের নায়ক-নায়িকা সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত। [পরম বিস্ময়ে লক্ষ্য ক'রলাম, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় "ফিয়েস্টা" উপন্যাসে "রোমান্টিক মাধুর্যে"র সন্ধান পেয়েছেন। এক হৃতপৌরুষ যুবককে ভালবেসে তার সঙ্গে মিলতে না পারার ব্যথায় নিজেকে চোখ ঠেরে অসংখ্য পুরুষের সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতায় মেতে, ফিয়েস্টা, বুলফাইট্, আর মদের আড্ডায় নাচের নেশায় কোন এক পূর্ণযৌবনা শান্তি খোঁজে, শান্তি পায় না, তীব্র জ্বালায় জ্ব'লে বারে বারে ফিরে আসে—এ-কাহিনীর মধ্যে হেমিংওয়ে মাধুর্য পাননি, ঢেলে দিয়েছেন তিক্ততার গরল। পাঠককে তিনি শান্তি দিতে চাননি, অশান্ত ক'রে তুলতে চেয়েছেন। নারায়ণবাবু সম্ভবত উপন্যাসটি ভুলে গেছেন।]

আফ্রিকার সবুজ পাহাড়ের মৃগয়া কিংবা স্পেনের বুল্-ফাইট্ ঐ যুদ্ধেরই অন্য রূপ। ষাঁড়ে-মানুষে বীভৎস লড়াই—তার নায়ক কিন্তু মানুষটাই—নিজের মনের পাশব ক্রূরতার বস্তুরূপ তথা প্রতীকের বিরুদ্ধে তার লড়াই—তার জয় অবধারিত। "ফিয়েস্টা" উপন্যাসে রোমেরো ষাঁড়টাকে কী নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে, কিন্তু পরমুহূর্তেই : "রোমেরো জিজ্ঞেস করে : 'তোমার ভাল লেগেছে?' ব্রেট্ কিছুই বলে না। ওরা পরস্পরের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে, হাসল।" বুলফাইটার রোমেরো মরা ষাঁড়ের কাটা কানটা ব্রেট-এর হাতে দিয়ে বলে :

"দেখো, রক্ত লাগিয়ো না যেন।" পশুকে সে হত্যা করেছে, সঙ্গে সঙ্গেই নিজের অন্তরের পশু প্রবৃত্তিগুলোকেও সে শক্ত হাতে দমন করেছে। বুলফাইটে 'কাথার্সিস', 'পার্গেশন', ক্লেদমুক্তি। এই নিষ্ঠুর অমানুষিক যুদ্ধে পশুটা মরে, কিন্তু মানুষটা নতুন জীবন পায়, তার চেতনায় পরিবর্তন আসে। যে-কোন প্রত্যয়নিষ্ঠ সংগ্রামের মূল্য হেমিংওয়ে এইভাবেই স্বীকার করে নেন।

॥ একালের যুদ্ধ ও সমকালীন অন্যেরা ॥

"মূলত হেমিংওয়ে ঔপন্যাসিক হিসেবে খুব স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব নন। যুদ্ধ এবং মানবতার সম্পর্ক নির্ণয়ে মহত্তম উপন্যাস রচনার গৌরব দাবি করবেন এরিখ মারিয়া রেমার্ক, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস 'দি নেকেড্ অ্যাণ্ড দি ডেড্'-এ বৃহত্তর শিল্পসার্থকতার দাবি জানাবেন নরমান মেলার, এরেনবুর্গের 'দি ফল অফ্ পারী' অথবা সার্ত্রের ত্রি-গ্রন্থের তৃতীয় 'আয়রন্ ইন্ দি সোল্' প্রৌঢ়তর প্রতিভায় উজ্জ্বল।"

আবার নারায়ণবাবুর কথা। এরেন্‌বুর্গ ও সার্ত্র-এর সঙ্গে এক পংক্তিতে অপেক্ষাকৃত অনেক নীচু দরের দু'জন লেখকের উল্লেখ কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। মেলার-এর উপন্যাসটি "বেস্ট-সেলার" হ'তে পারে, তার অধিক সম্মান তার প্রাপ্য নয়। [মার্কিন সাহিত্যের বিচক্ষণ ও উদারহৃদয় ইতিহাসকার স্বনামধন্য মার্কাস কান্‌লিফ্ একবার মাত্র উল্লেখে ঐ স্বীকৃতিটুকুর বেশি কিছু দেন নি।] তাই নীতির কারণেই কোন চিন্তাশীল নিষ্ঠাবান্ সাহিত্যসমালোচক সাহিত্যসমালোচনায় মেলার-এর নাম আনতে লজ্জাবোধ ক'রবেন।

একদা জনপ্রিয় "অল্ কোয়াএট"-এর দুর্বলতা আজ বড় বেশি স্পষ্ট। "এ টাইম্ টু লাভ অ্যাণ্ড এ টাইম টু ডাই" উপন্যাসটিই বোধ হয় রেমার্কের পরিণততম কীর্তি। অথচ এখানেও সযত্ন-লালিত সৌকর্যে ও উপমায় বিভীষিকাও যেন বিলাসিতা হ'য়ে ওঠে। জমাট বরফ খুঁড়লে দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়। কোন সদ্য-আহত মুমূর্ষু রুশ রমণীর মৃত্যু যন্ত্রণায় এক "বিরাট উজ্জ্বল ব্যাঙে"র ছবি মনে পড়ে। প্যারাশুট যেন বাতাসের মধ্যে "স্বচ্ছ জেলিফিশ্"। মৃতদেহ—"কীটকুলের মহাকাব্যে অতিকায় মহানুভব দেবতা"। এই উপমায় বীভৎসা যেন অনেক হালকা, কেমন যেন তরল হ'য়ে যায়—ক্ষীণজীবী অকালবৃদ্ধ ও

অপ্রাপ্তবয়স্কদের কাছেও যুদ্ধ এইভাবে স্পর্শবেদ্য হ'য়ে ওঠে। তাতে দুর্বলমনা পাঠকের মনের শান্তি হয়ত অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু সত্যের বিকৃতি ঘটে। যুদ্ধকে রেমার্ক ভয় করেন—তাই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তিনি বারে বারে পালিয়ে আসেন, প্রায় সব উপন্যাসেই। বর্তমান উপন্যাসে কথাটা একবার তিনি স্বীকারও ক'রে ফেলেছেন—শহরের ধ্বংসস্তূপে গ্রেবার মায়ার স্বাদ পায়, শান্তি পায়—যুদ্ধক্ষেত্রেই যত যন্ত্রণা। রেমার্কের মন যথেষ্ট পরিণত নয়—তাই মৃত্যু ও নবজীবনের সহাবস্থানের প্রতীকস্বরূপ ধ্বংসস্তূপ ও ফলন্ত গাছের ছবি বারবার যেখানে-সেখানে গজিয়ে ওঠে—আদি নাটকের সেই প্রিয় সহায় ডিউস্-এক্স্-মাকিনা-র মতই। [অথচ মৃত্যু-জন্ম তত্ত্বের শিল্পরূপও তো আমরা দেখেছি—"আনা কারেনিনা"-য় নিকোলাই-এর মৃত্যুর বর্ণনান্তেই কিটি-র অন্তঃসত্ত্বা হবার খবর—সেখানে স্বাভাবিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে।] ভাবাতিশয্য বা আবেগবিহ্বলতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ রেমার্ক নিজেই অন্তত একবার কৌতুকহাস্যের কারণ হ'য়ে উঠেছেন। কোন এক স্থূলাঙ্গিনীর স্বাস্থ্যহানিতে তাঁর সুগঠিত নিতম্বের শোকে যুদ্ধপ্রত্যাগত স্বামীর বিলাপে হাসি পায় (কিন্তু রেমার্ক নিশ্চয়ই তা চান নি)। রেমার্ক জীবনে ও মানবধর্মে বিশ্বাসী—সেই বিশ্বাস তাঁর উপন্যাসের পত্রে পত্রে বারম্বার বাঙ্ময় হ'য়ে উঠেছে। তিনি বিশ্ববাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার পাত্র। তবু, সাহিত্যবিচারে, এটুকু সবিনয়ে স্বীকার্য যে, মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে যথেষ্ট গভীরভাবে প্রবেশ করে নি। যুদ্ধ এবং মানবতার যে সম্পর্ক তিনি তুলে ধরেছেন, তাতে অতিসরলীকরণের দোষ লেগেছে। উপমার অযথা ব্যবহারে, রূপকল্প ও প্রতীকের অসার্থক প্রয়োগে তিনি যুদ্ধের ভীষণতার লাঘব ক'রেছেন। হেমিংওয়ে যদি যুদ্ধের ট্র্যাজেডি রচনা করে থাকেন, রেমার্ক দিয়েছেন তার মেলোড্রামা [ট্র্যাজেডি ও মেলোড্রামা, দুটি কথাই নাট্যশাস্ত্রবিধির সংজ্ঞা অনুসারে প্রযুক্ত—উপন্যাসের সঙ্গে ট্র্যাজেডি-মেলোড্রামার তুলনা খোঁজার নির্দেশ ডক্টর টিলিয়ার্ডের একটি প্রবন্ধ থেকে প্রাপ্ত।]।

এরেনবুর্গ ও সার্ত্র-এর উপন্যাসদ্বয়ের উল্লেখ এ প্রসঙ্গে কতখানি যুক্তিসঙ্গত, সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। সার্ত্র-এর ম্যাথিউ অস্তিত্ববাদী দর্শনে মুক্তিপ্রার্থী। ব্যর্থতার মধ্যেও ইচ্ছার বলিষ্ঠ প্রেরণায় ম্যাথিউ মুক্তি কিনে নেয়, পরাভব ও মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও জার্মান সেনাবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ কোন ফরাসী গ্রামে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জার্মান সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে। সঙ্গীদের

মৃত্যুর পরে সে সদর্পে ঘোষণা করে, "আমরা পনেরো মিনিটও ওদের রুখতে পারিনি, একথা যেন কেউ না বলে"। প্রায় অসম্ভবকে নিজের শক্তিতে সজ্ঞানে সম্ভব করে তুলে এই আত্মনিযুক্তিকরণের মধ্যে ম্যাথিউ মুক্তি পেয়েছে। ব্যক্তির স্বয়ম্ভূত্বে পৌঁছে এই মুক্তি। যুদ্ধের মধ্যেই ম্যাথিউ সেই সুযোগ পেয়েছে। যুদ্ধের মধ্যে একদল মানুষের অভিজ্ঞতা—বুদ্ধিবাদী মানুষের অভিজ্ঞতা—এর মধ্যে যুদ্ধের বহু প্রান্তই অনুপস্থিত। তা'ছাড়া, হেমিংওয়ে যুদ্ধকে দেখেছেন আরও কাছ থেকে—সার্ত্র-এর সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য স্বীকার করা গেলেও, প্রতিভার প্রৌঢ়তার বিচার হবে কোন্ মাপকাঠিতে? মহাযুদ্ধের বিশ্বব্যাপী অতিকায় রূপ, এবং এই রূপের রচনায় মন্টাজ-এর শিল্পগুণান্বিত ব্যবহার—এর জন্য অবশ্য "দি রিপ্রীভ্"-এর সার্ত্র-এর কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ। এরেন্‌বুর্গের "ফল অফ পারী"—এ-ও তো আসলে শহরের চোখে যুদ্ধ। এরেন্‌বুর্গ-হেমিংওয়ে-র তুলনা হবে কোন্ প্রসঙ্গে? যুদ্ধের দিকে দু'জনেই তাকিয়েছেন। কিন্তু ভিন্ন কেন্দ্র থেকে। এবং এই ভিন্নতা এত স্বাভাবিক, এত সত্য, ও এত জটিল যে, উভয়কেই স্বীকার ক'রে নিয়ে তুলনায় বিরত থাকাই কর্তব্য। যুদ্ধান্তে রচিত "দি স্টর্ম", জয়ী জাতির আত্মপ্রত্যয় থেকে অতীতের দিকে পিছন ফিরে তাকানো এক দৃষ্টি—এতে যুদ্ধের আরেক রূপ। এরেন্‌বুর্গ সার্ত্র; এবং হেমিংওয়ে (শলোখভ ও ফাদেয়েভ-ও এক পংক্তিতে স্থান পাবেন)—এঁদের সকলেই যুদ্ধকে দেখেছেন—গভীরতায় এঁদের দর্শন সমমূল্য। একালের যুদ্ধের কোন সত্যচিত্র যদি কেউ রচনা ক'রতে চান, তবে এঁদের উপন্যাস, লর্‌কার কবিতা, ও পিকাশোর ছবি, আরাগঁ, এলুয়ার, নেরুদা-র কবিতা মিলিয়ে দেখতে হবে। "কোন এক সত্য নয়, সবটাই সত্য।" ঔপন্যাসিকত্রয়ীর মধ্যে অবশ্য সার্ত্র-এর উপন্যাস "আইডিয়া"র নাটক, হেমিংওয়ে-র ট্র্যাজেডি, এরেন্‌বুর্গের রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডি ও ট্র্যাজিকমেডির সমন্বয়।

॥ পূর্বসূরী? ॥

ঋণস্বীকারে হেমিংওয়ে-র কার্পণ্য নেই।" "পারী রিভিউ" পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি অন্তত ত্রিশজন সাহিত্যিক পূর্বসূরীর নাম শুনিয়েছেন, এঁদের কাছেই তিনি "সবচেয়ে বেশি শিখেছেন।" এই তালিকায় গ্রথিত ফ্লবেয়র, স্তাঁদাল, তুর্গেনীভ, দস্তয়েভস্কি, চেহভ, শেক্‌স্‌পীয়র,

দান্তে, ভার্জিল অবশ্য বর্তমান শতকের যে-কোন উপন্যাসকারের আদিগুরু। এঁদের শিক্ষা আমাদের জীবন ও চিন্তার মধ্যে এমনভাবে অনুপ্রবিষ্ট যে, সে-শিক্ষা এড়ানোর সাধ্য কারো নেই। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, গার্ট্রুড স্টাইন, স্টিফেন ক্রেন ও ডস্ প্যাসস্, এঁদের কাউকেই কিন্তু তিনি গুরু ব'লে মানেন নি। এঁদের প্রভাব আবিষ্কার করার ব্রতে যে জ্ঞানিজনেরা নিয়োজিত, তাঁরা কি এখনও তাঁদের উপাখ্যানের মোহ কাটাতে পারবেন না?

তালিকার সর্বোচ্চে স্বভাবতই সেই নাম—মার্ক টোয়েন। রচনারীতির বাইরেও মার্ক টোয়েনের সঙ্গে হেমিংওয়ের যোগ গভীর। হেমিংওয়ে-র নায়ক কখনও স্বদেশভূমিতে আবদ্ধ থাকে নি। রবার্ট জর্ডান স্পেনে গেছে, জেক্ পারী থেকে স্পেনে গেছে, ক্যাণ্ট্ওয়েল ভেনিসে গেছে, হ্যারী আর সান্টিয়াগো তো সমুদ্র বিহারী। এই বাইরে এসেই সে জীবনকে দেখে, জীবনের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়। এই বিশেষ কাহিনীটি (ফিলিপ ইয়ং-এর মতে) হাক্ল্বেরি ফিনের উত্তরাধিকার।

পেত্রার্কার সুললিত উচ্ছ্বসিত প্রেমকাব্যের বিরুদ্ধে সপ্তদশ শতকের বিদ্রোহের আদিপুরুষ গঙ্গোরা, যোগ্য উত্তরাধিকারী ডান্ ও মার্ভেল্। এই তিনজনেরই সঙ্গে হেমিংওয়ে আত্মীয়তা অনুভব ক'রেছেন। পেত্রার্কা এ-মর্ত্যভূমিতেও শুধু অনাবিল স্বর্গলোককেই খুঁজেছেন। প্রেয়সীকে তিনি স্বপ্নের নায়িকার ভাবে চেয়েছেন। গঙ্গোরা-র দৃশ্যলোক আরো জটিল, আরো গভীর। প্রশ্ন ও সমস্যার ভারে ভাষাও জটিল। ডান ও মার্ভেল্-এ "সেসেন্টিজ্ন্"-এর ধারার পরিণতি। জটিল জীবনের জটিল রূপ—জীবনের এক অঞ্চল অন্য অঞ্চলে মাখামাখি (বিরহ থেকে কম্পাসের কাঁটা, প্রেমের পূর্ণতা থেকে বিশ্ব-মানচিত্র) এবং মৃত্যু ও চিন্তা—এই শিক্ষাই কি হেমিংওয়ে স্মরণ ক'রেছেন? ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির উপর ডান্-এর আস্থাই হয়ত হেমিংওয়ে-র মধ্যে সংক্রামিত। গঙ্গোরা এবং মেটাফিজিকাল কবিরা বাস্তবের রূঢ় স্বরূপেই বিশ্বাসী। এই বাস্তববোধের ধারাতেই হয়ত জ্যত্তো-র সঙ্গেও হেমিংওয়ে-র যোগ। জ্যত্তো-ই প্রথম গথিক্ শিল্পী যিনি দেবলোকের চিরপ্রশান্তি ছেড়ে মানুষের নাটকীয় জীবনকে রূপ দিলেন। বাইজ্যান্টিয় কাঠিন্য জ্যত্তো-র ছবিতে আরো মানবিক হ'য়ে এল। জ্যত্তো-র "ন্যাচরালিজ্ম্" হেমিংওয়ে-র মধ্যেও হয়ত প্রবেশ ক'রেছে।

শিল্পীকুলের মধ্যে অবশ্য গোয়আ-ই হেমিংওয়ে-র মধ্যে সবচেয়ে উজ্জলরূপে

উপস্থিত। ওরা মে-র অত্যাচারের সেই ছবির মধ্যে হেমিংওয়ের উপন্যাসের বীজের সন্ধান পাওয়া যায়। পাঁচজন মানুষের উপর একসার বন্দুক এগিয়ে আসছে। একজন মুখ ঢেকেছে, একজন আশা ছেড়েছে, জ্বলন্ত চোখে মুষ্টিবদ্ধ হাতে দু'জন; আর, এদের মধ্যে যে মুখ্য তার চোখের দৃষ্টিতে ক্রোধ, ঘৃণা, ভয়, আতঙ্ক, ও নৈরাশ্যের সমন্বয়। গাঢ় হলুদ, লাল, এবং, এই দুই রঙের নানা মিশ্রণে যে পরিবেশ রচিত, তার মধ্যে মুখ্য চরিত্রটির শার্টের শাদা যুদ্ধের তাণ্ডবে মনুষ্যত্বের অসহায়ত্বের রঙ হ'য়ে উঠেছে। আক্রমণোদ্যত সৈন্যদের মুখ প্রায় দেখাই যায় না—তাদের সমস্ত ভঙ্গিটায় নির্দয় পশুশক্তির প্রকাশ। "যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম" চিত্রমালায় এবং নিজের ভিলায় রক্ষিত মিউরালে শনির ছবিতে "যুদ্ধের নির্মম হৃদয়হীনতা ও জান্তবতার রূপ সমরবাদের বিরুদ্ধে গোয়আ-র সচেতন প্রতিবাদ। এদিক থেকেই হেমিংওয়ের সঙ্গে তাঁর মিল। আর, বুলফাইট্-এর ছবি থেকেও হয়ত হেমিংওয়ে কিছু শিখেছিলেন। গোয়আ-র ছবিতে হেমিংওয়ে যে স্পেন্‌কে দেখেছিলেন, তাঁর উপন্যাসে সেই স্পেন্‌ই প্রবেশ ক'রেছে—ছোট ছোট কুসংস্কার, যুদ্ধ, ভয়, মেয়েদের মুখ, বুল্‌ফাইট্। ব্রখেল্-ই গোয়আ-র নিকটতম পূর্বপুরুষ। "নিরপরাধ-হত্যার" স্মৃতি হয়ত হেমিংওয়ে ভোলেন নি। তিন্তোরেত্তো-র ছবির গতি বা "সেণ্ট মার্কের দৈবশক্তি"-র জনতার নাটকীয় চরিত্র "ফেয়ারওয়েল্ টু আর্মস্"-এর জনস্রোতের চিত্রায়ণের উপর হয়ত ছায়া ফেলেছে।

সেজানের তিন ডাইমেন্‌শন্-এর আদর্শকে সামনে রেখেই হেমিংওয়ে চরিত্র রচনায় প্রয়াস পেয়েছিলেন। "ফর হুম্ দি বেল্ টোল্‌স্"-এর পিলার প্রতিটি কথার মধ্যেই যেন বহুরূপে উপস্থিত; সে পাব্‌লো-কে ভালোবাসে, আবার প্রজাতন্ত্রকেও ভালোবাসে; পাব্‌লোর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও তার প্রেমে খাদ মেশে না; সে যেন একই সময়ে একাধিক স্তরে, একাধিক ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে।

"বন্দীশালার ইয়ার্ড" বা আরো বিশেষ ক'রে "রাত্রির কাফে"-র ভ্যান্ গখ্-এর সঙ্গেই হেমিংওয়ে-র আত্মীয়তা। ভ্যান্ গখ্ একদা কোন চিঠিতে লিখেছেন, "আমি আঁকতে চাই মানুষকে।" কিন্তু এই দুই ছবিতে সে কী রূপ মানুষের? পুনরুক্তি ও একঘেয়েমীর শূন্য জীবন দু'য়েরই প্রসঙ্গভূমি। এক ছবিতে পথ-আটকানো দেয়াল আর ইঁটের চাপ, অন্য ছবিতে খালি গেলাস,

নিষ্প্রাণ সবুজ, মানুষগুলোর অস্পষ্ট ব্যক্তিত্ববিহীন সঙ্কুচিত কায়া (প্রতিটি মানুষই যেন নিজের খোলসের মধ্যে আবদ্ধ), "শয়তানের ফার্গেসের পরিবেশ।" "ফিয়েষ্টে"র নারীপুরুষেরা এই পরিবেশেরই মানুষ।

গোগ্যাঁর সঙ্গে যোগ অন্য রকম। গোগ্যাঁ কোন এক বন্ধুকে ব'লেছিলেন, "তোমার সভ্যতা তোমার ব্যাধি, আমার আদিমতা আমার স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার।" তাই সভ্যতার কলুষ ছেড়ে তাঁর টাহিটি-প্রবাস—টাহিটিই যেন তাঁর ছবির মুখ্য চরিত্র। হেমিংওয়ে নিজে এবং তাঁর নায়কও সুসভ্য ধনগর্বী কুৎসিৎ আমেরিকায় শান্তি পাননি। স্পেনে, কিউবার জেলেপাড়ায়, আফ্রিকায় হেমিংওয়ে তাঁর টাহিটি খুঁজে পেয়েছেন।

পূর্বসূরীদের তালিকায় বাকি নাম—মোপাসাঁ, বাখ্, মোৎসার্ট, কিপ্লিং, থোরো, ক্যাপ্টেন্ ম্যারিয়াট, কেভেদো, পাতিনির, হিয়েরোনিমাস্ বশ, এবং, সান য়ুয়ান দে লা ক্রুথ্। এর মধ্যে কেভেদো এবং ক্রুথ্ হয়তো হেমিংওয়ে-র স্পেন-দর্শনে আলো যুগিয়েছিলেন।

॥ দি ওল্ড্ ম্যান্ অ্যাণ্ড্ দি সী ॥

বহু উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পাত্র "দি ওল্ড্ ম্যান্ অ্যাণ্ড্ দি সী" হেমিংওয়ে-র সাহিত্যলোকে ব্যতিক্রম নয়। "মানুষ বিধ্বস্ত হয়, কিন্তু পরাজিত হয় না।"—এ-কথা আমরা বারবার শুনেছি, হেমিংওয়ের এক উপন্যাস থেকে আরেক উপন্যাসে। রবার্ট জর্ডান, হ্যারী মর্গান, জেকব্ বার্নস্, রিচার্ড ক্যাণ্ট্ওয়েল্—সকলেই এই একই কথার সাক্ষাৎ প্রমাণ।

এ-উপন্যাসের নতুনত্ব অন্যত্র। নারী-পুরুষের সম্পর্ক, রাষ্ট্রনীতি, দৈনন্দিনের জীবন ইত্যাদি ছেড়ে হেমিংওয়ে বহু দূরে স'রে গেছেন—একেবারে মাঝ-সমুদ্রে, কূল থেকে বহু দূরে। শেষে সান্টিয়াগো হ'য়ে উঠেছে প্রায় কোন এক অস্তিত্ববাদী নায়ক। হেমিংওয়ের আগের উপন্যাসে জীবনের যুদ্ধে কেউ একা নয়। হেনরী পেয়েছে ক্যাথারিন্-কে, রিনাল্দিকে। রবার্ট পেয়েছে মারিয়াকে, পিলার, আন্সেল্মো, জিপসী ও এল্-সর্দোকে। হ্যারী পেয়েছে মারীকে, জেক্ ব্রেট-কে, ক্যাণ্টওয়েল্ রেনাটাকে। কিন্তু অকূল সমুদ্রে সান্টিয়াগো একা। লোকসমাজ থেকে তার দূরত্ব এক, তার নৈঃসঙ্গ্য—এদিকে হেমিংওয়ে বারে বারে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছেন—"বড় দূরে চ'লে গেছলাম"—আর, "ছেলেটা যদি সঙ্গে থাকত।"

বৃদ্ধ সান্টিয়াগো কি শেষে জয়ী? বিরাটতম মাছ আজ তার শিকার—"এমন মাছ কখনও ধরা পড়ে নি।" কিন্তু সান্টিয়াগো নিজে জানে সে হেরে গেছে। কোথায় তার হার? মার্লিন মাছের আঠারো ফীট কঙ্কাল ডাঙায় এসেছে। মাছটা যদি অক্ষতদেহে আসত, বাজারে যেত, পাউণ্ড প্রতি ত্রিশ সেণ্ট দরে হাজার পাউণ্ড বিক্রী হ'ত? তার মাংস "বাজারে সবচেয়ে সেরা দামে বিকিয়ে যেত।" শক্তির জয়, সাহসের জয় এইভাবেই জীবনের অংশ হ'য়ে উঠত, "ক্ষুধার শাস্তি" থেকে মুক্তি আসত। কিন্তু সান্টিয়াগো-র জয় র'য়ে গেল অপার্থিব, বস্তুবিচ্ছিন্ন, এবং সেইহেতু অসম্পূর্ণ।

সান্টিয়াগো নিজেকেই প্রশ্ন করে, কে তোমায় পরাস্ত ক'রল? "সে নিজেই জবাব দেয়ঃ কেউ না। আমি বড় বেশী দূরে চ'লে গেছলাম।" মানুষের সংস্রব ছেড়ে, বহুদূরে স'রে গিয়ে যে জয়লাভ, সে জয় অসম্পূর্ণ, মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন বলেই সে অসম্পূর্ণ। ডাঙা থেকে দূরে গেল, আর মানোলিন্‌কে ছেড়ে গেল বলেই সান্টিয়াগোর জয় তার জীবনে প্রবেশ ক'রল না।

এই অভিজ্ঞতায় দীক্ষিত সান্টিয়াগো আবার পাড়ি দেবে—নতুন গাড়িতে সঙ্গী থাকবে মানোলিনঃ "আবার আমরা একসঙ্গে মাছ ধ'রব।" সান্টিয়াগো সেই সংহতিচৈতন্যে ফিরে এসেই খবরের কাগজ দেখতে চায়। ক্ষুধা, বিরোধ, দ্বন্দ্বের পৃথিবীতে সে আবার ফিরে আসছে।

সান্টিয়াগোর জয় আংশিক হ'লেও নিষ্ঠায় ও সততায় পরিপূর্ণ। নিজের সীমার বাইরেও মানুষ হাত বাড়াবে। তবু প্রয়াসের মহত্ব ও অভিজ্ঞতার শিক্ষা ভবিষ্যৎ যাত্রাপথ আলোকিত ক'রবে। শিল্পী বাস্তবকে জয় ক'রতে যাবেন; হয়তো হার মানতে হবে—কিন্তু সে-হারও নিরর্থক নয়। সান্টিয়াগোর আংশিক জয় পূর্ণতর জয়ের গ্যারান্টি।

মেল্‌ভিলের "মবি ডিক্"—এর সঙ্গে হেমিংওয়ের "দি ওল্ড ম্যান্ অ্যাণ্ড দি সী"-র তুলনা চোখে প'ড়েছে। হেমিংওয়ের উপন্যাসের ব্যঞ্জনায় আশ্রিত জীবনচিন্তার বিশালতা ও গভীরতায় মেল্‌ভিল্ কোনদিনই পৌঁছোন নি। তাছাড়াও, জীবনের মধ্যে জোর ক'রে দর্শনচিন্তা ঢোকাবার চেষ্টায়, জীবনকে "রেটরিক্" ক'রে তুলে মেল্‌ভিল্ রুচির অভাবের প্রমাণ দিয়েছেন। তাই ডি. এইচ. লরেন্স্-এর অভিযোগঃ "নিজের সম্পর্কে নিশ্চিত নন ব'লেই ইনি

প্রচারে মেতে ওঠেন—আর বারবার এমন অ্যামেচারের মত প্রচার করেন।" বিভিন্ন রকমের মানুষ, যারা শেষ বিচারে কেউই নয়—এক অতিকায় তিনি, আসলে তিমিজাতির অনাত্মীয়—মনোম্যানিয়াক ক্যাপ্টেন আহাব—এরা সকলেই যেন কাঠের পুতুল—সেই পুতুলের একরোখা ভঙ্গি—সুতোর টানে নেচে চ'লেছে। লরেন্স-ই ঠিক কথা ব'লেছিলেন, এরা সকলেই প্রতীক; কিন্তু মেল্‌ভিল্ বোধ হয় নিজেই জানতেন না, এরা আসলে কিসের প্রতীক। প্রতীক যখন গভীরতার ভূমিতে পৌঁছায়, তখন তার প্রতীকতা একদৃষ্টিতে ধরাই পড়ে না। অক্ষম শিল্পীর কলমে প্রতীক "পুডিঙের মধ্যে প্লামের মত জেগে জেগে থাকে।" তাতে অবশ্য সময়ে সময়ে আয়েসী সাহিত্য-সমালোচকদের সুবিধা হয়। যে-কোন তুলনার বাইরে "মবি ডিক"-কে তার যোগ্য সম্মান দেব, কিন্তু তার সঙ্কীর্ণতা ও সীমিত মূল্য সম্পর্কেও সচেতন থাকব। হেমিংওয়ে মেল্‌ভিল্ তুলনা সেইকারণেই গ্রাহ্য হবে না।

প্রকল্পনা ও বিকল্পনা

দেবব্রত চক্রবর্তী

ইম্যাজিনেশন ও ফ্যান্সি। বাংলায় বলা যাক প্রকল্পনা ও বিকল্পনা। কল্পনার উৎকর্ষ-ব্যাপকতা-প্রগাঢ়তা—প্রকল্পনা। কল্পনার অপকর্ষ-লঘুতা-বিশীর্ণতা—বিকল্পনা। এই দুটি রীতিকে কেন্দ্র ক'রে যুগে যুগে শতকে শতকে পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্য-দর্শনে-মনস্তত্ত্বে নানা মত নানা সিদ্ধান্ত গ'ড়ে উঠেছে। আলোচনা, সমালোচনা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে এই রীতিদ্বয়ের স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা হয়েছে। অনেক মনীষীর, অনেক স্থিতধী চিন্তানায়কের অক্লান্ত সাধনা জেগে রয়েছে এদের পেছনে। আজ সাহিত্য-দর্শনের পাদপীঠে এরা অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল।

নানা দিক থেকে প্রকল্পনার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন, প্রকল্পনা হচ্ছে প্রত্যক্ষ প্রতিরূপের ক্ষমতা, এই সব প্রতিরূপ থেকে বস্তু ও বিশেষ ধর্মের আদর্শ সম্মিলন গঠনের শক্তি, অবস্থা ও বিশেষ ধর্মে শিল্পীর সহানুভাবী মনন, বিমূর্ত বোধের প্রতীক সৃষ্টির নৈপুণ্য, ভূমাদর্শী স্বজ্ঞার কাব্যিক অনুকল্প, এবং মনের মাঝে অন্তর্নিরূঢ় সৃজনী প্রতিভা। প্লেটো অধরিক আত্মার ক্রিয়া হিসেবে প্রকল্পাকে গ্রহণ করেননি, তবে তিনি স্বীকার করেছেন এর ভূমাদর্শনের নৈপুণ্য। অ্যারিস্টটল বলেছেন, এটি চিন্তার উৎসকে বর্ণালীতে শোভিত করবার সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতা। ভূমাদর্শন সম্বন্ধে প্লেটোর ইঙ্গিত নিয়ে সমালোচনা থেকে বিচ্ছিন্ন এই বিবরণ দু' হাজার বছর ধ'রে স্টয়ক্স ও নিও-প্লেটোনিস্টদের মধ্যে ও ক্লাসিক্যাল অলঙ্কারশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল। অতিসংবেদী প্রকল্পনাকে স্বীকার করেছেন এমন কয়েকজন ভূমাদর্শীর দৃষ্টিতে পুনরুৎপাদী ও সম্মিলিত ক্রিয়ার মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনা মধ্যযুগে প্রবল হয়েছিল। অনেকেই এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতেন। কেবল-মাত্র দান্তের আলোচনাতেই অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যিক ক্ষমতার পূর্ণ স্বীকৃতি ছিল। বিকল্পনা ও প্রকল্পনা সম্বন্ধে ব্যাপক সন্দেহ সত্ত্বেও রেনেসাঁসে ম্যাজোনি, ফ্র্যাকা-স্টোরো, ট্যাসো, সিডনী ও পুটেনহ্যামের কাব্যতত্ত্বে তাদের গঠনমূলক দৃষ্টির কথা উল্লিখিত হয়েছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রয়োগবাদ ও যুক্তিবাদ প্রবল হ'য়ে একটি প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করল সমালোচনামূলক সংজ্ঞার পক্ষে। হবস্ বললেন, বিকল্পনা হচ্ছে অবক্ষয়ী বোধ এবং তিনি কাউলের মতো সৌন্দর্যবিধায়ক ক্রিয়া সম্বন্ধে এই মত পোষণ করলেন যে, অঙ্গ বিন্যাস করে বিবেক, রূপরঙ্গ সৃষ্টি করে বিকল্পনা। যে-যুগে প্রকল্পনার ওপর বুদ্ধির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল সে-যুগে ড্রাইডেন একাকী সমালোচনামূলক শব্দের পরিসর বিস্তৃত করলেন এবং নিশ্চিতভাবে বললেন যে, কথাবস্তু ও চরিত্র সৃষ্টির পর কবির প্রধান কাজ বিকল্পনার বিশাল ক্ষেত্রে শিল্প-সম্পাদন করা; একমাত্র বিকল্পনাই সজীবতার স্পর্শ এনে দেয়। অ্যাডিশনের প্রকল্পনার আনন্দ ছিল ড্রাইডেনের অন্তর্দৃষ্টির বিপরীত। অনুষঙ্গবাদী মনস্তত্ত্বের প্রভাবে নিপুণ শিল্পকলায় অ্যাডিসন তাঁর বিবরণকে প্রত্যক্ষ প্রতিরূপে সীমায়িত করেছিলেন এবং রুচির নন্দনবৃত্তিকে অভিহিত করলেন প্রকল্পনা। লিওনার্ড ওয়েলস্টেড দৃঢ়ভাবে বলেছেন, প্রকল্পনা হচ্ছে প্রজ্ঞার অংশ, স্মৃতি বা বিবেকের বহিঃপ্রকাশ।

উদাসীন ভাবগ্রাহী প্রকল্পনা নয়, গভীর অর্থ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সক্রিয় প্রকল্পনার নোতুন ব্যাখ্যার জন্য রোমান্টিক কবি ও সমালোচকেরা অতীন্দ্রিয়তাবাদ ও আধুনিক জার্মান দর্শনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। ব্লেক বললেন, প্রকল্পনা হচ্ছে আধ্যাত্মিক সংবেদন, মানবের শাশ্বত রূপমূর্তি। কোলরিজ অতীন্দ্রিয়তাবাদ ও জার্মান দর্শনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে প্রচার করলেন যে, অসীম সত্তায় সৃজনের যে শাশ্বত ক্রিয়া চলেছে সসীম মনে তারই পুনরাবর্তন হ'ল মৌলিক প্রকল্পনা। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বললেন, প্রকল্পনা একটি পরম ক্ষমতা, অতিস্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি, মনের বিস্তৃতি ও প্রজ্ঞার ভাবানুষঙ্গ। রেনেসাঁসে বিকল্পনা যুক্ত হ'ল উদ্ভাবনার শক্তির সঙ্গে এবং সপ্তদপ শতাব্দীতে এটি বুদ্ধির সমার্থকরূপে দাবী করল বিবেকের সংযম। তখন উপকথা বা পুরাণকাহিনীর উৎস বোঝাতে প্রকল্পনা ও বিকল্পনা অস্পষ্ট-ভাবে একই অর্থ ব্যবহৃত হোত। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে বিকল্পনা থেকে প্রকল্পনাকে পৃথক করা হয়েছিল আর তাকে স্থাপন করা হয়েছিল বোধের সংযত আক্ষরিকতায় সীমিত অর্থে। অষ্টাদশ শতাব্দীর যৌক্তিকতার আলোকে বিকল্পনার মর্যাদা অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে এবং তা ব্যবহৃত হয়েছে লঘু ও অগভীরভাবে। কিন্তু প্রকল্পনা আপন অর্থ গৌরবে দীপ্তমান হ'য়ে রইল; সংবেদবাদী নন্দনতত্ত্বে পেল নোতুন মর্যাদা। রোমান্টিক সমালোচকেরা যখন বিকল্পনা ও প্রকল্পনার

প্রভেদ নির্ণয় করলেন তখন গুরুত্ব আরোপ করা হ'ল প্রকল্পনার ওপর। এর চারিপাশে গ'ড়ে উঠল পরম অনুভূতির কোমলতা, ব্যগ্রতা ও গভীরতা। আর বিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত হ'ল জড়তা, ভঙ্গুরতা। সমালোচকেরা বললেন, প্রকল্পনা হচ্ছে শাশ্বত চেতন যার অতলান্তে বিষয় ও বস্তু এক; এবং সৃজনক্ষম হিসেবে রূপকের প্রতি এর প্রয়োগ একে বিকল্পনা থেকে পৃথক করেছে। ড্রাইডেনের সময় থেকেই এদের ব্যবহারের সীমা নিরূপিত হয়েছিল। যেমন, প্রকল্পনা ও বিকল্পনা একই নৈপুণ্যের দুটি আখ্যা; যা দুরূহ, চিন্তনীয় তার প্রতি প্রযুক্ত হয় প্রকল্পনা এবং এর অকিঞ্চিৎকর ক্রিয়ায় থাকে বিকল্পনার মায়াবিলাস।

প্রথম দিকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকল্পনা ও বিকল্পনার মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন, সাধারণ উপাদান থেকে যে-হৃদয়গ্রাহী ফল লাভ করা যায় তা হচ্ছে প্রকল্পনা, আর অবস্থা ও অসংখ্য চিত্রকল্পের আকস্মিক বৈচিত্র্যের দ্বারা উদ্রিক্ত বিস্ময় ও আনন্দ হ'ল বিকল্পনা। এটি রয়েছে লিরিক্যাল ব্যালাডসের অষ্টাদশ শতকের সংস্করণে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজ প্রকল্পনার যে-প্রধান সমালোচনা করেছেন তা লিপিবদ্ধ রয়েছে পোয়েমসের ভূমিকায়; সেখানে ওয়ার্ডসওয়ার্থ সংশোধন করেছেন উইলিয়ম টেলারের একটি মত। টেলার লিখেছেন—একজন ব্যক্তি যে-অনুপাতে বোধের প্রত্যক্ষ প্রভাবকে ভাবরূপে স্পষ্টতার সঙ্গে অনুকরণ করতে পারেন, সেই অনুপাতে তিনি প্রকল্পনার অধিকারী। এটি মনের মাঝে সংবেদনের বিষয়কে প্রতিবিম্বিত করার ক্ষমতা। আবার একজন যে-অনুপাতে অবিদ্যমান বস্তুর আদর্শ উপস্থাপনকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে স্বচ্ছন্দে স্মরণ করতে পারেন, সংযুক্ত বা সন্নিবিষ্ট করতে পারেন ঐ সব আন্তর প্রতিরূপ, সে-অনুপাতে তিনি বিকল্পনার অধিকারী। প্রকল্পনা হচ্ছে চিত্রণের ক্ষমতা, বিকল্পনা—আহ্বান ও সম্মিলনের। প্রকল্পনা গ'ড়ে ওঠে স্থির পর্যবেক্ষণের দ্বারা; প্রকল্পনা অধিকতর যথার্থ; এর সাহায্যে চিত্রকর অথবা কবি বস্তুর উপস্থিতি ছাড়া অধিকতর নির্ভরতায় চিত্রণ অথবা বর্ণনা করতে পারেন। বিকল্পনা অপেক্ষাকৃত পরিবর্তনীয়; এর দ্বারা যে-রূপসজ্জা সম্ভব, তা অপেক্ষাকৃত নোতুন ও স্পষ্ট।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের আপত্তি হচ্ছে এই যে, টেলার পরস্পর বিরোধী শব্দ দুটিকে এলোমেলো ক'রে ফেলেছেন। প্রকল্পনা শব্দটিই সৃজনীক্ষমতা অথবা কাব্যতত্ত্ব বোঝাতে ব্যবহৃত হওয়া উচিত, বিকল্পনা নয়। তা ছাড়া শব্দ দুটির মধ্যে

পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে খুব নিম্নস্তরে। যেমন, টেলার যাকে বলেছেন বিকল্পনা, তার শক্তি শুধু প্রতিরূপকে সংযুক্ত বা সন্নিবিষ্ট করা, মনের পট-পরিবর্তন করা, রূপসজ্জা করবার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, এর চেয়েও উন্নততর ক্রিয়া তার আছে। এর সঙ্গে তুলনায় একটি উচ্চমানের সৃজনীক্ষমতা রয়েছে, তা হ'ল প্রকল্পনা।

বিকল্পনা যে-সব উপাদান ব্যবহার করে তারা গঠনের দিক থেকে পরিবর্তনের প্রবণতাবিশিষ্ট নয়। এবং যদি কোনো সময়ে রূপান্তর গ্রহণ করে তাও সীমিত অর্থে। যে-নিয়মের মধ্যে দিয়ে বিকল্পনার রীতিপরম্পরা প্রসারিত হয়েছে, তা বিষয়ের গঠনবিকৃতির মতো অব্যবস্থিত; এবং প্রাসঙ্গিকভাবে উপস্থিত বা আকস্মিকভাবে সংযুক্ত বিষয়ের মতো পরিণতি বিস্ময়কর, আনন্দোচ্ছল, করুণ বা কোমল। বিকল্পনা নির্ভর করে ক্ষিপ্রতা ও প্রাচুর্যের ওপর, এরই সাহায্যে সে মনন ও প্রতিরূপকে বিস্তৃত করে; তার বিশ্বাস, এই সব মনন ও প্রতিরূপের সংখ্যা ও সুষ্ঠুতা প্রাতিস্বিক মূল্যের পূর্ণতা সাধন করবে। বিকল্পনা তার অপূর্ব সূক্ষ্মতা ও সফল সম্পাদনের জন্যে গর্বিত, এর দ্বারা তাদের গোপন সম্পর্ক সে প্রকাশ করে। উইলিয়ম টেলারের মতে বিকল্পনা ছিল সৃজনক্ষম ও মৌলিক বিষয়; কিন্তু প্রকল্পনা ছিল তন্ময়না ও নিপুণ রূপকার ক্ষমতা। চার্লস ল্যামের ভাষায়—প্রকল্পনা সকল জিনিসকে একের মাঝে বিধৃত করে; সজীব অথবা জড়রূপে উপস্থাপিত করে আনুষঙ্গিক ধর্মকে অক্ষুণ্ণ রেখে। কোমল, নমনীয় ও অসীমের মাঝেই প্রকল্পনার স্বতঃস্ফূর্ততা। যখন প্রকল্পনা নিয়ে আসে তুলনা তখন মনে আসে সাদৃশ্যের বোধ। এটি আকারের চেয়ে প্রকাশের ওপর নির্ভর করে বেশি; স্পষ্টতা ও আকস্মিকতার চেয়ে বেশি নির্ভর করে অন্তর্নিরূঢ়তা ও স্বাভাবিকতার ওপর। মোট কথা, সার্থকভাবে বর্ণনা ও প্রতিফলনের নৈপুণ্য এবং আনন্দোজ্জ্বল রচয়িতা বিকল্পনার প্রভেদ নিয়ে যখন অষ্টাদশ শতাব্দী সন্তুষ্ট ছিল, ওয়ার্ডসওয়ার্থ তখন সমগ্র তুলনার মান উন্নত করলেন। তিনি বললেন, প্রতি-ফলনের দুটি রীতিই উদ্ভাবক। প্রভেদ হচ্ছে এই যে, একটি কৌতুকাবহ ও অধরিক এবং অপরটি সমগ্রভাবে গভীর ও উপরিক।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের লক্ষ্য ছিল প্রকল্পনাকে পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা। বিকল্পনার স্বীকৃতি লাভ হচ্ছে ঐ লক্ষ্যেরই আনুষঙ্গিক ফল। কিন্তু কোলরিজ

বিকল্পনাকে মেনে নিতে পারলেন না। তাই তিনি দৃপ্তকণ্ঠে প্রতিবাদ করলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতের। তিনি বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া গ্রন্থের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে লিখেছেন—পরিমেল ও সঙ্কলনের ক্ষমতা ব'লে যাকে তিনি অভিহিত করেন বা ওয়ার্ডসওয়ার্থ যাকে বলেন প্রকাশ ও সম্মিলনের ক্ষমতা, তা কখনোই প্রকল্পনা নয়। এবং তিনি সহজেই অনুমান করতে পারেন যে, প্রকল্পনার সঙ্গে বিকল্পনার স্থান নির্দেশ করে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ভুল করেছেন। কোলরিজের গভীরতর মনস্তাত্ত্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে কবিতার চেয়ে মৌলিক তত্ত্ব অর্থাৎ প্রাকল্পনিক সৃজনরীতির আলোচনা করা; আর কাব্যে বিকশিত প্রকল্পনা ও বিকল্পনার প্রভাব অথবা পরিণামের সমীক্ষা করা হ'ল ওয়ার্ডসওয়ার্থের লক্ষ্য। কোলরিজ তাঁর বায়োগ্রাফিয়া গ্রন্থে উভয়ের মধ্যে একটি তুলনার অবতারণা করেছেন। আমার মনে হয়, প্রকল্পনা সম্বন্ধে কোলরিজ এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ যে পৃথক সিদ্ধান্ত করেছেন তার মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি নয়। এবং দুটি মতই একসঙ্গে সুবিবেচিত হ'তে পারে। তবে কোলরিজের মত অধিকতর স্পষ্ট ও তত্ত্বপূর্ণ ব'লে স্বচ্ছন্দে গ্রহণযোগ্য।

কোলরিজ লক্ষ্য করেছেন হার্টলের অনুষঙ্গবাদ থেকে নিও-প্লেটোনিক এবং পরে জার্মান তুরীয় ভাববাদ পর্যন্ত তাঁর মনের ক্রমোন্নতির রেখাপথ। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে দশটি কোটি-প্রসঙ্গে বিবৃত ফিক্‌টে ও শেলিঙের অনবদ্য বাস্তবতায় তিনি নিজেকে দেখেছেন। প্রকল্পনার উৎস ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করবার জন্যে এদের স্বীকার করা হয়েছে। কোলরিজ বলেছেন,—প্রকল্পনা দু' রকমের: মৌলিক ও গৌণ। মৌলিক প্রকল্পনা হচ্ছে প্রাণ-অফুরান প্রতিভা, মানবিক প্রতীতির সর্বোৎকৃষ্ট রূপশিল্প, আর অনন্ত সত্তায় সৃষ্টির যে সনাতন ক্রিয়া চলেছে, তার পুনর্বৃত্তি। গৌণ প্রকল্পনা হল মৌলিক প্রকল্পনার প্রতিধ্বনি এবং সচেতন বাসনার সহাবস্থায়ী; তবু মৌলিক প্রকল্পনার সঙ্গে গৌণ প্রকল্পনার সাদৃশ্য আছে কাজের প্রকারের দিক থেকে, আর বৈসাদৃশ্য আছে প্রয়োগের রীতি ও মর্যাদার দিক থেকে। সৃজনের উচ্ছেশ্যে এটি বিযুক্ত হয়, বিক্ষিপ্ত হয়, সঞ্চারিত হয়; অথবা যেখানে এই রীতি অসম্ভব সেখানেও চেষ্টা করে রচনা করতে ও একীভূত করতে। সকল বস্তু যেমন মূলত স্থির ও জড়, এটি তেমনি মূলত প্রাণোচ্ছল। পক্ষান্তরে দৃঢ়তা ও স্পষ্টতা হচ্ছে বিকল্পনার বৈশিষ্ট্য। কল্পনা প্রকৃত পক্ষে স্থানকালের প্রভাবমুক্ত স্মৃতিরূপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

এটি ইচ্ছার প্রয়োগমূলক আভাস বা অভিরুচির দ্বারা রূপান্তরিত হয়। কিন্তু সাধারণ স্মৃতির সঙ্গে সমানভাবে বিকল্পনা পরিমেলবিধি থেকে তার সকল উপাদান গ্রহণ করে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সাহিত্যের বিবরণীতে ওয়ার্ডসওয়ার্থ যা নির্দেশ করেছেন কোলরিজ কি সেই একই জিনিস বুঝিয়েছেন? কিংবা অধিকতর নিগূঢ় কোনো কিছুর সূচনা করেছেন? কোলরিজের মনে জার্মান ভাবধারার উপস্থিতির জন্যে প্রশ্নটি খুবই জটিল। কাণ্ট ও শেলিঙের ধারণার সঙ্গে কোলরিজের তত্ত্বের কোনো কোনো জায়গায় মিল রয়েছে। একথা সত্য যে, কিছু সংখ্যক স্পষ্ট ও আনুপূর্বিক বিবরণের জন্যে কোলরিজ জার্মানদের কাছে ঋণী; তবে তাঁর ঋণের গুরুত্ব সব সময়ে প্রখরতা বা নিরূপণীয়তার আনুপাতিক নয়। প্রকৃতপক্ষে এই ভাবধারা বিস্তৃতভাবে পূর্বাভাসিত হয়েছিল নিও-প্লেটোনিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে, কোলরিজ ছিলেন যে-ঐতিহ্যের তত্ত্বজ্ঞ এবং যার ওপর ভিত্তি ক'রে কাণ্ট দাঁড়িয়েছিলেন স্পিনোজার ব্রহ্মময়তা ও মায়াবাদের বিপক্ষে।

কাণ্টের দুটি শব্দ বোধ ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধে কোলরিজ যে-সব সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন তাদের পাশাপাশি রেখে আমরা সহজেই জানতে পারি জার্মান ভাবধারার সঙ্গে কোলরিজের প্রকল্পনা ও বিকল্পনার সম্পর্ক। কোলরিজ লিখেছেন,—বোধ হচ্ছে বেদনজড়িত দৃষ্টিতে চিন্তার ও সিদ্ধান্ত গঠনের নৈপুণ্য, আর প্রজ্ঞা হ'ল এমন একটি ক্ষমতা যার দ্বারা আমরা লাভ করি দেকার্তে ও প্লেটোর ভাবধারার চিরন্তন যাথার্থ্য, প্রতিরূপের মূলতত্ত্ব নয়। তাঁর মতে, —বোধ সঞ্চারী; সকল বিবেচনায় বোধ তার চরম ক্ষমতার মতো অন্য কোনো নৈপুণ্যের উল্লেখ করে; বোধ প্রতিফলনের শক্তি। প্রজ্ঞা স্থির; সকল সিদ্ধান্তে সত্যের মূল কারণ ও তাৎপর্যের মতো প্রজ্ঞা নিজেকেই আকর্ষণ করে; প্রজ্ঞা চিন্তাশীল। বোধের চেয়ে বেদনের সঙ্গে প্রজ্ঞার সম্পর্ক নিবিড়তর। কারণ প্রজ্ঞা হচ্ছে সত্যের একটি উজ্জ্বল দিক, একটি আন্তর দর্শন; প্রাকৃতিক বা ঐন্দ্রিয়কের প্রতি বেদনের যেমন একটা সংযোগ আছে, জ্ঞানগভীর বা আত্মিকের প্রতি অনুরূপ সংযোগ রয়েছে প্রজ্ঞার। কাণ্টের সংবেদ-স্বজ্ঞার মতো প্লেটোর সংবেদ-জ্ঞান কোলরিজের অনুসৃত রীতিতে নেই। তবে পৃথকভাবে একে অস্পষ্ট সূচনা ব'লেই মনে হবে; বোধের নিয়মানুসারে ক্রিয়াশীল মৌলিক প্রকল্পনা দ্বারা এটি গ'ড়ে ওঠে আমাদের দৈনন্দিন বহিরভিজ্ঞতায়। এই প্রকল্পনা একটি

সৃজনক্ষম মৌলিক প্রতিভা, মানসের অভিলক্ষিত সক্রিয়তা, আত্মসচেতনতা, আত্মানুভাবী স্বজ্ঞা, বিষয় ও বস্তুর সম্মিলয়িতা। এই বিশ্লেষণকে সমর্থন করবার জন্যে কোলরিজ লিখেছেন,—স্পষ্টত দুটি শক্তি রয়েছে জীবনবেগের আনন্দে উজ্জ্বল, তারা আপেক্ষিকরূপে পরস্পরের প্রতি তৎপর ও উদাসীন; এবং একটি মধ্যবর্তী প্রতিভা দ্বারাই তা সম্ভব। দর্শনের ভাষায় এই প্রতিভাকেই আমরা বলব প্রকল্পনা। যে-শক্তি দুটির মাঝে প্রকল্পনা মীমাংসা করে তারা হ'ল বিষয় ও বস্তু। যদিও মৌলিক প্রকল্পনা একটি মানবিক সৃজননৈপুণ্য তবু তাকে আমরা স্বর্গীয় ব'লে স্বীকার করি।

আমার ধারণা, গৌণ প্রকল্পনা অধিকতর নমনীয় ক্ষমতা। অহং-পরম-জগৎ-ঈশ্বর প্রভৃতি ভাবের মূর্ত প্রকাশে এটি মৌলিক প্রকল্পনার প্রতীতিঘন রচনাকে পুনর্বার রূপায়িত করে। অলৌকিক মনের প্রজ্ঞায় এই সব ভাব অন্যরূপে গ'ড়ে ওঠে। কবিদৃষ্টির আলোকোদ্ভাসিত প্রকৃতি প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করে মানবের আত্মিক জীবনকে এবং সে সঙ্গে আত্যন্তিক জীবনকে যার মাঝে মানবের আত্মিক জীবন অংশগ্রহণ করে। এরকম একটি জীবনের ভাবধারা হচ্ছে মানস-দর্শনের বিষয় এবং প্রজ্ঞা তাদের দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টির নৈপুণ্য, গৌণ প্রকল্পনা তাদের মূর্ত ক'রে তোলে প্রতীকতার রূপে।

প্রতিরূপ তখনই কাব্যের কারুকলামণ্ডিত হয় যখন তাদের মাঝে কবির আপন মানস থেকে আসে একটি মানবিক ও প্রাজ্ঞিক জীবন। এই মানস কবিকে নিয়ে যায় মাটি-সাগর-হাওয়ার ভেতর দিয়ে।

অজন্তার কারুকাজ, বিকেলের আলো তার গায়,
মধুর ধ্রুপদ গান বাজে শুধু এই নিরালায়।

এখানে যা রয়েছে তার মাঝে পাই সহজ বর্ণনাময়তা; সাবলীল ভাষায় হালকাভাবে আঁকা হয়েছে একটি সাধারণ চিত্র। সবিশেষ বিবরণেই তার সকল সৌন্দর্য প্রকাশিত। কিন্তু সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে একই প্রতিরূপকে উন্নীত করা যায় কবিতার সাদৃশ্যধর্মের স্তরে ঃ

শুধু এই জড় অজন্তায়
স্খলিত ঢেউয়ের ফাঁকে তুলে নিয়ে বিকেলের আলো
মাধবী ধ্রুপদ গাওয়া কারুকাজে নির্জন শোনালো।

(—কিংবদন্তী।)

সেই সব কবিতাই চমৎকার যাদের নৈতিক রস মিশ্রিত হয় প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে। তারা সৃষ্টি করে প্রাজ্ঞিক ও প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে একটি মধুর চিরন্তন পরিমেল। কবির হৃদয় ও প্রজ্ঞা নিবিড়ভাবে সংযুক্ত হবে এবং প্রকৃতির আশ্চর্যসুন্দর প্রাণরঙ্গময়তার দ্বারা হবে একত্বে পরিণমিত। প্রতিরূপের সঙ্গে রসকে স্বাভাবিকভাবে মেলাতে হবে মনের গহনে। প্রতিরূপ জেগে উঠবে কবির মনে আপন আবেগে। গীতিকবিতায় বিষয় ও উপমা আত্মহারা হবে একে অপরের মাঝে।

ফলে উদ্ঘাটিত হ'ল সজীব চিত্রকল্পের তত্ত্ব, রোমান্টিক অ্যান্থ্রোপোমরফিজ্‌মের তত্ত্ব, যাকে রাস্কিন অভিহিত করলেন প্যাথেটিক ফ্যালাসি ব'লে। প্রকৃতি চিত্রণই এর মূল বিষয়, এই চিত্রণে ধরা পড়ে আমাদের মন, আমাদের অনুভূতি ; একই প্রকাশ প্রত্যক্ষীভূত হয় সকল স্থানে। সৃজনের মাঝে প্রকৃতি কাব্যিক প্রকল্পনার অংশ। সুকুমার শিল্প নিশ্চিতভাবে বহির্জগতের অধীন, কারণ সে নন্দিত করে দৃশ্য, ধ্বনি কিংবা অপর কোনো সংবেদনের প্রতিরূপের দ্বারা ; এবং এদের সূক্ষ্ম কারুকার্য ছাড়া কেউ সুরকার বা কবি হ'তে পারেন না, এ ধরণের শিল্পে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতেও পারেন না। তবে অনুভূতির মতো একটি প্রগাঢ় আন্তর শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত না হ'লে তিনি হবেন শিল্পের একজন অসফল অনুশীলক, এবং তিনি বেশিদূর অগ্রসর হ'তে পারবেন না শিল্পের ক্ষেত্রে যদি তাঁর প্রগতির পথে অস্পষ্ট আবেগ ক্রমে উজ্জ্বল, স্পষ্ট ও জীবন্ত ভাব না হ'য়ে ওঠে। যদিও মানবের আত্মা ও প্রকৃতির মধ্যে বন্ধন পূর্বস্বীকৃত, তথাপি শিল্পী যদি শুধু প্রকৃতিকে অনুকরণ করেন তবে তা কখনোই শিল্পকৃতি ব'লে বিবেচিত হবে না। প্রকৃতির অণুকণায় ছড়িয়ে রয়েছে প্রাকচেতন প্রজ্ঞার উপাদান, ক্রম ও রীতি ; এবং মন হচ্ছে প্রকৃতির প্রতিরূপের মধ্যে দিয়ে বিস্তৃত প্রজ্ঞার সকল আলোক-লেখার অধিশ্রয়ণ।

বিশ্বজনীনতার মাঝে জীবনকে উপভোগ করাই হ'ল প্রতিভার লক্ষণ ; পাখির কোমল পালকে, ফুলের কেশরে-পরাগে, তরুবীথির সবুজে-ধূসরে, জগতের প্রতিটি প্রাণের স্পন্দনে আপনাকে প্রসারিত করাই হ'ল মনীষার স্বরূপ ; এবং প্রতিভাবান ব্যক্তি দেখেন আপন মানসের প্রতিফলন। প্রকৃতির বিচিত্র রূপসম্ভার দেখে কবির ভেতরে অপরূপ সুরমূর্ছনায় বেজে ওঠে সাঙ্কেতিক ভাষা। কবির সংবেদী সত্তায় মিশে রয়েছে একটি অস্পষ্ট অনুভূতি ; নোতুন

আভাস তাঁর অন্তরপ্রকৃতির বিস্মৃত বা গোপন সত্যকে জাগিয়ে তোলে। শিল্পকে বলা যেতে পারে বস্তু ও মননের মধ্যবর্তী ধর্ম অথবা মানবিক হৃদয় ও প্রকৃতির সম্মিলন। এটি মননের মূর্ত ভাষা এবং প্রকৃতির সঙ্গে এর প্রভেদ নির্ণয় করা হয় মননে বা ভাবে সকল অঙ্গের সামঞ্জস্য দ্বারা।

প্রকৃতিবিষয়ক রোমান্টিক কবিতা হচ্ছে প্রতীক ও দর্শনের কবিতা, যে-দর্শন তন্ময়তার বা ব্রহ্মময়তার, যে-দর্শন সম্পৃক্ত ভাববাদের। জার্মানদের মতো কোলরিজ চেয়েছিলেন কবিতা ও দর্শনকে সমান করতে। তিনি বলেছেন,—পরম দার্শনিক না হ'য়ে কেউ কোনোদিন মহান কবি হ'তে পারেন নি। আধুনিক স্বজ্ঞাত সমালোচক এর আপত্তি করবেন কবিতার অতিভাবসত্তার জন্যে। সাম্প্রতিক কালে অ্যারিস্টটলের মতের কোনো অনুসারী বলবেন,—কবিতার এরকম একটি তত্ত্ব কাব্যিক বস্তুর তত্ত্ব নয়; কবিতার তত্ত্ব কাব্যিক রীতির ব্যবহার করে এবং এই রীতিকে মিলিত করে অধ্যাত্মবিদ্যা ও অকাব্যিক মানস-রীতির পঙ্গে। যেখানে আবেগ ও চিন্তা উভয়ই রয়েছে এক দেহে সেখানেই হবে সার্থক কবিতা রচনা। শিল্প ও প্রকৃতির যে-দর্শন কবিতার মূল উপাদান তাকে আমরা খুব স্পষ্টভাবে পাই রোমান্টিক কবিতায়। রোমান্টিক লেখকেরা শিল্প ও প্রকৃতিকে নিবিড় মিলনের মাঝে বিধৃত করতে পারেন। এই তত্ত্ব অসীম, প্রতিবর্তী ও আত্মসচেতন। রোমান্টিক কবিতার প্রবণতা রোমান্টিক প্রকল্পনার দিকে।

প্রকল্পনা নিজেকে প্রকাশ করে পরস্পর বিরোধী ধর্মের প্রতিমানে বা সংযোজনে: সাদৃশ্যের সঙ্গে পার্থক্যের, বিশেষের সঙ্গে সাধারণের, প্রতিরূপের সঙ্গে ভাবের, প্রাচীন ও সুপরিচিত বস্তুর সঙ্গে নূতনত্ব ও সজীবতার সংবেদনের, ক্রমের সঙ্গে আবেগের, প্রগাঢ় অনুভূতি ও হৃদয়োচ্ছ্বাসের সঙ্গে চিরজাগরূক বিবেক ও ধৃতির। প্রকল্পনা শিল্পকে প্রকৃতির এবং রীতিকে বিষয়ের অধীন করে। এই সংযোজনের মত কাব্যিক চিত্তবৃত্তি ও শিল্পরীতির জন্যে বিস্তৃত অনুমোদন হ'তে। কোলরিজ শেক্সপীয়রের ভেনাস অ্যাণ্ড অ্যাডোনিসের দুটি পংক্তি বিশ্লেষণ করেছেন।

Look! how a bright star shooteth from the sky;
So glides he in the night from Venus' eye.

অ্যাডোনিসের সৌন্দর্যে কয়েকটি প্রতিরূপ ও অনুভূতি একত্রে সমাবিষ্ট হয়েছে,

অনুষঙ্গে ও অবিরোধে। এত ফুটে উঠেছে অ্যাডোনিসের বিচরণের ক্ষিপ্রতা, প্রেমবিহ্বল দৃষ্টির তীব্র লালসা ও আশাহীনতা। কোলরিজ অন্য কোথাও শিল্পরীতিতে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছেন এই সংযোজনের মত। তিনি লিখেছেন,—অনুসৃষ্টি নিহিত রয়েছে মৌলিক পৃথকের মধ্যে দিয়ে সদৃশের মাঝে, অথবা তা গ'ড়ে ওঠে মৌলিক সদৃশের মধ্যে দিয়ে পৃথকের মিলনে। অনুসৃষ্টি হচ্ছে অনুরূপতা ও প্রভেদের মেলবন্ধ। এতে অনুরূপতার গুরুত্ব যতখানি, প্রভেদের গুরুত্ব তারই সমান। কারণ প্রভেদ না থাকলে অনুসৃষ্টি পরিগণিত হোত অনুকৃতি ব'লে।

আমরা এখন প্রশ্ন করতে পারি প্রকল্পনাক্ষম সংযোজনের সীমা সম্বন্ধে এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের ও কোলরিজের পরিচিন্তিত কাব্যিক প্রকল্পনার সমগ্র তত্ত্ব সম্বন্ধে। তাঁদের তত্ত্ব কি প্রকৃতপক্ষে কবিতার সর্বাঙ্গীণ তত্ত্ব? অথবা তাঁরা যে-ধরণের কবিতা রচনায় পারদর্শী, এই তত্ত্ব কি সেই বিশেষ ধরণের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট নয়?

কোলরিজ লিখেছেন,—মানবিক মনের সীমার উপযোগী ও পূর্ণ প্রতিরূপকে স্থাপন করবার জন্যে শিল্পরীতি নৈতিক প্রতিবর্তনের খুব কাছাকাছি আসে এবং তা বহিরঙ্গকে অন্তরঙ্গ ও অন্তরঙ্গকে বহিরঙ্গ করে, প্রকৃতিকে চিন্তা আর চিন্তাকে করে প্রকৃতি। এটাই ললিতকলার গোপন কথা। তত্ত্বটি মনে হয় এক বিশেষ ধরণের কবিতার ওপর ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে উঠেছে, এই কবিতা নাট্যপ্রভব চিত্রণের দ্বারা বা অন্তো বৈষয়িক অনুপ্রসঙ্গের দ্বারা হবে মৌলদর্শনের নির্দেশিত প্রতিনিধি। তবু এ কবিতা তত্ত্বের বিশ্লেষণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আমাদের সকল জ্ঞান হচ্ছে আত্মানুভাবী স্বজ্ঞা যা বিষয় বা সচেতন মানসকে বস্তু বা প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত করে। যে-কবিতা বিশেষ ক'রে এই পরম-প্রমিত মূলতত্ত্বের বিশ্লেষণ করবে তা রচনা করা অসম্ভব। প্রকৃতির রূপলাবণ্য যে নৈতিক প্রতিফলনের উপযোগী তা হ'ল সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। কীভাবে প্রকৃতি চিন্তা হয়, চিন্তা হয় প্রকৃতি এটি তারই বিশেষ প্রদর্শন।

কোলরিজ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের দ্বারা বিশ্লেষিত প্রকল্পনাতত্ত্ব হচ্ছে আকৃতি-গঠন-রূপকের দিক থেকে তাঁদের শ্রেষ্ঠ কবিতার উৎকৃষ্ট বর্ণনা। গঠনের মাঝে রয়েছে সাদৃশ্যের স্পষ্ট বিবৃতির সংযত ব্যবহার। তাৎপর্য ও ভাবপ্রকাশের মাধ্যম একই উপাদানের সাহায্যে সমরীতিতে শিল্পনির্মিত। দৃশ্যপট হচ্ছে অধ্যাত্মীয়

প্রতিফলন বা অলৌলিক অন্তর্দৃষ্টির ক্ষেত্র এবং রূপের উৎস যার দ্বারা প্রতিফলন বা অন্তর্দৃষ্টি নিরূপিত হয়। এরকম গঠনের বিভিন্নতায় ভাবোন্মেষের উপাদান স্পষ্ট হ'তে পারে না। আমাদের বিভিন্নতা-পরিজ্ঞাত সত্তা থেকে অনুরাগ মূর্ত হ'য়ে ওঠে নির্দিষ্ট অনুরূপতায় নয়, বহুবিধ চিত্রের প্রচ্ছন্ন পাণ্ডুরেখা ও সমতার সঙ্গে আমাদের অপরিচয়ে। এটাই সমন্বয়ের রীতি। এখানে রয়েছে কয়েকটি স্পষ্ট অনাধ্যাত্মিক প্রবণতা ; যেমন, একদিকে সরল সংজ্ঞার্থ, বিভিন্নতার লঘুকরণ, উপলভ্য বিষয়ের গতির অভাব, অন্যদিকে মানসের অনুপস্থিতি।

যে-অধরিক নৈপুণ্য সূচনাতেই প্রকল্পনা থেকে পৃথক তাকে বলা যাক বিকল্পনা। এটি লঘু, খেয়ালী ও আনন্দোচ্ছল ; এর চমৎকারিত্বে রয়েছে দৃঢ়তা, নির্দিষ্টতা। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বিকল্পনার উদাহরণ প্রসঙ্গে শেক্সপীয়রের কুইন ম্যাবের বর্ণনা থেকে দুটি পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন—

The dews of the evening most carefully shun,
They are the tears of the sky for the loss of the sun,

কোলরিজ উদ্ধৃত করেছেন ভেনাস অ্যাণ্ড অ্যাডোনিস থেকে—

Full gently now she takes him by the hand,
A lily prisoned in a jail of snow,
Or ivory in an alabaster band :
So white a friend ingirts so white a foe.

কোলরিজ কবিতায় কল্পনার চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তির অধিকতর প্রাধান্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, যে-কবি কবিতার আবেগকে বুদ্ধিচাতুর্যের অধীন করে, হৃদয়কে উৎসর্গ করে মস্তিষ্কের কাছে, তিনি কাব্যক্ষেত্রে অসফল, এবং তিনি সর্বাপেক্ষা কাল্পনিক চিন্তায় নিরত।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের দৃষ্টিতে বিকল্পনা ও প্রকল্পনার বিভাগ পরিহার করেছে সামান্য আবেগ ও চিন্তা। কোনো কিছুই অতিশয়িতরূপে নির্দিষ্ট নয়, চিন্তাগর্ভ নয়, কোনো কিছুই অত্যধিক উদাসীন নয়, আনন্দোচ্ছল নয়, বুদ্ধিদীপ্ত নয়। কোনো কিছুই বেশি আধ্যাত্মিক নয়। তাঁদের কাব্যিক প্রকল্পনাতত্ত্ব ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মৌলিকতার নিদর্শন এবং কবিতার অন্তর্নিহিত ভাববস্তু সম্বন্ধে এটি নির্দেশ করেছে আধ্যাত্মিক ও নিও-ক্লাসিক বুদ্ধিবৃত্তির বিপরীতে অষ্টাদশ শতকের প্রতিক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি বিষয়। এই বিষয়গুলি হচ্ছে প্রকৃতির

মহিমা এবং এর সকল অস্পষ্ট ও আবেগপ্রবণ উপাদান। সুচারু, সুন্দর ও রমণীয়ের প্রতি কোলরিজের আসক্তি প্রকৃতির মহিমা ও দৃশ্যপটের অন্যান্য বিভাগের মধ্যে প্রভেদ সূচিত করে এবং সেজন্য প্রকৃতির মহিমা ও কবিতার অন্যান্য বিভাগের মধ্যেও পার্থক্য নির্দেশিত হয়। তবু প্রকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনাকালে ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরিজ উভয়েই প্রকৃতির মহিমা বা এর সকল অস্পষ্ট ও আবেগ-প্রবণ উপাদানকে স্থাপন করেন ভাবোন্মেষের উৎস-সামীপ্যে, যার দ্বারা বিশ্লেষিত হয় প্রকল্পনা ও কবিতা। অসংখ্য রীতির সাহায্যে প্রকল্পনা সৃষ্টি করে; সে বহুত্বকে বিধৃত করে একের মাঝে, বহুত্বের মাঝে বিস্তৃত করে ঐক্য। তার প্রবল ও স্বর্গীয় নৈপুণ্যে তাকে নিয়ন্ত্রিত করে এক ভাবগভীর আত্মসচেতনতা। প্রকল্পনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ব্যাপ্তি, সীমাহীনতা অপরিস্ফুট আদর্শ। যা কোমল, নমনীয় ও বাধাবন্ধহারা তাকেই সে গ্রহণ করে আপনার প্রসারণের মাধ্যমরূপে। বিশ্বজনীন ভাবধারায় সে মূর্ত। শাশ্বতের মাঝে তার পূর্ণ সার্থকতা।

প্রকল্পনা ও বিকল্পনার প্রকৃত বৈসাদৃশ্য অনুধাবনের জন্যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ ক'রে কল্পনায় উভয় রীতির স্বরূপ প্রকাশের চেষ্টা করছি।

পারদ-হ্রদের জলে বৃত্ত এঁকে
উত্তরফল্গুনী মন সারণীর ভিজালি ফেনায়
খুঁজে পেল অরূপের
হঠাৎ হারিয়ে-যাওয়া বিকল্প পরাগ
আর
ছায়ারঙ্গ দিনের আঘ্রাণ।
(—মহুয়া স্মৃতি।)

পুরোনো দিনের স্মৃতি, পেছনে ফেলে-আসা অতীতের স্মৃতি—মহুয়ার মতো মধুর। মন তাকে খুঁজে ফিরেছিল, আজ পেয়েছে। পারদ যেমন কোমল, তেমনি কোমল হৃদয়ের অবচেতন স্তর। এই স্তরে সব কিছু যায় হারিয়ে, কিন্তু লুপ্ত হয় না। তাই সেখানে মৃদু তরঙ্গ তুলে মন পেয়েছে স্মৃতিকে ক্ষুদ্র নদীর মতো অতীত-বর্তমানের শীর্ণ যোগাযোগে। দূরের আকাশে জ্বলে স্বপ্নময় উত্তরফল্গুনী তারা। তারই ভীরুতা, উজ্জ্বলতা, স্বপ্নময়তা নিয়ে এ-মন আজ পেল ভুলে-যাওয়া

বিগতকে, পেল কায়াহীন কাহিনীর হারানো মাধুর্য, বিস্মৃতির ছায়াজড়িত দিনের পুলকিত সংরাগ। এখানে রয়েছে প্রকল্পনার দীপ্ত পরিচয়।

ছায়াতরল চোখের ভীরু পাপ্‌ড়ি মেলে রোদ নেমেছে—ঝিনুক-রঙা
রোদ নেমেছে আল্‌তো মেঘ-দেউল হ'তে নিরালা কোন্ বরণডালা নিয়ে।
ঘুমজড়ানো লিপির মতো ময়ূরঘরে শোলোক-সুরে ভরিয়ে-তোলা সময়
নিভে গেছে। অনেক পুঁতি ছড়িয়ে আছে, রাংতা দিয়ে চুম্‌কি দিয়ে
সাজানো সব লাজুক হাসি-খেলা। এলো না সে, এলো না সে
ময়ূরঘরে তবু। নূপুরে তার অঝোরধারা বেদন বাজে। পাপ্‌ড়ি-লেখা
জলছবিরই নামটি মুছে উজলবতী ঘাটের কাছে ভাসিয়ে দিল বরণডালাখানি।

(—কথাকলি।)

এখানেও প্রকল্পনার স্বাক্ষর স্পষ্ট। শেষ-বেলার রোদ, ঝিনুকের হলুদ আভা তার গায়ে; তার যে-চোখের দৃষ্টিতে ছায়া হয় তরলিত, এখন তা ভীরুতায় ঘেরা; নরম মেঘের আড়াল থেকে সে এলো। হাতে নির্জন বরণডালা, যে বরণডালা নিয়ে সে স্বাগত জানায় মুখর প্রভাতকে। ময়ূরের অঙ্গরূপের মতো বিচিত্র রঙে রঞ্জিত এই আকাশ-মাটির মাঝের জগতে কাকলী-কলরবে ভরপুর দিন শেষ হয়েছে; গভীর রাতে ঘুমজড়ানো চোখে বধূ যে-চিঠি লেখে তার প্রবাসী প্রিয়তমকে, তার লেখা যেমন এলোমেলো, ছন্দহারা, নিয়মবিহীন, সৌন্দর্যহীন, দিনশেষে এ জগৎও সেরকম নয়ন-আকর্ষণের একান্তই অনুপযুক্ত,—সংযত নয়, শিথিল। পুঁতি-রাংতা-চুম্‌কির মতো সারা দিনের উজ্জ্বল অথচ অত্যল্প মূল্যের ঘটনাবলী ছড়িয়ে রয়েছে। শেষ বেলার রোদ এখন তাদের প্রতি উদাসীন। সুরহীন জগতে বেজে উঠেছে না-পাওয়ার অনন্ত বেদনার বাণী। নামহারা ছবি জানাতে পারে না শিল্পীর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিকে, রসবেত্তার কাছে তার আবেদন অনেকাংশে মৃদু। জগতের নানা দৃশ্যও এখন নামহারা ছবির মতোন। শেষ রোদ প্রভাতকে স্বাগত জানাবার বরণডালা ভাসিয়ে দিল। সন্ধ্যা নামল।

ওপরের কবিতাংশ দুটি প্রকল্পনার উদাহরণ। চিন্তার গভীর, মানসের বিস্তৃতি, স্থির প্রজ্ঞা, বোধের ঔজ্জ্বল্য, অনুভূতির প্রাণরঙ্গময়তার প্রকাশ এদের মাঝে লক্ষণীয়। এদের পাশাপাশি বিকল্পনার দৃষ্টান্তেরও প্রয়োজন আছে, কারণ কল্পনার উভয় রীতির পার্থক্য তাহ'লে স্পষ্টরূপ প্রতিভাত হবে।

তারপর ঘুমভাঙা তৃষ্ণাতুর চোখে
আঙুরলতার মতো এঁকে বেঁকে শুধু
পুতুলের নির্জন ঘরে এলো
কোনো এক পাহাড়ী হরিণ।
শিথিল ছন্দে আর আলোঝরা নিবিড় নেশায়
হিমেল মৃত্যুর ঘ্রাণ পেল।
মৃগয়া—জটিল প্রশ্ন—ভীরু দিন
কাঁপে শুধু পলাতক হরিণের শীতে
শবরের বল্লম বিঁধে গেল ধূসর মাটিতে।

(—সেতুবন্ধ।)

এখানে যে কাহিনীটি লিপিবদ্ধ হয়েছে তার অর্থ প্রাঞ্জল হবে এবং কবিতার শিরোনামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে তিনটি রূপকের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হ'লে। পুতুলের নির্জন ঘর, পাহাড়ী হরিণ, শবরের বল্লম—এই তিনটি রূপকের প্রকৃত রূপটিকে যদি প্রকাশ করা যায় তবে এই মৃগয়া-কাহিনীর অন্তরালবর্তী বাস্তবতাটুকু সহজেই পাওয়া যায়। প্রাগৈতিহাসিক নির্জন পৃথিবী হচ্ছে পুতুলের নির্জন ঘর; পাহাড়ী হরিণ হচ্ছে পর্বতসম্ভূতা নদী; আর শবরের বল্লম মানবনির্মিত সেতুবন্ধের ভাষান্তর। সুতরাং এর মাঝে বিকল্পনারই মূর্ত প্রকাশ, প্রকল্পনার সকল বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত।

সবুজ পাতার মৃদু হাওয়া এলো, পালক ছড়িয়ে
তমালের ডাল থেকে দুটো পাখি চলে গেল উড়ে।
নরম নরম হাতে হাল্কা রঙের ছবি নিয়ে
হয়তো ঘরোয়া মন মিশে গেছে বিভাস রোদ্দুরে।

(—একটি মন ঃ রূপলেখা।)

হাল্কা খুশিতে সীমিত নরম মন সকালবেলার রোদ্দরে হ'ল দিশেহারা। এটিও বিকল্পনার সার্থক দৃষ্টান্ত। সহজভাবে চিত্রিত হয়েছে একটি দৃশ্য ও একটি ঘটনা।

বিকল্পনা বাহিরকে দেখে, এবং বহিরঙ্গের স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও সবিশেষ বর্ণনাময় চিত্র উপস্থাপিত করে। প্রকল্পনা দেখে হৃদয়কে, অন্তর প্রকৃতিকে, এবং পরিচিন্তনে এনে দেয় মায়ামধুর অনুভূতি। প্রকল্পনা নিশ্চিতভাবে প্রকৃত

বিষয়ের অনুরূপতার অনুসারী। বিকল্পনা বৈশ্লেষণিক, অনিয়মিত ; বিষয়কে সে পূর্ণ রূপে গ্রহণ করে না, স্বীকার করে আংশিক সাদৃশ্যকে। সংবেদনের কারণ হচ্ছে বাইরের জিনিস সংবেদ-ইন্দ্রিয়কে আঘাত করে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে। এমন অনেক ভাব রয়েছে যা ইন্দ্রিয়কে চঞ্চল করে ভিন্নরূপে। আমাদের কাছে তাদের আবির্ভাবই হ'ল বিকল্পনা। সকল ক্ষেত্রেই সংবেদন মৌলিক বিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রতিরূপ থেকে প্রকৃতকে দর্শনের এবং সকল সংবেদনের কাছে তার আবেদন জ্ঞাপনের রীতির নাম প্রকল্পনা। প্রতিরূপ যে-সংবেদনকে জাগিয়ে তোলে তার পুলক একদিন যায় হারিয়ে, কিন্তু জীর্ণ হয় না, সঙ্কলিত হয় অবচেতন মনে তার রোমাঞ্চ। এখানেই প্রকাশের উৎস খুঁজে পায় প্রাকল্পনিক সৃজনীশক্তি। সুতরাং প্রকল্পনা ও স্মৃতি এক সত্তায় বিধৃত,—দুটি গভীর চিন্তা, দুটি পৃথক নাম। সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিসের মাঝে সাদৃশ্য আবিষ্কার করা প্রজ্ঞার প্রধান লক্ষ্য। আর প্রকল্পনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সদৃশ বা সম-অনুভূতিযুক্ত জিনিসের মাঝে অনুরূপতার উদ্ভাবন।

প্রকল্পনার আবেগ প্রজ্ঞা থেকে আসে না, আসে আনন্দ থেকে। আনন্দের সঙ্গে সৃজনের সম্পর্ক প্রগাঢ়। নিত্য-আনন্দময়তায় সৃষ্টি করেন কবি। এই আনন্দস্রোত কবির মানসের অন্তস্তলে অধীর আবেগে প্রবহমান—তীরভূমিকে যায় সবুজ ক'রে সজীব ক'রে প্রাণস্পন্দনে উচ্ছলিত ক'রে। কিন্তু আনন্দকে একাকী উপভোগ ক'রে কবিচিত্ত তৃপ্ত নয়, তাকে সঞ্চারিত কররার মাঝেই রয়েছে উপভোগের পরম সফলতা। তখন প্রকল্পনা আসে, সৃষ্টি করে নোতুন রূপ, নোতুন রস, নব নব চেতনা, মূর্ত হ'য়ে ওঠে কবি মন, কবি মনন। প্রজ্ঞা এই সৃজন উৎসে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, এর প্রভাবে বিভাব হয় রসহীন, কবিমানসের আনন্দস্রোত ব'য়ে চলে শীর্ণ রেখায়, ব্যাহত হয় স্বতঃস্ফূর্ত প্রকল্পনা। তবে কবিতায় প্রজ্ঞার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা যায় না। প্রজ্ঞা না থাকলে কবিতা শুধুই আবেগ-উচ্ছ্বাসের কারুশিল্পে পরিণত হবে। তাই কবিতায় প্রজ্ঞা থাকবে ; প্রকল্পনা থাকবে ; প্রজ্ঞা হবে গৌণ, প্রকল্পনা প্রধান।

প্রজ্ঞার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জ্ঞানের প্রতিভা ; কিন্তু শেক্সপীয়রের সময় থেকে প্রজ্ঞা বলতে বোঝায় উজ্জ্বল জ্ঞান, উদ্ভাবনী শক্তি, কাব্যিক সূক্ষ্মতা বা প্রকল্পনা। কাউলের সময়ে প্রজ্ঞা কবিতার মূলতত্ত্বের সমান হয়। বিশ্লেষণের দিক থেকে এর ব্যাখ্যা করা হয় অসম বস্তুর মধ্যে দুরূহ সাদৃশ্য সংঘটনের

নৈপুণ্যরূপে; কিন্তু কার্যতঃ এটি শাব্দিক উপায়ের দ্বারা এরকম সাদৃশ্যের প্রবর্তক। এই সঙ্গমে প্রভেদ উপলব্ধির ওপর ক্রমবর্ধমান দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব আরোপের জটিলতা দেখা দেয়, জিনিসের মাঝে সাদৃশ্য গঠনের ওপর কোনো জটিলতা উদ্ভূত হয় না। অর্থাৎ সংশ্লেষণের চেয়ে বিশ্লেষণের ওপরই অধিকতর দৃঢ়তা; এবং বিশ্লেষণের ক্ষমতা পরিগণিত হয় প্রজ্ঞা ও বিবেক থেকে পৃথক হিসেবে। রচনাকারী প্রজ্ঞা হচ্ছে লেখকের মাঝে প্রকল্পনার প্রতিভা। লিখিত প্রজ্ঞা চিন্তার সুন্দর পরিণতি, প্রকল্পনার সার্থক সৃজন। স্বাভাবিক প্রজ্ঞা প্রধানত দুটি জিনিসের মিলনে গ'ড়ে ওঠে—প্রকল্পনার দ্রুততা এবং কোনো স্বীকৃত পরিণতির দিকে অপরিবর্তনীয় প্রগতি। বিবেক ও বিকল্পনা নিয়ে রচিত হয় কবিতা, তবে বিকল্পনার মর্যাদা অপেক্ষাকৃত বেশি। ইতিহাসে বিবেকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, শুধু লেখনরীতিকে শোভন করবার জন্যে সেখানে বিকল্পনার প্রয়োজন। বক্তৃতায় বিকল্পনারই প্রাধান্য। সুতরাং বিকল্পনাহীন বিবেক হচ্ছে প্রজ্ঞা, কিন্তু বিবেকহীন বিকল্পনা কখনোই প্রজ্ঞা নয়।

কবির সচেতন মন থেকে যে-চিন্তানুভূতি বেরিয়ে আসে তা বিকল্পনা, আর অবচেতন মানসের অতলান্ত ব্যপ্তি থেকে যে-গভীর উপলব্ধি আসে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে তা প্রকল্পনা। করিমন পৃথিবী থেকে, চারিপাশের জগৎ থেকে, দৈনিক জীবন থেকে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ আনন্দ আহরণ করে; বিকল্পনা তাদের প্রকাশ করে সাধারণভাবে সামান্য পরিবর্তিত রূপে, প্রকল্পনা তাদের সুন্দর করে নন্দনবোধের শোধনাগারে, তারপর সেই সৌন্দর্যের আলোকণা নিয়ে সৃষ্টি করে এক অপরূপ রূপলাবণ্য, রসচেতনা। এরই স্ফুরণ ছত্রে-ছত্রে, যমকে-যমকে, ছন্দে-ছন্দে বাণী-সৌকর্যের নীরব নিবিড়তায়। অর্থাৎ বিকল্পনার কাজ হচ্ছে বাস্তবের সার্থক প্রকাশ, প্রকল্পনার বৈশিষ্ট্য নিপুণ সৃজনীপ্রতিভা, বাস্তবের উপাদানে নোতুন প্রতিমার কারুশিল্প। প্রকল্পনায় রয়েছে ভাবগৌরব, দূরপ্রসারী চিন্তনের গভীরতা, বিকল্পনার সঙ্গে জড়িত লঘু ভাব, সীমিত চিন্তনের সংস্কৃতি।

প্রাচীন প্রাচ্যে ইতিহাস চর্চা

হারাণচন্দ্র নিয়োগী

মানব সমাজের ক্রমবিকাশের কাহিনীকে পণ্ডিতেরা 'ইতিহাস' আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে মানব-জাতির অগ্রগতির সকল ঘটনাই ইতিহাস পদবাচ্য হয় নাই। কেবলমাত্র সেই ঘটনাগুলিকেই ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে যাহা সমকালীন সামাজিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইয়াছে। সাধারণতঃ জাতি বা মানবগোষ্ঠির গৌরবজনক ঘটনাকে 'ইতিহাস' আখ্যা দিয়া স্মরণীয় করা হইয়াছে।

ইতিহাস সংকলন ও চর্চা মানুষ অতি প্রাচীনকাল হইতেই সুরু করে, অবসর বিনোদনের উপায় হিসাবে নহে—সামাজিক প্রয়োজনে। প্রাচীনকালে প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তির হাতে মানুষ নিজেকে নিঃসহায় বোধ করিত। তাই এই অজ্ঞাত শক্তিকে বশে আনিবার চেষ্টার অন্ত ছিল না। তন্ত্রমন্ত্র বা যাদু-প্রক্রিয়ার দ্বারা এই শক্তিকে বশ করা বা তাহার অনুগ্রহ লাভ করা যায় বলিয়া মানুষের বিশ্বাস ছিল। গোষ্ঠীর প্রাচীন গৌরব-কথা বা ইতিহাস ছিল এইসব অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বংশপরম্পরায় স্মরণ করিয়া রাখা ইতিহাস এইসব অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করিয়া মানুষ প্রেরণা পাইত এবং দেব-অনুগ্রহে অতীত-গৌরবের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে বলিয়া বিশ্বাস করিত। এইভাবে জীবনের তাগিদেই প্রথম ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত হয়।

লিপি আবিষ্কারের পূর্বে এই সকল ইতিকথা বংশপরম্পরায় কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা হইত। নিউজিল্যাণ্ডের সারোই জাতি এমনি করিয়াই মুখে মুখে তাহাদের বংশতালিকা ও পূর্বপুরুষের কীর্তিকথা স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে। প্রাচীন প্যালেষ্টাইনে ইহুদিরা একইভাবে তাহাদের ইতিহাস কাব্যের আকারে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিত। পরে অনেক পরিবর্তন পরিবর্ধনের পর উহা Old Testament-এর আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রাচীন গ্রীসের মহাকবি হোমার গ্রীক-জাতির গৌরব-কথা 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' নামক কাব্যে গ্রথিত করিয়া অমর করেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বেদেরও পূর্বে ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত হয় এবং ব্যাসদেবের শিষ্য প্রশিষ্যেরা বংশানুক্রমিকভাবে কাব্যের আকারে তাহা

মুখস্থ করিয়া রাখেন। পরবর্তী কালে ঐ সকল উপাদান পুরাণ ও মহাভারত-রামায়ণের আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়।

কিছুকাল পূর্বেও ধারণা ছিল যে বাইবেলের কাহিনী ও ভারতীয় প্রাচীনতম ইতিবৃত্ত অলীক কল্পনা মাত্র। কিন্তু পণ্ডিতদের নিরলস গবেষণার ফলে এই ধারণা আজ যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্ধিত হইয়াছে। প্যালেষ্টাইনে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে বাইবেলে উল্লিখিত অনেক বিষয় প্রমাণিত হইয়াছে। বাইবেলোক্ত অনেক স্থান ও বিশেষ ব্যক্তিকে অবিসংবাদিতরূপে নির্দেশ করা গিয়াছে। প্রাচীন ট্রয় নগরী ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া হোমারের কাব্যের ঐতিহাসিকতা নিরূপিত হইয়াছে। লিপি ও প্রাচীন মুদ্রার সাহায্যে পুরাণে উল্লিখিত যবন, শক-পহ্লব-কুশান, গুপ্ত ও অন্ধ্ররাজাদের বিস্তৃত ইতিহাস জানা গিয়াছে। কৌশাম্বীতে খননকার্যের ফলে ৭০০ খৃঃ পূঃ অব্দের যে প্রাসাদ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাকে পুরাণোক্ত বৎসরাজ উদয়নের প্রাসাদ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায় যে প্রাচীন প্রাচ্যে যে সকল পুরাবৃত্ত লোকপরম্পরায় আমাদের হাতে আসিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অমূলক নহে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য ও গবেষণা আরও অনেক পৌরাণিক কাহিনীকে ইতিহাসের মর্যাদা দিবে—এরূপ ধারণা অসঙ্গত নহে।

মানুষ যখন লিখিতে শিখিল, তখন হইতে তাহারা এই সকল ইতিকথা মাটি বা কাষ্ঠের ফলকে উৎকীর্ণ করিয়া মঠে বা মন্দিরে জমা করিতে লাগিল। প্রাচীন মিশরে ও মেসোপটামিয়ায় এরূপ লিপি প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। মন্দিরে রক্ষিত হইতে দেখিয়া অনুমান হয় যে এই সকলইতিবৃত্তকে ধর্মপুস্তকের মর্যাদা দেওয়া হইত। ভারতবর্ষেও 'ইতিহাস-পুরাণ'কে বেদের সম্মান দেওয়া হইয়াছে এবং ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্বর্গ লাভের হেতু বলা হইয়াছে। বাইবেলের বহু কাহিনীই যীশুখৃষ্টের জন্মের বহু পূর্বের—তবু তাহারা ধর্মপুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

প্রাচীন সুমেরীয় ও মিশরীয় লিপিগুলি হইতে প্রাচীন রাজবংশাবলী ও তাহাদের কার্যাবলী অবগত হওয়া যায়। রাজাদের লিখিত কার্যাবলীকে দুটি ভাগে ভাগে করা যায়—(১) তাহাদের পুণ্যকর্ম, দান, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি (২) যুদ্ধবিগ্রহ। ঠিক একই পদ্ধতিতে Old Testamentএ বর্ণিত রাজকাহিনীতে রাজারা বীরত্বকথার সহিত তাহার পুণ্যকর্মের বিবরণ লিপিবদ্ধ দেখা যায়। ভারতীয় ইতিহাস সংরক্ষণ পদ্ধতিতেও এই দুটি ভাগ খুবই স্পষ্ট। ঋক বেদে

'দানস্তুতি'র পাশাপাশি রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণও স্থান পাইয়াছে। মহাভারত পাঠেও জানা যায় যে যজ্ঞাদি কর্মে ব্রাহ্মণসুতের রাজার পুণ্যকর্মের ও ক্ষত্রিয়সুতেরা তাঁহার বীরত্বকথা গান করিতেন। পরবর্তী কালেও ভারতবর্ষে ইতিহাসের এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

প্রায় ২০০০ খৃঃ পূঃ অব্দে কোন এক অজ্ঞাত সুমেরীয় লিপিকার আরও বিস্তৃত ভাবে ঐতিহাসিক দলিল প্রস্তুত করেন। তিনি তৎকালীন ধারণা অনুযায়ী পৃথিবীর ইতিহাসের পটভূমিকায় সুমেরীয় ইতিহাস রচনার প্রয়াস করেন। তাঁহার উৎকীর্ণ ইতিবৃত্তের লিপিতে এই কয়টি বিভাগ দেখা যায়—

(১) সৃষ্টির কাহিনী।

(২) মন্বন্তর বা প্লাবনের পূর্ববর্তী দুইটি রাজবংশের বৃত্তান্ত।

(৩) মন্বন্তরের বর্ণনা।

(৪) প্লাবনের পরবর্তী রাজবংশের কথা।

ইহাতে রাজাদের বংশানুক্রমিক নাম, রাজত্বকাল ও সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ আছে। অনেক ক্ষেত্রে রাজবংশ দেবতা হইতে উদ্ভূত বলিয়া বলা হইয়াছে।

প্রায় ১৫০০ খৃঃ পূঃ অব্দে এসিয়া মাইনরে হাইটিট্ নামে এক পরাক্রান্ত জাতি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তাহাদের রাজারা শাসন কালের ঘটনা কালকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। তাহাদের জাতীয় উপকথা ও লোকশ্রুতিও একই ভাবে সযত্নে রক্ষিত হইত। লিপির প্রথমেই থাকিত পূর্বপুরুষের নামের তালিকা এবং প্রথম পুরুষে কথিত রাজার বক্তব্য—"মহারাজ রাজা অমুক, হাত্তির অধিপতি মহাবীর, হাত্তির অধিপতি মহাবীর মহারাজ অমুকের পুত্র, এরূপ বলিতেছেন"। লিপি-লিখনের এই পদ্ধতি পারস্যের রাজারা অনুসরণ করেন। প্রথম পুরুষে রাজ-আদেশ প্রচারের রীতি অশোকের লিপিতে লক্ষ্য করা যায়। ভারতের গুপ্তরাজারা ঐ পদ্ধতিতেই লিপিতে পূর্ব-পুরুষের নাম উল্লেখ করিতেন।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সংকলনের যে পদ্ধতি পুরাণাদি গ্রন্থ হইতে জানা যায় তাহার সহিত উল্লিখিত প্রাচীন মধ্য-প্রাচ্যের ইতিহাস রচনা পদ্ধতির আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে সিন্ধু সভ্যতার যুগ হইতে ভারতবর্ষ ও মধ্য-প্রাচ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগ বর্তমান ছিল। এই দুই অঞ্চলের ইতিহাস সংরক্ষণ পদ্ধতি তুলনা করিলে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ সামঞ্জস্য দেখা যায়—

(১) সৃষ্টির কাহিনী উভয় অঞ্চলেই ইতিহাসে স্থান পাইয়াছ।

(২) পৌরাণিক রাজবংশাবলী।

(৩) ঐতিহাসিক রাজ কাহিনী ও বংশাবলী।

(৪) রাজ-কাহিনীর দু'টি বিভাগ—রাজনৈতিক ও ধর্মবিষয়ক।

(৫) মন্বন্তরের কথা—বাইবেল ও সুমেরীয় লিপির প্লাবনের কথা শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লেখ দেখা যায়। পুরাণে এক একটি যুগের অবসানে মন্বন্তরের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(৬) দেবতা হইতে রাজ বংশের উদ্ভব—এ ধারণাও দুই দেশে একই।

(৭) দৈব-কার্যের সহিত ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রাচ্যের সমস্ত দেশ জুড়িয়া মোটামুটি একই রীতিতে, একই উদ্দেশ্যে ইতিহাস চর্চা করা হইত।

কেবলমাত্র ইতিহাস চর্চাই নহে, সেই যুগেও প্রাচ্যের জ্ঞানীগুণীরা পুরাতত্ত্ব আলোচনায় বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেন। মিশরে প্রায় ২৫০০ খৃঃ পূঃ অব্দে রচিত ৫০০ বৎসর পর হুবহু কপি করাইয়া সংরক্ষিত করা হইয়াছে দেখা যায়। ৮০০ খৃঃ পূঃ অব্দের আসিরিয়ার রাজারা হম্মুরাবীর আমল হইতে সুরু করিয়া প্রাচীন লিপি কপি করিয়া মিউজিয়াম বা লাইব্রেরী সাজাইতেন। এই সকল প্রাচীন লিপি লইয়া যে তৎকালীন পুরাতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা গবেষণা চালাইতেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় মিশর হইতে। প্রাচীন মিশরের গণিতের ফলক-পুস্তকের জনৈক প্রকাশক অত্যন্ত প্রাচীনকালে লিখিত বলিয়া তাঁহার পুস্তকের বিজ্ঞাপন দিয়াছেন দেখা যায়। আর একখানি পুস্তকে লিখিত আছে—"এখানি রাজা উস্‌ফেইসের আমলের রোগ-আরোগ্য-বিষয়ক পুস্তক যাহা প্রাচীন পুঁথি-পত্রের সহিত একটি বাক্সে অনুবিসের পাদদেশে পাওয়া গিয়াছে।"

খুব সম্ভবতঃ ইতিহাস বিদ্যায় পারদর্শী প্রাচ্যবাসীদের নিকট হইতে গ্রীকেরা অন্যান্য অনেক বিদ্যার মত ইতিহাস বিদ্যাও শিক্ষা করে। গ্রীক ঐতিহাসিক হোমার ও হেরোডোটাস দু'জনাই ছিলেন এসিয়াবাসী। দেলোফোনও তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি এসিয়ায় অতিবাহিত করেন। সুতরাং প্রাচ্যের ইতিহাস প্রণালী তাঁহাদিগকে প্রভাবিত করিয়া থাকিবে। এই অনুমান আরও দৃঢ় হয় যখন দেখি যে, হোমার ও হেরোডোটাস দু'জনেই ইতিহাস লিখিয়াছিলেন প্রাচ্য পদ্ধতিতে আবৃত্তির জন্য।

সাধু ভাষার প্রসঙ্গে

অনিমেষ পাল

'বাংলা ভাষা পরিচয়ের' আলোচ্য বিষয়বস্তুর পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—".....এই বইয়ে যে ভাষার রূপ আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি, তাকে বলে বাংলার চলিত ভাষা। আমি তাকে বলি প্রাকৃত বাংলা। সংস্কৃতের যুগে যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত প্রচলিত ছিল তেমনি প্রাকৃত বাংলারও নানারূপ আছে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অংশে, এদেরই মধ্যে একটা বিশেষ প্রাকৃত চলেছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে। এই প্রাকৃতেরই স্বভাব বিচার করেছি এই বইয়ে।" এই প্রসঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে তিনি যে রায় দিয়েছেন, ভাষা বিজ্ঞানের সাক্ষ্যের জোরে তার পুনর্বিচারের দাবী জানানোই এ আলোচনার উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "রূপকথায় বলে, এক যে ছিল রাজা, তার দুই ছিল রাণী, সুয়োরাণী আর দুয়োরাণী। তেমনি বাংলা বাক্যাধীপেরও আছে দুই রাণী—একটাকে আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে সাধু ভাষা; আর একটাকে কথ্যভাষা, কেউ বলে চল্‌তি ভাষা, আমার কোনো কোনো লেখায় আমি বলেছি প্রাকৃত বাংলা। সাধুভাষা মাজাঘষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা। চলতি ভাষার আটপৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা। অলংকারের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর কালিদাসের একটা লাইন তুলে দিলে তার জবাব হবে; কবি বলেন; কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্। যার মাধুর্য্য আছে সে যা পরে তাতেই তার শোভা। রূপকথায় শুনেছি সুয়োরাণী ঠাঁই দেয় দুয়োরাণীকে গোয়াল ঘরে। কিন্তু গল্পের পরিণামের দিকে দেখি সুয়োরাণী যায় নির্ব্বাসনে, টিকে থাকে একলা দুয়োরাণী রাণীর পদে। বাংলায় চলতিভাষা বহুকাল ধরে জায়গা পেয়েছে সাধারণ মাটির ঘরে, হেঁসেলের সঙ্গে, গোয়ালের ধারে, গোবর-নিকানো আঙিনার পাশে যেখানে সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপ জ্বালানো হয় তুলসীতলায় আর বোষ্টমী এসে নাম শুনিয়ে

যায় ভোর বেলাতে। গল্পের শেষ অংশটা এখনো সম্পূর্ণ আসে নি, কিন্তু আমার বিশ্বাস সুয়োরাণী নেবেন বিদায় আর একলা দুয়োরাণী বসবেন রাজাসনে।

"চলতি ভাষার চলার বিরাম নেই তার চলবার শক্তি আড়ষ্ট হবার সময় পায় না।" (বাংলা ভাষা পরিচয়, রঃ রঃ ২৬ খণ্ড, ৩৯৩ পৃঃ)

কিন্তু বাংলা ভাষার এই দ্বৈতরূপ মেনে নেওয়ায় একটা অনর্থ ঘটে যাচ্ছে বহুদিন ধরে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এতকাল আমাদের যে বাঙালী বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে আমরা বাংলা বলে থাকি।" (৩৯১ পৃঃ) অর্থাৎ বাঙালী জাতির সবচেয়ে বড় পরিচয় তারা বাংলাভাষাভাষী। চট্টগ্রামের লোকও বাঙ্গালী আবার জলপাইগুড়ির লোকও বাঙ্গালী, বাঁকুড়ার অধিবাসীরাও তাই। আর ঢাকা বরিশাল কিংবা সিলেট মৈমনসিংহের লোকেদের তো কথাই নেই। এঁদের সকলের মুখের ভাষাই বাংলা ভাষা। কিন্তু এই বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণের ব্যবহৃত যে বাংলা ভাষা তার রূপ কি এক? ভাষাতাত্ত্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত না করেও এ বিচার সহজেই সমাধা করা যাবে যদি কাঁথি অঞ্চলের কোন চাষী গৃহস্থকে চট্টগ্রামের কোন চাষী গৃহস্থের সঙ্গে এক টেবিলে বসিয়ে দেওয়া যায়। উভয়ের বাক্যালাপ প্রায় অসম্ভব। কারণ একজনের কথ্যভাষা অপর জনের কাছে প্রায় দুর্বোধ্য। তার উপর stress এবং pitchএর কথা না হয় বাদই দিলাম। যদি এঁরা নিরক্ষর না হন এবং যদি এঁদের অবসর সময়ে বাড়িতে রামায়ণ মহাভারতও পড়ার রেওয়াজ থাকে তাহলে অবশ্য কথাবার্তা চালিয়ে যেতে কোন বাধা থাকবেনা। যদিও কথার তোড় মাঝে মাঝে বাধাপ্রাপ্ত হবে; কথা চলতে চলতে হোঁচট খেয়ে থেমে পড়বে। যে ভাষায় পরস্পরের ভাববিনিময় হওয়া সম্ভব সে হল ঐ বইয়ের ভাষা। কিন্তু কোন অত্যাধুনিক বইয়ের নয়। ঐ রামায়ণ মহাভারতের ভাষা। অবশ্য উচ্চারণে তবু থাকবে প্রচুর পার্থক্য। এঁদের দুজনের ভাষাই যদি বাংলা হয় তাহলে এও ধরে নিতে হয় যে বাংলা ভাষার রূপ অন্ততঃ দুরকম।

অর্থাৎ বাংলা ভাষার রূপ কটি এই যদি প্রশ্ন হয় তবে তার উত্তরে কেউ যদি বলেন বাংলা ভাষার রূপ দুটি—যথা সাধু ও চল্‌তি, তাহলে উত্তরটি হবে অসম্পূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক, অতএব ভুল। বাংলা ভাষার রূপ কটি এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় সবকটি আঞ্চলিক রূপের কথা মনে রাখতে হবে। প্রসঙ্গত স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে—রাঢ়ী, বরেন্দ্রী, বাঙ্গালী, কামরূপী, ঝাড়খণ্ডী বলে বাংলা

ভাষায় যে পাঁচটি আঞ্চলিক রূপ ভাষাতাত্ত্বিকের স্বীকৃতি পেয়েছে এই পাঁচটি রূপের একটিকেও যথার্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এখনো যাচাই করা হয়ে ওঠে নি। অতএব সবকটি আঞ্চলিক রূপের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার আগে বাংলা ভাষার রূপ কটি সে সম্বন্ধে কোন সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আচার্য্য সুনীতিকুমার বাংলা ভাষার চারটি আঞ্চলিক রূপকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। যথা—রাঢ়ী, বরেন্দ্রী, কামরূপী এবং বঙ্গালী। রাঢ়ীকে দক্ষিণ-পশ্চিমা আর আসলরাঢ়ী এই দুই ভাগে এবং বঙ্গালীকে—পশ্চিমা ও দক্ষিণ-পশ্চিমা আর পূর্ব্বী ও দক্ষিণ-পূর্ব্বী এই দুই ভাগে বিভক্ত করে দেখানো হয়েছিল তাঁর Origin and Development of Bengal Language পুস্তকে। কামরূপীতেও দুইটি ভাগ, যথা—পূর্ব্বী ও পশ্চিমা। এই শ্রেণী বিভাগ থেকে বাংলা ভাষার আঞ্চলিক রূপগুলি সম্বন্ধে কোন ধারণা গড়ে তুলতে গেলে ভুল হবে প্রতি পদে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক বঙ্গালী উপভাষার পশ্চিমা ও দক্ষিণ পশ্চিমা অংশটির কথা। এই অংশটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মৈমনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, উত্তর-পূর্ব্ব নদীয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল, সন্দীপ, উত্তর পশ্চিম সিলেটের আঞ্চলিক কথ্যভাষাগুলিকে। ধ্বনি, শ্বাসাঘাত, সুর বা pitch, বিশেষ্য, ক্রিয়া, সর্বনাম, কারক, বিভক্তি, প্রকাশভঙ্গী ইত্যাদির যে কোন একটি বিষয় নিয়ে এই সব কথ্যভাষাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে মৈমনসিংহ আর ঢাকার কথ্যভাষায় পার্থক্য যত বেশী, সাদৃশ্য তত কম। অথবা ধরা যাক, উত্তর পূর্ব্ব নদীয়া আর উত্তর পশ্চিম সিলেটের কথা। এই দুই অঞ্চলের কথ্যভাষাকে কি করে যে একই অংশের অন্তর্ভুক্ত করা গেল, তা ভাবতে অবাক লাগে।

যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন চলতি ভাষা বা প্রাকৃত বাংলা এবং যাকে সাহিত্যের বাহন করবার জন্য জোর আন্দোলন চালিয়ে ছিলেন সবুজপত্রের পাতায় প্রমথ চৌধুরী মশাই তাকে ভাষাতাত্ত্বিক নাম দিয়েছেন Standard Colloquial। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখবার মত। প্রাকৃতজনের কথ্যভাষার অনেকগুলি রূপ বাংলা দেশে প্রচলিত। তার মধ্যে একটি ভাগীরথীর পূর্ব ও পশ্চিম তীরে প্রচলিত পূর্ব্বী রাঢ়ী কথ্যভাষা। কলকাতা, ২৪ পরগণা, হুগলী, হওড়ার ভদ্রজনের মুখের ভাষা কালগুণে ইংরেজ রাজত্বের থেকেই Standard হয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকেই একে সাহিত্যরচনার একমাত্র বাহন করতে উদ্যোগী ছিলেন। "বাংলা বাক্যাধীপের এই দুয়োরাণী", রবীন্দ্রনাথ

যেমন আশা করেছিলেন বর্ত্তমানে তেমনি একচ্ছত্র ভাবেই রাণীর আসন দখল করে ফেলেছে। এটা ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে সে প্রশ্ন আপাততঃ আলোচ্য নয়। যে কথা বিশেষ ভাবে বলবার তা হলো—সেই অতি উৎসাহে বাদবাকী আঞ্চলিক রূপগুলিকে আমরা আজো অবহেলা করে চলেছি। ফলে বাংলা ভাষার সম্পূর্ণ রূপটি আজো ধরা পড়ে নি। একটি Standard Colloquial ছাড়া আর কোন কথ্যরূপ সম্বন্ধে আমাদের সঠিক কোন ধারণা নেই। ফলে আজো পর্য্যন্ত বাংলা ব্যাকরণ অসম্পূর্ণ, একটা নিছক জোড়াতালি ব্যাপার। যে কোন বিদেশীর পক্ষে বাংলা ভাষার কথ্যরূপ আয়ত্ত করা প্রায় অসম্ভব।

তার পর সাধু ভাষার কথাটিও বিবেচনা করে দেখবার মত। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, "সাধুভাষা মাজাঘষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা," কিংবা "ও ভাষাটাই বানানো"—তেমনি ভাবে কথাটা মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কারণ সাধুভাষা সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা কিংবা বানিয়ে তোলা যে নয় তার প্রমাণ বহু। সাধুভাষার উৎপত্তির ইতিহাস বিবেচনা করে দেখলেই তা আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে। আচার্য্য সুনীতিকুমারের সাক্ষ্যই প্রথম উপস্থিত করা যাক!

"The speech of the upper classes in the western part of the Delta and in Eastern Radha gave the literary language to Bengal, and now the educated colloquial of this tract, especially of the cities of Nadia and Calcutta has become the standard one for Bengali....." (O.D.B.L. : Part I : Page 139)

এই সাক্ষ্য যদি গ্রহণ করা যায় তবে অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে সাধুভাষাও আসলে চলিত ভাষাই, অর্থাৎ এটিও বাংলা দেশের প্রাকৃত জনের কথ্য ভাষারই একটি রূপ, অতএব বানিয়ে তোলা নয়। বানিয়ে তোলা ভাষার উদাহরণ অন্যত্র খুঁজতে হবে এবং বর্ত্তমানে তা সম্ভবতঃ হাতের কাছেই পাওয়া যাবে। যাকে ইদানীং শুদ্ধ হিন্দী বলে রাষ্ট্রভাষা রূপে চালানোর জোর চেষ্টা চলছে তার সঙ্গে বাংলা ভাষার সাধুরূপটির তুলনা করলে অতি সহজেই পার্থক্যটা বোঝা যাবে। প্রসঙ্গত আরো একটি বিষয় পরিষ্কার করে নিতে হবে। উদ্ধৃত সাক্ষ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সাধু ভাষার বনিয়াদ যে অঞ্চলের কথ্যভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত

তথাকথিত চলতি ভাষাও সেই একই অঞ্চলের। দুইয়ের পার্থক্য শুধু বয়সের, (সাধুভাষা—"rather archaic" O. D. B. L.) কিন্তু এই সব নয়। এ সম্বন্ধে আরো সাক্ষ্য প্রয়োজন। আচার্য সুনীতিকুমার এই প্রসঙ্গে চূড়ান্ত রায় যা দিয়েছেন তা হলো ঃ

"The literary language has all the pan-Bengali characteristics, but some times leans to one dialect and sometimes to another, although its basis is 'Gaudiya' or typical west central Bengali. It is eminently representative" (O. D. B. L. পৃঃ ১৪১),

তাহলে শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াচ্ছে এই যে সাধুভাষা আর চলতিভাষার আঞ্চলিক বনিয়াদ এক হলেও সাধুভাষার তদুপরি আছে বহু সর্ব্ববঙ্গীয় বৈশিষ্ট্য এবং এ ছাড়াও সাধুভাষা আরো একাধিক আঞ্চলিক কথ্যরূপকে স্বীকৃতি জানিয়েছে। তাই এই সাধুভাষা বাংলাদেশের সকল আঞ্চলিক কথ্যরূপেরই যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম।

একটি মাত্র অঞ্চলের কথ্যভাষা পৃথিবীর বহুদেশেই কালগুণে Standard Colloquial হয়ে দাঁড়ায়। ভাগীরথী তীরবর্ত্তী অঞ্চলের কথ্যভাষা যে বাংলা দেশের Standard Colloquial-এর মর্যাদা পাচ্ছে এতে আপত্তিকর কিছুই নেই। কিন্তু বাংলাভাষাভাষী বলে যাদের চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের বিভিন্ন অংশের কথ্যভাষার মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান তা কালক্রমে কমে আসবার কোন লক্ষণ খুব স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না। এমন কি দেশ বিভাগ এবং পূর্ব্ব বাংলার বিভিন্ন জেলার প্রায় এককোটি লোক ছিন্নমূল হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব্ববঙ্গীয় আঞ্চলিক কথ্যভাষাগুলির মূল খুব শিথিল হয়েছে বলে মনে হয় না। সেই অবস্থায় সাহিত্যের ভাষা যদি অঞ্চল বিশেষের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা পড়ে তবে গোটা দেশের মনটি তাতে কোনদিনই পুরাপুরি ধরা পড়বে না। সব থেকে বড় কথা এই যে বাদবাকী আঞ্চলিক রূপগুলিকে অবহেলা করে Standard Colloquial-কেই যে সাহিত্যের দরবারে সর্ব্বেসর্ব্বা করে তোলা হচ্ছে এতো আমাদের সাহিত্যের পক্ষেও ক্ষতিকর। বিভিন্ন আঞ্চলিক কথ্যভাষার যে বিপুল সম্পদ এতদিন ধরে অনাদরে, অবহেলায় তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভস্মে আচ্ছাদিত হয়ে রয়েছে তাকে যত্ন করে তুলে না আনলে পরে আক্ষেপ করতে হবে। ইতিমধ্যেই দেরী হয়ে গেছে অনেক।

অবশ্য একাজ সহজসাধ্য নয় এবং খুব তাড়াতাড়ি তা যে সুসম্পন্ন করা যাবে এমনও নয়। তারাশঙ্কর এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু ঔপন্যাসিক এ বিষয়ে আমাদের ধন্যবাদার্হ। তাঁদের সাহিত্যকর্ম্মে যেমন তাঁরা মর্য্যাদা দিয়েছে সাধারণ মানুষকে, তেমনি মর্য্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন তাদের মুখের ভাষাকে। সমস্যাটা তবু রয়েই যাচ্ছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক কথ্যরূপগুলির পরস্পরের কাছাকাছি হওয়া অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব বলে মনে না হওয়ার কারণ কি? আচার্য্য সুনীতিকুমার এর অতিস্পষ্ট জবাব দিয়েছেন :

"The difference in pronunciation and stress, as well as in general enunciation and grammar which are observable in the Bengali of a Manbhum peasant, and in that of one from Maimansing are certainly connected with the fact that one is mainly Kol (or mixed Kol and Dravidian) and the other modified Bodo (Tibeto-Burman) by origin." কিন্তু মুস্কিল তো শুধু উচ্চারণ আর শ্বাসাঘাত আর ব্যাকরণ নিয়ে নয়। একটি কথ্যরূপের শব্দভাণ্ডারের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অপর কোন কথ্যরূপের শব্দভাণ্ডারের সঙ্গে কিছুতেই মিলছে না। দুই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দুটি শব্দ একই বস্তুকে চিহ্নিত করে। বিশেষ করে ঘর গেরস্থালীর শব্দেই এটি লক্ষ্য করেছি। উদাহরণ—Standard Colloquial-এ যাকে বলে "ঝাঁটা" ঢাকাই উপভাষায় তা হলো "পিছা"। উনুন (S. C.)—পাহাল (ঢাঃ উঃ)। এ ধরণের শব্দের তালিকা হাজারেরও বেশী হয়ে যাবে অনায়াসে। আর সবকটি আঞ্চলিক রূপের বৈজ্ঞানিক আলোচনা সুসম্পূর্ণ হলে এই তালিকা বাঙ্গালীকে খুব সহজেই দেখিয়ে দেবে বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান কত সীমাবদ্ধ।

যাই হোক, সমস্যা আছে বোঝা যাচ্ছে। সমাধানের উপায়? উপায় এখুনি খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। তবে Standaad Colloquail-কেই সর্ব্বরকমে একেশ্বরী করে তুললে সমাধানের আশা সুদূরপরাহত, এটা বুঝতে পারা যাচ্ছে। অতএব সুবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হবে যদি ঐ সাধুভাষাকে সাত তাড়াতাড়িতে নির্ব্বাসন না দেওয়া হয়। ঐ সাধুভাষা দিয়েই যে কাজ চলবে এমন কথা বলি না। তার বয়স হয়েছে, কিছু কিছু জীর্ণতা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। কিছু তার অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। কিন্তু ভুললে চলবে না একমাত্র

এই সাধুভাষাই "eminently representative" তাছাড়া এর আছে "all the pan-Bengali characteristics।"

কিন্তু হাতের কাছে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত রায় রয়ে গেছে। এক কথায় তাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। —"তর্ক ওঠে, বাংলা দেশে কোন প্রদেশের ভাষাকে সাহিত্যিক কথ্যভাষা বলে মেনে নেব। উত্তর এই যে, কোনো বিশেষ কারণে বিশেষ প্রদেশের ভাষা স্বতই সর্বজনীনতার মর্যাদা পায়। যে সকল সৌভাগ্যবান দেশে কোনো একমাত্র ভাষা বিনা তর্কে সর্বদেশের বাণীরূপে স্বীকৃত হয়েছে, সেখানেও নানা প্রাদেশিক উপভাষা আছে। বিশেষ কারণে টস্‌কানি প্রদেশের উপভাষা সমস্ত ইটালীর একভাষা বলে গণ্য হয়েছে। তেমনি কলকাতা শহরের নিকটবর্তী চারদিকের ভাষা স্বভাবতই বাংলাদেশের সকল দেশী ভাষা বলে গণ্য হয়েছে। এই একভাষার সর্বজনীনতা এবং বাংলাদেশের কল্যাণের বিষয় বলেই মনে করা উচিত।.....যাহোক যে দক্ষিণী বাংলা লোকমুখে এবং সাহিত্যে চলে যাচ্ছে তাকেই আমরা বাংলা ভাষা বলে গণ্য করব। এবং আশা করব, সাধুভাষা তাকেই আসন ছেড়ে দিয়ে ঐতিহাসিক কবরস্থানে বিশ্রাম লাভ করবে।"

কিন্তু মুস্কিল হল, একেবারে গোড়ায়। উপভাষাগুলির পরস্পরের সঙ্গে পার্থক্য অনেক বেশী। এই পার্থক্যগুলি ক্রমশঃ কমে আসবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সে রকম কোন সচেতন প্রচেষ্টা নেই। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হলো এই উপভাষাগুলি যাঁরা আসলে ব্যবহার করে বাঁচিয়ে রেখেছেন সেই কৃষকশ্রেণী, গ্রামবাংলার গরীব মানুষেরা শিক্ষা এবং সাহিত্যের গণ্ডীর একেবারে বাইরে অবস্থান করছেন। আবার ভাগীরথী-তীরবর্তী অঞ্চলের ভাষা Standard হয়ে উঠলেও একমাত্র তাকেই বাংলা বলে গণ্য করতে হবে এটা নিছক জোর জবরদস্তী। গ্রামবাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখের ভাষার কি কোন মূল্যই নেই? Standard Colloquialই সাধারণতঃ সাহিত্যের ভাষা হয়ে ওঠে, এতে দোষের কিছুই নেই। কিন্তু বাংলাদেশের যে Standard Colloquial কেবল তাতেই বাঙ্গালীর জাতীয় মানসের স্ফূর্তি ঘটা কি সম্ভব? বাঙ্গালীর সাহিত্য-সৃষ্টির বাহন হওয়ার পক্ষে তা কি যথেষ্ট শক্তিমান? এক শব্দভাণ্ডারের প্রশ্ন তুললেই ব্যাপারটার ফয়সালা হয়ে যাবে। সংস্কৃত ফার্সী, ইংরাজী, পর্তুগীজ থেকে ধার করেও Standard Colloquial গরীবই রয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ

বলেছেন, "বাংলা ভাষার একটা বিশেষত্ব এই যে, সর্বনামে লিঙ্গভেদ নেই।" (বঃ ভাঃ পঃ, পৃঃ ৪৩১)। অর্থাৎ বাংলায় it আছে he আছে কিন্তু she বোঝাবার জন্য কোন শব্দ নেই। ঢাকা অঞ্চলের কোন কোন উপভাষায় কিন্তু she বোঝাবার জন্যে 'তাই' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অবশ্য প্রয়োগটি খুব শিষ্ট নয়। মোদ্দাকথা Standard Colloquialএর সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে এইমাত্র যে অভিযোগগুলি পেশ করা গেল যে কোন আঞ্চলিক কথ্যরূপ সম্বন্ধে সেই অভিযোগগুলিই আরো বেশী করে প্রযুক্ত হতে পারে। অতএব সাধুভাষাকে তাড়াহুড়ো করে ঐতিহাসিক কবরস্থানে বিশ্রাম করতে পাঠালে সেটা খুব ভাল কাজ হবে না।

সাধুভাষার পক্ষে ওকালতি যা করা গেল তার দায় সামলানোর জন্যে এখন প্রয়োজন তার কোষাগারের খবর নেওয়া। সাধুভাষার সর্ব্ববঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে আচার্য্য সুনীতিকুমার বলেছেন, 'The Bengali dialects cannot be reffered to a single Primitive Bengali speech but they are derived from various local forms of late Magadh Apabhransa, which developed some common characteristics that may be called pan-Bengali: e. g. [(—ইল,—ইব)] **for the past and the future base rather than** [(—অল,—অব)] : [(—ইয়া)] **rather than simple** [(—ই)] **for the conjunctive ;** [(—এর <কের)] **besides** [(—অর< —কর)] **for the genitive ;**] (—কে, —রে)] **for the dative, rather than** [(—কু)] **as in Oriya : etc.**" এই সর্ব্ববঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যগুলিই যে সাধুভাষার সঙ্গে আঞ্চলিক উপভাষা-সমূহকে যুক্ত করে রেখেছে সে কথাও তিনি অতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন : "These pan-Bengali features link the dialects together as members of a group, and enabled them to be attached to a composiie literary language as a matter of course." (P. 139)

অবশ্য সমস্যাটিকে অন্য আর একদিক থেকে বিচার করতে হবে। পণ্ডিতী বাংলার উপদ্রব অনেকদিন হলো দূর হয়েছে। মুসলমানী বাংলার জেহাদও আর তেমন জোর ধরতে পারছে না, এমনকি পূর্ব্ব পাকিস্থানেও শত চেষ্টাতেও ইস্‌লাম কিছুতেই এছ্‌লাম হয়ে উঠছে না। মৃত্যু 'এন্তেকাল'কে জায়গা ছেড়ে

দিতে সেখানে বিলকুল গররাজী। মিশনারী বাংলা বাঙ্গালীকে "অন্ধকার হইতে অলোকে লইয়া যাইবার" চেষ্টা অনেকদিন হলো ত্যাগ করে শুদ্ধ বাইবেল মাত্র আশ্রয় করেছিল। ইদানীং তাকেও সংস্কৃত করে বাঙ্গালীর বোধগম্য করবার চেষ্টা হচ্ছে। সাধু ও চলিত ভাষার সমস্যাটিও তার আগেকার গুরুত্ব অনেক পরিমাণে হারিয়ে ফেলেছে। তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগকে কেউ আর এখন উপদ্রব বলে গণ্য করেন না। বরং শক্তিমান লেখকের হাতে তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগ একটি আশ্চর্য্যসুন্দর, বিশিষ্ট রচনারীতির মর্য্যাদা লাভ করেছে। অন্যদিকে কথ্য ভাষার বৈঠকী ঢংটি পর্য্যন্ত সাহিত্যে আরেকটি বিশিষ্ট রচনারীতি রূপে আদরণীয় হয়ে উঠেছে। তাছাড়া তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী শব্দের স্বচ্ছন্দ প্রয়োগে স্বচ্ছ চিন্তার বাহন, প্রবহমান গদ্য তথাকথিত সাধু ও চলতি উভয় রীতির মূল বৈশিষ্ট্যকেই অনায়াসে আত্মস্থ করেছে। ইদানীং 'হচ্ছে', 'করছে' ব্যবহার করেও যে মননশীল গদ্যরচনারীতি প্রবর্তিত হয়েছে তার অনুকারকের সংখ্যা অনুজদের মধ্যে একাধিক নয়, বহু। কিন্তু অতিশিষ্ট, বহুমার্জ্জিত, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অননুকরণীয় সেই ধ্রুপদী গদ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অতুলনীয়। এবং শব্দচয়নের আভিজাত্য ও অর্থদ্যোতনা কারো কারো লিপিমুখে এমনই দার্ঢ্য লাভ করেছে যে অন্ততঃ এই গদ্যে মুখোমুখি হলে সাধু ও চলিত ভাষার তর্ক যেন অকস্মাৎ নীরব হয়ে যেতে চায়।

অতএব রবীন্দ্রনাথ যাদের ধিক্কার দিয়েছিলেন, "ভাষার অবিমিশ্র কৌলিন্য নিয়ে খুঁত খুঁত করার" মত তেমন "গোঁড়া লোক" আজ আর নেই বললেই চলে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-আলোচনার অসুবিধের কথা তুলে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন—"বিজ্ঞানের দুর্বোধ্য তথ্য আছে, কিন্তু তা নিয়ে আমাদের সাধুভাষাও গলদ্‌ঘর্ম হয় আবার চলতি ভাষারও চোখে অন্ধকার ঠেকে। বিজ্ঞানের চর্চা আমাদের দেশে যখন ছড়িয়ে পড়বে তখন উভয় ভাষাতেই তার পথ প্রশস্ত হতে থাকবে। নতুন বানানো পারিভাষিকে উভয় পক্ষেরই হবে সমান স্বত্ব।"

যদি আজ রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেন তবে তিনি দেখে যেতে পারতেন, আজ যখন বাংলাসাহিত্যের প্রাঙ্গণে দেশবিদেশের জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনার ধারা সকালের সূর্য্যালোকের মত ঢুকে পড়ছে তখন সাধু-চলিত উভয় ভাষার পথ সত্যি প্রশস্ততর হয়েছে, উভয় ভাষার স্বত্বই প্রায় সমান সমান হয়ে উঠেছে।

তাই এ আলোচনার উপসংহারে সবিনয়ে নিবেদন, সাধুভাষাকে জ্যান্ত কবর

দেওয়ার মত নিষ্ঠুরতা থেকে আমরা যেন বিরত হই এবং যেন মনে রাখি, "প্রাকৃত বাংলারও নানা রূপ আছে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অংশে।" আর তাদের জাতে না তোলা পর্য্যন্ত তাদের প্রাচীন বর্বীয়ান প্রতিনিধি সাধুভাষাকে বিদায় করলে এই চির অবহেলিত গ্রাম্যজনের মুখর ভাষাগুলি চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাবে। সে ক্ষতি কোন পণ্ডিত-গবেষক কিংবা কোন হৃদয়বান সাহিত্যিকের পক্ষেও পূরণ করা অসাধ্য হবে।

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

শুরুদাস ভট্টাচার্য

ইতিহাস স্থাবর নয়, জঙ্গম। বিভিন্ন ঋতুবদল ও রীতিবদলের মধ্যে দিয়ে সে কেবলই এগিয়ে চলে এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায়, রূপ থেকে রূপান্তরে। তার চলনপথের কোন সুনির্দিষ্ট ছক বাঁধা নেই, তার পা ফেলার মধ্যে হিসেব কষা তাল লয় নেই। আগে থেকে পেতে রাখা কোন পরিকল্পনার তারের ওপর দিয়ে তার অগ্রগতি নয়। সে নিজের পথে আপন-মনেই চলতে থাকে। তা ব'লে তার পথহাঁটা খামখেয়ালী নয়, চাল-চলন কার্য-কারণ-বিরহিত নয়। আর তা নয় ব'লেই তার গতি নিরংকুশ বেতালাও নয়। তাই বর্তমানের বিন্দুতে দাঁড়িয়ে পেছনে-ফেলে-আসা ইতিহাসের গতিরেখার দিকে তাকালে, সেই রেখা-গুলির মধ্যে একটি স্বয়ংক্রিয় সুবিহিত ক্রম চোখে পড়ে, অসম পদক্ষেপের মধ্যেও একটি সুসম পদধ্বনি শোনা যায়। তাতে নাচের ছন্দ না থাকলেও চলার একটা ছাঁদ আছে, ঐ চলনটাই তার ছন্দ। তাই ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত সংকলনে একটি নিরবচ্ছিন্ন গতিসূত্রের সন্ধান করেন—যে সূত্রের সাহায্যে তার এগিয়ে চলা, বাঁকফেরা, তার আবর্তন-বিবর্তনের সত্য স্বরূপটি ধরা যাবে। নদীর গতিপথ অনুসরণ করে ভূবিজ্ঞানী যেমন তার রেখায়িত ভঙ্গিটিকে মানচিত্রে এঁকে দেন, ইতিবৃত্তের গতিপথ অনুসরণ করে ইতিহাস-বিজ্ঞানীও তেমনি তার বলয়িত ভঙ্গিটিকে মানসচিত্রে এঁকে দেন।

মানুষের কর্মতৎপরতা, মানুষের চিন্তাভাবনা—সেই তার সংস্কৃতি, সেই তার ইতিহাস। ইতিহাস-সন্ধানী তথ্যের সমাবেশ ও বিচার করে সংস্কৃতির এই ক্রম-আগত পর্যায়গুলিকে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। সাহিত্য এই তৎপরতা, এই চিন্তা-ভাবনার একটি প্রত্যঙ্গ। গতিশীল ইতিবৃত্তের আঘাতে সাহিত্যও প্র-গত অ-স্থির। শ্রেণীসম্বন্ধ, উৎপাদনরীতি ও উৎপাদন-কৌশলের রদ বদলে বিজ্ঞানের নব-নব আবিষ্কারে সমাজ বদলায়, মন বদলায়, তার সমতালে সাহিত্যের পরিবর্তন হতে থাকে। এমনিভাবে পরিবর্তিত হতে-হতে তারও একটি স্ব-তন্ত্র ইতিহাস গড়ে ওঠে—স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তার বিভিন্ন রূপ ও

রীতি। সাহিত্যের গতি তাই দ্বিমুখী : একদিকে সে নিজের কক্ষপথে ক্রম বিকশিত (তারও নানা ধারা-উপধারা); অন্যদিকে সে সংস্কৃতির মূল প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত, কর্মচঞ্চল জীবনের, শিল্পের অন্যান্য শাখার সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। সাহিত্যের ইতিহাসকার তার এই দ্বন্দ্ব জটিল গতিময়তাকে, তার বাঁকফেরাগুলিকে দেখেন বিভিন্ন পর্যায়ে ভাল ক'রে। এই বিভাগ করা হয় ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং সাহিত্যের লক্ষণ বিচারে। এই দৃষ্টিকোণ এবং লক্ষণ বিচার—দুই-ই নিরপেক্ষ এবং তথ্য ও যুক্তিনির্ভর। অবশ্য ইতিবৃত্ত রচনার ক্ষেত্রে মন্ময়তার স্থান আছে; ঐতিহাসিক স্বকীয় বুদ্ধি-চিন্তা প্রয়োগ করে এবং পুরাতন পর্যায়বিভাগ অস্বীকার করে নতুন যুগবিভাগ নির্দেশ করতে পারেন। চিন্তা তাঁর সেই মন্ময়তা। সেই যুগবিভাগও বিজ্ঞান তথা বস্তুসম্মত হওয়া দরকার; নিরালম্ব ডানা মেলার অবকাশ তাঁর নেই। ঘটে যাওয়া অতীতের ঘটনাগুলিকে সামনে রেখেই তিনি তাদের নতুন অধ্যায়ে বিভক্ত করেন। ঘটনা তথা তথ্যের বিচ্যুতি বিকৃতি পরিবর্তন পরিবর্ধন যেমন তিনি করতে পারেন না, তেমনি বস্তু-বিরহী আবেগ-ভর কল্পনাকেও প্রশ্রয় দিতে পারেন না। তথ্য সেই একই দেখার অদল-বদলে বদ্‌লে যায় তার ব্যাখ্যা। এবং ইতিহাস-দর্শনের ক্ষেত্রে বড় রকম বদল যদি কখনও হয়, তার মূলে থাকে নতুনতর তথ্যের আবিষ্কার বা দৃষ্টিভঙ্গির বিপুল পরিবর্তন। অপিচ সেই দৃষ্টিকোণও যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত হওয়া প্রয়োজন। তথ্যসন্ধানীর মনগড়া বা আবেগভরা কোন বায়ুভুক তত্ত্বকথা নয়।

সাধারণ ইতিহাসের রীতিপদ্ধতিই সাহিত্যের ইতিবৃত্তের পক্ষে সমভাবে সত্য। কারণ এই ছোট বৃত্তটি স্বয়ংসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও বড়ো বৃত্তেরই একটা অংশ। এবং ছোট-বড়ো সব ইতিবৃত্তেরই চলনভঙ্গি এবং ভঙ্গিকে বোঝবার পন্থাটি সর্বত্রই প্রায় অভিন্ন। প্রায় অভিন্ন এই কারণে যে, মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত হয়েও সংস্কৃতির প্রত্যেক শাখার স্বকীয় কক্ষপথ এবং পথ-পরিক্রমার স্বতন্ত্র ছন্দ আছে। কথাটাকে ঘুরিয়েও বলা যায়। সাংস্কৃতিক বিভিন্ন শাখার সৃজন ও সমালোচনার নিয়ম কানুন ভিন্নভিন্ন; কিন্তু সেগুলির ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সর্বত্র একই নীতি-নিয়ম অনুসরণ করা হয়। কারণ ঐতিহাসিকতা বিচারের মানদণ্ড একটিই এবং তা বিজ্ঞানসম্মত, বিষয়ভেদে তার ভেদবুদ্ধি নেই। ঐতিহাসিক মূল সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্রোতের সঙ্গে মিলিয়ে ধারাগুলির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেন। সাহিত্যের ইতিবৃত্তের ক্ষেত্রেও এই মানের পরিবর্তন হয় না। বাংলা সাহিত্যের

প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেন রামগতি ন্যায়রত্ন। যুগবিভাগের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উল্লেখ্য নয়। তাঁর হাতে প্রয়োজনীয় তথ্যও ছিল না। এদিক থেকে প্রথম কৃতিত্ব ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের। তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'ও পূর্ণাঙ্গ নয়। তবু ইতিহাসের রক্তগতিকে ধরবার বোঝবার প্রয়াস তিনি করেছিলেন। এইদিক থেকে তিনি পথিকৃৎ। বাংলা সাহিত্যের উদ্ভবকালকে তিনি 'হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ' এবং বিকাশকালকে 'ধর্মকলহের যুগ' বলে চিহ্নিত করেছেন। উদ্ভব মুখে, বাংলার তখন বিপদ, নাথসাহিত্য, শূন্যপুরাণ এবং হিন্দু পুরাণ ও সংস্কৃত সাহিত্যের অনুগামী কিছু সংস্কৃত এবং আধা-সংস্কৃত রচনা ধরেই তিনি একে হিন্দু-বৌদ্ধ-সাহিত্যের পর্ব বলে চিহ্নিত করেছেন; অথচ সেই সঙ্গে 'ডাক ও খনার বচনকে'ও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন! (ডক্টর সুকুমার সেন দেশী সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র চর্যাপদকেই এপর্বে স্থান দিয়েছেন)। চর্যাপদ বৌদ্ধ-তান্ত্রিক কবিতা-সংকলন। তবু প্রশ্ন জাগে—এযুগে বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান্য থাকলেও চর্যাপদ কি সমগ্র বাংলার সম্পত্তি ছিল? দরবারী-সাহিত্য সংস্কৃত রচনাবলীর কি জনসভার সম্পদ ছিল? তাছাড়া ডাক ও খনার বচন তো কোন ধর্মের এলাকায়ই থাকতে পারে না; এগুলি ধর্মনিরপেক্ষ কর্ম-প্রবচন! অপিচ তখন দেশ জুড়ে যে বিপুল লোকসাহিত্য বিদ্যমান ছিল (অবশ্য মুখেমুখে), তাদের হিসেব এখানে ধরা হয় নি। এদের অধিকাংশেই তখন হিন্দু বা বৌদ্ধ, কোন দলেরই সভ্য ছিল না। তাই ডক্টর সেনের যুগবিভাজন তথ্যের দিক থেকে অসম্পূর্ণ। তত্ত্বের দিক থেকেও প্রশ্ন ওঠে: যুগ কি ধর্মের অভিধার চিহ্নিত হতে পারে? উপযুগকে এভাবে ধর্মনামাঙ্কিত করা যেতে পারে বটে। তাও তার পরিধিও কালসীমার দিকে নজর রেখে। কিন্তু বড়ো বড়ো যুগের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়—বিশেষত যেখানে একাধিক ধর্ম ও সম্প্রদায় পাশাপাশি থাকে। আবার রাজার ধর্মই যে গণধর্ম। তাও তো সর্বত্র নয়। ডক্টর সেন সেকালীন ইংরেজ ঐতিহাসিককে অনুসরণ করেছিলেন—যাঁরা ভারত-ইতিহাসকে ভাগ করেছিলেন 'হিন্দুযুগ' ও 'মুসলিমযুগ' অভিধায়। ভারতীয় ইতিহাসবিদ অনেক দিন পর্যন্ত এই বিভাজনের অনৈতিহাসিকতা এবং রাজনৈতিক কূটকৌশল উপলব্ধি করতে পারেন নি। পারলে, দেখতেন—ইংরেজ ঐতিহাসিক আধুনিক যুগকে সমস্বরে 'খ্রীষ্টান যগ' না ব'লে অসমস্বরে বলেছেন—'ব্রিটিশ যুগ'!

পরবর্তীকালে ধর্মচিহ্নিত পর্ববিভাগ পরিত্যক্ত হল এবং বাংলা সাহিত্যের

ইতিহাসকে আদি-মধ্য-আধুনিক এইভাবে পর্যায়ভুক্ত করে নতুন দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা শুরু হল। এই বিভাগ অধিকতর সঙ্গত। কারণ ইতিহাসের গতি যে নদীর স্রোতের মতো, তা এই বিভাজনের দ্বারা ব্যক্ত হয়ে উঠল। অথচ কোন বিশেষ বিষয়ের উল্লেখ না থাকাতে একদেশদর্শিতা বা সীমাবদ্ধতার ত্রুটিও রইল না। তাছাড়া উপপর্বগুলিকেও বিন্যস্ত করা সহজ হল। সুতরাং তথ্য ও তত্ত্বের দিক থেকে আদি-মধ্য-আধুনিক যুগবিভাগ আরও বেশী প্রগত।

কিন্তু এই ইতিহাস-দর্শনের মধ্যেও ত্রুটি আছে। প্রথমতঃ চর্যাপদ কি বাঙালীর আদি সাহিত্য? তারও অনেক আগে থেকে বাঙলাদেশে মানুষ ছিল। তাদের জীবন ছিল, বাঁচবার লড়াই ছিল, মনও ছিল। জীবন ও মানসের যোগে তারা যেমন কাজে নামত, তেমনি কল্পনাও করত। এবং কর্ম ও কল্পনার যোগে তারা কৃত্যের অনুষ্ঠানও করত। পৃথিবীর সব আদিম সভ্যতায় এই কৃত্যের প্রযোজনা লক্ষ্যগোচর হয়। শিকার-কৃষি-পশুপালন ইত্যাদির সমৃদ্ধি ও অব্যাহত ধারা রক্ষার জন্যে আদিম মানুষ নানা জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করত। কৃত্য-গুলি এমনই এক জাদুবিদ্যা। এর একদিকে বিবিধ-বিচিত্র আচার অনুষ্ঠান, অন্যদিকে নাচ-গান-কথাশিল্প। এই কথা-গানগুলি ছিল তাদের সাহিত্য, মুখে-মুখে এগুলি চলিত থাকত। এইসব কৃত্য ও কৃত্যনিষ্ঠ (মৌখিক সাহিত্য ধর্মধৃত ছিল না (কারণ তখন ধর্মেরই অস্তিত্ব ছিল না), এরা ছিল জীবন-সংগ্রামের অবশ্যপ্রয়োজনীয় হাতিয়ার। এই আদিম কৃত্য পরে ধর্মে, এবং মৌখিক সাহিত্য লিখিত সাহিত্যে পর্যবসিত হয়। চর্যাপদ লিখিত সাহিত্য; সুতরাং তারও আগে যে বাঙলার আদিম সমাজে এই মৌখিক সাহিত্য তথা লোকশ্রুতি প্রচলিত ছিল, সন্দেহ নেই। এগুলিই বাঙালীর আদিযুগের রচনা, চর্যা নয়। অবশ্য মুখে মুখে চলিত থাকার জন্যে এগুলির কোন প্রত্যক্ষ নিদর্শন আজ আর পাওয়া যায় না। আজকের লোকসংস্কৃতির আসরে, কৃষিক্ষেত্রে এবং অন্যত্র এগুলি এখনও অনেকটা প্রাচীন রূপে বেঁচে আছে। বাঙালী কৃষক আজও যে 'চাষপালা' গায়, তার উৎস কোন সম্প্রদায়-ধর্মে নয়, আদিম কৃষি-কৃত্যে। পরবর্তীকালের ধর্মের আসরেও প্রাচীন গান লোকসমাজে অব্যাহত রয়েছে। যেমন—গাজন, চড়কের গান, নীলের গান, ব্রতগীতি ইত্যাদি। সর্বোপরি, মঙ্গলকাব্যের ব্রত-গল্পগুলি। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে স্থানীয় আর্যগণ অবলম্বন করে মঙ্গলকাব্য রচিত হতে থাকে, সেগুলি উপাস্য দেব-দেবীর

মাহাত্ম্যগীতি এবং দেবতাদের মতই তারা প্রাচীন। মনসা, চণ্ডী, ধর্ম প্রাগার্য বাঙালীর দেবতা এবং এঁদের সংশ্লিষ্ট হালামালা, কালকেতু। মঙ্গলদৈত্য, ধন্বন্তরী, রামাই পণ্ডিত ইত্যাদি কাহিনীও প্রাগার্যকালের। লক্ষণীয়, মঙ্গলকাব্য-গুলির প্রথম দিকে এই গল্পগুলি বিবৃত হত; পরে একমাত্র কালকেতু ছাড়া অন্যগুলি পরিত্যক্ত বা পরিশোধিত হয়, নতুন গল্প সংযোজিত হতে থাকে। ময়ূরভট্ট, হরি দত্ত, মাণিক দত্তের কাব্যের সঙ্গে পরবর্তী কাব্যগুলির তুলনা করলে এই রূপান্তর ধরা পড়ে। এথেকে বোঝা যায়, গ্রাম্য লৌকিক প্রমথ-প্রমথিনীর মতো এক বা একাধিক কাহিনী সংশ্লিষ্ট ছিল; পরে প্রমথ-প্রমথিনীরা হলেন দেব-দেবী এবং তাঁদের বিশিষ্ট গল্পগুলি নিয়ে লেখা হতে লাগল মঙ্গলকাব্য। এইসব গল্প কোন মূল পুরাণে পাওয়া যায় না; পরে অর্বাচীন পুরাণে অনেকগুলি স্থান পেয়েছে যেমন কালকেতু কাহিনীকে 'আখেটক উপাখ্যান' নাম দিয়ে জাতে তোলার চেষ্টা। আরও পরে, আদিম আখ্যানগুলিকে পরিত্যাগ অথবা প্রসাধিত করা হয়েছে, পুরাণ ও সমকালীন জীবন থেকে নতুনতর কাহিনী সংযোজিত করা হয়েছে। কথা-গান-দেবতা-অনুষ্ঠান ইত্যাদি অবলম্বন করে আরও সূক্ষ্ম বিচার করলে এ ধরনের বহু উপাদান পাওয়া যায়। যার সাহায্যে প্রমাণ করা সহজ যে, চর্যাপদেরও আগে বাঙলায় বাঙালীর সাহিত্য ছিল। তবে তার ভাষা কেমন ছিল জানবার উপায় নেই। কেবল—তন্ত্রের মন্ত্রে শূন্যপুরাণের কিছু বাক্যে (গোসাঞি তুমি যেন অটিসিনী, অটিসিনী যেন বটিসিনী, বটিসিনী যেন পঞ্চবটিসিনী) এবং ইতি-উতি ছড়ায়-গানে তার সামান্য নিদর্শন পাওয়া যায়। দেবতার ইতিহাসের মধ্যেও এই প্রাচীন সাহিত্যের ইঙ্গিত আছে। যেমন মনসা। পঞ্চদশ শতাব্দীর কৃত্তিবাসী রামায়ণে মনসা শিবের বোন, এবং কলহচারিণী, ভবিষ্যপুরাণে তিনি শিবের শিষ্যা এবং বিষ্ণুর উপাসিকা; অথচ মনসামঙ্গলে তিনি শিবের কন্যা। জরৎকারুর স্ত্রী এবং তাঁকে কেন্দ্র করে শিব-চণ্ডী-গঙ্গা বিবাদে প্রবৃত্ত হন। মনসা স্থানীয়া দেবী, আর্যবাহিত দেবতাদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা নানা ভাবে চলেছে বিভিন্ন অঞ্চলে। তাঁর সঙ্গে যুক্ত কাহিনীগুলি তাই ভিন্নতর। ক্রমশঃ মনসামঙ্গলের বক্তব্যই সর্বজনীন হয়ে ওঠে। এই কাহিনীগুলির মূল পুরাণে নেই, আছে জনসমাজের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বাঙলায় কৃষি-প্রথম ছিলেন, চাষের গান ছিল, কৃষিঘনিষ্ঠ ব্রত ও গীতি ছিল। পরে শিব এইসব প্রমথদের স্থান

অধিকার করলেন, 'চাষপালা' হল 'শিবের গান'। আজও বাঙলার গ্রামে-গ্রামে শিবের চাষ এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট কাহিনী গাওয়া হয়ে থাকে। বিদ্যাপতি এটিকে কাব্যে স্থান দিয়েছিলেন। তারপর এটি অভিজাত কাব্যজগৎ থেকে নির্বাসিত হয়। কিন্তু লোকসমাজে তার যে ধারা অব্যাহত ছিল, তা থেকে রচিত হল সপ্তদশ শতাব্দীর শূন্যপুরাণ ও ধর্মপূজাবিধানের 'অথ চাষপালা'। অষ্টাদশ শতাব্দীর রামেশ্বর তাঁর কাব্যে এটিকে আবার স্থান দিয়েছেন। এই জাতীয় 'কথা'গুলিই বাঙলার আদি সাহিত্য।

দ্বিতীয়তঃ আদি মধ্য ইত্যাদি যুগের বিভাগ শুধু কালের হিসেবে নয়, কলার হিসেবেও হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি যুগের নিজস্ব লক্ষণ আছে। যা তাকে আগের ও পরের যুগ থেকে স্বতন্ত্র করে। এবং এই 'যুগ-লক্ষণ' বিচার করেই যুগ-বিভাগ হয়। যেমন : আদি ও আধুনিক যুগের মধ্যবর্তী বলেই বিশেষ কয়েক শতাব্দীর নাম 'মধ্যযুগ' নয়। এই যুগের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্য কোন পর্বে নেই—তারই ফলে নাম দেওয়া হয়েছে 'মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গি'। ইতিহাসের পর্ববিভাগের সময় এই বিশিষ্ট লক্ষণের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়, শতাব্দীর সন-তারিখের হিসেব তার অনুগমন করে। ইউরোপে 'আধুনিক-যুগ'-এর আবির্ভাব যখন ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে ব'লে ধরা হয়, তখন এদেশে তার জন্মলগ্ন ঊনবিংশ শতকের আগে ব'লে উল্লিখিত হয় না। কালগণনা নয়, তথ্যভিত্তিক লক্ষণের দিকে লক্ষ্য রেখেই ইতিহাস এই সত্য নির্ধারণ করে। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ এই যুগলক্ষণ সম্পর্কে অনবহিত নন এবং 'আদিযুগ' বাদ দিলে অন্য দুই পর্ব সম্বন্ধে তাঁদের বিভাজন যথাযথ। কিন্তু এই বিভাজনক্ষেত্রে তাঁরা যুগলক্ষণের বিচার-বিশ্লেষণ এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন নি। অর্থাৎ পটভূমিকা বাদ দিয়ে শিল্প-মূর্তির উল্লেখ করেছেন। অথচ ঐ পটভূমিকা বাদ দিলে মূলভূমির স্বরূপও যথাযথ ধরা পড়েনা, সাহিত্যের ইতিহাস হয় তালিকাবদ্ধ গ্রন্থপঞ্জী মাত্র। কিন্তু সাহিত্য তো কেবলমাত্র গ্রন্থাবলীর সমাবেশ নয়, সে সংস্কৃতির একটি স্ফুলিঙ্গ। তার মাধ্যমে প্রকাশ পায় সমকালীন সমাজের-মানুষের-মানসের বিশিষ্ট তৎপরতা, আকাংক্ষা ও প্রয়াসগুলি, চাওয়া-পাওয়া—না-পাওয়ার ছবিগুলি, বাস্তব ও কল্পনার বিচিত্র ঢেউগুলি। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত সাহিত্যের নয়, গ্রন্থের নয়—

সেই শিল্প যে রচনা করে, সেই মানুষের, তার সংস্কৃতির ইতিকথা। ঢেউ-গুলিকেও দেখব, আস্বাদন করব; আবার তারাই আমাদের নিয়ে যাবে মূল প্রবাহের স্রোতোময়তায়, সেই স্রোতে অবগাহনে। ডক্টর সুকুমার সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—প্রথম খণ্ডে ভূমিকা-পত্রে এই ইঙ্গিতই দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ; দীনেশ চন্দ্র সেনের গ্রন্থ-সমালোচনার এবং আরও কয়েকটি নিবন্ধে তার পথ-পদ্ধতির আভাসও দিয়েছিলেন এর আগে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—প্রথম খণ্ডের কেবলমাত্র প্রথম দিকে সামাজিক পটভূমিকা বিবৃত হয়েছে; পরবর্তী ইতি-কথকদের রচনায় সেই বিবৃতি ক্রম-বিবর্ধিত হয়েছে। বাঙালী সংস্কৃতির ছবিটি আরও বড়ো আরও স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। এই ছবিকে আরও পূর্ণাঙ্গ করে তোলা দরকার এবং সেইসঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত 'যুগলক্ষণের' সংযোজনারও। তবেই সাহিত্যের ফুলবনে তার সাক্ষাৎ পাব, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'ইতিহাস-বনস্পতি'।

॥ ২ ॥

সাহিত্য মানব-তৎপরতার অন্যতম অভিব্যক্তি। সাহিত্যের ইতিহাস এই তৎপরতার ইতিহাস। এই দিকে লক্ষ্য রেখে সাহিত্যকৃতির গতিপথ নির্ধারণ এবং যুগনির্ণয় অধিকতর সংগত। সংস্কৃতি তথা ইতিহাসবনস্পতির বৃহত্তর আবর্তের মধ্যে থেকেই সে স্বপথে বিবর্তিত হতে থাকে। পৃথিবীর কক্ষপথ আর কোন গ্রহ-উপগ্রহের চলনপথ নয়; তবু তার গতিকে বুঝতে হলে মহাবিশ্বজাগতিক শক্তিলীলার পটভূমিকায় রেখেই তা করতে হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। তার রূপ-রস-আস্বাদন-সমালোচনা তার নিজস্ব; কিন্তু তার ইতিহাস-ভূগোল তার একার নয় এবং সমাজ-সংস্কৃতির ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ঘূর্ণী নয়।

আধুনিক বিজ্ঞান মানব-ইতিহাসকে কয়েকটি বড়-বড় ভাগে ভাগ করেছে: আদিম যুগ (পুরাতন ও নব্য প্রস্তর যুগ, সভ্যযুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ)। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অগ্রসৃত দেশগুলির ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করে এই সর্ব-সাধারণ পর্ব-বিভাজন গৃহীত হয়েছে। এবং বলা হয়েছে: ছোটবড় সব সভ্যতাই এই পথে বিবর্তিত হয়। বলা বাহুল্য, এই পর্বগুলি ক্রম-অভিব্যক্ত বলে স্বীকার করে নিয়েও বিজ্ঞান বলে: এই অভিব্যক্তি সর্বত্র একই কালে, একই

ভাবে, একই স্তরে হয় নি—কোথাও দ্রুত লয়ে, কোথাও বিলম্বিত লয়ে হয়েছে; কোন কোন ক্ষেত্রে একটি পর্ব দ্রুত অতিক্রান্ত হয়েছে। বিজ্ঞানী দেখেছেন, প্রতিটি পর্বের স্ব-তন্ত্র লক্ষণ ও বিশিষ্টতা আছে এবং এই বিভাজন তাঁরা করেছেন ঐ লক্ষণ-বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই। এর মধ্যে উপধারা, বিপরীত ধারা আছে; বিভিন্ন দেশের সমজাতীয় যুগগুলি যে হুবহু অভিন্ন, তাও নয়; একের সঙ্গে আরের বেশ কিছু পার্থক্যও আছে। তবু মৌল স্বরূপে এবং ক্রম-অভিব্যক্তিতে এরা পরস্পর-সদৃশ। অভিন্নও বটে।

আদিম যাযাবর মানুষ ফল সংগ্রহ করত, পাথর দিয়ে পশু শিকার ও শত্রু নিধন করত। পাথরের মূর্তি তৈরী করত এবং পাহাড়ের গায়ে ছবি খোদাই করত—এই যুগকে বিজ্ঞান নাম দিয়েছে 'পুরাতন প্রস্তর যুগ'। তারপর একদিন কৃষি আবিষ্কৃত হল, গ্রাম ও সমাজ গঠন সূচিত হল—মাতৃতন্ত্র ও সাম্য তার অঙ্গ। হল নতুন ধরণের জাদুবিদ্যা—'কৃত্য'। জীবনসংগ্রামের প্রতি পদে এইসব কৃত্য প্রযোজিত হত। এর একদিকে বিচিত্র অনুষ্ঠান, অন্যদিকে নাচ-গান-কথা-শিল্প। এই কথা-গানের মধ্যেই সাহিত্যের জন্ম তখন সে প্রচলিত ছিল মুখে-মুখে, অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে একাধিকারে। এই যুগকে বলা হয়েছে 'নব্য প্রস্তর যুগ'। অতঃপর জ্ঞানের প্রসার, বিজ্ঞানের প্রগতি, বাণিজ্য নিয়ে এল 'সভ্যযুগ'। সমাজে দেখা দিল পিতৃতন্ত্র। শ্রেণীবিন্যাস, সেই সঙ্গে শিল্পেরও। আদিম কৃত্য এখন ধর্মে পরিণত। সেই ধর্মধৃত নিয়মবদ্ধ আদর্শের আনুগত্যে শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান 'ধ্রুপদী' ও অভিজাত হয়ে উঠল। অন্যদিকে লোকায়ত সংস্কৃতি প্রবহমান রইল জনসমাজের গতানুগতিক অববাহিকায়। কালপ্রবাহে অনুশীলনে ভাঁটা পড়ল, প্রাধান্য পেল ধর্ম, তার তত্ত্ব ও সাধনা, তার শাস্ত্র ও সম্প্রদায়। তার অতি চাপে সাহিত্য ও বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের অনুগমনে বাধ্য হল। এই পর্বের নাম 'মধ্যযুগ', এ যুগের মহাপুরুষ 'সন্ত' এবং এযুগের সাহিত্য পল্লবগ্রাহী ও যৌথসৃষ্ট 'ধর্ম-সাহিত্য'। তারপর—'আধুনিক যুগ'—বিজ্ঞান, কলকারখানা, জ্ঞান ও শিল্পচেতনার নানা দিকে নতুনতর অভিব্যক্তি, নবনব পথে জীবনের ও মনের অভিযাত্রা। এ-পর্ব সম্পর্কে সকলেই যথেষ্ট অবহিত, সুতরাং বিস্তৃত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। অন্য যুগগুলিরও সংক্ষিপ্ততম পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। সর্বাঙ্গীন পরিচয় পেতে গেলে আরও অনেক উপকরণের উল্লেখ প্রয়োজন। কিন্তু আলোচ্য বিষয়ের প্রয়োজনে ঐটুকুই আপাততঃ যথেষ্ট। বিজ্ঞানী বিশ্ব-ইতিহাসের

পটভূমিকায় দেশ-বিদেশের সভ্যতার তুলনামূলক বিচার করেন। এই-যে যুগবিভাগ করেছেন, তার কালের হিসেবও তিনি দিয়েছেন। আধুনিক যুগের আবির্ভাব কাল বাদ দিলে পৃথিবীর তাবৎ প্রাচীন সভ্যতার যুগবিভাগ সম্পর্কে এই কাল-গণনা মোটামুটিভাবে সমপ্রযোজ্য। এখানে তার উল্লেখ করি নি। কারণ বঙ্গ-সংস্কৃতি মিশর গ্রীস ক্রীট ভারতের মতো অতো প্রাচীন নয়; তার ক্রমবিকাশ সে তুলনায় অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের। আমাদের প্রয়োজন ঐ যুগ বিভাগ, প্রতিটি যুগের লক্ষণ এবং তাদের অগ্রসৃতির ক্রমটি, অর্থাৎ সাংস্কৃতিক বিবর্তনের কালের দিক নয়, কলার দিক এবং বক্তব্য—এই বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের নতুন করে পর্যালোচনা এবং নতুন করে যুগ-বিভাগের প্রয়োজন আছে।

॥ ৩ ॥

বাংলা সাহিত্যের 'আদিম যুগ' তার আর্য-পূর্ব ইতিকথার অন্তর্ভুক্ত, যখন বিভিন্ন আদিম নৃগোষ্ঠী এখানে বসতি স্থাপন করে স্বকীয় পন্থায় জীবন নির্বাহ করত। তার 'পুরাতন প্রস্তর যুগ'-এর ইতিহাস আমাদের অজানা, 'নব্য প্রস্তর যুগের' ইতিহাসও অত্যন্ত জানা নয়। কিন্তু বহিরাগত উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার আগে কৃষি-বাংলার যে আদিম সংস্কৃতির ধারা। মাতৃতান্ত্রিকতা বিদ্যমান ছিল, তার বহুতর উপাদান প্রমাণ ছড়িয়ে আছে বাঙ্গালীর জীবনচর্যার, কৃষিপদ্ধতিতে, শিল্পে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা' প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি যে-যে বিষয়ে বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কার করেছেন, সে সবই অন্-আর্য আদিম বঙ্গসংস্কৃতির অবদান। তা ছাড়া আজও লোকায়ত সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ঐসব প্রাচীন উপকরণের অনেকগুলি স্বরূপে বা রূপান্তরিত আকারে পাওয়া যায়। এগুলির সাহায্যে বঙ্গসংস্কৃতিক একটি পূর্ণতর ছবি এঁকে দেওয়া যেতে পারে, সে ছবি কাল্পনিক নয়। নব্য প্রস্তর যুগের বাংলা সাহিত্যও যে এই সঙ্গে প্রচলিত ছিল, তা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। কারণ আদিম বাঙ্গালীর জীবনসংগ্রাম এবং তন্নিষ্ঠকৃত্য যখন ছিল, তখন কৃত্য-ঘনিষ্ঠ মৌখিক সাহিত্যও ছিল। সেই সাহিত্যের সূত্র পাওয়া যায় এখনও—প্রচলিত লোকগীতি, লোকসাহিত্যে এবং মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যে—শাস্ত্রে। কয়েকটি প্রমাণ-পঞ্জীর উল্লেখ একটু আগেই করেছি। সম্প্রতি প্রস্তর-যুগীয়

বাঙ্গলার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নানা স্থানে পাওয়া গেছে। রাজ্য সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এ সম্পর্কে সন্ধানরত।

খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে বাঙলায় আর্য অনুপ্রবেশের ফলে বঙ্গসংস্কৃতি প্রস্তর যুগকে পেছনে ফেলে 'সভ্যযুগে' উপনীত হল। এতদিন ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং মাতৃতান্ত্রিক সাম্যসমাজের প্রাধান্য। এখন সেখানে দেখা দিল শ্রেণী—অভিজাত ও লোকায়ত এবং পিতৃতন্ত্রের ইশারা। ভারতীয় সভ্যযুগের মতো কোন ধ্রুপদী মহৎ আদর্শ না থাকলেও ধর্ম সম্পর্কে উদারতা ও সহাবস্থান বজায় ছিল এই সময়ে। কৃষির পাশে এল বাণিজ্য। পাল-সেন পর্যন্ত রাজত্বকাল বাঙলার এই 'সভ্যযুগ' বিস্তৃত ছিল। 'চর্যাপদে'-র সমষ্টি-কামনায় ব্যষ্টিভাবনার ইঙ্গিত, প্রেমালাপে সহজ বলিষ্ঠতা এবং বস্তুনিষ্ঠা আদিমোত্তর ধ্রুপদী সাহিত্যের সগোত্র। জয়দেবের গীতগোবিন্দ ইত্যাদি বাঙ্গালীর সংস্কৃত রচনাগুলিও ধ্রুপদী-ভঙ্গিম। কিন্তু এগুলির কোনটিই বিশুদ্ধ 'ধ্রুপদী সাহিত্য' হতে পারে নি। মিশর-ব্যাবিলন-গ্রীস-ভারতের মতো পূর্ণতম 'সভ্যযুগ' বাঙলাদেশে দেখা দেয় নি, বাইরে থেকে আসা উত্তর ভারতের সংস্কৃতি তা হতে দেয় নি। এই সংস্কৃতিকে 'আর্য' বললেও এ আর এখন খাঁটি আর্য নয়, এ সংস্কৃতি তখন উপনীত হয়েছে ধর্ম-প্রভাবিত মধ্যযুগে। সুতরাং বহিরাগত প্রবলতর মধ্যযুগীয় ভাবনার নিকটতম সংস্পর্শে বঙ্গসংস্কৃতি সভ্যযুগ-এর সিঁড়িগুলিকে অতি-দ্রুত ও এলোমেলো ভাবে অতিক্রম করে এসেছে। তাই জয়দেবের গীতগোবিন্দ ইত্যাদি গৌরাণিক সাহিত্যরূপে এবং চর্যাপদ বৌদ্ধ সাহিত্যরূপে পরিচিত হল, আদর্শপ্রধান রচনা হতে পারল না। বাঙলার 'সভ্যযুগ' একদিকে আদিম অন্যদিকে মধ্যযুগের মিশ্র-রূপে বিবর্তিত হল। ধর্মের অতিপ্রভাব, শ্রেণীর জটিলতর বিন্যাস, সম্প্রদায়ের উদ্‌ভব, শাস্ত্র-আনুগত্য, ধর্ম-কলহ ইত্যাদি মধ্যযুগীয় লক্ষণ পাল আমলের চেয়ে সেন আমলেই স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে এবং গতি পেয়েছে তুর্কী-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে। বল্লাল সেনের আমল থেকে কুলপঞ্জী-শ্রেণীবিন্যাসের প্রবাদটির (যদি প্রবাদমাত্রও হয়) মধ্যে তাই অনেকখানি সত্য আছে। বিভিন্ন গোষ্ঠী ক্রমেই সামাজিক শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছিল; এখন তারা ঐক্যবদ্ধ হল একটি জাতিরূপে এবং সেই জাতি বহুধাবিভক্ত হল নানা শ্রেণী-উপশ্রেণীতে। বিভিন্ন ধর্ম ও দেবতার আশ্রয়ে সামাজিক শ্রেণীগুলি পুনরায় বিভক্ত হল ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়-উপসম্প্রদায়। শাস্ত্র এবং ধর্ম সাধনের অভিভবে পঞ্চদশ

শতাব্দী থেকে বাঙলার 'মধ্যযুগ' পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সাংস্কৃতিক আবর্তের অন্যতম ফল—মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্য এবং সেই সাহিত্যের মূল্যায়ন ঐ পটের ভূমিকায়। তার যে মূল তিনটি ধারা—আখ্যানকাব্য, পদাবলী, অনুবাদ সাহিত্য—সবের মধ্যেই ধর্মানুগমন, পল্লবগ্রাহিতা, যৌথ সৃষ্টি ইত্যাদি মধ্যযুগীয় লক্ষণগুলি স্বতঃবিদ্যমান। একই কাব্যের পাত্রে দেবত্ব মানবত্বের যে যুগ্ম স্রোত, তাও এই পর্বের অন্যতম বড়ো বৈশিষ্ট্য। সম্প্রদায় ও শাস্ত্রের দিক থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও গৌড়ীয় শাক্ত ধর্মের ছত্রছায়া এই যুগকে ধারণ করে আছে। এদেরও আবার নানা উপসম্প্রদায় এবং সে সমস্তের প্রভাব জীবনে সাহিত্যে মানসে স্বত। বাঙালীর রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব এবং শিবশক্তিতত্ত্ব তার নিজস্ব, এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সাহিত্য এবং সাহিত্যের অলংকার শাস্ত্রও। মধ্যযুগ—বাঙলার অদ্বিতীয় সন্ত চৈতন্যদেব।

শতাব্দীর সিঁড়ি পেরিয়ে পেরিয়ে মধ্যযুগ অন্তিমে এসে উপস্থিত হয়। ধর্ম অপেক্ষা জীবন, দেবত্ব অপেক্ষা মানবত্ব প্রাধান্য পেতে থাকে। নাস্তিক্য বুদ্ধি এবং কৃত্রিম নাগরিকতা সাহিত্যের মধুর রসকে আদিরসাত্মক করে তোলে। পূর্বাগত সম্প্রদায়-ভাবনাও ক্রমে ভেঙ্গে পড়ে। ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। শুধু কবিচিন্তায় নয়, রামপ্রসাদের গভীর ধর্মবোধেও একটি বিশিষ্টতা লক্ষণীয়—তার মধ্যে মধ্যযুগের প্রভাব যেমন আছে, তেমনি আছে একালের বিভাব। মধ্যযুগে ধর্ম ও ব্যক্তি সমাজ ও সম্প্রদায়গত—চৈতন্যদেবের সাধনা তাঁর একার নয়, আশপাশের আরও অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ; গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম তাই একদিকে শাস্ত্র, অন্যদিকে ধর্ম-সাহিত্য এবং একদিকে দেশজোড়া 'আখড়া'-র মধ্যে দিয়ে সম্প্রদায়রূপে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু রামপ্রসাদের অধ্যাত্ম সাধনা একান্ত ব্যক্তিগত, সমাজ বা সম্প্রদায়গত নয়। তিনি কোন নতুন সম্প্রদায় গড়েন নি, নতুন শাস্ত্র রচনায় অথবা তন্ত্র সাধনার দেশব্যাপী আশ্রম খোলার প্রেরণাও দেননি; শাক্ত পদাবলীর সঙ্গে তন্ত্রের যোগ থাকলেও তার উৎস বৈষ্ণব সাহিত্যের মত কোন 'উজ্জ্বল নীলমণি' নয়, কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ও নয়; তা একক ব্যক্তির অবদান। এ সময়ের সাহিত্যও ব্যক্তিনির্ভর। সপ্তদশ শতকের চট্টগ্রামের শৈব সাহিত্য যৌথ সৃষ্টি কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শিবায়নগুলি তা নয়। চণ্ডীমঙ্গলের অনুগমনে কাব্য রচনা করলেও ভারতচন্দ্র যে দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন, তিনি কোন সম্প্রদায়ের, এমনকি গ্রাম্য লৌকিক দেবীও নন—রাজা

কৃষ্ণচন্দ্রের গৃহদেবী অন্নপূর্ণা তিনি। কাহিনী এবং আঙ্গিকের দিক থেকেও তিনি পূর্ব ঐতিহ্যকে সচেতনভাবে এড়িয়ে গিয়ে নিজের মনোনীত নতুন রীতির কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর আদর্শ ছিল—দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার নয়, আদি রসের পরিবেক্ষণে পৃষ্ঠপোষকের ও নিজের (সভাসদদেরও) আত্মতৃপ্তি। অপিচ ধর্ম-বিরহিত সাহিত্যও লেখা হতে আরম্ভ করেছে—পূর্ববঙ্গগীতিকা তার দৃষ্টান্ত (এগুলির সৃষ্টির মূল কারণ অন্যত্রও নিহিত। কিন্তু সে কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক)।

মধ্যযুগের শেষভাগে প্রাচীন ধারার পাশেপাশে এই-যে নবীনের প্রতিধ্বনি, তার পদধ্বনি বেজে উঠল পলাশীর যুদ্ধোত্তর কালে। নতুন যুগের পত্তন হল কলকাতায়। পুরনো ধারা বয়ে চলল বাংলার গ্রামে-গ্রামান্তরে। শহুরে সভ্যতারও প্রথম পর্বে পাঁচালী কবিমনের অতীতবৃত্তি, তথা পুরাণের নবরূপ, দ্বিতীয় পর্বে 'নব্য ধ্রুপদীয়ানা' অবশেষে আধুনিক যুগের, রোমান্টিক সাহিত্যের প্রসন্ন সূর্যোদয়। মধ্যযুগের সাহিত্য, দেশজ লোকায়ত এবং বহির্বাঙ্গলার ভারতীয় সাহিত্যের আত্মীয় ছিল। এখন বিবিধ আত্মীয়তাই বিচ্ছিন্ন হল। নতুন পথ জেগে উঠল। তার ইতিহাস সকলেরই জানা।

এই প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ সম্পর্কে নতুন প্রস্তাব তুলেছে মাত্র এবং সমাজবিজ্ঞানের পথ ধরে সেই প্রস্তাবের স্বপক্ষে বাংলা সাহিত্যের রূপ-রেখার সামান্য বিশ্লেষণ করেছি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, নতুন ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তার আলোচনা। এবং এই প্রস্তাবও অভিনব কিছু নয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে এই পদ্ধতিতে যে বিপুল গবেষণা শুরু হয়েছে, তারই সম্প্রসারণ কামনা করছি তার সর্বাঙ্গে, সকল যুগের ক্ষেত্রে। তবেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসটি পূর্ণাঙ্গ ও বিজ্ঞানসম্মত হবে, এই উদ্দেশ্যে বাঙ্গালীর আদিম সাহিত্যের পুনরুদ্ধার করতে হবে, সভ্য ও মধ্যযুগের লক্ষণ-বিচারের প্রেক্ষাপটে সাহিত্যকৃতিগুলির পুনর্বিচার করতে হবে, বিভিন্ন যুগ-লক্ষণের স্বাতন্ত্র্য ও মিশ্রণগুলি আবিষ্কার ও চিহ্নিত করতে হবে। আজকের প্রগতি আধুনিকতার মাঝখানে এখনও যে মধ্যযুগীয় চিন্তা ও জীবনধারা বহমান, তার পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে হবে, গ্রাম্য লোক-সাহিত্যেরও ইতিহাস লিখতে হবে। এবং প্রাগাধুনিক ও আধুনিক চিন্তা চৈতন্যের ভেদাভেদতত্ত্ব জানতে ও জানাতে হবে।

এর ফলে বাংলা সাহিত্যের, বাঙ্গালী জীবন ও মানসের অগ্রসৃত অবিচ্ছিন্ন ধারাকে যেমন উপলব্ধি করতে পারব, তেমনি তার বাঁকফেরাগুলিকেও সুষ্ঠতর ভাবে বুঝতে পারব। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বাঙ্গালী সংস্কৃতির এবং এই দুইয়ের সঙ্গে ভারতীয় ও বিশ্বের সাহিত্য-সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের ধারণাও করতে পারব। সর্বোপরি, সাহিত্য যে মানুষের সৃষ্টি, সেই মানুষকে সভ্যতার অনুভব করতে তার আরও কাছে আসতে পারব।

সমাজবিজ্ঞান-সম্মত সাংস্কৃতিক ঃ ক্রমঅভিব্যক্তির রীতিপথে সাহিত্যের ইতিবৃত্ত রচনার মধ্যেই আছে এই সত্যের, এই অনুভূতির উপলব্ধি। আশা করি, বাঙ্গালী সংস্কৃতির সেই অপরূপ রূপকথা শোনাতে অগ্রসর হবেন সত্যসন্ধী ঐতিহাসিক, এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রত্নতত্ত্ব নৃতত্ত্ব বিভাগ সাগ্রহে সাহায্য করবেন।

মেঘনাদবধ কাব্যে উপমা

সৈয়দ আলি আহ্‌সান

মহাকাব্যে মানবজীবনের অংশবিশেষের অর্থাৎ বিশেষ কোন একটি দিকের পরিচর্যা থাকে না, কিন্তু জীবনের পরিপূর্ণতার পরিচয় থাকে। কবি বিভিন্ন কৌশলে এই পরিপূর্ণতাকে স্পষ্ট করেন। কবি আপন ভাষার মৌলিক শব্দভাণ্ডার এবং বাক্যের অন্বয়শৃঙ্খলাকে অবলম্বন করেই তার মধ্যে নতুন ভাবস্পন্দন এনে থাকেন এবং এভাবেই মহাকাব্যে জীবনোপলব্ধির পরিপূর্ণতা জাগে। চরিত্রনির্মাণে, ঘটনা এবং সর্বোপরি কাহিনীকে রূপ দেওয়ার মধ্যে পরিপূর্ণতার পরিচয় পাই। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কবি জীবনের বিস্তৃতির এবং বলিষ্ঠতার পরিচয় দেবার চেষ্টা করেন।

চরিত্রনির্মাণে পরিপূর্ণতা প্রতিষ্ঠার জন্য কবি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপমার ক্রমপ্রসার এবং অবিরল ব্যঞ্জনার সুযোগ নিয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গের উল্লেখ করা যেতে পারে। এ সর্গে আমরা প্রমীলার পরিচয় পাই। প্রমীলা স্বামীবিরহে কাতরা এবং স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্খায় দ্বিধাহীন জীবনমুক্তির কামনা করছে। সম্পূর্ণ সর্গে প্রমীলার যে পরিচয় পাই তা সব দিক থেকে পরিপূর্ণ। এমন কখনও মনে হয় না যে প্রমীলা বিভিন্ন মুহূর্তে কারণ-বিশেষ বিভিন্ন আবেগের অধীন হয়েছে, কিন্তু মনে হয় যে তার সম্পূর্ণ সত্তা একটা বিশেষ সত্যকে জাগ্রত করতেই উন্মুখ হয়েছে। তার চরিত্রের পূর্বাপর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে না, সম্পূর্ণ জীবনের প্রবাহেরও পরিচয় আমরা চাই না। যে মুহূর্তে সে প্রকাশিত সে মুহূর্তেই সে সম্পূর্ণ এবং সে মুহূর্তেই তার চরিত্র সর্বরূপে বিকশিত। কবি এই পরিপূর্ণতার পরিচয় এনেছেন সমধর্মী উপমার ক্রমপ্রসার ও অবিরল ব্যঞ্জনা এনে। বেদনা ব্যাখ্যায় এবং আবেগের তীব্র গতি—উভয় ক্ষেত্রেই ক্রমপ্রসারিত সমধর্মী উপমার প্রয়োগ করা হয়েছে। সর্গের আরম্ভেই বেদনাধর্মী উপমার অবিরল ব্যঞ্জন রয়েছে—

"প্রমোদ-উদ্যানে কাঁদে দানব নন্দিনী
প্রমীলা পতি-বিরহে কাতরা যুবতী।
অশ্রুআঁখি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে
কভু, ব্রজ-কুঞ্জবনে, হায় রে, যেমতি
ব্রজবালা, না হেরি কদম্বের মূলে
পীতধড়া পীতাম্বরে, অধরে মুরলী
কভু বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুন,
বিরহিনী,শূন্য নীড়ে কপোতী যেমতি
বিবশা ! কভু বা উঠি উচ্চ-গৃহ-চূড়ে,
এক-দৃষ্টে চাহে বামা দূরে লঙ্কা পানে,
অবিরল চক্ষুঃজল পুঁছিয়া আঁচলে।
নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ, মন্দিরা,
গীতধ্বনি।"

এখানে শৃঙ্খলিত রূপে অনেকগুলো উপমা এসেছে এবং সব কয়টি উপমা মিলে এমন একটি আচ্ছন্ন অবস্থার পরিচয় এসেছে যার মধ্যে কোন ছেদ নেই— একটি পরিপূর্ণ নিঃসংশয় বেদনার আচ্ছন্নতা। কৃষ্ণবিরহে সংসারের সর্বকৃত্য থেকে রাধার যে বেদনাময় মুক্তি এবং অনুক্ষণ বিবশা রাধার যে ব্যাকুলতা তার সঙ্গে এখানে প্রমীলার ব্যাকুলতার তুলনা করা হয়েছে। আবার শূন্যনীড়ে উদ্‌ভ্রান্ত কপোতীর উপমাও আনা হয়েছে। এবং সর্বশেষে সমস্ত আনন্দের নীরবতার ছবি তিনি এঁকেছেন একথা বলে যে "নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ মন্দিরা, গীতধ্বনি"। আরও কিছুদূর যেয়ে অন্য একটি উদাহরণের মধ্যে একই বেদনার বিক্ষেপ পাই—

"কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আঁখি
মুক্তিল শিশির-নীরে, কে পারে কহিতে ?
কত দূরে হেরি বামা সূর্যমুখী দুঃখী,
মলিন-বদনা, মরি, মিহির-বিরহে,
দাঁড়াইয়া তার কাছে কহিলা সুস্বরে ;—
'তোর লো যে দশা এই ভোর নিশীকালে,
ভানু-প্রিয়ে, আমিও লো সহি সে যাতনা !"

প্রমীলার মানসিক অবস্থার পরিচয় পেলাম। কবি বিভিন্ন উপমা এবং উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগে এ অবস্থার একটি একাগ্র রূপ আঁকতে চেয়েছেন। এখানে উপমার প্রয়োগ না হলে আমরা শুধুমাত্র একটি অবস্থার বিবৃতি পেতাম, কিন্তু প্রমীলার সম্পূর্ণ পরিচয় পেতাম না। উপমাবিহীন বেদনাবিবৃতি হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার কাব্যের শচী চরিত্রকে অত্যন্ত লঘু, অস্পষ্ট ও অস্বাভাবিক ক'রে তুলেছে। বৃত্রসংহারের চতুর্থ সর্গে শচীর মানসিক পরিচয় হেমচন্দ্র দিয়েছেন। শৃঙ্খলিত উপমার ব্যঞ্জনায় চরিত্র কত যে উজ্জ্বল হয় তার পরিচয় আমরা প্রমীলার ক্ষেত্রে দেখেছি, শচীর ক্ষেত্রে দেখবো যে নিছক বেদনাবিলাস বিলাপে রূপান্তরিত হয়ে চরিত্রকে সম্পূর্ণ নির্জীব করেছে—

"সায়াহ্নে সখীর সনে বসিলা নৈমিষ বনে,
শচী কহে সখীরে চাহিয়া।
'বল আর কত দিন, এ বেশে হেন শ্রীহীন,
থাকিব লো মরতে পড়িয়া॥
না হেরে অমরাবতী, চপলা, দুঃখেতে অতি,
আছি এ মানব-ভবনে
না ঘুচে মনের ব্যথা, জাগে নিত্য সেই কথা,
পুনঃ কবে পশিব গগনে॥

আর উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন।

মধুসূদন প্রমীলার পরিচয় এনেছেন বিভিন্ন উপমা এবং উৎপ্রেক্ষায়—প্রমীলার সাজসজ্জা এবং যাত্রার ব্যাখ্যায়। এ ব্যাখ্যায় আমরা আবেগের তীব্রতায় নিশ্চিন্ত গতি এবং দ্বিধাহীন জীবনমুক্তির পরিচয় পাই। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি—

(ক) কি কহিলি বাসন্তি? পর্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
(খ) রোষে লজ্জা ভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী
প্রমীলা। কিরীটছটা কবরী-উপরি,
হায় রে, শোভিল যথা কাদম্বিনী-শিরে
ইন্দ্রচাপ।
(গ) চড়িলা সুন্দরী
বড়বা নামেতে বামী—বাড়বাগ্নি-শিখা।
(ঘ) যথা বায়ু সখা সহ দাবানল গতি
দুর্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে।

টলিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি ;
ঘনঘনাকারে রেণু, উড়িল চৌদিকে ;
কিন্তু নিশাকালে কবে ধূমপুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নিশিখা ? অগ্নিশিখা তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে।"

প্রথম উপমাটি, একটি বিশেষ আবেগের পরিচয়সূচক সর্বশেষ এবং সর্বসম্পূর্ণ ইঙ্গিত। উচ্চ পর্বতের বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে নিম্ন-গতি যে নদী সমুদ্রের দিকে দ্রুতগামী, গতির পরিচয় অর্থে এটাই কি সর্বশেষ অলঙ্কার নয় ? এখানে প্রশ্নের অপেক্ষা নেই। এই উপমায় কবির নিশ্চিন্ত-বোধের পূর্ণজ্ঞানের স্বীকৃতি আছে। কবি যদি প্রান্তিক প্রবহমান নদীর গতির কথা বলতেন, তাহলে সে গতি দ্বিধাহীন এবং নিশ্চিত হতো না, সেখানে মন্থরতার সুযোগ থাকতো! একই তীব্রতা, বিমুক্ত প্রসার এবং সমগ্র-প্রাণতার পরিচয় দাবানলের উপমার মধ্যেও এসেছে। বায়ুর সহযোগিতায় দাবানলের গতি যেমন দুর্বার, প্রমীলার গতিও তেমনি দুর্বার ও নিঃশঙ্ক।

চতুর্থ সর্গে করুণাবোধের অনুষঙ্গী বিভিন্ন সমান্তরাল উপমার প্রশস্ত সীতা চরিত্র যে ভাবে ভাস্বর হয়েছে, অন্য কোনও উপায়ে সীতাকে সেভাবে স্পষ্ট করা সম্ভবপর ছিল না। মধুসূদন এই সর্গে বাংলা শব্দের সম্ভাবনাকে অনেক দূর বিস্তৃত করেছেন। যে ভাষার হৃদয়াবেগের বিবৃতি মাত্রই ছিল সজীব প্রাণ-পরিচয়ের সর্বশেষ কথা, সে ভাষাকে উপমারূপকের প্রাচুর্যে উচ্ছল ক'রে নিবেদিত-প্রাণ এবং সর্বংসহা সীতা চরিত্রের উজ্জীবন অসাধারণ কুশলতার পরিচায়ক। মধুসূদনের সময়ে ব্যবহৃত বাংলার মৌলিক শব্দ-ভাণ্ডারে যে এত ঐশ্বর্য এবং সম্ভাবনা নিহিত ছিল তা তখন কে ভাবতে পেরেছিল ? অন্ত্যযমক নির্বিচারে পরিহার করে যতিকে অর্থব্যক্তির প্রয়োজনে বিভিন্ন রূপে বিন্যস্ত ক'রে এবং অনবরত উপমারূপকের ক্রমপ্রসার ও অবিরল ব্যঞ্জনায় বাংলা ভাষাকে তিনি যে অসাধারণ শক্তিশালী করেছিলেন তার পরিচয় মেঘনাদবধ কাব্যের প্রমীলা ও সীতা চরিত্র বিকাশের মধ্যেই পাই। চতুর্থ সর্গে সীতা সরমার কাছে আপন বেদনার পরিচয় দিচ্ছে। এখানে সে একান্তভাবে স্মৃতিনির্ভর কিন্তু সর্বপ্রকার আচ্ছন্নতামুক্ত। বেদনা-সমর্থিত উপমা

প্রয়োগ ক'রে সে সমস্ত ইতিহাসকে দৃশ্যগোচর করেছে। অনেকগুলো উপমার ক্ষেত্রে মধুসূদন একই সঙ্গে ধ্বনিমাহাত্ম্য এবং ব্যাখ্যাসূত্রকে অবলম্বন করেছেন। এটা আমাদের মনে রাখা দরকার যে কবিতায় ধ্বনির বোধ প্রতিটি শব্দকে প্রাণবন্ত করে এবং চিন্তা ও মননের সর্বপ্রকার জাগরণের অনেক গভীর প্রবেশ করে: প্রাথমিক শিথিল এবং বিস্মিত অর্থকে আহরণ করতে চায়—একই সঙ্গে আরম্ভ এবং শেষ, আদিম এবং বর্তমানকে সন্ধান করে। শব্দার্থের বিচিত্র ব্যঞ্জনায় আমরা একই সঙ্গে প্রাচীন বিলুপ্ত সংস্কারকে এবং আধুনিক সচেতনাকে পাই। ধ্বনিবোধের এহেন পথযাত্রাকে শ্রোত্রকল্পনা বলতে পারি।

এ শ্রৌত্রকল্পনায় কবির অভিজ্ঞতার বিন্যাস আছে। বিস্ময় এবং আনন্দ, শঙ্কা এবং জাগরণ পাঠকের হৃদয়েও সাড়া জাগায়। তাই বলা হয়ে থাকে যে, মহৎ কবিতার উপলব্ধিতে পৌঁছুতে হয়, কিন্তু সাধারণ চেতনার কবিতাকে আমরা অনবরত অতিক্রম করে আসি।

চতুর্থ সর্গ থেকে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি—

(ক) হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূরে বনে!
মলিন-বদনা দেবী, হায়রে যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্যকান্ত মণি,
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বু-রাশি তলে!

(খ) বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ, চালে, তীর অতিক্রমি,
বারিরাশি দুই পাশে, তেমতি যে মন,
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।

(গ) হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে;
সরসীর তীরে বসি দেখিতাম কভু
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুরবালা-কেলি
পদ্মবনে; কভু সাধ্বী ঋষি-বংশ-বধূ
সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে।

বিভিন্ন ব্যঞ্জনের ধ্বনিসাম্যে ত বটেই,—অধিকন্তু আবেগ-নির্ভর উপমার প্রশ্রয়ে বিস্ময় আনন্দ এবং জাগরণের পরিচয় এসেছে। উপমা যদি বিস্ময় ও আনন্দ না জাগায় এবং উপমেয়র নিঃসংশয় প্রাণচেতনাকে যদি জাগ্রত না করে তবে সে উপমার কোনো মূল্য নেই। উপমানের দ্বারা উপমেয় অনেক ক্ষেত্রে অলঙ্কৃত হয় কিন্তু অলঙ্কারই তার শেষ নয়—লক্ষ্য রাখতে হবে যে অলঙ্কৃত হয়ে বস্তুরূপে সজীব হয়েছে কিনা। কালিদাসের কাব্যে অলঙ্কার সৌন্দর্য-হেতু কিন্তু সেখানে সৌন্দর্যই জীবন এবং সৌন্দর্যই সমস্ত কল্পনার শেষ, তাই কালিদাস অনবরত সৌন্দর্যের মধ্যেই সমস্ত প্রাণের জাগরণ দেখেছেন। কালিদাসের কাব্যে গতিময় উপমাও সৌন্দর্য-হেতু। আমি এখানে "রঘুবংশ" থেকে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

(ক) বৈদর্ভনির্দিষ্টমসৌ কুমারঃ, ক্রমেণ সোপানপথেন মঞ্চম্।
শিলাবিভঙ্গেমৃগরাজশাবস্তুঙ্গং নগোৎসঙ্গমিবারুরোহ॥

সিংহশাবক যেরূপ শিলাভঙ্গী দ্বারা উন্নত পর্বতশিখরে আরোহণ করে, তদ্রূপ কুমার অজ সুনির্মিত সোপানমার্গ দ্বারা ভোজরাজ নির্দিষ্ট মঞ্চে আরোহন করলেন।

(খ) তাং সৈব বেত্রগ্রহণে নিযুক্তা রাজান্তরং রাজসুতাং নিনায়।
সমীরণোত্থেব তরঙ্গলেখা, পদ্মান্তরং মানসরাজহংসীম॥

অনন্তর পবনবেগে সমুত্থিত তরঙ্গমালা যেমন মানস-সরোবরস্থিত রাজহংসীকে এক পদ্ম হ'তে অন্য এক পদ্মের নিকট নিয়ে যায়, তেমনি প্রতিহারী সুনন্দা রাজকুমারীকে অন্য এক রাজার সন্নিধানে নিয়ে গেল।

রাত্রিকালে সঞ্চারিণী দীপশিখা অতিক্রম ক'রে গেলে রাজ-পথস্থিত অট্টালিকাসমূহ যেরূপ তিমিরাচ্ছন্ন বোধ হ'য়ে থাকে, তদ্রূপ বিধাতার অতি মনোহর দৃষ্টিস্বরূপ ইন্দুমতী যে যে রাজাকে অতিক্রম করতে লাগলেন, তাঁরা সকলেই বিষাদে বিবর্ণভাব ধারণ করলেন।

(গ) উপরের তিনটি উদাহরণেই গতির কথা আছে—কিন্তু তা'র নিজস্ব কোনো সত্তা নেই। গতিকে সজীব করবার জন্য উপমা নির্মিত হয়নি, সৌন্দর্যের প্রকাশের জন্য গতির আবেশ সৃজিত হয়েছে। প্রথম উদাহরণে উপমেয় হচ্ছে—কুমার অজ কর্তৃক সোপান বেয়ে মঞ্চে আরোহন। এর উপমান হচ্ছে সিংহ-শাবক কর্তৃক শিলাভঙ্গী দ্বারা উন্নত পর্বতশিখরে আরোহণ। এ-উপমায় আরোহণের বিশেষ পদ্ধতি নয় কিন্তু আরোহণ—

কালে সুঠাম দেহবিন্যাসের সৌন্দর্যই কবির লক্ষ্য ছিল। দ্বিতীয় উদাহরণে চলমান মুহূর্তে যৌবনবতী রাজকুমারীর দেহ-তরঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। এখানকার উপমেয় সংক্ষিপ্ত পদচারণের সংবাদ, কিন্তু উপমান সৌন্দর্যহেতু বিস্তৃত—এক পদ্ম হ'তে অন্য পদ্মের নিকট রাজহংসীর নিছক গমন নয় কিন্তু তরঙ্গায়িত দেহের সচল ছন্দ, তৃতীয় উদাহরণেও গতির-কথা আছে কিন্তু গতিকে অতিক্রম করেছে ইন্দুমতীর দেহসৌষ্ঠব এবং রূপপ্রভা যা'কে কবি ব'লেছেন সঞ্চারিণী দীপশিখা।

নিছক সৌন্দর্য-বর্ণনার ক্ষেত্রে মধুসূদনের উপমা তীক্ষ্ণ ও সজীব নয়, অনেকটা মধ্যযুগীয় 'চন্দ্রের জিনিয়া রূপে'র মতো, যেমন—

"একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন।"

অথবা—

"কভু সাধবী ঋষি-বংশ-বধূ
সন্তাষিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে

অথবা—

"রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তাঁর সমাগমে!
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেননা হইবে সুখী, সর্ব-জন তথা,
জগত-আনন্দ তুমি ভুবন-মোহিনী।"

এ প্রকৃতির উপমা মধুসূদনের কাব্যে বিরল না হ'লেও, মধুসূদনের বিশিষ্টতা খুঁজতে হবে অন্য ক্ষেত্রে—গতিময় উপমার ক্ষেত্রে, প্রগাঢ় উপমা এবং বাঙ্গালী জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত উপমা-ব্যঞ্জনায়। বাংলা কাব্যে এগুলো নতুন সৃষ্টি। ক্ষেত্রে মধুসূদন হোমারের কাছে ঋণী।

আমি এখানে অনেকটা বিস্তৃতভাবে হোমারের উপমা সম্পর্কে একজন ইংরাজ সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃত করবো। বাংলাতে এ সম্পর্কে স্পষ্ট কোন আলোচনা এ-পর্যন্ত হয়নি বলেই, এতটা ব্যাপক উদ্ধৃতির প্রয়োজন অনুভব করছি। সমালোচক হোমারের উপমাকে বলছেন 'ব্যাখ্যাযুক্ত চিত্রকল্প'। সাধারণ নিয়মে, একটি বিশেষ বর্ণনায় উপমা সংখ্যা বর্ণিত

ঘটনার ব্যস্ত-অনুপাতে হয়ে থাকে। যেখানকার বর্ণিত ঘটনা প্রচুর, দ্রুতগতি এবং বিচিত্র, সেখানে উপমা অনেকটা সীমাবদ্ধ; কিন্তু যেখানে বর্ণনা ঘটনাবহুল নয় সেখানে চিত্রকল্পই প্রাধান্য পেয়েছে। ইলিয়াডে উপমা প্রাধান্য পেয়েছে—কেননা সেখানে ঘটনার গতি সহজ কিন্তু 'ওডিসি' এর বিপরীত।

"The first book of the Iliad is remarkable above the rest for the number and diversity of its historical details: it contains, accordingly, not one simile. The same is the case with the three opening cantos of the Odyssey. The battle pieces of the Iliad, on the other hand, where the action, however turbulent is uniform, even monotonous in its details, offers the greatest profession of similes. This may also, in part, be owing to the exciting nature of the subject..... In conformity with the same general law, the poet's similes are almost exclusively confined to the narrative or descriptive element of the two poems"

অর্থাৎ ইলিয়াডের প্রথম পুস্তক ঐতিহাসিক ঘটনার সংখ্যা এবং বৈচিত্র্যে সম্পূর্ণ গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ থেকে বিশিষ্ট। এ-অংশে একটিও উপমা নেই। ওডিসির প্রথম তিনটি সর্গের অবস্থাও তাই। অপর পক্ষে ইলিয়াডের যুদ্ধ বর্ণনার ক্ষেত্রে উপমার প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়—সেখানে ঘটনা যতই তীব্র ও আবর্তিত হোক না কেন, প্রধানতঃ তা' বিস্তৃত, বৈচিত্র্যহীন ও সমতালের। অবশ্য বর্ণনা উত্তেজনামূলক বলেও অংশতঃ উপমার প্রাচুর্য ঘটেছে হয়ত।.....একই সাধারণ নিয়মে একথা বলা চলে যে, উভয় গ্রন্থেই কবির উপমাগুলো বর্ণনামূলক অংশেই প্রধানতঃ পাওয়া যায়।

কোন মহান দৃশ্য অথবা বীভৎস ভয়াবহ দৃশ্য, অথবা সংগ্রামরত সৈন্যদল অথবা বিভিন্ন বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্ব হোমারকে বিভিন্ন সমান্তরাল বিচিত্র উপমা নির্মাণের সুযোগ দিয়েছে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে অনেক সময় তিনি সমধর্মী অনেকগুলো উপমা পর পর সাজিয়ে গেছেন। কখনও বা একই উপমার পুনরাবৃত্তি করেছেন—"The sight of some sublime

or terrible object of armies in battle array, or the war of hostile elements, seem to transport him, almost against his better judgement, into a profusion of equally vivid illustrations. In such cases he does not hesitate to borrow several figures in succession from the same class of natural phenomena. Nor does he disdain to avail himself of the same simile, on a recurrence of matter."

যে বস্তুর শক্তি বা সৌন্দর্য সম্পর্কে আমরা অধিকতর অবহিত সে বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা হয় অপেক্ষাকৃত অল্প অবহিত বস্তুর। যেমন নায়কের বীরত্ব অথবা শক্তিকে রূপ দেবার জন্য, তাকে তুলনা করা হয়, যখন সে শত্রুব্যূহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে—সিংহের সঙ্গে যে সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়েছে বলীবর্দের উপর। উপমেয়ক রূপ দেবার জন্য এখানে উপমান যথাযথ হয়েছে। আক্রমণের তীব্রতা ব্যাখ্যার জন্য এবং আক্রমণকারী যে আক্রান্ত শত্রুর চাইতে বলশালী তা প্রমাণ করবার জন্য এ-উপমা যথেষ্ট সঙ্গত। "A poetical simile may be defined, the illustration of one object with which the readar is assumed to be less familiar, by a comparison with some otner of which he is supposed to have a better knowlege···where the poet, wishing to magnify the extraordinary courage or strength of a hero, likens him, when rushing on the hostile ranks, to a lion rushing on a herd of oxen, the figure is both appropriate and exact in respect of the matter to be exemplified, the fury of the assault and the superiority of the assailant to his adversaries."

হোমার উপমার অলঙ্কারের দিকটিকে বিস্তৃত ক'রেছেন এমনভাবে যে শেষ পর্যন্ত উপমা তার নিজস্ব বেষ্টনরেখা অতিক্রম করিয়াছে—যা'কে সমালোচক বলেছেন : "the extension namely. or enlargement of the ornamental element of the comparison beyond the limits of the comparison itself."

হোমারের উপমার ক্ষেত্রে আমার সর্বশেষ উদ্ধৃতি :

"There are two main purposes for which similes may be introduced : first, that of illustrating the mode, secondly, that of marking the degree in which an action or object is exhibited. In the latter case, any close correspondence between the two members of the parallel is the less to be expected. The figure here, in fact, often becomes rather a poetical hyperbole than a comparison. When, for example, Achilles sweeping the flying enemy before him is compared to a fire ravaging a forest, the figure is purely hyperbolical. Still however, it is appropriate, as enhancing the irresistible ardour of the hero, and the rapidity of his destructive power." দুটি প্রধান উদ্দেশ্যে উপমা প্রয়োগ করা হ'য়ে থাকে : প্রথমতঃ, বস্তুর চিত্রকল্প নির্মাণের জন্য, দ্বিতীয়তঃ, ঘটনায় প্রকাশমান রূপের তীব্রতা বা গভীরতা নির্ধারণের জন্য। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, উপমান ও উপমেয়-র মধ্যে জাতিগত ঘনিষ্ঠতা না থাকাই সম্ভবপর। বস্তুতঃ এখানে উপমাটি কাব্যগত অতিশয়োক্তির রূপ নিয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ এ্যকিলিস পলায়নকারী শত্রুসৈন্য ধ্বংস করে চ'লেছে এ-ঘটনাকে 'দাবানল একটি বনকে গ্রাস করছে' এর সঙ্গে তুলনা সম্পূর্ণভাবেই 'অতিশয়োক্তি' অলঙ্কার। অতিশয়োক্তি হ'য়েও এটা যথাযথ, কেননা এখানে নায়কের অপ্রতিরোধ্য আবেগ এবং ধ্বংস-ক্ষমতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

হোমারের অনুকরণে মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যে প্রচুর পরিমাণে গতিময় উপমা নির্মাণ করেছেন। শুধু প্রকৃতির দিক থেকেই সমধর্মী নয়, বিষয় বা উপদেশের দিক থেকেও উভয়ের উপমা একজাতীয়! হোমারের কাব্যে সিংহ এবং অগ্নির উপমা এসেছে অনবরত। মধুসূদন হোমারের অনুকরণে বহুবার সিংহ এবং অগ্নির উপমা ব্যবহার ক'রেছেন। আমি এখানে বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য প্রথমে সিংহ বা ব্যাঘ্রের উপমা এবং পরে অগ্নির উপমা উদ্ধৃত ক'রব।

সিংহ বা ব্যাঘ্রের উপমা :

১। অগ্নিময় চক্ষু যথা ঋক্ষপতি রোষে
কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া

বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে।

২। শত প্রসরণে,
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী
গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি,
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী,
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা
ভীমাসমা।

৩। ভয়াকুল ফুল্ল-মনঃ পশিলা অমনি—
ভবানীর বক্ষঃস্থলে, পশয়ে যেমতি—
কেশরী কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে,
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে
বিজলী ঝলসে আঁখি কালানল তেজে।

৪। উল্লাসে দেব চলিলা অমনি
ভাঙ্গিলে শৃঙ্খল লক্ষ্মী কেশরী যেমতি,
যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত
গিরি-গর্ভে।

৫। কেহ বা নাদিলা,
গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিণী—
বীর-মদে, কাম-মদে উন্মাদ ভৈরবী।

৬। কাল সিংহী পশে যে বিপিনে,—
তার পাশে বাস যার সতর্ক সতত—
উচিত থাকিতে তার। কখন, কে জানে,
আসি আক্রমিবে ভীমা কোথায় কাহারে!

৭। দক্ষিণ দুয়ারে ফেরে কুমার অঙ্গদ—
ক্ষুধাতুর হরি যথা আহার-সন্ধানে।

৮। দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে—
হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে!

৯। একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথে
ভ্রমিতেছিনু কাননে; দূর গুল্ম-পাশে
চরিতেছিল হরিণী! সহসা শুনিনু
ঘোর নাদ; ভয়াকুলা দেখিনু চাহিয়া
ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে!
'রক্ষ, নাথ,' বলি আমি পড়িনু চরণে।

শরানলে শূর-শ্রেষ্ঠ ভস্মিলা শার্দূলে
মুহূর্তে। যতনে তুলি বাঁচাইনু আমি
বন-সুন্দরীরে, সখি। রক্ষঃকুল-পতি,
সেই শার্দূলের রূপ ধরিল আমারে।

১০। মায়া-জালে বেড়িব রাক্ষসে।
নিরস্ত্র, দুর্বল বলী দৈব-অস্ত্রাঘাতে,
অসহায় (সিংহ যেন আনায় মাঝারে)
মরিবে,—বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে ?

১১। অতি দ্রুত চলিলা সুমাত,
হেরি মৃগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা
অস্ত্রালয়ে—বাছি বাছি লইতে সত্বরে
তীক্ষ্ণতর প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে।

১২। ঘন বনে, হেরি দূরে যথা
মৃগবরে, চলে ব্যাঘ্র গুল্ম-আবরণে,
সুযোগপ্রয়াসী.....
অদৃশ্যে, লক্ষ্মণ-শূর, বধিতে রাক্ষসে,
সহ মিত্র বিভীষণ, চলিলা সত্বরে।

১৩। বৃষপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে
শূরেন্দ্র।

১৪। চাহিছে কেহ রঘুসৈন্য পানে
অগ্নিময় আঁখি রোষে বাঘিনী যেমনি—
(জালাবৃত) ব্যাধবর্গে হেরিয়া অদূরে।

এ-সমস্ত উপমাকে বস্তু-বর্ণনা বলা চলে না, কেন না এসব ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য বস্তুকে অলঙ্কৃত করা হয়নি, অধিকতর মনোহর করবার চেষ্টাও নেই। চেষ্টা আছে বস্তুকে ব্যাখ্যা করবার, তার শক্তি নির্ণয়ের এবং তার প্রাণধর্ম নির্ধারণের। সব ক্ষেত্রেই মধুসূদন যে সার্থক হয়েছেন তা' বলা চলে না। সম্পূর্ণ নতুন একটা কিছু নির্মাণের আবেগে অনেক সময় কবি প্রয়োগসিদ্ধতার কথা চিন্তা করেন নি। তৃতীয় উদাহরণটি এর একটি নিদর্শন। কামদেবের ফুল-ধনু ভবানীর বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করল যেন কেশরিণীর কোলে আশ্রয় গ্রহণ করল সিংহ-শাবক। এখানে অসংগতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। ফুল-ধনু আশ্রিত হয় না—চঞ্চল করে এবং হিংসা জাগায়।

প্রথম উপমাটি সংবাদ-পরিবেশনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, তাই

তার বিস্তার আছে এবং ব্যাখ্যা আছে। রামচন্দ্র আক্রমণ করলেন কুমারকে যেমন করে সিংহ আক্রমণ করে বৃষকে। মূলতঃ এ-দুটিই হচ্ছে সমান্তরাল ঘটনা, কিন্তু কবি বৃষস্কন্ধে সিংহের লম্ফপ্রাদানকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং তার স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন। কবির লক্ষ্য হল রামচন্দ্রের আক্রমণের উপর এ-সমস্ত গুণ আরোপ করা।

দ্বিতীয় উদাহরণে সিংহ এসেছে গৌণভাবে। এখানে মুখ্য উপমান হল ব্যাধ-দল কর্তৃক গহন কানন বেষ্টন।

অষ্টম উদাহরণে সীতার অসহায়তার সঙ্গে রাক্ষসদের নিশ্চিন্ততার প্রতিতুলনা নির্মিত হয়েছে—একদিকে হীন-প্রাণা হরিণী, অন্যদিকে নির্ভয়হৃদয় বাঘিনী। উপমাটি এখানে অত্যন্ত সজীব এবং যথাযথ।

নবম উদাহরণে মধুসূদন একটি নতুন কৌশল অবলম্বন করেছেন। এটাকে বলতে পারি স্মৃতি-নির্ভর বেদনাবৃত্তি। উপমানের একটি উদার বিস্তার আছে, যাকে বলা যায় illustrative imagery. ভার্জিলের ইনিডের মধ্যে এ-ধরনের কাহিনীগত চিত্রধর্মী উপমা আছে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। উদাহরণটি একটি ইংরেজী অনুবাদ থেকে নেওয়া—

"So speaks the god, and quicker than he speaks he smooths the swelling seas, and scatters the collected clouds, and restores the day. Cymothoe and Triton together lend their help, and push the ships off the jugged rocks, he himself heaves them with his trident, and opens the vast quick-sands, and calms the water's surface; and lightly with his wheels glides over the crests of the waves. As oft we see, when in a great people arises suddenly a tumult, and the ignoble croud rage angrily, presently brands and stones begin to fly; their fury finds them arms; but presently, if they chance to see a man dignified by propriety and virtues, they are silent and stand by with listening ears; he guides their souls by his words, and sooths their passions. Thus all at once is hushed the roaring of the sea, as soon as the Father looking out o'er its surface, and borne onwards through

the cloudless sky, guides his steeds, and as he flies, loosens the reins to speed his gliding car."

["দেবতা কথা বললেন। কথা বলবার চেয়েও দ্রুততার সঙ্গে তিনি উত্তাল সমুদ্রকে শান্ত করলেন এবং পুঞ্জীভূত মেঘরাশিকে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে দিয়ে দিবসের সূর্যকে মেঘমুক্ত করলেন। সাইমোথোয়ে ও ট্রিটনের সহযোগিতায় দেবতা শিলাস্তূপে আবদ্ধ জাহাজগুলোকে বাইরে ঠেলে মুক্ত করে দিলেন। তিনি ত্রিশূল দিয়ে শিলারাশিকে স্তূপীকৃত করলেন, চোরাবালিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে পথ তৈরী করলেন আর সমুদ্রকে শান্ত করলেন। সমুদ্রের তরঙ্গমালার উপর দিয়ে তিনি ধীরে ধীরে তাঁর রথের চাকা চালিয়ে নিয়ে গেলেন। মাঝে মাঝে আমরা যেমন দেখি যখন কোন জনমণ্ডলীর মধ্যে আকস্মিকভাবে গোলযোগের সৃষ্টি হয় বা নিম্নজাতীয় জনতা ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তখন ক্রোধবশতঃ তারা হাতে অস্ত্র তুলে নেয় এবং পাথর বা অস্ত্রাদি ছুঁড়ে মারতে থাকে। কিন্তু এসময় ঘটনাচক্রে কোন মর্যাদাসম্পন্ন ও পুণ্যবান ব্যক্তির আবির্ভাব হলে তারা নীরবে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শোনে। সেই পুণ্যবান ব্যক্তি তখন অমৃতবচনে তাদের আত্মার পথনির্দেশ করেন এবং তাদের উত্তেজনাকে প্রশমিত করেন। ঠিক তেমনি দেবতাও সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সমুদ্রের গর্জনও আকস্মিকভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়। আর তাঁর অশ্বদল এগিয়ে চলে। রথের গতি দ্রুত করবার জন্য তিনি হাতের বল্গা শিথিল করে দেন।"]

অগ্নির উপমা :

১। সাদী যথা অশ্বিনী-কুমার,
ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী
পরশু,—উঠিল আভা আকাশ-মণ্ডলে,
যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল।

২। শত শত হেন যোধ হত এ সমরে,
যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে
বৈশ্বানর, ভূগর্ভের মহীরুহবৃন্দ।
পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে।

৩। অমনি অম্বিকা,
সুবর্ণ বরণ মন মায়ায় সৃজিয়া,
মায়াময়ী, আবরিলা চারু অবয়বে।

হায়রে, নলিনী যেন দিবা অবসানে
ঢাকিল বদনশশী, কিম্বা অগ্নি-শিখা,
ভস্মরাশি মাঝে পশি, হাসি লুকাইলা।

৪। যথা বায়ু সখা সহ দাবানল-গতি
দুর্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে।
টলিল কনক-লঙ্কা, গর্জিল জলধি;
ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে;—
কিন্তু নিশাকালে কবে ধূম-পুঞ্জে পারে
আবরিতে অগ্নি-শিখা? অগ্নিশিখা তেজে তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল দলে।

৫। চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশা-কালে
হেরি অগ্নি-শিখা ঘরে।

৬। যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,
অগ্নিময় দশদিশ; দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নির্ধূম আকাশে,
সুবর্ণ বারিদ-পুঞ্জে!

৭। অগ্নিময় আকাশ পূরিল কোলাহলে,
যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে,
উগরে আগ্নেয়াগরি অগ্নি-স্রোতোরাশি
নিশীথে।

৮। যথা অগ্নি-শিখা দেখি পতঙ্গ-আবলী
ধায় রঙ্গে, চারিদিকে আইলা ধাইয়া
পৌরজন।

৯। চলিলা অঙ্গনা।
আগ্নেয় তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে।

১০। দহিবে বিপক্ষদলে, শুষ্ক তৃণে যথা
দহে বহ্নি, রিপুদমী।

১১। রুদ্রতেজে বীরভদ্র আশু চেতনিলা
রক্ষোবরে! অগ্নিকণা পরশে যেমতি
বারুদ, উঠিয়া বলি, আদেশিলা দূতে।

১২। জ্বলিছে অম্বর যথা বন দাবানলে।
১৩। যথা গৃহমাঝে বহ্নি জ্বলিলে উত্তেজে,
গবাক্ষ-দুয়ার পথে বাহিরায় বেগে
শিখাপুঞ্জ, বাহিরিল চারি দ্বার দিয়া
রাক্ষস, নিনাদি রোষে।

১৪। হুঙ্কারি শূর নিরস্তিলা সবে,
নিমেষে, কালাগ্নি যথা ভস্মে বনরাজি।

১৫। দেবদল, তেজোহীন এবে,
পালাইলা নর সহ, ধূম সহ যথা
যায় উড়ি অগ্নিকণা বাহিলে প্রবলে
পবন।

এ-উদাহরণগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে মধুসূদনের অগ্নির উপমা অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং সিংহ-ব্যাঘ্রের উপমার চেয়ে সংগততর। সিংহ-ব্যাঘ্রের ক্ষেত্রে অপরিচয়ের জন্যই উপমা সর্বত্র যথাযথ হয়নি। কিন্তু অগ্নির বিভিন্ন রূপ পরিচিত সীমানার মধ্যে—বাঙালী জীবনে অত্যন্ত সত্য ও নৈমিত্তিক। শুষ্ক তৃণে প্রজ্বলন, গ্রাম্য-গৃহে অগ্নি-দাহন, বনস্থলে দাবানলের ধ্বংসলীলা—বাঙালী জীবনে অপরিচিত ব্যাপার নয়। এ-চিত্রগুলোকেই মধুসূদন বারবার ব্যবহার করেছেন, এ-উপমাগুলো আপন অধিকারেই প্রতিষ্ঠিত।

আরও স্পষ্টভাবে বাঙালী জীবনের আনন্দ, আচরণ এবং বিশ্বাসের পরিচয়সূচক অনেকগুলো উপমা মধুসূদন ব্যবহার করেছেন, যেমন—

"হায়রে যেমতি
স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষত কৃষীদল বলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে।

অথবা—

"বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা,
হায়রে, সুমনোহর, বঙ্গগৃহে যথা

দেবদোলোৎসববাদ্য, দৈবদল যবে,
আবির্ভাবি ভবতলে, পূজেন রমেশে।"

অথবা—

"বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে।"

অথবা—

"ক্লান্ত শিশুকুল
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূচর সহ জলচর-আদি
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা।"

মধুসূদন উপমা ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রীক কাব্যরীতিকে আদর্শ করেছিলেন, একথা পূর্বেই ব'লেছি। সিংহ এবং অগ্নি উভয় উপমাই হোমার থেকে গৃহীত কিন্তু অগ্নির উপমার ক্ষেত্রে অনুকরণ বা অনুসরণের পরিচয় নেই। সিংহ বা ব্যাঘ্রের উপমার ক্ষেত্রে অনুকরণ অনেক বেশী স্পষ্ট। এখানে একই উপমার পুনরাবৃত্তি সম্পর্কে কিছু বলা দরকায়।

যে-যুগে হোমার কাব্য রচনা করেছিলেন সে-যুগে শ্রোতার আনন্দময় স্বীকৃতি দ্বারা কাব্যের মূল নির্ণিত হ'ত। একত্রিত শ্রোতৃবর্গ কাব্যের পাঠক্রম অনুসরণ ক'রে কবিতার রসাস্বাদ করত। এ কারণে কবিকে বিশেষ কতকগুলো কৌশল অবলম্বন করতে হত। শ্রোতা যাতে কাহিনীকে অনুসরণ করতে পারে, এবং অনুসরণের সময় যাতে কোনো প্রতিবন্ধকতা না জাগে সেজন্য ব্যাখ্যাযুক্ত দীর্ঘ উপমার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এবং নির্দেশক বিশেষণের ব্যবহার ঘটেছে। কবি শ্রোতার জন্য কোনো কিছু রেখে দেন নি। বক্তব্যের মর্মোদঘাটন পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই যেন ঘটে—সেজন্য উপমা বিলম্বিত এবং বিস্তৃত হ'য়েছে। প্রতিটি উপমা একটি পরিপূর্ণ চিত্ররূপে জেগেছে। শ্রোতাকে উপমাটি অনুভব করবার জন্য চিন্তা ক'রতে হয়নি—কেননা উপমাটি পরিচিত দৃশ্যের উদঘাটন ক'রেছে। যেমন,—'তার গাল বেয়ে চোখের পানি নেমে এল যেমন ক'রে পার্বত্য ঝরণার পানি কালো রেখায় পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসে; পেত্রোক্লুস একটি ছোট মেয়ের মত কাঁদছে যে-মেয়ে মায়ের কোলে উঠতে চায়। মায়ের আঁচল ধ'রে টানে, চোখভরা পানি নিয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকায় এবং যতক্ষণ না কোলে উঠতে পারে ততক্ষণ তার কান্না থামে না।' E. V. Rieu,-এর অনুবাদ থেকে আরও কতগুলো উদাহরণ দিচ্ছি:

1. "Then he advanced on them like a mountain lion who sallies out, defying wind and rain in the pride of his power, with fire in his eyes, to hunt the oxen or the sheep, to stalk the roaming deer, or to be forced by hunger to besiege toe very walls of the homestead and attack the pens." (Odyssey : Book VI)
2. "Seizing the olive pole, they drove its sharpened end into the Cyclops' eye, while I used my weight from above to twist it home, like a man boring a ship's timber with a drill which his mates below him twirl with a strap they hold at either end, so that it spins continuously." (Odyssey Book IX)

3. "Qdysseus broke down as the famous minstrel sang this lay and his cheeks were wet with the tears that ran down from his eyes. He wept as a woman weeps when she throws her arms round the body of her beloved husband, fallen in battle before his city comrades, fighting to save his home-town and his children from t e disaster. She has found him gasping in throngs of death ; she clings to him and lifts her voice in lamentation. But the enemy come up and belabour her back and shoulders with spears, as they lead her off into slavery and a life of miserable toil, with her cheeks wasted by her pitiful grief. Equally pitiful were the tears that now welled up in Odysseus' eyes. (Odyssey, Book VIII).

4. He was like a stallion who breaks his halter at the manger where they keep and fatten him, and gallops off across the fields in triumph to his usual bathing-place in the delightful river. He tosses up his head , his mane flies back along his shoulders ; he knows how beautiful he is, and away he goes skimming the ground with his feet, to the haunts and pastures

of the mares. Thus Hector sped away, when he had heard the god speak, to lead his charioteers to battle.

(Iliad ; Book XV).

[১। তিনি এক পার্বত্য সিংহের মত এগিয়ে এলেন। যে সিংহ শক্তিমদে মত্ত হয়ে, ঝড়-বৃষ্টিকে তুচ্ছ করে অগ্নিময় চক্ষে বলীর্বদ-মেষ শিকারের জন্য যে বিচরমান হরিণকে অতর্কিতে আক্রমণের জন্য গুহার বাইরে বেরিয়ে আসে। অথবা যে সিংহ গোষ্ঠগৃহের প্রাচীর ডিঙিয়ে গৃহপালিত পশুদের আক্রমণ করে। (অডিসি—৪র্থ খণ্ড)

২। অলিভ গাছের ডালটা সবাই মিলে ধরে সূক্ষ্মাগ্র দিকটা জোরে সাইক্লপ্‌সের চোখের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। আমি ডালটার ওপরে আমার শরীরের ওজন দিয়ে চেপে রেখেছিলাম যাতে সেটা ভাল ভাবে তার চোখ চুকতে পারে। ঠিক যেমন করে জাহাজের তক্তা ছিদ্র করার সময় একজন তুরপনের মাথাটা শক্ত করে ধরে রাখে যাতে তা' ঠিকমত ঘুরতে পারে আর তার সঙ্গীরা নীচে দু'দিক থেকে চর্মপেটী ধরে তুরপুনটা ঘোরাতে থাকে

(অডিসি—৯ম খণ্ড)

৩। খ্যাতনামা গায়কটি যখন এই গানটি গাইল ওডেসিয়াস তখন ভেঙ্গে পড়ল, অশ্রু ধারায় তার গণ্ডদেশ সিক্ত হল। তেমন করে সে কাঁদল—যেমন করে স্ত্রী অশ্রুপাত করে দেশ এবং জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে রণক্ষেত্রে পতিত প্রিয়তম স্বামীর দেহ আলিঙ্গন ক'রে। সে তাকে মৃত্যু যন্ত্রণায় শ্বাসরুদ্ধ দেখে জড়িয়ে ধ'রে উচ্চস্বরে বিলাপ শুরু করে। কিন্তু শত্রুরা এসে যায়, তার পৃষ্ঠদেশে ও স্কন্ধে বল্লম দিয়ে আঘাত করে; তাকে নিয়ে যায় দাসত্ব ও দুঃসহ পরিশ্রমের মধ্যে, দুঃখের দাহনে তার গণ্ডদেশ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। ওডেসিয়াসের চক্ষুতে এখন যে-অশ্রু উথলে উঠল তা তেমনি করুণ।

৪। আহারের পাত্র-সংলগ্ন দড়ি ছিঁড়ে অশ্ব মুক্তির আনন্দে ছুটে যায় মাঠের দিকে, নদীর তীরে যে নদীতে সে কতবার গা ধুয়েছে। মাথা উঁচু করে সে দাঁড়ায়। ঘাড়ের কেশর বাতাসে উড়তে থাকে। কি সুন্দর সে। আবার সে ছুটে যায়। খুরের আঘাতে মাটি কেঁপে ওঠে। সে ছুটে যায় ঘোটকীদের চারণভূমিতে।—দেবতার কথা শুনে হেক্টরও ঠিক তেমনি করেই ছুটে যান যুদ্ধে, রথবাহিনী পরিচালনার জন্য। (ইলিয়ড—১৫শ খণ্ড)]

হোমার অনুভূতি এবং হৃদয়াশ্রিত আবেগকে চিত্ররূপ দিয়েছেন। যেখানে পাঠক-শ্রোতাকে চিন্তা করতে হবে বা উপলব্ধির বিষয়কে লক্ষ্যগোচর করেছে। সেখানে বলা চলত যে, 'মেয়েটি মায়ের কোলে যাবার জন্য আকুল হয়েছে'— সেখানে তিনি আকুলতাকে চিত্রবৈচিত্র্যে ফুটিয়ে তুলবেন; যেমন 'মেয়েটি মায়ের আঁচল ধরে টানছে,' 'পানি ভরা চোখে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়েছে,' 'যতক্ষণ না কেলে উঠ্‌তে পার্‌ছে ততক্ষণ কাঁদছে' ইত্যাদি। এভাবে হোমার তাঁর শ্রোতার জন্য বিশ্লেষণের সুযোগ রাখেননি—প্রগাঢ় সহনাভূতি চিত্ররূপে দৃশ্যমান হ'য়েছে। শ্রোতাকে তিনি চমকিত ক'রেছেন সন্ত্রস্ত ক'রেছেন, বেদনাবৃত্তে আবর্তিত ক'রেছেন, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও অর্থবোধের কারণে চিন্তিত করেননি।

সৈয়দ আলী আহসান করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় বেঙ্গলী অ্যাকাডেমীর ডিরেক্টর। প্রবন্ধটি প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল পূর্ববঙ্গের বিশিষ্ট সাময়িক পত্রিকা 'সমকালে' (চৈত্র ১৩৬৭)।

চতুরঙ্গ

॥ অগ্রহায়ণ—১৩৬৮

প্রবন্ধ পত্রিকা

বর্ষ ২ সংখ্যা ৬
অগ্রহায়ণ ১৩৬৮
১৮৮৩ শকাব্দ

সূচীপত্র

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ১— ৪ ॥ নতুন গল্পের কথা
বেলা দত্তগুপ্ত ॥ ৫— ২০ ॥ 'কালো' কবিতা
আই. সেদফ ॥ ২১— ২৩ ॥ লেবেদেফ
দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য ॥ ২৪— ৩৪ ॥ সাহিত্য ও প্রতীচী
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ॥ ৩৫— ৪৯ ॥ সমাজধর্ম ও সাহিত্য
মৃণালকান্তি ভদ্র ॥ ৫০— ৭৬ ॥ সার্ত্রের দর্শন : আমি ও সে
অতীন্দ্রনাথ বসু ॥ ৭৭— ৮০ ॥ 'নায়কের মৃত্যু'
রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ ৮১— ৯৬ ॥ সাম্প্রতিক ছোট গল্প
সরোজ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৯৭—১১৫ ॥ প্রাচীন ভারতে শ্রেণী-সংগ্রাম

প্রচ্ছদশিল্পী
সুবোধ দাশগুপ্ত

সম্পাদক
রামেন্দু দত্ত | চিত্তরঞ্জন ঘোষ

দাম এক টাকা

ফসল

গল্প-সংখ্যা

লিখেছেন ঃ

অন্নদাশঙ্কর রায়।
মুজতবা আলী।
সমরেশ বসু।
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী।
বিমল কর।
শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়।
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
দেবেশ রায়। ইত্যাদি।

কপি কলেজ ষ্ট্রীটে পারিজা ব্রাদার্সে পাওয়া যাবে।

এজেণ্টরা যোগাযোগ করুন।

সার্কুলেশন ম্যানেজার, 'ফসল'

৩৭, কামিনী স্কুল লেন।

কলিকাতা। হাওড়া।

নতুন গল্পের কথা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা ছোটগল্পে একটা নতুন আন্দোলন নিয়ে এসেছেন বলে কয়েকজন তরুণ লেখক দাবি তুলেছেন। তাঁদের 'নতুন রীতি'র কিছু কিছু গল্প নিয়ে বেশ উত্তেজিত তর্ক-বিতর্কও চোখে পড়ল 'পরিচয়ে'র পাতায়। উত্তাপ যাঁরা সৃষ্টি করতে পারেন তাঁরা যে উপেক্ষণীয় নন—এ সত্যও অনস্বীকার্য।

এ-কালের পাঠক হিসেবে নতুনের আবির্ভাব দেখলে আমার মন খুশি হয়। জীবিত সাহিত্যের ধর্মই তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চিরচলিত অনুবর্তনকে অতিক্রম করে বেরিয়ে আসবার প্রয়াস। তার মধ্যে যা খাঁটি বস্তু—তার মার নেই। নিজের জোরেই তা জায়গা করে নেবে—অভিনন্দন তাকে বরণ করুক আর নিন্দা তাকে ধিক্কার দিক, কোনোটাই আর গণনীয় নয়। আর যদি জীবনকে চেনা-জানার কোনো নতুন সত্য সে না নিয়ে আসে, তা হলে প্রচণ্ড চীৎকার তুলেও তাকে টেঁকানো যাবে না। এটা পুরোনো কথা, আর—অত্যন্ত খাঁটি কথা।

নতুন গল্প বললে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, কিন্তু নতুন রীতিটা কী? চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে আমরা যখন কতগুলো ফর্মের আন্দোলন দেখেছি—এ কি তাই? এইটেই একটু বোঝবার চেষ্টা করা যেতে পরে।

ছবি সম্পর্কে আলোচনার জায়গা এ নয়। কিন্তু এটুকু নিশ্চয় বলা যায় যে মাত্র আঙ্গিকের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটানোই একটা আন্দোলন সৃষ্টির পথে যথেষ্ট নয়। একথা ঠিক যে বহুব্যবহৃত ভাষা, চিরাচরিত প্রয়োগনীতি বা মহাজন পন্থার অনুসরণ নতুন লেখক বা পাঠক উভয়তই ক্লান্তিকর। সুতরাং অভিনব আঙ্গিকের জন্যে কিছু সচেতন প্রয়াস সব সময়ে প্রয়োজন আছে। নতুন রীতি নতুন সাহিত্যের সঙ্গে অপরিহার্যভাবেই অসে। চিরদিনই আসছে।

কিন্তু 'নতুন সাহিত্য'—এই কথাটাই দরকারী। প্রশ্ন হল, বাংলা ছোটগল্পে কোনো নতুন কথা আসছে কি না; কোনো নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষাৎ মিলছে কিনা—যা এতদিন অননুশীলিত ছিল; পাওয়া যাচ্ছে কিনা কোনো নতুন বক্তব্য —যা আমাদের চিন্তাকে আলোড়িত করছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইংল্যাণ্ডে যে 'ব্লুম্‌স্‌বেরি গোষ্ঠীর' বিকাশ ঘটেছিল, আমেরিকায় যে 'লস্ট্‌ জেনারেশন' আবির্ভূত হয়েছিল ডস-পাসোজ কিংবা হেমিংওয়ে প্রমুখ লেখকদের ভেতরে, সাংপ্রতিক কালের যে 'অ্যাংগ্রি ইয়ং-ম্যানের' দল সমগ্র মূল্যবোধের বিরোধী—মোটামুটিভাবে তাঁরা অবক্ষয়বাদী। হেমিংওয়ের কলমে জীবনবোধের দীপ্তি কখনো কখনো চমকে উঠলেও রক্ত ও মৃত্যুর প্রতি তাঁর একটা উদগ্র প্যাশান সামগ্রিক ফলশ্রুতিতে শেষ পর্যন্ত তাঁকে মানবতাবাদের ওপারেই নির্বাসিত করে রেখেছে। লক্ষ্য করবার মতো, সাম্যবাদী চিন্তা চেষ্টা এবং নতুন মানুষের প্রতি একটা উন্নাসিক উপেক্ষাই প্রায় ক্ষেত্রে এইসব নবীন আঙ্গিকবাদীদের প্রধান প্রেরণা। যুদ্ধ, অর্থনৈতিক জীবন, মধ্যস্বত্বভোগীর পরাভূত মননের নৈরাজ্যবাদ, ক্লান্তি এবং ক্ষোভ—এইগুলিই কতগুলি ছোটবড়ো আন্দোলনের আগ্নেয়-শিখর থেকে বারবার উদ্গীরিত হচ্ছে। ঐকান্তিক ব্যক্তিতান্ত্রিকতাই এর প্রধান উৎস।

আমাদের দেশে যাঁরা নতুন রীতির গল্প লেখক, তাঁদের প্রধান অংশই মার্ক্‌সবাদে বিশ্বাসী। যদি তাই হয়, তা হলে অন্তত এই ক'টি সূত্র তাঁরা নিশ্চয় মানেন: (১) ব্যক্তিতান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতার তাঁরা শিকার নন—তাঁরা সমাজের সামগ্রিকতায় বিশ্বাসী; (২) পরীক্ষা করবার অধিকার তাঁদের অবশ্যই আছে—কিন্তু পরীক্ষা-সর্বস্বতা (Experimentation) নিশ্চয় তাঁদের শেষ কথা নয়; (৩) তাঁরা বাস্তববাদী—জীবনগত পরিপার্শ্বের সত্যনিষ্ঠ উপস্থাপনা তাঁদের রচনায় থাকতেই হবে; (৪) তাঁদের রচনায় দেশের মাটি ও মন হবে আশ্রেয়; (৫) এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নতুন সমাজবাদের বক্তব্যই হবে তাঁদের শেষ কথা।

দেখা যাচ্ছে, নতুন রীতির গল্পে মানুষের মনই হল প্রধান অবলম্বন। খুব ভালো কথা—আজকের শিল্পমাত্রেই কম-বেশি "Introvert" হতে বাধ্য। মোটা তুলির রং বুলিয়ে চোখ ভোলানো কিংবা মোটা কাঠামোর লিছক কাহিনী শোনানো—এর কোনোটাই প্রীতিকর নয়। এই মনকে তাঁরা প্রকাশ করছেন, 'চৈতন্য-প্রবাহের' আশ্রয়ে—যার সূচনা করেছিলেন প্রুস্ত-হেন্‌রি জেম্‌স্‌, অনেকটা বিকাশ ঘটিয়েছিলেন ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌—যার পূর্ণ মুক্তি জেম্‌স জয়েসে। এই চৈতন্য-প্রবাহ বাঁক নিচ্ছে কতগুলি প্রতীকের উপলে প্রহত হয়ে এবং শেষ পর্যন্ত একটা মানস-কুহেলির সমুদ্রে গিয়ে বিলয় লাভ করছে।

কিন্তু প্রুস্তের যুগ পার হয়েছি আমরা—হেন্‌রি জেম্‌স্ আর শেষ কথা নয়, সর্বাঙ্গীণ মানবতা সম্পর্কে ভার্জিনিয়া উল্‌ফের উন্নাসিকতার বৈদগ্ধ্য সমাজবাদী লেখকের আদর্শ হতে পারে না। যুদ্ধোত্তর ডাব্‌লিনের সূর্যহীন পথে জেম্‌স্ জয়েস্ একক যাত্রী—তাঁর সহগামী পথিক খুঁজে পাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য। এক কথায়, মানুষের চেতনাপ্রবাহ আজ আর পাতাল-বাহিনী নয়, ঐক-বিষণ্ণতার দুর্গের তা পরিখা নয়—হেন্‌রি জেম্‌সের টেস্ট্ টিউবে তা নতুন করে পরীক্ষিত হচ্ছে না। পৃথিবী আজ বড়ো হয়েছে—দেশে দেশে মানুষে মানুষে নতুন যোগের জোয়ার এসেছে—চেতনা-প্রবাহ আজ বিশ্বচেতনার সঙ্গে মিলতে চলেছে। আজকের পাঠক শুধু এইটুকুই দেখতে চাইবেন, নতুন রীতির গল্পের গতি সেই সম্মুখের অভিমুখে—না বিশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের বুর্জোয়া মনোবিলাস এবং ব্যক্তিক নৈঃসঙ্গ্যের দিকেই ধাবমান? যদি সেই অগ্রগামিতা না দেখি, তা হলে মনে হবে, নতুন গল্প আজ আবার পিছু হঠতে শুরু করেছে—প্রগতি সাহিত্য বহুকাল পূর্বে যাকে বর্জন করেছে তাকেই আবার গ্রহণ করতে চাইছে।

নতুন বাঙালি লেখকদের সম্পর্কে এ আশঙ্কা আমরা করতে চাই না। একটু আগেই যে সূত্রগুলির উল্লেখ করেছি—সেগুলি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সূত্র। নতুন লেখকেরা যে রীতিতেই গল্প লিখুন—তাঁদের লেখায় এই মৌল সূত্র ক'টির সাক্ষাৎ মিললেই আমরা আনন্দিত—তাঁদের সানন্দ অভিনন্দন জানাতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই। প্রথম কথা—তাঁরা বুর্জোয়া পরাভববাদীদের অহংসর্বস্বতার শিকার হবেন না, দ্বিতীয়ত তাঁরা ভাষা এবং শব্দের ভাঙচুর করে নিছক কতগুলো শৌখিন রূপচর্চা চালাবেন না, তৃতীয়ত আজকের জীবনকে বাস্তবের প্রেক্ষিত থেকে নতুন ভাবে উপস্থিত করবেন, চতুর্থত তাঁদের গল্পকে বাংলা দেশের বলেই চেনা যাবে এবং সর্বশেষে তাঁরা যে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এইটি তাঁরা নিশ্চিতভাবে উপস্থিত করবেন।

মনে হচ্ছে, বাঙালি পাঠকদের মনে কিছু কিছু সংশয় তাঁরা এনেছেন। একটি চিঠি আমি পেয়েছি, সেটি অংশত উদ্ধৃত করছি এখানে। চব্বিশ পরগণার রাজপুর থেকে শ্রীযুক্ত বিকাশ বসু চিঠিটি লিখছেন:

"'ছোট গল্প—নতুন রীতি' সম্পর্কে আপনার মতামত কী? আঙ্গিকের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথে পর্যাপ্ত মনোভঙ্গির বদল কি সত্যই হয়েছে? এ আন্দোলনের সঙ্গে কি আমাদের নাড়ীর যোগ আছে?"

এ চিঠির সত্যিকারের জবাব নতুন কালের গল্প লেখকেরাই দিতে পারেন।

নতুন রীতি কথাটা সম্পর্কেও কিছু প্রশ্নের অবকাশ আছে। কোনো একটা বিশেষ রীতিই যে আধুনিকতম—এ দাবি কে করতে পারেন? পৃথিবীর দেশে দেশে অসংখ্য আধুনিক লেখক অসংখ্য গল্প লিখছেন। তাঁদের নবীনত্ব বিষয়ের এবং বক্তব্যের নবীনতায়—কোনো একটি পদ্ধতিই আজ আধুনিকতার নিরিখ নয়। বরং অত্যন্ত সহজ ভাষায় অত্যন্ত গভীর করে বলাই এযুগের প্রধান চরিত্র বলে মনে হচ্ছে। ভাষাকে ভেঙেচুরে, আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে চমকপ্রদ করার চেষ্টা একালের কথাশিল্পীর কাছে ইন্‌ফিরিয়র আর্ট বলেই গণিত হয়ে থাকে। একটু উদাহরণ দিই। গল্পটি ১৯৫৮ সালে লেখা—লেখকের বয়েস তেত্রিশ, নাম হ্যারী মার্কস্ পেট্রাকিস্। আধুনিক গল্পলেখক হিসেবে তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন—

"A week passed. A week in which I saw the Widow Angela every night. Twice we ate in the little restaurant with the candles. Once we drove to an inn outside the city and ate beside a tree-shaded lake. Once we went to a movie and it was a sad love story and she cried. Several times after taking her home I stopped in for a little midnight coffee. She showed me an album of a family photographs. She had been a remarkably well-developed child—"

গল্পটি প্রেমের। অত্যন্ত স্বাভাবিক সহজ ভঙ্গিতে ভালোবাসার বিকাশ দেখানো হচ্ছে। আবেগ, আতিশয্য, কৃত্রিমতা কিছুরই প্রয়োজন হচ্ছে না—নিজের গতিতেই এগিয়ে যাচ্ছে। এবং, যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের ওপর দিয়ে গল্পটি শেষ হয়েছে, তার সঙ্গে এই রীতির সম্পূর্ণ সহযোগ রয়েছে। আসলে, সাহিত্যের নতুনত্ব তার বিষয়ে—তার বিবর্ধনে—তাকে ভাষ্য করার ওপরেই নির্ভর করে। কোনো রীতিই তার পক্ষে একতম নয়—অন্যতম নিয়ন্তা মাত্র।

আরো একটি কথা। রীতি অর্থে কি স্টাইল? আর স্টাইল কি দল বেঁধে গড়া যায়? তা কি লেখকের শিল্প-ব্যক্তিত্বেরই বিশিষ্ট পরিচয় বহন করে না?

নতুন গল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আশা করি, আমাদের এই সমস্ত জিজ্ঞাসা এবং সংশয়ের উত্তর অনুচ্চারিত থাকবে না।

'সমীপেষু'র সৌজন্যে।

'কালো' কবিতা

বেলা দত্তগুপ্ত

আমাদের পত্রপত্রিকায় সম্প্রতি আফ্রিকার কাব্য ও সাহিত্য সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা চোখে পড়ছে। "কৃষ্ণ" মহাদেশের শিল্পীমানসের সন্ধান ও সংবাদ যারা দিচ্ছেন তাঁরা নিঃসন্দেহে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। কিন্তু দু' একটি বিষয়ে এই সব আলোচনার সীমাবদ্ধতা লক্ষ্যণীয়। প্রথমতঃ, আফ্রিকার ভৌগোলিক সংজ্ঞাই খুব স্পষ্ট নয়। দ্বিতীয়তঃ ডেভিড ডিওপ (David Diop), লেওপোল্ড সেডার সেনথর্ (Leopold Sedor Senghor) ব্যতীত অন্য কোন আফ্রিকান কবি সাহিত্যিকের নামোল্লেখও প্রায়ই পাওয়া যায় না। এমন সব কবি ও সাহিত্যিকের উল্লেখ চোখে পড়ে যাঁরা আফ্রিকান নন, যেমন, লিওন দামা (Leon Damas) যিনি ফরাসী-গায়না-বাসী। গেব্রিএল ওকারা (Gabriel Okara), বারনার্দ দাদি (Bernard Dadie), মোরু-ইয়েসুফু গিওয়া (Moru-Yesufu Giwa), দেনিস ওসাদবে (Dennis Osadebay), দেই আনঙ্গ (Dei Anang), মাবেল ইমুখুএদে (Mabel Imoukhuede) প্রমুখ কবি কিংবা পিটার অ্যাব্রাম্‌স্ (Peter Abrams), কামারা লিই (Camara Laye), মঙ্গো বেটি (Mongo Beti), চিনুয়া আচেবে (Chinua Achebe), ফার্দিনান্দ ওয়োনো (Ferdinand Oyono) এজা বোটো (Eza Boto) প্রমুখ সাহিত্যিকদের উল্লেখ প্রায়ই থাকে না। অথচ একান্তভাবে আফ্রিকার "মাটির সন্তান" এসব লেখক কবির লেখা না জানতে পারলে সাম্প্রতিক আফ্রিকার সাহিত্যের কোন সন্ধানই পাওয়া যাবে না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আফ্রিকার নবজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে নিগ্রো সাহিত্যের একটু বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। নিগ্রো সাহিত্যের পটভূমি শুধু আফ্রিকা নয়, আমেরিকা, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়নের বিস্তৃত অঞ্চল-ও। তাই এ প্রবন্ধে আফ্রিকা ছাড়াও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, লাতিন আমেরিকা, জ্যামাইকা, হাইতি, কিউবা প্রভৃতি সুদূরবিসারী অঞ্চলের কাব্য সাহিত্য আলোচিত হয়েছে। নিগ্রো সাহিত্য প্রধানত ফরাসী, স্প্যানিশ ও পর্ত্তুগীজ ভাষার মাধ্যমেই আত্ম-প্রকাশ করেছে। ইংরেজি অনুবাদ বহুল নয় বলে নিগ্রো সাহিত্যের খুব সামান্য

অংশের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় লাভ ঘটেছে। উপকরণের স্বাভাবিক অপ্রাচুর্যের মধ্যেও নিগ্রো সাহিত্যের প্রয়াস ও প্রচেষ্টার একটি তন্নিষ্ঠ চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করছি। তথাপি এ প্রবন্ধ খণ্ডিত ও সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য, কারণ তামাম নিগ্রো দুনিয়ার খবর রাখা সহজ নয়। তার জন্য প্রয়োজন নিগ্রো সাহিত্য সম্বন্ধে স্থিরভাবে আলোচনা ও গবেষণা।

আফ্রিকার আত্মার সুর, তার সাহিত্য নিহিত আছে তার লোকায়ত সম্পদে, তার অযুত ছড়া, প্রবাদ, লোকগাথা ও লোকশ্রুতিতে। Stouck তাঁর আফ্রিকার লোকগাথার গবেষণায় বলেছেন যে শুধুমাত্র উত্তর আফ্রিকাতেই (উত্তর নাইজেরিয়া, উত্তর ঘানা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল) ২৫০০০০ লোকগাথা প্রচলিত আছে ; মিথ বা দেবকাহিনীর সংখ্যা ৫০০০০ এবং প্রবাদ অন্তহীন। প্রবাদের বহুল প্রচলন লক্ষ্য করে জনৈক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী মন্তব্য করেছিলেন "The chaga have four big possessions—land, cattle, water and proverbs." বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষায় (গা, চি, ইওরুবা, শান্টি, ফান্টি) নিহিত অসংখ্য সাহিত্যধর্ম্মী স্ফুলিঙ্গ এবং কখনো কখনো পূর্ণাঙ্গ কাব্যও দেখতে পাওয়া যায়। সাহিত্যিক সুষমামণ্ডিত হলেও এই লোকায়ত কাব্যের স্থান স্বতন্ত্র। রাজনৈতিক চেতনা ও সমাজমুখীনতা আফ্রিকার বর্তমান কাব্যসাহিত্যের মূল্যায়নের এক নিগূঢ় মানদণ্ড। এর প্রমাণ পরে দেবো। বিশিষ্ট কয়েকটি ভাবধারায় বর্তমান আফ্রিকা নিষিক্ত, আপ্লুত। স্বাধীনতা, মুক্তির এক দুর্ম্মর আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ তার প্রতিটি কর্ম্মে, এষণায় ; পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়া, উগাণ্ডা হতে শুরু করে কেপ টাউন অবধি প্রতিটি শহর বন্দরের আকাশে বাতাসে একটি মাত্র আওয়াজ "উহুরু" ("UHURU"), 'Hell with the whiteman's halo'। শুধু আফ্রিকার পূর্বার্ধ নয়, পশ্চিমার্ধে, উত্তরে দক্ষিণে সর্বত্র এই মুক্তির প্রয়াস। প্যাট্রিস লুমুম্বার কবিতার ভাস্বর সৌন্দর্য্য আজ এদেশে সুধীমহলে আর অজ্ঞাত নয়। সেনেগালের তরুণ কবি মুস্তাফা মাদে আমাদু-র 'ফ্রিডম' কবিতাটি স্বাধীনতার দুর্জ্জয় কেতন। তিনি লিখছেন ঃ

Freedom !
In the name of ancient Africa
I have come out of the mirk

of Night
To sing thy praise.
... ...
Freedom for country
which I adore.

শুধুমাত্র পরাধীনতার গ্লানি থেকে বাঁচা নয়—মানুষের মত বাঁচা, বিত্তে, ঐশ্বর্যে, বাঁচার বিস্ময়ে বাঁচা, নতুন আফ্রিকার এই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। এবং বাইরের বৈভব নয়, আন্তর সম্পদেও মহীয়ান হয়ে বাঁচতে চায় নতুন আফ্রিকার মানুষ। Apartheid-এর দূরত্বে নয়, মৈত্রীর মিলনসূত্রে। এই বিশিষ্ট ভাব-ধারাগুলিরই প্রকাশ বর্ত্তমান আফ্রিকার কাব্যে, সাহিত্যে, নৃতত্ব-গবেষণায়, রাজনীতির অধ্যয়নে।

এ সবেরই একটি ক্রমবিকাশের সূত্র আছে, আছে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পশ্চাদভূমির বিভিন্ন অথচ স্বাম্বয়ী ঘটনার ধারা উপধারা। ১৮২০ সনে লাই-বেরিয়ার জন্ম হয়—১৮৪৭ সনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে। লাইবেরিয়ার জন্মে কালো মানুষের স্বাধিকারের সোপান তৈরী হ'ল যেন। কিন্তু লাইবেরিয়ার জন্মের বহু আগে থেকেই দুর্ব্বার এক যুক্তির অভীপ্সায় বিধৃত ছিল আমেরিকার দীর্ঘবিসারী প্রান্তর হতে আরম্ভ করে ক্যারিবিয়ন, গিনিউপকূল। আমেরিকার জীবন ও প্রান্তরের প্রসারতা সত্ত্বেও কালো মানুষের মুক্তির পথ খুঁজে পেতে বহু বৎসর কেটে গেছে কিংবা বুঝি rat race-এর গোলক ধাঁধায় আজও ঘুরে মরছে আমেরিকার কালো মানুষ। আমেরিকার নিগ্রো সমাজবিজ্ঞানী ফ্রাঙ্কলিন ফ্রেজিয়ারের "Black Bourgeoisie"র উদ্ভবের আশঙ্কা সত্ত্বেও নিগ্রোদমন ও race riot-এর প্রাবল্য কমেনি আমেরিকায়। সাম্প্রতিককালে Little Rock-এর দুর্বিনীত কাহিনী তো সভ্যসমাজকে স্তম্ভিত করেছে! বৃটেনের Nottinghill Gate-এর কাহিনীও কম লজ্জাজনক নয়।

দানবীয় দমনের চেহারা আরও তীব্র, তীক্ষ্ণ হয়ে দেখা দিয়েছিল আফ্রিকার শ্বেত উপনিবেশগুলিতে। সভ্যের বর্ব্বর লোভে ছিন্নভিন্ন হয়েছে আফ্রিকা—ভূমধ্যসাগর হতে উত্তমাশা অন্তরীপ অবধি। ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, জার্মান, বেলজিয়ান, ব্রিটিশ—যাবতীয় ইওরোপীয় ধনতান্ত্রিক দেশের শোষণের লীলাভূমি হয়ে ওঠে আফ্রিকা। কৃষ্ণ মহাদেশকে সভ্য ও উন্নত করবার মুখোসের আড়ালে

চলে তার ধনসম্পদ লুণ্ঠনের হাজারো রকম কলাকৌশল। গ্রামের যূথবদ্ধ জীবনের পরিবেশে ফরমায়েসী শহর গড়ে তুললো ঔপনিবেশিকের দল। তাদের কলকারখানা, ক্ষেত-খামার; ফ্যাক্টরীর fodder হিসেবে ব্যবহার করা হল অযুত আফ্রিকানদের। Culture conflit ও tensionএ গোষ্ঠীসংবদ্ধতায় চিড় খেলো, আফ্রিকানদের পরিবারেও ভাঙ্গল ধরলো। এই disintegration-এর ছবি বহু সমাজবিজ্ঞানীর লেখায় দেখতে পাওয়া যায়। Banton-এর West African City, কিংবা Mr. & Mrs. Sofer-এর "Jinja"—a study in an African Community of Uganda; কিংবা Dr. K. A. Busiaর Sekondi-Takoradi, a Soial Survey—বইগুলি এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট আলোকপাত করবে। Dr. K. A. Busia দেখিয়েছেন যে disintegation of family system, conflict of cultural values, temptation of the town এ সবই ইন্ধন জুগিয়েছে juvenile delinquencyর। Boma boys এবং Plot boysএ দেশ ছেয়ে গেছে এবং এদের "Commonest offences are against poverty."

দারিদ্র্যের চেহারাও অসাধারণ। আফ্রিকান সম্বন্ধে UNESCOর হালের রিপোর্ট মানুষের সভ্যতা-অভিমানকে লজ্জা দেবে। সাধারণভাবে আফ্রিকার শতকরা ৮৫।৯০ জন মানুষ অক্ষরপরিচয়হীন। সালাজারের দোর্দণ্ডপ্রতাপের এমনই মহিমা যে পর্তুগীজ আঙ্গোলায় শতকরা ২ জন স্কুলে যায়। কেনিয়ায় একজন শ্বেতাঙ্গ ছাত্রের জন্য শিক্ষাখাতে সরকার বাৎসরিক ৮ পা. ১০ শি. খরচ করেন। সেক্ষেত্রে একজন অশ্বেত কেনিয়াবাসীর জন্য খরচ বাৎসরিক ১ শিলিং ৫ পেন্স অর্থাৎ $\frac{১}{১৮০}$ অংশ। অথচ এই সামান্য খরচ করেই ব্রিটিশদের আত্ম-সন্তুষ্টির অন্ত নেই—We are doing a lot for the African people! আলবার্ট সোয়াইৎজারের অন্তরের অগ্নিমন্থ "I am atoning for the white-man's crime in Africa" এই বাণী ব্রিটিশদের দম্ভে আঘাত খেয়ে ফিরে আসে মনে হয়। আর তাই না Hola Camp সম্ভব হয়েছে কেনিয়াতে। ১৮৬১ সন থেকে ১৯৬০ সন অবধি বৃটিশ ছত্রচ্ছায়ায় থাকবার পর নাইজেরিয়ায় আজ শতকরা ৯৫ জন নিরক্ষর; সেখানে প্রতি ১০০০০০ মানুষের জন্য একজন ডাক্তার ও প্রতি ২৫০০০ মানুষের জন্য একজন নার্স। বৃটিশ রক্ষণাধীন জাঞ্জিবার মাত্র ৬০ জন ডাক্তার অথচ সেখানকার লোকসংখ্যা লক্ষাধিক। সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত মালাগাসীতে (পূর্বতন ফরাসী মাদাগাস্কার) ৪৬০ জন ডাক্তার।

মালাগাসীর আয়তন ২২৮০০০ বর্গ মাইল ; মালাগাসীর লোকসংখ্যা ৫০ লক্ষ। ফরাসী অধিকৃত তিউনিসিয়ায় শতকরা ৮১ জন লোকের অক্ষর পরিচয়ের সৌভাগ্য হয় নি।

নীরবে এই নির্ম্মম অত্যাচার এক নিষ্ঠুর বিধাতার দান রূপে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না আফ্রিকার কালো মানুষের। তবু এর ভিতর থেকে উদ্ভব হয়েছে মানবপ্রেমী কবি, সাহিত্যিক ও রাজনীতিজ্ঞের। আজ হতে ৪০ বছর আগে ১৯২১ সনে রেনে মারাঁ (Rene Maran)-র **Batuoala** প্রকাশিত হয়। আফ্রিকার ফরাসী অধিকৃত বিষুবীয় অঞ্চলে সুসভ্য ফরাসী জাতি সেখানকার নিগ্রোদের জীবন ও সভ্যতার উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে "বাতোয়ালা" তার বেদনাময় কাহিনী। রেনে মারাঁ-র জন্ম হয় মার্তিনিকে—মা বাবা ছিলেন ফরাসী গায়নার লোক। আফ্রিকার শ্বেত মহাজনদের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে অক্লান্ত ছিল রেনে মারাঁ-র লেখনী—সূচীমুখ যন্ত্রণা অনুভব করেছেন কালো মানুষের দুঃখদুর্দ্দশায়। সেই বেদনার্ত অনুভবের অনবদ্য অবদান এই "বাতোয়ালা"। তাঁরই বিরতিহীন প্রচেষ্টায় ও প্রেরণায় ফরাসী আফ্রিকার নিগ্রোরা আজ মুক্তির স্বাদ পেতে শুরু করেছে। ১৯২১ সনে 'বাতোয়ালা' প্রকাশিত হবার পর রেনে মারাঁকে ফরাসী গকুঁর (Goncourt) পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯৩৬ সনে 'বাতোয়ালা' ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয় কিন্তু প্রকাশক মাত্র দেড় হাজার কপি বই ছাপিয়েছিলেন এবং প্রতিটি বইয়ে ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া ছিল—উদ্দেশ্য মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকই যেন সভ্য মানুষের এ কলঙ্কের কথা জানতে পারে।[১] রেনে মারাঁ-র মৃত্যু হয় মাত্র ১৯৬০ সনের মে মাসে। রেনে মারাঁর 'বাতোয়ালা' সত্যই এক নতুন দিগন্তের আকাশপ্রদীপ। ইংরেজ লেখক জয়েস কেরী-ও ইংরেজী ভাষাভাষী মানুষের আফ্রিকা সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর লেখা Aissa Saved (London 1932) An American Visitor (London 1933), The African Witch (London 1936), Mister Johnson (London 1939) আফ্রিকার জীবনের সর্ব্বতলার বিশ্লেষণে সার্থক

১। এখানে লিখতে গর্ব্ব অনুভব করছি যে রেনে মারাঁ-র "বাতোয়ালা" এশীয় ভাষার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বাংলাতেই অনুবাদ হয়। "এরাও মানুষ" নাম দিয়ে অনুবাদ করেছেন শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। এরাও মানুষ (র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব—কলিকাতা, ১৯৫০)।

রচনা। জয়েস কেরীর অনন্যসাধারণতা স্বীকার্য হলেও, রেনে মারাঁর প্রভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রধর্ম্মী ছিল এবং তাঁর বিদ্রোহী প্রতিভা পরবর্ত্তী কালে আমে সেজেয়ার, লিওপোল্ড সেতার সেজখর, লিওন দামাস ও আরও অজস্র কবি সাহিত্যিককে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও লাতিন আমেরিকার কবিসাহিত্যিকেরা অবশ্য নীরব ছিলেন না। যুক্তরাষ্ট্রে রিচার্ড রাইট (Richard Wright), ল্যাংস্টন হিউস্ (Langston Hughes), কাউন্টি কালেন (County Cullen), পল লরেন্স ডানবার (Paul Lawrence Dunber); হাইতির কবি অসওয়াল্ড ডুরাণ্ড (Oswald Durand); কিউবার নিকোলাস গিলেন (Nicolas Guillen); জ্যামাইকার ক্লোদ ম্যাকে (Claude Mckay) এবং আরও অনেক কবিসাহিত্যিক নিগ্রো জীবনের আশা, নিরাশা, আনন্দ ও আর্তির জীবনময় রূপ মেলে ধরেছেন তাঁদের লেখায়। রিচার্ড রাইটের "কালো ছেলে" আশ্চর্য্য জীবনঘনিষ্ঠ রচনা। ল্যাংস্টন হিউস তাঁর অসংখ্য গল্পে, কবিতায় নিগ্রো জীবনের সরু মোটা কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর "প্রত্যাবর্ত্তন" গল্পটি তীব্র এক বেদনাময় অনুভূতির সৃষ্টি করে পাঠকের মনে। একদিকে সাদা মানুষের বিরুদ্ধে অসহ্য ক্রোধে বিক্ষুব্ধ হয় সমস্ত অন্তর আর সেই সঙ্গে কালো মানুষের জন্য ফুটে ওঠে মমতার, ভালবাসার এক আশ্চর্য রক্ত গোলাপ। Song for a dark girl এই কবিতাটিতেও সেই স্থির বিষণ্ণ মাধুরী—

"Way down South in Dixie
(Break the heart of me)
Love is a naked shadow
On a gnarled and naked tree"

অসমতল প্রেমের "The same old spark !"-এর অনুভব সত্ত্বেও কী নিদারুণ পরিণতি Lynching-এ। হিউসের "I, too, sing America" কবিতাটিতে একদিকে যেমন শ্রেণীভেদের তীক্ষ্ণতা ফুটে উঠেছে অন্যদিকে তেমনি ফুটেছে এই অচলায়তন ভাঙবার এক প্রদীপ্ত প্রতিজ্ঞা।

কাউন্টি কালেনের লেখাতে ও সেই তির্যক, শ্লেষাত্মক ভঙ্গির সাক্ষাৎ মেলে। "For a Lady I Know" এই কবিতাটিই ধরা যাক। সূক্ষ্ম একটি মাত্র খোঁচায় সমগ্র মার্কিন সমাজের ভারসাম্যের চেহারা স্পষ্ট হয়েছে। উৎকটভাবে

শ্বেতবিদ্বেষ বা তার প্ররোচনা নেই কোথাও অথচ সূক্ষ্ম রেখার টানে অপূর্ব্ব ফলশ্রুতি ঘটেছে।

"She even thinks that up in heaven
Her class lies late and snores,
While poor black cherubs rise at seven
To do celestial chores."

অর্থাৎ, স্বর্গে গিয়েও ঢেঁকির ধানভানার গর্ব্ব থামবে না।

পল লরেন্স ডানবার-এর Sympathy কবিতাটি প্রথম চরণ থেকেই অত্যন্ত মরমী "I know what the cage bird feels, alas!" এই কবিতাটি বিশেষ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। কবি যে সমাজের নিগড়ে বন্দী নিগ্রোদের দুঃখে সংবেদনশীল এই সত্যটি Sympathy কবিতাটি একবার মাত্র পড়লেই নিবিড় ভাবে অনুভব করা যায়।

ক্যারিবিয়ান কবি নিকোলাস গিলেনও নিগ্রোদের দুঃখদুর্দ্দশা সম্বন্ধে লিখেছেন—লিখেছেন নিগ্রোদের সম্বন্ধে শ্বেত প্রভুদের আশ্চর্য্য নির্ব্বিকল্প মনোভাবের কথা। কিউবা প্রভৃতি অঞ্চলের আখের আবাদ পৃথিবীপ্রসিদ্ধ। ডেমেরার চিনি নাগরিক জীবনে delicacy-র সামগ্রী। অথচ এই আখ ক্ষেত, চিনি তৈরীর পিছনে কত না রক্তাক্ত কাহিনী সঞ্চিত আছে! নিকোলাস গিলেনের Cane কবিতাটি পড়লেই সেই বেদনান্তক পশ্চাদপটটি আশ্চর্যভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

Negro
in the cane fields.
White man
above the cane fields.
Earth
beneath the cane fields.
Blood
that flows from us.

কী অদ্ভুত গভীর অনুভূতির শেষ দুটি লাইন। প্রায় জাপানী অথবা চীনে আঙ্গিকে দু' একটি রেখার টান টেনে সমগ্র perspectiveটি তুলে ধরা হয়েছে

অভাব অভিযোগের কোন কথা নেই, নেই কোন জঙ্গী মনোভাবের পরিচয় অথচ নির্বেদ অনুভূতির ভিতর দিয়েই কবি কী অপূর্ব্ব নিপুণতায় ছুঁয়ে গেলেন আমাদের অন্তর।

আরেকটি অপূর্ব্ব কবিতা ক্লোদ ম্যাকের "Harlem Shadows"; ক্লোদ ম্যাকে জ্যামাইকার কবি, বিচিত্র-ঘটনা-বহুল এ কবির জীবন। তবে "নরকে আমার যাত্রা অলকার গন্ধ গায়ে মেখে"—তাই জীবনের সমস্ত রকম নরক যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে গিয়েও দুর্লভ এক মানবপ্রেমের রসসিক্ত নিসর্গনির্ভর অনুভূতি তাঁর কাব্যসাহিত্যে। Harlem নিউইয়র্ক শহরের নিগ্রো 'ঘেটো'। এই চতুষ্কোণের মধ্যে তমসার তীক্ষ্ণতায় বহু নিগ্রোর জীবন অতিবাহিত হয়। প্রচণ্ড অভাবে মেয়েরা দেহ বিক্রিতে অভ্যস্ত হয় যৌবনের প্রারম্ভেই। সেই Harlem-বাসিনী দুঃখিনীদের বেদনাময় ইতিহাস এই কবিতা Herlem Shadows।

Ah, stern harsh world, that in the wretched way
of poverty, dishonour and disgrace,
Has pushed the timid little feet of clay,
The sacred brown feet of my fallen race!
Ah, heart of me, the weary, weary feet
In Harlem wandering from street to street.

কিন্তু এসব কবিসাহিত্যিকদের প্রায় সবাই শুধুমাত্র সাহিত্যের মধ্য দিয়ে নিগ্রো ও সাদামানুষের দ্বন্দ্বের কাহিনীর রূপদান করেই ক্ষান্ত হন। মিশনারী সুলভ আত্মত্যাগ ও অ্যাপোক্যালিপটিক দূরদর্শন রেনে মারাঁর মধ্যে যতটা প্রত্যক্ষ করা যায় উপরোক্ত কবিদের মধ্যে তা সমপরিমাণে পরিলক্ষিত হয় না। আফ্রিকা সম্বন্ধে রিচার্ড রাইটের মোহভঙ্গ কৃষ্ণ কবিসাহিত্যিক মহলে এক বিক্ষোভের সঞ্চার করে।

আফ্রিকা, তথা পশ্চিম আফ্রিকার (বিশেষ করে বৃটিশ ও ফরাসী অধিকৃত আফ্রিকার) বুদ্ধিজীবীরা রেনে মারাঁ এবং ক্যারিবিয়ান ও আমেরিকান কবি সাহিত্যিকের লেখা ও ভাবধারায় যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হন। দুই সভ্যতার সঙ্করভূমি পশ্চিম আফ্রিকার কবিসাহিত্যিকেরা আজ কাব্যাদর্শ ও কাব্য-প্রকরণের দিকনির্ণয়ে কিছুটা দিকভ্রান্ত। তবে আপাতলক্ষ্য স্বাধীনতা-র

ফলপ্রাপ্তির পর তারা যে "বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহার সেইখানে স্থান আছে আমারো" এই নতুন উদ্‌গীথ প্রচার করছেন তার প্রমাণও আমরা পাই আধুনিক নিগ্রো সাহিত্যে।

পশ্চিম আফ্রিকায় বিশেষ করে ঘানা, নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন প্রভৃতি অঞ্চলে ইওরোপীয় দেশের সঙ্গে সংযোগের ফলে এক নতুন ধরণের সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে—তাকে মিশ্র সংস্কৃতি বললে ভুল বলা হবে না। এই বিশেষ অবস্থা উদ্ভবের পিছনের ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসন পত্তনের ইতিহাস। প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী Raymond Firth লিখেছেন—

"Apart from the general problems of raising real incomes and standards of living in the territories as a whole a special set of problems is posed by the urban centres. The urban drift, always a matter of concern, has been greatly accelerated by the war. In the coast towns in particular, conditions of overcrowding are often severe, and problems of high rents, unemployment, family dislocation, juvenile delinquency are present to a high degree....."

এক কথায় আফ্রিকার জীবন আজ নষ্টনীড়। ফলে, আফ্রিকার বুদ্ধিজীবীরা আজ চিন্তার জগতে এক উপপ্লবের সম্মুখীন হয়েছেন। দেশাত্মবোধের, ঐতিহ্য আশ্রয়ের ও পশ্চিমী সভ্যতার সম্মোহনমুক্ত রূপ যেমন স্পষ্ট তেমনি অন্যদিকে দেখি পশ্চিমী দেশের ভাবধারায় নিষিক্ত হওয়ার অভিলাষ। এই কারণে কবিসাহিত্যিক মহলে একদিকে যেমন একটি purist মনোভাবের প্রাবল্য যে আফ্রিকার কাব্যসাহিত্য আফ্রিকার নিজস্ব ভাষাতেই লেখা হবে, অন্যদিকে আবার ইংরেজি, ফরাসী, স্প্যানিশ ভাষার মাধ্যমে কবিসাহিত্যিকদের আত্মপ্রকাশের উৎকণ্ঠাও তেমনি স্পষ্ট। এই দ্বিমুখী স্রোতে আফ্রিকার কবি সাহিত্যিকেরা দ্বিধান্বিত বোধ করেন। কেউ বা আফ্রিকার পুরোনো ঐতিহ্যে ফিরে যেতে চান—শোক জানান তাদের গৌরবময় বেনিন রাজা ও রাজত্বের উদ্দেশ্যে। আবার কেউ বা শ্বেত প্রভুদের উদ্দেশ্যে কটূক্তি করেন ও শাসন ও শোষণমুক্ত নতুন আফ্রিকার স্বপ্নে আবেগে থরথর হয়ে ওঠেন। বর্ত্তমান দুই দশকের কবিতায় এই দুই সুরই দেখা যায় এবং প্রতিবাদের সুরটিই কবিতায়

উপন্যাসের বিশেষভাবে স্পষ্ট। প্রতিজ্ঞার জ্যা-বদ্ধ মনের এক অনমনীয় অনুলিপি এই প্রতিরোধের কবিতাগুলি।

মোরু-ইয়েসুফু গিওয়া (Moru-Yesufu-Giwa) বেনিন রাজা ও তাদের গৌরবময় রাজত্বের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে লিখছেন ঃ

"This done—but yesterday
The palaces of crowned Kings
And now a chaos of hard clay ;
Sleeping on the abyss
Without a surge."

অতীতকে আশ্রয় করে থাকার কী দুর্ম্মর ইচ্ছা!

লাইবেরিয়ার কবি কেরী টমাসও মোরু ইয়েসুফুর সুরে সুর মিলিয়ে লেখেন ঃ

"The warning drums
The jungle's never failing wireless
No longer beats upon the hills :
The warning cry
The plaintive note
Is hushed among the jungle notes."

এই ঐতিহ্যাশ্রয়ী মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ধারা দেখি নাইজেরিয়ার ডেনিস ওসাদবী-র কবিতায় ঃ

"My simple fathers
In childlike faith believed all things ;
It cost them much
And their offspring lost a lot ;
They questioned not the lies of magic
And fetish seemed to have some logic.
They were deceived by first appearance
And now I need deliverance.....

এবং মুক্তির পথ বলে দেবে শ্বেত শাসকেরা। তিনি শ্বেত শাসকদের

বিরোধিতা করেন না বরং তাঁরা পশ্চিমী ভাবধারা ও বস্তুতান্ত্রিক সামগ্রী যথেষ্ট আমদানী করেন নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

I'm not ungratefull though I ask
For more and more good things.
I cannot rest
Satisfied with half a loaf or less
When I know you can give the whole bread"...

তবে এ সুর একক সুর। বর্তমান কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে খুব সহসা এ মনোভাবের পরিচয় মেলে না। তারা প্রায় সকলেই বিদ্রোহের কবি। শ্বেত শাসকদের তারা মনে করেন দস্যু, নরহন্তা, শিশুহন্তা হিসেবে। কেরী টমাস লিখছেন :

"Be warned
That palefaced strangers
with unhallowed feet
Profane this heritage of our father's grave"...

সেনেগালের কবি ডেভিড ডিওপ আরও স্পষ্ট করে লিখছেন :

"My wives crushed their reddened mouths
On the hard thin lips of the steel-eyed conquerors
And my children left their peaceful nudity
For the uniform of iron and blood.

মাবেল ইমোখুয়েদের কবিতাও ক্রোধ ও শ্লেষের তির্যক তলোয়ার। তাঁর The Second Olympus কবিতায় পড়ি :

"They trampled down all that was strange
And filled the void
With half digested alien thoughts ;
They left a trial of red
Wherever their feet had passed".....

ঘানার কবি দেই আনাঙ্গ (Dei Anang)-এর লেখায় যদিও এই উগ্রতা

নেই তবে তিনি বস্তুসর্বস্ব প্রতীচীর মূল্যবোধ পরিত্যাগ করে আফ্রিকাকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হবার আহ্বান জানিয়েছেন বার বার ঃ

.....

"But dearer far than cold steel and iron
Is the tranquil art
Of thinking together
And living togeteer".....

আত্মপ্রত্যয়ে স্থির, স্বধর্মে আস্থাশীল হবার বাণীটি আরও বেশী স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে Negritude দর্শনের আবির্ভাবে। Negritude সম্বন্ধে নিগ্রো সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মতান্তর থাকলেও এই দর্শনে আশ্রয় খুঁজেছেন বহু কবি সাহিত্যিক এবং "কালো" কবিতার নতুন মূল্যায়ণ হয়েছে এই দর্শনের নিকষ পংক্তিতে।

রাজনীতি ও সমাজচেতনার জগতে Africanism যতটা সত্য ঠিক ততটা সত্য এই negritude দর্শন। Negritude বা Negro attitude to life কিংবা African Renascence—এই বিশিষ্ট দৃষ্টি কোণটি ক্যারিবিয়ান কবি আমে সেজেয়ারের অনুভূতির দান। সেজেয়ারের মতে negritude বলতে নিগ্রো মানসলোকের বিশেষ ধ্যানধারণাই বোঝায়, যে ধ্যানধারণাকে আশ্রয় করে তাদের জীবনের, শিল্পের, কাব্যের মূল্যায়ন। "It denotes a certain quality which is common to the thoughts and behaviour of the Negroes. It stands for the new consciousness of the Negro, for his newly gained self-confidence, and for his distinctive outlook on life, with which he distinguishes himself from non-negroes."

তাই "কালো" কবিতায়, কাব্যে, সাহিত্যে যে সুর ফিরে ফিরে দেখা দিয়েছে সে সুর কালো মানুষের নিপীড়িত আত্মার সুর, অনিকেত মানুষের ঘরে ফিরে যাবার সুর, অবহেলিত মানুষের আত্মমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার সুর। Jean Paul Sarte এর ভাষায় "Black poetry is functional; it answers a need which exactly defines it. Look through an anthology of white poetry to-day; you will find one hundred different subjects according to the mood or the concern of the poet,

according to his condition and his country. **In black poetry there is but one subject which all try to treat, with more or less success. From Haiti to Cayenne a sole idea, to make manifest the black soul.** (Bold প্রবন্ধে লেখিকার)।

গোয়াদেলুপের কবি গাই তিরোলিয়েঁর (Guy Tirolien) "কালো ছেলের প্রার্থনা" ঃ

ভগবান, আমি ওদের স্কুলে যেতে চাইনা।
তুমি আমায় রক্ষা করো,
আর যেন না যেতে হয় ওদের স্কুলে"

এই কবিতাটিতে প্রকাশ পেয়েছে পশ্চিমী সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতার রূপ। জীবন, প্রকৃতির সাথে সংযোগহীন শহুরে ভদ্রলোকের সেখানে বেশী মূল্য। প্রকৃতিআশ্লিষ্ট জীবনের কোন মূল্য নেই তাদের ঊর্ধ্বশ্বাস দৈনন্দিনে—এই সত্যই প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতায়। তাই লিয়ঁ দামা (Leon Damas) "কালো পুতুল" (Black Doll) কবিতায় লেখেন ঃ

আমার কালো পুতুল আমায় ফিরিয়ে দাও।
আমার ক্লান্তির রাজপথে
যে পাণ্ডুমুখ রূপোপজীবিনী, প্রেমপসারিণীর আনাগোনা
তাদের দূর করে দিতে
আমার কালো পুতুল আমায় ফিরিয়ে দাও।

দেশপ্রেমের আন্তর আর্তিটি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে "কালো পুতুল" কবিতাটিতে। ইওরোপকে এখানে পাণ্ডুমুখ রূপোপজীবিনী, প্রেমপসারিনী (pallid wenches, vendors of love) বলে অভিহিত করা হয়েছে। কবির কাছে আফ্রিকা সেই স্বপ্নরাজ্য যেখানে জীবন প্রেমে, বিশ্বাসে, মানবতায়, ঘনিষ্ঠ, জঙ্গম। আফ্রিকার সম্বন্ধে এক বিষণ্ণ বিধুরতার (nostalgia) সুর শুনি রবার্ট মেইডেনের O Daedalus, Fly away Home কবিতাটিতে ঃ

"Do you remember Africa ?
O cleave the air, fly away home.
I knew all the stars of Africa.

Spread my wings and cleave the air
My gran, he flew back to Africa,
Just spread his arms and flew away home."

গ্রীক মিথলজির ডিডেলাসের অনুষঙ্গটি আশ্চর্য্যভাবে এক জাতীয় রূপকে উন্নীত হয়েছে। ডিডেলাস ও তাঁর ছেলে ইকেরাস জুপিটারের অভিশাপে ক্রীট দ্বীপে বন্দী হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন বন্দী থাকবার পর মুক্তির এক পথ খুঁজে বের করেন ডিডেলাস ও ছেলে ইকেরাস। দুই কাঁধের সঙ্গে দুটি পাখা মোম দিয়ে আটকে নিয়ে ডি ডেলাস ক্রীট দ্বীপ থেকে ইতালিতে পালিয়ে আসেন। ইকেরাস উড়তে উড়তে প্রায় সূর্য্যের কাছে পৌঁছলে উত্তাপে ঘোম গলে যায় ও ইকেরাস সমুদ্রে পড়ে যান। বর্তমান পৃথিবীর "কৃষ্ণ" ডিভেলাসকে ও পাখায় ভর করে ফিরতে হবে স্বদেশে কিন্তু সে পাখা মোমে জোড়া নয়—'Weaving a wish and weariness together'এ তৈরী সে পাখায় শুধু সঞ্চরণ নয়, সে পাখা দিয়ে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করা! Oh cleave the air, fly away home.

গৃহ আজ হয়ত হতশ্রী, নির্বাপিতালোক শূন্য কক্ষের মত ম্লান, কিন্তু ফিনিকস পাখীর অবিনশ্বরতায় আবার ভস্মস্তূপ থেকে জন্ম নেবে আফ্রিকার অপরাজেয় অমিত আত্মা। আমে সেজেয়ার তাই লিখছেন ঃ

the hidden things shall climb again the slopes
of slumbering music
a wound of today is a womb of the orient
a shuddering whjch rises from the black
forgotten fires, it is
the ruin risen from the ash, bitter word of scars
all lithe and new, a visage
of old, bird of scorn, bird reborn, brother of the sun.
(Africa)

আমে সেজেয়ারের আফ্রিকা জীবনের প্রতীক, প্রাণঐশ্বর্য্যের প্রতীক—সেই আশ্চর্য পৃথিবী যা পশ্চিমী দেশগুলোর মত "যন্ত্র আর কামানে" মরে যায়নি এবং মরতে পারে না। সঞ্জীবনী রসের এক অনন্ত স্রোত প্রবহমান সেখানে। তাঁর

Africa কবিতাটি রূপকে, প্রতিমাকল্পে, ভাবসৌন্দর্য্যে ও বলিষ্ঠ আশাবাদে যেন এক নীলকান্তমণি।

African Renascence-এর ধ্রুববাণী নিয়ে আজ কালো কবি, সাহিত্যিক মুখর হয়ে উঠেছেন। নিগ্রো সংস্কৃতি উৎকর্ষের, নিগ্রোজীবনের সংহতির উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সনে প্রেজাঁস আফ্রিকেইন (Presence Africaine) এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয় প্যারিস শহরে। সেনেগালের এক প্রখর বুদ্ধিজীবী আলিউনে ডিওপ "প্রেজাঁস আফ্রিকেইন"-এর প্রতিষ্ঠাতা। প্রেজাঁস আফ্রিকেইন প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তা অকুণ্ঠ আশীর্ব্বাদ লাভ করে আন্দ্রে জিদ, আলবেয়ার কামু, জাঁ পল সার্ত, রিচার্ড রাইট, ল্যাংষ্টন হিউস প্রভৃতি প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সুধী-বৃন্দের। ১৯৫৭ সনে প্রেজাঁস আফ্রিকেইনের সঙ্গে যুক্ত হল, আরেকটি আশাবাদী প্রতিষ্ঠান—সোসিয়েতে আফ্রিকেইন দ্য কুলতুর (Socie'te' Africaine de Culture)। ১৯৫৯ সনের মার্চ্চ মাসে রোম শহরে এদের দ্বিতীয় ও প্রকাশ্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় (১৯৫৭ সনে সোরবোনে প্রথম অধিবেশন হয়)। সুখ্যাত সাহিত্যিক এডুয়ার গ্লিসাঁ সভাপতিত্ব করেন। প্রতীচীর ব্যক্তিসর্ব্বস্ব, বস্তুসর্ব্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করে নতুন চেতনায়, জীবন-সংবেদ্যতায় উদ্বুদ্ধ হতে আহ্বান জানানো হয় নিগ্রো কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকারদের। লেওপোল্ড সেডার সেনঘরের New York কবিতাটি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে তাঁদের। সেনঘরের বিদ্রূপাত্মক চরণগুলি

"No mothers' breast, but only nylon legs.
Legs and breasts that have no sweat or smell"

অথবা

, , , , , dark waters carry away hygienic loves,
like rivers flooded with corpses of children."

নিগ্রো কবি সাহিত্যিকদের পশ্চিমী সভ্যতার মোহমুক্তির এক হাতিয়ার হয়ে ওঠে এই সব কবিতা। পশ্চিমীদেশের মেকী জীবনের ধারক বাহক হতে আজ এক গভীর অনীহা তাদের। আজ সত্যই black man is in search of his god. এই অন্বেষার পিছনে আছে কালো মানুষের আপন সত্তার স্বরূপ জানবার প্রাণনা। স্বাধীনতার এষণা নবজাগ্রত আফ্রিকায় আজ এত বেশী প্রখর যে নাইজেরিয়ার Malinke tribe-এর লেখক Camara Laye-র L'enfaut Noir

যে "Un পড়ে, তার সাহিত্যসৌন্দর্য্য, জীবনলগ্নতা সম্বন্ধে প্রশংসামুখর হওয়া সত্ত্বেও এটা livre de combat" নয় এই খেদোক্তি করেন গিনির এক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। সমাজ-সচেতনা যে বর্তমান কাব্যসাহিত্যের মূল্যায়ণের এক নিগূঢ় মানদণ্ড এ সত্যই এ থেকে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

কিন্তু এই Importance of being black এই সুরটি নিরবলম্ব স্বয়ম্ভূ মনোভাবের পরিপোষক নয়। Black Renaissanceএর কবি কালো আত্মাকে খুঁজে পাবার সাধনায় পথের দুধারের ফুল-লতা-পাতা, পাখী-পশু-মানুষ, সুর ও গানের পরিব্যাপ্ত পরিদৃশ্যমান জগৎকে অস্বীকার করতে চান না, বরং সব কিছুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিনি গাইবেন, লিখবেন "Of the birds, the cockatoox, of bills, silk scarfs and drums, of child's talks and love talk তাঁর Negroism :

"It dives into the red flesh of the soil
It dives into the flowing flesh of the sky···

এই cosmic সুরের মীড়, গমক, মূর্ছনা দেখি আমে সেজেয়ারের Since Akad, Since Elam, Since Sumar কবিতাটিতে—কবিতাটির প্রারম্ভেই পড়ি :

Master of the three roads a man stands before you
wno walked much
Master of the three roads a man stands before you
who walked on hands who walked on feet
who walked on the belly
who walked on the behind.
Since Elam, Since Akkad, Since Sumer.

St. John Perseএর Anabase-এর ধ্রুপদী সৌন্দর্যে, আলেকজান্দ্রিন চরণের অনুরূপ দীর্ঘায়ত চরণমাধুর্যে ও রূপকল্পের স্থির গাম্ভীর্য্যে আমে সেজেয়ারের কবিতা সত্যই মহাজাগতিক, অবিস্মরণীয়।

গেরাসিম লেবেদেফ স্মরণে

আই. সেদফ

শিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে, বিশেষ করে শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে, গেরাসিম লেবেদেফের নামটি সুপরিচিত। সোভিয়েত দেশের লোকও তাঁকে সমান শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করে। রাশিয়ায় ভারতবিদ্যা অনুশীলনের গোড়াপত্তন করেন তিনিই। তিনিই ইউরোপীয় ধাঁচের প্রথম ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের প্রবর্তক। আরও নানা ভাবে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির সেবা করেছেন। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে তাঁর ভারত আগমন, বিশেষ করে তাঁর কলিকাতার ঘটনাবহুল জীবন ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে।

আজ থেকে ১৭৫ বছর আগে লেবেদেফ প্রথম ভারতে আসেন। বর্তমান বছরে সেই স্মরণীয় ঘটনার ১৭৫তম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হবে। সোভিয়েত দেশে সেই শুভ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ আয়োজন চলছে।

ভল্গা নদীর তীরবর্তী ইয়ারোস্লাভল শহরে ১৭৪৬ সালে ভারতবন্ধু লেবেদেফ জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই গানবাজনার দিকে তাঁর প্রবল ঝোঁক দেখা যায়। বেহালা ছিল তাঁর প্রিয় বাদ্যযন্ত্র। তিনি খান কয়েক গানেও সুর দেন। লেবেদেফের জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল প্রবল। দেশ-বিদেশের মানুষের বিচিত্র জীবনের সঙ্গে পরিচয় লাভের আগ্রহ ছিল অদম্য। এই তৃষ্ণা, এই আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে একদিন ঘরছাড়া করল। তিনি প্রথমে গেলেন প্যারিসে, তারপরে লণ্ডনে। লণ্ডনে থাকার সময় ভারতবর্ষে যাবার সুযোগ এল। এই ভারতভূমি সম্পর্কে তিনি কত কথা কত কাহিনীই না শুনেছিলেন। ভারতের মানুষ আর ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের জন্যে তিনি উদগ্রীব হয়ে ছিলেন। সেই অপরিসীম আগ্রহই তাঁকে টেনে নিয়ে গেল ভারতবর্ষে।

১৭৮৫ সালে লেবেদেফ মাদ্রাজে পৌঁছে জাহাজ থেকে ভারতের মাটিতে প্রথম পদার্পণ করেন। সেখানে তিনি বেহালা বাজিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সেই সঙ্গে তিনি অবসর সময়ে তামিল ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস চর্চায় মনোনিবেশ করেন। রুশদের মধ্যে গেরাসিম লেবেদেফই প্রথম তামিল ভাষা আয়ত্ত করেন।

ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে সুষ্ঠু পরিচয় লাভ করতে গিয়ে তিনি পদে পদে বাধা পান। কারণ সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে তাঁর আদৌ পরিচয় ছিল না। তাই সংস্কৃত শিখবার জন্যে ১৭৮৭ সালে তিনি মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় যান।

অনেক করে তিনি একজন উপযুক্ত শিক্ষক খুঁজে পান। এই বাঙ্গালী শিক্ষকটি তাঁকে সংস্কৃত শেখাতে রাজি হন। কলকাতার জীবনেই লেবেদেফের গুণাবলী—শিল্পী হিসাবে ও সংগঠক হিসাবে তাঁর প্রতিভা—পূর্ণ বিকাশ ও প্রকাশের সুযোগ পায়। কলকাতায় তিনি রুশ ধাঁচের বা পশ্চিম-ইউরোপীয় ধারার এক রঙ্গমঞ্চও স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। ইউরোপীয় ভাষাগুলি থেকে খানকয়েক নাটক বাংলায় অনুবাদ করে তিনি সেইগুলিকে মঞ্চস্থ করার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন।

১৭৯৫ সালে ইংরেজ লেখক জডরেলের "প্রিটেন্স্" নাটকখানি তিনি মঞ্চস্থ করলেন। বাংলা দেশের জীবনযাত্রা ও আচারপ্রথার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলেই লেবেদেফ বিদেশী নাটকখানিকে বাঙ্গালী দর্শকদের কাছে বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষক করে তুলতে পেরেছিলেন। নাটকের ঘটনাস্থল কলকাতা এবং পাত্র-পাত্রীদের সংলাপের ভাষাও বাংলা ভাষা। নাটকের আবহসঙ্গীত সৃষ্টি করা হয়েছিল ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রেরই সাহায্যে। নাটকের গানের কথাগুলি অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত বাঙ্গালী কবি ভারতচন্দ্রের। এই গানগুলিতে ভারতীয় লোক-সঙ্গীতের অনুসরণে সুর সংযোজনা করেন স্বয়ং লেবেদেফ। এতসব শুভ যোগা-যোগের কারণেই নাটকখানির অভিনয় বেশ সাফল্যমণ্ডিত হয়। কলকাতার বাঙ্গালী দর্শকসমাজ নাটকের অপূর্ব অভিনয় দেখে মুগ্ধ হন। তাঁরা লেবেদেফের প্রযোজনা ও সংগঠনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই প্রভূত সাফল্য সত্ত্বেও নাটকখানির অভিনয় হয় মাত্র দুবার। বাংলা ভাষায় নাটক অভিনয়ের এই নূতন রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আদৌ খুশি হতে পারেন নি। এই নূতন জাতীয় রঙ্গমঞ্চটিকে তুলে দেবার জন্যে তাঁদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এমন কি আগুন লাগিয়ে ঐ থিয়েটারটিকে ধ্বংস করে দেবার চেষ্টা করতেও তাঁরা পশ্চাদপদ হন নি। সৌভাগ্যবশত থিয়েটারের বাঙ্গালী কর্মচারী ও লোকজন যথাসময় আগুন নিভিয়ে ফেলতে সক্ষম হন। কিন্তু এখানেই লড়াই সাঙ্গ হল না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারীরা লেবেদেফের জীবন অতিষ্ঠ করে তুললেন। তাঁর বিরুদ্ধে চলতে থাকে নালিশের পর নালিশ আর কুৎসার

অভিযান। ব্যাপার আদালত পর্যন্ত গড়ায়। অবশেষে লেবেদেফের থিয়েটার নিলামে বিক্রি হয়ে গেল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আদালতের এক রায়ের বলে।

১৮০১ সালে লেবেদেফ ফিরে এলেন রাশিয়ায়—ফিরে এলেন তাঁর জন্মভূমিতে। ভারতের বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর সময়ের রুশ সমাজের পরিচয় সাধনের কাজে তিনি বাকি জীবন উৎসর্গ করলেন। ঐ ১৮০১ সালেই তিনি তাঁর বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। এরই চার বছর পরে তিনি বাংলা হরফের ছাঁচ তৈরি করিয়ে নিয়ে একটি ছাপাখানা স্থাপন করলেন। তাঁর এই ছাপাখানা থেকেই ১৮০৫ সালে বার হল তাঁর "পূর্ব ভারতের ব্রাহ্মণশ্রেণী, তাঁদের ধর্মাঙ্গীণ ক্রিয়াকলাপ ও সামাজিক আচারপ্রথার এক অপক্ষপাত আলোচনা।" এই গ্রন্থখানিই ভারত সম্পর্কে রুশ ভাষায় লেখা প্রথম মৌলিক রচনা। এই বই-এর ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে ভারতের অধিবাসীদের প্রতি লেখকের গভীর সহানুভূতি। এই গ্রন্থে ভারতবাসীদের জীবনযাত্রা ও আচারপ্রথার বিশদ বর্ণনাই শুধু নেই, ভারতের ভূগোল ও অর্থনীতি সম্পর্কেও তথ্যাদি লিপিবদ্ধ হয়েছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুনাফা আর অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের বহির্বাণিজ্যের কথাও ঐ গ্রন্থ পড়ে জানা যায়। বইখানির উপসংহারে রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্যের জন্যে আবেদন জানানো হয়েছে।

পরে লেবেদেক আর একখানি ছোটো বই বার করেন—ভারতীয় পাটিগণিতের প্রথম পাঠ। বাংলা ভাষা শিক্ষার এক অনুশীলনীমালাও তিনি প্রকাশ করেন। একখানি বাংলা-রুশ অভিধান প্রণয়নের পরিকল্পনাও তিনি করেছিলেন। কিন্তু এই সঙ্কল্প তিনি কার্যে পরিণত করে যেতে পারেন নি। ১৮১৭ সালে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঐ বছরেরই ১৫ই জুলাই এই ভারতবন্ধু শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। আজ সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী-বন্ধন উত্তরোত্তর দৃঢ়তর ও নিবিড়তর হচ্ছে। এই দুই দেশের জনগণকে পরস্পরের নিকটতর করার কাজে লেবেদেফের অসামান্য ভূমিকার তাৎপর্য কেবল গবেষকদের কাছেই নয়, উভয় দেশের জনসাধারণেরও কাছে। সোভিয়েত দেশে লেবেদেফের জীবন নিয়ে একাধিক গ্রন্থ লিখিত হয়েছে, সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই রুশ ভারতবিদ্যাবিদের কর্মজীবন নিয়ে লেখা "ভারত, আমার স্বপ্ন" নামক একখানি নাটক মস্কোর একটি থিয়েটার মঞ্চস্থ করেছে।

সাহিত্য ও প্রতীচী

দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

জীবনের সায়াহ্নে চিন্তার স্রোত হয়ে আসে মন্থর ; বুদ্ধির দীপ্তি হয়ে আসে ম্লান। এইটাই স্বাভাবিক, অন্তত আমাদের দেশে ; রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম মাত্র। তাই বার্ট্রাণ্ড রাসেল যখন ৭৫ বছর বয়সে লিখলেন "পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস"; তখন বুঝি রবীন্দ্রনাথ কেন বারবার প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা নত করেছেন প্রতীচীর মননশীলতা ও মনীষার কাছে। ভাষার কী আশ্চর্য্য বলশালিতা, চিন্তার কী অদ্ভুত উজ্জ্বলতা ; আর সেই সঙ্গে বুদ্ধির কী ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতা।

প্রায় চল্লিশ বছর ধরে উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও সমালোচনায় পাঠক সমাজকে বিচিত্রভাবে আনন্দ দান করে, সাহিত্যজগৎ থেকে যখন অবসর গ্রহণের কাল এল J. B. Priestley-এর—৬৫ বৎসর বয়সে—হঠাৎ তাঁর লেখনী থেকে নিঃসৃত হল এক পরম বিস্ময়। কারণ 'সাহিত্য ও প্রতীচ্য মানব'* শুধু তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কৃতি নয়, ইংরেজি ভাষায় সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে এর তুলনা নেই। তাঁর আলোচ্য বিষয় হল রেনেসাঁস্ থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা (১৯৩৯) পর্যন্ত—যেটাকে প্রতীচ্য সভ্যতার আধুনিক যুগ বলা যেতে পারে—পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ইতিহাস। সাহিত্যের ইতিহাস কথাটা ঠিক হল না, কারণ ভূমিকাতেও তিনি বলেছেন—এটা কালানুক্রমিক বর্ণনা নয়, আলোচনা। আর এই আলোচনায় উচ্চাঙ্গ সমালোচনা-সাহিত্যের সব কটি গুণই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান : প্রখর ধীশক্তি ও সূক্ষ্ম অনুভূতি, পাণ্ডিত্য—যদিও ভূমিকায় বলেছেন আমি পণ্ডিত নই—দার্শনিকোচিত বিশ্লেষণ-কুশলতা ও শব্দপ্রয়োগে সাবধানতা, দৃষ্টির ঔদার্য ও ব্যাপকতা। আর—এইখানে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য লক্ষণীয়—ভাষার আশ্চর্য ওজস্বিতা আর প্রাঞ্জলতা। এই শেষোক্ত বৈশিষ্ট্য এই গ্রন্থটির

---

* J. B. Priestley : Literature and the Western Man.

অসাধারণ ; Priestley-র ইংরেজী গদ্য যে অনবদ্য তা অনেকেই জানেন, কিন্তু ইংরেজি ভাষার গদ্য যে আজও কি অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে পারে তা এই গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে সম্যক উপলব্ধি হবে। শ্রেষ্ঠ ফরাসী সমালোচনা সাহিত্যেই —এবং একথা সর্বজনবিদিত যে সমালোচনা সাহিত্যে ফরাসী লেখকরা ইংরেজ লেখকদের অতিক্রম করে গেছেন—যার সাক্ষাৎকার মেলে এবং ইংরেজি সমালোচনা-সাহিত্যে যা বিরল এমন একটি গুণ Priestley-র এই উপাদেয় গ্রন্থে বিদ্যমান—সেটা হচ্ছে চিন্তার স্বচ্ছতা ও ভাষার বুদ্ধিদীপ্ত প্রসাদময়তা। আর একটা কথা। তাঁর লেখা কিছুটা পড়লেই চক্ষুষ্মান্ পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে এ জিনিষ লেখা তাঁর পক্ষেই সম্ভব সাহিত্য যাঁর কাছে শুধু নেশা নয় পেশাও। অর্থাৎ সাহিত্যের বিদগ্ধ অধ্যাপক, যাঁর সাহিত্য-রসবোধ শুধু অধ্যয়ন-সঞ্জাত, সাহিত্য সৃষ্টির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ নয়, তাঁর পক্ষে এ জিনিস লেখা সম্ভব নয়। Priestley-র সমালোচনার প্রতিটি ছত্রে রয়েছে এই সাহিত্য-স্রষ্টার সাধনা ও বেদনা যার পশ্চাৎ-এ সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত, ব্যর্থতা ও চরিতার্থতা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে নাটক ও নাট্যকারদের সম্বন্ধে তিনি নানা স্থানে যে মন্তব্য করেছেন তা তাঁর পক্ষেই সম্ভব যিনি স্বয়ং নাটক শুধু রচনাই করেন নি, পরিচালনাও করেছেন দীর্ঘকাল ধরে এবং সাফল্যের সঙ্গে। যাঁরা সারা জীবন ধরে সাহিত্যের সমালোচনাই করেছেন, সৃষ্টি—তা সে যতই সামান্য হোক—করেন নি তাঁদের লেখায় আর এ লেখায় অনেক তফাৎ।

এর থেকে যেন পাঠক মনে না করেন এতে শুধু জীবন ও সাহিত্য-রচনার প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও তৎ-সঞ্জাত প্রজ্ঞাই বর্ত্তমান। কারণ—যদিও লেখক গ্রন্থের ভূমিকায় নিজের পাণ্ডিত্যকে অস্বীকার করেছেন—তাঁর রচনায় ব্যাপক ও গভীর ও দীর্ঘকালব্যাপী সাহিত্য অধ্যয়নের পরিচয় সর্বত্র বিদ্যমান। তাঁর ভূমিকাতেই তিনি প্রসঙ্গত হঠাৎ বলে ফেলেছেন—তাও বন্ধনীর মধ্যে—যে তাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগারে মাত্র দশ হাজার বই রয়েছে! ইউরোপ ও আমেরিকার বিগত পাঁচশো বছরের সাহিত্যে সুপরিচিত, অল্প-পরিচিত ও অপরিচিত অনেক গ্রন্থের তিনি যে ভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন তা তাঁর পক্ষেই সম্ভব যিনি প্রত্যেকটি বই অত্যন্ত যত্ন ও মনোযোগ সহকারে, কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিকবার, পড়েছেন এবং মনে রেখেছেন এবং তা এমন ভাবে

আত্মসাৎ করেছেন যে পাণ্ডিত্য কোথাও প্রকট হয় নি ; প্রচ্ছন্ন। (অধ্যয়ন যে দীর্ঘকাল ধরে এবং প্রচুর পরিমাণে করেছেন তা নিজেও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।) এই গ্রন্থের প্রতিটি বাক্য চিন্তাপূর্ণ, প্রতিটি শব্দ তাৎপর্যযুক্ত, অথচ পাণ্ডিত্য-ভারাক্রান্ত নয়, এবং সমগ্র গ্রন্থটি অতীব সুখপাঠ্য। এর কারণ হল গ্রন্থকার শুধু সুপণ্ডিত ও মনীষা সম্পন্ন নন তাঁর সব চেয়ে বড় পরিচয়, তিনি আর্টিষ্ট।

॥ ২ ॥

পাঠক কিছুটা অগ্রসর হলেই—এবং একবার আরম্ভ করলে আদ্যন্ত না পড়ে উপায় নেই, লেখা এতই চমৎকার—ক্রমশ কয়েকটা জিনিস তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট করবে, বিশেষ করে যখন থেকে সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে ঔপন্যাসিকদের আবির্ভাব হতে লাগল। যদিও এর অনেকগুলি দিক্ পরে উপন্যাসের প্রসঙ্গ আলোচিত হবে, তাহলেও সাধারণভাবে তার পূর্বে কিছু বলে নেওয়া দরকার।

প্রথমেই একটা জিনিস লক্ষ্য করে পাঠক, বিশেষ করে তিনি যদি আধুনিক অর্থে সংস্কৃতিবান্ ও প্রগতিবাদী হন, প্রথমে কৌতুকান্বিত, পরে বিস্মিত, এবং আরও পরে রীতিমত অস্বস্তিযুক্ত হবেন। সেটা হচ্ছে এই যে সাহিত্যের স্বরূপ ও উৎকর্ষ বিচারে Priestley সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতি-গত ব্যাখ্যার শরণাপন্ন হন নি। মতবাদের মাদকতায় ও একটি সদ্যোজাত, অপরিণত অর্ধবিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহের আতিশয্যে (প্রসঙ্গত একটা জিনিস আমার কাছে ভারি অদ্ভুত মনে হয়। যে বিজ্ঞান সম্পূর্ণ, পরিণত ও যথাযথ এবং সম্যক্ জ্ঞান গাণিতিক ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ মস্তিষ্ক চালনা-সাপেক্ষ, যেমন পদার্থবিজ্ঞান, তার সম্বন্ধে এই প্রগতি-গর্বিত তরুণ চিন্তানায়কবৃন্দের প্রবল অনীহা, আর যে বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে সাধনা বা মস্তিষ্ক চালনা কোনটারই প্রয়োজন হয় না তার—যথা সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে এঁদের আগ্রহ, উৎসাহ ও উত্তেজনা অপরিসীম।) যাঁরা কোন "work of art"-এর সামাজিক পটভূমিকা ও মনস্তাত্ত্বিক ইতিবৃত্ত তার মূল্য নির্ধারণের প্রধান মানদণ্ড মনে করেন Priestley তাঁদের অন্যতম নন। অবশ্য তার মানে এ নয় যে তিনি সাহিত্য-রচনার

সামাজিক ও অর্থনীতিক পটভূমিকা উপেক্ষা করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রতীচ্য সাহিত্যে শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব যে কত গভীর এবং ব্যাপক তা অত্যন্ত পরিষ্কার করে দেখিয়েছেন। কিন্তু কোন একটি বিশেষ সাহিত্য-সৃষ্টির উৎকর্ষ-বিচারে এই সমসাময়িক সামাজিক ও অর্থনীতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ—যার গুরুত্ব নিশ্চয়ই আছে—সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ও নিষ্প্রয়োজন মনে করেছেন।

তবে লেখকের মানসিক গঠন, ব্যক্তিত্ব, চরিত্র (ব্যাপক অর্থে) এবং চেতনার স্বাভাবিক প্রবণতা তাঁর কাছে অপ্রাসঙ্গিক তো নয়ই, বরং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক এই কারণেই তাঁকে ঠিক "jurist" বা নিছক "aesthetic" বলেও আখ্যাত করা যায় না, কারণ তাঁর কাছে "art for art's sake" একথা খানিকটা অর্থহীন। লেখকের ব্যক্তিত্ব তিনি কোথাও উপেক্ষা করেন নি। একটা উদাহরণ দিই। গয়টের কোন রচনাকেই—এমন কি Faustকে পর্যন্ত—work of art হিসাবে তিনি উচ্চ স্থান দেন নি; একথা পরিষ্কার বলেছেন, artist হিসাবে হোমার, দান্তে বা শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু তিনি এই পর্যন্ত বলেই শেষ করেন নি। T. S. Eliotএর গয়টে সম্বন্ধে অদ্ভুত উক্তির ("He dabbled in both philosophy and poetry and made no great success of either.") তিনি প্রতিবাদ করেছেন এবং গয়টের প্রত্যেকটি রচনার ত্রুটি ও ন্যূনাধিক ব্যর্থতা প্রতিপন্ন করে শেষে মন্তব্য করেছেন "But when all this has been said, his greatness remains." আধুনিক কালের লেখকদের মধ্যেও দৃষ্টান্তের অভাব নেই যেমন রলাঁ ও জীদ্। এঁদের স্রষ্টা হিসাবে উচ্চ আসন দেন নি, প্রতিভাকেও সন্দেহ করেছেন, কিন্তু এঁদের মহত্ত্ব ও আত্মার ঐশ্বর্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন।

Priestley যদিও প্রতীচীর সাহিত্যের কোন শাখাই বাদ দেন নি, অনালোচিত রাখেন নি, তবু একটা জিনিস ক্রমশ পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে—সাহিত্যের যে বিভাগে তাঁর সমালোচনা সব চেয়ে সমুজ্জ্বল, সব চেয়ে মৌলিক, ও চিন্তার উদ্দীপক তা হল উপন্যাস। আর তার পরেই নাটক। (তাঁর কবি ও কাব্য সমালোচনাও অত্যন্ত উপভোগ্য, বিশেষ করে ফরাসী Symbolist movement সম্বন্ধে তাঁর অধ্যায়টি অতি চমৎকার; Yeats—যাঁকে তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রতীচীর শ্রেষ্ঠ কবি বলতে দ্বিধা করেন নি—সম্বন্ধে তাঁর পৃষ্ঠাগুলি

অপূর্ব।) এই জন্যে শুধু উপন্যাস ও ঔপন্যাসিকদের সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচিত হবে।*

এখানে একটা জিনিস আমার কাছে একটু আশ্চর্য মনে হয়েছে। সাহিত্যে বিশেষ করে আধুনিক সাহিত্যে, উপন্যাসের প্রাপ্য গুরুত্ব ও মর্যাদা তিনি যেমন দিয়েছেন, ছোট গল্পের ক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীত। স্পষ্ট খোলাখুলি না বললেও বুদ্ধিমান্ পাঠকের এটা অধিকার করতে দেরি হবে না যে আধুনিক সাহিত্যের এই অত্যন্ত আদৃত ও ব্যাপকভাবে প্রচলিত শাখাটির প্রতি Priestley যথেষ্ট অবজ্ঞা দেখিয়েছেন। স্পষ্ট উক্তির চেয়ে মৌন দ্বারাই একথাটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়েছে যে সৃষ্টি হিসাবে ছোট গল্প উপন্যাসের চেয়ে ঢের নিম্ন স্তরের জিনিস। দু-একজন জগদ্‌বিখ্যাত গল্প-লেখকের দৃষ্টান্ত দিলেই এটা প্রমাণিত হবে। মোপাসাঁর মধ্যে তাঁর "superb naturalistic technique" ছাড়া প্রশংসার যোগ্য কিছু পান নি এবং তাঁর ছোট গল্প—যার দ্বারা তিনি আজ ভুবনবিদিত—সম্বন্ধে যেন ঈষৎ উষ্মার সঙ্গেই মন্তব্য করেছেন, There is as much falsification in the cool, neat, cynical maupassant type of short story as there is in the sentimental and rosy fiction of the popular magazine." নাট্যকার হিসাবে চেখফের তিনি উচ্ছ্বসিত—উচ্ছ্বাস তাঁর লেখায় নেই বললেই চলে—প্রশংসা করেছেন, এমন কি কোন কোন দিক্ থেকে ইবসেন্‌কেও তিনি অতিক্রম করে গেছেন একথাও বলেছেন। অথচ আশ্চর্য হচ্ছে এই যে চেখফ যে কোন কালে ছোট গল্প লিখেছিলেন এবং এমন ছোট গল্প যা অন্তত তাঁর অপার্থিব সঙ্গীতময় মূল রাগ্যান গল্পে—বিশ্ব সাহিত্যের এক পরম বিস্ময়—তার কোন উল্লেখই প্রায় নেই। শেষ দৃষ্টান্তটি বিংশ শতাব্দীর একজন খ্যাতিমান্ ও অত্যন্ত জনপ্রিয় গল্প-রচয়িতা—সমারসেট্ মম্। এই বিশাল গ্রন্থে মম্ একবার মাত্র উল্লিখিত হয়েছেন এবং তাঁর বরাদ্দ জুটেছে একটি মাত্র লাইন, Maugham made good use of his intelligence work in *Ashenden*"।

ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত মনে হলেও প্রণিধানযোগ্য—ছোট গল্পের প্রতি Priestleyর এই ঔদাসীন্য। কারণ লোকপ্রিয়তায় কথাসাহিত্যের এই শাখাটি

* লেখকের 'উপন্যাস প্রসঙ্গে প্রিষ্টলে' শীঘ্রই আমরা প্রকাশ করব।—সম্পাদক

উপন্যাসকেও অতিক্রম করেছে এবং সাময়িক পত্রিকার যা হল প্রধান উপকরণ, বাংলাদেশের শারদীয়া সংখ্যার—ও তার মুগ্ধ পাঠক, বিশেষ করে পাঠিকাবৃন্দের —প্রাণ। (একথাটা মনে হলে কৌতুক বোধ হয় যে সাময়িক পত্রের যখন সৃষ্টি হল তার প্রধান আকর্ষণ ছিল essay, আর এই essayর যে আখ্যায়িকা-অংশ (ancedote) তাই ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র শাখায় রূপান্তরিত হল।) অথচ Priestleyর কথাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তিনি অভ্রান্ত বলে নয়, এ নিয়ে তিনি চিন্তা করেছেন; এবং তাঁর রুচিবোধ সর্বত্র সম্মানিত। অবশ্য একথা মানতেই হবে, মোপাসাঁর প্রতি তিনি সুবিচার করেন নি; তেমনি একথাও সত্য ছোট গল্পকে প্রশ্রয় না দিয়ে ও উপন্যাসকে গৌরবান্বিত করে তিনি যথার্থ সাহিত্যানুরাগিগণের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। গত এক শো বছরের মধ্যে মানুষের সমাজ ও জীবন এত জটিল, এত সংক্ষুব্ধ, এত সমস্যাসঙ্কুল হয়ে উঠেছে যে ছোট গল্পের মাধ্যমে তাকে প্রকাশ করতে গেলে একদেশদর্শিতা ও oversimplification অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া হৃদয়ের গভীরতম আকূতি ও বেদনা, জীবনের নিগূঢ়তম রহস্যকে গদ্যে মূর্তিদান করতে গেলে তার ক্ষেত্র ব্যাপকতর হওয়া চাই, যেমন, "War and Peace" বা A la Recherche du Tempo Perdu. তাই নিপুণ গল্পলেখক হতে হলে talentই যথেষ্ট; কিন্তু সত্যিকারের মহৎ উপন্যাস তিনিই সৃষ্টি করতে পারেন যাঁর প্রতিভা (genius) আছে।

Priestleyর বক্তব্য সম্যক অনুধাবন করতে হলে এই genius শব্দটির বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। এখানে একটা কথা সর্বদা স্মর্তব্য। Priestley অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিশেষণ নির্বাচন এবং প্রয়োগ করেছেন; সতিকারের বড় ক্রিটিক মাত্রেই শব্দের মর্যাদা সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সচেতন। এই বিশেষণগুলির মধ্যে দুটি তিনি লেখকদের সম্বন্ধে কচিৎ প্রয়োগ করেছেন অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে—great এবং major. আর একটি শব্দ যেটি বিশেষ্য—genius.

প্রথমেই বলে রাখি, তিনি এই পরম মূল্যবান্ শব্দটির কোন সংজ্ঞা বর্ণনা দেন নি। তবে কোন্ কোন্ লেখক ও গ্রন্থ সম্বন্ধে এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন লক্ষ্য করলেই কয়েকটা কথা ক্রমশ বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সব চেয়ে বড় কথা হল যে-লেখকের মধ্যে genius কাছে তাঁর সৃষ্টি কখনই শুধু চেতন স্তরে নিবদ্ধ থাকতে পারে না, মগ্নচৈতন্যের রহস্যলোকের অস্ফুট বাণী সে বহন করে

আনবেই। তা যদি না হয় তা হলে লেখকের রচনা—গদ্য বা পদ্য—যতই উজ্জ্বল, যতই বুদ্ধি-দীপ্ত, যতই technically perfect হোক, তাঁকে প্রতিভাশালী স্রষ্টা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে না, কেন না এতে অবচেতনের অনির্বচনীয়তা নেই। genius যাঁর আছে তিনিই স্রষ্টা, আর সৃষ্টির উৎস হল এই মগ্নচৈতন্য।

genius আর greatness-এর মধ্যে অর্থের তফাৎ থাকলেও এর একটি প্রযুক্ত হলে অপরটিও প্রযোজ্য, কেন না genius ছাড়া সাহিত্যে greatness অসম্ভব। সাহিত্যের যাঁরা যথার্থ স্রষ্টা, যাঁদের great writer, great poet বা novelist বলা যায় তাঁদের সংখ্যা Priestley-র মতে অতি অল্প, যুগে যুগেই বিরল। এ কথাটা মনে রাখা উচিত কারণ Priestley অনেক বিশ্ববিখ্যাত লেখকের ক্ষেত্রে এই চরম বিশেষণটি প্রয়োগ করতে অসম্মত হয়েছেন—যথা, Flaubert. Flaubert-এর "solid talent" স্বীকার করেছেন, কিন্তু তিনি genius নন, great-ও নন। মাদাম বোভারির—flaubert-এর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—নায়িকা এম্মা বোভারির চরিত্র হিসাবে অপূর্ণতার উল্লেখ করে তল্‌স্তয়ের আন্না কারেনিনার সঙ্গে তার তুলনা করে বলছেন—Compare her with Anna Karenina, and there is revealed at once the difference between talent-plus-industry-and-patience and sheer creative genius." কথাটা খুবই আশ্চর্য, কারণ আন্না কারেনিনা যেমন উপন্যাস হিসাবে অত্যুত্তম, বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়, (Priestley স্বয়ং এর সম্বন্ধে বলেছেন "a very great novel") তেমনি মাদাম বোভারি সাহিত্যের এক অপরূপ সৃষ্টি। এই অনবদ্য উপন্যাসটি যাঁরা মূল ফরাসীতে পড়েছেন তাঁরাই জানেন: flaubert-এর ফরাসী গদ্য কি জিনিস, তাঁর বর্ণনা কি নিখুঁত, তুলির প্রতিটি রেখা কী স্পষ্ট ও উজ্জ্বল, চরিত্র-বিশ্লেষণ কত সূক্ষ্ম। এ জিনিস ফরাসী দেশেই সম্ভব, পৃথিবীর সাহিত্যে এর তুলনা নেই। Priestley কি তা হলে অন্ধ?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক সম্বন্ধে Priestley-র মত—যা এ গ্রন্থের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ—জানা আবশ্যক। তার আগে সাধারণভাবে আর্ট ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর কয়েকটি মূল বক্তব্য সংক্ষেপে আলোচনা করছি। তাতে ফ্লোবেয়র্ এবং স্তাঁদাল—যাঁকে আঁদ্রে জীদে ফরাসী দেশের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলে অভিনন্দিত করেছেন—কেন তাঁর মতে মহৎ প্রতিভাশালী স্রষ্টা নন সেটা পরিষ্কার হবে।

প্রথমত—যে কথাটা পূর্বেই বলেছি—মহৎ সৃষ্টি, সাহিত্য ও আর্টের ক্ষেত্রে, চেতন স্তরে হতে পারে না। কারণ, "After all it is the unconscious that both creates and responds to what is best in literature." চেতন স্তরের পরাকাষ্ঠা, চরম পরিণতি হল talent ; genius মানেই মগ্নচৈতন্য, সৃষ্টির যা উৎসলোক। একথা যদি সত্য হয় তা হলে এর থেকে কয়েকটা সিদ্ধান্ত আমরা করতে পারি, Priestleyও তা করেছেন।

প্রথমত সৃষ্টিপ্রতিভার সঙ্গে টেকনিক্-এর সম্পর্ক কিছু মাত্র নেই, technically perfect সাহিত্য বা আর্ট সৃষ্টি হিসাবে মহৎ নাও হতে পারে ; অপর পক্ষে যথার্থ মহৎ সৃষ্টি, টেকনিক্-এর দিক থেকে দোষযুক্ত ও ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, উপন্যাস সাহিত্যে যাঁরা খুব উঁচুদরের স্রষ্টা তাঁরা প্রায় কেউ stylist ছিলেন না, এমন কি ভাষার ব্যাপারেও তাঁরা অনেকেই যথেষ্ট শিথিলতা ও ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন—যেমন ডিকেন্স্। দ্বিতীয়ত, সাহিত্যে বা আর্টে সৃষ্টির সঙ্গে তুলনায় technical innovation অনেক তুচ্ছ জিনিস, তার জন্য প্রতিভার প্রয়োজন হয় না। সৃষ্টি আর আবিষ্কার এক জিনিস নয়, তা হলে বিজ্ঞান আর আর্ট এক হয়ে যেত। সর্বত্র যাঁরা নূতনত্বের অন্বেষণ করেন সাহিত্য বা আর্ট তাঁদের জন্য নয়।

এর থেকেই বোঝা যাবে, যাঁরা কোন নূতন শৈলীর আবিষ্কর্তা, টেক্নিকের দিক থেকে পথিকৃৎ অথচ Pristleyর অর্থে স্রষ্টা নন, তাঁদের সম্বন্ধে তিনি কিঞ্চিৎ নিরাগ্রহ। এর থেকে আর একটা জিনিসও তিনি ইঙ্গিতে যেন বলতে চেয়েছেন —আর্ট interesting হলেই যে great হবে তার কোন মানে নেই। আরো বড় কথা, originality বা মৌলিকতাও চরম কথা নয়, একজন শক্তিমান্ লেখক original হয়েও মহৎপদবাচ্য নাও হতে পারেন। একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক—মার্সেল প্রুস্ত্, যিনি Priestleyর মতে সম্ভবত বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। বাল্জাক্কে বাদ দিলে অন্য কোন ফরাসী ঔপন্যাসিকের সম্বন্ধে তিনি এত প্রশংসা করেন নি। প্রুস্ত্কে তিনি বলেছেন "a great novelist" এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে great তিনি কজনকে বলেছেন আঙ্গুলে গুনে বলা যায়। কিন্তু মজা হচ্ছে এই, যে-কারণে প্রুস্তের এত নাম, অর্থাৎ উপন্যাসে এক নব্য রীতির প্রবর্তন ও যুগান্তর আনয়ন, সে কারণে Priestldy তাঁকে বড় বলেন নি। তাঁর মতে প্রুস্ত উপন্যাসের চিরাচরিত রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন বলে বড় নন,

তিনি বড় এইজন্য যে "he continued a great tradition." (এই tradition কথাটি তাঁর লেখায় শুধু গৌরবান্বিত নয়, একেবারে কেন্দ্রগত, যেটা উপন্যাসের অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচিত হবে।)

তৃতীয়তঃ, প্রতিভার প্রকাশ অনেকটা সহজ, স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত, কিছুটা যেন অন্যমনস্ক। talent কিন্তু ঠিক এর বিপরীত, তার প্রকাশ আত্ম-সচেতন, বিশ্লেষণাত্মক, শিক্ষা-অভ্যাস-অনুশীলনসাপেক্ষ। T. S. Eliot এখানে Priestleyর সঙ্গে নিশ্চয়ই একমত হবেন না, তাঁর সমালোচনা পড়লে মনে হয়, 'great art' অবশ্যই "conscious and deibserate" হতে পারে, কারণ সাহিত্যে এমন কি কাব্যেও, creation ও criticismএর দ্বন্দ্ব তিনি স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে inteltectual power'-এর প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক বা গাণিতিক আবিষ্কারে যতটা, উচ্চস্তরের সাহিত্যসৃষ্টিতেও ঠিক ততটাই, criticism ছাড়া creation হয় না। আমার মনে হয়, Eliotএর কথাটার সত্যের অংশ বেশি, যদিও একথা তিনিও স্বীকার করবেন Priestleyর সঙ্গে যে শুধু বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি হয় না—এমন কি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও না—মহাবিশ্বের মত আর্টেও সৃষ্টিতত্ত্ব আজও রহস্যাবৃত।

genious ও talantএর মধ্যে এই মূলগত পার্থক্য স্মরণ রাখলে আর একটা জিনিস পরিষ্কার হবে—সেটা হচ্ছে অনেক বিশ্ববরেণ্য ফরাসী সাহিত্যগুরুর সম্বন্ধে তাঁর উচ্ছ্বাসের অভাব। আমার ধারণা তিনি ফরাসী সাহিত্যের প্রতি কোন কোন জায়গায় সুবিচার করেন নি। ফোবেয়র্, স্তাঁদল ও মোপাসাঁর দৃষ্টান্ত পূর্বেই দিয়েছি। ফরাসী সাহিত্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার বলে ফরাসী দেশে আদৃত ও সম্মানিত সেই 'রাসীন্'কে তিনি উচ্চস্থান দেন নি। আধুনিক যুগের একজন অসামান্য প্রতিপত্তিশালী শক্তিমান্ লেখকের সম্বন্ধে তিনি কিছুটা অবজ্ঞাই দেখিয়েছেন—আঁদ্রে জীদ্। মানুষ হিসাবে তাঁর মহত্ত্ব, বুদ্ধিমত্তা, কাল্‌চার ও অসাধারণ লিপিচাতুর্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু তাঁকে "major creative writer" বলতে তিনি অসম্মত। Symbolist কবিদের সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা অতি চমৎকার কিন্তু পল ভ্যালেরির প্রতি তিনি বেশ কঠোর। অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, যেমন মলিয়ের্, ভলতেয়র, দীদ্‌রো, (যাঁর চরিত্র-চিত্র অবিস্মরণীয়) পাস্কাল্ এবং আধুনিক যুগে মার্সেল প্রুস্ত্। কিন্তু সব মিলিয়ে

ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি যেন কিছু কঠোর। এর কারণ কি বর্তমান বিশ্ব-ব্যাপী ফরাসী সাহিত্যপ্রিয়তা, যার বিরুদ্ধে Priestley বিদ্রোহ জানিয়েছেন ?

আমার মনে হয় অনেক প্রথিতযশা সর্বত্র-প্রশংসিত ফরাসী লেখকের সম্বন্ধে তাঁর গদ্‌গদ না হাওয়ার কারণ অন্ধ প্রীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া মোটেই নয় ; ঠিক স্পষ্ট করে কোথাও না বললেও আমার বিশ্বাস যে তাঁর এই অনুচ্ছ্বাসের কারণ হল ফরাসী সাহিত্যের—অন্তত তার খুব বড় একটা অংশের আত্ম-সচেতনতা, ঐকান্তিক বুদ্ধিনির্ভরতা, আর সবচেয়ে বড় কথা—মনের চেতন স্তরের প্রাধান্য ও অতিরিক্ত আধিপত্য। মগ্নচৈতন্যের অন্তর্গূঢ় বেদনা ও আকূতির প্রকাশ এ সাহিত্যে অপেক্ষাকৃত বিরল ও দুর্বল। অর্থাৎ ফরাসী সাহিত্যে geniusএর চেয়ে talentএর, matter এর চেয়ে formএর, creation এর চেয়ে criticism-এর প্রাবল্য বেশি ; ক্রিটিক হিসেবে এঁরা অতুলনীয়, কিন্তু স্রষ্টা হিসাবে এঁরা প্রশংসা প্রাপ্যের চেয়ে ঢের বেশি পেয়েছেন, যেমন আঁদ্রে জীদ বা পল ভ্যালেরি।

তা হলে সাহিত্যে geniusই কি সব ? talent কি নিতান্তই অপেক্ষাকৃত নিম্নাধিকারীর জন্য ? মহৎ সাহিত্য-সৃষ্টিতে সুরুচি, সংস্কৃতি, সূক্ষ্ম ও মার্জিত অনুভূতি। ভাষার মাধুর্য ও লিপিচাতুর্য—এসবের কি কোনই দাম নেই ? এর উত্তর, নিশ্চয়ই আছে। genius ছাড়া উঁচুদরের সৃষ্টি হয় না একথা যেমন সত্য, তেমনি এ কথাও সত্য যে geniusএর মধ্যে একটা বন্যতা, একটা প্রবল দুর্দাম উন্মত্ততা আছে, যাকে শান্ত, সংহত ও সুমিত করে তুলতে হলে প্রয়োজন talent-এর সংযম। genious talent-এর দ্বারা মার্জিত ও সংস্কৃত না হলে তার পরিণাম কি হতে পারে তার একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত হলেন Faulkner. এই Faulkner প্রসঙ্গেই Priestley একটি গভীর মন্তব্য করেছেন "When a writer is over-mastered and swept along by unconscious elements, he achieves power and intensity, as Faulker does, but without great conscious discipline his work will be unequal, without proportion, any steady vision." এর থেকেই বোঝা যাবে শুধু geniusই যথেষ্ট নয়, তা talent এর সঙ্গে সংযুক্ত হলেই পূর্ণাঙ্গ ও মহৎ আর্ট সৃষ্টি সম্ভব। এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক, Priestley সাহিত্যে ও আর্টে balance বা ভারসাম্যের ওপর অত্যন্ত জোর দিয়েছেন ; কোন একটা জিনিস তা সে যত ভালোই হ'ক—

আত্যন্তিক প্রাধান্য লাভ করলেই এই সামঞ্জস্য ও ভারসাম্যের অভাব ঘটে। শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্ট বা সাহিত্যস্রষ্টা তাঁরাই যাদের লেখায় আমরা পাই বাহ্য ও অন্তঃ, ব্যাপ্তি ও গভীরতা, চেতন ও অবচেতনের পরিপূর্ণ একতানতা। এই কথাটাই বলতে চেয়েছেন এক জায়গায় স্মরণীয় ভাষায়—The great masters of literature are equally open to what outward experience will bring them and what will arise from the depths of their soul.

সমাজধর্ম ও সাহিত্য

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ধর্ম বোলতে সাধারণত শ্রেণীগত ও ব্যক্তিগত ধর্ম বুঝি। যে পরিমাণে প্রত্যেক নর-নারীর বিকাশ, তার শ্রেণীর কিংবা সমাজের অবস্থা ও অভিব্যক্তি এবং সমাজনায়কদের আদর্শের ওপর নির্ভর করে সেই পরিমাণে ব্যক্তিগত ধর্ম সামাজিক ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে বাধ্য। ব্যক্তিগত ধর্মই সামাজিক ধর্মের প্রেরণা। ব্যক্তিগত ধর্মের অর্থ যতটুকু ধারণ করবার শক্তি, ততটুকু ধর্মই সহজাত। কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম মানে শুধু ধারণ করবার শক্তি নয়, সৃষ্টি করবারও শক্তি। সর্ব্বক্ষেত্রেই, অবস্থার বিপর্যয়ে পুনর্গঠনের শক্তিই ধর্মের প্রাণ। সামাজিক ধর্ম যখন রক্ষণ ও ধারণ কোরে ক্ষান্ত হয়, তখন বুঝতে হবে যে, সে সমাজে মানুষের মত মানুষের দুর্ভিক্ষ হয়েছে, সে সমাজে আছে শুধু কঙ্কাল। ব্যক্তিগত ধর্ম যখন কেবল পুরাতনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করা ছাড়া অন্য কাজ পায় না, তখন বুঝতে হবে যে, সে ধর্ম বহুদিন পূর্ব্বে মারা গিয়েছে। সৃষ্টির অর্থে জীবজগতের সৃষ্টি যতদূর হোক্ আর না হোক্, রূপ-জগতের, মানসিক জগতের, ব্যবহারিক জগতের এবং আনুষ্ঠানিক সৃষ্টিই বুঝতে হবে। সমাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে মুক্ত ব্যক্তি, সমাজ সেই মুক্তিযজ্ঞের মাল-মশলা জোগান দেয় মাত্র। বাংলা দেশের বর্তমান সমাজ এই জোগান দিতে পরাঙ্মুখ হয়েছে বোলে সকলেরই মনে হচ্ছে স্নেহান্ধ পিতামাতা যেমন সন্তানের অর্বাচীনতা বয়সের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেরা দোষমুক্ত এবং দায়িত্বশূন্য হন, তেমনি অনেকে পূর্বোক্ত পরাঙ্মুখীনতাকে যুগধর্মের স্বভাব বোলে বেশ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন দেখেছি। কিন্তু অক্ষমতাকে যুগধর্ম বোলে যাঁরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন তাঁরা এই কথাটির মধ্যে ধর্মের যথার্থ মানে না বুঝে, ধর্মকে বাদ দিয়ে, যুগেরই উপাসনা করেন। যে কোন দু'টি মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তন ঘটছে সেই কালই সেই পরিবর্তনের সম্পর্কে যুগ। কালও পরিবর্তনের মধ্যে নিহিত রয়েছে—কালাতীত পরিবর্তন হোতে পারে না। দুটি ক্ষণস্থায়ীর মধ্যে একটি বুঝতে হলে, সুবিধার জন্য, হয় একটি স্থির ভাবতে হবে, না হয় তৃতীয় একটি

স্থিরসত্তা ভাবতে হয়। যুগ অনবরত সরে যাচ্ছে, ধর্মও অনরবত বদলাচ্ছে—ঐ ক্ষেত্রে যুগধর্ম মানে জর্ম্মান অধ্যাপকের আবিষ্কৃত Zeit Geist-এর তর্জমা ছাড়া অন্য কিছু নয়। কালের যুগের এমন কোন সত্ত্ব, কিংবা গুণ, কিংবা প্রাধান্য থাকতে পারে না, যার জন্য ধর্মের সত্তা, গুণ কিংবা প্রাধান্য লোপ পাবে। এ বৎসরের পঞ্জিকায় যে ১৯০০ সাল লেখা নেই,—১৯২৮ সাল লেখা আছে, এই তথ্যটি পরিবর্তন-ক্রিয়ার কর্তা নয়। তবে কর্তা কে? সমাজতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, কর্ত্তা হচ্ছে সমাজ কিংবা শ্রেণী, অর্থাৎ ব্যষ্টির সমবেত শক্তি। কিন্তু যাঁরা মানব-মনের অনুকরণেচ্ছা লক্ষ্য কোরেছেন তাঁরা বোধ হয় অ-সাধারণ ব্যক্তিকে কর্ত্তা বলতে দ্বিধা বোধ কোরবেন না। যাঁরা অসাধারণত্বে অবিশ্বাসী, তাঁরাও ভেবে দেখেছেন যে ব্যক্তিই হচ্ছেন কর্ত্তা; যদিও কর্তৃত্ব করবার সুযোগ ঠিক্ করে ঐ সমাজ, এবং আজকালকার যুগে ঐ শ্রেণী।

সে যাই হোক্, আর্থিক কিংবা পারমার্থিক কারণে সমাজ না হয় বদলে গেল। কিন্তু দ্রষ্টা এবং অ-সাধারণ ব্যক্তি জন্মায় কি কোরে? সুপ্রজনন-বিদ্যার সাহায্যে অসাধারণত্বের খানিকটা প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সমাজ এখানেও বাধা দিচ্ছে। যে সমাজে শিক্ষিত যুবকের দল পর্য্যন্ত জন্মরোধের সুফল সম্বন্ধে সন্দিহান, যেখানে জীবনের বিবাহাদি প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি অন্ধবিশ্বাসের প্রতীক এবং প্রেতমূর্ত্তি পিতামাতা এবং পত্নীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেখানে সুপ্রজনন-বিদ্যার বিস্তৃত প্রয়োগ আপাতত অসম্ভব। অবশ্য এই বিদ্যাটি রসায়নশাস্ত্র কিংবা পদার্থবিজ্ঞানের মতন এমন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি যে, তার সিদ্ধান্তের সাহায্যে কোন ভবিষ্যৎ-বাণী করা যায়। তবুও মানুষের নির্ব্বাচন-শক্তির দ্বারা অনুপযুক্ত লোকের জন্মরোধ, আর্থিক দুর্গতি থেকে পরিত্রাণ এবং উপযুক্ত লোকের মৃত্যু-হার কমান সম্ভব, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। যে দেশে উপযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা বেশি, সেখানে এই হলেই যথেষ্ট। আমাদের দেশে দুঃখ থেকে নিস্তার পেলেই চলবে না, সুখের রীতিমত ব্যবস্থা কোরতে হবে। তবে উপযুক্ত ব্যক্তি কে—কি রকম বিবাহে কোন্ ধরণের উপযুক্ত ব্যক্তি জন্মাবেন—আগে থেকে ঠিক করা অসম্ভব। কেননা, যেমন সুপ্রজনন-বিদ্যাটি অপরিণত, তেমনি বিদ্যার্থীর মনে উপযোগিতা সম্বন্ধে কোন মতের ঐক্য নেই—ফলে সুজনন-বিদ্যা, হিন্দুশাস্ত্রের মতন উদার হয়ে উঠেছে। যে বিদ্যার যে কোন পূর্ব্বতন সংস্কারের নজীর পাওয়া যায়, সে বিদ্যা অল্প জানলেই নিজের মতকে

দৃঢ়তর করা যায়। বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে উপযোগিতা সম্বন্ধে অনৈক্যের অন্যতম কারণ—প্রেমের প্রতি অন্ধবিশ্বাস। জাতিবিচার নিরর্থক হবার পরেই যৌন-বিচারের অন্য পদ্ধতি আবিষ্কার করা দরকার হলো। বাংলা দেশে প্রেম নামক পদ্ধতি আবিষ্কার কোরলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কর্ত্তাদের বারণ কেউ মান্‌ল না। তার পর এলেন রবিবাবু। তিনিই আমাদের সকলকে প্রেমে পড়তে শিখিয়েছেন। তাঁরই ভাষা দিয়ে আমরা প্রেম করি, তাঁরই ভাব দিয়ে আমরা প্রেমে পড়ি—গুরুজন ও গুরুদাসবাবুর বাধা সত্ত্বেও। প্রেম আমাদের ধাতে এসে গিয়েছে। ভিক্টোরিয়ান সাহিত্যের প্রকোপে অন্য কিছু হতেই পারত না। সে যাই হোক্, প্রেম কোরে বিবাহের মধ্যে এমন একটি দৈহিক ও মানসিক মাদকতা এবং অন্তত কয়েক মাসের জন্যও যৌন-সম্বন্ধের এমন একটি সম্পূর্ণতা আছে যার ফলে পুত্রকন্যারা ঢের বেশি স্বাধীনতাপ্রিয় ও নির্ভীক্ হয়ে ওঠে। যাঁরা বর্ত্তমান হিন্দু-বিবাহের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা খুঁজে পান, এবং হিন্দু-বিবাহে আধ্যাত্মিকতা ছাড়া অন্য কিছু নেই, এবং থাকা উচিত নয় মনে করেন, তাঁদের অবশ্য প্রেমে আস্থা নেই। যে আধ্যাত্মিকতা খুঁজে বার কোরতে হয়, তার চেয়ে দৈহিক ও মানসিক মাদকতা জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় মনে করা স্বাভাবিক। প্রেমে পড়ে বিবাহ, এ ক্ষেত্রে মন্দের ভাল মানতেই হবে। এ গেল সুপ্রজনন-বিদ্যার উপকারিতা সম্বন্ধে ইংরাজী শিক্ষায় অনুপ্রাণিত যুবকদের ধারণা। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং অন্যধরণে শিক্ষিত ব্যক্তির মনে সামাজিক উপযোগিতা সম্বন্ধে নানাপ্রকার ধারণা থাকলেও, একটি গড়পড়তা মত পাওয়া যায়। উপযুক্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্য থাকবে, সাধারণ বুদ্ধি থাকবে, টাকা রোজগারের ক্ষমতা থাকবে, এবং সে ব্যক্তি অন্তত প্রকাশ্যে সামাজিক প্রথা মেনে চলবে। স্বাস্থ্য, অর্থ ও বুদ্ধিসম্পন্ন সন্তানের জন্যও সুপ্রজনন-বিদ্যার প্রয়োগ প্রয়োজনীয়, কিন্তু সুবোধ, সুশীল সন্তানদের জন্য সে প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। যে বিবাহের ফলে সুবোধ, সুশীল বালক-বালিকা জন্মগ্রহণ করে, সে বিবাহের নামই বিংশ শতাব্দীর 'হিন্দু-বিবাহ'। আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশে লোক যে দেহে ও মনে এত ভীরু তার একটি কারণ এই যে, দেশের পিতামাতার বিবাহিত জীবনে কোন প্রকার স্বাধীনতা ও স্ফূর্ত্তির ছাপ নেই, বরঞ্চ এমন একটি সঙ্কোচ আছে যার আওতায় দেহ ও মন ফুটে উঠতে পারে না। ভবিষ্যতে যুবক-যুবতীর মনে থেকে ভীরুতা দূর করবার এবং

তাদের সাহসী করবার একমাত্র উপায় যৌন-নির্ব্বাচন। যতদিন সে উপায়টি অবলম্বিত না হচ্ছে ততদিন প্রেমে পড়ে, বিবাহকেই বরণ কোরে নিতে হবে।

অ-সাধারণ ব্যক্তির জন্মগ্রহণের সুযোগ দেওয়া ভিন্নও সাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার দ্বারা সমাজের সাধারণ স্তরকে উন্নত করা যায় অনেকে বিশ্বাস করেন, এই উপায়ের বিপক্ষে অনেক আপত্তি আছে। প্রথমতঃ, উপায়টিই উপায়ের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ, সুপ্রজনন-বিদ্যায় যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির খুব বেশি উন্নতি করা যায় বিশ্বাস করেন না। এ কথা সত্য যে, সাধারণের মধ্যে বুদ্ধির এবং জ্ঞানার্জ্জনের ক্ষমতার বিভাগ এবং বিস্তার সহজাতশক্তির ওপর যতটা নির্ভর করে, শিক্ষার তারতম্য এবং বিস্তারের ওপর ততটা করে না। শিক্ষিত হবার ক্ষমতাও যৌন-নির্ব্বাচনের দ্বারা বাড়ান যায়। তৃতীয়তঃ, সুপ্রজনন-বিদ্যা সম্বন্ধে যেমন মতের অনৈক্য আছে, শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশি বৈ কম অনৈক্য নেই। শুধু তাই নয়, প্রাথমিক শিক্ষার দ্বারা সমাজের বড় বেশি উন্নতি করা যায় না। অবশ্য, এগুলি ঠিক আপত্তি নয়, বিপত্তি। অতএব ধীরে ধীরে বিপত্তিগুলি দূর হবে আশা করা যেতে পারে। যে কোন ভাল কাজেই বাধা-বিঘ্ন আছে—যে কোন সত্যেরই অন্তরায় আছে—সে অন্তরায় দেখাতে পারলেই সত্যকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে অন্তরায় হচ্ছে সাধারণের অশিক্ষা। অতএব সুপ্রজনন-বিদ্যার কথা মনে রেখে শিক্ষাবিস্তার কোরতে হবে। সেইজন্য বাংলাদেশে একটি মানসিক ভূগোল তৈরি কোরতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় একা এ কাজ হাতে নিতে পারে না—রাজারও ইচ্ছা নেই, কল্পনা নেই। অতএব বিবাহিত জীবনকেই সংস্কৃত কোরতে হবে। বিবাহিত জীবনই সামাজিক জীবনের মেরুদণ্ড, সেটিকে সোজা রাখতে হবে। উপায়—প্রেম ও সুপ্রজনন-বিদ্যার সাহায্যে যৌন-নির্ব্বাচনের সামঞ্জস্য রক্ষা করা। এক কথায়, উপায়—জীবনকে, জীবনের প্রধান প্রধান অধ্যায়কে বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবান্বিত করা। আমার বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমান মাসিক পত্রের পাতায় পাতায় পরোক্ষে বিবাহ ও যৌন-সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু খোলাখুলি অথচ ভদ্রভাবে কেউ এ সম্বন্ধে লেখেন না। আমার বিশ্বাস আর্টিষ্ট এই নিয়ে গল্পও লিখতে পারেন। কিন্তু সকলেই প্রেম নিয়ে ব্যস্ত। নব্য-সাহিত্যিকরা মনে করেন, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের যুগ চলে গিয়েছে—যদি গিয়েই থাকে তাহলে তাঁদের আবিষ্কৃত প্রেমও মাসিক-সাহিত্যের পাতা থেকে

চলে যাক্ না কেন? সামাজিক ধর্ম বদলাচ্ছে, ব্যক্তি বলছে যে, সে শুধু ধর্ম রক্ষা কোরে ক্ষান্ত হতে পারছে না। সে এমন একটি ধর্ম গড়তে চায় যার সাহায্যে তার শক্তির স্ফুরণ হবে—তার ক্ষমতাগুলি শতদলের মতন বিকশিত হবে। আপাতত, ব্যক্তি কাঁটা হয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তির সঙ্গে পুরাতন সংস্কারের গরমিল হচ্ছে। সমাজ পেছিয়ে পড়ছে, ব্যক্তির অভাব পূরণ কোরতে পারছে না। ব্যক্তিও জোর গলায় বলছে না যে, সে বড় একটা কিছু কোরতে চায়। তার আকাঙ্ক্ষা ছোট। এ সময় মানুষ যা চাচ্ছে তার মধ্যে বীরত্ব নেই, সমাজ যে ভাবে বদলাচ্ছে তার মধ্যে ব্যক্তির প্রবল ইচ্ছা নেই, তার পিছনে বুদ্ধির চালনা নেই, তার সামনে কোন বিজ্ঞানসম্মত আদর্শ নেই। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের লেন-দেনের মধ্যে মানুষের চাওয়া কম—এর মধ্যে অনেকখানি ইচ্ছাশক্তির অতিরিক্ত, অর্থগত ও বিদেশীভাবগত অসামঞ্জস্যের প্রেরণা রয়েছে। যা পরিবর্ত্তন হচ্ছে সবই আমাদের অনিচ্ছায়—এ পরিবর্ত্তন ভগবানের লীলার মতন বীর্যহীন। যা কিছু কোরতে হবে—সব যেন চোখ খুলে করি, নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে করি, নিজের শক্তি খাটিয়ে করি। Social force-এ বিশ্বাস করাও যা, বাইরের ভগবানের বিশ্বাস করাও তা—সবই আত্মপ্রবঞ্চনা।

এক বছর পরে দেশে ফিরে তিনটি ঘটনা আমার চোখে পড়েছে। একটি সাহিত্যিক ঝগড়া, দ্বিতীয়টি কলকারখানায় ধর্মঘট, এবং তৃতীয়টি যুবক-সম্প্রদায়ের জাগরণ। প্রত্যেক ঘটনার পিছনে আছে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধ। প্রথমটির সম্বন্ধে এত মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে যে, সে বিষয়ে কোন নতুন কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে একটা অতি পুরাতন কথা না বোলে থাকা যায় না। নবীন সাহিত্য, অতি-আধুনিক সাহিত্য বোলতে আমি 'কল্লোল', 'কালি-কলম', 'প্রগতি'র ভাল লেখাকে যেমন ধরি, তেমনি ধরি 'শনিবারের চিঠি'র ভাল ব্যঙ্গ-রচনাগুলিকেও। দুই দলের লেখাতেই স্বাতন্ত্র্য আছে, বৈশিষ্ট্য আছে। রস জিনিষটি দেশ ও কালের অতিরিক্ত হলেও যে বস্তুর, যে রূপের, যে আধারের সাহায্যে সেটি তৈরি হয়, সে বিষয়বস্তু, সে রূপ ও সে আধার সাধারণত দেশ ও কালের অন্তর্ভুক্ত সমাজসংক্রান্ত চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত থাকে। প্রতিক্রিয়াও এক ধরণের যোগ। শুধু প্রতিক্রিয়ার দ্বারা অবশ্য সাহিত্য হয় না, কিন্তু সব প্রতিক্রিয়া কেবলমাত্র বৈপরীত্যের বিকার নয়। বৈপরীত্যের পিছনে নতুন ভাবের তাড়না থাকতে বাধ্য—যেমন মাইকেলী যুগে

ছিল। অতি-আধুনিক সাহিত্য আমাকে রাজনারায়ণ বসুর আত্মজীবনী, মাইকেলের জীবন-কথা, এবং নিমচাঁদের চরিত্র স্মরণ করিয়ে দেয়। ভূত যখন ছাড়ে, তখন ছাড়ার চিহ্নস্বরূপ গাছের ডালপালা ভেঙ্গে দিয়ে যায়। অত্যন্ত প্রপীড়িত হয়ে মানুষ যখন শাসনের বিপক্ষে বিদ্রোহ করে, যখন সে বিদ্রোহ দমন কোরতে শাসনকর্ত্তা শাস্ত্র আওড়ান এবং শস্ত্র ধরেন, তখন সে বিদ্রোহের মধ্যে, সে শাস্ত্র ও অস্ত্রক্ষেপের মধ্যে সঙ্গতি, সামঞ্জস্য, সুবিচার, সুরুচি থাকে না—কারণ এক দৈহিক পীড়ন ছাড়া অন্য কোন পীড়ন সামাজিক পীড়নের মত নিষ্ঠুর, নিবিড় ও ব্যাপক নয়। কিন্তু মানুষ বিরক্ত হয়ে মহাপুরুষদের মতন সংসার ত্যাগ কোরতে পারে না—সে যখন সমাজের মধ্যে থাকতে বাধ্য তখন তার বুদ্ধিবৃত্তিও অসামাজিক হতে বাধ্য। সেইজন্য মানুষের সঙ্গে তারই রচিত সমাজের মনকষাকষি চিরকালই চলছে—নিজের রচনার সঙ্গে বিবাদ করা বোধ হয় মানুষের ধর্ম্ম। যে কর্ম্মী, সে এই অসামঞ্জস্য-জনিত শক্তিকে সংস্কারের কাজে লাগায়, সেই নবযুগের পুরুষ। যে সাহিত্যিক কোন মতামত প্রচার না কোরেও গোটা মানুষের সঙ্গে বাহিরের সমাজ ও অন্তরের প্রকৃতির নতুনপ্রকার বিরোধকে রূপ দিতে পারে সেই নব্য-সাহিত্যিক। এই রূপ সামাজিক হবে না, অ-পরিচিত হবে জনসাধারণের কাছে। কিন্তু যে ব্যক্তি বিরোধের সঙ্গে পরিচিত সে এই নতুনত্বের খাতির করবে। সাহিত্যের সঙ্গে যুগধর্ম্মের ও সমাজের সম্বন্ধ এই বিরোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য, যতদিন সাহিত্যের বিষয় মানুষ থাকবে এবং যতদিন সাহিত্যিক বুঝতে কল বুঝব না, মানুষ বুঝব।* সমাজতত্ত্ববিদ্

* ১৬ই মে তারিখের আমেরিকান 'নেশন' পত্রিকায় দুটি উপাদেয় প্রবন্ধ পড়লুম। একটির বিষয় বর্তমান ফরাসী সাহিত্যের ধারা, অন্যটির বর্তমান রুষ-সাহিত্য। লেখকদ্বয় নামজাদা সমালোচক Rene Lalou লিখছেন—"The most striking feature in every field of French literture at the present moment seems to be a general disinclination to treat art for art's sake ; our writers deliberately use it as instrument for the probing of social or psychological problems"—লেখক বিস্তর দৃষ্টান্ত দিয়ে লিখছেন—"...in our time *the true traitor is the artits who does not take sides.* Even in psychology, neutrality seems impossible ...From that point of view literature may be said to play its part in the national effort to build up France again." Louis Fischer ঐ সংখ্যায় রুষ-সাহিত্য সম্বন্ধে একই কথা লিখছেন—"To the Soviet critic an author's social

অবশ্য রূপ সৃষ্টি করে না, কিন্তু সেও মানুষের দীর্ঘনিশ্বাস শুনতে পায়, সেও সামাজিক অত্যাচার লক্ষ্য করে, এবং অত্যাচার উপশম করবার জন্য জ্ঞানত অসামাজিক মতামত পোষণ ও প্রচার কোরতে বাধ্য হয়—এই হতে বাধ্য, যতদিন সমাজতত্ত্বের বিষয় প্রথমে মানুষ, পরে মানুষের অনুষ্ঠান থাকবে—যতদিন সমাজতত্ত্ব লিখতে মানুষের দরকার হবে। বিজ্ঞানসম্মত সমাজতত্ত্বেও সামাজিক অত্যাচার নিরাকরণের অধ্যায় বাদ পড়বে না। অতএব যদি সমাজের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়ে থাকে, যদি সমাজশাসনের বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে থাকে, এবং সে প্রতিক্রিয়ার যদি কিছু মূল্য থাকে; যদি লোকে বুঝতে পেরে থাকে যে, বড় আদর্শ, পুণ্য, ধর্ম, পবিত্রতার নামে সেই পুরাতন ব্রাহ্মণের বংশধর, সমাজরক্ষকের দল পৈতা ফেলে, plain dress constable সেজে agent provocateur-এর কাজই করছে, তাহলে সে বিদ্রোহের, সে প্রতিক্রিয়ার সুফল, কুফল মাসিক-সাহিত্যের পাতায়, সমাজতত্ত্বের পাতায় ধরা পড়বে। অবশ্য যদি এই সব সত্য হয়, তবেই ধরা পড়বে, নচেৎ নয়, এ কথা বলাই বাহুল্য। নব্য মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন যে, complex ভাঙ্গবার একমাত্র উপায় সাহসভরে তাকে বোঝা, তাকে প্রকাশ করা। সেইজন্য মনে হয় কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতি ও শনিবারের চিঠির লেখকবৃন্দের মধ্যে যে কেউ প্রতি মাসে বর্ত্তমান সমাজের বিপক্ষে যুবক-সম্প্রদায়ের আপত্তিগুলি দাখিল করেন, তাহলে নিছক সাহিত্যসৃষ্টি না হলেও যুবক-সম্প্রদায়ের জাগরণ সত্যকারের জাগরণ হয়, যুবকদের মনে প্রতিক্রিয়ার অসার বৈপরীত্যবোধ লোপ পেয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হয়, এবং তাঁরা নিজেদের ধর্ম খুঁজে পেয়ে সংযত হ'ন। সংযমী হবার এই একটি উপায় আছে। দেশে জনকয়েক Calvins of East Bengal-এর দরকার হয়েছে—ব্রাহ্মধর্মের কাজ এখন ও ফুরোয়নি। নতুন সাহিত্য গঠনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান সমাজের দোষত্রুটি লোকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখবার সময় এসেছে। নব-সাহিত্যের অতিরঞ্জনের জন্য সমাজকেই দায়ী করি। মানুষের

---

philosophy is the first criterion...The only decisive difference between seven or seventeen literary armies is their realism or futurism"—মন্তব্যগুলি ফরাসী কি রুষ-সাহিত্য সম্বন্ধে সত্য কি মিথ্যা যাচাই করার ক্ষমতা নেই। বিদেশে যা হচ্ছে এদেশে তাই হওয়া উচিত তাও বলছি না। তবে সামাজিক পরিবর্তনকে অর্থাৎ বিরোধকে সাহিত্যিক সাহিত্যের বস্তুহিসাবে গ্রহণ কোরতে বাধ্য, এই আমার ধারণা।

দোষ বেশি দেখতে পাই না, যদি তার দোষ থাকে সেটি এই যে, সে এতদিন সমাজের দোষগুলি বুঝতে পারেনি।

নব্য-সাহিত্যে এই অতিরঞ্জনের মধ্যে বিদ্রোহ এবং প্রতিক্রিয়ার অংশটুকু বাদ দিলে অন্য কোন সাহিত্যগুণ আছে কিনা সে বিষয় আলোচনা আমি করছি না। রসবোধ রুচিসাপেক্ষ। রুচি শুধু স্বাভাবিক বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, শুধু বিচার-বুদ্ধির দ্বারা স্থিরীকৃত হয় না, শিক্ষার দ্বারা নির্ধারিত হয় না—শুধু conditioned reflex বা learned reaction দ্বারা তার ব্যাখ্যা করা যায় না—রুচি নিউটনেরও তোয়াক্কা রাখে না, ওয়াট্‌সনেরও খাতির রাখে না। রুচি অভ্যাস নয়, স্মৃতিও নয়। রুচি ব্যক্তির একটি সম্পূর্ণ অনুভূতির প্রতিবিম্ব। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ হয়নি, তার অনুভূতি একদেশদর্শী, তার অনুভূতি প্রবৃত্তির নামান্তর—অতএব তার রুচির কোন বিশেষ মূল্য নেই—অন্তত রসের ক্ষেত্রে। ব্যক্তিত্ববিকাশের স্তরের জন্য রুচিগত পার্থক্য হয়। রুচির অভিব্যক্তি আছে, ইতিহাস আছে, অতএব ভিন্নস্তরের রুচির সঙ্গে মিল সম্ভব হয়। সেইজন্য রুচির কথা ছেড়ে দিচ্ছি। পূর্ব্বেই বোলেছি যে বোঝবার সুবিধার জন্য সাহিত্যের বক্তব্য এবং বিষয়বস্তুকে রস থেকে পৃথক কোরতে হয়। বক্তব্য বিষয়ে অতি-আধুনিক সাহিত্যিক সচেতন কিনা, রূপে কতখানি মতামতের খাদ থাকা উচিত, কিংবা কতখানি খাদ থাকলে অলঙ্কার তৈরি হতে পারে, একই বিষয়-বস্তুর একই রূপ হওয়া উচিত কিনা, আমি জানি না। আমি জানি এইটুকু—যদি ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের মনোমালিন্য হয়ে থাকে, যদি এই মানসিক ঘর্ষণের ফলে ব্যক্তির মধ্যে কোন নবশক্তির উদ্রেক হয়ে থাকে, তবে সে শক্তিকে মাত্র একটি রূপে পর্যবসিত কোরলে সে শক্তিকে অপমান করা হয়।

একটি রূপ বোলতে একধারে যৌনসম্বন্ধমূলক সাহিত্য এবং অন্যধারে সেই সাহিত্যের প্রতিক্রিয়ার ব্যঙ্গরচনাকেই নির্দ্দেশ করছি। যৌন-সম্বন্ধ মানুষের খুব বড় সম্বন্ধ, পুরুষ স্ত্রীজাতির ওপর অত্যাচার করে এই সম্বন্ধ নিয়ে, যৌন-সম্পর্কেই অত লুকোচুরি, অত জুয়াচুরি ; এবং সে অত্যাচার, সে জুয়াচুরি যত শীঘ্র সমাজ থেকে যায় ততই মঙ্গল। ব্যঙ্গরচনাও উচ্চ সাহিত্যের একটি অঙ্গ। 'পরশুরাম' বাংলা সাহিত্যে অমর থাকবেন। সতীশ ঘটকের 'রঙ্গ ও ব্যঙ্গ' সকলেরই প্রিয়। কিন্তু হিন্দু-বিবাহের বাধাবিপত্তির বিপক্ষে বিদ্রোহটাই যেমন

রচনা-শক্তি নয়, তেমনি বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এমন শক্তি নেই যেটি স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে উঠতে পারে। যৌন-সম্বন্ধ মানুষের সম্বন্ধ, ব্যঙ্গ-শক্তি মানুষেরই শক্তি। মানুষকে ভুলে গিয়ে তার বিশেষ কোন শক্তি এবং সম্বন্ধ বিচার করা বৈজ্ঞানিক হিসাবে সুবিধার কথা হলেও রসানুভূতির পথ নয়। যেখানে ব্যথা, যেটি সহজগম্য নয়, সেইখানেই চোখ পড়া স্বাভাবিক—অতএব সাহিত্যের বিষয়-বস্তু অবৈধ অর্থাৎ অসামাজিক প্রেম হতে বাধ্য। প্রেমে পড়া—কি বৈধ কি অবৈধ প্রেমে পড়া—মানুষের সব চেয়ে exacting profession হলেও সাধারণত এমন প্রেম ত' দেখিনি যার জন্য মানুষের সব চিরকালের জন্য বদলে গেল। আর যাদের সব যায় তাদের সাহিত্যসৃষ্টি করবার কোন স্থিরবুদ্ধি থাকে না। প্রেমে ভাটা পড়লে তবে পলি পড়ে এবং সেই পলিতেই আর্ট ও সাহিত্যের ভাল ফসল তৈরি হয়। রাগ থামলে তবে ব্যঙ্গরচনা সম্ভব হয়। সাহিত্য detumescent অবস্থার চিহ্ন। অবশ্য এ সব কথা রসস্রষ্টার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধেই খাটে—কিন্তু রাগ এবং অনুরাগের সব অবস্থাই সাহিত্যের বিষয়-বস্তু হতে পারে না বলি কি কোরে! ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চে রক্তের স্রোত বইত, দু'শ বছর পরে ফরাসী সাহিত্যের প্রভাবে রঙ্গমঞ্চে খুনখারাপি বন্ধ হলো, আবার আজকাল সে দেশে এমন নাটকও লেখা হচ্ছে যার প্রথম দৃশ্যেই বন্দুক চলছে। রোণ্ডাঁর বৃদ্ধা বেশ্যাকে দেখলে লেসিং লাওকুনের হাসি-মুখের অন্য ব্যাখ্যা কোরতেন নিশ্চয়। সব জিনিষই রসবস্তু হতে পারে, তবে রসোৎপাদনের জন্য সে বস্তুর কতটুকু প্রকাশ্য, কতটুকু বেছে নিতে হবে তার ভার রসস্রষ্টার হাতে। আমার বক্তব্য এই যে, কামবিষয়ে নিরর্থক এবং নিতান্ত অপকারী লজ্জাকে ভাঙ্গতে আমাদের সব শক্তি যেন নিয়োজিত না হয়, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য complex-কেও ভাঙ্গতে হবে। আদৎ কথা, মনের ভয় ভাঙ্গা; কাম ছাড়া মনের অন্য জুজু নেই কি? আমার বিশ্বাস, সাহিত্য জুজু তাড়াবার ভার বেশ নিতে পারে। হয়ত সেটি মাসিক-সাহিত্য হবে, তা হোক্, এই মাসিক-সাহিত্যের চিরস্থায়ী হতে কোন বাধা নেই। অনেক নজির দেখান যায় যে, মাসিক-সাহিত্য সনাতনত্বের কোঠায় উঠেছে। সমসাময়িক সভ্যতা গড়ে তোলা কি এক দলের কাজ, না একঘেয়ে কাজ, না শুধু সমাজ-সংস্কারকের একচেটে ব্যবসা? এক কাজ সাহিত্যিকের, বৈজ্ঞানিকের এবং ঐতিহাসিকের, পরে সমাজ-সংস্কারদের, এককথায় এ কাজ প্রবুদ্ধ ব্যক্তির। আমি সব দলকে

নিবেদন করছি, যেন তাঁরা ক্ষোভের বশে, দাম্ভিকতার বসে, রাগের বশে সভ্যতা তৈরি করার ভার অন্যের হাতে ন্যস্ত না করেন।

কথাটা অন্যভাবে বলা যাক্। বাস্তব-সাহিত্য বোলে যদি কোন সাহিত্য থাকে তাহলে সে সাহিত্যের methodology হবে বৈজ্ঞানিক এবং বিষয় হবে প্রকৃতি ও মানুষের অভিজ্ঞতার ঘাত-প্রতিঘাত। এই বচনটি বস্তুতন্ত্রবাদের গুরু জোলা লিখেছিলেন গত শতাব্দীতে, যখন বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রের মোহে সকলেই আচ্ছন্ন। কিন্তু এখনও সে মোহ সকলে কাটিয়ে উঠতে না পারলেও অনেকেই বেশ বুঝেছেন যে, মোটামুটিভাবে বৈজ্ঞানিকের মনোভাবের সঙ্গে রূপকারের মনোভাবের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। মধ্যযুগের শিল্পী তাঁর সততা, নির্ব্বাচন-শক্তি এবং একনিষ্ঠতার সাহায্যে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকের সমকক্ষ। অবশ্য সাধারণ লোকের, যাদের মন শিল্পীরও নয়, বৈজ্ঞানিকেরও নয়, অথচ শিল্প ও বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবান্বিত, তাঁদের ধারণা এই যে, ঐতিহ্যের সঙ্গে, আদর্শের সঙ্গে objective outlook-এর একটি আন্তরিক বিরোধ আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ বিরোধের বিজ্ঞানের সঙ্গে আর্টের নয়, এ বিরোধ ঐতিহ্যবাদী আদর্শবাদীর সঙ্গে বিজ্ঞানবাদীর—রূপ ও রসসৃষ্টির স্বাধীনতার সঙ্গে প্রভুসম্মত বাণীর। আমরা সাধারণ লোক কিছুই সৃষ্টি কোরতে পারি না—কিছুই ভাঙ্গতে চাই না কিংবা ভাঙ্গবার সাহস আমাদের নেই—আমাদের বিজ্ঞান পড়া ইংরাজী, সংস্কৃত ও ইতিহাস না জানার দরুণই হয়। কিন্তু যাঁরা বস্তুতন্ত্রবাদী তাঁদের কাছেও বৈজ্ঞানিক মনোভাব এবং বর্ত্তমানের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন প্রত্যাশা করা কি অসঙ্গত? শনি-মণ্ডল বস্তুতন্ত্রবাদী নন্, কিন্তু তাঁরাও বলেন যে, তাঁরা নৈর্ব্যক্তিক আলোচনা কোরে থাকেন—কোন ব্যক্তিকে আঘাত করেন না, কেবল ধারা নিয়ে সমালোচনা করেন—অর্থাৎ ব্যবহারে তাঁরা বৈজ্ঞানিক এই প্রমাণ কোরতে চান্। কিন্তু তাঁদের কারুর মধ্যে scientific spirit আছে বোলে ত' মনে হয় না। কল্লোল-দল কাম ও ক্রাইম নিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে লিখবেন, কেউ রাগতে পাবে না, শনি-মণ্ডল কোন বিশেষ ব্যক্তির অযথা ও অন্যায় সমালোচনা কোরবেন, তাঁর বন্ধুরা রাগতে পাবে না—এইটুকুই কি বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সঙ্গে তাঁদের একমাত্র সম্বন্ধের চিহ্ন হবে? নব্য-সাহিত্যিক বাল্য-বিবাহের বিরোধী, প্রেমে স্বাধীনতা চান, বিবাহকে সংস্কার গণ্য করেন—কিন্তু হিন্দু-সমাজকে, হিন্দু-মনোভাবকে ভেঙ্গে চুরে দিতে হবে বোলতে ভয় পান কেন?

আমি জানি দু'দলের কোন কোন মহারথীরা হিন্দু-ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার কোরতে শতমুখ হ'ন—হিন্দু-সমাজ এতদিন বেঁচে এসেছে বোলেই শ্রেষ্ঠ সমাজ, কায়দায় পড়ে, না জেনে শুনে, অন্য সমাজকে, অন্যধর্মাবলম্বীকে আশ্রয় দিয়েছে বোলেই খুব উদার, হিন্দু-ধর্ম সর্বধর্মকে সমন্বয় কোরবে, এইসব ধারণা হৃদয়ে পোষণ করেন, এবং তাঁদের মস্তিষ্কটি হৃদয়ে অবস্থিত বোলেই হিন্দু-ধর্ম নিয়ে অনেক ভাবপ্রবণ 'চিন্তাশীল' লেখা লেখেন ; নব্য-সাহিত্যিকরা সব খদ্দর পরছেন—মনের কোণে বোধ হয় এই বিশ্বাস আছে যে, খদ্দর পরলে দেশ স্বাধীন হোক্ আর না হোক্ সাহেব জব্দ হবে। এঁরা কেউ কেউ দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় ব্যস্ত—অথচ সত্যকারের বৈজ্ঞানিক মনোভাবের কাছে, গণতান্ত্রিক মনোভাবের কাছে, দরিদ্র-নারায়ণের যথার্থ সেবকবৃন্দ, অর্থাৎ সোশিয়ালিষ্টের কাছে না আছে দেশী, না আছে বিলেতী। সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রবাদ কি তাহলে অসাহিত্যিক মনের কাজ ছাড়া অন্য কিছু নয় ? একটি নতুন ভঙ্গিমার বিস্তার মাত্র ? এর মধ্যে সত্য কি কিছুই নেই ? আধুনিক সাহিত্যিকরা শুধু Realism-এর ভক্ত—না সত্যকারের Realists ? শনি-মণ্ডলের লেখা পড়লে মনে হয় যে, তাঁরা সব ব্রাহ্মণ সভার পরিপোষক, গোপনে গোপনে বোধ হয় চাঁদাও দেন। বস্তুতন্ত্র-বাদীরা না হয় অবৈজ্ঞানিক হলেন, কিন্তু তাঁদের হতে আপত্তি কি ? তাঁরাও ত' নব্যভব্য—তাঁদের রসরচনাও ত' বাংলা সাহিত্যে নতুন সম্পদ এনেছে ? স্রেফ্ গালাগালি দেওয়া তাঁদের উদ্দেশ্য কখনই হতে পারে না। উদ্দেশ্য, মাত্র এক সমসাময়িক সভ্যতার মূল্য নির্দ্ধারণ করাই হতে পারে, পুরাতন সভ্যতার মূল্য নতুন আদর্শে নতুন অবস্থার অনুপাতে নতুন কোরে যাচাই করা এবং পরবর্ত্তী সভ্যতা ভব্যতা ও বৈদগ্ধ্যের ভিত্তি গাঁথাই আদর্শ হতে পারে। কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতি এবং শনিবারের চিঠি আমি পেলেই পড়ি এবং প্রায়ই পড়ি। কিন্তু কোথাও contemporay culture-এর সমালোচনা পড়েছি বোলে মনে হয় না। শনি-মণ্ডলের সমালোচনা-শক্তি কল্লোল-দলের অপেক্ষা বেশি আছে অনেকে সন্দেহ করেন, তাঁরাই এ কাজটি করুন না ? আমি 'শনি-মণ্ডল'কে কালো নীরে ঝাঁপ দিতে অনুরোধ করি। নিজেদের ছায়া দেখে ভয় কোরলে চলবে না। আমার সন্দেহ হয়েছে যে, শনি-মণ্ডল কল্লোল-সম্প্রদায়ের মতনই সমাজ ও জীবনের first and last things নিয়ে নাড়া চাড়া কোরতে ভয় পান, কিংবা সময় পান না, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধে যে শক্তি জন্মগ্রহণ কোরছে

তাকে খাটাতে ভয় পান কিংবা সময় পান না! আমাদের মতন কাপুরুষ বোধ হয় কুত্রাপি নেই—নচেৎ যাঁরা দেহ সম্বন্ধে এত খোলাখুলি লিখতে সাহস পান—যাঁরা যে কোন সাহিত্যিকের লেখা সমালোচনা কোরতে ব্যগ্র এবং জনমতের বিপক্ষে মন্তব্য প্রকাশ কোরতে উদ্যত, তাঁরাও লজিকের শেষবেশ দেখতে নারাজ!

কার্ল মার্কসের শিষ্যেরা সমাজ অর্থে মূলত শ্রেণী বোঝেন। তাঁদের মতানুসারে সামাজিক ধর্মের মানে শ্রেণীগত ধর্ম—সে ধর্ম বদলাচ্ছে; পূর্বে, পরে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত ধর্মও বদলাচ্ছে। যৌন-সম্পর্ক সমাজ-ধর্মের একটি মূলকথা, সে সম্বন্ধে ধারণা বদলাচ্ছে (অনেকস্থলে সাহিত্যের সাহায্যে,) বিষয়-বস্তুর নির্বাচনে এই পরিবর্তনের আভাস ভাল কোরেই পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সমাজে অন্যান্য ঘটনাও ঘটছে—সেগুলির মূল্য আমরা দিতে শিখিনি। বিবাহ-পদ্ধতি বদলান যেমনভাবে দরকারী মনে করি, দেশের অন্যান্য অবস্থার পরিবর্তনও তেমন আগ্রহের সঙ্গে দরকারী মনে করি না। সেগুলি সাহিত্যের বিষয়-বস্তু বোলে গ্রাহ্য কোরছেন অনেকে, দু এক জনের হাতে সেগুলির সাহায্যে রসসৃষ্টিও হয়েছে। কিন্তু সেই ঘটনাগুলির প্রভাবে যে নতুন মানুষ তৈরি হচ্ছে সেই নতুন মানুষের স্থান সাহিত্য এখনও নিরূপণ করেনি। সাহিত্য সেগুলিকে tendency বোলে ছেড়ে দিয়েছে—সেই tendency-র ফলে সংস্কৃত ব্যক্তির আচরণ লিখতে অনেকেই ভয় পান। এই যে ধীরে ধীরে বাংলা দেশের লোকেরা গ্রাম ছেড়ে ছোট বড় সহরে বাস কোরেছে, এই যে লোকেরা ব্যবসা সুরু কোরেছে, ধান ডাল যবের ক্ষেত না কোরে পাট এবং রপ্তানীর উপযোগী শস্যের চাষ আরম্ভ কোরেছে, এই যে টাকার আধিপত্য সুরু হয়েছে, যেখানে কল-কারখানা সেখানে মুটেমজুরদের দল ঝুঁকে পড়েছে অথচ স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর-কন্না কোরতে পারছে না, কিংবা যে ঘরে ঘরকন্না কোরছে সেটি বাসের উপযুক্ত মোটেই নয়, এই যে মধ্যবিত্ত ভদ্রসম্প্রদায় সহরের মেসে বাস কোরছে, এর ফলে কি ধর্ম, সমাজ এবং গোষ্ঠী ভেঙ্গে যাছে না—এবং সেই ভাঙ্গনের ফলে মানুষের আচরণ-ব্যবহারগুলি কি বদলে যাচ্ছে না? মুটেমজুর, চাকরবাকর, বাড়ীর স্ত্রী, পুত্রকন্যা, চাষী ও গরীব কেরাণীর দল সকলেই অত্যাচারীর বিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, সঙ্ঘ বাঁধছে, ধর্মঘট কোরছে, টাকা দিয়ে মানুষের মূল্য ঠিক্ কোরছে, এককথায় 'জড়বাদী' হয়ে উঠেছে। আগে লোকেরা কতখানি

আধ্যাত্মিক ছিল জানি না, তবে ভগ্নী নিবেদিতার পর থেকে জনসাধারণের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা বিরল হয়ে উঠেছে দেখছি। তবে ভণ্ডামীও সেই অনুপাতে বাড়ছে বলা যেতে পারে। জড়বাদ ভাল কি মন্দ সে কথা উঠছে না এবং সাহিত্য জড়বাদের ব্যাখ্যা করুক তাও বলছি না। তবে জড়বাদ যে বর্তমান যুগে নিতান্তই স্বাভাবিক, সে-কথা ক্ষুধার্ত ব্যক্তি এবং সহুরে লোক কি কোরে অস্বীকার করে? যতক্ষণ অঙ্গ অসুস্থ থাকে ততক্ষণ মন অসুস্থ অঙ্গের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে—অবশ্য তুলনাটি ঠিক্ হলো না, কেননা ক্ষুধা অসুস্থতা নয়, সুস্থদেহেরই লক্ষণ। যাই হোক্, মানুষের মনোবৃত্তিগুলি এবং আচার ব্যবহার এমনিভাবে বদলাচ্ছে যে, সেগুলি সকলেরই নজরে পড়া উচিত। নজরে পড়লে অনেকে তৎক্ষণাৎ চোখ বন্ধ কোরে ফেলেন। মনের মধ্যে একধারে ঐতিহ্যরূপ চেড়ীর দল চাবুক নিয়ে শাসাচ্ছে, অন্য ধারে গালফুলো ভুঁড়িওয়ালা, গগন ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্রের ভট্চায্যি মশাই-এর মতন আত্মপ্রসন্ন দেশাত্মবোধ সর্বদাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, আমরা সব আধ্যাত্মিক; ফলে মন কাজ বন্ধ কোরে দিয়েছে। বস্তুতন্ত্রবাদীদের সোশিয়ালিষ্ট্ হবার সাহস আছে কি? সামাজিক পরিবর্তনের ফলে দেশের মতিগতি কোন্ ধারে যাচ্ছে তার খতিয়ান শনি-মঙ্গল কবে কোরবেন? সবই নারায়ণ কোরছেন বোলে আশ্বস্ত হলে চলবে না। বীর্যবান্ পুরুষ ভগবানের মুখ চেয়ে থাকে না। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি, প্রপীড়িত ব্যক্তি ধীরে ধীরে বুঝছে যে তার রচিত, কিংবা ধনীর, কিংবা ব্রাহ্মণের রচিত ভগবান্ স্বকল্পিত দুঃখের অবসান কোরতে পারেন, কিন্তু প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক দুঃখের অবসান করা সেই স্বকল্পিত ভগবানের ক্ষমতার অতিরিক্ত। নাটকের ছয়টি চরিত্রের কোনটিও নাট্যকারের ক্ষুন্নিবৃত্তি কোরতে পারে না। দরিদ্রবৎসল, প্রপীড়িতবৎসল ভগবান্, হয় দরিদ্র ও পীড়িত মস্তিষ্কের, না হয় স্বার্থপর মস্তিষ্কের উদ্ভূত।

তরুণ দলের অনেকে দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় রত হয়েছেন। দরিদ্র ব্যক্তির সেবকদের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু দেশের আত্মার সন্ধান যাঁরা পেয়েছেন তাঁরাই দরিদ্রের ভগবানকে খুঁজে বার কোরেছেন। যাঁরা নিজেদের আবিষ্কৃত দেশাত্মার উপাসনা কোরে ও পূজারী হয়ে অন্নের সংস্থান করেন, সাধারণত তাঁরাই সর্বদেশে দরিদ্র-নারায়ণের সেবায়েৎ হ'ন। এঁরা সকলেই প্রায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক। এঁরা যখন মুখ খোলেন এবং সেই মুখ থেকে

যখন অনুকম্পার দুধ ক্ষরণ হয়, তখন সেই দুধের সাধ হয় একটু ঘোলের মতন। যে কোন নামজাদা বিলেতী নভেলের পাতায় গরীবদের জীবনকাহিনী এবং বর্তমান মাসিক-পত্রিকায় বর্ণিত মুটে-মজুর-বেশ্যার জীবনকাহিনী পড়লেই বেশ বুঝা যায় তফাৎ শুধু আর্টের ক্ষেত্রে নয়, sincerity of feeling-এও। এ লেখায় মধ্যে মধ্যে এমন একটি patronising-এর সুর পাওয়া যায় যেটি সত্যকারের অভিজ্ঞ ব্যক্তির কলম থেকে আশা করা যায় না। এ ধরণের লেখা মন্দের ভাল। একধারে যেমন মজুরদের শিক্ষার অভাবে তুলসী গোঁসাই ও দেওয়ান চমনলাল নেতা হতে বাধ্য হয়েছেন, তেমনি বাধ্য হয়ে অধ্যাপকের দল ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় মজুর-সাহিত্য লিখতে সুরু কোরেছেন। আর একটি কারণে এই ধরণের বর্ণনার মধ্যে ভুল সুর থাকে। যে পরিমাণে যৌবন আদর্শবাদী, সেই পরিমাণে যৌবন দুঃখবাদী নয়। বুদ্ধদেব যাই থাকুন না কেন, বর্তমান যুগে খুঁজে খুঁজে দুঃখ বার করা এবং সেই দুঃখের সঙ্গে প্রেমে পড়ে যাওয়া, নয় বিকারের চিহ্ন, না হয় এক ধরণের ভাববিলাস মাত্র। দুঃখ চোখের সামনে না এসে পড়লে, মনকে বিশেষ রকম ধাক্কা না দিলে, দুঃখকে তাড়াবার এবং উড়িয়ে দেবার চেষ্টা বিফল না হলে আর কেউ দুঃখকে গ্রহণ করে না। দুঃখকে বুঝে তাকে দূর করবার জন্য উপায় অবলম্বন করবার সঙ্গে যে সাম্য ও মৈত্রীভাব আসে সেই ভাবই স্থির ও কার্য্যকরী, কিন্তু সে ভাব আনতে রীতিমত সময় লাগে। শিশুরা পর্যন্ত ভীষণ অর্থাভিমানী হয়। অনেক দেখে শুনে, অনেক পোড় খেয়ে, অনেক অভিজ্ঞতার পর, অনেক বিচারের ফলে মানুষ সত্যকারের জ্ঞানী হয়। সহানুভূতি স্থিরবুদ্ধির ফল, অর্বাচীনতার ফল নয়। যৌবনে দরিদ্র-নারায়ণের পূজা করা সাহিত্যের রোমান্টিসিজ্‌ম্ ছাড়া সাধারণত অন্য কিছু নয়। শুধু তাই নয়, যেমন প্রেম শেষ হবার সময় সাহিত্য সম্ভব হয়, রাগ থামলে ব্যঙ্গরচনা সার্থক হয়, তেমনি পরের দুঃখে কান্না বন্ধ হলেই ব্যথার সাহিত্য সম্ভব হয়। আমার মনে হয় মুটেমজুর-বেশ্যাকে দেখবা-মাত্রই যে কান্না আসে, সে কান্না চোখের দোষেই। সত্যকারের দরদ আনবার জন্য সহানুভূতি ছাড়া কার্ল মার্কসের বই পড়তে হয়, তাঁর মত এদেশে কতখানি খাটে ভেবে দেখতে হয়, এককথায় কিছু বুদ্ধি খরচ কোরতে হয়। দেখে শুনেও যদি দুঃখ ঘোচাবার প্রবৃত্তি থাকে তাহলে পুরোপুরি সোশিয়ালিষ্ট হতে হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেশপ্রীতিও উড়ে যাবে জেনে রাখা ভাল। দরিদ্র-নারায়ণ

দেশমাতার ভীষণ শত্রু। দুটোর একটিকে ছাড়তেই হবে—না একটিকে রাখা চলে? মাসিক-পত্রিকা পড়ে মনে হয় যে, নব্য-সাহিত্যিকবৃন্দ দুই-ই রাখতে চান। ভারপ্রবণতার সরু গলিতে জুড়ী হাঁকান অসম্ভব।

সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। সমাজ ও ধর্মের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির সূক্ষ্মপুরুষটি না বদলালেও তার মানসিক অভ্যাসগুলি বদলে যাচ্ছে। সেই পরিবর্তনের বিবরণ চাই। সেই বিবরণই ভবিষ্যৎ সাহিত্যের বিষয়-বস্তু হবে। তারপর অ-সাধারণ ব্যক্তির কথা—আর্টিষ্টের কাজ। সে সম্বন্ধে কিছু বোলতে চাই না।

প্রথম প্রকাশ : ১৩৩১ সন। 'চিন্তয়সি'-তে (ডিসেম্বর ১৯৩৩) অন্তর্ভুক্ত।

সার্ত্রের দর্শন ঃ আমি ও সে

মৃণালকান্তি ভদ্র

সার্ত্রের দর্শনে ব্যক্তির সঙ্গে তার প্রতিবেশীর সম্পর্ক একটা বড় স্থান অধিকার করে। ব্যক্তি জগতে একা বাস করে না, আবার পাঁচজনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেই তার জীবন। আমি একজন ব্যক্তি এবং আমার প্রতিবেশীও একজন ব্যক্তি। ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে দুজনেই স্বাধীন, সার্বভৌম, কিন্তু আবার আমরা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িত। একটি বিশেষ অভিজ্ঞতার কথা ধরা যাক, লজ্জা। এই অভিজ্ঞতায় আমার স্বরূপকে অন্যান্য অভিজ্ঞতায় যেভাবে উপলব্ধি করি, তাতো করছিই, তার চেয়ে কিছু বেশি এখানে অনুভব করছি। লজ্জার বৈশিষ্ট্য হোল যে কারও সাম্‌নে বা কারও কাছে আমি লজ্জিত। একটা অন্যায় কাজ করে আমার চেতনায় তাকে অনুভব করি। কিন্তু "Suddenly I raise my head. Somebody was there and has seen me." তখন আমার কাজের খারাপ দিকটা বোধগম্য হয় এবং আমি লজ্জিত হই। আর একজন থাকাটা লজ্জার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। এর ফলে আমি নিজের কাজকে সমালোচনা করতে সুরু করি। আমি নিজেকে বস্তু হিসাবে গণ্য করি, কারণ অপরের কাছে আমিও বস্তু। সার্ত্র বলছেন, "Shame is by nature recognition. I recognise that I am as the other sees me." এই ভাবে অপরের উপস্থিতিতে আমার ব্যক্তিজীবনের আর একটা দিক উদ্ভাসিত হয়েছে। আমার নিজস্ব চেতনার দিক থেকে একে ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ আমার চেতনার উদ্দেশ্য আমার স্বাধীনতাকে বিকশিত করা। কিন্তু অপরের সঙ্গে সান্নিধ্যে আমার স্বাধীনতা ব্যাহত হচ্ছে। অতএব, অপরের সম্পর্কে আমার এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-শূন্যতা কি করে হচ্ছে জানা দরকার। আমি অপরের সামনে যে ভাবে প্রকাশিত, তার কারণ সেও নয়। আসলে লজ্জার অভিজ্ঞতায় আমি আর অপর জন অবিচ্ছিন্ন। আমার অস্তিত্বের পূর্ণতায় অপরকেও আমার প্রয়োজন। সেইজন্য দুটো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দরকার (১) অপরের অস্তিত্ব কি করে সম্ভব? আর (২) অপরের সঙ্গে আমার কি কি সম্পর্ক?

হাইডেগার বলেছেন, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সত্তার সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কের ফলে তারা পরস্পরের উপর অবিচ্ছেদ্যভাবে নির্ভরশীল। তিনি জাগতিক সত্তা (being-in-the world) বলে একটি বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেছেন, যা তাঁর মতে মানবিক অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করতে পারে। তিনি মনে করেন, জগতের সাহায্যে মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করতে পরে। সত্তা তাঁর কাছে কোন কিছুর সম্পর্কে জড়িত। অতএব, মানবিক সত্তার অর্থই হোল অন্য সকলের সঙ্গে অস্তিত্ব। অন্যের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আমার অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য, যেমনভাবে জগতে বাস করা আমার মানবিক অস্তিত্বের একটি উপাদান। অন্যজন আমার অস্তিত্বের একটি পরিধি, আমাকে আমার কাছ থেকে আর সব কিছুর দিকে ঠেলে দেওয়ার একটি শক্তি সে। জগতের বিভিন্ন বস্তুকে আমার উদ্দেশ্যের উপকরণ হিসাবে আমি একটা জগত গড়ে তুলি, কিন্তু সেই সব বস্তুকে অপরজনও কাজে লাগাতে পারে। তারই ফলে আমার অস্তিত্ব তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কিন্তু হাইডেগারের মতে আমার সত্তার দুটো দিক আছে—একটি তার স্বরূপ, অপরটি তার দৈনিক রূপ। দৈনিক জীবনে আমি অন্য সকলের সঙ্গে মিলে একটি বৃহৎ দলে পরিণত। জগতের সঙ্গে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হিসাবে বস্তুগুলি সকলের সঙ্গে একই সম্পর্কে জড়িত। এই পর্যায়ে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কে একটি ব্যক্তিত্ব অপর একটি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে না, বরং জড় পদার্থের পুঞ্জের মতই তাদের পারস্পরিক বৈশিষ্ট্য লুপ্ত। এই বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করে বলা যায়, I am not opposed to the other, for I am not "me" ; instead we have the social unity of "they." সত্তার স্বরূপ এবং ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হয়। যদি বিবেকের আহ্বানে মৃত্যুকে আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে তাই সিদ্ধ করবার চেষ্টা করি, তবে তাই হবে আমার স্বরূপ উপলব্ধি।

সার্ত্র মনে করেন, হাইডেগারের ব্যক্তি-সম্পর্ক বাদে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে পরস্পরের সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে না। তিনি এই ব্যক্তি-সম্পর্ককে একদল নাবিকের একসঙ্গে দাঁড় টানার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু রোজকার এই দলগত জীবনে যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যু-সম্ভাবনাকে আদর্শ বলে উপলব্ধি করছে, তখনই সে দলবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। অর্থাৎ ব্যক্তি-সত্তার আদর্শের সঙ্গে অপর জনের সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারছে না।

সার্ত্রের মতে, আমার সঙ্গে অপরের সম্পর্কের প্রধান কথা হোল, একজন

ব্যক্তি হিসাবে সে আমার কাছে প্রকাশিত। কিভাবে আমার অভিজ্ঞতায় অপরের আবির্ভাব হচ্ছে, উদাহরণ সাহায্যে তা বোঝান যেতে পারে। আমি একটি পার্কে বসে আছি। একটু দূরে বেঞ্চিতে একজন লোক বসে আছে। একটি বস্তুকে প্রত্যক্ষ করার মতই আমি তাকে দেখছি। আবার, সঙ্গে সঙ্গে এও উপলব্ধি করছি, এই বস্তুটি হোল একটি মানুষ। এটা কি করে সম্ভব? অন্য বস্তুর মত তাকে মনে করলে তার সঙ্গে সেই সব পদার্থের বিশেষণগত সম্বন্ধ হোত। আমার নিজস্ব জগতের তার মাধ্যমে নতুন কোন সম্পর্ক দেখা দিত না। কিন্তু তাকে মানুষ হিসাবে স্বীকার করার অর্থ, যে বস্তুগুলি আমার জগৎ গড়ে তুলেছে, সেগুলির নতুন এক সংস্থান ঘটেছে। এই নতুন সংস্থান আমার আয়ত্তের বাইরে। এখন আর, আমার সামনে যে সবুজ জমিটুকু পড়ে আছে, তার দুশাশে দুটি অনড় বস্তু নেই, বরং দুটি সজীব মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই সবুজ জমিটাকে এক বিশেষভাবে সংযুক্ত করা হচ্ছে। আমার এবং তার মাঝখানে যে ব্যবধান বা দূরত্ব তার যেন নতুন রূপ নিচ্ছে। যে পরিবেশ আমি কতকগুলি বস্তু নিয়ে গড়ে তুলেছিলাম, তা যেন ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু এই পরিবেশ নূতনীকরণ বা পরিবর্তিত হওয়া, তাতে আমার কোন হাত নেই। এইভাবে আমার পরিচিত পরিবেশে ভাঙনের উপাদান থেকেই বুঝতে পারি, আমার জগতে অন্য মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। সার্ত্র বলছেন, "Thus the appearence among the objects of my universe an element of disintegration in that universe is what I mean by the appearence of a man in my universe."

কিন্তু এই ভাঙনটা ধীরে ধীরে ঘটে। যে সব বস্তুগুলি আমার সম্পর্কে জড়িত সেগুলি তার সম্পর্কে নতুনভাবে অবস্থিত হতে থাকে। পার্কে যে মূর্তি আছে, যে গাছগুলি আছে, সবই তার সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ হয়ে এবং তার সঙ্গে এ সব বস্তুর সম্পর্কের মধ্যে এসবের সঙ্গে আমার স্থান-গত সম্বন্ধ রয়েছে। তার স্থান-গত সম্বন্ধের মধ্যে আমার স্থানিক সম্পর্কও কবলিত হয়। কিন্তু এইভাবে সমস্ত পরিবেশ সাজানোতে আমি জড়িত হয়ে পড়লেও আমার কিছু করবার নেই। যে সবুজ ঘাস আমি দেখি, তার কাছে তা নতুনভাবে প্রতিভাত হয়। এই সম্পর্কটাকে অন্য বস্তুর মত আমি প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু কিভাবে সে সবুজ রঙ দেখ্‌ছে, তা আমি বল্‌তে পারি না। আমার মনে হয়, এমন কিছুর আবির্ভাব

ঘটেছে, যা আমার কাছ থেকে সমস্ত জগতটাকে হরণ করে নিচ্ছে। অন্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত জগতটা কেমন যেন নির্দিষ্টভাবে সরে যাচ্ছে। যে জগতের কেন্দ্র আমি ছিলাম, আমি যেন তার থেকে কেন্দ্র-চ্যুত হয়ে পড়ছি।

কিন্তু তবু এই অপরজনকে আমি বস্তু হিসাবে দেখি। সমস্ত জগৎ একটা ছিদ্র দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে মনে হলেও, সেই পলায়মান জগৎকে আমি বস্তু হিসাবে আবার আঁকড়ে ধরতে পারি। ধরা যাক, মানুষটি হাঁটতে হাঁটতে বই পড়ছে। সে এখন একটি বিশেষ কাজে আবদ্ধ এবং তার "বই-পড়া" রূপটির সঙ্গে আমার কাছে অচল পাথরের কোন প্রভেদ নেই। কিন্তু পৃথিবীর অপর বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কে সে যেমন আমার কাছে বস্তু, তেমনি আমিও তার কাছে বস্তু হিসাবে ধরা পড়ি। বস্তু হিসাবে আমার কাছে প্রকাশিত হবার মধ্য দিয়েই তার ব্যক্তিরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়। জগতের বস্তু এবং আমার সঙ্গে সম্পর্কেই এই অন্য ব্যক্তি-রূপ সত্তা নিয়ন্ত্রিত। জগতে তার বস্তু হিসাবে উপস্থিতি একটি অন্তঃক্ষরণের সৃষ্টি করে। আমার বস্তুরূপের দ্বারাই তার ব্যক্তিসত্তা প্রকাশিত হয়। কিন্তু আমার সম্মুখে যে বস্তু উপস্থিত, তারই সাহায্যে আমি একটি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে সৃষ্টি করছি না। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রতি ক্ষণের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করি। প্রতি মুহূর্তে সে আমাকে দেখছে। আমার প্রতি তার এই দৃষ্টিই তার এবং আমার সম্পর্কের প্রধান অবলম্বন।

যখন কেউ আমার দিকে তাকায়, তখন সেই দৃষ্টি কোন একটি বিশেষ রূপের মধ্যে প্রকাশিত হয়। সাধারণতঃ দুটি চোখ আমার দিকে নিবদ্ধ থাকে। কিন্তু গাছের পাতার খস্‌খস্ শব্দে, নিস্তব্ধতায় মধ্যে কারও পা টিপে টিপে আসা, জানালায় শাশি একটু খোলা, কিংবা পরদাটা একটু তোলা—এ সবের মধ্যেও আমরা অপরজনের দৃষ্টির আভাস পাই। সৈন্যরা যখন চুপিসাড়ে এগুচ্ছে, তখন দূরে আকাশের গায়ে একটা বাড়ী দেখলেই সতর্ক হয়। এমন হতে পারে আমি যখন এগুচ্ছি, তখন সামনের একটা ঝোপ নড়ে উঠ্‌ল এবং হয়ত তার ভিতর থেকে কেউ আমাকে দেখছে। কিন্তু এই ঝোপ বা বাড়ী এগুলি দৃষ্টি নয়, তবে এগুলির পিছনে বা এদের উপর অবলম্বন করে দৃষ্টি থাকতে পারে। কিন্তু আমার দিকে যখন কেউ তাকাচ্ছে, তখন তার চোখের থেকে বড় হ'য়ে উঠ্‌ছে দৃষ্টিটা। তাই তাকানোর মধ্যে বড় সত্য হচ্ছে, আমাকে কেউ দেখ্‌ছে। যে দৃষ্টি আমার উপর পড়ছে তা যে কোন রকম চোখ থেকে আসুক না কেন, তাতে কিছু এসে

যায় না। যখন আমি আমি পাতার খস্‌খস্‌ শব্দ শুনি, তখন আমি হয়ত কাউকে প্রত্যক্ষ করি না। তবে আমি অনুভব করি, যে কোন মুহূর্তে আমার উপর কেউ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, আমি যেখানে আছি, সেখান থেকে পালানো অসম্ভব। সংক্ষেপে—আমাকে অন্যে দেখে ফেলেছে। এই অন্যের দৃষ্টির দ্বারাই আমার সত্তার একটি বিশেষ দিককে উপলব্ধি করি। ধরা যাক, ঈর্ষার বশীভূত হয়ে আমি একটি দরজায় কান পাত্‌ছি এবং চাবির ছিদ্র দিয়ে ভিতরে কি হচ্ছে দেখবার চেষ্টা করছি। এই পরিবেশে আমার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ আছে, কারণ একটা কাজ আমি স্বাধীনভাবে করতে যাচ্ছি। কিন্তু আমি যে ঈর্ষার বশে একাজ করছি, সে সম্বন্ধে আমার পূর্ণ চেতনা নেই। ফলে, আমাকে ঠিক কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় আবদ্ধ করা যাচ্ছে না। আমি আমার বর্তমানকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছি অর্থাৎ আমিই আমার অনস্তিত্ব ঘটাচ্ছি। এরই ভিতর দিয়ে আমার স্বাধীনতা অনুভূত হচ্ছে। হঠাৎ আমার পিছনে পদশব্দ শোনা গেল এবং সেই মুহূর্তে আমার সত্তা পরিবর্তিত হোল। আমার চেতনাকে বস্তু হিসাবে বিচার করা সম্ভব হোল। আমি এখন আর একটি স্বাধীন চেতনা নই, অন্যের কাছে বস্তু হিসাবে প্রতিভাত বলে, আমার চেতনাতেও সেই বস্তুরূপ ধরা পড়ছে। আমার এই অনুভূতি হোল, আমার সত্তা বাইরের এক ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। অথচ এই সত্তাকে আমার অস্বীকার করার উপায় নেই। লজ্জার ভিতর দিয়ে আমি একে আবিষ্কার করছি, কখনও বা গৌরবের ভিতর দিয়ে। কিন্তু সর্বত্রই আমি অপরের দ্বারা দৃষ্টিবিদ্ধ।

এই লজ্জা আমার আত্মার অগৌরব, এর অর্থ আমি একটি বস্তু যাকে অন্যজন দেখ্‌ছে, বিচার করছে। আমি এমন একটি জগতের অধিবাসী হয়ে পড়লাম, যা অন্যের দ্বারা সৃষ্ট। সমস্ত জগত তারই দিক ধাবমান। এই দ্রুতগতিতে অপসৃয়মান জগতের শেষ নেই। অন্যের দৃষ্টি আমার সত্তা থেকে আমাকে দূরে নিক্ষেপ করেছে এবং যে জগতে আমি নিক্ষিপ্ত, তা একই জগৎ হলেও আমার জগৎ নয়। সার্ত্র প্রশ্ন করেছেন—এই যে লজ্জা-প্রকাশিত আমার রূপ, এর সঙ্গে আমার সত্তার কি সম্বন্ধ ?

অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত আমার এই পরিচয়কে আমি অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু এই নতুন রূপের একটা কেমন যেন অনিশ্চয়তা আছে। অপর একটি স্বাধীন সত্তার উপর নির্ভর করছে, ভবিষ্যতে আমি কি করব বা হব। এখানে

পরিণতি আমার স্বাধীনতা অনুভূতি থেকে আসছে না। এই নতুন রূপ তাই আমার স্বাধীনতার সীমা। সার্ত্র বলছেন, "Its back-stage, in the sense that we speak of "behind the scenes," It is given to me as a burden which I can carry without ever being able to turn back to know it, without even being able to realise it." অন্যের দৃষ্টিতে আমি বস্তুতে রূপান্তরিত। আমি স্বাধীন সত্তা বলে কখনও বস্তুভাবে নিজেকে উপলব্ধি করি না। কিন্তু অন্যজনের দৃষ্টিতে আমি টেবিলের উপর বসা দোয়াত-দানের মত নিশ্চল। যেবন ভাবে গাছ ঝড়ে নুয়ে পড়ে, তেমনিভাবে আমি চাবির ছিদ্রের উপর ঝুঁকে পড়েছি। অন্যের অস্তিত্ব তাই আমার আদি পতন। (My original fall is the Other's existence)। অন্যের দৃষ্টি আমার সম্ভাবনা থেকে আমাকে ছিনিয়ে নেয়। আমি যে পরিবেশ গড়ে দরজায় কান পাত্‌ছিলাম, অন্যের পদশব্দে তা একেবারে ভেঙে গেল। আমি যে অন্ধকারে আত্মগোপন করে আমার উদ্দেশ্য সফল করার চেষ্টা করছিলাম, তা ব্যর্থ হোল। আমি এই ভঙ্গীতে ধরা পড়ে গেছি, তার অর্থ আমার সম্ভাবনা অন্যে এসে বিনষ্ট করে দিল। যে আমি স্বাধীন সত্তা, এখন কোন একজন হয়ে পড়লাম, যার পক্ষে পরিবেশের বস্তুগুলোকে আর আগের মত ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। যে অন্ধকার কোণে আমি পালাতে পারতাম, তা যে কোন মুহূর্তে আলোকিত হয়ে উঠ্‌তে পারে। হয়ত আমার পিছনে দাঁড়িয়ে সে রিভলবার বার করতে পারে। আমার পলায়নের পথে বাধা এসে পড়েছে। অন্যের দৃষ্টি আমাকে সম্পূর্ণভাবে এইরকম নিরস্ত্র করে, যার জন্য সার্ত্র বলেন, "This being-seen constitutes me as a defenseless being for a freedom which is not my freedom. It is in this sense that we can consider ourselves as "slaves" in so far as we appear to the Other,"

অন্যজন তাহলে এমন এক ব্যক্তি যে আমাকে দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ করে এবং আমার অনিশ্চিত, অজ্ঞাত সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করে যে আমাকে সমস্ত সম্ভাবনা বিনষ্টির মূল কেন্দ্র এবং যার দিকে আমার জগৎ ধাবিত হচ্ছে। কিন্তু সে এই সম্ভাবনাবিনষ্ট এবং ধাবমান জগৎ থেকে পৃথক হতে পারে না। আমি যখন লজ্জায় নিরস্ত্র, তখন তার বিরাট অদৃশ্য উপস্থিতি আমার লজ্জাকে ধারণ করে।

অপর ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের একটি বড় কথা হোল আমরা পরস্পর থেকে

বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের সত্তা অনুভব করি। আমি যেমন তার থেকে আলাদা হয়ে নিজেকে বাঁচাতে চাই, সেও তেমনি বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচতে চায়। সার্ত্র এই বৈশিষ্ট্যকে বল্‌ছেন পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা (mutual negation)। তাকে ব্যক্তি হিসাবে আমি ধরতে পারি না, কিন্তু আমি-রূপ বস্তু থেকে আলাদা হয়ে সে যে নিজেকে গড়ে তুল্‌ছে, এইভাবে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে। Blackham বল্‌ছেন, "I do not seize him directly, but by not being the objective me whom he separates himself from to constitute himself as a subject : I refuse myself refused." কিন্তু এর অর্থ আমাকে বস্তু হিসাবে এবং তাকে ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা। আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেকে গড়ে তোলা এবং তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমার নিজেকে গড়ে তোলা দুটিই মানতে হবে। তা না হলে আমি ও সে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়্‌ব। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতা আবার আমাদের মধ্যে বন্ধনের সেতু।

আমার সঙ্গে অপরজনের সম্পর্কের দ্বিতীয় স্তরে আমি তাকে বস্তুতে পরিণত করি। প্রথমে আমার অভিজ্ঞতায় তার আবির্ভাব হয় এবং আমাদের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতার সম্বন্ধ আছে, তার প্রাথমিক রূপে সে আমি নয়, এইটুকু জানা যায়। কিন্তু এই জানার মধ্য দিয়ে আবার এও জানা যায়, আমিও তাকে বস্তু হিসাবে কল্পনা করেই আমার আত্ম-চেতনাকে ফিরে পেতে পারি। এই চেতনা সব সময়ই বর্তমান ছিল, কিন্তু তাকে প্রকাশ করবার জন্য কিছুক্ষণ আবৃত হয়েছিল। কিন্তু অপরজন যদি আমার স্বাধীনতাকে ব্যহত করবার জন্য আবির্ভূত হয়ে থাকে, তার কারণ, তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে আমি নিজেকে তার থেকে আলাদা করে নিয়েছি। অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার এই চেতনা এবং বিচ্ছিন্ন করা ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার একই চেতনার মধ্যে আমার স্বাধীন সত্তা অনুভূত হচ্ছে। যেভাবে অপরজন আমাকে বস্তু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে, তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আমি তাকেই বস্তু করে ফেল্‌ছি। সুতরাং স্বাধীন সত্তা হিসাবে আমার উদ্দেশ্যকে সাধন করবার মধ্যেই আমি অপরজনের অস্তিত্বের জন্য দায়িত্ব অনুভব করছি। আমিই "by the very affirmation of my free spontaneity cause there to be an other :—" আমি বস্তু হিসাবে পরিগণিত হলে অপরজন ব্যক্তি হতে পারে, কিন্তু তা সম্ভব হয় আমি নিজে তার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলে। অর্থাৎ আমি বস্তু হওয়া আমার ব্যক্তি-সত্তার উপর নির্ভর-

করে। কিন্তু একই সঙ্গে আমার পক্ষে বস্তু ও ব্যক্তিরূপ উপলব্ধি করা অসম্ভব বলে অপরজনকে ব্যক্তি বলে ভাবি। অতএব "The other becomes now what I limit in my very projection towards not-being-the other," আমি যদি নিজেকে অপরজনের বস্তু বলে ভাবি, তাহলে আমার অস্তিত্বের আশঙ্কা আমার লক্ষ্যে আমাকে পৌঁছাতে দিতে পারে না। কিন্তু আমি যদি মনে করি আমার এই বস্তু-রূপ নেহাতই অপ্রয়োজনীয় অংশ, তাহলে আমার লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। তার জন্য প্রয়োজন অপরজনকে আমার উপর নির্ভর করানো। তার সম্ভাবনাকে আমি অগ্রাহ্য করতে পারি এবং সেগুলিকে মৃত ধরেই আমি এগুতে পারি। আমি আবার অসংখ্য সম্ভাবনার কেন্দ্র হিসাবে আমাকে উদ্ধার করতে পেরেছি, এবং অপরজনের সমস্ত সম্ভাবনাই আমার কাছে মৃত কারণ সেগুলির মধ্যে আমার অস্তিত্ব প্রকাশিত হয় না। যে মুহূর্তে সে আমার কাছে বস্তুতে পরিণত, তখনই তার ব্যক্তিত্ব বস্তুরূপের একটি গুণ ছাড়া আর কিছু নয়। যেমন একটি বাক্সের "ভিতর দিক" আছে তেমন সে-রূপ বস্তুর ব্যক্তিত্ব আছে। এইভাবে, নিজের ব্যক্তিসত্তা আমি উদ্ধার করি, যদিও আমি তার কাছে বস্তু-রূপে ধরা পড়ি, কিন্তু সে হোল বস্তুর কাছে বস্তু হিসাবে গণ্য হওয়া। অতএব, তা আমার কোন ক্ষতি করতে পারে না। আমাকে আর তা স্পর্শ করে না, কারণ সে আমাকে বস্তু হিসাবে জানলে আমি তার মধ্যে আমারই ছবি দেখতে পারি, কারণ তার অস্তিত্বের মূলে আমি।

অপরজনের আরও বৈশিষ্ট্য হোল, সে সব সময় কোনও না কোন পরিবেশে আছে। আমিই তাকে জগতে একটি পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছি। বাস্তব জগতের বিভিন্ন বস্তু-সমন্বয় আমার উদ্দেশ্য সাধনের উপাদান মাত্র। অপরজনও নিজের সঙ্গে সম্পর্কে বস্তু-সমবায়কে যুক্ত রাখে। সেই হিসাবে আমাদের প্রত্যেকের কাছেই বাস্তব-পদার্থগুলি তার উদ্দেশ্য-সাধনের যন্ত্র-বিশেষ, বা তার নিজেরই প্রতিচ্ছবি। কিন্তু আমার কাছে সে বিভিন্ন বস্তু সমাবেশের এক বিশেষ পর্যায়। আমার কাছে সে বস্তু-পর্যায়ের হলেও তার দিক থেকে সে ব্যক্তি। যদিও আমার বিচ্ছিন্নতার উপর তার অস্তিত্ব নির্ভর করে, তবুও সব সময় একটা সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে যে, সে নিজেকে গড়ে নিতে পারে। আমার বস্তু হিসাবে পরিণত হবার সম্ভাবনা যখন রয়েছে, তখনই বোঝা যাচ্ছে, "The peculiar possibility of apprehending myself as an object is the possibility belonging to

the other as a subject and hence is not for me a living possibility ; its absolute possibilty—which derives its source only from itself—that on the ground of the total annihilation of the other as object, there may occur the upsurge of an other-as-subject which I shall experience across my objectivity-for-him." তাই সার্ত্র বলছেন, অপরজন একটি বিস্ফোরক অস্ত্রের মত, যা আমাকে খুব সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়। সুতরাং আমার সর্বক্ষণের চেষ্টা হবে তাকে বস্তুতে রূপান্তরিত করে রাখা, এবং আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক তাকে বস্তু হিসাবে বন্দী করে রাখার বিভিন্ন প্রচেষ্টা। কিন্তু তার একটি সজাগ দৃষ্টিতে আমার সমস্ত প্রচেষ্টা ভেঙে পড়তে পারে এবং আমি আবার তার বস্তুতে পরিণত হতে পারি। এইভাবে আমার সঙ্গে তার চিরন্তন দ্বন্দ্ব চলেছে। আমরা উভয়েই উভয়কেই বস্তু হিসাবে বাঁধতে চাইছি, কিন্তু পারছি না। একমাত্র মৃত্যু ছাড়া ব্যক্তি চিরকালের জন্য বস্তুতে পরিণত হতে পারে না। তাই সার্ত্র বলছেন, "Only the dead can be perpetually objects without ever becoming subject—for to die is not to lose one's objectivity in the midst of the world ; all the dead are tnere in the world around us. But to die is to lose all possibility of revealing as Subject to an Other."

সার্ত্র বলেন, অপরের অস্তিত্বের জন্য প্রমাণ দেওয়া যায় না, কারণ সে আমার অস্তিত্বের বাইরের একজন ব্যক্তি এবং প্রমাণ নির্ভর করছে আমার অন্তঃঅভিজ্ঞতার উপর। কিন্তু অপরের অস্তিত্ব প্রমাণ না করতে পারলেও, তাকে আমি বাস্তব বলে জানি। অপরের অস্তিত্বে সন্দেহ করা নিজের অস্তিত্বে সন্দেহ করার মতই অমূলক অর্থাৎ তা নেহাতই শুকনো যুক্তি হবে। আবার জনের অস্তিত্ব জাগতিক দিক দিয়ে নিশ্চিত। এর অর্থ হোল, Hazel Barnes-এর ভাষায় বলতে গেলে, "This means That while I cannot prove the fact that the very being of my consciousness is affected by another consciousness, I do in fact experience it."

সার্ত্রের একটি নাটক In Camer-তে আমাদের জীবনে পরস্পরের চিরন্তন দ্বন্দ্বের সম্পর্ক চিত্রিত হয়েছে। এই নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় Les Autres (The Other) এই নামে। Being and Nothingness-এ

অপরজন সম্বন্ধে যে মতবাদ তিনি প্রচার করেছেন, তারই উপর ভিত্তি করে এই নাটক রচিত। দুজনের সম্পর্কে একজন আর একজনকে আয়ত্তে আনতে চায়, যখন তৃতীয় ব্যক্তি প্রবেশ করে, দুজনের মধ্যে যদি কোন বোঝাপড়া হয়ে থাকে তা ভেঙে যায়। তারা আবার তৃতীয় ব্যক্তিকে জয়ের চেষ্টা করে। জীবিত অবস্থায় আমরা এইভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্যে বাঁচার আশা রাখি। মৃত্যুর পরে আমাদের সে আশা চলে যায়, কারণ তখন আমরা সকলের সমালোচনার বস্তু হয়ে পড়ি। নাটকটির কাহিনী হোল, তিনটি চরিত্র Garciu, Estelle এবং Ines সবাই মৃত্যুর পরে নরকে এসেছে। হোটেলের পরিচারক চলে যাবার পরে তারা পরস্পরের কাছে নরকে তাদের কেন আসা উচিত, তাই ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করে। Ines, নিজেকে নরকে দেখে আশ্চর্য হয়নি। Estelle প্রথমে ভান করে, ব্যভিচারের জন্য সে দণ্ডিত হয়েছে। তার ভাই-এর দেখাশুনা করার জন্য সে একজন ধনী ভদ্রলোককে বিয়ে করে। তার সঙ্গে সে ছ বছর কাটায়, তারপরেই সে তার যথার্থ ভালবাসার পাত্রকে খুঁজে পায়। সে Graciu-কে জিজ্ঞাসা ক'রে এটা কি পাপ? উত্তরে Garciu তাকে আশ্বাস দেয়। নিজের সম্বন্ধে সে বলে, সে নিজের নীতি অনুযায়ী জীবন যাপন করেছে। সে একটি শান্তিবাদী পত্রিকার সম্পাদক ছিল। যুদ্ধের সময় স্বমতে বিশ্বাসের জন্যই সে প্রাণ দেয়। Estelle এবং Garciu পরস্পরকে বিশ্বাস করে। কিন্তু Ines জানে, এরা নিশ্চয়ই সত্যকথা বলছে না। Estelle প্রসাধন সেরে আয়নায় মুখ দেখ্‌তে চাইলে দেখে, Ines-এর চোখ ছাড়া আর কোন আয়না নেই। তখন Garciu Ines-এর দাবী মেনে নেয়, যে প্রত্যেকে তাদের পাপ প্রকাশ করবে। তখন Gareiu বলে, সে তার স্ত্রীর প্রতি নির্দয় ছিল। Ines একজন মহিলাকে তার স্বামীকে ত্যাগ করতে প্ররোচিত করে, তাকে বোঝায় যে তারা দুজনেই তার স্বামীর মৃত্যুর কারণ। ফলে, মহিলাটি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে দুজনেরই মৃত্যু ঘটায়। Estelle জানায় সে তার প্রণয়ীকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে। এখন সে চায়, Garciu তার প্রতি নজর দিক। কিন্তু Garciu পৃথিবীতে লোকে তার সম্বন্ধে কি বল্‌ছে, তাই নিয়ে ব্যস্ত। এবার প্রকাশ পায়, সে ছিল কাপুরুষ। যুদ্ধের সময় পালাতে গিয়ে তার ফাঁসী হয়। এখন মৃত্যুর পরে সবাই তাকে কাপুরুষতার জন্য সমালোচনা করছে, এবং তা বন্ধ

করবার ক্ষমতা তার নেই। Estelle আর Garciu আলাদা ভাবে মিলতে চাইছে, কিন্তু Ines একা থাকতে ভয় পাচ্ছে। তাই Garciu Estelle-কে সাহায্য করতে রাজী নয়। সে Ins-কে বোঝাতে চায়, সে একজন বীর। কিন্তু Ines বলে, তার কাপুরুষের মত কাজই সাক্ষ্য দিচ্ছে সে ভীরু। Garciu Ines-কে রাগানোর জন্য Estelle-কে আলিঙ্গন করতে গেলে, Ines তাকে বিদ্রূপ করে। তখন Estelle Ines-কে হত্যা করবার জন্য ছুরি দিয়ে আঘাত করে। Ines হেসে ওঠে, মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করতে যাওয়া পাগলামি ছাড়া আর কি। নাটক শেষ হয় এই অনুভূতি নিয়ে যে এইরকম দ্বন্দ্বের মধ্যেই তাদের চিরকাল কাটবে।

আমাদের দেহকে কেন্দ্র করে জগতের সব বস্তু প্রকাশিত হয়। যে সব বস্তু আমার নিত্য ব্যবহার্য, সেগুলি আমার দেহের দ্বারা নির্দিষ্ট স্থান দখল করে এবং আমার দেহের সঙ্গে সম্পর্কেই তাদের অর্থ বুঝি। আমি কিন্তু আমার দেহকে বস্তুতে পরিণত করতে পারি না। জগতের বিভিন্ন বস্তুকে কাজে লাগানর জন্য আমার দেহ সব কিছুর মধ্যে একটা অর্থ ও সঙ্গতি খোঁজবার চেষ্টা করে। আমার দেহ একটি দৃষ্টিভঙ্গী, আবার আমার কর্ম-প্রচেষ্টার প্রাথমিক ধাপ, কারণ এরই সাহায্যে জগতের বস্তুগুলিকে আমি সংঘবদ্ধ করে তুলি। আবার, দেহ আমার উদ্দেশ্য সাধনের পথে অন্তরায়ও বটে, কারণ কি করা হবে তাও এর উপর নির্ভর করে। আমার দেহে আমি জীবন যাপন করি, কিন্তু আমি একে জানতে পারি না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আমি এর সম্বন্ধে সচেতন নই; যেমন, শব্দ একটি প্রতীকমাত্র এবং তাকে অতিক্রম করে আমরা আসল অর্থ খুঁজি, তেমনি দেহ পেরিয়ে আমার উদ্দেশ্যকে আমি আবিষ্কার করি। চেতনার অর্থ জাগতিক পরিবেশে কোন কিছুকে জানা এবং এই চেতনা সব সময় দৈহিক চেতনা। কিন্তু এই দৈহিক চেতনা জ্ঞানমূলক নয়, অনুভূতিমূলক। এই চেতনায় বেদনা বা সুখ থাকতে পারে। বেদনা থেকে আমরা দূরে সরে যাবার চেষ্টা করি, কিন্তু সুখের চেতনাও কম অপ্রীতিকর নয়। কারণ তখনই একটা একঘেয়েমি বিরক্তিবোধ জন্মে। আমাদের অস্তিত্বের একঘেয়েমি একটি বিভ্রমিষাভাব সৃষ্টি করে। অন্যের দেহের সঙ্গেও জাগতিক বস্তুর একটা কেন্দ্র-সম্পর্ক আছে, তবে আমার কাছে তার দেহ একটি উপাদান বিশেষ। তার দেহ সম্পর্কে অভিজ্ঞতায় বস্তু-অভিজ্ঞতা

থেকে একটি পার্থক্য আছে, কারণ তার দেহকে অতিক্রম করে আমি অন্য বস্তুকে কাজে লাগাতে পারি। অতএব, আমার দেহের তিনটি দিক আছে, আমি দেহের মধ্যে জীবন কাটাই, দেহ অন্য যে কেউ জানতে পারে ও ব্যবহার করতে পারে এবং আমি তার কাছে বস্তু-সদৃশ হলে সে ব্যক্তি। তার জানার মধ্য দিয়েই আমার দেহ-জীবন যাপন করি।

আমার অস্তিত্বের একটি দিক অপর জনের দান এবং এই দিকটি আমার কাছ থেকে অজ্ঞাত। তাই সে আমার থেকে একটি সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে রয়েছে। আমিও তাকে বস্তুতে রূপান্তরিত করতে পারি এবং তাই করেই আমার ব্যক্তিসত্তাকে পুনরুদ্ধার করতে পারি। কিন্তু তাকে বস্তু হিসাবে পেলে তার আসল রূপ আমার অগম্য থেকে যাচ্ছে, তাই তার স্বাধীন সত্তা শুদ্ধ তাকে আয়ত্তে আনতে চাই। তার সঙ্গে আমার যতগুলি সম্পর্ক আছে, সবগুলিরই এই বিপরীত রূপ, অর্থাৎ তাকে বস্তুরূপে, অথচ স্বাধীন সত্তা হিসাবে চাই। কিন্তু দুটি প্রচেষ্টার একটি অপরটির মৃত্যু ঘটায়। দুটিকে কখনও একসঙ্গে লাভ করা যায় না। আবার, আমি যেমন নিজের স্বাধীনতাকে তার কবল থেকে উদ্ধার করতে চাইছি, সেও তেমনি নিজে মুক্ত হতে চায়; আমি তাকে বন্দী করতে চাই, সেও আমাকে বন্দী করতে চায়। অপরের দৃষ্টি থেকে বোঝা যায় আমি তার কবলিত। তার দৃষ্টি আমার দেহকে নতুনভাবে সৃষ্টি করে, যা আমার কাছে চিরদিনই অজানা। সার্ত্র বলছেন, "The Other's look fashions my body in its nakedness, causes it to be born, sculptures it, produces it as it is, sees it as I shall never see it." এই যে অপরের কাছে আমার সত্তা, এর জন্য আমার দায়িত্ব আছে, কিন্তু আমি কখনও এর প্রতিষ্ঠাতা নই। তাই যে সত্তার কারণ আমার থেকে দূরে, আমিই তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাই। আর তা হতে পারে, যদি আমি তার স্বাধীন সত্তাকে আয়ত্তে আনতে পারি। সুতরাং আমার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার অর্থ হোল অন্যের স্বাধীনতাকে অধিকার করা। কিন্তু তাহলে, অন্যের সঙ্গে আমাকে একাত্ম হতে হয়, আমাদের মধ্যে যে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা আছে, তা অতিক্রম করতে হয়। অথচ তা সম্ভব নয়, কারণ এই বিচ্ছিন্নতাই আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি। অপরজনের সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপন করে এই অনায়ত্ত আদর্শ সফল করতে চেষ্টা

করি, তা হোল প্রেম। প্রেমই হোল তার সঙ্গে আমার সম্পর্কের প্রাথমিক রূপ।

প্রেমে আমি অপরের স্বাধীনতাকে স্বাধীনসত্তাসহ অধিকার করতে চাই। প্রেমিক প্রেমিকাকে তার দাসীরূপে চায় না, কারণ তাহলে সে একটি যান্ত্রিক আবেগের বস্তুতে পরিণত হচ্ছে। প্রেমিকাকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করলে প্রেমের মৃত্যু ঘটে। প্রেমিকা যদি একটি কলের পুতুলে পরিণত হয়, তাহলে প্রেমিক নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে। বস্তুকে লাভ করার মত সে প্রেমিকাকে চায় না। সে চায় "to possess a freedom as freedom." আবার প্রেমিকা যদি স্বেচ্ছায় তাকে ভালবাসে, তাহলেও সে বিরক্ত হয়। সে প্রেমিকার অঙ্গীকার চায়, কিন্তু আবার এও চায়, এই স্বেচ্ছাবরণ শেষ পর্যন্ত স্বাধীন থাকবে। প্রেমিকা তার বন্দী হবে, অথচ স্বাধীনতা বজায় রেখে তাকে শৃঙ্খলিত হতে হবে। স্বাধীনতাকে প্রেমে পরাধীনতার ভূমিকা নিতে হবে। প্রেমিক চায়, একমাত্র তাকেই প্রেমিকা বেছে নেবে এবং সে হবে প্রেমিকার সম্পূর্ণ জগৎ। এই ভাবে, প্রেমিক বস্তু হিসাবে গণ্য হলেও তার পিছনে তার নিজস্ব ইচ্ছা রয়েছে। কিন্তু প্রেমের এই সম্পর্ক লাভ করতে হলে প্রেমিককে প্রেমিকার দ্বারা নির্বাচিত হবার কলা-কৌশল প্রয়োগ করতে হবে, অর্থাৎ তাকে নির্বাচনযোগ্য হতে হবে। তাকে এমন যোগ্য হতে হবে, যাতে প্রেমিকা, তাকেই সমগ্র জগতের প্রতীক বলে মনে করতে পারে। তার জন্য, প্রেমিককে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ভাষা প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু তার ভাষা বা শব্দ-চয়ন কি ভাবে প্রেমিকা গ্রহণ করবে তা সে জানে না। তার ভাষার গন্তব্য স্থান তার কাছে দুর্গম। প্রেমের সম্পর্কে প্রেমিক অপরের ভালবাসা চায়। অপর জনও চায়, তার ভালবাসা যে চায় সেও তাকে ভালবাসুক। সার্ত্রের কথায় ".....thus by wanting the other to love him, he only wants the other to want to be loved in turn." আমি চাই অপরে আমাকে ভালবাসুক এবং তার জন্য আমি সব কিছু করতে রাজী। কিন্তু সে যদি আমায় ভালবাসে, তাহলে আমি প্রভাবিত হচ্ছি। আমি চেয়েছিলাম, সে আমার কাছে ব্যক্তি হিসাবে উপস্থিত থাকুক। কিন্তু এখন সে তার ব্যক্তিত্ব হারাতে চলেছে। এবার তাহলে আমরা প্রেমের আদর্শের ব্যর্থতা দেখাতে পারি। প্রথমতঃ, প্রেম একটি প্রতারণার সম্পর্ক, কারণ প্রেমে অন্যের ভালবাসা চাওয়ার অর্থ অন্যেরও চাওয়া যে আমি তাকে

ভালবাসি। দ্বিতীয়তঃ, যে কোন মুহূর্তে সে আত্ম-চেতনা ফিরে পেয়ে আমাকে সম্পূর্ণ বস্তুরূপে আয়ত্ত করতে পারে। অতএব, প্রেমে সব সময় একটা আশঙ্কা থাকছে। তৃতীয়তঃ, প্রেমের জগতে অন্যের প্রবেশ প্রেমকে অনিশ্চিত করে তুলছে। প্রেমের পূর্ণতা লাভ করতে হলে জগতে প্রেমিক-প্রেমিকার যুগল অস্তিত্বই থাকবে। সার্ত্র এই ভাবকে প্রকাশ করেছেন, "One would have to be alone in the world with the beloved in order for love to preserve its character as an absolute axis of reference—hence the lover's perpetual shame."

প্রেমের আদর্শ ব্যর্থ হওয়ায় আমি নিজেকে তার দ্বারা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হতে দিতে পারি। এই প্রচেষ্টাকে বলা যায় মর্ষকাম প্রবৃত্তি (masochistic attitude)। আমি অপরের দ্বারা সম্পূর্ণ পরিচালিত হতে চাই। কিন্তু এই প্রবৃত্তির সঙ্গে আমার একটি অপরাধবোধ জড়িত থাকে। বস্তু হিসাবে রূপান্তরিত বলে আমি অপরাধী, সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন বলে আমি অপরাধী। অন্যকে আমি আমার এই বস্তুরূপ দিয়ে মোহিত করতে চাই। কিন্তু মর্ষকামও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যতই ব্যক্তি নিজের বস্তুরূপে মগ্ন থাকতে চায়, ততই তার একথাও মনে পড়ে যে সে একজন ব্যক্তি। অপরের জন্য সে অশ্লীল যে কোন কাজ করতে পারে এবং সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে। কিন্তু তার সুপ্ত ব্যক্তিচেতনা তার মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করে। অপরজনের কাছে সে যে ব্যবহার পাচ্ছে, তারই দ্বারাই অপরজন একটি বস্তুতে পরিণত হচ্ছে। সার্ত্র বলছেন, "Even the masochist who pays a woman to whip him is treating her as instrument and by this very fact posits himself in transcendence in relation to her."

অপরজনের স্বাধীনতাকে আয়ত্ত করতে গিয়ে তাকে আমি বস্তুতে পরিণত করে ফেলি। আমার নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয় এই ভাবে কারণ আমি আমার দৃষ্টির সামনে তার স্বাধীনতা লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু অপরজনের এই ব্যক্তিত্ব নাশের মধ্য দিয়েও আমি আমার ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে পারি। সার্ত্র সেই সম্পর্ককে বলছেন ঔদাসীন্যের সম্পর্ক। এই সম্পর্কে আমি অপরজনকে মোটেই লক্ষ্য করি না। আমি এমন ভাবে চলতে পারি যে জগতে আমি একা। জগতে যে সমস্ত লোক আছে, তারা আমার কাছে ব্যক্তি-সত্তা বর্জিত কতকগুলি কর্ম-

সমবায় মাত্র। অপরজন আমার নিজস্ব সম্ভাবনায় কোন ক্ষতি করতে পারে না চিন্তা করে আমি আশান্বিত হই। কিন্তু এ সম্পর্কও ব্যর্থ হয়ে যায়। টিকিট-কণ্ডাক্টর আমার কাছে কতকগুলি কাজের সমষ্টি হলে সেই কাজগুলি আমার বাইরে একটি সত্তা নির্দেশ করে। তারই ফলে আমার শূন্যতাবোধ এবং অস্বস্তি-বোধ সৃষ্টি হচ্ছে। অপরজনের সঙ্গে আমার সম্পর্কের একটি মূল দ্বন্দ্ব হোল, অপরজনের ব্যক্তিসত্তা আমার ক্ষতি করতে পারে বলে আমি তাকে সম্পূর্ণ আমার আয়ত্তে এনে আমিই আমার প্রতিষ্ঠাতা হতে পারি; আবার অপরজন না থাকলে আমার অস্তিত্বের জন্য আমাকেই দায়ী হতে হয়, যদিও এই অস্তিত্ব আমি চাই নি। ঔদাসীন্যের সম্পর্ককে সার্ত্র বলেছেন, এটা একপ্রকার অন্ধতা, তবুও এর মধ্যে অন্যের অস্তিত্বের সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। তারই জন্য অপরজনকে আমি নতুনভাবে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করি।

সার্ত্র বলছেন, যৌন-ইচ্ছার মাধ্যমে আমি অপরজনের স্বাধীন সত্তাকে আমার কাছে তার বস্তুরূপের মধ্যে পেতে চাই। তিনি বলছেন, যৌনতা জীবনের সব পর্য্যায়ে বর্তমান এবং ব্যক্তি-সত্তার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। সমস্ত যৌন-ইচ্ছা তৃপ্তি সৃষ্টি না করতে পারলেও, তার মতে "……if we take these modes into account we are forced to recognise that sexuality appears with birth and disappears only with death." যৌন-জীবনের অর্থ অপর একজনের জন্য যৌন-বিশিষ্ট জীবনযাপন এবং সেই অপরজনও যৌনবিশিষ্ট। তবে সেই অপরজনকে যে বিপরীত প্রকৃতির হতে হবে, তার কোন অর্থ নেই। অপরজন যৌনবিশিষ্ট ব্যক্তি হলেই চলবে। এই অপরজনকে আমি ইচ্ছা করি এবং আমার ইচ্ছার মাধ্যমেই আবিষ্কার করি, সে যৌনবিশিষ্ট। ইচ্ছাকে সব সময় যে বস্তু ঈপ্সিত, তার সাহায্যে বুঝতে হবে। আমাদের ইচ্ছার বস্তু কি অপরজনের দেহ? সার্ত্র বলছেন, দেহের কোন অনাবৃত অংশ হয়ত আমাদের চঞ্চল করে তোলে। তবু সেই অংশ আমাদের সমস্ত দেহের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েই ঈপ্সিত হতে পারে। একটি বিশেষ পরিস্থিতির দেহ আমার ইচ্ছাকে জাগরিত করতে পারে। কিন্তু আর একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, একটি অচেতন বস্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে থাকতে পারে না। যে বিশেষ পরিস্থিতির দেহ আমার কাম্য, তা একটি চেতনার প্রকাশ বলেই কাম্য। সার্ত্র বলছেন, "To be sure, one can desire a

woman who is asleep, but one desires her in so far as this sleep appears on the ground of consciousness." এই কারণে, আমাদের ঈপ্সিত বস্তু হচ্ছে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে বর্তমান সজীব দেহ যাকে স্পর্শ করে আছে চেতনা।

যে ইচ্ছা করছে, তার দেহও একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে আছে এবং তারই ফলে সে অস্তিত্বের একটি বিশেষ পর্যায়ে রয়েছে। ইচ্ছাতে ব্যক্তির অস্তিত্ব বিব্রত। যৌন-ইচ্ছায় অন্য ইচ্ছার মতই দেহ একটি বিশেষ অবস্থায় থাকে। ইচ্ছার ভিতর দিয়ে ব্যক্তি সেই বাস্তব অবস্থায় সঞ্জীবিত হয় এবং এই অবস্থার মধ্য দিয়েই ঈপ্সিত দেহ কাম্য হয়ে ওঠে। কিন্তু তবু যৌন-ইচ্ছার সঙ্গে অন্য ইচ্ছার পার্থক্য আছে। তার কারণ, এই ইচ্ছা ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে। দৈহিক অবস্থা চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং ইচ্ছার কাছে নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণ করে। সার্ত্র বলছেন, "This is because when we do desire a woman, we donot keep ourselves wholly outside the desire ; the desire compromises me." যৌন-ইচ্ছায় অন্যের দেহ কাম্য হলেও ব্যক্তির নিজের কাছেও দেহতে পরিণত হয়। এই ইচ্ছায় তাই এক দেহ অন্য দেহকে কামনা করছে, যার জন্য সার্ত্র বলছেন, "The being which desires is consciousness making itself body." ইচ্ছায় ব্যক্তি নিজেকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করে অন্যের দেহকেও একটি অচেতন বস্তুপুঞ্জে পরিণত করতে চায়। সার্ত্রের কথায় "Desire is attempt to strip the body of its movements as of its clothing and to make it exist as pure flesh ; it is an attempt to incarnate the other's body." অপরের দেহকে আদর করার মধ্যেই সেই দেহ জয় করা যায়। "In caressing the other I cause her flesh to be born beneath my caress under my fingers." তাই আদরও ইচ্ছা থেকে পৃথক নয়। সম্মোহ দৃষ্টি আর ইচ্ছা একই। সার্ত্র বলছেন "Desire is expressed by the caress as thought in language." কিন্তু আদর বা ইচ্ছায় ঈপ্সিত দেহকে বস্তুতে পরিণত করে আমার দেহকেও বস্তুতে পরিণত করছি, যাতে অপর দেহ তা উপভোগ করতে পারে। ইচ্ছায় তাই পারস্পরিক অধিকার ঘটে। অপরের দেহ-সংস্পর্শের সময়ে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর সঙ্গেও পড়ে না, যেমন, বাতাসের

উত্তাপ, আলো, আকাশ। এ সবের সঙ্গে যেন আমার দেহ যুক্ত হয়ে পড়েছে। তাই ইচ্ছায় আমি যেন সারা জগতের বন্দী হয়ে পড়েছি। চেতনা দেহে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, এবং দেহ সমস্ত জগতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই ইচ্ছার আদর্শ, সমস্ত জগতের সঙ্গে একাত্ম হওয়া এবং দৈহিক তৃপ্তিতে এই বোধ আসে বলে, অনেক সময় তাকে মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করা হয়। মৃত্যুতে আমরা জগতের সঙ্গে এক হয়ে যাই। কিন্তু এই যে ইচ্ছার মধ্য দিয়ে অন্যের দেহকে অধিকার এবং তার মধ্য দিয়ে তার চেতনা বা স্বাধীনতাকে করায়ত্ত করা তা অসম্ভব। আমি অন্যের দেহকেই অধিকার করতে পারি, এবং যে চেতনা সেই দেহের মতই নির্জীব, তাই লাভ করি। ইচ্ছায় আমার আদর্শ শুধু তাকে আমার কাছে এবং আমাকে তার কাছে বস্তুতে পরিণত করা নয়। আমি তাকে বস্তুপুঞ্জের মধ্যে টেনে নামাই। আমি চাই সেও এমন বস্তু হোক, যাকে ইচ্ছামত স্পর্শ করা যাবে, অধিকার করা যাবে। সার্ত্র তার যাদুময়ী ভাষায় এই আদর্শকে বর্ণনা করেছেন এবং আমরা তা এখানে উদ্ধৃত করছি। "I make myself flesh so as to incarnate the Other by my nakedness and to provoke in her the desire for my flesh—exactly because this desire will be nothing else in the Other but an incarnation similar to mine. Thus desire is an invitation to desire. It is my flesh alone which knows how to find the road to other's flesh, and I lay my flesh next to her flesh so as to awaken her to the meaning of flesh. In the caress when I slowly lay my inert hand against the other's flank, I am making that flank feel my flesh and this can be achieved only if it renders itself inert. The shiver of pleasure which it feels is precisely the awakening of consciousness as flesh. If I extend my hand, remove it, or clasp it, then it becomes again body in action, but by the same stroke I make my hand disappear as flesh. So let it run indifferently over the length of her body, to reduce my hand to a soft brushing almost stripped of meaning, to a pure existence, to a pure matter, slightly silky, slightly satiny,

slightly rough—this is to give up for oneself being the one who establishes references and unfolds distances ; it is to be made pure mucous membrane. At this moment the communion of desire is realised ; each consciousness by incarnating itself has realised the incarnation of the other ; each one's disturbance has caused disturbance to be born in the other and is thereby so much enriched." কিন্তু ইচ্ছা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। কারণ, যৌন-ইচ্ছার পরিতৃপ্তিতে যেই তৃপ্তির প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়, তাতেই অপরজনকে যে দেহে বা বস্তুতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল, সেটা ভুলে যাওয়া হয়। দুটি দেহ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ইচ্ছা তার আদর্শচ্যুত হয়। এর ফলে, ব্যক্তি মর্ষকাম পদ্ধতি বেছে নিতে পারে, যাতে অন্যের চেতনায় সে নিজেকে নিষ্ক্রিয় বস্তু বলে মনে করতে পারে। আবার ইচ্ছার ব্যর্থতা থেকে sadism বা ধর্ষকাম জন্ম নিতে পারে। যৌন-ইচ্ছার উদ্দেশ্য অপরকে অধিকার করা, কিন্তু সে উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না বলে ধর্ষকামের আশ্রয় খোঁজা হয়।

ধর্ষকাম একটি নিস্ফল দৃঢ় আবেগ। এতে চেতনা নিজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন না হয়েও একটি বিশেষ কাজে লেগে থাকে, ইচ্ছার বিব্রতভাব এতে নেই, এই চেতনা শূন্য। অপরজনকে বস্তু হিসাবে আয়ত্ত করাই এর উদ্দেশ্য। কিন্তু ইচ্ছায় ব্যক্তি নিজের দেহকে প্রকাশ করে যে অপরের সঙ্গে একাত্ম হতে চায়, এখানে তা নেই। সে নিজের দেহকে লুকিয়ে রেখে জোর করে অপরের দেহকে ব্যবহার করতে চায়। এখানে পারস্পরিক কোন সম্পর্ক নেই। ধর্ষকাম ব্যক্তি অপরের দেহকে যন্ত্রের মত ভেঙে দুমড়ে কুৎসিৎ ভাবে চায়। দেহের সুন্দর ভঙ্গিমার সঙ্গে কুৎসিৎ ভঙ্গিমার একটা পার্থক্য আছে। বের্গসঁর মতে, সুন্দর ভঙ্গিমায় দেহ যন্ত্র হিসাবেই স্বাধীনতাকে রূপায়িত করে। সাত্র বলছেন, "The most graceful body is the naked body whose acts inclose it with an invisible garment while entirely disrobing its flesh, while the flesh is totally present to the eyes of the spectators." কুৎসিৎ ভঙ্গিমায় দেহ একটি পরিপূর্ণ যন্ত্র, কিন্তু তার থেকে স্বাধীনতা বিলুপ্ত। তাই সে দেহের অস্তিত্ব অযৌক্তিক। সেখানে দেহের সঙ্গে তার কাজের কোন সঙ্গতি থাকে না, তাই তার কাজ বা গতিকে

কুৎসিৎ মনে হয়। সার্ত্রের ভাষায়, "The sight of a naked body from behind is not obscene, But certain involuntary waddlings of the rumpare obscene. This is because then it is only the legs which are acting for the walker and the rump is like an isolated cushoin which is carried by the legs and the balancing which is a pure obedience to the laws of weight." এই প্রসঙ্গে সার্ত্রের Intimacy গল্প স্মরণ করা যেতে পারে, সেখানে তিনি এই বক্তব্যের প্রয়োগ দেখাতে চেষ্টা করেছেন। ধর্ষকাম ব্যক্তি দেহের সৌন্দর্যকে ভেঙে নতুনভাবে গড়তে চায় যার কোন অর্থ থাকবে না, যাতে কোন স্বাধীনতা থাকবে না। সে অত্যাচার করে, ভয় দেখিয়ে তাকে নিজের মনোমত গড়তে চায়। একাজে সে তাড়াহুড়ো করে না। আস্তে আস্তে অত্যাচারকে সে চরম সীমায় নিয়ে যায়, যখন তার কবলিত ব্যক্তি আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। বিভিন্ন পন্থাগুলিকে সে দক্ষ মিস্ত্রীর মতই কাজে লাগায়। কিন্তু ধর্ষকাম ব্যক্তিকেও ব্যর্থ হতে হয়। সে যে দেহকে যন্ত্রের মত ব্যবহার করছে, তার কোন উদ্দেশ্য সে খুঁজে পায় না। দেহ যখন সম্পূর্ণ করায়ত্ত তখন সে বুঝতে পারে না যে সে এই দেহ দিয়ে কি করবে। "It is there and it is for nothing." সুতরাং এই দেহকে কাজে লাগাতে হলে আবার যৌন-ইচ্ছার কাছে ফিরে আসতে হয়। এইভাবে, যেমন যৌন-কামনার ব্যর্থতা থেকে ধর্ষ-কামনা জন্ম নিতে পারে, তেমনি ধর্ষ-কামনার ব্যর্থতা থেকে আবার যৌনকামনা আসতে পারে। ধর্ষ-কাম ব্যক্তি অপরের স্বাধীনতাকে পেতে চায়, কিন্তু সেই স্বাধীনতা সব সময়ই তার অনায়ত্ত। অত্যাচারিত ব্যক্তি যখন তার দিকে তাকায়, তখনই ধর্ষকাম ব্যক্তি তার ভুল বুঝতে পারে। সে বুঝতে পারে, চরম অত্যাচার করেও সে তাকে পরাজিত করতে পারে নি। অত্যাচারিত ব্যক্তির দৃষ্টির শক্তি যে অত্যাচারীর কাছে কি ভয়ানক, তার সার্থক বর্ণনা দিয়েছেন Faulkner তাঁর Light in Augustএর শেষ দিকে। নাগরিকেরা নিগ্রো খৃষ্টমাসকে অত্যাচার করে তার লিঙ্গচ্ছেদ করেছে। খৃষ্টমাস মৃত্যুমুখে। তখনকার বর্ণনা, "But the man on the floor had not moved. He just lay there with his eyes open and empty of everything save consciousness and with something a shadow about his mouth for a long moment he looked up at them with

peaceful and unfathomable and unbearable eyes. This his face, body, all seemed to collapse, to fall in upon itself and from out the slashed garments about his hips and loins the pent black blood seemed to rush like a released breath. It seemed to rush out of his pale body like the rush of sparks from a rising rocket; upon that black blast the man seemed to rise soaring into their memories for ever and ever. They are not to lose it, in whatever peaceful valleys, beside whatever placed and reassuring streams of old age, in the mining face of whatever children they will contemplate old disasters and never hopes. *It will be there musing, quiet, steadfast not fading and not particularly threatful, but of itself alone serene, of itself alone triumphant.* Again from the town deadened a little by the walls, the scream of the siren mounted toward its unbelievable crescendo, passing out of the realm of being." (*Italics* সার্ত্রের)

এ পর্যন্ত দেখান হয়েছে, অপরজনের সঙ্গে যৌন-সম্পর্ক একটি প্রধান সম্পর্ক। অবশ্য সব সম্পর্কই যে যৌন-সম্পর্ক তা নয়। কিন্তু অন্য সব জটীল সম্পর্ক যৌন-সম্পর্ক থেকে উত্থিত হয়েছে বলা যায়। আর একটি সম্পর্ক আছে, সেটি ঘৃণা। সমস্ত সম্পর্কের পিছনেই যৌন-সম্পর্ক ভিত্তি হিসাব রয়েছে। অবশ্য সাধারণ ভাবে, এই সত্যটি ধরা পড়ে না। কিন্তু এই যৌন-সম্পর্ক অচেতন স্তরে রয়েছে বলা যায় না। ব্যক্তির চেতনায়ই এই সম্পর্ক রয়েছে।

আমি এবং অপরজন জগতে রয়েছি এবং আমরা পরস্পরের স্বাধীনতার সীমা। অপরজন আমার বাধা বলেই আমি তাকে ঘৃণা করি। আমি বুঝতে পারি, অপরজনকে আমার কাজে লাগান যাবে না। তাই এমন জগৎ আমি কামনা করি, যেখানে অপরজন নেই। অর্থাৎ আমি তার মৃত্যু কামনা করি। আমি শুধু একজনের অস্তিত্ব চাই না তাই নয়, যতজন অপরজন আছে, সকলে নিশ্চিহ্ন হোক তাই চাই। অপরজনের প্রতি ঘৃণা আমার অস্তিত্বের সর্বপর্যায়ে আছে। এমন কি কেউ আমাকে দয়া করলেও আমি তাকে ঘৃণা করি; কারণ অপরের দয়ায় আমি বস্তুতে পরিণত হচ্ছি। অর্থাৎ এমন কিছু আমার জীবনে

হচ্ছে, যার জন্য আমি শক্তিহীন। তাই সার্ত্র বলছেন, কৃতজ্ঞতা আর ঘৃণা কাছা-কাছি। অপর সকলে আমার যে স্বাধীনতা হরণ করেছে, আমি তা ফিরে পেতে চাই বলে ঘৃণা একটি বীভৎস অনুভূতি। কিন্তু ঘৃণাও ব্যর্থতায় শেষ হয়, কারণ এর উদ্দেশ্য অন্যের চেতনাকে নিশ্চিহ্ন করা। কিন্তু অপর জন নিশ্চিহ্ন হলেও একটা জিনিষ থেকেই যাচ্ছে যে, অপরজন ছিল। এই অতীত অস্তিত্ব আমার ক্ষতি করেছে, যার ভিতর দিয়ে আমার বর্তমান গড়ে উঠেছে। আমার যে অংশ অতীত অপরজনের দ্বারা গড়ে উঠেছে, তার উপর আমার হাত নেই। তার মৃত্যুতে তা চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। তাই ঘৃণার মধ্যে যে জয় আমি লাভ করতে চাই, তা পরাজয়ে পরিণত হয়। এই বন্ধনের চক্র থেকে আমার মুক্তি নেই। তাই নৈরাশ্য আমার জীবনকে ঢেকে ফেলে, এবং যৌন-সম্পর্কের দুইটি বিশেষ রূপ—মর্ষকামনা ও ধর্ষকামনার মধ্যে আমার অস্তিত্ব আন্দোলিত হতে থাকে।

অপরজনের সঙ্গে সংঘাতের সম্পর্কই এতক্ষণ আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু যে সমস্ত ক্ষেত্রে অপর ব্যক্তিদের সঙ্গে একত্রে দলবদ্ধ হই, সেই যৌথ-জীবনের সত্য পরিচয় কি? "আমরা" বলে যে শব্দটি আমরা ব্যবহার করি, তাতে ত আমরা প্রত্যেকের ব্যক্তিসত্তা উপলব্ধি করি। সার্ত্র বলছেন, এই "আমরা" বোধ সচেতন নয়। কোন একটি সম্মিলিত কাজ বা পরিস্থিতির মধ্যে আমরা দলবদ্ধ হই। এই স্তরে চেতনা বিচারশীল নয়, সম্পূর্ণ পরিস্ফুট নয়, সার্ত্রের ভাষায় "lateral non-thetic consciousness." একটি উদাহরণ দিয়ে তিনি এই "আমরা" চেতনা বোঝাচ্ছেন। কাফের দরজায় আমি দাঁড়িয়ে আছি। অন্যের আমাকে দেখছে। হঠাৎ রাস্তায় জীপের সঙ্গে লরীর একটা ধাক্কা লাগল। সকলের সঙ্গে হয়ে আমিও সেই দৃশ্য দেখতে লাগলাম। একটু আগে অপর-জনদের সঙ্গে আমার যে বিরোধ ছিল, তা যেন দূর হয়ে আমরা সব একই সঙ্গে দৃশ্যটিতে মনোনিবেশ করলাম। এই অবস্থাকেই হাইডেগার বলেছেন Mitsein বা দলভাব। কিন্তু এই আমরা চেতনায় অনেকগুলি "আমি"র সম্মিলিত অনুভূতি থাকছে না, বা এমন কোন একটা বৃহৎ "আমি" ভাবও থাকে না, আমরা প্রত্যেকে যার অংশ। একজন ব্যক্তির চেতনায় এই "আমরা" বোধ এসেছে। আর এই "আমরা" বোধের জন্য অপরজনের অস্তিত্ব আগে থাকা দরকার, কারণ অপরজনের সম্পর্কে আমার ব্যক্তিসত্তাকে কেন্দ্র করে অপরের সঙ্গে দলবদ্ধ

মনোভাব বা "আমরা" বোধ গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু "আমরা" বোধ দুরকম হতে পারে—"আমরা ব্যক্তি" এবং "আমরা বস্তু"। যখন আমরা বলি, "তারা আমাদের দিকে তাকাচ্ছে" তখন আমি অন্য সকলের সঙ্গে এক অবিচ্ছেদ্য বস্তু—চেতনা লাভ করছি। আমার শক্তি যেমন অন্যের দ্বারা পরাক্রান্ত, অন্য সকলের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

সার্ত্র বর্ণনা করছেন, "আমরা বস্তু" এই চেতনায় সকলের সঙ্গে মিলে একটা অপমান বোধ বা লজ্জা বোধ রয়েছে। যখন কোন সুন্দরী সম্ভ্রান্ত মহিলা কারাগারে বন্দীদের পরিদর্শন করতে আসে, তখন তাদের মনে যে রাগ ও লজ্জার আবির্ভাব হয়, "আমরা বস্তু" চেতনায় সেই ভাব দেখা দেয়। আমি যখন অপরজনের সঙ্গে কোন পরিস্থিতিতে আছি, তখন এটা লক্ষ্য করিনি, যে আরও বহু লোকের সঙ্গে আমার বা তার সম্পর্ক হতে পারে। যখন তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, সেও যদি অপর ব্যক্তির মত আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহলে তারা দুজনেই আমার কাছে ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু সে যদি অপর ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করে; তাহলে সমস্যাটা কঠিন হবে। আমি যদি তৃতীয় জনের সঙ্গে যোগ দিয়ে অপর জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহলে অপর জন বস্তুতে পরিণত হবে, আর যদি তৃতীয় ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহলে তৃতীয় জন বস্তুতে পরিণত হবে। কিন্তু সে আবার অপরজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করছে। অবস্থাটা অনিশ্চিত, কারণ আমি অপরজনের বস্তু, সে তৃতীয় জনের বস্তু, আবার তৃতীয় জন আমার বস্তু। আমার স্বাধীনতাই এক্ষেত্রে কি পরিণতি হবে তা ঠিক করতে পারে। কিন্তু এমন হতে পারে, আমি ও অপরজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারি এবং দুজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তৃতীয়জনকে শক্তিহীন করতে পারি। কিন্তু অপরজনের প্রতি তৃতীয়জনের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায় অপরজন আমার জগত থেকে দূরে সরে যেতে পারে। কিন্তু তা হয়ে ওঠে না, কারণ এই তৃতীয় জনের সঙ্গে অন্য বহুজনের সম্পর্ক থাকতে পারে এবং আমি সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। আবার, তৃতীয়জন আমার দিকে তাকিয়ে আমি যে অপরজনকে উপাদান হিসাবে প্রয়োগ করতে যাচ্ছিলাম, সে সম্ভাবনাকে মৃত সম্ভাবনায় পরিণত করতে পারে। আমি হয়ত অপরজনকে নিপীড়ন করছিলাম, তৃতীয়জনের উপস্থিতিতে আমি তাকে ছোড় দিই। সে একটি অস্তিত্বমাত্রে পর্যবসিত হয়।

আমি অপরজনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে রত ছিলাম। তৃতীয় জন এসে আমাদের দুজনকে তার দৃষ্টি দিয়ে আচ্ছন্ন করে ফেল্‌ল। ফলে আমি ও সে সম্ভাবনা-বিচ্ছিন্ন হয়ে একই পর্যায়ে পরিণত হলাম। আমাদের দুজনের সমস্ত সম্ভাবনাই তৃতীয় জনের কাছে মৃত সম্ভাবনা। আমাদের মধ্যে আর সংঘর্ষ নেই। আমার বাইরে একটি অস্তিত্ব আছে যে আমাকে বস্তুতে পরিণত করেছে এবং সেই অবস্থায় আমি অপরজনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ হলাম। সার্ত্র বল্‌ছেন, "Thus what I experience is a being outside in which I am orgainsed with the other in an indissoluble objective whole, a whole in which I am fundamentally no longer distinct from the outer but which I agree in solidarity with the other to constitute." কিন্তু এই অবিচ্ছেদ্য অস্তিত্বের জন্য আমি অপরজনের জন্য দায়িত্ব অনুভব করছি এবং এই ভাবেই "আমরা বস্তু" বোধের জন্ম। এই বস্তু-বোধের সঙ্গে জড়িত আছে শক্তিহীনতা ও লজ্জা। যে অপরজনের সঙ্গে দলগতভাবে এই "আমরা বস্তু" ভাব অনুভব করে, সে জগতের বহু অদ্ভুত ঘটনার জালে নিজেকে আবদ্ধ মনে করে। সমস্ত সম্ভাবনা রহিত হয়ে সে মুক্তির উপায়হীন। যখন সকলে একসঙ্গে কারও দৃষ্টির অধীনে কাজ করে বা কোন বস্তু উৎপাদন করে, তখনই এই "আমরা বস্তু" ভাব জাগে। আমরা তখন একটি উৎপাদন যন্ত্রের উপাদান বিশেষ এবং উৎপাদনের উদ্দেশ্যেই আমাদের প্রত্যেকের আসন নির্ধারিত হয়েছে। তাই সার্ত্রের কথায়, "Materiality puts its seal on our 'solid' community." "আমরা বস্তু" ভাবের একটি বিশেষ ক্ষেত্র শ্রেণীচেতনা এবং এক্ষেত্রে একথা মনে রাখা প্রয়োজন, তৃতীয় ব্যক্তি যে বা যারা, আমাদের বস্তুতে পরিণত করে, তাদের উপস্থিতি অনিবার্য নয়। তাদের অনুপস্থিতিও আমাদের মধ্যে বস্তুভাব জাগাতে পারে।

শ্রেণীচেতনায় এই "আমরা বস্তু" ভাব বর্তমান। যে সমাজে দুইটি শ্রেণী আছে, একটি শোষক এবং অপরটি শোষিত, সেখানে শোষক শ্রেণী শোষিত শ্রেণীর সামনে সব সময় তৃতীয় ব্যক্তির মূর্তি এবং তাদের দৃষ্টি শোষিত শ্রেণীকে স্বাধীনতাহীন ও শক্তিহীন করে তোলে। কঠোর পরিশ্রম, জীবনের নিম্ন মান বা দুঃখ-কষ্ট শ্রমিকদের শ্রেণী চেতনায় সঙ্ঘবদ্ধ করে না। সঙ্ঘবদ্ধ কর্মের মধ্য

দিয়ে তারা বরং "আমরা ব্যক্তি" এই চেতনা লাভ করতে পারে। শোষক শ্রেণীর জীবন ধারণের উন্নত মানের সঙ্গে তুলনা করে তারা হিংসা, বা দ্বেষ অনুভব করতে পারে। এর মধ্যে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলার ভিত্তি নেই। শোষিত শ্রেণীর প্রত্যেকটি সভ্য অন্য শ্রেণীর দৃষ্টির মাধ্যমেই নিজেদের পরস্পরের সঙ্গে সংহতি খুঁজে পায়। ধনিক শ্রেণী বা সামন্ত প্রভু এদের জন্য শোষিত শ্রেণীকে জীবনধারণ করতে হয়। তাদের জন্যই আমি একজন শ্রমিক। তাদের দৃষ্টি যদি আমাকে সর্বদা পীড়িত না করে, তাহলে আমি অন্যের সঙ্গে বস্তু-ভাব অনুভব করতে পারি না। যদি তারা না থাকৃত; আমি নিজেকে স্বাধীন ব্যক্তি মনে করতে পারতাম। আমার এবং অপরজনের মধ্যে তৃতীয় এই ব্যক্তিদের উপস্থিতি আমাদের সকলকে বস্তুসদৃশ করে ফেলেছে। আমরা পরাক্রান্ত ও পরাজিত শ্রেণীতে পরিণত শোষিত শ্রেণী শোষক শ্রেণীর দ্বারা জ্ঞাত হচ্ছে, এই পরিস্থিতি শ্রেণী সংহতি সৃষ্টি করছে। শ্রেণী চেতনা একই সঙ্গে "আমরা বস্তু" ভাবের সঙ্গে জড়িত লজ্জাকে উৎপাদিত করে। "আমরা বস্তু" ভাবের বৈশিষ্ট্য হোল (১) আমরা অপরের জন্য উপাদান (২) আমরা শক্তি-হীন এবং (৩) আমাদের এই অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত রয়েছে লজ্জা। এই শক্তিহীনতা তখনই দূর হতে পারে যখন "আমরা বস্তু" সঙ্ঘ তৃতীয় ব্যক্তি বা শোষক শ্রেণীর দিকে সাহস ভরে তাকায়। কিন্তু "আমরা বস্তু" থেকে "আমরা ব্যক্তিতে উত্তীর্ণ হতে পারি সকলের সমবেত প্রচেষ্টায়। শোষক শ্রেণীকে বস্তুতে পরিণত করেই তা সম্ভব হতে পারে। অনেক সময় শোষিত শ্রেণী শোষক শ্রেণীর কাছে পূর্ণ দাসত্ব মেনে নিয়ে বস্তু-জীবনেই পরিতৃপ্তি খুঁজতে পারে। অপরজনের সঙ্গে সম্পর্কে যেমন তাকে অধিকার না করতে পেরে মর্ষকামনাতেই চরম পরিতৃপ্তি খোঁজা হয়, জনতার শোষকশ্রেণীর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণও অনেকটা তাই। জননেতার সঙ্গে সম্পর্কে জনতার ব্যবহারও এই ধরণের। জনতার প্রত্যেক সভ্য নিজের ব্যক্তিসত্তা বিসর্জন দিয়ে নেতার হাতে যন্ত্রের মত ব্যবহৃত হতে চায়। তাই সার্ত্র বলছেন, "..... the crowd has been constituted as a crowd by the look of the leader or the speaker ; its unity is an object unity which each one of its member reads in the look of the third who dominates it and each one then forms the project of losing himself in this object-ness, of

wholly abandoning his selfness in order to be no longer anything but an instrument in the hands of the leader." "আমরা বস্তু" ভাবের বাস্তব উদাহরণে একটি শ্রেণী অপর শ্রেণী দ্বারা বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু সমগ্র মানব-জাতি বস্তুতে রূপান্তরিত হতে পারে এরকম কল্পনাও করা যায় এবং সেখানে যার দৃষ্টিতে এই বস্তু-রূপ উৎপাদিত হবে, তিনি ঈশ্বর। সার্ত্র বল্‌ছেন, ঈশ্বর যদি অনন্ত অনুপস্থিতি বলে, তাহলে মানবজাতির বস্তুরূপ অসম্ভব। যাই হোক, ঈশ্বর ও মানবজাতি পরস্পরসাপেক্ষ, একথা বলা যায়। কিন্তু সমগ্র মানবজাতি বস্তুতে পরিণত হচ্ছে, এ পরিস্থিতি নেহাতই বিমূর্ত চিন্তার বিষয়। "আমরা বস্তু" ভাবে প্রসার করে সমগ্র মানবজাতির বস্তুরূপে কল্পনা করা যায়, কিন্তু সে আদর্শ সফল করা সম্ভব নয়।

এবার সার্ত্র "আমরা ব্যক্তি" রূপ প্রসঙ্গে আলোচনা করছেন। আমাদের জগৎ উৎপাদিত বস্তু-সমষ্টি নিয়ে সৃষ্ট এবং এই জগতে বাস করেই আমাদের দলগত ব্যক্তিসত্তা উপলব্ধি করি। শ্রমিক যখন কোন পণ্য উৎপাদন করছে, তখন সে যারা ভোগ করবে; তাদের কথা ভেবেই এটা সৃষ্টি করছে। পণ্য-উপভোগকারী ব্যক্তি একটা স্বাধীনতা অনুভব করে। পণ্যের মধ্যে আমার কতকগুলি কর্ম-সম্ভাবনা দেখ্‌তে পাই। পণ্যের মধ্যে এই সব সম্ভাবনা নিহিত আছে বলে পণ্যের সঙ্গে সম্পর্কে আমি স্বাধীন-ব্যক্তিদের একজন। কিন্তু এই পণ্য-ভোগ আমার মত যে কেউ করতে পারে। আমি ট্রামে চড়ে কোন এক বিশেষ জায়গায় যেতে পারি এবং সেখানে আমার সঙ্গে অন্য কারও বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। এই ভাবে, যে সব উদ্দেশ্যের সাধনে আমি অন্যের সঙ্গে একাত্ম হতে পারি, সেই সব ক্ষেত্রে আমি দলগত ঐক্য অর্জন করে "আমরা"য় পরিণত হচ্ছি। সার্ত্র বল্‌ছেন, যে ভূগর্ভস্থ পথ দিয়ে স্টেশনের প্লাটফরমে এসে পড়ছি, তারই মাধ্যমে আমি মানুষের স্রোতের সঙ্গে মিলছি। এখানে সকলের সঙ্গে আমার উদ্দেশ্য এক হয়ে গেছে। কিন্তু এই চেতনায় সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে প্রকৃত কোন ঐক্যবোধ হচ্ছে। একই ধরণের বস্তুকে ব্যবহার করার ভিতর দিয়ে একটা ঐক্যবোধ হচ্ছে, কিন্তু সকলের স্বাধীনতা-বোধের কোন পরিষ্কার অনুভূতি নেই। আমি "দলগত ব্যক্তি"র মধ্যে একজন। সার্ত্র বল্‌ছেন, "In particular the fact that I am engaged with others in a common rhythm which I contribute to creating is specially likely to

to lead me to apprehend myself as engaged in a we-subject." সৈন্যদের মার্চের মধ্যে, জাহাজের নাবিকদের সমবেত কাজে একজন ব্যক্তি যেমন অনুভব করে, দলগত ব্যক্তিত্ব-বোধে তাই উপলব্ধি করা হয়। আমার কাজ আমার স্বাধীনতা প্রসূত হলেও আমার কাজের ছন্দের সঙ্গে অন্যের কাজের ছন্দের যে মিলন, সেটা যেন অঙ্গাঙ্গী নয়, পার্শ্বিক। আমি আমার উদ্দেশ্যকে তাদের সঙ্গে মিলিত না করে, নিজের কাজকে পৃথকভাবে সফল করার চেষ্টা করি। অবশ্য আমার উদ্দেশ্যের মধ্যে তাদের উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়। এই ভাবেই আমার কাজ সকলের সঙ্গে এক হয়ে ওঠে। তাই "আমরা ব্যক্তি" রূপ চেতনায় একজনের চেতনায় প্রকাশিত হয়। সার্ত্র বলছেন "It is a question only of a way of feeling myself in the midst of others." তবু "আমরা ব্যক্তি" রূপ সমস্ত মানবজাতির আদর্শ যার সাহায্যে আমরা সমস্ত পৃথিবীর উপর আধিপত্য করতে পারি। তবে ব্যক্তির চেতনায় সকলের চেতনার যে ছবি আমরা দিয়েছি, তাকিয়ে এই আদর্শ লাভ করা যাবে না কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তবে বস্তু-বিশ্বের মধ্যে আমাদের উদ্দেশ্যকে চালিত করতে গিয়ে আমরা উপলব্ধি করি, আমাদের জীবন ধারণের সমস্ত উপকরণ আবার সকলের উপর নির্ভর করছে। এই ভাবে সকলের উপর নির্ভরশীলতা-বোধের ভিত্তিতেই জগতের মধ্য দিয়ে আমরা উপলব্ধি করি, "আমি আমরার একটি অংশ।" এই জন্যেই "আমরা ব্যক্তি" ভাব আমার মনে যে অনুভূতি সৃষ্টি করছে অপরের মনে তার কোন সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়া জাগায় না। তাই "আমরা ব্যক্তি" ভাব ক্ষণভঙ্গুর এবং পরিস্থিতির জন্য এই সঙ্ঘবদ্ধ ভাব জাগে, তা দূর হলেই এ ভাবও চলে যায়।

"আমরা" অনুভব প্রাথমিক নয়। যে পণ্য আমি ভোগ করি, তার সঙ্গে অপরের সম্পর্ক জড়িত। আমাকে অপরের গঠিত দ্রব্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। অপরজনই আমাকে স্বাধীনসত্তার মর্যাদা দেয়, একথা সত্য হলেও, দ্রব্য ব্যবহার করার সময় অপরের অস্তিত্ব আমাকে স্বীকার নিতে হচ্ছে। আমি সকলের সঙ্গে মিলিত হতে পারি পণ্য ব্যবহারের মাধ্যমে এবং সেই পণ্য অপরজন উৎপাদিত করে বলে, "The experience of the we-subject is based on the original experience of the other and can be

only a secondary and subordinate experience." আবার, আমি-চেতনা "আমরা চেতনা"র অংশ নয়। যে কোন মানুষের স্রোতেই আমি আমার স্বতন্ত্র চৈতনা অনুভব করি। "আমরা চেতনা"র আবির্ভাব আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধের সাময়িক সমাধান হিসাবে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে কোন "আমরা" চেতনা সম্ভব নয়, যখন সমস্ত চেতনাটি একটি অন্তর্মানবিক সঙ্ঘবদ্ধ ব্যক্তি চেতনা।

শোষিত শ্রেণীচেতনায় যেমন "আমরা বস্তু" ভাব আছে, মনে করা যেতে পারে, বিপরীতভাবে সেই রকম একটি "আমরা ব্যক্তি" চেতনা শোষকের মনে আছে। কিন্তু শোষকশ্রেণীর বৈশিষ্ট্যই হোল চরম স্বাতন্ত্র্যবোধ। 'বুর্জোয়া' চেতনায় কোন শ্রেণী চেতনা নেই। কোন ধনিক ব্যক্তি একটি শ্রেণীতে নিজেকে যুক্ত করে বস্তু-ভাব কামনা করে। "আমরা-চেতনা"র বৈশিষ্ট্য হোল, কতকগুলি ক্ষণিক চেতনায় এক হওয়া, তার মধ্যে প্রকৃতিগত কোন ঐক্য নেই। "বুর্জোয়া" শ্রেণী অস্বীকার করে, সে মনে করে শ্রমিকের শ্রেণীচেতনার পেছনে রয়েছে প্রচার। তার ধারণা, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে স্বার্থের দিক থেকে ঐক্য আছে; সে এমন একটা ঐক্যের কথা বলে যেখানে শ্রমিক মালিকের দ্বন্দ্বের অবসান হবে। তবে যখন শোষিত শ্রেণী বিপ্লব বা বিদ্রোহের দ্বারা মালিক শ্রেণীর অত্যাচারকে প্রতিহত করে, তখন শোষক শ্রেণী "আমরা" চেতনা লাভ করে। তবে সেই চেতনা বস্তু-চেতনা, এবং লজ্জা ও ভয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক। তাই "আমরা বস্তু" ও "আমরা ব্যক্তি" চেতনার মধ্যে সাম্য নেই। প্রথমটিতে অপর ব্যক্তিদের যন্ত্র হিসাবে জীবনযাপনের মধ্যে এক সংহতিভাব জাগলেও, দ্বিতীয়টিতে একটি বিশেষ মানুষের চেতনায় অনুভূতি ছাড়া বাস্তব কোন উপলব্ধি নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে হয় তাই আমি অপরের দ্বারা বস্তুতে পরিণত, এবং সেখানে আমার মত অনেকেই বস্তুতে পরিণত, নয়ত আমি অপরকে শক্তিহীন করে স্বাধীন সত্তায় উন্নীত। তাই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে সার্ত্রের শেষ কথা হোল "The essence of the relations between consciousnesses is not the Mitsein; it is conflict."

অপরজনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সম্বন্ধে এইভাবে দীর্ঘ আলোচনা করে সার্ত্র বলছেন, আমার অস্তিত্ব বস্তুকে অতিক্রম করে নিজের সমস্ত সম্ভাবনাকে সফল করতে চায়। কিন্তু অপরজন যখন আমার আমার জগতে আসে, তখন এই বস্তু

জগতে আমি আবার আবদ্ধ হয়ে পড়ি। একাকী আমি সমস্ত জগতকে অতিক্রম করে জয়লাভ করতে পারি, কিন্তু অপরজন আমাকে জগতের মধ্যে একটি অনড় বস্তুতে পরিণত করে। সার্ত্রের ভাষায় বলতে গেলে, "This petrifaction in in-itself by the other's look is the profound meaning of the myth of Medusa." কিন্তু একথাও সার্ত্র বলেছেন, এই বস্তু রূপ আমার উপরে বাইরে থেকে চাপান হয়েছে। আমার যথার্থ প্রকৃতি স্বাধীন সত্তা, এবং কিছুতেই সেই স্বাধীন সত্তা বস্তুতে পরিণত পারে পারে না।*

* এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত সার্ত্রের উদ্ধৃতগুলি তাঁর Being and Nothingness (English Translation of L' Etre et le Neant by Hazel Barnes) থেকে নেওয়া হয়েছে।

'নায়কের মৃত্যু'

অতীন্দ্রনাথ বসু

[অতীন্দ্রনাথ বসু মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে এই সমালোচনাটি লেখেন। খুব সম্ভবত এই অপ্রকাশিত আলোচনাটিই তাঁর শেষ বাংলা লেখা।—সম্পাদক।]

যে কালে লোকের বসে ভাববার অবকাশ নেই, অধ্যয়নের নেশা শিক্ষিত মহলে লোপ পেতে বসেছে এবং পঠনপাঠন পেশাদারি হয়ে দাঁড়িয়েছে সেকালে সাহিত্য বৈঠকী আলাপ ও রঙ্গরসে এসে নামবে ঐ কিছু বিচিত্র নয়। যা এক নিঃশ্বাসে শেষ করা যায়, যা ট্রেনের তিন ঘণ্টা দৈনন্দিন পাপক্ষয়ের ভার লাঘব করতে পারে আজ বাজারে এমন বইএর চাহিদা। তাই একালে প্রবন্ধ সাহিত্যের দুর্গতি সব চেয়ে বেশী, বৈদগ্ধ্য ও মননশীলতা দুর্লভ।

এমতাবস্থায় শিবনারায়ণ রায়ের প্রবন্ধাবলী এক অপ্রত্যাশিত বস্তু।* চোখ মেলে দেখা এবং দেখা জিনিস নিয়ে মাথা ঘামানর ব্যারাম কিছু লোকের থাকেই, তা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যারা ভাবনাচিন্তার দায় অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বসে আছে এবং প্রত্যহ সেই অন্যদের বাপান্ত না করে জল গ্রহণ করে না তাদের কাছে ভাববার কথাগুলো হাজির করা দুঃসাহস বই কি। প্রকাশকের পক্ষেও এ নিছক পাগলামি।

তবে ভরসার কথা, আমরা গালাগালি পছন্দ করি, যদিও প্রধানত করতে, তবু শুনতেও মন্দ লাগে না। রায়ের গালগুলো ধারাল, আত্মজ্বালায় বিষাক্ত, রুচির শালীনতা আছে বলে আরো মর্মভেদী! আমাদের জীবনযাত্রার একটি ফিল্‌ম্ তুলে যদি হাটেবাজারে দেখান হয় সেটি লজ্জার ব্যাপার হয় বটে। তবু তাকিয়ে দেখবার লোভও এড়ান যায় না। এও তেমনি। প্রবন্ধে প্রবন্ধে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর চেহারা আয়নার মত প্রতিফলিত, নিজেদের কীর্তিকলাপ ডকুমেন্টারী ফিল্‌মের মত দেখতে পাই। রাগ হয়, লজ্জা হয়, আবার মজাও লাগে।

যেমন কলকাতার কথা—

---

* নায়কের মৃত্যু—শিবনারায়ণ রায়। শতাব্দী গ্রন্থভবন। সাড়ে চার টাকা।

"পৃথিবীতে আর কোন বড় শহর আছে যেখানে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যায় পাড়াশুদ্ধ লোকের শান্তিহরণ করে আমার কিংবা আপনার ঘরে উচ্চতম নিনাদে রেডিও অথবা লাউডস্পীকার লাগানো গ্রামোফোন বাজতে পারে? যেখানে পথে লোক চলাচল বন্ধ করে ব্যাণ্ড বাজিয়ে মিছিল সাজিয়ে লরীর ওপরে সিংহাসনে বসে বর বিয়ে করতে যায়? যেখানে ধুতিপাঞ্জাবী অথবা প্যান্ট-কোট চাপানো শিক্ষিত লোকেও খোলা সড়কে অপরের বাড়ির দেয়ালের গায় শরীরের সঞ্চিত জলভার নিষ্কাশনে সঙ্কোচ বোধ করে না? যেখানে ওপর থেকে রঙীন পানের পিক এবং পায়ের নীচে পিচ্ছিল ফলের খোসার যুগপৎ আক্রমণ এড়িয়ে পথ চলতে হয়? (এবং পাশ থেকে থুতু ও কফ,—লেখক এ দুটো বাদ দিলেন কেন?)...এখানে এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও কোন তরুণের সঙ্গে কোন তরুণীকে দু' একদিন ঘোরাফেরা করতে দেখলে শুধু প্রবীণরা নন, অপর যুবক-যুবতীরা পর্যন্ত তাদের নৈতিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন, এমন কি উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। কোন সাহসিকা দ্বিচক্রযানে আরূঢ়া হয়ে পথে বেরুলে দুধারে প্রদর্শনীর ভীড় জমে যায়।"

বাঙ্গালীর জীবনে রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উৎসবের দিন। কিন্তু বাঙ্গালীর সংস্কৃতিতে তাঁর সৃষ্টির ছাপ কোথায়? মৃত্যুর আগে তাঁর শবদেহ নিয়ে হৈ-হল্লা করতে তিনি সেবকদের নিষেধ করেছিলেন। এঁদের বাধা উপেক্ষা করে একদল অযাচিত ভক্ত এসে ঠিক সে কাজটাই করেছিল। সেই বর্বর ঐতিহ্য আজকাল দেশ জুড়ে চলেছে রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে।

"যিনি সারাজীবন সৌন্দর্য ও শুচিতার সাধনা করে গেলেন, তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে গিয়ে উদ্যোক্তারা নিজেদের যে রুচিকে প্রকটিত করেন তাতে সুষমা দূরের কথা, পরিচ্ছন্নতাবোধের আভাস পর্যন্ত দুর্লভ। বিরাট প্যাণ্ডালের নীচে হৈহুল্লোড়লোভী জনতার ঘর্মাক্ত সমাবেশ; "তারকাদের" ভাড়া করার জন্য বেহায়া প্রতিযোগিতা; লাউডস্পীকারের প্রচণ্ড উচ্চনাদ; মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, নিদেনপক্ষে লক্ষ্মীমন্ত ব্যবসায়ী অথবা শক্তিমান দলীয় মাতব্বরদের (যাঁরা জীবনেও 'রবীন্দ্র রচনাবলী'র পাতা উলটে দেখেছেন কি না সন্দেহ) পৃষ্ঠপোষ্টা পাবার জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম; অনুষ্ঠানের বিবরণ (সম্ভব হলে ছবিসমেত) কাগজে বার করার জন্য দৈনিক সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষের পায়ে অপর্যাপ্ত

তৈলনিষেক—রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকে অপমান করার জন্য এর চাইতে বেশী আর কি ব্যবস্থা করা চলত, তা ত আমি জানি নে।"

অবশ্য এঁদের পক্ষেও যুক্তি আছে। একবার এক বহির্বঙ্গীয় বাঙ্গালী শহরে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। সেদিন মাননীয় রেলমন্ত্রী শহরে আসছেন জেনে উদ্যোক্তারা তাঁকে প্রধান অতিথির পদে বরণ করলেন। একটা গৌণ উদ্দেশ্যও ছিল—শহরের একটি লেভেল ক্রসিংএর জায়গায় ওভারব্রিজ করিয়ে নেওয়া। মন্ত্রী মহাশয় বিচক্ষণ ও রুচিবান ব্যক্তি। তিনি এসে ভাষণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে ধন্য করলেন বটে কিন্তু রেলগাড়ির রসহীন প্রসঙ্গ পাড়তে দিলেন না।

রুচিবান অভিজাত বাঙ্গালী মনের এরূপ বিকৃতি ঘটল কেন তার বিশ্লেষণ লেখক একাধিক প্রবন্ধে করেছেন। উগ্র জাতীয়তাবোধ, ধ্বংসাত্মক রাজনীতি, দায়িত্বহীন পরমুখাপেক্ষিতা এই সব রোগ বর্তমান উপসর্গের হেতু। কিন্তু এদেরই বা মূল কোথায় এবং চিকিৎসাই বা কি? এ সমস্যা গভীর বিচার-সাপেক্ষ।

শিশিরকুমারের প্রসঙ্গে বাঙ্গালীর সংস্কৃতির মর্মান্তিক ট্রাজেডিটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

"যে দেশে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিকরাও বিত্ত এবং বিজ্ঞাপনের লোভে নিকৃষ্টতম সিনেমা-পত্রিকায় চড়া দামে নিজেদের রচনা প্রকাশে উদ্যোগী, ক্ষমতাবান গল্পলেখক প্রকাশকের চাপে ছোট গল্পকে ফেনিয়ে উপন্যাস বানাতে কুণ্ঠাবোধ করেন না, দেশবিশ্রুত অধ্যাপক অপরের লেখা ছাত্রপাঠ্য নোট বইতে মোটা সেলামীর বিনিময়ে নিজের নাম লেখক হিসেবে ছাপতে দিতে প্রস্তুত, প্রখ্যাত পত্রিকার সম্পাদক জনপ্রিয়তার আকাঙ্ক্ষায় অথবা মালিকের হুকুমে নিজের প্রত্যয়বিরোধী প্রস্তাব ফলাও করে উপস্থিত করতে সুপটু, রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভের জন্য যেখানে শিল্পী, সাহিত্যিক ও মনীষীরা ঘোর প্রতিযোগিতায় ব্যাপৃত—সে দেশে শিশিরকুমারের মত স্বাধীনচেতা এবং স্বধর্মনিষ্ঠ শিল্পীর উপস্থিতি বিস্ময়কর না ঠেকে উপায় কি?"

শিল্প যেখানে ব্যবসায়ীর পণ্য, শিল্পী যেখানে ভাড়াটিয়া সেখানে যে নট শিল্পের মর্যাদা রাখবার জন্যে খ্যাতি, বিত্ত এমন কি বৃত্তি-ব্যবসা পর্যন্ত নষ্ট করলেন তাঁকেও বিদগ্ধ বাঙ্গালী সম্মান দেয় নি।

আমাদের বর্তমান গোষ্ঠিজীবনের দুটি বৈশিষ্ট্য—লক্ষ্যহীন বিক্ষোভ আর নিষ্ক্রিয় সহিষ্ণুতা—উভয়ের সমন্বয় আমাদের গালাগালি-প্রিয়তা। আমরা নিজেরা কিছু করবো না, সব অপরে আমাদের জন্যে করে দেবে। অপরে দায়িত্ব নিয়ে যদি না করে তাকে শাসন করবো না, কেবল গালাগালি করবো। শুধু ডাল ভাত, ঘরবাড়ি নয়—শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প সব করে দেবে সরকার। আমাদের ব্যক্তিত্ব শুষে নিয়েছে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র।

"এককালে ঠাকুর-দেবতা, জমিদার-পুরোহিত আমাদের মনে যে জায়গা জুড়ে ছিল আজ রাষ্ট্রকে আমরা সেই জায়গায় বসাতে চলেছি। জনসাধারণের মধ্যে উদ্যোগ নেই, আত্মপ্রত্যয় নেই, তাদের সক্রিয় সহযোগের ভিত্তিতে গঠিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠান নেই। এদেশে শিক্ষিতরাও বিশ্বাস করেন না যে তাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা কোন রকমের সংস্কার বা উন্নতিসাধন সম্ভব। তাঁদের ধারণা, সমাজের কোনো কল্যাণ করতে হলে প্রথমেই রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। ফলে রাজনীতি আমাদের শিক্ষিত সাধারণের কেন্দ্রীয় সাধনা হয়ে উঠেছে।"

ভয়ের কথা এইটে। স্বাধীনতাপ্রিয় বাঙ্গালী আত্মিক দাসত্বে লুপ্তপ্রায়। সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের সঙ্গে এসেছে সমষ্টিবাদী দর্শন আর যন্ত্রসভ্যতার সাংস্কৃতিক সমীকরণ। যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দেশকাল নির্বিশেষে সংস্কৃতির উৎস তাকে সংহার করবার আয়োজন নিখুঁত। লেখক আশা হারান নি। দেশে এখনো আশাবাদী বলিষ্ঠ ভাবুক মন জীবিত আছে এইটেই ভরসা। তাদেরকে কাজের রাস্তা খুঁজে বার করতে হবে, নিশ্চিন্ত গড্ডালিকাপ্রবাহকে সক্রিয়ভাবে রুখতে হবে, এ প্রয়োজন আজ সর্বপ্রথম।

সাম্প্রতিক গল্প প্রসঙ্গে

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের গৌরব। বৈচিত্র্য ব্যাপ্তি ও গভীরতায় সে সাবালক য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রতিস্পর্ধী হতে পারে। সুতরাং ছোটগল্প প্রসঙ্গে পাঠক ও সমালোচক মহলও স্বভাবতই বেশি আগ্রহী। তাই বারে বারে মতান্তর রূপান্তরকে কেন্দ্র করে নানা আন্দোলনের তরঙ্গও দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সম্বর্ধনা পেলেও শৈলজানন্দ-মানিক-তারাশঙ্কর প্রমুখের আঞ্চলিক জীবনরস এবং বাস্তববোধ সেকালের প্রেক্ষিতে নিশ্চয় নবীন স্বাদ এনেছিল। এই লেখকগোষ্ঠী এখনও লিখছেন ; কিন্তু অনেকে চলচ্চিত্রের কাঞ্চনস্বর্গে পথভ্রষ্ট, আবার কেউ বা বয়সোচিত অবসাদে রোমন্থন করছেন। এই লেখকদের পরিত্যক্ত কথাসূত্র ধরে, এঁদেরই অনুশীলন করে অথচ মৌলিক বক্তব্য নিয়ে অনেক লেখক বাংলাসাহিত্যে এখন স্বপ্রতিষ্ঠ। যেমন সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নবেন্দু ঘোষ, সমরেশ বসু প্রভৃতি।

বাংলা সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য, বড় সাফল্যের পরেই অন্বেষা, নতুন নিরীক্ষা। অবসাদ বা আত্মতৃপ্তি নয়। তাই বোধ হয় বাংলাগল্পের অবিসংবাদিত সিদ্ধির সময়েও কিছু কিছু নতুন লেখক প্রতিক্রিয়ার মুখে বিক্ষোভের সুরে বলছেন, 'আমাদের থেকেই সুরু, পূর্ববর্তীরা কেবল ঘটনায় ঘট ভরিয়েছেন।' এমনকি গত দশকের মধ্যেই বিশিষ্ট বক্তব্য ও আঙ্গিকের আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে, তাঁরা এমন দাবি করছেন। এই আন্দোলনের দাবিদাররা প্রায় সকলেই অনূর্দ্ধ তিরিশ। অনায়াসে এই দাবি তারুণ্যের আত্মঘোষণা, ছাত্রোচিত প্রগল্‌ভতা বলে তুচ্ছ করা যেত। কিন্তু এ দাবির অন্যতম প্রবক্তা বিমল কর ইতোপূর্বেই কথাশিল্পী রূপে (নতুন রীতির কথা তখনো বিমলবাবু উত্থাপন করেন নি।) খ্যাতিলাভ করেছেন এবং দেশ (১২ই কার্তিক, ১৭ই অগ্রহায়ণ, ২৪শে অগ্রহায়ণ, ২রা পৌষ) ও পরিচয়-এর মত পত্রে এ বিষয়ে (পৌষ, মাঘ ১৩৬৭) প্রবল মতভেদ ও আলোচনা দেখা গেছে। অতএব কয়েকটি গল্প বিশ্লেষণ ক'রে মোটামুটি ইদানীংকার গল্পলেখার 'নতুন রীতি'র স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা করা

উচিত। প্রধানতঃ বিমল কর সম্পাদিত 'এই দশকের গল্প', দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চর্যাপদের হরিণী', ননী ভৌমিকের 'চৈত্রদিন' এবং অরুণ চৌধুরীর 'সীমানা' এই আলোচনার লক্ষ্য।* অন্য গল্প, অন্য গল্পকারের কথাও প্রসঙ্গত এসে পড়বে।

কোন গল্পের উপসংহারে লেখকের মন্তব্য : 'পঁচিশ বছরের যুবতীর প্রকাশ্য নগ্নতাকে উপভোগ ক'রে সস্তা মজা লুটবার সুযোগ তারা কেন ছাড়বে? অবচেতনার খাঁচায় আমরা সবাই একটা করে বিষাক্ত সাপ পুষছি। সামান্য উত্তেজনায় সেটা ফণা তুলতে চায়। (সে খাঁচায় পাখি পুষতেন আমাদের পিতৃ পুরুষ।)

'কিন্তু এই কি পরিণাম? এই কি আমাদের মানুষ হবার সাধনা?...আপনি নিশ্চয়ই অনুভব করবেন এ-যন্ত্রণা, এ-বেদনা। আপনি ওদের ক্ষুধাকে সংযত করতে বলুন। ওদের মানুষ হতে বলুন, ওদের সভ্য হতে বলুন।' গল্পের লেখক অমলেন্দু চক্রবর্তী। 'কোন লেখক বন্ধুকে' চিঠি লেখার রীতিতে গ্রামীন একটি দরিদ্র মেয়ের কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। সে কলকাতায় এসে একাধিক বাড়ির ঝি হল, লেখকেরও (উত্তমপুরুষ); নানাজনের সঙ্গে ঘর বাঁধতে চাইল, পারল না; শেষে তাকে দেখা গেল হাওড়ার ব্রিজের নীচে, নগ্ন উন্মাদিনী। এই হল গল্পাংশের চুম্বক। লেখক গল্পকে মনোরম করেছেন প্রসাদগুণান্বিত ভাষায়, মাঝে মাঝে এক-একটি মন্তব্যে বুদ্ধিদীপ্ত চমক আরো আকর্ষনীয়। 'ফুল ফুটুক না ফুটুক, আজ বসন্ত,' 'মেলাবেন তিনি মেলাবেন' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পঙ্‌ক্তির প্রয়োগে বাচনিক নৈপুণ্যও আছে। কিন্তু ঐ গল্পের ভূমিকায় লেখক বিশ্বপরিক্রমা করলেন কেন? মেয়েটির জীবন-ট্র্যাজেডি ব্যক্ত বা ব্যঞ্জিত করতে অত বড় গৌরচন্দ্রিকা অনিবার্য ছিল না। ফলে তাঁর ঝোঁক যতটা বহির্মুখী, ততটা অন্তর্মুখী হতে পারে নি।

উপসংহারের শেষ তিনটি বাক্য চমকপ্রদ, কিন্তু সে তো পাঠকের সঙ্গে গল্পকারের ব্যক্তিগত আলাপ। তাঁর চিঠি-গল্প পড়ে আমাদের ভাবতে না দিয়েই

---

* ১। এই দশকের গল্প—বিমল কর সম্পাদিত। পলাশী প্রকাশনী।
২। চর্যাপদের হরিণী—দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্রালয়।
৩। চৈত্রদিন। ননী ভৌমিক। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী।
৪। সীমানা—অরুণ চৌধুরী। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী।

তিনি স্বীয় ভাবনা যোগ করেছেন। মন্তব্যের অতিমিতিই কি গভীর হবার সাধনা?

'এই দশকের গল্প' গ্রন্থের দুর্বলতম রচনা 'ফানুস'। সম্পাদক গ্রন্থারম্ভে কটাক্ষ করেছেন: 'সর্বত্র সু-মুখ পাবার সৌভাগ্য কদাচিৎ কোনো মানুষের হয়; আমরা বি-মুখে অভ্যস্ত। এবং তাঁর বিশ্বাস, 'গত পাঁচ বছরের বাংলা ছোটগল্পে যে-কটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হয়েছে, এই গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পই সেই সংযোজনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে'। সুতরাং গল্পগুলির আলোচনায় কোন অপূর্ণতার কথা উচ্চারিত হলে তিনি তা বিমুখ পাঠকের 'বাদানুবাদ' বলে অগ্রাহ্য করতে পারেন। কিন্তু গ্রন্থারম্ভের প্রতিশ্রুতি গ্রন্থপাঠে রক্ষিত না হলে সম্পাদক অবশ্যই দায়ী হবেন। কারণ, মন্তব্যে তিনি অনেক ঐতিহাসিক গুরুত্বের ঝুঁকি নিয়েছেন।

অনিমা নাম্নী একটি অনূঢ়া মেয়ের জীবনযন্ত্রণা লেখকের উপজীব্য। পঙ্কজ নামে এক যুবকের সঙ্গে তার আলাপ, ঘনিষ্ঠতা প্রেমে রূপান্তরিত হয়। লেখক (উত্তমপুরুষ) পঙ্কজের বন্ধুরূপে অনিমার সঙ্গে আলাপিত হন, বাকী অংশ অনিমার চিঠিতে বিবৃত। একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পবিবারের দুঃখদীর্ণ ছবি। বাবা মেয়ের পাত্র খুঁজছেন, পাচ্ছেন না। অথচ মা এখনো যথাকাল ব্যবধানে অন্তঃসত্ত্বা হচ্ছেন। শেষ সংবাদটি 'স্টান্ট্' হিসেবে স্থাপিত হয়েছে। অনিমার চিঠি অত্যন্ত গতানুগতিক, চিঠিই, লেখক অনিমা চরিত্রকে বিকশিত হবার সুযোগ দিলে হয়ত ছকে-বাঁধা এই গল্পও রসোত্তীর্ণ হ'ত। লেখক তো সে সুযোগও পেয়েছিলেন। দুর্ভিক্ষ, উদ্বাস্তু জীবনের পটভূমিতে এমন ছবি অজস্র গল্পে বারবার দেখা গেছে। এর গল্পত্বটুকুও সাধারণ মানের, রীতিও 'যথাপূর্বং'। এই দশকের বৈশিষ্ট্য কী খুঁজে পেলাম না।

'দুঃসময়' গল্পে ডিটেল্‌সের প্রয়োগে সিদ্ধ হবার আকাঙ্ক্ষা প্রশংসনীয়। দিব্যেন্দু পালিতের কলম পরিস্থিতিকে দৃশ্যে এবং দৃশ্যকে অনুভূতিগোচর রূপ দিতে পারে। কিন্তু তিনি নতুন কি অন্বেষার পরিচয় দিলেন? অক্ষয়বাবু, আমরা, সবাই মহামারী বা সামাজিক দুর্যোগের কাছে অসহায় দ্রষ্টা? লেখক অস্তিবাদী কিনা জানি না। কামুর 'প্লেগ' গল্পে ব্যাধির নির্মম প্রকোপ বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সেখানে ত্রাণকর্মীদের সেবাব্রতে বিপন্মুক্তির সংকেত দিয়ে সমাপ্তি।

দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশ্বমেধের ঘোড়া' সংকলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প।

কাঞ্চনের আত্মচিন্তা, জীবন-বিশ্লেষণ লেখকের শক্তিমত্তার সাক্ষ্যবহ। রেখা নামে একটি যুবতীর সঙ্গে কাঞ্চনের গভীর ভালবাসা হয়, তার পরিণতি ঘটে রেজিস্ট্রেশন বিবাহে। কিন্তু এখানেই যবনিকা পড়ল না। চন্দ্রকোষ রাগের মূর্চ্ছনা জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলে পরিবেশটিকে মধুর করেছে। নায়ক-নায়িকাও স্বামী-স্ত্রী। অথচ সমস্যা। রেখার মার বিবাহে আপত্তি। রেখা বৃদ্ধা মাকে কষ্ট দিতে চায় না। কাঞ্চনকে গ্রহণেও কোন দ্বিধা নেই। এত বড় মহানগরীতে নিভৃত মিলনের জায়গা নেই? আছে, কিন্তু ব্যয়বহুল। তাই তারা ফিটনগাড়ী আশ্রয় করল। তবু একটু ধীরে ধীরে খিদিরপুর যাবে। শেষে গাড়োয়ানের কুশ্রী ইঙ্গিতে কাঞ্চন-রেখার অর্থাৎ আধুনিক মধ্যবিত্ত সমাজের ট্র্যাজেডি চমৎকার ফুটেছে। গাড়োয়ানও করুণা করে। 'ফুল ফোটার গল্প' মনে পড়ে। সেখানেও গভীর করুণ বিষাদ। শাড়ীতে ফুলফোটার প্রতীক ব্যবহার করে গল্পটির মোড় ফিরিয়েছেন সুন্দর। 'অশ্বমেধের ঘোড়া' সে তুলনায় একটু অপরিচ্ছন্ন। প্রসঙ্গত দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চর্যাপদের হরিণী'ও আলোচিত হতে পারে। সেগুলিও এই দশকের গল্প। ভাসান, কয়েকটি পৃথিবী, ঘাম, নরকের প্রহরী, চর্যাপদের হরিণী—এই পাঁচটি গল্পের সংকলন। 'ভাসান' চরের মাঝিদের সুখদুঃখবেদনার গল্প। কফিলুদ্দী, মণিরুদ্দী, এন্তাজুদ্দী, উকিলুদ্দী দুই পুরুষের কাহিনী গল্পে বিবৃত। আদিম জীবনের সারল্য, ক্রোধ, জৈব-অনুভূতি পরিস্ফুটনে লেখকের নৈপুণ্য আছে। তাঁর সহানুভূতি দৃষ্টিকে গভীর করেছে। তবে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা সমরেশ বসুর একাধিক রচনার পশ্চাৎপট মনে পড়ে। লেখক এ-গল্পে সম্পূর্ণ স্ব-স্থিত নন। কয়েকটি পৃথিবী এবং নরকের প্রহরী নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। সুধা ও তৃপ্তি দুই বোন। গল্পের যখন সূচনা, তখন বাবা-মা গত হয়েছেন। 'মোটামুটি বাঙ্গালী ঘরের আয়ু নিয়েই বাবা মারা গেছেন।' মা সংসারের আগুনে পুড়ে একটু রূঢ়, কঠোর হয়েছিলেন। সুধার বুদ্ধি কম, সে বড় হয়ে সংসারে ছেলের অভাব পূরণ করতে পারবে না মনে করে মা তার প্রতি বিমুখ। বেচারা সুধা জীবনে কৃতিত্ব অর্জন করার সাধনায় হারিয়েছে স্বাস্থ্য, মনের যৌবন। 'মাইনাস সাত পাওয়ারের চশমা যার, বিছানায় শুয়ে খালি চোখে আকাশের দিকে তাকালে তার পক্ষে নক্ষত্রের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়।' বাবার স্মৃতিটি করুণ: 'আকাশের ওই তারাটা যেমন থেকেও তার চোখে পড়ছে না, বাবার স্মৃতি তেমনি থেকেও তার চোখে, ধরা পড়ছে না।...কতগুলো

বিবর্ণ রঙ আর রেখার মতই তিনি অস্পষ্ট।' পিতৃবিয়োগের অনেক পরে, স্মৃতি-লোকে নিরপেক্ষ ছবি আঁকতে গিয়ে সুধা বুঝেছে পঙ্কজিনী নির্মম, পক্ষপাতী, রূঢ় হতে পারেন, তবু তিনিই অনেকখানি জীবন জুড়ে ছিলেন, মৃত্যুর পরেও তিনি জীবন্ত। মা মেয়ের বিচার্য, সমালোচ্য ব্যক্তি নন। কিন্তু চোদ্দ বছর শিক্ষকতা করে সংসারের হাল ধরে ধরে সুধা অনেক দেখেছে, এবং জেনেছে। সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে ভেবেছেও অনেক। ভাবনাপ্রবণ মনই তার হেতু নয়। একটা অখণ্ড মানুষ আবাল্য পরিস্থিতির শৈলে আহত হয়ে যেমন অনেক হারায় (সুধা হারিয়েছে তৃপ্তির উচ্ছলতা, স্বাস্থ্য) তেমনি মনের মধ্যে আশ্রয় নেয়—অজ্ঞাতসারেই চিন্তার জাল বোনে; ছেঁড়ে আর বোনে। তাই সুধা এখন মায়ের চরিত্র স্পষ্ট ব্যাখ্যা করতে পারে।

'জীবনে অবসর পেলেন না বলে মা চিরদিনই বিরক্ত। নিজের ক্লান্তি আর রুগ্নতা নিয়ে তাঁর ক্ষোভের অন্ত ছিল না। কিন্তু একটু বড় হয়ে সুধা যেদিন সামান্য বিশ্রামের আয়োজন করতে চাইল, সেদিন মার চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠেছিল। কথায় আচরণে এমনই স্ববিরোধিতার মধ্যে মা বেশ অনায়াসে বেঁচে ছিলেন।' সুধা দুবেলা দুটো ট্যুইশনি করতো, পরে শিক্ষিকা হল। তৃপ্তি লেখাপড়ায় ভালো। সেও ট্যুইশনি করে দিদির ভার একটু লাঘব করতে চাইল। তখনি পঙ্কজিনীর উচ্চাশা ক্রূর হয়ে উঠল; 'জেনে রাখ, আমি যতদিন বেঁচে আছি—ততদিন এসব হবে না। তৃপ্তিকে লেখাপড়া শেখাব, ভালো বিয়ে দেব। বুঝলি?' 'মার মনের এই কুৎসিত সন্দেহ আর দৈন্য যেন ময়াল সাপের মত তার গলায় পাকের পর পাক দিচ্ছে' জেনে সুধার আত্মহত্যার ইচ্ছা অসম্ভব নয়। জীবনাসক্তি দুর্মর। তাই সুধা মরে না, বাঁচার ইচ্ছায় টিঁকে থাকে।

গল্পটিতে লেখক উপন্যাসের শাখায়িত ব্যাপ্তি এনেছেন। সুধার কলেজ থেকে শিক্ষকতা জীবন, ক্ল্যাসব্যাকে বাবা-মার প্রসঙ্গ, তৃপ্তির বিস্তৃত কলেজপর্ব, পৃথ্বীশের প্রেম, তৃপ্তির দর্পণে নিজের বৈকল্যকে আর একবার মুখোমুখি দেখে সুধার অন্তর্ভাবনা জটিল বৃত্ত রচনা করেছে। 'কয়েকটি পৃথিবী' নামের ব্যঞ্জনা তাতে সার্থক হলেও তৃপ্তির কলেজপর্ব সংক্ষিপ্ত করা যেত। তাহলে 'নতুন রীতি'র 'চৈতন্যপ্রবাহ' উদ্ঘাটন আরো সংহত, চরিত্রকেন্দ্রিক হতে পারত।

'নরকের প্রহরী' এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ গল্প। মানুষের প্রতি সহমর্মিতা গল্পটির

সম্পদ। মেলার একটি সার্কাস দল 'সাক্ষাৎ নরক',—পাপের নানা মূর্তি, তিন ছেলের এক মাথা, কাটামুণ্ড যমদূত, জালকুমারী। ভুতো, শশী, গোবরা তিনজনকে নিয়ে সার্কাসের খেলা। লেখক মানুষগুলির মর্মে পৌঁচেছেন। নতুন রীতির গল্প যদি মানুষের অধিকার থেকে নির্বাসিত মানুষদের বেদনায় দৃষ্টি দেয়, বক্তব্যগুণেই, গল্পের চিরকালের সংজ্ঞাতেই তার মূল্য স্বীকৃতি পাবে। সংবেদী মনের পরিচায়ক কয়েকটি অংশ : (ক) ভুতোটা এতক্ষণ রুদ্ধনিশ্বাসে ছিল। পালা শেষ হতে সম্বিত ফিরে পেল। বুঝল ঘামে শরীর ভিজে গেছে। গুমোটে, উত্তেজনায়, ভয়ে। আর কাঠের তক্তার ওপরে গলাটা, মুখটা, মাথাটা। ধড় ও মুণ্ডুর মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান। কপালে ঘাম জমেছে, গাল চুলকোচ্ছে, কিন্তু দুটো হাতই বাক্সের ভেতরে বন্ধ। এবং গলাটা আঁট, আঁট। (খ) ইচ্ছে গেল শ্রীকেষ্টর (দলের জোকার) মত, একটা জন্তুর মত, একটা দানোয় পাওয়া জোয়ান ছেলের মত চিৎকার করে বলে, আমায় প্রণাম কোরো না, আমি কাটামুণ্ড নই, যমদূত নই। আমি ভুতো, আমি শ্যামলডাঙার ভুতো।' 'চর্যাপদের হরিণী'-র রীতি স্বতন্ত্র। কোন যুবকের জার্নাল। সংগ্রাম, গ্লানি, নৈরাশ্য, অনুভব সব আছে। সব বিচ্ছিন্ন। জার্নালের মত। জয়েসের 'ইউলিসিস'-রীতি গল্পে আনছেন? উপন্যাসের বহু মানুষের মেলায় একটি অর্দ্ধ-সুস্থ, দ্বিধাগ্রস্ত বুদ্ধিমান চরিত্র থাকলে বিচিত্রের স্বাদে হয়ত তাকে মেনে নেওয়া যায়। তাছাড়া, প্রগতিশীল লেখকের কি এই পথ? জীবনের সক্রিয় ভূমিকা হারিয়ে কল্পনার লুতাতন্তু বোনা? 'Euphony' আশ্রয় করলে স্বভাবতই পাঠকমহল হ্রস্ব হয়ে আসে। অবশ্য 'পরিপ্রেক্ষিত' এই রীতির গল্পের সীমা সত্ত্বেও অনুভব করার, ভাববার মত গল্প। এখানে নিরীক্ষা সিদ্ধির অভিমুখে।

'ঘাম' গল্পটি নানাকারণে আমার ভালো লাগে নি। তাই নীরব থাকাই শ্রেয়। ইতোপূর্বে এর পক্ষে বিপক্ষে কিছু বিতর্ক হয়েছে, আবার কেউ-বা এই গল্পে নতুন গর্কির প্রতিশ্রুতি দেখেছেন। এক্ষেত্রে বিস্তৃততর আলোচনা প্রয়োজন। কিন্তু তাহলে আলোচনায় ভারসাম্য নষ্ট হবার আশঙ্কা।

আবার 'এই দশকের গল্প'। দেবেশ রায়ের 'দুপুর' নামক গল্পটি যেন একটি কবিতার গদ্য-বিলাস। বক্তব্য প্রায় নেই। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। 'নতুন রীতি' মানে যদি হয় আচমকা উপমা, তাহলে 'দুপুর' উল্লেখযোগ্য।

যেমন, 'আকাশটা নীল—মায়ার রঙ্‌চটা নীল শাড়ীর মতো।' 'টইটুম্বুর, টসটস করছে দুপুরটা। মধ্য সমুদ্রের মত নিস্তরঙ্গ বিরাট, ব্যাপক, রঙ্‌হীন; চুম্বক পাহাড়ের মত আকর্ষক, ফুলশয্যার পুরুষের মতো স্থির, সবল, জ্যান্ত।' অথবা, 'অনেক ছেলের মা শিথিলদেহ শ্লথযৌবন নারীর মতো দুপুরটা হাঁফসাচ্ছে।' 'হাঁফসাচ্ছে' ক্রিয়াপদ ইতোপূর্বে শুনিনি।

প্রবোধবন্ধু অধিকারীর 'নকল নক্ষত্র' লিপিকুশলতার পরিচায়ক। অবিনাশ নামক এক যৌবনোত্তর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক গল্পের একতম চরিত্র। অবিনাশ মন্থপ, দায়িত্বজ্ঞানহীন, অবিবেচক। কিন্তু তিনি এরকম ছিলেন না, এরকম হতে চান নি, গোটা মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা তাঁরও ছিল। তাই বিবেক এখনো মরে নি। অবিনাশ, বর্তমানের পতিত অবিনাশ যেন বিবেকী অবিনাশকে দ্বিতীয় স্বতন্ত্র ব্যক্তির মতই মুখোমুখি পাশাপাশি দেখতে পান। এক ব্যক্তিত্বের দুই অমূর্ত রূপকে লেখক দুই আধারে উপস্থাপিত করেছেন। তাই গল্প একা অবিনাশের, অথচ সে একা নয়। কিছুক্ষণ এই নতুন উপস্থাপনা পদ্ধতি উপভোগ্য লাগে। কিন্তু এক ব্যক্তির দুইনামের চমৎকারিত্ব (বিনাশ, অবিনাশ) বেশিক্ষণ রস সঞ্চার করে না। চৈতন্যপ্রবাহ যার, সে-মানুষটার পূর্ণ চেহারা কই? এহেন এ্যাবস্ট্রাকশন সচল মনোধর্মেরই মর্মঘাতী, চরিত্র-সৃজনে একেবারে 'ক্ষীরম্ অম্বুমধ্যাৎ' নিষ্কাশন চরিত্রকে বাঁচাবার নীতি নয়।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তোপ' আর-একটি মেলার গল্প। নরকের প্রহরী-র পরিবেশ মেলা নয়, মেলার অন্তর্গত একটি সার্কাসের ছেঁড়া-তাবু। 'তোপ' সমগ্র তোপহাটার মেলার গল্প। কেন্দ্রীয় প্লট নেই। গাল-তোবড়ানো বহুরূপীর কালী-কাচ, কাটামুণ্ডের খেলা, চালমুগরার তেল, ডালমুটের পসার এবং জনাবালীর দাঠাকুরের হিন্দু থেকে মোসলেম হবার কথা আছে। তাছাড়া ছকড়ি বোষ্টমের রামায়ণ পাঠ। চৈত্র সংক্রান্তির এই মেলার দিনে তোপহাটায় আশ-পাশ থেকে সবাই জড়ো হয়, গল্প করে। যে যা জানে বলে, যে যা সত্য হলে খুশী হত তাও বলে। বলার জন্যই। তারপরে তো আবার প্রত্যহের ঘূর্ণীপাকে উদয়াস্ত মুখ বুঁজে জীবনের ভার বহন।

'আলোগুলি এখন সাপুড়েদের মতো সাপ নাচানো খেলা খেলছে। লোকগুলি আবার ছোট হয়ে যেতে যেতে মাছির মতো এই এতটুকু হয়ে যাচ্ছে। এইবার ধীরে ধীরে সবাই বিন্দু বিন্দু হয়ে গিয়ে সুড় সুড় করে এই তোপের

খোলের মধ্যে ঢুকে যাবে। কাল থেকে আর টুঁ শব্দটিও থাকবে না। থাকবে না ততদিন যতদিন না আবার আর একটা চৈত্র সংক্রান্তি আসে।' 'তোপ' বস্তুসত্য হয়েও বৃহত্তর অর্থের ব্যঞ্জনাবহ।

মতি নন্দীর 'চোরা ঢেউ' আর-একটি প্রশংসনীয় রচনা; যদিচ এ গল্পেরও বক্তব্য সামান্য। সস্তার ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে মেজজেঠিমা স্থানীয়া একজন বস্তিতে উঠে যাচ্ছেন। তাতে প্রতিবেশীদের মনে যে প্রতিক্রিয়া জেগেছে তাই চোরা ঢেউ। ভানুদি, খুদী কেলোর মা, বুল্টা, ফেলার মার বিচিত্র প্রতিক্রিয়া। আবার মেজ জেঠিমা হারালেন, সে-ঘরে এলেন স্বাধীনভর্তৃকা এক নতুন বৌ। তাকে নিয়ে কৌতূহল তরঙ্গিত হল। তারাও উঠে গেল। মেয়েলি মন মেয়েলি ভাষা হুবহু রক্ষিত। এখানেই লেখকের কৃতিত্ব। উত্তমপুরুষে গল্প বিবৃত হয় নি, অথচ সব চরিত্রে সহানুভূতিকে ছড়িয়ে দিয়ে লেখক নিজে দূরে থেকেছেন। 'বারো ঘর এক উঠোনে' মঞ্জুদির মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটের বাসা-ছাড়ার সময় এবং বেলেঘাটা বস্তিতে ঘর-বাঁধার পর প্রতিবেশীদের কথালাপ তুলনীয়।

যশোদাজীবন ভট্টাচার্যের 'প্ল্যাটফরমের গল্প' স্কেচধর্মী হলেও বাস্তব চিত্র। একেবারে প্রকৃতির আরশি বলাও ভুল হবে, লেখক কয়েকটি ঘটনা-দৃশ্য সংকলন করে একটি সম্পূর্ণ ছবি এঁকেছেন। কোন গল্প নেই, তিনি দৃষ্টির ক্যামেরাকে মুন্সীগঞ্জের নারায়ণ পণ্ডিতের বউ, রাইমোহন, সতীশের ওপর থেকে সরিয়ে ফকিরচাঁদের পিসী, নন্দর মা'র ওপর রেখেছেন। সেখান থেকে দৃষ্টি পড়েছে আবার কমলা, শিশুবালা, রসিক বৈরাগী, নিরুপমা, সন্ন্যাসী শিকদার, গুরুপদর বৌয়ের দিকে। বহু মানুষের ভিড়। প্ল্যাটফরমের মতই লেখক জটলার আকারে গল্পে এনেছেন। এখানেই গল্পটির সাফল্য ও সীমা। সাফল্য এইজন্য যে, ছবিটি ফুটেছে ভালো, আগামীকালের পাঠকদের কাছে 'উদ্বাস্তু' নামক পরিত্যক্ত আত্মীয় মানুষগুলির জীবনচিত্ররূপে অন্যতর দলিলের মর্যাদা পাবে। কিন্তু গল্প কই? প্ল্যাটফরমের গল্প যেন বৃহৎ উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত অংশ। রীতির নবীনতা পাই নি।

রতন ভট্টাচার্যের 'পিঞ্জর' এই দশকের 'নতুন রীতি'তে লিখিত মোটেই নয়। তাতে এর গল্পত্ব খর্ব হয় নি। 'পিঞ্জর' সার্থক রসোত্তীর্ণ গল্প। প্রকাশের একই আপিসের সহকর্মিনী কাজল। দুজনের আলাপ একসময় প্রেমে রূপান্তরিত হল। দুজনেই ডেলিপ্যাসেঞ্জার। শনিবার দুজনে একসঙ্গে পথ

হাঁটে, দেরী করে বাড়ী যায়। প্রকাশের মা-র সঙ্গে আলাপ করার দিনটিতে গল্পের প্রস্তাবনা। একগলির মধ্যে স্বগ্রামবাসীদের (এখন পাকিস্তানে) এক মেসে গিয়ে উঠল কাজল। কয়েক মিনিটের শর্ত। তারপর অনেক সময় মেসে কাটল, কাজল সহরে সৌজন্য ভুলে কখনো কারো চৌকিতে গড়াল, ছেলেমানুষী করল। তারপর প্ল্যাটফরমে গেল। পাকিস্তানের ট্রেনে সিরাজগঞ্জের কামরায় পেল গ্রামবাসী স্বজনের দেখা। তার শিশুকে নিয়েই খুশী। এ দিকে ট্রেন ছাড়ল। কাজল সে গাড়ীতেই রয়ে গেল। গ্রামের মায়া, স্বগ্রামবাসীর প্রতি মায়া। পিঞ্জর ও প্ল্যাটফরমের গল্পের পশ্চাৎপট এক।

'যৌবন' (শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়) যৌবন বেদনারসে উচ্ছল দিনগুলির অপরিণতি অতিক্রম করে নি। ইতুর 'যৌবনস্বপ্ন' গল্পের উপজীব্য। 'গল্পের সঙ্গে কবিতার বিবাহ' দিতে চেয়েছেন লেখক। এত অপটু লেখা কেন সংকলিত হল, জানি না। 'তুষার হরিণী'তেও (শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়) গল্পরস জমে নি। 'আমার মেয়ের পুতুল'—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্প। উত্তমপুরুষে কথিত। একটি রুগ্ন মেয়েকে (শান্তা) আশ্রয় করে পিতৃহৃদয়ের কারুণ্য প্রকাশিত। পিতা ও কন্যার স্নেহমধুর পরিবেশের অন্তরালে একটি করুণ বেদনার ইতিবৃত্ত রয়েছে। শান্তা বাঁচবে না। এখানেই যুগের ছাপ। সব চেয়ে আকর্ষণীয় পিতার দুঃখে অভিভূত কন্যার সহানুভূতি। শান্তার সমবয়সী সুকুমারীর সুখী দাম্পত্য জীবন, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শিশুসন্তান পিতার মনে ঈর্ষামিশ্রিত অনুভূতি আনে। শান্তার কি ভবিষ্যৎস্বপ্ন নেই? 'শান্তা সেই কথাটা বলবে না। আমি জানি। এ-সব কথা বলতে নেই।...আমার ইচ্ছে করছে, তবু আমি কোনদিন তোকে গল্পটা বলব না। শুধু মনে মনে ভাবব, শানু তুই বড় হয়ে গেছিস। মস্ত বড়।...সংসারটা উপচে পড়ছে সম্পদের আধিক্যে।'

স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জল-পোকা' মার্জিত লিপিচাতুর্যের পরিচয় দেয়। কবিদৃষ্টি গল্পটির স্বাদ বাড়িয়েছে। বক্তব্য অকিঞ্চিৎকর; কোন জীবনভাষ্যের ইঙ্গিত নেই। লেখক জ্যোতিরিন্দ্রসুলভ ভঙ্গিতে একটি মাত্র অনুভূতিকে (এখানে জল-প্রীতি) নানা দিনের পটে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত করেছেন। পর্যবেক্ষণশক্তি আছে, কিন্তু দেখার ইচ্ছে অল্প। তাই দৃষ্টি মেলে দেখেন, 'পায়ের পেটি-পায়ের গড়ন মোটা, পায়ে একটু কালো কালো লোম আছে।

ওটা কি খারাপ লক্ষণ! না। খারাপ আবার কি! অনিল কিছু বলে নি তো এর জন্যে।' অথবা, 'এইভাবে জলের কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সমস্ত ভার কমিয়ে সে ছোট হয়ে যায়। সরু ক্ষীণ দেহ থেকে কটিদেশ আবছা অস্পষ্ট করুণ হয়ে কেবল দুটো চোখ, শুধু চোখ দুটো বাড়িয়ে বেলা এক একবার জল থেকে তৃপ্তি খুঁজে নিয়ে আসে।' গল্পের নায়িকা মূলতঃ যেন মানবী নয়, জল-পোকা। শুচিবায়ুগ্রস্ত বুড়ীরই যুবতী সংস্করণ। এর বেশি ব্যঞ্জনা নেই। বেলার মূর্চ্ছা যাবার ব্যাপারে লেখকের হয়ত কিছু বক্তব্য ছিল, কিন্তু আভাসিত হতে পারে নি। 'অবচেতনার খাঁচা' খুলতে চেয়েছিলেন?

সোমনাথ ভট্টাচার্যের 'হাউই' চিন্তাশ্রিত গল্প। একটি বারোয়ারী পূজামণ্ডপ, ধনীর দুলাল সত্যদা, বিসর্জনের মিছিল, রিক্‌শা চালকের ছেলে দীনুর চপলনৃত্য উপভোগ, তাকে উৎসাহ ও পানীয়দান এবং উৎসবশেষে পরদিন তাকে ভুলে যাওয়া—মোটামুটি গল্পের কথাবস্তু। দীনু ও একটি কুকুরের আচরণে গল্পকার প্রতীকী ব্যঞ্জনা ফুটিয়েছেন। মিছিল বর্ণনাই উপভোগ্য। মূলতঃ বহিরাশ্রয়ী দৃষ্টি। লেখক 'শিক্ষানবিশী' শেষ করে 'নিজস্ব পথটি' এখনও খুঁজে পান নি।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'দশ বছরে পরের একদিন' অভিনিবেশ যোগে লেখা। বর্তমান যুগের বিচ্ছিন্ন যুব মনের একাকিত্বের বেদনা গল্পের উপজীব্য। 'চৈতন্য প্রবাহ'-রীতি অংশত অবলম্বিত হয়েছে। আখ্যানটিকে উপসংহারে পিঁপড়ের রূপকে দেখিয়ে লেখক বক্তব্যের ব্যাখ্যা করেছেন। তাতেও সংশয়মুক্ত হতে পারেন নি। তাই আবার স্মৃতিছলে উপমাবিন্যাস: 'তার মনে পড়ল, দশ বছর আগে ইউনিভারসিটিতে পড়ার সময় সে একবার সিংভূমে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে একটা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে একজন লোককে সে বহু সময় ধরে নিচের উপত্যকাটা পেরুতে দেখেছিল। একা বলেই লোকটি সেদিন তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আজ বুঝতে পারল প্রিয়রঞ্জন।'

উল্লিখিত গল্পগুলির মধ্যে সাম্প্রতিক ছোট গল্পের সর্বার্থসিদ্ধি হোক না বা হোক, কতকগুলি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সেখানেই নতুন গল্পের বৈশিষ্ট্য। (১) নায়ক বা নায়িকা এবং লেখক অভিন্ন; উত্তমপুরুষে বিবৃতির পন্থা খুব বেশি গৃহীত হচ্ছে। তাতে খণ্ডের খণ্ডাংশে দৃষ্টি বৃত্ত রচনা করছে। অন্তর্মুখিতা অন্তর্বৃত হতে চলেছে। (২) চরিত্রগুলি Brooding করে, চিন্তার কুম্ভীপাক থেকে মুক্তির আগ্রহ তত নেই, বিষণ্ণ চিন্তাজাল বিন্যাস করেই শান্ত, সান্ত্বনাপ্রিয়।

'পৃথিবীর ঘোরতর অসুখ এখন' এই ভাব প্রাধান্য পাচ্ছে। একেবারে অসত্য নয়, কিন্তু অর্ধ-সত্য। (৩) Euphony চর্চায় অত্যুৎসাহ। চৈতন্যপ্রবাহ রীতির স্বপক্ষে নিশ্চয় Euphony প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। যে-কোন জিনিসের পুনরাবৃত্তিতে ক্লান্তি আসে ; সুতরাং চৈতন্যপ্রবাহের বিচ্ছিন্ন শব্দ, স্বর, ভাবুকতার পুনরাবৃত্তিতে পাঠকের সঙ্গে গল্পকারের সহিতত্ব বাড়বে কিনা সন্দেহ। এই চৈতন্যপ্রবাহ অধিকাংশ সময় আবার অতীতরোমন্থন বলে বর্ণনার রঙ, রস আরো ফিকে হয়। (৪) অনাবশ্যক পুঙ্খানুপুঙ্খতা। ঢেউয়ে পূজোর ফুল, শ্মশানের কাঠকয়লা এবং আরো নোংরা জিনিস একসঙ্গে ভেসে যায় এবং তাতে জলের বিশুদ্ধতা একেবারে নষ্ট হয় না। কারণ স্রোতের টান। পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার পক্ষে এই উপমা দেওয়া চলে না। কারণ উপমা যুক্তির কাছাকাছি, কিন্তু যুক্তি নয়। মানসপ্রবাহে অব্যাহত একমুখী স্রোত নেই। সেখানে গুরুলঘু, স্ববিরোধী নানা চিন্তার সমাবেশ। সুতরাং নির্বাচনী নৈপুণ্য অপরিহার্য। আপাত-অবিন্যস্ত চিন্তা থেকে পাঠক কল্পনায় অনুমানে একটি সম্পূর্ণরূপ গড়ে নিতে পারবে। সব লেখক বলবেন না, খুব তির্যক বাক্য, প্রতীকী রূপক হলেও না। নতুবা গল্প বর্ণনাতেই ফুরিয়ে যায়। এই দশকের গল্পে ৮১ পৃষ্ঠায় দুই অবিনাশের চলা, ৩য় অনুচ্ছেদ, 'ঘাম' গল্পের বহু অংশ স্মরণীয়। (৫) অদ্ভুত বিশেষণ উপমার ঝোঁক 'ডিসটিংশন' লাভের কৈশোরচাপল্য ব্যক্ত করে ; কিন্তু একে অতিক্রম না করলে শক্তির সংযম প্রকাশ পায় না। 'রেণুবালার গায়ে ঘামের গন্ধ-মিষ্টি বোটকা।' (প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, আধুনিক গল্পকাররা অনেকেই ঘাম বিষয়ে উৎসাহী, তবে বোট্‌কা-কে মিষ্টি আর কেউ বলেন নি) 'ছাল-ছাড়ানো আস্ত শুয়োরের ধড় লোহার হুকে টাঙিয়ে তলায় চুল্লীর বুকে আগুন দিলে যেমন দেখায় আকাশ আর বাইরেটা হঠাৎ সেইরকম ভাকাবুকো কুচ্ছিত মনে হ'ল।' অথবা, 'মাঠে ফুটবল খেলতে খেলতে দেখা কোনো দোতলা বাড়ির বারান্দায় দাঁড়ানো মেয়ের মতো—দূরের, তাই মনের কাছে সুন্দর।' এ ছাড়া দেহ 'টাস্‌টাস্' করা, 'টা-টা' দুপুর, 'হাঁফসাচ্ছে' শব্দও অভিনব।

অবশ্য সব লক্ষণই দুর্লক্ষণ নয়। বিশেষত যখন রীতিবাদীরা সকলে একমত নন। উত্তমপুরুষের প্রাধান্য যেমন আধুনিক গল্পের অন্যতর লক্ষণ, তেমন এই দশকেরই জনৈক লেখক বলেন, 'বলবার কথা দশটা-বিশটা নয়, একটিই

হয়ে থাকে। মুস্কিল এই, 'আমি'-গল্পে সেই কথাটি একটি রচনাতেই নিঃশেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় মুস্কিল, 'আমি' ব্যক্তিটি সব সময় লেখকের অভিজ্ঞতার সীমাটিকেই বয়ে বেড়ায়, ফলে 'আমি'-গল্পগুলিতে ক্রমাগত একটি গলাই শুনতে পাই, তা লেখকের। অথচ এভাবে কথা বলায় খাটুনি কম লাগে তাই নয় উত্তমপুরুষের জবানীতে চমকপ্রদ কথা বলে তড়িৎ দৃষ্টি আকর্ষণের সুযোগও, বেশি।' (পরিচয়, ১৩৬৭ শ্রাবণ, 'গল্পের আমি : তিনজন লেখক' দ্রষ্টব্য) চৈতন্যপ্রবাহ রীতিরও একটি ত্রুটি স্বীকৃত হয়েছে : 'গল্পটি আগাগোড়াই কোন একজনের চিন্তা। কিন্তু সেই একজনটি কে? নিশ্চয় তিনি মানুষ। কিন্তু কেমন মানুষ?...মানুষটি হাওয়ায় নয়, রক্তমাংসে গড়া, এই প্রত্যয়টুকু লেখককে গল্পে রাখতেই হবে, কেন না গল্প-উপন্যাসের কারবার যাদের নিয়ে তারা সমাজবাসী।' শুধু লেখকেরা নিজেরাই নন, পাঠকরাও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। দেশ পত্রিকার পূর্বোক্ত সংখ্যাগুলি দ্রষ্টব্য। অবশ্য আমি নিছক প্রতিবাদী নই। নতুন, সারবান নতুন, প্রাণবান নতুন সর্বদাই অভিনন্দনীয়। 'নতুন রীতি' সম্পর্কে সংশয়িত শ্রদ্ধা প্রকাশ করছি বলে মনে করা অনুচিত যে সার্থক 'গল্প অথবা কবিতাটিতে ধর্মঘটের কথা লেখা আছে কিনা' সেটাই আমার লক্ষ্য। শ্রীযুক্ত অশোক রুদ্রের মত (পরিচয়, মাঘ ১৩৬৭) আমি কেবল মুদ্রাদোষ দেখছি না। কিন্তু কাব্যগুণোপেত দু'একটি সার্থক উপমা বা প্রতীকের ব্যঞ্জনা মুদ্রাদোষের অরণ্যে হারিয়ে যায়। তাতে লেখকেরই ক্ষতি, বাংলা গল্পেরও। সেজন্যই সহৃদয় পাঠক বেদনাহত হন।

অন্য দিকে, নতুন বিষয় প্রকাশের অনিবার্য তাগিদে যখন রীতি বদলায় (যেমন 'ভাসান' গল্পের বর্ণনায় গ্রাম্য মানুষের উচ্চারণ রক্ষিত, 'চোরা-ঢেউ'য়ের মেয়েলি কথা) তখন মন নতুন আবিষ্কারের আনন্দ পায়। এই দশকের গল্পকারদের মধ্যে আর একটি নাম যুক্ত করা যায়, অরুণ চৌধুরী। তাঁর গল্প গ্রন্থ 'সীমানা' কাফেলা, যাদু, দাফন, মিথ্যাবাদী, সীমানা, পাঁচটি গল্পের সংকলন। কাফেলা বা দাফনে বক্তব্য ও রীতি সার্থকতায় অন্বিত। গ্রন্থটি বিশদ আলোচনার যোগ্য। তাঁর লেখায় অন্ততঃ এটুকু স্পষ্ট, মরবিড্ বা নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা নরনারীই বর্তমান দশকের একমাত্র চরিত্রচিত্র নয়। পূর্ববাংলা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও অনাত্মীয় নয়। তবু সংশয় ও সাম্প্রদায়িকতা ত্যাগ কঠিন। এহেন পূর্ববাংলার পটভূমিতে পাঁচটি গল্পের বীজসমুৎপত্তি।

অপ্রত্যয়ের অন্ধকারে যেখানেই আলোর উজ্জ্বল দীপ জেগে উঠেছে, সেখানেই লেখকের গল্পের আসর। 'অভিজ্ঞতা' ও 'সহানুভূতি' সমন্বিত।

প্রথম গল্প 'কাফেলা'। দুটি পলাতক মানুষের যাত্রা। বেলভাঙার মৌজা শাহাবাজপুরের প্রতিবেশী ইসমাইল ও সালেমা। কেউ কারো পরিচিত নয়। পরিস্থিতি তাদের একই সংকটের মুখোমুখি এনে দেয়। দেনার দায়ে সালেমা কাজীর বাড়ী আটক, ইসমাইলও বন্দী। গভীর রাতে সালেমা বাঁধন খুলে দেয় ইসমাইলের। শুধু পালানোর সময় তাকে সঙ্গে নিতে হবে এই শর্ত।

'আল্লায় মোক বাঁচাইছে বাহে। আর বাঁচাছেন তোঁরা।' সালেমার কথায় সহজ কৃতজ্ঞতা। কোন সুলভ রোমান্সের রসান দেবার চেষ্টা নেই। ইসমাইল সম্পর্কে সব শুনেছে সালেমা। তাই তো ভরসা পেয়েছে মনে। 'কি কয় ওমরা?' সালেমার উত্তর: 'তোঁরাই দেশটাকে নাকি জ্বালাই খাইবেন, জমিদারি উচ্ছেদ করবেন, তালেবরদের ধ্বংস করবেন...হ্যানো ত্যানো রাইতে দিনে কত বকর বকর। তোমার কথা না কইয়া ওমরা ভাতই খাবা নাই।' কথায় প্রাণ পায় চরিত্র। সংলাপ গ্রন্থনের নিপুণতায় কাটালের পরিবেশ, অপরিচিত কাফেলার, চিত্র সুন্দর ফুটেছে। সমরেশ বসুর 'উত্তাপ' বা গোর্কির 'Once in the Autumn গল্পের ছায়া হয়ত পড়েছে; তবু কাফেলা-ই সংকলনের শ্রেষ্ঠ গল্প। তারপর 'মিথ্যাবাদী' উল্লেখযোগ্য। একটু রুক্ষ, গোঁয়ার, কিন্তু সৎ খালাসী বুড়ো বোরহান। তার ছেলে রহমৎ সদ্যবিবাহিত। কিন্তু খালাসীর কোয়ার্টার এক-কামরা। ইনসানি রক্ষা হয় না। বাপবেটা দুজনেই রেলকর্মী। দু'জন মিলে দু' কামরার কোয়ার্টার ভাড়া নেবার জন্য ইউনিয়ন মারফৎ দুটো দরখাস্তও করেছে। কিন্তু কালান্তক লাল ফিতে। নিরুত্তর। একটা সামঞ্জস্য বোরহান করে নিয়েছিল। উনুনের পাশের জায়গাটিতেই 'আসুয়া কি মাঈ' তাকে খাটিয়া পেতে দেয়। পোকা-মাকড়-হিম থেকে বাঁচায় মশারি। কিন্তু বর্ষায় সব জলে ভিজে একাকার। তাই বর্ষায় বোরহান ক্রুদ্ধ। অবশ্য রহমৎ অমানুষ নয়। 'ঘরের ভেতরে একটা চাপা পরামর্শ হয়তো শোনা যায়। দরজাটাও হয়তো বা একটু পরে খুলে যায়—আব্বা অন্দরমে আও।' রহমৎ বেতমিজ নয়, তার বিবিও ভালো। বোরহান নিজের পছন্দের তারিফ করে। দুঃখের মধ্যেও শান্তির স্বর্গ। কেবল বেলেল্লাপনা শ্রমিকজীবনের আলেখ্য নয়, অরুণবাবু জানেন। হঠাৎ

ঝড় এল বোরহানের মনে। ঝুট বললো সে। চার্জম্যান তার নামে মিথ্যে চার্জশীট দিয়েছে। সে কাজের সময় ক্যারেজে শুয়ে ঘুমিয়েছে। সাক্ষী তার জুটি আনোয়ার চার্জম্যান। অভিযোগ অকাট্য। সবাই মিথ্যে চার্জশীটের সাক্ষী হত না। ইউনিয়ন নেতা এমদাদ আলী অসন্তুষ্ট হয়। একজনের দোষে ইউনিয়নের বদনাম। তার পক্ষে ওকালতি অন্যায়। তবু বুড়ো বোরহানের বিপদে আইন বাঁচিয়ে আর্জি লিখে দেয় এমদাদ-'ভারি ডিউটি ছিল। মেহনত হয়েছিল।...ঠিক টের পাইনি। কখন তন্দ্রা লেগে এসেছিল। বৃদ্ধ বয়স এবং মানবতার খাতিরে এবার মাফ করা হোক।' নিরুপায় বোরহান হয়ত মেনে নিত ঐ আর্জি। কিন্তু এমদাদের ধিক্কারে (৮২ পৃঃ) আগুন জ্বলে উঠল বোরহানের মনে। 'এভি ঝুট আছে।...অব, যো সহি উওহি লিখো। লিখো...বুঢ়া হইলেও হমার গায়ে তাকত আছে। ডিউটির টাইমে নিন্দ্ যাওয়া হমার আদত্ না। লেকিন আমি ইনসান আহি। জানোয়ার নেহি আছি। যবতক হমার ডবল-কমিরা কোয়ার্টার না মিলবে, তব তক রাতে পানি বর্ষাইলে দিনে ডিউটির টাইমে হামি কভি কভি নিন্দ যাইবে।' শেষে লেখক সার্থক 'টুইস্ট' দিয়েছেন! পূর্বাংশের বাগ্‌বাহুল্য আরো সংক্ষিপ্ত হতে পারত। সবচেয়ে দুর্বল 'সীমানা', উপকরণ-স্তরে রয়ে গেছে বিষয়টি, গল্পের বিন্যাস হয় নি।

ননী ভৌমিকের 'চৈত্রদিন' এই দশকের অন্যতম গল্পসংগ্রহ। ইতোপূর্বে প্রকাশিত 'ধানকানা', 'আগন্তুক' গ্রন্থে রিপোর্টাজ থেকে ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ গল্পলেখকের পদবীতে লেখকের সার্থক উত্তরণ লক্ষ্য করা গেছে। অহল্যা, নোংরা বা আগন্তুক ননীবাবুর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচায়ক। স্বদেশী শাসনে আমরা কী পেয়েছি এবং কারা বঞ্চিত হয়েছে; 'অহল্যা' তার করুণ আলেখ্য, 'আগন্তুকে' উগ্র বামপন্থী রাজনীতির বিভ্রান্তির পটে গ্রামীণ মানুষের প্রতিক্রিয়া বর্ণিত। নাম-গল্পটি আগন্তুক সংকলনের শ্রেষ্ঠ গল্প। 'নোংরা' দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা নিম্ন স্তরের মিলনমধুর প্রেমের গল্প। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছেলেমানুষী', 'স্থানে ও স্থানে' প্রভৃতি মনে পড়ে। 'পূর্বক্ষণ' থেকে ননীবাবু নতুন পথ নিয়েছেন। 'পূর্বক্ষণ' গল্পটি অনেকের মতে লেখকের শ্রেষ্ঠ গল্প, সম্প্রতি প্রকাশিত 'পঞ্চাশ বছরের প্রেমের গল্প' সংকলনে 'পূর্বক্ষণ' সংকলিত হয়েছে। হয়ত চেতনাপ্রবাহরীতি অনুসরণ তার হেতু। আমার কাছে

'পূর্বক্ষণ' রতিতাড়িত যুবকের আত্মকণ্ডুয়ন। এই বিকৃত বাসনাকে 'চৈতন্যপ্রবাহ' আখ্যা দিলে দুটি শব্দেরই অভিধার্থ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। ননীবাবুর 'অন্যবিধ' সমাজতন্ত্রবিরোধী, জীবনবিরোধী রচনা। 'নতুন রীতি'-র গল্প হিসেবে হয়ত উল্লেখযোগ্য। অবাক হয়েছি 'চৈত্রদিন'-গ্রন্থের লেখকের 'অন্যবিধ', 'মাটিতে নেমে' প'ড়ে। চৈত্রদিনে ননী ভৌমিক যাদের 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার', তাদের বৃহদংশকে দেখেছেন পরিবারের নিজস্ব ভিত্তিভূমিতে, জীবনসংগ্রামের রুদ্র বিদ্বেষে। মেহনতী মানুষের শিক্ষা নেই, সৌজন্য নেই, বোঝে না রাজনীতির গোলক ধাঁধা। কিন্তু এই তথাকথিত অন্ত্যজদের মধ্যেও জেগে আছে শাশ্বত মাতৃহৃদয় (মরদ), সংগ্রামেক্লান্ত পলাতক মানুষের মন বাঁধা পড়ে আবার সংগ্রামের রাখীবন্ধনে (চৈত্রদিন)। সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে বাংলার গ্রামে গ্রামে হতাশায় যে লক্ষ মানুষের আত্মা ডুকরে কেঁদে ওঠে, কেউবা ম'রে বাঁচে, 'অন্নপূর্ণা' তাদেরই একজন। সে সাধারণ, তবু অনন্যা। রাঢ়ের রুক্ষ লাল মাটি আর সৃষ্টিধরের দুঃখবন্ধুর জীবন দুয়ের কান্না অন্নপূর্ণার দু চোখে ঝরেছে অবিরল। অন্নপূর্ণার স্বামী সৃষ্টিধর বৃথাই ভেবেছিল, 'রাঢ়ের নিষ্ঠুর লাল মাটিকে সুধায় ভরে দিয়ে ক্যানেলে ক্যানেলে নালায় নালায় বুঝি ছড়িয়ে পড়বে ময়ূরাক্ষীর গৈরিক আশীর্বাদ। হেমন্তের সিঁদুরমুখী আকাশকে আলোড়িত করে বুঝি স্বপ্নের নূপুরের মত গভীর শব্দে বাজবে নুয়ে-পড়া পাকা ধানের মঞ্জরী।' তার স্বপ্ন যেমন সুন্দর, বেদনা তেমনি মর্মস্পর্শী। বিধবা কিশোরীর আর্তস্বরে গল্পের উপসংহার 'থাকতে লারবো গো বাবা, আমাকে মেরে ফেলাইবে।' পলাশসন্ধ্যা, প্রতিদ্বন্দ্বী, অন্নপূর্ণা, মরদ গল্পঙ্গিকে সার্থক। হাসি, পাওয়া না পাওয়া, বিজ্ঞাপন-এ গল্পের উপাদান আছে। কিন্তু লেখকের অনবধানতা বা অভিপ্রায় বশতঃই এগুলি 'স্কেচ' বা নক্সাধর্মী হয়েছে। পলাশসন্ধ্যা ও চৈত্রদিনের শিল্পোৎকর্ষ প্রতিস্পর্ধী। সার্কাস নিয়ে গল্প লেখা সম্প্রতি একটা হুজুগে দাঁড়িয়েছে। এগুলিতে দুঃখ ও সমাজপ্রগতি আছে। কিন্তু সব মিলিয়ে কাল্পনিকতার ভ্রান্তিবিলাস। ননী ভৌমিকের 'পলাশসন্ধ্যা' ও দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নরকের প্রহরী' সার্কাস-গল্পমণ্ডলীতে ব্যতিক্রম।

'চৈত্রদিন' সংকলনটির শ্রেষ্ঠ গল্প। কিন্তু 'অন্যবিধ'-'মাটিতে নেমে' গল্পের প্রবণতা ননীবাবুর আত্মহত্যার পথ।

প্রাচীন ভারতে শ্রেণী-সংঘর্ষ

সরোজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

গান্ধীজী রামরাজ্যের কল্পনা করেছিলেন, আর কংগ্রেসী সরকার সেই স্বর্ণ-যুগের রামরাজ্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছেন! রামরাজ্য বর্ণাশ্রমধর্মের চরম পরিণতি। এই বর্ণাশ্রমধর্মই আমাদের দেশের সমাজকে যুগ যুগ ধরে বেঁধে রেখেছে। বৌদ্ধ যুগে বর্ণাশ্রম ধর্মের ভিতর ফাটল ধরলেও কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন পাকাপোক্ত ভাবে সংঘটিত হতে পারেনি। রামরাজ্যের যুগে প্রাচীন আর্যদের ভিতর শ্রেণীবিন্যাস যে ভাবেই হয়ে থাক না কেন, বর্ণাশ্রম ধর্মের চরম রূপ দিয়েছেন মনু। প্রথমেই প্রশ্ন উঠতে পারে মনুর রচয়িতা কে এবং তিনি কোন সময়ের লোক। মনুসংহিতা আলোচনা করলে প্রথমেই চোখ পড়ে যে আমরা যাকে মনুসংহিতা বলি, মনুর নামের সঙ্গে সংযুক্ত হলেও সেটি আসলে মনুর লেখা নয়, সেটি ভৃগুর লেখা। প্রথম অধ্যায়ের ১ থেকে ৫৯ শ্লোক পর্যন্ত মনুর লেখা হলেও সমগ্র বইখানি ভৃগুর দ্বারা রচিত হয়েছে।

মনু কোন শতাব্দীর লেখা বই তা বলাও কঠিন। তবে যতদূর মনে হয় মনুর অধিকাংশ শ্লোকই বুদ্ধের পূর্বে রচিত হয়ে থাকবে, কারণ সমগ্র বইখানিতে কোথাও বুদ্ধ বা বৌদ্ধধর্মের নামমাত্রও উল্লেখ নাই। ভারতের ভিতর এতবড় একটা ধার্মিক বিপ্লবের জন্য নামমাত্রও উল্লেখ করেন নি, এটাই কি আশ্চর্য ঠেকে না? মনুতে গণ, অক্ষত্রিয় রাজ্যের উল্লেখ অবশ্য আছে (৪, ৬১, ২০৯, ২১৯) কিন্তু এই অক্ষত্রিয় গণ বা শূদ্ররাজ্য যে বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য ছিলনা তা নিশ্চিত; কারণ সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত রাজা ও রাজধর্ম সম্বন্ধে মনু যে ভাবে আলোচনা করেছেন, তা থেকে খুব সহজেই বুঝতে পারা যায় যে মনু-বর্ণিত, রাজারা ছিলেন নেহাৎই ছোট রকমের, আর তাঁদের রাজ্যের সীমাও ছিল খুব সঙ্কীর্ণ। নিজেদের রাজ্যের ছোট ছোট গণ্ডীর ভিতর থেকেই তাঁরা রাজ্য শাসন করতেন বা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত হতেন। তাই মনে হয় বৈদিক যুগের শেষের দিক থেকে আরম্ভ করে বুদ্ধের পূর্বেই মনুসংহিতার শ্লোকগুলি

প্রধানতঃ রচিত হয়ে থাকবে। তবে কিছু শ্লোক বুদ্ধোত্তর কালেও সন্নিবিষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই, বিশেষ করে দশম অধ্যায়ে বর্ণিত অর্ধসভ্য বিদেশী জাতির উল্লেখ থেকে তা বুঝতে পারা যায়, ব্রাহ্মণেরা এই অর্ধসভ্য জাতিগুলিকে নিজেদের দিকে টেনে আনবার জন্যই যে তাদের ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলেছিলেন—এরূপ সন্দেহ সাধারণতঃই মনে উদয় হয়।

কিছু ঐতিহাসিক মনুসংহিতাকে শুঙ্গ সাম্রাজ্যের সময়ের লেখা বই বলে বিশ্বাস করেন। এখানে আমার কোন ঐতিহাসিক আলোচনা করবার ইচ্ছা নাই। তবে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দিয়ে মনুসংহিতা একটু আলোচনা করলেই সহজে দুটি বিষয় চোখে পড়ে। প্রথম, মনুসংহিতায় বৈশ্যের স্থান। কোন সামাজিক আন্দোলন বা পরিবর্তন শুধু মাত্র কল্পনাকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেনা—তার অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রয়োজন হয়। শুধুমাত্র বুদ্ধের বাণীই কি ভারতীয় সমাজে একটা বন্যার সৃষ্টি করেছিল? আমরা ভুলে যাই যে বুদ্ধের পূর্বে নানারূপ শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি আর ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার সমাজের ভিতর একটা গুণগত পরিবর্তন এনেছিল। সমাজের ভিতর এক শ্রেণীর মানুষ প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল যারা ব্রাহ্মণ্য যুগের সঙ্কীর্ণ অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে সহ্য করতে পারে নি। তারা ছিল বৈশ্য বা শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়। তাদের সাহায্য নিয়েই অশোক বৌদ্ধধর্মের প্রচার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মনুর ভিতর এই বৈশ্যশ্রেণীর জন্ম হয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু তখনও তারা এত দুর্বল যে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সমর্থ নয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি হোল ধর্ম। মনুর ভিতর নিষ্কাম ধর্মের আমরা সামান্যই উল্লেখ পাই। মনু নিজেই স্বীকার করেছেন "যদ্‌যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎ কামস্য বেষ্টিতম।" (২।৪): কামনা ব্যতিরেকে কোন কর্মেই প্রবৃত্তি হয়না। কিন্তু নিষ্কাম ধর্মের বীজ যে মনুর সময়েই জন্ম গ্রহণ করেছে তাতেও সন্দেহ নাই। (২।৫।) এর বিকাশ হয়েছে পরবর্তী যুগে গীতায়। কিন্তু গীতা-বর্ণিত ভক্তিতত্ত্বের কোন উল্লেখই আমরা মনুতে পাই না। সমাজের ভিতর ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা এতই সুরক্ষিত ছিল যে তাদের নিষ্কাম ধর্ম ও ভক্তিতত্ত্বও প্রচারের অধিকার তত্ত্বের কোনই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বৌদ্ধযুগের বিপ্লবের পর ব্রাহ্মণদের এ অবস্থা ছিলনা। বিশাল মৌর্যসাম্রাজ্যের ক্রিয়াশীল চিহ্নগুলি অবলুপ্ত হলেও, তার অর্থ-নৈতিক কাঠামোর ভিতর কোন পরিবর্তন হয় নি। সুতরাং ব্রাহ্মণেরা আর

অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। পূর্বে ব্রাহ্মণেরা সমাজের শীর্ষে বসেছিলেন ক্ষত্রিয়ের সাহায্যে। (৯।৩২২) মৌর্যযুগে ক্ষত্রিয়দের আর কোনই রাজনৈতিক তৎপরতার উল্লেখ আমরা পাইনা। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে তাদের মৃত্যু ঘটেছিল। ব্রাহ্মণদের সহযোগী এই সক্রিয় অংশের অভাবে বাধ্য হয়েই তাদের ভক্তিতত্ত্ব আর নিষ্কাম কর্মের ভণ্ডামী আবিষ্কার করতে হয়েছিল। সুতরাং বৈদিক যুগের শেষের দিকেই যে মনুসংহিতা রচিত হয়ে ছিল এরূপ কল্পনা করা খুব অযৌক্তিক নয়।

তাছাড়া মনুর যুগে আর্যরা শুধু মাত্র উত্তর ভারতেই বসতি স্থাপন করেছিল। পূর্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত এই ছিল মনুর যুগের ভারত। (২।২২) ভৃগু যে সময়ে মনুসংহিতা রচনা করেছিলেন তখন পর্যন্ত আর্যরা দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করেনি। বৈদিক কালের রাজাদের নাম উল্লেখ থাকলেও রামায়ণ বর্ণিত রাম বা রাবণের কোনই উল্লেখ আমরা মনুতে পাইনা, অথচ পরবর্তী কালে যখনই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত করবার চেষ্টা করা হয়েছে তখনই রামায়ণের সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে। এ সম্বন্ধে অবশ্য আলোচনা সম্ভব নয়।

মনু প্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রম ধর্মের বিশেষত্ব ছিল দ্বিজ ও শূদ্রের মধ্যে সংঘর্ষ। এই শূদ্র কারা? আমাদের দেশে আজও সাধারণতঃ এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে শূদ্র হল সেই সব অনার্য যারা আর্যদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাদের দাসত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়। কিন্তু শূদ্ররা যে অনার্য ছিল তা খুব যুক্তিসঙ্গত বলে মোটেই মনে হয় না। ভারতবর্ষে আসবার পর অসভ্য আর্যরা পাইকারী হারে অনার্য বধ করেছিল নিশ্চয়ই। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের গল্প থেকে থেকে তা সহজেই কল্পনা করা চলে। সুতরাং আর্যদের বস্তিতে বা তাহার নিকটেই অনার্যের অস্তিত্ব কল্পনা করা খুবই কষ্টসাধ্য। তা ছাড়া যুদ্ধে পরাজিত অনার্যদের দাসত্ব স্বীকার করবার কোন প্রয়োজনও ছিল না। ভারতের মত বিশাল ভুখণ্ডে পিছু হটে যাবার স্থানের অভাব তাদের মোটেই ছিল না। আর যদি কোন কারণে আর্য ও অনার্যের ভিতর সংযোগ হয়ে অপত্যের সৃষ্টিও হয়ে থাকে, তাহলে মাতৃতান্ত্রিক অনার্যদের সন্তানরা মায়ের সঙ্গেই থাকত, পিতার সঙ্গে নয়। হিড়িম্বা ও ঘটোৎকচের ঘটনা থেকে এর একটা আভাষ স্পষ্টই চোখে পড়ে।

মনু রাক্ষস বা অনার্যদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন (৭।৩৮) রাক্ষস কথার

উল্লেখ দু'এক জায়গায় থাকলেও শূদ্ররা যে রাক্ষস বা রাক্ষস বংশোদ্ভূত ছিল একথা মনু কোথাও বলেন নি। মনু শূদ্রের কাযকে অনার্যের কায বলে স্বীকার করেছেন (১০।৭৩।) কিন্তু শ্রেণী বিভক্ত সমাজের নিয়মই হল যে যারা অর্থের প্রাচুর্যে শারীরিক শ্রম থেকে মুক্তি পায় তারা শারীরিক শ্রম ও শ্রমিককে ঘৃণা করে। সর্বজনবিজিত দ্বিজ বৈশ্যের কৃষিকার্যকেও মনু ঘৃণার চোখে দেখেছেন। "কৃষিং যত্নেন বর্জয়েৎ"। ১০।৮৩।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে মানুষের আদিম সমাজের আলোচনা করলেই বুঝতে পারা যাবে যে প্রাচীন যুগে কোন সমাজেই শ্রেণীর সৃষ্টি হয় নি। মহাভারত এ কথা খুব স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন, "ন বিশেষোস্তি বর্ণানাং সর্বৈব্রাহ্মমিদং জগৎ। ব্রাহ্মণাঃ পূর্বসৃষ্টংমাহি কর্মভিঃ বর্ণতাং গতঃ।"। ১০, শান্তি ১৮১। সুতরাং আর্যদের আদিম সমাজে কোনও বর্ণের অস্তিত্ব ছিল না। শ্রী ডাঙ্গে তাঁহার From Primitive Communism to Slavery পুস্তকে শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে পরের যুগে আর্যদেব সমাজে তিন বর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের (P. 101. Foot note). সব আদিম সমাজেই গোড়ার দিকে তিন বর্ণের সৃষ্টি হওয়াই খুব স্বাভাবিক।

সব সমাজবিজ্ঞানীরাই স্বীকার করেন যে মানুষের আদিম যুগে (food gathering stage) বৃত্তিভেদ হিসাবে কোন বর্ণ বা বিশেষজ্ঞের সৃষ্টি হতে পারে না। সেই জংলী অবস্থায় অন্যান্য বন্যজন্তুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রকৃতির রৌদ্ররূপের বিরুদ্ধে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখাই ছিল সব চেয়ে বড় সমস্যা। কিন্তু মানুষ যে দিন পশুকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনতে সক্ষম হয়েছিল সেদিন মানুষের সমাজে এক বিরাট পরিবর্তন হয়। একদিকে যেমন খাদ্যের অনিশ্চিত অবস্থা শেষ হয়ে যায় অন্য দিকে তেমনি জৈবিক প্রোটিন খাদ্যের নিয়মিত সরবরাহের ফলে তাদের মানসিক বিকাশ ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর দুই গোলার্ধের ভিতর মানুষের ইতিহাস আলোচনা করলেই পশুপালনের প্রভাব খুব স্পষ্টই আমাদের চোখে পড়ে। বিখ্যাত আমেরিকান লেখক Morgan বলেছেন "But when the most advanced tribes in the Eastern hemisphere, at the commencement of the Middle period of barbarism had domesticated animals which gave them meat and milk, their condition, without a

knowledge of cereals, was much superior to that of the American aborigines in the corresponding period, with maize and plants but without domestic animals." (Ancient society P. 22) পশুকে নির্ভর করেই মানুষ সভ্যতার পথে এগিয়ে চলে। পশুর দুগ্ধকে যথোপযুক্ত কাজে আনবার জন্য তাদের মৃৎভাণ্ডের প্রয়োজন হয়, আর তার কলে কুমোরের চাকের আবিষ্কার হয়। পশুর লোমকে কার্যকরী করবার জন্য প্রয়োজন হয় চরকার, আর পশুর চামড়াকে প্রয়োজনীয় করে তুলতে নানারকম যন্ত্র ও যন্ত্রশিল্পীর প্রয়োজন হয়ে উঠে। সুতরাং এ অবস্থায় আর্যদের ভিতর বর্ণভেদেরও সৃষ্টি হয়। মনু নিজেই স্বীকার করেছেন যে স্রষ্টা পশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই বৈশ্যের সৃষ্টি করেছেন (৯।৩২৬, ৩২৭) এখানে বৈশ্যের কর্তব্য হিসাবে পশুপালনকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, কৃষিকে নয়। কিন্তু তখনও সভ্যতার সৃষ্টি হয় নি। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এ যুগকে neolithic barbarism এর যুগ বলেন। আর্যদের ভিতর তখনও চতুর্থ বা শূদ্রবর্ণের সৃষ্টি হয় নি।

অতি আদিম কাল থেকেই সব অসভ্য সমাজে এক শ্রেণীর লোক ছিল যারা যাদু বা ম্যাজিক নিয়ে কারবার করত। প্রকৃতির সহিত নিরন্তর যুদ্ধ ও নিজের অসহায় অবস্থার তুলনা থেকেই এই ম্যাজিক বা যাদুর সৃষ্টি হয়েছে। "So even in savagery of the Old Stone Age, we can discern the germs of religion···" (Gordon Childe : What Happend in Histoty. P. 42) সমাজের ভিতর যারা অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধ ও অক্ষম ছিল এবং শিকার বা যুদ্ধে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারত না তারাই অপেক্ষাকৃত কর্মঠ ও শক্তিশালী লোকদের নিজেদের কর্মঠ জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য করত। সুতরাং আর্যদের ভিতরও যদি গোড়ার দিকে তিন শ্রেণীর উদ্ভব হয়ে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নাই। যাদুকর বা যাজক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ, শক্তিশালী বা যুবক সম্প্রদায় ক্ষত্রিয় আর পশুপালক বৈশ্য! তখনও চতুর্থ বা শূদ্রবর্ণের উৎপত্তি হয় নি।

শূদ্রবর্ণের সৃষ্টি হয়েছে পরের যুগে আর শূদ্ররা সম্পূর্ণরূপেই আর্যগোষ্ঠীভুক্ত। ধাতুর যুগ থেকেই, বিশেষ করে লোহা আবিষ্কার হবার পরই মানুষের ইতিহাসে এক বিরাট পরিবর্তন হয়। এইখান থেকে সভ্যতার সৃষ্টি হয়। প্রথম দিকে

আসে তামা, তারপর ব্রোঞ্জ ও লোহা। ধাতুকে প্রয়োজন মত কাজে আনতে হলে এমন এক শ্রেণীর মানুষের প্রয়োজন হয় যাদের সমাজের অন্যান্য কাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে রেহাই দিতে হয়, কারণ, প্রথমতঃ ধাতু সব জায়গায় সহজলব্ধ নয়, সাধারণতঃ পার্বত্য অঞ্চলেই ধাতু পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ ধাতুশিল্পে সর্বক্ষণের ধাতুশিল্পীর দ্বারা অন্য কোন কাজ সম্ভব নয়; সেই অসভ্য যুগে ধাতুকে গলিয়ে তাকে প্রয়োজনীয় ছাঁচে ঢালতে কত যে অভিজ্ঞতা, পরিশ্রম, ও এক্সপেরিমেন্টের প্রয়োজন হয়েছিল তা সহজেই কল্পনা করা যায়। Gordon Childe বলেছেন, 'It is very doubtful whether metallurgy could be practised as a domestic industry in the intervals of agricultural work (Man Makes Himself P. 94) সুতরাং ধাতুর যুগ থেকেই মানুষের সমাজে এমন এক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল যারা সমাজের অন্যান্য শ্রেণী থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। একথা প্রত্নতাত্ত্বিকেরা স্বীকার করেন, "The adoption of metal tools will make room for a new class that had no place in a pure neolithic economy." (What Happed in History P. 79) সেই অসভ্য যুগেই মানুষ বুঝেছিল যে ধাতুশিল্প তাদের জীবনের জন্য কত প্রয়োজন। আর সেই জন্য মানুষ এই শিল্পে ব্যাপৃত তাদের সঙ্গীদের খুব আনন্দের সহিতই সমাজের অন্য সব বাধ্যবাধকতা থেকে রেহাই দিয়েছিল। তারাই সমগ্র সমাজের সেবা করত। সমাজের অস্তিত্ব, সমাজের অগ্রগতি এই ধাতু শিল্পীর শ্রমের উপরই নির্ভর করত। মানুষের দুটি পা যেমন তার শরীরের সমগ্র ভার বহন করে তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তাকে বিপদ থেকে মুক্ত করে; ঠিক তেমনি ধাতুশিল্পী সমগ্র সমাজের ভার বহন করে তাকে প্রগতির পথে নিয়ে যায়। সেই জন্যই নিওলিথিক যুগের আর্য কবিরা তাকে স্রষ্টার পাদোদ্ভূত কল্পনা করে কবি প্রতিভার অদ্ভুত নিদর্শন দিয়েছেন। সুতরাং আর্যদের ভিতর ও লৌহযুগ থেকে এক চতুর্থ শ্রেণীর উদ্ভব হয়—এই শ্রেণী হোল শূদ্র শ্রেণী।

ধাতুর ব্যবহার, বিশেষ করে লৌহের ব্যবহার আরম্ভ হবার পর আর্য্যদের ভিতর একটা অর্থনৈতিক বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছিল। ধাতুর অস্ত্র ও যন্ত্রপাতির শ্রেষ্ঠত্ব যেমন তাদের সভ্যতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়, ঠিক তেমনি সমাজের ভিতর নানা রূপ শিল্পের ও প্রতিষ্ঠান হয়। তার ফলে সমাজের ভিতর একটা গুণগত পরিবর্তন হয়। প্রথমে ধাতুশিল্পী ও পরে সব শিল্পীই একটি নূতন শ্রেণীর

সৃষ্টি করে। Engels বলেছেন, "Such diverse activties could no longer be conducted by any single individual; the second great division of labour took place; handicrafts separted from agriculture." (Marx. Engels Selected Works. Vol II-P. 283)

সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচি ও সৌন্দর্যজ্ঞানের ও উত্তরোত্তর উন্নতি হতে বাধ্য; সুতরাং সব শিল্পকলাই ক্রমশঃ সময়সাপেক্ষ হয়ে উঠে। বিশেষ করে সে যুগে লিখিত পুস্তকের অভাবে সব শিল্পকলাই অভিজ্ঞ শিক্ষককে অনুকরণ করেই আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল। তাই শিক্ষানবীশরা শিক্ষকের সান্নিধ্যে থেকেই এই শিল্পগুলি শিক্ষা করতে পারত। সুতরাং এই সব অপরিণত বয়সের শিক্ষার্থীদের সমাজের অন্য বাধ্যবাধকতা থেকে, যেমন বেদাধ্যয়ন, বা অস্ত্রশিক্ষা থেকে রেহাই দেওয়া প্রয়োজনীয় ছিল। বিশেষ করে সেই যুগে ধাতুশিল্পীর পক্ষে একস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করা সম্ভব ছিল না, কারণ ধাতু পাঞ্জাব বা উত্তর প্রদেশের অ্যালুভিয়াল মাটিতে সহজলব্ধ ছিল না, সুদূর পার্বত্য অঞ্চল থেকেই তা সংগ্রহ করা হোত। সুতরাং শিল্পীরা ছিল ভ্রাম্যমান। প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সন্ধানে যেমন তাদের নানাস্থানে ভ্রমণ করতে হোত, তেমনি কাঁচামাল নিকটে উপলব্ধ হোলে ও বস্তির ভিতর তা আনা অনেক সময় সম্ভব ছিল না। যেমন নিকটবর্তী জঙ্গলের ভিতর প্রয়োজনীয় বড় গাছ পাওয়া গেলে ও সেই আদিম যুগে তাকে বস্তিতে বয়ে আনা সহজ কাজ ছিল না। এ অবস্থা শুধু ভারতেই নয় সভ্যতার গোড়ার দিকে সব দেশেই অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। আবার কাঁচামাল সহজলব্ধ হলেও শিল্পীরা যে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারত তা নয়। "Scince his equipment is very simple, his raw material is available everywhere, the expert potter may be a perambulating craftsman as easily as the smith." (What Happened in History, P. 85) এর একটা অর্থনৈতিক কারণও আছে। শিল্পীরা সোজাসুজি খাদ্য উৎপাদন থেকে বিরত থাকত। নগর সভ্যতার পূর্ব পর্যন্ত কোনও একটি আর্য বস্তি কোনও শিল্পীকে সারা বৎসর ভরণপোষণ করতে সক্ষম হোত না। তার ফলে শিল্পী শ্রেণীরা ভ্রাম্যমান জীবন অতিবাহিত করত। মনু শিল্পীর এই অবস্থা উপলব্ধি করে নিজেই বিধান দিয়েছেন "শূদ্রস্তু যস্মিন কস্মিন

বা নিবসেদ্‌বৃত্তিকর্শিতঃ" ২।২৪। এর ফলে তাদের মধ্যে একটা পরিবর্তনও ঘটেছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মানুষের সমাজ যে ভাবে গড়ে উঠে আমাদের দেশেও তার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম হয় নি। ইজিপ্ট সম্বন্ধে Gordon Childe বলেছেন, "Such craftsman are therefore lessamenable to social discipline than fisherman and farmers, less dependent on territorial society than even the magician, for his authority is rooted in the subjective beliefs and superstitions of his fellow craftsman." (What Happened History P. 78) আর্যদের ভিতরও যাদুকর ও শিল্পীর মধ্যে একটি ব্যবধান ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল। তবে এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করছি।

শূদ্ররা যে শিল্পী-শ্রেণী ছিল মনু একথা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন ১০।১০০ ৭।১৩৮, ১০।১২০। তবে সাধারণ আর্যের অনুপাতে এরা সংখ্যায় ছিল খুবই কম, বিশেষ করে লৌহযুগের পূর্বে। খাদ্য উৎপাদনে যতক্ষণ না একটা স্বাচ্ছন্দ্য অবস্থার সৃষ্টি হয় ততক্ষণ কোন ও সমাজ বহুসংখ্যক শিল্পীকে ভরণপোষণ করতে পারে না। কিন্তু ভারতের মত উর্বর দেশে এ অবস্থার সৃষ্টি খুব শীঘ্রই হয়ে ছিল। লৌহ যুগের একটি বিশেষত্ব হল এক দিকে নানারূপ শিল্পের বিকাশ ও অন্যদিকে জনসংখ্যার অভূতপূর্ব ভাবে বৃদ্ধি। যার ফলে নগর সভ্যতার সৃষ্টি হয়।

লোহার যন্ত্রপাতি, বিশেষ করে কুড়ুল আর লাঙলের ফাল আর্যদের সমাজে এক অর্থনৈতিক বিপ্লবের সৃষ্টি করে। যতই কৃষিযোগ্য ভূমি আর্যদের করায়ত্ত হতে থাকে ততই তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতার সৃষ্টি হয়। বৈদিক যুগের "আত্মা প্রজা পশবঃ" ধীরে ধীরে ভূমিতে পরিবর্তিত হতে থাকে। বৈদিক যুগে আর্যদের প্রধান ধনসম্পত্তি ছিল পশু। একথা সর্বজনবিদিত, কিন্তু মনুর যুগে ধনসম্পত্তির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে ভূমি ও অর্থ, পশু নয়। পশুর স্থান ভূমি ও অর্থের পর। এই অর্থ নৈতিক পরিবর্তনের ফলে তাদের সমাজের ভিতর ও বিভিন্ন শ্রেণীগুলির মধ্যে একটা পরিবর্তন হয়। ভূমির অধিকারী আর্য ও ভ্রাম্যমান শিল্পী আর্যদের মধ্যে পূর্বের অস্পষ্ট ব্যবধান শুধুই যে স্পষ্টতর হয়ে উঠে তা নয়, তাদের সম্পর্কের ভিতর ও উচ্চ ও নীচের সৃষ্টি হয়। সমাজে শূদ্রের মর্যাদাও নিশ্চিতভাবে হ্রাস পায়।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা অনুরূপ অবস্থা সহজেই দেখতে পাই। ইজিপ্ট সম্বন্ধে Gordon Childe বলেছেন, "But if assured of food and shelter, the smith for instance, loses, the freedom and prestige earned by his skill under barbarism (What Happened in History P. 95) গ্রীসের সমাজ সম্বন্ধে Xenophona লিখেছেন, "What are called the mechanical arts are rightly dishonoured in our cities···Furthermore the workers at these trades···are tooked upon as bad citizens and bad patriots, and in some cities, espeacially the war-like ones, it is not legal for a citizen to ply a mechanical art. (From Ferrington's Greek Science Part I. Page 29) বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক Plato শিল্পী-শ্রেণীকে "base-born mechanic" বলে ঘৃণা করেছেন। (The Republic III 405) মনু শূদ্রকে "জঘন্য প্রভব হি স" ৮।২৭০ বলে ঘৃণার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

যারা ভূমিহীন ছিল তারা নিশ্চয়ই দরিদ্র ছিল এ কথা বুঝাইয়া বলবার প্রয়োজন নাই।

মনু সমাজকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করেছেন, দ্বিজ ও শূদ্র। দ্বিজের ভিতর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্মিলিত ছিল, তাদের কর্তব্য ও অধিকার অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন ছিল। কিন্তু সমাজের সব সুখ সুবিধা ও অধিকার যে সব দ্বিজই ভোগ করত এ রূপ কল্পনা করা মোটেই সমীচীন নয়। সমাজের সুবিধা ও অধিকারগুলি শুধুমাত্র সঙ্গতিপন্ন দ্বিজের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছিল। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দ্বিজরা শীঘ্রই শূদ্রত্বে পরিণত হত। এবং অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিশালী শূদ্ররা ব্রাহ্মণত্বেও পরিবর্তিত হতে পারত। "শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্" ১০।৬৫ মনু নিজেই স্বীকার করেছেন যে "চত্বারস্তুপচীয়ন্তে বিপ্র আঢ্যোবনিঙনৃপঃ" ৮।১৬৯। বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার যে এখানে আঢ্য বণিক ও নৃপ বলা হয়েছে। বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় বলা হয় নি। বিপ্রের কথা পরে বলছি।

মনুর সমাজ ব্যবস্থার ভিতরই ধনী ও দরিদ্র সৃষ্টির বীজ নিহিত ছিল। পিতার মৃত্যুর পর তার সব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি পুত্রদের

মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হত। (৯।১৫০।) কিন্তু সব পুত্ররা সামন ভাগ পেত না। "জ্যেষ্ঠস্য বিংশ উদ্ধারঃ সর্বদ্রব্যাচ্চ যদ্বরম্। ততোঽধং মধ্যমস্য স্যাত্তুরীয়ন্তু যবীয়সঃ" ।৯।১১২। অর্থাৎ সমগ্র ধনের বিশ ভাগ করিয়া এক ভাগ জ্যেষ্ঠকে ও সমগ্র ধনের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাও জ্যেষ্ঠকে, মধ্যমকে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ও সর্ব কনিষ্ঠকে অশীতি ভাগের এক ভাগ দিয়া অবশিষ্ট ধন সমানভাবে ভাগ করিবে। এই জটিল ও অসমান বণ্টন ব্যবস্থা কালক্রমে যে দ্বিজসমাজকে ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছিল এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

এই আর্থিক অনৈক্য দরিদ্র দ্বিজের সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার উপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল। দ্বিজত্বের একমাত্র মাপকাঠি ছিল বেদাধ্যয়ন ও বৈদিক সংস্কার। বেদাধ্যয়ন শুধুমাত্র শ্রম সাধ্যই ছিল না, যথেষ্ট অর্থসাপেক্ষও ছিল। কারণ, অর্থ প্রাপ্তি না হলে, মনু গুরুদের বেদাধ্যাপন করতে বিশেষভাবে নিষেধ করেছেন। ২।১১২। সুতরাং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দ্বিজের পুত্ররা বেদাধ্যয়ন থেকে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হয়েছিল, এতে কোনই সন্দেহ নাই। শিক্ষান্তে গুরু দক্ষিণার কঠোরতা সম্বন্ধে অনেক গল্পই সংস্কৃত পুঁথিপত্র খুঁজলে পাওয়া যায় এ কথা সকলেই জানেন। গুরু দক্ষিণার যে ফিরিস্তি মনু দিয়েছেন তা খুবই চিত্তাকর্ষক তাতে সন্দেহ নাই। ২।২৪৬। মূল্যবান দ্রব্যের সঙ্গে ধান্য ও শাকের উল্লেখ থাকলেও গুরুরা যে ঐ দক্ষিণাতে সন্তুষ্ট হতেন এরূপ কল্পনা করবার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ দেখা যায় না; যেহেতু মনুই বিধান দিয়েছেন "অমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্"। ২।২৩৯। অর্থাৎ অপবিত্র স্থান হইতেও স্বর্ণ সংগ্রহ করিবে। সুতরাং দরিদ্র দ্বিজের পুত্ররা যে বেদাধ্যয়ন থেকে বঞ্চিত থাকত এতে কোনই সন্দেহ নাই। আর বেদাধ্যয়ন না হলেই শূদ্রত্ব প্রাপ্তি এ কথা মনু বিশেষভাবে বলেছেন। ২।১৬৮।

যে সব দ্বিজের পুত্ররা বৈদিক সংস্কারে সংস্কৃত না হত তারাও পতিত হয়ে সমাজচ্যুত হত। বৈদিক সংস্কার ছিল ব্যয়-সাপেক্ষ সুতরাং দরিদ্র দ্বিজের পুত্ররা যে শীঘ্রই শূদ্রত্ব পেয়েছিল এতে কোন সন্দেহ নাই। ২।৩৯। প্রথম দিকে তারা হত ব্রাত্য ও পরে শূদ্র, কারণ ব্রাত্য নামধারী কোন জাতি ভারতীয় সমাজে খুঁজে পাওয়া যায় না।

কিন্তু বেদাধ্যয়ন ও বৈদিক সংস্কারবিহীন হওয়ার ফলেই যে মনুর যুগ থেকে

শূদ্র, সমাজে অতি নীচ স্থান গ্রহণ করে ও ঘৃণিত হয় এরূপ মনে করবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না। কৃষিভিত্তিক সমাজের অধিকাংশই চাষী। উৎপাদনের যন্ত্রগুলি যতক্ষণ উৎপাদকের আয়ত্তে থাকে ততক্ষণ সে বেদজ্ঞই হোক আর বেদে অনভিজ্ঞই হোক, বৈদিক সংস্কারে সংস্কৃতই হোক আর অসংস্কৃতই হোক, সামাজিক দৃষ্টি থেকে তার একটা অর্থ নৈতিক মূল্য থাকে; এবং সে শুধু এই জন্যই সমাজে খোলাখুলি ভাবে ঘৃণিত হতে পারে না। কিন্তু মনু সঙ্গতিপন্ন আর্যদের স্বার্থে এমন কতকগুলি নিয়ম প্রবর্তিত করেন, যার ফলে অর্থ কতকগুলি হাতে কেন্দ্রিত হতে থাকে, আর সমাজের ভিতর অধিকাংশ লোকই দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে সমাজের ভিতর বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করে।

গ্রীসের সমাজ সম্বন্ধে Engels বলেছেন, "The principal means of stifling the liberty of the commonality were money and usury" (Ibid, 241) সভ্যতার আদিমকাল থেকেই বিভিন্ন গণ-সমাজে ভোগ্যবস্তুর আদান-প্রদান প্রচলিত ছিল। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মূল্যমান নির্ধারণের জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুর চলন আমরা সব দেশেই দেখতে পাই। মনুর যুগে মুদ্রার প্রচলন খুব ব্যাপক ভাবেই ছিল তা অষ্টম অধ্যায় পড়লেই বেশ বুঝতে পারা যায়। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন সুবিধার জন্য মুদ্রার ব্যবহার বৃদ্ধি পায়, তেমনি সমাজের ভিতর ঋণের আদান-প্রদানও প্রবর্তিত ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। কৃষিভিত্তিক সমাজে ঋণের আদান-প্রদান অপরিহার্য। ভারতবর্ষের মত দেশে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি, বিভিন্ন প্রকারের ক্ষতিকর পোকা-মাকড় কৃষকের নিত্য সহচর। সুতরাং যে সব ছোট ছোট কৃষক ছিল, অজন্মা ও শস্যের ক্ষতি হলে সামাজিক উৎপাদনের স্বার্থে তারাও ঋণ নিতে বাধ্য হয়। এ ছাড়া ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যও অনেক সময় কৃষককে ঋণ নিতে বাধ্য করে। ছোট ছোট কৃষকের এই দুর্ভাগ্যের সুযোগ নিয়ে অনেক নীতিজ্ঞানহীন সঙ্গতিপন্ন মানুষ কুসীদ-বৃত্তির মাধ্যমে কৃষককে সর্বস্বান্ত করে এ কথা সর্বজনবিদিত তাই অতীত যুগে অধিকাংশ ধর্মই দরিদ্রকে লোভী মানুষের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে এসেছিল।

খ্রীষ্টান ধর্মে কুসীদবৃত্তি অতি নিন্দনীয়। বাইবেল বলছেন, "If thou lend money to any of my people with thee that is poor thou shall not be to him as a creditor ; neither shall ye lay upon

him usury (Exodus XXII 25) Take thou no usury of him or increase.....(Leviticus XXV 36) He that putteth not out his money to usury nor taketh reward against the innocent. He that doeth these things shall never be moved. (The Psalms XV 5) বাইবেলের আরো অনেক স্থানে কুসীদবৃত্তিকে নিন্দা করা হয়েছে। ইয়োরোপের ইহুদী সম্প্রদায় কুসীদবৃত্তির জন্যই ঘৃণ্য হয়েছিল। শাইলক আজও ঘৃণার পাত্রই হয়ে আছে। মুসলমান ধর্ম কুসীদবৃত্তিকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে। "They who swallow down usury shall arise in the resurrection only as he ariseth whom Satan hath infected by his touch (The Koran, II 276. Rodwell's Translation) And because they have taken usury, though they were forbidden it; and have devoured men's substance in frivolity, we have got ready for the infidels among them a grievous torment (Ibid IV 159) Whatever ye put out at usury to increase it with the substance of others shall have no increase from God...(Ibid XXX 38) মধ্যযুগীয় ইয়োরোপে Protestant ধর্মের প্রবর্তক Martin Luther বলেছেন "As since we break on the wheel, and behead highwaymen, murderers and house-breakers, how much more we ought to break on the wheel and kill...hunt down curse and behead all usurers" (Quoted from Marx : Capital vol I. P. 593) অন্যান্য দেশেও মানবতার জন্য ধর্ম দরিদ্রের সহায় হয়ে ধনীর অর্থ লালসা থেকে মানুষকে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে এসেছে, আর তাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে।

ঋণদান ও কুসীদবৃত্তির মধ্যেও একটা পার্থক্য আছে। অর্থ বিজ্ঞানের বিষয় হলেও এখানে শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন যে যখন উৎপাদনের জন্য সুদ নিয়ে ঋণ দেওয়া হয় তখন তার উৎপাদানর ভিতর ঋণের একটা সৃজনাত্মক অংশ থাকে। তখন ঋণ উৎপাদন ব্যবস্থাকে সাহায্য করে ও সমাজের উৎপাদন বৃদ্ধি করে সাধারণ মানুষের জীবনের মান উন্নয়ন করে। কিন্তু যখন কুসীদবৃত্তির মাধ্যমে উত্তমর্ণ অত্যধিক সুদ গ্রহণ করে তখন labour বা শ্রমের প্রতিদান

মজুরী ছাড়া সব উদ্বৃত্ত অংশই (Surplus) উত্তমর্ণের কুক্ষিগত হয় এবং মজুরীও ক্রমে ক্রমে সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছায়। তার ফলে সমাজে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়। "In the form of interest the entire surplus above the barest means of substance (the amount that later becomes wages of the producers) can be consumed by usury (this later assumes the form of profit and ground rent……" (Capital vol. III: 582). এর ফলে শুধু যে অর্থনৈতিক উৎপাদনই ব্যাহত হয়ে ব্যাপক দারিদ্র্যের সৃষ্টি করে তা নয়, বরং অসংখ্য ছোট ছোট ভূম্যাধিকারী নিজের ভূমি থেকে উৎখাত হয়ে ভূমিহীন দাস বা অর্ধ দাস সমাজের সৃষ্টি করে। তাই Marx বলেছেন, On the other hand, it undermines and ruins small peasant and small burgher production, in short all forms in which the producer still appears as the owner of his means of production (Ibid 583) সুতরাং কুসীদবৃত্তি কোনও ঐতিহাসিক কালে কোনও দেশের শুধু সর্বনাশই সাধন করে না, বরং উৎপাদনের স্রোতকে রুদ্ধ করে দিয়ে ভবিষ্যৎ বিকাশের পথেও প্রধান বাধা হয়ে উঠে।

গ্রীসের সমাজ সম্বন্ধে Engels লিখেছেন, "All rural districts of Attica bristled with mortgage posts bearing the legend that the lot on which they stood was mortgaged to so and so for so and so much." (Selected works vol. II 241) ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন এর ফল কি হয়েছিল। রোমের সমাজ সম্বন্ধে Marx বলেছেন, "As soon as the usury of the Roman patricians had completely ruined plebians, the small peasants, this form of exploitation came to an end, and a pure slave economy replaced the small peasant economy." (Ibid, 582) এই সামাজিক বিপর্যয়ের জন্যই পাশ্চাত্ত্য দেশে খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম কুসীদবৃত্তিকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখেই দেখেছে।

কিন্তু বর্ণাশ্রম হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মনু ধার্মিক ভাবেই কুসীদ বৃত্তিকে সমর্থন করে যে সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন তা জগদ্দল পাথরের মত আজও সমাজের স্বাচ্ছন্দ্যগতিকে বোধ করে রয়েছে। মনু বলেছেন, "বণিক পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ" ১।৯০। কিন্তু তিনি কুসীদবৃত্তি শুধু মাত্র

বৈশ্যের জন্য সীমাবদ্ধ রাখেন নি, এ বিষয়ে ব্রাহ্মণকেও অবাধ অধিকার দিয়েছেন ১০।১১৬। আবার মজার ব্যাপার হোল যে ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে তিনি শুধু কুসীদ বৃত্তি সমর্থন করেই সন্তুষ্ট হননি, ধর্মার্থে চুরি বা ডাকাতি করতেও বিধান দিয়েছেন। ১১।১৩। এই এগার অধ্যায়ের বহু শ্লোকে চুরি বা ডাকাতি করতে বিধান দেওয়া হয়েছে।

মনু শুধু কুসীদবৃত্তিকেই ধার্মিকভাবে সমর্থন করেন নি, তিনি যে হারে সুদ নেওয়াকে ধার্মিক আখ্যা দিয়েছেন তা নির্লোভ ব্রাহ্মণের পক্ষে উপযুক্তই বটে। অবশ্য এ ব্যাপারে মনুকেই পাইওনিয়ার (Pioneer) বলা যেতে পারে না, কারণ মনুর পূর্ববর্তী ঋষি বশিষ্ঠই ধর্মের নামে অবাধ শোষণকে সমর্থন করেছিলেন। নির্লোভ বশিষ্ঠ ঋষি প্রতি মাসে আশী পারসেন্ট অর্থাৎ বৎসরে ৯৬০% সুদ সমর্থন করেছিলেন একথা মনু স্বীকার করেছেন ।৮।১৪০। বোধ হয় নির্লোভ ব্রাহ্মণের পক্ষে এই সুদের হার কিছু বেশী বোধ হওয়ায় তিনি মাত্র ৫০০% সুদ সমর্থন করেছেন, "ধান্যে সদে লবে বাহ্যে নাতিগ্রীমতি পঞ্চতাম্। ৮।১৫১। মানব ধর্ম সংহিতার রচয়িতা মনুর ঐতিহ্য যে আমাদের দেশে আজও সমানভাবে কার্যকরী রয়েছে তার প্রমাণেরও অভাব নাই। "...Workers in many collieries have to part with half of their wages each week in paying interest at the rate of 300% to 500% per annum. (The Statesman 9.10.60)

সুতরাং এটা বুঝতে পারা মোটেই শক্ত নয় যে আমাদের দেশের ধর্মের রূপ দ্বিমুখী। কল্পনার ক্ষেত্রে আলাদা, আর বাস্তবের ক্ষেত্রে আলাদা। সমাজের যে শ্রেণী কাব্য, সাহিত্য আর দর্শনের সৃষ্টি করেছে, তার কল্পনার ক্ষেত্রে সর্বভূতের ভিতর ঈশ্বরের দর্শন করেছে (১২।১২) অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে তারা মানুষকে "জয়ন্ত প্রভব হি স" (৮।২১০) বলে ঘৃণা করতে কসুর করেনি, এমন কি তাদের মুখ দর্শন করাও পাপ মনে করেছে। ১০।৫৩। নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বিশ্ব স্রষ্টার কাল্পনিক শরীরের ভিতর ও উত্তমাঙ্গ ও অধমাঙ্গের মধ্যে পার্থক্য করতে দ্বিধা করেনি, অথচ শিবলিঙ্গের মাধ্যমে সেই অধমাঙ্গের পূজা করতেও ছাড়েনি।

সামাজিক ও আদর্শবাদের ক্ষেত্রে এই বৈষম্যই আমাদের দেশের বিশেষত্ব) এই বৈষম্যই শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের একমাত্র পরিণতি। যারা ক্ষমতার আসনে

অধিষ্ঠিত ছিল, তারা নিজেদের স্বার্থকে কায়েমী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যে কোন উপায়ই অবলম্বন করতে দ্বিধা করে নি। এই বৈষম্য অবশ্য স্টেটের সাহায্য ব্যতীত সম্ভব ছিল না। মনু স্টেটের উৎপত্তি সম্বন্ধে অবশ্য একথা স্বীকারও করেছেন, তবে সে সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হয় নি।

সঙ্গতিপন্ন আর্যদের স্বার্থে ছোট ছোট কৃষকদের জমি থেকে উৎখাত করবার ধার্মিক ব্যবস্থাও অবশ্য মনু করেছেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে উৎপাদনের প্রধান যন্ত্র যেমন ভূমি ও পশু বন্ধক রাখা সম্ভব ছিল। ৮।১৪৯। সুতরাং উৎপাদনের প্রধান উৎসই যদি বন্ধক পড়ে তাহলে দরিদ্র চাষীর কি অবস্থা হতে পারে তা কল্পনা করা খুবই সহজ। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে যে হয়ত অধমর্ণের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে মনু উৎপাদনের প্রধান যন্ত্র যেমন পশু, ক্ষেত্র, বাগান ইত্যাদির জন্য আলাদা বৃদ্ধির বিধান দেননি। ৮।১৪৩। কিন্তু বাস্তব হোল যে এগুলি বন্ধক পড়লে অধমর্ণের হাত ছাড়া হয়ে যেত, উত্তমর্ণই এগুলিকে ভোগ করত; আর দশ বৎসর ভোগ করবার পর উত্তমর্ণের এগুলির উপর ধার্মিক স্বত্ব স্থাপিত হোত, অধমর্ণের কোনই অধিকার থাকত না। সুরাং যৎকিঞ্চিদ্দশবর্ষাণি সন্নিধৌ প্রেক্ষতে ধনী। ভুজ্যমানং পরৈর্তুষ্ণীং ন স তল্লব্ধুমর্হতি।" সুতরাং মনুর যুগ থেকেই আর্যদের সমাজে প্রলিটেরিয়েট সৃষ্টির ব্যবস্থা বর্ণাশ্রম ধর্মের মাধ্যমে হিন্দু সমাজে পাকাপোক্ত ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যবস্থা থেকে কোন বর্ণই বাদ পড়েনি। দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তানও যে দাশ শ্রেণীভুক্ত হয়েছিল তার উদাহরণ আমরা মনুতেই পাই। ৮।৪১২। এরা সকলেই শূদ্রত্বলাভ করেছিল। সুতরাং শূদ্রের অর্থই হোল দরিদ্র। দশম অধ্যায়ের ৪০, ৪৫ ও ৫৭ নম্বরের শ্লোকগুলি একটু বিশ্লেষণ করলেই বেশ বুঝতে পারা যাবে।

বৈদিক যুগের গণস্মৃতি তখনও সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় নি। তখনও আর্য-সন্তানরা বৈদিক ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে ভুলতে পারে নি, যখন তারা সকলে একত্র হয়ে বৃষ্টির জন্য অথবা রাক্ষসদের বিনাশের জন্য ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতার কাছে আকুল প্রার্থনা জানাত। বর্ণাশ্রম ধর্মের মত নূতন ধর্ম যেখানে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি ছিল অর্থ তাদের সহজে প্রভাবিত করতে পারে নি; তাই এই নূতন ধর্ম-ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে যারা শূদ্র ছিল বা দরিদ্র ছিল তারা এই ব্যবস্থার

বিরোধ করে ছিল। সংস্কৃতজ্ঞ মাত্রেই জানেন শূদ্রের আর একটি নাম হোল বৃষল। বৃষ অর্থে ধর্ম, যারা এই ধর্মের লোপ করে তারাই হোল বৃষল ৮।১৬। গণযুগীয় শিল্পী ও দরিদ্র দ্বিজরা কিছুতেই বুঝতে পারে নি যে একই গোষ্ঠিভুক্ত মানুষের ভিতর শুধুমাত্র অর্থের জন্যই শ্রেষ্ঠত্ব বা দ্বিবত্বের সৃষ্টি কি করে হতে পারে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য যেমন শূদ্রত্বলাভ করে ছিল, দরিদ্র ক্ষত্রিয়ও তেমনি ভাড়াটে গুণ্ডায় পরিণত হয়েছিল অর্থব্যয় করলেই তাদের সেবা ক্রয় করা সম্ভব ছিল। ৭।১৯৩।

সুতরাং এরূপ কল্পনা করা কি অযৌক্তিক হবে যে মনুপ্রবর্তিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম আর্যদের সমাজে এক নূতন প্রকারের শ্রেণী সঙ্ঘর্ষের সৃষ্টি করেছিল, যেখানে সমাজের সব সুখ সুবিধাগুলি ভোগ করত সঙ্গতিপন্ন দ্বিজ, আর দরিদ্র দ্বিজ আর শূদ্রের ভাগ্যে ছিল শুধুমাত্র দুর্ভোগ। কিন্তু কোন সমাজই মাত্র এই দুই শ্রেণী নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। যখন অর্থ ও সম্মান কতকগুলি লোকের হাতে কেন্দ্রিত হয় আর অধিকাংশের ভাগ্যে থাকে দারিদ্র্য আর ঘৃণা তখন সমাজের ভিতর এক বৈপ্লবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ বিপ্লব থেকে সমাজকে রক্ষা করতে পারে এমন এক শ্রেণী, যে আদর্শের দিক থেকে ধনিক শ্রেণীর সহগোষ্ঠী, কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে দরিদ্রের সমপর্যায় ভুক্ত। এই শ্রেণী আজকের দিনের পেটি বুর্জুয়ার মত; যারা আদর্শের দিক থেকে এরা বুর্জুয়াভাবাপন্ন অথচ আর্থিক দিক থেকে সম্পূর্ণরূপেই প্রলিটারিয়েট। একদিকে এরা বুর্জুয়ার আদর্শকে পূজা করে অন্য দিকে মেহনতী মানুষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে স্তিমিত করে রাখে। মনুও এই রকম এক শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন।

মনু থেকে উদ্ধৃত করে পূর্বেই দেখান হয়েছে যে দ্বিজত্বের মাপকাঠি ছিল বেদাধ্যয়ন। কিন্তু বেদাধ্যয়ন শুধুমাত্র শ্রমসাধ্যই ছিলনা অর্থসাপেক্ষও ছিল। সুতরাং বহু দরিদ্র দ্বিজ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বেদাধ্যয়ন থেকে বঞ্চিত হয়ে দ্বিজের পক্ষে বিপদজনক ও ছিল সুতরাং মনু দ্বিজত্ব রক্ষার এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেন—এই পন্থা ছিল ওঙ্কার ও গায়ত্রী।২।৮৩। একমাত্র গায়ত্রী জপ করেই তিনটি বেদাধ্যয়নের পুণ্য অর্জন করা সম্ভব ছিল ২।৭৮,৭৯।

এই নূতন দাওয়াইয়ের ফলে এক দিকে যেমন দ্বিজের সংখ্যা রোধ করা সম্ভব হয়ে ছিল, অন্য দিকে তেমনি হিন্দুধর্ম ও সমাজের ভিতর যে ভণ্ডামী প্রতিষ্ঠিত হয়, তা থেকে হিন্দুসমাজ আজও নিষ্কৃতি পায় নি। বেদাধ্যয়ন, জ্ঞানযোগ

কর্মযোগ আর ভক্তিতত্ত্বের কথা যতই আওড়ান হোক না কেন ভারতের হিন্দুসমাজে প্রাধান্য পেয়েছে ওঙ্কার ও গায়ত্রী। মনু যে এই নূতন দ্বিজ সমাজের সৃষ্টি করেছিলেন, সে দ্বিজ সম্প্রদায় সব কাজই করত, ন্যায়-অন্যায়ের কোন বালাই এদের ছিলনা, কারণ, গোটাকতক সাপের মন্তরের মত অর্থহীন মন্ত্র পড়েই সব পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যেত, আর দ্বিজত্বও সহজে রক্ষা করা চলত। কিন্তু মনুর যুগেই বিত্তশালী দ্বিজ এদের ঘৃণা করত। ২।১৫৭। ঠিক যেমন আজকাল বুর্জুয়া পেটি বুর্জুয়াকে ঘৃণা করে অথচ পেটি বুর্জুয়া না থাকলে বুর্জুয়া বাঁচতে পারে না।

ফলপ্রসূ শ্রমকে ঘৃণা ক'রে যখন কতকগুলা অর্থহীন ক্রিয়াকর্ম ও বাহ্যিক চিহ্ন শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায় তখন সমাজের ভিতর জটিলতার সৃষ্টি হয়ে সমাজে ভণ্ডামী প্রশ্রয় লাভ করে। ঐ অর্থহীন ক্রিয়াকর্ম ও বাহ্যিক চিহ্ন ধারণ করে সবাই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে, অনেকটা আজকের দিনের খদ্দর ও গান্ধী টুপির মত। মনুর যুগেই হিন্দু সমাজে এই ভণ্ডামী প্রশ্রয় পেয়ে ছিল। ৪।১৯৭, ২০০; ৯।২২৪, ২৬০। কিন্তু শ্রেণীস্বার্থে মনু এই ভণ্ডামীকেও সমর্থন করেছেন। ৮।২০। তাই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ন্যায় ও সত্যের নামে যতই ঢাক পিটান হোক না কেন ঐ দুইটি বস্তুই ঐ সমাজে মরীচিকা ছাড়া আর কিছু নয়। ভণ্ডামী যত বেশী ব্যাপক হয় ততই তাকে ঢাকবার জন্য গালভরা কথারও আবিষ্কার করা হয়—"...the most pitiful reality corresponds with the most high-sounding phrases..." (Anti Duhring, 359) ১২।৯৯, ১২৫, ৮।২৮১।

একটা সঙ্গত প্রশ্ন হয়ত অনেকেই জিজ্ঞাসা করতে পারেন বেদের ভিতর এমন কি যাদু ছিল যার জন্য হিন্দুসমাজ বেদাধ্যয়নের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করেছিল। যাঁরাই বেদ সম্বন্ধে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছেন তাঁরাই জানেন যে বেদ আদিম আর্য সমাজের একটি নিখুঁত ছবি। অসভ্য যাযাবর জীবন থেকে আরম্ভ করে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ভাববাদী দর্শন পর্যন্ত সবই বেদের ভিতর খুঁজলে পাওয়া যায় আর এর রচনাকাল বেশ কয়েক শতাব্দী খ্রীষ্টীয়পূর্ব, দুই কি আড়াই হাজার বছর থেকে আরম্ভ করে বুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত অন্ততঃ দুই কি দেড় হাজার বছরের মধ্যে আর্যদের জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়ে ছিল, তাদের ভাষা ও রীতিনীতিও সব পাল্টে গিয়েছিল। সুতরাং

বেদাধ্যয়ন ছিল অধিকাংশ ছাত্রের কাছে না বুঝে মুখস্থ করার মত একটা অর্থহীন ক্রিয়া, যেখানে যুক্তি নাই, একমাত্র ছিল আদেশ। আর এই জন্যই সমাজের মুষ্টিমেয় ক্ষমতায় আসীন মানুষের পক্ষে কুসংস্কার সৃষ্টির খুবই সুবিধা হয়েছিল। আজও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে "বেদে আছে" বলে সহজেই নিরস্ত করা যায়। ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন যে বেদের ব্যাকরণ প্রথম রচনা করেন যাস্ক দ্বিতীয় শতক খ্রীষ্টপূর্বে, বোধ হয় বৌদ্ধযুগের ফল স্বরূপ। আর বেদের প্রথম ব্যাখ্যা করেছেন মাধব পঞ্চম শতাব্দীতে আর সায়ন চতুর্দশ শতাব্দীতে। (আমি অবশ্য সংহিতা সম্বন্ধেই বলছি।) বেদ জনসাধারণের বোধগম্য হোলে ধর্মের নামে ভণ্ডামী করার সুবিধা হোত না, তাই বোধ হয় উপনিষদ ও ষড়দর্শনের ব্যাখ্যা হলেও বেদের ব্যাখ্যার অভাব ছিল। যে দেশে পরিবর্তনশীল "জগৎ" এর ভিতর অপরিবর্তনীয় সমাজ ব্যবস্থার কল্পনা করা হয় সেখানে সবই সম্ভব।

বড়ই দুঃখের কথা আজ অবধি ভারতের বাস্তব ইতিহাসের সৃষ্টি হয় নি। যাঁরা ইতিহাস আলোচনা করেন তাঁরা প্রাচীন ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে ইংরাজ ঐতিহাসিকের মতই কোন রাজা কোন দিন কি খেয়েছিলেন, কোন পাশ ফিরে ঘুমিয়েছিলেন তাই অনুসন্ধানেই ব্যস্ত, আর এইগুলিই বিদগ্ধ সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়। শুধুমাত্র রিচুয়ালিজম বা বুদ্ধের বাণীই সমাজ বিপ্লব আনতে পারে না, বা শুধুমাত্র ভৌগলিক কারণে-ই কোন সমাজের অগ্রগতি রুদ্ধ হতে পারে না। তার একটা অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রয়োজন। কুসীদ বৃত্তির মাধ্যমে বর্ণাশ্রমধর্ম যে অবাধ লালসাকে উৎসাহিত করে দাস সমাজের সৃষ্টি করেছিল তার পতন গ্রীস ও রোমের মতই নিশ্চিত ছিল। মনু ধার্মিক ভাবে যে অবাধ শোষণকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, সেই ধর্মই ভারতের অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছিল। Marx বলেছেন. "—And this usurer's capital impoverishes the mode of production, paralyses the productive forces instead of developing them, and at the same time perpetuates the miserable conditions in which the social productivity of labour is not developed at the expense of labour itself, as in the capitalist mode of production" (Capital vol III P. 582)

আমাদের দেশের ধর্মগ্রন্থগুলির যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হয়েছে—এমন কথা অন্ততঃ আমার জানা নাই। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সেই মান্ধাতার কালেই সত্যকে যে "নিহিতং গুহায়াং" করেছিলেন, সেই সত্যের মুক্তি আজও হয় নি। আজকের দিনে বরং তাকে হত্যা করবার তোড়জোড়ই চলেছে। কারণ সত্যের উদ্ঘাটন হলে শোষক শ্রেণীর বিপদই ঘনীভূত হয়। এই সম্বন্ধে শ্রী ডাঙ্গের একটা উক্তি দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করছি।

"When the famous historian Rajwada began to write his great work on the development of family and marriage among the Hindus by utilising the Vedic, Bharat and Puran texts and researches of European writers amongst the aboriginal tribes alive today, the Hlndu Marathi press in the Maharashtra and the Hindu orthodoxy raised a howl against the publisher and the writer". (Dange : From Primitive Communism to Slavery P. 21) এবং "The story of the theft of Jayswal's famous manuscript on the ancient Indian Gaua Sanghas and republics, the sabotage of its publication is well known to the students of history."—(Ibid, Footnote)

আহারের পর
দিনে দু'বার..

সব ঋতুতে
স্বাস্থ্য লাভের
শ্রেষ্ঠ উপায়

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

সাধনা ঔষধালয় ⊙ ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়াল পাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি;এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

॥ পৌষ—১৩৬৮ ॥

প্রবন্ধ পত্রিকা

বর্ষ ২, সংখ্যা ৯ ॥ পৌষ ১৩৬৮ ॥ জানুয়ারী ১৯৬২

॥ সূচীপত্র ॥

রথীন্দ্রনাথ রায় ॥ ১—১০ ॥ 'ঘরে বাইরে'
অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ১১—২৫ ॥ আদিবাসী সমাজ-জীবনের স্বরূপ
বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ॥ ২৬—৫৪ ॥ ভক্তিরসরাজ ত্যাগরাজ
সুভাষ সরকার ॥ ৫৫—৬৬ ॥ কাব্যনাট্য ও 'চার চোখ'
চিত্তরঞ্জন ঘোষ ॥ ৬৭—৭৪ ॥ রবীন্দ্রোত্তর নাটক : ভূমিকা
গিরিশংকর ॥ ৭৫—৮৫ ॥ রক্তকরবীর শিল্পরূপ
গৌতম চট্টোপাধ্যায় ॥ ৮৬—৯০ ॥ 'এক্ষণ' : ইতিহাস সংখ্যা
অশোক মুস্তাফি ॥ ৯১—৯৮ ॥ একজন বিস্মৃত চিন্তানায়ক ও স্ত্রীস্বাধীনতা
বিশ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ॥ ৯৯—১০৪ ॥ বিজ্ঞানশিক্ষা ও রবীন্দ্রনাথ
দেবীপদ ভট্টাচার্য ॥ ১০৫—১০৬ ॥ হেমিংওয়ে প্রসঙ্গে

প্রচ্ছদশিল্পী
সুবোধ দাশগুপ্ত

সম্পাদক
রামেন্দু দত্ত । চিত্তরঞ্জন ঘোষ

এক টাকা

প্র কা শি ত হ য়ে ছে

ফ স ল

গল্প সংখ্যা

লিখেছেন

অন্নদাশঙ্কর রায়
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
বিমল কর
শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
দেবেশ রায় ইত্যাদি

কলেজ ষ্ট্রীটে পারিজা ব্রাদার্সে পাওয়া যাবে।

ফ স ল
৩৭, কামিনী স্কুল লেন,
কলিকাতা। (হাওড়া)

প্রবন্ধ পত্রিকা

মাঘ সংখ্যার সম্ভাব্য সূচী

॥ বিশেষ আকর্ষণ ॥

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও জীবনানন্দ দাশের অপ্রকাশিত রচনা

॥ সাহিত্য ॥

রথীন্দ্রনাথ রায় : 'ঘরে বাইরে'

দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য : উপন্যাস ও প্রিস্টলে

সুনীল চক্রবর্তী : তারাশংকরের গল্প

॥ ইতিহাস ॥

অশোক মুস্তাফি : স্ত্রীস্বাধীনতা আন্দোলন প্রসঙ্গে

অধীর চক্রবর্তী : ভারতীয় সমাজেতিহাস পাঠের ভূমিকা

॥ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ॥

বাসব সরকার : ব্যক্তি ও রাষ্ট্র

॥ পত্রিকাপ্রসঙ্গ ॥

গুরুদাস ভট্টাচার্য : 'একতা'

এ ছাড়া থাকবে গ্রন্থপ্রসঙ্গ ও পুনর্মুদ্রণ।

দাম এক টাকা ॥ বার্ষিক বারো টাকা

প্রকাশ আসন্ন

ফসল প্রকাশনীর
প্রথম বই

নিতাই বসুর

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁর জীবনটাই একটা ট্রাজেডি হয়ে ওঠে কেননা সামাজিক ভালো মন্দের সংগে ব্যক্তিক অনুভূতি খাপ খায় না। সেই ট্রাজেডিই যে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং সেই আমরন জীবনই যে নাটকের উপজীব্য, সেই নাটকের উপজীব্য, সেই নাটকের মৃত্যুঞ্জয়ী নায়ক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এ এক পরম আশ্চর্য। অন্তত আমাদের নিরুদ্বিগ্ন জীবনের নিরবচ্ছিন্ন একঘেয়েমির কাছে এ নায়কের নীলকণ্ঠ-বৃত্তি এক অদ্ভুত বিস্ময়ের দ্যোতক। প্রতিভা ছিল, অর্থপ্রাপ্তির সুবিধা ছিল, জীবনে সুখী হওয়াও যার কাছে মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না, সেই নায়কের জীবনের যবনিকা পতন হোল কিনা এক চরমতম আত্মক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে। আত্মযন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে।

বোধ হয় এই পরিণতিই তাঁর পক্ষে অনিবার্য ছিল। যিনি জীবনে ন্যায় ও অসত্যের সংগে আপোষ করে চলতে শেখেন নি, নিজের সাধনার বৃহত্তম মূল্যকে যিনি একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, যন্ত্রনা ও বেদনা নিত্য সংগী হয়েও যাকে সারস্বত-সংগ থেকে কখনো বিচ্যুত করতে পারেনি, খ্যাতির মোহ

খাতিরের লোভে যাঁর সুতীব্র দাসীন্য, সেই বৈরাগ্য সাধকের জীবনের পটভূমিতে আনন্দ বিলাসের কোন চিহ্ন থাকে না।

ফসল প্রকাশনী
৩৭ কামিনী স্কুল লেন
সালকিয়া, হাওড়া

প্রবন্ধ পত্রিকা

বর্ষ ২, সংখ্যা ৯ ॥ পৌষ ১৩৬৮ ॥ জানুয়ারী ১৯৬২

ঘরে-বাইরে

রথীন্দ্রনাথ রায়

'ঘরে-বাইরে' 'সবুজ পত্র' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রিত হয়েছিল (বৈশাখ-ফাল্গুন, ১৩২২)। উপন্যাসখানি যখন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়, তখন থেকেই কবিকে নানা বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পরেও কিছুকাল পর্যন্ত সেই বিতর্কের ধারা অব্যাহত ছিল। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনো উপন্যাস নিয়ে এমন দীর্ঘস্থায়ী ও জটিল বিতর্কের সৃষ্টি হয় নি। এর কারণ নির্ণয় করাও মোটেই দুরূহ নয়। 'গোরা'র পর থেকে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে নূতন পদ্ধতি ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নূতন বক্তব্যেরও অবতারণা করেছেন। বাংলা উপন্যাসের এই চালচলন যেমন নূতন, তেমনি আকস্মিক। কারণ গল্পরস-প্রধান ভিক্টোরীয় উপন্যাসের কথাবিস্তার ও মন্থরগতি এখানে অনুপস্থিত। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সহজেই অনেকখানি এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন। তাঁর সামনে সেখানে কোনো আদর্শ ছিল না, সবটাই তাঁর নিজের তৈরি করে নিতে হয়েছে। এতে যত অসুবিধাই হোক না কেন, অবাধ স্বাধীনতা ছিল, সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে অনেকদিন পর্যন্ত উনিশ শতকীয় উপন্যাসের আঙ্গিক তাঁর মানতে হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের যে আঙ্গিক ও পরিসর নির্দেশ করেছিলেন, সেই কক্ষপথে তাঁর চলতে হয়েছিল। 'গোরা' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের ক্ষেত্রে পুরনো আঙ্গিকের 'ট্র্যাডিশন' ধরেই অগ্রসর হয়েছিলেন।

'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে-বাইরে' মূলত 'সবুজপত্র' পর্বের ফসল। কথাশিল্প রচনায় কবি নূতন রূপ ও রীতির পরীক্ষা শুরু করেছেন। গল্পরসের ঘনবদ্ধতা ও পল্লবিত কথা বিস্তার এখানে বর্জিত হয়েছে। এই সময়ে তিনি প্রমথ চৌধুরীর কাছে একটি চিঠিতে তাঁর এই পর্বের গল্পগুলি সম্পর্কে যা লিখেছিলেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: "গল্প লিখতে বসেছি কিন্তু লেখার এত ব্যাঘাত যে কি লিখছি ও কি লিখতে হবে সেটা বারবার করে ভোলবার জো হয়েছে। গল্প

এমনতর খাব্‌লা খাব লা করে লিখলে তার জোড় মেলানো শক্ত হয় এবং তার ফাটলগুলো দিয়ে রস বেরিয়ে যায়। যাই হোক্ আমার এই লেখাগুলি গল্প-পিপাসু পাঠকদের বেশ ঢক্ ঢক্ করে খাবার মত হচ্চে না—এগুলো গল্প না বললেই হয়।"*

এই পর্বের গল্পগুলি সম্পর্কে কবির মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। গল্পগুলিতে যে গল্পরসের ঘনবদ্ধতা অনুপস্থিত, এ কথা কবি প্রকারান্তরে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বক্তব্যকে তীক্ষ্ণ করে অভিনব আঙ্গিক সৃষ্টির দিকেই কবির দৃষ্টি প্রধানত নিবদ্ধ হয়েছে। 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে-বাইরে'—উপন্যাস দুটিতেও কবি উপন্যাসের ক্ষেত্রে নব্যরীতির পরীক্ষা করেছেন। পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলির তৃপ্তিদায়ক নিটোল গল্পরস পরবর্তী উপন্যাসগুলির মধ্যে মিলবে না। ঘটনার ভীড় এখানে কমে এসেছে, তার স্থান অধিকার করেছে অলঙ্কৃত বাগবিভূতি, আকস্মিকতার চমক ও কয়েকটি তীক্ষ্ণচূড় উজ্জ্বল মুহূর্ত। উপন্যাসের মন্থর বিশ্লেষণ ও তথ্যসন্নিবেশের চেয়ে কাব্যময় ব্যঞ্জনার দিকেই কবির অধিকতর আকর্ষণ। বুদ্ধির তীক্ষ্ণ কঠিন ঔজ্জ্বল্য সূচ্যগ্র বাগ্‌ভঙ্গিকে অধিকতর প্রদীপ্ত করে তুলেছে। শুধু বর্ণনায় ও বিবৃতিতেই নয়, সংলাপের ভাষার মধ্যেও একই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম আগাগোড়া চলতি ভাষা ব্যবহার করেছেন। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসেই কবি এই পথে অনেকখানি এগিয়ে-ছিলেন। এই উপন্যাসখানির বহিরঙ্গ সাধু ভাষার হলেও এর অন্তরঙ্গ মেজাজ চলতি ভাষারই। সাধু ভাষার কাঠামো যেন চলতি ভাষার রূপে ও রসে সুচিক্কণ হয়ে উঠেছে। এ ভাষার ফ্রেম দৃঢ়-শাসনের, কঠিন সংহতির, অথচ এর লীলা কত লঘু, চলার ভঙ্গি কত দ্রুত! তবু চতুরঙ্গ কবির সাধু ভাষায় লেখা শেষ উপন্যাস। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে যেন কবি সাধু ভাষার মধ্যে চলতি ভাষার মেজাজ সঞ্চারিত করা যায় কি না তার শেষ পরীক্ষা করেছেন। তাই এখানকার ভাষা ও সংহত অনুচ্ছ্বসিত। মনের মধ্যে চলতি ভাষার বেগ এসেছে, তাকে সাধু ভাষার বাঁধ দিয়ে বাঁধা হলো। 'ঘরে-বাইরে'তে সে বাঁধ আর নেই, তাই চলতি ভাষার অবরুদ্ধ ধারা এখানে উল্লাসে উদ্দীপনায় মুখর হয়ে উঠেছে।

বন্ধন মুক্তির প্রাথমিক বেগের দুর্বার প্রাবল্য এখানে বিদ্যমান। 'চতুরঙ্গ'-এ

* চিঠি-পত্র, পঞ্চম খণ্ড (২৬ নং)

যে বাঁধন দেওয়া হয়েছিল—সাধু ভাষার কঠিন বাঁধন, এখানে তার উদ্ধত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। ঝড়ের উন্মত্ত বেগে, বাতাসের ঘূর্ণিনৃত্যে বাঁধভাঙার উল্লাস ছড়িয়ে পড়ল। এখানে মনে রাখতে হবে যে, সবুজপত্রের যুগে সাধুভাষা ও চলতি ভাষা নিয়ে প্রচুর তর্কবিতর্ক হয়েছে। সেই বিতর্কে কবি চলতি ভাষাবাদীদের পক্ষ নিয়েছিলেন। 'ঘরে-বাইরে' লিখে তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে, চলতি ভাষায় পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রচনা করাও সম্ভব। বন্ধনমুক্ত চলতি ভাষার উল্লসিত আত্মপ্রকাশের সঙ্গে এই ভাষাকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়ার সচেষ্ট আকাঙ্ক্ষাও ছিল। তাই এই ভাষায় সংহতি ও সংযমের অভাব—বাগ্‌বিভূতি সৃষ্টির নেশা যেন কবিকে পেয়ে বসেছে। বিশেষণের বাহুল্য ও অলঙ্কারের চমক কখনো কখনো বক্তব্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

'ঘরে-বাইরে' রচনারীতির দিক থেকেও বৈশিষ্ট্য দাবি করতে পারে। কবি এখানে উপন্যাস রচনার প্রচলিত পদ্ধতি অবলম্বন করেন নি। উত্তম পুরুষে ডায়েরির পদ্ধতিতে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। এই ডায়েরির লেখক তিনজন: বিমলা, নিখিলেশ ও সন্দীপ। তিনজন নায়ক নায়িকার বিবৃতি জোড়া দিয়ে যেন উপন্যাসখানি রচিত হয়েছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এই রীতির পথ প্রদর্শক নন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'রজনী' উপন্যাস রচনায় এই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন। ইংরেজি উপন্যাসের গোড়ার যুগে রিচার্ডসনের 'পামেলা' পত্রাকারে রচিত উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ডায়েরি, আত্মকথা বা চিঠিপত্র—মাধ্যম যাই হোক না কেন, মূল ব্যাপারটি একই। উত্তম পুরুষে উপন্যাস রচনার দুটি ধারা থাকতে পারে। কাহিনীর কথক একজন হতে পারেন, অথবা একাধিক ব্যক্তিও হতে পারেন। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস বিন্যস্ত হয়েছে শ্রীবিলাসের জবানীতে, শ্রীবিলাসের দৃষ্টিতেই ঘটনা পর্যায়ের উন্মোচন হয়েছে। ঘরে-বাইরের পদ্ধতি চতুরঙ্গের মতোও নয়—এখানে নিখিলেশ, বিমলা ও সন্দীপ তিনজনই ডায়ারির লেখক, তারা আত্মকথা বলেছে। এই নূতন পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে উপন্যাসের উৎকর্ষ ঘটে নি, বরং নূতন সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কথকতার এই ভঙ্গি ছোটগল্পের ক্ষেত্রে সার্থক হলেও দীর্ঘ উপন্যাসের পক্ষে সার্থক হওয়ার অনেক বাধা আছে। প্রত্যেকটি চরিত্রকে সর্বজ্ঞ করে তুলতে হয়, একজন কাহিনীর যতটুকু বলেন, পরের কথককে তার সূত্র ধরে গল্পকে এগিয়ে নিতে হয়। বহু বক্তার বক্তব্যকে জোড়া দিয়ে আরব্য

উপন্যাসের মতো গল্পমালা রচিত হতে পারে, কিন্তু উপন্যাস গড়ে তুলতে হলে তার মধ্যে ফাঁক থাকার সম্ভাবনা ঘটে। অবশ্য 'আত্মকথা'য় নায়ক-নায়িকা নিজেদের হৃদয়কে অকপটে উদ্ঘাটিত করতে পারে। কিন্তু সুদীর্ঘ উপন্যাসের পক্ষে এই পদ্ধতির কৃত্রিমতাকেও অস্বীকার করা যায় না। মনে হয় যেন সকলেই যুক্তি করে ডায়েরি লিখতে বসেছেন, কে কতদূর পর্যন্ত বলেছেন, তা যেন অন্য ডায়েরি লেখকদের নখদর্পণে। এই প্রসঙ্গে চেকভের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

I am of the opinion that the epistolary form is an antiquated affair. It is all right when the gist of the matter is in the letters themselves (e. g., in the case of a district policeman who loves letter-writing), but as a literary form it is no good in many respects : it puts the author into frame,—that is its main weakness.*

'ঘরে-বাইরে'র মতো উপন্যাস এই পদ্ধতিতে না লিখলেই ভালো হত।

॥ ২ ॥

সে যুগে ঘরে-বাইরের প্রধান আলোচ্য ছিল এর বিষয়বস্তু। এর বিরুদ্ধে যে আপত্তি উঠেছিল, তার দুটি দিক ছিল : একটি সামাজিক, আর একটি রাজনৈতিক। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাস প্রসঙ্গে একাধিকবার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। উপন্যাসটির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে সমস্ত বিতর্ক উত্থিত হয়েছিল, তা আলোচনা করতে হলে যে তিনটি চরিত্র অবলম্বন করে কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে, তাদের সম্পর্ক-বৈচিত্র্য আলোচনার প্রয়োজন।

ঘরে-বাইরে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিমলা। বিমলার 'আত্মকথা' দিয়েই কাহিনীর সূত্রপাত। প্রথম আত্মকথার মধ্যেই কাহিনীর মূল অভিপ্রায় লক্ষণীয়। তা ছাড়া প্রথম আত্মকথার মধ্যেই সন্দীপের সঙ্গে পরিচয়ের আগে বিমলার পরিবেশ ও নিখিলেশের সঙ্গে তার সম্পর্কের একটি চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। মায়ের ভক্তি-বিনম্র স্নিগ্ধ মূর্তি বিমলার বাল্য-কৈশোর জীবনের মধ্যে,

* Letter to N. A. Leikin (4 March 1885), Letters on Literature (1924), ed. Louis S. Friedland.

মধু সিঞ্চিত করেছে। সারেক নিয়মে বাঁধা শ্বশুর পরিবারের মধ্যে স্বামী নিখিলেশ একালের মানুষ, তার বিদ্যাবত্তা ও মানসিকতা ও একালের আলো-হাওয়ায় পুষ্ট। যে অভিজাত পরিবারের ছোট ছেলে নিখিলেশ, সেখানে মদের ফেনা ও নটীর নূপুর নিক্কণের ছন্দেই পুরুষদের ভোগসঙ্কুল জীবন আবর্তিত হতো। নিখিলেশ তার উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বিমলার মন স্বামীকে পূজো করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত, কিন্তু নিখিলেশের কোনো প্রশ্রয় ছিল না সেখানে, বিমলাই তার মত জানিয়েছে ঃ

> আমার স্বামী বরাবর বলে এসেছেন, স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ।

স্ত্রীকে বাইরে বের করতে নিখিলেশের উৎসাহ ছিল। তার এই আদর্শ নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বিমলা তার স্বামীর মত সম্পর্কে বলেছে ঃ

> এ কথা নানা রকম নানা আকারে বার বার উঠেছে। তিনি বলতেন, যে পেটুক মাছের ঝোল ভালোবাসে সে মাছকে কেটে কুটে সাঁতলে সিদ্ধ করে মসলা দিয়ে নিজের মনের মতোটি করে নেয়, কিন্তু যে লোক মাছকেই সত্য ভালোবাসে সে তাকে পিতলের হাঁড়িতে রেঁধে পাথরের বাটিতে ভরতি করতে চায় না—সে তাকে ছাড়া জলের মধ্যেই বশ করতে পারে তো ভালো, না পারে তো ডাঙায় বসে অপেক্ষা করে—তার পরে যখন ঘরে ফেরে তখন এইটুকু তার সান্ত্বনা থাকে যে, যাকে চাই তাকে পাই নি, কিন্তু নিজের শখের বা সুবিধার জন্যে তাকে ছেঁটে ফেলে নষ্ট করি নি। আস্ত পাওয়াটাই সব চেয়ে ভালো, নিতান্তই যদি তা সম্ভব না হয় তবে হারানোটাই ভালো।

এই স্বীকৃতির আলোকে নিখিলেশের জীবনদর্শন উদ্ভাসিত হয়েছে। ঠিক এই সময়েই এলো বাংলা দেশে স্বদেশী যুগের বন্যা। বিমলার সীমার মধ্যে দূরদিগন্তের আহ্বান এসে পৌঁছলো। নিখিলেশ দেশের প্রয়োজনের জিনিস দেশেই উৎপন্ন করা'র কাজে সচেষ্ট হলো, বিমলাকে পোলিটিক্যাল ইকনমি পড়াতে শুরু করলো। কিন্তু বিমলার বিলাতি জিনিস পোড়ানোর প্রস্তাবে সে প্রথম থেকেই রাজি হতে পারে নি।

সন্দীপ সম্পর্কে বিমলার মনোভাব উপন্যাস বিচারের একটি প্রয়োজনীয় অংশ। এক সময় সন্দীপের দাবি যখন তার স্বামী বিনা দ্বিধায় পূরণ করতো, তখন বিমলার ভালো লাগে নি। প্রথম দর্শনেও সন্দীপের চারিত্রিক স্থূলত্ব

তার দৃষ্টি এড়ায় নি। কিন্তু সন্দীপের বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া তার মনে এক অগ্নিদীপ্ত রসোল্লাসের সৃষ্টি করেছে। বিমলা বুঝতে পেরেছে যে তারই মুখের দীপ্তি সন্দীপের ভাষাকে বহ্নিমান করে তুলেছে। আত্মপ্রসাদ ও একটি মূঢ় বীর পূজার গৌরবে বিমলার মন ভরে উঠেছে ঃ

> সেদিন একটা অপূর্ব আনন্দ ও অহংকারে দীপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলুম। ভিতরে একটা আগুনের ঝড়ের বেগ আমাকে এক মুহূর্তে এক কেন্দ্র থেকে আর এক কেন্দ্রে টেনে নিয়ে গেল। আমার ইচ্ছা করতে লাগল গ্রীসের বীরাঙ্গনার মতো চুল কেটে দিই ওই বীরের হাতে ধনুকের ছিলা করবার জন্য—আমার এই আজানুলম্বিত চুল। যদি ভিতরকার চিত্তের সঙ্গে বাইরেকার গয়নার যোগ থাকত তাহলে আমার কণ্ঠি আমার গলার হার আমার বাজুবন্ধ উল্কাবৃষ্টির মতো সেই সভায় ছুটে ছুটে খসে খসে পড়ে যেত।

বিমলার সন্দীপের প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির তুলনায় তার স্বামীর নিরুত্তাপ ভূমিকাকে দুর্বলতা বলে মনে হয়েছে। সন্দীপের মাদকতা তার মনে মোহাবেশ সৃষ্টি করেছে। বিমলা যেন নূতন করে তার ব্যক্তিত্বের মূল্য পেলো। সন্দীপের স্তুতিবাদের মধ্যে সে নিজেকে আবিষ্কার করলো, তার রূপারতির মন্ত্রে সে হলো সুন্দরী, তার নির্ভরতায় সে হলো শক্তিময়ী, ব্যক্তিত্বের এই নূতন উদ্ঘাটন তার মনে এক প্রবল আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করেছে ঃ 'আমি পারি, সমস্তই পারি, আমার মধ্যে একটা দিব্যশক্তি এসেছে—সে এমন একটা কিছু, যাকে ইতিপূর্বে আমি অনুভব করি নি, যা আমার অতীত।' এই তীব্র উন্মাদনার মুহূর্তে বিমলা কখন যে তার স্বামীর কক্ষপথ থেকে সরে এসেছে, তা সে নিজেও উপলব্ধি করতে পারে নি। সন্দীপ তার আচার আচরণের মধ্য দিয়ে তার বিকৃত রূপটিকে স্পষ্ট করে তুলেছে। বিমলাও সন্দীপের এই মূর্তি ধরতে পেরেছে ঃ 'এও আমি, প্রথমে না হোক ক্রমে ক্রমে জানতে পেরেছি যে, সন্দীপের মধ্যে যে-জিনিসটাকে পৌরুষ বলে ভ্রম হয়, সেটা চাঞ্চল্য মাত্র।' তবু সন্দীপ যখন সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, তখন আত্মসংবরণ করার শক্তি তার হারিয়ে যায়।

বিমলা-সন্দীপের দোলাচল সম্পর্কের মধ্যে আর একটি নূতন সমস্যা এসে উপস্থিত হয়েছে। অর্থকে অবলম্বন করে সন্দীপের লুব্ধতা ও অসংযত আত্মপ্রকাশ বিমলার মোহাবেশকে নির্মমভাবে আঘাত করেছে। স্বামীর সিন্দুক

থেকে বড়োরাণী মেজোরাণীর টাকা চুরি করতে গিয়ে তার মনে যে নীতিবোধ ও অনুশোচনা জাগ্রত হয়েছিল, তা সন্দীপের মোহপাশ মুক্তির অন্যতম কারণ হিসাবে গ্রাহ্য। শীতের অন্ধকার রাত্রি ও আকাশের তারা বিমলার মানস প্রতিক্রিয়ার একখানি সুন্দর ছবি এঁকেছে :

> আমি ছাদের উপর শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম—দেশের নাম করে ওই তারাগুলি যদি একটি একটি মোহরের মতো আমাকে চুরি করতে হত—অন্ধকারের বুকের মধ্যে সঞ্চিত ওই তারাগুলি—তার পরদিন থেকে চিরকালের জন্যে রাত্রি একেবারে বিধবা,—নিশীথের আকাশ একেবারে অন্ধ,—তা হলে সে চুরি যে সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি হত। আজ আমি এই যে চুরি করে আনলুম, এও তো টাকা চুরি নয়, এ যে আকাশের চিরকালের আলো চুরিরই মতো—এ চুরি সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি,—বিশ্বাস চুরি, ধর্ম চুরি।

আসল কথা, বিমলার মোহভঙ্গের বীজ তার চরিত্রের অন্তরালেই নিহিত ছিল। আকস্মিক ঝড়ের মতো সন্দীপের আবির্ভাব তার চরিত্রের ভারসাম্য বিচলিত করেছিল বটে, কিন্তু পুনরুদ্ধারের সংকেতও এই চরিত্রেরই মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে। বাইরের দিক থেকে দুটি প্রধান কারণ বিমলার প্রত্যাবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছে। প্রথমত, সন্দীপের স্বরূপ বিমলার কাছে ধরা পড়েছে; দ্বিতীয়ত, অমূল্যর আবির্ভাব। সন্দীপের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পরও বিমলা সম্পূর্ণভাবে দ্বিধামুক্ত হতে পারে নি। ন'বছর আগের দিনটিতে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা জেগেছে, কিন্তু সেখানেও দ্বিধার শৃংখল বেজে উঠেছে :

> ওগো, এই জগতে কোন্ দেবতার পায়ে মাথা কুটে মরলে সেই বউ চন্দন-চেলি পরে সেই বরণের পিঁড়িতে এসে দাঁড়াতে পারে? কতদিন লাগবে আর—কত যুগ, কত যুগান্তর—সেই ন'বছর আগেকার দিনটিতে আর একটি বার ফিরে যেতে? দেবতা নতুন সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু ভাঙা সৃষ্টিকে ফিরে গড়তে পারেন এমন সাধ্য কি তাঁর আছে?

'ভাঙা সৃষ্টিকে ফিরে গড়া'র জন্যই অমূল্যর প্রয়োজন ছিল। তার মতো অবলম্বন না পেলে বিমলার পক্ষে পুরাতন পথে ফিরে আসা দুঃসাধ্য ছিল। পুরাতনের সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে, তাকে বিমলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে চায়—অথচ সন্দীপের ক্লেদাক্ত অথচ জোরালো বন্ধনকে কাটানোর ক্ষমতা যেমন

তার ছিল না, তেমনি ছিল না সরাসরি অতিক্রম করার উপায়। তাই অমূল্যকে অবলম্বন করে সে তার পুরাতন মূল্যবোধ ফিরে পেতে চেয়েছে। স্নেহ-বাৎসল্য ও শুভবুদ্ধিই তাকে পুরাতন পথে ফিরতে সাহায্য করেছে। কিশোর অমূল্যকে পেয়ে তার দীর্ঘকাল সঞ্চিত স্নেহ বুভুক্ষা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, তার প্রবাহে সন্দীপ ভেসে গিয়েছে। অমূল্য বিমলার সঙ্গে নিখিলেশের পুনর্মিলনের পথকেই প্রশস্ত করে দিয়েছে।

নিখিলেশ ও সন্দীপ—দুই বিরুদ্ধ প্রকৃতির পুরুষের বিপরীতমুখী আকর্ষণ লীলায় বিমলার অন্তর্জীবন গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছে। এই দুই কোটির মধ্যে সন্দীপের আকর্ষণ প্রধানত তার ব্যক্তিত্বের ও প্রবল মতবাদের। কিন্তু নিখিলেশের আকর্ষণ তার ব্যক্তিত্বের বা মতবাদের নয় - সে আকর্ষণ বিমলারই সংস্কার ও নীতিবোধের। নিখিলেশের প্রতি বিমলার ভক্তি-বিনম্র মনোভাবের মধ্যে নারীচিত্তের যুগযুগান্তের সংস্কারই কার্যকরী হয়েছে। নিখিলেশের মতবাদ বা তার নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিত্বের কাব্যধর্মী উদার অভিব্যক্তি—কোনোটিই বিমলার মনে ছায়াপাত করে নি। মায়ের নজিরেই সে স্বামীকে পূজার সামগ্রী করে তুলতে চেয়েছিল, স্বামীর ব্যক্তিত্বের কোনো গূঢ় আকর্ষণ তাকে নিয়ন্ত্রিত করে নি। আত্মকথার প্রারম্ভেই বিমলা বলেছে :

> ভক্তির আপন সৌন্দর্যে সমস্তই কেমন সুন্দর হয়ে ওঠে সে আমি ছেলেবেলায় দেখেছি। মা যখন বাবার জন্যে বিশেষ করে ফলের খোসা ছাড়িয়ে সাদা পাথরের রেকাবিতে জল খাবার গুছিয়ে দিতেন, বাবার জন্যে পানগুলি বিশেষ করে কেওড়া-জলের ছিটে দেওয়া কাপড়ের টুকরোয় আলাদা জড়িয়ে রাখতেন, তিনি খেতে বসলে তালপাতার পাখা নিয়ে আস্তে আস্তে মাছি তাড়িয়ে দিতেন, তাঁর সেই লক্ষ্মীর হাতের আদর, তাঁর হৃদয়ের সেই সুধারসের ধারা কোন্ অপরূপ রূপের সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত সে যে আমার সেই ছেলেবেলাতেও মনের মধ্যে বুঝতুম।

বিমলা চরিত্রের এই বিপরীত আকর্ষণ সমান শক্তিশালী এ কথা বলা যায় না। চরিত্রটির উপস্থাপনা, চিরাচরিত সংস্কার ও নীতিবোধ, ঘরের গণ্ডি অতিক্রম করার দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব প্রভৃতি অনেকগুলি প্রবল শক্তি সন্দীপের মোহাবেশ ছিন্ন করতে সাহায্য করেছে।

॥ ৩ ॥

'ঘরে-বাইরে' শুধু টেক্‌নিকের দিক থেকেই নয়, বক্তব্যের দিক থেকেও পরীক্ষামূলক উপন্যাস। নিখিলেশ চরিত্রের মধ্য দিয়ে কবি একটি দুঃসাহসিক পরীক্ষা করেছেন। বিমলার প্রথম আত্মকথাতেই নিখিলেশের বিশিষ্ট আইডিয়া আত্মপ্রকাশ করেছে: "আমার স্বামী বলে এসেছে, স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ।" তাই বিমলার মন যখন তাকে পূজা করতে উন্মুখ হতো, তখন সে পূজার অবকাশ দিতে চাইতো না। তার মত ছিল: "ভীর্থের অর্থ পিশাচ পাণ্ডা পূজার জন্যে কাড়াকাড়ি করে, কেন না সে পূজনীয় নয়; পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূজা দাবি করে থাকে।" নিখিলেশ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পূজারী—বিমলাকেও নিখিলেশ শৃংখলমুক্ত করতে চেয়েছে। শৃংখলমুক্ত বিমলার কাছে তার স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার কতখানি মূল্য তা সে যাচাই করতে চেয়েছে। মানুষের পূর্ণ মুক্তরূপ সত্যরূপে দেখতে হলে তার উপর নগদ দাবি ছেড়ে দিতে হয়। তাই সে বিমলার বন্ধনমুক্ত স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা কি ভাবে তাকে গ্রহণ করবে, তা সে যাচাই করতে চেয়েছিল। নিখিলেশের এই পরীক্ষার অভিনবত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু শুরু থেকেই সেখানে সংকট দেখা দিয়েছে। তাই প্রথম থেকেই নিখিলেশের উক্তির মধ্যে আশাভঙ্গের বেদনা ধ্বনিত হয়েছে:

> আজ পর্যন্ত বিমল এক জায়গায় আমাকে কোনোমতেই বুঝতে পারে নি। জবরদস্তিকে আমি বরাবর দুর্বলতা বলেই জানি। যে দুর্বল সে সুবিচার করতে সাহস করে না,—ন্যায়পরতার দায়িত্ব এড়িয়ে অন্যায়ের দ্বারা সে তাড়াতাড়ি ফল পেতে চায়। ধৈর্যের পরে বিমলার ধৈর্য নেই। পুরুষের মধ্যে সে দুর্দান্ত, ক্রুদ্ধ, এমন কি অন্যায়কারীকে দেখতে ভালোবাসে। শ্রদ্ধার সঙ্গে একটা ভয়ের আকাঙ্ক্ষা যেন তার মনে আছে।

এই আশাভঙ্গের বেদনার সঙ্গে নিখিলেশ আত্মবিচার করেছে। তার মনেও আইডিয়ার মোহজাল বিস্তৃত হয়েছিল। সে কতকগুলি দামি আইডিয়াল দিয়ে বিমলাকে সাজাতে চেয়েছিল। সেই মানসী মূর্তির সঙ্গে বিমলার মিল ছিল না। সেই মানসীকে মানস-সম্ভোগ করার দিকেই ছিল তার আকর্ষণ, বিমলা আসলে ছিল উপলক্ষ। নিখিলেশ যুক্তি দিয়ে বিষয়টিকে পরিচ্ছন্নভাবে দেখতে চেয়েছে, বিমলাকে মোহমুক্ত দৃষ্টিতে বুঝতেও চেয়েছে। বলাবাহুল্য এখানে বিমলার

ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নিখিলেশ একটি স্পষ্ট ধারণায় উপনীত হয়েছে। বিমলাকে সে স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার প্রাঙ্গনে মুক্তি দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তারই সঙ্গে আইডিয়াল দিয়েও সাজিয়েছিল। নিখিলেশের ভাবদৃষ্টিতে এই দু'য়ের সমন্বয় ঘটাই স্বাভাবিক ছিল। জিনিসটা দাঁড়ালো এই যে, নিজের আইডিয়ালে গড়া মানসী বিমলাকে (বাস্তবের বিমলাকে নয়) নিখিলেশ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উজ্জ্বল আলোক পরীক্ষা করতে চেয়েছিল। সেখানেই হলো তার পরীক্ষার প্রথম ত্রুটি। পরবর্তীকালে সে ভুল বুঝতে পেরেছে, কিন্তু তখন তার পরীক্ষণীয় বস্তুটি পরীক্ষাগারের বাইরে চলে গিয়েছে। নিখিলেশ অবস্থাকে বুদ্ধির আলো জ্বেলে বুঝতে চেষ্টা করেছে ঃ

> তা হলে আজ আমাকে সমস্ত পরিষ্কার করে দেখে নিতে হবে। মায়ার রঙে যে-সব চিত্র বিচিত্র করেছি, সে আজ খুব শক্ত করে মুছে ফেলব। এতদিন অনেক জিনিস আমি দেখেও দেখি নি। আজ এ-কথা স্পষ্ট বুঝেছি বিমলের জীবনে আমি আকস্মিক মাত্র ; বিমলের সমস্ত প্রকৃতি যার সঙ্গে সত্য মিলতে পারে সে হচ্ছে সন্দীপ। এইটুকু জানাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। কেননা আজ আমার নিজের কাছেও নিজের বিনয় করবার দিন নেই। সন্দীপের মধ্যে অনেক গুণ আছে যা লোভনীয়, সেই গুণে আমাকেও এতদিন সে আকর্ষণ করে এসেছে, কিন্তু খুব কম করেও যদি বলি তবু এ-কথা আজ নিজের কাছে বলতে হবে যে, মোটের উপর সে আমার চেয়ে বড়ো নয়। স্বয়ংবর সভায় আজ আমার গলায় যদি মালা না পড়ে, যদি মালা সন্দীপই পায় তবে এই উপেক্ষায় দেবতা তাঁরই বিচার করলেন যিনি মালা দিলেন—আমার নয়।

আইডিয়ালের পূজারী নিখিলেশ কিছুতেই তার আদর্শকে ছোট করতে রাজি নয়। নিজের দাম্পত্যজীবনের বেদনাকেও সে তার আদর্শের আলোকেই পরিমার্জিত করে তুলতে চায়। ভাদ্রমাসের বন্যায় চারদিক যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন নিখিলেশ কণ্ঠ এক অব্যক্ত বেদনার সুরে মুখর হয়—'ভরা মাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।' তার মন স্মৃতিমন্থর অতীত দিনে পরিভ্রমণ করেছে। নিখিলেশের কবিমন প্রথম মিলনের স্বপ্ন ঘিরে এবং চিরন্তন বাণী রচনা করেছে—কৈলাসে মানস-সরোবরের পদ্মবনে হরপার্বতীর মিলনের ব্যঞ্জনায় সেই মিলনের চিত্র অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছে ঃ

আমি বিমলকে বলতুম, গানকে বারে বারে আপন ধুয়োয় ফিরে আসতে হয় ;—জীবনে মিলন-সংগীতে ধুয়োই হচ্ছে এইখানে, এই খোলা প্রকৃতির মধ্যে ;—এই ছলছল-করা জলের উপরে যেখানে 'বায়ু বহে পুরবৈয়া', যেখানে শ্যামল পৃথিবী মাথায় ছায়ার ঘোমটা টেনে নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নায় কূলে কূলে কান পেতে সারা রাত আড়ি পাতছে, সেইখানেই স্ত্রীপুরুষের প্রথম চার চক্ষের মিলন হয়েছিল, দেয়ালের মধ্যে নয়,—তাই এখানে আমরা একবার করে সেই আদিযুগের প্রথম মিলনের ধুয়োর মধ্যে ফিরে আসি, যে-মিলন হচ্ছে হরপার্বতীর মিলন, কৈলাসে মানস সরোবরের পদ্মবনে।

নিখিলেশ তার আদর্শবাদের বাঁধা-সড়ক ছাড়া এক পাও যেতে পারে নি। তার নির্জন মনের নিভৃত চিন্তাও কখনো এই নির্ধারিত গণ্ডী অতিক্রম করে নি। তার চরিত্রে হৃদয়াবেগের অভাব ছিল না। কিন্তু সেই আবেগের চারপাশে এক দৃঢ়-কঠিন সংযমের বেষ্টনী ছিল। তার আদর্শবাদের সতর্ক-শাসন কখনো বিচলিত হতে দেয় নি। সন্দীপের তীব্র আকর্ষণে যখন বিমলা ভেসে চলেছিল, তখনো নিখিলেশ কোনো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে নি। বৈজ্ঞানিক যেমন নিরাসক্ত চিত্তে বীক্ষণাগারে তার পরীক্ষা চালিয়ে যান, নিখিলেশও তেমনি বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি নিয়ে তার পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাই তার ব্যক্তিহৃদয়ের কোনো স্পন্দন আত্মকথার মধ্যে লীলায়িত হয়ে ওঠে নি। এর বিরুদ্ধে দুটি প্রশ্ন হতে পারে : প্রথমত, নিজের স্ত্রী যখন জীবনের চরম সংকটের সম্মুখে উপনীত, তখনো নিখিলেশের পক্ষে অনুত্তেজিত দ্রষ্টার আসনে উপবিষ্ট থাকা কেমন করে সম্ভব হলো! নিখিলেশের রক্ত-মাংসের মানবসত্তা সম্পর্কেই সন্দেহ জাগে। আদর্শবাদ উপন্যাসে যতই থাকুক না কেন, তাকে চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত ও অন্তর্জীবনের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে জীবন্ত হতে হবে। নিখিলেশকে তাই এক আদর্শলোকবাসী ছায়াশরীরী বলে মনে হয়।

দ্বিতীয়ত, নিখিলেশ-সম্পর্কে আর-এক জাতীয় অভিযোগও উপস্থিত করা যায়। বিমলাকে সে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মুক্ত প্রাঙ্গনে পরীক্ষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই পরীক্ষার স্বরূপ বিমলা চরিত্রে কতদূর আত্মপ্রকাশ করেছে, সে বিষয় সন্দেহের অবকাশ আছে। প্রথম থেকেই নিখিলেশের পরীক্ষার ব্যর্থতা ধরা পড়েছে। বিমলা তার পরীক্ষাগারের একটি বিশেষ উপকরণে পরিণত হয়েছে।

[ক্রমশঃ]

আদিবাসী সমাজ-জীবনের স্বরূপ

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

আদিম অধিবাসী এই শব্দটি সাধারণত ভারতে উপজাতীয় লোকদের সম্পর্কে বুঝায় ঠিক ব্যুৎপত্তি গত অর্থের দিক থেকে নয়, এই শব্দটি বুঝায় সেই সব লোকদের বেলায় যারা বর্তমান সময়কার জনসাধারণের মধ্যে সেই আদিমতম কাল থেকে বসবাস করছে, অর্থাৎ আদিবাসী বলতে আমরা সেই সব লোকদের বুঝি যারা ভারতের জনসমাজে প্রাচীনতম কাল থেকে জীবন্ত রয়েছে এবং যাদের নিজস্ব সম্প্রদায়গত রীতি নীতি আচার ব্যবহার সংস্কার ও ঐতিহ্য বরাবরকার মতো এখনও বিদ্যমান রয়েছে। সর্বশেষ যে লোক গণনা করা হয়েছে তার হিসাব অনুযায়ী দেখা গিয়েছে যে আদিবাসীদের সংখ্যা ১৯০ লক্ষের চাইতেও বেশী। এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা সবাই কিন্তু একই ভাষায় কথা বলে না, সবাই এক মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সকলেই সমাজ ও সভ্যতা এক ধরণের নয়। আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেদের আচার ব্যবহার, সংস্কৃতি ও রীতি-নীতি উল্লেখযোগ্যভাবে স্বতন্ত্র ধরণের।

আদিবাসী সম্প্রদায় যেই যেই অঞ্চলে বাস করে সেই সেই অঞ্চলের ভৌগলিক সীমা রেখা অনুযায়ী তাদের তিনটি বৃহৎ গোষ্ঠীতে ভাগ করা চলে, যথা, উত্তর অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায়, উত্তর পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য ভূমিতে ও উপত্যকা সমূহে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায় এবং ভারতের পূর্ব সীমান্তে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায়। আদিবাসীদের আরও একটি দ্বিতীয় গোষ্ঠী রয়েছে যারা দক্ষিণ ভারত ও ভারতের উত্তরাঞ্চলের গাঙ্গেয় ভূমির মধ্যবর্তী স্থানে যে পাহাড় পর্যন্ত বন-জঙ্গল পরিপূর্ণ এলাকা রয়েছে তাতে বসবাস করে। এ ছাড়াও দক্ষিণ পশ্চিম ভারতে দূরে দূরে অঞ্চল জুড়ে এবং পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট অঞ্চলের পর্বতশ্রেণী জুড়ে অনেকগুলো আদিবাসী সম্প্রদায় বসবাস করছে। এই সব অঞ্চলে যতগুলো আদিবাসী সম্প্রদায় বাস করে তাদের সকলেরই ভাষা আলাদা তাদের সংস্কৃতি প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ধরনের এবং প্রত্যেকেরই দৈহিক গঠন ও শারীরিক কাঠামো এক একটি বিশেষ প্রকৃতির যদিও প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর

মধ্যেই এমন কতকগুলো বৈচিত্র্য রয়েছে যে, বৈচিত্র্যের জন্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের কোন না কোন রকমের সাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে। এই সব আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক ও আঞ্চলিক বিভেদ ও বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে তা ঠিক আকস্মিকভাবে উদ্ভূত হয় নি, যেহেতু এই সব আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকরা বাইরে থেকে এ দেশে এসেছে তাহারা এসেছে বিভিন্ন রকমের প্রাকৃতিক পরিস্থিতি, বিভিন্ন রকের উৎপত্তির স্থল এবং নানা জাতের উৎস থেকে এবং সবচেয়ে বড় কথা, তারা এসেছে ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে।

উপরে যে তিনটি আঞ্চলিক আদিবাসীর কথা উল্লেখ করা হ'ল তাদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায় প্রধানত পশ্চিমঘাট অঞ্চলে দক্ষিণাংশ জুড়ে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে বসবাস করছে। পশ্চিমঘাট অঞ্চলের এলাকা হ'ল ওয়াইনাদ থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত। যে সব আদিবাসী সম্প্রদায় দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম ঘাট অঞ্চলের ঐ অংশে বাস করে তাদের প্রাচীনতম আবাস প্রমাণ করে যে তারাই হ'ল ভারতবর্ষের বসবাসকারী সমস্ত ভারতবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো আদিবাসী, সঙ্গম যুগের প্রাচীনতম তামিল সাহিত্য থেকেই এই প্রমাণের সমর্থন উপযোগী তথ্য পাওয়া যায়, আরও প্রমাণিত হয় যে, পশ্চিমঘাট অঞ্চলের দক্ষিণাংশে এই সব বসবাসকারীরা ধীরে ধীরে অপেক্ষাকৃত সভ্য মনুষ্যদের অভিযানের দ্বারা পরাস্ত হয়ে ক্রমে আরও সরে এসেছে ঠিক ঠিক সে অঞ্চলে যেখানে তারা এখন বসবাস করছে। তাদের বর্তমান আবাস স্থল বাইরের চাপ থেকে তাদের নিরাপত্তা ও বৈশিষ্ট্য রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী বলে তারা মনে করে নেয়।

উত্তর-পূর্ব অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে কৃষ্ণা নদীর হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত যে নালাই মশই পর্বতমালা রয়েছে সেই পর্বতমালার বক্ররেখা জুড়ে বসবাস করে চেঞ্চু জাতীয় অধিবাসীরা। দক্ষিণ কানাড়া অঞ্চলের কোরাগা থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার উপর দিয়ে, কুর্গ পর্বতমালার নিম্নভাবে বসবাসকারী উরুবা সম্প্রদায় এবং ওয়াইনাদ অঞ্চলের ইরোলা, পানিয়ান এবং কুরুম্বা সম্প্রদায় এবং কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলের পর্বতমালার উপর দিয়ে কন্যাকুমারীকা পর্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত এলাকা জুড়ে যে সব আদিবাসীরা রয়েছে এবং যারা অরণ্য অঞ্চলের নিভৃত এলাকার মধ্যে বসবাস করছে তাদের মধ্যে প্রাচীনতমকালের ভারতের

আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে, কাডার, কানিক্কা, মলপন্তমম্ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আদিবাসী, এই সব আদিবাসীদের অনেকেরই একেবারে মৌলিক লক্ষণবৈচিত্র্য আজও অবধি অব্যাহত আছে

নীলগিরি পর্বতমালা অঞ্চলে বসবাসকারী টোডা, বাডাগা এবং কোটা জাতীয় আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো একটি ঘনসংবদ্ধ অর্থ নৈতিক ও সামাজিক সংস্থাকে অবলম্বন করে বিদ্যমান রয়েছে এবং তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, এই সব আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকদের জীবন ধারণের অবলম্বন হ'ল বনে বনে অরণ্যপশুর শিকার করে খাবার সংগ্রহ করে বেড়ান, এখনও পর্যন্ত এই সব সম্প্রদায় একটি স্থায়ী আবাস বেছে নেয়নি, এখনও পর্যন্ত এরা একটি সুনির্ধারিত ও গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ জীবন গড়ে তুলতে সক্ষম হয় নি, এক স্থান থেকে স্থানান্তরে আহার্যের সন্ধানে এরা আজও পর্যন্ত বিচরণ করে বেড়ায়। আহার সন্ধানের জন্য এদের হাতিয়ার হ'ল একটি মাটি খুঁড়বার শাবল এবং সামান্য আর একটি কাঠ ও লোহা দিয়ে গড়া যন্ত্র এই দুইটি সাধারণ যন্ত্রের সাহায্যে এরা বন্য ফলমূল গাছের লতাপাতা মধু ও অন্যান্য খাদ্য বস্তু সংগ্রহ করে বেড়ায়, সময়ে সময়ে এরা বনের পাখী ও ছোট ছোট জীব জন্তু ও শিকারের দ্বারা সংগ্রহ করে এবং ঐ সব জিনিসই হ'ল এদের দৈনন্দিন খাদ্য বস্তু প্রধান উপকরণ ও উপাদান। আগুন জ্বালানোর জন্য এরা পাহাড়ের সঙ্গে পাথর ঘষে বা চকমকি ঠুকে ব্যবস্থা অবলম্বন করে : মাত্র সেদিন পর্যন্তও এদের পরিধেয় ছিল গাছের পাতা দিয়ে তৈরি অথবা সবুজ ঘাস বুনট করে তৈরি এক রকমের পোষাক।

এই সম্প্রদায়ের লোকদের সামাজিক জীবন একটি দ্বৈত সংগঠনের উপর নির্ভরশীল, এদের দলের যে মোড়ল থাকে সেই হ'ল এদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি, সে মোড়ল বা প্রধান ব্যক্তি যে কোন রকম ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করে দেয় এবং এরা যখন শিকার করতে বেড়োয় তখন সকল রকমের সামাজিক অনুষ্ঠানও মোড়লের পছন্দ অনুযায়ী এরা সমাপ্ত করে। এদের পরিবারের মধ্যে মেয়েদের স্থান পুরুষের স্থানের চাইতে উঁচুতে, এদের সমাজ হ'ল প্রধানত মাতৃকেন্দ্রীক এবং এদের পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ মারুমাক্কাথ্যাম নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট-কৃত হয়। এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে কাডার জাতীয় আদিবাসীদের সমাজে একটি রীতি রয়েছে দাঁত উপড়ে ফেলার এবং শরীরের নানান জায়গায় চিহ্নিত করে সৌন্দর্য বাড়ানোর রীতি এদের মধ্যে এখনও প্রচলিত রয়েছে। এই

সব আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভাষা প্রথমে কি ছিল তা এখনও সঠিক জানা যায় না। এখনকার দিনে দেখা যায় যে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর কতকগুলো অপভ্রংশ ভাষা, যেমন মালয়ালম, তামিল, তেলেগু ও কানাড়া ভাষার অপভ্রংশ জাতীয় কতকগুলো উপভাষা এরা আজকের দিনে ব্যবহার করে। এই সব আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা যে যেই অঞ্চলে বাস করে সেই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য দ্রাবিড় ভাষার অপভ্রংশ ভাষা এরা বলা কওয়ার জন্য ব্যবহার করে থাকে, অর্থাৎ প্রতিটি আঞ্চলিক দ্রাবিড় ভাষার অপভ্রংশ সেই অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে চলিত রয়েছে।

দৈহিক গঠনের দিক থেকে এই সব আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা বেঁটে ও মাঝারি আকারের এদের গায়ের রঙ, ঘন ধূসর, চকলেট রঙের মতো, এদের নাক বেশ চওড়া ও চ্যাপ্‌টা ও ঠোঁট পুরু মাথা লম্বা এবং দেহ সুগঠিত। পার্বত্য অঞ্চলের অভ্যন্তরে যে সব আদিবাসী বাস করে বিশেষ করে কাডার, ইবোলা এবং পালোয়ান জাতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় যে এদের মাথার চুল কোঁকড়ান অথবা বাঁকা ত্যাড়াভাবে ঢেউ খেলানো, অনেকটা ম্যালানেশিয়ান সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের—মাথার চুলের মতো, কিন্তু আন্দামানে বসবাসকারী আন্দামানিজ আদিবাদের মতো নয়। আর একটি জিনিস যা খুবই উপভোগ্য-ভাবে লক্ষণীয় তা হ'ল এই সব আদিবাসী সম্প্রদায়ের দেহের রক্তের সঙ্গে ম্যালা-নেশিয়ান সম্প্রদায়ের লোকদের রক্তের খুবই নিকট মিল রয়েছে। বর্তমান সময়ে কিন্তু এই সব আদিবাসী সম্প্রদায়ের জনসাধারণ পূর্বের মতো আর অবিমিশ্র নেই, জাতিগতভাবে এদের মধ্যে আরও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে একটা মিশ্রণ ঘটেছে এবং পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে যারা খুব বেশী অভ্যন্তর-ভাবে বসবাস করে একমাত্র তাদের মধেই সেই প্রাচীনতম কালের একেবারে আদিম জাতের অধিবাসী দেখা যায়।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় গোষ্ঠীটি নর্মদা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী যে পার্বত্য শ্রেণী রয়েছে তাতে বসবাস করে। এই পার্বত্য শ্রেণী হ'ল এমন একটি কেন্দ্রীয় প্রাচীর যা দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারতকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছে এবং ঐ পর্বতমালার সুদূর প্রাচীন কাল থেকে বহু আদিম আদিবাসী গোষ্ঠী আশ্রয় নিয়েছে। এই সব আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে বারে বারে ভারতের সভ্য সমাজের লোকদের যে সব সংঘর্ষ

বিরোধ ও লড়াই ঘটেছে তার উল্লেখ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক জায়গায় রয়েছে, শুধু তাই নয় সংস্কৃত সাহিত্যের নানা কাব্যে নাটকে এই সব আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকদের চেহারারও যথার্থ বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকদের একটি বৃহৎ অংশ হ'ল এই সব অঞ্চলের আদিম মানুষরা, এদের সংখ্যা ৭০ লক্ষের মতো এবং এদের মধ্যে একমাত্র সাঁওতালদের সংখ্যাই হ'ল ২৫ লক্ষের উপর।

এই সব আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে আরও যে সব উল্লেখযোগ্য আদিম মনুষ্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা যায় যারা পূর্বঘাট পর্বতমালা থেকে উড়িষ্যার পাহাড়ী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বসবাস করে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে খোন্দ, ভূমিজ ও ভুঁইয়া জাতির আদিবাসী সম্প্রদায়। ছোটনাগপুরের সমতল অঞ্চলে বসবাস করে মুণ্ডা, উরাইন, হো, এবং বীরহোর জাতীয় আদিবাসী সম্প্রদায়। বিন্ধ্য পর্বতের আরও পশ্চিম অঞ্চলে বসবাস করে কোল এবং ভীল জাতীয় আদিবাসী সম্প্রদায়। ভীল সম্প্রদায়ের আবাস সমস্ত আরাবল্লী পর্বতমালা জুড়ে ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত বিরাট এলাকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। সাঁওতালদের পরে গোঁদ জাতীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী। গোঁদ জাতীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের আবাস গণ্ডয়ানা এলাকায় আর গোঁদ সম্প্রদায় দক্ষিণে হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী কাকা ও বস্তা অঞ্চলেও বসবাস করে সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর চারদিক জুড়ে আরও অনেক ধরণের আদিবাসী সম্প্রদায় রয়েছে যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল কোকো, আগারিয়া পরধান ও বেগা জাতীয় আদিবাসী সম্প্রদায়। বস্তার অঞ্চলের পাহাড়ী এলাকায় এমন সব আদিবাসী সম্প্রদায় বসবাস করছে যারা বসন ভূষণের পরিপাট্যে অত্যন্ত মনোহর ও সুশ্রী ধরণের, এরা হ'ল মুরিয়া, আবুজমার পর্বতমালার অধিবাসী পার্বত্য মারিয়া এবং ইন্দ্রবর্তী উপত্যকার অধিবাসী বাইসন শিং মারিয়া। দক্ষিণ অঞ্চলের আদিবাসীদের মতো এরা নিজেদের মূল কথ্য ভাষাকে বর্জন করে নি, নিজেদের সেই আদিম কালের পুরানো কথ্য ভাষা এরা আজো অবধি বজায় রেখেছে, যদিও ভীল, কোল, গোঁদ এবং ওরাউন জাতীয় আদিবাসী সম্প্রায় আর্য ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কতকগুলো ধরণের কথ্য ভাষাকে দৈনন্দিন কাজ কর্মের জন্য ব্যবহার করে থাকে। এই সব সম্প্রদায়ের মূল ভাষা, যা এখনও বহুল পরিমাণে অবিকৃত হয়ে রয়েছে তা হ'ল ভাষার

অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর মণ্ডা শাখার অন্তর্ভুক্ত, ভাষায় এই অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর নামকরণ করেছেন পি, ডাবলিউ স্মিড্‌ট সাহেব। তার নিজের দেশ অষ্ট্রিয়ার নাম অনুসারে পূর্ব এশিয়া ও ওশেনিয়া প্রভৃতি এলাকায় যে বহু সংখ্যক ভাষা বিস্তৃত ভাবে প্রচলিত রয়েছে তিনি সেই সমস্ত ভাষার অষ্ট্রিক গোষ্ঠী বলে নামকরণ করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে গোদাবরী নদীর দক্ষিণে যে সব ভাষা প্রচলিত রয়েছে সেই ভাষা সমূহ অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। অষ্ট্রিক হ'ল এমন এক ধরণের ভাষা যেন ভাষার শব্দগুলো সহজ সরল কিন্তু সরল শব্দগুলো সমাসবদ্ধ হয়ে জটিল শব্দে রূপায়িত হয় এবং প্রত্যেকটি শব্দের সঙ্গে অনেকগুলো করে উপসর্গ ও প্রত্যয় জুড়ে দেওয়া হয়ে থাকে, ভাষার মধ্যে পুংলিঙ্গ গু স্ত্রীলিঙ্গের তফাত আছে, আর শব্দের ব্যবহারের দ্বারা যে সব বস্তুকে বুঝানো হয় সেই সব বস্তুগুলোকে চেতন অথবা জড় এই দুই জাতে ভাগ করে বোঝান হয়।

সাধারণত বলা যায় এই সব আদিবাসী সম্প্রদায় দক্ষিণ ভারতের আদিবাসীদের তুলনায় উন্নতি ও পরিবৃদ্ধির অনেক উৎকৃষ্টতর স্তরে রয়েছে। এই সব অঞ্চলের আদিবাসীরা আহার্যের জন্য শিকার করা এবং যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করার বদলে চাষবাস করে থাকে যদিও তারা প্রধানত কোদাল, কুড়ুল, লাঙ্গল প্রভৃতি ছোট খাটো যন্ত্রপাতির সাহায্যেই এখনো পর্যন্ত অস্থায়ী-ভাবেই চাষবাস করে। যে সব আদিবাসী সম্প্রদায় ভারতের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে বসবাস করে এবং যারা পার্বত্য অঞ্চলের অভ্যন্তর ভাগে রয়েছে তারা ছাড়া আর অন্যান্য এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায় তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের নিকট থেকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকের বহু কিছু গ্রহণ করেছে, এমন কি হিন্দুদের অনেক রকমের রীতি নীতি আচার ও সংস্কার পর্যন্ত এরা অতি অনায়াসে সম্পূর্ণ নিজের বলে আত্মস্থ করে নিয়েছে।

আরও প্রাচীন যুগে আদিবাসী সম্প্রদায়ের জনসাধারণ শুধু মাত্র গাছের বাকল পরে থাকতো এবং আদিবাসীদের মধ্যে আরও বেশী আদিম যারা যেমন কেওনঝড় ও পল লহড়া এলাকার জোয়াং সম্প্রদায় এমন সব পোষাক পরতো যা পুরোপুরি ভাবে গাছের পাতা দিয়ে তৈরি। আজকের দিনে সেই সব আদিবাসীরাই কাপড়ের কলে তৈরি ধুতি শাড়ী পরে, ঐ সব ধুতি শাড়ী তারা তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের নিকট থেকে কিনে আনে। এই সব আদিবাসী সম্প্রদায় তাঁতে সুতো বুনে কাপড় তৈরি করতে পারে না, কিন্তু

বাঁশ ও বেত দিয়ে ঝুড়ি চুপড়ী তৈরি করা এবং কাঠ খোদাই-এর কাজে এরা খুবই সিদ্ধহস্ত। এই সব আদিবাসী সম্প্রদায় গোষ্ঠীবদ্ধভাবে সমাজ জীবন যাপন করে, তারা বসবাস করে সযত্নে তৈরি গায়ে গায়ে ঘেঁষা কুটিরে এবং এদের সমাজে এক এক জন মোড়লের পরিচালনাধীনে এরা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করে। এই সব আদিবাসীদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত অগ্রসর, শিক্ষাদীক্ষার দিক থেকে কিছুটা উন্নত, যেমন সাঁওতাল সম্প্রদায়, তাদের শুধুমাত্র যে একটি গ্রাম্য পরিষদ বা পঞ্চায়েত আছে তাই নয়, ঐ পরিষদকে বলা হয় 'ধীরি', উপরন্তু সমস্ত সম্প্রদায়ের জন্য একটি করে হাণ্ট কাউন্সিল বা সুপ্রীম কাউন্সিল রয়েছে, ঐ কাউন্সিলের সদস্যগণ সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত হন এবং ঐ কাউন্সিলের প্রধান কাজ হ'ল সাঁওতালী সমাজে এক গ্রামের সঙ্গে আর এক গ্রামের যদি কোন রকমের ঝগড়া বিবাদ হয় তবে তা মিটিয়ে দেওয়া।

সাধারণভাবে বলা যায় এই ধরণের আদিবাসীদের সমাজ মূলতঃ পিতৃকেন্দ্রিক এবং এদের সমাজে বিবাহাদির অনুষ্ঠান হয় জোর করে মেয়েকে ধরে এনে। এদের সমাজে আরও একটা মজার জিনিস আছে, আদিবাসীদের সমাজে একটি করে আবাসস্থল থাকে যার নাম হ'ল 'ধূমকারিয়া' অর্থাৎ অবিবাহিত ছেলেদের আবাস স্থল। প্রই 'ধূমকারিয়া' হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠবান যাকে অবলম্বন করে আদিবাসীদের সামাজিক জীবন গড়ে ওঠে। বাস্তার এলাকায় মুরিয়া বলে যে সব আদিবাসী আছে তাদের সমাজে এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের আরও উল্লেখযোগ্য রকমের উন্নতি হয়েছে। মুরিয়াদের সমাজে এমনি ধরণের যে আবাসস্থল, তা'কে বলা হয় 'ঘোটুল'—'ঘোটুল' জাতীয় আবাস স্থল ঐ সম্প্রদায়ের অবিবাহিত ছেলেরা (যাদের বলা হয় 'চেনিক') ও অবিবাহিতা মেয়েরা (যাদের বলা হয় 'মোতিয়ারী') বসবাস করে। ঘোটুলে বসবাসকারী অল্প বয়সের মেয়েদের ও ছেলেদের বহু জিনিস শেখানো হয়, কর্তব্যপরায়ণতা, জীবনের শৃঙ্খলাবোধ প্রভৃতি সম্বন্ধে তাদের ভাল করে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং গ্রামের অধিবাসীদের জন্য অনেক রকমের বাড়তি কাজ ও অনেক রকমের প্রয়োজনীয় কাজ করে থাকে। এই সব আবাসস্থলগুলো আদিবাসী জীবনের লোকনৃত্য এবং লোকসঙ্গীত অনুশীলন ও অভ্যাসের কেন্দ্রস্থলও বটে। লোকনৃত্য এবং লোকসংগীত আদিবাসী জীবনের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয় এবং এই সব আবাসস্থল থেকে নৃত্য কলা ও গান ও বাজনার যথাযথ অভ্যাস পরিবৃদ্ধি

ও অনুশীলন হয়ে থাকে। দৈহিক গঠনের দিক থেকে এই সব সম্প্রদায়ের লোক বেঁটে ও মাঝারি রকমের। এদের গায়ের রং কালো, মাথা লম্বাটে এবং মাথার চুল কোঁকড়ানো। এদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল এদের কপালের নীচের দিকটা যথেষ্ট উঁচু এবং নাক চ্যাপ্টা, তা ছাড়া এদের নাক আকারে ছোট এবং বেশ চওড়া। এই জাতীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের খুবই মিল রয়েছে এবং উপরিউক্ত শারীরিক লক্ষণগুলো অষ্ট্রেলিয়া আদিবাসীদের মধ্যেও রয়েছে। শারীরিক গঠনের দিক থেকে এই সব আদিবাসীরা অত্যন্ত বলিষ্ঠ, এদের দেহ পেশীবহুল ও সুগঠিত। এই সব সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের মধ্যে চলিত কথ্য ভাষাতে 'ব' শব্দের ব্যবহার বেশী, যেমন নাকি দক্ষিণ ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে 'অ' শব্দের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত বেশী।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের তৃতীয় গোষ্ঠী ভারতের পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চলে এবং পার্বত্য উপত্যকাগুলোতে বসবাস করছে, ঐ এলাকার মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের বিশেষ করে বর্মার আদিবাসী সম্প্রদায় আসাম ও তিব্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে, বালিপুরা, আরব ও মিশমী পাহাড় প্রভৃতি জেলার মধ্যে যে সব আদিবাসী সম্প্রদায় বাস করে, তারা হ'ল থাকা, দফলা, মিরি এবং অপাতমী প্রভৃতি উপজাতি, এই সব উপজাতি সম্প্রদায় সুবনসিড়ি নদীর পশ্চিমাঞ্চলে বসবাস করে এবং আসামও তিব্বতের মধ্যবর্তী এলাকার মধ্যে দিহং উপত্যকায় যে সব উপজাতি সম্প্রদায় বাস করে তারা হ'ল গ্যালং, মিনিয়ং, পাসীকদম এবং পাঙ্গী।

দিবং এবং লোহিত নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে উঁচু পার্বত্য এলাকায় মিশমী সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করে। পূর্বাঞ্চলের দিকে আরও যে সব আদিবাসী রয়েছে তারা হ'ল খামটি ও শিংপো সম্প্রদায় এবং ঐ এলাকা ছাড়িয়ে দক্ষিণের দিকে আরও যে সব আদিবাসী রয়েছে তারা হ'ল নাগাদের বিভিন্ন সম্প্রদায় যারা পাটকোই অঞ্চলের উভয় দিকে বিস্তৃত পর্বত শ্রেণীতে বসবাস করে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর নাগাদের আবাস ঐ অঞ্চল ভারত সীমান্ত ছাড়িয়ে বর্মার অশাসিত অংশে অবস্থিত হুকাওয়াং উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।

নাগা সম্প্রদায়কে সাধারণত পাঁচটি প্রধান প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে, এর মধ্য রয়েছে উত্তর ভাগের বংপান ও কোনিয়াক নাগা সম্প্রদায় পশ্চিম

ভাগের রেংমা, সেমা ও অঙ্গামী সম্প্রদায় মধ্য ভাগের আও লোটা, ফোং চাং, শান্‌তম এবং কিসমত্‌ সুয়ার সম্প্রদায়, দক্ষিণ অঞ্চলের কাচা ও কাবুই সম্প্রদায় এবং পূর্ব ভাগের টাঙ্কুল ও কল্লো কেঙ্কু সম্প্রদায়। মণিপুর, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকার উপর দিয়ে নাগা পর্বতমালার দক্ষিণভাগ বিস্তারিত হয়ে রয়েছে, এবং বর্মার আরাকান পর্বত শ্রেণী পর্যন্ত গিয়ে নাগা পর্বতের দক্ষিণ ভাগে মিশেছে। এই পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে বসবাস করছে কুশী লুসাই লোয়ার কীন প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়।

ভারতের সীমান্ত পেরিয়ে আদিবাসী সম্প্রদায় যে জনপ্রবাহ এগিয়ে চলেছে উপরিউক্ত সম্প্রদায়গুলো সেই জন-প্রবাহের এক একটি মণ্ডলী।

আসলে ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের উপর দিয়ে পাটকুই থেকে চীন পর্বতমালা পর্যন্ত আসাম এবং বর্মার মধ্যে জনবসতি কোন প্রকার সুস্পষ্ট রেখাপাত নেই এবং এ অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায় জাতিগত ভাবে এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে নিকটভাবে সংশ্লিষ্ট। এই অঞ্চলের আদিবাসীরা যে ভাষায় কথা বলে তা হ'ল তিব্বতী চীনা গোষ্ঠীর ভাষা এবং ঐ ভাষা প্রধানত অন্য যে কোন ভাষার চাইতে স্বতন্ত্র ধরণের এবং ঐ ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলো প্রত্যেকটি হ্রস্ব প্রকৃতির। যদিও আসামের আদিবাসী সম্প্রদায়ের জনসাধারণের মধ্যে ভাষার মধ্যে শব্দের বিচিত্র গঠন যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। এই সব ভাষাগুলোর বৈশিষ্ট্যযুক্ত লক্ষণ হ'ল যে এই ভাষার মধ্যে যথার্থ ক্রিয়া পদ নেই এবং ভাষার মধ্যে ক্রিয়াপদ না থাকা এমন একটি ত্রুটি যা ভাষাকে যথেষ্ট বলিষ্ঠ ও গতিশীল করে তুলতে পারে না, ফলে ঐ ভাষার সাহায্য উচ্চতর চিন্তা ও আদর্শবাণী ভাবধারা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না, যদিও ঐ ভাষার সাহায্যে যথার্থ শব্দ ব্যবহার করে বিবরণী ও তথ্যমূলক জিনিস সহজে ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা যায়। এই সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন আদিবাসীদের ভাষা যেমন খাসি ভাষা ও মনখেসর ভাষা অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর শাখা বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

সিকিম এবং দার্জিলিং-এর উত্তর অঞ্চলে অনেকগুলো আদিম আদিবাসী সম্প্রদায় রয়েছে, তাদের মধ্যে লেপ্‌চারাই সবচেয়ে বেশী পরিচিত। সমস্ত হিমালয় অঞ্চল জুড়ে অনেকগুলো আদিবাসী সম্প্রদায়, যেমন ল্যাপ্‌চা এবং

গ্যালোং সম্প্রদায় লোকদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলন রয়েছে, কিন্তু বহু বিবাহের নিয়ম থাকা সত্ত্বেও আসলে সকলেই একবার বিয়ে করে থাকে কারণ সমাজের মূল ভিত্তি হ'ল মাতৃকেন্দ্রিক। বিশেষ করে দেখা যায় খাসি এবং গাচো সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাজে মেয়েদের প্রতিষ্ঠা এতো বেশী যা আর কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোথাও দেখা যায় না। এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে এমনও দেখা যায়, কেউ মারা গেলে পরে মৃতের সম্মানের জন্য তারা পাথরের মর্মরস্তম্ভ গড়ে তোলে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংখ্যায় অনেক। যদিও এদের সামগ্রিক শক্তি মধ্য ভারত অঞ্চলের অধিবাসীদের শক্তির মত নয়। আসামের কাছাড় জেলার ডিমাপুরে অঞ্চলে বৃহৎ আকারে পাথরের ফলক রয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আদিবাসী সম্প্রদায় ঐ অঞ্চলে পরে গিয়ে বসবাস করে। আসামের কাছাড় পর্বতমালার ডিমাপুরের মত আরও অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলে আরও বহু সংখ্যক পাথরের স্তম্ভ ও ফলক দেখতে পাওয়া যায় তা থেকে এও বোঝা যায় যে ঐ সব অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীরা অন্য জায়গা থেকে ভারতবর্ষে এসে বসতি স্থাপন করে। এবং ধীরে ধীরে এই সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোক এতো বেশী উন্নতিশীল হ'য়ে ওঠে যে আজকের দিনে এদের আর আদিবাসী বলে অভিহিত করা যায় না, যদিও এদের সামাজিক সংগঠন খুবই সহজ এবং এরা অনেক সময় পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদে করে থাকে। পূর্বাঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে বিশেষ করে মণিপুরে এবং নাগা পাহাড় অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে স্তর বিভাগ করে চাষের কাজ খুবই উল্লেখযোগ্য বলে গৃহীত হয়েছে এবং ঐ ধরণের চাষ ব্যবস্থা ঐ অঞ্চলে খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অস্থায়ীভাবে জমি চাষের কাজ এখনও পর্যন্ত চাষ-ব্যবস্থার খুবই উল্লেখযোগ্য রীতি বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। ঐ সব অঞ্চলে অবিবাহিত যুবকদের আবাসস্থল অথবা অবিবাহিতা মেয়েদের বাসস্থল বিশেষভাবে সুগঠিত এবং ঐ সব আবাসস্থলে যে শুধুমাত্র যুবক যুবতীদের আদিবাসীদের সমাজ জীবন সম্পর্কে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করে তোলা হয় তাই নয়, উপরন্তু ঐ সব আবাসস্থল হচ্ছে আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধান কেন্দ্রস্থল যেমন আদিবাসী জীবনের গান-বাজনা তাদের সমাজের প্রচলিত লৌকিক কথা ও কাহিনী বিশেষ করে আদিবাসীদের গণজীবনের সাংস্কৃতিক

রূপায়ণের যে উজ্জ্বল দিক তা অবশ্যই ঐ সমস্ত আবাসিক শিক্ষণ শিবিরগুলোতে পরিবর্ধিত ও পরিপোষিত হয়।

উত্তর-পূর্ব ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই তাঁতের কাজে খুবই সিদ্ধ হস্ত, ঐ সব অঞ্চলে আদিবাসী সমাজে যে ধরণের তাঁত ব্যবহৃত হয় তা আকারে সরু এবং তাতে কাজের কারিগরীও খুবই উন্নত পর্যায়ের। ঐ সব অঞ্চলে ব্যবহৃত তাঁতগুলো তিব্বত থেকে সংগ্রহ করা। এরা সাধারণত চাষবাস করে ঝুম পদ্ধতি অনুযায়ী, তুলা, ধান ও অন্যান্য শস্য বীজের ফসল এরা মাটিতে ফলায় ঝুম চাষের দ্বারা এবং ঐ সব সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যে সবাই প্রায় কাজ করে। মেয়েদের প্রধান কাজ হ'ল সুতা কাটা ও তাঁত বোনা। সমস্ত আদিবাসীদের সমাজ, এক কথায় তাদের সামাজিক কাঠামো এমনভাবে গড়ে উঠেছে যেন সব সময়ের জন্যই তারা কোন দৈব দুর্বিপাকের বিরুদ্ধে যে কোন ধরণের লড়াই করার জন্য তৈরি হয়ে আছে। আদিবাসীদের গ্রামগুলো গড়ে উঠেছে পাহাড়ের শিখর দেশে অথবা পাহাড়ের ধার ঘেঁষে এমন একটা বিশেষ জায়গায় যেখান থেকে প্রয়োজন বোধে শত্রু পক্ষের উপরে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, শুধু তাই নয় ঠিক যেই জায়গায় তাদের গ্রামগুলোর অবস্থান সেই স্থান শত্রু পক্ষের প্রতিনিয়ত অভিযানের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এবং আত্মরক্ষা করার জন্য খুব বেশী কার্যকরী।

এই সব আদিবাসীদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় বিশেষ করে নাগা সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষের মাথা শিকার করা একটি খুবই উল্লেখযোগ্য কাজ, এই কাজের মধ্যে তাদের বীরত্বের প্রকাশ রয়েছে আর রয়েছে গৌরবময় প্রতিষ্ঠা। নাগা সম্প্রদায়ের লোকেরা মানুষের মাথা শিকার করে অনেকটা এই বিশ্বাসের ফলে যা হ'ল তারা এক ধরণের আত্মার শক্তিতে বিশ্বাস করে, অথবা তারা এমন এক ধরণের ভাবধারা পোষণ করে যে মানুষের দেহ যেই উপাদান দিয়ে তৈরি সেই উপাদান ছাড়া মানুষের আঘাতে এমন এক আশ্চর্য গুণসম্পন্ন উৎকৃষ্টতর পদার্থ রয়েছে যা দেহের শক্তি এনে দেয়, মনে উৎসাহের সঞ্চার করে এবং ঐ পদার্থ কোন এক বিশেষ সময়ে কোন এক বিশেষ অঞ্চলের লোকদের মধ্যে অথবা কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে। যদি আত্মার শক্তির কোনক্রমে অপচয় ঘটে তবে সেই অঞ্চলে অরাজকতা দেখা দেবে, হয়তো মাঠে ফসল ফলবে না এবং নানান রকমের ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হবে। এই সব

বিপদ আপদ যাতে না ঘটে তার জন্য আত্মার অতিরিক্ত শক্তি সংগ্রহ করা দরকার এবং তা সংগ্রহ করা সম্ভব হতে পারে মানুষের মাথা শিকার করে এবং মানুষের খুলিগুলোকে শিকারকারী তার বাসগৃহে সযত্নে রক্ষা করতে পারে যাতে সেই বিশেষ ব্যক্তির পরিবারে বা সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কোন রকমে আত্মার শক্তির অপচয় হয় তবে ঐ ঘরে-রাখা মড়ার মাথা আত্মার শক্তির ঘাটতি পূরণ করবে। এই ক্ষেত্রে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে, এই যে মানুষের মাথা সংগ্রহ করার রীতি তা শুধুমাত্র নাগা সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; উপরন্তু ভারতের সীমান্ত ছাড়িয়ে ওশেনিয়া ও ম্যালানেশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীদের মধ্যেও এই রীতি প্রচলিত রয়েছে দেখতে পাওয়া যায় এবং সেই সব দেশেও এইভাবে মানুষ হত্যা করে মাথা সংগ্রহ করার রীতি এই একই প্রাচীন বিশ্বাস এবং আদিম ভাবধারা প্রসূত। মানুষ বলি দেওয়ার কাজ হল এই সব সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির, ধন, ঐশ্বর্য ও বিষয় সম্পত্তি বাড়ানোর একটা বিশেষ পন্থা। ব্যক্তিগত জীবনে অথবা সামাজিক জীবনে বৈষয়িক উন্নতি লাভ করতে হলে মানুষের মাথা শিকার করে উন্নতি লাভ করতে পারা যায় এই হ'ল এদের স্থির বিশ্বাস।

ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায় শারীরিক গঠনের দিক থেকে মঙ্গোলয়ের সম্প্রদায়ভুক্ত, তাদের দেহের চামড়া পাতলা, মাথার চুল খাড়া খাড়া এবং নাক চ্যাপ্টা। এদের চোখ দেখে মনে হয় সব সময়েই যেন চোখগুলো আধা খোলা অবস্থায় রয়েছে, চোখের উপরের দিককার পাতা আংশিকভাবে অথবা পুরোপুরিভাবে যেন চোখের ভিতরকার মণিটিকে আবৃত করে রেখেছে। এই আধ-বোজা চোখে পাতাকে নৃতাত্ত্বিক ভাষায় বলা হয় 'এ্যাপিক্যান্থিক ফোল্ড'। এই সব আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকেরই দেহের উচ্চতা মাঝারি রকমের হয়, এদের মাথা লম্বা, আর তিব্বত অঞ্চলের সীমান্ত ঘেঁষে যে সব সম্প্রদায় বসবাস করে তাদের মাথা ও মুখ গোলাকৃতি এই সব সম্প্রদায়ের লোকদের দেহের রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গিয়াছে যে এদের রক্ত অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের দেহের রক্তের মতো নয়, এদের রক্তের মধ্যে 'এ', 'বি' ও 'ও' এই তিন প্রকৃতির এ্যান্টিনজেন্স উপাদান রয়েছে। এই সব সম্প্রদায়ের সমস্ত লোক, এমন কি এদের মেয়েরা পর্যন্ত দৈহিক গঠনের দিক থেকে বেশ পেশীবহুল। এদের দেহের পেশী খুব সুগঠিত ও সুপুষ্ট। এদের

আরও গুণ রয়েছে, এরা সবাই উঁচু উঁচু পাহাড় পর্বতে আরোহণ করতে সুপটু এবং পাহাড়ের দুর্গম পথ ধরে অনেক উচ্চ স্থানেও এরা গুরুভার বয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম। এরা খুব স্বাস্থ্যবান, প্রচুর কর্মঠ ও পরিশ্রমী, মন-মেজাজের দিক থেকে এরা খুব স্বাধীনচেতা ও বলদৃপ্ত। সব চেয়ে বড় কথা হ'ল এদের জীবনধারণের প্রণালী চমৎকারভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ, যেমন নাকি পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের সাধারণত হয়ে থাকে। একদিকে প্রচুর কষ্টসাধ্য কাজ করা আর অন্যদিকে আরাম ও অবসর বিনোদনের জন্য প্রাণ ভরে আনন্দ উপভোগ করা, এই দুইটি দিকেই এদের সামাজিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। প্রাণপণে খাটা ও আনন্দ উপভোগ করা এই দুইটির সঙ্গে এদের আরও রয়েছে আবেগময় হৃদয়ের অনুভূতি, যা এদের মনে দুরন্ত ও উদ্দাম উল্লাসের সৃষ্টি করে।

ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়ের উপরে আলোচিত বিভাগ শুধুমাত্র আদিবাসী জীবনের বিভিন্ন সামাজিক বিন্যাস ও পর্যায়কেই বর্ণিত করছে না, আহার সংগ্রহকারী শিকার বৃত্তির দ্বারা যাযাবর সমাজ জীবনের অবস্থা থেকে স্থায়ী ও সুগঠিত এবং সংস্কৃতি-প্রাণ গোষ্ঠীজীবনেই আদিবাসীদের বিভিন্ন সংস্থার বিবরণ শেষ নয়, উপরন্তু এদের সামাজিক বিধি নিয়ম পরিবেশ ও পরিস্থিতি আরও অনেক ঐতিহাসিক নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক উপাদান আমাদের সামনে উপস্থাপিত করছে। ইতিহাসের উত্থান-পতনের কোন কোন অধ্যায়ে এরা পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে কোথায় বিদ্যমান ছিল, বাইরের কোন দেশ থেকে এরা ভারতবর্ষে এসে উপনীত হয়েছে, কোন জাতীয় আদিবাসীদের মূল বাসস্থান কোথায় এবং কোন কোন রাস্তা ধরে এরা উদ্দাম গতিতে ভারতবর্ষে এসে উপনীত হয়েছে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে অনেক তথ্য আমরা আদিবাসীদের সমাজজীবনের নানা পরিস্থিতি থেকে সমাধান করতে পারি। সব শুদ্ধ কথাই বলা যায় যে এই সব সম্প্রদায়ের লোকেরাই হ'ল ভারতে আদিবাসী প্রাচীন যুগে থেকে এরা ভারতের আদিজাতি হিসাবে বসবাস করছে, শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষের সভ্যতা আদিবাসীদের সমাজ থেকে অনেক উল্লেখযোগ্য অবদান সংগ্রহ করে সমৃদ্ধতর হয়েছে। আদিবাসীদের সম্বন্ধে ভাসাভাসীভাবে কোন ধারণা পোষণ না করে, তাদের সম্বন্ধে ঘৃণাপ্রসূত কোন রকম ধারণা মনে না রেখে, এ কথা অনায়াসে বলা যায় যে, আমরা আদিবাসীদের সমাজ থেকে অনেক শিখতে পারি, তাদের স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধ আবেগপ্রধান এবং সুনিয়ন্ত্রি

জীবনের বিচিত্র ধারা থেকে, কর্ম প্রচেষ্টার ও চিন্তাধারা এতোদুভয়ের সম্পর্কের মধ্যে আদিবাসীদের যে সরল, সহজ ও অকপট সত্যনিষ্ঠা তা থেকেও আমাদের শিখবার রয়েছে,—শুধু তাই নয় আদিবাসীদের এইসব গুণ আমাদের সভ্য সমাজের উপরেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।

ভক্তিরসরাজ ত্যাগরাজ

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

ভারতীয় ভাষাভিজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা তেলুগু ভাষার মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া উহার নাম দিয়াছেন—প্রাচ্য দেশের ইতালিয়ান্। তামিল কবি ভারতী তাঁহার "ভারতদেশম্' নামক কবিতার এক জায়গায় বলিয়াছেন, সিন্ধু নদীর বুকে জ্যোৎস্নাফুল্ল রজনীতে তিনি যখন কেরল সুন্দরীদের সহিত নৌবিহার করিবেন তখন তাঁহার কণ্ঠে থাকিবে সুমধুর তেলুগু সঙ্গীত। ইহা হইতে তেলুগু ভাষার কান্তকোমল স্বাভাবিক মাধুর্যের কথা বুঝা যাইবে। অন্যদিকে ভক্তি সাধনার ক্ষেত্রে তামিলনাডের ঐতিহ্যও ভুলিবার নয়। তাহার কাবেরী-তাম্রপর্ণী আজও বহন করিয়া চলিয়াছে সুপ্রাচীন ভক্ত কবিদের স্মৃতি। এইরূপ ভক্তি-পূত ভক্তিকার সহিত মধুর তেলুগু ভাষার সংযোগ ঘটিলে যে কিরূপ অমৃত ফল ফলিতে পারে, তাহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ত্যাগরাজ (১৭৬৭-১৮৪৭)।

সাধনা, কবিত্ব ও গীতনৈপুণ্যে তাঞ্জোরের এই তেলুগু ব্রাহ্মণ যাহা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল আন্ধ্র প্রদেশের নয়, সমগ্র দাক্ষিণাত্যের অনুপম সম্পদ্। ত্যাগরাজের কিছু রচনা সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ, কিছু সংখ্যক পদের ভাষা তেলুগুমিশ্র সংস্কৃত ;- কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠ এবং অধিকাংশ পদ রচিত হইয়াছে তাঁহার মাতৃভাষায়। আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হওয়া সত্ত্বেও ত্যাগরাজের পদাবলী যে দক্ষিণাবর্তে এতটা জনপ্রিয় তাহার প্রধান কারণ, বোধ করি, তাহার সুর গৌরব। সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞদের মতে কর্ণাটক সঙ্গীত ত্যাগরাজের কণ্ঠে উত্তম রস-রূপ লাভ করিয়াছে।[১] এখন পর্যন্ত ত্যাগরাজই উক্ত গীতধারার শ্রেষ্ঠ সুরকার।[২] এইরূপে সঙ্গীত, সাহিত্য ও ভক্তিরসের মধুর সংমিশ্রণে

---

(১) The period of Tyagaraja is the brightest epoch in the istory of Karnatic Music. P. Sambamoorthy, History of Indian Music.

(২) Tyagaraja is the greatest name in the history of modern

ত্যাগরাজের রচনা ভক্তজনের পরম আদরের সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে। আলোয়ারদের কণ্ঠে তামিল ভাষায় যাহার সূচনা, ত্যাগরাজের কণ্ঠে তেলুগু ভাষায় তাহার সার্থক পরিণাম।

ত্যাগরাজের রচনাবলীর মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করিতে হয় তিনখানি গেয়-নাট্য বা গীতাভিনয়ের কথা—সীতারাম বিজয়ম্, প্রহ্লাদ-ভক্তি বিজয়ম্ এবং নৌকাচরিত্রম্। সীতারাম বিজয়ম্ অপেক্ষাকৃত অল্পখ্যাত রচনা। রামের উত্তর চরিত অবলম্বনে লিখিত এই গেয়-নাট্যের একখানি গান এইরূপ ঃ

হে রাম, তুমি যে এই মহত্ত্ব অর্জন করিয়াছ তাহা কেবল আমাদের জানকীকে বিবাহ করিয়া। তাহারই ফলে তুমি রাবণজয়ীরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছ। জানকী তোমার সঙ্গে বনে গেলেন, অগ্নি পার্শ্বে তাঁহার নিজস্ব কায়া রাখিয়া রাবণের সঙ্গে গেলেন মায়ারূপ ধারণ করিয়া ; অশোক বনে তিনি যে রাবণের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে (কোপদৃষ্টি দিয়া) বধ করেন নাই তাহা কেবল তোমাকে শত্রুজয়ের গৌরব দানের জন্য।[৩]

প্রহ্লাদ ভক্তি বিজয়ম্ পঞ্চাঙ্কে সম্পূর্ণ দীর্ঘতম নাটক। ইহাতে গান আছে ৪৫ খানি। গল্পাংশ এইরূপ ঃ

South Indian music.....He has shed lustre on South Indian music by his melodious and soul-stirring compositions..... Tyagaraja is the greatest composer of the modern period. P. Sambamoorthy—Great Composers, Book II.

(৩) মা জানকি চেট্টবট্টগ-মহারাজ বৈতিবি ॥
রাজ রাজবর রাজীবাক্ষ বিন্নু
রাবণারিয়নি রাজিল্লু কীর্তিয়ু ॥
কানকেগি যাজ্ঞ মীরকমায়া
কার মুনিচি শিখি চেন্তনে য়ুণ্ডি
দানবুনি বেন্টনে চনিয়শোকতরু মূলনুণ্ডি
বানি মাটলকু গোপগিঞ্চি কণ্ট বধিয়িঞ্চকনেয়ুণ্ডি
শ্রীনায়ক ! যশমুনীকে কল্গ-
জেয় লেদা ত্যাগরাজপরিপাল ॥

সর্প বন্ধনে বাঁধিয়া প্রহ্লাদকে ফেলিয়া দেওয়া হয় সমুদ্রে। জলাধিপতি মহাযোগী প্রহ্লাদের সংস্পর্শে নিজেকে ধন্য মনে করিয়া তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইল। গরুড়ের কাছে প্রার্থনা জানাইতে গরুড় আসিয়া প্রহ্লাদকে সর্প-বন্ধন হইতে মুক্ত করে। অতঃপর প্রহ্লাদ কর্তৃক সমুদ্রকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন (১ম অঙ্ক)। ভগবানের কাছে প্রহ্লাদের নিরন্তর প্রার্থনা। একটি পদে রামরূপী ঈশ্বরের বন্দনা এইরূপ: হে সেতু-বন্ধন ভক্তচন্দন রঘুনন্দন রাম! আমি কি তোমার অপরিচিত? তুমি কি আমার এই দুর্দশায় আনন্দ পাও? হে রমা হৃদয়বাসী, আমাকে আশীর্বাদ করা কি তোমার পক্ষে ভার-স্বরূপ? তোমার কীর্তি কথা শুনিয়া আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়াছি এবং তোমাকে উপস্থিত হইবার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি। তোমার প্রতি আমার যে ভক্তি তাহা বিসর্জন দিয়া আমি অপরের কাছে ভিক্ষা করিব না। তুমি আসিয়া আমাকে বর দাও। হে মুনি বন্দিত রাম! ইহা কি তোমার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত? অথবা আমাকে আশীর্বাদ করার মতো কাজকে তুমি হেয় মনে করো? তোমার নাম নিত্য মঙ্গলদায়ী। হে করুণাসাগর, তুমি এস। (৪) নারদ আসিয়া বলিলেন, বৈকুণ্ঠলোক হইতে হরি শীঘ্রই প্রহ্লাদকে দর্শন দিবেন (২য় অঙ্ক)। প্রহ্লাদ একাগ্রচিত্তে ঈশ্বর-বন্দনায় রত: যে নয়ন সর্পশয়ন প্রভুর সৌন্দর্য দেখিলনা সেই নয়নের কী প্রয়োজন? যে দেহ সেই নীলসমুদ্রকান্তি শ্রীহরিকে আলিঙ্গন করিতে পারিল না তাহাতো পিঞ্জরের তুল্য। পদ্ম তুলসী প্রভৃতি দিয়া যে হাত তাঁহার পূজা করিতে পারিল না সেই হাত থাকা না

---

(৪) বন্দনমু রঘুনন্দন সেতুবন্ধন ভক্তচন্দন রাম!
শ্রীদমা নাতোবাদমা নে ভেদমায়িদি মোদমা রাম!
শ্রীরমাহৃচ্চারমা ব্রোব ভারমা রায় ভারমা রাম!
বিন্টিনি নম্মু কোন্টিনি শরণন্টিনি রম্মন্টিনি রাম!
ওডন্নু ভক্তি বীডন্নু নোরুল বেডন্নু নীবাডন্নু রাম!
কম্মনি বিডমিম্মনি বরমু কোম্মনি পলুকেরম্মনি রাম!
ন্যায়মা নীকায়দমায়িঙ্ক হেয়মা মুনিগেয়মা রাম!
ক্ষেমমু দিব্যধামমু নিত্যনেমমু রামনামমু রাম!
বেগরা করুণাসাগরা শ্রীত্যাগরাজহৃদয়াগারা রাম!

থাকা সমান। যে রসনা ত্যাগরাজ-রক্ষক রাম মূর্তির স্তুতিগান করিল না সেই রসনার কোনো সার্থকতা নাই। সেই ব্যক্তির সূত্র মালিকা পরিধানও নিরর্থক।[৫] এমন সময়ে শ্রীহরি আসিয়া প্রহ্লাদকে দর্শন দিলেন (৩য় অঙ্ক)। চতুর্থ অঙ্কে হরি-প্রহ্লাদ সংবাদ। পঞ্চম অঙ্কের আরম্ভে হরি বৈকুণ্ঠে ফিরিয়া যাওয়ার সংকল্প জানাইলে প্রহ্লাদের ভক্ত হৃদয় এই বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল: আমাকে একা ফেলিয়া তুমি যাইও না। অর্ধনিমেষের জন্যও আমি তোমার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিব না। ডুবুরী যেমন শ্বাস বন্ধ করিয়া সমুদ্রে ডুব দিয়া মুক্তা পায় তোমাকে আমি সেইরূপ পাইয়াছি। আমি যেন সূর্য্যের প্রখর কিরণ হইতে কল্পতরুর ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়াছি। ভূমি-খননকারী যেমন ধন ভাণ্ড লাভ করে, আমিও সেইরূপ তোমাকে পাইলাম। আমাকে তুমি রক্ষা কর। এই দেহ তোমারই সম্পত্তি।[৬] হরির অন্তর্ধানের পরে

(৫) এন্নগ মনসুকুরানি পন্নগশায়ি সোগসু
পন্নগ গন্তুগোননি কন্নুলেলে
কন্নুলেলে কন্টি মিন্নুলেলে।
মোহমুতো নীলবারি বাহ কান্তিনি গেরিন
শ্রীহরিনি গট্টুকোননি দেহমেলে
দেহমেলে য়ী গেহমেলে।
সরসিজ মল্লেতু লসি বিরুবাজি পারিজাতপু
বিরুলচে বুজিঞ্চনি করমুলেলে
কর মুলেলে য়ী কাপুর মুলেলে।
মালিমিনি ত্যাগরাজু নেলিন রামমূর্তিনি
লালিঞ্চি পোগডনি নালিকেলে
নালিকেলে সূত্র মালিকেলে॥

(৬) নন্ন বিডচি কদলকুরা রাময্য বদলকুরা।
নিন্ন বাসি য়র নিমিষ মোর্বন্নুরা॥
অব ধিলো মুনিগিশ্বাসমুন্ন বট্টি
য়ানিমুত্যমু গন্নট্টলায়ে শ্রীরমণ॥
তরমুগানি য়েণ্ডেবেল গল্প-
তরুনিড দোরিকি নট্টলায়ে নীবেল॥

প্রহ্লাদের গীত—আমি কিরূপ পাপ করিয়াছি যে প্রভু আমার সঙ্গে নাই। আমি এখন কী করিব? কিরূপে ইহা সহ্য করিব? দুঃখ-হরণ হরিকে একবার দেখিলে আর কি তাঁহার বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করা যায়? প্রথমে আমাকে স্নেহ দেখাইয়া এখন কি তিনি বঞ্চনা করিলেন? সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া আমি এখন যন্ত্রনা ভোগ করিব ইহাই কি আমার বিধিলিপি? আমি আমার প্রভুকে দেখিতে পাই না। জীবন দিয়া তাঁহার সেবা করিয়া শেষে ইহাই আমার ভাগ্যে ছিল![৭] প্রহ্লাদের পুনঃপুনঃ আবেদনের ফলে হরি আবার আসিয়া দর্শন দিলেন, এবার অবশ্য লক্ষ্মীকে সঙ্গে লইয়া। এইরূপে প্রহ্লাদের ভক্তি ফলপ্রসূ হইল।

ত্যাগরাজের সর্বাধিক জনপ্রিয় গেয়নাট্য নৌকা চরিত্রম্। পাঁচটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ এই একাঙ্ক নাটকখানির বিষয়বস্তু মোটামুটি বাংলাদেশের সুপরিচিত 'নৌকা বিলাস' পালাকীর্তনের সগোত্র। গল্পাংশ এইরূপ :—একদিন সন্ধ্যায় গোপীরা কৃষ্ণের মধুর বংশীধ্বনি শুনিতে পাইয়া যমুনার তীরে আসিয়া দেখিতে পায় একখানি সুন্দর নৌকা। নৌবিহারের সংকল্প করিয়া তাহারা বালক কৃষ্ণকে সঙ্গে লইবে কিনা এই বিষয়ে বলাবলি করিতে লাগিল। "কৃষ্ণ বালকমাত্র, জল কেলিতে অনভিজ্ঞ" ইত্যাদি মন্তব্য শুনিয়া কৃষ্ণ বলিয়া উঠিল—তোমরা কি আমার ক্ষমতার কথা জান না? তোমরা কি জান না বেদে বলিয়াছে আমাকে ছাড়া পৃথিবীর কোনো কিছুই ঘটেনা? এই লইয়া গানের মধ্য দিয়া কৃষ্ণ ও

বসুধল্লু খননমু জেসি ধন
ভাণ্ড মব্বিনরীতি গল্লুগোন্টি ডাসি ॥
বাগুন নন্নেলুকোম্মু য়িল
ত্যাগরাজনুত তল্লুবু নীসোম্মু ॥

(৭) এন্ত পাপিনৈতি নেমি সেয়ুদু হায়েলাগু দালুদুনে ও রাম!
অন্তদুঃখমুলন্নু দীচু হরিনি জূচি য়েন্ত বারৈ নন্নু বায় সহিন্তুরে!
মচ্চিকতো দাসু মুচ্চটাডি মোস বুচ্চি য়েচ মদি বচ্চেনো কটকটা?
আসমিঞ্চি য়ায়াসবডলু বিধি ব্রাসুনানামুদ্দু বেসুনি গানমে?
সেবজেয়ুটে জীবনমনি য়ুন্টিদৈবমা নাপালি ভাগ্য মিট্লায়নে?
রাজিল্লু শ্রীত্যাগরাজু তা বোঙ্গুচু বৃজিঞ্চু শ্রীরঘুরাজিন্দু লেনন্দু ॥

গোপীদের মধ্যে বেশ রসালো বচসা হইল। অবশেষে কৃষ্ণসহ গোপীদের নৌবিহার। মনোহর সন্ধ্যায় সেই মনোহর নৌ বিলাসের আনন্দ ব্যক্ত হইয়াছে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম গানে। বহুরূপী কৃষ্ণ একই সময়ে সকল গোপীর সঙ্গে ক্রীড়া করিলে তাহারা নিজেদেরকে ভাগ্যবান্ বলিয়া গাহিতে থাকে। কৃষ্ণও গোপীদের রূপের প্রশংসা করে। তখন গোপীরা বলিল—সকল মানুষই নারী সৌন্দর্যের বশীভূত। হে কৃষ্ণ! তুমিও তাহাদেরই দলে। এই ভাবে রূপ-যৌবনের অহঙ্কারে গোপীরা মত্ত হইয়া উঠিলে কৃষ্ণ তাহাদের শিক্ষাদানের জন্য মায়া বলে ঝড়ের সৃষ্টি করিল। ভীত নারীদের কাতর আর্তনাদে সে তাহাদের অঙ্গ হইতে বস্ত্র অপসারণের আদেশ দিলে (বস্ত্র কি কামনা-বাসনার প্রতীক?) গোপীরা সম্পূর্ণরূপে তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করে। ঝড় থামিলে দেখা গেল গোপীরা যমুনার তীরে অবস্থিত।

ত্যাগরাজ এই গেয়নাট্য রচনায় বিশেষ শিল্প কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই। ভাগবত-বহির্ভূত এই লৌকিক কাহিনীর পরিকল্পনার জন্য তিনি বোধ করি বাংলাদেশের নিকট ঋণী। ভাগবতের বস্ত্রাপহরণ এবং রাসলীলার প্রসঙ্গও তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকিবে।

তিনখানি গীতাভিনয় রচনা করিলেও ত্যাগরাজের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁহার পদ সমূহ—দাক্ষিণাত্যে যাহা 'কৃতি' নামে পরিচিত। ত্যাগরাজের এই কৃতি বা পদগুলি বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানের জন্য ধারাবাহিক রূপে বা পালা আকারে রচিত হয় নাই। তাঁহার রচনার অধিকাংশ- রাম ভক্তি বিষয়ক হইলেও সেগুলির মধ্যে রামায়ণের কাহিনী অনুসরণের কোনো চেষ্টা নাই। নানা পদে বিক্ষিপ্তরূপে লক্ষ্মণ-জানকী-ভরত-হনুমান্ রাবণ প্রভৃতির প্রসঙ্গ থাকিলেও কোনো ক্ষেত্রে (যেমন প্রহ্লাদ ভক্তি বিজয়ম্ নাটকে) 'রাম' বলিতে তিনি দশরথ-পুত্রকে বুঝাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কবীর দাস প্রভৃতি সন্ত কবি যেমন পরব্রহ্ম অর্থে রাম, হরি, কৃষ্ণ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, ত্যাগরাজের পদেও আমরা কখনো কখনো সেই প্রবণতা লক্ষ্য করি।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ত্যাগরাজের ভক্তিও রাম ভক্তির প্রেরণা আসিয়াছিল অন্য দিক হইতে। পূর্বসূরিদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকারে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে তাঁহার 'এন্দরো মহানুভাবু-লন্দরিকি বন্দনমু' পদটি স্মরণীয়। কবির বক্তব্য এই যে, তাঁহার পূর্বে কত

কত মহানুভব জন্মগ্রহণ করিয়া ধরণীকে পূত পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে নমস্কার। তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয় পদ্মে প্রভুকে দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়াছেন ; সামগানপ্রিয় প্রভুর লাবণ্য দর্শনে তাঁহারা ধন্য। কত ভক্ত সেই মানস-অরণ্য-চারীর দর্শন পাইয়াছেন ; কত ভক্ত তাঁহার পাদযুগলে সঁপিয়া দিয়াছেন চিত্ত-কমল ; কত ভক্ত স্বরলয় রাগে গুণগান করিয়াছেন সেই পতিত পাবনের। নারদ প্রহ্লাদের ন্যায় কত পরম ভাগবত, কত মুনিবর! প্রভুর নাম-বৈভব-শক্তি পরাক্রম-প্রশান্তির কত গায়ক! আরও কত-যাঁহারা ভাগবত রামায়ণ গীতা বেদ-শাস্ত্রে-পুরাণের মর্মোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন ; যাঁহারা ভাব-রাগ লয় সমৃদ্ধ গীত-সাধনায় আয়ুষ্মান্—যাঁহারা ত্যাগরাজের বন্ধু। আরও কত ভক্ত পরিপূর্ণ প্রেমে শ্রীরামচন্দ্রের নাম অনুধ্যান করিয়া ত্যাগরাজ-বন্দিত সেই প্রভুর দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন! তাঁহাদের সকলকে বন্দনা করি—এন্দরো মহানুভাবু লন্দরিকি বন্দনমু!

'প্রহ্লাদ ভক্তি বিজয়' নাটকে কবি যাঁহাদের বন্দনা করিয়াছেন সেই তালিকায় আমরা প্রথম নাম পাই তুলসীদাসের। উত্তর ভারতের এই শ্রেষ্ঠ রাম ভক্তের মূল কৃতির সহিত ত্যাগরাজ কতটা পরিচিত ছিলেন জানিনা, কিন্তু সর্বাগ্রে তাঁহার নামোল্লেখ হইতে ত্যাগরাজের মনোভাব কতকটা বুঝা যাইবে। তুলসী দাসের পরে যাঁহারা উল্লিখিত হইয়াছেন তাঁহাদের তালিকা এইরূপ—পুরন্দর দাস, ভদ্রাচল রাম দাস, নামদেব, জ্ঞানদেব, জয়দেব, তুকারাম, নারায়ণ তীর্থ। ইঁহাদের মধ্যে জ্ঞানদেব (জ্ঞানেশ্বর) নামদেব ও তুকারাম মারাঠী ভক্ত ; জয়দেব বাঙালি ; পুরন্দর দাস কর্ণাটকের শ্রেষ্ঠ ভক্ত কবি ; সংস্কৃত গেয় নাট্য কৃষ্ণলীলা তরঙ্গিণীর রচয়িতা নারায়ণ তীর্থ এবং কবি ভদ্রাচল রাম দাস আন্ধ্র-সন্তান। প্রকৃতপক্ষে ইঁহাদের মধ্যে রামভক্ত কবি একমাত্র ভদ্রাচল রামদাস। পুরন্দর দাস এবং তৎসহ কনক দাস প্রভৃতি পুরোগামী কন্নড়িগ বৈষ্ণব কবিদের রচনা হইতে ত্যাগরাজ যথেষ্ট প্রেরণা পাইয়াছিলেন বলা হইলে তাঁহার ভক্তি এবং বিশেষ ভাবে রাম ভক্তির উৎস-সন্ধান শেষ হইয়া যায় না।

বস্তুত ত্যাগরাজ তাঁহার পূর্বগামী সকল ভারতীয় ভক্তি সাহিত্যের সুফল। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত[৮] হইতে জানা যায়, তাঁহার মা সীতাম্মা (সীতাদেবী) ভালো গান জানিতেন। এবং শৈশব হইতে ত্যাগরাজ তাঁহার মায়ের কণ্ঠে

(৮) Great Composers (Book II)—P. Sambamoorthy.

অন্নমাচার্য্য, পুরন্দর দাস প্রভৃতি ভক্ত মহাজনের পদাবলী শোনার সুযোগ লাভ করেন। তেলুগুর শ্রেষ্ঠ ভাগবতকার পোতানা সম্পর্কে ত্যাগরাজের শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। তেলুগুভাষী সংস্কৃত কবি নারায়ণ তীর্থের "কৃষ্ণ লীলা তরঙ্গিণী"র কোনো কোনো পদ ত্যাগরাজের তেলুগু পদের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। দাক্ষিণাত্যে রাধা-কল্যাণ, রুক্মিণী-কল্যাণ ও সীতা কল্যাণের বার্ষিক উৎসবগুলিতে নারায়ণ তীর্থের ভজন সঙ্গীত একটি অত্যাবশ্যক অনুষ্ঠান। সুতরাং অতি স্বাভাবিক ভাবেই ত্যাগরাজের "গিরিরাজ সুতা-তনয়" "বিনতা-সুত-বাহন", "রাগসুধারস", প্রভৃতি পদগুলিতে কৃষ্ণ লীলা তরঙ্গিণীর প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

ত্যাগরাজের পদাবলীতে যে সকল রাম কথার উল্লেখ রহিয়ছে তাহার সবগুলি বাল্মীকি রামায়ণে পাওয়া যায় না। উত্তর ভারতে মধ্যযুগে রামোপাসনার যে বৃহৎ সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার মূল প্রচারক দক্ষিণী ব্রাহ্মণ রামানন্দ। এই রামায়ৎ সম্প্রদায়ের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ হইল অধ্যাত্ম রামায়ণ। তাছাড়া, আনন্দ রামায়ণ অদ্ভুত রামায়ণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, অগস্ত্য সংহিতা, রামগীতা, রাম সহস্র নাম, রাম রহস্যোপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থাদির মধ্য চিয়া রাম-ভক্তির ক্রম-বিস্তার ও ক্রম-বিকাশ হইতে লাগিল। রূপ গোস্বামী যেমন তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ে কৃষ্ণ-ভক্তিকে একটা অলঙ্কার শাস্ত্র-সম্মত রূপদানের চেষ্টা করিয়াছেন, রাম-ভক্তি সম্পর্কে সেই কাজ করিয়াছেন বঘেল-রাজ বিশ্বনাথ সিংহ।[৯] উত্তর ভারতে এই রাম-ভক্তি-বিকাশের ধারা সম্পর্কে ত্যাগরাজ অবহিত ছিলেন বলিয়াই হিন্দীর শ্রেষ্ঠ রামায়ণকার তুলসী দাসকে তিনি প্রণাম জানাইয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যেও বৈষ্ণবভক্তিসম্প্রদায় হইতে শুরু করিয়া ত্যাগরাজের কাল পর্যন্ত নানাভাবে রামায়ণ-চর্চা ও রামভক্তির প্রসার ঘটিয়াছে। এই প্রসঙ্গে তামিল ভাষার শ্রেষ্ঠ রামায়ণ-কার কাবেরী-তীর-নিবাসী কম্বনের প্রসঙ্গ মনে না আসিয়া পারে না। ত্যাগরাজও জন্মিলেন কাবেরী নদীর তীরে—তাঞ্জোরের তিরুবারূর গ্রামে। প্রসিদ্ধ শৈব কবি সুন্দরমূর্তির স্মৃতি-বিজড়িত এই ভূমির স্থান মাহাত্ম্য সম্পর্কে ত্যাগরাজ যে খুবই সচেতন ছিলেন তাহা বোঝা যায় তাঁহার

(৯) V. Raghavan—The Spiritual Heritage of Tyagaraja PP. 128-129

রচনা হইতে। "মুরি-পেমুগলিগেগদা" পদটিতে কবি কাবেরী-ধৌত শিব-কাঙ্ক্ষিত মলয়-মারুত-সেবিত সাম-গান-মুখরিত চোল দেশের জয়গান করিয়াছেন। আর একটি পদে (সারি বেডলিন ঈ কাবেরিনি জূডরে) কবি সাবেরি-রাগে কবেরী-বন্দনা করিয়াছেন এই ভাবে—ঐ দেখ, কাবেরী চলিয়াছে তাহার পতি গৃহে (সমুদ্রাভিমুখে); কখনো দ্রুতগামিনী, কখনো শান্তবাহিনী; দুই তীরে কোকিলের গান শুনিতে শুনিতে মন্দিরে মন্দিরে দেব-প্রণাম করিয়া চলিয়াছে—কখনো পঞ্চনদেশ্বর, কখনো রঙ্গনাথের পায়ে। ব্রাহ্মণগণ দুই তীরে দাঁড়াইয়া পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন। ঐ দেখ বিপ্র-বন্দিতা রাজরাজেশ্বরী চলিয়াছে তাহার পতিগৃহে।

এই পুণ্য ভূমিতে পুণ্য ঐতিহ্যের অধিকারী ত্যাগরাজ একটি পুণ্য পরিবেশে বর্ধিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ঈষৎ অগ্রবর্তী তেলুগু কবি ভদ্রাচল রামদাসের জীবন ও বাণী তাঁহার চিত্তে জাগরূক ছিল। একটি পদে (কলিগিয়ুণ্টেগদা) ত্যাগরাজ বলিয়াছিন—তিনি যদি নারদ, প্রহ্লাদ, পরাশর ও রামদাসের ন্যায় রামপদ ভজনা করিতেন তবে তাঁহার করুণা-লাভ সম্ভব হইত। অন্য একটি পদে (ক্ষীরসাগর শয়ন) কবি রামকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—"আমি শুনিয়াছি, ধীর, রামদাসকে তুমি বন্ধন-মুক্ত করিয়াছ" (ধীরুডৌ রামদাসুনি বন্ধমু-দীর্চিনর্দি বিন্নানুরা)। আর একটি পদে (এমি দোব বল্‌কুমা) আছে—"আমি যদি রামদাস হইতাম সীতাদেবী তোমাকে আমার সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেন" (রামদাসু বলে নৈতে সীতা-ভাম মন্দলিঞ্চুনু নীতো)।

ত্যাগরাজের যুগে অনেক সন্ন্যাসী ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য বেদান্ত-জ্ঞানের সঙ্গে নাদোপাসনাকেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমনি একজন গায়ক সন্ন্যাসী ছিলেন সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র যাঁহার "মানস সঞ্চর রে" গানখানির প্রতিধ্বনি শোনা যায় ত্যাগরাজের অনুরূপ একটি পদে।[১০] তৎকালীন অন্যতম রামভক্ত দীক্ষিতের স্তোত্রসমূহ চোল দেশে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। ইহা ছাড়া মাতামহ, রামভক্ত পিতা রামব্রহ্মম্ এবং পিতৃবন্ধু উপনিষদ্ ব্রহ্মেন্দ্র (কাঞ্চীপুরের রামভক্ত সন্ন্যাসী) ত্যাগরাজের মানস-গঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।[১১] "রাম নী

(১০) V. Raghavan—The Spiritual Heritage of Tyagaraja. P. 6

(১১) Upanishad Brahmendra, the well-known recluse of Kanchipuram, sems to have exerted the greatest influence on

সমান মেবরু" এই পদের শেষে কবি রামকে সম্বোধন করিয়াছেন 'ত্যাগরাজের কুলদেবতা' বলিয়া—'ত্যাগরাজকুলবিভূষ'। 'পলুকবেমি নাদৈবমা' পদের একস্থানে বলিয়াছেন—"পিতামাতা ভক্তি দিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন" (তল্লি তণ্ডি ভক্তিনোসগি রক্ষিঞ্চিরি)। আর একটি পদে (ইন্নালু দয়রাকুন্ন) বলা হইয়াছে—"হে রাম, বাল্য কাল হইতে আমি তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও বিশ্বাস করি নাই" (চিন্ননাট নুণ্ডি নিন্নে গানি নেননুল্যল নম্মিতিনা ও রাম)। রবীন্দ্রনাথ যেমন উপনিষদের মন্ত্র হইতে লালন ফকিরের বাউলগান পর্যন্ত আত্মসাৎ করিয়া বাংলাভাষার মধ্য দিয়া কাব্যে নবরূপ সঞ্চার করিয়াছেন, ত্যাগরাজ তেমনি বাল্মীকি-রামায়ণ হইতে ভদ্রাচল রামদাসের গান পর্যন্ত আত্মসাৎ করিয়া তেলুগু ভাষার মধ্য দিয়া ভক্তি সাহিত্যকে নবরসে গরীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছেন।

ভক্ত-কবি রূপে ত্যাগরাজের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে প্রথমেই যে কথা মনে জাগে তাহা তাঁহার গীতি-শক্তি। গায়ক ও সুরকার হিসাবে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব তর্কাতীত।[১২] ত্যাগরাজের প্রত্যেকটি পদের সূচনায় রাগ ও তালের নির্দেশ দেওয়া আছে। ইহা হইতে তাঁহার সঙ্গীত-প্রীতি কতকটা বুঝা যাইবে। অবশ্য রাগ-তালের উল্লেখ থাকিলেই কোনো রচনা গান হইয়া উঠে না, সুর-সংযোগে গাহিলেও না। আবার এমন সব কবিতা আছে যেখানে রাগ-রাগিনীর নির্দেশ না থাকিলেও এবং সুরে গীত না হইলেও তাহার মধ্য দিয়া যথার্থ গীতরসের আস্বাদন পাওয়া যায়। ত্যাগরাজের রচনা সেই জাতীয়। তাঁহার পূর্বে দাক্ষিণাত্যে যে ভক্তি-সঙ্গীত রচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সাহিত্যভাব-ই প্রবল অর্থাৎ সেখানে কথার সাহায্যেই সকল কথা বলা হইয়াছে। ফলে সেই সকল ভক্তি-সঙ্গীত ভক্তি-অংশে উৎকৃষ্ট হইলেও সঙ্গীতাংশে তাহাদের উৎকর্ষ তত নয়। ত্যাগরাজের রচনায় সঙ্গীত সেই মর্যাদা পাইয়াছে। কিন্তু তাহা বিশুদ্ধ হিন্দুস্তানী

Tyagaraja in music as well as adoration of Rama's name.—The Spiritual Heritage of Tyagaraja, P. 7.

(১২) Tyagaraja is the prince amongst Composers..... Tyogaraja occupies the same position in Indian music as Beethoven in European music.—P. Sambamoorthy—Great Composers (Book II).

সঙ্গীতের সগোত্র নয় যে, সুর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে গানের কথা তুচ্ছ হইয়া পড়িবে। বঙ্গদেশের কীর্তনের ন্যায় ত্যাগরাজের পদাবলীতে "কাব্য ও সঙ্গীতের সম্মিলন এক আশ্চর্য আকার ধারণ করিয়াছে। তাহাতে কাব্য ও পরিপূর্ণ এবং সঙ্গীতও প্রবল। মনে হয় যেন ভাবের-বোঝাই-পূর্ণ সোনার কবিতা ভরা সুরের সঙ্গীতে নদীর মাঝখান দিয়া বেগে ভাসিয়া চলিয়াছে।"

ত্যাগরাজ যে কেবল ভালো গান রচনা করিয়াছেন তাহাই নয়, গানই তাঁহার প্রাণ। রবীন্দ্র-জীবন-সাধনায় গানের যে স্থান, ত্যাগরাজের ভক্তি-সাধনায় সঙ্গীতের গুরুত্ব ততখানি। একটি পদে তিনি তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন: হে, দেব, আমি কোনো উদ্দেশ্য না লইয়া জন্মিয়াছি এরূপ মনে করিও না। আমার সেই সাধনার কথা তুমি কি জান না? সত্য বটে বাল্মীকি আদি মুনিরা তোমার গুণ কীর্তন করিয়াছেন ("তোমার সভায় কত যে গান কতই আছে গুণী") কিন্তু তাহাতে কি আমার আশা মেটে?[১৩] জীবন সায়াহ্নে উপনীত হইয়া তিনি আবার সেই কথার সূত্র ধরিয়া বলিলেন: আমি সমস্ত অন্তর দিয়া সযত্নে তোমার আদেশ পালন করিয়াছি ("তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার, বাজাই আমি বাঁশি")। এখন তুমি দয়া করিয়া আমাকে আশীর্বাদ কর।[১৪] আর একটি পদে কবি বলিয়াছেন: প্রভু, তুমি রামরূপে অবতীর্ণ হইলে কেন? সে কি অযোধ্যা-শাসনের জন্য না যুদ্ধ করিবার জন্য? সে কি ভবরোগ হইতে মানুষকে মুক্তি দানের জন্য না যোগীদের সম্মুখে দর্শন-দানের জন্য? আসলে ইহার কোনোটাই সত্য নয়। তুমি আসিয়াছিলে অন্য কারণে। যে ত্যাগরাজ শতরাগে তোমার জন্য গীতরত্ন

---

(১৩) এপানিকো জন্মিঞ্চিতিননি নল্লেঞ্চবলদু শ্রীরাম!
শ্রীপতি শ্রীরামচন্দ্র নী চিত্তমুনকু তেলিয়দা?
বাল্মীকাদি মুনলু নরুলু নিন্ন
বর্ণিঞ্চিরি না য়াশদীরুনা?.....

(১৪) দয়জু চুট কিদি বেলরা।.....
মুদু নীবান তিচ্চিন পদু লাসগোনি নে-
মন সারগ নিদানমুগ সল্লিনাদু বরত্যাগ রাজাদ!

মালিকা রচনা করিবে তুমি আসিয়াছিলে তাহাকে বর দিতে'[১৫] ("পরিয়ে যেতে পারি তোমায় আমার গলার মালা, সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা")। অন্য একটি পদে আছে : ভক্তিহীন কবিরা তোমার স্বরূপ মাহাত্ম্য বুঝিতে না পারায় তুমি মোক্ষদায়ক দিব্য সঙ্গীত রচনার প্রেরণা ও ক্ষমতা ত্যাগরাজকে দিয়াছ ? হে দাশরথি, তোমার ঋণ অপরিশোধ্য'[১৬] ("চিরজীবন বইব গানের ডালা, এই কি তোমার খুশি ? আমায় তাই পরালে মালা সুরের গন্ধঢালা ?")

ত্যাগরাজ দেবর্ষি নারদকে গুরু পদে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, কারণ নারদ ছিলেন প্রথম ভক্ত গায়ক। কখনও কখনও সেই সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ বোধ হইয়াছিল যে, কবি নারদকে 'ত্যাগরাজ-সখ' বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। নারদের প্রশংসায় কয়েকটি পদ রচিত হইয়াছে। তাহার একটি এইরূপ : হে গুরু রায় ! পূর্বজন্মকৃত তপস্যার ফলে আজ আমি তোমার দর্শন পাইয়া ধন্য হইলাম। আমি তোমাকে সমস্ত অন্তর দিয়া খুঁজিয়াছি ; আজ আমার নয়ন সার্থক হইল। তোমাকে সেবা করিয়া আমি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইলাম, প্রভু।...হে গুরু রায় ! হে ত্যাগরাজ রক্ষক উজ্জ্বল বীণাকর সদ্‌গুরু !'[১৭] আর একটি পদে কবি নারদকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন "গীত পদ্মের ভ্রমর" (শ্রীনারদ নাদসরসী রুহভৃঙ্গ)।

---

(১৫) এলাবতার মেত্তু কোন্টিবি এমি কারণমু রামুভে ?
আলমুসেয়ুটকা অয়োধ্যপালন জেয়ুটকা ও রাঘব !
যোগুলু জ্‌চুটন্দুকা ভব রোগুল ব্রোচুটন্দুকা ? শত-
রাগরত্ন মালিকলু রচিঞ্চিণ ত্যাগরাজুকু বর মোসগুটন্দুকা।

(১৬) দাশরথী নী রুণমু দীর্পনা
দরমা ? পরমপাবন নাথ !.....
ভক্তিলোনি কবিজাল বরেন্থুলু
ভাব মেরুগলেরনি কলিলোন জনি
ভুক্তিমুক্তি গল্‌গুননি কীর্তনমুল
বোধিঞ্চিন ত্যাগরাজকরার্চিত !

(১৭) শ্রীনারদমুনী গুরুরায় !, গন্টিমেনাটি তপমো গুরুরায় !
মনসার কোরিতি গুরুরায়, নেড়ু কন্নুলার খনু গোন্টিমি গুরুরায় !

ত্যাগরাজের কল্পনায় গান কেবল ভক্তিমার্গের সহায়ক নয়, গানই মুক্তি। "গানের সুরে মুক্তি আমার ঊর্ধ্বে ভাসে"—এই মর্মে রচিত ত্যাগরাজের পদসংখ্যা কম নয়। একটি পদে বলিয়াছেন: "সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞানস্থ সারূপ্য সৌখ্যদমে মনসা।" অপর একটি পদে বলা হইয়াছে: হে মন! স্বর-রাগ-সুধা-যুক্ত যে ভক্তি তাহাই স্বর্গ, তাহাই মোক্ষ।...জ্ঞানী মুক্তি পায় বহু জন্মের পরে। কিন্তু সহজ ভক্তির সহিত যাঁহার রাগ-জ্ঞান রহিয়াছে তিনি তো জীবন্মুক্ত।[১৮] অপর একটি পদে আছে: সংসারী হইলেও মানুষের আশঙ্কার কোনো কারণ নাই যদি সে বীণা বাদনের সহিত রাগ-তাল সমন্বিত হরি গুণ গান করিতে পারে (সংসারুলৈতে নেমৈয়্যা ইত্যাদি)। "না মোর লন্থ বিনি" পদটিতে ভগবানকে বলা হইয়াছে—"রাগস্বর যুত প্রেমভক্তজনরক্ষক।" অন্যত্র কবি বলিয়াছেন: সদ্‌ভক্তি ও সঙ্গীতজ্ঞান যাহার নাই সে কি কখনও মোক্ষ লাভ করিতে পারে (মোক্ষস্থ গলদা...সাক্ষাৎকার নী সদ্‌ভক্তি সংগীত জ্ঞান-বিহীনলকু)? সঙ্গীতজ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মানন্দ সাগরে যাহারা ভাসিতে পারে না, এই পৃথিবীতে তাহাদের দেহ ভার-স্বরূপ (আনন্দ-সাগর মীদনি দেহমু ভূমি ভারমু ইত্যাদি পদ)। সুতরাং হে মন, যে রাগ সুধারস যাগ-যোগ-ত্যাগ-ভোগ সকলের ফল দান করিতে পারে তুমি তাহা পান করিয়া মত্ত হও। ত্যাগরাজ জানে, নাদ-ওঙ্কার-স্বর জ্ঞান যাঁহার আছে তিনি জীবন্মুক্ত।[১৯] সঙ্গীতের স্তুতি-বন্দনায় ত্যাগরাজ এখানেই ক্ষান্ত হন নাই। স্বয়ং শ্রীরাম চন্দ্রের অনন্ত গুণ রাশির মধ্যে একটি গুণ এই যে, তিনি গীত-প্রিয়', সঙ্গীতলোল', 'সামগানলোল', 'রাগ-রসিক',

---

মীসেব দোরিকেন্থ গুরুরায়, ভব-পাশমু দোলগেন্থ গুরুরায়।.....
রাজিল্লু বীণেগল গুরুরায়, ত্যাগরাজুনি ব্রোচিন সদ্‌গুরুরায়॥

(১৮) স্বর-রাগ-সুধারসযুত ভক্তি স্বর্গাপবর্গমুরা ও মনসা,.....
বহু জন্মমুলকুপৈনি জ্ঞানিয়ৈ বরগুট মোক্ষমুরা।
সহজ ভক্তিতো রাগজ্ঞান সহিতুড়ু মুক্তুড়ুরা ও মনসা!

(১৯) রাগসুধারস পানমু জেসি রাজিল্লবে মনসা!
যাগযোগ ত্যাগভোগ ফল মোসঙ্গে
সদাশিব ময়মগু নাদোঙ্কার স্বর-
বিদুলু জীবন্মুক্তুলনি ত্যাগরাজু দেলিয়ু।

'সপ্ত স্বর-চারী' ইত্যাদি। অবশেষে কবি সঙ্গীতের মধ্যেই ভগবৎ-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন ঃ বেদ-পুরান-আগম-শাস্ত্রাদির আধার যে নাদসুধারস তাহা (রামের মধ্যে) সাকার হইয়া উঠিয়াছে। রাগ তাঁহার ধনুঃ; সপ্ত স্বর সেই ধনু-র সপ্ত ঘণ্টা; দ্রুত-নয়-দেশ্য তাহার ত্রি-গুণ; গানের গতি তাহার শর; আর সরস পদাবলী তাহার কথা। এইরূপে নাদসুধারস নরমূর্তি ধারণ করিল।[২০]

বলা বাহুল্য, ত্যাগরাজ যে সঙ্গীতের স্তুতি-বন্দনা করিয়াছেন তাহা সাধারণ সঙ্গীত নয়। ভক্তিবিহীন যে সঙ্গীত তাহা তো মানুষকে উন্মার্গগামী করিবে (সংগীতজ্ঞানমু ভক্তিবিনা সন্মার্গমু গলদে মনসা)। "সময়মু দেলিসি" এই পদে কবি বলিয়াছেন ঃ যে পদে রাম গুণ কীর্তন নাই সেই পদ গীত না হইলে কিছু যায় আসে না। যে ব্যক্তির হৃদয়ে রাম ভক্তির উদ্রেক হইবে না, তাহার নরজন্ম গ্রহণ আবশ্যক।[২১] হে রাম, তোমার গানই গান; তোমার পথই পথ—রাম নী পাটে পাট, রাম নী বাটে বাট ('রাম কোদণ্ড রাম' পদটি দ্রষ্টব্য)। এই ভাবে ত্যাগরাজ যত গান গাহিয়ছেন, তাহার সর্বত্র রামভক্তি পরিব্যাপ্ত।[২২]

একদিকে সমস্ত জগৎ, উহার বিলাস, ঐশ্বর্য, নানাবিধ ভোগ্য পদার্থ; অন্যদিকে কবির আরাধ্য দেবতা। কবি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করিতেছেন ঃ হে মন, কোন্‌টি তোমার গ্রহণীয়? সত্য করিয়া বল, তোমার কী চাই—নিধি (সম্পদ্) না প্রভুর সন্নিধি (উপস্থিতি)? ইহাদের কোন্‌টি তোমার উপাদেয়? দধি-ক্ষীর-ননী-মাখনে তোমার রুচি, না দাশরথির সাধন-ভজন-রূপ সুধারসে?

---

(২০) নাদসুধারসম্বিলনু নরাকৃতিয়ায়ে মনসা
বেদপুরাণাগম শাস্ত্রাদুলকাধার মৌ।
স্বরমুলারুন্নোকটি ঘণ্টলু, বররাগমু কোদণ্ডমু,
দ্রুর নয় দেশ্যমু ত্রিগুণমু, নিরতগতি শরমুরা
সরস সঙ্গতি সন্দর্ভমু গলগিরমুলুরাধর ভজন ভাগ্য মুরা ত্যাগরাজ
সেবিঞ্চু।

(২১) পদমু ত্যাগরাজনুতিনিপৈ গানিদি পাডিয়েমি পাডকুণ্ডিন নেমি॥
এদনু শ্রীরামভক্তিয়ু লেনি নরজন্ম মেত্তিয়েমি য়েত্তকুণ্ডিন নেমি॥

(২২) ত্যাগরাজের গীতসংখ্যা প্রায় আটশত। The Spiritual Heritge of Tyagaraja গ্রন্থে সাড়ে পাঁচ শ' গীত সংকলিত হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়-জয় গঙ্গা স্নানের তুল্য ; বিষয়াসক্তি যেন কূপের কর্দম স্নান ; ইহাদের কোন্‌টি তোমার পক্ষে আনন্দদায়ক ? তুমি কি মমতাবন্ধনযুক্ত মানুষের স্তুতি-রচনা করিবে, না প্রভুর মহিমা কীর্তন করিবে।[২৩] ইহার উত্তরও কবি দিয়াছেন : 'প্রভুই যখন আমার ধন-ধান্য-দেবতা, তখন দুর্মার্গ-গামী অধম মানুষের স্তুতি বন্দনার কোনো প্রয়োজন নাই।' এই পদটির ভাব ও প্রথম পংক্তি (দুর্মার্গ চরাধমুলনু) ত্যাগরাজের পূর্বসূরি ভাগবত-কার পোতানা-র "ইম্‌মনুজেশ্বরাধমুলকিচ্চি" ইত্যাদি পদটির কথা স্মরণ করায়। আরও পূর্ববর্তী তামিল বৈষ্ণব কবি নম্মালোয়ার্-ও এই সুরে অনেক পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ভক্তি সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ নাম-মাহাত্ম্য ও গুরু-মাহাত্ম্য বর্ণনা। বাহুল্য ভয়ে ত্যাগরাজের এই প্রসঙ্গ এখানে বর্জিত হইল। প্রকৃত ভক্তের পক্ষে বাহ্য পূজা-অর্চনার প্রয়োজন নাই, প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতা একান্তই নিষ্ফল—এই মর্মে ত্যাগরাজের দু' একটি পদের কথা বলা হইতেছে। একটি পদে আছে ; মনকে জয় করিতে না পারিলে কেবল ঘণ্টা বাজাইয়া ও ফুল ছড়াইয়া কী হইবে ? দুর্মদ ব্যক্তির পক্ষে কাবেরী বা মন্দাকিনী-স্নানে লাভ কী ? পত্নীর যদি উপ-পতি থাকে, তবে কি সোমযাজী স্বর্গ লাভের আশা করিতে করিতে পারে ? (সোম-যজ্ঞ পত্নী-সহ আচরণীয়)। কামক্রোধের বশীভূত ব্যক্তিকে তপস্যা ও রক্ষা করিতে পারে না।[২৪] বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান দিয়া

---

(২৩) নিধি চাল সুখমা ? রামুনি সন্নিধি সেব সুখমা ? নিজমুগ বল্‌কু মনসা !
দধি নবনীত ক্ষীরমুলু রুচিয়ো ? দাশ-
রথি ধ্যান ভজন সুধারসমু রুচিয়ো ?
দমশম মনু গঙ্গা স্নানমু সুখমা ?
কর্দম দুর্বিষয় কূপস্নানমু সুখমা ?
মমত বন্ধন যুত নরস্তুতি সুখমা ?
সুমতি ত্যাগরাজনুতুনি কীর্তন সুখমা ?

(২৪) মনসু নিল্প শক্তি লেক বোতে মধুর ঘণ্ট বিরুল পূজয়েমি জেয়ুনু ?
ঘন দুর্মদুডৈ তামুনিগিতে কাবেরি মন্দাকিনি য়টু ব্রোচুনু ?

যদি বিচার করিতে হয়, তবে তো মনুষ্যেতর বহু জীবজন্তুকে উচ্চতর আসন না দিয়া উপায় নাই। "বলমু কুলমু য়েল" এই পদে কবি ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছেন ঃ কাক ও মাছ জলে ডুব দেয়; ইহা কি পবিত্র প্রাতঃস্নান? বক চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকে, ইহা কি দিব্য ধ্যান? ছাগল কেবল পত্রাদি ভক্ষণ করে; ইহা কি পুণ্য উপবাস? পাখীরা আকাশে বিচরণ করে; ইহারা কি চন্দ্র সূর্যের তুল্য? সাধারণ মানুষ সাধুর বেশে গুহায় থাকিলেই কি তপস্বী হইয়া যায়? অরণ্যবাসী বানর কি বানপ্রস্থ যাপন করে? জঙ্গম অর্থাৎ বীর শৈবের বেশ ধরিয়া মৌন থাকিলেই কি ভিখারী মৌনী হয়? উলঙ্গ শিশু কি দিগম্বর সাধু বলিয়া গণ্য হইতে পারে? [২৫]

প্রকৃত পক্ষে মন্ত্র-তন্ত্র জপ-তপ পূজা-অর্চনার কোনো আবশ্যকতা নাই। কারণ যে ব্যক্তি মনকে জয় করিতে পারে নাই, সে এই সমস্ত বাহ্য অনুষ্ঠানের সাহায্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। আবার যিনি সংযত-মনা, তাঁহার পক্ষেও মন্ত্র-তন্ত্র নিরর্থক (মনসু স্বাধীনমৈন য়াথনুনিকি মরিমন্ত্র তন্ত্র মুলেল)। তবে কি দেব পূজায় গঙ্গাজল-আসন-শুদ্ধবস্ত্র-গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ প্রভৃতি উপচরের কোনোই প্রয়োজন নাই? কবি তাহার উত্তর দিয়াছেন "পরিপালয় রঘুনাথ" পদটিতে ঃ আমার দেহই তোমার পূজার মন্দির;

সোমিদম্ম সোগসুগাও গৌরিতে
সোময়াজি স্বর্গার্হ ডৌনো?
কামক্রোধুড়ু দপং বোন চিতে
গাচিরক্ষিঞ্চুনো ত্যাগরাজনুত।

(২৫) নীটু কাকি মীনু মুনুগ নিরত মুদয় স্নানমা
তেট কর্নুল কোঙ্গ-গূর্চদেব দেব ধ্যানমা
পত্রমুলুনু মেয়ু মেক-বুলমৈনয়ুপায়মা
চিত্রপক্ষুলেগয় সূর্য চন্দ্র লকু সাম্যমা
গুহল বেষ কোটু লুণ্টে গুণমুকলগু মৌনুলা
গহনমুনলু কোতুলুণ্টে ঘনমৌ বনবাসমা
জঙ্গমুলু বলুককুণ্টে সঙ্গতিগা মৌনুলা
অঙ্গমুমুয়্যনি বালুলুয়পুড়ু দিগম্বরুলা?

আমার স্থিরচিত্ত তোমার স্বর্ণপীঠ। তোমার চরণ-ধ্যানই গঙ্গাজল ; তোমার প্রতি ভালোবাসাই শুভ বস্ত্র। তোমার গুণ-কীর্ত্তনই চন্দন-গন্ধ ; তোমার নাম-স্মরণই প্রস্ফুটিত পদ্ম। আমার অতীত জীবনের দুষ্কৃতি তোমার সম্মুখে ধূপ হইয়া পুড়িবে ; আমার ভক্তি তোমার পূজার প্রদীপ হইয়া জ্বলিবে। আমার এই পূজার ফল তোমার নৈবেদ্য ; এই পূজা-প্রসূত স্থায়ী আনন্দ তোমার তাম্বূল এবং তোমার দর্শনই তোমার আরতি (দীপারধনা)।[২৬]

ইষ্টদেবতার প্রতি ভক্তি যখন স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন কবি অনায়াসে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারেন : হে রাজীবলোচন, হে রাজ রাজশিরোমণি, হে জীবনাশ্রয়, হে আমার তপস্যাজাত ফল, হে নয়ন-জ্যোতি ! (না জীবাধার, না নোমুফলমা, রাজীবলোচন, রাজ রাজশিরোমণি, না চুপু প্রকাশমা, না নাসিক পরিমলমা ইত্যাদি)। এই জাতীয় অন্য একটি পদে (পাহি কল্যাণরাম পাবন গুণধাম) কবি বলিয়াছেন : তুমি আমার জীবনাশ্রয়, তুমি তপস্যার ফল ; তুমি আমার মঙ্গলময়, তুমি দেহের বল ; তুমি কুলসম্পদ, তুমি চিদানন্দ ; তুমি মনোহর, তুমি সন্তোষ ; তুমি আমার জীবন-যৌবন-ভালবাসা, তুমি ভাগ্য তুমি বৈরাগ্য ইত্যাদি।[২৭]

---

(২৬) তনুবে নীকনুবৈন সদনমৌরা রঘুনাথ
স্থিরচিত্তমু বর চামীকর পীঠমু রঘুনাথ
সুপদধ্যানমু গঙ্গাজলমৌরা রঘুনাথ
ইভপালক য়ভিমানমু শুভচেলমু রঘুনাথ
ঘনকীর্তিনি বলকু বাসনগন্ধমু রঘুনাথ
হরিনাম স্মরণমুলু বিরুতামা রঘুনাথ
তোলিদুষ্কৃত ফলমেল্ল গুগ গুলু ধূপমু রঘুনাথ
নীপাদভক্তিয়ে প্রোদ্দু দীপম্বগু রঘুনাথ
এডবায়নি নায়েড গল্‌গুসুখমু বিডমৌরা রঘুনাথ
নিন্নুজ্‌চুটে ঘনদীপারাধন মৌরা রঘুনাথ।

(২৭) না জীবাধারমু না শুভাকারমু
না নোমু ফলমু না মেনু বলমু
না বংশধনমু না দৈদোতনমু
না চিত্তানন্দমু নাদু সন্তোষমু

দিব্যশক্তির উপর যদি আমাদের এইরূপ বিশ্বাস থাকে তবে জীবন-সংগ্রামে উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজন নাই। কবি এই মর্মে একটি পদে বলিয়াছেন: হে অযোধ্যা রাজপুত্র রামচন্দ্র, তুমি থাকিতে আমার চিন্তা কিসের? তুমি জগৎ জুড়িয়া একটি নাট্যাভিনয় চালাইতেছ, আর সেই নাটকের সূত্রধার তুমি। সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত।[২৮] রবীন্দ্রনাথের গানেও অনুরূপ আত্মসমর্পণ দেখিতে পাই:

ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার।
হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার॥

ভক্তি এক ও অখণ্ড হইলেও তাহার লক্ষণ নানাবিধ। ভাগবতে প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুকে নব-লক্ষণা ভক্তির কথা শুনাইয়াছিলেন।[২৯] শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-পদসেবা-অর্চনা-বন্দনা-দাস্য-সখ্য-আত্মনিবেদন—ত্যাগরাজের সঙ্গীতে এই সমস্ত লক্ষণের পরিচয় থাকিলেও তাহার সর্বাঙ্গীন আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ভক্তি-সাহিত্যের একটি বিশেষ অঙ্গ মাধুর্যভাব। ত্যাগরাজের পদাবলীতে ইহার কিছু অসদ্‌ভাব নাই। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। কৃষ্ণভক্ত কবিরা যেমন যশোদা-কৃষ্ণ অবলম্বনে বাৎসল্য-রস এবং গোপীদের কাহিনী লইয়া শৃঙ্গার বা মধুর রস সৃষ্টির সুযোগ লাভ করেন, শিব-ভক্ত বা রাম-ভক্ত কবিদের

না মনোহরমু নাদু শৃঙ্গারমু
না পালি ভাগ্যমু নাদু বৈরাগ্যমু
নাদু জীবনমু নাদু যৌবনমু ইত্যাদি।

(২৮) মা কেলরা বিচারমু মরুগন্ন শ্রীরামচন্দ্র!
সাকেত রাজকুমার সদ্‌ভক্তমন্দার শ্রীকর!
জতগূর্চি নাটক সূত্রমুলু জগমেল্ল মেচ্চগ করমুন নিডি
গতি তপ্পক য়াডি চেদবু সুমীনত ত্যাগরাজ গিরীশবিনুত।

(২৯) শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥
—৭।৫।২৩-২৪

সেই সুবিধা অল্প। ফলে কৃষ্ণসাহিত্যের তুলনায় রাম সাহিত্য ও শিব-সাহিত্যে বাৎসল্য ও শৃঙ্গার রসের আয়োজন অপেক্ষাকৃত কম। হিন্দী সাহিত্যের সূরদাস যে বাৎসল্য-ধারার পরিচয় দিয়াছেন অথবা তেলুগু সাহিত্যের ক্ষেত্রয়্য যে শৃঙ্গার রসের প্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছেন রামভক্ত কবি ত্যাগরাজে তাহা আশা করা যায় না। ত্যাগরাজের রচনায় বাৎসল্যের প্রচলিত রূপ (কবি=পিতা বা মাতা; দেবতা=পুত্র) অপেক্ষা ইহার বিপরীত রূপের (দেবতা=পিতা; কবি=শিশুপুত্র) পরিচয় বেশি পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় পদকে বাৎসল্য রসের অন্তর্ভুক্ত করিতে গেলে আপত্তি উঠিবার সম্ভাবনা। রসের দৃষ্টিতে ত্যাগরাজ মুখ্যত দাস্য রসের কবি। একটি পদে তিনি বলিয়াছেন: হে রাম, তুমি হনুমান্ ও ভরতকে যেমন নিকটে থাকিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, আমাকেও সেইরূপ থাকিতে দিও। আমি প্রাণ মন দিয়া তোমার আদেশ পালন করিব প্রভু। তোমাকে মুখে কিছু বলিতে হইবে না, তোমার মনে কোনো ইচ্ছা জন্মিবামাত্র আমি তাহা বুঝিতে পারিব। ভরতের ন্যায় আমাকে কেবল নিকটে রাখিয়া দিও।[৩০] আর একটি তেলুগু-মিশ্র সংস্কৃত পদে কবি বলিয়াছেন: আমি তোমার দাস। আমি তোমাকে খুঁজিতেছিলাম। আমাকে তুমি রক্ষা কর; আমার নিবেদন শোন। আমাকে তুমি ভুলিওনা। পৃথিবীতে তোমার ন্যায় দেবতা আর নাই, ইহা বুঝিয়াই আমি তোমার শরণ লইয়াছি।—

তবদাসোঽহং তবদাসোঽহং তবদাসোঽহং দাশরথে!
বরমুদ্ভাষ বিরহিতদোষ নরবরবেষ দাশরথে!
সরসিজনেত্র পরম পবিত্র সুরপতি মিশ্র দাশরথে!
নিন্নু কোরিতিরা নিরুপমশূর নন্নেলু কোরা দাশরথে!
মনবিনি বিন্নুমা মরব সমমা ইনকুল ধনমা দাশরথে!
ঘনসমনীল মুনিজনপাল কনকদুকূল দাশরথে!
ধরনীবন্টি দেবমুলেদন্টি শরণন্নু কোন্টি দাশরথে!

(৩০) চেন্তনে সদা য়ুণ্ডুকোবয়্য
মন্তকেক্কু শ্রীমন্তুডৈ হনু
মন্তরীতিগ শ্রীকান্ত!
তলচিন পন্নুলন্নু নে দেলিসি
তলতো নডচি সন্তসিল্ল দুরা;

ভক্তের জীবন-পথ বড়ো সহজ নয়; তাঁহার সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। এক দিকে সে মানুষ, এই মর্ত্যের ধূলি-ধূসর জীব; আর এক দিকে সে দেবতা, দিব্য জ্যোতির প্রতিচ্ছায়া। ভূলোক হইতে দ্যুলোকের পথে মানবাত্মার যে অভিসার তাহা জয়-পরাজয়-আনন্দবিষাদের আলো-আঁধারে বিচিত্র। যতক্ষণ না এই দ্বন্দ্বের অবসান, ততক্ষন ভক্তের হৃদয়াকাশে ঔৎসুক্য-দৈন্য-হর্ষ-অমর্ষের মনোরম বর্ণ-সুষমা। ত্যাগরাজের কয়েকটি পদের সাহায্যে আমরা সেই বর্ণ-বৈচিত্র্যের পরিচয় পাইব। একটি দৈন্য-মূলক পদে কবি এই ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন: চপলচিত্ত আমি তোমার মনের কথা না জানিয়া যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছি' তাহা তুমি ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন কর। তুমি তো বিশ্বের সকল জীবের পরিত্রাতা; সকলের দোষ-গুণও তোমার ভালো করিয়া জানা আছে। তৎসত্ত্বেও যে আমি তোমার গীতাঞ্জলি (কীর্তন শতক) রচনা করিয়া তোমার বিশেষ অনুগ্রহ-প্রার্থী হইয়াছি তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর।[৩১]

সর্বজ্ঞ ভগবানের কাছে আবেদন-পত্র পাঠাইবার কোনো প্রয়োজন নাই সত্য, কিন্তু নীরবে অপেক্ষা করিলেই কি তাঁহার অনুগ্রহ পাওয়া যাইবে? এ সম্পর্কে কবিরও সংশয় ছিল। ভক্ত ভগবানের কাছে যাইবে, না ভগবান্ আসিয়া ভক্তকে উদ্ধার করিবেন যেমন তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন গজেন্দ্রকে? কবি প্রশ্ন করিতেছেন: মা কি পুত্রের কাছে যাইবে, না পুত্র মায়ের কাছে আগাইয়া

পলুমারুবল্‌ক পনিলেদু রামা!
ভরতুনিবলে ত্যাগরাজনুত!

(৩১) অপরাধ মুলনু নোর্ব সময়মু
কৃপজ্‌ডুমু ঘনমৈননা
চপলচিত্তুডৈ মনসেরুগক নে
জালি বেট্টু কোনি মোরল নিডু
সকল লোকুল ফলমুল নেরিগি
সংরক্ষিঞ্চুচু নুণ্ডগ ন
ন্নোকনি ব্রোব তেলিয় গীত নশ-
তক মোনর্চু ত্যাগরাজনুত! নায়পরাধ ইত্যাদি।

আসিবে ? বৎস কি ধেনুর কাছে যায়, না ধেনু বৎসের কাছে ? শস্যক্ষেত্র কি মেঘের কাছে যায় জলপ্রার্থনার জন্য ? প্রেমিক কি প্রেমিকার কাছে যায় ভালোবাসা জানাইতে ? ইহার মধ্যে কোন্‌টি সত্য আমি জানি না। তুমি আসিয়া আমার সংশয় নিরসন করিয়া তোমার সুন্দর মূর্তিখানি দেখাও।[৩২]

ভক্তচিত্তে সর্বদা এই দৈন্যভাব দেখা যায় না। দেবতার কৃপা বর্ষণে বিলম্ব দেখিয়া কবি রুষ্ট হইয়া অভিযোগ করেন : আমি এতদিন তোমার দাসানুদাস হইয়া রহিলাম, কিন্তু তাহার ফল হইল কী ? বস্তুত গরীব ধার্মিকের জন্য তোমার ভালোবাসা নাই (নী দাসানুদাসুড ননি পেরেয়েমি ফলমু ইত্যাদি)। সত্যই যদি আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা থাকিত তবে আমার এই পুনঃ পুনঃ ক্রন্দনে তোমার হৃদয় অবশ্যই বিগলিত হইত। হে সর্বান্তর্যামী, গজেন্দ্রের প্রার্থনা শুনিয়া তুমি ছুটিয়া গিয়াছিলে কেন ? করুণাপরবশ হইয়া তুমি যে ধ্রুবের নিকটে গিয়াছিলে সে গল্প আমি শুনিয়াছি। প্রহ্লাদের জন্য তুমি যে নরসিংহ মূর্তি ধারণ করিলে তাহার কারণ কী ? যে বনচর সুগ্রীব তাহার প্রতিশ্রুতি ভুলিয়াছিল, তুমি তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া মহিমা অর্জন করিলে ! আর সেই তুমি আমাকে উপেক্ষা করিতেছ। অতঃপর আমি আর কোনো কথা শুনিবনা।[৩৩]

---

(৩২) তনয়ুনি ব্রোব জননি বচ্চুনো
তল্লি বদ্দ বালুডু বোনো ?
ইনকুলোত্তমা ! ঈ রহস্যমুন্নু
য়েরিগিংপুমু, মোমুন্নু গনুপিম্‌পুমু !
বৎসমু বেণ্ট ধেনুবু চন্নুনো ?
বারিদমুন্নু গনি পৈরুলু চন্নুনো ?
মৎস্যকর্টিকি রিটুডু বেডলুনো ?
মহিনি ত্যাগরাজবিনুত রম্মু দেল্‌পুমু।

(৩৩) মরি মরি নিন্নে মোরলিড নী মনসুন দয়রাদু
করিমোর বিনি সরগুন চন নীকু
গারণ মেমি ? সর্বান্তর্যামি !
করুণতো ধ্রুবু নিকেট্টি নিল্‌চিন কথ বিন্নানয্য ;

দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া পরিহাসের কথাও আছে। তিরুপতি পর্বতে বেঙ্কটেশ্বর, শ্রীরঙ্গম্ দ্বীপে যিনি রঙ্গনাথ, যমুনাকূলে যিনি গোপীজনবল্লভ, ত কিছু ভিন্ন নন। রাম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে প্রকটিত। কবি পরিহাস বলিতেছেন ('সীতানায়ক শ্রিত জন পোষক' পদটিতে) : হে রাম, তুমি কি ভক্তদের জ্বালাতনে অস্থির হ) পর্বতারূঢ় হইয়াছ ? ভক্তজন সহজে তে কাছে যাইতে না পারে তাই কি তুমি কি শ্রীরঙ্গম্ দ্বীপে বাসা বাঁধিলে ? তে বানর-বেষ্টিত হইয়া থাকার কারণও বোধ করি তাহাই। কুচেল (কৃষ্ণের সহপাঠী ; কু চেল অর্থাৎ বসন যাহার) তোমার কাছে একদিন মথুরায় করিতে আসিবে এই কথা বুঝিতে পারিয়াই কি তুমি গোপীদের বং করিয়াছিলে ? এই জাতীয় প্রশ্নগুলি অসঙ্গত হইলেও নিতান্তই পরি অপর একটি পদে ("অডিগি সুখমু লেব্বরনু ভবিঞ্চিরিরা" ইত্যাদি পদে) পরি মিশ্র উক্তিগুলি বেশ একটু বেদনার্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। কবি প্রথমেই জি করিলেন : হে প্রভু, তোমার কাছে সুখের প্রার্থনা করিয়া কে কবে পাইয়াছে ? তোমার অনুগতা সীতাকে বনবাসের কষ্ট ভোগ করিতে হ শূর্পনখা তোমাকে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তুমি তাহার নাসিকা করিলে ! নারদ তোমার মায়া বুঝিতে গিয়া স্ত্রীরূপে পরিণত হইল ! পুত্রলাভের আনন্দ পাইতে চাহিলে তুমি তাহা যশোদাকে অর্পণ কি গোপীরা তোমাকে পতিরূপে পাইতে চাহিলে তুমি তাহাদের পতি করাইলে ! তোমার রহস্যের কথা আর কী বলিব ?

ভক্তি সাহিত্যের শেষ কথা বিরহ-মিলন। এই পর্যায়ে নায়িকা বে পরকীয়া, কোথাও স্বকীয়া। ত্যাগরাজের পূর্বসূরি ক্ষেত্রয়্য পরকীয়া ন প্রসঙ্গে মধুর রসের চূড়ান্ত রূপ দেখাইছেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ভাব ভক্ত ত্যাগরাজের মুখ্য ভাব নয়। "পিতৃ মাতৃহীনা বিবাহিতা ব যেরূপ তাহার স্বামীকেই জানে, আমিও সেইরূপ তোমার উপর

সুররিপু তনয়ুনিকৈ নরমৃগমৌ সূচনলেময়্য ?
মরচিয়ুন্ন বনচরুনি ব্রোচিন মহিম দেলুপবয়্য
ধরনু বেলয়ু ত্যাগরাজসন্নুত
তরমুগা দিকনে বিননয়্য ॥

নির্ভরশীল। তুমি কেন আসিতেছনা ?"[৩৪] কবির এই উক্তি হইতে বোঝা যায়, তিনি স্বকীয়া নায়িকারূপে প্রভুকে বরণ করিয়াছেন। সেই ভাবেই তিনি রঘুবর-কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন : আমাকে ভুলিয়া যাওয়া কি তোমার উচিত ? নারীর পক্ষে কি পতির সঙ্গে পিতামাতা বন্ধু ভ্রাতা এবং অন্য স্বজনের তুলনা চলে ? নারীর পরিধেয় মঙ্গল সূত্রের সঙ্গে কি অন্য অলঙ্কারের সমতা হয় ? আমার পূর্ব জন্মের পুণ্যের ফলে তুমি আমার মনে যে আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিয়াছ, আমি সেই আকাঙ্ক্ষা জনিত প্রেম বহন করিতেছি।[৩৫]

পতির সঙ্গে মিলিত না হইতে পারার বেদনা একটি পদে প্রকাশ পাইয়াছে এইরূপে : হে রামাভিরাম, তোমাকে পাওয়ার জন্য আমি চঞ্চল। কিন্তু আমার প্রতি তোমার করুণা নাই। আমাকে এই দুঃখ দিয়া তোমার কী লাভ ? আমার হৃদয়-বাসিনী নারী তোমাকে ভালোবাসিয়াছে, কিন্তু তুমি তাহার পাণি গ্রহণ করিতেছ না। আমি প্রেমভরে তোমার সেবা করিতেছি, কিন্তু তোমার আচরণ অন্যরূপ। আমার অদৃষ্টে কী আছে জানি না। হৃদয়ে তোমার শয্যা রচনা করিয়াছি, কিন্তু তুমি তাহাতে উদাসীন থাকিয়া আমাকে কষ্ট দিতেছ। তোমাকে একমাত্র আশ্রয় জানিয়া আমি তোমার উপর নির্ভর করিয়া আছি, আর-তুমি আমার দোষগুণ বিচারে ব্যাপৃত। তোমার এইরূপ আচরণের সার্থকতা কী ?[৩৬]

---

(৩৪) চের রাবদেমির রাময়্য !.....
তল্লি তণ্ডি লেনি বাল তন ন্যধু গোরুরীতি ইত্যাদি

(৩৫) রখুবর ! নন্নু মরব তগুনা ? .....
তল্লি তণ্ডুলন্নতম্মুলুয়ুন্ন
পোলতিকিয়োক্কড়ু পুরুষুড়ু য়োনা ?
পরদৈবমুলু বাগু সোম্মুলু সুরন্নুত ! মঙ্গল সূত মুলো না ? ইত্যাদি

(৩৬) রামাভিরাম রমণীয়নাম সমাজরিপু ভীম সাকেতধাম
বনজলোচন নীবলনয়লসিতিনি মনসুন দয়লেদুয়ল্লাভি কলমেমি
মনসুচেলি নীকে মরুলুকোন্নদিগানি চন্নুবুন চেয়িবট্টিমমুলরক্ষিম্পবু
কোরি কোরি নিন্নু গোলুবগনীদারি বেরৈনদি ধাত ব্রা লেমো
কমনীয়মগু পান্পু গবিক্ষিত নন্দু রমিয়িম্পকনন্নু রচ্চ জেসেদবু
দিক্কু নীবনি নেন্নু দিন দিন মুন্নু নম্মুয়েক্কুবতক্কুবলন্দু য়েনেসেড়ু গুণমেমো ?

অবশেষে মিলন। কবি সেই আনন্দের কথা বলিতেছেন : হে রাম, আমি তোমাকে কিরূপে পাইয়াছি জান? মানুষ যেমন একটা তুচ্ছ হারানো পয়সা খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ অমূল্য রত্ন পাইয়া যায়, সেইরূপ। অম্বলের প্রত্যাশা করিয়া যেমন অমৃত পাওয়া যায়, সেইরূপ। ক্লান্ত সাঁতারু হঠাৎ নৌকা পাইলে যে অবস্থা হয়, সেইরূপ। তীর্থযাত্রী যেরূপ তীর্থে উপনীত হয়, সেইরূপ ইত্যাদি।[৩৭]

আর একটি পদে ("রাম সীতারাম রাম রাজ") মিলনের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া কবি দুইটি উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন এইভাবে : সতী নারী যেরূপ পতি সেবায় আনন্দ পায়, আমার মনও সেইরূপ তোমার উৎসবে উৎফুল্ল হয়। লতা যেভাবে কল্পতরুকে জড়াইয়া ধরে, আমার মনও সেইরূপ যুগ যুগ ধরিয়া তোমাতে সংলগ্ন রহিবে।[৩৮] নিম্নলিখিত অংশটি ত্যাগরাজের মিলন পর্যায়ের একটি শ্রেষ্ঠ পদ। ইহার মধ্যে কবির আধ্যাত্মিক অনুভূতির মধুর পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে : তোমার প্রসাদ বারি আমার দিকে প্রবাহিত হউক। আমার যে আনন্দ তাহা বর্ণনাতীত। যখন তোমার কথা ভাবি আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। যখন তোমার দর্শন পাই, নয়ন বহিয়া আনন্দাশ্রু নামিয়া আসে। তোমার চরণ আলিঙ্গন কালে আমি দেহ-সত্তা ভুলিয়া যাই।

---

(৩৭) নন্নু ব্রোবকন্নু বিডবন্নুরা রাম!
কাসুন্নু বেতুকগ-গন্ন রত্ন মুরীতি
দোসমু তোল গিম্প দোরি কিতিবি গানি
অম্বলি দিন্নু বেল নমৃত মব্বিন রীতি
তুম্বুরু সন্নুত দোরি কিতিরি গানি
চেয়্যল সিনবেল দেপ্প দোরকুরীতি
নয়্যা না পালিটি-নমরিতি বিগানি। ইত্যাদি

(৩৮) সৎসতি পতি সেব জেয়ুচন্দমুন না মনস্সু
উৎসবমুলু জেয়ুট কুপ্পোঙ্গেন্নু রাম
কল্পভূজমুন তীগ কট্টরীতি মনস্সু
কল্পমু লেন্নেন বিড়িচি কদলদু শ্রীরাম।

তুমি যখন কাছে থাক, আমি সমস্ত চিন্তামুক্ত। যখন তোমার জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, সমস্ত জগৎ আমার কাছে তৃণবৎ তুচ্ছ হইয়া যায়।[৩৯]

ভক্ত কবি ত্যাগরাজের কাব্য-কৃতির যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল, তাঁহার সৃজনী-শক্তির তুলনায় তাহা নিতান্তই অপর্যাপ্ত। সঙ্গীতে ও কবিতায় যাহার পূর্ণতা, এমন এক একটি পদের অঙ্গ হইতে সুরের অলঙ্কারগুলি খুলিয়া ফেলিয়া আমরা তাহার নিরাভরণ রূপের সৌন্দর্য বিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছি মাত্র, তাহাও আবার গদ্য ভাষান্তরে। এমন অবস্থায় কবির প্রতি সুবিচার হইতে পারে না। অধ্যাপক রাঘবন্ ত্যাগরাজের রচনার কাব্যগুণ সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন, কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও এই প্রসঙ্গে তাহা উদ্ধরণ-যোগ্য বলিয়া মনে করি : Poetic fancies, learned allusious, moral precepts, enunciation of doctrines, high upanishadic truths, condemnation of sham, hypocrisy and false paths, happy similies, worldly wisdom, popular sayings, and above all every shade and mood of religious, devotional and spiritual experince,—renunciation of worldly good and the flattery of the rich, prayer, plaintive pleading, yearning, anguish, remonstrance, sportive rebuke, despair and dejection, self-depreciation, faith, hope, exhilaration, ecstacy of realisation, endearment, joy of service, surrender and dedication, satisfaction at his own devout life, gratitude—these make his

---

(৩৯) দয়রাণী দয়রাণী দাশরথী রাম !
বিবরিম্প দরমা রঘুবীরা নন্দমুনু রাম
তলচিতে মেনেল্ল বুলকরিঞ্চেনু রাম
কনুগোন নানন্দমৈ কন্নীরু নিণ্ডেনু রাম
চরণ কৌগিলি বেল জেলগি মৈসর চেনু রাম
চেন্তনুণ্ডগ নাদু চিন্তলু তোলগেনু রাম
আসিঞ্চুবেল জগমন্ত তৃণ মায়েনু রাম
শ্রী ত্যাগরাজুনি চেলিকাড়ু নীবে রাম ॥

songs an endless epic record of the mind of a great Bhakta which was, till the end, erupting like a ceaseless volcano.[৪০]

ভক্তিসাহিত্যের দিক হইতে দাক্ষিণাত্যকে দুইটি অংশে বিভক্ত করা চলে—দক্ষিণ ও উত্তর অর্থাৎ দ্রাবিড় ও কর্ণাটক। আজ আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি 'ভক্তি-সাহিত্য দ্রাবিড়ে উৎপন্ন হইয়া কর্ণাটকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল'। এখানে কর্ণাটক বলিতে মধ্যযুগীয় কর্ণাটক সাম্রাজ্যের কথা বলা হইতেছে বর্তমানে যেখানে কন্নড ও তেলুগু ভাষার প্রচলন। ষষ্ঠ হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যেমন তামিল ভক্তিসাহিত্যের যুগ, দ্বাদশ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত তেমনি কর্ণাটকী ভক্তি-সাহিত্যের যুগ। তামিলভক্তি সাহিত্যের শৈব ও বৈষ্ণব শাখা যেমন প্রায় সমান্তরাল ভাবে বহিয়া চলিয়াছিল, কর্ণাটকী ভক্তিসাহিত্যে কিন্তু তাহার অনুবৃত্তি ঘটে নাই। কর্ণাটকের কন্নড ও তেলুগু উভয় ভাষাতেই শৈব-সাহিত্যের যুগ দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত প্রসারিত। অতঃপর বৈষ্ণব-সাহিত্যের আবির্ভাব। ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত তাহার পূর্ণ প্রভাব।

সঙ্গীতের দিক হইতেও দ্রাবিড় ও কর্ণাটক এই দুই অঞ্চলের ভক্তিসাহিত্যের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। তামিল সাহিত্যের শৈব ও বৈষ্ণব উভয় ধারার পদাবলী সমভাবে গীত হইত। কর্ণাটকী সাহিত্যের বৈষ্ণব সাহিত্য যেমন গীতরূপ পাইয়াছে, শৈব সাহিত্যের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ শৈব সাহিত্যের আকৃতি ও প্রকৃতি। বৈষ্ণব সাহিত্যের একটা মুখ্য অংশ যেমন ভক্তচিত্তের বিচিত্র ভাবানুভূতি অবলম্বনে পদাকারে রচিত, শৈব সাহিত্যে আমরা তাহার আপেক্ষিক অভাব দেখিতে পাই। তেলুগু শৈব-সাহিত্যের প্রধান গৌরব তাহার প্রবন্ধ কাব্যগুলি, যাহার গীতরূপ কল্পনা করা সুকঠিন। কন্নড শৈবসাহিত্যে ভক্তচিত্তের হর্ষ-বেদনার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে প্রকাশমান হইয়া গীতি-কবিতার সগোত্র রূপ লইয়াছে সত্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে তাহা গীতসাহিত্যের উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করে নাই তাহার কারণ শৈবসাহিত্যের উৎকৃষ্ট রচনাগুলি বচন-সাহিত্য অর্থাৎ গদ্যবন্ধে রচিত।

দাক্ষিণাত্যের যে নিজস্ব সংগীত-ধারা কর্ণাটকী সঙ্গীত নামে পরিচিত, আধুনিক কালে তাহাতে দক্ষিণের সব ক'টি ভাষার প্রবেশ ঘটিলেও ঐ সঙ্গীতের নামকরণ হইতেই উহার তাৎপর্যটি বোঝা যাইবে। এই গীত-পদ্ধতির যাঁহারা

(৪০) The spiritual Heritage of Tyagaraja, Introduction, p. 4

প্রথম প্রবর্তক, যাঁহারা প্রথম পৃষ্ঠপোষক এবং যাঁহারা প্রথম বৈয়াকরণ, তাঁহারা সকলেই কর্ণাটকের অধিবাসী বলিয়া কালক্রমে ইহা কর্ণাটকী সঙ্গীত নামে পরিচিত হইতে থাকে।

কর্ণাটকী সঙ্গীতের সহিত কর্ণাটকী বৈষ্ণব সাহিত্যের যোগ অবিচ্ছেদ্য। তাই সঙ্গীতের উদ্‌ভব ও বিকাশের সহিত আন্ধ্র (তেলুগু-ভাষী) ও কন্নডিগ (কন্নড়-ভাষী) উভয় সম্প্রদায়ের সাধনা যুক্ত থাকিলেও, ইহা প্রধানত আন্ধ্র বৈষ্ণব কবিদের হাতেই অধিকতর সমৃদ্ধ হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। উদ্‌ভবের যুগে অবশ্য কন্নডিগ বৈষ্ণব কবি পুরন্দর দাসের দান সর্বাধিক স্মরণীয়। কিন্তু একথাও মনে রাখা প্রয়োজন, পুরন্দর দাস তাঁহার প্রথম যৌবনে বর্ষীয়ান্ তেলুগু বৈষ্ণব কবি অন্নমাচার্যের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। কর্ণাটকী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যে পল্লবি, অনুপল্লবি এবং চরণ[৪১] (অস্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারীর ন্যায়)—এই ত্রিবিধ অংশকে 'ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসকার শান্তমূর্তি একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উদ্‌ভাবন বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার সূচনা হয় পঞ্চদশ শতকের তেলুগু বৈষ্ণব কবি অন্নমাচার্যের হাতে।[৪২] অন্নমাচার্য যে 'তাল্লপাক' বংশের সন্তান, সেই বংশের আরও অনেক কবি তেলুগু কীর্তন রচনা করিয়া কর্ণাটকী সঙ্গীতের বিকাশ-সাধনে সহায়তা করেন।

পুরন্দর দাস ব্যতীত কনক দাস, জগন্নাথ দাস প্রভৃতি অন্যান্য কন্নডিগ বৈষ্ণব কবিগণ কর্ণাটকী সঙ্গীতে সমৃদ্ধিকল্পে যে সাধনা করিয়া গিয়াছেন তাহার গুরুত্ব ও মূল্যের কথা স্মরণে রাখিয়াও আমরা বলিতে পারি আন্ধ্রের সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য মহত্তর। কর্ণাটকী সঙ্গীতের উৎকর্ষ ও পরিমাণের আভাস পাইতে হইলে আমাদের তেলুগু ভাষার শরণাপন্ন হইতে হইবে। দাক্ষিণাত্যের ভক্তিসঙ্গীতের

---

(৪১) পল্লবি অনেকটা সূত্রের ন্যায়। একছত্র-বিশিষ্ট পল্লবিতে মূল কথার উপস্থাপনা। অনুপল্লবি হইল বৃত্তি—তাহাতে মূল কথার পরিবর্ধন। চরণ হইল ভাষ্য—তাহাতে বিষয়-বস্তুর ব্যাখ্যা ও সম্প্রসারণ। দুই বা চার ছত্র লইয়া এক একটি চরণ। এক একটি পদে চরণ সংখ্যা এক হইতে ছয়-সাত পর্যন্ত হইতে পারে।

(৪২) P. Sambamoorthy—History of Indian Music (1960) P. 30

একটা বৃহৎ অংশ হইল তেলুগু কীর্তন। কেবল তাহাই নয়, তেলুগু সঙ্গীত যেমন ভাষার বন্ধন অতিক্রম করিয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্যে তাহার আসন পাতিয়াছে, এমন সৌভাগ্য উত্তর ভারতে হিন্দী বা হিন্দুস্তানী সঙ্গীতও অর্জন করিয়াছে কিনা সন্দেহ। হিন্দী আর্যাবর্তের আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা হওয়া সত্ত্বেও তাহার সঙ্গীতকে যে মহৎ মর্যাদা দিতে পারে নাই, তেলুগু দাক্ষিণাত্যের প্রাদেশিক ভাষা হইয়াও তাহার সঙ্গীতকে সেই গৌরব অর্পণ করিয়াছে। তেলুগুর সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য আজ সমগ্র দাক্ষিণাত্যের সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

এমন এক সময় ছিল যখন তেলুগু সঙ্গীতের আদর্শ আন্ধ্রপ্রদেশের বাহিরে অন্যান্য ভাষা-ভাষীর মধ্যেও সঞ্চারিত হইয়াছিল। সপ্তদশ শতকের তেলুগু কবি ক্ষেত্রজ্ঞ বা ক্ষেত্রয়্যর সমকালেই আমরা ইহার পরিচয় পাই। তামিলনাড়ে তেলুগু সঙ্গীত ও নৃত্যের যে বিশেষ চর্চা হইত ইহা একটি স্বীকৃত সত্য। ক্ষেত্রয়্য-র পদের অনুসরণে তামিল কবিরা পদ-রচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন।[৪৩] কিন্তু তাহা তেলুগু পদের ন্যায় স্থায়ী হইতে পারে নাই। তেলুগু পদের গীত-মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া তামিল, কন্নড় ও মারাঠী কবিরাও তেলুগু শিক্ষা করিয়া উহাতে পদ-রচনার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই। একশত বৎসর আগে পর্যন্ত কাহাকেও দক্ষিণের গীত বিদ্যায় অধিকার অর্জন করিতে হইলে যত্ন করিয়া তেলুগু শিখিতে হইত।[৪৪] ইহা বিশেষ করিয়া সম্ভব হইয়াছিল অষ্টাদশ শতকে তামিলনাড়ের মৃত্তিকায় সেই বিশিষ্ট তিন আন্ধ্র সন্তানের আবির্ভাবে—সঙ্গীত-সাধনার ইতিহাসে যাঁহারা 'ত্রিমূর্তি' বলিয়া পরিচিত এবং যাঁহাদের রচনা ও সুর সাধনা আন্ধ্র তথা তেলুগুর ঐতিহ্যকে অসামান্য গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছে। সেই প্রসিদ্ধ ত্রিমূর্তির শ্রেষ্ঠ কবি ভক্তিরসরাজ ত্যাগরাজ।

তামিল বৈষ্ণব কবি নম্মালোয়ার সুদূর অতীতে একদিন হরিনামামৃতমত্ত

---

(৪৩) (অধ্যাপক রাঘবনের মন্তব্য) In the Tamil country, where the Telugu dance ane music heritage was most carefully preserved, Tamil versions and Tamil padas also, on the model of Kshetrajna's compositions, arose. First Anniversary Souvenir (1961), Andhra Sahitya Parishad, Calcutta. P. 60

(৪৪) ঐ

ভক্তবৃন্দের দিকে চাহিয়া আনন্দ-বিহ্বল কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"পোলিক পোলিক পোলিক"—জয় হোক জয় হোক জয় হোক ; জীবনের অভিশাপ দূর হইয়াছে, নরক যন্ত্রণা আর থাকিবে না, মর্ত্যলোকে যমরাজের কোনো কাজ নাই। ঠিক অনুরূপ সুরে ত্যাগরাজও গাহিলেন—চিন্তিস্তন্নাডে যমুড়ু—যমরাজ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন, কারণ "সন্ততমু সুজনুলেল্ল সদ্‌ভজন জেয়ুট জূচি"—সমস্ত সজ্জন সর্বদা ভজন কীর্তনে রত। এমন কি, জ্ঞানহীন যাহারা সহজেই যমদূতের শিকার হইত, তাহারাও আজ ত্যাগরাজের মঙ্গলকীর্তনে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে—সারমণি ত্যাগরাজু সংকীর্তনমু বাডেরল্লুচু। তাম্রপর্ণীর তীরে তামিল সন্তানের গানে যে আশার বাণী উদ্‌গীত হইয়াছিল, তাহাই যে আবার হাজার বছর পরে কাবেরী নদীর তীরে তেলুগু সন্তানের কণ্ঠে এমন করিয়া প্রতিধ্বনিত হইবে কে জানিত।

কাব্যনাট্য ও 'চার চোখ'

সুভাষ সরকার

য়ুরোপে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পূর্বানুসৃত রোমান্টিক নাট্যসাহিত্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন একদল নাট্যকার। এঁদের অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন নরওয়ের প্রখ্যাত নাট্যকার হেন্‌রিক ইব্‌সেন্‌। জীবনের ক্ষেত্রে যে বাস্তব ও রুক্ষ অনুভূতি মানুষকে কল্পনার অন্তঃপুর থেকে বহির্জগতে নির্ব্বাসিত করে, এঁদের মূল প্রস্তাব হলো তাকে মঞ্চে অভিষিক্ত করা, সর্ব্বসাধারণের গোচরে আনা। বাস্তবরোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে নতুন নাট্যশিল্পীরা তাঁদের রচনায় এক বিশেষ ধরনের ব্যবহারিক ও বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বাগত জানান। প্রাত্যহিক জীবনের মানসিক ও সামাজিক দ্বন্দ্বের কাহিনী প্রজ্ঞাশ্রিত বিশ্লেষণধর্ম্মী রচনার মধ্যে প্রকাশ করাই এঁদের অন্যতম আদর্শরূপে পরিগণিত হয়। আন্তর্লৌকিক চেতনা যা কল্পনায় বিশেষিত হয়ে উঠে, স্থান কাল পাত্রের ঊর্দ্ধে যে সার্ব্বিক অনুভূতি মানুষকে যথার্থ মহিমায় আত্মপ্রকাশ করতে সাহায্য করে তার শিল্পায়ন এই বাস্তবানুগ নাট্যসাহিত্যের পরিপন্থী। সামাজিক ও সমস্যামূলক আধুনিক নাটকগুলি তাই রিয়ালিজমের নামে চরিত্রচিত্রনে এক অভূতপূর্ব লঘুচিত্ততার পরিচয় দিয়েছে। বাস্তবধর্ম্মী নাট্যসাহিত্যে মানুষকে সামাজিক জীব হিসেবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, কিম্বা বিশেষ সামাজিক সমস্যা তথা জীবনাদর্শের অঙ্গ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর ফলে ব্যক্তিমানসের সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রকাশ সম্ভব হয়নি। বহির্জগতের সমস্যার পেছনে যে জটিল মানসিক পটভূমি তাকে বাদ দিয়ে শুধু বাস্তবতার দোহাই দিয়ে নাট্যসাহিত্যে যে সমাজ জীবনে আলোকচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে তার মধ্যে যথার্থ জীবনায়ন সম্ভব হয়নি। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে, রীয়ালিজমের শৈল্পিক প্রকাশ গদ্যের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে; কাব্যকে তাই নির্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে রঙ্গমঞ্চ থেকে। কিন্তু কাব্যের মধ্যে যে অন্তর্মুখীতা রয়েছে, জীবনের গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে আবেগ-সঞ্চারিত অনুভূতির যে ছন্দোবদ্ধ আত্মপ্রকাশ নিগূঢ় চেতনাকে রূপায়িত করতে সক্ষম, তার অনুপস্থিতি কয়েকজন চিন্তাশীল নাট্যকারকে কাব্যের আশ্রয়

নিতে উৎসাহিত করেছে। রঙ্গমঞ্চে কাব্যের পুনরাবির্ভাব অনেকাংশে বাস্তবধর্ম্মী নাটকের সীমিত জীবনবোধের জন্যই সম্ভব হয়েছে বলা চলে। কিন্তু আঙ্গিকের দিক থেকে কাব্যের আশ্রয় নিলেও, বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব বহু ক্ষেত্রেই নাটককে বিপর্যস্ত করেছে। নিছক কাব্যাশ্রয়ী নাটক হলেই যে তাকে যথার্থ কাব্যনাট্যের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না তার বহু দৃষ্টান্ত আধুনিক নাট্যসাহিত্যে মিলবে। মূলতঃ নাট্যসাহিত্যের ভবিষ্যত নির্ভর করে নাট্যকারের জীবনবোধ ও শৈল্পিক চেতনার উপর। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় নাটকে কাব্যের ব্যবহার নেহাৎ কাব্যকে মঞ্চে অধিষ্ঠিত করবার জন্যই। সেখানে নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করা যায় না। কাব্যনাট্য, কাব্য ও নাটকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার উদ্ভূত এক বিশেষ ধরণের নাটক। এর প্যাটার্ণ কিম্বা ব্যঞ্জনা কাব্যিক,—ঘটনার প্রক্ষেপন নাটকীয় এক বিষয়বস্তুর আন্তঃলৌকিক চেতনায় উদ্ভাসিত। অবশ্য সমারসেট মমের মত চিন্তাশীল সাহিত্যরথীও এক জায়গায় বলেছেন ঃ আধুনিক নাটক কাব্যের অলঙ্কারে সজ্জিত না হওয়ায় এর অনেকটা মূল্য হারিয়েছে। কাব্যকে নাটকের অলঙ্কার রূপে গ্রহণ করলে নাট্যসাহিত্যে আদৌ কাব্যনাট্যের আবির্ভাব ঘটতো কিনা সন্দেহ আছে। নাটকের চরিত্রের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব বা অন্তর্দ্বন্দ্ব নাট্যরসের সৃষ্টি করে তার যথাযথ রূপায়ন কাব্যের মাধ্যমেই সম্ভব। মানুষের নিভৃততম সত্তা ও নিগূঢ় জীবনবোধ নিত্যব্যবহার্য সংলাপের মধ্যে কখনই নিজস্ব রূপ পায় না। যা অন্তরের আবেগ রঞ্জিত, যা অন্তর্দৃষ্টির আলোক স্পর্শে উদ্ভাসিত তার রূপায়ন একমাত্র কাব্যের সিম্বল বা ইমেজের মধ্যেই ইঙ্গিতময় হয়ে উঠ্‌তে পারে। জন গ্যাসনার নাটকের ক্ষেত্রে কাব্যের অবদান সম্পর্কে বলেছেন, "Poetry is the precipitate of the chemical action of a writer's being—of his intrinsic, rather than superimposed or self-imposed feelings, perceptions, attitudes, and aptitude for expression." জটিল জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত নাটকের মধ্যে নাট্যকারের গভীর উপলব্ধিকে একমাত্র কাব্যই বাঙ্ময় করে তুল্‌তে পারে। শিল্পীর ব্যক্তিসত্তা কাব্যের চিত্রকল্প ও ছন্দের মধ্যে এমন একটি সহানুভূতিসূচক পরিবেশ খুঁজে পায় যা কখনই দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়।

বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত অনুভূতির প্রত্যক্ষ রূপদানের যে প্রচেষ্টা

আধুনিক কবিমানসে লক্ষ্য করা যায়, তা মূলতঃ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত। খুঁটিনাটি বিষয়ে জটিল অভিজ্ঞতার আত্মপ্রকাশ আজকের দিনে দর্শনেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করেই সম্ভব হচ্ছে। তাই রূপকল্প কবিতার অন্যতম সার্থক অবলম্বন। নাট্যকার হেনরিক ইবসেন স্বয়ং একথা স্বীকার করেছেন :

"To be a poet means essentially to see, but mark well, to see in such a way that whatever is seen is perceived by the audience just as the poet saw it."

আবেগ নাট্যসাহিত্যের মূল অবলম্বন। আবেগ-সঞ্চারিত অনুভূতি কাব্যের আশ্রয় ভিন্ন দর্শকবৃন্দের কাছে অভিপ্রেত রূপে পৌঁছতে পারে না। নাটকের মধ্যে যে ঘটনার সমাবেশ ও বিভিন্ন চরিত্রের প্রক্ষেপন সম্ভব, কবিতায় সে বিস্তার সম্ভব নয়। তাই সাম্প্রতিক কালের নাট্যসাহিত্যে কাব্যনাট্য রচনার যে প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করছি প্রধানত তাকে শিল্পীর আত্মপ্রকাশের একটা স্বাভাবিক প্রচেষ্টা বলেই মনে করবো। ভাষাগত অসম্পূর্ণতা যেমন নাট্যকারকে কবিতার আশ্রয় নিতে উৎসাহিত করছে, ঠিক তেমনি কবিকেও নাটকের প্যাটার্ণের মধ্যে তার বিচিত্র অনুভূতিকে রূপায়িত করতে অনুপ্রেরণা দান করছে। কাজেই যারা কাব্যনাট্যকে শুধু নাটকের দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করেনি, কিম্বা কাব্যের মানদণ্ডে বিচার করেন, অনেক ক্ষেত্রেই তারা কাব্যনাট্যের রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত। অবশ্য একথা স্পষ্টভাবেই বলা দরকার আঙ্গিকের দিক থেকে কাব্যনাট্য মূলতঃ নাটক ও পরিবেশে কাব্য, যদিও কাব্যিক ব্যঞ্জনাই এ বিশেষ ধরনের নাটকের উপজীব্য। এ প্রসঙ্গে আধুনিক ইংরেজ কবি-সমালোচক তথা নাট্যকার এলিয়টের উক্তিকে স্মরণ করা যেতে পারে :

"To work out a play in verse is to be working like a musician as well as like a prose dramatist : it is to see the thing as a whole musical pattern..... The verse dramatist must operate on you on two levels at once dramatically, with the characters and plot. The requirements for a good plot are just as severe as for a prose play.....it is fatal for a poet trying to write a play, to hope to make up for defects in the movement of the play by bursts of poetry which do not help the action.

But underneath the action, which should be perfectly intelligible, there should be a musical pattern which intensifies our excitement by reinforcing it with feeling from a deeper and less articulate level."

(The Listener—The Need for a Poetic Drama).

যে সমস্ত উৎসাহী কবি কবিতাকে বিস্তৃতি দান করবার জন্য রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন তাঁদের ক্ষেত্রে এলিয়টের এ উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ।

নাটকের আঙ্গিক বা রসরূপ সম্পর্কে যথার্থ সচেতন না হলে, অনেক ক্ষেত্রে কাব্যের বিচিত্র উপকরণ ও সম্ভার থাকা সত্ত্বেও কবির প্রচেষ্টা শুধু নাট্যকাব্যের রূপ পরিগ্রহ করে ।

চারটি আধুনিক কাব্যনাট্যের সঙ্কলন 'চার চোখ' পড়তে গিয়ে নিঃসংশয়ে মনে হল নাটক রচনার ক্ষেত্রে আধুনিক কবিদের অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। বস্তুতঃ কবিতাকে নাটকের আঙ্গিকে রূপদান করবার জন্য যে বিশেষ নাট্যশৈলীর প্রয়োজন, এঁদের মধ্যে তার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য মুখবন্ধে এঁরা বলেছেন—"কবিতার প্রকরণে নাটক লিখে নাটককে নতুন পরীক্ষার মুখোমুখি করা হয়নি। কাব্যকেই নতুনতর অভিজ্ঞতায় প্রবেশ করানো হয়েছে।"

আধুনিক কাব্যকে নতুন অভিজ্ঞতার পটভূমিতে নাটকের আঙ্গিকে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছেন এঁরা। এক্ষেত্রে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে নাটকের রসরূপ সম্পর্কে এঁরা সম্পূর্ণ সজাগ কিনা? শুধুমাত্র কাব্যের অনুভূতি ও উপাদান থাকলেই কাব্যনাট্য রচনা সম্ভব নয়। অবশ্য এলিয়ট কাব্যনাট্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন একমাত্র কবির পক্ষেই সার্থক কাব্যনাট্য লেখার প্রচেষ্টা করা সম্ভব। অপরদিকে বিখ্যাত নাট্য-সমালোচক গ্র্যান্‌ভীল্ বার্‌কার্ বলেছেন নাটকের আঙ্গিক, গঠননৈপুণ্য ও নাট্যরস সম্পর্কে বিস্তৃত অভিজ্ঞতা থাকলেই কাব্যনাট্য লেখা সম্ভব।

অর্থাৎ নাট্যকারের প্রস্তুতি না থাকলে কাব্যনাট্য রচনা সম্ভব নয়। মূলত এ কাব্যনাট্য সংকলনের রচয়িতারা সকলেই কবি। (একমাত্র গিরিশঙ্কর প্রধানত নাট্যকার). আধুনিক বাংলা কাব্যে এঁদের অনেকেরই স্বীকৃতি আছে। কিন্তু পড়তে গিয়ে মনে হল নাটকের বিষয়বস্তু ও রসরূপ সম্পর্কে এঁরা যথেষ্ট সচেতন। এ নাট্য-চেতনার মূলে হয়তো রয়েছে এঁদের প্রগতিবাদী মন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে বাংলাদেশের তরুণ লেখক ও শিল্পী সম্প্রদায় এক প্রগতিবাদী শিল্পীগোষ্ঠীর সৃষ্টি করেন। এই গোষ্ঠি আবার পরবর্তীকালে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। সাম্প্রতিককালে প্রগতিবাদী লেখকগোষ্ঠীর প্রচেষ্টায়ই সম্ভবত সর্বপ্রথম বাংলা রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন কাব্যাংশ জুড়ে দিয়ে এক নতুন ধরণের রচনা উপস্থাপিত করা হয়। কাব্যকে মঞ্চে অধিষ্ঠিত করবার এ অভিনব প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে আধুনিক কাব্যনাট্য রচনার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। 'চারচোখ' সংকলনটি এ নিরীক্ষারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মুখবন্ধে রচয়িতারা বলেছেন—"জীবনের সহযাত্রী হবার জন্যই কবিতা আজ নাটক হয়ে উঠেছে। যদি কেউ আপত্তি তোলেন যে নাট্যরূপ নিয়ে কবিতা আত্মরক্ষার পথ খুঁজছে, তাহলে বলবো কথাটা আংশিক সত্য। আত্মরক্ষা নয় আত্মপ্রসারই কাব্যকে কাব্যনাট্যের আঙ্গিনায় ঠেলে দিয়েছে"।

এ উক্তির পেছনে যে যুক্তিই থাক কাব্যনাট্য রচনার ভিত্তি হিসাবে এর কোন অস্তিত্ব নেই। কবিতার আত্মপ্রসারের জন্য রচিত কাব্য হয়তো নাটকীয় সত্তা লাভ করতে পারে কিন্তু কাব্যনাট্য হয়ে উঠ্‌তে পারে না। জীবনবোধ ও আন্তঃর্লৌকিক চেতনার সংযোজনই নয়—তার বাস্তব সম্মত দৃশ্যরূপ ও সার্থক রূপায়ন মূলত কাব্যনাটকের পটভূমি। শুধু কাব্যকে নাটকের আঙ্গিকে রূপ দেওয়া নয়, নাটককেও কাব্যের সাহচর্যে অন্তঃসলিলা করে তোলার মধ্যেই যত কারিগরি। আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই বলা হয়েছে কাব্যনাট্য এক বিশেষ ধরণের নাটক। অবশ্য একথাও স্বীকার করেছেন এঁরা মুখবন্ধে—"নাটকের কাছ থেকে সে নিল বৈচিত্র্যময় গতি আর নাটক তার কাছ থেকে গ্রহণ করল মন্ত্রোচ্চারণের যাদু।"

কবিতার এই 'যাদু'ই প্রধানতঃ নাটককে কাব্যের আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। 'চারচোখে'র রচয়িতারা যে সে কথা স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করেছেন তাঁদের রচনা থেকে তা বোঝা গেল। কিন্তু একথা স্বীকার না করে উপায় নেই—নাট্যচেতনা থাকলেও নাটকের বহিরঙ্গ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠতে পারেন নি এঁরা। একমাত্র গিরিশঙ্করের নাটিকাটির মধ্যে এর কিছুটা আভাস মেলে।

নাটকের প্লট না থাকলে নাট্যরসের যথার্থ পরিবেষণ সম্ভব নয়। প্লট অবশ্য দু'রকমের হতে পারে: বিস্তৃতিমূলক এবং ঘটনাবহুল। অনেক ক্ষেত্রে এ

দু'য়ের সম্মেলনে নাটকে রসঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন চরিত্রের সংযোজন ও পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে এক ধরণের প্যাটার্ণ সৃষ্টি হয়। এই প্যাটার্ণের মধ্যেই অনেক নাটকের সার্থকতা নির্ভর করে। একে বিস্তৃতিমূলক প্লট বলা যেতে পারে। অনেক সময় নাটকে চরিত্রের সংযোজন থাকে অত্যন্ত সীমিত পর্য্যায়ে কিন্তু ঘটনার বিস্তৃতিই প্রাধান্য লাভ করে। শেষোক্ত প্লটই ঘটনা-বহুল প্লট।

'চার চোখে'-এর কবিরা প্লট সম্পর্কে তেমন সচেতন নন। এর কারণ অবশ্য খুবই স্পষ্ট। একাঙ্কিকা কাব্যনাট্য রচনা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। এখানে ঘটনার ক্ষেত্রে যেমন বিস্তৃতির সুযোগ নেই, চরিত্র সংযোজনের ক্ষেত্রেও তাই। শীর্ষাঙ্কে পৌঁছেই যেন ঘটনা ও চরিত্রের অবতারণা। কাজেই চরিত্রের দ্বন্দ্ব কিম্বা অন্তর্দ্বন্দ্বের তরঙ্গশীর্ষেই একাঙ্কিকার যাত্রা। কিন্তু কবির অন্তর্মুখিতা অনেক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টির পরিপন্থী হতে পারে। চরিত্রের প্রস্তাবনা করতে গিয়েই হয়তো রচয়িতা নিছক কাব্যরসের সৃষ্টি করতে পারেন। নাটকের ঘটনা (লৌকিক তথা আন্তঃলৌকিক) সন্নিবেশিত করার মুখেই হয়তো কবির কাব্যসত্তা নাটকের রসরূপকে গ্রাস করে ফেলতে পারে। কাব্যনাট্য রচনার ক্ষেত্রে তাই পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনাই বিধেয়। এই নাট্য চতুষ্টয় পূর্ণাঙ্গ নাটকের রূপ পেলে হয়তো সার্থক কাব্যনাট্য হয়ে উঠতে পারতো।

চারটি নাটকের বিষয়বস্তু মূলত অভিন্ন। চারজন কবি যেন নাট্যকারের দৃষ্টিতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রেমের উৎসকে বিচার করতে চেয়েছেন। আধুনিক জীবনের জটিল সমস্যার অন্তরালেও হৃদয়ে যে অনুরাগ সঞ্চিত রয়েছে তাকে আশা করে মানুষ এখনও কল্পনার পাখা মেলে দিতে পারে। পৃথিবীর তপ্ত দীর্ঘশ্বাস থেকে খানিকটা মুক্তির আনন্দ পেতে পারে এই প্রেমের কল্পনায়। কিন্তু সমস্যাকীর্ণ সংসারে, বস্তুবাদের তাড়নায় বুঝি সে প্রেমও বিঘ্নিত, বিধ্বস্ত। আত্মপ্রবঞ্চনা ও মিথ্যা অহমিকার ঘেরাটোপে আজ হৃদয়ের প্রশান্তি হারিয়েছে মানুষ। প্রেম সংকীর্ণতার আঘাতে ক্ষত বিক্ষত।

কৃষ্ণ ধরের নাটক 'দ্বিতীয় নায়িকা' নায়ক-কবি অমলের দ্বিধাবিভক্ত মনের এক নাট্যরূপ। প্রেমের নিবিড় বন্ধনে অমল একদিন জড়িয়ে পড়েছিল রমার সঙ্গে। তারপর রমা তার সহধর্মিণী হয়ে এল সংসারে। কখন সংসারের কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে প্রত্যহের গ্লানিতে রমা সখার স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে শুধু

সাধারণ স্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হল অমলের কাছে। কবির রূপসন্ধানী অতৃপ্ত মন এ পরিবর্ত্তনে বিক্ষুব্ধ। কিন্তু এর পেছনে যে অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে যাচ্ছে সে কথা ভুলে যায় অমল। অমল এর জন্য স্ত্রীকেই দোষী সাব্যস্ত করে :

"আকাশ ? সে তো একজনই হতে পারতো,
হয়ে গেল ছোট্ট একটা নীড়,
ঘরে ফেরা পাখিদের মত।"

প্রেমের মধ্যে যে মুক্তির আনন্দ, যে শান্তি, তার সন্ধানে অমল তাই অস্থির। এই অস্থিরতা ও, শান্তিলাভের আকুতি অদ্ভুত নাটকীয় রূপ নিয়েছে একটা চিত্রকল্পের মধ্যে :

"তুমি যদি নদী হও, আমি তাতে ডুব দিই,
নদী হও, নদী হও যদি।"

কাব্যনাট্যে চিত্রকল্পের ব্যবহারের উপর নাটকের রসরূপ বহুলাংশে নির্ভরশীল। নাটকের একটি বিশেষ রূপকল্পের মধ্যে বিষয়বস্তু ইঙ্গিতময় হয়ে উঠতে পারে। কৃষ্ণ ধর রূপকল্পের ব্যবহার সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। নদীর চিত্রকল্প চিত্রকল্প ব্যবহার করে নাটকের মূল বিষয়বস্তু নায়কের অস্থিরচিত্ততা ও প্রেমের গভীরতায় শান্তিলাভের আকাঙ্ক্ষাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

কাব্যনাট্য রচনা করতে গিয়ে আধুনিক কবি কিম্বা নাট্যকারকে যে বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তা হল নাটকে কবিতার ব্যবহার যেন দর্শকদের মনে না করিয়ে দেয় তারা নিছক কবিতা শুনছে। বাস্তব জীবনে কবিতার ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। গদ্যময় জীবনে সার্থকরূপ তাই গদ্যের মধ্যে সম্ভব। কিন্তু জীবনের নিগূঢ় চেতনাকে রূপদান করতে কাব্যের প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে নাট্যকারকে সাধারণ জীবনে ব্যবহৃত ভাষার আশ্রয় নিয়েও তাকে কাব্যে রূপান্তরিত করতে হয়। নিঃসন্দেহে এটা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কৃষ্ণধরের 'দ্বিতীয় নায়িকা' পড়ে মনে হল, ইনি এ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তার নাটকে প্রতিদিনকার ব্যবহৃত ভাষার সার্থক কাব্যক রূপায়ন সম্ভব হয়েছে শব্দের সুষ্ঠু সংযোজনে ও ছন্দ-চাতুর্য্য মাধ্যমে। আবেগ তাড়িত অনুভূতির নাটকীয় প্রকাশ ছন্দের কৌশলে বাঁধা পড়েছে :

'গেরুয়া মাটির পথ, ঝাউ গাছ, বাউণ্ডুলে,
উত্তুরে বাতাস, শ্রাবণের বিপন্ন আকাশ
আর তুমি, তুমি,
তুমি।
প্রতিশ্রুতি? সে কথা মনে করাবো না
সে থাক আমার।"

কৃষ্ণধরের রচনায় মাঝে মাঝে বিদেশী লেখকদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রচনার সঙ্গতি বজায় রেখেই ইনি এ প্রভাবকে গ্রহণ করেছেন। এলিয়টের কাব্যে ও নাটকে মাঝে মাঝে যে উদ্ধৃতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় 'দ্বিতীয় নায়িকা' নাটিকাটির মধ্যেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। যেমন—

"তবে কি অমল ধবল পালে
লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া?"

অথবা—

"কী বলবো?
ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো"!

দু' এক জায়গায় এলিয়টের নাটকের প্রতিধ্বনিও লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য কৃষ্ণবাবু তাঁর স্বকীয়তায় এ প্রভাবকে আপন রচনার সৌকুমার্য্য বৃদ্ধির সহায়ক করেছেন। 'দ্য ওয়েষ্টল্যাণ্ডের' প্রারম্ভিক পর্য্যায়ে যে দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে এখানেও তার ছায়া পড়েছে।

"তুমি বসে পড়লে, হাঁপিয়ে উঠেছিলে
ডাকলে আমাকে ঃ অমল, হাত ধরো আমার"।

কৃষ্ণবাবুর নাটকে অমল ও কণ্ঠস্বরের যে সংলাপ সৃষ্টি করা হয়েছে নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে তা খুব সহায়ক নয়। অমলের অন্তর্দ্বন্দ্বকে অরুনাংশুর সঙ্গে তার কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়েও ফুটিয়ে তোলা যেতো। হয়তো সেটা বাস্তব সম্মত হোত। যেখানে টেলিফোন ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে নেপথ্যে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর অনেকটা পরিবেশকে অতিপ্রাকৃত করে তোলে।

রাম বসুর 'তন্দ্রা ভেঙ্গে ফেরা' বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের দিক থেকে যথার্থ কাব্যিক। নাটকে সিম্বল বা চিত্রকল্পের ব্যবহারে তার যথেষ্ট দক্ষতা আছে স্বীকার করতে হবে। জন্মবৃত্তান্ত রহস্যকে কেন্দ্র করে যে নাটকীয় পরিবেশ

সৃষ্টি করা হয়েছে তার রচনায় তার মধ্যে খানিকটা ঘটনার বিস্তার রয়েছে লক্ষ্য করা যায়। প্লট সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্যান্য নাটিকাগুলি থেকে তার প্রচেষ্টা সফলতর। দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত ভাষাকে কৃষ্ণবাবুর মতই দক্ষতার সঙ্গে কাব্যের পর্য্যায়ে উন্নীত করেছেন ইনি। অনুভূতির গভীরতার উপর কাব্যের রূপও যে কাব্যনাট্যে পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত এ কথাটা বিশেষভাবে নাট্যকারদের মনে রাখা উচিত। রামবাবু শব্দচয়নে ও চিত্রকল্পের ব্যবহার, এ বিষয়ে যথেষ্ট আত্মসচেতনা মাঝে মাঝে আবেগের গভীরতায় তার কাব্য অদ্ভুত নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছে—

আলোক ঃ

"সমুদ্রের শেষহীন ওঠা পড়া, সেই
নিষ্কলুষ নগ্নতায় আমি যেন আদিম কৃষক
তোমার চুলের মধ্যে বিভ্রান্ত জোনাকি
নোনতা জলের বিন্দু কণ্ঠায় গ্রীবায় অপরূপ মণি
উরুর কুণ্ঠিত তিল বিমর্ষ নক্ষত্র ॥"

শিখা ঃ পায়ে পড়ি চুপ করো, চুপ করো।

কাব্যনাট্যের বিশেষ আকর্ষণ তার সঙ্গীতময়তা। ক্রীষ্টোফার ফ্রাই বলেছেন, কাব্যনাট্যের গতি কাব্যের সঙ্গীতানুসঙ্গের উপর নির্ভরশীল। শ্রাবণের মাধ্যমে শ্রোতৃবর্গ দৃশ্যনাট্যকে গভীরতর পর্য্যায়ে উপলব্ধি করেন। রামবসুর নাটকে সংলাপের মধ্যে তার নিদর্শন রয়েছে। যেমন—

আলোক ঃ দুটি চোখে কি আছে তোমার ?
শিখা ঃ তোমার ইচ্ছার আলো।
আলোক ঃ কি রেখেছ লুকিয়ে ?
শিখা ঃ তোমার অনিষ্ট, পদ্ম।
আলোক ঃ তোমার দর্পিত ঠোঁটে কিসের সঞ্চয় ?
শিখা ঃ তৃষ্ণার গোলাপ।

রামবসুর নাটকেও এলিয়টের রচনার ছায়াপাত ঘটেছে। Four Quartets এর প্রতিধ্বনি রয়েছে তাঁর নাটকে—

"গলে মিশে গেল শব্দে ঐক্যে
অসম্ভবের দিকে

চূড়ান্তের দিকে
নৈঃশব্দ্যের দিকে।"

তাঁর নাটকের প্লট মনে হয় "The Family Reunion-এর Harryর জন্মরহস্যকে অবলম্বন করে রচিত। অবশ্য এলিয়টের নাটকে ঘটনার গতি জটিলতর ও দর্শনের গাম্ভীর্য্যে অন্তর্মুখী।

গিরিশঙ্কর মূলতঃ নাট্যকার। তার নাটকে চরিত্রের প্রক্ষেপন ও সংযোজনের মধ্যে যে বলিষ্ঠ নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁর রচনায় কাব্যের গতি বিঘ্নিত হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে ছন্দ-চাতুর্য্যের অভাবে।

সম্পূর্ণভাবে বিদেশী প্রভাবমুক্ত হওয়ায় তার নাটিকা দেশজ অনুভূতি দ্বারা পরিপুষ্ট, তাই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এড়াতে পারেননি তিনি। সাধারণভাবে নাটকে রূপকের আশ্রয় নিয়ে তিনি চরিত্রগুলিকে সিম্বলের মত ব্যবহার করেছেন। অবশ্য চরিত্রচিত্রনে যথেষ্ট বলিষ্ঠতার ছাপ রেখেছেন তিনি। অর্জ্জুনমণ্ডলের চরিত্রের মধ্যে যে দৃঢ়তা ও যৌবনের প্রত্যয় আছে তার নিদর্শন সচরাচর খেলে না।

গ্রাম্যজীবনের পটভূমিতে রচিত গিরিশঙ্করের কাব্যনাট্য 'চেরাগ বিবির হাট' বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। এ স্বাতন্ত্র্য মূলতঃ পরিবেশ রচনা ও চরিত্র চিত্রণের স্বাতন্ত্র্য। বিভিন্ন হাটুরেদের কথোপকথনের মধ্যে ও অর্জ্জুনের উক্তির মধ্যে যে স্বাভাবিক উচ্ছলতা ফুটে উঠেছে নাট্যরস সৃষ্টির পক্ষে তা অত্যন্ত সহায়ক। ভিন্নধর্ম্মী চরিত্রের সমাবেশে নাট্যকারের নৈর্ব্যক্তিক চেতনা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। চেরাগ বিবি, বুড়ো দাঁড়কাক, অর্জ্জুন মণ্ডল ও নবীন পটো আপন স্বকীয়তায় স্বাভাবিকতা লাভ করেছে। অবশ্য চরিত্রগুলির পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের পথে যথেষ্ট বাঁধার সৃষ্টি করেছে গিরিশঙ্করের রূপক বা সিম্বলের প্রতি অনুরাগ। 'চেরাগ বিবির হাট' তাই সাধারণ জীবনের পটচ্ছবি নয়। খুব সম্ভবতঃ মনে হয় নাট্যকার 'হাট' অর্থে জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রকেই বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। বাস্তববাদী যারা, বস্তুসংসারের দাবীকে যারা অগ্রগণ্য মনে করেন তাদের পানপাত্র উছলে উঠলেও জীবনকে তারা সম্পূর্ণভাবে জয় করতে পারেন না। হয় তো তারই কোন ইঙ্গিত রাখতে চেয়েছেন গিরিশঙ্কর নাটকের মধ্যে। বুড়ো দাঁড়কাক যেন অবিচ্ছিন্নভাবে কাল গণনা করে চলেছে। সময়ের প্রতিমূর্ত্তি যেন। অর্জুন উদ্ধত যৌবনের দাবী নিয়ে জোর করে আদায় করতে চেয়েছে

সব কিছু চেরাগ বিবির কাছ থেকে ; কিন্তু সব পায়নি। চেরাগ বিবি জীবনের পল্‌তে জ্বালিয়ে রেখেছেন সবার জন্যে। হয়তো তাঁর কাছে নীরব কর্মীর দাবীই মহত্তম দাবী। তাই চেরাগবিবি অর্জুনের কাছ থেকে এতকিছু পেয়েও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উপহার দিতে পারছে না তাঁর কাছে। নবীন পটোর 'মনটা'কে অলক্ষ্যে মূল্য দিয়ে ফেলেছেন তিনি।

নীরব সাধনার নিদর্শন তাঁর পটের লেখন চেরাগবিবিকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু নবীন পটো পেলেনা জীবনে কোন স্বীকৃতি। অবশ্য স্বীকৃতির প্রত্যাশাও সে করেনি। শুধু সময় তুলে দেয় জীবনের হাতে কোন নীরব সাধনার অঞ্জলি। আবার সময়ের দাবী মেটাবার জন্য জীবন তাঁর কাছেই বাঁধা রাখে সে সৃষ্টিকে। এভাবেই চলে জীবন যাত্রা।

চেরাগবিবির চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে নাট্যকার গিরিশঙ্কর মনে হয় কল্পনার জোয়ারে ভেসে গেছেন। অর্জুনের পাশে তাই চেরাগবিবিকে অত্যন্ত ম্লান ও অসহায় মনে হয়। রক্তমাংসে গড়া অর্জুনের মধ্যে যেন একটা স্পর্দ্ধা ও সজীবতা রয়েছে, জীবনের প্রতিমূর্ত্তি হয়েও চেরাগবিবি অনেকটা নিষ্প্রভ। খুব সম্ভবতঃ চেরাগবিবিকে সিম্বল হিসেবে ব্যবহার করতে গিয়ে তাঁকে যেন অবাস্তব চরিত্রে পরিণত করা হয়েছে। অর্জুনের দাবীর উত্তরে যখন সে দার্শনিক ভঙ্গিতে উত্তর দিচ্ছে, তখন স্বভাবতই মনে হয় তাঁর চরিত্রের স্বাভাবিকতাকে বিসর্জন দিয়েছেন নাট্যকার। চেরাগবিবির সঙ্গে অর্জুনের কথোপকথনের মধ্যে গিরিশঙ্কর একবারও অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রশ্নকে তুলে ধরেননি। অথচ তাঁর নাটকে প্রচুর সম্ভাবনা ছিল এখানে। নবীন পটোর প্রতি তাঁর ভালবাসা ও অপর পক্ষে অর্জুনের উদ্দাম ও আন্তরিক প্রেমের টানে দ্বিধাবিভক্ত সত্তাকে ফুটিয়ে তুল্‌লে এ নাটক যথার্থ রসোত্তীর্ণ হতে পারতো। 'চেরাগবিবির হাট'-এর রচয়িতা যদি কাব্যের আশ্রয় না নিয়ে গদ্য কাব্যে তাঁর নাটক রচনা করতেন, নাটিকাটি হয়তো আরও সবল ও স্বাভাবিক হতো। সব সময়েই যে ছন্দোত্তীর্ণ কাব্যের আঙ্গিকে কাব্যনাট্য লিখতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত নয়। আইরিশ নাট্যকার Synge কেমন সাবলীল ভঙ্গিতে গ্রাম্য জীবনের ভাষাকে কাব্যনাট্যের পর্য্যায়ে উন্নীত করেছেন তার 'Riders to the Sea' নাটকে। গিরিশঙ্কর তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারতেন।

'চারচোখ' এর সর্বশেষ নাটক 'সংলাপ' নাট্যকারের বিক্ষিপ্ত সংলাপ বলেই

মনে হল। দিলীপ রায়ের এ রচনাটি বিশেষ অর্থে নাট্যকাব্যরূপে পরিচিত হতে পারে। কাব্যের অন্তরঙ্গতা ও মাধুর্য্যে মুগ্ধ করে দেবার মত যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর রচনায়। মনে হল চিত্রকরের মত 'ইম্প্রেসনিষ্টিক' ভঙ্গিতে তিনি তুলি চালিয়ে গেছেন। এ নাটিকাটিতে জীবনের অতলস্পর্শী বিদ্রূপকে কবি যেন বরণ করে নিয়েছেন সৈনিকের মত। আধুনিক সমাজের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখার এক প্রচেষ্টা রয়েছে এখানে। কিন্তু নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি বিভিন্ন চরিত্রের বিক্ষিপ্ত উক্তির মাধ্যমে। নাটকের গতি যেন কাব্যের ব্যঞ্জনায় কোথায় হারিয়ে গেছে।

রবীন্দ্রোত্তর নাটক ঃ ভূমিকা

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

১৮৫০-এ ইবসনের প্রথম নাটক বেরোয়—'ক্যাটিলিনা'; আর ১৯৫০-এ বেরোয় এলিয়টের 'দি ককটেল পার্টি'। এই এক শো বছর ইয়োরোপীয় নাটকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাল। এই একশো বছরের মধ্যে তাঁদের নাট্যজীবনের চূড়ান্ত ফসল দিয়েছেন—ইবসেন, ষ্ট্রিণ্ডবার্গ, শেখভ্, শ, সীন্‌জ, মেটারলিংক, হাউপ্‌টম্যান, পিরান্‌দেল্লো, ইয়েট্‌স্, এলিয়ট্ এঁরা। খুব সাধারণভাবে বললে এ কথা বলা যায় যে এ কালের সূচনা ন্যাচারালিজ্‌মকে অবলম্বন করে, এবং পরিণতি সিম্বলিজ্‌মে ও কাব্যনাট্যের পুনরুজ্জীবনে।

ইবসেন তাঁর আদি নাটকগুলি ছন্দে লিখলেও পরে স্বেচ্ছায় চাইলেন ঃ

'Everyday contemporay situations', 'everyday, ordinary characters' এবং 'plain language spoken in real life.'

কিন্তু দৈনন্দিন মুখের ভাষায় সীমাবদ্ধতা আছে। এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার প্রচেষ্টায় কেউ গেলেন সিম্বলিজমের দিকে, কেউ কাব্যনাট্যের দিকে। যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, সেই ভাষাতীতকে কেউ প্রকাশ করতে চাইলেন প্রতীকের দ্যুতির সাহায্যে, কেউ মনে করলেন ঃ

The human soul, in intense emotion, strives to express itself in verse ...The tendency.....of prose drama is to emphasise the ephemeral and superficial; if we want to get at the permanent and universal we tend to express ourselves in verse. (Eliot : A Dialogue on Dramatic Poetry.)

এবং, কাব্য নাট্য —

'...should remove the surface of things, expose the underneath, or the inside, of the natural surface appearance. It may allow the characters to behave inconsistently, but only with

respect to a deeper consistency. (S. L. Bethell-এর বইয়ের এলিয়ট লিখিত ভূমিকা।)

১৮৫০—১৯৫০ এই শতবর্ষের আশি বছর জুড়ে রবীন্দ্রনাথের জীবৎকাল—গোড়ার ও শেষের দশটা বছর বাদ দিয়ে। এই শতবর্ষের হাওয়াতেই রবীন্দ্রনাথ নিশ্বাস নিয়েছেন। এদিকে রবীন্দ্রনাথের আগে পর্যন্ত বাংলা নাট্যসাহিত্যে একচ্ছত্র প্রভাব শেক্‌স্‌পীয়রের। রবীন্দ্রনাথেরও প্রথম যুগের নাটকে শেক্‌স্‌পীয়রের ছায়া দুর্লক্ষ্য নয়। তাঁর যাত্রা সেক্‌স্‌পীয়র থেকেই সুরু। তারপর তিনি এলেন সমসাময়িক ইয়োরোপের সংস্পর্শে। তাঁর মন ন্যাচারালিজমের খুব অনুকূল ছিল না। সমসাময়িক দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা তাঁর নাটকের বিষয় নয়। (প্রহসনগুলি ব্যাতিরেকে; দ্বিতীয় ব্যতিক্রম, রক্তকরবী প্রভৃতি, যেখানে সমসাময়িক জীবনকে নেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু অ্যাব্‌ষ্ট্রাক্‌শন-রূপে।) তাঁর সংলাপও জীবনের আটপৌরে ভাষায় নয়। সব চরিত্রেই রবীন্দ্র-সুলভ ভাষা। এ ছাড়াও তাঁর ছিল সর্বগ্রাসী লিরিক-প্রবণতা; ন্যাচারলিজম তাঁকে বিশেষ আকর্ষণ করেনি। ক্রমে সিম্বলিজম্ ও কাব্যনাট্যকে (শেষে নৃত্যনাট্যকে) তিনি প্রধানত গ্রহণ করেছেন, এবং বাংলা নাট্যসাহিত্যকে ইয়োরোপীয় নাটকের সঙ্গে সমরেখায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটক ন্যাচারালিজমকে প্রধানত গ্রহণ করেছে। সমসাময়িক পরিস্থিতি, সাধারণ মানুষ, সাদাসিধে দৈনন্দিন ভাষা—এই চেয়েছেন রবীন্দ্রোত্তর নাট্যকারেরা। এর দুটো পর্ব আছে বলা যায়। তিরিশের দশক গণনাট্য আন্দোলন সুরু হবার আগের পর্ব, আর চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশক তার পরের পর্ব। চল্লিশ-পঞ্চাশের পর্ব ন্যাচারালিজমের শ্রেষ্ঠ অংশের অভিমুখী। রাজনৈতিক সামাজিক সচেতনতাও বেশি, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা ও সংগ্রামকে রূপায়িত করবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল। কিন্তু উভয় পর্বের রীতি মুখ্যত ন্যাচারিলিজ্‌ম্-আশ্রয়ী।

খুব হালে অবশ্য সিম্বলিজম্ ও কাব্যনাট্যে সামান্য কিছু পরীক্ষা হয়েছে, কিন্তু তা সামান্য।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের প্রধান নাট্য-মাধ্যম নৃত্যনাট্য। 'সারফেস্ অফ থিংস্'-কে সরিয়ে একেবারে অন্তর্নিহিত ভাবকে রূপ দিতে চাইছিলেন তিনি, যে-ভাব স্বভাবতই কাব্য, স্বভাবতই সঙ্গীত। দেহের নীরব সঙ্গীত—নৃত্য—

মাধ্যমে তিনি তাঁর নাট্যসমস্যার মীমাংসা করেছিলেন। এই নৃত্যনাট্যের ধারা রবীন্দ্রোত্তর যুগে তিরোহিত হয়েছে। কোলকাতায় বহু নৃত্যপ্রতিষ্ঠান অবশ্য 'নৃত্যনাট্য' পরিবেশন করে থাকে। কিন্তু সেগুলি 'নৃত্যসংকলন' মাত্র, নৃত্যনাট্য নয়।

॥ ২ ॥

প্রাক্-রবীন্দ্র নাটক সাহিত্যগুণে ছিল দীন। রবীন্দ্র-নাটক সাহিত্যগুণে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। রবীন্দ্র-নাট্য এমন একটা উন্নত মানের সাহিত্যও, যা কল্পনাশীল পাঠকের কাছে অভিনয়-নিরপেক্ষভাবে-ও অনেকখানি স্বয়ংসম্পন্ন।

রবীন্দ্রোত্তর নাটকে এই সাহিত্যগুণ রবীন্দ্র-মানকে অনুসরণ তো করেই নি, বরং তা যথেষ্ট নিম্নধারায় প্রবাহিত। রবীন্দ্রোত্তর গল্প-উপন্যাস ও কাব্য যে সাহিত্যমানকে ধারণ করে আছে, তা রবীন্দ্রোত্তর নাটক পারে নি। এর একটা কারণ হয়তো সে-রকম নাট্যকারের অভাব। দ্বিতীয় কারণ, প্রযোজকরা (নবনাট্যের সংঘগুলিসহ) প্রায় সকলেই মঞ্চকলা ও অভিনয়কে মুখ্য মনে করেন, (অনেকে অভিনয়কেও গৌণ ভাবেন।) নাটক তাঁদের কাছে 'স্ক্রীপ্ট' মাত্র। ফলে মঞ্চকলা প্রায় আলাদা একটা আর্ট হয়ে মঞ্চে একাধিপত্য বিস্তার করছে, এবং নাটক বেচারী রক্তহীন 'স্ক্রীপ্ট' হিসাবে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। অসংখ্য 'মঞ্চসফল' নাটকের নাম করা যায় যা সাহিত্য হিসেবে অকিঞ্চিৎকর। মঞ্চকলা পরিত্যাজ্য নয় নিশ্চয়ই কিন্তু তার ভূমিকা নাটকের অধীন, নাটককে ছাপিয়ে নয়। নাটকের মুড্ ও আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য তার অস্তিত্ব। যতক্ষণ সে এই ভূমিকায় আছে, ততক্ষণ তাকে বলি মঞ্চকলা; আর নাটককে অতিক্রম করে যখন সে নিজেই মঞ্চের বাদশা, তখন তা মঞ্চকৌশল মাত্র।

আধুনিক প্রযোজকদের ঝোঁক কোন্ দিকে বোঝা যাবে নর্মান মার্শালের এ উক্তি থেকে :

The producer is an independent artist; using other artists and co-ordinating their arts into a whole which is the composite art-of-the-theatre. The author contributes a framework, ideas, dialogue, the designer...architectural form, the actors...sound and movement, and the whole is built up by the producer into

what should be a work of theatre-art. (The Other Theatre, p. 64.)

প্রযোজক কতখানি 'ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্ট', এই মাত্রা নিয়ে প্রশ্ন তোলবার অবকাশ আছে এখানে।

নর্মান মার্শালের মত খুব প্রতিনিধি-স্থানীয় মত। তিনি নিজে একজন বিশিষ্ট প্রযোজক (লিট্‌ল্ থিয়েটার্স্) এবং ওয়েষ্ট এণ্ড থিয়েটারের ত্রুটি সম্পর্কে অত্যন্ত স্বচ্ছ-দৃষ্টি। টেরেন্‌স্ গ্রে-র নিরীক্ষা-মূলক কাজের আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রে-র মতহিসেবে পূর্বোক্ত কথাগুলি লিখেছেন উনি ; এটা নর্মান মার্শালেরও মত। তিনি শেক্‌সপীয়রের নাটককেও 'স্ক্রীপ্ট' নামেই উল্লেখ করেছেন। (The Other Theatre, p 63)

এই জাতীয় মনোভাব আমাদের প্রযোজকদের মধ্যেও বর্তমান। একটা 'স্ক্রীপ্ট' বা 'ফ্রেমওয়ার্ক' হলেই তাঁদের চলে। বাকী সবই তাঁদের হাতে প্রস্তুত আছে। এ দৃষ্টিভঙ্গি প্রযোজকদের ছাপিয়ে সাধারণের মধ্যেও কিছুটা এসে পড়েছে, এবং হয়তো নাট্যকারদেরও প্রভাবিত করছে। নাটকের একটা 'ফ্রেমওয়ার্ক' বা 'আইডিয়া' বা 'ডায়ালগ' তৈরী করে দিতে তাঁরা সচেষ্ট।

পাশ্চাত্যে অবশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট জোরালোভাবে থাকলেও তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিপক্ষ-মতও আছে। সাহিত্য ও নাটকের এই বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে এলিয়ট বলেছেন তাঁর 'ফোর এলিজাবেথান ড্রামাটিস্টস্' প্রবন্ধে। রেমণ্ড উইলিয়াম্‌স্ এই সূত্র অনুসরণ করেই বলেছেন,

'Performance is the means of communication of dramatic literature'. (Drama from Ibsen to Eliot. p. 21.)

অভিনয় হচ্ছে নাট্যসাহিত্যের 'মিন্‌স্ অফ্ কমিউনিকেশন্'। কাব্যসাহিত্য আবৃত্তির মাধ্যমেই নিজেকে সুষ্ঠুভাবে পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়ে সংলগ্ন হতে পারে, কিন্তু তাই বলে আবৃত্তি নামের কর্মটাই চূড়ান্ত কাব্য নয়। অভিনয়-কর্ম ও নাটকের সম্পর্কও একেবারে এক না হলেও কিছুটা ঐ রকম্ ; অভিনয় বা প্রযোজনা আবৃত্তির থেকে অনেক বিস্তৃত জটিল যৌথকর্ম, সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ নেই।

এসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সুনির্দিষ্ট মত আছে। 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধটি ১৩০৯

সালের পৌষ-সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় ষাট বছর আগে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন, তা একটু বিস্তৃত হলেও তুলে দিচ্ছি :

'ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমঞ্চের বর্ণনা আছে। তাহাতে দৃশ্যপটের কোনো উল্লেখ দেখিতে পাই না। তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল এরূপ আমি বোধ করি না..... । ছবিটা কেন। আমার মতে তাহাতে অভিনেতার অক্ষমতা কাপুরুষতা প্রকাশ পায়। এইরূপে যে উপায়ে দর্শকদের মনে বিভ্রম উৎপাদন করিয়া সে নিজের কাজকে সহজ করিয়া তোলে, তাহা চিত্রকরের কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া আনা।'

ঐ প্রবন্ধেরই অন্যত্র : 'সাহিত্য পাঠ করিবার সময় আমরা সকলেই মনে মনে অভিনয় করিয়া থাকি ; সে-অভিনয়ে যে কাব্যের সৌন্দর্য খোলে না সে কাব্য কোনো কবিকে যশস্বী করে নাই। বরঞ্চ এ কথা বলিতে পার যে, অভিনয়বিদ্যা নিতান্ত পরাশ্রিতা। সে অনাথা নাটকের জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে। নাটকের গৌরব অবলম্বন করিয়াই সে আপনার গৌরব দেখাইতে পারে। স্ত্রৈণ স্বামী যেমন লোকের কাছে উপহাস পায়, নাটক তেমনি যদি অভিনয়ের অপেক্ষা করিয়া আপনাকে নানা দিকে খর্ব করে, তবে সেও সেইরূপ উপহাসের যোগ্য হইয়া ওঠে। নাটকের ভাবখানা এইরূপ হওয়া উচিত যে, আমার যদি অভিনয় হয় তো হউক, না হয় তো অভিনয়ের পোড়াকপাল—আমার কোনই ক্ষতি নাই।

'যাহাই হউক, অভিনয়কে কাব্যের অধীনতা স্বীকার করিতেই হয়।'

এর মধ্যে দুটো কথা বড় হয়ে আছে। এক, মঞ্চসজ্জার গুরুত্ব কম দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। (এ কথা সজ্জা ছাড়াও মঞ্চকলা সম্পর্কেই হয়তো সামগ্রিক ভাবে প্রযোজ্য।) দুই, অভিনয় নাটকের অধীন ; অভিনয়ের কথা ভেবে নাটক নিজেকে খর্ব করবে না।

নিজের নাটকের সাহিত্যশক্তি সম্পর্কে এতখানি আস্থাশীল নাট্যকার একালের বাংলাদেশে কজন আছেন বলা শক্ত।

॥ ৩ ॥

প্রাক্‌রবীন্দ্র বাংলা নাট্যসাহিত্য গঠনের দিক থেকে শেক্‌স্‌পীরীয়। রবীন্দ্রনাথ নাটককে পেয়েছিলেন এইখানে, ছেড়েছেন আধুনিক ইয়োরোপীয় নাটকের সমরেখায় এসে। একথা গঠনকৌশলের দিক থেকেও সত্য।

শেক্‌স্‌পীরীয় বহু-দৃশ্য-বিভাজিত পঞ্চাঙ্ক ব্যাপ্তিকে তিনি কালক্রমে এক-দৃশ্য নাটকের তীক্ষ্ণ সংহতি দান করেছিলেন। নিতান্ত আবশ্যকের ভিত্তির ওপর অপরিহার্যকে আকার দিয়েছিলেন তিনি।

এই গঠনসৌকর্যের দিকে প্রখর না হোক, মোটামুটি দৃষ্টি রবীন্দ্রোত্তর নাট্যকারদের অনেকের আছে। তিরিশের পর্বের তুলনায় চল্লিশের দশকে, এবং চল্লিশের তুলনায় পঞ্চাশের দশকে এই গঠন-সচেতনতা ক্রমে বাড়ছে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের পেশাদারী মঞ্চে কোনো দিনই তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি—না নাটকের ক্ষেত্রে, না মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে। এ কালে চল্লিশের আমল থেকে আপেশদারী নাট্য আন্দোলন যে ব্যাপক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিল, তার প্রভাব এখন পেশাদারী মঞ্চেও কিছুটা অনুভব করা যাচ্ছে।

চল্লিশের দশকেই শিশিরকুমার ভাদুড়ী তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' মঞ্চস্থ করেছিলেন। তুলসীবাবু 'দুঃখীর ইমান' লিখেছিলেন অনেকটা নবান্নের প্রেরণায়, এবং 'নবান্ন'-র সাফল্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে 'দুঃখীর ইমান' করতে উৎসাহ দেয়।' (সুধী প্রধান, নব-নাট্য আন্দোলন প্রসঙ্গে, সূত্রধার, আশ্বিন, ১৩৬৮)।

অবশ্য শিশিরবাবু রবীন্দ্র-নাটককে পেশাদারী মঞ্চে এনেছিলেন। কিন্তু তার বিশেষ কোনো স্থায়ী দাগ থাকে নি। 'দুঃখীর ইমান'-ও চল্লিশের দশকে প্রায় একক।

পঞ্চাশের দশকে কোলকাতার চারটি স্থায়ী পেশাদারী মঞ্চের মধ্যে এক 'ষ্টার' একটু সাবেকী চালে চালিত। বাকী তিনটি মঞ্চেই কোনো না কোনো ভাবে অপেশাদারী নাট্যাভিনয়ের প্রভাব পড়েছে। এ প্রভাব কোথাও নাটক বা অভিনেতা নির্বাচনে অথবা মঞ্চকলার ক্ষেত্রে, কোথাও স্বাভাবিক অভিনয়ভঙ্গি বা টিমওয়ার্কের গুরুত্বদানে, কোথাও হল্‌-এর সাময়িক বা স্থায়ী ইজারা-দানে।

রবীন্দ্রোত্তর কালের এক নতুন শাখা বলা যেতে পারে একাঙ্ককে। রক্তকরবী বা মুক্তধারা অবশ্য একটি দৃশ্যে সমাপ্ত, তবে এগুলি পূর্ণ-দৈর্ঘ্য নাটক। স্বল্প-আয়তনের মধ্যে অতিরিক্ত কেন্দ্রসংহত একাঙ্ক তিনি লেখেন নি। ('হাস্য-কৌতুক' ইত্যাদির লেখাগুলি ঠিক নাটক নয়, অনেকটা নক্‌সাজাতীয়, স্কেচ।) কতকগুলি সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে থেকে বোধহয় বাংলা একাঙ্কের উদ্ভব ও প্রসার; ইয়োরোপীয় আদর্শের প্রেরণা অবশ্যই এর সঙ্গে যুক্ত।

অল্প দিনের মধ্যেই একাঙ্ক বিশেষ অগ্রগতি লাভ করেছে এবং উজ্জ্বল একটি শাখার প্রত্যাশা জাগিয়েছে। বাংলা উপন্যাসের চেয়ে যেমন বাংলা গল্প বয়সে নবীন হয়েও শিল্পকর্মে বেশি পরিণত হয়েছে, তেমনি পূর্ণ দৈর্ঘ্য নাটকের তুলনায় একাঙ্কের জন্ম পরে হয়েও হয়তো বাঙ্গালী লেখকের হাতে এর দ্রুত পরিণত বিকাশ ঘটতে পারে। অন্তত তার কিছু লক্ষণ নিঃসন্দেহে পরিস্ফুট।

'একতা'-র সৌজন্যে।

রক্তকরবীর শিল্পরূপ

গিরিশংকর

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবিই হোন আর গীতিকারই হোন তিনি বিভিন্ন চরিত্রের অনেকগুলো নাটক লিখেছিলেন। তাদের সংখ্যা কম নয়। যেকোন নাট্যকার শুধুমাত্র ঐ সংখ্যার জোরেই বুক বাজিয়ে আহ্লাদিত হতে পারেন। গুণগত বিচারের চুলচেরা হিসেবে পা না বাড়িয়ে বলা যায়, তাঁর যে কটি নাটক উৎরেছে তারও সংখ্যা উপেক্ষা করার মত নয়। রক্তকরবী নাটকের আলোচনায় একথাগুলো একবার স্মরণ করে রাখা ভাল।

রক্তকরবী রচিত হবার আগে রবীন্দ্রনাথের কিছু নাটকের মধ্যে একটা নতুন লক্ষণ ক্রমশঃ দেখা দিতে থাকে যাকে অনেকেই সেদিন ভেবেছিলেন তাঁর কাব্যপ্রতিভার অপপ্রভাব। আজ অবশ্য অন্যকথা ভাবার সুযোগ উপস্থিত। আজ ভাবা যেতে পারে রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্তকরবী, রথের রশি পর্যায়ের নাটকগুলোর বৈশিষ্ট্যে এসে পৌঁছোবার তোরণ ছিল ঐ বিশেষ ঝোঁক। রবীন্দ্রচেতনার বিকাশের একটা ধারা এ পর্যায়ের নাটকগুলোর মধ্যে বিধৃত। আর এ চেতনাটা মানুষের মুক্তির মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কিত।

তাই 'রাজা' নাটক মানবাত্মার অন্তর্দ্বন্দ্ব যেখানে রহস্যঘন অরূপরতনের মোহনায় পৌঁছুবার অন্তরায় মানুষেরই অন্তরজগতে। সমাজ সেখানে নিরপেক্ষ, পরিবেশ নিষ্ক্রিয়। ভারতীয় দর্শনের এ্যাবষ্ট্রাকশানটুকু এ চিন্তায় পরিস্ফুট। জন্মসূত্রে পাওয়া ভারতবর্ষের বাণী রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হওয়া আশ্চর্য নয়। পরবর্তী নাটক দুটি 'ডাকঘর' আর 'অচলায়তন' মৌল অর্থে মুক্তির নাটক। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক চিন্তায় বিবর্তন আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যাবে ঠাকুরবাড়ির পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সবদিকের জানালাগুলো খোলা থাকার ফলে বাইরের আলো বাতাস প্রচুর পরিমাণে ভেতরে এসেছে। স্বভাবতই তিনি ক্রমশ তার পরিবেশ সমাজ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছেন। এ কথাই 'ডাকঘর' আর 'অচলায়তন' আলোচনায় সমর্থিত হবে। ডাকঘর নাটকেও প্রার্থিত মুক্তির ইঙ্গিত রহস্যের মোড়কে মোড়া রাজার সঙ্গে মিলনে। কিন্তু

তার অন্তরায় বাইরে, অমলের মনের ভেতরে নয়। আর অচলায়তনে সমাজ তো খোলা হাটের মাঝখানে বুক ফুলিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর মুক্তধারাতে যন্ত্র একটা চরিত্র যা গোটা নাটকের পরিণতিকে প্রভাবিত করেছে। এই নাটকগুলি সম্পর্কে বলা যায় যেন রক্তকরবী রচনার একটা প্রস্তুতিপর্বের ইঙ্গিত এগুলোর মধ্যে রয়েছে।

ব্যক্তি মানুষের অন্তরের দুর্বলতা, সামাজিক কুসংস্কার এবং গুটিকয় মানুষের লোভ আর দম্ভের পেষণ এগুলোই হচ্ছে মানব মুক্তির অন্তরায়। মানুষের মুক্তির এই তিন প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ কলম হাতে নিয়েছিলেন অন্ততঃ আলোচ্য নাটকগুলোর ঘনিষ্ঠ আলোচনায় তাই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। রক্তকরবীতে একইকালে এই তিনটি বিরোধী শক্তির সঙ্গে মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষার তিনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ [বৃহত্তর অর্থে পরস্পর নির্ভর] শ্রেণীবদ্ধ সংঘাত সংঘর্ষ ও তার পরিণতির রূপ দেখতে চেয়েছেন।

প্রচলিত নাট্যাদর্শ মেনে চললে এই একই বিষয়ে একাধিক নাটক রচনা উচিত। রবীন্দ্রনাথও তা করেছেন [রাজা, ডাকঘর ইত্যাদি]। কিন্তু গোল বেধেছে রক্তকরবী রচনা নিয়ে। চলতি নাটকের ফর্মায় কিছুতেই রক্তকরবীকে ধরা যাচ্ছে না। অথচ এর বিস্ময়কর আকর্ষণও উপেক্ষা করা অসম্ভব।

মানুষের মুক্তি সংগ্রামের এমন সার্বিক রূপ ইতিপূর্বে কোন নাট্যরচনায় চেষ্টিত হয় নি। সেই সংগ্রামের যে কোন একটি শ্রেণীবদ্ধ সংঘাতকেই সকলে প্রাধান্য দিয়েছেন—প্রয়োজনবোধে অন্য ক্ষেত্রকে স্পর্শ করেছেন মাত্র। কিন্তু ঝোঁক পড়েছে মূলত একটি ক্ষেত্রেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এই সত্যে উপনীত হয়েছিলেন যে মানুষের বন্ধনটা বাইরে থেকে এলেও তার ব্যক্তি এবং সমাজগত দুর্বলতা সে বন্ধনের জন্য কিছু কম দায়ী নয়। এই কথা তার রাজনৈতিক ক্রিয়া কলাপ ও প্রবন্ধ সাহিত্য বিশ্লেষণে পরিষ্কার হবে। তাই তিনি রক্তকরবীতে যেমন সর্দার স্থাপিত খুঁটিতে খুঁটিতে বাঁধা বেড়াজালকে মানবমুক্তির অন্তরায় বলতে চেয়েছেন—তেমনি যক্ষপুরীর বেদনার্ত মানব-সমাজের মূঢ়তা ক্ষুদ্রতাকেও সমভাবে দায়ী করেছেন—আবার একই কালে গোটা যক্ষপুরীর এবং যেকোন ব্যক্তিমানুষের প্রতিনিধি রাজার অন্তরের পেছুটানকেও মানবমুক্তির অন্তরায় বলে ঘোষণা করতে দ্বিধা করেন নি। এবং মানবমুক্তির

সংগ্রামের এই তিনটি মূল ক্ষেত্রকে একই কালে সমমূল্যে উপস্থিত করার জন্যই রক্তকরবীর শিল্পশৈলীর এই অভিনবত্ব।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে এই অভিনবত্বের স্বরূপ কি? প্রচলিত নাট্যাদর্শে রচিত নাটকে সাধারণত জীবনের যে কোন একটি ক্ষেত্রকেই বাছাই করা হয়। তারই ওপর কাহিনী বিস্তার, চরিত্রের রূপায়ণ ঘটে এবং প্রসঙ্গত সেই রচনার কোন একটি আবিষ্ট মুহূর্তে অন্য ক্ষেত্রকে স্পর্শ করে মাত্র। কিন্তু রক্তকরবীতে যেহেতু একাধিক ক্ষেত্রে রচয়িতার মনীষা একই কালে ক্রিয়াশীল তাই এক নতুন জটিল শিল্পরূপের নক্সায় রক্তকরবী আমাদের বিভ্রান্ত করে।

রক্তকরবীর পাঠকের এ অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই হয়েছে নাটকের কাহিনী বিস্তারের সাথে সাথে, চরিত্রের বিবর্তনের সাথে সাথে মাঝে মাঝেই এমন ঘটনা, বা চরিত্রের এমন মোচড়ের সম্মুখীন হতে হয় যা আমাদের অনুভূতিকে গভীর সংবেদনায় স্পর্শ করলেও আমাদের বুদ্ধিকে আকস্মিকতার আঘাতে বিমূঢ় করে। নাটকের প্রথম পর্যায়ে নন্দিনী, কিশোর, অধ্যাপক, গোকুল—এদের সংলাপে ব্যঞ্জনার উপস্থিতি সত্বেও রক্তকরবী নাটকের পটভূমি সৃষ্টিতে কোন অস্বস্তির কারণ ঘটে না। কিন্তু আমরা বিস্মিত হই যখন দেখি নন্দিনী চায় একটি মানুষকে উদ্ধার করতে—যার শক্তির প্রচণ্ডতায় সে মুগ্ধ—অথচ যে একটি জালের আবেষ্টনীর আড়ালে অন্তরীণ। আমরা বিস্মিত হই বটে—কিন্তু আমরা অবিশ্বাস করতে পারি না। অবিশ্বাস করতে পারি না—কারণ একই কালে আমাদের, পাঠকের অমিতশক্তি অর্জনের ইচ্ছা এবং বর্ত্তমান যান্ত্রিকতায় ক্লিষ্ট বেদনা এই উভয়বিধ আত্মপ্রক্ষেপণ উপলব্ধি করি রাজা চরিত্রে। অথবা যে রঞ্জনের আগমনের প্রত্যাশায় গোটা নাটক স্পন্দনমান—সেই রঞ্জন যক্ষপুরীর মরা পাঁজরে প্রাণ জাগিয়ে এলো বটে - কিন্তু সে নিজে পড়ে রইলে রাজার প্রাসাদ-কক্ষে অপ্রয়োজনীয় বোঝার মত। কিশোর, সেই প্রাণের দীপ্ত স্ফুলিঙ্গ বিলুপ্ত হয়ে গেল বুদ্বুদের মত। আর নন্দিনী দুর্ভেদ্য কুহেলিকাচ্ছন্ন আনন্দের কলধ্বনি রঞ্জনের মৃত্যুর পর রাজার সঙ্গে লড়াই ঘোষণা করল। আবার তারই হাতে হাত মিলিয়ে চলল সর্দারের বর্শার ডগার কুন্দফুলের মালাকে তার বুকের রক্তে রাঙা করে দিতে। এই অসঙ্গতি মনে হয় রক্তকরবী নাটকের। এই মনে হওয়া আমাদের নাটক বিচারের সাধারণ মান সম্পর্কিত চেতনানির্ভর।

নাটক বিচারের সাধারণ যে মান আমাদের সংস্কারে গ্রথিত তা আগেই

বলেছি এমন নাটক সম্পর্কিত যেগুলো মূলতঃ জীবনের একটি শ্রেণীবদ্ধ সংঘাতের রূপ। উদাহরণ স্বরূপ ইবসেন সাহেবের ডলস্ হাউসকে ধরা যাক। নোরা নাম্নী একটি গৃহস্থ বধূর কাহিনী। তার গৃহজীবনের টানা পোড়েনের কাহিনী—সেই ক্ষেত্রে সামাজিক শক্তির যে অংশটুকু ক্রিয়াশীল সেটুকুর প্রকাশ। সভ্যতার বিকাশের কোন একটি পর্যায়ে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক সম্বন্ধীয় সামাজিক মূল্যবোধের সাথে নোরার চেতনার শ্রেণীবদ্ধ বিরোধের কাহিনী তাদের গৃহজীবনের পট-ভূমিতে রচিত।

যেহেতু ব্যক্তি জীবন সমাজ জীবনের পটভূমিতে না দাঁড়ালে প্রাণহীন অথবা কোন ব্যক্তির অন্তর্জগৎকে বিলুপ্ত করে তার সমাজ জীবনের অস্তিত্ব অসম্ভব। তাই তার গৃহজীবনে সমাজ চেতনার বা অন্তর্দ্বন্দ্বের ভগ্নাংশ যে উপস্থিত তা অনস্বীকার্য। কিন্তু এসবই জীবনের প্রস্থচ্ছেদে গৃহজীবনের যেটুকু প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব তার বেশী নয়। অর্থাৎ গৃহজীবনের প্রস্থচ্ছেদে সমাজ জীবনের সংঘাত বা মৌলিক সংঘাতের প্রতিসরণই ঘটবে—তাই তার মৌলিক চেহারার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। যখন জীবনের কোন একটি ক্ষেত্রে নাটক রচনা হয়—তখন অপর ক্ষেত্রের সংঘাত প্রতিসরিত হওয়ার ফলে তার নিজস্ব চেহারার রূপ পরিবর্তিত হয় পূর্বক্ষেত্রের অনুকূলে। সুতরাং অপর ক্ষেত্রের সংঘাতের যথার্থ রূপ অনুধাবনে অসুবিধা হয়।

প্রচলিত নাট্যাদর্শে রক্তকরবী রচিত হলে তার নিজস্ব শিল্পসৌগন্ধের বিচ্যুতি ঘটা অনিবার্য। এ বিচ্যুতি যদি কেবলমাত্র শিল্পপ্রকরণে সীমাবদ্ধ হত তাহলে তেমন আপত্তি ছিল না। কারণ প্রকরণের মূল্য তার ভাববস্তুর যথার্থ প্রকাশে। পূর্ব বিশ্লেষণে একথা স্পষ্ট রক্তকরবীর ভাববস্তু শেষবিচারে মানব মুক্তি এবং রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবীতে একই কালে সমান ঝোঁকে তিনটি বিভিন্ন রাস্তায় প্রার্থিত মুক্তিতে উপনীত। সুতরাং প্রচলিত নাট্যাদর্শে রক্তকরবী রচিত হলে তার কেবল মাত্র প্রকরণক্ষেত্রে নয় ভাববিস্তারের ক্ষেত্রেও আমরা বঞ্চিত হতাম। সুতরাং নাটক বিচারের মান সম্পর্কে সংস্কার মুক্ত হয়ে দেখা যেতে পারে অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায়।

রক্তকরবী নাটকে মানব জীবনের তিনটি ক্ষেত্রকে সমমূল্যে উপস্থিত করার জন্য স্বভাবতই তাদের তিনটি ভিন্ন স্তরে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যে ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের হাতিয়ারকে করতলগত করে মুষ্টিমেয় মানুষের লোভ গোটা

মানবিকতার প্রাণবন্যার ধারাকে রোধ করে দাঁড়িয়েছে সেই ক্ষেত্রটির প্রস্তুতি রবীন্দ্র মানসে হয়েছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পটভূমিতে। অর্থাৎ ঠাকুর বাড়ীর বালক রবীন্দ্রনাথ জীবনের পর্বে পর্বে পা বাড়িয়ে বাংলাদেশ ভারতবর্ষ অবশেষে গোটা পৃথিবীর মুক্ত প্রাঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ভারতবর্ষের বুকের ওপর ইারাজ সাম্রাজ্যবাদীর নখ দন্ত অপরিসীম লোলুপতায় দিন রাত আঁচড়াচ্ছে— এসত্য যেমন তার কাছে স্পষ্ট ছিল তেমনি স্পষ্ট ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে ঐশ্বর্যের বোঝা স্তরে স্তরে স্তূপীকৃত হয়ে উঠছে মানুষের প্রাণকে শোষণ করে। মানুষের মারণযজ্ঞের সেই তামসিক পুরোহিত গোষ্ঠীর চেহারা মূলতঃ এক। অথবা বলা যেতে পারে ব্যক্তি চরিত্রে তারা বিভিন্ন হলেও যে সামাজিক নিরিখে তারা স্পষ্টতর সেখানে তার অভিন্ন। অর্থাৎ সমাজ ও অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত করে দেখলে এদের যে চেহারাটা স্পষ্ট তার কোন তফাৎ নেই। তাই নাটকের স্বল্প পরিসরে স্বভাবতই এদের সামাজিক রূপটাই তুলে ধরা হয়েছে। এ চরিত্রগুলিকে তাই আমরা Social Type বা Social Abstrrction বলতে পারি।

রক্তকরবী নাটকে এই Social Type এর অন্যতম উদাহরণ সর্দার গোষ্ঠী। সর্দার গোষ্ঠীকে Social Type হিসাবে উপস্থিত করাতে তারা যে কেবল মাত্র কোন একটি বিশেষ দেশ কাল ও সমাজের পীড়ক শক্তি হয়েছে তা নয়। বরং বলা যায় আন্তর্জাতিক রবীন্দ্রনাথ সর্ব দেশ, সর্ব কাল ও সর্ব সমাজের যে পীড়ক শক্তি, যার চেহারা দেশ কাল সমাজের ক্ষেত্র অনুযায়ী উপরি স্তরে পরিবর্তিত হলেও মৌল অর্থে এক, তারই স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন। ফলে এক অসাধারণ ব্যপ্তির সঞ্চার ঘটেছে রক্তকরবীর এই বিশেষ ক্ষেত্রে।

প্রশ্ন উঠতে পারে—সর্দার গোষ্ঠীকে Social Type হিসাবে আঁকাতে তার বিস্তার ঘটলেও বেধের অভাব ঘটেছে কি না? আপাত দৃষ্টিতে ঘটেছে। কারণ সর্দার গোষ্ঠী বা অন্য Social Type চরিত্রগুলোর অনেকখানি ব্যক্তি জীবন এ নাটকে প্রতিফলিত হয় নি। আলোচ্য সর্দার চরিত্রকে তার ব্যক্তি জীবনের যে কোন পরিবেশ বা চরিত্রের সম্পর্কযুক্ত করে আঁকলে আরো ভিন্নতর আভা প্রকাশিত হত। কিন্তু সে ভিন্নতর আভা এ নাটকের ক্ষেত্রে কতখানি প্রয়োজন তা ভেবে দেখার অবকাশ আছে। মানব মুক্তির সর্বিক নাটকে সর্দার চরিত্রের যেটুকু অনিবার্য তার সবটুকুই কিন্তু রক্তকরবীতে উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ নিজেই

বলেছেন এ নাটকে স্থানাভাবের জন্য তিনি একাধিক চরিত্রকে একটি চরিত্রে আরোপ করেছেন। আবার উল্টো ঘটনাও এখানে রয়েছে—একটি মৌল সামাজিক শক্তির বিভিন্ন আভাকে বিভিন্ন চরিত্রে সন্নিবেশিত করা। মেজো এবং ছোট সর্দার দুচারটে ছোট সিচুয়েশনে সংলাপে মৌল পীড়ক-শক্তির অন্তর্নিহিত সংঘাত বা দুর্বলতা প্রকাশে যে বেধের সৃষ্টি হয়েছে তাই এক্ষেত্রে কাম্য।

তাহলে দেখা গেল—রক্ত করবী নাটকের যে শ্রেণীবদ্ধ সংঘাত; শোষণ ও শোষিতের সংঘাত, তার রূপায়ণের ক্ষেত্রটি বাস্তবিকতার তলে না থাকায় এমন একটা ব্যাপ্তিতে পৌঁছান সম্ভব হয়েছে যার একটি ভগ্নাংশ মাত্র সাধারণ নাট্যগঠন রীতির আয়ত্তাধীন।

রক্তকরবীর দ্বিতীয় ক্ষেত্র—সামাজিক মূঢ়তা-সংস্কার ইত্যাদি প্রতিকূল শক্তির সাথে মুক্তির আকাঙ্ক্ষার সংঘাতের ক্ষেত্র। এক্ষেত্রে যে চরিত্রের সমাবেশ বা ঘটনার সংস্থাপনা হয়েছে তাকে বুঝতে আমাদের অসুবিধে নেই। দৃশ্যমাণ বাস্তবের প্রতিলিপি। একদিকে যক্ষপুরীর শ্রমিক সমাজ সর্দারের কুটিল শাষণের বিরুদ্ধে ধূমায়মান অথচ সেই সমাজভুক্ত গোকুল ও চন্দ্রা নিজেদের মূঢ়তায় সর্দারেরই অনুগ্রহপ্রার্থী। এই একটি মাত্র ক্ষেত্রেই সাধারণত নাটক রচিত হয় এবং তারই কোন কোন মূহুর্তে অন্য ক্ষেত্রকে স্পর্শ করে এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। আলোচ্য নাটকেও এ ক্ষেত্রে যেমন কাহিনী বিস্তার চরিত্র সমাবেশ হয়েছে তারই ফাঁকে ফাঁকে কোথাও অন্য ক্ষেত্রকে স্পর্শ করেছে। যেমন ফাগুলাল বস্তুতঃ একজন শ্রমিক মাত্র কিন্তু বিশেষ কোন মূহুর্তে মনে হয় ফাগুলাল বুঝি শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি আবার কখনো নন্দিনী সম্পর্কিত দোদুল্য-মানতাকে মনে হয় আধুনিক মনের দোদুল্যমানতার প্রতীক। সাধারণ নাট্যাদর্শে যদি রক্তকরবী রচিত হত তাহলে—ফাগুলালকে কেন্দ্র করেই এ নাটকের মূল বক্তব্য বলার চেষ্টা করা যেত। কিন্তু তাহলে রক্ত করবীর জটিল শিল্পরূপের বিশেষ সৌগন্ধটুকু পেতাম কি? অথবা রক্তকরবীর বক্তব্যের ব্যাপকতা কি অবশ্যাম্ভাবিরূপে খণ্ডিত হত না। কিম্বা রক্তকরবীর শিল্পরূপের জটিল গঠন চাতুর্য সমস্যার যে গভীরতায় আমাদের টেনে নেয় সেখানে পৌছন কি সম্ভব হত? দেখা যাক তৃতীয় সংঘাতের ক্ষেত্রটিতে রবীন্দ্রনাথ কি কৌশল অবলম্বন করেছেন? হয়ত স্মরণ আছে অবশিষ্ট ক্ষেত্রটি হচ্ছে মানরাত্মার অন্তর

জগত। এই ক্ষেত্রে মানব মুক্তির আকাঙ্ক্ষার প্রতিকূলতা সৃষ্টি কর্চ্ছে তার অন্তরের বিরোধ। একথার ভগ্নাংশ অন্য দুটি ক্ষেত্রেও উপস্থিত, কিন্তু স্বভাবতই নিজ ক্ষেত্রে উপস্থিতির অভাবে অসম্পূর্ণ।

মানুষের অন্তর জগৎ স্বপ্রকাশিত নয়। অর্থাৎ অন্তরজগতের ক্রিয়াকলাপ টানাপোড়েন দৃশ্যমান জগতে প্রত্যক্ষ নয়। দৃশ্যমান জগতের ঘটনা বা সংলাপে তারা পরোক্ষভাবে উপস্থিত। এই পরোক্ষ জগৎকে প্রত্যক্ষ করার একটি কৌশল রূপকের বা প্রতীকের ব্যবহার। সাধারণত রূপাতীত কোন নির্দিষ্ট ভাব বা সত্যকে চরিত্রে প্রতিফলিত করাকে রূপকের ব্যবহার বলে। গোটা শিল্পকর্ম রূপক হয়ে ওঠে যখন নির্যাসিত (Abstracted) কোন ভাবের বা সত্যের ক্রমবিকাশ আপাত ভিন্ন কোন কাহিনীর পর্বে পর্বে বিকশিত হয়ে ওঠে। রূপক শিল্পে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কাহিনী কোনটিই বুদ্ধির অতীত হয় না। প্রতীক ব্যবহারের প্রধান কথাই হচ্ছে—তা নির্দিষ্ট সীমা সম্পন্ন কোন রূপকেই প্রকাশ করে না। মানুষের বুদ্ধির চৌহদ্দির বাইরে যে অস্পষ্ট (Translusent) পরিমণ্ডল বর্তমান তারই অন্তরস্থ কোন লক্ষ্যের ইঙ্গিত বহন করে প্রতীক। রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন মহারথী করেছেন। সে ব্যবহার কখনো বাস্তবিকতার তলে চলতে চলতে মূহুর্তে প্রতীকে তন্ময় হয়ে যাওয়া অথবা সম্পূর্ণ ভাবেই গোটা শিল্পবস্তুকে প্রতীকের তন্ময় ক্ষেত্রে সন্নিবেশিত করা। কিন্তু যেহেতু রবীন্দ্রনাথের পূর্বে কেউ এক অখণ্ড মৌল বক্তব্যে উপনীত হবার তাগিদে তিনটি ভিন্ন শ্রেণীবদ্ধ সংঘাত-সংঘর্ষকে (Serial conflict & contradiction) সমমূল্যে উপস্থাপিত করার প্রয়াসী হন নি তাই পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে তিনটি ক্ষেত্রে তিনটি তলে এমন অনন্য বেণীবন্ধনে সহস্রদ্যুতি বিচ্ছুরণ ঘটেনি।

আজ সমাজ বিকাশের দ্রুত তালের সাথে তাল মিলিয়েই মানুষ ক্রমাগত নিজেকে আড়াল করতে চাইছে। সভ্যতার আর এক নাম হয়ত বা আবরণ। এ আবরণ আজ আর বল্কল খণ্ড নেই—এর ভাঁজে ভাঁজে পরতে পরতে জটিলতা আশ্রয় নিয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর মানুষ সে পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কোন সমাজেই অবস্থিত হোক না কেন এ যুগের জটিল যন্ত্রণা থেকে তার মুক্তি নেই। তাই সর্ব দেশের মানুষের নির্যাস (Abstraction) আরো এক নতুন তলে রূপায়িত হয়েছে জালের অন্তরালে রাজায়। এই তল সাঙ্কেতিকতার। তাই রাজা চরিত্রের দার্ঢ্য আর বেদনা যতই আমাদের অন্তরকে

স্পর্শ করুক তার নির্দিষ্ট বহঃরেখা কখনো আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। জটিল জালের অন্তরালে রহস্যঘন রাজা তাই বিভিন্ন আভায় (Shades) দ্যুতিমান। রক্তকরবীর শিল্পপ্রকরণের একটা মৌল চেহারা বোধহয় আমাদের কাছে ওপরের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তা'লে আমরা রক্ত করবী রচনার একটা বিশেষ শিল্পভঙ্গীর রূপ ধরতে পারলাম—এবং এই রূপের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা ও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। এবারে দেখা যেতে পারে—এই বিশেষ প্রকরণের ফলশ্রুতি কি ?

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে সাধারণ আদর্শে রচিত নাটকের তন্ময় মুহূর্তে তা অন্য ক্ষেত্রকে স্পর্শ করে। স্বভাবতই সে মুহূর্তে অন্য ক্ষেত্রের আস্বাদন অনুভূত হয় এবং স্পষ্ট শিল্পে একটা নতুন বেধের সঞ্চার ঘটে। এই যে একটা ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে পাঠক বা দর্শক মনকে টেনে নেওয়া তা ঘটে চরিত্রের বিবর্তনে অথবা অভিনব কোন ঘটনা সংস্থাপনায়। রক্তকরবী নাটক তিনটি বিভিন্ন ক্ষেত্রের বেণীবন্ধন হওয়ায়—চরিত্রের বিবর্তন এখানে ঘটেছে একাধিক কৌশলে—এবং অভিনব ঘটনার সংস্থাপনাও হয়েছে অভূতপূর্ব সাবলীলতায়।

রক্তকরবীর ঘনিষ্ঠ পর্যালোচনায় দেখা যাবে এখানে কিছু চরিত্র মূলতঃ একই ক্ষেত্রে বিবর্তিত হয়েছে এবং সাধারণ নিয়ম অনুসারে অন্যক্ষেত্রের ছোঁওয়া পেয়েছে। যেমন ফাগুলাল চন্দ্রা অধ্যাপক গোকুল প্রভৃতি। আবার কিছু চরিত্র যেবন সর্দার গোষ্ঠী মোড়ল গোঁসাই—এরা প্রায় কখনোই তাদের নিজ ক্ষেত্রচ্যুত হয়নি। অথচ রাজা নন্দিনী কিশোর রঞ্জন আর বিশুর সাবলীল সঞ্চার তিনটি ক্ষেত্রে তিনটি স্তরে।

ফলতঃ ফাগুলাল চন্দ্রা ইত্যাদি চরিত্র বা এই সব চরিত্র সম্পৃক্ত ঘটনাবলী আমাদের প্রচলিত নাট্যাদর্শানুযায়ী হওয়াতে আমরা স্বস্তি বোধ করি। কিন্তু এইসব চরিত্রের বিবর্তন বা ঘটনাবলীর পরিণতি অন্য ক্ষেত্রজ চরিত্র ও ঘটনাবলী সাপেক্ষ হওয়ায় অস্বস্তি ঘটে। আবার সর্দারগোষ্ঠী বা ঐ ধরণের চরিত্রগুলি আমাদের কাছে গোটা মানব চরিত্রের ভগ্নাংশ মনে হয় যদিও এদের অভাবনীয় বিস্তার আমাদের বিস্ময় ঘটায়। এবং রাজা নন্দিনী কিশোর রঞ্জন ও বিশু চরিত্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও স্তরে সাবলীল সঞ্চার ও তজ্জনিত বিস্ময়কর ঘটনাবলী আমাদের মগজের বিশ্লেষণের সাধারণ তৈরী মানকে চূর্ণ করে। কিন্তু যেহেতু রক্তকরবীর বক্তব্য মানবিক অর্থাৎ মানব সম্পর্কিত [মানুষের স্বপক্ষে] এবং

যেহেতু তার শিল্পপ্রকরণ নির্বিকল্প তাই নাটকের সংস্কারাচ্ছন্ন বুদ্ধিকে বিহ্বল ক'রেও অনুভূতির গভীরে অনিবার্য ঢেউ তোলে।

রবীন্দ্রনাথ যত জটিল শিল্পপ্রকরণেই রক্তকরবীকে রূপায়িত করুন না কেন তাঁকে তাঁর বক্তব্য অর্থাৎ তাঁর নাটকের কাহিনী চরিত্র এবং ভাববস্তু [অর্থাৎ দর্শন] সচেতন মনে বা অবচেতন মনে তাঁর সমকাল ও সমদেশ [ব্যাপ্তার্থে] থেকে আহরণ করতে হয়েছে। সেই আহৃত ভাব বিষয় কাহিনী ও চরিত্র রবীন্দ্রমানসের বৈশিষ্ট্যে প্রতিসরিত হয়ে যে শিল্পরূপে পরিণতি লাভ করে তাকে সংস্কার বশে গ্রহণ করতে অস্বস্তি ঘটলেও একই দেশকাল ও সমাজ প্রেক্ষিতে পুষ্ট দর্শক বা পাঠক মানসে পরিণত শিল্পরূপ পুনঃপ্রতিসরিত হয়ে একই মৌল বাস্তববোধে সাড়া জাগায়।

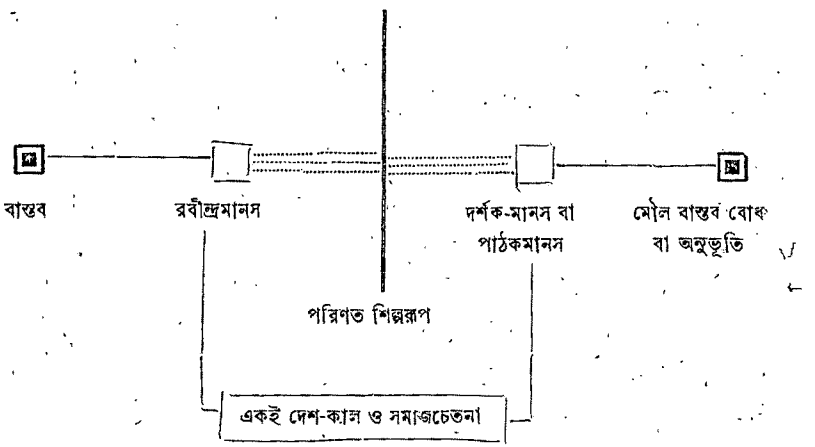

এ প্রক্রিয়া সাধারণভাবে যে কোন জটিল শিল্পরূপ সম্পর্কেই প্রযোজ্য। প্রযোজ্য বলেই বিশেষ বিশেষ সামাজিক পরিবেশে উদ্ভূত নূতন শিল্পরূপ সেই সামাজিক পরিবেশে শেষবিচারে আদৃত হয়। অবশ্য এর মধ্যে অন্য বহুপ্রকার চ্যুতির সম্ভাবনা বর্তমান। যথা লেখক বা শিল্পী মানসের গঠনের অপরিণতি বা শিল্পপ্রকরণের নৈপুণ্যের অভাব গোটা প্রক্রিয়াকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারে। আবার পাঠক মানস যে সব সময়ই সৃষ্টশিল্প অনুধাবনে সক্ষম হবে এমন কথা বলা চলে না।

রক্তকরবীর ক্ষেত্রে রবীন্দ্রমানস তার পরিণত অবস্থায় একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার

মধ্য দিয়ে এই শিল্পপ্রয়াস আয়ত্ত করেছে। কিন্তু একই দেশ, কাল উদ্ভূত পাঠক সমাজ সংস্কার বশে তা গ্রহণে দীর্ঘকাল অক্ষম ছিল তবু এই প্রকরণ যেহেতু বুদ্ধিকে অতিক্রম করে অনুভূতির গভীর ঢেউ তোলে তাই তার আকর্ষণ এড়ানো কখনো সম্ভব হয় নি।

সর্বশেষে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে রক্তকরবীর এই শিল্পরূপকে কি নামে অভিহিত করা যায়? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এ নাটক সত্যমূলক। সত্যমূলক (Real) ত বটেই। কোন সার্থক শিল্পসৃষ্টি যে কোন শিল্পভঙ্গিমাতেই রচিত হোক না কেন শেষ বিচারে সত্যমূলক হতে বাধ্য। আমাদের আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট যে রক্তকরবী সাধারণ নাটকের আদর্শে রচিত না হওয়ায় একে বাস্তব নাটক (Realistic) বলা চলে না। রূপক নাটকের (Allegory) বৈশিষ্ট্য তার সম্পর্কহীন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কহিনীর উপস্থিতি এখানে পাওয়া যাবে না। কারো মতে এ নাটক সমস্যামূলক (Problem Play) সমস্যা অবশ্যই রক্তকরবীতে বর্তমান—কিন্তু সব মহৎ নাটকেই কি সমস্যার উপস্থিতি অনিবার্য নয়? এবং সত্যমূলক বা সমস্যামূলক বল্লে নাটকের চরিত্র সম্পর্কে বলা হয় বটে কিন্তু তার গঠন সম্পর্কে কিছুই বলা হয় না।

এ নাটকে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রকে বিভিন্ন স্তরে সন্নিবেশিত দেখেছি। আরো দেখেছি নাটকের কিছু প্রধান চরিত্র বিভিন্ন স্তরে উপস্থিত থেকেও সাঙ্কেতিকতার স্তরেই প্রধান। এর একটি উদাহরণ রাজা—যার উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি। আরো একটি চরিত্র নন্দিনী। নন্দিনী একই কালে শকলু, গজ্জু, অনুপ, রঞ্জনদের পাড়ার মেয়ে নন্দিন্। এটুকু নন্দিনী চরিত্রের মূল (Root)। কিন্তু যক্ষপুরীর গুমোট দমবন্ধ করা পাষাণ প্রাচীরে সে আশার আলোর হাতছানি, মানুষের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এখানে নন্দিনী যক্ষপুরীর বেড়াজালের মধ্যে তার শাখা পল্লব বিস্তার করেছে। ফুল ফুটেছে আকাশে—সেখানে নন্দিনী চরম নির্যাসিত রূপে উদ্ভাসিত তাই রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয়—"এমন সময়ে সেখানে নারী এলো—এলো নন্দিনী—প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপরে....." শুধু নারী বলে বা নন্দিনী বলে সম্পূর্ণটা বলা হয় না—তাই বলতে হয় প্রাণের বেগ। এ কথাকে আরো স্পষ্টতর করে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয়েছে—".....This personality the divine essence of the infinite in the vessel of the finite—has its last treasure-

honse in woman's heart....." এই woman's heart বলতে রবীন্দ্রনাথ কি বলতে চেয়েছেন? একি শুধুই নারীহৃদয়? তাহলে চন্দ্রার নারী হৃদয়কে রচয়িতা এ কাজে লাগাতে পারলেন না কেন? স্বভাবতই বুঝতে হবে Woman's heart বলতে এখানে নারীজাতির হৃদয়ের কথা বলা হয় নি—বলা হয়েছে Woman's heart of the humanity বা Woman's heart of every individual. রবীন্দ্রচেতনায় এ বিশ্বাস বলবতী ছিল—যে প্রতিটি মানুষের অন্তরে একটি নারীসত্তা উপস্থিত যার কাছে মানুষ তার সমস্ত অর্জনকে হাজির করে বলছে—সঞ্চয় করে রাখ। আর যে উপনিষদের মৈত্রেয়ীর মত বলে "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ তেনাহং কিং কুর্যাম্॥"

রবীন্দ্রচেতনায় এ কথার উপস্থিতি আরো স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে এই পর্যায়ের পরবর্তী এবং শেষ নাটক "রথের রসি"তে। এখানে গোটা নাটক সহজ রূপকে বর্ণিত হয়েছে। এ নাটকের শেষাংশে যেখানে বিহ্বল পুরোহিত জিজ্ঞাসায় উৎকণ্ঠিত—"রথ তারা [কবিরা] চালাবে কিসের জোরে। বুঝিয়ে বলো।" কবির প্রত্যয়নিষ্ঠ ঘোষণা—"গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে।" এই ছন্দ জিনিসটা কি? বক্তব্যকে মনোহর করে তোলার বিশেষ শব্দবিন্যাস রীতিই ছন্দ—এই অর্থের ব্যাপ্তি এবং গভীরতা ক্ষেত্রে আলোচ্য লক্ষণীয়। বক্তব্যকে মনোহর করে তোলার ইচ্ছার গভীরে যে বোধ এবং সেই বোধের যে সামাজিক প্রকাশ তাকেই এক্ষেত্রে ছন্দ বলা হয়েছে। একথা বুঝতে যদি কেউ অস্বীকার করেন তাহলে বলতেই হবে সাহিত্যপাঠের ভূমিকা তার মনে প্রস্তুত হয় নি। বলতেই হবে রাজনীতি সমাজনীতি আর সাহিত্য এদের ভিত্তিভূমি এক হলেও এদের প্রকাশভঙ্গী ভিন্ন।

তাহলে এক কথায় আমরা বলতে পারি নন্দিনী চরিত্রের মূল ব্যক্তিমানুষে প্রোথিত হলেও তার সঞ্চার ঘটেছে সমাজরূপকে এবং পরিণতি লাভ করেছে সূক্ষ্মতম সাঙ্কেতিকতায়। বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনার অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে রক্তকরবী নাটকে সাঙ্কেতিকতার ভূমিকা প্রায় প্রধান।

পূর্বে বলা হয়েছে সাঙ্কেতিকতার (Symbolism) লক্ষ্য মানুষের বুদ্ধির চৌহদ্দির বাইরের অর্ধস্বচ্ছ (Translusant) পরিমণ্ডলের অন্তরস্থ ভাবকে ইঙ্গিতের সাহায্যে স্পর্শ করা। রক্তকরবী নাটকের মূল ভাববস্তু মানবমুক্তি।

যেহেতু এখানে মূল ভাববস্তুকে তিনটি ক্ষেত্রে সমমূল্যে গঠনের চেষ্টা হয়েছে

তাই অনিবার্যরূপে মানবমুক্তি এখানে অর্জিত হয়েছে তিনটি মূল প্রতিকূল শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করে। তারই ফলে মানবমুক্তি এ নাটকে মূলত তিন রঙের চেহারায় এবং বহু রঙের আভায় প্রকাশিত। স্বভাবতই মানবমুক্তি এ নাটকে কোন নির্দিষ্ট সীমাসম্পন্ন রূপকে প্রকাশ করছে না। সুতরাং এ নাটক সাঙ্কেতিক।

কিন্তু রক্তকরবী পাঠে অনিবার্য ভাবে একথাই মনে হয় যে যক্ষপুরীর লৌহ নিগড়ের অবসানেই মানবমুক্তি সম্ভব। যে নিগড়ের স্বরূপ হচ্ছে তাল তাল সোনার সঞ্চয় বাড়িয়ে তুলতে গিয়ে সাধারণ শ্রমিক খোদাইকার পরিণত হয় গঞ্জু শকলু অনুপের মত অন্তসারশূন্য রাজার এঁটোয়। এ নিগড় যেহেতু নিশ্চিতরূপে সামাজিক তাই মানবমুক্তি এখানে সামাজিক শোষণবিযুক্ত নয়।

রক্তকরবী নাটক তখন চরম নাটকীয় শীর্ষে উপনীত হয়, যখন রাজা বেরিয়ে আসে জালের আড়াল থেকে—অন্তরজগতের সংঘাত পরিণতি লাভ করে। নন্দিনী রাজা শ্রমিক খোদাইকাররা প্রতিরোধ গড়ে তোলে সর্দারের বিরুদ্ধে যার তীব্রতায় আভাস দেয় সর্দারশাসনের গুঁড়িয়ে যাওয়া। যক্ষপুরীর চাতালের উপর একা ফাগুলাল দাঁড়িয়ে থাকে, তার চর পাশে সর্দারের রাজছত্র গুঁড়িয়ে পড়ছে—রণডঙ্কার শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে নৈশব্দের অতলে—আর রক্তমাখা অস্ত্রের যত শাসন আর শোষণ ক্রমেই অপসারিত হয়ে পরিণত হচ্ছে শিশুপাঠ্য ইতিহাসের পাতায় নির্জীব ফসিলে। গুরু গুরু গর্জনে গুণ গুণ স্বরে যুগাবসানের ফসল কাটার গান এগিয়ে আসছে স্পর্শ করছে যক্ষপুরীকে, সংক্রামিত হচ্ছে তার প্রতিটি অনড় ইঁটের পাঁজরে।

সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসের অমোঘ গতিপথ রক্তকবরীতে এই ভাবে প্রকাশিত। তাই এ নাটকের নামকরণে সমাজবিজ্ঞানকে অনিবার্য রূপেই স্থান দিতে হবে। তাই বলা যেতে পারে রক্তকবরী একখানি সাঙ্কেতিক-সমাজ-নাট্য (Socio-Simbolic Drama)।

এই শিল্পরূপের অনুশীলন ইতিপূর্বে কোন দেশে বা কোন কালে হয়েছে বলে আমার জানা নেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই শিল্পরূপের অনুশীলন পরবর্তী কালে করেন নি। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে শ্রীনবেন্দু ঘোষ এই প্রচেষ্টা করেছিলেন (আজব নগরীর কাহিনী) এবং ইউরোপখণ্ডে এই শিল্পরূপেরই কিছু কিছু হেরফের সাম্প্রতিক কালে লক্ষণীয়।

'এক্ষণ' ঃ ইতিহাস সংখ্যা

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

'এক্ষণ' পত্রিকাটি নতুন। বোধকরি জন্মের একবছরও এখনও পুরো হয় নি। তবু ইতিমধ্যেই কয়েকটি কারণে এই নবজাত দ্বিমাসিকটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রথমত, এর প্রতিটি সংখ্যায়ই অন্ততঃ দুএকটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে, যা পাঠকদের ভাবতে বাধ্য করে। আজকের দিনে এটা নেহাৎ কম কৃতিত্ব নয়। দ্বিতীয়ত, লেখকদের প্রায় সবাই বয়সে তরুণ এবং বেশ কয়েকজন লেখক হিসেবেও নতুন। তাই তাঁদের লেখায় গভীরতার স্বাদ পেয়ে মনটা আরও খুসী হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। আলোচ্য সংখ্যাটি "এক্ষণের" আর একটি সাহসী পদক্ষেপের চিহ্ন বহন করে এনেছে। তার তৃতীয় সংখ্যাটি 'ইতিহাস-সংখ্যা'।*

সংখ্যাটিতে তিন ধরণের লেখা আছে—পুনর্মুদ্রণ, চিন্তাশীল প্রবন্ধ এবং পুস্তক-পরিচিতি। প্রথম ও তৃতীয় ধরণের লেখাগুলির আলোচনাই আগে করব কারণ দ্বিতীয় ধরণের প্রবন্ধ কটির আলোচনা হয়ত কিছুটা বেশী জায়গা নেবে। সবার আগেই সম্পাদকদের অভিনন্দন জানাতে হয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অর্ধ-বিস্মৃত প্রবন্ধটিকে পুনঃ-প্রকাশ করার জন্য। আজ থেকে ৮০ বছরেরও আগে এই প্রবন্ধটি লেখা হয়। অথচ তাতে ইতিহাস আলোচনা সম্বন্ধে যে আধুনিক মন ও চিন্তার পরিচয় মেলে তা বিস্ময়কর। প্রবন্ধটি থেকে দু চার লাইন তুলে দিলেই বক্তব্যটা সকলের কাছে স্পষ্ট হ'বে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লেখার প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তব সম্ভাবনার কথা বলতে গিয়ে রাজকৃষ্ণ লিখছেন ঃ

"এক্ষণে ক্রমে ক্রমে উন্নতবুদ্ধি জ্ঞানিগণের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে রাজা বা সেনানীর জীবনবৃত্তান্ত ইতিহাস নহে। ব্যক্তি বিশেষের কার্যাবলী ইতিহাসের পটে অল্পস্থান মাত্র অধিকার করিতে পারে; সমাজের পরিবর্ত্তন প্রদর্শনই ইতিহাসের বিষয়। সুতরাং ঐতিহাসিক চিত্রে রাজা অপেক্ষা সর্বসাধারণের

* সম্পাদক ঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য।

প্রজাগণের প্রাধান্য। লোকের রীতি, নীতি, জ্ঞান, ধর্ম, শিল্প, শাস্ত্র, কৃষি, বাণিজ্য, ধন, বল প্রভৃতি কালে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা লিপিবদ্ধ করাই ইতিহাসের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রাচীন ভারতবর্ষের এরূপ ইতিহাস লিখিবার উপকরণ নাই আমরা মনে করিনা।"(পৃঃ ৬৭)

আশা করতে পারি যে এই উদ্ধৃতিটুকু পড়েই গোটা প্রবন্ধটা পড়ে দেখার উৎসাহ অনেকের মনেই জাগবে। আর একটু সাহস করে এ আশাও করতে পারি কি যে রাজকৃষ্ণর প্রবন্ধটি পড়ে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় ইতিহাস-সাধনা সম্বন্ধে তরুণ গবেষকদের উদ্যোগ ও তৎপরতা আর একটু বেড়ে যাবে ?

"মহারাষ্ট্র-পুরাণ" সহজে হাতে পেয়ে পড়া অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। 'এক্ষণে'র সৌজন্যে এখন সে চাহিদা অনেকখানি মিটল।

পাঁচখানি বাংলা ও একটি ইংরেজি বই নিয়ে ছ'টি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। বইগুলি বাছাই করা প্রশংসনীয়। বাংলা পুস্তক পরিচিতি আরম্ভ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধের সঙ্কলন "ইতিহাস" বইটি দিয়ে। তারপরে এসেছে অতুলচন্দ্র গুপ্তের বুদ্ধিদীপ্ত "ইতিহাসের মুক্তি" বইটি। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের তথ্য ও বিশ্লেষণ-সমৃদ্ধ 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন' বইটির সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও রয়েছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের বই, মুক্তি সংগ্রামের এক অগ্নিগর্ভ অধ্যায়কে জীবন্ত করে তুলেছে, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের "বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি"। সে অধ্যায়টির কথাও পাঠকদের মনে করিয়ে দিয়েছেন শক্তিময় রায়। তবে এই বইগুলির সঙ্গে মনোরঞ্জন রায়ের "ইতিহাসের দর্শন" বইটিকে কেন যুক্ত করা হ'ল তা ঠিক বুঝলাম না। বইটি কোনদিক থেকেই কোন মৌলিকত্বের দাবী রাখে না। নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর একটি উদ্যম। বরঞ্চ পুরাণো হ'লেও এই সূত্রে অমিত সেনের "ইতিহাসের ধারা" বইটির পর্যালোচনা হ'লে পুস্তক-পরিচিত বিভাগটি বৈচিত্র্যের দিক থেকে পূর্ণতা লাভ করত।

জন ষ্ট্রেচীর "The End of Empire" বইটির পর্যালোচনা করতে গিয়ে ছোট একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করেছেন শঙ্কর বসু। উদ্যম হিসেবে এটিও নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় তবে কিছুটা দুর্বল। সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যবাদের যুগাবসান সম্বন্ধে ষ্ট্রেচীর বিতর্কমূলক বক্তব্যটি প্রবন্ধের কেন্দ্র হিসেবে তুলে ধরার প্রয়োজন

ছিল, তা করা হয়নি। অতীতের ইংরেজ ইতিহাসবিদদের অধিকাংশই সাম্রাজ্য-বাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রচনা করে গেছেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাস। ভারতীয় ইতিহাসবিদরা হয় তাঁদের অনুসরণ করেছেন অতীতে, নয় দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত হয়ে অন্যদিকে একপেশে ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। আজকে ভারতীয় ও ইংরেজ ইতিহাসবিদ উভয়েরই প্রয়োজন বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের উত্থান পতন ও অবদানের জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। শঙ্কর বাবু একথা ঠিকই বলেছেন যে ষ্ট্রেচী সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু ষ্ট্রেচীর দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তব কিনা, সে সম্বন্ধে শঙ্কর বাবু কোন মন্তব্য করেননি। তার ফলে এ মন্তব্যের সমর্থনে যুক্তি পাওয়া গেল না তাঁর প্রবন্ধে যে "শত দুর্বলতা সত্ত্বেও ষ্ট্রেচীর গ্রন্থের কৌলীন্য অনস্বীকার্য?" তা ছাড়া আমার খুবই আপত্তিকর লেগেছে তাঁর সর্বশেষ মন্তব্যটি। এদেশে যাঁরা অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার কঠিন কাজে উদ্যোগী হয়েছেন বা হচ্ছেন তাঁরা "হঠাৎ ব্যগ্র" হয়েছেন, এ খোঁচাটির কোন অর্থ বা মূল্য আমি অন্ততঃ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম না।

এবারে স্বাধীন প্রবন্ধগুলির সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করব। রমেন মিত্রর "লুথার ও রামমোহন : মূলশাস্ত্র" একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপের ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন ও জাগরণের সঙ্গে উনিশ শতকের বাংলার ধর্ম তথা সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও জাগরণের চারিত্রিক মিল ও তফাৎ নিয়ে যথেষ্ট ভাবনার খোরাক যোগানো এক আলোচনার তিনি সূত্রপাত করেছেন। প্রবন্ধটি পড়ে মনে হয় দীর্ঘ ও গভীরতর রচনার এটি সূত্রপাত মাত্র। সেইজন্যই ভবিষ্যতের আলোচনার সুবিধার দিকে তাকিয়ে, এই সুযোগে তাঁর কাছে দুএকটি প্রশ্ন হাজির করছি। ইউরোপীয় রিফর্মেশনের পিছনে ধর্মীয় সংস্কার ও সমাজ-বিদ্রোহ, এই দুটি ধারাই উপাদান যুগিয়েছিল, একথা স্বর্বজনস্বীকৃত। সামন্ত-তন্ত্রের প্রধান স্তম্ভ পোপতন্ত্রের উপর প্রবল আঘাত হানার অনস্বীকার্য কৃতিত্ব সত্ত্বেও জার্মানীর কৃষকদের গণবিপ্লবের বিরুদ্ধে লুথারের কলঙ্কজনক ভূমিকার কথাও আমরা জানি। ধর্মীয় জগতে সীমাবদ্ধ বিদ্রোহের ধ্বজাধারী হয়েও রাজনৈতিক চিন্তার জগতে লুথার প্রচার করলেন মাথা মত করে স্বৈরাচারকে মেনে নেওয়ার মতবাদ—Doctrine of non-resistance বা doctrine of passive obedience। তার ঐতিহাসিক কারণও অবশ্য ছিল—সে আলোচনায় এখন যাওয়া সম্ভব নয়। তবু এই সূত্রে ষোড়শ শতাব্দীর লুথারের সঙ্গে উনিশ

শতকের রামমোহনের বৈসাদৃশ্য ও তার কারণ সম্বন্ধে কিছু বলা নিশ্চয় প্রয়োজন। কেনই বা রামমোহন আয়ার্ল্যাণ্ডের কৃষক সংগ্রাম থেকে সুরু করে দক্ষিণ আমেরিকার মুক্তি-বিপ্লব পর্যন্ত সোল্লাসে, দ্বিধাহীন চিত্তে সমর্থন করলেন? আর কেনই বা পোপতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবী লুথার ১৫২৬এ ঘোষণা করলেন যে বিদ্রোহী কৃষকদের নির্মমভাবে হত্যা করলে ঈশ্বর পরমপ্রীত হ'বেন? হয়ত এই প্রবন্ধের সীমাবদ্ধ আয়তনের মধ্যে এত বেশী আলোচনা সম্ভব ছিল না, কিন্তু বারান্তরে 'এক্ষণে' আমরা তার প্রত্যাশায় থাকব।

আরও একটি কথা। ধর্মগ্রন্থ বাইবেলকে ভিত্তি করে পোপতন্ত্রের বনিয়াদে কুঠারাঘাত করলেন লুথার। জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের দরজা খুলে গেল জাতীয় চার্চ্চ গঠনের পথে। তবু লুথারের আন্দোলন প্রবলভাবেই ধর্মীয়। কিন্তু রামমোহনের মতবাদ ও চিন্তাধারা, বিপ্লবের প্রতি তাঁর সমর্থন ও ব্রাহ্মসভার ফলকে লেখা তাঁর বিশ্বজনীনতা ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার বদলে ধর্মনিরপেক্ষতার দ্বারাই খুলতে সাহায্য করেনি কি? যার থেকে আমরা এসে পৌঁছতে পারি মানুষের ধর্মে? এদিকটাও ভেবে দেখার এবং আলোচনা করার প্রয়োজন রইল।

এর পরেই উল্লেখযোগ্য অশোক মুস্তাফির লেখা "বাংলার নবজাগৃতি ও টম পেন।" ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণ নিয়ে আমরা প্রায় সবাই খুব গর্বিত কিন্তু এই জাগরণ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আজও একান্ত অস্পষ্ট। অমিত সেনের "Notes on Bengal Renaissance" একদা অনুসন্ধানের সূচনা করেছিল। শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পালের শতবার্ষিকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধসমষ্টি মনে আশা জাগিয়েছিল যে কাজটা বোধহয় এগোচ্ছে। কিছুই এগোয়নি, একথা আমি বলছি না কিন্তু যা হয়েছে তা নিতান্তই অল্প ও অসম্পূর্ণ। সেদিক থেকে "Commonsense" ও "Rights of Man"-এর বিশ্ববিখ্যাত লেখক টম পেনের প্রভাব উনিশ শতকের বাংলার তরুণ মনকে কি ভাবে আলোড়িত করেছিল সে আলোচনা যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করে। আশা করব শ্রীমুস্তাফি এই পর্যায়ে আলোচনা ভবিষ্যতে আরও করবেন এবং আরো অনেকে সেই আলোচনায় লিখিত ভাবে যোগদান করবেন।

শ্রীঅধীর চক্রবর্ত্তীর মূল্যবান প্রবন্ধ "ইতিহাসের স্বরূপ" গভীর ভাবে বিতর্ক-মূলক। এ সম্বন্ধে এই পর্যালোচনায় কিছু বলা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে এ বিতর্কে যোগদানের ইচ্ছা রইল। প্রবন্ধগুলির মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ বোধ হয়

শ্রীসুকুমার মিত্রের "যুদ্ধোত্তর ভারতে ইতিহাস চিন্তা।" সর্দ্দার কে. এম. পাণিক্কর ও তাঁর বইগুলির নাম এই প্রবন্ধটি থেকে বিস্ময়করভাবে অনুপস্থিত। কোশাম্বীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। অথচ আমার তো মনে হয় যুদ্ধোত্তর ভারতে ইতিহাস চিন্তার নতুন ধারা যে দুজনের লেখায় আমরা সবচেয়ে বেশী পেয়েছি, তাঁরা হলেন পাণিক্কর ও কোশাম্বী। তাছাড়া যুদ্ধোত্তর ভারতে অর্থ-নৈতিক ইতিহাস রচনায় যে সঠিক জোর পড়েছে, সেদিকে উল্লেখ থাকা অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। সেইসূত্রে উত্তর ভারত ও বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন তরুণ গবেষকের নামের উল্লেখ না থাকা প্রবন্ধটির গুরুতর দুর্বলতারই পরিচায়ক।

সব মিলিয়ে, গোড়াতে সে কথা বলেছি, সেটাই সিদ্ধান্ত হিসেবে দাঁড়াল। "এক্ষণের" ইতিহাস-সংখ্যা একটি বৈচিত্র্যময় সার্থক ও নতুন ধরণের উদ্যম। আমরা এই ধরণের উদ্যম আরও অনেকবার এই দ্বিমাসিকের বিভিন্ন সংখ্যায় দেখবার প্রত্যাশী রইলাম।

নারীমুক্তি ও একজন বিস্মৃত চিন্তানায়ক

অশোক মুস্তাফি

রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলন হিসেবে নারীমুক্তি প্রচেষ্টার আন্দোলন খানিকটা নূতন মনে হলেও তার মূল ভাবগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর কিংবা তারও চেয়ে বেশি পুরোনো। খৃষ্টধর্মের প্রসার, শিল্পগত পরিবর্তন, বিশ্বযুদ্ধ এবং সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধারণভাবে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তিত করেছে। যাঁরা নারীর মর্যাদা দানে প্রথম আগ্রহী হয়েছিলেন তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে ক্রমশঃ নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। অবলারা রাজনৈতিক অধিকারও পেয়ে যাবেন। স্পষ্টতই নারীর মর্যাদা দানের সামাজিক দিকটা নিয়ে তাঁরা খুব মাথা ঘামাতে চাইতেন না। কারণ নারীর পদমর্যাদা বৃদ্ধিতে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এই আশঙ্কা তাঁরা করতেন। তার ফলে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ বা সম্পত্তির ব্যাপারে যে সমস্ত মূল প্রশ্ন বা সমস্যা উত্থাপিত হতে পারতো সেগুলো চাপা পড়েই ছিল। নারীর মর্যাদাদানের ব্যাপারটা—যা স্বভাবতই সমাজজীবনের ভিত্তিমূলে আঘাত করে—অনেকেই অপরিণত সমস্যা বলে অগ্রাহ্য করতেন। কিংবা স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, বৈপ্লবিক মনে করতেন।

কিন্তু শতাব্দীর নতুন বিজ্ঞান ও মানবিকতা একদল উগ্রপন্থীকে অপরিণত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার শিক্ষা দিয়েছিল। সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁরা কোনো বাধা অনুভব করেন নি। তাঁরা বিশ্বাস করতেন নৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্তিই হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড় সহায়। নারী সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে পুরুষের সংগে সম্পূর্ণভাবে জড়িত হবে এটিই তাঁদের দাবি ছিল। তাঁদের পক্ষে যদিও পুরাতন ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করবার মতো সুযোগ বা সুবিধা তখন ছিল না, তাঁরা চেয়েছিলেন নারীও পুরুষের মতো স্বাধীনভাবে তার ভবিষ্যতের পথ বেছে নেবে। 'Rights of man'-এর বিখ্যাত লেখক Thomas Paine সেই সময় অল্পসংখ্যক সহকর্মীর সংগে মিলিত হয়ে সামাজিক বিদ্রোহের সূচনা করেন। পেইন ছিলেন অত্যুৎসাহী স্ত্রী-

স্বাধীনতাবাদী। যে নারীসমাজ সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট এলিয়ট বলেছিলেন 'lived themselves...under the burden of a sad and cruel creed'[১] সেই নারী সমাজের স্বাধীনতা ও সুযোগ আরও বাড়াবার জন্য পেইন চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, পরবর্তী কালে টমাস পেইনের এই আন্দোলন প্রচেষ্টাকে লোকে ভুলে গেছে।

এ যুগের মানুষ আমরা জানিই না যে টমাস পেইন নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় কিরকম খড়্গহস্ত হয়ে কলম ধরেছিলেন। প্রচলিত প্রথাকে নস্যাৎ করে নারীর প্রতি দৃষ্টিপাতের নতুন ভঙ্গিকে তিনিই দেখিয়েছিলেন। রিপাব্লিকান হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব এই যে, নারীর ক্ষুদ্র স্বার্থগুলি জাতীয় স্বার্থের সংগে এক করে দেখেন নি। এই আন্দোলনের ব্যাপারে পেইন সব সময়েই যেন যুগের তুলনায় এগিয়ে থাকতেন। এমন দাবিও করা হয় যে নারীর প্রতি আইনসঙ্গত সুবিচারের ব্যাপারে পেইন ছিলেন অগ্রণী। এই সুবিচার দুদিক থেকে প্রয়োজনীয় ছিল : (১) পুরুষের সংগে আইনগত সমান অধিকার, (২) বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত ধারণা। কিন্তু Crane Brinton-এর মতে 'Paine cannot be numberbed among the first defenders of women's rights'. (Dictionory of American Biography vol xiii, xiv), অধ্যাপক Uark-ও এই মতের সমর্থক। ব্রিনটন বলেন যে Conway 'পেনসিল ভেনিয়া ম্যাগাজিন'-এ পেইনের একটি লেখা প্রকাশ করেন। লেখাটি ফরাসী ভাষার ইংরিজি অনুবাদ। কিন্তু পেইন ফরাসী ভাষা জানতেন না। তবে এই রচনার লেখক কে সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ না করলে এইটুকু বলা যায় যে, রচনাটির মধ্যে গভীর দৃষ্টিশক্তি ও সূক্ষ্ম মন্তব্যের প্রমাণ মেলে। পেইন স্ত্রীস্বাধীনতার ব্যাপারে যে উল্লেখযোগ্য সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সমসাময়িক লেখকেরা সে রকম সচেতনতার পরিচয় দিতে পারেননি। উদাহরণ স্বরূপ Thomas Jefferson-এর নাম করা যেতে পারে। তিনি নারীর নাগরিক অধিকারের বিরোধী ছিলেন। এবং একথা ঠিক যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে পেইনকে নারী-স্বাধীনতাবাদী বললে ভুল করা হবে না। আমেরিকায় স্ত্রীস্বাধীনতার প্রথম প্রচেষ্টা তিনিই করেছিলেন।

পেইন ছিলেন জাত র‍্যাডিকাল। অবস্থার চাপে তিনি স্ত্রীস্বাধীনতাবাদী হতে বাধ্য হয়েছিলেন। কাজটা খুব সহজ ছিল না। কারণ একটা অপ্রিয়

উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করে জনপ্রিয় করবার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকের যুগগত বৈশিষ্ট্য যুক্তিবাদের সংগে তাল রেখেই পেইন সামাজিক কুসংস্কার আচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। নারীর স্বাধীনতা ও তার ন্যায়সঙ্গত অধিকারের দাবিতে পেইনের এই বিদ্রোহকে তৎকালীন মানুষ সন্দেহ করতো। স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা পারিবারিক জীবনে অশান্তি আনতে পারে এমন একটা ভয় তৎকালীন মানুষের ছিল। পেইনের শাণিত যুক্তির নির্ভুল প্রয়োগে তৎকালীন আমেরিকানদের মনের এই ভুল ধারণা দূর হয়েছিল।

১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে মেরীল্যাণ্ডের মিস মার্গারেট ব্রেন্ট নারী সমাজের স্বপক্ষে কতগুলি দাবি করেন। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে এনি হাচিন্‌সন্ প্রথম নারীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে পেইনের Reflections on Unhappy Marriage প্রকাশিত হয়। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে মিসেস করবিন নারীর ভোটাধিকারের প্রস্তাব করেন। মেরি উলষ্টনক্র্যাফ্‌টের 'Vindication of the Rights of Women' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে Roger Fulford বলেছিলেন, 'She derived the title and some parts of her book from the revolutionery outpourings of Tom Paine called the 'Rights of Man' and it was this revolutionary taint which compelled Walpale to communicate it outside the pale of my library."[২] এর থেকেই পেইন যে স্ত্রীস্বাধীনতা আন্দোলনের একজন অগ্রদূত সে কথা প্রমাণিত হয়। মার্গারেট ব্রেন্ট ও পেইনের মধ্যেকার শতাধিক বছরগুলিতে কিছু খবরের কাগজের আলোচনা, সভা ও নারীপ্রগতিমূলক কয়েকটি প্রস্তাব ছাড়া আর কিছু ঘটেনি। আসলে 'Tom Paine cherished the 'unmilitant' plan of setting up in Philadelphia a seminary of polite learning from young ladies.'[৩]

টমপেইন খ্যাতনামা মানুষদের সঙ্গ পেয়েছিলেন। বেঞ্জামিন রাশ, টিমনি ডুইট, নোয়া ও য়েবস্‌টার এঁরাই তাঁর সঙ্গী ছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই কয়েক বছরের পরেই নাগরিক হবার উদ্দেশ্যে স্ত্রীশিক্ষার দিকে ঝুঁকেছিলেন। এতদিন স্ত্রী-উন্নতি বিষয়ক চেষ্টার মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ স্থান স্বীকার করা হোতো না। পেইন বৃহত্তর সামাজিক সমস্যার সঙ্গে নারী-উন্নতি-বিষয়ক সমস্যাকেও যুক্ত করে দেখলেন। সমস্যাটিকে আলাদা করে রেখে দিয়ে তাকে অবহেলা করলেন না।

এ বিষয়ে পেইন যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলেন তাতে তাঁর কল্পনাশক্তি ও সহানুভূতি দুইই সমানমাত্রায় ছিল। সমসাময়িক সংস্কারকদের সঙ্গে পেইনের দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎই ছিল দৃষ্টিভঙ্গিতেই।

'Women in Nineteenth Century' বইতে মার্গারেট ফুলার বলেছেন যে, দাসপ্রথার বিরুদ্ধে যে অভিযান হয়েছিল তার থেকেই আমেরিকায় নারী-উন্নতি-বিষয়ক আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। সাম্য ও স্বাধীনতার পরিপোষক পেইন 'black slavery' এবং white slavery বা নারী পরাধীনতার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। মানুষ মানুষের সম্পত্তি নয় এই তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্য ছিল। সেইজন্য সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে (অর্থনৈতিক ও সামাজিক) পুরুষের সঙ্গে নারীর মিলনকে মূল ভিত্তি স্বরূপ মনে করতেন। কাজেই যে সরকার Susan Anthonyর ভাষায় 'oligarcy of sex' সে সরকারকে পেইন যে পছন্দ করবেন না এটা খুব স্বাভাবিক। স্ত্রীস্বাধীনতার ক্ষেত্রে নারীর রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতাকেই পেইন বেশি কাম্য মনে করতেন। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে সমসাময়িক নিরুত্তাপ স্ত্রীস্বাধীনতাবাদীদের পার্থক্য ছিল। এক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে পেইন যে শুধু নারীদের আইনগত অধিকার দানেই ক্ষান্ত ছিলেন তা নয় বা পুরুষদের কাজে নারীর অধিকার দানেই নিশ্চিন্ত হতেন তা নয় তিনি মেয়েদের সম্পর্কে গোটা দৃষ্টিভঙ্গিটাই পাল্টাতে চেয়েছিলেন।

ঔপনিবেশিক যুগে লেখা তাঁর সামান্য কয়েকটি শরীর অধিকার বিষয়ক প্রবন্ধ আছে। তার মধ্যে একটি তাঁর লেখা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। কিন্তু সে লেখাটির বক্তব্য ও বলবার ভঙ্গি একান্তই তাঁর নিজস্ব। 'An Occasional Letter to the Female Sex এবং 'Unhappy Marriages-'এর ওপর একটি প্রবন্ধ, দুটিই Pennsylvania ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল। এবং এই দুটি লেখাই প্রগতিবাদী লেখকদের আদর্শ ঃ প্রেরণায় স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রথম রচনাটি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা হয়েছিল। দ্বিতীয়টিতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিশেষ ভাবেই সমাজবিজ্ঞানির্ভর। তবে দুটি রচনাই আমেরিকার স্ত্রীস্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাথমিক দলিল রূপে শ্রদ্ধা করা হয়। তাঁর প্রচুর পরিমাণ রচনা সাময়িক, এবং সাংবাদিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও তাঁর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও নতুন পথ বাতলে দেবার ক্ষমতা সেগুলিকে একেবারে মূল্যহীন করে

তোলেনি। পরে অবশ্য দাসপ্রথা ও অন্যান্য ঔপনিবেশিক সমস্যায় পীড়িত করে পেইন এবিষয়ে আর লেখেননি। তাঁছাড়া স্ত্রীস্বাধীনতা তখন কিছুটা স্বাবলম্বী আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। যাই হোক, স্ত্রীস্বাধীনতাবাদী হিসেবে তাঁর ভূমিকা তৎকালীন সামাজিক পরিবেশের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রীতিমত চিন্তাশীল ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মতো। একথা বললে অত্যুক্তি হবেনা যে Susan Anthony, Elizabeth Stanton, Harriet Stowe-র লেখার মতো পেইনের এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত রচনাও স্ত্রীস্বাধীনতার আন্দোলনকে প্রত্যক্ষভাবে প্রেরণা দিয়েছে।

স্ত্রীস্বাধীনতার পরিপোষক হিসেবে পেইনকে Plato, Mill ইত্যাদি মনীষীদের সঙ্গে এক পংক্তিতে ফেলতে পারি। পিতৃপ্রধান সমাজকে সমালোচনা করতে এবং নারীর সামাজিক স্বার্থকে রক্ষা করতে পেইন ছিলেন অদ্বিতীয়। পুরুষের আশ্রিত হিসেবে নারীকে অন্যায়ভাবে অবহেলা করা হয়েছে। তাদের পৃথক সত্তা হিসেবে দেখা হয়নি। পেইন উদ্ধতভাবে বলেছিলেন যে, If we have a survey of the ages, and the countries, we shall find women at all times, and in all places, adored and oppressed.'[৪] তৎকালীন সমাজে নারীদের এই উভয়প্রকার অবস্থাকেই পেইন নির্মম যুক্তির অস্ত্রে আক্রমণ করেছিলেন। করুণা ও কৃতজ্ঞতার পাত্রী হিসাবে নারীদের দেখতেও তিনি বারণ করেছিলেন। অন্তরের আবেগ আর নৈতিক আদর্শ—এই দুয়ের মধ্যে তারা জ্বলে পুড়ে মরেছে। কাজেই তাদের বুদ্ধি ও হৃদয়কে অপমান করবার মতো আইন-কানুন না হওয়াই শ্রেয় বলে মনে করতেন তিনি। পেইন চাইতেন, পরিবারে নারীর যেমন সম্মান ও মর্যাদার স্থান, সামাজিক ক্ষেত্রেও সম্মান ও মর্যাদাও তার প্রাপ্য। পুরুষের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবার আগে নারীকে আত্মনির্ভর হবার সুযোগ দিতে হবে। আমেরিকান সমাজে নারীর প্রতি এই সুবিচারই তিনি আশা করতেন। ধীরে ধীরে সমাজের সংস্কারগুলি দূর করতে পারলেই নারীদের উপযুক্ত স্থান সমাজে হবে। সহানুভূতি ও সমগ্র সামাজিক পরিবেশের চিন্তা না থাকাতেই নারীর প্রতি এই অমর্যাদা ঘটেছে। পেইনের ভাষায় when they are not beloved, they are nothing; and when they are, they tormented.[৫] সমাজে নারীর স্থান সম্পর্কে পেইন এই সিদ্ধান্তই করেছিলেন। পুরুষের তৈরি আইনে সমাজে নারীর এই ব্যক্তিগত প্রকাশ একেবারে বন্ধ। সে আইন তুললে তবে নারী সমাজে স্বাভাবিক অধিকার ফিরে পাবে।

স্ত্রী স্বাধীনতার সমর্থনের একটি অর্থনৈতিক দিকও আছে সে কথা পেইন ভেবেছিবেন কিন্তু সমসাময়িক অন্যান্য চিন্তাশীল মনীষীরা ভাবেন নি। বিবাহকে আর্থিক লাভের উপায় হিসেবে দেখতে পেইন চাইতেন না। তিনি বলতেন, Those who either marry gold withovt love, or love without gold should be miserable. Sum of each other, they no longer take any pains to be mutually agreeable. এই উক্তির মধ্যে যে আর্থিক লালসা বৈবাহিক সম্পর্কে নষ্ট করছে সেই লালসাকে এবং যৌতুক গ্রহণ প্রথাকেও সমালোচনা করেছেন। মনোবিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের ছাত্রের মতো (যদিও ও দুটি শাস্ত্র তিনি পড়েছেন বলে প্রমাণ নেই) নরনারীর মিলন ও বিচ্ছেদের সমস্যাটিকে আলোচনা করেছেন বোধ হয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেই। দৃঢ় ও সুগঠিত পারিবারিক জীবনের ওপরই মানুষের সুগম সামাজিক জীবন নির্ভরশীল। পরিবারই হোল জীবনের সকল প্রকার প্রগতির কেন্দ্র এবং পরিবারের আবহাওয়া নারীর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। অবশ্য পেইন নারী-পুরুষের সম্পূর্ণ সমান অধিকার চাননি। তার কারণ যুগগত পরিসীমা তিনিও কাটাতে পারেননি সম্পূর্ণভাবে। নারীর অসহায় করুণ অবস্থা ও অত্যাচার সহ্য করবার নীরব সহনক্ষমতাই তাঁকে নারীর সামাজিক অবস্থার প্রতিকারে প্রেরণা দিয়েছে। বিহাহকে তিনি অস্পষ্ট অমূর্ত ভাবে হিসেবে গ্রহণ না করে খানিকটা ব্যবসায় ক্ষেত্রের সহযোগীর মতোই ভাবতেন। এ চিন্তা তাঁর সামাজিক বাস্তববুদ্ধির পরিচয় বহন করে। অসুখী বিবাহিত জীবন ও তার ফলাফলবিষয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। সুখী বিবাহিত জীবনই সমগ্র জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসে। কাজেই পারস্পরিক নির্বাচন ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

আরও লক্ষ্য করবার বিষয় হোলো যে, এশিয়া ও আফ্রিকার নারীসমাজের করুণ অবস্থার প্রতি পেইনের দৃষ্টি পড়েছিল। তখন এই দুটি দেশের নারী-সমাজের প্রতি সে দেশের আর কারো দৃষ্টি পড়ে নি। 'An Occasional Letter to the Female Sex'-এ তিনি বলেছিলেন, 'The women among the Indian in America are what the Helots were among the Spartans, a vanquished people obliged to toil for their conquerors. এ উক্তিতে দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে। এশিয়াকে নারী-

সমাজের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে পেইন যা বলেছেন তাতে প্রশংসার কোনো কথাই নেই।—'All Asia is covered with prison, where beauty in bondage waits the caprices of a master. The multitude of women there assembled have no will, no inclinations but his.'[৭] প্রাচ্যে – বিশেষ করে তুরস্ক, ভারতবর্ষ, জাপান এবং চীনে মনুষ্যজাতির অর্ধাংশ অপর অর্ধাংশের দ্বারা শোষিত হচ্ছে এবং এই শোষণে বহু মানবিক শক্তি নষ্ট হচ্ছে—এই ধারণা ও দেশে পেইনের মনেই প্রথম এসেছিল। পেইনের এই সমস্ত সাময়িক রচনাগুলি তৎকালীন ভারতীয় সমাজের উপযোগী হয়েছিল, কারণ সে সময় ভারতীয় সমাজেও বিপ্লব দেখা দিয়েছিল।

নারীর স্বাধীনতা বিষয়ে পেইন খুব বেশিদিন ধরে লেখেন নি বলে অনেক সমালোচক পেইনকে সত্যিকারের 'women righter' বলতে রাজি হন নি। কিন্তু যুগগত সংস্কারকে সম্পূর্ণ কাটাতে না পারলেও নারী-সমাজের বিশেষ প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলিকে পেইন তুলে ধরেছিলেন। নারীর আইনগত ও সামাজিক মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করবার প্রচেষ্টা তিনি করেছিলেন। ঐ প্রচেষ্টার সঙ্গে ক্ষমতার অপব্যবহারের আশঙ্কা অবশ্যই জড়িত। তাই সমস্ত প্রকার শ্রেণীবিভাগ ও সংস্কার থেকে মুক্ত স্বাধীন শাসন ব্যবস্থার মধ্যেই নারীকে যথার্থ মর্যাদা দেওয়া সম্ভব—এই ছিল পেইনের মত প্রকৃতপক্ষে Mary Woolstoncraft-এর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি এবং John Stuart Mill-এর ন্যায়বোধ এই দুটিকে এক করেছিলেন টমাস পেইন। মিল যখন তাঁর 'Subjection of Women' এর সূচনায় বলেন 'The principle which regulates the existing social relations between the two sexes—the legal subordination of one sex to the other—is wrong in itself and now one of the chief hindrances to human improvement'[৮]—তখন পেইনের সংগে তাঁর তুলনার কথা মনে আসে। মিল কিন্তু পেইনের মতো সামাজিক অবস্থা ও মনোভঙ্গির ওপর তেমন জোর দেন দি। তবে দুজনেই নারীর প্রতি অবিচারশীল সমাজকে সমালোচনা করে নারী সমাজের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় ওকালতি করেছিলেন।

নারীমুক্তির ক্ষেত্রে পেইনের কোনো কোনো বক্তব্য অবশ্যই বর্তমান যুগের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কারণ বর্তমান যুগে সাধারণ শিক্ষার সংগে যৌন

শিক্ষা ও যৌনজ্ঞানেরও সমান প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়। Charter of the Frisco Conference-এর ভূমিকায় নর-নারীর সমান মর্যাদা স্বীকার করা হয়েছে। মানবাধিকারকে সর্বতোভাবে গ্রহণ ক'রে এবং U. N. Sub-committee-র (১৯৫২) মধ্যে প্রস্তাব পাশ ক'রে নারীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এখন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে একটি রয়াল কমিশন বিবাহবিচ্ছেদ, পরিবার, সম্পত্তি ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধানও করেছে। বর্তমানে তিনটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি সবচেয়ে আকৃষ্ট হয়েছে দেখা যাচ্ছে: রাজনৈতিক অধিকার, বিবাহিত নারীর জাতীয়তা এবং নারীর মর্যাদা। নারীসমাজ এখন নতুন যুগের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে এবং এই অগ্রগতির জন্য আমরা বিশেষ ভাবে টমাস পেইনের নিকট ঋণী।

(১) New View Points in American History. Page 127. A. M. Schelesinger.

(২) Vote for Women by Roger Fulford, Page 23.

(৩) Main Currents of American Thought—Liberation and the Constitution—Parrington, Page 328.

(৪) An Occasional Letter on the Female Sex. Ed. Conway Works of Paine. volume I.

(৫) Do.

(৬) Reflections on Unhappy Marriages—conway Vol. I.

(৭) An Occasional Letter on the Femele Sex—Conway.

(৮) Subjection of Women by J. S. Mill.

বিজ্ঞানশিক্ষা ও রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

গত শতকের জনৈক জার্মাণ মনীষী নিম্নলিখিত ভাষায় ইউরোপীয় Renaissance বা নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন: "It was the greatest progressive revolution that man has so far experienced, a time which called for giants and produced giants—giants in power of thought, passion, and character, in universality and learning. .....The heroes of that time had not yet come under the servitude of the division of labour, the restricting effects of which, with its production of one-sidedness, we often notice in their successors. .....They almost all pursue their lives and activities in the midst of the contemporary movements, in the practical struggle ; they take sides and join in the fight, one by speaking and writing, another with sword, many with both. Hence the fullness and force of character that makes them complete men."

যখন কোনও দেশে একটা বৈপ্লবিক নবজাগরণ আসে, তখন তার অগ্রদূত ও পথিকৃৎদের মধ্যে মূলগতভাবে যে লক্ষণগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেইগুলি এই উদ্ধৃতির মধ্যে অননুকরণীয়ভাবে বর্ণিত হয়েছে। ভারতবর্ষে গত শতকে যে নবজাগরণ আসে, তার বিকাশ হয়তো বিদেশী শাসনের বেড়াজালে পূর্ণতা ও প্রবলতা পায়নি, কিন্তু যে মহাপুরুষরা (*heroes*) স্বদেশের প্রয়োজনকে এবং চাহিদাকে বুদ্ধি ('*power of thought*') ও হৃদয় ('*passion*') দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁরা অনেকেই ছিলেন '*giants* ..... *in universality and learning*'। উন্নত মানবসমাজে specialization-এর দরকার অবশ্যই খুব বেশী, কিন্তু আধুনিক যুগে *specialization* বা '*division of labour*'-এর আতিশয্য এমন পর্যায়ে প্রায়ই পৌঁছচ্ছে, যাতে সমকালীন প্রয়োজনীয় আন্দোলনে

বা *'contemporary movements*-এ (শিক্ষামূলক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক) যোগ দেবার মত মানসিক প্রসার অনেক ক্ষেত্রেই গড়ে উঠছে না বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে, কারণ তাঁদের মধ্যে দেখা দিয়েছে *'one-sidedness'*। কিন্তু ভারতবর্ষীয় নবজাগরণের যে দুজন পথিকৃৎএর শতবার্ষিকী উৎসব আমরা করছি, তাঁদের মধ্যে একজন মূলত কবি—রবীন্দ্রনাথ, এবং আর একজন মূলত বিজ্ঞানী—প্রফুল্লচন্দ্র ; অথচ তাঁরা *'complete men'*। কারণ তাঁরা দ্বিধাহীন ভাবে সাড়া দিয়েছেন, যোগ দিয়েছেন, পথ দেখিয়েছেন স্বদেশের নূতন নূতন আন্দোলনে —কর্মের মধ্যে দিয়ে, সংগঠনের মধ্য দিয়ে, বলার মধ্য দিয়ে, লেখার মধ্য দিয়ে (*'by speaking and writing'*) ; সেই আন্দোলন, দেশের সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন ও উন্নতির আন্দোলন। তাছাড়া, জ্ঞানের রাজ্যেও তাঁরা কেবল নিজেদের specialization নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। মানবসমাজকে সেবা করতে গিয়ে তাঁদের দৃষ্টি ও জ্ঞান যেমন প্রসারিত হয়েছে, তেমনি নিছক জ্ঞান আহরণের আনন্দেও তাঁরা নিজেদের জ্ঞানভাণ্ডারকে অক্লান্তভাবে পূর্ণ করেছেন।

সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ এবং ব্যক্তিগত জ্ঞানপিপাসার অখণ্ডতার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ রচিত "বিশ্বপরিচয়"—'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার' প্রথম গ্রন্থ। এই বইয়ের পত্র-ভূমিকায় (অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে লিখিত) রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই, বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা স্বীকার করলে তাতে অগৌরব নেই। সেই দায়িত্ব নিয়েই আমি এ কাজ শুরু করেছি। .....বস্তুতঃ আমি কর্তব্য-বোধে লিখেছি কিন্তু কর্তব্য কেবল ছাত্রদের প্রতি নয় আমার নিজের প্রতিও। এই লেখার ভিতর দিয়ে আমার নিজেকেও শিক্ষা দিয়ে চলতে হয়েছে।"

সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত কর্তব্য-বোধের এই অখণ্ডতা রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রত্যেক শাখাতেই প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু বিশেষভাবে বিজ্ঞান-শিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে তাঁর সচেতনতার কারণ তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন "বিশ্বপরিচয়ের" পত্র-ভূমিকাতেই। বছর বারো তেরো বয়স থেকেই আকাশের নক্ষত্র চেনা, এবং ক্রমে ক্রমে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রাণবিজ্ঞানের বই পড়ার ভেতর দিয়ে তাঁর "মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ধ বিশ্বাসের মূঢ়তার

প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে।" নির্বিচারে authority বা dogmaকে না-মানবার যে বৈজ্ঞানিক মনোভাব সেটা তাঁর মধ্যে অল্প বয়স থেকে পাকা হয়ে বসেছিল বিজ্ঞানচর্চার ভেতর দিয়েই। 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা' প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্যে প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞান-চর্চার।" তিনি নিজে কবি হয়েও অনুভব করেছেন, যে "গল্প এবং কবিতা বাংলাভাষাকে অবলম্বন করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে অশিক্ষিত ও স্বল্প-শিক্ষিত মনে মনন-শক্তির দুর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিল্য ঘটবার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেছে। এর প্রতিকারের জন্যে সর্বাঙ্গীন শিক্ষা অচিরাৎ অত্যাবশ্যক"—এই "সর্বাঙ্গীন শিক্ষার" জন্যে তিনি "প্রধান প্রয়োজন" উপলব্ধি করেছেন বিজ্ঞান-চর্চার, যা "বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক" করতে পারে। দেশের লোককে মূঢ়তা ও মোহাচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত করবার সাধনা তিনি করে গেছেন তাঁর সমগ্র জীবন দিয়ে; কারণ "বিরাট মূঢ়তার ভার বহন করে দেশ কখনোই মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে না।" তাই জ্ঞান বিজ্ঞানকে বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেবার জন্যে ১৯৩৬ সালে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ মতো 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা' প্রকাশের ব্যবস্থা হয়, যার প্রথম বই বিজ্ঞানের বই ('বিশ্বপরিচয়') এবং সে বই লেখার ভার কবি নিজেই নেন, এবং দেখান যে, "যথাসম্ভব পরিভাষা বর্জিত" বিজ্ঞানের এমন পাঠ্যপুস্তক রচনা করা সম্ভব যার মধ্যে "বিষয় বস্তুর দৈন্য থাকবে না।"

১৯৪০-এ শান্তিনিকেতনে পদার্থবিজ্ঞানের তদানীন্তন অধ্যাপক প্রমথনাথ সেনগুপ্ত 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার' জন্যে 'পৃথ্বীপরিচয়' নামে একটি সরস ও প্রাঞ্জল বই লেখেন রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায়। সেই বইয়ের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন : "বিষয় হিসাবে বিজ্ঞান সহজে আয়ত্তগম্য নয় বলেই বিজ্ঞান অধ্যাপনায় শিক্ষকেরা সচরাচর দুরূহ শব্দের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। দুর্বোধ শিক্ষার ভার দুর্গম ভাষার পথে বহন করতে গিয়ে প্রথম শিক্ষার্থীদের মন পীড়িত পিষ্ট হোতে থাকে, এবং তাদের শক্তির প্রভূত অপচয় ঘটে। এই অনর্থক মানসিক ক্ষতি নিবারণ অত্যন্ত আবশ্যক বলে আমি মনে করি। জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞানের দ্বার উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা পাশ্চাত্ত্য দেশে আজকাল বহু প্রচলিত। এই কর্তব্যসাধনে যাঁরা প্রবৃত্ত তাঁরা কেবল যে বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ তা নয়, তাঁরা ভাষা ব্যবহারে নিপুণ। তাঁরা

শিক্ষণীয় বিষয়কে যথোচিত সরল করতে চেষ্টার ত্রুটি করেন না। দেশের চিত্তক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সেচন ব্যাপারকে ব্যাপক করে তোলা তাঁরা কত বড়ো সতর্ক সাধনার বিষয় বলে মনে করেন এর থেকে তার প্রমাণ হয়। আমাদের দেশে জনসাধারণ যেখানে বিজ্ঞানের পরিচয় থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত সেখানে সহজ প্রণালীতে বিদ্যাদানের অধ্যবসায়কে আমি পুণ্য কর্ম বলে গণ্য করি। লোকশিক্ষা সংসদ এই কাজের ভার গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত।" পাঠকরা তো জানেন যে, Jeans, Gamow, Eddington প্রমুখ বিজ্ঞানীদের specialized কাজ বিজ্ঞান-জগতে প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু তাঁরাও জনসাধারণের মধ্যে "বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক" করে তোলার চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞানের খুব সরল অথচ তথ্যপূর্ণ বই লিখে। আমাদের দেশে specialistদের মধ্যে সেই কর্তব্যবোধের অভাব দেখে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এগিয়ে এসেছিলেন সে অভাব মেটাতে এবং অনেককে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এ বিষয়ে অগ্রণী হ'তে।

একটা কথা বলা দরকার যে, বিজ্ঞান-শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সচেতনতা শুধু মাত্র theoretical বা তাত্ত্বিক বিজ্ঞান প্রচারেই পর্যবসিত হয় নি। Practiceকেও তিনি কতটা বড় স্থান দিয়েছেন, তার স্পষ্ট নিদর্শন—শ্রীনিকেতনে কারুশিল্প (handicrafts) শিক্ষার ব্যবস্থা এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে কৃষি ও গোপালনের ব্যবস্থা। তিনি তাঁর নিজের পুত্রকে এবং বন্ধু-পুত্র সন্তোষ মজুমদারকে আমেরিকা পাঠান, তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী হবার জন্যে নয়, স্বদেশের কৃষিকে বৈজ্ঞানিকভাবে উন্নত করার উদ্দেশ্যে নতুন ব্যবহারিক জ্ঞান আহরণ করার জন্যে। বৈজ্ঞানিকভাবে কারুশিল্প আয়ত্ত করবার উদ্দেশ্যে আদর্শবাদী কর্মী লক্ষ্মীশ্বর সিংহকে সুইডেন্ পাঠান Sloyd পদ্ধতি শেখবার জন্যে (সুইডিশ : Sloyd = দক্ষতা)। আবার সুইডেন থেকে শ্রীমতী Jeanson ও শ্রীমতী Cederblom আসেন শান্তিনিকেতনে Sloyd-শিক্ষিকা হিসাবে। জাপান থেকে কারুদক্ষ কাসাহারা আসেন কাঠের কাজ শেখাবার জন্যে। দরিদ্র স্বদেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ কতটা সজাগ ছিলেন, তা বোঝা যায় এই উদাহরণগুলি থেকে। কারুশিল্পকে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করতেও তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হননি। লক্ষ্মীশ্বর সিংহ সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্যে 'কাঠের কাজ' নামে একটি বই লেখেন (১৯২৫) ; রবীন্দ্রনাথ বইটির ভূমিকায় বলেন : "আমাদের মতে পঙ্গুতাই ভদ্রসমাজের লক্ষণ, হাত পা গুলোকে

অপটু করিয়া তুলিলেই ভদ্রতা পাকা হয়। ইহার ক্ষতি যতদিন বুঝিতে পারি নাই ততদিন বাঙালি ভদ্রসন্তানের একমাত্র মোক্ষলাভ ছিল কেরাণীতীর্থে। সেখানে জায়গার টানাটানি ঘটিতেই দেখা গেল তাহার মতো অসহায় প্রাণী আর জীবলোকে নাই। সংসার-সমুদ্রে পুঁথিগত বিদ্যাই যাহাদের একমাত্র ভেলা ছিল তাহাদের এবার নৌকাডুবির পালা। সেই সংকটের তাড়নায় ভদ্রলোকের ছেলেকেও আজ হাতে ও কলমে দুই দিকেই শক্ত হইতে হইবে এই তাগিদ আসিয়াছে। এই শুভদিনের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ 'কাঠের কাজ' বইখানি লিখিয়াছেন, ভদ্রলোকের ভয়ে 'ছুতোরের কাজ' নাম দিতে পারেন নাই। যাহার হাত দুটো কর্মিষ্ঠ নয়, হাতের দিকে সে মূঢ়, তা হোক না সে নামজাদা, বা পণ্ডিত-বংশের কুলতিলক।" Theory-কে অগ্রাহ্য করে practice-এর ভিত্তি যেমন পাকা হয় না, তেমনি আবার হাতে করার, চোখে দেখার অভিজ্ঞতাকে, অর্থাৎ practice-কে, তাচ্ছিল্য করেও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা theory কখনও সুদৃঢ় হয় না। পাঠকরা বোধহয় জানেন যে, ইউরোপীয় নবজাগরণের অগ্রদূত লেওনার্দো দ্য ভিন্‌চি যেমন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের (theory) প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনি তাঁর আত্মবিশ্বাসের মূলে ছিল তাঁর কারুদক্ষতা, হাতে কাজ করার ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা (experience & practice)। Theory ও practice-এর এই সমন্বয়ের আদর্শ নবজাগ্রত পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষাপ্রণালীকে সর্বাঙ্গীনভাবে পুষ্ট করেছে। আমাদের দেশের শিক্ষায় এই সমন্বয়ের অভাব রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায়নি এবং তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের এবিষয়ে সর্বদা সজাগ করে দিয়েছেন, যাতে "পুথিগত বিদ্যাই" ছাত্রছাত্রীদের জীবনে "একমাত্র ভেলা" না হয়ে ওঠে। একটা কথা উল্লেখ করা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতা প্রতি পদে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কবিতায়, গানের মধ্যেও। যেমন, তাঁর রচিত প্রকৃতির গানে ছয় ঋতুর যে বিচিত্র ফুল, ফল, গাছপালার কথা এসে পড়েছে, তার মধ্যে কোথাও কোনও অবৈজ্ঞানিক অজ্ঞতার চিহ্ন নেই। শরতের গানে কখনও বেল ফুলের জুঁই ফুলের কথা বলে বসেন নি, অথবা কাশ ঝরে যাবার বর্ণনা করেন নি। গান রচনার সময় এর জন্যে তাঁকে মোটেই বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হয় নি, কারণ তাঁর বাল্যকালেই, তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় বা senses প্রকৃতিকে সজাগভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে বিস্ময় ও কৌতূহলের সঙ্গে।

যাতে এই sense training তাঁর ছাত্রছাত্রীরাও পায়, সেজন্যে নানা রকম পরীক্ষা নেওয়া হত। যেমন শান্তিনিকেতনে কত রকম গাছ আছে, কোন্ জায়গায় কী গাছ আছে, কোন্ বাড়ীটা কতখানি আন্দাজ উঁচু ইত্যাদি। মোট কথা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করার জন্যে যেমন তিনি আধুনিক পরীক্ষাগারের আয়োজন করতেও ত্রুটি করেন নি বা সরল তথ্যপূর্ণ বই লেখবার ও লেখাবার ত্রুটি করেন নি, তেমনি সুস্থ প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে তাদের মধ্যে কৌতূহল ও পর্যবেক্ষণ-শক্তি জাগাবারও চেষ্টা করেছেন, যে জিনিষটা বৈজ্ঞানিক মনোভাব সৃষ্টির জন্যে অত্যাবশ্যক।

দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনে ও চিত্তক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ অক্লান্তভাবে চেষ্টা করেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। যন্ত্রযুগকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন, যন্ত্রকে তিনি কখনও ঘৃণা বা ভয় করেন নি। যে যন্ত্র ও যান্ত্রিকতা মানুষের জীবন ও মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে, তার বিরুদ্ধেই তাঁর বিদ্রোহ। তাঁর 'অচলায়তন' নাটকে পাশ্চাত্যের উদ্যম ও সৃজনীশক্তির যারা প্রতীক, তারাই বলেছে, "কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন, ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে।"

হেমিংওয়ে প্রসঙ্গে

দেবীপদ ভট্টাচার্য

১. হেমিংওয়ে সম্পর্কে শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রবন্ধ পত্রিকা'র গত কার্তিক সংখ্যায় একটি তথ্যপূর্ণ, মনোজ্ঞ ও চিন্তা-উদ্রেকী প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি হেমিংওয়ের সাহিত্যিক ঐতিহ্য, সংলাপ-রচনাকৌশল, বলিষ্ঠ জীবনদর্শন ও সুচিহ্নিত স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করেছেন। কারলস্ বেকার 'Hemingway and his Critics' নামে একখানি বই সম্পাদনা করেছেন। ঐ গ্রন্থে হেমিংওয়ে সম্পর্কে নানা মতের ও পথের সমালোচকদের মন্তব্য সামাহৃত হয়েছে। ফিলিপ ইয়ং-এর পুস্তিকাখানিও মূল্যবান। আরো অনেকে সমালোচনা করেছেন, কিন্তু ফিলিপ টয়েনবি যে-ভাবে হেমিংওয়ের সাহিত্যকীর্তির নিন্দা করেছেন, তাকে সমর্থন করা চলে না। তিনি হেমিংওয়ের মধ্যে মহৎ শিল্পীর কোনো লক্ষণ দেখতে পাননি।

২. ফিলিপ টয়েনবির মতে সম্মতি হয়ত অনেকেই দেবেন না। কিন্তু হেমিংওয়ের উপন্যাসগুলি অন্যান্য সমালোচকের চোখে কেমন লেগেছে তার দু একটি প্রসঙ্গ জানানো অসঙ্গত নয়। 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস'-এ (১৯২৯) তাঁরা দেখেছেন গারট্রুড ষ্টেন কথিত 'লষ্ট জেনারেশন'-এর প্রতিচ্ছায়া। তাঁরা মনে করেন, ১৯১৪-১৮এ প্রথম মহাযুদ্ধরত মানুষের, আমেরিকানদের চিত্তপোষিত সামাজিক মূল্যবোধগুলি যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর যুগে কাম্য রূপ পরিগ্রহ করেনি। তাই প্রসবকালে ক্যাথারিন বার্কলের মৃত্যু যেন সেই প্রেম, সেই-সব মূল্যবোধের মৃত্যু। সেই মৃত্যুতে হেনরি আরও 'সিনিসিজম্'এ নেমে গেছে, নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা তার চোখে লুপ্ত হয়েছে। সেজন্যই এডুইন্ বেরি বারগাম্ লিখেছেন : "From this point of view, A Farewell to Arms gives the history of those basic emotional reactions which culminated in the maladies of the postwar generation and marks Hemingway as pre-eminently the novelist of the 'lost generation' of the 20s."

৩. হেমিংওয়ের 'For whom the bell tolls' উপন্যাস বহুখ্যাত। এর কাল-পর্ব ৬৮ ঘণ্টা মাত্র। স্পেনের রক্তক্ষর গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় এ উপন্যাসখানি রচিত। গণতন্ত্রী ও ফ্যাসিষ্টপন্থীরদের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়েছিল তার প্রামাণিক রূপ এ উপন্যাসে ফুটে ওঠেনি বলে সমালোচকেরা অভিযোগ করেছেন। "As a political history of the war the novel is wilfully misleading." বিখ্যাত ঔপন্যাসিক Arturo Barea এ উপন্যাসের 'অবাস্তবতা'র বিরুদ্ধে লিখেছিলেন। যুদ্ধের পটভূমিকায় স্পেনীয় নারী মারিয়া-র পক্ষে স্বল্প পরিচিত আমেরিকান জর্ডান-সঙ্গমে স্পেনের পাঠকেরা হতবাক্ হয়েছিলেন তাঁরা একে 'বিশ্বাস্য' (convinicing) বলে মনে করেননি। সোভিয়েটের পাঠকেরাও জর্ডান চরিত্রের সমালোচনা করে বলেছিলেন হেমিংওয়ে জানাননি বা বই পড়ে জানা যায় না: 'What precisely his ideas and values were, what made him anti-Fascist, what he hoped to achieve and he hoped to leave behind?" এবং জর্ডানের মৃত্যুবরণকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'anarchistic belief in the mystical value of Self-Sacrifice,' সোভিয়েট সমালোচক, কাশকিন্ লিখেছেন "In the absence of a clearly realised ultimate aim Hemingway's main heroes, even if they join the Common Struggle remain lonely Sportsmen.."—এই সমালোচনা হেমিংওয়ের প্রাপ্য।

চরিত্র পরিচয়

CALCUTTA
ORIENTAL
LIBRARY

CALC

প্রবন্ধ পত্রিকা

বর্ষ ২ সংখ্যা ১০ ॥ মাঘ ১৩৬৮ ॥ ফেব্রুয়ারী ১৯৬২

॥ সূচীপত্র ॥

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ ১—৬ ॥ বাংলার পুনর্জন্ম

জগদীশ ভট্টাচার্য ॥ ৭—১১ ॥ জীবনানন্দ দাশের অপ্রকাশিত দুটি পত্র ও চারটি কবিতা

দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য ॥ ১২—৩০ ॥ উপন্যাস ও প্রিস্টলে

অমলেন্দু ঘোষ ॥ ৩১—৩৬ ॥ বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান চর্চার এক অধ্যায়

সুনীল চক্রবর্তী ॥ ৩৭—৫৭ ॥ তারাশংকর : ছোট গল্পে

গুরুদাস ভট্টাচার্য ॥ ৫৮—৬২ ॥ একতা : রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ সংখ্যা

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৬৩—৭৬ ॥ ইভো আন্দ্রিচ

ই. গোরেফ ॥ ৭৭—৮২ ॥ রাষ্ট্রসংঘ ও প্রাকৃতিক সম্পদ

অধীর চক্রবর্তী ॥ ৮২—১০০ ॥ ভারতীয় প্রাচীন সমাজেতিহাস পাঠের ভূমিকা

প্রচ্ছদশিল্পী : সুবোধ দাশগুপ্ত

সম্পাদক

রামেন্দু দত্ত । চিত্তরঞ্জন ঘোষ

দাম এক টাকা ॥ ২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫ ॥ ফোন : ৬৫-৪৪২৫

প্রকাশ আসন্ন
ফসল প্রকাশনীর
প্রথম বই

বোধ হয় এই পরিণতিই তাঁর পক্ষে অনিবার্য ছিল। যিনি জীবনে অন্যায় ও অসত্যের সংগে আপোষ করে চলতে শেখেন নি, নিজের বাসনার বৃহত্তম মূল্যকে যিনি একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, বঞ্চনা ও বেদনা নিত্য সংগী হয়েও যাঁকে সারস্বত-সংগ থেকে কখনো বিচ্যুত করতে পারেনি, খ্যাতির মোহ ও খাতিরের লোভে যাঁর সুতীব্র উদাসীন্য, সেই বৈরাগ্য সাধকের জীবনের পটভূমিতে আনন্দ বিলাসের কোন চিহ্ন থাকে না।

এ এক পরম আশ্চর্য। অন্তত আমাদের নিরুদ্বিগ্ন জীবনের নিরবচ্ছিন্ন একঘেয়েমির কাছে এ নায়কের নীল-কণ্ঠ-বৃত্তি এক অদ্ভুত বিস্ময়ের দ্যোতক। প্রতিভা ছিল, অর্থপ্রাপ্তির সুবিধা ছিল, জীবনে সুখী হওয়াও যার কাছে মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না, সেই নায়কের জীবনের যবনিকা পতন হোল কিনা এক চরমতম আত্মক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে। আত্মযন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে।

নিতাই বসুর

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁর জীবনটাই একটা ট্রাজেডি হয়ে ওঠে কেননা সামাজিক ভালো মন্দের সংগে ব্যক্তিক অনুভূতি খাপ খায় না। সেই ট্রাজেডিই যে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং সেই আমরন জীবনই যে নাটকের উপজীব্য, সেই নাটকের উপজীব্য, সেই নাটকের মৃত্যুঞ্জয়ী নায়ক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফসল-প্রকাশনী
৩৭ কামিনী স্কুল লেন
সালকিয়া, হাওড়া

প্রবন্ধ পত্রিকা

বর্ষ ২ সংখ্যা ১০ ॥ মাঘ ১৩৬৮ ॥ ফেব্রুয়ারী ১৯৬২

বাংলার পুনর্জন্ম

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

ইতিহাসজ্ঞরা জানেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত তথা বাংলা অতীব দুর্দশাগ্রস্ত ছিল। বিদেশ থেকে আসা নানা ভাগ্যান্বেষীরা ভারতে এসে নানা গোলমাল সৃষ্টি করেছিল। সাধারণ লোকের কাছে এরা মোগল বলে পরিচিত ছিল। এরপরে দেখা দিল মহারাষ্ট্রের অভ্যুত্থান। মারাঠাদের হাঙ্গামা বাংলায় তার সমস্ত তীব্রতা নিয়ে আবির্ভূত হল। তারও পরে বাংলাদেশ ইংরেজদের দ্বারা অধিকৃত হল এবং তারাই ধীরে ধীরে ভারত গ্রাস করল।

এই রকম নানা ধরনের রাজনৈতিক বিস্ফোরণের ফলে ভারতবাসীর আদর্শ ও মন অত্যন্ত কলুষিত হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপীয়রা বাংগালীর যে চরিত্র অংকিত করেছেন, তা আমাদের পক্ষে চরম লজ্জার। কথায় আছে—'যস্মিন রাজা তস্মিন প্রজা' সুতরাং ইংরেজ রাজত্বে এদেশে লোকের মন ও চরিত্রের অবনতি ঘটবে, সেটা স্বাভাবিক। একটা নতুন শাসন যন্ত্র সেই সংগে আভ্যন্তরীণ শান্তি তারা প্রতিষ্ঠিত করেছিল, কিন্তু দেশবাসীর নৈতিক উন্নতি সাধন করতে পারেনি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মেকলে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করলেন—"গঙ্গা-তীরবাসী কালোমুখ ছেলেরা হোমর সেক্সপীয়র, মিল্টন পড়বে ও আমাদের সভ্যতায় গৌরবান্বিত হবে।"—এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু সেই ইচ্ছা ব্যর্থ হয়। প্রথমে রাজা রামমোহন এবং পরে ইংরেজী-সাহিত্যে সুশিক্ষিত একদল যুবক এদেশে নতুন জ্ঞানের প্রসারে অগ্রসর হলেন। এ ঘটনাকে ভারতের নব জাগরণ বলে ঘোষণা করা হয়ে থাকে।

পারস্য-চর্চা একদিন আমাদের দেশ থেকে চলে গিয়েছিল। তার জন্য দুঃখ নেই। কিন্তু যে নতুন কৃষ্টি পশ্চিম থেকে এল, তা রক্ষা করবে কারা? ধনীরা লেখাপড়া শেখে না। মধ্যবিত্তরা চাকরীর জন্যে লেখাপড়া শেখে। দেশের লোকের মন অবনত। ইংরেজী শিক্ষায় কোন নবপ্রভাত আসতে পারে? ইংরেজ শাসনে তাদের সংগে জুটে তাদের ছোট অংশীদার হয়ে যারা লুটের অভিযানে যোগ দিয়েছিল, তারা হলো ধনী সম্প্রদায়। আর যারা ইংরেজের অধীনে আড়তে গোমস্তাখানাতে মুহুরীগিরি করত তাদের বংশধররা হলো বর্তমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এরাই নাকি দেশের নব জাগরণ সম্ভব করেছে!

এই শ্রেণীগুলি ভারত তথা বাংলার অতীতের সংগে সম্পর্কবিহীন। তাদের ইতিহাস শুরু হয়েছে পলাশী যুদ্ধের প্রাঙ্গণ থেকে। তারা জানত, সিরাজদ্দৌল্লা অত্যাচারী, বিদ্রোহী সিপাহীরা বর্বর এবং ইংরেজ সরকার তাদের মা-বাপ।

যে জাতির ওপর হাজার বছরের ভাগ্য বিপর্যয়ের ঝড় বয়ে গেছে, যারা নিজেদের অতীত কীর্তি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত, সেই বাঙ্গালী জাতিকে বাংলার অতীত গৌরবের কথা বললে তারা হয়ত আজও উপহাস করবে, কিন্তু মনে রাখা দরকার, অনেক অতীতে নয়, চৈতন্যদেব এবং তারো পরবর্তীকালে মধুসূদন সরস্বতীর আবির্ভাব ঘটেছিল এই বাংলা দেশে।

আঠারো শ' চুরানব্বই সালে যখন আমরা স্কুলে পড়তাম, আকাশ বাতাস মথিত করে বাঙ্গালীর ভীরু অপবাদ শোনা যেত। বইয়ে ছবি থাকতো সাতজন লোক একজন বাঙ্গালীকে ধরে তার হাতে বন্দুক দিয়ে তবে গুলী করাচ্ছে। বাঙ্গালী মানসিকতার এই অবস্থাকে নব জাগরণ বলা যায় কি? শ্রীঅরবিন্দও ঠিক এই কথাই বলেছেন, অতীতে যদি কৃষ্টির অভাব না ঘটে থাকে এবং বর্তমানে যদি তার সংগে কোন পার্থক্য না থাকে তবে তাকে রেনেঁসাস বলব কোন মুখে? আসল কথা ইউরোপীয়দের কাছ থেকে সব কিছু ধার করতে করতে আমরা ইতিহাসও ধার করতে শিখেছি। ভুলে গেছি যে ইউরোপীয় ইতিহাস আর এ দেশীয় ইতিহাস এক নয়। ইউরোপীয় রেনেসাঁসকে আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীতে আরোপ করা ইতিহাসসম্মত নয়।

বাস্তবিকই ঊনবিংশ শতাব্দীর অবস্থাটা কি রকম ছিল। দেশ সত্যিই মরে গেছে। রাজনৈতিক জয় তো বটেই ইংরেজের মানসিক জয়ও কায়েম হয়েছে। একটি নগণ্য চাকরীর জন্য ইংরেজের জয়গান করতে কারো বাধত না। প্রকাশ্যেই

লোকে বলে বেড়াতে, 'ইংরেজ রাজত্বে সূর্য অস্ত যাবার নয়। বাঙ্গালীর ভাগ্যে চিরপরাধীনতাই লেখা রয়েছে। প্রথমে তুর্কী, তারপর মোগল-পাঠান, সবশেষে ইংরেজ। ইংরেজ শাসন যদি শৃংখল হয় তবে সে শৃংখল স্বর্ণশৃংখল।'

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর কাছে অতীত ছিল অবজ্ঞাত। ভবিষ্যত অজ্ঞাত। বর্তমান ছিল কলুষিত এবং কলুষিত বর্তমান নিয়েই সে ব্যস্ত থাকত। অন্নচিন্তাই ছিল প্রধান চিন্তা, ইংরেজকে মা-বাপ বলে কোন ক্রমে ইংরেজী শিখে একটি সরকারী চাকুরী জুটিয়ে ধন্য হওয়া ছিল তার জীবনের লক্ষ্য। বাঙ্গালীর না ছিল কোন রাষ্ট্রচেতনা, ব্যবসা বাণিজ্য বিদেশীর হাতে। বীরত্বের চরমতম পরাকাষ্ঠা ছিল আত্মীয়-বিরোধ নিয়ে হাইকোর্টে মামলা চালান। তার মনও অন্য সব বিষয়ে স্থাণুবৎ ছিল।

সত্য বটে, ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার আন্দোলন দেশে সুরু হয়েছিল। কিন্তু একথাও সমান সত্য, অগণিত জনসাধারণকে তা স্পর্শও করে নাই। নব্য বাঙ্গালী এবং কেশবচন্দ্রের কঠোর নীতির প্রচারে একটা উচ্চ নৈতিক আদর্শ জাগরিত হয়েছিল কিন্তু অধিকাংশ লোকের মধ্যে তার ছায়াপাতও হয় নি এবং সে আদর্শ বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। বাংলার বাইরে বাঙ্গালী এর ফলে কিছু সুনাম অর্জন করলেও দুর্বল মানসিকতার জন্য উচ্চ আদর্শ শীঘ্রই বিদায় নিয়েছিল। স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবোধ ছিল তার কাছে দুর্বোধ্য—প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালী যা বুঝত তা হল দলাদলি এবং জানত মারামারি।

একটা চাতক পাখি দেখা গেলেই যেমন গ্রীষ্ম আসে না—তেমনি দুচার জন যথার্থ ইংরেজীবিদ নামজাদা লোকের আবির্ভাবে বাংলায় উনবিংশ শতাব্দীতে নবযুগ আসে নি। জাতীয় জীবনের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও সাধনা বাঙ্গালীর ছিল না। ফলে ধর্মের নামে দলাদলি ছিল তার মুখ্য অবলম্বন। যদিচ 'পিউরিটান' প্রচারে দেশের মুষ্টিমেয় লোকের কিছু চারিত্রিক উন্নতি ঘটেছিল কিন্তু এ উন্নতি বৃহৎ অংশের উপর ছাপ ফেলে নি। তা ছাড়া দেশের মধ্যে যাঁরা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হলেন তারা বস্তুত বিজাতীয়ে পরিণত হয়েছিলেন। দেশের মাটির সঙ্গে কোন সংযোগ তাদের ছিল না। ছিন্নমূল এই সম্প্রদায়রে কৃষ্ণবর্ণ ইংরেজ বললেই তাদের সঠিক পরিচয় দেওয়া হয়—মন তাদের ঘুরে বেড়াত টেমসের তীরে, লণ্ডনে, বাকিংহামে।

এমন সময় স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব শিকাগোর ধর্মসভা থেকে জীবনের

শেষদিন পর্যন্ত তিনি শুনিয়ে গেছেন, ভারতবাসীর লজ্জিত হবার কারণ নেই। ভারতবাসী উচ্চ সভ্যতার অধিকারী এবং সে জেগে উঠতে পারে। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য এবং উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্ত বরান্ নিবোধতঃ—এ অবসন্ন জাতির কাছে টনিকের কাজ করেছে। বাংলার পুনর্জাগরণের সূত্রপাত এখান থেকেই। আমেরিকায় তাঁর সাফল্য বাঙালীকে গভীর আত্মবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বিবেকানন্দের মৃত্যু হয়। তার পরেই সমস্ত বাংলাদেশে আক্রমণশীল জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশ দেখা দেয়। ফরাসী মনীষী রোঁমা রোঁলা বলেছেন, "স্বামী বিবেকানন্দের নব বেদান্ত মৃতপ্রায় জাতীয়তাবাদের ক্ষতে আরোগ্যের প্রলেপের কাজ করে।"

১৯০৩ সালের আর একটি অভাবনীয় ঘটনা বাংলার পুনর্জাগরণকে অগ্রসর করার সহায়ক হয়। ঐ সালেই শ্রীঅরবিন্দ বাংলা দেশে আসেন এবং কয়েক-জনকে নিয়ে গুপ্ত সমিতি গঠন করেন। তরুণদের স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত করার ব্যাপারে এই গুপ্ত সমিতির দান অপরিসীম।

স্বামী বিবেকানন্দ লোকসেবাকেই কর্মযোগ রূপে চিত্রিত করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ স্বাধীনতাকেই কর্মযোগ বলে অভিহিত করলেন। গুপ্ত সমিতিগুলির প্রসার, কর্মযোগী ও যুগান্তর পত্রিকার প্রচারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশেও ইউরোপের Blood and thunder যুগের মত রক্ত ও ঝটিকার যুগের সূত্রপাত হল। স্বদেশী গানের মাধ্যমে দেশ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। বাংলা সাহিত্য, গান, বক্তৃতা অগ্নিবর্ষণ সুরু হল। দেশবাসীর মনোভাব পরিবর্তিত হতে লাগল। দেশে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক আলোচনা, তর্কবিতর্ক ও বক্তৃতার প্লাবন বয়ে যেতে লাগল। ইউরোপীয়রা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতি এই বদ্ধমূল ধারণাও ক্রমে ক্রমে অপসৃত হয়ে রয়ে গেল কেবল মুষ্টিমেয় ইঙ্গ-বঙ্গের মনে।

এর পর ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাংলাদেশ গর্জন করে উঠল। এর আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ ইংরাজকে জাতীয় জীবন থেকে বর্জন করার উপদেশ দিতেন। তিনি এ সময়ে Parallel Government গঠন করে জাতীয় জীবনকে স্বায়িত্বাধীন করতে বললেন (স্বদেশী সমাজ দ্রষ্টব্য)। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা দেখা গেল, অতীত ইতিহাস অন্বেষণ আরম্ভ হল। বারভূঁইয়ারা আবিষ্কৃত হলেন, মল্লভূমির ইতিহাস আলোচিত হতে লাগল।

গুপ্ত সমিতির আখড়াগুলি দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। দেহে মনে একটি সুস্থ সবল জাতি হবার আগ্রহ বাংলা দেশে দেখা দিল। কুস্তি ব্যায়ামচর্চা যেমন চলতে লাগল তেমনি স্বামী বিবেকানন্দের বই, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, স্বপ্নদত্ত ভারতের ইতিহাস ইত্যাদি পড়া হতে লাগল ঘরে ঘরে।

নূতন বাংলা জন্মগ্রহণ করল। পুরাতন বাংলা, যা দেখে বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করেছিলেন, "ভূতলে অধম বাঙালী জাতি"—সে বাংলা অন্তর্ধান করল।

আমি বাংলার অতীতকে দেখেছি, বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে কিছু জ্ঞান আমার আছে, আমার সামনে বর্তমান বাংলা গড়ে উঠেছে। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, যে অতীতকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি আর যে বাংলা আমার চোখের সামনে গড়ে উঠছে এই উভয় বাংলা এক নয়, নূতন বংলার ইতিহাস স্বতন্ত্র। স্বদেশী আন্দোলন থেকেই এই বাংলার সূত্রপাত। স্বামী বিবেকানন্দ এই বাংলার জমি প্রস্তুত করেছেন, শ্রীঅরবিন্দ সেই জমিতে বীজ বপন করেছেন কিন্তু তরু পল্লবিত হতে সময় লেগেছিল।

দুঃখের কথা পরবর্তী সময়ে রোমান্টিকতা বাংলা দেশের চেতনাকে অভিভূত করেছিল। গুপ্ত সমিতিগুলি সন্ত্রাসবাদ ও প্রাণদানকে যতটা মূল্য দিতেন, দেশের জাগরণকে ততটা মূল্য দেননি। ফলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ও বিদেশী অস্ত্র-প্রাপ্তির আশায় তাদের দিন কাটত। স্তালিন যেভাবে গুপ্ত আন্দোলন ও গণ আন্দোলনকে মেলাতে পেরেছিলেন এদেশের সন্ত্রাসবাদীরা ততটা পারেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে গান্ধীজীই এদেশে প্রথম গণ আন্দোলন সুরু করলেন। কিন্তু গান্ধীজীর গণআন্দোলন ছিল অহিংসার লৌহ আবরণে মোড়া—ফলে তার সমস্ত ধার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের সঙ্গে দরদস্তুরে সুবিধা আদায় করে নেওয়া। যারা যথার্থ ভিত্তিতে গণআন্দোলন পরিচালনা করছিল সেই সাম্যবাদীরা দুর্বল ছিলেন। ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত আমাদের দেশে এই অবস্থায় চলেছিল। ১৯৪২ সালের আগষ্টে কুইট ইণ্ডিয়া প্রস্তাবে একবার দেশে বিস্ফোরণ ঘটে, কিন্তু অসংগঠিত আন্দোলনে শীঘ্রই ভাঁটা পড়ে।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে ভারতে প্রবেশ করেন, ভারতবর্ষের তথা বাংলার জাগরণের দিক থেকে তার অত্যাশ্চর্য অবদান রয়েছে। ভারতভূমিতে তাঁরা

জাতীয় পতাকা উড্ডীন করেছিলেন বা কোহিমা পর্যন্ত দখল করেছিলেন, ঘটনার দিকে থেকে এটি তত বড় ঘটনা না হতে পারে কিন্তু ভারতীয় মানসিকতায় এই ঘটনা বিপ্লব সাধন করেছিল—সে পরিবর্তন কত ব্যাপক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ঘটনাগুলি এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ তার প্রমাণ।

স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে বাঙালীর আত্মবিশ্বাস বেড়েছে, বাঙালী মেয়েরা ইংলিশ চ্যানেল পার হচ্ছে, ছেলেরা নন্দাঘুন্টি, মানা অভিযানে বের হচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারে বাঙালীর আগ্রহ বেড়েছে। অতীতকে জানবার, বর্তমানকে উপভোগ করবার, ভবিষ্যত গড়ে তুলবার আগ্রহ থেকে স্বচ্ছন্দে বলতে পারি, বাঙালী জাতি জেগে উঠেছে।

দুঃখের কথা, স্বাধীন বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়ে পৃথক ভাবে বিবেচিত হচ্ছে। এ দুঃখ আমি ভুলতে পারি না। ভবিষ্যত ভবিষ্যতেরই হাতে দিয়ে আমি বিদায় গ্রহণ করছি। "জয় হিন্দ" (৪ঠা অক্টোবর, ১৯৬১)।*

---

*ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কর্মময় জীবনের অবসান ঘটেছে। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা হয়েও তাঁর ছায়ায় ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কখনও ঢাকা পড়েন নি। নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন তাঁর কর্ম ও চিন্তায়। 'বাংলার পুনর্জন্ম—স্বামীজী থেকে নেতাজী' এই শিরোনামায় একখানি গ্রন্থ লেখার ইচ্ছা তাঁর ছিল। সে বইখানি তাঁর লেখা হয়ে ওঠেনি। পুস্তকখানির বিষয়বস্তু, অতি সংক্ষেপে, বীজাকারে এই প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে। যতদূর আমরা জানি, ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের এইটিই শেষ লেখা। 'বিংশ শতাব্দী'-র সৌজন্যে প্রবন্ধটি প্রাপ্ত। —সম্পাদক

জীবানানন্দ দাশের দুটি পত্র ও চারটি কবিতা

জগদীশ ভট্টাচার্য

॥ এক ॥

আমার সম্পাদনায় 'বৈজয়ন্তী' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে। বৈশাখ ১৩৪৭-এ রবীন্দ্র-সংখ্যা প্রকাশিত হয়েই এই স্বল্পায়ু মাসিক-পত্রখানি বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকার ছ'টি মাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। লেখকগোষ্ঠীতে ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। প্রতি মাসেই তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছে। আর যাঁদের এক বা একাধিক রচনা প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে ছিলেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, প্রিয়রঞ্জন সেন, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, সজনীকান্ত দাস, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বনফুল', পরিমল গোস্বামী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, 'সম্বুদ্ধ', নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও অমলেন্দু দাশগুপ্ত প্রমুখ বাংলার প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিকগণ।

আরো অনেকের লেখা প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল। সম্পাদক হিসাবে কবি জীবনানন্দ দাশ মহাশয়ের নিকটও আমরা রচনা প্রার্থনা করেছিলাম। জীবনানন্দ চারটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু যখন তাঁর রচনা আমাদের হাতে পৌঁছল তখন পত্রিকাখানির শিশুমৃত্যু হয়েছে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৩৪৭ সালে লেখা কবির এই চারটি কবিতা একুশ বৎসর পরে এই সূত্রে আমাকে লেখা জীবনানন্দের দু'খানি পত্রও প্রকাশ করলাম।

॥ দুই ॥

জীবনানন্দের প্রথম পত্র ঃ

সর্বানন্দ ভবন
বরিশাল
১৪, ১, ৪০,

প্রীতিভাজনেষু,

'বৈজয়ন্তী'র প্রাপ্তি সংবাদ জানাতে দেরী হয়ে গেল—আশা করি ক্ষমা করবেন।

অগ্রহায়ণের বৈজয়ন্তী যথাসময়ে পেয়েছিলাম। পৌষের বৈজয়ন্তীও কিছুদিন হল পেয়েছি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। বৈজয়ন্তীর অনেক লেখাই আমার ভালো লেগেছে। আপনাদের পত্রিকাটির একটা রীতিমত বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

আজকালকার হৃদয়হীন দলাদলির দিনে আপনারা নিজের বুকের উপর হাত রেখে সাহিত্য বিচার করতে সচেষ্ট দেখে আমি প্রীত হয়েছি।

আমি সর্বান্তঃকরণে বৈজয়ন্তীকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। আপনাদের এই পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও উন্নতি কামনা করি।

আপনি আমার প্রীতিনমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি—

জীবনানন্দ দাশ।

জীবনানন্দ দাশের দ্বিতীয় পত্র ঃ

সর্বানন্দ ভবন
বরিশাল
২৩, ৫, ৪০,

প্রীতিভাজনেষু,

নানাকারণে 'বৈজয়ন্তী'র জন্য কবিতা পাঠাতে বড় দেরী হয়ে গেল। আশা করি ক্ষমা করবেন।

ইউনিভারসিটির খাতা দেখতে প্রায় দেড় মাস লেগেছে। তার পরেই আমার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। আপাতত কলকাতায় যাওয়া হল না। পরে যাব কিনা বলতে পারি না।

আপনার পত্রিকার জন্য কয়েকটি কবিতা পাঠালাম। পরে অবসর মত পাঠাব। আপনি এখন কলকাতায় আছেন কি না জানি না।

আশা করি ভাল আছেন। প্রীতিনমস্কার জানবেন। ইতি—

জীবনানন্দ দাশ

দুর্দ্দিন

যখন আমার চোখে ঘের নদী জেগে যে একদিন
চারদিক আমাদের দেশে ভোর হ'লে,
শুধু একটি নদী দেখা যেত শুধু পরপর;
কেবল একটি নদী খরস্রোত কোলে
নদীর বেথার দিক লক্ষ্য ক'রে চ'লে যায়;—
সূর্য্যের মতন গোল সোনার ভিতরে
শিল্পীর কাঁচিতে কাটা শাদা কাগজের
যেন এক মাইলার মূর্ত্তি এসে পড়ে;
[redacted] সমস্ত সূর্য্যের রং বিভোর পরিধি
যেন এর নিজের জিনিস।
এতদিন পরে সেই চুল যিরে যেত
প্রণয়ের কাছে যদি করি মুখোমুখি—
ওড়ালে সে মুছে দেবে মোমের সালোকে,
ইস্পাত কাগজে যেরা এই ম্লান দেয়ালের ঘড়ি;
একটি একলা যেন কতদিন হয়
নিজেকে চুমিতে ছেঁটে—সূর্য্যের ভিতর
ডুবে গেছি;—পরপর রাত হয়ে ডুবে গেছে
সে ও এর [redacted] নিরালা শাদা ঘরগুলি।
নদীরা যে নেই আর পৃথিবীতে—মৃত্যু নেই—
এর এই কানুহীন সময়ের দেওা।

জীবনানন্দ দাশের স্ব-লিখিত 'দুর্দ্দিন' কবিতার হস্তলিপি

॥ তিন ॥

জীবনানন্দ দাশের চারটি কবিতা ঃ

দুর্দ্দিন

যদিও আমার চোখে ঢের নদী জেগে যেত একদিন
পুনরায় আমাদের দেশে ভোর হলে,
তবুও একটি নদী দেখা যেত শুধু তারপর ;
কেবল একটি নারী খরগোশ কোলে
নদীর রেখার দিক লক্ষ্য ক'রে চলে যায় ;—
সূর্যের সমস্ত গোল সোনার ভিতরে
শিল্পীর কাঁচিতে কাটা শাদা কাপড়ের
যেন এক মহিলার মূর্তি এসে পড়ে
সমস্ত সূর্যের বড় বিভোর পরিধি
যেন তার নিজের জিনিষ।
এতদিন পরে সেই ছবি ফিরে পেতে
সময়ের কাছে যদি করি সুপারিশ—
তাহ'লে সে স্মৃতি দেবে মোমের আলোকে,
হলুদ কাগজে মোড়া এই ম্লান দেয়ালের ঘরে ;—
একটি তরুণী যেন বহুদিন হয়
নিজেকে ছবিতে ছেঁটে—সূর্যের ভিতরে
ঢুকে গেছে ;—তারপর বার হ'তে ভুলে গেছে
সে ও তার নিরাবিল শাদা খরগোশ।
নদীরা যে নেই আজ পৃথিবীতে—সূর্য নেই—
সব এই জানুহীন সময়ের দোষ।

হেমন্তের নদীর পারে

মাঝে মাঝে মনে হয়
হেমন্ত সন্ধ্যায় ঐ বৃক্ষদের মুখ দেখে
আবছায়া নদীর দর্পণে :
যে বিতর্ক লোপ পায় বালিকার মেধে
অথবা যুবার চিত্তে অকালজটীর মত আশ্চর্য নির্বেদে
কিংবা যোদ্ধদের প্রাণে সারাদিন বায়ুকুকুরের মত ঘুরে,—
তবু মানুষের সাথে শুরু পরিচয় চেয়ে নিশীথের ভূমিকায়
সেই সব চিন্তা এসে পিতাদের হৃদয়ে দাঁড়ায়।

মৃত, বর্তমানে উপেক্ষিত কবিদের উপর অনেক সমালোচনা পড়ে

শিল্পের উন্মার্গ নিয়ে বেঁচে ছিল যারা পৃথিবীতে
তাহাদের তাপ যদি এক মাঘে জন্ম নিয়ে অন্য এক শীতে
হয়ে যেত পৃথিবীর ভূস্তরে বিলীন,
তাহলে হৃদয়ে আর অহংকার থাকিত না ভাষ্যকারদের ;
মৃত্তিকার সাত হাত নীচে থেকে কবিও পেত না তবে টের
যেই সব বৃঢ় চিন্তা একদিন করেছে সে মানুষের মত দেহ ধরে
বিষুবরেখার সাথে ঘুরে
তাহারা বিষাক্ত সাপ যেন আজ ; আর সবই ভারতীয় খেলার সাপুড়ে।

শিল্পী

জীবন কাটায়ে দেয় যে মানুষ সূক্ষ্মতর শিল্পচিন্তা নিয়ে,
ফলকের পর ক্ষুদ্র নিয়ন্তা রেখার টানে ফেলেছে যে সীমানা হারিয়ে,
সেই সব মানুষের আত্মা যেন বিশ্রস্ত মুকুরে
কেবলি নড়িতে আছে জলের আভার মত উদ্বিগ্ন দুপুরে।
অথবা আশ্চর্য হংসী অব্যর্থ ডানার অসংযমে
নির্ঝরের কোনো এক রূপালি শঙ্খের মত মাছকে প্রণয়ী বলে ভেবেছিল ভ্রমে ;
আজো ভাবে ; বরফের মত শাদা ডানা নিয়ে পিঙ্গল ঢেউয়ের পিঠে চ'ড়ে
যখন সে তার খেয়ে—অথবা রক্তের হর্ষে সৌরপৃথিবীর মত ঘোরে !

উপন্যাস ও প্রিস্‌ট্‌লে

দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য

Priestley-র এই পরম উপাদেয় গ্রন্থটির Literature and the Western Man যে অংশ সবচেয়ে সমুজ্জ্বল ও সমালোচনা হিসাবে সবচেয়ে বেশি সমাদরণীয় তা হল উপন্যাস। যদিও রেনেসাঁস থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের কোন শাখাই তিনি অনালোচিত রাখেন নি, তথাপি একাধিক কারণে—যা অনতিবিলম্বেই উল্লিখিত হচ্ছে—উপন্যাসের একটি স্বতন্ত্র আলোচনা প্রয়োজন; তা ছাড়া একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের সংকীর্ণ আয়তনের মধ্যে এমন একটি বিশাল গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ ও সম্যক্ আলোচনা সম্ভবও নয়। কাজেই নির্বাচন অপরিহার্য।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কবিতার উত্তরোত্তর অধোগতি ঘটে কিনা জানি না, যদিও এ সম্বন্ধে মেকলের বিখ্যাত উক্তি পৃথিবীর সাহিত্য-ইতিবৃত্তে অনেকটা সমর্থিত হয়েছে। এ নিয়ে হয়ত বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে; কিন্তু একথাটা আজ অবিসংবাদিত যে পৃথিবীর সব দেশেই সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে গদ্যের আবির্ভাব পদ্যের পরে। আর ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই পদ্যসাহিত্যের শীর্ষে রয়েছে উপন্যাস যার মধ্যে বিগত শিল্প-বিপ্লবোত্তর শতবর্ষের মানুষের জীবন ও চেতনার পূর্ণতম প্রকাশ ঘটেছে। শুধু তাই নয় আধুনিক সাহিত্যের অন্য কোন শাখায়, কি গদ্যে কি কবিতায়, প্রতিভাশালী লেখকের এমন অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটে নি, কি সংখ্যায়, কি শক্তিমত্তায়। উপন্যাসের এই অধুনাতন আধিপত্য আকস্মিক বা accidental নয়, কারণ বিগত এক শো বছরে প্রতীচ্য মানবের জীবনযাত্রায় যন্ত্রদানবের ইন্দ্রজাল বিস্তীর্ণ হয়েছে আর তার ফলে সবকিছুই হয়ে পড়েছে কৃত্রিম, জটিল ও দ্রুত পরিবর্তমান, যাকে প্রকাশ করতে হলে সৃষ্টির এমন একটি মাধ্যম প্রয়োজন যার মধ্যে প্রতিবিম্বিত ও তরঙ্গিত হতে পারে এই সংক্ষুব্ধ সভ্যতার বিচিত্র ছায়ালোক। উপন্যাস হল এমন একটি মাধ্যম: যার মধ্যে শৃঙ্খলা আছে কিন্তু শৃঙ্খল নেই, যার মধ্যে সমাজজীবনের ব্যাপ্তি ও ব্যক্তিজীবনের

গভীরতা দুইই প্রকাশ পেতে পারে, যার প্রকৃতি মুক্ত, নমনীয়, যার আকৃতি অনন্তবৈচিত্র্যময়।

৮২ পৃষ্ঠায় Priestley নিজেই প্রশ্ন করেছেন, What is a novel? এর উত্তরে বলেছেন উপন্যাস এমনই একটি আর্ট—অবশ্য উপন্যাস আদৌ আর্টপদবাচ্য কিনা এ নিয়ে তর্ক হতে পারে এবং হয়েওছে—যার সংজ্ঞা-নির্ণয়প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য, ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটাকে পেটিকায় আবদ্ধ করার হাস্যকর প্রচেষ্টার মত। কারণ আর্ট হিসাবে সাহিত্যের এই শাখাটি নানাবর্ণাঢ্য ঘনসন্নিবিষ্ট পুষ্পপর্ণে এমনই সমাচ্ছন্ন যে নিরাকার না হলেও চিত্র বা সঙ্গীত বা সনেটের মত সুমিত, সীমিত বা সাকার নয়। কাজেই উপন্যাসের আকৃতি বা প্রকৃতি নিয়ে গোঁড়ামি মূঢ়তার পরিচায়ক। এই প্রসঙ্গে বলেছেন "Coming into existence to please an increasingly varied number of readers, novels, good novels too, can be of various kinds—a statement that only the narrowest and most intolerant critic of fiction would deny." এই কথাটাই অন্যত্র আরো স্পষ্ট করে বলেছেন—"The novel is a very loose, wide form: and the task of the novelist is to write as well as he can the kind of novel he wants to write." অন্যত্র উপন্যাসের প্রসঙ্গেই "loose, mixed form" কথাটা প্রয়োগ করেছেন।

কিন্তু ব্যাপারটা এইখানেই শেষ নয়, তা যদি হত হলে উপন্যাস সম্বন্ধে এই প্রবন্ধটি অর্থহীন ও অনাবশ্যক হত। কারণ Pristley উপন্যাসের আকার-শূন্যতার উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হন নি। উপন্যাসের, অন্তত প্রতীচ্য সাহিত্যে, প্রথম স্রষ্টা কে এই বহুবিতর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি নেতি নেতি করে শেষটায় সদর্থক কিছু বলতে বাধ্য হয়েছেন, Bunyan-এর Pilgrim's Progress-এর প্রসঙ্গে। Pilgrim's Progress কি উপন্যাস? উত্তর, না। কেন না allegory এক ধরনের prose fiction, উপন্যাস নয়। কেন নয়? এর উত্তরেই আমরা পাই উপন্যাসের প্রথম স্বরূপনির্দেশ, "For the novel must not only have acceptable individuals as characters, but it must make these characters move in a recognisable society. Characters in a society make the novel." এই শেষোক্ত সংক্ষিপ্ত

বাক্যটি উপন্যাস প্রসঙ্গে সর্বদা স্মর্তব্য এবং পরে দেখব আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত সাধারণ এই উক্তিটির মধ্যে উপন্যাসের মূল সত্যটি বিধৃত রয়েছে। বিশেষ করে এই "recognisable society" কথাটার উপরে তিনি কতটা জোর দিয়েছেন তা অব্যবহিত পরবর্তী বাক্যটি উদ্ধৃত করলেই স্পষ্ট হবে—"And as we shall see, society itself becomes more and more important to the serious novelist, and indeed turns into a character itself, perhaps the chief character." আর একটা কথা। Prose fiction আর novel এক নয়, কারণ প্রথমটি ব্যাপক, দ্বিতীয়টি ব্যাপ্য। অর্থাৎ উপন্যাসমাত্রই prose fiction, কিন্তু prose fiction মাত্রই উপন্যাস নয়।

তা যদি হয়, অর্থাৎ চরিত্রসৃষ্টি ও তাৎকালিকসমাজবর্ণনা যদি উপন্যাসের একেবারে মর্মগত হয়, তা হলে প্রতীচ্য সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিককে এই সমস্যার মীমাংসা হতে পারে। এ বিষয়ে যে মতটি সর্বাধিক প্রচলিত Priestley তা অগ্রাহ্য করেছেন, অর্থাৎ Gil Blas (গিল্ ব্লা) গ্রন্থের প্রণেতা Lesage (ল্যা সাজ)কে তিনি উপন্যাসের জনয়িতা বলতে অস্বীকৃত ; তাঁর মতে Cervantes (১৫৪৭-১৬১৬) এই গৌরবের অধিকারী, কারণ তাঁর অমর সৃষ্টি Don Quixote (১৬০৫) গ্রন্থে উপন্যাসের এই দুটি লক্ষণই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। অতএব তাঁর মতে, "the novel is there, complete and glorious, in Don Quixote."

পূর্বেই বলেছি Priestleyর মতে উপন্যাস হচ্ছে "a loose and mixed form." এইখানে পাঠকের একটা খটকা লাগতে পারে, বিশেষ করে গ্রন্থের শেষে। সেটা হচ্ছে এই যে উপন্যাসের সংজ্ঞা যদি এতই ব্যাপক, তার বৈচিত্র্য যখন অন্তহীন, তার স্বরূপ বিচারে দৃষ্টির ঔদার্য যখন তাঁর মতে আদরণীয় ও সংকীর্ণতা নিন্দনীয়, তখন অনেক ঔপন্যাসিকদের সম্বন্ধে Pristley এত খুঁতখুঁতে কেন ? অনেক যশস্বী, সর্বজনসমাদৃত, উচ্চপ্রশংসিত উপন্যাসরচয়িতার সম্বন্ধে তিনি অবজ্ঞাসূচক উক্তি করেছেন, এমন কি ঔপন্যাসিক পদবীই দিতে অস্বীকৃত হয়েছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে ঈষৎ উষ্মার সঙ্গে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। Flaubertকে তিনি মহৎ ঔপন্যাসিক বলেন নি এবং মাদাম বোভারি তাঁর মতে perfect তো নয়ই বরং art হিসাবে অত্যন্ত দোষযুক্ত ; চরিত্র সৃষ্টিতেও তিনি বলেছেন, "his novels offer us too many dubious elements to be

accepted as great fiction." অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে আঁদ্রে জীদের সম্বন্ধে বলেছেন, "A born diarist and self-explainer, Gide is no creator."

এতো গেল ফরাসী সাহিত্যের কথা। এখন আসা যাক Priestleyর নিজের দেশে ইংরেজি সাহিত্যে। Jane Austenএর সম্বন্ধে "incomparable" বিশেষণটি প্রয়োগ করলেও একটিমাত্র—তাও নাতিদীর্ঘ—বাক্যেই তাঁর আলোচনা সমাপ্ত। Thackerayকে একজন "major novelist" বলতে গিয়েও থেমে গেছেন; তাঁর "Vanity Fair"কে বলেছেন "unquestionably a masterpiece," কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা বলেছেন তা ঠিক অকুণ্ঠ প্রশংসা নয়: "his work as a whole is unsatisfactory and disappointing." Hardyর সম্বন্ধে আলোচনা যা হওয়া উচিত ছিল তার চেয়ে অনেক সংক্ষিপ্ত; তাঁর কারুণ্যঘন, বিষণ্ণ-গম্ভীর সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করা দূরে থাক, স্পর্শও করেছে বলে মনে হয় না। বিংশ শতাব্দীর ইংরেজি উপন্যাস-সাহিত্যে যাঁর প্রভাব, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশি সেই James Joyceএর সম্বন্ধে তাঁর কি অভিমত দেখা যাক। তাঁর Ulysses যাকে অনেকে মনে করেন "the greatest modern masterpiece of fiction" তার সম্বন্ধে তিনি যেমন অশ্লীলতা ও স্থূলতার অপবাদ হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিয়েছেন তেমনি আর এক দিকে তাকে মহৎ উপন্যাস বলেও স্বীকার করতে প্রবল ও দৃঢ় অসম্মতি জানিয়েছেন। তারপর বলেছেন এসব চুলচেরা বিচার ও উত্তেজিত তর্কবিতর্ক ছেড়ে দিয়ে কয়েকটা সোজা, অত্যন্ত মামুলি ও আন্‌কালচার্ড প্রশ্ন করতে চাই: "Is it entirely satisfactory as a narrtive? Do we want, or need for the purposes of the novel, as much of Dublin as he gives us? Is Bloom really as solidly and convincingly created as he is thought to be? Is Stephen Dedalus artistically essential? Is the author, in fact, creating characters and scenes as a great artist in fiction would create them?" (প্রশ্নগুলি কিছুটা বিস্তারিত-ভাবে উদ্ধৃত হল, কেন না এর থেকে একটি যথার্থ উত্তম উপন্যাস বলতে তাঁর মতে কি বোঝায় তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে।) এই তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট, চোখা চোখা প্রশ্নগুলির প্রত্যেকটির উত্তর হল: না। অতএব এ বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত

সিদ্ধান্ত হল : "He is not so much a novelist as a unique combination of fantasist, humorist, scholar, poet...And most of what we have been told about Joyce as the great modern master of the novel, changing the course of fiction, opening a way for later novelists, is nonsense." অবশ্য Joyceএর প্রতিভাকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন, তবে সেটা কবি ও ইংরেজি ভাষার একজন অত্যাশ্চর্য ঐন্দ্রজালিকরূপে, ঔপন্যাসিক হিসেবে নয়। (প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে মতামতের কথা বাদ দিয়ে Joyce সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনা criticism হিসাবে অতি উচ্চাঙ্গের। Henry Jamesএর সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য এই সঙ্গে তুলনীয় ও উল্লেখযোগ্য।)

Galswarthyর Forsyte Sagaকে তিনি সার্থক ও সন্তোষজনক সৃষ্টি মনে করেন নি এবং একথাও গ্রন্থের পরিশিষ্টে—এই সংক্ষিপ্ত জীবনীগুলি গ্রন্থটির অন্যতম আকর্ষণ—ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন যে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে নোবেল প্রাইজ তাঁকে না দিলেও চলত, কারণ তাঁর নিজের দেশেই তখন তাঁর চেয়ে যোগ্যতর লেখক ছিল। অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে, হঠাৎ মনে পড়ার মত একবার উল্লেখ করেছেন Aldous Huxleyর ; তাঁর সম্বন্ধে বক্তব্য এক লাইনে শেষ করেছেন ; "he is concerned with ideas and not with persons." আর পৃথিবীতে একদা সমারসেট মম নামধারী কোন ইংরেজ লেখকের আবির্ভাব ঘটেছিল, যিনি Of Human Bondage বলে একটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য ও উপভোগ্য উপন্যাসও রচনা করেছিলেন, তার কোন প্রমাণ এ-গ্রন্থে নেই ; মিশরের মামিও মমের তুলনায় জীবন্ত।

অতলান্তিকের পশ্চিম পারে তাকালে প্রথমেই চোখে পড়ে Moby Dick, যার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, উপন্যাস হিসেবে নয়, "symbolic epic-drama" রূপে যার "epic grandeur" অতুলনীয়। কিন্তু তার পর ? "Where Moby Dick is weak, it is worse than the average goodish novel." আর বিখ্যাত, ইনটেলেকচুয়াল সমাজে সর্বত্র অভিনন্দিত ও অনুকৃত Henry James ? তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতি ও প্রখর ধীশক্তি, সুরুচি ও সংস্কৃতি যেন কিছুটা দ্বিধার সঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন, কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

ঔপন্যাসিক রূপে তিনি তাঁর প্রাপ্যের চেয়ে প্রশংসা পেয়েছেন ঢের বেশি ; তাঁকে নিয়ে এতটা মাতামাতির কোন কারণ ঘটে নি।

যদি প্রশ্নটা এই হত, এই সব খ্যাতিমান্, ব্যাপক ও বিপুলভাবে আদৃত ও প্রশংসিত—যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বরন্দিত—সাহিত্যজগতের দিক্‌পালদের Priestley খর্ব করেছেন বা তাঁদের স্রষ্টৃত্ব ও শক্তিমত্তা অস্বীকার করেছেন, বা এক কথায় তাঁর ভাল লাগে নি এঁদের রচনা, তা হলে বলবার কিছু থাকত না। ব্যাপারটা ঠিক ব্যক্তিগত বা রুচিগত নয় ; ভাল না লাগা এক জিনিস, কিন্তু তাঁদের ঔপন্যাসিক বলতেও যে Priestleyর প্রবল আপত্তি। তাহলে এ প্রশ্ন আমাদের মনে আসাটা খুবই সঙ্গত : ঠিক ঠিক ঔপন্যাসিক তা হলে কে, বা কারা ? কী সেই লোকোত্তর অমূল্য সম্পদ্, যার অভাবে এই সব সর্বজন-সমাদৃত লেখক 'ঔপন্যাসিক' পদবী হতে বঞ্চিত হয়েছেন ? Priestley যাঁদের মহৎ উপন্যাস-স্রষ্টা বলে সম্মানিত করেছেন তাঁদের মধ্যে এমন কি গুণ বিদ্যমান যা এঁদের মধ্যে নেই ?

প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার পূর্বে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। মাধ্যম হিসাবে উপন্যাসের নমনীয়তা ও স্বাধীনতা মেনে নেওয়া মানে এ নয় যে সব কিছুই, গদ্যে রচিত আখ্যায়িকামাত্রই উপন্যাসপদবাচ্য ; উপন্যাসের একটা আদর্শ নিশ্চয়ই আছে যার দ্বারা তার উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ণীত হতে পারে। কি সেই আদর্শ ?

যথার্থ মহৎ উপন্যাস রচনা যিনি করবেন তাঁর প্রথম ও প্রধান গুণ চরিত্র-চিত্রণ-সামর্থ্য, এমন চরিত্র তিনি সৃষ্টি করবেন যা পাঠকের সমগ্র সত্তাকে একেবারে আবিষ্ট, মন্ত্রমুগ্ধ, আত্মবিস্মৃত করে দেবে, নানাগুণান্বিত, প্রশংসার্হ বা শ্রদ্ধার্হ বলে নয়, এর মূলে হল সতেজ, সরস, প্রাণবত্তা যাকে শ্রদ্ধা না করলেও বিশ্বাস না করে, সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে নিবিড়ভাবে, অব্যবহিতভাবে অনুভব না করে উপায় নেই। "For what is essential is that the novelist, whatever else he does, should be able to show us people who by some means or other, through delighted fascination, repulsion, or mere conviction that in their own world they exist, catch and hold our imagination. If his characters fail to do this, then the novelist has failed." অন্য কোন গুণ তাঁর যদিও নাও থাকে, তিনি

যথার্থ ঔপন্যাসিক ; আর অন্য সহস্র গুণ থাকলেও এই দুর্লভ ক্ষমতাটি যদি না থাকে, তিনি আর যাই হোন উপন্যাস-রচয়িতা নন। "The narrative itself may go through all manner of transformations, the narrator himself may be a wise man or almost a fool, but this vital relationship between us and its people, or at least some of them, remains central in fiction, its keystone." এই চরিত্রসৃষ্টির প্রতিভার যথার্থ অধিকারী অতি অল্প ; আর এই সর্জন-সামর্থ্যের রহস্য আজও অনুদ্‌ঘাটিত ; সংক্ষেপে শুধু এইটুকুই বলা যায় যে "this mysterious creative faculty appears to be linked with childhood." (এ প্রসঙ্গে বোদ্‌লেয়র-এর বিখ্যাত, এবং Priestley কর্তৃক একাধিকবার উদ্ধৃত, উক্তিটি বারংবার স্মর্তব্য : Genius is childhood recaptured at will.) তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বা মার্জিত, সংবেদনশীল অনুভূতি দিয়ে এর ব্যাখ্যা হয় না, তা যদি হত তা হলে Walter Pater একজন বড় ঔপন্যাসিক হতে পারতেন। এখন প্রশ্ন হল এই লোকোত্তর, দেবদুর্লভ ক্ষমতার অধিকারী যাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে হয়েছেন তাঁদের জীবন ও মানসিক গঠন সম্বন্ধে কোন বিশিষ্টতা বা অসাধারণত্ব লক্ষ্য করা যায় কি ? উত্তর : হাঁ। যাঁদের মধ্যে এই ক্ষমতাটি বিদ্যমান তাঁরা প্রায়শঃই হলেন "men who have rich but not integrated personalities, contradictory characters, divided men, of whom Tolstoy and Dickens are obvious examples." তাঁর এই শেষোক্ত মন্তব্যটি ক্রিটিক হিসাবে Priestleyর মৌলিক চিন্তাধারার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর একথাটি যদি সত্য হয় তা হলে সুস্থ, স্বস্থ, নির্দ্বন্দ্ব, সুসমঞ্জস, পরিতৃপ্ত, আত্মপ্রসাদ-নিমীলিত-নেত্র মানসিকতা উপন্যাস রচনার পক্ষে প্রতিকূল ; খণ্ডিত সত্তার আনন্দ ও বেদনা, তীব্র সংবেগও সংশয়, সর্বোপরি ছিন্ন, খণ্ডিত, দ্বিধা-বিদীর্ণ আত্মার অশান্ত, অন্তহীন অন্তর্দ্বন্দ্ব—এই হল শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-রচয়িতার উপযুক্ত মানসিকতা। ঠিক এই কারণেই সাহিত্যস্রষ্টার পক্ষে, বিশেষ করে আধুনিক কালে, তরুণ বয়সে সাফল্য ও তজ্জনিত খ্যাতি ও আত্ম-পরিতৃপ্তি মারাত্মক—যেমন Hemingway.

মহৎ ঔপন্যাসিকের এই প্রথম ও প্রধান ক্ষমতাটির সম্বন্ধে Priestley-র পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্য সমূহ থেকে আর একটা জিনিস পরিষ্কার হবে—"novel of ideas" এর প্রতি তাঁর তীব্র বিরূপতা। আইডিয়া তা সে যত গভীর যত মহৎই

হোক না, উপন্যাসে তার স্থান গৌণ, সংকীর্ণ ; তা যদি না হত তা হলে রলাঁ, জীদ্‌ বা হাক্সলে তলস্তয় ডিকেন্‌স্‌ এর চেয়ে বড় ঔপন্যাসিক বলে গণ্য হতেন। এই প্রসঙ্গে রলাঁর সম্বন্ধে তাঁর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য : But he (রলাঁ) failed as a major novelist from a deficiency of···the very quality that turns a thinker into a richly creative artist, an idea into colour and movement, character and life." উপন্যাসকে কোন দার্শনিক তত্ত্ব বা মতবাদের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহারের তিনি প্রবল বিরোধী, কারণ, "The creative literary form has to be loved, not merely used."

উপন্যাসরচয়িতার দ্বিতীয় প্রয়োজন সামাজিক পটভূমিকা। আর এই সমাজ হওয়া চাই বাস্তব ও তাৎকালিক ; বস্তুত এইখানেই রোমান্স্‌ এর সঙ্গে উপন্যাসের মূলগত পার্থক্য। চরিত্র ও ঘটনা কাল্পনিক হতে পারে—যদিও সেখানেও কল্পনা নিরালম্ব নয়, অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ, বস্তুনির্ভর, এমন কি Robinson Crusoe তেও—কিন্তু উপন্যাসের নরনারীর যে জগতে গতিবিধি ও সঞ্চার তা বাস্তব ও প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। ঠিক এই কারণেই Gulliver's Travels বা Robinson Crusoe খাঁটি উপন্যাস নয় ; ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রেও একথা কতকটা প্রযোজ্য। উপন্যাসের বাতাবরণ, সমাজ, দেশকালে দূরবর্তী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়, যে কারণে Thackeray'র Esmond একটি পরম রমণীয় সৃষ্টি হলেও একটি চমৎকার ও বিস্ময়কর tour de force মাত্র, উপন্যাস হিসাবে Vanity Fair অনেক বড়। Priestley'র কাছে এই সমসাময়িক সামাজিক পটভূমিকার গুরুত্ব এতটাই কেন্দ্রগত যে তিনি একথাও বলেছেন যে অনেক উত্তম উপন্যাসে সমাজই হল প্রধান চরিত্র, অন্তরালবর্তী নয় একেবারে পুরোবর্তী। এই কথাটাই স্পষ্ট করে বলেছেন তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ঔপন্যাসিক প্রুস্ত্‌ এর প্রসঙ্গে—"With a major novelist, society itself will be an all-important character."

তা হলে দেখা যাচ্ছে উপন্যাসের প্রধান উপকরণ হল দুটি—চরিত্র ও সমাজ। এ দুটো যাতে নেই তা উপন্যাসই নয়। এইবার দেখা যাক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার—যেমন দস্তয়েফ্‌স্কি, তলস্তয়, ডিকেন্স্‌—যাঁরা তাঁদের মধ্যে আর কি কি বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এবার তৃতীয় যে বৈশিষ্ট্যটির উল্লেখ করব সেটি অত্যন্ত বিতর্কমূলক ; শুধু তাই নয়, প্রভাবশালী, শক্তিমান্‌ ও জনপ্রিয় আধুনিক

সাহিত্য সমালোচকবৃন্দের খুব বড় একটা অংশ Priestleyর এই মতের বিরোধী। প্রশ্নটা হল উপন্যাস (বা নাটক) রচনায় naturalistic technique এর স্থান নিয়ে। Priestleyর দৃঢ় অভিমত, মহৎ উপন্যাস বা নাটকের যাঁরা স্রষ্টা তাঁরা নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত দ্রষ্টা মাত্র নন। এই কথাটাই খুব স্পষ্ট করে জোরের সঙ্গে বলেছেন Zolaর সম্বন্ধে আক্ষেপ করে—আক্ষেপ করে, কেন না Zola তাঁর মতে একজন "great novelist"—"For literature does not put life under a microscope, remaining outside it to observe and to record what it is doing. Literature thinks and feels and imagines its way into life expressing it from the inside." এই শেষোক্ত বাক্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাঁর সাহিত্যসমালোচনার একটা মূল সুর এতে ধ্বনিত হয়েছে। এখন আমরা বুঝতে পারব কেন Priestleyর মতে স্রষ্টা হিসাবে ফ্লোবেয়র, স্তাঁদাল, মোপাসাঁ, ডিকেন্‌স্ বা তলস্তয় বা দস্তয়েফস্কির চেয়ে অনেক নিম্নে, কেন হেন্‌রি জেম্‌স্‌এর প্রতি তাঁর এই কঠোর মনোভাব, কেন গল্‌স্‌ওয়ার্দি ও বেনেট তাঁর মতে উচ্চস্তরের স্রষ্টা নন।

Naturalistic technique এর বিরুদ্ধে Priestleyর এই দৃঢ় প্রতিবাদ আর একটা কারণে গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হল সাহিত্য সৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক রীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির স্থান। কারণ বিজ্ঞানের সঙ্গে naturalism ওতপ্রোত ভাবে সম্পর্কিত। তাঁর মতে সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক নৈর্ব্যক্তিকতা প্রবর্তনের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এতে করে সাহিত্য যে একটা আর্ট তা আমরা বিস্মৃত হতে চলেছি; এই ধরনের রিপোর্ট রচনা সাংবাদিকতা হিসাবে উত্তম হতে পারে, কিন্তু এর মধ্যে যা নেই তা হল "the peculiar enchantment of literature." উপন্যাসের প্রসঙ্গে একজায়গায় বলেছেন, "Any novel that begins to approach greatness must be something more than a close imitation of a chronicle or memoirs, no matter how deceptively truthful it appears to be." Henry James একদা বলেছিলেন উপন্যাসের উপজীব্য কি নির্দেশ করতে গিয়ে, "The only reason for the existence of a novel is that it does attempt to represent life." Priestley এর উত্তরে চমৎকারভাবে বলেছেন, "But to represent life with any breadth, depth, feeling, a man must have had to be up to the

neck in it somewhere, and not have merely gone about on tiptoe, peeping at it."

গল্‌সওয়র্দি কেন আর্টিস্ট হিসাবে আরো বড় হতে পারেন নি তার কারণ প্রদর্শন করতে গিয়ে Priestley এই প্রসঙ্গেই কথাটা একটু অন্যভাবে বলেছেন—We miss in his fiction and his drama the *total commitment*, conscious and unconscious, of the artist." এই "total commitment" কথাটি অত্যন্ত গভীরার্থব্যঞ্জক; বাংলায়—যদিও এর ঠিক প্রতিশব্দ বাংলাভাষায় নেই—একে বলা যেতে পারে "আর্টের, সৃষ্টির মধ্যে নিজের সমগ্র সত্তাকে নিঃশেষে বিলীন করে দেওয়া, স্রষ্টা আর সৃষ্টি এক হয়ে যাওয়া। এই জিনিসটাকেই লক্ষ্য করে অন্যত্র বলেছেন "warm imaginative identification" যার জন্য প্রয়োজন আত্ম-সচেতনতা নয়, আত্মবিলোপ। Keats বোধ হয় স্রষ্টার এই আত্মবিস্মৃত তন্ময়তাকেই ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছিলেন "negative capability". জার্মান ভাষায় ঠিক এই ভাবটিরই দ্যোতক একটি চমৎকার শব্দ রয়েছে Einfuhlung যার ইংরেজি করা হয়েছে empathy.

ঠিক এই কথাটাই বলেছেন ফ্লোবেয়রএর সম্বন্ধে আশ্চর্য সুন্দর ভাষায় পৃথিবীর সর্বদেশের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিটিক, যাঁকে T. S. Eliot "great critic" এবং অন্যত্র "perfect critic" বলে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন—রেমি w গূর্ম: "Flaubert incorporait toute sa personalite a ses oeuvres. Hors de ses livres, ou il se transvasait goutte a goutte, jusque' a la lie, Flaubert est fort peu interessant." অর্থাৎ "ফ্লোবেয়র তাঁর সমগ্র সত্তা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিলীন করে দিয়েছিলেন। তিনি এমন নিঃশেষে নিজেকে নিংড়ে ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে যে তাঁর রচিত সাহিত্যের অতিরিক্ত যে সত্তা তা আমাদের কাছে তেমন interesting নয়।" এই হল "total commitment", এবং Priestley যাই বলুন এ জিনিস ফ্লোবেয়রের মধ্যে ছিল, এবং প্রচুর পরিমাণে ছিল। মাদাম বোভারির নায়িকার তিনি উদাসীন (আক্ষরিক অর্থে, উৎ+আসীন) নির্লিপ্ত দ্রষ্টা মাত্র নন, এমন কি স্রষ্টা বললেও সবটা বলা হয় না, কারণ মাদাম বোভারি তিনি স্বয়ং। তা যদি না হত তা হলে এই অপূর্ব উপন্যাসটির অবিস্মরণীয় অন্তিম

দৃশ্যে নায়িকার আর্সেনিক সেবনের দারুণ প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে গিয়ে ফ্লোবেয়্‌র নিজে অসুস্থ হয়ে পড়তেন না, আর এম্মা বোভারির সঙ্গে নিজেও বমি করতে শুরু করতেন না।

মহৎ উপন্যাসের মধ্যে আর যে জিনিসটির সাক্ষাৎ আমরা পাই তা শুধু উপন্যাস নয় মহৎ সাহিত্য (বিশেষ করে কাব্য) ও আর্ট মাত্রেরই সাধারণ গুণ। তা হল চেতনার উজ্জ্বল জ্যোতির্বিন্দুকে কেন্দ্র করে অবচেতন ও অচেতনের রহস্যঘন, মায়াময়, ম্লানতর ছায়ালোক ; মগ্নচৈতন্যের অনভিব্যক্ত প্রকাশকাতরতা, অতলস্পর্শ গভীরতা। উচ্চস্তরের আর্টসৃষ্টিতে প্রতিভার এই পরম প্রসাদটির স্থান কতখানি তার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বেই করেছি। এখন শুধু এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ইংরেজ উপন্যাস রচয়িত্রী George Eliotএর সম্বন্ধে Priestleyর একটি গভীর মন্তব্য উদ্ধৃত করছি। লেখিকার রচনার নানা গুণ থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধি-জ্ঞান-দীপ্ত চেতনার আত্যন্তিক প্রাধান্য তাঁর মতে কল্যাণাবহ হয় নি। একটু আক্ষেপের সঙ্গেই বলেছেন অপূর্ব ভাষায়, "··· ··· but because so much depends on consciousness in this fiction and so little is left for the creative unconscious to contribute, there is a loss too, of irrational poetic elements, of sudden ecstasy or sudden tragic insights, of life's heights and depths and fury and horror and beauty and wonder. তার পরেই একটি মারাত্মক কথা বলেছেন ; কেন না "opium" বস্তুটি সেবন করলে তা মারাত্মক নাও হতে পারে, কিন্তু বস্তুটি না হলেও শব্দটি প্রগতিশীল আলোকদীপ্ত ইদানীন্তন সমালোচনায় একটি সাংঘাতিক মারণাস্ত্র এবং বাংলাদেশের আধুনিক সংস্কৃতি-যজ্ঞের প্রগতি-ধ্বজা-উড্ডীনকারী অপ্রতিহত প্রভাবশালী দোর্দণ্ডপ্রতাপান্বিত হোতা, ঋত্বিক্ ও পুরোধাবৃন্দের কটূক্তি-তূণের একটি মোক্ষম বাণ ও প্রতিক্রিয়াশীল দুশমন্‌দের শয়তানিকে উদ্দেশ করে গালাগালি দেওয়ার পক্ষে একটি অতীব উপযোগী, আর ধর্ম ও কুসংস্কার (সমার্থক শব্দ ?) কে ছিন্নভিন্ন ধ্বস্তবিধ্বস্ত চূর্ণবিচূর্ণ করার পক্ষে এটি একটি কলিযুগের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র। Priestleyর কি দুর্মতি হল জানি না হঠাৎ গম্ভীরভাবে একটি অদ্ভুত প্রলাপোক্তি করলেন—But literature likes a little opium." এটা কি "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" না বার্ধক্যজনিত ভীমরতি ? খুব সম্ভব দ্বিতীয়টিই যথার্থ কারণ। হায় Priestley !

Priestley-র মতিচ্ছন্নতা বা প্রতিক্রিয়াশীলতার (সমার্থক শব্দ?) চূড়ান্ত আমরা পাব সাহিত্য ও আর্টএ religion-এর স্থান সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় অভিমত যেখানে জ্ঞাপন করেছেন গ্রন্থের উপসংহারে। তার পূর্বে—না হলে ইন্টেলেক্‌-চুয়াল মহলে পাঠকের সংখ্যা হঠাৎ এবং দ্রুত হ্রাস পেতে পারে এই আশঙ্কায় উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁর আরো দু একটি অভিমত উল্লেখ করছি। সকলেই জানেন ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রতীচীর সাহিত্য-রঙ্গমঞ্চে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ উপন্যাস; সাহিত্যের অন্য কোন শাখায় প্রতিভার এমন বিপুল ও বিচিত্র সমাবেশ ঘটে নি। উপন্যাসের ধারা এই বর্ষশতার্দ্ধে ত্রিস্রোতা। প্রথম ধারাটির বর্ণনা করে বলেছেন এই ধারার অনুবর্তীরা—"They could go nearer the scientist, the sociologist. the reporter; could try to be as objective as possible; could observe and record rather than invent and create: like Zola and the the novelists of naturalism." পূর্বেই বলেছি এ জাতীয় naturalistic উপন্যাসের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নেই। দ্বিতীয় ধারাটির প্রসঙ্গে বলেছেন—Moving in another direction, they could insist upon rejecting the loose mixed form in the hope of turning the novel into a work of literary art, technically as perfect as a good sonnet." এইটাই ছিল ফ্লোবেয়্‌র আর হেনরি জেম্‌স্‌ প্রমুখ উপন্যাস-রচয়িতৃগণের স্বপ্ন। এই দ্বিতীয় ধারার অনুসরণ যাঁরা করেছেন ফ্লোবেয়্‌রকে পুরোবর্তী করে তাঁদের সম্বন্ধেও Priestley শ্রদ্ধাহীন না হলেও আশান্বিত নন। লক্ষ্য হিসাবে এই আদর্শ নিঃসন্দেহ মহৎ ও উচ্চ, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে এই স্বপ্ন যেদিন সত্য হবে সেদিন উপন্যাস আর উপন্যাস থাকবে না কারণ ঠিক ঠিক আর্ট বলতে যা বোঝায় উপন্যাস তা কোন দিনই হতে পারবে না; তার প্রকৃতিটাই হল মিশ্র, অবিশুদ্ধ। তৃতীয় যে ধারাটি ঊনবিংশ শতকের শেষার্দ্ধে বহমানা হয়েছিল তার সম্বন্ধে বলেছেন—"They deliberately transform the novel into an instrument of propaganda. the expression in narrative and dramatic form of a definite philosophy of life." এই অপেক্ষাকৃত আধুনিক ধারার দৃষ্টান্ত হলেন শেষের দিকের তলস্তয়, জর্জ এলিয়ট, মেরেডিথ, হার্ডি, আনাতল ফ্রাঁস্‌। এঁদের সম্বন্ধে Priestley

অনুৎসাহ নন, প্রশংসাও করেছেন কিন্তু সর্বোচ্চ স্তরের স্রষ্টা—অবশ্য প্রথম জীবনার্দ্ধের তলস্তয় নিশ্চয়ই এঁদের একজন—এঁরা কেউই নন।

এত গেল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের বা উপন্যাসের স্বর্ণযুগের কথা। তারপর বিংশ শতাব্দী। এই শতাব্দীর, বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের অনেক খ্যাতিমান্ ব্যাপকভাবে আদৃত ও সম্মানিত ঔপন্যাসিকদের প্রতি তাঁর অপ্রেম আমরা পূর্বেই বারংবার লক্ষ্য করেছি। আধুনিক এবং সমসাময়িক লেখকদের—স্রষ্টা এবং ক্রিটিক—সম্বন্ধে তাঁর এই অত্যন্ত স্পষ্ট বিরাগের কারণটা কি? কারণ উপন্যাসে প্রতীচীর প্রতিভাবান্ মহৎ স্রষ্টা যাঁরা—"major creative artists"—তাঁদের অনুসৃত যে মূল ধারা বা tradition তার থেকে আধুনিক, বিশেষ করে ১৯১৯ এর পরবর্তী যুগের, লেখকরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। এবং এই বিচ্ছেদের প্রধান কারণ হল এঁদের বহির্বিমুখতা ও অতিরিক্ত, অস্বাস্থ্যকর অভ্যন্তরপ্রবণতা বা introversion. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসস্রষ্টারা এই অস্বাভাবিক অন্তর্মুখিতা হতে মুক্ত ছিলেন এবং তাঁদের অনেকেরই স্পষ্ট প্রবণতা ছিল ঠিক এর বিপরীত অর্থাৎ বর্হিমুখ, extrovert. এই কারণেই কোন কোন অতি-উচ্চপ্রতিভাশালী স্রষ্টার প্রতি আমরা ঘোর অবিচার করেছি যেমন Fielding যাঁর সাম্প্রতিক অনাদরের উল্লেখ করে আক্ষেপের সঙ্গে বলেছেন—"And he and his masterpiece are big enough and strong enough to endure neglect, to await the time when fashion will swing from introverted to extroverted novels." শলোকফ্ এর প্রসঙ্গে ঈষৎ ক্ষোভের সঙ্গে এই আধুনিক অন্তর্মুখিতা-প্রিয়তাকে আক্রমণ করে বলেছেন "the deeply subjective and introverted guardians of mordern Literature.

এর থেকেই বোঝা যাবে Priestley কেন Joyceএর প্রসঙ্গে "stream-of-consciousness, free association, interior monologue" নামে প্রসিদ্ধ আধুনিক উপন্যাসরীতিকে "clumsy, fatiguing; and downright boring" বলে বিরক্তির সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। রীতি হিসাবে এর দুর্বলতা কোথায় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Virginia Woolfএর প্রসঙ্গে বলেছেন—"If his (novelist's) fiction is concerned with men in a particular society, then this highly subjective, interior monologue, halo-and-

envelope method will not serve his purpose at all. In the unending dazzle of thoughts and impressions, society disappears and even persons begin to disintegrate."

(দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালের ইংরেজি ভাষায় রচিত উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন "Thoughts in the Wilderness" নামে একটি গভীরচিন্তাপূর্ণ গ্রন্থের অন্তর্গত "The Newest Novels" শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে। এই তরুণ উপন্যাসলেখকদের দুটি প্রধান দুর্বলতার উল্লেখ করেছেন হতাশার সঙ্গে। প্রথমটি হল—"The world they present does not seem to me quite real." দ্বিতীয় অভিযোগটি হল—"their central characters are too deliberately unheroic.")

বিংশ শতাব্দীর দুজন জার্মান ঔপন্যাসিকের একটু স্বতন্ত্র উল্লেখ এখানে প্রয়োজন, কারণ ব্যাপারটা একটু interesting. এঁরা হলে কাফ্‌কা এবং টমাস মান্। ব্যাপারটা interesting বলেছি এইজন্য যে Priestleyর বর্ণিত প্রতীচ্য উপন্যাসের মূল ধারার এঁরা বহির্বর্তী অথচ Priestley শ্রদ্ধার সঙ্গে, আদরের সঙ্গে এঁদের দুজনের উল্লেখ করেছেন। এই দুজন প্রতিভাবান্ এবং প্রভাবশালী জার্মান ঔপন্যাসিকের প্রতি তাঁর এই অপ্রত্যাশিত প্রীতির কারণ কি? কারণ হচ্ছে এই যে উপন্যাসে allegory তাঁর ভাল না লাগলেও Symbolismকে নিন্দনীয় তো মনে করেনই নি, বরং সাদর অভিনন্দন জানিয়েছেন; অবশ্য লেখক যদি শক্তিমান্ হন। কাফ্‌কার সম্বন্ধে বলেছেন, "His is the most triumphantly sustained symbolism in prose fiction." আর টমাস মান্‌এর Der Zauerbergকে বলেছেন, "(It) is a great novel." উপন্যাসে naturalism তিনি পছন্দ করেন না; কিন্তু symbolism তাঁকে আকৃষ্ট করে যদি তা যথার্থ ও গভীর হয়। Moby Dickএর প্রধান আকর্ষণ এই symbolism.

তা হলে দেখা যাচ্ছে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে ব্যাপকভাবে অনুসৃত তিনটি বিভিন্ন ধারার কোনটিকেই Priestley উপন্যাসের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক মনে করেন নি; আর বিংশ শতাব্দীর উপন্যাসসাহিত্যের নানা পরীক্ষানিরীক্ষা তাঁর চিত্তে উৎসাহের সঞ্চার করে নি। এতক্ষণ ধরে তো নেতি নেতি হল, এটা নয়, ওটা নয়; কিন্তু তারপর? তা হলে অধৈর্য হতাশ

দীর্ঘশ্বসিত পাঠক নিশ্চয়ই বিস্মিত প্রশ্ন করবেন : তা হলে কি এমন কোন উপন্যাসরচয়িতা প্রতীচ্য সাহিত্যের ইতিহাসে জন্মগ্রহণ করেন নি যাঁরা Priestleyর মত খুঁতখুঁতে বিশ্বনিন্দুককেও পরিপূর্ণ তৃপ্তিদানে সমর্থ? যদি থাকেন তবে তাঁরা কারা এবং কোন ধারার অনুবর্তী?

এর উত্তর হচ্ছে—যা পূর্বেও উল্লেখ করেছি—tradition. অর্থাৎ অন্য সব কিছুর মত উপন্যাসেরও একটি মূল ধারা—central tradition বিদ্যমান। এই "great tradition" এর স্রষ্টা যাঁরা তাঁদের মধ্যেই আমরা পূর্বোক্ত চারটি গুণের সমন্বয় প্রত্যক্ষ করি : চরিত্রসৃষ্টি, সমাজচিত্র, আত্মবিস্মৃত তন্ময়তা, মগ্নচৈতন্যের অনির্বচনীয়তা। এঁদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এঁরা একদেশদর্শী নন, সম্যগ্‌দ্রষ্টা, onesided নন, balanced. আধুনিক সাহিত্যের অন্তর্মুখীনতার প্রতি তাঁর তীব্র বিরাগ থেকে একথা মনে হতে পারে যে তিনি extrovert সাহিত্যের অনুরাগী। কিন্তু এ ধারণাও ঠিক নয়, কেন না Priestley এখানেও যার ওপর জোর দিয়েছেন সেটা হল balance, introversion ও entroversion, অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ এর ঐকাত্ম্য। আর তার সঙ্গে চাই প্রাণস্পন্দন, জীবনানন্দ ; Priestley যাকে বলেছেন "life-enhanting quality."

এর পর যে প্রশ্নটির উত্তর দিয়ে উপন্যাসের এই আলোচনা সমাপন করছি সেটা হল : এই "great" বা "central" tradition এর স্রষ্টা কাঁরা? Priestley নিজে এ প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টভাবে না দিলেও বলা যেতে পারে যে এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন : সেরভান্তেস্, ফিল্ডিং, ডিকেন্স্, বালজাক্, দস্তয়েফ্‌স্কি, তলস্তয় এবং বিংশ শতাব্দীতে মার্সেল প্রুস্ত।

উপসংহারে প্রতীচীর মানুষ ও সাহিত্য সম্বন্ধে—বিশেষ করে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—Priestley কয়েকটি গভীর, চিন্তাপূর্ণ, প্রথমে বিষণ্ণ ও পরিশেষে আশান্বিত উক্তি করেছেন। তাঁর Weltanschauung বা বিশ্ববীক্ষারও কিছু ইঙ্গিত পাই এই ক্ষুদ্র, অপূর্ব উপসংহারে যার প্রতিটি শব্দ গভীর-তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর বিশ্ববীক্ষার একটি সংবাদী সুর ধ্বনিত হয়েছে তলস্তয়ের সম্বন্ধে তাঁর একটি আশ্চর্য (প্রগতিশীল বুদ্ধিবাদীর কাছে) মন্তব্যে প্রসঙ্গটা হচ্ছে স্রষ্টা তলস্তয় নয়, আর্ট-ক্রিটিক তলস্তয়। Priestley অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছেন War and Peace ও Anna Karenina-র স্রষ্টা কি করে তাঁর "What is Art"-এর মত একটি তৃতীয় শ্রেণীর "street-corner tract" প্রণয়ন করলেন। ব্যাপারটা যদি এই-

খানেই, এই বিস্ময় ও আক্ষেপেই শেষ হত তা হলে বলবার কিছুই থাকত না এবং বাংলাদেশের অমিতবিক্রমশালী দুর্দান্ত ইণ্টেলেকচুয়াল সম্প্রদায়েরও নাসিকা কুঞ্চনের অবকাশ ঘটত না। কিন্তু Priestley-র পুনরায় মতিভ্রংশ ঘটল, খামখা একটা অদ্ভুত উক্তি করে বসলেন, একবার ভেবেও দেখলেন না ভূতপূর্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তবর্তী নব্যতন সংস্কৃতির একটি প্রাণকেন্দ্রে তাঁর এই বৃদ্ধবয়সের গ্রন্থটির তরুণ ক্রেতার সংখ্যা শোচনীয়ভাবে হ্রাস পেতে পারে। এইবার উক্তিটি—আশা করি ব্যাবসায়িক স্বার্থেও অন্তত পরবর্তী সংস্করণে বাক্যটি প্রত্যাহৃত করবেন—উদ্ধৃত করছি। "Yet behind this nonsense was something profoundly true and in danger of being forgotten, namely, the idea that art should be religious in origin and feeling and ought to be widely understood and appreciated, not the possession of a few, but enjoyed by the mass of people." বাক্যটির শেষাংশ অধ্যয়ন করে হয়ত কোন কোন মার্ক্সবাদী অর্থাৎ সংস্কৃতিবান্ (সমার্থক শব্দ ?) পাঠক পাঠিকা উল্লসিত ও করতালিপ্রদানোদ্যত হবেন গণচেতনার ("mass of people") জয়গান শুনে। কিন্তু সে গুড়েও বালি। কারণ গ্রন্থের ২০২ পৃষ্ঠায় "The Age and its Prophets" অধ্যায়ে Karl Marx-এর সম্মানে একটি পুরো পৃষ্ঠা উৎসর্গ করেছেন (Communism কে একটি দুর্ভাগ্য ও দুঃস্বপ্ন বলে বর্ণনা করলেও মার্ক্স এর সম্বন্ধে—বিশেষ করে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও কাল্‌চার—তিনি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নি যদিও তাঁর প্রেরণার মূলে যে তিক্ততা ও বিদ্বেষ—hatred রয়েছে তা তাঁর ভাল লাগে নি।) এবং শেষে সাহিত্যে মার্ক্সবাদের প্রভাব সম্বন্ধে এই অদ্ভুত (?) মন্তব্যটি করেছেন। "The writing, both creative and critical, inspired by Marxism has been almost always of poor quality. Whatever they intended their doctrines to accomplish, Marx and Engels have done literature more harm than good." (প্রসঙ্গত একটু ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও বলে রাখি, নিজের মত বলে কোন উক্তিকে চালানো যেখানে, বিশেষ করে অর্বাচীন সাহিত্যযশোলিপ্সুর পক্ষে, অত্যন্ত বিপজ্জনক সেখানে Priestley-র মত কোন খ্যাতিমান্ ও শক্তিমান্ লেখকের বিস্তীর্ণ পক্ষপুটের অন্তরালবর্তী হয়ে মতামত প্রকাশ করাই শ্রেয় ও

বিজ্ঞোচিত বিশেষ করে সেই উদীয়মান (?) সমালোচক-যশঃপ্রার্থী যদি—যেমন বর্তমান প্রবন্ধের লেখক—অপ্রিয়বিবক্ষু অথচ ভীরু ও কাপুরুষ হন ; কারণ পৃথিবীর তাবৎ ইংরেজিভাষী দেশে লক্ষ লক্ষ সপ্রশংস পাঠকপাঠিকা যাঁর সেই Priestley-র পাঠকের সংখ্যা বাংলাদেশে দু'এক হাজার কমল কি বাড়ল তাতে অল্পই আসে যায়, কিন্তু বেচারা নবোদ্গতদন্ত সাহিত্যিকযশঃপ্রার্থীর পক্ষে এ যে অঙ্কুরেই বিনাশ !)

উপসংহারে Priestley প্রতীচীর বর্তমান সাহিত্যিক পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সাহিত্য ক্রমশ সমাজের কেন্দ্র থেকে দূরে চলে যাচ্ছে ; তার বিগত দুই শতাব্দীর মহিমান্বিত আসন ক্রমশ অধিকার করে নিচ্ছে "mass communication" অর্থাৎ চলচ্চিত্র, রেডিও ও television. সাহিত্য ক্রমশ হয়ে আসছে কঠিন, "neurotic" এবং "unhealthy" যার ফলে সাহিত্য শুধু কেন্দ্রচ্যুত হয় নি তার নিগূঢ় রস ও আনন্দ আজ আর সর্বজনগম্য নয়, মুষ্টিমেয়-বিশেষজ্ঞ-আস্বাদ্য।

আধুনিক প্রতীচ্য সমাজ ও সাহিত্যের প্রধান সমস্যা হল "religious consciousness" এর অন্তর্ধান। "It is doubtful if our society can last longer without religion." (এই প্রসঙ্গে বলে রাখি religion শব্দটি Priestley খুব গভীর ও ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেছেন।) একটা কথা অত্যন্ত জোরের—এই জোরের প্রয়োজন ছিল—সঙ্গে অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলতে চেয়েছেন ; সেটা হচ্ছে এই যে Humanism কিছুতেই religion-এর অভাব পূর্ণ করতে পারে না, কেন না, "Man cannot remain man unless he looks beyond himself." Preistley-র এই বাক্যটিতে তাঁর জীবনদর্শনের একটি মূল প্রত্যয় ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর এই গ্রন্থে এই কথাটা বারবার বলেছেন যে পরিপূর্ণ মানুষ হতে গেলে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে ঊর্ধ্বে, এমন কিছুর দিকে যা মানুষের চেয়ে বড়। Humanism-এর মূল তত্ত্ব "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" (Sophoclesএর Antigoneতেও মানবপ্রশস্তি আছে) অত্যন্ত বালকোচিত, অপরিণত ও অশ্রদ্ধেয়।

ধর্ম যখন মনুষ্যসমাজ থেকে আজ দ্রুত বিলীয়মান তখন সমাজের ও ব্যক্তি-জীবনের গুরুভার বোঝা আজ বহন করবে কে ? এর একটা উত্তর হতে পারে : Sex. "Since the Second War, in this atomic age, sure of nothing

but sex—and, to take two successful English examples, what is there left at the end of "Lucky Jim" or "Look Back in Anger" but sex ?—We are now piling on to sex the whole gigantic load of our increasing dissatisfactions, our despair, a burden far greater than it can safely take." কিন্তু Sex-এর কুসুম-সুকুমার কোমল অংসদেশ এই হিমাচলতুলনীয় বোঝা বইতে পারবে কেন ? সমাজজীবনের দুঃসহ জটিলতা ব্যক্তিজীবনের বিচিত্র আনন্দ-বেদনা দ্বন্দ্ব-সন্দেহ আশা-নৈরাশ্যের ভার বহন করতে সমর্থ একমাত্র religion. "Religion alone can carry the load, defend us against the de-humanising collectives, restore true personality."

আধুনিক কালে মহৎ-সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে "religious basis and frame-work"এর প্রায়াবলুপ্তির মত এত বড় সর্বনাশ আর কিছু হতে পারে না। Priestley আক্ষেপ করে বলেছেন, "But I have no religion, most of my friends have no religion, very few of the major modern writers we have been considering have had any religion ; and what is certain is that our society has none." কিন্তু যা নেই, যা চিরতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে তা নিয়ে আক্ষেপ করলে তো সমস্যার সমাধান হবে না। তা হলে কি আমাদের, বিশেষ করে শক্তিমান্ লেখকদের, করণীয় কিছুই নেই, আমরা কি শক্তিহীন, প্রতিকারহীন, অসহায় দর্শক মাত্র ? এর উত্তরে গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় বলেছেন, দৃঢ়তার সঙ্গেঃ না। "We can stop disinheriting ourselves. We can challenge the whole de-humanising, de-personalising process, ...that is taking the symbolic richness, the dimension in depth, out of men's lives." প্রতীচ্য মানবের সবচেয়ে বড় সর্বনাশ, সে আজ দ্বিধা-খণ্ডিত, শতধাবিদীর্ণ, বেসুরো। "Western man is now schizophrenic." আমাদের, বিশেষ করে মনীষী ও স্রষ্টাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হল, "to bring our outer and inner worlds, now tearing us in two, closer together, more in harmoy." এই হারিয়ে যাওয়া সুর জীবনে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে আর তার প্রথম সোপান হল বিশ্বাস, শ্রদ্ধা। কি সেই বিশ্বাস, কি সেই শ্রদ্ধা ?

"We can at least believe that man lives, under God, in a great mystery, which is what we found the original masters, of our literature, Shakespeare and Rabelais, Cervantes and Montaigne, proclaining at the very start of this journey of Western man."

Literature and Westernman-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখকের তৃতীয় প্রবন্ধ 'নাটক ও প্রিস্ট্‌লে' আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।—সম্পাদক।

বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান চর্চার এক অধ্যায়

অমলেন্দু ঘোষ

ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগে বাঙ্গালীর ইংরেজি জ্ঞানের অবস্থা ছিল শিশুর চলার মতো থপ্‌থপে। ইংরাজি বুলি কণ্ঠস্থ করে বাঙ্গালী বলতে আরম্ভ করলো: "টেক্ টেক্ নো-টেক্ নো-টেক্, একবার তো সী"। প্রতিবেশী তাজ্জব বনে গেল। অথচ এই বাঙ্গালীই পরবর্তীকালে ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষায়, লিখনে-পঠনে সর্ব্ব স্তরের ইউরোপীয়দের সমকক্ষ হয়েছিল—বিদগ্ধজনের প্রাণখোলা অভিনন্দন আদায় করেছিল। একথা ইতিহাসের। ইতিহাস বলে: বাঙ্গালীই ইংরেজের সর্বাধিক প্রিয়পাত্র, আবার সেরা দুষমনও বটে। সে কথা যাক্।

তৎকালীন কলিকাতার মুৎসদ্দি মহায়য়দেরও ইংরেজি জ্ঞানের নমুনা আমাদের হাতে আছে। গৃহস্থ বাঙ্গালীর অতি পরিচিত 'ঢেঁকি যন্ত্রে'র বিবরণ ইংরেজের কাছে সবিস্তারে দিতে গিয়ে জনৈক মুৎসদ্দি মহাশয় বলেছেন ঢেঁকি মানে: "টু মেন ধাপুড় ধুপুড় ওয়ান ম্যান সেকে দেয়" ইত্যাদি।—বলা বাহুল্য এটি যদিও প্রবাদের মতো তবু এ সংবাদ ঐতিহাসিক সত্য। সংবাদটি বাংলা ২০ বৈশাখ ১২৩৮ সালের 'সমাচার চন্দ্রিকা' (২ মে, ১৮৩১) পত্রিকা থেকেই সংগৃহীত।

আরও একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।—

আজ যেখানে গার্ডেনরিচ বা মেটিয়াবুরুজ, সেখানেই কোম্পানীর আমল থেকেই বিদেশী জাহাজ নোঙ্গর ফেলে আসছে। ইংরেজি ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 'ফ্যাকন' নামে একটি জাহাজ নিয়ে ক্যাপ্‌টেন স্ট্যাফোর্ড সাহেব এসে হাজির হোলেন মেটিয়াবুরুজ বা গার্ডেনরিচ ঘাটে। এদেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ ক্যাপ্‌টেন স্ট্যাফোর্ড গোবিন্দপুরের শেঠ বসাকদের খ্যাতির কথা শুনেছিলেম। তাই তিনি শেঠ-বসাকদের কাছে অনুরোধ করেন একজন দোভাষী পাঠিয়ে দিতে। 'দোভাষী' কথাটি সাহেব হয়তো স্বভাবতই 'দুবাস' রূপে উচ্চারণ করায় শেঠ

বসাকেরা তার অর্থ অনুসরণ করতে পারেন নি। তার ফল কি হয়েছে শুনুন ঃ

"শেঠ বসাকেরা 'ডুবাস' কথাটার অর্থ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া, সাহেবেরা একজন ধোপা চাহিয়াছেন, ইহাই সিদ্ধান্ত করিলেন। এই সিদ্ধান্তানুসারে, রতন সরকার নামক একজন ধোপাকে, তাঁহারা সাহেবদের জাহাজে পাঠাইয়া দেন। রতন একটু আধটু ইংরাজী বুঝিত। সে কতগুলি উপঢৌকন লইয়া, ভদ্রলোকের মত পোষাক পরিয়া, জাহাজের কাপ্তেনের সহিত দেখা করিল। রতন ধোপার সহিত ইংরাজীতে কথাবার্তায়, কাপ্তেন বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। রজক, রতনই ইংরেজের প্রথম দ্বিভাষীর পদ লাভ করিলেন।"

[কলিকাতা সেকালের ও একালের ; হরিসাধন মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ২২০-২১]

এই যে একাধিক ঘটনার উল্লেখ করলাম এরকম শত শত ঘটনার সংকলন করা যায়। কিন্তু তাতে লাভ কি? উল্লিখিত ঘটনা কয়টিতেই বোঝা যায় ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগে বাঙ্গালীর অবস্থা কি ছিল। অবস্থা অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষার নমুনার কথাই আমি বলতে চেয়েছি।

॥ দুই ॥

ইংরেজি শিক্ষার এই প্রথম যুগে বাঙ্গালীদের মধ্যে স্বভাবতই বাংলা-ইংরেজি (Anglo-Bengali) অভিধান এবং ব্যাকরণ-এর অভাব অনুভূত হয়। তারই ফলে সেকালে নানান্ জনের দ্বারা শব্দার্থ পুস্তক (Word Book, Spelling book etc.) 'বাক্যাবলি' 'বকেচিলরি' অর্থাৎ Vocabulary প্রভৃতি সংকলিত হোতে থাকে। কিন্তু শব্দার্থপুস্তকরূপী ঘোল কখনো অভিধানরূপী দুধের স্বাদ মেটাতে পারে? কখনোই নয়।

তাই, এই অভাবের তাড়না থেকেই তৎকালীন বাঙ্গালীরা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন যদি কোনো শিক্ষিত ভদ্রলোক দয়াপরবশ হয়ে একখানি বাংলা-ইংরেজি অভিধান ও ব্যাকরণ সংকলনের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, এই সংকলনে থাকা চাই বাংলার অতি সাধারণ দেশজ শব্দের ইংরেজি অর্থ ও ব্যাকরণের নিয়মাদি। বাঙ্গালী উদ্যোক্তারা বিজ্ঞাপনে একথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন উপযুক্ত বিবেচনা করলে তাঁরা ইংরেজ সরকারের কাছে এই অভিধান ও ব্যাকরণ প্রকাশে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও আদায় করে দেবেন। এই সমস্ত

বিবরণ সম্বলিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় ২৩এ এপ্রিল ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের 'কলিকাতা গেজেট' (Calcutta Gazette) পত্রিকায়। বিজ্ঞাপনটি এই রকম :

The humble request of several Natives of Bengal :—

We humbly beseech any Gentleman will be so good to us to take the trouble of making a Bengali Grammar and Dictionary, in which, we hope to find all common Bengali country words made into English. By this means we shall be enabled to recommend ourselves to the English Government and understand their orders ; this favour will be gratefully remembered by us and our posterity for ever.

(The Calcutta Gazette, 23 April, 1789).

আজ থেকে প্রায় পৌনে দুইশত বছর পূর্বে ইংরেজি শিক্ষার্থী বাঙ্গালী একখানি বাংলা-ইংরেজি ব্যাকরণের জন্যে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের মতোই হাহাকার করছে। তার একমাত্র কারণ না হোলেও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ এই যে : তৎকালে ইউরোপীয়ান ও দেশীয়দের মধ্যে কথাবার্তা প্রায়ই হিন্দি ও পারসিক মাধ্যমেই সম্পন্ন হোত। ইংরেজি জানা লোকের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য ছিল। আর তাঁদের মধ্যে রতন সরকারের মতো লোকেরও অভাব ছিল না। তাই এই অবস্থা।

॥ তিন ॥

কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত বাঙ্গালীদের ওই আবেদনের ফলে প্রায় আঠারো মাস পরে অর্থাৎ ২৩এ সেপ্‌টেম্বর ১৭৯০ তারিখের কলিকাতা গেজেট পত্রিকায় আর একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।

ডক্‌টর মেকিনান (Dr, Maccinnon) নামে জনৈক ইউরোপীয়ান-এর নামে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়। ওই বিজ্ঞাপনটি ছিল একখানি বাংলা ও পারসি মিশ্রিত ইংরেজি ব্যাকরণ সম্পর্কিত। বিজ্ঞাপনটি এইরকম :

An
English Grammar,
Compiled by
Dr. MACCINNON,
will be speedily published,
in
PERSIAN and BENGALI
at
The Honorable Company's Press,
in Calcutta.

THE COMPILER of the GRAMMAR, has chiefly adopted the Rules and Authorities of Dr. LOWTH and JOHNSON. But he has ventured an innovation in the arrangement, in order to conform to the fashion of the Orientalists.

HE has divided all the words in the English language into three classes : Particles, Nouns and Verbs.

Ist. Under Particles he has comprehended, Articles, Adverbs, Prepositions, Conjunctions and Interjections : which he has specified and defined, giving complete lists of them all.

2ndly. He has divided Nouns into Nouns Substantive, Nouns Adjective and Pronouns and pointed out the few variation or inflections which they undergo in expressing Gender, Number, Agent, Object and Degrees of Comparison, &c.

THE PRONOUNS obliged him to throw these inflections into the form of a regular Declension and to use three cases, viz. Nominative, Genitive or possessive and Objective.

3dly. THE VERBS he divided into Auxiliaries and Principles and gave a complete Conjugation or the Active Voice, but took no notice of a Passive Voice.

He GAVE the general Rules for the formatlon of the different parts of the Verb from the Imperative, which, following Dr. PRIESTLEY, he has called the radical form of the Verb.

HE ENUMERATED all the irregular Verbs distributing them into Classes as Dr. LOWTH had done.

To ENABLE the Asiaticks to express and comprehend the various modes of the English Verb, he has chiefly adopted their own names or technical terms aod given a Conjugation of it.

He HAS given a few rules of Syntax under the following heads: Concord, Government and Arrangement.

HE HAS also given the common rules of Versification.

THUS HE has endeavoured to trip the Grammar of the English language of all unnecessary technical terms and definitions, and to exhibit it in its own peculiar simplicity.

N. B. IT ought to have been mentioned that the first book of the Grammar is entirely taken up with the Orthography, and pronunciation. The second, with inflexion; and the third, with Syntax and Prosody.

THE Compiler and Editor of this work, instead of a dedication, has, after the manner of the Orientalists, prefixed to it an humble address to the supreme being, supplicating that it may be instrumental in opening a way for

light and true knowledge, to shine on his fellow creatures and fellow citizens in the East.

BUT were he to seek for the aid of any name of man, whose breath in his nostrils, it would be that of WARREN HASTINGS, Esq. late Governor General of India, who has already given the Inhabitants of ASIA as sublime an idea of the English and human character, as it is possible for our language to give.

(Calcutta Gazette, 23 September, 1790. Vol., XIV, No. 343.)

কোম্পানীর ছাপাখানায় মুদ্রিত এই ব্যাকরণখানি ইংরেজ, পারসি ও বাংলা হরফে মুদ্রিত হয়। ব্যাকরণখানি তৎকালে একাধারে ব্যাকরণ, শব্দকোষ, তথা ইংরেজি ভাষা শিক্ষার একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে সম্মানিত হয়। গ্রন্থ খানির প্রকাশকাল ওই বিজ্ঞাপনটিরই বছর অর্থাৎ ইংরেজি ১৭৯০।

ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগের বাঙ্গালীর সম্পর্কে এই ঘটনাগুলি আজ আমাদের কাছে কৌতুকাবহ হোলেও তা ঐতিহাসিক সত্য। এই তথ্যগুলিকেই এখানে উপস্থিত করলাম।

তারাশঙ্কর ঃ ছোট গল্পে

সুনীল চক্রবর্তী

॥ এক ॥

সাত রায়ের ইতিহাস। তিন পুরুষ ধরে রায়েরা সঞ্চয় করেছিল। চতুর্থ পুরুষ সে সঞ্চয়ের সিংহাসনে বসে রাজত্ব করল। তারপর দু' পুরুষ ধরে চলল ভোগ ও ঋণ। সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভর রায়ের আমলে রায় পরিবারের লক্ষ্মী ঋণ-সমুদ্রে তলিয়ে গেল। বিশ্বম্ভর রায়বংশের লক্ষ্মীহীন দেবরাজ।

চকমিলান রায়বাড়ী। সুপরিসর সুদীর্ঘ বারান্দা। বারান্দায় সারি সারি গোল থামের মাথায় খড়খড়িতে চামচিকে বাসা বেঁধেছে। অন্ধকার তালাবন্ধ ঘরগুলোতেও চামচিকের আধিপত্য। ছাদের সিঁড়ির পাশেই বিছানাঘর। তুলা ছড়িয়ে আছে বারান্দায়। তারপরেই ফরাসঘর। জাজিম, শতরঞ্জি, গালিচা থাকে ঘরটায়। সেগুলো বোধ হয় পচে গেছে। বিশ্রী গন্ধ। বাতি-ঘরেও আজকাল চামচিকের আড্ডা। বেলোয়ারী ঝাড়ের কলমগুলো মাঝে মাঝে দোল খায়। ফরাস-বরদারের, পত্তনীদারের মহল আজ শূন্য। দেওয়ালে বড় বড় ছবি টাঙ্গানো। আজ প্রথম ছবিখানির ছবি নেই, কাচ নেই, শুধু ফ্রেমখানি ঝুলে আছে। দ্বিতীয়টার কাচ নেই। সেরেস্তাখানার সারি সারি ঘরে রায় বংশের রাশি রাশি কাগজ বোঝাই হয়ে আছে।

ওদিকে জলসাঘর। হুকে হুকে ঝাড় দেওয়ালগিরি। প্রকাণ্ড হলের চারিদিকে প্রাচীর বিলম্বিত রায়বংশের মালিকদের যুবা বয়সের প্রতিকৃতি। আদি পুরুষ ভুবনেশ্বর রায় থেকে সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভর রায় পর্যন্ত সকলেরই বিলাস-ব্যসনমত্ত প্রতিকৃতি। প্রপিতামহ রাবণেশ্বর রায় দাঁড়িয়ে আছেন শিকার করা বাঘের উপর পা রেখে—হাতে সড়কি, বল্লম, পিঠে ঢাল। পিতা ধনেশ্বর বসে আছেন গদির উপর, পাশে ছোট গিন্নী। যুবক বিশ্বম্ভর তুফানের পিঠে বসে আছে।

এ জলসাঘরে শেষ রজনী। নেচেছিল পিয়ারী আর কৃষ্ণা। নতুন ভোরের আলো এসে যখন সে রাত্রির কোমর জড়িয়ে ধরেছে তখন বিশ্বম্ভর রায় দেখলেন

জলসাঘর তখনও খোলা। সব শূন্য, অভিসারিকা চলে গেছে। সুরার শূন্য বোতল আসরে গড়াগড়ি যাচ্ছে। দেওয়ালের গায়ে দৃপ্ত রায়বংশধরেরা—মুখে মত্ত হাসি। ঝাড়-দেওয়ালগিরির বাতি তখনও নির্বাপিত হয় নি একেবারে। বিশ্বম্ভর রায় সভয়ে পিছিয়ে এলেন। মোহ, মোহ শুধু তাঁর নয়; সাত রায়ের মোহ জমে আছে ওই ঘরে। ভীতার্তের মত তিনি চীৎকার করে উঠলেন : বাতি নিবিয়ে দে, বাতি নিবিয়ে দে। তাঁর হাতের চাবুকটা সশব্দে জলসাঘরের দরজায় আছড়ে পড়ল।

এ কাহিনী শুধু সাত রায়ের ইতিহাস নয়; নতুন ধনিক সভ্যতার বিকাশে ভাঙ্গনধরা বাঙলাদেশের জমিদারতন্ত্রের ইতিকাহিনী। এমনিভাবেই প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারদের জলসাঘরের দরজা এক এক করে বন্ধ হয়েছে। নন্দীর বামপ্রকোষ্ঠার্পিত হেমবেত্রের মত বিশ্বম্ভর রায়ের চাবুকটি যেন জমিদারতন্ত্রের সুরামত্ত বিলাসকলাকুতূহলের সীমান্ত প্রাচীর। অতীত কালের বিলাসপ্রমত্ত সুরের রেশ যুগ যুগ ধরে যে মোহের মায়াজাল বিস্তার করেছিল তা সেখানেই নিঃশেষে মিলিয়ে যায় নি। তার অতনুমোহ আজও মাঝে মাঝে নন্দীর তর্জনীকে উপেক্ষা করতে উদ্যত হয়।

এমনি ঐশ্বর্যভ্রষ্ট একটি জমিদার পরিবার। সে পরিবারের একটি ছেলে। পৈত্রিক বিষয় দেখবে অথবা কয়লাখাদের ওভারম্যান হিসাবে জীবন সুরু করে পারমিট ম্যানেজার হবেন—এই ছিল তাঁর স্বাভাবিক নিয়তি। কিন্তু তিনি ভালোবাসলেন বাঙলাদেশের মানুষকে, ভালোবাসেন বাঙলার মাটিকে, শুনলেন সোনাফলানো মাঠের গান। কলেরা বসন্ত মহামারীর রাহুগ্রাসে কবলিত গ্রাম—বাঙলার ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ালেন, সঞ্জীবিত হলেন আপামর সাধারণের সান্নিধ্যে। সারা ভারতবর্ষে তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে জনজাগরণের 'জোয়ার জেগেছে বাঁধনভাঙ্গা কল্লোলে। সে কুলপ্লাবী আন্দোলনের বন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। স্বদেশকে ভালোবাসার পুরস্কার লাভ করে কারাবরণ করলেন।

জেল থেকে বেরিয়ে সে স্বদেশী যুবক গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঘুরে ঘুরে একদিন তিনি এক উকীলের বাড়ীতে আস্তানা নিলেন। সে বাড়ীর বৈঠকখানায় একটি তক্তপোষের একধারে সেদিন তিনি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। শুয়ে শুয়ে আর সময় কাটে না। হাত বাড়িয়ে একটা

কাগজ টেনে নিলেন। মলাট ছেঁড়া। কাগজখানির নাম 'কালিকলম' আশ্চর্য নাম। উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে একটি গল্পের শিরোনামে এসে তিনি থামলেন। গল্পটির নাম 'পোনাঘাট পেরিয়ে'। লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র। এক নিঃশ্বাসে গল্পটি শেষ করলেন। তিনি সন্ধান পেলেন সে মাটির, যে মাটি মলিন অথচ মহত্বময়। স্পর্শ পেলেন সাধারণ মানুষের। উৎপীড়িত অপরাজেয় মানুষ। পতিতের মধ্যে শাশ্বত আত্মার পিপাসা। উঠে বসলেন তিনি। কিছুদূর এগিয়ে আর একটি গল্প ঃ 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে'। গল্পকার শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। গল্পটির পটভূমি বীরভূম। এ যেন তাঁরই অন্তরঙ্গ কাহিনী। বাঙলা সাহিত্যে নবীনতম জীবনের ইসারায় তিনি সজাগ হয়ে উঠলেন। নতুন জীবনের রসে কলম ডুবিয়ে গল্প লেখার প্রেরণা পেলেন তিনি। কিন্তু গল্প কোথায়! কি গল্প তিনি লিখবেন! অনাগত গল্পের জন্ম যন্ত্রণা বুকে নিয়ে তিনি এলেন একটি পল্লীগ্রামে। তাঁদেরই মহল।

তাঁর বাসার সামনেই ছায়ানিবিড় এক বৈষ্ণবের কুঞ্জ ঃ কমলিনীর আখড়া। রসিকজন বলে কমলিনীর কুঞ্জ। তিনি পৌঁছুবার কিছুক্ষণ পরেই ক্ষারে ধোয়া কাপড়খানি পরিপাটি করে পরে শ্যামবর্ণ মেয়েটি হাসিমুখে সামনে এসে দাঁড়াল। হাতে একখানি ঝকঝকে রেকাবীতে দু'খিলি পান, পাশে দুটি লবঙ্গ, টুকরো দুয়েক দারুচিনি, একটি ছোট এলাচ। হাত থেকে রেকাবীটা নামিয়ে রেখে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বললে ঃ প্রভুর জয় হোক।

উঠবার সময় মাথার কাপড় একটু সরে গেল। রাখাল-চূড়া বাঁধা কেশ-প্রসাধন চোখে পড়ল তাঁর। মেয়েটির সর্বাঙ্গে যেন রূপের জলতরঙ্গে আলোর পদাবলী বেজে চলেছে।

কি একটা কাজে উঠে ঘরের মধ্যে গেলেন তিনি। তাঁর কানে এল-গোমস্তা বলছে ঃ পানের চেয়ে বৈষ্ণবীর হাসি মিষ্টি। সত্যি, সে হাসিতে যেন কত গভীর গল্পের কথকতা, কত না-বলা বাণীর কথাকলি।

তাঁর মনে হলো, বৈষ্ণবীর কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হয়ে উঠেছে। আড়াল থেকে তিনি দেখলেন, না, তা নয়। সবিনয়ে বৈষ্ণবী আরও একটু হেসে বললে ঃ বৈষ্ণবের ঐ তো সম্বল প্রভু।

কথার হাওয়ায় জৈব রসের দীঘিতে ঢেউ উঠল, তাতে তো তার জীবন ডুবল না। সে ঢেউয়ের উপর পদ্মের মতো নাচতে লাগল।

তারপর এল পাগলা বৈরাগী পুলিন দাস। লোকে বলে ক্ষ্যাপা। সঙ্গে তার বলাই মোড়ল।

ক্ষ্যাপা ফাঁক পাওয়া মাত্র কমলিনীর আখড়ায় গিয়ে উঠল।

পুলিন প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই ওখানে থাকে। সেদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে তিনি শুনলেন—কমলিনী পুলিনকে বলছে ঃ যাও, বাড়ী যাও।

—কেন ?

—রাগ করবে যে !

—কে ?

—কে আবার ! তোমার বোষ্টুমী। বলেই কমলিনী হেসে ছড়া কাটল ঃ পাঁচসিকের বোষ্টুমী তোমার গোসা করেছে হে গোসা করেছে।

তিনি গল্প খুঁজে পেলেন। তাঁর ঘুম ছুটে গেল। দোয়াত কলম খাতা নিয়ে তিনি বসে গেলেন। কিন্তু সুরু করবেন কোথা থেকে ?

গ্রামে ঢুকতেই ছোট নদীর ধারে একটি বটগাছ দেখেছিলেন তিনি। বিচিত্র বটগাছ। তার শিকড়গুলোর তলা থেকে মাটি ধুয়ে গেছে, বড় অজগরের মত এঁকে বেঁকে বেরিয়ে আছে শিকড়টা। মনে হয় একটা বড় সাপ গর্তে মুখ ঢুকিয়ে দেহটায় রোদ বাতাস নিচ্ছে। সে বটগাছটা তাঁর মনে পড়ল। সেখান থেকেই সুরু করলেন ঃ "পাল পুকুরের ঘাটের উপরেই প্রকাণ্ড বটগাছটার শিকড় বিশাল অজগরের মতো কুণ্ডলী পাকাইয়া গর্তের ভিতর মুখ সেঁধাইয়া যেন পিঠে রোদ পোহাইতেছে। পুলিন দাস তাহার উপর হাঁটুভাঙ্গা দয়ের মতো উবু হইয়া বসিয়া জলে খোলামকুচি ছুঁড়িয়া 'ব্যাং-ছুড়ছুড়ি' খেলিতেছিল ; তাহার কাঁধে গামছা, কানে একটা পোড়া বিড়ি।

গল্পটি শেষ করে তিনি পাঠালেন প্রবাসীতে, ১৩৪৪ সালের বৈশাখ মাসে। সঙ্গে ডাকটিকিট ছিল। জ্যৈষ্ঠ থেকে পৌষ পর্যন্ত প্রতিমাসে রিপ্লাই পোষ্টকার্ড লিখে তিনি একই জবাব পেলেন ঃ গল্পটি সম্পাদকের বিবেচনাধীন। সুদীর্ঘ নয় মাস পরে পৌষের শেষে তিনি নিজে এসে হাজির হলেন প্রবাসী পত্রিকার অফিসে। তখনও লেখাটি বিবেচনা করছেন সম্পাদক। বিবেচনা আর শেষ হয় না। তিনি লেখাটি ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। তারপর গল্পটা পাঠিয়ে দিলেন 'কল্লোলে'। কল্লোল থেকে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় চিঠি লিখলেন ঃ এতদিন আপনি চুপ করিয়া ছিলেন কেন ? গল্পটি মনোনীত হয়েছে। চারদিনের

মধ্যেই তিনি সে চিঠি পেলেন। ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসে গল্পটি 'কল্লোলে' প্রকাশিত হল। গল্পটির নাম 'রসকলি'। গল্পকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩৩৫ সালের বৈশাখে প্রকাশিত হল 'হারাণো সুর', কল্লোলেই। তারাশঙ্কর বলেছেন : এই ১৩৩৫ সালের বৈশাখ থেকেই আমার সাহিত্যিক জীবনের সুরু।

॥ দুই ॥

তারপর তারাশঙ্করের জীবন এগিয়েছে উত্থান-পতন-বন্ধুর পথে। সে পথে চলতে চলতে নতুন জীবনের রসে কলম ডুবিয়ে অনেকগুলি গল্প লিখলেন তিনি। 'শ্মশানের পথে', প্রকাশিত হল 'কালি-কলমে'। এ গল্পটিকে তারাশঙ্কর তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রথম মাইল পোষ্ট' বলে অভিহিত করেছেন। এ গল্পটিরই উপন্যাসরূপ তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'চৈতালী ঘূর্ণী'।

এ সময়ে হঠাৎ তাঁর দু' বছরের কন্যা বুলুর মৃত্যু হয়। বুলুর মৃত্যুর ছ'সাত মাস পরে লেখা শোকজর্জর পিতৃহৃদয়ের স্পষ্টতম অভিব্যক্তি : 'বাণী মা' গল্প। এ মৃত্যুশোক সম্পর্কে তারাশঙ্কর বলেছেন : "আমার গল্প-উপন্যাসের কয়েক ক্ষেত্রেই বুলুকে হারাণোর বেদনার কথা আছে। 'বেদেনী' গল্প সংগ্রহে 'বাণী মা' গল্পের মধ্যে স্পষ্ট করেই বলেছি।—'বাণীর আগে একটি মেয়ে ছিল। কালো মেয়ে, একটি চোখ ট্যারা, তায় নাম দিয়াছিলাম বুলবুল। বুলবুল সংক্ষিপ্ত হইয়া বলুতে পরিণত হইয়াছিল। সেই বলু অকস্মাৎ একদিন চলিয়া গেল। প্রথমটা সে আঘাতে পাগল হইয়া গিয়াছিলাম।"

বুলুর মৃত্যুর দিন পনেরো আগে তারাশঙ্কর উদ্ধারণপুরে গিয়েছিলেন। উদ্ধারণপুরের বিচিত্র পরিবেশের পটভূমিতে 'শ্মশানঘাট' গল্পটির সূচনা। তিনি বলেছেন : উদ্ধারণপুর বাজারের পালকর্তা, মাদুর-বুনিয়ে শ্রীমতী, মেয়ে কুসুম, তাদের সন্ধ্যার রূপকথার আসরে কুকুর ছানাটির আবির্ভাব, কেনারাম নামক উদাসী ব্যক্তিটির বক্তৃতা, দ্বিজদাসের কানা টাকা পাওয়া, শ্মশানঘাটের পৈরু, আর ছোট মেয়ে, চিতায় সেই ছোট মেয়ের শবদাহ—সবই সত্য। বুলুর মৃত্যুর পর তিনি গল্পটি শেষ করেছেন। বলুর মৃত্যুর পরে সমাপ্ত হয়েছে বলেই গল্পটি বর্তমান রূপ লাভ করেছে। তা না হলে তার রূপাবয়ব ভিন্নতর হতো।

১৩৩৮ সালের বৈশাখে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হল 'ডাইনীর বাঁশী', আর 'বঙ্গশ্রী'-তে 'মেলা'। তার কিছুদিন পরের লেখা 'রাজা, রাণী ও প্রজা'।

১৯৩৩ সালে তারাশঙ্কর মনোহরপুকুর সেকেণ্ড লেনে একটি বাসা ভাড়া করলেন। পাকা দেওয়াল, টিনের ছাউনি। এখানেই তিনি তাঁর সাহিত্যিক জীবনের ভূমিকাপর্বকে অতিক্রম করলেন। তখন তিনি ঐ ঘরে থাকেন, হোটেলে খান, রাস্তার কল থেকে জল ধরে স্নান করেন, তৃষ্ণা মেটান। সতরঞ্জির উপর সুটকেস পেতে রাইটিং ডেস্‌ক্ করে নিয়ে লেখেন। এ ঘরে তিনি প্রায় দেড় বছর কাটিয়েছিলেন। শ্মশান বৈরাগ্য, ছলনাময়ী, মধু মাষ্টার, ঘাসের ফুল, দেবতার ব্যাধি, রঙিন চশমা, জলসাঘর, রায়বাড়ী, টহলদার, আখড়াইয়ের দীঘি, ট্যারা, তারিণী মাঝি, প্রতীক্ষা, দুইপুরুষের বীজ নুটু মোক্তারের সওয়াল প্রভৃতি তিনি এখানেই রচনা করেছিলেন। 'নারী ও নাগিনী' গল্পটি এ সময়ের হলেও লাভপুরে রচিত।

তারপর তাঁর জীবনে কত ঘাত-প্রতিঘাতের ঢেউ জেগেছে। তাঁর স্পর্শকাতর মন ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। মানুষের মহত্ত্বে তিনি পেয়েছেন আনন্দ। তাঁর চলার পথের বাঁকে বাঁকে আশানিরাশার কড়িকোমলে কত আকাশমাটির গান বেজেছে। অনরুণ অন্ধকারের প্রান্তরে বসে তিনি সূর্যের সাধনা করেছেন, বেদনার বেহালায় বেঁধেছেন নিশান্তক ভৈরবী। সে সাধন সংগীতের বিচিত্র-বিপুল অভিজ্ঞতাকে তিনি ধরে রেখেছেন কথাসাহিত্যের ভাণ্ডারে। এই বিচীত্রবীর্য ভাণ্ডারকে উপলব্ধি করার জন্য তাঁর জীবনের পরিবেশের প্রতি দৃষ্টি-পাত অপরিহার্য। কবিজীবনই কবিকথার গৌরচন্দ্রিকা। তাই তারাশঙ্করের ছোটগল্প আলোচনার ভূমিকা হিসাবে তাঁর জীবনকথার এ সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা।

॥ তিন ॥

কল্লোলের কাল ক্রূর কঠিন নিষ্ঠুর জীবনের নিরাভরণ প্রকাশের লগ্ন। কল্লোল গোষ্ঠী জীবনকে ঠিক যেমনটি দেখেছেন তেমনটি আঁকার চেষ্টা করেছেন। তারাশঙ্করের প্রাথমিক প্রয়াসও ছিল তাই। কিন্তু তাঁর সাধনা সে প্রয়াসের সীমাকে অতিক্রম করেছে। সে সীমাতিগ প্রয়াসেই তাঁর সার্থকতা। আলোক-চিত্র যেমন অঙ্কনশিল্প নয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদও তাই। এই সত্যোপ-লব্ধির ফলশ্রুতিতেই তাঁর সিদ্ধি।

কল্লোলের লেখকেরা সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

ছিলেন না। কিন্তু তারাশঙ্করের সঙ্গে রাজনীতির যোগ ছিল গভীর। তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী।

তুলনামূলকভাবে বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের উপস্থিতি বিলম্বিত। কিন্তু বিলম্বিত হলেও তাঁর দৃঢ় দৃপ্ত পদচারণা প্রথমাবধিই পরিণত মানসিকতার মহিমায় সুচিহ্নিত। সে মহিমান্বিত মানসিকতার অধিকারেই তাঁর রচনায় একটি স্বাদবৈচিত্র্য সঞ্চারিত হয়েছিল। পাঠকসাধারণ অনায়াসেই সে বৈচিত্র্য স্পর্শ করেছে।

কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার তারাশঙ্করের গল্প-সংকলন 'রসকলি'র সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন : "তারাশঙ্করের গল্পগুলিতে জীবনকে দেখিবার যে দৃষ্টিভঙ্গী তাহাই উৎকৃষ্ট কবিদৃষ্টি—বস্তুর বাস্তবতাকেই গ্রাহ্য করিয়া তাহার রসরূপ আবিষ্কার করায় যে কবি-মনোভাব, তাহার একটি অভিনব মৌলিক ভঙ্গী তাঁহার গল্পগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা কবিমানসের সেই সবল ও সুস্থ অপক্ষপাত যাহা জীবনের বিচিত্রতম অভিব্যক্তিকে একটি কেন্দ্রস্থির রসকল্পনার অধীন করিতে পারে ; পশু ও মানুষ, বন্য ও সভ্য, সুরূপ ও কুরূপ, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত এবং কোমল ও রুক্ষ, মেধ্য ও অমেধ্য, আদিম দুর্নীতি ও শিক্ষিত সুনীতি এই সকলের মধ্যেই তিনি জীবনের সেই একই রস-রহস্যের সন্ধান পাইয়া থাকেন।"

বাঙলা কথা-সাহিত্যে তারাশঙ্করের যে স্বাতন্ত্র্য তা মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের সমালোচনসূত্র সুস্পষ্ট। অনেক ছোট গল্পকারের ক্ষেত্রে গল্প বলার আর্ট গল্পকে ছাপিয়ে উঠেছে। বিষয়বস্তু সেখানে আঙ্গিকের সীমালগ্ন হতে পারে নি। তারাশঙ্কর প্রাধান্য দিয়েছেন বিষয়বস্তুকে। বাস্তব-প্রাধান্য তাঁর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। তিনি যা দেখেছেন, যা কিছুর মুখোমুখি দাঁড়াবার সুযোগ তাঁর জীবনে এসেছে প্রত্যক্ষভাবে, তাই তাঁকে উদ্দীপিত করেছে। তারাশঙ্করের এ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রধানত পল্লী-বাঙলার বুক থেকে আহৃত।

তাঁর আবির্ভাবের ক্ষেত্রে প্রস্তুত ছিল। নতুন মানুষ নতুন চরিত্র নিয়ে তিনি এলেন অতীত ঐশ্বর্যের রঙমহলে। রাঢ়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে তারাশঙ্করের মনে হল অতীতের বিপুল বিলাস ও প্রচণ্ড আদিম শক্তির কথা। জমিদার তন্ত্রে তখন ভাঙ্গন ধরেছে। ঐতিহাসিক নিয়মে বর্তমান যে অতীতের মহাসমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে, তারই মোহে তারাশঙ্কর মুগ্ধ। নতুনকালের বিজ্ঞান প্রবুদ্ধ আবি-

ভাবকে তিনি দেখতে চান নি। অধুনাতন মানসিকতার শাণিত অধিকার তিনি আত্মস্থ করেন নি। অতীত ঐশ্বর্যের শ্মশানসৌন্দর্য, তান্ত্রিক গুহ্য যোগ পন্থার আলৌকিক রহস্য, হৃতসর্বস্ব জমিদারতন্ত্রের বিপুলবীর্য মহিমার স্মৃতি তাঁর মনকে আধুনিকতার প্রতি আকৃষ্ট হতে দেয় নি। প্রাচীন ভারতকে তিনি জানতে চেয়েছেন, উপলব্ধি করতে চেয়েছেন, আত্মস্থ করতে চেয়েছেন। মহিমান্বিত প্রাচীনের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা।

অতীত তাঁর কাছে বিরাট দানবিক শক্তির বিপুলকায় ধ্বংসাবশেষ। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ অতীতের মধ্যে যে রোমাঞ্চ সন্ধান করেছেন, তারাশঙ্কর তা করেন নি। বিধ্বস্ত অতীতের আকর্ষণে তিনি উপস্থিত হয়েছেন বেদে, কাহার, বাউরী, বাগ্দীদের মধ্যে। তারাই বাঙলাদেশের আদিমতম বাসিন্দা। আর্য আগমনের আগে থেকেই তারা এদেশে বাস করে আসছে। এ আদিম মানুষের প্রতি তাঁর দৃষ্টি সুস্থির। তিনি যেখানে এ সব মানুষের কথা বলেছেন সেখানে তিনি মহৎ। এ সব মানুষ যখন আধুনিকতার আকর্ষণে ভিন্নতর জগৎ ও জীবনের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াচ্ছে, যেখানে পুরাতন মানুষের মানসিকতা ও জীবনচর্যা ভেঙ্গে ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, সেখানেই তাঁর সকরুণ দীর্ঘশ্বাস।

সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে আদিমতা, পাশবতার মধ্যে তারাশঙ্কর বীভৎসতার রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি সে আদিম বীভৎসের সীমাগণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে নি। তাঁর পথপরিক্রমা বেশীদিন মানসিক শূন্যতার গোলকধাঁধায় দিশাহারা হয় নি। ফ্যাসীবিরোধী আন্দোলনের সময় তিনি মার্কস্‌বাদী ভাবধারার আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের সান্নিধ্য নিয়েছিলেন। কিন্তু যে উপাদানে তাঁর সাহিত্যমন গঠিত, যে মাটির মোহনীল সংস্কার তাঁরে মনে-প্রাণে তা মার্কস্‌বাদের প্রতি তাঁর আকর্ষণকে দীর্ঘস্থায়ী হতে দেয় নি। ভারতীয় প্রাচীন ভাবাদর্শের দিকেই তাঁর সুদীর্ঘ পদসঞ্চার, নিষ্ঠাশীল আনুগত্য।

কল্লোলে তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হলেও কল্লোলগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর মানসিক সাধর্ম্য ছিল না। কল্লোলের সঙ্গে তারাশঙ্করের মনোবীণার যে সুরসঙ্গতি সাধিত হয় নি তার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত মহাশয় যথার্থই বলেছেন : "তারাশঙ্কর যে মিশতে পারেনি তার কারণ আহ্বানের

আন্তরিকতার অভাব নয়, তারই নিজের বহির্মুখিতা। আসলে সে বিদ্রোহের নয়, সে স্বীকৃতির, সে স্থৈর্যের। উত্তাল ঊর্মিলতার নয়, সমতল তটভূমির, কিংবা, বলি, তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের।"

তারাশঙ্কর সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমারের এ সিদ্ধান্ত একান্ত সত্য। তারাশঙ্কর তাঁর এ স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের জন্য রাজনৈতিক দিক থেকে গান্ধীবাদী। এজন্যই বর্তমানের বেদীমূলে অতীতকে বলিদান দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। শিউলি হলুদ অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করে বারংবার তাঁর দীর্ঘশ্বাস পড়েছে। জলসাঘর, ময়দানব, মাটি প্রভৃতি গল্পে ঝঙ্কৃত হয়েছে সে দীর্ঘশ্বাসের সকরুণ ক্রন্দনবাস্ত।

ফণি মিস্ত্রী ভেবেছিল তাকে ছাড়া কারখানা চলবে না। ম্যানেজার দিনরাত পরিশ্রম করে নিরুপায় হয়ে তার কাছে ছুটে আসবে। তারপর ফণি যাবে। স্পর্শ দেবে সে তার যাদুদণ্ডের, তারপর চলবে কারখানা। "অকস্মাৎ শব্দ-ধ্বনিতে ফণি চকিত হয়ে উঠল। গ্রাইণ্ডিং মেশিন ঘুরছে! কারখানা চলছে! তাকে ছেড়েও কারখানা চলছে! তার হাতে গড়া কারখানা তার বিনাস্পর্শে চলছে! সে ছুটে বেরিয়ে এল, ঢুকল গিয়ে কারখানায়।

দেখলে কারখানা জনশূন্য। শুধু ইলেক্‌ট্রিক শেডে দাঁড়িয়ে ম্যানেজার ও ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিনীয়ার। শুনেছিল পাওয়ারে কারখানা চলবে। আজ চলছে। সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। আর তাকে দরকার নাই। তারই হাতে গড়া কারখানা চলছে—অথচ তার হুকুম নেয় নি। কোনদিন আর নেবে না। কেউ আর তার মুখের দিকেও চেয়ে থাকবে না।...তার নিজের হাতে গড়া কারখানা—সেও তার বিনা হুকুমে চলছে; আর কোনদিন তার মুখের দিকে চেয়ে থাকবে না। ...শব্দধ্বনি-মুখর শেডের ঘূর্ণ্যমান যন্ত্রপাতির মধ্য দিয়ে সে চলে যাবে। আর সে এখানে থাকবে না। কারখানাটা আর তাকে চায় না।

যন্ত্রপাতির মধ্য দিয়ে সংকীর্ণ পথ। তার অত্যন্ত পরিচিত পথ। বিহ্বল মিস্ত্রীর চোখ জলে ঝাপসা হয়ে এল।...

হঠাৎ গ্রাইণ্ডিং মেশিনের ও-দিকটায়—যেখানে স্থূল আকারের বড় বড় কয়েকটা চাকা তীক্ষ্ণ দাঁতে দাঁতে মিলে ঘুরছে—সেখানকার শ্যাফ্‌টটা ঝাঁকি খেয়ে বার দুয়েক কেঁপে উঠল।...

মেশিন চলছে। রক্ত শুকিয়ে গেল—চাকায় থেকে চাকায় ঘুরে ঘুরে মাংসচিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেল; ফণির চর্বিতে শুধু যন্ত্রপুরীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত

পর্যন্ত মসৃণ স্বচ্ছন্দগামী করে দিলে। মেশিন চলছে স্বচ্ছন্দে, শব্দের মধ্যে কান পেতে শুনলে বোধ হয় ফণির মোটা গলার গান শোনা যাচ্ছে।"

ফণির (ময়দানব) জীবনবীণার নায়কী তারটিতে যে বেদনার সকরুণ রাগিনী কেঁদে কেঁদে উঠেছে তাকে দীর্ঘায়ত করেছে তারাশঙ্করের দীর্ঘশ্বাসের ক্রন্দনার্ত সঞ্চারিণী। বিজ্ঞানবাহন সভ্যতার বিপ্লবলীলায় তারাশঙ্করের স্থৈর্যবাদী মানসিকতা শঙ্কিত। তাই মেওয়ালালের (মাটি) বেদনার সঙ্গে তাঁর বেদনার একাত্মতা। যন্ত্রজাগরণ গৃহহীন ফকির মেওয়ালালের মত তিনিও পলিমাটির প্রসাদ মাখতে চান সর্বাঙ্গে। তাইতো মেওয়ালালের বক্তব্যে এত উচ্ছ্বাসের আন্তরিকতা: "কেন এলাম এখানে? রাস্তার ঘাটে—কোথাও এতটুকু মাটি নেই। ইটের—লোহার—পিচের উপর পা ফেলে শরীর কেমন শিউরে উঠছিল বাবুজী। গঙ্গাজীর ঘাটে বসে থাকতে থাকতে ওসব ভুলে গেলাম। মনে হল—এই ত সেই গঙ্গাজী! গঙ্গাজীর এই যে এখানে ঘোলা জল, ওই জলেই আছে ত আমার ক্ষেতের মাটি! ভাবছি এমন সময় ভাটি পড়ল গঙ্গায়। আমার দেশে ভাটি নাই, জোয়ার নাই। আমি অবাক হয়ে দেখলাম। জেগে গেল দুপাশে কাদামাটি, চিকচিকে বালি মেশানো মিহি পলি। ঠিক আমার ক্ষেতির মাটি। কি মনে হল—তুলে নিলাম খানিকটা মাটি, দু'হাতে ঘাঁটলাম, পিষলাম, নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকলাম। মনে হল অবিকল সেই মাটি। দু'হাত ভরে মাটি আমি তাল বেঁধে তুলে নিলাম—বাউরার মত।" স্বপ্ন-সম্মোহন অতীতের আকর্ষণে তারাশঙ্করের বাউল মন মুগ্ধ, বিস্ময়বিমূঢ়। তাই মেওয়ালালের দুঃখের সঙ্গে তাঁর সশঙ্কচিত্তের বেদনার্তি এমনিভাবে এক হয়ে মিশে গেছে।

তারাশঙ্কর রুদ্রের উপাসক। ধূলিধূসর ধূম্রপিঙ্গল তপঃক্লিষ্ট তপ্ততনু বীরভূমের মাটির মহিমা মেখে বাঙলা সাহিত্যলোকে কথাশিল্পী তারাশঙ্করের রূঢ় রুক্ষ পদক্ষেপ। ঐ বৈশিষ্ট্যভাস্বর ব্যক্তিত্বের জন্য তিনি যে যন্ত্র বেছে নিয়েছেন তাতে কোমলের মধুর ঝঙ্কার আত্মপ্রকাশের অবকাশ পায়নি।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় নৈরাজ্যের উপকূলেই তাঁর উপনিবেশ। কিন্তু একটু গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যাবে তিনি নিঃসন্দেহে আস্তিক্যবাদী। তাই তাঁর বিশ্বাস, পাপীর উপর সহস্রাক্ষ সর্বদর্শী বিধাতার দণ্ড নেমে আসে অনিবার্যভাবে। 'আখড়াইয়ের দীঘি'র কালী বাগ্দীর জীবনে এমনিভাবেই নেমে এসেছে পাপের চরমদণ্ড। কালী বাগ্দী জীবনে কত মানুষ খুন করেছে তার হিসাব নেই।

তারই জবানবন্দী : রাত্রির পর রাত্রি চামড়ার মত পুরু অন্ধকারে গা ঢেকে কুলার ঘাঁটিতে ওৎ-পেতে বসে থেকেছি। মদের নেশায় মাথার ভিতরে আগুন ছুটত! সে নেশা ঝিমিয়ে আসতে পেত না। পাশেই থাকত মদের ভাঁড়। সে ভাঁড়ে চুমুক দিতাম। অন্ধকারের মধ্যে পথিক দেখতে পেলে বাঘের মত লাফ দিয়ে উঠতাম। হাতে থাকত 'ফাব্‌ড়া'—শক্ত বাঁশের দু' হাত লম্বা লাঠি। সেই লাঠি ছুঁড়তাম মাটির কোল ঘেঁসে। সাপের মত গোঙাতে গোঙাতে সে লাঠি ছুটে গিয়ে পথিকের পায়ে লাগলে আর তার নিস্তার ছিল না। তাকে পড়তেই হত। তারপর একখানা বড় লাঠি তার ঘাড়ের উপর দিয়ে চেপে দাঁড়াতাম, আর পা দুটো ধরে দেহটা উল্টে দিলেই ঘাড়টা ভেঙ্গে যেত! এ নরহত্যার পরিণাম পুত্রহত্যায়। কালী বাগ্দীর দণ্ডাদেশে বিচারক যে কথা লিখেছিলেন তা তারাশঙ্করেরও রায় : "যুগ-যুগান্তরের সাধনায় মানুষ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া ন্যায় অন্যায়ের সীমারেখার নির্দেশ করিয়াছে। তাঁহারই নামে সৃষ্টি ও সমাজের কল্যাণে অন্যায় ও পাপের রোধ হেতু দণ্ডবিধির সৃষ্টি হইয়াছে। ঈশ্বরের প্রতিভূস্বরূপ বিচারক সেই বিধি অনুসারে অন্যায়ের শাস্তিবিধান করিয়া থাকেন। এই ব্যক্তির যে অপরাধ, বর্তমান রাষ্ট্রতন্ত্রের দণ্ডবিধিতে তাহার যোগ্য শাস্তি নাই। এক্ষেত্রে একমাত্র চরম দণ্ডই বিধি। আমার স্থির বিশ্বাস, সেইজন্য সমস্ত বিশ্বের অদৃশ্য পরিচালক তাহার দণ্ডবিধান স্বয়ং করিয়াছেন।"

'অগ্রদানী' গল্পের নায়ক পূর্ণ চক্রবর্তীর পরিণাম রূপায়ণেও তারাশঙ্করের এ মনোভঙ্গি সুস্পষ্ট। পূর্ণ চক্রবর্তী জৈব আসক্তির মূর্ত প্রতাক। কুৎসিৎ তার পিপাসা। কুৎসিৎ ও বীভৎস না হলে যেন তারাশঙ্করের হাতে চরিত্রগুলির প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হচ্ছে না। তারা যেন ইতিহাসের ওপার থেকে এসে উপস্থিত হয়েছে। অতীতের মহিমা কালের ক্ষতচিহ্নে বিকৃত। পঙ্গু অতীতের ধ্বংসাবশেষ অশোভন, কুৎসিৎ, ক্লেদাক্ত। পূর্ণ চক্রবর্তীর জৈবসর্বস্বতায় ক্লেদকীর্ণ ক্ষুধার সর্বগ্রামী প্ররোচনা। আপন সন্তানকেও ভাসিয়ে দেয় সে বুভুক্ষার বন্যায়। সে বিসর্জনের বাজনা দ্রুততম লয়ে বেজে উঠেছে 'অগ্রদানী'র উপসংহারে। আপন সন্তানের হাতে পিণ্ড ভোজন করেও তার লোলুপতার তৃপ্তি হয় নি। শ্যামদাসবাবুর বংশধর হিসাবে পরিচিত তারই পুত্রের শ্রাদ্ধবাসরে বিধবা পুত্রবধূ তার হাতে পিণ্ডপাত্র তুলে দিল। পুরোহিত বললে : 'খাও হে চক্রবর্তী'। কৃতকর্মের কী অমোঘ শাস্তি।

বর্ষণমুখর পরিবেশের কারুণ্যনিবিড়তায় 'ইমারত' গল্পটির পরিণাম রচিত হয়েছে।—

ঝপঝপ বৃষ্টি নেমে আসছে।

আসুক।

জনাব তাকালে মাথার উপরে—বুড়া বটগাছের পাতায় পাতায় ঢাকা গোল গম্বুজের মতো মাথার দিকে। খোদাতালার নিজের হাতে গড়া ইমারত।

অনুভূতির সত্যতায় ও কলাবিধির বাস্তবতায় গল্পটি যেখানে সার্থক হয়ে উঠেছে, তারাশঙ্করের জীবনবোধ সেখানে শান্তি ও ভক্তির মধ্যে স্বস্তি খুঁজেছে। জনাবের পরিণাম গল্পকারের ব্যক্তিসত্তাকে অনাবৃত করেছে। 'কামধেনু' গল্পটির মধ্যেও ঐশ্বরিক অনুভূতির অলৌকিকত্ব মুখ্য।

পাপের প্রস্তরস্তূপের অন্তরাল থেকে মহতের অহল্যা মহিমাকে আবিষ্কার করতে তিনি প্রবৃত্ত হন নি। বাস্তবের অভিজ্ঞতা থেকে আহৃত উপাদানে গল্প রচনা করার ক্ষমতাই তারাশঙ্করের অসাধারণ। অপ্রত্যক্ষকে মহাপ্রাণের অধিকার দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। প্রত্যক্ষকে আশ্চর্যতম রূপে বিলসিত করে তোলার ক্ষেত্রেই তিনি অনন্য।

তারাশঙ্করের আঞ্চলিক মন হাড়ী, বাউরী, কাহার, বেদে, বাদ্যী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে তাঁর ছোট গল্পের চরিত্রগুলিকে আহরণ করার চেষ্টা করেছে। তারাই এ দেশে প্রাচীনের উত্তরাধিকারী। অতীতের প্রতি যে তাঁর অপরিসীম মোহ। খুনী কালী বাদ্যী (আখড়াইয়ের দীঘি), জৈব-জীবনসর্বস্ব পূর্ণ চক্রবর্তী (অগ্রদানী), সাপিণীর সতীন জোবেদা, কদাচারী খোঁড়া শেখ (নারী ও নাগিণী), হিংস্র নিষ্ঠুর শম্ভু বাজীকর, উগ্র মদির মোহিনী রাধিকা বেদেনী, বেদের ছেলে কিষ্টো বাজীকর (বেদেনী), কৃত্তিবাসের ছেলে পঙ্খী (তমসা), আগুনের শিখা রতনলাল (শেষকথা), জেলের ছেলে দুর্ধর্ষ পশুপতি (প্রত্যাবর্তন), করমচার মত রাঙা চোখ ছ' ফুট লম্বা রতন হাড়ী (ব্যাঘ্রচর্ম) দাগী চোর ইস্কাপন (ইস্কাপন), ভূতের মতো বীভৎস-দর্শন মতিলাল ভালুক, মতিলালের বৌ পেত্নীর মত ভুবন (মতিলাল), বাজীকরী রমার দল (যাদুকরী) প্রভৃতি চরিত্র বিলুপ্ত অতীতের অন্ধকার মেখে হাজির হয়েছে। তাদের জীবনে

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিয়াছেন, তাঁহার কথায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একখানি পুস্তকের প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন—তাহা আর মুদ্রিত করেন নাই। কেদারবাবুর কথা সর্বজনবিদিত।

শীতলাকান্ত যখন তরুণ, তখন পাঞ্জাবের সর্দার দয়াল সিংহ পঞ্জাবে প্রথম ভারতীয়দিগের ইংরাজী সংবাদপত্র প্রচার করিতে উদ্যোগী হইয়া সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক মনোনীত করিতে বলিলে সুরেন্দ্রনাথ ইঁহাকে নির্বাচিত করিয়া লাহোরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তথায় তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন ও লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার স্মৃতিকথায় প্রশংসা সহকারে শীতলাকান্তের নামোল্লেখ করিয়াছেন। শীতলাকান্ত "বালকে" সমসাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিতেন। তাঁহার বাঙ্গলা রচনা কিরূপ সুখ-পাঠ্য হইত, তাহার পরিচয়—"বালকে" শেষ রচনা—পঞ্জাবী লোক-কথা—"জাঠ ও বেনে"। অল্পবয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। বোধ হয়, অতিশ্রমই সেই অকাল মৃত্যুর কারণ।

"বালকে" প্রথম সংখ্যা হইতেই প্রতিভাসুন্দরী দেবী গান শিক্ষা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। দ্বিতীয় সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" গানের প্রথম ছয় চরণের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। বাঙ্গলায় তাহাই ঐ সঙ্গীতের প্রথম প্রকাশিত স্বরলিপি। সঙ্গে একখানি চিত্র ছিল—বহুসন্তান-পরিবেষ্টিতা মাতৃমূর্তি।

আমরা যে পরিচয় দিলাম, তাহাতেই স্বল্পায়ু "বালক" পত্রের সাহিত্যিক গুরুত্ব বুঝিতে পারা যাইবে। আমাদের মনে হয়, ভবিষ্যতে—যাঁহারা বাঙ্গলা সাহিত্যিকদিগের সাধনার ক্রমবিকাশের—বিশেষ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিভার ক্রমোন্নতির ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে চেষ্টা করিবেন, "বালক" তাঁহাদিগের অবশ্য পাঠ্য হইবে।

প্রয়োজনবোধে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ শেষ করিব। "বালকের" শেষ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের "সত্য" দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার এক স্থানে ছিল :—

"আমাদের জাতি যেমন সত্যকে অবহেলা করে এমন আর কোন জাতি করে কিনা জানি না। আমরা মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া অনুভব করি না। মিথ্যা

যোগেন্দ্রনাথ সাহা, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ব্যতীত যে সকল তরুণ লেখক-লেখিকা পরবর্তীকালে সাহিত্যে সমৃদ্ধি সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, প্রিয়নাথ সেন, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়। সুধীন্দ্রনাথ পরে 'সাধনার' সম্পাদক হইয়াছিলেন। সরলা দেবী 'ভারতীর' সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার একাধিক গান জনপ্রিয় হইয়াছিল। বলেন্দ্রনাথ প্রসিদ্ধ সাহিত্য-শিল্পীদিগের মধ্যে অন্যতম হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অকালমৃত্যু সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতির কারণ।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সব্যসাচী ছিলেন। বাংলা ও ইংরেজীতে—বহু পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। উঁহার Reflections and Reminiscences. নামক সুখপাঠ্য স্মৃতিকথা পাঠ করিলে মনে হয়, তাঁহার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রায় কাহারও শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জনে তিনি বিফলমনোরথ হন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সতীর্থ ছিলেন এবং লাহোরে যাইয়া তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার এই পুস্তক ভবিষ্যতে সমাজের ও রাজনীতিক পরিবর্তনের ঐতিহাসিকের নিকট মূল্যবান উপকরণের খনি বলিয়া বিবেচিত হইবে।

তরুণ বয়সে তিনি করাচীতে যাইয়া সাংবাদিকের কাজ করিতে থাকেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সাংবাদিক ছিলেন—তাঁহার লেখনী কখনও বিশ্রাম জানিত না। বাঙ্গলায় তিনি বহু উপন্যাস ও ছোট গল্প লিখিয়া গিয়াছেন এবং সে সকল আদর লাভ করিয়াছে। বাঙ্গলা ছোটগল্প লেখকদিগের মধ্যে তিনি অগ্রণীদিগের অন্যতম। তিনি বোম্বাই, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও বাঙ্গলা—চারি প্রদেশেই সাংবাদিক রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বহু বাঙ্গলা প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বাঙ্গলা সাহিত্যে একটি বিশেষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত একযোগে বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহভাজন ছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

প্রিয়নাথ সেন বহুভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি সাহিত্যের জহুরী ছিলেন।

আমরা ইহা বুঝিয়াছিলাম, বহুদিন পরে—স্বদেশী আন্দোলনের সময় যখন আমরা সেই উপকরণের সদ্ব্যবহার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তখনও প্রবীণ নেতারা ও ভক্তগণ "হিংসার" ভয় দেখাইয়া তাহার ব্যবহারের বিরোধিতা করিয়াছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর জাহাজের নাম ছিল :—

(১) ভারত (২) বঙ্গলক্ষ্মী (৩) লর্ড রিপন (৪) স্বদেশী। যাঁহারা বরিশালে নানাভাবে স্বদেশী সাধনার সহায় হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অশ্বিনীকুমার দত্ত অন্যতম। বরিশালে "জাতীয় সংকীর্তন" তখন যেমন স্বদেশীভাব জাগাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল—পরে তেমনই মুকুন্দ দাসের যাত্রায় সে কাজ হইয়াছিল। সংকীর্তনের উদ্দেশ্য অশ্বিনীবাবু একখানি টুলের উপর দাঁড়াইয়া জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

সংকীর্তনের একটি গান :—

"কে কোথায় আছিস ভাই, আয়রে সকলে গাই,
প্রাণের সঙ্গীত আজি কাঁপায়ে গগন।
বেঁধে আজি প্রাণে প্রাণে শতকণ্ঠে একতানে
সবে মিলে গাই গীত মৃতসঞ্জীবন।
(ও ভাই) দেখ সব ঘুমিয়ে অচেতন হয়ে
দেশের দশা একবার করে না স্মরণ।
(মোরা) সবারে জাগাব দুর্দশা ঘুচাব
নিদ্রাগত প্রাণে আনিব চেতন।
"ভিন্ন ভিন্ন জাতি মিলে দিবারাতি
ভাই ভাই হয়ে করিব সাধন।
দেখ্‌বে দেশে দেশে এ ভারতে মিশে
কত জাতির হ'ল প্রেমেতে মিলন।"

* * *

"বালকে"র কয়েকজন লেখক-লেখিকাকে পরে আর আমরা সাহিত্যক্ষেত্রে দেখিতে পাইনা।

নগেন্দ্রবালা দেবী, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র দত্ত, হৃদয়নাথ মুখোপাধ্যায়, ভুবনমোহন মিত্র, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ,

পরবশ্যতা জাতিকে পঙ্গু করিয়া তাহার উন্নতির উপায় নষ্ট করে। পরে যেমন—তখনও তেমনিই বাঙ্গালী তরুণরা দেশের সকল উন্নতিজনক-কার্যে উৎসাহী। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন :—

"আমরা বড়ই সাবধানী জাত। অতি-সাবধানটা ভাল নয়। ইংরেজরা আমাদের বুঝে নিয়েছে। তুমি অবশ্য জান, এখানে আমার যেমন জাহাজ চলবে তেমনি ফ্লোটিলা কোম্পানি নামক একটি ইংরেজ কোম্পানীর জাহাজ চল্‌বে। আমাদের উভয়ের মধ্যে খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা চল্‌বে। ফ্লোটিলা কোম্পানীর অনেক খরচপত্র লোকজনের ব্যয়, কিন্তু তারা প্রায়ই যাত্রী পায় না। অধিকাংশ যাত্রী আমাদের জাহাজে যায়। তাদের বিস্তর ক্ষতি হচ্ছে তবু তারা সমান নিয়মিতভাবে জাহাজ চালাচ্ছে।—যত্নের একটু ত্রুটি কিম্বা শৈথিল্য করে না। আর, তারা প্রকাশ্যভাবে বলে—বাঙ্গালীর অধ্যবসায় নাই। তাহারা আমাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে কতদিন জাহাজ চালাতে পারবে। এখানে আমাদের জাহাজ যাতে স্থায়ী হয় তার জন্য এখানকার লোকের—বিশেষতঃ ইস্কুলের ছাত্রদের অপরিসীম উৎসাহ ও যত্ন। এমন উৎসাহ আমি কখনও দেখিনি। তাদের ভাব দেখে চমৎকৃত হতে হয়। প্রত্যহ খুব ভোরে আমাদের জাহাজ এখান থেকে যাত্রী নিয়ে খুলনায় যায়। ফ্লোটিলা কোম্পানীর জাহাজও সেই সময় যায়। পাছে আমাদের জাহাজে লোক না গিয়ে প্রতিপক্ষের জাহাজে যায় এইজন্য কতকগুলি ভদ্রলোক ও ইস্কুলের ছাত্র রাত্রি ৪টার সময় উঠে দলবদ্ধ হয়ে উৎসাহের সহিত জাহাজের ঘাটে প্রত্যহ উপস্থিত হন ও যদি কোন যাত্রী প্রতিপক্ষের জাহাজে যেতে চান, তাকে অনেক প্রকার বুঝিয়ে—এমন কি পায়ে পর্যন্ত ধরে ফিরিয়ে আনেন। এমন কি যে জেটি বোটে করে প্রতিপক্ষের জাহাজে লোক উঠ্‌ছে সেখান পর্যন্ত গিয়ে তাদের বুঝাতে থাকেন।"

পাঠ করিলে মনে হয়, কতদিন—কতকাল আমরা মোহবশে এই উপাদানের সদ্ব্যবহার করিতে পারি নাই—নহিলে বহুদিন পূর্বেই আমরা অর্থনীতিক ও রাজনীতিক মুক্তিলাভ করিতে পারিতাম। আমরা তাহা করি নাই। সে দোষ নেতৃবৃন্দের। আমাদের এই ত্রুটিতে রামপ্রসাদের সেই গান মনে পড়ে :—

"মন, তুমি কৃষিকাজ জান না—
এমন মানব-জমিন রইল পড়ে
আবাদ করলে ফল্‌ত সোনা॥

কিন্তু ওদিক আবার সিংহের মামা ভোম্বল জাপানে আছেন। কাজেই তাহা হইয়া উঠে না।

"সিংহ-শরীরের অভ্যন্তরে যে চিত্রের আভাস দেখা যাইতেছে ইহার অর্থ কি?

"ইহা ভারতের ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট পুরুষ। যে বঙ্গদেশ সিংহের পাকস্থলীর মধ্যে (কারণ বাঙ্গালীকে সিংহ যতটা হজম করিয়া ফেলিয়াছে এমন আর কাহাকেও না) সেই বঙ্গদেশেই অদৃষ্ট পুরুষের মস্তক দেখা যাইতেছে। জিহ্বা-সাত্রী বাক-সর্ব্বস্ব বাঙ্গালীর বুদ্ধি ঐ মস্তকে জাজ্বল্যমান। উত্তর-পশ্চিমে অদৃষ্ট পুরুষের বাহু কেন প্রসারিত তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। বোম্বাই মাদ্রাজে অদৃষ্ট পুরুষের পদদ্বয় কেন প্রসারিত তাহা কি বলিতে হইবে? গতিবিধি বাণিজ্যের প্রাণ—সুতরাং পদদ্বারা বাণিজ্য সূচিত হইতেছে।

"চিত্রটি ভাল করিয়া দেখ, দেখিবে উহার রেখা সকল বিচ্ছিন্নভাবে আছে। যেদিন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমস্ত অংশ পরস্পর সংলগ্ন হইবে—মস্তকের সহিত বাহু ও চরণ জোড়া লাগিবে—সমস্ত মিলিয়া একটি সমগ্র শরীর গঠিত হইবে, সে দিন কি শুভ দিন!"

(৩) যাঁহারা বাঙ্গলার (তথা ভারতের) স্বাধীনতার ইতিহাসের ইতিহাস জানিতে চাহেন, তাঁহাদিগের পক্ষে "বরিশালের পত্র" অবশ্য পাঠ্য। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একখানি জাহাজের খোল কিনিয়া আনিলেন। শেষে তাহা পূর্ণ হইয়াছিল, ঋণে ও সর্ব্বনাশে। জোতিরিন্দ্রনাথ বিদেশী ব্যবসায়ীদিগের সহিত জাহাজ চালানর প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার ত্যাগ জাতির পক্ষে পরম সম্পদ হইয়াছিল। "স্বদেশী আন্দোলনের" বহুদিন পূর্ব্বে তিনি আপনার ত্যাগের উপর স্বদেশী মনোভাবের উদ্ভব সম্ভব করিয়াছিলেন। সে কাজে যে তিনি অগ্রণী (অন্ততঃ সমস্ত ভারতে অগ্রণীদিগের অন্যতম) তাহা অনেকেই জানেন না—স্বদেশীর কথায় তাঁহার নামোল্লেখ হয় না! বরিশাল পর্যন্ত তাঁহার জাহাজ যাতায়াত করিত। এই "বরিশালের পত্রে" তিনি ভারতের অর্থনীতিক উন্নতির অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তখনও অনেক বুঝিতে পারেন নাই, রাজনীতিক পরবশ্যতা সহজে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু অর্থনীতিক পরবশ্যতা রাজনীতিক পরবশ্যতা অপেক্ষা ভয়ানক। অর্থনীতিক

বুদ্ধি—সূক্ষ্ম রুচি ও অসাধারণ দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। বঙ্কিমবাবুর চোখে বহির্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পায়। * * * নেতার লক্ষণ ইহার মুখে জাজ্বল্যমান। ইঁহার খড়্গ নাশা, লম্বা চাপা ঠোঁট, তীক্ষ্ণ চোখ লইয়া ইনি কাহারও উপর যাইয়া পড়েন, তবে সে হতভাগ্য বজ্রাঘাতের মর্ম্ম বুঝিতে পারে।"

(২) "নব্যভারতের মানচিত্র" প্রবন্ধের তাৎপর্য অসাধারণ। যে সময় ইহা লিখিত হয়, তখন আফগানিস্থানের (চিত্রে "কণ্ঠতরু") ওদিক হইতে রাশিয়া (ভল্লুক) সিংহ (ইংলণ্ড) কবলিত ভারতের দিকে লোলুপ দৃটিপাত করিতেছে পাঁজরের নিকটে রাশিয়ার ঘাঁটি স্থাপনের কথা শুনা যাইতেছে। সিংহ কবলিত ভারতে "ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট পুরুষের" বিচ্ছিন্ন দেহ দেখা যাইতেছে—দেশ ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

"ভারতের মানচিত্র একবার ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখ দেখি—সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিতে পাইবে এবং ভারতের গর্ভে ভবিষ্যৎ কিরূপে অল্পে অল্পে গঠিত হইতেছে, তাহার আভাস পাইবে।

"ভারতের সে দেবাকৃতি এখন আর নাই—

ধ্যান-ধারণা ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আধ্যাত্মিক ভাব এখন কোথায়? এখন ভারত পশু আকারে পরিণত—ধর্ম্মবলের স্থানে পাশব বলের আধিপত্য দেখা যাইতেছে। পশুরাজ সিংহ ভারতকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছে।

"একপারে সিংহ আর একপারে রুষ্ট ভল্লুক, মধ্যে একটা বৃক্ষ। কণ্টক বৃক্ষের অন্তরাল হইতে ঋক্ষ মহাশয়কে দেখিতে পাইয়া সিংহরাজ হিমালয়রূপ জটা ফুলাইয়া, পঞ্জাবচক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, সচকিত সিমলা-কর্ণ খাঁড়া করিয়া, সিন্ধু-নাসারন্ধ্র ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া বিকট গর্জ্জন করিতেছেন। অপরদিকে ধূর্ত্ত রুষ্ট ভল্লুক গুড়িগুড়ি এক এক পা করিয়া অগ্রসর হইয়া একটা পঞ্জরে (Panjeb) থাবা মারিয়াছে।

"স্থানাভাবযুক্ত সিংহের সমস্ত শরীরটা আঁকা যায় নাই। স্থান থাকিলে আমরা দেখাইতে পারিতাম, সিংহের লেজ আল্পস পর্যন্ত লম্বমান। সিংহের বড় দুঃখ এই, লেজটি ভাল করিয়া আস্ফালন করিতে পারিতেছেন না। এক একবার ইচ্ছা হইতেছে, বরাবর চীনের গা ঘেঁসিয়া লেজটি আরামে উত্তোলন করেন।

যাইতে মানস সরে কারো না মানস সরে,
আছে তারা এমনি আরামে।"

দ্বিজেন্দ্রনাথের পরে সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁহার "গাও ভারতের জয়" গান একদিন বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এই গান সম্বন্ধে 'বঙ্গদর্শনের' উক্তি—

"এই মহাগীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক, হিমালয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক, গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু গোদাবরীতটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক, পূর্ব্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জ্জনে আদ্রীভূত হউক, এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়-যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।"

"বন্দে মাতরম" সঙ্গীত সম্বন্ধে অরবিন্দ লিখিয়াছেন—

In a sudden moment of awakening from long delesions the people of Bengal looked round for the truth and in a fated moment somebody sang BANDE MATARAM. The montra had been given and in a single day a whole people had been converted to the religion of patriotism." তাহার পূর্ব্বে রমেশচন্দ্র দত্ত একদিন—বোম্বাই প্রদেশে সত্যেন্দ্রনাথের গান গীত হইতে শুনিয়া লিখিয়াছিলেন—উহাই আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হইতেছে।

"বালকে" সত্যেন্দ্রনাথের বোম্বাই সম্বন্ধীয় কয়টি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেইগুলি বিস্তৃত হইয়া "বোম্বাই চিত্র" নামক মনোজ্ঞ পুস্তকে পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীই "বালকের" সম্পাদিকা ছিলেন।

ইহার পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা। "বালকে" তাঁহার নানা বিষয়ক ১০টি রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সকলের মধ্যে কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) "মুখচেনা"—মানুষের মুখ, চোখ, নাক, প্রভৃতিতে মানুষের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারা যায়। বঙ্কিমবাবুর কপালের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে—বঙ্কিমবাবুর অসাধারণ নাক। এই নাকে সুরুচি, অভিনিবেশ, মানব-চরিত্র—জ্ঞান ও অসাধারণ উদ্যম প্রকাশ পায়। তাঁহার ওকালতি কাজ সত্বেও উপর্য্যুপরি এত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যে তিনি লিখিতে পারিয়াছেন, সে কেবল তাঁর নাকের জোরে। * * * বঙ্কিমবাবুর ঠোঁট খুব সরু—ইহাতে কার্যকরী

আছেন আরেক জন পালোয়ান মিঞা
নাম খুব জাঁকালো—পিঠে পালান ঞ ॥
পালানে হেলান দিয়া পাকাইয়া ল্যাজ
ঝিমোয় রাত্রির দিন—এই তার কাজ ॥
গেরদা ঠেসান দিয়া আলবোলা ফোঁকে
ঢুলিয়া পড়েছে ঘাড় আফিমের ঝোঁকে ॥
কোন কাজ যদি তারে দেখিনু করিতে !
এত তার কেরামত চৈতন্য-চরিতে ॥
ঞ আর অন্তঃস্থ ব—মিছে এক দায় !
পেনসন দিয়া দোঁহে করিনু বিদায় ॥
হল কলেবর হতে ঝাড়ি গেল বিষ
চৌত্রিশের দুই গেল রহিল বত্রিশ ॥

"বালকে" গ্রন্থ সমালোচনায় দ্বিজেন্দ্রনাথ অনুবাদ সম্বন্ধে যে নির্দেশ দিয়াছেন, তাহা অবশ্যগ্রাহ্য—"অনুবাদকদের পক্ষে ভাষার প্রাঞ্জলতা রক্ষা করা যেমন আবশ্যক—মূলের সহিত ঐক্য রক্ষা করাও তেমনি আবশ্যক, বরং ভাষার, এদিক ওদিক করা চলে—মূলের সহিত অনৈক্য রক্ষা কিছুতেই চলে না।

এই নিয়ম তিনি তাঁহার অনুবাদে কিরূপে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মেঘদূতের অনুবাদ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় :—

"কুবের আলয় ছাড়ি উত্তরে আমার বাড়ী,
গিয়া তুমি দেখিবে সেথায়—
সম্মুখে বাহির দ্বার বাহার কে দেখে তার
ইন্দ্রধনু যেন শোভা পায়।
পার্শ্বে এক সরোবর, দেখা যায় মনোহর,
পদ্ম সনে ভাবি করে ঠাট।
তাহার একটিধারে অপরূপ দেখিবারে
পরকাশে মণি বাঁধা ঘাট।
সরসীর স্বচ্ছজলে ভাসি ভাসি দলে দলে,
হংস হংসী ভ্রমে অবিশ্রাম।

করিতে হইত। এই ক্ষুদ্র রচনায় রবীন্দ্রনাথের কবিসুলভ উপমাপ্রিয়তার পরিচয় অনেক। যথা ঃ—

(১) "পাতলা লম্বা শুক্‌নো সাদা ঘাসগুলো কেমন যেন কাশ ফুলের মত দেখাইতেছে।"

(২) গাছের তলা দিয়া দিয়া একটুখানি শীতল নির্ঝর রেখা যেমন ছায়ায় ছায়ায় কুল্‌কুল্ করিয়া যায়, জীবন তেমনি করিয়া যাইতেছে।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দার্শনিক খ্যাতি তাঁহার কবি খ্যাতিকে ফুটিতে দেয় নাই। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার "স্বপ্নপ্রয়াণে" ছন্দের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়াছেন এবং তাঁহার মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, তিনি কিরূপ উন্নতস্তরের কবি। তাঁহার অনুবাদ মেঘদূত পাঠ করিলে তাহা যে মূল নহে—অনুবাদ, ইহা মনে হয়না। "স্বপ্নপ্রয়াণে" তিনি নিজপরিচয়ে ভ্রাতাদিগের নামোল্লেখ করিয়াছেন ঃ—

"ভাতে যথা সত্য হেম, আছে যথা বীর,
গুণজ্যোতি হরে যথা মনের তিমির।
নব শোভা ধরে যথা, সোম আর রবি,
সেই দেব নিকেতনে বাস করে কবি।"

সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ সকলেই তাঁহার মত বাঙ্গলা সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়াছেন এবং "বালকে" তাঁহারই মত সত্যেন্দ্রনাথের, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথের রচনা পাওয়া যায়। বীরেন্দ্রনাথের পুত্র বলেন্দ্রনাথ পরে বাঙ্গলা সাহিত্যে আপনার স্বতন্ত্র আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন। "বালকে" বালক বলেন্দ্রনাথের রচনা আরম্ভ বলিয়া মনে হয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ "বালকে" বাঙ্গলা রেখাধর বর্ণমালার (সর্ট হ্যাণ্ড রাইটিং) প্রবর্তন করেন। শুভঙ্করের "আর্যার" মত তাহা কবিতায় বর্ণিত। আরম্ভে বর্ণের সংখ্যাহ্রাস করিবার জন্য "অন্তস্থ ব" ও "ঞ" বর্জন করা হয়—

"চৌত্রিশটি হল বর্ণ, তা'র মধ্যে দুটি
কোন কাজ নাহি করে, বারোমাস ছুটি ॥
দুই ব র এক ব তো কিছুই না করে,
অথচ অন্তঃস্থ বলি খ্যাত চরাচরে ॥

অর্থ বুঝিতে পারি—কিন্তু মেয়েরা কেন যে পরীক্ষা দিবে তাহার কোন অর্থ বুঝিতে পারি না। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য, লেখক "আমারই লাঠী ঘুরাইয়া আমাকেই বিলক্ষণ শিক্ষা দিয়াছেন।" আর আষাঢ় সংখ্যায় যে "লাঠালাঠি" প্রকাশিত হয়, তাহার লেখক—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরবর্তী-কালে স্বনামধন্য। কেদারবাবু রঙ্গ করিয়া বলিতেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লাঠালাঠি করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনাটিতে যেমন, কেদারবাবুর রচনাটিতেও তেমনই মুন্সিয়ানার বনিয়াদ লক্ষ্য করা যায়। উভয় লেখকই আমাদের দারিদ্র্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন—সে জন্য বেদনানুভব করিয়াছিলেন। কেদারবাবুর রচনায় গঠনমূলক প্রস্তাব ছিল। কেদারবাবু ব্যায়ামে ব্যাঘাত হেতু তাঁহার দুইটি "অঙ্কুরের মত বন্ধুর" ১৮।১৯ বৎসর বয়সে ক্ষয়কাশে প্রাণত্যাগের কথা বলিয়া শেষে মন্তব্য করেন :—

"তবে এ ব্যাঘাত নিবারণের এক উপায় আছে। বোধ করি তাহা হইলে সুখী হওয়া যায়। যেরূপ বাল্যাবস্থায় ব্যায়ামের চর্চা হইতেছে—তৎসঙ্গে সঙ্গে আবশ্যকীয় শিল্পশিক্ষা হওয়া উচিত। যাহাতে কেহ ছুতারের, কেহ কামারের কেহ স্বর্ণকারের, কেহ ঘড়ির, কেহ লোহাখানার প্রভৃতি কার্য শিখিতে পারে তাহার পথ প্রশস্ত হউক। তাহা হইলে চিরকাল স্বাধীন পরিশ্রমে, আমরাও নূতন নূতন উৎসাহে দিনপাত করিতে পারিব। নতুবা সকসেই ভাবিয়া আছি, কেরাণী হইব—পূর্ণমাত্রায় দাসত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইব ; 'পোড়ের ভাত ও ধোয়া মুগের ডালের একটু নূনলঙ্কাবিবর্জিত ঝোল খাইয়া অম্ল ও অজীর্ণ দমন করিব—এরূপ অবস্থায় কয় জনের ব্যায়াম চর্চার স্ফূর্তি জন্মায় ?"

এই বিতর্কে আর একজন যোগ দিয়াছেন। তাঁহার নাম পাওয়া যায় না। তবে তাঁহার রচনা ("পরীক্ষা")—"বালিকার রচনা" বলিয়া প্রকাশিত হইয়া-ছিল। সরলা দেবীর আর একটি রচনা "বালিকার রচনা" বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে মনে হয়—তিনি ইহার লেখিকা। তখন তিনি "য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষার্থিনী"ও বটেন। তিনি বালিকাদিগের পরীক্ষাও সমর্থন করেন। তিনি বলেন, "আমি যতদূর জানি তাহাতেও মনে হয় যে বিদ্যাশিক্ষা করাই মেয়েদের পরীক্ষা দিবার একমাত্র উদ্দেশ্য।"

রবীন্দ্রনাথের "দশদিনের ছুটি"—হাজারিবাগ ভ্রমণের বিবরণ। তখন হাজারিবাগে যাইবার রেল হয় নাই—"হুস্ হুস্" নামক ঠেলাগাড়ীতেই যাতায়াত

"বসন্ত হাসিয়ে বসন ধ'রে টানে,
পশন ভরে দেয় কুহু কুহু গানে
ফুলের গন্ধ নিয়ে প্রাণের পরে হানে,
হাসির পরে হানে হাসি।"

"বালকের" প্রথম সংখ্যায় সম্পাদিকার "ব্যায়াম" প্রবন্ধে আমাদের দেশে ছেলেদের ব্যায়ামমর্চার দ্বারা শরীর সবল ও কর্মঠ করার প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিবার জন্য একটি প্রবন্ধ লিখিত হয়। তাহাতে আমেরিকার কোন লেখকের "লাঠির ব্যায়াম"—চিত্রসহ বর্ণিত হয়। পরবর্তী সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ "লাঠির উপর লাঠি" লিখিয়া তাহার আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "সম্পাদক বোধহয়, এ দেশের লোকের দারিদ্র্যের স্বরূপ বুঝেন না। তাহারা পুষ্টিকর খাদ্য খাইবে, এত টাকা কোথায়? পেট ভরিয়া ডালভাত তাই জোটেনা। নুনের ট্যাক্সের দায়ে অনেক গরীব শুধু ভাত খাইয়া মরে, নুনও জোটে না।" অর্থানয়নের জন্য ছেলেরা খেলাধূলা আমোদ-প্রমোদ বন্ধ করিয়া "বিদেশী ব্যাকরণের শুষ্ক সূত্র, বীজগণিতের কঠিন আঁট ও জ্যামিতির তীক্ষ্ণ ত্রিকোণ চতুষ্কোণ গিলিতে থাকে।" আবার—য়ুরোপীয়রা নিজের ভাষায় জ্ঞান উপার্জন করে, আমরা পরের ভাষায় জ্ঞানোপার্জন করি। বিদেশী ভাষা ও বিদেশীয় ভাব আয়ত্ত করিতে আমাদের কত সময় চলিয়া যায়, তাহার পরে সেই ভাষার ভাণ্ডারস্থিত ফল। * * * বিমাতৃভাষা আমাদের তিক্ত ঔষধ, শক্ত পিল, গিলিতে হয়—গলায় বাধে। নাক চোখ জলে ভাসিয়া যায়।"

মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার জন্য যে আন্দোলন রবীন্দ্রনাথ সমস্ত জীবন করিয়া গিয়াছেন, তাহার আরম্ভ এই স্থানে। পরে 'সাধনায়' প্রকাশিত (১২৯৯ বঙ্গাব্দে) "শিক্ষার হেরফের" প্রবন্ধে এই কথাই পরিণতি পাইয়াছিল। এই প্রবন্ধের আর একটি মন্তব্য উল্লেখ যোগ্য :—

"আমাদের মেয়েরাও আবার আজকাল একজামিন পাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বাঙ্গালী জাতটাই কি একেবারে একজামিন দিতে দিতে জগৎ সংসার হইতে 'পাস' হইয়া যাইবে; পাসকরা ছেলেদের শরীরও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। মেয়েদের মধ্যেও কি শীর্ণ শরীর, জীর্ণ মস্তিষ্ক, রুগ্নপাকযন্ত্র প্রচলিত হইবে? মেয়েদেরও কি চোখে চশমা, পকেটে কুইনাইন, উদরে দাওয়াইখানার প্রাদুর্ভাব হইবে? * * * ছেলেরা যে বিদ্যাশিক্ষা করিবে, তাহার একটা

Progress. কিন্তু "বালক" যখন প্রকাশিত হয়, তখন ইংরেজী রচনার রসাস্বাদন করিবার ক্ষমতা আমার ছিল না—"বালক" সম্বন্ধে সে বাধা ছিল না।

কিন্তু যখন বাল্যকালে এই মাসিকপত্রের রসাস্বাদন করিতাম, তখন বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিভার ক্রমবিকাশ বুঝিবার জন্য ইহার প্রয়োজন ও গুরুত্ব বুঝিতে পারি নাই। আজ মনে হয়, ইহার গুরুত্ব ও প্রয়োজন অসাধারণ।

"বালকে" প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্য নানারূপ রচনার সংখ্যা ৬৯টি। রবীন্দ্রনাথ নানা বাঙ্গলা সাময়িক পত্রের সহিত—সম্পাদকরূপে অথবা লেখকরূপে —সম্পর্কিত ছিলেন। যথা—'বালক', 'ভারতী', 'সাধনা', 'বঙ্গদর্শন' (নব পর্যায়), 'ভাণ্ডার' প্রভৃতি। বিস্ময়ের বিষয় কোনটিই অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু এ সকল পত্রেই তাঁহার রচনার সংখ্যাধিক্য বিস্ময়কর।

রবীন্দ্রনাথ "বালকে" ছোটগল্প লিখিয়াছিলেন (মুকুট), উপন্যাস লিখিয়াছিলেন (রাজর্ষি)—আর কবিতা, হেঁয়ালি নাট্য নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। "বালকে" তাঁহার সাহিত্য সাধনার প্রথম সোপান না বলিলেও সোপানশ্রেণীর আরম্ভ বলা অসঙ্গত হয় না। গল্পে ও উপন্যাসে "বালকে" তাঁহার রচনা প্রারম্ভিক দৌর্বল্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু "বালকের' বহু রচনায় তাঁহার পরবর্তী রচনার আরম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার "আহ্বানগীতের" আরম্ভ—

"পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ, শুনিতে পেয়েছি, ওই—
সবাই এসেছে লইয়া নিশান, কইরে বাঙ্গালী কই!
সুগভীরস্বর কাঁদিয়া বেড়ায় বঙ্গ-সাগরের তীরে,
'বাঙ্গালীর ঘরে কে আছিস আয়,' ডাকিতেছে ফিরে ফিরে।
ঘরে ঘরে কেন দুয়ার ভেজানো, পথে কেন নাই লোক,
সারাদেশ ব্যাপি মরেছে কে যেন, বেঁচে আছে শুধু শোক।"

ইহার বিবর্তন দেখিতে পাই—

"দিন আগত ঐ ভারত তবু কই" ইত্যাদি।

"বালকের" রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ কবিতায় যুক্তাক্ষর দুই অক্ষর ধরেন নাই —"বঙ্গ-সাগরের তীরে", তাহার প্রমাণ। "ফুলের ঘা" কবিতায়ও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়—

'বালক'

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

১২৯২ বঙ্গাব্দে কলিকাতা—আদি ব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত—"বালক" মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ইহার সম্পাদিকা ছিলেন—রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কর্মাধ্যক্ষ। এক বৎসর মাত্র "বালক" তাহার স্বতন্ত্র সত্তা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল—তাহার পরে তাহা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কর্তৃক সম্পাদিত "ভারতী"র অঙ্গীভূত হয়। শেষ সংখ্যার শেষে "কার্যাধ্যক্ষের নিবেদন"—

"কার্যাধ্যক্ষের অপটুতাবশতঃ কিছুকাল হইল বালক প্রকাশে ও বিতরণে অনিয়ম ঘটিয়াছে এবং উত্তরোত্তর অধিকতর অনিয়ম ঘটিবার সম্ভাবনা, এই জন্য পাঠককিগের নিকটে মার্জনা প্রার্থনা করিয়া কার্যাধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিতেছেন। "বালক" কার্যাধ্যক্ষ—সাহিত্যব্যবসায়ী, যথেষ্ট অবকাশ তাঁহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক—তিনি কর্মিষ্ঠতা ও কার্যনিপুণতার জন্যও বিখ্যাত নহেন, তৎসত্ত্বেও তাঁহার হাতে অন্যান্য কাজের ভার আছে, আশা করি এই সকল বিবেচনা করিয়া "বালকের" গ্রাহকেরা প্রসন্নমনে তাঁহাদের কার্যাধ্যক্ষকে বিদায় দিবেন।"

"বালকে"র আরম্ভে রবীন্দ্রনাথের কবিতা—"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এলো বান"—আর তাহার শেষে রবীন্দ্রনাথের পূর্বোদ্ধৃত "কার্যাধ্যক্ষের নিবেদন।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "জীবনস্মৃতিতে" রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'—"অর্থাৎ পুরাবৃত্তেতিহাস, প্রাণীবিদ্যা, শিশুসাহিত্যবিদ্যোতক মাসিকপত্র" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—তিনি ইহার এক ভাগ সংগ্রহ করিয়াছিলেন—"বারবার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুসি আজও আমার মনে পড়ে।" তেমনই বাল্যকালে সচিত্র "বালক" পাঠ করিয়া যে আনন্দ লাভ করিতাম, তাহার কথা এখনও মনে আছে ইহার পূর্বে ঠিক এই ধরনের কোন মাসিকপত্র আমি পাই নাই। মাদ্রাজ হইতে খৃষ্টানদিগের দ্বারা প্রকাশিত একখানি সচিত্র ইংরেজী পত্র ছিল—

নানা কাজে প্রেরণা দেয়। কাদম্বরীর এই ক্ষমতা তাঁর নিজ গুণেই বিকশিত হয়েছিল। বিহারীলাল তাই তাঁর উদ্দেশে প্রশস্তি গেয়েছেন—

সাহিত্য-সংসারে তুমি
সুকুমার ফুলভূমি,
তোমার স্নেহের গুণে কত রকমের ফুল
ফুটে আছে থরে থরে ;
কেমন সৌরভ ভরে
সোহাগ সমীরে কি যে করিতেছে ঢুল্ ঢুল্।
তোমার উৎসাহ ধারা
বিচিত্র বিদ্যুৎপারা,
কতই বোবার মুখে কথা ফুটেছে...

এমন রমণী যে রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করবেন, বিচিত্র কি ? প্রকৃত পক্ষে, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যালোক কাদম্বরীর নয়নআলোকে উদ্ভাসিত কি না সে বিষয়ে গভীর গবেষণা ও বিচারের বিরাট অবকাশ রয়েছে। কবির কবিত্বশক্তি ছিল অবশ্য বিধিদত্ত; কিন্তু মনে হয় তার বিচিত্র বিকাশের পেছনে ছিল কাদম্বরী হস্ত। মৃত্যুর পরেও তাই কাদম্বরী কবির কাছে শুধু পটে লিখা ছবিতে পরিণত হন নি, কবিজীবনের অন্তরতম প্রাণশক্তিরূপে প্রচ্ছন্ন থেকেছেন। একদা বহু দিন পরে কাদম্বরীর ছবি দেখে কবি তাই পরম আবেগে গেয়ে উঠেন—

এ জীবনে
আমার ভুবনে
কত সতী ছিলে।
মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
রূপের তুলিকা ধরি রসের মুরতি।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে,
তব সুর বাজে মোর গানে ;
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।

বালক বয়সে রচিত প্রবন্ধে কবি বলেছিলেন, দান্তের জীবনদেবতা হলেন বিয়াত্রিচে। কবির নিজের ক্ষেত্রেও কাদম্বরী বুঝি তাই।

এ সম্বন্ধ হৃদয়ের পরশে মধুর, ফলশ্রুতিতে মহান। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিজীবনে কাদম্বরীর নারীসত্তা কবি-মানসী ও ধ্রুবতারার ন্যায় কাজ করেছে।

এ সম্বন্ধ নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কলুষ।

চণ্ডীদাস বলেছেন, রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ, কাম গন্ধ নাহি তায়। ঠিক এমনি ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে কাদম্বরী রূপ। আমাদের মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী কৈশোর-লীলার মধ্যে দিয়ে অনেক দিন অতিবাহিত করেন। খেলার সাথী হিসেবেই দুজনের মধ্যে অলক্ষ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

তারপর এসেছে যৌবন। তখন দুজনকেই থমকে দাঁড়াতে হয়েছে। তাঁদের মাঝখানে যে দুস্তর বাধা, সে বিষয়ে উভয়ই সচেতন হয়েছেন। কিন্তু সেই বাধাই কবি জীবনের বিকাশের পক্ষে পরম উপাদান রূপে কাজ করেছে। কাদম্বরী সহজেই কবি-মানসী হতে পেরেছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট মানস-গঠন এই সম্পর্কে গড়ে তোলার পক্ষে খুবই উপযোগী হয়েছে রবীন্দ্র-মানসের স্বভাব হল রোমান্টিক তথা প্লেটোনিক। এমন মন চায় বিশুদ্ধ প্রেমের লীলা। তার কারণ সে নিজের কল্পনায় ও ভাবে বিশেষকে অতি সহজে নির্বিশেষ করতে পারে। কাদম্বরী রবীন্দ্রহৃদয়ে প্রেমসত্তা জাগরিত করেছেন এটা ঠিক, কিন্তু সে প্রেমসত্তা নির্বিশেষ প্রেমের,—বিশেষ প্রেমের লোভ, অর্থাৎ কাম তাকে স্পর্শ করেনি। চন্দননগরে গঙ্গাতীরে মোরান সাহেবের বাগান বাড়িতে কাদম্বরীর সাহচর্যে কবির প্রথম যৌবনের যে পরম রমণীয় দিনগুলি অতিবাহিত হয়, সেই সময়ের লেখা একটি রচনায় কবি লেখেন, "ভালবাসা অর্থে আত্মসমর্পণ নহে। ভালবাসা অর্থে, নিজের যাহা কিছু ভাল তাহাই সমর্পণ করা। হৃদয়ে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা নহে; হৃদয়ের যেখানে দেবত্র-ভূমি যেখানে মন্দির, সেইখানেই প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা।

যাহাকে তুমি ভালবাস, তাহাকে ফুল দাও, কাঁটা দিও না; তোমার হৃদয়-সরোবরের পদ্ম দাও, পঙ্ক দিও না। প্রেম হৃদয়ের সারভাগ মাত্র। হৃদয় মন্থন করিয়া যে অমৃতটুকু উঠে তাহাই। ভালবাসা অর্থে ভাল বাসা, অর্থাৎ অন্যকে ভাল বাসস্থান দেওয়া, অন্যকে মনের সর্বাপেক্ষা ভাল জায়গায় স্থাপন করা।"

এই জন্যেই কবিজীবনে কাদম্বরী হয়েছেন প্রিয়ার মধুর সত্তা। এবং নারীর এই সত্তা পুরুষচিত্তকে আনন্দরসে স্নিগ্ধ করে, তার মানসশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে,

এই ঘটনার জন্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেই দোষী করেছেন। এই সময়েই আর একটি রচনায় রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আপন হৃদয়ের 'পুষ্পাঞ্জলি' নামেই বের হয়। এই রচনার প্রত্যেক ছত্রে রবীন্দ্রনাথের বেদনা-বিধুর হৃদয় কাদম্বরীর প্রতি শ্রদ্ধার দ্বারা যে কতখানি সংপৃক্ত তা অনুভব করতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না। পুষ্পাঞ্জলির শেষ অংশে কবি লিখেছেন—

"যাহারা ভালো, যাহারা ভালোবাসিতে পারে, যাহাদের হৃদয় আছে, সংসারে তাহাদের কিসের সুখ। কিছু না, কিছু না। তাহারা তারের যন্ত্রের মতো, বীণার মতো—তাহাদের প্রত্যেক কোমল স্নায়ু, প্রত্যেক শিরা সংসারের প্রতি আঘাতে বাজিয়া উঠিতেছে। সে গান সকলেই শুনে, শুনিয়ে সকলেই মুগ্ধ হয়—তাহাদের বিলাপধ্বনি রাগিণী হইয়া উঠে, শুনিয়া কেহ নিঃশ্বাস ফেলে না। তাই যেন হইল, কিন্তু যখন আঘাত আর সহিতে পারে না, যখন তার ছিঁড়িয়া যায়, যখন আর বাজে না, তখন কেন সকলে তাহাকে নিন্দা করে, তখন কেন কেহ বলে 'আহা'!—তখন তাহাকে সকলে তুচ্ছ করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়।....পাষণ্ড নরাধম পাষাণহৃদয় যে ইচ্ছা সেই ঝন্ ঝন্ করিয়া চলিয়া যায়, অকাতরে তার ছিঁড়িয়া হাসিতে থাকে—খেলাছলে তাহার প্রাণের সংগীত শুনিয়া তারপরে যে যার ঘরে চলিয়া যায়, আর মনে রাখে না। এ বীণাটিকে তাহারা দেবতার অনুগ্রহ বলিয়া মনে করে না—তাহারা আপনাকেই প্রভু বলিয়া জানে—এইজন্য কখনো বা উপহাস করিয়া, কখনো বা অনাবশ্যক জ্ঞান করিয়া এই সুমধুর সুকোমল পবিত্রতার উপরে তাহাদের কঠিন চরণের আঘাত করে—সংগীত চিরকালের জন্য নীরব হইয়া যায়।"

যদি রবীন্দ্রনাথের বিবাহের সঙ্গে কাদম্বরীর আত্মহত্যার কোনো সত্যকার যোগ থাকত তাহলে কবির রচনায় এমন ভাব প্রকাশ পেত না।

॥ ৫ ॥

আসলে রবীন্দ্রজীবনে কাদম্বরীর সম্পর্ক সম্বন্ধে সাধারণ লৌকিক বিচার সহজেই ভুল করতে পারে। গভীর ভাবে না দেখলে রবীন্দ্র-কাদম্বরী সম্বন্ধের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারা দুষ্কর।

সত্যর আলোকে, রবীন্দ্র-কাদম্বরী সম্বন্ধ একটি মধুর ও মহান সম্বন্ধ।

মনঃ প্রাণ যৌবন
কি দিয়ে পাইবে মন !
পশুর মতন এরা নিতই নূতন চায়।
এস না ধরায়।
সরল হৃদয় লুটি
এ ফুলে ও ফুলে ছুটি
ভ্রমর কলঙ্ককালো উড়িয়ে বেড়ায়,
গুন্ গুন্ রব ওর
বিষাক্ত মদের ঘোর,
ও নহে কাহারো পতি ;
কেন গো দাঁড়িয়ে সতী !
যাও মা অমরাবতী, এস না ধরায়
আর এস না ধরায়।

স্পষ্টই দেখছি, বিহারীলাল কাদম্বরীর আত্মহত্যার জন্যে কাদম্বরীর স্বামীকেই দায়ী করেছেন। এবং স্বামীর দোষ কোথায় তার প্রতিও ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট ও তীব্র।

এই মাসেই রবীন্দ্রনাথ ভারতী পত্রিকায় 'হায়' নামক একটি গানে লেখেন—

তোরা বসে গাঁথিস মালা,
তারা গলায় পরে।
কখন যে শুকায়ে যায়
ফেলে দেয় রে অনাদরে।
তোরা সুধা করিস দান,
তারা শুধু করে পান,
সুধায় অরুচি হলে
ফিরেও নাহি চায় ;
হৃদয়ের পাত্রখানি
ভেঙে দিয়ে চলে যায়।

এখানে বক্তব্য বহুবচন দ্বারা সাধারণীকৃত হয়েছে, কিন্তু বহুবচনের আবরণটি ভেদ করলেই বোঝা যায় যে কাদম্বরীর আত্মহত্যায় শোকতপ্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ

অপ্রাসঙ্গিকভাবে জানিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহধর্মিণী হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে পরস্পরের প্রেমে পড়েন, এবং কলঙ্ক ঢাকবার জন্যে বাড়ির ব্যবস্থায় তাঁর বিবাহ হয়ে গেলেও সমস্ত ব্যাপার খারাপ থেকে আরও খারাপই হল—তাঁর বৌঠান আত্মহত্যা করলেন।

সুধীন্দ্রনাথ এই কথা এমনভাবে লিখেছেন যেন তা সকলেরই জানা, তিনি শুধু একটা বিদিত সত্য উল্লেখ করছেন।

কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ নিশ্চয় ভালো করে জানতেন যে কাদম্বরীর আত্মহত্যা সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন তাকে সত্য বলা চলে না। অন্তত সে বিষয়ে কোন প্রমাণ নেই।

বরং কাদম্বরী যে অন্য কারণে আত্মহত্যা করেন তার প্রমাণই সহজে দাখিল করা চলে।

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর একান্ত ভক্ত ছিলেন কাদম্বরী। বিহারীলালের 'সারদা মঙ্গল' কাব্যগ্রন্থ প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল। কবির প্রতি তাঁর ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ তিনি বহু দিনের পরিশ্রমে একটি উৎকৃষ্ট আসন বোনেন, এবং তা বিহারীলালকে উপহার দেন। সে আসনের মাঝখানে সারদামঙ্গল থেকে কয়েক লাইন কবিতাও বোনা ছিল—

হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু দুনয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাঁহারে ধেয়াও?

আসনটি উপহার দিয়ে কাদম্বরী বিহারীলালকে অনুরোধ করেছিলেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে। কাদম্বরীর জীবিতকালে বিহারীলালের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি। তিনি উত্তর দেন কাদম্বরীর মৃত্যুর পর 'সাধের আসন' নামক কাব্য লিখে। এই কাব্য পড়ে জানা যায় যে সে দিনের শ্রেষ্ঠ কবির কাছে কাদম্বরী কতখানি মহীয়সী নারীরূপে প্রতিভাত ছিলেন। এই কাব্যের দশম সর্গ 'পতিব্রতা' নামক কবিতায় কবি বলেছেন—

সতীর প্রেমের প্রাণ
পতি প্রতি এক টান
পুরুষ কিম্ভূতমতি চেনে না তোমায়।

নিস্তব্ধ নিশীথ ? সেই জ্যোৎস্নালোক ? সেই দুইজনে মিলিয়া কল্পনার রাজ্যে বিচরণ ? সেই মৃদু গভীর স্বরে গম্ভীর আলোচনা ? সেই দুইজনে স্তব্ধ হইয়া নীরবে বসিয়া থাকা ? সেই প্রভাতের বাতাস, সেই সন্ধ্যার ছায়া ! একদিন সেই ঘনঘোর বর্ষার মেঘ, শ্রাবণের বর্ষণ, বিদ্যাপতির গান ? তাহারা সব চলিয়া গিয়াছে । কিন্তু আমার এই ভাবগুলির মধ্যে তাহাদের ইতিহাস লেখা রহিল । আমার এই খেলার মধ্যে লেখা রহিল, এক লেখা তুমি আমি পড়িব, আর এক লেখা সকলে পড়িবে ।”

ছবি ও গান, শৈশবসংগীত ও ভানুসিংহের পদাবলী কাব্যগ্রন্থগুলির উৎসর্গ পত্রও কাদম্বরীর উদ্দেশে রচিত হয়েছে । মানসীর প্রথম কবিতা উপহারের শেষ চরণে কবি লিখেছেন—

সেই আনন্দ মুহূর্তগুলি তব করে দিনু তুলি
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ ।

এখানে ‘তব করে’-র অর্থ যে কাদম্বরী-হস্তে, এমন অনুমান আমরা অনায়াসেই করতে পারি ।

মানসীর পর কবির আর কোন গ্রন্থ কাদম্বরীর উদ্দেশে উৎসর্গিত হয় নি । কিন্তু কাদম্বরীর স্মৃতি সুস্পষ্ট ভাবে স্থান নিয়েছে কবির লেখায়—পদ্যে ও গদ্যে । পদ্যে বিশেষ করে নাম করা যেতে পারে ক্ষণিকার অন্তরতম ও সমাপ্তি কবিতা, পূরবীর কিশোর প্রেম, খেলা ও দোসর কবিতা, বলাকার ছবি কবিতা ; বিচিত্রিতার নীহারিকা কবিতা ; পত্রপুটের ১৫ সংখ্যক কবিতা ; আকাশপ্রদীপের শ্যামা ও কাঁচা আম কবিতা, এবং বীথিকার কৈশোরিকা ও নিমন্ত্রণ কবিতা । গদ্যে লিপিকার প্রথম শোক নামের রচনা, এবং জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা ।

॥ ৪ ॥

রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে, ৯ই ডিসেম্বর । এবং তার চার মাস পরে ১৮৮৪, ১৯শে এপ্রিলে কাদম্বরী আত্মহত্যা করেন ।

মনে প্রশ্ন জাগে, কেন এই আত্মহত্যা ? এ আত্মহত্যার কারণ কি রবীন্দ্রনাথের বিবাহ ?

সম্প্রতি একটি ইংরেজি পত্রিকায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটা লেখা নজরে পড়ল । গীতিকবি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক এক জায়গায় অনেকটা

হৃদয়ের বনে বনে সূর্যমুখী শত শত
ওই মুখ পানে চেয়ে ফুটিয়া উঠেছে যত।
জীবন-সমুদ্রে তব জীবন-তটিনী মোর
মিশায়েছি একেবারে আনন্দে হইয়ে ভোর……
হয়ত জান না, দেবি, অদৃশ্য বাঁধন দিয়া
নিয়মিত পথে এক ফিরাইছ মোর হিয়া।
গেছি দূরে, গেছি কাছে, সেই আকর্ষণ আছে,
পথভ্রষ্ট হইনাক তাহারি অটল বলে
নহিলে হৃদয় মম ছিন্ন ধূমকেতু সম
দিশাহারা হইত সে অনন্ত আকাশতলে।

সন্ধ্যাসংগীত কাব্যগ্রন্থের সর্বশেষ রচনা 'উপহার' কবিতাটি যে কাদম্বরীকে স্মরণ করেই লেখা তা স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে যেখানে কবি লিখেছেন,

ভুলে গেছি কবে তুমি ছেলেবেলা একদিন
মরমের কাছে এসেছিলে,
স্নেহময় ছায়াময় সন্ধ্যাসম আঁখি মেলি
একবার বুঝি হেসেছিলে।
বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ওই আঁখি দুটি—
চাহিলে হৃদয় পানে মরমেতে পড়ে ছায়া,
তারা উঠে ফুটি।
আগে কে জানিত বল কত কী লুকানো ছিল
হৃদয় নিভৃতে,
তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে।……

সন্ধ্যাসংগীতের কালে লেখা 'বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থের সর্বশেষ রচনায় কাদম্বরীকেই উদ্দেশ করে লিখেছেন—

"আর আমার পাঠকদিগের মধ্যে একজন লোককে বিশেষ করিয়া আমার এই ভাবগুলি উৎসর্গ করিতেছি; এ ভাবগুলির সহিত তোমাকে আরও কিছু দিলাম, সে তুমিই দেখিতে পাইবে! সেই গঙ্গার ধার মনে পড়ে? সেই

॥ ৩ ॥

ঠাকুরবাড়িতে কাদম্বরী পদার্পণ করেন বাড়ির কনিষ্ঠা বধূরূপে আট বৎসর বয়সে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তখন বালক। বয়স সাত বৎসর।

প্রায় সমবয়সী একটি বালক ও একটি বালিকা। তার ওপর তাদের মধ্যে দেওর ও বৌঠানের মধুর সম্পর্ক।

স্নেহ-প্রীতির আকর্ষণ তাদের দুজনের মধ্যে তাই স্বাভাবিক কারণেই বেড়ে ওঠে।

কাদম্বরীর স্নেহ-সখিত্ব বালক রবীন্দ্রনাথের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করবে, তার কারণ ছিল। ঠাকুরবাড়ির রীতি অনুযায়ী বালক রবীন্দ্রনাথকে বাড়ির চাকরদের পাহারা ও তদারকের মধ্যে কাটাতে হয়েছে। অন্দরমহলে এমনিতেই ইচ্ছামত যাতায়াত করার উপায় ছিল না। তার ওপর মায়ের অসুস্থ শরীর, এবং অন্যান্য বৌদিরা যথেষ্ট বড় এবং তাঁরা যে যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত। মেয়েদের কাছ থেকে স্নেহের প্রশ্রয় পাবার সুযোগ তাই তেমন ছিল না।

কিন্তু কাদম্বরী বৌঠান আসাতে সেই সুযোগ ঘটল।

এই স্নেহ-সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে কিশোর রবীন্দ্রনাথের হৃদয়-মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি বিকশিত হতে লাগল।

তারপর একদিন উভয়েই অজ্ঞান কৈশোর-জীবন অতিক্রান্ত করে যৌবনের সীমায় মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

তখন আত্মসচেতন তরুণ রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা পড়ল এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। তিনি যে চেতনা ও কল্পনায় জগৎকে জানছেন সে চেতনা ও কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ, নিয়ন্ত্রিত ও সমৃদ্ধ করছে একটি নারীর শক্তি।

সে নারী কাদম্বরী।

যে রবীন্দ্রনাথ কবি সেই রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা ও সৃষ্টিশক্তি স্বচ্ছ ধারায় উৎসাহিত করেছেন কাদম্বরী। তাই তো দেখা যায় কবি তাঁর জীবনে কাদম্বরী-প্রভাবকে প্রথম থেকেই স্বীকৃতি দিতে উন্মুখ হয়েছেন।

ভগ্নহৃদয় কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গিত হয়েছে 'শ্রীমতী হে'—কে। শ্রীমতী হে'—হলেন 'হেকেটি'—যে-নামে কাদম্বরী অন্তরঙ্গ-মহলে পরিচিত ছিলেন। এই উৎসর্গ কবিতায় কবি লিখেন—

চাহিয়া হতভম্ব হইয়া থাকিত। ...এইরূপে অন্তঃপুরের পর্দা তো উঠাইলামই সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের পর্দাটিও একেবারে উঠিয়া গেল।"

সত্যই বিস্ময়কর রূপান্তর। শ্যামলাল গাঙ্গুলির বালিকা কন্যা ঠাকুরবাড়িতে বধূরূপে এসে কী অপরূপ হয়েই না উঠলেন। পিত্রালয়ে তাঁর নাম ছিল কাদম্বিনী। শ্বশুরালয়ে সে নামেরও রূপান্তর ঘটে। কাদম্বিনীর বদলে নূতন নাম রাখা হয় কাদম্বরী। এই নাম পরিবর্তনকে বলা যেতে পারে বালিকা বধূর ভবিষ্যৎ রূপান্তরের প্রতীকী সূচনা। ঠাকুরবাড়ির নূতন পরিবেশে, সযত্নব্যবস্থিত শিক্ষায়-দীক্ষায় ধীরে ধীরে একটি বধূরূপী বালিকা যখন তরুণীতে পরিণত হল তখন দেখা গেল সে নারী হয়ে উঠেছে যেন পরিপূর্ণ পূর্ণিমা। সর্বগুণান্বিতা অপূর্ব মহিমাময়ী। তাঁকে 'পরমাসুন্দরী কন্যা' বলে বর্ণনা করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনীকার মন্মথ নাথ ঘোষ; জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর আত্মকথায় উল্লেখিত আছে যে মহর্ষিভবনের বধূরা শাশুড়ী ননদের মতো অত গৌরবর্ণা ছিলেন না। বরং তুলনায় শ্যামবর্ণই বলা চলে। কিন্তু নারীর সৌন্দর্য তো শুধু গৌরবর্ণ-নির্ভর নয়। সুতরাং গৌরবর্ণা না হয়েও কাদম্বরী যে পরমা সুন্দরী হতে পারেন এ কথায় স্বীকৃতি দিতে কোনো বাধা নেই।

এই পরমাসুন্দরী তরুণী একদিকে যেমন ঘোড়ায় চড়েছেন, অন্যদিকে তেমনি 'ভারতীর' সারস্বত-কুঞ্জেও স্থান নিয়েছেন। কাদম্বরী যখন ষোড়শী তখন 'ভারতী'-গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই ভারতী-গোষ্ঠীতে কাদম্বরীর স্থান কতখানি ছিল সে সম্পর্কে 'শুভ-বিবাহ'-লেখিকা শরৎকুমারী লিখেছেন, "ফুলের তোড়ার ফুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে বাঁধনে তাহা বাঁধা থাকে, তাহার অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে না। মহর্ষি পরিবারের গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এই বাঁধন।"

এবং কাদম্বরীর মহিমাময়ী প্রেরণাদাত্রীরূপে মুগ্ধ বিহ্বল হয়ে কবি বিহারীলাল গেয়ে ওঠেন—

তুমি প্রভাতের ঊষা,
স্বর্গের ললাট-ভূষা,
ব্রহ্মার মানস-সরে প্রফুল্ল নলিনী গো!

বিধির নির্বন্ধ। জীবনের যে ভূমিকা কাদম্বরীর জন্যে দৈব-নির্দিষ্ট ছিল তা গ্রহণ করতে তাঁকে ঠাকুর বাড়ীতে বধূরূপে আসতেই হবে।

কাদম্বরী বালিকা বধূ হয়ে মহর্ষিভবনে এলেন বটে, কিন্তু অচিরেই তাঁর রূপান্তর ঘটল।

বাড়িতে তখন একাল ও সেকালের বিরোধ সুরু হয়ে গেছে, ভাঙ্গা-গড়ার কাজ চলেছে। অন্তঃপুরের অবরোধ দূর করবার আয়োজন জোরালো। এসব কাজের অগ্রভাগে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তিনি বিলেত থেকে ফিরে এসে ঠাকুর বাড়ির ভেতর মহলে একালের হাওয়া ঢোকান। তিনি তাঁর কর্মস্থল বম্বেতে তাঁর পত্নীকে নিয়ে যাবার অনুমতি পিতার কাছ থেকে আদায় করেন, এবং সেই প্রথম ঠাকুর বাড়ির ঘরের বৌ বাইরের জগতে পা বাড়ান।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথের বিপ্লবী চিন্তার ফলে ঠাকুরবাড়ির অন্দর মহলে মেয়েদের নতুন শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। বাঙ্গালী খৃষ্টান শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করা, এমন কি সপ্তাহে একদিন মেম দ্বারা বাইবেল পড়ানোরও বন্দোবস্ত হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ওপর রীতিমত দেখা দেয়, যদিও প্রথমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রাচীন-পন্থী ছিলেন। মেয়েদের স্বাধীনতা নিয়ে একটা ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন লেখেন, যার নাম 'কিঞ্চিৎ জলযোগ।' কিন্তু পরে তাঁর পরিবর্তনটাও হল তেমনি জোরালো। তিনি নিজে তাঁর জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন, "ইহার কিছুদিন পরে মেজদাদা বিলাত হইতে ফিরিয়া, আমাদের পরিবারে যখন আমূল পরিবর্তনের বন্যা বহাইয়া দিলেন, তখন আমারও মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। তখন হইতে আর আমি অবরোধ প্রথার সমর্থক নহি, বরং ক্রমে ক্রমে একজন নব্য-পন্থী হইয়া উঠিলাম। স্ত্রীস্বাধীনতার শেষে আমি এত পক্ষপাতী হইয়া পরিলাম যে, গঙ্গার ধারের কোনো বাগান বাড়িতে সস্ত্রীক অবস্থান কালে আমার স্ত্রীকে আমি নিজেই অশ্বারোহণ পর্যন্ত শিখাইতাম। তাহার পর জোড়াসাঁকো বাড়িতে আসিয়া, দুইটি আরব ঘোড়ায় দুই জনে পাশাপাশি চড়িয়া বাড়ি হইতে গড়ের মাঠ পর্যন্ত প্রত্যহ বেড়াইতে যাইতাম। ময়দানে পৌঁছিয়া দুই জনে সবেগে ঘোড়া ছুটাইতাম। প্রতিবাসীরা স্তম্ভিত হইয়া গালে হাত দিত। রাস্তার লোকেরা কৌতূহলে ও বিস্ময়ে মুখব্যাদন করিয়া

প্রেমের যে-গান তিনি গেয়েছেন, সে-সবের পেছনে ছিল একটি বিশেষ নারীর প্রেরণা।

এই নারী হলেন কাদম্বরী।

রবীন্দ্রজীবনে কাদম্বরী ছিলেন 'নতুন বৌঠান'—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী। ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরিকা বধূ।

কিন্তু কবিজীবনে কাদম্বরী ছিলেন প্রেমোপলব্ধি ও কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা, লীলাময়ী মানসী মূর্তি।

যেমন বিদ্যাপতির কবিজীবনের ছিলেন রাণী লছিমা।

চণ্ডীদাসের রামী।

কিম্বা যেমন দান্তের বিয়াত্রিচে, অথবা প্রেত্রার্কের লরা।

পৃথিবীর একাধিক মহাকবির কাব্যসৃষ্টির পেছনে বিশেষ বিশেষ নারী প্রেরণাদাত্রী মানসীরূপে কাজ করেছে। এবং সেই সব মহাকবিদের কাব্য রহস্য উন্মোচিত করার চাবিকাঠি থেকেছে তাঁদের মানসীর হাতে।

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন এবং কাব্য-রহস্যের আসল চাবিকাঠিও সম্ভবত কাদম্বরী-হস্তেই।

॥ ২ ॥

কাদম্বরী বালিকা বধূরূপে ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন ১২৭৫ সালে সালের ২৩শে আষাঢ়। তখন তাঁর বয়স আট বছর। তাঁর পিতা মধ্য-কলিকাতার গাঙ্গুলি পরিবারের শ্যামলাল গাঙ্গুলী। এই গাঙ্গুলী পরিবারের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর পূর্ব-পরিচয় ও যোগাযোগ ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিজে দেখে তাঁর পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্যে এই কন্যাকে নির্বাচিত করেন। বাড়ীর মেজ ছেলে সত্যেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল না কাদম্বরীর সঙ্গে তাঁর ভাইয়ের বিবাহ হয়। তাঁর সংস্কারপন্থী মন চেয়েছিল তাঁর ভাইকে বিলেতে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়ে তার পরে বিয়ে দিতে। সাধ ছিল প্রগতিশীল সমাজের প্রাপ্তবয়স্কা তরুণীকে ভ্রাতৃবধূ রূপে দেখবার। এই ইচ্ছাতেই সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী সূর্যকুমার (গুডীব) চক্রবর্ত্তীর বড় মেয়ের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহের জন্যে অনেক দূর অগ্রসর হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি।

কবিজীবনে কাদম্বরী

আদিত্য ওহদেদার

[ইংরাজী ত্রৈমাসিক Quest-এর ১৯৬১-র মে সংখ্যায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলেছেন : That in course of time he (Rabindranath) and the wife of his brother Jyotirindranath fell desperately in love with each other did not mend matters at all and when the family married him off presumably to prevent scandal, bad got worse and worse until his sister-in-law killed herself.

এ উক্তি কতদূর সত্য ? একটি মত এখানে মুদ্রিত হল—সম্পাদক]

পরম উৎসুক হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বৈষ্ণব কবিতা'-য় বৈষ্ণব কবিদের প্রশ্ন করেছেন,—

সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।
.....এত প্রেমকথা.....
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা—
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে।

এমন প্রশ্ন কবি এত স্পষ্ট ভাবে করতে পেরেছেন, তার কারণ তিনি তাঁর নিজেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বুঝতে পেরেছিলেন যে বৈষ্ণব-কবিতার কবিরা আপন অন্তরের প্রেম-রসোপলব্ধিকেই রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনীর মধ্যে প্রকাশ করেছেন। তিনি নিজে 'ভানুসিংহের কবিতা'য় রাধিকার যে-প্রেমোপলব্ধি ব্যক্ত করেছেন, এবং এবং তাঁর কাব্য-জীবনের শুরু থেকে তাঁর কবিতায়

তুলার মাশুল আদায়কারী রচিত হয়েছে। স্বপ্ন-বিভ্রান্ত মানুষটি কবির স্মৃতি-লোকচারী সেই নিদ্রাহারা বালকটির শিল্পরূপ। মেহের আলি পরিণততর মনের রচনা। যখন শুধু বিহ্বল স্বপ্নবিলাস 'নলিনী ও গোলাপবালা'র গান শোনায় না—যখন 'কল্পনা'পর্বের বাস্তব ও স্বপ্নের দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে, মেহের আলি তখনকার সৃষ্টি। ভাষার ইন্দ্রজাল, কবিকল্পনার দীপ্তি ও সাংকেতিকতা বাদশাহি যুগের রোমান্স কাহিনীকে সূক্ষ্মতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠা করেছে। অথচ কত বাস্তবধর্মী সেটিং-এর মধ্যে কবি গল্পটিকে স্থাপিত করেছেন। 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর গদ্যরীতি রবীন্দ্রগদ্যরীতির ইতিহাসে বিশিষ্ট মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। অলস-মন্থরগতি ভাষা, দীর্ঘবিতানিত বাক্যাংশ ও অলংকারের প্রাচুর্য বহুমূল্যবান পারসিক গালিচার মতোই বিস্তৃত—ছায়াশরীরিণীদের লঘুপদস্পর্শ যেখানে স্বপ্নের আলপনা আঁকে, সুকোমল অদৃশ্য ওড়না সেখান দূরযুগের আতরগন্ধ ছড়ায়।

দেহে হিমস্পর্শ মসৃণতা। পো এই অমানুষিক চরিত্রগুলিকে স্থূলভাবেই উপস্থিত করেছেন—এতে যথার্থ ভীতি ও বীভৎসতার ভাব সঞ্চারিত হয়েছে।

'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে কোনো প্রেতলোকবাসিনীর স্থূল উপস্থিতি নেই। শুধু স্বপ্নাবিষ্ট মনের কয়েকটি ধারণা এখানে চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের লীলায়িত সুষমা একটি গীতিকবিতার মূর্ছনায় বিলসিত: "পলকের মধ্যে গ্রীবা বাঁকাইয়া, তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপুল চক্ষু তারকায় সুগভীর আবেগতীব্র বেদনাপূর্ণ কটাক্ষপাত করিয়া, সরস সুন্দর বিম্বাধরে একটি অস্ফুট ভাষার আভাস মাত্র দিয়া, লঘু ললিত নৃত্যে আপন যৌবনপুষ্পিত দেহলতাটিকে দ্রুত বেগে ঊর্ধ্বাভিমুখে আবর্তিত করিয়া মুহূর্তকালের মধ্যে বেদনা বাসনা ও বিভ্রমের, হাস্য কটাক্ষ ও ভূষণজ্যোতির স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করিয়া দিয়া দর্পণেই মিলাইয়া গেল।" এই বর্ণনার মধ্যে বীভৎসতা বা কোনো ভীতির শিহরণ নেই, কিন্তু অবিমিশ্র কল্পরসকে কত সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

তরুণ মাশুল আদায়কারীর মানস স্বপ্ন রচনারও কয়েকটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন কবি। দ্বিতীয় শা মামুদের বিলাস-নিকেতন সম্পর্কে কিছু পূর্ববর্তী ধারণা নিয়েই গল্প কথক এখানে এসেছিলেন। পারসিক তরুণীর নগ্ন পদে পল্লব ও দ্রাক্ষাবনের গজল গানের স্বপ্নের সংস্কার নিয়েই তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন। করিম খাঁয়ের সতর্ক নিষেধ বাণীও সত্ত্বেও তার ধারণাগুলিকে তীব্রতরই করে তুলেছিল। তা ছাড়া এই মোহস্বপ্নের উপযুক্ত পরিবেশও সৃষ্টি করা হয়েছে: "তখন শুস্তা নদী শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে; ওপারের অনেকখানি বালুতট অপরাহ্নের আভায় রঙিন হইয়া উঠিয়াছে, এপারে ঘাটের সোপানমূলে স্বচ্ছ অগভীর জলের তলে নুড়িগুলি ঝিক্‌ঝিক করিতেছে। সেদিন কোথাও বাতাস ছিল না। নিকটের পাহাড়ে বনতুলসী, পুদিনা ও মৌরির জঙ্গল হইতে একটা ঘন সুগন্ধ উঠিয়া স্থির আকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল।" এই পরিবেশে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে এসেছে।

'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটিকে নিঃসন্দেহে কাব্যধর্মী বলা যায়, সম্ভবত, বিশ্ব-সাহিত্যেরও কাব্যধর্মী গল্পের দরবারে এর আসন অগ্রগণ্য। ভাষাবিন্যাস ও কারুকার্য বাদশাহী যুগের স্বপ্নকাহিনীর সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কথকের ছদ্মবেশে কবিই তাঁর স্বপ্নাবেশের কাব্য শুনিয়েছেন। সতের বছর আগে শাহিবাগে যে "ক্ষিপ্ত বালক নিদ্রাহারা গ্রীষ্ম রজনী" যাপন করেছিল, তারই ব্যক্তিত্বের রসে

॥ ৪ ॥

একজন ইংরেজ সমালোচক বলেছেন : "Fantasy and fancy are akin in origin and meaning, and the tale of fancy is often close to poetic fancy" "ক্ষুধিত পাষাণ" প্রসঙ্গে এই মন্তব্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যায়। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কবিচিত্ত ও সিদ্ধ কল্পরস সাধনা গল্পটির মধ্যে দূরাভিসারের অন্তহীন দিগন্তের সন্ধান পেয়েছে। আড়াই শো বছরের বাদশাহি প্রাসাদে রবীন্দ্রনাথের কবি কল্পনাকে বহ্নিদীপ্ত করে তুলেছে। তরুণ মাশুল আদায়কারীর মোহময় অনুভূতি ও স্বপ্নবিলাসের উপর ভিত্তি করে একটি কাহিনীর অস্পষ্ট রেখার আভাস পাওয়া যায়। পূর্ণাঙ্গ কাহিনী রচনার দিকে কবির কোনো আগ্রহ নেই। অদৃশ্য স্নানার্থিনীদের স্নানবিলাস, অদৃশ্য ইরাণী দূতীর মর্মর শুভ্র কঠিন নিটোল হাতের অমোঘ নির্দেশ, ইরাণী তরুণীর 'ঘনকৃষ্ণ বিপুল চক্ষু তারকায় সুগভীর আবেগ তীব্র বেদনা পূর্ণ আগ্রহ কটাক্ষপাত', পাষাণ ভিত্তির তলদেশে অন্ধ কবর ভূমির কান্না প্রভৃতি কয়েকটি বিচ্ছিন্ন চিত্র আছে। গুলবাগের ইরাণী বাঁদির যেটুকু আভাস তিনি দিয়েছেন, তাতে একটি সম্পূর্ণ কাহিনী রচনার কোনো অসুবিধা ঘটে না। কিন্তু তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে গল্পাভাসটুকুকে ভারাক্রান্ত করেন নি।

যিনি এই আশ্চর্য কাহিনীর দ্রষ্টা তাঁর মোহাবেশের সুযোগ নিয়েই কাহিনীটি রচিত হয়েছে। প্রেতলোকের অধিবাসিনীরা কোথায়ও স্থূলভাবে উপস্থিত হয় নি। 'বহুদিবসের লুপ্তাবশিষ্ট মাখাঘষা,' 'আতরের মৃদু গন্ধ' ফোয়ারার 'ঝর্ঝর শব্দ,' 'স্বর্ণভূষণের শিঞ্জন,' 'নূপুরের নিক্কণ,' তাম্রঘণ্টার প্রহর বাজার শব্দ প্রভৃতি ঘ্রাণচেতনা ও শব্দচেতনাগুলিকে একত্রিত করে কবি ইরাণী রোমান্সের আভাস দিয়েছেন। সমস্ত স্থূলত্ব বিসর্জন দিয়ে তার সূক্ষ্মতর ভাবের নির্যাসকেই বর্ণময় কথাসূত্রে গ্রথিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রেতলোকবাসিনীদের অদৃশ্য সঞ্চরণের আভাস দিয়েছেন। এর জন্য কোনো বিভীষিকা বা প্রেতাতংকের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এডগার অ্যালন পো-র অনেকগুলি গল্পেই কবরভূমি থেকে মৃতরা ফিরে এসেছে। চিররুগ্না বালিকা বধূ ভার্জিনিয়া ক্লেমেরই কবরভূমি থেকে বিচিত্র পুনরুত্থানের অসম্ভব স্বপ্ন দেখেছেন পো পো-র কবরভূমি প্রত্যাগতা নারীচরিত্রগুলি তাই অমানুষিক ভাবে শুভ্র, তাদের

অতিপ্রাকৃত রসের অবতারণায় পো-স্টিভেনসন তথাকথিত Horror Story'-র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'অতিপ্রাকৃত' চিহ্নিত কোনো গল্পেই ভয়-ভীষণ বীভৎসতার কোনো পরিচয় নেই। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে অতিপ্রাকৃত রসটি মুখ্য নয়, এই রসটির সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাকে মাধ্যম হিসেবেই গ্রহণ করা হয়েছে—কবির মূল লক্ষ্য অন্যত্র সুতরাং 'ক্ষুধিত পাষাণ'-কে অতি-প্রাকৃত রসের গল্প না বললেও কোনো ক্ষতি নেই। 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর বর্ণময় বর্ণনা, কারুখচিত ভাষা ও কল্পনার ঐশ্বর্য যতই থাকুক না কেন, পাগলা মেহের আলি এর মধ্যমণি। মেহের আলি চরিত্রটি না থাকলে গল্পটি খুব সুন্দর একটি আষাঢ়ে গল্পে পরিণত হত। অতীত যুগের বাদশাহি রোমান্সকে মেহের আলিই জীবন-ব্যঞ্জনায় সুগভীর করে তুলেছে। তরুণ তুলার মাশুল আদায়কারী অভিশপ্ত প্রাসাদের মধ্যে যখন ইরাণী রোমান্সের স্বপ্নে মোহাবিষ্ট হয়, তখনই মেহের আলির সতর্ক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়—'তফাত যাও, তফাত যাও, সর ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।' এই উন্মত্ত নিষেধবাণী মোহজালকে ছিন্ন বিছিন্ন করে কঠিন বাস্তবলোকে ফিরিয়ে আনে। স্বপ্ন ও বাস্তবের এই দ্বন্দ্ব গল্পটিকে জীবনের মেঘরৌদ্রলীলায় পরম সুন্দর করে তুলেছে।

অভিশপ্ত প্রাসাদের ক্ষুধার্ত প্রস্তরখণ্ড অনেক মোহগ্রস্তকে গ্রাস করেছে—শুধু মেহের আলির নেশা কাটে নি—সে এখনো "অজগরের কবলের চতুর্দিকে ঘূর্ণ্যমান মোহাবিষ্ট পক্ষীর ন্যায়" চীৎকার করে ঘুরে বেড়ায়। সে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে, কিন্তু নিজের সতর্ক হওয়ার ক্ষমতা নেই। বিষামৃতময় জীবন লীলার এই নির্মম ট্র্যাজেডি রোমান্সের মেঘলোক বিদীর্ণ করে বজ্রবিদ্যুতের অট্টহাসিতে দুঃসহ সুন্দর হয়ে উঠেছে। মেহের আলির সতর্ক নিষেধবাণী শুধু অভিশপ্ত প্রাসাদের মোহগ্রস্ত ব্যক্তিকেই সচকিত করে না, বৃহত্তর জীবনের দূর-প্রসারী ব্যঞ্জনাকেও বহন করে আনে। মেহের আলি জীবনের সর্বকালের মর্মবাণী প্রকাশ করেছে। সে ক্ষুধিত পাষাণের প্রকৃতি জানে, কিন্তু তার এই জ্ঞান পাষাণসুন্দরীর মোহ থেকে মুক্ত করতে পারে নি। কবি মেহের আলির ভিতর দিয়ে জীবনের বিচিত্র পিপাসা ও আকর্ষণকেই দেখিয়েছেন—এক স্বেচ্ছাবৃত দহনের দুঃসহ আনন্দই জীবনকে এত আকর্ষণীয় করে তুলেছে। মেহের আলি বিষামৃতময় এই জীবনেরই উন্মত্ত নীলকণ্ঠ।

সহিত প্রথম পরামর্শ করিয়া বিশ্ববিধাতা সকল কাজ করিয়া থাকেন।...লোকটা সামান্য উপলক্ষ্যে কখনও বিজ্ঞান বলে, কখনও বেদের ব্যাখ্যা করে আবার হঠাৎ কখনও পার্সি বয়েত আওড়াইতে থাকে; বিজ্ঞান, বেদ এবং পার্সি ভাষায় আমাদের কোনরূপ অধিকার না থাকাতে তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল।"

মূল গল্পটি উত্তম পুরুষে রচিত হয়েছে। গল্প কথকের অসাধারণ চরিত্র ও রহস্যময় ব্যক্তিত্ব গল্পটির অনেকখানিই রচনা করেছে। কবির থিয়সফিস্ট আত্মীয়টির কথক সম্পর্কে ধারণা গল্পের সেটিংকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। নব-পরিচিত অসাধারণ ব্যক্তিটির মুখে হ্যামলেটের বিখ্যাত উক্তিটির আবৃত্তি পরি-বেশকে আরো জমিয়ে তুলেছে। দৃশ্যমান জগতের বাইরে অদৃশ্য লোকের গূঢ় সংকেত এখানে আভাসিত হয়ে উঠেছে—গল্পটির স্বরূপ-ধর্মই যেন এখানে সুকৌশলে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে।

ছোট গল্পের ব্যঞ্জনাধর্মিতা গল্পটির শেষাংশে এক অতর্কিত ও আকস্মিক পরি-সমাপ্তির মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছে। গুলবাগের ইরাণী ক্রীতদাসীর অর্ধসমাপ্ত কাহিনী গল্পটির উপরে রহস্যের যবনিকা টেনে দিয়েছে। গল্পটি শেষ হওয়ার আগেই ট্রেন এসে পড়েছে। এই জাতীয় শিল্পকৌশল না করলে গল্পটি আর্টের দিক থেকে পরিপূর্ণ হতে পারত না। ইরাণী ক্রীতদাসীর বিড়ম্বিত জীবনকাহিনী শোনার কৌতূহল গল্পলোভী পাঠকের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু গল্পটির সবটুকু বললে এর সুন্দর ভারসাম্য নষ্ট হতো। একটি নির্মম কাহিনীর আভাস দিয়েই কবি গল্পটির যবনিকা টেনেছেন। এর পরের কাহিনী পাঠকের অনুমানে ও কল্পনায় রচিত হয়েছে। কবি আসল গল্পের বস্তুঅংশ পরিত্যাগ করে ভাবের নির্যাসটুকু পরিবেশন করেছেন। ইরাণী বাঁদির অর্ধসমাপ্ত কাহিনী যে করুণ মধুর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে, সম্পূর্ণ কাহিনী উদ্ঘাটিত হলে তা নষ্ট হতো, আধুনিক ছোটগল্পের তীক্ষ্ণতাও থাকত না। গল্পটি লেখার বাইশ বছর পর কবি একখানি চিঠিতে লিখেছেন: "ক্ষুধিত পাষাণে ইরাণী বাঁদির কথা জানবার জন্যে আমারও খুব ইচ্ছে আছে কিন্তু যে-লোকটা বলতে পারত আজ পর্যন্ত তার ঠিকানা পাওয়া গেল না।"[৯] কবি কৌতুকের সঙ্গে এই মন্তব্যটি করলেও, তাঁর আসল মনোভাবটি বুঝতে অসুবিধা হয় না।

৯। ভানু সিংহের পত্রাবলী (১নং), ৩রা ভাদ্র ১৩২৪।

রবীন্দ্রনাথের অনেক আগেই ইয়োরোপ ও আমেরিকার কোনো কোনো গল্পকার এই রসটিকে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। অতিপ্রাকৃত রস ও ফ্যান্টাসি সৃষ্টিতে এডগার অ্যালেন পো-র অগ্রগণ্য ভূমিকাটি স্মর্তব্য। বিশ্ব-ছোটগল্পের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম এই রসটিকে উচ্চতর শিল্পে মণ্ডিত করেছিলেন। পো-র অভিশপ্ত জীবনের অসুস্থ মনোবিকার ও আতংকপাণ্ডুর বিভীষিকাগ্রস্ত দৃষ্টি তাঁর গল্প ও কবিতায় মৃত্যুবিবর্ণ ছায়া ফেলেছে। প্রেতায়িত শিহরণ, মৃত্যুহিম পরিবেশ ও অমানুষিক বীভৎসতা পো-র গল্পগুলির স্বরূপ-ধর্ম। পো-শিষ্য স্টিভেনসনের রোগজর্জর মনও অদ্ভুত ও আশ্চর্য পৃথিবীতে অভিসার করেছে। তাঁর কাহিনীগুলিতে প্রেতপিংগল রহস্যব্যঞ্জনা ও অসুস্থ কল্পনা-সম্ভূত দুঃস্বপ্নের অজানা শিহরণ আছে। পো-স্টিভেনসনের গল্পের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। অতিপ্রাকৃতের চির সহচর প্রেতায়িত শিহরণ। পো ও স্টিভেনসনের গল্প পাঠে রোমাঞ্চকর অনুভূতি সঞ্চারিত হয়। শ্বাসরোধকারী থমথমে আবহাওয়া ও প্রেতায়িত বীভৎসতা তাঁদের গল্পগুলিকে দুঃস্বপ্নের রহস্যজাল দিয়ে ঘিরে রেখেছে। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্প পাঠের ফলশ্রুতি তেমন নয়। এখানে বাদশাহি যুগের রোমান্স রসকে কল্পনার বিচিত্র স্ফটিক পাত্রে পরিবেশন করা হয়েছে। আতংক-বিহ্বল শিহরণ বা দুঃস্বপ্নঘেরা বীভৎসতা এখানে অনুপস্থিত। এক সৃষ্টিশীল কল্পনার প্রবাল-দীপ্তিতে বিষামৃতময় জীবনলীলার একটি নির্মম সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে। বীভৎসতা ও অসুস্থ মনোবিকারের অন্ধ দুর্বাসনা এখানে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। অতীত রোমান্সের অভিসিঞ্চনে এখানে সতেজ কল্পনার সমগ্র সম্পূর্ণ দিব্যমূর্তি উদ্ভাসিত।

॥ ৩ ॥

'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটির রচনাকৌশলও উল্লেখযোগ্য। মূল গল্পটির একটি ভূমিকা ও সংক্ষিপ্ত উপসংহার আছে। এই মুখবন্ধ ও উপসংহার মূল গল্পটির শিল্পোৎকর্ষ বাড়িয়ে তুলেছে। গল্পটি বলা হয়েছে জংশন স্টেশনের ওয়েটিংরুমে —'তখন রাত্রি সাড়ে দশটা।' গল্পটির যিনি কথক তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি : "তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া প্রথমটা তাঁহাকে পশ্চিম দেশীয় মুসলমান বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া আরও ধাঁধা লাগিয়া যায়। পৃথিবীর সকল বিষয়েই এমন করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার

অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। 'আরব বেদুইন' হওয়ার দুরন্ত আশা এক সময় কবির মনে জেগেছিল। সে আশা মিটিয়েছেন 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে—কবির যাযাবর কল্পনা 'অন্ধকার নিশীথে সুপ্তিমগ্ন বাগদাদের নির্বাপিতদীপ সংকীর্ণ পথে কোন এক সংকটসংকুল অভিসারে' যাত্রা করেছে।

'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটিকে কোনো কোনো সমালোচক অতিপ্রাকৃত রসের গল্প বলেছেন। কিন্তু শুধু এই বিশেষণেই গল্পটির অন্তরাত্মার পরিচয় পাওয়া যায় না। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে কবি যে ফ্যান্টাসি সৃষ্টি করেছেন, তার এমন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে, যা বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসেও দুর্লভ। এক সময় অতিপ্রাকৃত রস গথিক উপন্যাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই বিবেচিত হত। কিন্তু বর্তমানকালে প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের হাতে এই রসটি নবরূপ লাভ করেছে। আধুনিক যুগে মনোবিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির সঙ্গে অতিপ্রাকৃত রসের গল্পগুলি অভিনব অর্থগৌরবে তাৎপর্যমণ্ডিত হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাহিনীতে মন্ত্র-তন্ত্র, জিন-ভূত-পরী, অলৌকিক ও অসম্ভব ঘটনার অভাব ছিল না, কিন্তু বাস্তব জীবনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। আধুনিক যুগে মানবমনস্তত্ত্বের সঙ্গে এই রসটিকে সমন্বিত করে সম্পূর্ণ লৌকিক ও স্বাভাবিক করে তোলা হয়েছে। মধ্যযুগীয় রোমান্স কাহিনীগুলির অতিপ্রাকৃত রসের সঙ্গে আধুনিক যুগের অতিপ্রাকৃত রসের এইখানেই পার্থক্য। একজন অধুনিক সমালোচক বলেছেন :

"Garments that lend invisibility to their wearers, inexhaustible purses, instruments that foretell the future, tricks that cheat death, and magic-working objects like Aladdin's lamp are some of the supernatural devices they have employed. More recently they have begun to delve into abnormal psychology, using the double self, the death instinct, dream symbolism and the more curious manifestations of ambivalence in their stories to give them new meaning and greater conviction."[৮]

৮। Introduction : Great Tales of Fantasy and Imagination, Edited By Philip Van Doren Stern.

নিশাচর কল্পনার সঙ্গে সমন্বিত হয়ে একটি চমৎকার ছবির সৃষ্টি হয়েছে। রৌদ্রমুগ্ধ উত্তরবঙ্গের নির্জন দ্বিপ্রহরে ইরাণী রোমান্সের স্বপ্নরস ঘনিয়ে উঠেছে ঃ

"কেন জানিনে, মনে হয়, এই রকম সোনালি রৌদ্রে ভরা দুপুর বেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়েছে—অর্থাৎ সেই পারস্য এবং আরব্য দেশ, দামাস্ক, সমর্‌কন্দ, বুখারা—আঙ্গুরের গুচ্ছ, গোলাপের বন, বুলবুলের গান, শিরাজের মদ,—মরুভূমির পথ, উটের সার, ঘোড়সওয়ার পথিক, ঘনখেজুরের ছায়ায় স্বচ্ছজলের উৎস,—নগরের মাঝে মাঝে চাঁদোয়া খাটানো সংকীর্ণ বাজারের পথ, পথের প্রান্তে পাগড়ী ও ঢিলে জামা-পরা দোকানী খর্মুজ এবং মেওয়া বিক্রি করছে; পথের ধারে বৃহৎ রাজপ্রাসাদ, ভিতরে ধূপের গন্ধ, জানালার ধারে বৃহৎ তাকিয়া এবং কিংখাব বিছানো; জরির চটি, ফুলো পায়জামা এবং রঙিন কাঁচলি পরা আমিনা, জোবেদি, সুফি, পাশে পায়ের কাছে কুণ্ডলায়িত গুড়গুড়ির নল গড়াচ্ছে, দরজার কাছে জমকালো কাপড়পরা কালো হাব্‌শি পাহারা দিচ্ছে, এবং এই রহস্যপূর্ণ অপরিচিত সুদূর দেশে, এই ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্যময় ভয়ভীষণ বিচিত্র প্রাসাদে মানুষের হাসি কান্না আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কত শত সহস্র রকমের সম্ভব অসম্ভব গল্প তৈরি হচ্ছে।"[৬]

শাহিবাগের নির্জন প্রাসাদের সঙ্গে আরব্য উপন্যাসের কাহিনীর কিছু আভাস দেওয়া হয়েছে। 'আমিনা, জোবেদি ও সুফি'র বিচিত্র কাহিনী থেকেই কবি প্রধানত গল্পটির বর্ণনা অংশ গ্রহণ করেছেন।[৭] প্রাচ্য রোমান্সের রসভাণ্ডার থেকে কবি এই কাহিনীর কিছু কিছু উপকরণ সংগ্রহ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কবিকল্পনার দীপ্তি একে অসাধারণ সৃষ্টিতে পরিণত করেছে। শাহিবাগের জজ সাহেবের অট্টালিকা সম্ভবত মুঘল যুগের শেষদিকে নির্মিত হয়েছিল। প্রত্যক্ষ ভাবে এই প্রাসাদ 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর পটভূমি, কিন্তু কবিকল্পনায় আরব্যরজনীর মোহময় পরিবেশ

৬। ছিন্নপত্র, সাহাজাদপুর, ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৪।

৭। রিচার্ড বার্টন সম্পাদিত আরব্য উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের 'The Porter and the three ladies of Bagdad' গল্পটি দ্রষ্টব্য।

ফুস্‌ফাস্‌। অন্দর মহলে খোলা তলোয়ার হাতে হাবসি খোজারা পাহারা দিচ্ছে। বেগমদের হামামে ছুটছে গোলাব জলের ফোয়ারা, উঠছে বাজুবন্ধ-কাঁকনের ঝনঝনি।"[৪]

'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে বাদশাহি যুগের যে বর্ণময় পটভূমিকা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তার সঙ্গে কবি বর্ণিত এই ছবিগুলির নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। সুবিস্তৃত অবকাশ ও নির্জন প্রহরগুলি কবি অধ্যয়ন ও কাব্য রচনা করে কাটিয়ে দিতেন। সত্যেন্দ্রনাথের বিরাট লাইব্রেরী থেকে তিনি নিজের খুসিমতো বই নিয়ে পড়তেন, কখনো কবিতা লিখতেন, কখনো গানে সুর দিতেন, আবার কখনো বা সঞ্চয়িত জ্ঞানভাণ্ডার অবলম্বন করে প্রবন্ধ লিখতেন। এই সময় রচিত কবিতাগুলির মধ্যে কবিহৃদয়ের রোমান্টিক বাসনাগুলি অস্পষ্ট নীহারিকার মতো সঞ্চরণশীল। ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটির জন্মলগ্নে কবির মানসিক অবস্থার একটি সুন্দর ছবি পাওয়া যায়।

'সকলের উপরের তলায় একটি ছোট ঘরে আমার আশ্রয় ছিল। রাত্রেও আমি সেই নির্জন ঘরে শুইয়া থাকিতাম। শুক্লপক্ষের কত নিস্তব্ধ রাতে আমি সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাদটাতে একলা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। এইরূপ একটা রাত্রে আমি যেমন খুসি ভাঙ্গা ছন্দে একটা গান তৈরী করিয়াছিলাম।—পরে ভদ্রছন্দে বাঁধিয়া পরিবর্তিত করিয়া তখনকার গানের বহিতে ছাপাইয়াছিলাম— কিন্তু সেই পরিবর্তনের মধ্যে, সেই সাবরমতী নদী তীরের সেই ক্ষিপ্ত বালকের নিদ্রাহারা গ্রীষ্ম রজনীর কিছুই ছিল না। "বলি ও আমার গোলাপবালা" গানটা এমনি আর এক রাত্রে লিখিয়া বেহাগ সুরে বসাইয়া গুণ গুণ করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছিলাম। 'শুন নলিনী মেলো গো আঁখি," "আঁধার শাখা উজ্জ্বল করি" প্রভৃতি আমার ছেলেবেলাকার গান এইখানেই লেখা।"[৫]

॥ ২ ॥

"ক্ষিপ্ত বালকের নিদ্রাহারা গ্রীষ্ম রজনী" কাব্যে-সংগীতে ও বিমুগ্ধ স্বপ্নাতুরতায় মুখর হয়ে উঠেছে। 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর পশ্চাৎপট আরব্য রজনীর

৪। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬২৭—৬২৮।

৫। জীবনস্মৃতি (রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা), পৃঃ ২০৪।

নদী তীরের জজসাহেবের নির্জন পাষাণপুরীই কিশোর কবির কল্পনাকে শত শিখায় বহ্নিমান করে তুলেছিল। পরবর্তী কালে কবি বলেছেন ঃ

"শাহিবাগে জজের বাসা। ইহা বাদশাহি আমলের প্রাসাদ, বাদশাহের জন্যই নির্মিত। এই প্রাসাদের প্রাকারপাদমূলে গ্রীষ্মকালের ক্ষীণস্বচ্ছস্রোতা সাবরমতী নদী তাহার বালুশয্যার এক প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। সেই নদী তীরের দিকে প্রাসাদের সম্মুখভাগে একটি প্রকাণ্ড খোলা ছাদ। মেজদাদা আদালতে চলিয়া যাইতেন। প্রকাণ্ড বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেহ থাকিত না—শব্দের মধ্যে কেবল পায়রাগুলির মধ্যাহ্নকূজন শোনা যাইত। তখন যেন আমি একটা অকারণ কৌতূহলে শূন্য ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম।"[২]

এরও ত্রিশ বছর পর কবি শাহিবাগের বাদশাহি প্রাসাদের কথা বলেছেন আরো সুন্দর করে ঃ

"আমেদাবাদের একটা পুরনো ইতিহাসের ছবির মধ্যে আমার মন উড়ে বেড়াতে লাগল।...সামনে প্রকাণ্ড চাতাল, সেখান থেকে দেখা যেত সাবরমতী নদী হাঁটুজল লুটিয়ে নিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে বালির মধ্যে। চাতালটার কোথাও কোথাও চৌবাচ্ছার পাথরের গাঁথনিতে যেন খবর জমা হয়ে আছে বেগমদের স্নানের আমিরিআনার।...আমেদাবাদে এসে এই প্রথম দেখলুম চলতি ইতিহাস থেমে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে তার পিছন ফেরা বড়ো ঘরোয়ানা। তার সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষের ধনের মতো মাটির নীচে পোঁতা। আমার মনের মধ্যে প্রথম আভাস দিয়েছিল 'ক্ষুধিত পাষাণ' এর গল্পের।"[৩]

অশীতিস্পৃষ্ট কবি সেদিনের অতীতচারী স্বপ্নবিলাসের স্মৃতি-রোমন্থন করেছেন। প্রাচীন প্রাসাদের মর্মর-মসৃণ পাষাণ দর্পণে সেদিন প্রতিবিম্বিত হয়েছিল অতীত ইতিহাসের কয়েকটি বর্ণবিচিত্র অধ্যায় ঃ

"সে আজ কতশত বৎসরের কথা। নহবৎখানায় বাজছে রোশনচৌকি দিনরাত্রে অষ্টপ্রহরের রাগিণীতে, রাস্তায় তালে তালে ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠছে, ঘোড়সওয়ার তুর্কি ফৌজের চলছে কুচকাওয়াজ, তাদের বর্ষার ফলায় রোদ উঠছে ঝকঝকিয়ে। বাদশাহি দরবারের চারদিকে চলেছে সর্বনাশ কানাকানি

২। জীবনস্মৃতি (রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা), পৃ ৮৫

৩। ছেলেবেলা, পৃঃ ৬২৭, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষড়বিংশ খণ্ড।

প্রবন্ধ পত্রিকা

বর্ষ ২ সংখ্যা ১১ ॥ ফাল্গুন ১৩৬৮ ॥ মার্চ ১৯৬২

রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ'

রথীন্দ্রনাথ রায়

'ক্ষুধিত পাষাণ' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প। শুধু তাই নয় অসামান্য গল্পটিতে কবিকল্পনার এমন একটি সুদুর্লভ নেপথ্যলোক উদ্ভাসিত হয়েছে, বিশ্বসাহিত্যের কথামালার ইতিহাসেও যার দোসর মেলা সহজ নয়। রবীন্দ্রসাহিত্যে অনেকগুলি 'জুড়ি' আছে, প্রথমবার লিখে তেমন মনঃপূত না হওয়ায় দ্বিতীয়বার একই বিষয় অন্যভাবে লিখেছেন। প্রসঙ্গত, 'দুই বোন' ও 'মালঞ্চ'—এই উপন্যাসযুগলের কথা উল্লেখ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতার একাধিক পাঠান্তরের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। কিন্তু 'ক্ষুধিত পাষাণ' এমন সমগ্র ও সম্পূর্ণ যে, দ্বিতীয়বার রোমন্থনের কোনো প্রয়োজন হয় নি। অথচ গল্পটি কবির মনে দীর্ঘ সতের বছর ব্যাপী স্মৃতি ও কল্পনার সুকুমার স্নেহ ছায়ায় লালিত হয়েছিল। সতের বছর বয়সে দেখা শাহিবাগের বাদশাহী আমলের প্রাসাদ কিশোর কবিকে স্বপ্নমুগ্ধ করেছিল, দীর্ঘ সতের বছর পর 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটি প্রকাশিত হয়।[১] এই দীর্ঘকাল কবির মনের নিভৃতে বাসনা ও বেদনার বর্ণে পাণ্ডুলিপি রচনার কাজ চলেছিল।

'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের জন্মলগ্নের ইতিহাস কবির স্মৃতিলোকে এক স্বপ্নসর্গ রচনা করেছিল। বিলাত যাওয়ার আগে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ কবিকে আমেদাবাদে নিয়ে গেলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন আমেদাবাদের সেসন জজ। তাঁর পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী পুত্রকন্যাদের নিয়ে তখন বিলাতে। সাবরমতী

১। সাধনা : শ্রাবণ ১৩০২।

প্রকাশ হয়েছে
ফসল প্রকাশনীর
প্রথম বই

নিতাই বসুর
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

এ এক পরম আশ্চর্য। অন্তত আমাদের নিরুদ্বিগ্ন জীবনের নিরবচ্ছিন্ন একঘেয়েমির কাছে এ নায়কের নীলকণ্ঠ-বৃত্তি এক অদ্ভুত বিস্ময়ের দ্যোতক। প্রতিভা ছিল, অর্থপ্রাপ্তির সুবিধা ছিল, জীবনে সুখী হওয়াও যার কাছে মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না, সেই নায়কের জীবনের যবনিকা পতন হোল কিনা এক চরমতম আত্মক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে। আত্মযন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে।

বোধ হয় এই পরিণতিই তাঁর পক্ষে অনিবার্য ছিল। যিনি জীবনে অন্যায় ও অসত্যের সংগে আপোষ করে চলতে শেখেন নি, নিজের বাসনার বৃহত্তম মূল্যকে যিনি একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, বঞ্চনা ও বেদনা নিত্য সংগী হয়েও যাঁকে সারস্বত-সংগ থেকে কখনো বিচ্যুত করতে পারেনি, খ্যাতির মোহ ও খাতিরের লোভে যাঁর সুতীব্র উদাসীন্য, সেই বৈরাগ্য সাধকের জীবনের পটভূমিতে আনন্দ বিলাসের কোন চিহ্ন থাকে না।

তাঁর জীবনটাই একটা ট্রাজেডি হয়ে ওঠে কেননা সামাজিক ভালো মন্দের সংগে ব্যক্তিক অনুভূতি খাপ খায় না। সেই ট্রাজেডিই যে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং সেই আমরন জীবনই যে নাটকের উপজীব্য, সেই নাটকের উপজীব্য, সেই নাটকের মৃত্যুঞ্জয়ী নায়ক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফসল প্রকাশনী
৩৭ কার্মিনী স্কুল লেন
সালকিয়া, হাওড়া

প্রবন্ধ পত্রিকা

বর্ষ ২ সংখ্যা ১১ ॥ ফাল্গুন ১৩৩৮

॥ সূচীপত্র ॥

রথীন্দ্রনাথ রায়	১—১১	রবীন্দ্রনাথে
আদিত্য ওহদেদার	১২—২৩	কবিজীবনে
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	২৪—৩৯	'বালক'
সমীরকুমার মুখোপাধ্যায়	৪০—৪৪	সাম্প্রতিক
অশোক ভট্টাচার্য	৪৫—৫০	ভারতীয় প্র
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫১—৫৫	সজনীকান্ত
বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য	৫৬—৯৫	তামিল কবি
অদিতিনাথ রায়	৯৬—১০৩	হেমিংওয়ে

প্রচ্ছদশিল্পী : সুবোধ দাশগুপ্ত

সম্পাদক

রামেন্দু দত্ত । চিত্তরঞ্জন ঘে

দাম এক টাকা ॥ ২০, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৫ ॥

চতুরঙ্গ

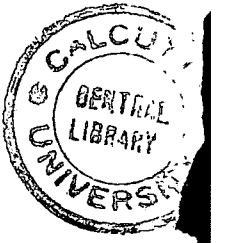

॥ ফাল্গুন—১৩৬৮ ॥

উচ্চ দুই বর্ণের মধ্যেও যে অন্তর্বিরোধ ছিলো তা'র আভাস মেলে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রাজন্যদের এবং শতপথ ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণদের পরস্পরবিরোধী দাবীর মধ্য দিয়ে। আবার ক্ষত্র ও ব্রহ্মের মিলিত শাসন যে একান্ত বাঞ্ছনীয় এরূপ ইঙ্গিতও আছে। মধ্যযুগীয় য়ুরোপে পোপ ও রোমক সম্রাট্‌গণের সংঘর্ষের সংগে কি এর কোনো চরিত্রগত সাদৃশ্য নেই? উত্তর-বৈদিক যুগে এই দুই উচ্চবর্ণের সম্পর্ক সঠিক কী প্রকার ছিলো সেকথা জানা প্রয়োজন। অন্য দিকে সমাজের নাচুতলায় মানুষ উচ্চবর্ণের নিরঙ্কুশ প্রাধান্যের বিরুদ্ধে কি কোনো প্রতিবাদ জানায় নি? বেদমন্ত্র উচ্চারণ এমন কি শ্রবণ করলে পর্যন্ত শূদ্রদের কানে গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া বা জিহ্বা উৎপাটনের যে বিধি ধর্মসূত্রে আছে তা'র দ্বারা কি একথা প্রমাণিত হয় না যে শূদ্রজাতীয়গণ ব্রাহ্মণপ্রাধান্য সময়ে সময়ে অস্বীকার করতো? কোনো একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ধর্মসূত্রকার এবংবিধ বিধান দিয়েছেন এরূপ অনুমান করা সমীচীন নয়। বস্তুতঃপক্ষে বৌদ্ধধর্ম কী শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ্য যাগযজ্ঞাদির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ? বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি ও প্রসারের সংগে সাধারণ মানুষের স্বার্থ কিছু জড়িয়ে ছিলো কি? যদি তাই হয় তবে কেন বুদ্ধদেবের সব চেয়ে বড়ো ভক্ত বিম্বিসার, অজাতশত্রু, প্রসেনজিৎ চণ্ড প্রদ্যোৎ প্রমুখ তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদী শাসকগণ? কী কারণে অনাথ পিণ্ডিকের ন্যায় শ্রেষ্ঠী মহাশ্রেষ্ঠিগণ গ্রহণ করেছিলেন সদ্ধর্ম? কেন ভগবান্ বুদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘে দাসদের প্রবেশ নিষেধ করে দিয়েছিলেন? ভগবান্ বুদ্ধের দেশ কপিলবস্তুতে কেন তাঁর মহাভিনিষ্ক্রমণের পরেও দাস-বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিলো?

উপরে যে প্রশ্নগুলি অথবা ইঙ্গিত সমূহ তুলে ধরা হয়েছে সেগুলি একান্ত ভাবে আমার ব্যক্তি মনের সোচ্চার চিন্তার পর্যায়ভুক্ত। তবে একথা বলা চলে যে ইতিহাস-গবেষণার সনাতনী পথ ছেড়ে যদি সমাজতাত্ত্বিকের নির্দেশিত পথে চলার চেষ্টা শুরু হয়, তবে তা হবে ফললাভের শুভ দ্যোতক। যে তরুণ ঐতিহাসিকেরা এপথে অগ্রসর হচ্ছেন তাঁদের স্বাগত জানাই। তবে মনে হয় সর্ব-ভারতীয় ও সর্বাঙ্গীন সমাজেতিহাস প্রণয়নের অসফল প্রয়াস না করে প্রথমে আঞ্চলিক ইতিহাস সংকলিত হোক ভূতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, ভাষাতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকের যৌথ প্রচেষ্টায়। এইরূপ প্রচেষ্টার সাফল্যের উপর নির্ভর করবে বিভিন্নযুগে ভারতীয় জন-জীবনের বিচিত্র ইতিবৃত্তের গ্রন্থনা।

মনুষ্য সমাজের আর্থনীতিক বিবর্তনের যে সুনির্দিষ্ট ধারা গবেষকগণ আবিষ্কার করেছেন, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তা' প্রয়োগ করার চেষ্টা খুব কিছু হয় নি। আর্থনীতিক ব্যবস্থায় জটিলতা বৃদ্ধির সংগে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হয়ে যায় এবং উৎপাদন সম্পর্ক বহুলাংশে সামাজিক প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তির সূচকরূপে দেখা দেয় সে কথা ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ এতাবৎ প্রায় বিস্মৃত হয়ে রয়েছেন। সেই কারণে ভারতীয় ইতিহাসের দাসশ্রম-নির্ভর অর্থনীতি সামন্তভিত্তিক সমাজব্যবস্থার কোনো আলোচনা কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত হ'ত না। দাসত্ব সম্পর্কে মেগাস্থেনেসের বা কৌটিল্যের বিশেষ কয়েকটি উক্তিকে সত্য বলে ধরে নেওয়া হ'ত। ধর্ম শাস্ত্রে অথবা বৌদ্ধ সাহিত্যে, এমন কি স্বয়ং মেগাস্থেনেস ও ও কৌটিল্যের লেখায় পর্যন্ত, যে বিভিন্ন প্রকার দাসের উল্লেখ আছে সে সম্পর্কে বস্তুনির্ভর আলোচনা হয় নি। প্রাচীন গ্রীসীয় রোমক অথবা মধ্য প্রাচ্যীয় সভ্যতাগুলির ন্যায় ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও আর্থনীতিক শ্রীবৃদ্ধি দাস শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো কি না আজো পর্যন্ত তা'র আলোচনা কোনো প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ঐতিহাসিক করেন নি। সুখের বিষয় তরুণ ঐতিহাসিকেরা এদিকে মনোনিবেশ করেছেন। রাম শরণ শর্মার 'Sudras in Ancient India' দেবরাজ চানানার 'Slavery in Ancient India' পি. সারনের Labour in Ancient India' প্রভৃতি প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সার্থক না হলেও প্রশংসনীয় উদ্যম।

য়ুরোপীয় অর্থে Feudalism এদেশে কোনোদিন প্রতিষ্ঠিত হয় নি এমন কথা আজো আমাদের ঐতিহাসিকেরা বলে থাকেন। সোভিয়েৎ ভারততাত্ত্বিক আন্তানোভা, কালিয়ানভ প্রমুখ মনীষিদের রচনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এ সম্পর্কে নতুন আলোক সম্পতের প্রয়াসে উদ্যোগী হয়েছেন কোশাম্বি, রামশরণ শর্মা, হুসেনি প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ।

শাস্ত্রমতে প্রাচীন ভারতে সমাজ চতুর্বর্ণে বিভক্ত ছিলো। কিন্তু বর্ণবিন্যাস কতোদূর পর্যন্ত আর্থনীতিক শ্রেণীর সমার্থক ছিলো সে সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট আলোচনা না হওয়ার জন্য প্রাচীন ভারতে শ্রেণী সংগ্রামের বিস্তৃতি ও গভীরতা সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ রয়েছি। সাধারণভাবে চতুর্বর্ণের উচ্চ দুই বর্ণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। করভার ও কায়িক শ্রমের সবটুকুই ছিলো বৈশ্য ও শূদ্রদের উপর। বিশেষতঃ উল্লেখযোগ্য এই যে বৈশ্য, শূদ্র ও তথা-কথিত সংকর বর্ণের মধ্যে উপজীবিকাগত প্রভেদ ক্রমশঃ লোপ পেতে থাকে।

ব্যবস্থাকে আয়ত্ত করেছে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও একথা মনে করা হয়তো ভ্রমাত্মক নয় যে উপজাতীয় সমাজগুলির বিশ্লেষণাত্মক এবং তুলনামূলক সমালোচনা (analytical and comparative criticism) করলে প্রাচীন ভারতীয় সমাজদেহের স্বরূপ অনেকাংশে বোঝা যাবে। বর্তমানের সত্য থেকে পিছু হঠে ক্রমে অতীত ও আরো অতীতের সত্যে পৌঁছানের পরোক্ষ এবং আরোহ প্রয়াস আজো পর্যন্ত আমাদের দেশে হয় হয় নি। হয়তো বা ব্যতিক্রম শ্রীযুত নির্মলচন্দ্র বসু মহাশয়ের 'হিন্দু সমাজের গড়ন' এবং ডি. ডি কোশাম্বি বিরচিত 'An Introduction to the Study of Indian History' নামক গ্রন্থদ্বয়।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যেও প্রাচীন ভারতীয় সমাজবিধির কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। হিন্দু সমাজে বিবাহিতা মহিলা সিঁথিতে সিঁদুর দেন। 'সিন্দুর' কথাটি এসেছে চৈনিক 'সিন্-তুঙ' থেকে। চৈনিকদের সংগে ভারতীয়গণের সর্বপ্রথম পরিচয় হয় ১২৮ খৃষ্ট পূর্বাব্দে। অতএব সিন্দুর ধারণের ইতিহাস এই সময়ের পূর্ববর্তী হতে পারে না। সিঁদুর পরার তাৎপর্য নিয়ে প্রচুর মতভেদ আছে। রাক্ষস-বিবাহের স্মৃতিবহ বলে একে অনেকে মনে করেন। কিন্তু যদি এই প্রথা চৈনিকদের কাছ থেকে ভারতীয়গণ গ্রহণ করে থাকেন, তবে রাক্ষস-বিবাহের সংগে নিশ্চয়ই এই প্রথার কোনো যোগসূত্র নেই। হয়তো মূলতঃ সিঁদুর রক্তের প্রতীক ছিলো এবং রক্ত হোলো নতুন প্রাণের ইঙ্গিতবহ। অন্য ভাষায় সিঁদুর পরা Fetility cult এর সংগে সম্পৃক্ত একটি ঐন্দ্রজালিক প্রথা।

সমাজেতিহাস প্রণয়নের যে উপাদান প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে তা'কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা এতোদিন বিশেষ হয় নি। আমাদের জাতিগর্ব এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিলো যে আমরা ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম আমাদের সমাজের বিবর্তন এক বিশিষ্ট ও অনন্য পথে হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় সমাজ-সংগঠনের বিবর্তনের ধারা সাধারণভাবে মনুষ্য সমাজের ইতিহাসের এক অধ্যায় মাত্র। সমাজ বিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ নিয়মের ঊর্ধ্বে তা হতে পারে না। ভারতীয় সাহিত্যিক উপাদানের স্তরীভেদের প্রয়োজন পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এই কার্যে সমাজতাত্ত্বিকের সমাজ-সংস্থিতির রূপান্তর সম্পর্কিত মৌল সিদ্ধান্তগুলিকে স্মরণে রাখলে উপকার পাওয়া যাবে।

জাতির বিশিষ্ট সামাজ আর্থনীতিক, রীতি-নীতি এবং আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা কীভাবে স্বীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে অথবা পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নতুনতর প্রতীতীর সৃষ্টি করেছে তা জানা সমাজেতিহাসের ছাত্রের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। যদিও প্রশ্ন উঠতে পারে জাতিগত সংস্কৃতি (racial culture) বলে বিশিষ্ট কিছু আছে কি না। সামাজ-নৃতাত্বিক গবেষণা যে ভারতীয় সমাজেতিহাস পাঠে কতোদূর প্রয়োজনীয় একটি উদাহরণ থেকে সে কথা বোঝা যাবে। ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্ত থেকে শুরু করে 'মানবধর্মশাস্ত্র' পর্যন্ত সর্বত্র বর্ণপ্রকার উৎপত্তির একই আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। বর্তমান কালের গবেষণায় কিন্তু দেখা যায় যে বর্ণপ্রথার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—পংক্তিভোজন (commensality) এবং বিবাহবন্ধনের বিধিনিষেধ (connubium)—তথাকথিত আর্য-পূর্ব ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিলো। গবেষকগণ প্রমাণ করেছেন যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পীঠস্থান ব্রহ্মাবর্ত বা সামগ্রিকভাবে উত্তর ভারত অপেক্ষা অনার্য দক্ষিণ ভারতে বর্ণপ্রথার কঠোরতা অনেক বেশি। বর্তমানকালীন বিভিন্ন আদিম উপজাতীয় গোষ্ঠীর সমাজবন্ধন থেকেও দেখানো হয়েছে যে, যে অঞ্চলে আর্য-সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই সেখানেও বর্ণপ্রথার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি অন্যান্য totem-নিষেধের (taboo) সংগে সমাজে বিরাজমান। অতএব প্রতীয়মান হয় যে বর্ণপ্রথা আর্যগণের উদ্ভাবিত কোনো রীতি নয়। আর্যগণের কৃতিত্ব এই যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ও কৌমের মধ্যে তাঁরা উচ্চ-নীচ ধারণার (idea of gradation) প্রবর্তন করেছেন।

যজ্ঞসর্বস্ব বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম থেকে কালক্রমে বিবর্তিত হয়েছে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম। বাহন সমেত বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিমা গড়া এবং সেগুলিকে পূজা করা, আম্রপল্লব, ডাব, কলাগাছ, ধান, দুর্বা প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা পর্যন্ত অনেক কিছুই অনার্য জাতিগোষ্ঠীগুলির অবদান। ধর্মশাস্ত্রে এগুলির সাধারণ স্বীকৃতি নেই কিন্তু বাস্তবজীবনে বর্তমানের ন্যায় অতীতেও এগুলি সমাজ সত্য ছিলো। সে কারণে প্রাচীন ভারতের জনগণের প্রাকৃত সংস্কৃতির পরিচয় পেতে হলে আমাদের সমকালীন আদিম উপজাতীয় সমাজ-সংগঠনের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে আধুনিক উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলি বহুলাংশে ব্রাহ্মণ্য সমাজ কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছে। অতীতের রীতি-নীতি ও সংগঠনের অনেক কিছু তারা পরিত্যাগ করেছে ও নতুনতর কোনো

বিধিব্যবস্থা-পদ্ধতি কী প্রকারের ছিলো ? এই প্রকার অনেক প্রশ্ন জাগে যখন আমরা মহাবলিপুরম, মাদুরাই, কাঞ্চী, পুরী, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত মন্দিরগুলি দেখি।

॥ তিন ॥

দেশী ও বিদেশী সাহিত্য পাঠ ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা দ্বারা সমাজেতিহাস রচনার সমস্যাবলীর আলোচনা এতোক্ষণ করেছি। এ বিষয়ে কোনো মোহ থাকা উচিত নয় যে এই বিচ্ছিন্ন ও অপর্যাপ্ত উপকরণগুলি দ্বারা সর্বযুগের সর্বাঞ্চলের সুসন্নিবদ্ধ ধারাবাহিক সামাজ-আর্থনীতিক ইতিহাস রচনা সম্ভবপর হবে। ভূগোল, ভূ-তত্ত্ব, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, সামাজ নৃতত্ত্ব, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি অন্যবিধ বিজ্ঞানের সাহায্যে আমার মনে হয় সমাজেতিহাসের পাদপূরণ সম্ভব। অন্ততঃপক্ষে নিঃসঙ্কোচে একথা বলা চলে যে সাহিত্যিক-প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের তাৎপর্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে এই শাস্ত্রগুলি বিশেষরূপে সহায়ক হবে।

সমাজেতিহাসের আলোচনা স্থান, কাল ও পাত্র নির্ভর। উপমহাদেশীয় বিস্তৃতিসম্পন্ন বিশাল ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সংগঠন, জলবায়ু, ভূমির উর্বরতা প্রভৃতি বিভিন্ন যুগে কী প্রকার ছিলো সে সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন কারণ সামাজিক বিধিব্যবস্থা এবং সামাজ-আর্থনীতিক বুনিয়াদ বহুলাংশে ভৌগোলিক অবস্থার দ্বারা নির্ণীত হয়। নিম্ন সিন্ধু উপত্যকা ও পশ্চিম পাঞ্জাবের যে অংশ বর্তমানে মরুভূমির ন্যায় উষর, সেই অঞ্চল দূর অতীতে কী প্রকারে কমপক্ষে সহস্র বৎসরকালস্থায়ী এক বিশাল নাগর সভ্যতার লীলাভূমি ছিলো তা' সম্যক্ উপলব্ধি করা যাবে প্রাচীনকালে ঐ অংশের ভৌগোলিক অবস্থার সবিশেষ জ্ঞান থাকলে। ভূতাত্ত্বিক গবেষণাও এক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রদ হবে মনে হয়। Carbon 14 পরীক্ষা ও Dendrochronology দেশপরিচয় ও কালনির্ণয়ে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারে।

নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যায় ভারতীয়গণ একটি মিশ্রজাতি। কালানুক্রমে নেগ্রিটো, প্রোটো-অস্ট্রালয়েড (ভেড্ডয়েড), ভূমধ্যসাগরীয়, আলপিনো-আর্মেনয়েড, মঙ্গোলীয় ও নর্ডিক জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে ভারতীয় জাতির সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন জাতির রক্তের সংমিশ্রণ-ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন অনুপাতে হয়েছে। অতএব ভারতীয় সমাজের বিবর্তনের ইতিহাসে বিভিন্ন

রয়েছে এক্ষেত্রে। প্রথমতঃ শিল্পরীতি বিচারে মন্দির ও স্তম্ভগুলির আনুমানিক কাল নির্ণয় করা সম্ভবপর হলেও, অনেক ক্ষেত্রে এ বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না। সেই কারণে মন্দির প্রভৃতি অনুশীলন করে যে সব সামাজিক-আর্থনীতিক তথ্য পাওয়া যায় সেগুলি কোন্‌কালের পক্ষে সামাজিক সত্য তা' সঠিক ভাবে বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ অথবা একক কোনো মূর্তির অঙ্গসজ্জা, রূপচর্চা বা বিভিন্ন লীলাচঞ্চল ভঙ্গী কতদূর বাস্তবানুগ এবং কতোদূর শিল্পী-স্থপতির কল্পনাপ্রসূত? কিন্তু একথা স্মরণ রাখতে হবে শিল্পীর ও সামাজিক বস্তুভিত্তিক অস্তিত্ব আছে। যা সমাজে কোনো না কোনো প্রকারে নেই, তা'র কল্পনাও শিল্পী করতে পারেন না। অতএব পুরী, কোনার্ক অথবা খজুরাহোর মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ চিত্রলিপিমালা যে বহুলাংশে জীবনমুখীন একথা স্বীকারে অসংগত কিছু নেই, তা' ধর্মশাস্ত্রীয় বাধা যতোই থাকুক না কেন। কিন্তু শিল্পীর কল্পনাকেও অস্বীকার করা অসমীচীন। সাঁচী-বরহুত অথবা কোনার্ক খজুরাহো-এর স্ত্রীমূর্তিগুলির আবক্ষ নগ্ন রূপায়ন সমাজের বাস্তব অবস্থার সার্থক প্রতিফলন এমনতর মনে করার কোনো যুক্তি নিশ্চয় নেই। অতএব সাধারণ ও অভিজাত মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিচয় শিল্পবস্তু থেকে পাওয়া গেলেও, তা'কে অত্যন্ত সতর্কতার সংগে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য কর্ম থেকে তৎকালীন আর্থনীতিক জীবনের কথাও কিছু জানা যেতে পারে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। সম্রাট্ অশোক অনেকগুলি বিরাট একশিল স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। এই স্তম্ভগুলি প্রস্তুত করতে এবং বিশেষভাবে উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে বহুদূরে অবস্থিত বিভিন্ন স্থানে স্থাপনা করতে যে প্রচুর অর্থ ও জনশক্তির প্রয়োজন হয়েছিলো ('তারিখ-ই-ফিরূজশাহী'তে তা'র একটি সুন্দর বিবরণী রয়েছে) তা' আসতো কোথা থেকে? এগুলি কি দাসশ্রমে প্রস্তুত (কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে খনি, কর্মান্ত ও বাঁধ নির্মাণের কার্যে দাসদের নিয়োগের উল্লেখ দেখা যায়)? যান্ত্রিক কলা-কৌশলের কিছু ব্যবহার করা হয়েছিলো কি? তা'ই যদি হয় তবে সেগুলি কী প্রকারের? অশোকের স্তম্ভগুলির যে মসৃণতা পূর্ববর্তী বা পরবর্তী অন্য কোনো যুগের স্তম্ভে তা' দেখতে পাওয়া যায় না। অনুমিত হয় যে এই মসৃণতার কৃতিত্ব পারসিক শিল্পীদের। যদি তা'ই হয়ে থাকে তবে পারসিক স্থপতিদের কর্মে নিয়োগের

সামগ্রিকভাবে উৎপাদন-পদ্ধতি কীরূপ ছিলো তা'র সঠিক হদিস্ পাওয়া না গেলেও উৎপাদন সম্পর্ক ও সামাজিক ধনবৈষম্যের আন্দাজ মুদ্রাগুলি থেকে করা যায়। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে তাম্র মুদ্রা পাওয়া গেছে। যে সকল রাজগণ স্বর্ণমুদ্রা প্রচার করেন নি দেখা যায় তাঁরা অনেকেই কিন্তু প্রচুর তাম্র মুদ্রা প্রস্তুত করেছেন।

প্রাচীন লিপিমালা ও মুদ্রাবলী একত্র পাঠে ভারতীয় সমাজেতিহাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য যে সমন্বয়ী প্রকৃতি তা'র পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীসীয়, শক, হূণ, গুর্জর প্রভৃতি বিভিন্ন বৈদেশিক জাতিগোষ্ঠীর সহিত এতদ্দেশীয় জনসাধারণের পারস্পারিক সংঘাত ও সংমিশ্রণের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে ভারতীয় জাতি ও সংস্কৃতি। 'মিলিন্দ পঞ্হো' থেকে প্রথম জানা যায় যে মিনান্দার নামক গ্রীসীয় নরপতি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হোলিওদোরাসের বেসনগর লিপি থেকে আমরা জানি যে তিনি বিদিশায় এসেছিলেন গ্রীসীয় রাজা অন্তলিকিতের (এ্যান্তিয়াল কিদাসের) দূত হিসাবে। তিনি এখানে ভাগবত ধর্ম গ্রহণ করেন। শক নৃপতি মৌএস্-এর মুদ্রায় রয়েছে ত্রিশূলধারী শিবের প্রতিকৃতি। প্রথম কুষাণ রাজ কুজুল কদ্ফিস্ ছিলেন 'সত্যধর্মস্থিত' অর্থাৎ বৌদ্ধ। এই বংশের দ্বিতীয় রাজা বিম ছিলেন ধর্মে মাহেশ্বর; তৃতীয় নরপতি কনিষ্কের মুদ্রায় রয়েছে শাক্যমুনি বুদ্ধের নাম ও প্রতিকৃতি। চতুর্থ বৌদ্ধ ধর্মসংগীতি তাঁ'র সময় আহুত হয়। রাজধানী পুরুষপুরে তিনি নির্মাণ করেছিলেন কনিষ্ক-চৈত্য। পরবর্তীকালে, অগ্নিকুল রাজপুতদের উৎপত্তি ও ধর্মবিশ্বাসের কথা আমরা জানতে পারি গুর্জর-প্রতীহার, পরমার, চাহমান, চন্দেল্ল প্রভৃতি রাজবংশগুলির লিপিমালা থেকে। জীমূতবাহন, রঘুনন্দন প্রমুখ স্মার্ত পণ্ডিতদের বিধিনিষেধের জগদ্দল পাথর চাপা ভারতীয় ব্রাহ্মণ সমাজের কতো বিপরীত এই উদাহরণগুলি। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-সংগঠনে স্থিতিস্থাপকতার যে প্রসাদ গুণ ছিলো তা' মুসলমানী আমলে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় রাজনীতিক কারণে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য সমাজের অবক্ষয় শুরু হয়েছিল বহু পূর্বে। প্রশ্ন ওঠে স্বীকরণের যে স্বভাব শক্তি প্রাচীন সমাজের ছিলো তা' লুপ্ত হয়ে গেলো কী কারণে?

ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের গৌরবময় ঐতিহ্য বহন করছে এদেশের মন্দির ও মূর্তিগুলি। এইগুলির শিল্পগত উৎকর্ষ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সমাজেতিহাস প্রণয়নে এগুলিকে বিশেষ ব্যবহার করা হয়নি। অসুবিধা কিছু

তোয়-পীত-বাহন' বলে বর্ণনা করা হয়েছে তা'র পেছনে বাস্তব সত্য কিছু পরিমাণ ছিলো। ব্যবসা-বাণিজ্যে ধনাগম প্রচুর পরিমাণে হ'ত। বিভিন্ন যজ্ঞ সমাপনের পর সাতবাহন রাজ্ঞী নাগনিকা প্রচুর পরিমাণে কাহাপণ (কার্ষাপণ) প্রতীক নামক রৌপ্যমুদ্রা দক্ষিণাস্বরূপ দান করেছিলেন। ভারতবর্ষে কোনোদিন রৌপ্যের খনি ছিল না। তবে এই রৌপ্য আসতো কোথা থেকে? নিশ্চয়ই লাভজনক বহির্বাণিজ্যের ফলে। প্রশ্ন জাগে, বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির সংগে সংগে সাতবাহন রাজগণ স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করেন নি কেন? বস্তুতঃপক্ষে দ্বিতীয় কুষাণরাজ বিম কদফিসের পূর্বে অন্য কোন ভারতীয় রাজা স্বর্ণমুদ্রা প্রচার করেন নি। তিনিই বা হঠাৎ করতে গেলেন কেন? প্রথমে ভারতে কীলক-চিহ্নিত অঙ্কযুক্ত মুদ্রা (Punch-marked coins) তৈরী হ'ত। এগুলি ধরণ-পূরণ ওজনের। ব্যাক্‌ট্রিয়-গ্রীসীয় রাজগণের মুদ্রাগুলি কিন্তু অ্যাটিক তৌলমানানুসারী। কিন্তু কেন? কুষাণ রাজগণের স্বর্ণমুদ্রাগুলি রোমক সলিডাস ও দীনরিয়াসের অনুরূপ কী কারণে? স্কন্দগুপ্তের রাজত্বের শেষভাগে কী জন্য ভারতীয় সুবর্ণ তৌলমানের পুনঃপ্রবর্তন হয়? স্বর্ণমুদ্রাকে তখনো কেন 'দীনার' বলা হ'ত? ভারতের খনি থেকে সংগৃহীত অথবা নদীকূলে বালি পরিশ্রুত করে অহুত স্বর্ণ থেকে মুদ্রা প্রস্তুত হয় না। খৃষ্টীয় ৬৯ অব্দের পর থেকে রোমক সাম্রাজ্য থেকে স্বর্ণ রপ্তানী সরকারীভাবে বন্ধ হয়ে যায়। তা'হলে প্রশ্ন জাগে কুষাণ বা পরবর্তীকালে গুপ্তরাজগণের প্রয়োজনে স্বর্ণ কোথা থেকে আসতো? বড়ো প্লিনি বিরচিত 'Natural History' থেকে অবশ্য অনুমিত হয় যে অন্ততঃপক্ষে ৭৭-৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রোমক সাম্রাজ্য থেকে ভারতে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ আমদানী হ'ত। পরবর্তীকালে যেখান থেকেই স্বর্ণ ভারতে আমদানী হোক না কেন একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় আন্তর্জাতিক বিনিময়-বাণিজ্যে ভারতীয়গণ অধিকতর লাভবান হ'ত। অন্য ভাষায় উৎপাদন-পদ্ধতি অন্য দেশীয়দের অপেক্ষা ভারতীয়দের অধিকতর উন্নত ছিলো বল চলে। প্রায় সমকালে পশ্চিমে রোমক সাম্রাজ্য এবং ভারতে গুপ্ত সম্রাটগণের পতন ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি করেছিলো সন্দেহ নাই, কিন্তু পরবর্তীকালে ভারতীয় মুদ্রায় স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদি মূল্যবান ধাতুর স্বল্পতা এবং সাধারণভাবে মুদ্রার অপ্রাচুর্য ও শিল্পগত অধঃপতন কী ভারতীয় আর্থনীতিক ব্যবস্থায় বৃহত্তর কোনো অবনতির সূচক নয়?

থেকে। অশোকের বিভিন্ন শিলালিপিতে সমাজের উচ্চ ও নিম্নবর্গের উল্লেখ আছে। সমাজে ধনবৈষম্য যে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিলো তা বোঝা যাবে যেখানে অশোক তাঁর প্রজাদের উপদেশ দিয়েছেন অল্পব্যয় ও অল্পসঞ্চয় (অপ-ব্যয়তা ও অপভাংডতা) সম্পর্কে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন লিপির মাধ্যমে তিনি দাস ও বেতনভুক্ কর্মচারীদের প্রতি দয়া ও সম্যক্ ব্যবহার করার আবেদন জানিয়েছেন। সরকারীভাবে ধনবৈষম্য দূর করার কোনো চেষ্টা হয়েছিল কিনা তা অবশ্য জানা যায় না। তবে প্রজাসাধারণের অবস্থা সাধারণভাবে যে খুব ভালো ছিলো না তা'র পরিচয় পাওয়া যাবে অশোকের লুম্বিনী স্তম্ভলিপি থেকে। ভগবান বুদ্ধের জন্ম-স্থানে তীর্থযাত্রার পর সম্রাট্ অশোক ঐ পুণ্যস্থানের অধিবাসীদের যেটুকু সুবিধা করে দিয়ে ভাবলেন অনেক করা হোলো তা হচ্ছে জমির উৎপাদন কর (ভাগ) কমিয়ে এক-অষ্টমাংশ করে দেওয়া। এই থেকে অনুমান করা যাবে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতির অধীনে প্রজাসাধারণের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ বাস্তবে কতোটুকু ছিলো। একথা কী ভাববার বিষয় নয় যে অশোকের সকল প্রধান লিপিগুলি পাওয়া গেছে তাঁর সাম্রাজ্যের প্রান্তিক অঞ্চলে ? অন্য ভাষায় প্রজাপুঞ্জের ইহলৌকিক-পারলৌকিক মঙ্গল-কামনা অপেক্ষা সীমান্তবর্তী দেশগুলিতে স্বীয়-মাহাত্ম্যের প্রচার বাসনা অশোককে কতো দূরে প্রণোদিত করেছিলে। যদি তাঁর এরূপ কোনো অভীষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্য থাকে তবে তাঁ'র সমকালীন সমাজ-ইতিহাস রচনায় তাঁ'র লিপিগুলির মূল্য বহুলাংশে কমে যাবে। গুপ্তসম্রাট্গণের এবং তাঁ'দের পরবর্তীকালের তাম্রপটগুলি গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে সামন্তভিত্তিক সমাজে করের সমস্ত বোঝা সাধারণ লোকের উপরে ন্যস্ত হয়েছিলো। সাম্প্রদায়িক অশান্তি যে প্রজাদের যথেষ্ট পরিমাণে ছিলো তা' বোঝা যায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের অশোকের পুনঃপুনঃ চেষ্টার মধ্যে।

মুদ্রাগুলি থেকে বোঝা যায় প্রাচীন ভারতীয়দের ধর্মবিশ্বাসের স্বরূপ এবং বিশেষ করে তাঁদের আর্থনীতিক জীবনের কথা। কুষাণ-রাজ কনিষ্ক অথবা গুপ্ত সম্রাট্গণের মুদ্রাগুলিতে অঙ্কিত দেব-দেবীর প্রতিমূর্তি থেকে তৎকালীন ভারতীয়-দের পূজা-উপাসনার পরিচয় সুস্পষ্টরূপে পাওয়া যায়।

মুদ্রাগুলির ধাতুগত উপাদান এবং ওজন আর্থনীতিক ইতিহাসের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। সাতবাহন রাজাদের কতকগুলি মুদ্রায় জাহাজের ছবি অঙ্কিত হয়েছে। বোঝা যায় নাসিক প্রশস্তিতে গৌতমীপুত্রকে যে 'ত্রি-সমুদ্র-

মুদ্রাবলী এবং স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলির সময় কম বেশি নিশ্চিত করে বলা যায়। সেই হিসাবে সাহিত্যিক উপাদানের চেয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্রের মূল্য নিঃসন্দেহে অনেক বেশি। কিন্তু অনুশাসনাবলী ও মুদ্রা প্রস্তুত হয়েছে রাজন্য অথবা অভিজাত বর্গের দ্বারা। অতএব রাজবৃত্তের আখ্যান এগুলি থেকে যতোখানি পাওয়া যায় সামাজ-আর্থনীতিক ইতিহাস ততোখানি নয়। দ্বিতীয়তঃ রাজসভায় ব্রাহ্ম পুরোহিতের প্রাধান্য থাকায় এই অনুলেখ-গুলিতে অনেক সময় সমাজের সত্যকারের রূপায়ন না হয়ে আদর্শায়িত ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। লিপিগুলিতে প্রায়ই দেখা যায় রাজগণ চতুর্বর্ণের রক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন। অথচ পূর্বেই দেখানো হয়েছে যে ভারতীয় সমাজ কোনো কালে চতুর্বর্ণে বিভক্ত ছিলো না।

লিপিগুলির মধ্যে কিন্তু সমাজেতিহাসের প্রচুর উপকরণ ছাড়িয়ে আছে। সমাজের সংগঠন, শ্রেণীভেদ, আর্থনীতিক জীবন ধারার পরিচয় মেলে এগুলি থেকে। পিপ্রাওয়া লিপি থেকে মৌর্য পূর্বকালে শাক্যদের পরিবার সংগঠন কী রকম ছিলো তা জানা যায়। অশোকের লিপিমালা থেকে জানা যায় পরিবারের ভিত্তি ও চরিত্র। সাতবাহন রাজাদের মাতৃনাম বহন অথবা ইক্ষ্বাকু রাজগণের বিচিত্র বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে কী মাতৃসত্তা ও পিতৃ-সত্তার মধ্যে আপোষের ইংগিত পাওয়া যায় না? কদম্ব অথবা পালরাজগণ যখন দাবী করেন যে যথাক্রমে কদম্ব বৃক্ষ ও সমুদ্র থেকে তাঁ'দের উৎপত্তি তখন কী বুঝতে অসুবিধা হয় যে এবংবিধ দাবী টোটেমধর্মী? পল্লব বংশের ঐ প্রকার নামকরণের কারণ কী? নাগরাজগণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিলো অথবা ধর্মবিশ্বাসে বৈষ্ণব ছিলেন বলেই কী গুপ্তরাজগণ গরুড়কে তাঁদের প্রতীক করে নিয়েছিলেন?

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণিকে 'একব্রাহ্মণ' বলে বর্ণনা করা করা হয়েছে কিন্তু সংগে সংগে জানানো হয়েছে যে তিনি হলেন 'ক্ষত্রিয় দর্প-মান-মদন'। শুঙ্গ রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্র ছিলেন বর্ণে ব্রাহ্মণ কিন্তু উপজীবিকায় সেনানী। কদম্ব রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ময়ূরশর্মন্ ছিলেন ব্রাহ্মণ। বাংলার সেনরাজগণ নিজেদের বর্ণনা করেছেন 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়' বলে। এই উদাহরণগুলি থেকে কি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের পারস্পরিক সংঘর্ষ ও সংহতির ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

বস্তুতঃপক্ষে সামাজিক-আর্থনীতিক শ্রেণীবিন্যাসের ধারণা করা যায় লিপিগুলি

the Erythraean Sea'। এই গ্রন্থখানি পশ্চিমী জগতের সংগে ভারতীয়দের বাণিজ্যের ইতিহাস। গ্রীক উদ্যোগে পশ্চিমী জগতের সংগে ভারতের জলপথে বাণিজ্যের পথ সুগম হয় মহাবীর আলেকজাণ্ডারের নৌ-সেনাপতি নিয়ার্কসের সিন্ধু নদ বেয়ে আরব সাগর পারসীক উপসাগর হয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছানোর মাধ্যমে। নিয়ার্কস্ তাঁর যাত্রার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন 'Voyages' নামক গ্রন্থে। Periplusএর রচনাকাল খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষার্ধ। কস্‌মস্ বর্ণিত 'Christian Topography' থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারত-চীন এবং ভারত রোমক বাণিজ্যের বহুতর তথ্য জানা যায়।

চৈনিক পরিব্রাজকেরা এসেছেন ভক্তের মন নিয়ে ভগবান বুদ্ধের দেশে তীর্থ করতে। সামাজিক আর্থনীতিক বিষয়ে তাঁরা যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন না। সে কারণে একমাত্র হিউয়েন সাঙ বিরচিত লেখা 'সি-য়ু কি ভিন্ন' পরিব্রাজকদের ভ্রমণ কাহিনীর সাহায্যে ভারতীয় সামাজ-আর্থনীতিক বিন্যাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে এইরূপ তীর্থযাত্রীর সংখ্যার প্রাচুর্য, তাঁ'দের ভ্রমণপথ, এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উক্তি থেকে সামাজিক ইতিহাসের কিছু উপাদান অবশ্য পাওয়া যায়। চীনা পর্যটকদের ভারতে আগমন এবং ভারতীয় প্রচারক-গণের চীন ও দূর প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে গমনের দীর্ঘ ইতিহাস থেকে তৎ-কালীন ভারতীয়দের সামুদ্রিক বাণিজ্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতির আভাস পাওয়া যায়।

চৈনিক ভ্রমণকারীদের পর এদেশে আসেন আরবীয় ও তুর্কীগণ। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আরবীয় বণিকদের দেখা পাওয়া যায়। মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ভারতীয়দের বাণিজ্যিক প্রয়াস এবং পশ্চিম ভারতীয় সমাজের আংশিক প্রতিফলন হয়েছে সুলেমান, মাসুদি, টবরি প্রভৃতির রচনায়। খৃষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথমার্ধে মনীষি অল্-বিরুনী লিখেছেন তাঁর প্রসিদ্ধ 'তাখিখ্-ই হিন্দ্'। অন্য কোনো বিদেশী ভারত সম্পর্কে এতো বিশদ আলোচনা করেন নি। কিন্তু অল্-বিরুনী ভারত সম্পর্কে যা লিখেছেন তা' হচ্ছে ভারতীয় পুরাণ ইত্যাদির সংক্ষিপ্তসার। অর্থাৎ তাঁ'র সমকালীন ভারতের সত্যকারের সামাজ-আর্থনীতিক কাঠামো কী ছিলো তা' তার লেখা পড়ে জানার উপায় নেই॥

সাহিত্যিক উপাদানের পরে আসে প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান অর্থাৎ পর্বতগাত্রে, স্তম্ভে অথবা তাম্রপটে উৎকীর্ণ লিপিমালা,

সামাজিক-আর্থনীতিক বিন্যাস লক্ষ্য করার সুযোগ হয় পান নি নতুবা চা'ন নি। প্রচলিত জনশ্রুতি শুনে তা'কে সত্য বলে তাঁরা অনেক সময় লিখে গেছেন। তা' ছাড়া অল্প কিছুদিন এদেশে কাটিয়ে কারো পক্ষে এই উপমহাদেশের বহুমুখী বৈচিত্র্যের স্বরূপ সম্যক্ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

উপরিউক্ত সাধারণ ত্রুটিগুলি ছাড়া বিভিন্ন বৈদেশিক লেখকদের বিশিষ্ট কতকগুলি ত্রুটি রয়েছে। গ্রীসীয়-রোমককের কথা প্রথমে ধরা যাক। এঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান হলেন মেগাস্থেনেস। বাস্তব তথ্যানুগত্য অপেক্ষা সাহিত্যিক ঔৎকর্ষের প্রতি তাঁ'র প্রবণতা বিশেষরূপে লক্ষনীয় (তুঃ ভারতীয় নদীগুলি সম্পর্কে উক্তি)। দূরের দেশ ভারতকে আদর্শায়িত করে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা তিনি একাধিক জায়গায় করেছেন (তুঃ দুর্ভিক্ষ ও দাসত্বপ্রথা সম্পর্কিত উক্তি)। ভারতীয় সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক্ সম্পর্ক ও নিয়মাবলীকে অনেক সময় তিনি গ্রীসীয় ধ্যান-ধারণার আলোকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন (তুঃ সপ্তজাতির সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক ; ভারতে হেরাক্লেস্ ও ডায়োনিসিউসের উপাখ্যান)। এতদ্‌সত্ত্বেও একথা অবশ্য স্বীকার্য যে মেগাস্থেনেসের 'ইণ্ডিকা' প্রাচীন ভারতীয় সমাজেতিহাস প্রণয়ণের এক অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বইখানির বর্তমানে কোনো অস্তিত্ব নেই। মেগাস্থেনেসের পরবর্তী গ্রীসীয়-রোমকদের লেখায় তাঁর রচনার উদ্ধৃতি রয়েছে। এই অনুচ্ছেদগুলিকে একত্র সংকলিত করে মেগাস্থেনেসের ভারত-দর্শনের সম্পূর্ণ রূপ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা অবশ্য হয়েছে।

মেগাস্থেনেসের পরবর্তী গ্রীসীয়-রোমক লেখকদের প্রায় কেউই ভারতে আসেন নি। তাঁরা ভারত সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করেছেন মেগাস্থেনের 'ইণ্ডিকা' থেকে। অনেক ক্ষেত্রে তাঁ'রা মেগাস্থেসের বক্তব্য সঠিক বুঝতে পারেন নি। নিজেদের অজ্ঞতাকে ঢাকার জন্য তাঁরা মেগাস্থেনেসকে মিথ্যাবাদী বলে নিন্দাবাদ করেছেন অথবা ইচ্ছাখুসি মতো তাঁর উক্তিকে বিকৃত করেছেন। স্ট্রাবো, ডিওডোরাস ও আরিয়ান লিখিত মেগাস্থেনেসের বর্ণনার সংক্ষিপ্তসার পড়লে উপরি উক্ত বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যাবে।

পরবর্তী কালের গ্রীসীয়-রোমক লেখকগণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের এক অজ্ঞতনামা নাবিক এবং কসমস্ ইণ্ডিকোপ্লিউস্‌টেস্ (ভারত-ভ্রমণকারী)। প্রথমোক্ত জন রচনা করেন 'The Periplus of

তৃতীয়তঃ, ভারতীয় ধর্মীয় সাহিত্যে, বিশেষ করে ধর্মসূত্র, ধর্মশাস্ত্র ও মহাকাব্য দুখানিতে বাস্তব জীবনের প্রতিফলন নেই। সমাজকে একটা সুনির্দিষ্ট কিন্তু অবাস্তব ছকে বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা এগুলিতে হয়েছে। এই শাস্ত্রগুলির সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তি চাতুর্বর্ণ্য। চতুর্বর্ণের উৎপত্তির যে কাহিনী বিভিন্ন শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে তা একান্তরূপে অলৌকিক। তা' ছাড়া আধুনিককালের গবেষণায় দেখা যায় যে ভারতীয় সমাজ কোনো কালে চতুর্বর্ণে বিভক্ত ছিলো না। ধর্মশাস্ত্রকারগণও যে বাস্তব সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না তা'র প্রমাণ তাঁরা সকলেই সংকর বর্ণের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু চতুর্বর্ণ থেকে বিভিন্ন সংকরবর্ণের উৎপত্তির যে সব কারণ (বৃত্তিত্যাগ, ব্যাভিচার ইত্যাদি) তাঁরা নির্দেশ করেছেন সেগুলি একান্ত হাস্যকর।

চতুর্থতঃ এই ধরণের সাহিত্যে যে রীতি নীতিগুলির উল্লেখ আছে সেগুলি একান্তভাবে ঔচিত্যবাচক। বাস্তবজীবনের সংগে যে এগুলির কোনো যোগ ছিলো না তা বোঝা যাবে ধর্মশাস্ত্রোক্ত নিয়মাবলী এবং কাব্য ও নাট্য সাহিত্যের (এমন কি মহাভারতেরও) নায়ক-নায়িকাদের কার্যাবলীর তুলনামূলক বিচারের দ্বারা। 'মৃচ্ছকটিক' বা 'মালতী মাধবের' নায়কদের জীবনযাত্রার পদ্ধতির সমর্থন পাওয়া যাবে ধর্মশাস্ত্রে নয়, বাৎস্যায়নের কামসূত্রে।

সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য, ধর্মশাস্ত্রীয় নিয়মাবলী কেবল সমাজের দুই উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরিপালনীয়, বৃহত্তর জনসাধারণ বৈশ্য শূদ্র ও সংকরবর্ণের লোকদের সামাজিক নিয়মাবলী সম্পর্কে বিশেষ তথ্য ধর্মশাস্ত্রগুলি থেকে পাই না। বরং পাই, বৌদ্ধ ত্রিপিটকে এবং জাতক সাহিত্যের 'পচ্চুপন্নবথ্থু' অংশে। তবে 'বোধিসত্ত্ব' কাহিনীর অবতারণার ফলে আদর্শায়িত রূপায়ণের দিকে প্রবণতা বিশেষ লক্ষ্যণীয়।

দেশীয় সাহিত্য ছাড়া অন্যবিধ সাহিত্যিক উপকরণ হোলো বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণ-কাহিনী। বৈদেশিক পর্যটকেরা হলেন প্রধানতঃ গ্রীসীয়-রোমক, চৈনিক ও ঐস্লামিক। এঁদের প্রদত্ত বিবরণের বিশেষ মূল্য এই যে এঁদের সকলের রচনার সময় জানা আছে। অতএব এই বর্ণনাগুলির মূল্য অপরিসীম। কিন্তু এই বর্ণনাগুলির কতোগুলি মৌল ত্রুটি রয়েছে। ভারতবর্ষ একটি বিরাট দেশ। তা'র বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, ভাষা, ধর্ম ও সামাজিক রীতি-নীতি। বৈদেশিক পর্যটকগণ দেশের সমস্ত অঞ্চলের সমস্ত জনগোষ্ঠীর

এই ঘটনাকে বিভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা করতে হয়েছে। মহাভারতের রচনাকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে যে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক রীতি-নীতি প্রচলিত ছিলো তা'র প্রমাণ পাওয়া যাবে 'বিবাহ সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি, কুন্তীর প্রতি পাণ্ডুর উপদেশ, অর্জুন এবং অভিমন্যু কর্তৃক তাঁ'দের মামাতো বোনদের বিয়ে করা থেকে। একদিকে সত্যবতী উপাখ্যান, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুর, কর্ণ ও পাণ্ডব-ভ্রাতৃবর্গের জন্মকাহিনী ইত্যাদি এবং অন্যদিকে অনুশাসন এবং শান্তিপর্বে বর্ণিত সামাজিক রীতি-নীতি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে মহাভারত বিভিন্নযুগে বিভিন্ন অঞ্চলে লিখিত হয়েছিলো।

অনুরূপভাবে স্ত্রীলোক এবং অনুলোম বিবাহ সম্পর্কে মনুসংহিতায় পরস্পর বিরোধী উক্তি থেকে বোঝা যায় যে মনুসংহিতা এক যুগে রচিত হয় নি।

অতএব সহজেই অনুমেয় যে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের কালানুক্রনিক এবং রচনাস্থানানুযায়ী স্তরীকরণ না হলে, এই বিশাল সাহিত্যিক উপাদানকে সমাজোতিহাস রচনার কাজে সার্থকভাবে লাগানো যাবে না।

সমাজেতিহাস প্রণয়নে সাহিত্যিক উপাদান ব্যবহারের পথে দ্বিতীয় অসুবিধা এই যে কোনো বিশেষ পদের অর্থের প্রসার, সংকোচ অথবা বিকৃতি প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন টীকাকারগণ একই পদের অর্থবোধ বিভিন্নরূপে করেছেন। ফলে মূল সাহিত্যের রচনাকালে সেই বিশিষ্ট পদযুক্ত সূত্রার্থ কী ছিলো তা নিরূপণ করা সম্ভব হচ্ছে না। টীকাকারগণের রচনাকালও কম-বেশি অনিশ্চিত। অতএব সেই বিশেষ সূত্রটি কোন্ যুগে বা কোন্ অঞ্চলে কীরূপ সমাজসিদ্ধ রীতি হিসাবে পালিত হ'ত তা জানা যাচ্ছে না। সূত্রান্তর্গত পদের বাচ্যার্থ নির্ণয়ে অন্যবিধ অসুবিধা রয়েছে। পদের অর্থবোধ দুই প্রকারে করার রীতি প্রাচীন ভারতে চলিত ছিলো, যথা—ঐতিহাসিক এবং বৈয়াকরণিক। পুরাণের অহল্যা কাহিনীর কথা ধরা যাক। ঐতিহাসিক মতে অহল্যা গৌতম মুনির স্ত্রী যাঁর সংগে ইন্দ্রের অবৈধ সম্পর্ক ছিলো। সে কারণে ইন্দ্র হলেন 'অহল্যা-জার'। কিন্তু বৈয়াকরণিক মতে 'অহল্যা' শব্দটির অর্থ শিশিরবিন্দু। প্রভাতী সূর্য শিশিরকণাকে বাষ্পীভূত করে দেয়। সে কারণে সূর্যের অপর নাম 'অহল্যা-জার'। বৈয়াকরণিক অর্থ মেনে নিলে পুরাণোক্ত এই কাহিনী থেকে সামাজিকভাবে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক ঠিক কতোখানি স্বাধীন ছিলো তা বোঝা যাবে না।

আছে। অতএব দেখা যায় যে আমাদের তথাকথিত ঐতিহাসিক সাহিত্য থেকে সমাজেতিহাসের বিশেষ কোনো উপাদান পাওয়া যায় না।

সামাজ-আর্থনীতিক ইতিহাসের প্রচুর উপাদান কিন্তু ছড়িয়ে আছে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত এবং পালি-প্রাকৃত সাহিত্যে। এই সাহিত্যিক উপাদানগুলিকে বৈজ্ঞানিক ভাবে ব্যবহার করার পথে অবশ্য প্রচুর অসুবিধা রয়েছে। ব্রাহ্মণ শাস্ত্রীয় সাহিত্যের কথাই ধরা যাক। বৈদিক সাহিত্য অর্থাৎ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্‌গুলি, ধর্মসূত্র, ধর্মশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদির কোনোগুলিই একযুগে এক ব্যক্তির দ্বারা এক অঞ্চলে লিখিত হয় নি। বহু যুগে বহু ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন প্রয়াসে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে উপাখ্যান ও রীতি-নীতিগুলির সৃষ্টি হয়েছিল এগুলি কম-বেশি তা'র সংকলন মাত্র। কয়েকটি উদাহরণের দ্বারা আমার বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ঋক্ সংহিতার কথাই ধরা যাক্। নবম মণ্ডল ১১২'৩ সূক্তে উল্লিখিত হয়েছে যে এক পরিবারে পিতা ভিষক্, পুত্র উদ্গাতৃ অর্থাৎ সোমগান গায়ক এবং মাতা উপলপ্রক্ষিণী অর্থাৎ শস্যপেষিকা। স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে এই মন্ত্রটি রচিত হওয়ার সময় পর্যন্ত জন্মভিত্তিক জাতিভেদ প্রথারউদ্ভব হয় নি। কিন্তু ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে (১০.৯০.১২) জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে বিরাট্ পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় থেকে রাজন্য, উরুদেশ থেকে বৈশ্য এবং চরণ দুখানি থেকে শূদ্রের উৎপত্তি হয়েছে। অতএব সহজেই অনুমেয় ঋগ্বেদের বিভিন্ন অংশ সমকালীন নয়।

তারপর বৌধায়ন ধর্মসূত্রে লিখিত হয়েছে যে দক্ষিণ দেশে মাতৃ-পিতৃ-স্বসৃ দুহিতৃ-গমন অর্থাৎ মামাতো-পিসতুত বা মাসতুত-ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ সিদ্ধ। কিন্তু উত্তর ভারতের ক্ষেত্রে এ রীতি প্রযোজ্য নয়। আবার উত্তর ভারতের অধিবাসীদের পক্ষে সমুদ্র যাত্রা অন্যায় নয়। বস্তুতঃ পক্ষে অনুমান করার সংগত কারণ আছে যে বৌধায়ন ধর্মসূত্র দক্ষিণাঞ্চলে কোথাও রচিত হয়েছিলো।

দ্রৌপদী কর্তৃক পঞ্চ পতি বরণের কারণ মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে উল্লিখিত হয়েছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ একটি আদিম রীতি। পরবর্তী কালে তা' সমাজসিদ্ধ বলে স্বীকৃত হ'ত না। অথচ মহাভারত থেকে দ্রৌপদী উপাখ্যানকে উঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি। সেইজন্য

জাতীয়তাবোধের উদ্ভব হোলো। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-সভ্যতার অনগ্রসরতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের মতবাদ যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত একথা প্রমাণ করার কাজে কিছু ভারতীয় ঐতিহাসিক এগিয়ে এলেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে প্রাচীন ভারত আধুনিক য়ুরোপের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ছিলেন একথা প্রমাণ করতে তাঁরা মনোযোগী হলেন। ডঃ কাশিপ্রসাদ জয়সবালের 'Hindu Polity' ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের 'Nationalism in Hindu Culture ও 'Local Government in Ancient India এবং ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'Corporate Life in Ancient India' প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে আমার বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস। আধুনিক কালে ভারতীয় প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনাকার্যে এঁরা পথিকৃৎকর্ম করেছেন এবং সেই হেতু নমস্য। তবে তাঁদের প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তার উপর শ্রদ্ধা রেখেও একথা বলা চলে যে তাঁদের প্রণীত ইতিহাস বিদেশী পণ্ডিতগণ কর্তৃক রচিত ইতিহাসের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। বৈজ্ঞানিক অর্থে সত্য ইতিহাস নয়। অন্ততঃ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরবর্তী যুগে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের স্বরূপ নির্ণয়ের নতুনতর প্রয়াস একান্তরূপে বাঞ্ছনীয়।

॥ দুই ॥

প্রাচীন ভারতীয় সমাজের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার পথে এক বিরাট অসুবিধা হোলো উপকরণের অভাব। দেশে খণ্ডিত, কালে সীমিত যে ইতিহাস, তা'র কোনো ধারণা প্রাচীন ভারতীয়দের ছিলো না। সেইজন্য চীনদেশে যেমন বিভিন্ন রাজবংশের ইতিবৃত্ত রয়েছে ভারতে তেমন নেই। য়ুসিদিদেস্ অথবা পলিবিয়াসের মতো নিরপেক্ষ ইতিহাসকারও এদেশে জন্মান নি। তবে কি ঐতিহাসিক সাহিত্য আমাদের একেবারে নেই? আছে। যেমন কল্‌হনের 'রাজতরঙ্গিনী', বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', বাকপতিরাজের 'গৌড়বহো', সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' অথবা বিল্‌হণের 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত'। কিন্তু এগুলি প্রথমতঃ সর্বভারতীয় ইতিহাস নয়। কল্‌হনের গ্রন্থখানি ব্যতীত অন্য সবগুলিই একজন মাত্র রাজার কাহিনী। দ্বিতীয়তঃ এগুলি প্রায় সবই সভা-কবির রচনা। অতএব একদেশদর্শী। সর্বশেষে সাধারণ মানুষের কথা এগুলিতে খুব কমই

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতার রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির বাৎসরিক সভায় ভাষণদান কালে স্যার উইলিয়ম্ জোন্স্ দেখালেন যে ঋগ্বেদের সংস্কৃত, অবেস্ত-র আদি পারসিক, গ্রীক্, স্লাভ গোষ্ঠিভুক্ত ভাষানিচয়, লাতিন ও জর্মান ভাষার মধ্যে সুনিশ্চিত সাদৃশ্য আছে। এই ভাবে পত্তন হল তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা স্যার উইলিয়মের গবেষণাকে নিজেদের প্রয়োজনে লাগালেন। দুটি প্রতিপাদ্য বিষয়কে তাঁরা স্বীকার করে নিলেন। প্রথমতঃ, উপরিউক্ত ভাষাভাষীবৃন্দ হলেন আর্য এবং আর্যদের আদি বাসস্থান হোলো ভারতবর্ষ। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করলেন যে মূল সংস্কৃত থেকে অন্যান্য আর্য ভাষাগুলির উৎপত্তি হয়েছে। এই প্রকার বিশ্বাস তাঁদের ছিলো বলে তাঁরা ধরে নিলেন যে ভারতীয় আর্যদের প্রাচীন সাহিত্য অর্থাৎ ঋগ্বেদে যে সমাজ সভ্যতার রূপায়ন রয়েছে সামগ্রিকভাবে আদি আর্যদের ক্ষেত্রে সেকথা সত্য। অর্থাৎ ঋগ্বেদের মধ্যে পাওয়া যাবে যন্ত্রশিল্পে প্রাগ্রসর সভ্যতাস্পর্ধী পশ্চিম য়ুরোপীয় সভ্যতার আদিম চেহারা। পাশ্চাত্যের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা শুরু করলেন বেদচর্চা। বেদ-উপনিষদ্ অধ্যয়ন শেষ হলে তাঁরা আরম্ভ করলেন ধর্মসূত্র-ধর্মশাস্ত্র পাঠ। দীর্ঘ গবেষণার পর তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন ব্যবহারিক জীবন যাত্রার পদ্ধতিতে বৈদিক আর্যগণ অত্যন্ত অনুন্নত ছিলো। তাদের রাজনৈতিক সংগঠনও ছিলো অত্যন্ত আদিম। কিন্তু সংগে সংগে তাঁরা বিস্ময়াবিষ্ট হলেন আর্যদের দার্শনিক আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে চিন্তার সূক্ষ্মতা উৎকর্ষ দেখে।

শাস্ত্রীয় সাহিত্য চর্চার পর য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ মনোযোগী হলেন কালিদাস প্রমুখ মহারথীদের কাব্যপাঠে। সাধারণভাবে এখানেও তাঁরা দেখলেন যে বস্তুজাগতিক ব্যাপারে নায়ক-নায়িকারা কেউ বিশেষ উৎসাহী ন'ন। তাঁরা একান্তভাবে রোমন্তিক। ক্লাসিকাল সংস্কৃত নাটক ও কাব্যের তৎকালীন সমাজ ও অর্থনীতির বিশেষ কোনো প্রতিফলন সেজন্য সেখানে নেই।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অথবা বাৎস্যায়নের কামসূত্র যে একান্ত-ভাবে ইহলৌকিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে ব্যস্ত, একথা অস্বীকার না করলেও য়ুরোপীয় মনীষিগণ ভারতীয়দিগকে একান্তভাবে দার্শনিক ও রোমন্তিক, সভ্যতার বস্তুভিত্তিবিমুখ বলে মনে করলেন।

কিন্তু শীঘ্র প্রতিক্রিয়া শুরু হোলো। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য অর্থে

প্রাচীন ভারতীয় সমাজেতিহাস পাঠের ভূমিকা

অধীর চক্রবর্তী

॥ এক ॥

পরিহাসের মতো শোনালেও একথা সত্য যে আধুনিক কালে ভারত-তত্ত্বের গবেষণা ভারতীয় মনীষীরা শুরু করেন নি। এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছিলেন পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী। তাঁদের এই মহৎ প্রয়াসের পরিপ্রেক্ষিত কিন্তু একান্তভাবে ব্যবহারিক জগতের বাস্তব অবস্থার দ্বারা নির্ণীত। খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে পশ্চিম য়ুরোপীয় দেশগুলিতে যন্ত্র শিল্পায়নের প্রসার ঘটে। এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আসে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ শতকে যন্ত্রশিল্পে অনগ্রসর এবং সেই হেতু অনুন্নত দেশগুলিতে পশ্চিম য়ুরোপীয় শক্তিগুলির শাসন ও শোষণ স্থাপিত হয়। কার্যতঃ সুপ্রতিষ্ঠিত এই প্রাধান্য যে ন্যায়রীতি সংগত একথা প্রমাণ করার প্রয়োজন শীঘ্রই অনুভূত হয়। সেই কারণে শাসিত দেশগুলির সামাজ-আর্থনীতিক সংগঠন এবং বাস্তব জীবনযাত্রার মান যে অত্যন্ত আদিম এ কথা প্রমাণ করে দেখাবার চেষ্টা হয় যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বস্তুতঃ পৃথিবীর এই হতভাগ্য দেশগুলির অধিবাসিগণকে ত্রাণ করতে এসেছে। তারা নিঃস্বার্থ ভাবে বহন করে যাচ্ছে শুধু 'white men's burden'। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের এবংবিধ প্রয়োজনে ভারত-চর্চার পত্তন এদেশে হয়েছিল সন্দেহ নেই কিন্তু তা'র চেয়েও বড়ো আরো একটি কারণ ছিল পশ্চিমী পণ্ডিতদের।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপে বিবর্তনবাদ ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছিলো। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ডারউইন তাঁ'র প্রসিদ্ধ 'Origin of Species and the Descent of Man' প্রকাশ করলেন। শিল্প-বিপ্লবোত্তর সামাজ-আর্থনীতিক সংগঠন ও মহান ফরাসী বিপ্লবসঞ্জাত জাতীয়তাবোধকে তখন পশ্চিম য়ুরোপীয় সমাজ মনুষ্য সভ্যতার চরম প্রকাশ বলে স্বীকার নিলো। পাশ্চাত্য মনীষিবৃন্দ উৎসাহী হয়ে উঠলেন তাঁদের সমাজ-সভ্যতার উৎস নির্ণয়ে। দিশারী আলো তাঁরা সামনেই পেলেন।

বিষয়ে বেশ কিছু আলোচনা হয়ে গেছে। আর আলোচনা চলার সাধারণ আসন্ন ষোড়শ অধিবেশনে যেখানে কম-অগ্রসর দেশগুলির অধিকাংশ প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন। তাছাড়া, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধির সুপারিশ মেনে নিয়ে—পশ্চিমী দেশগুলির প্রতিনিধিদের বিরোধিতা সত্ত্বেও—কমিশন এই অর্থে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে যে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরে এই জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার বিষয়টি সম্পর্কে স্থায়ী ভিত্তিতে রাষ্ট্রসংঘকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

এক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের কাজ সুফলপ্রসূ হবে শুধু তখনই যখন বিদেশী পুঁজির বদলে কম-অগ্রসর দেশগুলির জাতীয় স্বার্থ তার প্রয়োজনের দিকে মনোযোগ দেওয়া হবে এবং এইসব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরে সেই সেই দেশের জনগণের পরিপূর্ণ অধিকারকে সুরক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করাটাই হবে রাষ্ট্রসংঘ নিয়োজিত এই কমিশনের মুখ্য লক্ষ্য।

I. Gorev-এর Sovereignty Over Natural Resources & the United Nations প্রবন্ধের অনুবাদ।

প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিদল এই প্রস্তাব সমর্থন এবং কতকগুলি কম-অগ্রসর দেশের প্রতিনিধিরা এই খসড়া-প্রস্তাবের কতকগুলি ধারার গুরুত্ব উল্লেখ করেন।

আরেকটি খসড়া-প্রস্তাব পেশ করেন চিলির প্রতিনিধিরা। খুব উল্লেখযোগ্য একটি ব্যাপার হল এই যে, পশ্চিমী দেশগুলির প্রতিনিধিরা সোভিয়েত খসড়া-প্রস্তাব ভালো করে পড়ে দেখারও আগে যেই পেশ করা হল তৎক্ষণাৎ তার বিরোধিতা করলেন এবং চিলির প্রতিনিধিদের পাল্টা প্রস্তাবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সুরু করলেন।

এর কারণটা কি?

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ এই কমিশনের ওপর যে দায়িত্ব দিয়েছিল তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রেখেই সোভিয়েত প্রতিনিধিরা প্রত্যেকটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরে যেই দেশের জনসাধারণের সার্বভৌম অধিকারকে সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করে তোলার জন্যে কতকগুলি বাস্তব, প্রত্যক্ষ এবং কার্যকরী প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। এই অধিকারকে যাতে কেউ লংঘন করতে না পারে, তার জন্যে বিধিব্যবস্থা সোভিয়েত খসড়া-প্রস্তাবে ছিল এবং এই বিধিব্যবস্থাকে কেউ লংঘন করলে কাকে প্রতিহত করার জন্যে রাষ্ট্রসংঘের কর্তব্য সম্পর্কেও সোভিয়েত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, পশ্চিমী দেশগুলির প্রতিনিধিরা এইটেই পছন্দ করেন নি—যদিও স্পষ্ট করে মুখে একথা বলার সাহস তাঁদের হয়নি।

আর চিলির প্রতিনিধিদের প্রস্তাবে কোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরে সেই দেশের জনসাধারণের সার্বভৌম অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুরক্ষিত করার বদলে বরং প্রকারান্তরে কম-অগ্রসর দেশগুলির প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনকারী বিদেশী একচেটে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলির স্বার্থকে তার সুবিধাভোগী অধিকারকেই সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা ছিল। বাস্তবিক পক্ষে, চিলির প্রস্তাবে এখন কতকগুলি ধারা ছিল যার দ্বারা ওই জাতীয় সার্বভৌম অধিকারকে লংঘন করা যায়। চিলির এই প্রস্তাবে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, দখল নেওয়া, স্বত্বনিরসন ইত্যাদি জাতীয় অধিকারের প্রয়োগকে এখন কতকগুলি শর্তে বাঁধা হয়েছিল যাতে এগুলি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

পশ্চিমী দেশগুলির সমর্থনের ফলে চিলির খসড়া প্রস্তাবটি গৃহীত হলেও, প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরে জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রশ্নটির মীমাংসা এখনও হয়নি। জুলাই মাসে রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধিবেশনে এই

সমস্ত উৎসের ও কেন্দ্রের মালিক এবং এইসব প্রাকৃতিক সম্পদের নতুন নতুন ক্ষেত্র সন্ধানের ও গবেষণা, জরিপকার্য ইত্যাদি চালানোর এ কথাও অধিকারীও তারাই। তাছাড়া, ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত এই কোম্পানিটি সমস্ত উত্তর-রোডেসিয়ার শাসনকার্যও চালিয়েছে। অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে এই কোম্পানিটিই ছিল গোটা দেশের একচ্ছত্র মালিক।

ভূতপূর্ব বেলজিয়ান কঙ্গোয় আন্তর্জাতিক একচেটে প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন নিনিয়ের ত্যু হাউট-কাটাঙ্গা কঙ্গোর সমস্ত খনিজ সম্পদের ৯০ শতাংশ দখল করেছিল। এরই ফলে এই কোম্পানিটি ধনতান্ত্রিক বিশ্বে মোট কোবল্ট খনি থেকে উদ্‌ধৃত হয় তার ৬০ শতাংশ, মোট ইউরেনিয়নের ১০ শতাংশ, মোট তাম্রের ৮ শতাংশ এবং আরও কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ধাতুর মোট পরিমাণের একটা বড়ো অংশ দখল করেছিল। কঙ্গোর জনসাধারণ যদি এই বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের সার্বভৌম মালিক হত, তাহলে তাদের জাতীয় অর্থ-নীতি আজ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারত!

কিন্তু একথা মনে করলে ভুল হবে যে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরে সার্বভৌম অধিকার লংঘনের ব্যাপারটি শুধু উপনিবেশ আর অছিভুক্ত দেশগুলির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরেও ভূতপূর্ব উপনিবেশগুলির বহু জাতি আর্থিক ও অর্থ নৈতিক পরাধীনতার গ্লানিময় ঐতিহ্যকেই মেনে চলেছে তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ-ভাণ্ডার দীর্ঘকাল ধরে বিদেশীদের হাতেই থেকে যাচ্ছে। কম-অগ্রসর দেশগুলির জনগণ এই অর্থ নৈতিক পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করলেই সাম্রাজ্যবাদীরা অর্থ নৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করা থেকে খোলাখুলি সশস্ত্র আক্রমণ পর্যন্ত সব রকমের প্রত্যাঘাত করে থাকে। সুয়েজ খালের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ আর কিউবার ওপরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাম্প্রতিক সশস্ত্র আক্রমণ চালানোর সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলীর কথা স্মরণ করলেই যথেষ্ট হবে।

এইসব তথ্য থেকেই দেখা যাচ্ছে যে কোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরে সেই দেশের জনগণের সার্বভৌমত্বকে শক্তিশালী করে তোলার জন্যে রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব দেওয়া এ সুপারিশ করা খুবই যুক্তিসংগত। এইজন্যেই এ বিষয়ে বাস্তব ও কার্যকরী কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বনের একটি খসড়া-প্রস্তাব সোভিয়েত প্রতিনিধিদল পেশ করেন। আফগানিস্তান ও সংযুক্ত আরব

দেওয়া হয়নি, ঔপনিবেশিক ও পরাধীন ভূখণ্ডগুলিতে শেতাঙ্গ ও দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে কারা কতটা জমির মালিক সে সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই, অর্থনীতির দিক দিয়ে কম-অগ্রসর দেশগুলির ওপরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি আর তাদের একচেটে প্রতিষ্ঠানগুলি যেসব শেকলে বাঁধা চুক্তি চাপিয়ে দেয়, সে সম্পর্কেও কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি।

এইসব বিষয়ে বহুজ্ঞাত তথ্যগুলিকে পশ্চিমী শক্তিগুলির প্রতিনিধিরা আর রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরের কর্মকর্তারা খণ্ডন করতে পারেন নি। এই সমালোচনাগুলি যে সঠিক, সে কথা স্বীকার করতে তাঁরা বাধ্য হন। তখন এই পর্যালোচনা বিবরণটিকে সংশোধন করে আবার নতুন করে লেখার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়; কিন্তু বর্তমানের এই সংশোধিত আকারেও এ বিষয়ে পুরোপুরি সমস্ত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

এই সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত কমিশনের সাম্প্রতিকতম তৃতীয় অধিবেশনে সোভিয়েত প্রতিনিধি এ বিষয়ে তাঁর ভাষণে আলোচনা করেন এই কমিশনের কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে।

মার্কিণ সংবাদগুলির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০ থেকে ৩০; আর এই পাতাগুলি জুড়ে সব রকমের খুন-রাহাজানি আর সমাজবিরোধী কাজের খুব খুঁটিনাটি রসালো বিবরণ দেওয়া হয়। কিন্তু তারা রাষ্ট্রসংঘের এই সার্বভৌমত্ব কমিশনের কাজ সম্পর্কে কোন খবর দেবার আর এই কাজের ফলাফলের মূল্য বিচার করার মতো জায়গা খুঁজে পায় না। অন্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে যারা যুগ যুগ ধরে লুণ্ঠন করে এসেছে, এখনও যারা অন্যান্য জাতীর প্রাকৃতিক সম্পদ আর কাঁচা মাল শোষণ করে বিক্রয় করে বিপুল মুনাফা কামাচ্ছে, তাদের পক্ষে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করাটা অবশ্যই খুব "লোকসানজনক"।

বিশেষ করে উপনিবেশগুলির দেশজ জনসাধারণের অবস্থা এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির শোষণে অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছে। নিজের দেশের সবচেয়ে ভালো জমি, সবচেয়ে মূল্যবান খনিজ ও অন্যান্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত।

উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, ব্রিটিশ উপনিবেশ বেচুয়ানল্যাণ্ডের কথা। সেখানকার কতকগুলি বৃহৎ ভূখণ্ড চিরকালের জন্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্রিটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানিকে। এই একই ব্রিটিশ কোম্পানি আবার উত্তর-রোডেসিয়াতে যাবতীয় খনিজ সম্পদের, খনিজ তৈলের ও প্রাকৃতিক গ্যাসের

সুইডেন, আফগানিস্তান, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, নেদারল্যাণ্ডস্, গুয়াতেমালা, ফিলিপিন্স্, চিলি, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও এই সম্পদের উৎসগুলির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সর্বাঙ্গীণ অনুসন্ধান ও পরিদর্শনের কাজ চালাবার দায়িত্ব এই কমিশনের ওপরে দেওয়া হয়েছিল। প্রস্তাবে এও বলা হয়েছিল যে এই কমিশন প্রয়োজন হলে কোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরে সেই দেশের জনগণের সার্বভৌম অধিকারকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা করার জন্যে যথোপযুক্ত বিধি ব্যবস্থা সুপারিশ করবে।

আজ তিন বছর ধরে এই কমিশনের কাজ চলেছে। এই কমিশনের নির্দেশ মতো রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তর যে বড়ো বড়ো দুই খণ্ডে এক বৃহৎ পর্যালোচনা-গ্রন্থ তৈরি করেছেন, তাতে এই বিষয়ে অবস্থা বিবৃত হয়েছে এবং এই সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার আইনসম্মত ভিত্তি স্থাপন সম্পর্কেও খসড়া-আইনকানুন দেওয়া হয়েছে।

এই কথাটির ওপরে বিশেষ জোর দেওয়া দরকার যে কমিশনের কাজের একেবারে গোড়া থেকেই দুটি দৃষ্টিভঙ্গী, সমস্যা সম্পর্কে দুটি আলাদা রকমের মনোভাব দেখা দেয়। একদিকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি এবং কম-অগ্রসর দেশগুলির—প্রধানতঃ আফগানিস্তান ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিরা—প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে খুব খুঁটিয়ে আর সর্বাঙ্গীণভাবে অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তার ওপরে জোর দেন। এই সার্বভৌম অধিকারকে রক্ষা করা আর শক্তিশালী করে তোলার জন্যে কার্যকরী বিধিব্যবস্থাকে সুপারিশ করার প্রয়োজনীয়তার ওপরেও তাঁরা জোর দেন।

পক্ষান্তরে, পশ্চিমী শক্তিগুলির—এবং সর্বোপরি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের—প্রতিনিধিরা সমস্যাটির গঠনমূলক ও বাস্তবমুখী আলোচনার পথে বাধা দেবার জন্যে সর্বপ্রকারে চেষ্টা করেন।

রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরের জন্যে পর্যালোচনাতেই প্রশ্নটি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা প্রকট হয়ে ওঠে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, আফগানিস্তান ও দেশের প্রতিনিধিরা বলেন যে এই পর্যালোচনায় প্রকৃত অবস্থাকে বিকৃত করা হয়েছে এবং মনগড়াভাবে সাজানো হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় যে অন্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণকারী বিদেশী একচেটে প্রতিষ্ঠাগুলির মুনাফা সম্পর্কে কোনো তথ্য

রাষ্ট্রসংঘ ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপরে সার্বভৌম অধিকার

ই. গোরেফ

সোভিয়েত সংবিধানে বলা আছে যে আমাদের দেশের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ —এই দেশের জমি, খনিজ, জলভাগ আর অরণ্য ইত্যাদি সব কিছু—রাষ্ট্রের সম্পত্তি, অর্থাৎ জনগণের সম্পত্তি। সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক জনসাধারণ এবং এগুলির ওপরে জনসাধারণেরই সার্বভৌম অধিকার। কার্যক্ষেত্রে দেশের সর্বসাধারণের এই সর্বজনীন ও ষোল আনা অধিকারকে মেনে নেওয়াটা হল আমাদের দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ সর্ত।

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এবং যেসব দেশ অল্পদিন আগে পর্যন্ত উপনিবেশ অথবা পরাধীন ছিল, সেই সব দেশে ব্যাপারটা অন্য রকম। সেই সব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরে জনগণের ও জাতির সার্বভৌম অধিকার প্রতিনিয়ত লঙ্ঘিত হচ্ছে, অনধিকারীর ভোগদখলে লাগছে। বিদেশী কোম্পানীগুলি দেশের কাঁচা মালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসগুলিকে দখল করে নিয়ে এই সব দেশের সম্পদ লুট করছে, জনগণকে শোষণ করছে। আর উপনিবেশ-দেশগুলির জনসাধারণ তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরে নামে মাত্র সার্বভৌম অধিকার কায়েম করার সামান্যতম সুযোগ থেকেও বঞ্চিত।

তাই কোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরে সেই জাতীর ও জনগণের সর্বাঙ্গীণ সার্বভৌম অধিকারের প্রশ্নটি হল সেই জাতীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে একটি প্রাথমিক শর্ত। কোনো দেশের অর্থনৈতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে এটা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও সেই সব সম্পদের উৎসের ওপরে সার্বভৌম অধিকার সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ করার জন্যে একটি কমিশন গঠন করার বিষয়ে ১৯৫৮ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ তার ত্রয়োদশ অধিবেশনে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। ন'টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়ঃ

মানব-জীবনের শাশ্বত সত্যের উপর নির্ভর করলেই যথার্থ শান্তি পাওয়া যায়। পাপ, অন্যায়, অবিচার—এসব প্রত্যেক যুগেই ছিল এবং এখনও আছে। প্রত্যেক যুগের লোকই সমকালীন জীবনের ত্রুটিগুলি বড় করে দেখেছে। কিন্তু এগুলি জীবনের বহিরঙ্গ। অন্তরালবর্তী শাশ্বত জীবন অবিনশ্বর। মহাকালের পটভূমিকায় বর্তমান জীবনের দুঃখ-দুর্দৈব দুঃস্বপ্নের মতোই ক্ষণস্থায়ী।

জীবনের যে-অংশ অস্থায়ী তার রূপ বারবার পরিবর্তিত হয় এবং সেই পরিবর্তন সাধারণ মানুষের মনে দুঃখ এবং অতৃপ্তির কারণ হয়। কিন্তু যা চিরন্তন তার রূপ ও ধর্ম বদল হয় না। আকাশের নীলিমা কত লক্ষ বছর যাবৎ অবিকৃত রয়েছে; চালের খাদ্যগুণেরও কোনো পরিবর্তন হয়নি। মানুষের অন্তরের দয়া, ভালোবাসা, ন্যায়বোধ এত আঘাত সত্ত্বেও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। শুধু ভালো দিক নয়; মন্দ দিকটাও যুগযুগান্তর ধরে তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। তাই আন্দ্রিচ তাঁর কাহিনীর প্রথমে দেখিয়েছেন রাদিসাভের শূলের উপরে মৃত্যু; আর সমাপিত পর্বে দেখছি অস্ট্রিয়ান সেনাধ্যক্ষ ভিশেগার্ড শহরে ভাজোকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে হত্যা করছে। শূল এবং ফাঁসিকাঠ অবশ্যই আলাদা; কিন্তু এই পার্থক্য একান্তই বাইরেরর। চার-শতাব্দীর ব্যবধান সত্ত্বেও অত্যাচারীর মনের চেহারাটা এক।

মানুষের তৈরী পুল একদিন মানুষের হাতের আঘাতেই ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু মানব-জীবনের ধারা চিরন্তন, অবিনশ্বর। সুতরাং পুল নয়, অন্য কিছু নয়, মানুষই মানুষের শেষ আশ্রয়। বিশেষ করে মানুষের সেই অংশটুকু, যা শাশ্বত জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত।*

* সপ্তর্ষি'-র সৌজন্যে।

একটা ব্যথা অনুভব করায় সে বাড়ির পথ ধরল। If they destoy here, then somewhere else someone else is building. Surely there are still peacful countries and men of good sensé who know of God's love? If God had abandoned this unlucky town on the Drina. He had surely not abandoned the whole world that was beneath the skies? They would not do this for ever.

অর্ধেক পথ উঠে আলিহোজা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আর উঠল না। তার মৃত্যু পাঠকের মনে তীব্র বেদনার সৃষ্টি করে না, কারণ আলিহোজা আশার বাণী শুনিয়ে গেছে শেষ মুহূর্তে। ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি শুধুই ধ্বংস করে না, গড়েনও—এই বিশ্বাসের মধ্যেই আলিহোজার আশার জন্ম।

আন্দ্রিচ নিজে 'বোসনিয়ান স্টোরি' এবং 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা'-কে উপন্যাস বলেন না। তিনি বলেন, ক্রনিক্‌ল্, ঐতিহাসিক কাহিনী। 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা'র নায়ক পুলটির জন্ম-মৃত্যু দেখানো হয়েছে। অন্য চরিত্রগুলি মিছিলের মুখের মতো একটু দেখা দিয়ে হারিয়ে গেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম আলিহোজা। পুলের কথা বলবার জন্য এমনি একজন মানুষের প্রয়োজন ছিল। তুর্কী, ইহুদী জিপসী, সার্ব, খ্রীষ্টান, মুসলমান—কত জাতি ও ধর্মের লোক সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে উঠে এসেছে তাঁর তুলির স্পর্শে! প্রত্যেকের জন্যই তাঁর গভীর মমতা। আন্দ্রিচের গল্পে নারী প্রধান, পুরুষকে তারা কাচপোকার মতো আকর্ষণ করে। কিন্তু 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা'য় নারী চরিত্র এবং প্রেম প্রায় অনুপস্থিত। লোটি এবং জোরকার জীবন সম্বন্ধে আন্দ্রিচ শুধু ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাদের সামনে আনেন নি।

'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা'য় আন্দ্রিচের জীবনদর্শন পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রথম জীবনে বারবার আঘাত পেয়ে তিনি প্রশ্ন করেছেন ঃ Who do you not look above the earth and over yourself? But above there had been only the high frozen sky, and below the hard pitiless earth. The former unattainable and the latter unacceptable.

তাহলে আশ্রয় কোথায়? আলিহোজা পুলের স্থায়িত্বে আস্থা স্থাপন করে ঠকেছে। আন্দ্রিচ দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফলে উপলব্ধি করেছেন

আগে মেয়েরা পুলের উপর বেড়াতে আসতে না। নতুন কালের মেয়েরা লেখাপড়া শিখে অসংকোচে চলাফেরা করে। পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে পুলের উপর বেড়াতে আসে। শিক্ষিকা জোরকার বিয়োগান্ত প্রেমের সূচনা হয়েছিল এই পুলের উপর।

জীবনের এই নব রূপায়ণ আলিহোজার ভালো লাগে না। সে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। জীবন বড় দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। আলিহোজা সেই পরিবারের শেষ বংশধর যে-পরিবারের কর্তার উপর সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্বে এই পুল রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হয়েছিল। আলিহোজা এখন বৃদ্ধ। ভিশেগার্ড শহরে একটি দোকানের মালিক সে। দোকানে বসে চাইলেই পুল দেখা যায়। সাদা পাথরের পুল, রোদে ঝক্ ঝক্ করছে, নীচে বয়ে চলেছে ড্রিনা নদী। আলিহোজা মাঝে মাঝে চুপ করে চেয়ে থাকে।

নদীর জলের মতো মানুষের জীবনের ধারা বয়ে চলে। রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। ব্যক্তি জীবনের স্রোতে হারিয়ে যায়। তবু জীবন চিরন্তন, তার ক্ষয় নেই। ড্রিনার জলধারা জীবনের গতিপ্রবাহের এবং নদীর উপকার অচঞ্চল পুলটি জীবনের চিরন্তন অংশের প্রতীক :—life was an incomprehensible marvel, since it was wasted and spent, yet none the less it lasted and endured 'like the bridge on the Drina.'

১৯১৪ সালের গ্রীষ্মকাল। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ভিশেগার্ড এবং পুল এখন অস্ট্রিয়ান সেনাবাহিনীর হাতে। শহরে থমথমে ভাব। বাজারে দোকানপাট বন্ধ। আলিহোজা দোকানের দরজা বন্ধ করে ভিতরে বসে আছে। শুনতে পাচ্ছে দূর থেকে কামানের গোলা এসে পড়ছে ড্রিনার জলে, পুলের উপর। হঠাৎ প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে আলিহোজা অজ্ঞান হয়ে পড়ল। জ্ঞান হবার পর সামনে চেয়ে দেখল পুলের মাঝখানটা ফাঁকা,—শত্রুর গোলায় পুল ভেঙ্গে গেছে। আলিহোজার জীবনের ভিত্তিভূমি টলে উঠল। এই পুল কখনো ভাঙ্গতে পারে তা কল্পনাও করেনি। পূর্বপুরুষের কাছ থেকে সে পেয়েছে। অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে সুদৃঢ় বিশ্বাস। বিশেষ একজন মানুষ এবং তার কীর্তি হারিয়ে যাবে; কিন্তু পুল থাকবে শাশ্বতকাল ধরে। সেই পুল ভেঙ্গে যাবার ফলে আলিহোজার যেন বাঁচবার অবলম্বন হারিয়ে গেল। বুকে

থেকে কাহিনী ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। উত্তেজনা ও ঔৎসুক্য প্রায় অনুপস্থিত। সমতল ভূমির শান্তগতি নদীর মতো।

নদী পার হবার জন্য দূর দূরান্ত থেকে কত লোক আসে এই পথ দিয়ে। পুল হওয়ায় সুবিধা হল ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের। ভিশেগার্ড ক্রমশঃ বড় শহরে পরিণত হল। এই পুলের উপর দিয়ে বিয়ের শোভাযাত্রা এবং মৃতের শোকযাত্রা যায়; যুদ্ধের সময় সৈন্যের দল কুচকাওয়াজ করে এপার-ওপার হয়; শত্রুসৈন্য ঠেকাবার জন্য পুলের মুখে বসে সামরিক পাহারা। শুধু কি প্রয়োজন মেটায়? ভিশেগার্ডের নাগরিকদের নিকট পুলটি বন্ধুর মতো। পুলের উপর প্রশস্ত খোলা জায়গায় রাখা হয়েছে। বেঞ্চ আছে বসে গল্পগুজব করবার। যারা বেড়াতে আসে তাদের জন্য খোলা হয়েছে কফি ও ফলের দোকান। ভিশেগার্ডের নাগরিকরা এখানে আসে আড্ডা জমাতে। অনেক বিষয়ের পরামর্শও এখানেই হয়। কতলোকের ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখের স্মৃতি পুলের সঙ্গে অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত হয়ে পড়েছে। ভিশেগার্ডের সেরা সুন্দরী ফাতা, তার নামে শহরের তরুণরা উন্মত্ত হয়ে ওঠে। প্রেমহীন বিয়ের বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পাবার জন্য শ্বশুরবাড়ি যাবার পথে পুলের উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে আত্মহত্যা করেছিল। পুলের উপর পাহারারত তরুণ সৈনিক ফেজুন বোরখা-পরা এক তুর্কী মেয়ের কালো চোখ দেখে যে ভুল করেছিল তার জন্য তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে করতে হয়েছিল প্রাণ দিয়ে। পুলের সংলগ্ন হোটেলে ইহুদী তরুণী লোটি হিসাব পরীক্ষা করে। তার সুগঠিত দেহ কত পুরুষের হৃদয় উন্মনা করে; কিন্তু লোটির মনে কোনো চাঞ্চল্য নেই। সে রাত জেগে শুধুই টাকা আনা পাইয়ের হিসাব রাখে।

এই পুলকে কেন্দ্র করে বোসনিয়ার ইতিহাসে আবর্তিত হয়েছে। কত যুদ্ধ হল, কত রাজা এল আর গেল! সবকিছু ড্রিনা নদীর পুলের উপর ছায়া ফেলেছে।

এল নতুন যুগ। ভিশেগার্ড শহরে মিউনিসিপ্যালিটি হল। সেখানকার শ্রমিকেরা করেছে ট্রেড ইউনিয়ন। বিজ্ঞানের দান পৌঁছে গেছে এত দূরে অঞ্চলেও। ভিশেগার্ডের পথঘাট এবং পুল বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত হয়েছে। পুলের ধারেই আছে ঝরনা। এতদিন সবাই ভিড় করে আসতে ঝরনার জল নিতে। এখন বাড়ি বাড়ি গেছে জলের কল। ঝরনা এখন পরিত্যক্ত। আর এসেছে রেলপথ। একেবারে পুল পর্যন্ত।

হল। পুল তৈরীর কাজে বেগার খাটতে হবে। পড়ে রইল চাষাবাদের কাজ। জবরদস্তিটা বেশি বেশি হল খ্রীষ্টান প্রজাদের উপর।

একে একে তিন বছর পার হয়ে গেল। কাজ যে কতদূর অগ্রসর হচ্ছে তা বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। লোকের মনে সন্দেহ দৃঢ় হল,—ড্রিনা নদীর উপরে পুল তৈরী করা সম্ভব নয়। কিন্তু আবিদাগা তার তাড়না শিথিল করেনি। বেগার খাটিয়ে নিচ্ছে কঠোরভাবে। শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠছে। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস করে না। শুধু রাদিসাভ গোপনে সকলকে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করে। আর কতদিন এই অত্যাচার সহ্য করা যায়? রাদিসাভ নিজেই প্রতিশোধ নেবার সংকল্প করল। দিনে যতটুকু কাজ হয় রাত্রির অন্ধকারে রাদিসাভ তা ভেঙ্গে দিয়ে আসে। শহরে গুজব রটল নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং পুলের কাজ ভেঙ্গে দিয়ে যান। তিনি পুল করতে দেবেন না।

আবিদাগা চতুর লোক। গুজবে তার বিশ্বাস নেই। রাত্রিতে কড়া পাহারা বসবার ফলে রাদিসাভ ধরা পড়ল। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তার ওপর চলল বর্বরোচিত অত্যাচার। তারপর পুল যেখানে তৈরী হচ্ছে সেখানে শূলে চড়ানো হল। জল্লাদ খুব ওস্তাদ; তাই শূলের অনেকক্ষণ বেঁচে রইল রাদিসাভ মুমূর্ষু রাদিসাভের শেষ অসংলগ্ন কথা: তুর্কীরা—তুর্কীরা—পুল।

আকাশের পশ্চাৎপটে অনেক উঁচুতে শূলের উপরে যন্ত্রণাবিদ্ধ রাদিসাভ দর্শকদের মনে অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করল। প্রকাশ্যে কিছু বলতে না পারলেও মনে মনে সবাই রাদিসাভকে শহীদ বলে স্বীকার করে নিল।

এরপর নতুন তত্ত্বাবধায়ক এল। এবার পুলের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলল। পুল সমাপ্ত হল একদিন, বাঁধা পড়ল নদীর দুই তীর। বিরাট ভোজ দিয়ে পুল সমাপ্তি উৎসব সম্পন্ন হল। ঐ অঞ্চলের কেউ নিমন্ত্রণ থেকে বাদ পড়ল না। সাদা পাথরে তৈরী ঝকঝকে সুন্দর পুলের রূপে সকলে মুগ্ধ। আকাশে উড়বার এবং জলের উপর দিয়ে চলবার বাসনা মানুষের চিরদিনের। এই একটি বাসনা সফল করল। সেই আনন্দে সবাই মত্ত। রাদিসাভের স্মৃতি সেই আনন্দ ম্লান করতে পারল না।

এ-পর্যন্ত কাহিনীর গতি দ্রুত, পাঠকের কৌতূহলও থাকে অক্ষুণ্ণ। তারপর

আদর করে তাকে ডাকতেন। এখন সে মহম্মদ পাশা সোকোলি নামে বিখ্যাত।

সোকোলির বয়স হয়েছে ষাট। পরিপূর্ণ জীবন। অর্থ, যশঃ, পারিবারিক শান্তি—কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু কিছুকাল যাবৎ বুকে একটা তীব্র বেদনা দেখা দেয় মাঝে মাঝে। কিছুক্ষণ থাকে, তারপর চলে যায়। চিকিৎসায় ফল হয় না। একদিন এমনি এক বেদনার আক্রমণে যখন আচ্ছন্ন হয়ে বিছানায় শুয়েছিল তখন একটা পুলের ছবি ভেসে উঠল। যেন স্বপ্ন দেখছে, নদীর উপর পাথরে তৈরী একটা পুল,—তার উপর দিয়ে কত লোক চলাচল করছে। তন্দ্রার মধ্যেই শুনতে গেল কে যেন বলছে, ড্রিনা নদীর উপর একটা পুল তৈরী করে দাও, তাহলে তোমার ব্যথা সেরে যাবে।

মা পার হতে পারেননি ড্রিনা নদী, আসতে পারেননি তার সঙ্গে। মা'র সেই নিরুপায় কান্না কিশোরের অবচেতন মন আশ্রয় করে সংগোপনে বেঁচে আছে এতদিন। সে কান্না আজ বুক ভেঙ্গে বের হতে চায়।

সোকোলি ঘোষণা করল, ড্রিনা নদীর উপর পুল তৈরী করা হবে। রাজকোষের অর্থে নয়, সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করবে সে নিজে।

ড্রিনা পার্বত্য নদী। ছোট, কিন্তু তীব্র তার স্রোত। বোসনিয়া ও সার্বিয়ার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে এই নদী। ছোট গ্রাম ভিশেগার্ড নির্বাচিত হল। পুল তৈরী হবে এখানে। পুল তৈরী হলে শুধু যে বোসনিয়ার সঙ্গে সার্বিয়া যুক্ত হবে তাই নয়, প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের মিলনের পথ হবে সহজ।

গ্রীস থেকে, রোম থেকে, আরও অনেক জায়গা থেকে খুঁজে খুঁজে আনা হল পাথরের কাজ জানা মিস্ত্রী ও কারিগর। শ্বেত পাথরের বড় বড় খণ্ড এসে পৌঁছল ; এল নানারকম মাল-মসলা যন্ত্রপাতি। ভিশেগার্ড হঠাৎ সরগরম হয়ে উঠল, গ্রাম ক্রমশঃ শহর হয়ে উঠতে লাগল। পুলের কাজ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পড়েছে আবিদাগার উপর।

স্থানীয় লোক বিশ্বাস করতে পারে না যে ড্রিনার উপর সত্যি কখনো পুল হবে। ভগবানের ইচ্ছা নয় মানুষ ড্রিনার জলস্রোতের উপর দিয়ে হেঁটে যাবে। সে ইচ্ছা থাকলে তিনি নদী সৃষ্টি করলেন কেন ? জলপরীরা নিশ্চয়ই বাধা দেবে।

আবিদাগার আদেশে চারপাশের খেতখামার থেকে কৃষকদের ধরে আনা

অনেক উন্নত। কিন্তু নোবেল কমিটি পুরস্কার দেবার যে-কারণ ঘোষণা করেছেন তা 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা' সম্বন্ধেই বিশেষরূপে প্রযোজ্য। আন্দ্রিচ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন "for the epic force with which he has depicted themes and human destinies from the history of his country."

'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা' যে এপিকের গুণসম্পন্ন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুদীর্ঘ চারশত বছরের ইতিহাস নিয়ে কাহিনী রচিত হয়েছে; অসংখ্য চরিত্রের মিছিল পাঠকের সামনে দিয়ে চলে যায়; আর কাহিনী সমাপ্ত করবার পর জীবন সম্বন্ধে গভীর ভাবনা পাঠকের মন আচ্ছন্ন করে।

১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দ। বোসনিয়া তখন অটোম্যান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। বোসনিয়ার খ্রীষ্টান অধিবাসীদের সম্রাটকে দিতে হত 'রক্ত-কর'। অর্থাৎ পালা করে প্রতি বছর কিশোর বালকদের দিয়ে দিতে হত সম্রাটকে। চিরদিনের জন্য দেওয়া। বাড়ির সঙ্গে তাদের আর সম্পর্ক থাকত না। মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে নতুন নাম দিয়ে এদের সম্রাটের কাজে ভর্তি করা হত।

এমনি একদল কিশোরকে বোসনিয়ার পথ দিয়ে সম্রাটের কর্মচারীরা নিয়ে চলেছে ইস্তানবুল। একটু দূরে থেকে কয়েকজন নারী তাদের অনুসরণ করছে। দীর্ঘ পথ চলার ক্লান্তিতে, অনাহারে এবং গভীর শোকে তারা প্রায় উন্মাদিনী। কেঁদে কেঁদে তাদের চোখ মুখ ফুলে উঠেছে। ঐ যে সামনে চলেছে বন্দী কিশোরদল, তাদের মধ্যে আছে কারো ছেলে বা ভাই। যতক্ষণ সম্ভব দেখবে বলে পিছে পিছে আসছে। কিন্তু বেশী নিকটে যেতে পারে না। পাহারাদার লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে আসে।

ড্রিনা নদীর তীরে এসে থামতে হল। রাজকর্মচারীরা সদলবলে পার হয়ে গেল। তাদের ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক ছিল। এ-পাড়ে পড়ে রইল মা-বোনেরা।

এই কিশোরদের মধ্যে একজন কর্মদক্ষতার জন্য সুলতানের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। সুলতান নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন তার সঙ্গে। অটোম্যান সাম্রাজ্যের সে এখন এক শক্তিশালী স্তম্ভ। কোথায় কোন গ্রামে তার বাড়ি ছিল এখন মনে নাই; ভুলে গেছে মা-বাবার নাম। ভুলে গেছে তাঁরা কি-নামে

বিশ্বাস হারালো। রাইকার সর্বদাই মনে হত সবাই তার অর্থ কেড়ে নিতে চায়, সকলের চোখেই সে দেখতে পায় লোভের দৃষ্টি। রাইকা মানুষের অর্থলিপ্সার প্রতীক। কৃপণের টাইপ চরিত্র হলেও রাইকার জীবনের বৈশিষ্ট্য পাঠকদের মন সহজেই আকৃষ্ট করে। ছেলেবেলায় এক বিপর্যয়ের ফলে তার দেহ বিকৃত হয়ে পড়েছে। আর সেই সঙ্গে নারীজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা হয়তো নিঃশেষে মুছে গেছে তার মন থেকে! তাই অর্থ উপার্জন এবং যক্ষের মতো তার সংরক্ষণ হয়েছে রাইকার বেঁচে থাকবার একমাত্র অবলম্বন।

বোসনিয়ার রাজধানী ট্রাভনিক 'বোসনিয়ান স্টোরির' পটভূমি। কাহিনীর সময় ১৮০৭ থেকে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ। এই শহরে ফ্রান্স ও অষ্ট্রীয়ার দূতাবাস ছিল। নেপোলিয়নের পরাজয়ের সাত আট বছর পূর্বে ফ্রান্সের দূত হয়ে ট্রাভনিকে এলেন জাঁ দাভিল অষ্ট্রিয়ান দূতের নাম ভন মিত্তেরার। নাগরিকদের নিকট এঁরা পেলেন বিরূপ অভ্যর্থনা। দাভিল শহরে পৌঁছবার পর মুসলমান জনতার কাছ থেকে পেলেন ধিক্কার ও অপমান। নেপোলিয়ন পোপের বিরুদ্ধাচরণ করবার ফলে দাভিল শহরের ক্যাথলিক নাগরিকদের কাছ থেকেও পেলেন ঘৃণা। অষ্ট্রিয়ান দূতও ক্যাথলিক বাদে অন্য সকলের নিকট পেলেন অবজ্ঞা। অথচ এই বিরূপ পরিবেশের মধ্যেও দুই দেশের দুই দূতকে সপরিবারে বাস করতে হয়েছে দীর্ঘ সাত বছর। এই দিক থেকে দু'জনের মধ্যে মিল আছে ; কিন্তু নিজের নিজের দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য আবার দুজনের মধ্যে সর্বদাই ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দাভিল। ট্রাভনিকের অস্বস্তিকর জীবনযাত্রার মধ্যেও সাহিত্যচর্চা করে। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সে লিখতে বসে আলেক-জাণ্ডারের জীবনের মহাকাব্য। বিরাট পরিকল্পনা। প্রেরণা নেই, তবু সে পরিকল্পিত মহাকাব্যর বৈচিত্র্যহীন লাইনগুলি রুটিন করে লিখে চলে। শিল্পকে রুটিনে পর্যবসিত করাই তার জীবনের ট্র্যাজেডি।

দুই দূতের কথাই সব নয়। বোসনিয়ার জনসাধারণের দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা এবং অনগ্রসরতাও নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। ছোট-খাটো বহু ঘটনা ও বহু তথ্যের সমাবেশ পাঠককে অভিভূত করে। কাহিনীর প্রতিটি চরিত্র এবং ঘটনা ইতিহাস থেকে সমর্থন করা যেতে পারে।

'বোসনিয়ান স্টোরি'র আঙ্গিক এবং চরিত্রচিত্রণ অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায়

এবং গণিকা মারার কাহিনী আমাদের দিয়েছে দু'টি বিস্ময়কর নারীচরিত্র। আন্দ্রিচ যে-সব গল্পে নারীচরিত্রের প্রাধান্য দিয়েছেন নারী সেখানে যৌনানুভূতির দ্বারা গভীররূপে প্রভাবান্বিত। পুরুষকে বাঁধবার প্রধান অস্ত্র যৌন আকর্ষণ। তাই আন্দ্রিচ বলেছেন, অন্য সব দুর্ভাগ্য ঠেকানো যায়, ঠেকানো যায় না নারীর আকর্ষণকে। পুরুষের মুক্তির যে একটিমাত্র পথ আছে, সেই পথ রুদ্ধ করে রেখেছে নারীদেহ।

১৯২৪ থেকে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আন্দ্রিচের তিনটি গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয়। ১৯৩৬ সালে তাঁর লেখক-জীবনের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটে। এই পর্বে তাঁর দান—যুগোস্লোভ সাহিত্যে গদ্য কবিতার প্রবর্তন এবং অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর ছোট গল্প রচনা।

দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হয় ১৯৩৯ সাল থেকে। যুগোস্লাভিয়া এবং য়ুরোপের জীবন যখন যুদ্ধের আঘাতে বিপর্যস্ত তখন একান্ত নির্লিপ্ত চিত্তে আন্দ্রিচ রচনা করেছেন তাঁর তিনটি অনন্যসাধারণ উপন্যাস। বর্তমান পীড়াদায়ক; তাই সৃষ্টির আনন্দে ডুবে থেকে বর্তমানকে তিনি ভুলতে চেয়েছিলেন। বর্তমান জীবনও তাঁর উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করে নি। 'বোসনিয়ান স্টোরি' ও 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা' বিগত দিনের কাহিনী। 'মিস এক্স' বা 'অজানিতা' ঐতিহাসিক গল্প না হলেও যুদ্ধ অনুপস্থিত। প্রই তিনটি উপন্যাসই যুদ্ধ শেষ হবার অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম দু'টি বই ইংরেজী অনুবাদে পাওয়া যায়।

'অজানিতা'র পটভূমিকা ঐতিহাসিক নয়। কিন্তু তাই বলে সমস্যা-পীড়িত বর্তমান জীবনের ছবি সেখানে নেই। কাহিনীর নায়িকা রাইকা; প্রকৃতপক্ষে প্রধান চরিত্র এই একটি। রাইকার বাবা লোকের কথায় বিশ্বাস করে ঠকেছেন, মুক্তহস্তে দান দান করে প্রায় রিক্ত হয়েছে তাঁর অর্থভাণ্ডার। সুতরাং মৃত্যুর পূর্বে মেয়েকে উপদেশ দিয়ে গেলেন,—ব্যয়কুণ্ঠ হও, অর্থ সঞ্চয় করো।

রাইকা এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে লাগল। বাবা যে সামান্য অর্থ রেখে গিয়েছেন তা সে ক্রমশঃ বাড়িয়ে তুলতে লাগল নানা উপায়ে। যে করে হোক, অর্থ সঞ্চয় করতে হবে—এই হলো রাইকার জীবনের একমাত্র নেশা। অর্থ উপার্জন করা এবং তাকে রক্ষা করাই রাইকার জীবনের ব্রত। সঞ্চিত অর্থ রক্ষা করবার প্রেরণায় মানুষের উপরে সে

প্রথম মহাযুদ্ধ কোনো বিশেষ দেশ কিংবা জাতীর জয় অথবা পরাজয় নির্দেশ করে না। আন্দ্রিচ যুদ্ধের মধ্যে দেখেছেন সমগ্র মানবজাতির পরাজয়। আত্ম-বিধ্বংসী সমাজে তাই তাঁর মন আশ্রয় খুঁজে পায় নি। 'এক্স পন্টো'তে কবি নিজেকেই প্রশ্ন করেছেন : এই নিষ্ঠুর সংসার এবং দুর্বল মানুষের সঙ্গে তোমার মনের শান্তি যুক্ত করেছ কেন? কেন আঙুল দিয়ে সুখ স্পর্শ করতে চাও? পৃথিবী ছাড়িয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে আরো দূরে তাকাও না?

আন্দ্রিচের কবিতা প্রথম শ্রেণীর এমন কথা বলা যায় না। অন্ততঃ আজ আন্দ্রিচের কবিতা সম্বন্ধে তাঁর দেশবাসীর খুব আগ্রহ নেই। তবে একথা মনে করা ভুল হবে যে, অনেক লেখকের মতো আন্দ্রিচ কবিতা দিয়ে সাহিত্যজীবন শুরু করেছিলেন, এবং উপন্যাস-শাখায় সাফল্য লাভ করবার পর তা একেবারেই হারিয়ে গেছে। কবি আন্দ্রিচ ও ঔপন্যাসিক আন্দ্রিচের মধ্যে নিবিড় যোগ রয়েছে। উপন্যাসের সম্পূর্ণ রসোপলব্ধির জন্য তাঁর কাব্যের পরিচয় প্রয়োজন। কবির মন যে জীবন-জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল হয়েছে, ঔপন্যাসিক তার উত্তর দিয়েছেন।

আন্দ্রিচ সাহিত্য-সমালোচক হিসাবেও যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। লেখক, শিল্পী ও ঐতিহাসিক চরিত্রের অনেকগুলি চিত্তাকর্ষক জীবনী আন্দ্রিচ লিখেছেন। কিন্তু কবিতার পর আন্দ্রিচ ছোট গল্প রচনাতেই বিশেষ করে মনোনিবেশ করলেন। এই গল্পগুলির উৎকর্ষ প্রথম শ্রেণীর। অতি সহজেই আন্দ্রিচ লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। গভীর জীবনবোধের দ্বারা তাঁর প্রতিটি গল্প চিহ্নিত। কিংবদন্তী, সমকালীন জীবন, মনোবিশ্লেষণ এবং দার্শনিক চিন্তার বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছে আন্দ্রিচের গল্পে। 'আলিজার ভ্রমণ' যুগোস্লাভ সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য ছোট গল্প, এবং এই গল্পটি আন্দ্রিচকে কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সাহায্য করেছে।

ব্যাক্তিগত জীবনের দুঃখ, দারিদ্র্য, কারাবাস ও ভগ্নস্বাস্থ্যের যন্ত্রণা থেকেই আন্দ্রিচের অধিকাংশ কবিতার জন্ম হয়েছে। আত্মতান্ত্রিক কবি ছোট গল্পে বিষয়তান্ত্রিক হয়েছেন দেখতে পাই। এই রূপান্তর উপন্যাসে সম্পূর্ণ হয়েছে।

উপন্যাস ও ছোটগল্প মিলিতভাবে আন্দ্রিচের জীবনোপলব্ধিকে পূর্ণ করেছে। তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা'য় নর-নারীর সম্পর্কের চিত্র প্রায় অনুপস্থিত। এই অভাব পূর্ণ হয়েছে ছোট গল্পে। আনিকা

বেদনা এবং জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে নানা জিজ্ঞাসা কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য। 'এক্স পণ্টো'-তে কবি বলেছেন : Encircled by an alien and hardly well-meaning world, I withdrew into myself and felt alone and abandoned, alone beneath the vast indifferent sky, outside any community, any society, and so I have always lived, unprotected by the privileges of any class, without occupation, without a future, without family or friends who could help me. Alone, outcast, ill.

আন্দ্রিচ তাঁর হৃদয়কে তুলনা করেছেন কালো জলের হ্রদের সঙ্গে। কারো কলসার স্পর্শে সে জলে ঢেউ ওঠে না, কালো জলে কারো ছবির প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে না।

সমকালীন জীবনের প্রতিটি ঘটনা এবং পরিচিত মানুষের সঙ্গ দুঃখের কারণ। এই জীবন কেমন ?

For me and for my age there is no expression :
Paces unnumbered in a narrow cell,
Day after day, eyes full of fear,
Maddened hell of my times, break-up and end of
everything.

সমকালীন জীবনের যন্ত্রণাগুলি প্রেতচ্ছায়ার মতো কবির নিদ্রাহীন রাত্রিগুলি আতঙ্কিত করে তোলে :

Nightly the knavish guests arrive,
Unseen, unheard,
And fill with burning sand
My mouth and eyes……

বর্তমান জীবনের বেদনা এড়াবার উপায় অতীতের দিকে মুখ ফেরানো। আন্দ্রিচ বলেছেন : দুঃসহ দুর্দিনে যখন অন্তঃসারশূন্য কথা এবং বিকৃত আদর্শ সান্ত্বনা দিতে পারে না, তখন শান্তি পাই পূর্বপুরুষদের মঙ্গলময় উত্তরাধিকার থেকে। তাঁদের দেহ পড়ে আছে পুরনো কবরখানায়, কিন্তু তাঁদের গুণগুলি রোপণ করে গেছেন আমাদের আত্মার জমিতে। তাই আত্মার গভীরে অনুসন্ধান করলে শাশ্বত জীবনের ধারা উপলব্ধি করা যায়।

তিনি করেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্ত থেকে দূরে নিভৃতে সাহিত্যচর্চা করতেই তাঁর ভালো লাগে। ব্যবহারিক জীবনে আন্দ্রিচ যতটুকু সাফল্য অর্জন করছেন তা একান্তই নিজের উদ্যম ও অধ্যবসায়ের ফল।

সতেরো-আঠারো বছর যখন বয়স তখন থেকেই আন্দ্রিচের কবিতা, প্রবন্ধ এবং অনুবাদ যুগোস্লাভিয়ার জনপ্রিয় সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হতে থাকে। জেলে যাবার আগে তিনি হুইটম্যানের কবিতা অনুবাদ করেছেন। অথচ সে সময় হুইটম্যানের কবিমানসের ঠিক বিপরীত ছিল আন্দ্রিচের মানসিক অবস্থা। হুইট-ম্যানের কবিতার অনুবাদ বৈপরীত্যের প্রতি আকর্ষণের দৃষ্টান্ত।

আন্দ্রিচের প্রকৃত সাহিত্যচর্চা আরম্ভ হয় জেলের ভিতরে। ব্যক্তিগত জীবনের গভীর বেদনার অনুভূতি থেকে তিনি পেয়েছিলেন লেখার প্রেরণা। দুঃখ, দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন কেটেছে। যৌবনে পদার্পণ করে যুক্ত হল একটি নূতন যন্ত্রণা। অনুভব করতে শিখলেন পরাধীনতার জ্বালা। এই জ্বালা প্রকাশ করবার অভিযোগে বিদেশী সরকারের প্রতিনিধিরা তাঁকে অনন্ত জীবন-প্রবাহ থেকে ছিঁড়ে এনে কারাগারের শীতল পরিবেশে রাখল। কবে মুক্তি পাবেন, কোনদিন পাবেন কিনা—কেউ জানে না।

এর ফলে আন্দ্রিচ গভীর দুঃখবাদী হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে হল, জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শুধু দুঃখময়। একমাত্র নিজের অভিজ্ঞতার ফলেই যে জীবন কালো হয়ে গেল তা নয়। কির্কেগারের (Soren Kierkegaard) একটি বই লুকিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন জেলের মধ্যে। নিঃসঙ্গ বন্দী জীবনে এই একটি মাত্র বই তাঁর কাছে হল জপমন্ত্রের মতো। প্রতিদিন বারবার পড়ে কির্কেগারের অস্তিবাদ তাঁর মজ্জাগত হয়ে গেল। বেদনার শরশয্যা আশ্রয় করে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করাই জীবন। তাই জেলে বসে আন্দ্রিচ লিখলেন ঃ জীবনে বেদনাই একমাত্র সত্য ; দুঃখ ছাড়া আর সবই অলীক ; জলের প্রতিটি বিন্দুতে, প্রতিটি ঘাসে, স্ফটিকের প্রতি পলে, প্রতিটি কণ্ঠস্বরে কেবল দুঃখ ও যন্ত্রণার প্রকাশ ; কি নিদ্রায়, কি জাগরণে ; জীবনে, জীবনের পূর্বে এবং হয়তো জীবনের পরেও,—এই বেদনার অস্তিত্বটাই একমাত্র সত্য।

বন্দী জীবনের রচনাগুলি ১৯১৮ ও ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় Ex Ponto ও Unrest নামে। এ দু'টি কাব্যগ্রন্থ প্রধানতঃ গদ্যকবিতার সংকলন। এদের মধ্যে আন্দ্রিচ নিজেকে প্রকাশ করেছেন অকুণ্ঠভাবে। ব্যক্তিগত জীবনের

গোস্লাভিয়ার জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। যুগোস্লাভিয়ার ঘটনাবহুল বিক্ষুব্ধ তিহাসই আমাদের নিকট বড় হয়ে দেখা দিয়েছে; সাহিত্য ও সংস্কৃতির রিচয় অন্তরালে রয়ে গেছে। প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও আন্দ্রিচ যে প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস রচনা করে নোবেল কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন তা প্রকৃতই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। যখন জার্মান বোমা বেলগ্রেড শহর ও অন্যান্য অঞ্চল বিধ্বস্ত করছে তখন আত্মসমাহিত হয়ে আন্দ্রিচ রচনা করেছেন তাঁর কয়েকটি অসাধারণ উপন্যাস।

বোস্নিয়ার অন্তর্গত ট্রাভনিকে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর ইভো আন্দ্রিচ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন স্বল্প আয়ের কারিগর। আন্দ্রিচের বয়স যখন মাত্র দু'বছর তখন তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। পারিবারিক কারণে তাঁকে চলে আসতে হয় ছোট শহর ভিশেগার্ডে। আন্দ্রিচের শৈশব কেটেছে ভিশেগার্ডের সমাজ ও চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে এখানকারই স্কুলে। পরবর্তী জীবনে ভিশেগার্ডের জীবন নিয়ে লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা'।

আন্দ্রিচের মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হয় সারাজেভোর বিদ্যালয়ে। এর পর দর্শনশাস্ত্র পড়বার জন্য তিনি ভিয়েনা, জাগ্রেব, ক্রাকোভো প্রভৃতি স্থানে ঘুরেছেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন গ্রাৎস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

কিন্তু তাঁর পড়াশুনা মাঝপথে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল রাজনৈতিক কারণে। যুগোস্লাভ জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকবার 'অপরাধে' অস্ট্রিয়ান কর্তৃপক্ষ আন্দ্রিচকে প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়াতেই বন্দী করেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর জেল থেকে বেরিয়ে এসে নতুন করে পড়া আরম্ভ করলেন। পড়া শেষ করে যুগোস্লাভ সরকারের কূটনৈতিক দপ্তরে পেলেন চাকরি। কার্যোপলক্ষে তাঁকে কিছু কাল করে থাকতে হয়েছে রোম, বুখারেস্ট, মাদ্রিদ, জেনিভা ও বার্লিন শহরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার সময় আন্দ্রিচ ছিলেন বার্লিনে। বার্লিন ত্যাগ করে দেশে পৌঁছবার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বেলগ্রেড শহরের উপর পড়েছিল জার্মান বোমা।

যুদ্ধের পর যুগোস্লাভিয়ায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েক বছর তিনি পীপলস্ অ্যাসেম্বলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যুগোস্লাভ লেখক সংঘের সভাপতিত্বও

ইভো আন্দ্রিচ ঃ সাহিত্য ও জীবনদর্শন

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক যুগোস্লাভ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ইভো আন্দ্রিচ (Ivo Andric') ১৯৬১ সালের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। যুগোস্লাভ সাহিত্যের পরিচয় আমাদের সামান্যই জানা আছে ; বিশেষ করে আন্দ্রিচের নাম এদেশে একেবারেই অপরিচিত ছিল। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ১৯৫৮ সাল থেকে তিনি পরিচিত হতে আরম্ভ করেছেন। আটান্ন ও ঊনষাট সালে পর পর তাঁর দু'খানি উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ হয়। অনুবাদের মাধ্যমে তাঁর খ্যাতি বিস্তার লাভ করবার পূর্বেই এল এই অপ্রত্যাশিত সম্মানের ঘোষণা।

যুগোস্লাভিয়া বলকান উপদ্বীপের একটি রাষ্ট্র। বলকান যুদ্ধবিগ্রহের দেশ। মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য যে-শান্তি অত্যাবশ্যক বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ বলকান তার সুযোগ পায়নি। পঞ্চদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই অঞ্চল ছিল অটোম্যান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। তার ফলে মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে খ্রীষ্টান ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরোধ দীর্ঘকাল যাবৎ বলকানবাসীর জীবন বিক্ষুব্ধ করেছে। যুগোস্লাভিয়ার সংস্কৃতি ও সাহিত্যে এই বিরোধের প্রভাব এখনো সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। অটোম্যান সাম্রাজ্যের পর যুগোস্লাভিয়া অন্তর্ভুক্ত হল অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের। ১৯১৮ সালে যুগোস্লাভিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যুগোস্লাভিয়ায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় ; তার পূর্বে ছিল রাজতন্ত্র।

যুগোস্লাভিয়ার আয়তন প্রায় ছিয়ানব্বই হাজার বর্গমাইল ; অসমতল পার্বত্য দেশ। জনসংখ্যা এক কোটি সত্তর লক্ষ। এতটুকু দেশের প্রধান ভাষা তিনটি—স্লোভেন্স, ম্যাসিডোনিয়ান ও সার্বো-ক্রোট। সবচেয়ে সমৃদ্ধ সার্বো-ক্রোট। আন্দ্রিচ এই ভাষার লেখক।

সমগ্র বলকান,—বিশেষতঃ যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র য়ুরোপের রাজনৈতিক ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। য়ুরোপে যুদ্ধ বা রাজনৈতিক বিক্ষোভ আরম্ভ হলে যুগোস্লাভিয়ার উপায় নেই দূরে থাকবার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে

যথাসম্ভব দূরত্ব সৃষ্টিই আমাদের লক্ষ্য থেকেছে', সম্পাদকমণ্ডলীর এই ঘোষণাকে পাঠশেষে অনেকটা অতিশয়োক্তিই মনে হয়েছে, তবু উপসংহারে, সম্পাদকীয় এই কথাগুলির সঙ্গে আমিও একমত : 'অসংখ্য সংকলন ও পত্র-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার মধ্যে কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনেই 'একতা'র রবীন্দ্রসংখ্যার প্রকাশ নয়। ছাত্রদের স্বতন্ত্র কণ্ঠ প্রকাশেই তার মৌল তাৎপর্য।'

'ভাবনার বৃত্তে' পর্যায়ের পরিকল্পনাটি ভালো লাগার মতো, যদিও দু-একটি বাদে অধিকাংশ রচনাই অনুশীলন-সাপেক্ষ। তবু টুকরো-টুকরো অনুভূতির দ্বীপপুঞ্জ একত্রিত হয়ে নতুন স্বাদ এনেছে। কিন্তু স্বাদ অসম্পূর্ণ থাকে ; যেহেতু সাদা পাতার চারটি চতুষ্কোণ এই বৃত্তেই আসন গ্রহণ করেছে।

চতুর্থ স্তরে, রবীন্দ্রোত্তর গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ-চিত্রকলার পর্যবেক্ষণ। সবগুলি প্রবন্ধই সুলিখিত, বিষয় যেহেতু সাম্প্রতিক তাই অতি-প্রয়োজনীয়, এবং যথোচিত ব্যাপক পরিধির। ব্যতিক্রম চিত্তরঞ্জন ঘোষের'রবীন্দ্রোত্তর নাটক'। লেখক পটভূমিকাকে আকর্ষণীয় করে, মূল ভূমিতে পাঠককে এনে তারপর হঠাৎই তাদের পরিত্যাগ করেছেন, ক্লাইম্যাক্স্-এর মুখে এনে আলোচনার যবনিকাপাত করেছেন, অথচ এ-প্রসঙ্গের বিস্তৃতি তাঁর অনায়াসসাধ্য ছিল। এই স্তরে আর একটি ব্যতিক্রম সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের আত্ম-প্রতিকৃতি'। স্থপতির চোখে, এর যথা-স্থান দ্বিতীয় স্তরে। হয়তো 'অনিবার্য কারণে' তা করা সম্ভব হয়নি। বিষয়, দৃষ্টিকোণ ও বাগ্ভঙ্গি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ; কিন্তু সুমন্ত-বাবুর ইদানীংকালের লেখাগুলি অকারণে হ্রস্বকায় ও দ্রুত-পথিক হয়ে উঠছে, অথচ ধীরে-সুস্থে গভীরে অবগাহনের নিশ্চিন্ত ক্ষমতা তাঁর আছে।

চার স্তর তথা চতুর্মাত্রিক স্থাপত্যের শিরোভূষণ মুখ্য সম্পাদকের 'কয়েকটি প্রকাশ ও প্রস্রবণের' কারুকাজে। পূর্ণচ্ছেদটিও বেদীর মত রমণীয়।

ইংরেজি অংশে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং রুশী অনুবাদ ও সমালোচনা [স্বনামখ্যাতা ভেরা নবিকোভার লেখা] উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক এবং রবীন্দ্রসংগীতের আলোচনায়, বিশেষত প্রথমটিতে, নতুন কোন বক্তব্য নেই। হিন্দী-অংশে পর্যবেক্ষণের গভীরতা নিশ্চয়ই অপ্রত্যাশিত। তবু কবিকে বোঝবার চেষ্টা এখানেও স্বতঃ। তার মধ্যে দুটি রচনা—রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দী ছায়াবাদী কবি, এবং রবীন্দ্রনাথ ও (অগ্রজ ছায়াবাদী কবি) জয়শংকর প্রসাদের তুলনামূলক আলোচনা—নতুন পদক্ষেপের অনুস্থত চিহ্ন।

'একতা'-র আলোচ্য সংখ্যায় লিখেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ও (পঞ্চাশ দশকের) প্রাক্তন ছাত্রমণ্ডলী। প্রাক্তনদের মধ্যে আছেন পরিণামসিদ্ধ লেখক ও অধ্যাপকও। দুটি-একটি রচনায় ভাষার জটিল বক্রতা লক্ষণীয়, নতুবা স্বচ্ছন্দ ও সুখপাঠ্য। সবচেয়ে বড়ো কথা, মানগত শ্রেণীবিন্যাস একরকম অসম্ভব। যদিচ, 'লেখক ও রচনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিক গতানুগতিকতা থেকে

সংখ্যাগুরুত্ব প্রত্যাশিত। বাংলা ও ইংরেজি সূচীর সাজ ভিন্‌জাতের না হলে, জাস্‌টিফিকেশনের দিক থেকে ভালোতর হত। তবে ছাপার ভুল এখানেই সবচেয়ে কম।

'একতা'-র কারুকলাগত অনৈক্য সম্পর্কে বক্তব্য বোধহয় প্রসারিত হল। কিন্তু অনর্থক নয়। নিবন্ধগুলির জাতীয়তার প্রেক্ষিতে গোত্রহীন আক্ষরিক স্খলন নিতান্ত বেদনাদায়ক, এবং প্রাথমিক ও অন্তিম আনন্দের মাঝখানটুকু ভরে আছে এই শূন্য-গর্ভ বেদনায়।

'একতা'-র সবচেয়ে দ্রষ্টব্য বৈশিষ্ট্য বাংলা বিভাগের বিষয়-সম্পাদনা। 'বিবিধ-বিচিত্র প্রসঙ্গের অবতারণা অন্যত্রও সুলভ। কিন্তু এখানে যেভাবে একটি সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে সম্পাদকমণ্ডলী অগ্রসর হয়েছেন, তা নিরঙ্কুশ প্রশংসনীয়। অপিচ, নিবন্ধগুলিকে সাজানোর মধ্যেও স্থাপত্যের একটি ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বহুবাচনিক আত্মীয়তার কৌতূহলী ইতিহাস বিবৃত ক'রে স্থাপত্যের বেদী রচিত হয়েছে। প্রসঙ্গটি কেশব চক্রবর্তী সহজ ও রমণীয় ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করেছেন। অতঃপর প্রাক্-রবীন্দ্র যুগের ইতিবৃত্ত ছুঁয়ে আলোচনার ধারা গড়ে উঠেছে, রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্র সেই বৃত্তের দ্বৈত বলয়। রবীন্দ্র-যুগে প্রমথ চৌধুরী একটি আত্মদীপ্ত ব্যক্তিত্ব, তাঁর উল্লেখও প্রাসঙ্গিক। ভাস্কর বসুর রচনা পরিশ্রমী, অরুণ সেনের বক্তব্য মাঝে মধ্যে জটিলতায় ভারাতুর। প্রমথ চৌধুরী প্রসঙ্গে নির্মাল্য আচার্য কয়েকটি নতুন কথা উচ্চারণ করেছেন, যা প্রচলিত আলোচনায় অপ্রাপণীয়। দ্বিতীয় স্তরে, রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ। শতবর্ষের পরম আয়ুতে উপনীত একটি সর্বতোমুখী মনের দৃশ্য-অদৃশ্য নানা রঙ্‌কে, তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ও সুমিত-অমিত বক্রতা ও রূপান্তরকে বোঝবার আন্তরিক প্রচেষ্টা। স্বাভাবিকভাবেই এই স্তরটি সবচেয়ে বেশি পরিমিত স্থান নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ, বিজ্ঞানচিন্তা, দার্শনিকতা, সাহিত্য-তত্ত্ব, মানবতা, কাব্যনাট্য, গদ্যের ও নাটকের ভাষা এখানে প্রাসঙ্গিক বিষয়। প্রতিটি রচনাই, হয় বিষয়বস্তুর নবীনতায় অথবা পুরনো বিষয়ের নবমূল্যায়নে, স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। বিজন পুরকায়স্থ, বেতুইন চক্রবর্তী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শিশিরকুমার দাশ, শঙ্খ ঘোষ, বিশেষত শেষ দুজনের, আলোচনা চিন্তার নতুন পথে পরিচালিত। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বার্ণিক রায়ের নিবন্ধ-দুটির অনাবশ্যক সংক্ষিপ্তি অতৃপ্তিদায়ক।

আরও দুটি সংখ্যার ললাটলিখনও একই দেখেছি। জানিনা, এই কলঙ্কমুক্তি সর্বজনীন কিনা। তবু একে যন্ত্র-ভৌতিক দৌরাত্ম্য বলে সহজেই মেনে নেওয়া [illegible]; কিন্তু সে দৌরাত্ম্য যখন পাতা ছেড়ে শিরায় তথা চরণে-চরণে মারাত্মক হয়ে ওঠে, তখন অনুকূল মনও বিস্রস্ত হয়ে ওঠে। প্রুফ্-রিডার যিনিই হোন, দায়িত্ব সম্পাদকমণ্ডলীর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্রে মুদ্রণ-প্রমাদের শরশয্যা আদৌ সাম্মানিক নয়। মুদ্রণ-প্রমাদ শুধু অসংখ্য নয়, অসহ্য, এবং অক্ষর বাহিনীতে শুধু নয়, ট্র্যাফিক তথা ছেদ-চিহ্নেও যথেষ্ট। ফলে, পাঠ-প্রমাদও পদে-পদে, এমনকি বাক্যের চেহারা ও বক্তব্যের অস্যার্থ বুঝতে অনেক সময়ে বিপর্যস্ত হতে হয়েছে। ভয় হয়েছে, কনিষ্ঠজন একেই না নব্যরীতির স্টাইল মনে করে বসে! বিশেষত যখন কয়েকজন লেখকের ব্যক্তিত্ব সাধারণ্যে পরিচিত ও চিহ্নিত।

বাংলা ও ইংরেজি অংশে মুদ্রণের যে সৌকর্য ও সুপ্রসাধন স্বতঃ, হিন্দী ও উর্দু অংশে তার অভাব এবং মান্ধাতার আমলের সেই গাঁটছড়াবাঁধা সচিত্র রীতির আবির্ভাব দেখে আরেকদফা বিস্মিত হয়েছি। খুব সম্ভব অন্যতর প্রেসে এই অংশগুলি ছাপা হয়েছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্পাদকমণ্ডলী, বিশেষত মুখ্য সম্পাদক, এ বিষয়ে অবহিত হলে সংখ্যাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হত, এক-সুরের প্রসাধন নতুন ঐতিহ্যের সূচনা করত। [অপিচ, হিন্দী-উর্দু সাহিত্য-পত্রিকা যে নব্যরীতিতে মুদ্রিত হয় না, তাওতো নয়!] উর্দু ভাষায় আমি অনধিকারী, বলতে পারব না, কিন্তু হিন্দী অংশে সূচীপত্র নেই কেন? ছাপার ভুল তো যথাযথ আছে! একটি ভুল, কোন্ জাতের জানিনা, উল্লেখ্য। অমর বাহাদুর সিংহ রচিত 'রবীন্দ্রসাহিত্য কী পৃষ্ঠভূমি—এক অধ্যয়ন' নিবন্ধের এক জায়গায়: 'কবি নবীনচন্দ্র রায় নে পৌরাণিক কৃষ্ণ কো পূর্ণ মানব কে রূপ মেঁ অপনে কাব্য মেঁ চিত্রিত কিয়া।' নবীন সেনের উপাধিতে এই 'রায়'-দান যান্ত্রিক ভূতের একক কৃতিত্ব বলে মনে হয় না। অপ্রসঙ্গত, এই প্রবন্ধেই তথ্যগত আর-একটি বিভ্রান্তি চোখে পড়ল। লেখক বলেছেন: মধুসূদন বাংলা 'সাহিত্য কী গতি ন দে সকে। বে ইস মানসিক ক্রান্তি কো সমঝ্নে মেঁ অসফল রহে'; মধুসূদন নব্য বাঙ্গালার ক্রান্তি-বিন্দু উপলব্ধি করতে পারেননি এবং সাহিত্যকে গতি দিতে পারেননি, এ-সিদ্ধান্ত, মতামতের নয়, অনৈতিহাসিক।

ইংরেজি নিবন্ধগুলি বিষয়ের দিক থেকে সুনির্বাচিত, কিন্তু আলোচনার দিক থেকে সংক্ষিপ্ত। সংখ্যালঘুও বটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকায় ইংরেজি রচনার

একতা ঃ রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ সংখ্যা

গুরুদাস ভট্টাচার্য

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসমাজের মুখপত্র 'একতা'-র* বয়স অল্প নয়। কিন্তু বহুদিন তার কেটেছে গতানুগতিকতার সনাতন অববাহিকায়। ইদানীং-কালের সংখ্যাগুলি নতুন খাতে চলতে সুরু করেছে, এবং বিষয়বস্তু নির্বাচন ও সাহসিক মুদ্রণ-আঙ্গিকে পত্রিকাটি স্ব-তন্ত্র চরিত্র অর্জন করেছে, সেই অর্জিত চারিত্র্য উন্নততম বিন্দু ছুঁয়েছে বর্তমান বিশেষ সংখ্যাটিতে। শুধু 'একতা'-র স্বগত ইতিহাসে নয়, রবীন্দ্র-শতবর্ষ-সংখ্যার প্রসারিত ভূসীমাতেও এটি একটি উল্লেখযোগ্য ও উজ্জ্বল সংযোজন। বলা উচিত, উজ্জ্বলতমদের অন্যতম।

প্রথমেই চোখে পড়ে, অভিজাত আয়তন। প্রয়োজনীয় ও স্বাদু রচনার অভাবে কলেজ-পত্রিকার বিশেষ-নির্বিশেষ যাবতীয় সংখ্যাই সাধারণতঃ ক্ষীণকায়া ও ক্ষীণতোয়া। একদা 'একতার' পাণ্ডুরতাও প্রবাদ-বাক্য ছিল। সম্প্রতিকালে সেই ব্যাধির পলায়নী মনোবৃত্তি স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। রবীন্দ্র-সংখ্যা ব্যাধিমুক্ত, সুস্থ, এবং পদার্থবিদ্যার বিচারে আশাতীতভাবে বেধগভীর। পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনা সাহিত্যায়ন নয়, বিজ্ঞানসম্মত শিল্প। এই শিল্পদৃষ্টিতে যে-ক'টি রবীন্দ্র-স্মরণ-সংখ্যা স্মরণীয় স্বাক্ষর রেখেছে, 'একতা' তাদের দলে স্বাধিকার-প্রবেশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত পাণ্ডুলিপি-চিত্র অবলম্বনে অজয় গুপ্ত যে প্রচ্ছদটি এঁকেছেন, ব্যঞ্জনায় ও বর্ণালি-সম্পাতে, সৌম্য সুসমতায় তা লোচন-গ্রাহিনী, এবং তদতিরিক্ত মনোহারিণীও। অন্দরমহলের মুদ্রণ-প্রসাধনও সমভাবে রুচি ও সৌন্দর্য-সম্মত। সব মিলিয়ে 'একতা' নব্যরীতির একটি বিশিষ্ট প্রকাশ-সংকলন।

তা ব'লে বিপ্রতীপ বক্তব্যের অবকাশও যে-এতে নেই, তা নয়। 'প্রবন্ধ পত্রিকার' সম্পাদক যে সংখ্যাটি সমালোচনার্থে আমাকে দিয়েছেন, তার চারটি পৃষ্ঠা (১২২—২৩ ও ১২৬—২৭) নিপাট নিরক্ষর অর্থাৎ সাদা। পরস্মৈপদী

* কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা। ১৩৬৮

গল্প ও গল্পপাঠক সম্পর্কে তারাশঙ্করের এ সংস্কার থেকেই জন্ম নিয়েছে তাঁর ছোট গল্পের বৃত্তান্তমুখ্য উপন্যাসধর্মী কাহিনী-প্রাধান্য।

কৃষিনির্ভর জমিদার তন্ত্র শাসিত গ্রামিক সমাজের শ্লথগতি পরিবেশে বিবর্ধিত তারাশঙ্করের দৈবনির্ভর প্রাচীনানুরক্ত অতীতচারী সাহিত্যমন বিজ্ঞান নির্ভর যন্ত্র যুগের নাগরিক ক্ষিপ্রতাকে আত্মসাৎ করতে পারে নি। বিলম্বিত লয়ের উপন্যাসধর্মী বর্ণনাতেই তাঁর আত্মতৃপ্তি। তারাশঙ্করের ছোট গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুতীক্ষ্ণ সাংকেতিকতা, হৃদয়ের জটিল অরণ্য-বিচরণের স্বচ্ছন্দ নৈপুণ্য অভাবিত। নীচু তলার সূচীভেদ্য অন্ধকারে তিনি মহৎ জীবনের তাৎপর্য সন্ধান করেন নি। ক্ষয়িষ্ণু মনোবিকলনের অধুনাতন রূপের প্রতিও তার আকর্ষণ নেই। অপসৃয়মান অতীতের ক্ষীণায়তন বদ্ধ জলাশয়ে অবগাহন করেই আত্মতৃপ্ত। অধুনাতন জীবনের বন্ধনবিমুখ তরঙ্গোচ্ছ্বাসে তিনি আতঙ্কিত। ছোট গল্পের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যও তিনি সর্বত্র আয়ত্ত করতে পারেন নি। ছোট গল্পকার তারাশঙ্করের জীবনচিন্তায় অশ্রুর নদী ঐক্যের সাগরসঙ্গমে মিলিত হয় নি, যন্ত্রের অরণ্য অতিক্রম করে জনারণ্যে উপস্থিত হতে পারে নি তাঁর শিল্প ব্যক্তিত্ব, তাঁর শিল্প চিন্তায় তিল তিল মৃত্যুর যাত্রা উজ্জীবনের পথে বাঁক নিয়ে সূর্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার অবকাশ পায় নি। তা সত্ত্বেও কাহিনীর রসোচ্ছলতা অনুভূতির সত্যতা, প্রকাশ-রীতির আন্তরিকতা ও বর্ণনার বাস্তবতায় তাঁর ছোট গল্প রসোত্তীর্ণ। তারাশঙ্কর যত বড় শিল্পী তার চেয়েও অনেক বড় পলায়নপর জীবন-রসের রসিক—এখানেই তাঁর সীমা ও সিদ্ধি।

আর তারাশঙ্করের 'বেদেনী' গল্পের উপসংহারে রাধিকা বেদেনী একদিকে কিষ্টো বেদেকে তার তাঁবু ও সার্কাসের সাজ সরঞ্জাম শম্ভু বাজীকরের জন্য রেখে যেতে অনুরোধ করে; অন্যদিকে যাবার সময় শম্ভুর তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে : 'বুড়া পুড়্যা মরুক'।

সর্বশেষ অনুচ্ছেদ দুটির মাধ্যমে জৈবকামনার একটিমাত্র মুহূর্ত 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে যে বিশাল ব্যঞ্জনায় রূপায়িত হয়েছে, গল্পের পরিণতিটি যেমন একটিমাত্র প্রতীতীতর সমগ্রতায় সার্থকতা লাভ করেছে, 'বেদেনী' গল্পে সেরূপ বিশাল ব্যঞ্জনা, তেমনিতর একক প্রতীতির সমগ্রতা অনুপস্থিত।

তারাশঙ্করের ছোটগল্প বৃত্তান্ত-প্রধান। গল্পগ্রাহী সাধারণ পাঠকের কাছে তিনি রস পরিবেশন করার প্রয়াসী। ষষ্ঠী নামে যে লোকটি তাঁর মনোহর পুকুরের বাসার কাজকর্ম করে দিত তাকে তিনি তাঁর লেখা ছলনাময়ী; মধু মাষ্টার, রায়বাড়ী আখড়াইয়ের দীঘি, ট্যারা, তারিণী মাঝি প্রভৃতি গল্প শুনিয়েছিলেন। গল্পগুলি তার ভাল লেগেছিল। তিনি বলেছেন : এই থেকেই আমি বুঝেছিলাম, বাঙলার অতি সাধারণ মানুষদের আমরা আধুনিক লেখকশ্রেণী যে নির্বোধ বা রসবোধহীন মনে করি, এর চেয়ে ভুল আর কিছু হয় না। যারা রামায়ণ মহাভারত বুঝতে পারে—কৃত্তিবাসী, কাশীরামদাসীই শুধু নয়, গদ্য অনুবাদ—যেগুলির ভাষায় ছাঁকা সংস্কৃত শব্দের প্রাধান্য, এবং ভাগবতের কথকতা যারা বুঝতে পারে, তারা একালের লেখাগুলি বুঝতে পারবে না কেন? ... ... যে অংশটুকু গল্প, যার আরম্ভ আছে, গতি আছে, এক অনিবার্য পরিণতি আছে সে তারা অবশ্যই বুঝতে পারবে.....। আমি দেখেছি তাতে তারা অভিভূত হয়, গল্পের পাত্রপাত্রীর সুখে দুঃখে তারা হাসে, কাঁদে। বুদ্ধিবাদী সমঝদারেরা মনের গঠনের দিক থেকে সম্পূর্ণ কাট ছাঁট করা, পালিশ করা কঠিন কষ্টিপাথরের চাকতি, সোনারূপার দাগ যাচাই করে মূল্য নির্ণয় করেন, সোনারূপার অলঙ্কারে এঁদের দরকার নেই। সাধারণ মানুষ হল নরম কষ্টিপাথর, যা থেকে বিগ্রহ গঠিত হয়, তারাই পরে এই সোনারূপার অলঙ্কার।

এই সাধারণ মানুষের মধ্যেই রসপিপাসা সত্যকারের তৃষ্ণা।.....সাধারণ মানুষেরাই সাহিত্যের সত্যকার পাঠক।"

"ঘরের দরজায় ধাক্কার সঙ্গে বাড়িউলির কর্কশ গলা শোনা গেল, ভর সন্ধ্যায় দরজা বন্ধ কেন লা বেগুন ? খোলনা, কতক্ষণ দাঁড়াব ?

প্রদীপের অস্পষ্ট আলোকে একটি বিগত-যৌবনা রোগা লম্বা স্ত্রীলোক সিল্কের একটা শাড়ী সেলাই করছিল— ।"

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পটির সূচনাই বলছে, এটি একটি ছোট গল্প। প্রতিটি অক্ষর এখানে লক্ষ্যভেদ করেছে। এ লক্ষ্যভেদের মধ্যেই ছোট গল্পের সার্থকতা।

ছোট গল্পে বেশী কথা বলার অবকাশ নেই। ন্যূনতম বক্তব্য উপস্থাপিত করাই ছোট গল্পের অবশ্যকৃত্য। কিন্তু তারাশঙ্করের বর্ণনাধর্মী ঔপন্যাসিক মন তাঁর ছোট গল্পের এ অবশ্য কর্তব্য পালনের অন্তরায় হয়েছে। তাই তাঁর 'আখড়াইয়ের দীঘি'র কালী বাগ্দীর কাহিনী পঁয়ষট্টি অনুচ্ছেদ-ব্যাপী রাজকর্মচারী মহলের তদন্ত বৃত্তান্তে ভারাক্রান্ত। রমা বাজীকরীর বিচিত্র জীবনের কথা বলতে গিয়ে তিনি বাজীকর সম্প্রদায়ের নিখুঁত ইতিহাস, তাদের আচার-আচরণের বিস্তৃত বিবরণ বর্ণনা করতে ইতস্তত করেন না।

একটি মাত্র প্রতীতীর সমগ্রতার বিশাল ব্যঞ্জনাতে ছোটগল্পের মুক্তি। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রতীতী প্রযোজনার তীক্ষ্ণাগ্র সাংকেতিকতা তারা শঙ্করের অনুপস্থিত। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' ও তারাশঙ্করের 'বেদেনী' গল্পে জান্তব লীলার একটি দিক প্রতীক্ষিত। 'প্রাগৈতিহাসিকে'র উপসংহার :

"ভিখুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া পাঁচী তাহার পিঠের উপর ঝুলিয়া রহিল। তাহার দেহের ভারে সামনে ঝুঁকিয়া ভিখু জোরে জোরে পথ হাঁটিতে লাগিল। পথের দুধারে ধানের ক্ষেত আবছা আলোয় নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। দূরে গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।

হয়ত ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই—পাইবেও না।"

সঞ্জীবিত। গল্পগুলির স্বাদ বৈচিত্র্য ও সিদ্ধির রহস্য জীবন ও জীবন পরিবেশের প্রভাব-পুষ্ট। তাঁর জীবন-উৎস থেকেই তারা উৎসারিত। জীবনের উষ্ণ স্পর্শ ও অনুভূতির সত্যতার মধ্যেই তাদের সার্থকতা।

॥ চার ॥

তারাশঙ্কর মূলত ঔপন্যাসিক। তাঁর অধিকাংশ ছোট গল্প উপন্যাস-সুলভ বিস্তৃত ক্যানভাসের উপর চিত্রিত। বিদ্যুৎ-বিস্ফার ব্যঞ্জনা চকিত আরম্ভ তার ছোট গল্পে অনুপস্থিত। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে এখানেই তাঁর পার্থক্য। দু'জনের দুটি গল্পের সুরুকে পাশাপাশি রাখলেই পার্থক্যটি স্পষ্ট হবে। তারাশঙ্করের 'প্রতিমা' গল্পটি সুরু হয়েছে এভাবে :

"ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সময়। আকাশে মেঘে বর্ষার সে ঘনঘোর রূপ আর নাই। মেঘের রঙ ফিরিতে আরম্ভ হইয়াছে, রৌদ্রের রঙে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। গত বৎসরের অনাবৃষ্টি ও অজন্মার পর এবার বর্ষা হইয়াছে ভাল, মাঠে ধানের রঙ কসকসে কালো, আর ঝাড়ে গোছেও সুন্দর পরিপুষ্ট। দেশে একটা প্রশান্ত ভাব।"

গল্পটির এ আরম্ভে সকরুণ পরিণতির বিন্দুমাত্র ব্যঞ্জনা নেই। বর্ণিত বিষয় সূচনাতে অভিব্যঞ্জিত হবার অবকাশ পায় নি। তাঁরই বিখ্যাত উপন্যাস 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' সুরু হয়েছে এমনিতর দেশজোড়া বিস্তৃতিকে আত্মসাৎ করে :

"মা ভাগীরথীর কূলে কূলে চরভূমিতে ঝাউবন আর ঘাসবন—তারই মধ্যে বড় বড় দেবদারু গাছ। উলুঘাস কাশ শর আর সিদ্ধি গাছে গাছে চাপ বেঁধে আছে। মানুষের মাথার চেয়েও উঁচু। এরই মধ্যে গঙ্গার স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হিজল-বিল এঁকে বেঁকে নানা ধরণের আকার নিয়ে চলে গেছে।"

একই বিলম্বিত সূচনা। প্রথম বাক্য থেকেই তারাশঙ্কের ছোট গল্প সুনিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে যাত্রা করে নি। অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে পটভূমি রচনার একটি প্রস্তুতিপর্ব তারাশঙ্করের ছোটগল্পে লক্ষণীয়। মূল রাগিনীর আভাস সূচনাকে চকিত করে তোলে নি। মুহূর্তজীবী বিদ্যুদ্বিকাশে তাঁর ছোটগল্পের বক্তব্য শেষ হয়নি।

সূচনার মধ্যে ছোটগল্পের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। একটি গল্পের সূচনা :

কাঁখে অক্ষয় পূর্ণকুম্ভ নিয়ে তৃষ্ণার ক্ষেত্রে জল-সত্র ব্রতধারিণী হয়ে জল পরিবেশন করে বেড়াচ্ছে। 'তারিণী মাঝি' গল্পের পটভূমি ময়ূরাক্ষীর বন্যার বর্ণনা আজ ইতিহাসের উপাদান হয়েছে। পরের কালের মানুষ ময়ূরাক্ষীর বর্ণনার মধ্যে অনেক গরমিল দেখে বিস্মিত হবে। কিন্তু 'তারিণী মাঝি' গল্পটির মধ্যে এমনই প্রাণবান তার সুখ দুঃখ এমনই চিরকালের সুখ দুঃখ যে তাকে অতিচেনা কাছের মানুষ বলে মনে হবে। তারিণীই গল্পটিকে কাল থেকে কালান্তরে নিয়ে যাবে। তারিণী মাঝি সম্পর্কে সে বিশ্বাস আমার আছে।"

মন্বন্তরের সময়ে '১৩৫০' নাম নিয়ে তাঁর একটি গল্প সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি এ গল্প সংগ্রহের দ্বিতীয় প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছেন। কারণ তিনি মনে করেন তারা যে কালের পটভূমিকা ও বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত সেকাল অবসিত। এবং সে কালের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে গল্পগুলিও মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। "১৩৫০'-এর দ্বিতীয় প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া সম্পর্কে এইটিই বোধ করি একমাত্র কারণ নয়। সে দিনের তারাশঙ্কর আর আজকের তারাশঙ্করের মধ্যে মতবাদগত পার্থক্য অনেকখানি। যে রাজনৈতিক মতবাদের স্পর্শে '১৩৫০'-এর গল্পগুলি প্রাণবান হয়ে উঠেছিল, সে রাজনৈতিক মতাদর্শ থেকে তারাশঙ্কর অনেকখানি দূরে সরে এসেছেন। "১৩৫০'-সমকালীন রাজনৈতিক মতাদর্শ তারাশঙ্করের জীবনে মুহূর্তজীবী।

তাঁর সৃষ্ট মানুষগুলির মধ্যে আদিমতার প্রবাহ প্রবল। তাই তিনি যে কামনার কথা বলেছেন সে কামনা সর্বত্র বিস্তৃতিশীল সভ্যতার সৌন্দর্যরসে অবগাহন করে প্রেমের মার্জিত রূপশ্রী লাভ করে নি। তাঁর কামনাকন্যারা মিথুনলীলার সঙ্গিনী মৃন্ময়ী, মার্জিতমনা প্রেমের চিন্ময়ীরূপে বিলসিত হয় নি। ব্যতিক্রম কিছু আছে, তবে একান্তই নগণ্য।

একদিকে তিনি যেমন মানুষের মধ্যে পাশবিকতা দেখেছেন, তেমনি অন্যদিকে পশুর মধ্যেও মানবিক বৃত্তির আরোপ করেছেন। মানুষ ও পশুর মানসিক সহমর্মিতা ঘটিয়ে তিনি যে সব গল্প লিখেছেন তার মধ্যে 'কালাপাহাড়' অন্যতম। শরৎচন্দ্রের মহেশের তুলনায় কালাপাহাড় আয়তনে অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও 'মহেশে'র আবেদনের তুলনায় কালাপাহাড়ের আবেদনের পরিসর অনেক সংকীর্ণ। তার কারণ কালাপাহাড়ের ক্ষেত্রের সংকীর্ণতা।

তারাশঙ্করের ছোট গল্পের উপাদানগুলি আপন জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়

চরিত্র অপূর্ব সার্থকতায় মণ্ডিত। এ গল্পটি রচনার মুন্সীয়ানায় চিরকালের হয়ে উঠেছে।

বনজঙ্গল; হিংস্র জন্তু, পাশবিক মানুষ, রূঢ় বীরভূম তারাশঙ্করের ছোট গল্পের আধার। তাঁর বিচার নিষ্ঠুর ও চূড়ান্ত। আপন অঞ্চলের মানুষের প্রাচীন পরিবেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি ভারতীয় দর্শনচিন্তা ও জীবনবেদের অনুশীলন করেছেন। বাঙলা সাহিত্যে অঞ্চলের কথা কিছু কিছু গল্পকার বলেছেন। কিন্তু তারাশঙ্করকেই একমাত্র পুরোপুরি আঞ্চলিক। আঞ্চলিক পশ্চাদ্ভূমি থেকেই তাঁর অধিকাংশ গল্প প্রাণরস সঞ্চয় করেছে। অঞ্চলের ভূমিকাকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে তাঁর বহু গল্প সম্পূর্ণতা হারিয়ে ফেলে। কারণ আঞ্চলিকতার আকাশমাটি আলোছায়ায় তারা লালিত ও বিবর্ধিত। বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের বা গোষ্ঠীর বিশেষ ধরণের মানুষ তাঁর অবলম্বন। তিনি যখন তাদের এঁকেছেন তখন তিনি মহৎ জীবনশিল্পী। অনুভূতির সত্যতায়, শিল্পীর অন্তরঙ্গ আবেগস্পর্শে তারা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। উদাহরণে বক্তব্য স্পষ্ট হবে। তাঁর 'ইমারত' গল্পটির কথাই ধরা যাক। রাজমিস্ত্রী জনাব শেখের বর্ণনা : 'মাঝখানে চেরা সিঁথিটি তার ওস্তাদের সুতোয় পাকানো সরু দড়িটির মতো সাদা এবং সোজা, বাবরীকাটা সাদা চুলগুলি পরিপাটি করে আঁচড়ানো, কর্ণিক দিয়ে মাজা পঙ্কের পলেস্তারার মতো চকচক করছে। ঘাড়ে চুলগুলির প্রান্তভাগ সযত্নে কেটে নিচে থেকে ঘাড়টা কামিয়ে ফেলেছে, গোল থামের মাথায় বেড় দেওয়া কার্ণিশের বিটের মতো—সবচেয়ে পাতলা কর্ণিক দিয়ে দড়ি ধরে কাটা হয়েছে যেন।'

তারাশঙ্কর এখানে প্রথম থেকেই রাজমিস্ত্রীর চোখ দিয়ে জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন। জনাবের শারীরিক বর্ণনাতেও তাই রাজমিস্ত্রীর পরিভাষার প্রয়োগ। বর্ণনার নৈপুণ্যে, কলাবিধির উৎকর্ষে আঞ্চলিক পটভূমিতে চিত্রিত হয়েও গল্পটি স্থান কালের সংকীর্ণ গণ্ডীকে অতিক্রম করেছে। এমনিতর আর একটি সার্থক গল্প 'তারিণী মাঝি'। এ গল্প প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের বক্তব্য যথার্থ :

"আমার একটি গল্প আছে 'তারিণী মাঝি'; পটভূমি ময়ূরাক্ষী। ময়ূরাক্ষীর সর্বনাশা হড়পা বান দেশের বুকে কি ধ্বংসলীলায় বেয়ে চলে যায়—তার বর্ণনা তাতে অনেক আছে। কিন্তু তার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে তারিণীর সুখ দুঃখ। আজ ময়ূরাক্ষী বাঁধা পড়েছে। এ কালে বাঁধে বাঁধা ময়ূরাক্ষী তার নখর দন্ত সম্বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। শান্ত শিষ্ট মেয়েটির মত সে আজ দেশে দেশে

মধ্যেও অটল ভগবদ্ ভক্তি, শোকে অবিচলিত ধৈর্য, দানে মুক্তহস্ততা তাঁর চরিত্রকে বিশালতা দিয়েছে। কিন্তু প্রজাদের বিশ্বাসঘাতকতার দারুণ দণ্ডদানের ভার তিনি তুলে নিলেন নিজের হাতে। তাঁর উপর দৈবের অভিশাপ নেমে এল আতর্কিত বজ্রপাতের মত। গল্পের মধ্যে এ পরিণতির পূর্বসূচনা না থাকা সত্ত্বেও তাঁর আস্তিক্যবাদী মন এ উপসংহারে আসতে বাধ্য হয়েছে। সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার, পুত্রেষ্টি, ব্যাঘ্রচর্ম প্রভৃতি গল্প জমিদার জীবনের পটভূমিতে রচিত। সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার সরকার বাবুর সকরুণ পরিণতি গল্পকারের সহানুভূতির ব্যথাসজল স্পর্শে আর্দ্র।

ডাক হরকরা, চৌকিদার প্রভৃতি গল্প কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয়-লিপিকা। তাই দীনু ডোমের (ডাক হরকরা) অবিবেচনা কর্তব্যনিষ্ঠা বুদ্ধি বিবেচনার অতীত সহজাত সংস্কার। চৌকিদারের জীবনে ডাক হরকরার মত কোন কঠোর কর্তব্য বা আদর্শের নিষ্ঠা তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে নি। গ্রামসেবকের জীবন যাত্রার চিত্র হিসাবেই চৌকিদার গল্পটি সার্থক।

'মধুমাষ্টার' সগোত্র গল্পগুলি গ্রাম্য শিক্ষকের আত্মভোলা প্রকৃতি, অসাধারণ জ্ঞানস্পৃহা এবং অতুলনীয় তেজস্বিতার বিবরণ। গল্পের উপসংহারে তাঁর স্ত্রীর মুখে প্রেমব্যঞ্জক সংলাপ একটি মনস্তাত্ত্বিক রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেছে। তাই প্রেমের সঙ্গে বাস্তবের বিরোধ এ গল্পটির ফলশ্রুতি। রাখাল বাড়ুজ্যে গল্পটি কৃপণ, অর্থলোভী আত্মসম্মান জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণের অপরিমেয় নীচতার চিত্র। বিধবা হৈমর দৃপ্ত তেজস্বিতার বিপ্রতীপে মানুষের হীনমন্যতা স্পষ্টতম রূপে ধরা পড়েছে। গ্রাম্য জীবনের মত্ত অসংযম 'জুয়াড়ী' গল্পে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। 'প্রতিমা' গল্পটি মানুষের সন্দেহ পরায়ণতা ও নীচতার চিত্র। এ গল্পের সূত্রগুলি তেমন সুগ্রথিত নয়। 'ডাইনীর বাঁশী' ও 'মতিলাল' গল্পের আবেদন এক। সন্তানের জন্য যে ক্ষুধ্য দুটি গল্পে উত্তপ্ত মুহূর্তে জ্বলে উঠেছে, তার সঙ্গে লোকাচার জর্জর অন্ধসংস্কারের কুশ্রীতা যুক্ত হয়েছে 'ডাইনীর বাঁশী' গল্পের পটভূমিকায়।

তারাশঙ্করের সার্থকতম গল্পগুলির মধ্যে 'দেবতার ব্যাধি' অন্যতম। ডাক্তার গড়গড়ি অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। কাউকে সে গ্রাহ্য করে না। গ্রামবাসীরা তার কাছে বর্বর। গ্রামের স্কুলের হেডমাষ্টারের সঙ্গেই শুধু তার হৃদ্যতা। ডাক্তার দেবতা, লালসা তার মারাত্মক ব্যাধি। ব্যাধিগ্রস্ত দেবতার চিত্র হিসাবে গড়াগড়ি

প্রাগৈতিহাসিক কামনা বন্যাধারা। মিথুনলীলার ফেনায় ফেনায় সে কামনা ফেনিল। তাদের কামনাটি দেহের দেউলে মাথা কুটে মরে।

'নারী ও নাগিনী'র জান্তব প্রেম বাস্তব। সে প্রেম ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচার করে করে না। 'প্রেম ও বাসনা, আদিম ঈর্ষার আশ্চর্য উদাহরণ যে রাধিকা বেদেনী একদিন তার স্বামীর ঘর ছেড়ে শম্ভু বাজীকরের সঙ্গে চলে এসেছিল সে বহুচারিণী নারী আবার একদিন শম্ভুকে ছেড়ে গেল কিষ্টো বেদের যৌবন-ভোগের উন্মত্ত কামনায়। 'রসকলি'র প্রধান রস শৃঙ্গার। কারুণ্যঘন উপসংহারও আদিরসের ঔজ্জ্বল্যকে ম্লান করতে পারে নি। তাই গল্পটির উপসংহার অস্বাভাবিক মনে হয়।

তারাশঙ্করের নায়িকারা কামাতুর পুরুষের পিপাসার মুখে যৌবনোচ্ছল সুরার পাত্র তুলে ধরতেই অভ্যস্ত। তাদের অনেকেরই দেহে রেসাতির পশরা। অনেকেই রমার সগোত্রা। থানাদারদের সঙ্গে রমার আচার আচরণে তাদের প্রতীক সংকেত :

—আজ্ঞে নতুন দারোগাবাবু এলেন, তাথেই বলছি।

—উনি এখানে কাজে এসেছেন।

—কাজে!

—হ্যাঁ, তোকে ধরে নিয়ে যাবেন। পরোয়ানা আছে তোর নামে।

—আমার নামে? মেয়েটি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—হাসছিস যে। তোরা হারামজাদীরা পাকা চোর।

হাসিতে হাসিতে বাজীকরী বলিল—আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু ধর্য্যা কি করবেন হুজুর, মন চুরির বমাল যে সনাক্ত হয় না।

নতুন দারোগাবাবুটি চোখ কপালে তুলিয়া বলিল—ওরে বাপরে!

বাজীকরী দুই-হাতে তুড়ি দিয়া আরম্ভ করিল—

উব-র জাগ জাগ জাঘিন ঘিনা জাবমিনি না—
সরু কাপড় নক্সি পেড়ে—মাকড়ি চুরি গয়না—
গোটা পাটা সাপ কাঁটায় পুঁজিপাটা রয়না—

বিদায় হইয়া বাজীকরী চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু বারান্দায় উপবিষ্ট কনেস্টবল দলের জনদুয়েক উঠিয়া গিয়া থানার বড় বটগাছটার আড়াল হইতেই তাহাকে ডাকিল।

হাসিয়া বাজীকরী বলিল—বলো, কি বলছ।

—আমাদের আলাদা করে নাচ দেখাতে হবে।

—দেখাব।

—ল্যাংটা হয়ে নাচতে হবে। এরা এসেছে ভরতপুর থেকে, দেখবে।

মুখের দিকে চাহিয়া বাজীকরী বলিল—এক টাকা লিব কিন্তুক।

—আমি দেব।...

কনেস্টবলটা তাহার মুখের দিকে চাহিল;—মদির দৃষ্টিতে বাজীকরী তাহারই মুখের দিকে চাহিয়াছিল, ঠোঁটের রেখায় মাখানো লাস্যভরা হাসি।

মেয়েটা সত্যই নাচে সমস্ত আবরণ পরিত্যাগ করিয়া। এতটুক সংকোচ নাই, কুণ্ঠা নাই, যৌবন লীলায়িত অনাবৃত তনুদেহ, চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি।"

তারাশঙ্করের নায়িকারা ইতিহাসের যে স্তর থেকে উঠে এসেছে সেখানে প্রেমলীলা ও কামনানীল মিথুনবিলাস সমার্থক। প্রেমের সমুন্নত ছবি তারাশঙ্করের ছোট গল্পে বিরল। উচ্ছল কামকেলি বর্ণনাতেই তাঁর আত্মস্বাচ্ছন্দ্য।

তারাশঙ্করের কিছু কিছু হাসির গল্প আছে। কিন্তু সে গল্পগুলি সবসময় আমাদের হাসি উদ্রিক্ত করতে সমর্থ হয় না। 'তাসের ঘর' গল্পটি হাসিকান্নার মিশ্রণে গঠিত। বধূ শৈলর মানসিকতা বাস্তব সমাজে বিরলদৃষ্ট শুধু নয়, উদ্ভট। বিশেষ অঞ্চলের স্থান কাল, এমনকি বিশেষ ব্যক্তিকে অতিক্রম করতে পারে নি গল্পটি। একটি মেজাজ, একটি আচরণ, একটি পলাতক মুহূর্তকে, এমনিতর এক একটি ছোট জিনিষকে কেন্দ্র করে রচিত ছোট গল্প চিরন্তন সত্যের দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠতে পারে। একটি মুহূর্তের সমস্যা সর্বকালের ব্যাপ্তি পেতে পারে। এই পারার মধ্যেই ছোট গল্পের সার্থকতা। কিন্তু তাসের ঘরের শৈল একান্তই ব্যক্তিক, বিশেষ স্থান কালের গণ্ডীতে সীমিত, সংকীর্ণ। তারাশঙ্কর শৈলর মত বহু বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তারা আমাদের অনুভূতিকে চকিত করে, ভাববার সুযোগ দেয় না। তারা কেবল বিমূঢ় করে, আঘাত হানে। সে আঘাত কিন্তু মনের নয়, বাইরের। মন্বন্তরের সময়ে লেখা 'পৌষ লক্ষ্মী' এ পর্যায়ের আর একটি গল্প।

ভগবদ-বিশ্বাস ও বিধাতার উপর সুদৃঢ় আস্থা তারাশঙ্করের আস্তিক মনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'রায়বাড়ী' গল্পে রাবণেশ্বর রায়ের দৃপ্ত শৌর্য, ভোগলিপ্সার

আমাদের পক্ষে অতিশয় সহজ-স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। আমরা অতি গুরুতর এবং অতি সামান্য বিষয়েও অকাতরে মিথ্যা বলি। অনেক কাগজ বঙ্গদেশে অত্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে তাহারা মিথ্যা কথা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, পাঠকদের ঘৃণা বোধ হয় না। আমরা ছেলেদের সযত্নে ক খ শেখাই, কিন্তু সত্যপ্রিয়তা শেখাই না—তাহাদের একটা ইংরাজি শব্দের বানান ভুল দেখিলে আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়, কিন্তু তাহাদের প্রতিদিবসের সহস্র ক্ষুদ্র মিথ্যাচরণ দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্য বোধ করি না। এমন কি আমরা তাহাদিগকে ও তাহাদের সাক্ষাতে মিথ্যা কথা বলি ও তাহাদিগকে স্পষ্টতর মিথ্যা কথা বলিতে শিক্ষা দিই। আমরা মিথ্যাবাদী বলিয়াই এত ভীরু! এবং ভীরু বলিয়াই এমন মিথ্যাবাদী। আমরা ঘুসি মারিতে লড়াই করিতে পারি না বলিয়া যে আমরা হীন তাহা নহে—স্পষ্ট করিয়া সত্য বলিতে পারি না বলিয়া আমরা এত হীন। আবশ্যক বা অনাবশ্যক মত মিথ্যা আমাদের গলায় বাধে না বলিয়াই আমরা এত হীন। সত্য জানিয়া আমরা সত্যানুষ্ঠান করিতে পারি না বলিয়াই আমরা এত হীন। পাছে সত্যের দ্বারা আমাদের তিলার্দ্ধমাত্র অনিষ্ট হয় এই ভয়েই আমরা মরিয়া আছি।"

লেখকের সহসা এই উচ্ছ্বাসের কি কারণ ঘটিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। একটি জাতিকে এমন ভাবে মিথ্যাবাদী বলিয়া অভিহিত করিবার ধৃষ্টতা মেকলের মত লোকের পক্ষেও লজ্জার বিষয়; কারণ, ব্যক্তি-বিশেষের বা দলবিশেষের ত্রুটি সত্য হইলেও সেই ত্রুটির কলঙ্কলেপে একটি জাতিকে কলঙ্কিত করা কখনই সমর্থিত হইতে পারে না। এই "আমাদের জাতির" মধ্যেই রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামতনু লাহিড়ী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির আবির্ভাব এই রচনার পূর্বেই হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন সমগ্র জাতিকে (তিনিও সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত) মিথ্যাশ্রয়ী বলিয়াছেন, তখন তিনি যদি সংবাদপত্রগুলিকে মিথ্যাশ্রয়ী বলেন, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। জীবিকা নির্বাহের জন্য মিথ্যাই যে প্রয়োজন, তাহাও নহে। বিশেষ সংবাদপত্র সম্বন্ধে লেখকের অভিজ্ঞতাও যে অধিক, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

সে যাহাই হউক—এই প্রবন্ধে যাহা বলা হইয়াছিল, তাহাই আরও বিস্তৃত ও প্রবলভাবে একটি প্রবন্ধে নিবদ্ধ করিয়া কয় মাস পরেই রবীন্দ্রনাথ তাহা কোন

সভায় পাঠ করিয়াছিলেন। পরবর্তী অগ্রহায়ণ মাসের 'ভারতী' পত্রে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষভাবে আক্রমণ করা হয়—

"আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্যভাবে, অসঙ্কোচে, অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন। সাকার নিরাকারের উপাসনা ভেদ লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছেন, কিন্তু অলক্ষ্যে ধর্মের ভিত্তিমূলে যে আঘাত পড়িতেছে, সেই আঘাত হইতে ধর্মকে ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ দণ্ডায়মান হইতেছেন না। একথা কেহ ভাবিতেছেন না যে, যে সমাজে প্রকাশ্যভাবে কেহ ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সাহস করে, সেখানে ধর্মের মূল না জানি কতখানি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আমাদের নিজের মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চারিত না হইত, তাহা হইলে কি আমাদের দেশের মুখ্য লেখকগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্দ্ধা সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করেন?" এই অভিযোগের উত্তর বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রচার' পত্রে দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের নাম ছিল "একটি পুরাতন কথা।" বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ—"আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও 'নব হিন্দু সম্প্রদায়'।" বঙ্কিমবাবুর প্রবন্ধ যেমন গাম্ভীর্যদ্যোতক তেমনই তীব্রতা-পূর্ণ। তিনি প্রথমেই বলেন, "রবীন্দ্রনাথের কথার প্রয়োজনীয় উত্তর দুইছত্রে দেওয়া যাইতে পারে—ইহার বেশী প্রয়োজন নাই।" কিন্তু "রবির পেছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি"—সে ছায়া আদি ব্রাহ্ম সমাজ। আদি ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ হইতে তাঁহার প্রতি যে সব আক্রমণ হইয়াছিল, সে সকলের পরিচয় দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেন :—

"রবীন্দ্রবাবু 'সত্য' এবং 'মিথ্যা' এই দুইটি শব্দ ইংরাজি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সেই অর্থেই আমার ব্যবহৃত 'সত্য', মিথ্যা' বুঝিয়াছেন। তাঁহার কাছে সত্য Truth মিথ্যা falsehood। আমি সত্য মিথ্যা শব্দ ব্যবহারকালে ইংরেজির অনুবাদ করি নাই। এই অনুবাদপরায়ণতাই, আমার বিবেচনায়, আমাদের মৌলিকতা, স্বাধীন চিন্তা ও উন্নতির এক বিঘ্ন হইয়া উঠিয়াছে। 'সত্য' 'মিথ্যা' প্রাচীনকাল হইতে যে অর্থে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, আমি সেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। যে দেশী অর্থে সত্য —Truth, আর তাহা ছাড়া আরও কিছু। প্রতিজ্ঞারক্ষা, আপনার কথা রক্ষা

ইহাও সত্য। এইরূপ একটি প্রাচীন ইংরাজি কথা—Truth। ইহাই Truth শব্দের প্রাচীন রূপ। এখন Truth শব্দ ও Truth ভিন্নার্থ হইয়া পড়িয়াছে। ঐ শব্দটিও এখনও আর বড় ব্যবহৃত হয় না। Honour, Faith এই সকল শব্দ তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এ সামগ্রী চোর ও দুষ্ক্রিয়াচারীদিগের মধ্যেও আছে। তাহারা ইহার সাহায্যে পৃথিবীর পাপ বৃদ্ধি করিয়া থাকে।"

প্রবন্ধের শেষ ভাগে উক্তি—"মৌখিক অসত্যের অপেক্ষা আন্তরিক অসত্য যে গুরুতর পাপ, রবীন্দ্রবাবু বোধহয় তাহা স্বীকার করিবেন। সত্যের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে গিয়া কেবল মৌখিক সত্যের প্রচার, আন্তরিক সত্যের প্রতি অপেক্ষাকৃত অমনোযোগ, রবীন্দ্রবাবুর যত্নে এমনটা না ঘটে, এইটুকু সাবধান করিয়া দিতেছি। ঘটিয়াছে, এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু পথ বড় পিচ্ছিল, এজন্য এটুকু বলিলাম, মার্জনা করিবেন।"

এই বাদানুবাদের সব স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার দ্বারা অপসারিত করিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুতে লিখিত তাঁহার প্রবন্ধে। "বালকে" যাহার সূচনা ও "ভারতীতে" প্রকাশ—"সাধনায়" তাহার সমাপ্তি।

সাম্প্রতিক ছোট গল্প ঃ একটি মত

সমীরকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধ-পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ গুপ্তের প্রবন্ধ দুটি পড়লাম। শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় যা বলেছেন, তাতে আপত্তি করার কিছু নেই, বরংচ তাঁর বক্তব্য তরুণ গল্পকারদের শিরোধার্য। কিন্তু শ্রীযুক্ত গুপ্তের প্রবন্ধটি নানা কারণে যথেষ্ট তর্কসাপেক্ষ। তারই সূত্র ধরে এখানে সাম্প্রতিক ছোটো গল্প সম্পর্কে কিছু ব্যক্তিগত মত উপস্থাপিত করছি।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে বর্তমান আলোচনাটি মোটেই শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের মতো নির্বিশেষ ধরণের লেখা নয়, বিশেষ কয়েকজন সাহিত্যিকের গল্প ধরেই এই নিবন্ধটি রচিত।

'ধানকানা'-'আগন্তুক' থেকে 'চৈত্রদিন' পর্যন্ত ননী ভৌমিকের লেখা গল্পগুলি অধিকাংশই সার্থক, দুঃশীল সমালোচক তার নিন্দা করতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক সাহিত্যরসিকের কাছেই সেগুলি প্রসংশাযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। শ্রীযুক্ত গুপ্তও তাই বিবেচনা করেছেন। কিন্তু তারপর, এ বৎসরের শারদীয়া 'পরিচয়' ও 'স্বাধীনতা'-য় প্রকাশিত 'অন্যবিধ' ও 'মাটিতে নেমে' গল্প দুটি দেখছি পাঠক মহলে যথেষ্ট বিভ্রান্তির কারণ হয়েছে। শ্রীযুক্ত গুপ্ত দেখলাম সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। তিনি স্পষ্টই বলছেন, 'অন্যবিধ-মাটিতে নেমে' গল্পের প্রবণতা ননীবাবুর আত্মহত্যার পথ।

যিনি ননী ভৌমিকের 'পলাশসন্ধ্যা' বা 'চৈত্রদিনে'র মতো গল্প পড়েছেন, তাঁর পক্ষে অন্যবিধ-মাটিতে নেমে পড়ে বিভ্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক। দু লেখকের মধ্যে যেন আকাশ-পাতাল ফারাক। আমিও স্বীকার করতে বাধ্য যে ও-ধরণের মনোভাব আমারও একবার এসেছিল। কিন্তু তা বলে তা'ই সত্যি নয়।

শ্রীযুক্ত গুপ্ত আশা করি জানেন যে ননীবাবু অনেকদিন রাশিয়াবাসী। 'পূর্বক্ষণে'র চার বছর বাদে মতি নন্দী আকাঙ্ক্ষিত অনেক নতুনত্বই তিনি

এনেছেন। আর সে পটভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে সত্যিই তাঁকে সমাজবাদ-বিরোধী, জীবনবিরোধী বলে মনে হবে।

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ গুপ্তের ও মত মেনে নিলে নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির 'ইস্পাত'কেও উক্ত অভিধায় চিহ্নিত করতে হয়। এবং এই 'ইস্পাতে'র সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে 'অন্যবিধ' বুঝতে সুবিধে হবে। ধরা যাক্, রিতা-চরিত্রটি। প্রথমে সে ভালবেসেছে সাজিকে, তারপর প্যাভেলকে, এবং শেষে সারা-রুশ তরুণ কমিউনিষ্ট লীগের ষষ্ঠ কংগ্রেসে যখন প্যাভেলের সঙ্গে রিতার দেখা হ'লো। তখন রিতা জানালো, 'আমার কোলে এখন একটি ছোট্ট মেয়ে, বুঝলে? ওর বাবাকে আমি খুব ভালোবাসি।.....'

আমরা প্রেমের একনিষ্ঠতায় বিশ্বাসী। আমরা ভাবসম্মিলনের চেয়ে বিরহকে বেশী ওপরে স্থান দিই। আমাদের দর্শনে তাই নারীর মূল্য একনিষ্ঠতায় —তা মা বা প্রেমিকা যে ভূমিকাতেই হোক না কেন। পক্ষান্তরে, ওদেশের দর্শনে, প্রেমের একনিষ্ঠতা একটা সৌখীন তত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই না। ওরা জীবনকে পূর্ণভাবে উপভোগ করতে চায়, বসে বসে হাহুতাশ করাকে সময় নষ্ট বলেই জানে। প্রেমদর্শনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এ-এক মৌল প্রভেদ।

'অন্যবিধ' গল্পে ননী ভৌমিক অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সেই দু'দর্শনের পার্থক্যকে তুলে ধরেছেন। সেই মেয়েটি এক-দুই-তিন চারজনকে ভালবেসেছে, হয়তো আরও বাসবে—অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে, হয়তো আরও হবে—প্রেমের এ-রূপ আমাদের রক্ষণশীল মনকে (অর্ধ-সামন্ত অর্ধ-ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাতে থেকেই ও-ধরণের মন গড়ে উঠেছে) আহত করে, ঠিক বুঝে উঠতে পারি না—কারণ, প্রেম আমাদের কাছে এক মহান্ আধাত্মিক জিনিষ, দেহাশ্রয়ী প্রেম তাই আমাদের কাছে ঘৃণ্য; দেহাতীত, কামগন্ধহীন প্রেমে আমাদের তাই অসম্ভব অনুরাগ। ননীবাবু সে রূপকে যথার্থ রেমব্র্যাণ্ডীয় রঙে চিত্রিত করেছেন।

এবং সঙ্গে সঙ্গে আর-একটি কথাও এসে পড়ে—রাশিয়ার বর্তমান সমাজবাদ ও সাম্যবাদ-অভিমুখী জীবনের কথা। বহুদিন আগে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একটি ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছিলেন—'বিলেত দেশটা মাটিরই, ভাই, সোনারূপার নয়'।

ননীবাবুও অনুরূপ কথাই বলতে চান। তিনি জানাতে চান, রাশিয়া দেশটাও মাটির আর মানুষের—যে মানুষের অত্যন্ত প্রাথমিক প্যাশানগুলি সমস্ত

দেশেকালে এক। তারা ভালোবাসা চায়, ভালোবেসে প্রতারিত হয়, কিন্তু সব মিলিয়ে তারা মানুষ—নতুনযুগের মানুষ হ'লেও এই এলিমেণ্টাল-প্যাশানগুলির দিক থেকে ধনতান্ত্রিক জগতের মানুষের সঙ্গেও তাদের প্রভেদ অল্প।

আর এই কথাটিই আরও স্থূলভাবে এক-ভারতীয় পাইলটে'র মুখ দিয়ে বলিয়েছেন ননীবাবু তাঁর 'মাটিতে নেমে' গল্পে। এতেও প্রমাণিতব্য বিষয় এক: রাশিয়া দেশটা দেবতুতের দেশ নয়, দোষে-গুণে ভরা মানুষেরই দেশ।

এ ধরণের কথায় আমাদের দেশের যে-সব ব্যক্তিরা রাশিয়া সম্বন্ধে অতি মহান অতি উদার ধরণের চিন্তা করেন—তাঁরা হয়তো হতবাক্ হবেন, কিন্তু সত্যের অনুল্লেখ সততা নয়। ননীবাবু মার্কসবাদে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। সত্যকে জানাতে তাই তিনি দ্বিধান্বিত নন। অবশ্য উসংহারে এ-কথা সর্বথা স্বীকার্য—উক্ত গল্পদুটিতে 'চৈত্রদিনে'র ননী ভৌমিকের স্বাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু তাই বলে একে আত্মহত্যার পথও বলা যায় না। তা বলার জন্য আমাদের আরো অনেকখানি অপেক্ষা করতে হবে।

সম্ভবত দেবেশ রায়ই প্রথম বাংলা ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে নিজেদের নিউ জেনারেশন বলে দাবি করেন। ১৩৬৬-র 'ছোটোগল্পে'র একটি সংখ্যায় তিনি এ-সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন—সেটিই বোধহয় বাংলা নতুন রীতির ছোটোগল্প-আন্দোলনের প্রথম ইস্তাহার। পরে অন্যান্য কিছু পত্রিকাতেও তিনি এ-নিয়ে আলোচনা করেছেন, ১৩৬৮-র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'পরিচয়ে' অশোক রুদ্রের প্রবন্ধের উত্তর-ও দিয়েছেন।

কিন্তু দেবেশ রায় এমনই একজন লেখক যিনি শুধু মাত্র ঐ প্রবন্ধগুলির জন্য নয়। তাঁর গল্পগুলির জন্যই মার্কসবাদী মহলে বিশেষ করে বিতর্কিত। যেমন, 'দুপুর' গল্পটি। অমল দাশগুপ্ত একে একটি সার্থক গল্প বলেই মনে করেন (পরিচয়: শ্রাবণ ১৩৬৮), কিন্তু শ্রীযুক্ত গুপ্ত একে বক্তব্যহীন, কবিতার গদ্য-বিলাস ইত্যাদি বলছেন।

বস্তুত, ছোটোগল্পের আঙ্গিকের বিচারে 'দুপুর' একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। একটা দুপুরে নানা ধরণের মানুষের নানা প্রতিক্রিয়াকে একটা সাধারণ সূত্রে

গেঁথে ফেলার যথেষ্ট মুন্সীয়ানা দেবেশবাবু দেখিয়েছেন, যার অভাবে কার্তিক লাহিড়ীর 'বন্দীনিবাস' রিক্ত ও আচমকা শেষ হয়ে গেছে। এ-মুন্সীয়ানা উপমা-সম্পদের মধ্যে দিয়েও প্রকাশিত।

অনেকটা ঐ ধরণের আঙ্গিকেই 'পশ্চাৎভূমি' লেখা। সে-গল্পও সার্থক।

আর দেবেশ রায়ের সূত্রেই বিমল কর-উক্ত 'গল্প ও কবিতার বিবাহ' জিনিসটি আলোচ্য। দিব্যেন্দু পালিত অবশ্য স্পষ্টতই এর বিপক্ষে, কিন্তু তাই বলে নতুনরীতির ছোটোগল্পে ও জিনিসটা মোটেই দুর্লক্ষ্য নয়।

আর দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরিপ্রেক্ষিত'-ও তাই নতুন দিগন্ত উন্মোচন-কারী গল্প। প্রত্যক্ষভাবে নতুন সমাজবাদের বক্তব্যই তিনি এ গল্পে উপস্থাপিত করেছেন। সমাজবাদী বাস্তবতা কোনো বাঁধা-ধরা সূত্রসমষ্টি মাত্র নয়। বিশেষ দেশে বিশেষ কালে বিশেষ ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই তা গড়ে ওঠে। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ করলেন যে সমাজবাদী বাস্তবতা শুধু মাত্র রুশ সাহিত্য থেকে ধার করা সূত্র নয়—তার যোগ প্রত্যেক দেশের মাটির সঙ্গে রয়েছে। দেশভেদে অবস্থাভেদে তার প্রভেদ আছে, কিন্তু সত্যিই কোনো আত্যন্তিক ভেদ নেই!

'পরিপ্রেক্ষিত' অবশ্যই প্রচারধর্মী গল্প, ব্যক্তি বিশেষের কাছে তা অস্বস্তিকর ঠেকতে পারে—কিন্তু তাতে তার মূল্য হ্রাস হয় না। বলা যায়, এ গল্পেই একরকম বাংলা গল্পে সমাজবাদী বাস্তবতা-র আগমনকে ত্বরান্বিত করছে।

শ্রীযুক্ত গুপ্ত দীপেনবাবুর সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন বটে, কিন্তু তাঁর লেখা পড়ে মনে হয়, তিনি এ ব্যাপারে কিঞ্চিৎ দ্বিধান্বিত। কিন্তু তাঁরই অভিধায় এ-কথা বলা যায় যে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে (এবং উপন্যাসেই) বিশুদ্ধ ও ফলিত—উভয় প্রকার সাহিত্যেরই ব্রহ্মা-প্রজাপতি মিলন ঘটেছে।

উপরে আলোচিত তিনজন লেখক ছাড়াও নতুন রীতি আন্দোলনের অনেক লেখক আছেন। সকলকে নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এবং নতুন রীতির আন্দোলন একদিন যথার্থই সাহিত্যে কৌলীন্য পাবে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। অবশ্যই নতুন রীতির সকল লেখকই সমশক্তিশালী নন্।

সকলেই মার্কসবাদে বিশ্বাসীও নন্। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের মতো সতীত্ব সম্বন্ধে সামন্ততান্ত্রিক ধারণাবাদী ব্যক্তিও তাতে আছেন। আবার অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রূপকথার রাজপুত্রে'র মতো সরল গম্ভীর গল্পও তার গৌরব। সব মিলিয়ে 'নতুন রীতি' আন্দোলন একটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন—তাতে সন্দেহ নেই।*

* এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ গুপ্তের বক্তব্য আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে —সম্পাদক

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব প্রসঙ্গে

অশোক ভট্টাচার্য

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে নয়া দিল্লীতে গত ১৪ই ডিসেম্বর থেকে কয়েক দিন ব্যাপী এশীয় প্রত্ন-তাত্ত্বিকদের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। নানা কারণেই এই সম্মেলন আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। উদ্বোধক হিসাবে শ্রীজহরলাল নেহরুর উপস্থিতি ছাড়াও এতে অংশ গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন দেশের আড়াই শতাধিক প্রত্নপ্রাত্ত্বিক। কী আলোচনার গভীরতায়, কী জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টিতে, কী পারস্পরিক বোঝাবুঝিতে, সব দিক থেকেই এই সম্মেলন সার্থকতা অর্জন করেছে তাৎপর্যের দিক থেকে এই সম্মেলনের সাফল্য এই যে তা কিছুটা হলেও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

ইতিহাসের আধুনিকতম চর্চায় প্রত্নতত্ত্বের ভূমিকা অপরিসীম বলে স্বীকৃত। গর্ডন চাইল্ডের মতে প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাসের পরিধি শতগুণে বিস্তৃত করেছে। মানুষের লিখিত ইতিহাস—যা মাত্র পাঁচ হাজার বছর কালের তার সভ্যতার এক শতাংশ মাত্র উপস্থাপিত করতে সক্ষম; অথচ এ কথা আজ সর্বজনগ্রাহ্য যে প্রত্নতত্ত্ব শুধুমাত্র মানব সভ্যতার অগ্রগতির প্রাথমিক স্তর, যা প্রাকৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে বিজড়িত, সম্পর্কেই তথ্য পরিবেশন করে না, এমন কী প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সভ্যতার চরিত্র নির্দেশেও হয়ে ওঠে অবশ্য অবলম্বনীয় বিজ্ঞান। উপরন্তু, লিখিত ইতিহাস যখন মূলত ব্যক্তি বা রাজ্য বিশেষের সামরিক শক্তির খতিয়ানেই মোটামুটি ব্যয়িত এবং তার চরিত্র যখন দৈবাৎ-ই নিরপেক্ষতার দাবি করতে সক্ষম, সেই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের "আদিম" ও "প্রাচীন" সভ্যতার সাংস্কৃতিক প্রকৃতি নির্ণয়ে প্রত্নতত্ত্বই হয়ে দাঁড়ায় মূল চর্চার বিষয়। গর্ডন চাইল্ড বলছেন: "Arehaeology furnishes a sort of history of human activity, provided always that the actions have produced concrete results and left recognisable material traces...It has enlarged astronomy's vision of space. It has extended his-

tory's view backward in time a hundred fold, just as the microscope revealed to biology beneath the surface of gross bodies the lines of infinitesimal cells. Finally, it has altered the content of historical study in much the same sort of way as radioactivity affected chemistry."

"দি আর্কেওলাজিকার সার্ভে অব ইণ্ডিয়া" নামক সরকারী প্রতিষ্ঠানটির জন্ম যদিও ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে, এ দেশে প্রত্নতত্ত্বচর্চার সূচনা ঘটেছিল আরও সত্তর বছর আগে, উইলিয়ম জোন্‌সের দ্বারা ১৭৮৪ খৃঃ কলকাতায় রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে। ভারতীয় পুরাতত্ত্বের গবেষণার ক্ষেত্রে সোসাইটির অবদান সর্বজনস্বীকৃত। উইলিয়ম জোন্‌সের ব্যক্তিগত গবেষণাদি ছাড়াও সোসাইটির এককালীন সম্পাদক জেম্‌স প্রিন্সেপের দ্বারা ব্রাহ্মি ও খরোষ্ঠি লিপির উদ্ধারের গুরুত্বও সহজেই অনুমেয়। এ কথাও আমাদের অজানা নয় যে সোসাইটির মাধ্যমেই রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ ভারতীয় ভারততাত্ত্বিকরা বিভিন্ন ধারার কাজ চালিয়েছিলেন। প্রিন্সেপ কিন্তু এই লিপি উদ্ধার ব্যতীত অন্যভাবেও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছিনেন এবং তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি "field archaeology কথাটা ব্যবহার করেন এবং তার গুরুত্ব অনুধাবন করে নির্ভুল জমি জরিপের প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দেন। প্রিন্সেপের পর প্রত্নতাত্ত্বিক কর্মকাণ্ডের কর্ণধার রূপে দেখা যেন কানিংহাম। পূর্বে কানিংহাম ছিলেন বৃটিশ সামরিক বাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার এবং ইতিমধ্যেই তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক ও মুদ্রাবিদ্ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কানিংহাম ১৮৪৮ খৃঃ ইণ্ডিয়ান আর্কেওলাজিকার সার্ভের একটি পরিকল্পনা রচনা করে তা কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা প্রায় বার বছর পড়ে থাকার পর ক্যানিং-এর আমলে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দেই সর্বপ্রথম স্বীকৃতি অর্জনে সক্ষম হয়।

স্বভাবতই ইণ্ডিয়ান আর্কেওলাজিকাল সার্ভের পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয় কানিংহামের ওপর। ১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কানিংহাম প্রধানত হিউ-য়েন-সাঙের ভ্রমণ পথানুসরে উত্তর ভারতের গয়া থেকে সিন্ধুনদ এবং কলসি থেকে নর্মদা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের পুরাতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু এই কর্মতৎপরতা সত্ত্বেও ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে সরকারী বিভাগটিকে অবলুপ্ত করা হয়েছিল। তবে সরকারী বিভাগটিকে ১৮৭০ খৃঃ আবার চালু করা হয় এবং

ডাইরেক্টর জেনারেল পদে পুনরায় কানিংহামকেই কর্মপরিচালনার ভার দেওয়া হয়। প্রকৃত পক্ষে কানিংহামের কর্মতৎপরতা এবং মনীষাই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বকে নির্ভরযোগ্য ভিত্তির ওপর স্থাপন করতে সক্ষম হয়ে ছিল। তিনি যে কেবল মাত্র তাঁর বিখ্যাত প্রাচীন ভারতীয় ভূ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ "এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া" কিংবা ভারতীয় সন সংক্রান্ত মূল্যবান গ্রন্থটি অথবা ভারহুতের বিবরণ রচনা করেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন তা নয়, লেখমালার (Epigraphy) গুরুত্ব অনুধাবন করে সুবিখ্যাত corpus Inscriptiomum Indicomum নামক অশোক ও তাঁর পৌত্রের অনুশাসন সংক্রান্ত পুস্তকটি প্রকাশের দায়িত্বও পালন করেন। তাঁরই নির্দ্দেশে পরবর্তী কালে ক্লিট গুপ্ত লেখমালা সংক্রান্ত পুস্তকটি সম্পাদনা করেন।

কানিংহামের পর ডঃ বার্গেস প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হন। তাঁর আমলে মূল গুরুত্ব আরোপ করা হয় লেখমালার ওপর এবং Epigraphia Indica নামক বিখ্যাত ত্রৈমাসিকটিও এই সময় প্রকাশিত হতে থাকে। এ ছাড়া তাঁর অপর কৃতিত্ব হলো Archaeological Survey of India New Imperial seriesএর প্রকাশ। ডঃ বার্গেসের পর ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দুর্যোগের দিন চলতে থাকে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দুরবস্থার কথা বিবেচনা করে কিছু সাংগঠনিক সংস্কারের চেষ্টা করলেন তা বিশেষ কার্যকরী হয় নি। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দুর্দিন দূর হয়েছিল অবশ্য লর্ড কার্জনের দূরদৃষ্টির সৌজন্যে। আধুনিক শিক্ষায় অগ্রণী কার্জন ভারতের গভর্ণর হয়ে এসে এদেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের করুণ অবহেলিত অবস্থা লক্ষ্য করে ছিলেন এবং ইংলণ্ডের সংশ্লিষ্ট মহলে এর প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে এ সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি পেশ করে ছিলেন। তিনি লিখলেন : "Thus it has come about that owing to the absence of any central and duly qualified advising authority, not merely are beautiful and famous buildings crumbling to decay : but there is neither principle nor unity is conservation or repair, while from time to time horrors are still committed that make the student shudder and turn grey.....

"The continuance of this state of affairs sums to me little

sort of scandal. Were Germany the ruling power in India, I do not hesitate to say that she would be spending many lakhs a year on a task to what we have hitherto rather plumed ourselves on our generosity in devoting Rs. 61,000 raised only a little more than a year ago to 88,000.....

এর ফলে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষামূলক ভাবে পাঁচ বছরের জন্যে লর্ড কার্জনের সাংগঠনিক প্রস্তাবকে কার্যকরী করা হয় এবং ডাইরেক্টর জেনারেল পদে নিযুক্ত হয়ে আসেন অভিজ্ঞ প্রত্নতাত্ত্বিক জন মার্শাল। কার্জনের প্রস্তাবে পরবর্তীকালের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মধারার মূল সূত্রটিকে নির্দেশিত করা হয়েছিল; তিনি লিখেছিলেন—It is, in my judgement, equally our duty to dig and discover, to classify, reproduce and describe, to copy and decipher and to cherish and conserve."

এর পরবর্তীকালের ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ক্রমাগ্রগতির পরিচয় বিশেষ অজানা নয়। জন মার্শালের আমল কেবলমাত্র যে সরকারী বিভাগটিকে স্থায়িত্ব দান করেছিল কিংবা তার সাংগঠনিক রূপকে দৃঢ়তর করেছিল তাই নয়, নব নব আবিষ্কারে এবং সুদূরপ্রসারী অনুসন্ধান কার্য পরিচালনায় তাঁর আমলকে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের স্বর্ণযুগ বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। সিন্ধু উপত্যকায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কার এবং তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কিংবা গঙ্গা-যমুনা অঞ্চলের অনুসন্ধান ও খননকার্য যে ভারতীয় ইতিহাসকে বিস্তৃততর পরিধি ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দান করতে সক্ষম হয়েছে, তা আর নতুন করে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। মার্শালের আমলে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কার্যক্রম ভারতের ভৌগলিক সীমারেখাকেও অতিক্রম করে গিয়েছিল। তাঁর আমলেই সার অরেলা স্টেইন চীনা-তুর্কিস্তানের বিখ্যাত অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করেছিলেন। জন মার্শাল ব্যাক্তিগতভাবে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ডাইরেক্টর-জেনারেল পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলেও তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনার জন্যে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে থেকে যান। পরবর্তী কালে তাঁর কাজের ধারা অনুসারেই হারগ্রীভস, দয়ারাম সাহনী ও কে, এল, দীক্ষিত যথাক্রমে ডাইরেক্টর-জেনারেল রূপে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কার্য পরিচালনা করেছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সংকটে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কাজ অর্থনৈতিক কারণে অবহেলিত হতে থাকে। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে সার মার্টিমার হুইলার ডাইরেক্টর জেনারেল হয়ে আসার পর আবার অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। তিনিই প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ যাঁর অধীনে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিশ্বের বিশেষজ্ঞ দেশগুলির স্তরে উন্নীত হলো। বিভাগীয় প্রকাশনাকে উপযুক্ত করে তুলে, একটি কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভা গঠন করে এবং সর্বোপরি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও খননকার্য পরিচালনা করে তিনি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দান করতে সক্ষম হন। আশার কথা, ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশ বিভাগের পরও মার্টিমার হুইলার প্রবর্তিত কর্মধারা এবং কর্মমান অনুসৃত হচ্ছে। কিছুদিন আগে ভারত ভ্রমণকালে বিখ্যাত জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক ডঃ হাইনস মোদে তাই তাঁর একটি বক্তৃতায় ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক মানের উচ্চ প্রশংসা করে গেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর বক্তৃতায় একথাও উল্লেখ করেছেন যে যদিও এদেশের কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে অনুসন্ধান ও খননকার্য সংগঠিত হয়েছে, মূলতঃ সরকার-নির্ভর হওয়ায়, এবং বহুলাংশে সরকারী গাফিলতির ফলে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-সামগ্রিকভাবে জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেনি। স্বভাবতই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের সীমাবদ্ধতা, চূড়ান্ত সরকারী দক্ষতা সত্ত্বেও, সহজেই অনুমেয়।

এই দুর্বলতার দিকটি অবশ্য সার হুইলারের চোখ এড়ায় নি। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধরচন্দ্র বক্তৃতামালায় তিনি বর্তমানকালের প্রত্নতত্ত্বকে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমন্বয়ে একটি যৌগিক বিজ্ঞান বলে মেনে নিয়ে বলেছেন : "Science has long burst the bonds of limited patronage. The ultimate patrons of science today are the educated public as a whole : an essential fact which it behoves the the scientist no less than the public to bear constantly in mind. ...The scientists should must be the public ; and, on its side, the public should must the scientists." তিনি আরো বলেছেন যে, কোনো বৈজ্ঞানিক চর্চাই সাধারণের মনকে পরিহার করে দীর্ঘকাল সুস্থভাবে সমৃদ্ধির পথে এগোতে পারে না এবং মেনেছেন যে সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ তার অপরাপর কৃতিত্ব সত্ত্বেও জনগণের মধ্যে প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে উৎসাহ সৃষ্টিতে ব্যর্থ

হয়েছে। শুধু তাই নয়, সরকারী পক্ষ যে জনসাধারণের সমালোচনার কোনো মূল্যই দেন নি, সে বিষয়েও হুইলার একমত হয়েছেন। প্রত্নতত্ত্ব চর্চা সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক ঐতিহাসিক বোধ এবং ঐতিহ্যপ্রীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং সেই কারণেই জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণ উপলব্ধি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে তার শিক্ষা সুদূরপ্রসারী হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রত্নতত্ত্ব চর্চা সরকারী মূলধন না থেকে বিভিন্ন স্তরে ও স্থানে ছড়িয়ে পড়া প্রয়োজন এবং সে দিক থেকে পুরনো ও নতুন পুরাতত্ত্ব চর্চার কেন্দ্রগুলির তৎপরতাও অবশ্য প্রয়োজনীয়। আশা করা যেতে পারে সাধারণের স্বতোৎসারিত উৎসাহে সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহযোগিতা যথাকালে যথাযথভাবে প্রদর্শিত হতে দেখা যাবে।

সজনীকান্ত দাস ঃ গ্রন্থপঞ্জী

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রচিত ও সঙ্কলিত গ্রন্থ

১। **অজয়** (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩৩৬ সাল (১৭-৮-১৯২৯)। পৃ. ১৮২।

২। **পথ চলতে ঘাসের ফুল** (গীতিকাব্য)। ভাদ্র ১৩৩৬ (২৪-৯-১৯২৯)। পৃ. ৬২।

৩। **বঙ্গরণভূমে** (জাতীয়তামূলক ব্যঙ্গকবিতা)। [অক্টোবর ১৯৩১*]। পৃ. ১১২।

৪। **মনোদর্পণ** (ব্যঙ্গকবিতা)। [অক্টোবর ১৯৩১*]। পৃ ১৩৫।

৫। **মধু ও হুল** (ব্যঙ্গরসাত্মক গল্প ও নিবন্ধ)। ১৩৩৮ সাল (১৫-১০-১৯৩১)। পৃ ১৫৭।

দিবাকর শর্মা (রবীন্দ্রনাথ মৈত্র)-লিখিত ভূমিকা সহ। দ্বিতীয় সংস্করণটি (নবেম্বর ১৯৪৬) পরিবর্দ্ধিত।

৬। **অঙ্গুষ্ঠ** (ব্যঙ্গকবিতা)। (২০ অক্টোবর ১৯৩১) পৃ. ২০২।

৭। **রাজহংস** (কাব্য)। চৈত্র ১৩৪২ (৭-৪-১৯৩৬)। পৃ. ৮৭।

দ্বিতীয় সংস্করণটি (আশ্বিন ১৩৫০) পরিবর্দ্ধিত।

৮। **আলো-আঁধারি** (কাব্য)। বৈশাখ ১৩৪৩ (২০-৫-১৯৩৬)। পৃ. ১৩৯।

"বিভিন্ন বয়সে ও বিভিন্ন অবস্থায় রচিত...স্বপ্ন-জাগরণ কবিতাটি ছন্দের দিক দিয়া একেবারে হাস্যকর। তথাপি ওইটিই আমার ছাপার অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত কবিতা...।"

৯। **কলিকাল** (সচিত্র হাসির গল্প) ৯ ভাদ্র ১৩৪৭ (২৫-৮-১৯৪০)। পৃ. ১৫৫।

---

* 'বঙ্গরণভূমে,' 'মনোদর্পণ,' 'মধু ও হুল' ও 'অঙ্গুষ্ঠ' একসঙ্গে একই সময়ে প্রকাশিত হয়।—১৩৩৮ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

১০। **কেড্‌স ও স্যাণ্ডাল** (সচিত্র হাসির কবিতা)। ভাদ্র ১৩৪৭ (১-৯-১৯৪০)। পৃ. ১৩১।

১১। **উইলিয়ম কেরী** (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৫)। বৈশাখ ১৩৪৯ (৭-৫-১৯৪২)। পৃ. ৫৬।

১২। **পঁচিশে বৈশাখ** (রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কীয় কাব্য)। বৈশাখ ১৩৪৯ (১১-৫-১৯৪২)। পৃ. ৬১।

২য় সংস্করণের পুস্তকে (অগ্রহায়ণ ১৩৪৯) "মারণ" কবিতাটি পরিত্যক্ত এবং "রবি-চক্র" ও "রবীন্দ্র-কাব্যপাঠে" কবিতা দুইটি সংযোজিত হইয়াছে। তৃতীয় সংস্করণে (কার্ত্তিক ১৩৫০) "বাইশে শ্রাবণ" কবিতাটি নূতন সংযোজন।

১৩। **মানস-সরোবর** (কাব্য)। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯ (২০-৫-১৯৪২)। পৃ. ৭৫।

১৪। **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা—২২)। মাঘ ১৩৪৯ (২০-৫-১৯৪৩)। পৃ. ১০২।

ইহা আমাদের উভয়ের সম্মিলিত রচনা।

১৫। **বাংলার কবিগান** (সাহিত্য গ্রন্থিকা : প্রবন্ধমালা—১)। [আষাঢ় ১৩৫১]। পৃ. ১৬।

১৬। **মৃত্যুদূত** (উপন্যাস)। ৯ ভাদ্র ১৩৫১ (৭-৯-১৯৪৪)। পৃ. ১৩৮।

সেল্‌মা লাগর্‌লফ-রচিত *Thy Soul shall bear Witness* (ইংরেজী অনুবাদ) উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ।

১৭। **রাজমোহনের স্ত্রী** (উপন্যাস)। ৯ ভাদ্র ১৩৫১। (২০-৯-১৯৪৪)। পৃ. ১৩৯।

"বঙ্কিমচন্দ্রের *Rajmohan's Wife*-এর সংকৃত অনুবাদ (চতুর্থ পরিচ্ছেদ হইতে) . এই পুস্তকে 'বারি-বাহিনী'র সহায়তায় প্রথম তিন পরিচ্ছেদও যুক্ত হইয়াছে। এই তিন পরিচ্ছেদে কোটেশনমার্কা দেওয়া অংশ বঙ্কিমচন্দ্রের অনুবাদ থাকা সত্ত্বেও আমরা এই পুস্তকে তাহা ব্যবহার করি নাই, কারণ আমরা মূল ইংরেজীরই যথাযথ অনুসরণ করিয়াছি।"

১৯। **আকাশ-বাসর** (গল্প-সংগ্রহ)। কার্ত্তিক ১৩৫১ (২৬-১০-১৯৪৪।) পৃ. ২৬৭।

"এই বইয়ে সংগৃহীত গল্পগুলি (শেষ গল্প "মৃত্যু-দর্শন" ছাড়া)

১৩৩১ হইতে ১৩৪০ বঙ্গাব্দের মধ্যে লিখিত এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত।"

১৯। **বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস** (গদ্যের প্রথম যুগ)। আষাঢ় ১৩৫৩ (ইং ১৯৪৬)। পৃ ১৮১।

ডক্টর সুশীলকুমার দে'র ভূমিকা সহ।

২০। **পথের সন্ধান** (সন্দর্ভ)। ১৩৫৩ সাল (ইং ১৯৪৬)। পৃ ৪৮।

১৩৫৩ সালের আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত "শক্তি-পূজা" ও "আমাদের সমস্যা" নামক প্রবন্ধ দুইটি এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। ধন্যকুমার জৈন কর্তৃক ইহা 'রাহকী খোজ' নামে হিন্দীতে ভাষান্তরিত হইয়াছে।

সম্পাদিত গ্রন্থ

১। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-প্রকাশিত কাশীরাম দাসের সচিত্র অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত ... ১৩৩৪, আশ্বিন

২। রজত-জয়ন্তী : ভারত-সাম্রাজ্যের পঁচিশ বৎসর (১৯১১-৩৫) ... ১৯৩৫, জুন

অন্যতর সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।

৩। বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী, ১-৩ খণ্ড ... ১৩৪৪, ফাল্গুন

অন্যতম সম্পাদক—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩৪৬, চৈত্র ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা :

নং ১২—'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ ... ১৩৪৬, শ্রাবণ

নং ১৩—'কথোপকথন' ১৩৪৯, বৈশাখ

আমাদের যুগ্ম-সম্পাদনায় যে-সকল গ্রন্থের সুষ্ঠু সংস্করণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ('রবীন্দ্র-রচনাবলী' অচলিত সংগ্রহ ছাড়া) প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলির তালিকা :—

৫। বঙ্কিম-রচনাবলী, ১-৯ খণ্ড ... ১৩৪৫, আষাঢ়-১৩৪৮, পৌষ

৬। 'আলালের ঘরের দুলাল : প্যারীচাঁদ মিত্র ১৩৪৭, জ্যৈষ্ঠ

৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ১-২ খণ্ড ... ১৩৪৭, আশ্বিন-১৩৪৮, অগ্রহায়ণ

৮।	মধুসূদন-গ্রন্থাবলী, ১-২ খণ্ড	...	১৩৪৭, অগ্রহায়ণ-
		...	১৩৪৮, জ্যৈষ্ঠ
৯।	ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী, ১-২ খণ্ড	...	১৩৪৯, মাঘ-
			১৩৫০, ভাদ্র
১০।	বাংলার কবি ও কাব্য গ্রন্থমালা :		
	১। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ২। বলদেব	...	১৩৪৯, চৈত্র
	পালিত, ৩। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৩৫১, ভাদ্র
১১।	দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী, ১-২ খণ্ড	...	১৩৫০, আষাঢ়-
			১৩৫১, ভাদ্র
১২।	পালামৌ : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	১৩৫১, বৈশাখ
১৩।	রামমোহন-গ্রন্থাবলী, ১-২ খণ্ড	...	১৩৫১, অগ্রহায়ণ-
			১৩৫২, ফাল্গুন
১৪।	শকুন্তলা : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	...	১৩৫২, অগ্রহায়ণ
১৫।	দ্বিজেন্দ্রলাল-গ্রন্থাবলী (কবিতা ও গান)	...	১৩৫৩, ভাদ্র
১৬।	হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র	...	১৩৫৫, বৈশাখ
১৭।	সীতার বনবাস : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	...	১৩৫৫, আশ্বিন
১৮।	রামেন্দ্র-রচনাবলী, ১-৪ খণ্ড	...	১৩৫৬, আষাঢ়-
			১৩৫৭, আষাঢ়
১৯।	সারদামঙ্গল : বিহারিলাল চক্রবর্তী	...	১৩৫৬, ফাল্গুন
২০।	মহিলা : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	...	১৩৫৭, বৈশাখ
২১।	শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী	...	১৩৫৭, শ্রাবণ

এই গ্রন্থপঞ্জী ১৩৫৭ (৯ ভাদ্র)—তে সংকলিত। এর পরে প্রকাশিত হয়েছে শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৬১), রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য (১৯৬১), এবং একটি কবিতার বই। এ ছাড়া সম্পাদনা করেছেন নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী (১৯৬০)। মৃত্যুর আগে সজনীকান্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের-এর পরের অংশ লিখছিলেন। এটি প্রকাশ করবেন মিত্রালয়। সজনীকান্ত লিখিত বনফুল, তারাশংকর, বিভূতিভূষণ প্রভৃতির সম্পর্কে প্রবন্ধের সংকলন প্রকাশ করবেন শতাব্দী গ্রন্থ ভবন।—সম্পাদক।

রামভক্তির আলোকে তামিল কবি কম্বন্

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

॥ ১ ॥

ভক্তিরস গীতিকাব্য বা ঐ জাতীয় আবেগ মূলক ক্ষুদ্র গদ্য-রচনার পক্ষে (যেমন কন্নড ভাষার বচন কবিতা) বিশেষ উপযোগী হইলেও মহাকাব্য বা সুবৃহৎ আখ্যান কাব্য সম্পর্কে তাহা ঠিক বলা যায় না। কারণ, ভক্তিরসের প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া তাহার গল্পরস পদে পদে খণ্ডিত হয় এবং বিভিন্ন প্রকৃতির চরিত্র তাহাদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া একটা বিশেষ ছাঁচে গড়িয়া উঠে। এই প্রবণতার ফলে ভক্তিরসাত্মক আখ্যান-কাব্য বস্তুলোকের স্বাভাবিকতাকে লঙ্ঘন করিয়া অলৌকিক জগতের বস্তু হইয়া পড়ে এবং ভক্তিরস ও কাব্যরস পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া যায়। ভারতীয় সাহিত্যে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আবার ব্যতিক্রমও আছে। একটি স্মরণীয় ব্যতিক্রম হইল দ্বাদশ শতাব্দীর তামিল কবি কম্বন্-বিরচিত 'রামাবতার কাব্যম্', যাহা সাধারণত কম্ব-রামায়ণ নামে পরিচিত।

বাল্মীকি-রামায়ণ যে মূলত ভক্তিরসের কাব্য নয় ইহা একটি সুবিদিত তথ্য। এই কাব্যের সূচনায় রামচন্দ্র অবতার ছিলেন না, কবি তাঁহাকে মনুষ্যরূপেই কল্পনা করিয়াছিলেন। রামায়ণের যে অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে রামাবতারের কথা আভাসিত অথবা স্পষ্টরূপে প্রাকাশিত হইয়াছে, পণ্ডিতগণের মতে তাহা পরবর্তী কালের সংযোজন। এইরূপ প্রক্ষিপ্ত অংশর পরিমাণ খুব বেশী নয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে বালকাণ্ডের পঞ্চদশ সর্গে বর্ণিত দশরথের পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ (১।১৫।২০-২১), অযোধ্যাকাণ্ডের প্রথম সর্গে রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেকের জন্য দশরথের সংকল্প (২।১।৭), সুন্দরকাণ্ডের ৫১ তম সর্গে রাবণের প্রশ্নের উত্তরে হনুমানের আত্ম-পরিচয়দান (৫।৫১।৩৯-৪০) যুদ্ধ কাণ্ডের ৭২ তম সর্গে রাবণের দৃষ্টিতে রঘুনন্দনে নারায়ণ-প্রতীতি (৬।৭২।১১), যুদ্ধকাণ্ডের ১১৪ তম সর্গে মন্দোদরী বিলাপে রামকে পুরুষপুরুষ বিষ্ণু বলিয়া উল্লেখ (৬-১১৪।১৪-১৭), যুদ্ধকাণ্ডের ১১৯তম সর্গে সীতার

অগ্নিপরীক্ষা প্রসঙ্গে ব্রহ্মাদি কর্তৃক রামের স্বরূপকথন (৬।১১৯।৬, ১৩-১৪) ইত্যাদি।[১]

রামায়ণের যে দুইটি প্রধান চরিত্রকে বৈষ্ণবদের ভক্ত-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহাদের মধ্যে হনুমান বিশেষভাবে উত্তরভারতে জনপ্রিয় এবং বিভীষণের অনুরূপ জনপ্রিয়তা দক্ষিণভারতে। পরবর্তী যুগের রামায়ণ-কাব্যে এই দু'টি চরিত্র অবলম্বনে যে-ভাবে ভক্তিরসের স্ফুরণ হইয়াছে, বাল্মীকি রামায়ণে তাহার সামান্যই পরিচয় পাওয়া যায়। তুলনামূলক আলোচনায় বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে।

বাল্মীকি রামায়ণের ৫।৫১ তম সর্গে দেখিতে পাই হনুমান রাবনের কাছে নিজেকে রামের দূত বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া বলিতেছে—মহাযশা রাম সংসারের সর্বজাতীয় প্রাণিপুঞ্জের সংহার করিয়া পুনরায় সেইরূপ সৃষ্টি করিতে পারেন।[২] হনুমানের উল্লিখিত বাক্যাংশে রামের ভগবত্তা সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই রামকে বিষ্ণু না বলিয়া বলা হইয়াছে বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমশালী।[৩] তুলসীদাসের রামায়ণে দেখা যায়, হনুমান এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছে—'হে রাবণ শোন, যাঁহার বলে মায়া সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড রচনা করে; যাঁহার বলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সৃষ্টি পালন ও সংহার করে, দেবগণের রক্ষার জন্য যিনি নানা প্রকার দেহধারণ করেন, যাঁহার সামান্য বলে বলীয়ান্ হইয়া তুমি সমস্ত চরাচর জয় করিয়াছ, আমি তাঁহারই দূত।'—

সুনু রাবণ ব্রহ্মাণ্ড নিকায়া। পাই জাসু বল বিরচতি মায়া॥
জাকেঁ বল বিরিঞ্চি হরিঈসা। পালত সৃজত হরত দসসীসা॥
ধরই জো বিবিধ দেহ সুরত্রাতা। .....
জাকে বল লবলেস তেঁ জিতেহু চরাচর ঝারি।
তাসু দূত মৈঁ .....

১। বর্তমান প্রবন্ধে বাল্মীকি রামায়ণের সংকেত সূত্রগুলি মদ্রাস হইতে রামরত্নম্ প্রকাশিত সংস্করণ (১৯৫৮) অনুযায়ী।

২। সর্বাল্লোঁকান্ সুসংহৃত্য সভূতান্ সচরাচরান্॥
পুনরেব তথা স্রষ্টুং শক্তো রামো মহাযশঃ। ৩৯-৪০

৩। যো রামং প্রতিযুধ্যেত বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমম্॥ ৪২

হনুমান কেবল আত্মপরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই অযাচিতভাবে রাবণকে উপদেশও দিয়াছে—'হে রাবণ' আমি হাত জোড় করিয়া তোমার কাছে প্রার্থনা জানাইতেছি যে, তুমি স্বীয় পবিত্র কুলের কথা চিন্তা করিয়া এবং অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া ভক্তভয়হারী ভগবানকে ভজনা কর।'—

বিনতী করউঁ জোরি কর রাবণ। সুনহু মান তজি মোর সিখাবন ॥
দেখহু তুম্হ নিজ কুলহি বিচারী। ভ্রম তজি ভজহু ভগত ভয় হারী ॥

বাল্মীকি রামায়ণের যে অংশটি বৈষ্ণবগণের দৃষ্টিতে মহাভারতের গীতা অংশের সহিত তুলনীয় বলিয়া মনে হইতে পারে তাহা হইল রামের চরণে বিভীষণের শরণ গ্রহণ (৬।১৮) গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিয়াছিলেন পরম আশ্বাসবাণী—মামেকং শরণং ব্রজ। বাল্মীকি রামায়ণে রামও বলিয়াছেন—'যখন বিভীষণ মিত্রতা করিবার নিমিত্ত আমার শরণাগত হইয়াছে তখন তাহার অশেষ দোষ থাকিলেও আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। ... ... একবার মাত্র 'আমি আপনার শরণাগত হইলাম' এই কথা বলিয়া আমার আশ্রয় প্রার্থনা করিলে সে যে হউক না কেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অভয় প্রদান করিব। [৪]

উল্লিখিত অংশে শরণাগতির প্রসঙ্গ থাকিলেও তাহা মানুষের সাধারণ ধর্মবাচক। ইহার মধ্যে মধ্যে ভক্ত ভগবানের কল্পনা অনাবশ্যক। তুলসীদাসের রাম বলিয়াছেন—'যে কোটি কোটি ব্রহ্মহত্যার পাপে মগ্ন, শরণাগত হইলে আমি তাহাকেও ত্যাগ করিনা। জীব যেইমাত্র আমার সম্মুখে আসে তখনই তাহার জন্মজন্মান্তরের পাপ নষ্ট হইয়া যায়।' [৫] ইহা হইল ভগবান রামের উক্তি।

বাল্মীকি রামায়ণে অবশ্য রামের একটি কথা পাওয়া যায় এইরূপ—'আমি ইচ্ছা

৪। মিত্র ভাবেন সংপ্রাপ্তং ন ত্যজেয়ং কথংচন। দোষো যদ্যপি তস্য স্যাৎ ... ...
সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে ॥ অভয়ং সর্বভূতেভ্যো
দদাম্যেতদ্ ব্রতংমম। ৬।১৮।৩, ৩৩-৩৪

(৫) কোটি বিপ্রবধ লাগহিঁ জাহু। আএঁ সরন তজউঁ নহিঁ তাহু ॥
সনমুখ হোই জীব মোহি জবহীঁ। জন্ম কোটি অঘ নাসহিঁ তবহীঁ ॥

করিলে পৃথিবীস্থ তাবৎ পিশাচ, দানব, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারাই নিহত করিতে পারি।'[৬] ইহা মানুষ রামের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। ইহা অবশ্যই ভগবান রামের উক্তি। কিন্তু অগ্র-পশ্চাতের সহিত মিলাইয়া লইলে রামের এই উক্তিটি অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হইবে! একটু পরেই দেখা যায়, সুগ্রীব বিভীষণকে রামের সম্মুখে উপস্থিত করিলে রাম প্রথম আলাপেই জিজ্ঞাসা করিলেন—'বিভীষণ, তুমি রাক্ষসগণের বলাবল সমস্ত আমার নিকট প্রকৃতরূপে বর্ণনা কর।—

আখ্যোহি মম তত্ত্বেন রাক্ষসানাং বলাবলম্ ॥ ৬।১৯।৭

বিভীষণের কাছ হইতে এইভাবে রাক্ষস-বাহিনীর বলাবল সম্পর্কে গুপ্ত সংবাদ আদায় করার চেষ্টা ভগবান্ রামের পক্ষে আদৌ মর্যাদা-সূচক নয়। তুলসীদাসের রাম এক্ষেত্রে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহার মধ্যে অশোভন কিছু নাই—'হে বিভীষণ, তোমার পারিবারিক কুশল বল।'

কহু লঙ্কেস সহিত পরিবারা। কুসল.....

আসলে বাল্মীকির রাম মানুষ হিসাবেই রাক্ষস-বাহিনীর বলাবল জানিতে চাহিয়াছেন এবং ইহার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নাই। সুতরাং সেই রামের মুখে—'আমি ইচ্ছা করিলে পৃথিবীস্থ তাবৎ পিশাচ, দানব, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারাই নিহত করিতে পারি।'—এইরূপ ভাগবত উক্তি নিতান্তই অসঙ্গত।

বিভীষণ যে ভক্ত পুরুষ বাল্মীকি রামায়ণ হইতে তাহা বোঝা যায় না। মূল রামায়ণে বিভীষণ যতবার রাবণকে উপদেশ দিয়াছে তাহার মূল কথা হইতেছে ন্যায়ধর্ম আচরণ। 'সীতাকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়, রামের সহিত শত্রুতা করিয়া লাভ কী? আপনি সীতাকে ফিরাইয়া দিন।'—

আহৃতা সা পরিত্যজ্যা কলহার্থে কৃতেন কিম্ ॥
বৈরং নিরর্থকং কর্তুং দীয়তমস্য মৈথিলী ॥ ৬।৯।১৬-১৭

'যে অবধি সীতা লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন সেই হইতেই নানাবিধ অশুভ সূচক দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে।'—

---

(৬) পিশাচান্ দানবান্ যক্ষান্ পৃথিব্যাং চৈব রাক্ষসান্ ॥
অঙ্গুল্যগ্রেণ তান্ হন্যামিচ্ছন্ হরিগণেশ্বর। ৬।১৮।২৩-৩৪

যদা প্রভৃতি বৈদেহী সংপ্রাপ্তেমাং পুরীং তব।
তদা প্রভৃতি দৃশ্যন্তে নিমিত্তান্যশুভানি নঃ ॥ ৬।১০।১৪

'আমি এই লঙ্কাপুরী, রাক্ষসরাজ, তাহার সুহৃদগণ যাবতীয় রাক্ষসগণের হিতের নিমিত্ত বলিতেছি—সীতাকে ফিরাইয়া দিন।'—

ইদং পুরস্যাস্য সরাক্ষসস্য রাজ্ঞশ্চ পথ্যং সসুহৃজ্জনস্য।
সম্যগ্ হি বাক্যং সতত্য ব্রবীমি নরেন্দ্রপুত্রায় দদাম পত্নীম্ ॥
৭।১৪।২০

এই সমস্ত উক্তি ন্যায়-নীতি-নিষ্ঠ সৎমানুষের কথা, ইহার মধ্যে ভক্ত বা ভক্তির কোনো আভাস নাই।

তুলসীদাসের রামায়ণে বিভীষণ অন্যান্য কথার বলিয়াছে—'সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া রঘুবীরকে ভজনা করুন। যাঁহাকে সমস্ত সাধু ধর্মাত্মা ভজনা করেন। রাম কেবল মনুষ্যকুলেরই রাজা নহেন, তিনি সমস্ত লোকেরও প্রভু, কালেরও কাল। তিনি নিরাময়, (বিকার-রহিত) অজন্মা, (জন্ম-রহিত) ব্যাপক, অজেয়, অনাদি, অনন্ত ব্রহ্ম।'—

তাত রাম নহিঁ নরভূপালা। ভুবনেস্বর কালহু কর কালা ॥
ব্রহ্ম অনাময় অজ ভগবন্তা। ব্যাপক অজিত অনাদি অনন্তা ॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণেও দেখা যায়, বিভীষণ উপদেশ-প্রসঙ্গে রাবণকে বলিতেছে :

প্রকটেও ঈশ্বরে না চিনে অজ্ঞ জন।
অন্ধ যে চিনিতে নারে পেয়েও রতন ॥

বাল্মীকি-রামায়ণের ৬।৫০ সর্গে দেখা যায়, ইন্দ্রজিতের নাগপাশে বদ্ধ রাম-লক্ষ্মণকে ভূপতিত দেখিয়া বিভীষণ এই বলিয়া রোদন করিতেছে—'হায়, যাহাদের বীর্যের উপর নির্ভর করিয়াই আমি প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম, সেই পুরুষ পুঙ্গব রাজনন্দনযুগল দেহ নাশ করিবার নিমিত্ত শয়ান রহিয়াছেন। ইঁহাদের এইরূপ অবস্থায় আমি জীবিত থাকিয়াও বিপন্ন হইলাম এবং আমার রাজ্যলাভের আশাও নষ্ট হইল।'—

যয়োর্বীর্য্যমুপাশ্রিত্য প্রতিষ্ঠা কাঙ্ক্ষিতা ময়া।
তাবুভৌ দেহনাশায় প্রসুপ্তৌ পুরুষর্ষভৌ ॥
জীবন্নস্য বিপন্নোঽস্মি নষ্টরাজ্যমনোরথঃ। ৬।৫০।১৮-১৯

বলা বাহুল্য, ইহা ভক্তজনের উক্তি নহে। ইহার পশ্চাতে রাজ্যলাভের যে আকাঙ্ক্ষা উঁকি মারিয়াছে, তাহারই জন্য বিভীষণ উত্তরকালে এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে দেশদ্রোহীরূপে চিহ্নিত হইয়াছে।

বাল্মীকি রামায়ণের যে সমস্ত ক্ষেত্রে রাম ভগবানরূপে অঙ্কিত হইয়াছেন, তর্কের খাতিরে সেইগুলিকে মূল রচনার অংশ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও পরবর্তীকালের ভক্তিকাব্য হইতে বাল্মীকি-রামায়ণের এই একটা বড়ো পার্থক্য দেখা যায় যে, তুলসীদাস প্রভৃতির রচনায় রাম যেমন নিজের ভগবৎ-সত্তা সম্পর্কে সচেতন, মূল রামায়ণে তাহা নাই। ৬।১২০তম সর্গে সীতার অগ্নিপরীক্ষা-প্রসঙ্গে রামচন্দ্র বলিতেছেন—'আত্মানং মানুষং মন্যে। আমি নিজেকে দশরথ-নন্দন রাম-নামক-মানুষ বলিয়া জানি।' (৬।১২০।১১)। রামচন্দ্রের প্রত্যুত্তরে ব্রহ্মবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য ব্রহ্মা বলিলেন - 'আপনি চক্রধারী নারায়ণ। আপনি পুরুষোত্তম' ইত্যাদি (৬।১২০।১৩, ১৫)। ব্রহ্মা রামের স্তব করিলেও রাম যে নিজের মহিমা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। তুলসীদাসের রাম একাধিক স্থলে কখনও ইঙ্গিতে কখনও প্রকাশ্যে, তাঁহার ভগবৎ-সত্তার কথা বলিয়াছেন। রাজা জনক বিশ্বামিত্রের কাছে রামের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে মুনি বলিলেন—'জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেরই ইনি প্রিয়।' মুনির এই রহস্যময়ী বাণী শুনিয়া রাম মনে মনে হাসিলেন। তাঁহার এই হাসির তাৎপর্য এই যে, তিনি মুনিকে রহস্যভেদ করিতে নিষেধ করিতেছেন। তখন মুনি বিশ্বামিত্র ইঙ্গিতের মর্ম বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—'ইনি রঘুকুলমণি মহারাজ দশরথের পুত্র' ইত্যাদি।

য়ে প্রিয় সবহি জহাঁ লাগি প্রাণী। মন মুস্কাহি রামু সুনি বাণী।
রঘুকুলমনি দশরথ কে জাএ। মম হিত লাগি নরেস পঠাএ॥

মারীচ বধের পূর্বে রাম সীতাকে বলিয়াছিলেন—'হে প্রিয়ে, এখন আমি কিছু মনোহর মনুষ্যলীলা দেখাইব।' বাল্মীকি-রামায়ণে ব্রহ্মাদি কর্তৃক বন্দিত হইয়ার রাম বলিলেন—'আত্মানং মানুষং মন্যে।' তুলসী রামায়ণে রাম অযাচিত ভাবেই সীতাকে বলিলেন—'মৈঁ কছু করবি ললিত নরলীলা।'

বাল্মীকি রামায়ণে রামকে বিষ্ণু বা বিষ্ণুর অবতার বলা হইলেও আবার বহু স্থলে তাঁহাকে বিষ্ণুর সদৃশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 'বিষ্ণুনা সদৃশো

বীর্যে' (১।১।১৮) ইত্যাদি। ১।১।৯৭ সং শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, একাদশ সহস্র বর্ষ রাজ্য করিয়া রাম ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন।—

দশ বর্ষ সহস্রাণি দশ বর্ষ শতানি চ।
রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি ॥

রাম মনুষ্য না হইয়া বিষ্ণু বা বিষ্ণুর অবতার হইলে তাঁহার সম্পর্কে এই জাতীয় উক্তি প্রযুক্ত হইত না। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে বাল্মীকি রামায়ণে সমগ্র বালকাণ্ডের নায়ক বিশ্বামিত্র রামের অবতার রূপ সম্পর্কে কিছুই জানিতেন না। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, "বাল্মীকির কাছে রাম অবতার ছিলেন না, তিনি মানুষই ছিলেন। কবি যদি রামায়ণে নর চরিত্র বর্ণনা না করিয়া দেব চরিত্র বর্ণনা করিতেন, তবে তাহাতে রামায়ণের গৌরব হ্রাস হইত, সুতরাং তাহা কাব্যাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। মানুষ বলিয়াই রাম মহিমান্বিত।... রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে।" (প্রাচীন সাহিত্য)

॥ ২ ॥

রামচন্দ্রের নর হইতে নারায়ণে পরিণতি লাভের ধারাটি উপযুক্ত ইতিহাসের অভাবে অস্পষ্ট হইয়া আছে। বাল্মীকি ও তুলসীদাসের মধ্যে দুই সহস্র বৎসরের ব্যবধান। অবশ্য তুলসীদাস রামভক্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হইলেও তাঁহার অনেক কাল পূর্ব হইতেই রাম ভক্তি ও রামোপাসনা চলিয়া আসিয়াছে। বাল্মীকিরামায়ণের অবতারবিষয়ক অংশগুলি প্রক্ষিপ্ত, কিন্তু তাহা অর্বাচীন নহে।

রামচন্দ্র অযোধ্যার আর্য সন্তান হইলেও তাঁহার লীলাসাধনার অমর নিকেতন ভারতের দক্ষিণ অঞ্চল। ইহা মনে করা কিছু অযৌক্তিক হইবে না যে, রাম ভক্তির প্রথম সূচনা ও উদ্‌ভব ঘটিয়াছিল দক্ষিণ ভারতে। "রামকথা"র রচয়িতা কামিল বুল্‌কে সাহেবের অনুমান আমাদের বিশ্বাসের অনুকূল।[৭] ভারতীয় ধর্ম সাহিত্যের অভিজ্ঞ লেখক ফার্কুহর সাহেবও মনে করেন রাম ভক্তির উৎপত্তি হয় দাক্ষিণাত্যে—তামিলনাড়ে।[৮] বর্তমান তামিলনাড়ে পৃথক

(৭) রাম কথা—কামিল বুল্‌কে, প্রথম সংস্করণ পৃঃ ১৫০

(৮) J. N. Farquhar—An outline of the religious Literature of India P. 25.

কোনো রাম সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব না থাকিলেও এমন অনেক ভক্ত সাধকের কথা জানা যায় যাঁহারা রাম নামের মধ্যেই মুক্তি অন্বেষণ করেন। এইরূপ সাধক মণ্ডলীর মধ্য হইতে আবির্ভূত অর্বাচীন কালের শ্রেষ্ঠ মহাজন হইতেছেন তাঞ্জোরের তেলুগু কবি ত্যাগরাজ—অষ্টাদশ শতকে যাঁহার রচনা ও গীত নৈপুণ্য সমগ্র দাক্ষিণাত্যকে নতুনভাবে সঞ্জীবিত করিয়াছে। এই সমস্ত হইতে যদি অনুমান করা যায় যে, দাক্ষিণাত্যে প্রাচীন যুগেই একটি রামাইত সম্প্রদায়ের উদ্‌ভব ঘটে তবে তাহা অসঙ্গত হইবেনা। প্রাচীন যুগের আলোচনার পূর্বে আমরা মধ্য যুগের কথাটা সারিয়া লইতে চাই।

মধ্যযুগীয় ভক্তি সাধনা প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে যাঁহার কথা মনে জাগে, তিনি দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ সন্তান পঞ্চদশ শতকের সাধক স্বামী রামানন্দ। ভারতীয় সাধনার ইতিহাস রামানন্দ একটি শ্রেষ্ঠ নাম হইলেও তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না। কেহ কেহ রামানন্দের জন্মস্থান প্রয়াগ বলিয়া উল্লেখ করিলেও তিনি যে দ্রাবিড় সন্তান ছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।[৯] রামানুজের শিষ্য পরম্পরায় রামানন্দ পঞ্চম স্থানীয়।[১০] স্বীয় গুরু রাঘবানন্দের সহিত কোনও কারণে মতভেদ ঘটিলে রামানন্দ ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ উত্তর ভারতে চলিয়া আসেন এবং তাঁহার ধর্ম সাধনার নূতন কেন্দ্র হইল কাশী। গুরু শিষ্যের কলহ নীতির দিক হইতে নিন্দনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু উত্তর ভারতের ভক্তি সাধনার দিক হইতে তাহা বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছিল। রামানন্দকে প্রকৃতপক্ষে হিন্দী ভক্তি সাহিত্যের প্রধান গুরুরূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে।[১১] কেবল হিন্দী সাহিত্যেই নয়, সাধারণ ভাবে সমগ্র মধ্যযুগের সাধনাতেই তিনি নব প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজস্ব রচনার

---

(৯) J. N. Farquhar—An outline of the religious literature of India P. 324

(১০) ভাণ্ডারকরের মতে রামানুজ ও রামানন্দের মধ্যে তিন পুরুষের ব্যবধান এবং রামানন্দের জীবৎকাল চতুর্দশ শতাব্দী (১৩০০-১৪১১ খ্রীষ্টাব্দ)।

(১১) হিন্দীতে একটি কথা প্রচলিত আছে যাহার তাৎপর্য এইরূপ : ভক্তির উৎপত্তি দ্রাবিড় দেশে, তাহা উত্তর ভারতে লইয়া আসেন রামানন্দ এবং প্রকট করেন কবীর দাস।

পরিমাণ খুবই সামান্য।[১২] এবং এই সকল রচনার উপর তাঁহার কীর্তি নির্ভরশীল নয়। রামানন্দের প্রধান কীর্তি ধর্ম সাধনার ক্ষেত্রে কতগুলি পরিবর্তন সাধন। প্রথমত, সংস্কৃতের পরিবর্তে তাঁহার উপদেশ দানের মাধ্যম হইল তৎকাল প্রচলিত মুখের ভাষা। এতদিন যে সাধনা ছিল প্রধানত সংস্কৃত চর্চাকারীদের মধ্যে আবদ্ধ, তাহাকে তিনি সর্বজনের সাধনা করিয়া তুলিলেন। দ্বিতীয়ত, উপাসনা পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে গুরুকে হইতে হইবে আকাশধর্মী—যে আকাশ নিরন্তর আলোক বিতরণ করিয়া বৃক্ষশিশুকে বড় হইবার অবকাশ দেয়।[১৩] তৃতীয়ত, তাঁহার ঔদার্য। আচার নিষ্ঠ রামানুজ সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াও তিনি জাতিবর্ণনির্বিশেষে সমস্ত বৈষ্ণবের পংক্তি ভোজন অনুমোদন করেন। রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে অনেকে ছিলেন সমাজের নিচুতলার লোক। তন্মধ্যে পীপা, ধন্না, সেনা, রৈদাস, কবীর প্রভৃতি কয়েকজন সাধকজীবনে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেন। মোট কথা, আচারের ধর্ম ছাড়িয়া ভক্তি ধর্মের প্রচারে রামানন্দ দেশকে মাতাইয়া তুলিলেন।[১৪] চতুর্থত, তিনি রামানুজ পন্থী হইয়াও কৃষ্ণের পরিবর্তে বিষ্ণুর অন্যতর অবতার রামের উপাসনা প্রচার করিয়া যান।

এই শেষোক্ত সংস্কারই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ আলোচনার বিষয়। এই সম্পর্কে একটা অনুমানের অবকাশ রহিয়াছে। রামানুজের পূর্বেই দাক্ষিণাত্যে রামভক্ত সমপ্রদায়ের উদ্‌ভব হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কোনো প্রখর

---

(১২) রামানন্দ-রচিত তিনখানি সংস্কৃত গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়—বেদান্ত সূত্রের আনন্দভাষ্য, রামার্চন পদ্ধতি এবং বৈষ্ণবমতাব্জ ভাস্কর। ইহা ছাড়া রামানন্দ হিন্দীতেও কিছু পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থ সাহেবে এইরূপ একটি পদ রামানন্দের ভণিতায় পাওয়া যায়—'কত জাঈ ঐ রে ঘর লাগো রঙ্গু'—কোথায় যাইতেছ, ঘরে উৎসব লাগিয়াই আছে।

(১৩) হজারী প্রসাদ দ্বিবেদী, হিন্দী সাহিত্য কী ভূমিকা পৃ ৪৮

(১৪) ক্ষিতিমোহন সেন—ভারতের সংস্কৃতি পৃ ৬০। রামানন্দের মানবমন্ত্র রবীন্দ্রনাথের কবি-চিত্তকে যে কত গভীর ভাবে নাড়া দিয়াছিল তাহা বোঝা যায় 'পুনশ্চ' গ্রন্থের শুচি, প্রেমের সোনা ও স্নান সমাপন কবিতা হইতে। পত্রপুটেও তাহার প্রভাব রহিয়াছে।

ব্যক্তিত্বশালী গুরুর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল কিনা জানা যায় না। এই পৃথক রামাইত বৈষ্ণব সম্প্রদায় একাদশ শতকে কৃষ্ণোপাসক রামানুজের অলৌকিক ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নেতৃত্বে স্বীকার করিয়া লয়। কিন্তু তাহারা যে রামানুজ-সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়া তাহাদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়াছিল এরূপ মনে হয়না। বরং তাহার বিপরীত সাক্ষ্য পাওয়া যায়। মধ্যযুগে সংস্কৃত ভাষায় যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ অধ্যাত্ম রামায়ণ, আনন্দ রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ প্রভৃতি যে কয়খানি সাম্প্রদায়িক রামায়ণ রচিত হয় অর্থাৎ বিশেষ ভাবে রামভক্তি প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়াই যে গ্রন্থগুলির রচনা, তাহাদের আদি গ্রন্থ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (রচনাকাল ১১০০—১২৫০ খ্রীষ্টাব্দ) এবং শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অধ্যাত্মরামায়ণ। অধ্যাত্ম রামায়ণের মুখ্য উদ্দেশ্য বেদান্তদর্শনের আধারে রামভক্তির প্রতিপাদন। বস্তুত রামভক্তির বিকাশ সাধনে এই গ্রন্থখানি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালের আনন্দ রামায়ণ, একনাথকৃত মরাঠী রামায়ণ, তুলসীদাস রচিত রাম চরিত মানস প্রভৃতির উপর ইহার যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। অধ্যাত্মরামায়ণ কাহার রচনা বলা কঠিন। রামানন্দী সম্প্রদায়ে এই গ্রন্থখানির বিশেষ সমাদর ও প্রতিপত্তি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন, রামানন্দই এই গ্রন্থের রচয়িতা।[১৫] কিন্তু ফার্কুহরের মতে অধ্যাত্ম রামায়ণের রচনাকাল ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দী।[১৬] সে যাহাই হউক, তামিলনাডের যে রামভক্ত সম্প্রদায়, রামানুজ-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া যায়, তাহাদের মধ্য হইতে রামানন্দের আবির্ভাব এবং তাহার দুই শতাব্দী পূর্বে অধ্যাত্ম রামায়ণের সৃষ্টি।

॥ ৩ ॥

অধ্যাত্ম রামায়ণের অন্তত এক শতাব্দী পূর্বে এবং যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেরও কিছুকাল আগে সুপ্রসিদ্ধ তামিল ভক্ত কবি কম্বন্ তাঁহার রামায়ণ "রামাবতার কাব্যম্" রচনা করেন। কেহ কেহ কম্বনের আবির্ভাব কাল নবম শতাব্দী বলিয়া নির্দেশ করিলেও তামিল সাহিত্যের ইতিহাস বিবেচনা করিয়া আমরা

(১৫) কামিল বুলকে—রামকথা পৃ ১৬৪

(১৬) J. N. Furquhar—An outline of the religious Literature of India P, 250

তাঁহাকে দ্বাদশ শতাব্দীর কবি বলিয়া স্বীকার করাই অধিকতর সঙ্গত মনে করি। কম্ব-রামায়ণে যে ভক্ত-কবির দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রহিয়াছে তাহাতে একথা মনে করা আদৌ অসঙ্গত হইবে না যে, কম্বনের বেশ কিছুকাল পূর্ব হইতেই তামিলনাডের চিত্তভূমিতে রামভক্তির বীজ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এখানে একটি সদৃশ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে চাই। তুলসীদাসের অগ্রবর্তী কবি মলিক মুহম্মদ জায়সী রচিত 'পদমাবত্' কাব্যে রামায়ণের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, তুলসীদাসের রাম চরিতমানস' রচনার অনেককাল পূর্ব হইতেই রামচন্দ্রের পবিত্র জীবন-কথা উত্তর ভারতের জনজীবনকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে। 'রামচরিতমানস' সেই বিশিষ্ট জন চেতনার ভক্তি ঘন রূপ। কম্ব রামায়ণ ও তামিলনাডের রাম ভক্তি প্রচার সম্পর্কেও ঠিক একই কথা বলা চলে। কম্বন্ যাহা রচনা করিয়াছেন তাহা জনমানসের ভক্তি চেতনার উৎকৃষ্ট কাব্যরূপ মাত্র। কম্বনের অনেককাল পূর্ব হইতে তামিলনাডে রামায়ণের কাহিনী কতটা পরিচিত ও জনপ্রিয় ছিল এবং কী ভাবে তাহা ধীরে ধীয়ে ভক্তিধর্মের অবলম্বন হইয়া উঠে. প্রাচীন তামিল সাহিত্যের মধ্য দিয়া আমরা তাহার পরিচয় লইতে চেষ্টা করিব।

প্রাচীনতম তামিল সাহিত্য সাধারণত 'সঙ্ঘম্ সাহিত্য' নামে পরিচিত। চঙ্কম্ বা সঙ্ঘম্ কথাটির তাৎপর্য হইল পরিষদ্ অথবা বিদ্বৎ পরিষদ্। মনে হয়, প্রাচীন তামিলনাডের সুধীবৃন্দ দীর্ঘকাল পর পর সাহিত্য অধিবেশনে মিলিত হইয়া পূর্বগামী যুগে রচিত সাহিত্যের সমীক্ষা, সমালোচনা ও শ্রেণীবিভাগ করিতেন। এবং এই ভাবেই হয়ত 'সঙ্ঘম্ সাহিত্য' কথাটির সৃষ্টি হইয়াছে। তামিল সাহিত্যের ইতিহাসে মাদুরায় অনুষ্ঠিত এইরূপ তিনটি সঙ্ঘের কথা জানা যায়। প্রথম সঙ্ঘীয় সাহিত্যের নিদর্শন আজ আর কিছু পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় সঙ্ঘের নিদর্শনের মধ্যে রহিয়াছে একখানি তামিল ব্যাকরণ জাতীয় গ্রন্থ — যাহা অগস্ত্য মুনির শিষ্য তোল্কাপ্পিয়' কর্তৃক রচিত বলিয়া 'তোল্কাপ্পিয়ম্' নামে পরিচিত। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে আর্যাবর্তে বসিয়া পানিনি যখন অষ্টাধ্যায়ী-প্রণয়নে ব্রতী ছিলেন, তখন দাক্ষিণাত্যের সুদূরতম প্রান্তে বসিয়া অগস্ত্য-মুনির শিষ্য রচনা করেন তোল্কাপ্পিয়ম্। সঙ্ঘ সাহিত্যের বিশদ ও যথার্থ নিদর্শন পাওয়া যায় তৃতীয় সঙ্ঘের রচনায়। এই যুগের মুখ্য গ্রন্থগুলি ব্যক্তি-বিশেষের নামে পরিচিত নয়, ইহার অধিকাংশ সঙ্কলন। তৃতীয় সঙ্ঘের রচনা-

বলীকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যাস করা হইয়াছে—(১) এট্টুত্ তোকৈ অর্থাৎ অষ্ট (গীতি) সংগ্রহ (২) পত্তুপ্ পাট্টু অর্থাৎ দশ (গাথা) সংগ্রহ (৩) পদিনেন্ কিল্কনক্কু অর্থাৎ অষ্টাদশ (শ্লোক) সংগ্রহ। বিশুদ্ধ সাহিত্যের দিক হইতে রস-সমৃদ্ধ এই রচনাগুলি খ্রীষ্টজন্মের কাছাকাছি সময়ে (কিছু আগে ও কিছু পরে) রচিত হইয়া থাকিবে।

সংঘ সাহিত্য ও ভক্তি সাহিত্যের মধ্যবর্তী যুগে এমন কয়েকখানি আখ্যান কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তামিল সাহিত্যের ইতিহাসে যেগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এই শ্রেণীর দশখানি কাব্যের মধ্যে পাঁচখানি পঞ্চ বৃহৎ-কাব্য (ঐন্-পেরুম্-কাব্যম্) এবং অপর পাঁচখানি পঞ্চ-ক্ষুদ্র-কাব্য (ঐন-চিরু-কাব্যম্) নামে পরিচিত। ইহাদের মধ্যে প্রথম তালিকাভুক্ত চিলপ্পধিকারম্, মণি মেখলৈ ও জীবক চিন্তামণি এই তিনখানি বৃহৎ কাব্য জৈন-বৌদ্ধ কবিদের সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও শৈব-বৈষ্ণব-প্রধান বর্তমান তামিলনাড়ে উচ্চ সমাদর লাভ করিতেছে।

আলোয়ার ও নায়ন্মার কবিদের আবির্ভাবকালের পূর্ব পর্যন্ত (খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী) তামিল সাহিত্যের যে কাঠামোর কথা উপরে উল্লেখ করা হইল, ভক্তি ধর্ম, বিশেষত রাম-ভক্তির দিক হইতে সে সম্পর্কে দু'এক কথা বলা প্রয়োজন। প্রাচীনতম গ্রন্থ 'তোল্কাপ্পিয়ম্'-এ বিষ্ণুর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে 'কৃষ্ণবর্ণ বন্ দেবতা' (অথবা 'বনদেবতা কৃষ্ণ') রূপে—মায়োন্ মেয় কাডুরৈ য়ুলকমুম্ (৩।১।৫)। প্রাচীন তামিলনাড়ে স্থলভূমিকে পাঁচটি অংশে বিভক্ত করিয়া বর্ণনা করার একটি বিশিষ্ট প্রথা প্রচলিত ছিল—কুরিঞ্জি (পর্বত), পলৈ (মরুভূমি), মুল্লৈ (বন) নেইদল্ (সমুদ্রতীর) ও মরুদম্ (কৃষিক্ষেত্র)। ইহাদের মধ্যে মুল্লৈ অর্থাৎ অরণ্যের দেবতারূপে কল্পিত হইয়াছিলেন বিষ্ণু। পত্তুপ্পাট্টুর অন্তর্গত "পেরুম্-পাণ্ আট্রুপ্পডৈ" অংশের একস্থলে বিষ্ণুকে বলা হইয়াছে "সর্প-শয়ন" রূপে—পাম্বনৈপ্ পল্লি অমর্ন্দোন্ আঙ্গন্ (৩৭০ সংপংক্তি)। পত্তুপ্ পট্টুর অপর একটি "মুল্লৈপ-পাট্টু" অর্থাৎ বন্ গীতি প্রধানত বিষ্ণুস্তুতির জন্যই রচিত। ইহার প্রথম অংশের বর্ণনায় আছে—শঙ্খচক্রধারী লক্ষ্মীপতির কথা—ননন্ তলৈ উলকম্ বলৈ নেমিয়োপু বলম্ ডুরি পোরিত্ত মা তাঙ্গু ইত্যাদি। তিরুক্ কুরল্-নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থেও 'তামরৈক্ কন্নন্' (পদ্মলোচন), 'অডিঅ লন্দান্' ('ত্রিবিক্রম') প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারা তিরুমাল্ বা বিষ্ণুকে বোঝান হইয়াছে।

তোল্‌কাপ্পিয়ম্-এ বিষ্ণুর রামাবতারের কোনও উল্লেখ নাই। রামায়ণ-কাহিনীর প্রথম উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সন্ধান পাওয়া যায় তৃতীয় সঙ্গম্-এর কোনও কোনও রচনায়। "এট্টু ত-তোকৈ" অন্তর্গত "অক-না-নূরু" (প্রেম চতুঃ-শতক) ও "পুর-না-নূরু" (যুদ্ধ-চতুঃশতক) দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। 'পুর-না-নূরু'তে আছে (দ্রষ্টব্য ৩৭৮ সং কবিতা—১৮-২১ পংক্তি) রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, সীতা কর্তৃক অলঙ্কার-নিক্ষেপ, সুগ্রীব প্রভৃতির সেই অলঙ্কার-প্রাপ্তি ও অলঙ্কার-পরিধানের পদ্ধতি জানা না থাকায় বিস্ময়-মূঢ় বানরদের দেহের যত্র-তত্র অলঙ্কার-পরিধানের চেষ্টা। "অক-না-নূরু"-তে আছে (দ্রষ্টব্য ৭০ সং কবিতা—১৫-১৭ পংক্তি), সমুদ্র অতিক্রম করিয়া এক বিরাট বটবৃক্ষের নীচে রামচন্দ্র তাঁহার যুদ্ধ-পরিষদের সভা আহ্বান করেন। তখন সেই বৃক্ষস্থিত পক্ষিকুলের কোলাহলে মন্ত্রণা-সভার কিছু ব্যাঘাত ঘটে।

এই সমস্ত গ্রন্থে রাম কথার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থাকিলেও তাহার মধ্যে রামের প্রতি বিশেষ কোনো শ্রদ্ধা বা ভক্তিপূর্ণ মনোভাবের ইঙ্গিত নাই। সেই ইঙ্গিতের পরিচয় পাওয়া যায় সঙ্গোত্তর সাহিত্যে—চিলপ্পধিকারম্, মণি-মেখলৈ প্রভৃতি গ্রন্থে। আমরা এখানে বিশেষভাবে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত 'চিলপ্পধিকারম্' (নূপুর কাব্য) গ্রন্থে বর্ণিত রাম কথার উল্লেখ করিতে চাই! গ্রন্থের নায়ক কোবলন্ সর্বস্বান্ত হইয়া অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িলে কউন্তি অডিকল্ (কৌন্তী দেবী) তাহাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করেন। অতীতযুগে কিভাবে মহৎ ব্যক্তিরা জীবনে দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া গিয়াছেন তাহারই বর্ণনা প্রসঙ্গে রামচন্দ্রের কথা আসিয়া পড়ে। বর্ষীয়সী রমণী রামায়ণের কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে রাম স্বয়ং মহাবিষ্ণু এবং তাঁহার মধ্য হইতেই বেদকর্তা ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন যে, রামায়ণের এই কাহিনী অতি প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এই গ্রন্থের অন্যত্র কবি এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, কোবলন্-এর মৃত্যুর পরে মাদুরা নগরী রামচন্দ্রের নির্বাসনের পরে অযোধ্যানগরীর ন্যায় শ্রীহীন হইয়া পড়িল। অপর একটি স্থলে বলা হইয়াছে যে, রামায়ণের কাহিনী যে শ্রবণ করে নাই সে সত্যই হতভাগ্য।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্ত কিছু অযৌক্তিক নয় যে, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের বেশ কিছুকাল পূর্বেই তামিলনাডে রামায়ণের কল্পনা আরম্ভ হইয়া

গিয়াছে। চিলপ্পধিকারম্ কাব্যে তাহার প্রথম সাহিত্যরূপ। অর্থাৎ বাল্মীকি রামায়ণ (রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী) রচিত হওয়ার অর্ধ সহস্রাব্দী না যাইতেই এবং কম্বনের আবির্ভাবের এক সহস্রাব্দী পূর্বেই তামিলনাডে রামভক্তির প্রতিষ্ঠা হয়। রামভক্তির প্রতিষ্ঠা হইলেও তখনও কোনো সঙ্ঘবদ্ধ রামাইত সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না

চিলপ্পধিকারম্ কাব্যে রামভক্তির যে উন্মেষ দেখা গেল, তাহার বিকশিত রূপের সন্ধান পাই পঞ্চম ও নবম শতকের মধ্যে আবির্ভূত আলোয়ায় সাধকদের রচনায়। কুলশেখরের রচনার একপঞ্চমাংশ রামভক্তি বিষয়ক। প্রধান কবি নম্মালোয়ার উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—রামচন্দ্র প্রভুর কথা ছাড়িয়া যাহারা অন্য কথা শ্রবণ করে তাহারা কিছু জ্ঞানলাভ করিবে কি?

কর্পার্ ইরাম পিরানৈ অল্লাল্ মট্রুম্ কর্পরো?'[১৭] নম্মালোয়ারের এই স্পষ্ট ঘোষণার পশ্চাতে যেন একটা শক্তিশালী সম্প্রদায়ের কলধ্বনি শোনা যাইতেছে।

॥ ৪ ॥

আমরা দেখিয়াছি, কম্বনের অনেককাল পূর্বেই রামচন্দ্র আদর্শ পুরুষ হইতে ধীরে ধীরে পুরুষোত্তমে উন্নীত হইয়াছেন, নর হইতে নারায়ণে পরিণত হইয়াছেন। যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের হৃদয় মন্দিরে যিনি পূজিত হইয়া আসিতেছিলেন, কম্বন্ সেই বন্দিত পুরুষোত্তমকে তাঁহার মহাকাব্যে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিলেন। এই জাতীয় চরিত্রের সার্থক রূপায়ণ বড় সহজ নয়। বিশেষণের উপর বিশেষণ চাপাইয়া রামের চরিত্র-মহিমাকে উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে কাব্যরস নিতান্তই ক্ষুণ্ণ হয়। বিভিন্ন ঘটনা ও বিভিন্ন চরিত্রের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া রামচন্দ্রের ভগবৎ সত্তাকে কাব্যসম্মতরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কম্বন্ যে কবিত্ব ও সামঞ্জস্যবোধের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর।

কম্বন্ তামিলনাডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিরূপে বিবেচিত হইলেও বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা তাঁহার ভক্তরূপটির পরিচয় গ্রহণে সচেষ্ট থাকিব। রামায়ণের মূল কাহিনীকে যথাসম্ভব বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করিয়া কিভাবে তিনি তাহার মধ্যে ভক্তিরস সঞ্চার করিয়াছেন তাহাই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। কথা-

(১৭) রায় চৌ, সম্পাদিত "আলবার্ অমুদু", ৩৪৭ সংপদ।

প্রসঙ্গে হিন্দী রামায়ণকার তুলসীদাসের আলোচনাও কিছু কিছু প্রয়োজন হইবে।

বাল্মীকি, কম্বন্ ও তুলসীদাস এই তিন মহাকবির রচনা পাশাপাশি রাখিয়া পাঠ করিলে প্রথমেই যে কথাটি মনে জাগে তাহা হইল রাম-চরিত্রের রূপায়ণ। বাল্মীকি-রামায়ণে যিনি নর-চরিত্ররূপে অঙ্কিত, তুলসীদাসে তিনি আদ্যোপান্ত নারায়ণে পরিণত হইলেন। কম্বনের রাম এই দুই রূপের মধ্যবর্তী। ইহা সত্য যে তামিল কবিও তুলসীদাসের ন্যায় রামের ভগবৎ রূপকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে বাল্মীকীয় রামচন্দ্রের মানবিক দিকটাকে তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তুলসী রামায়ণের সমস্ত ঘটনা, সমস্ত চরিত্র, সমস্ত বর্ণনা একটি কাজের জন্য নিযুক্ত—তাহা হইল রামের ঈশ্বরীয় মহিমার প্রচার। পঞ্চবটী-দণ্ডকারণ্যের মুনিঋষি নিশাচর, অযোধ্যা ও মিথিলার নরনারী, কিষ্কিন্ধ্যার বানরবাহিনী লঙ্কার রাক্ষস-কুল—যে কেহ রামের সংস্পর্শে আসে অতি অবলীলাক্রমে তাঁহাকে ভগবান্ রূপে চিনিতে পারিয়া তাঁহার চরণাশ্রিত হয়! সুযোগ পাইলেই কবি শ্রীরামচন্দ্রের মহিমাকীর্তন করিয়াছেন, এবং বলা বাহুল্য, সেই সুযোগের স্বাক্ষর তুলসী-রামায়ণের প্রতিটি পৃষ্ঠায় চিহ্নিত।

কম্বনের ভক্তি চেতনা তাঁহার কবি-সত্তাকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। কম্বন্ কাহিনী অংশে বাল্মীকির যথাসম্ভব অনুগামী। তুলসীদাস সম্পর্কে সেকথা বলা যায় না। রামায়ণের যে সমস্ত ঘটনা ভগবদ ভক্তি-মহিমা-বৃদ্ধির সহায়ক নয়, হিন্দী কবি সেগুলি সযত্নে বর্জন করিয়াছেন। নিকুম্ভিলা যজ্ঞস্থলে বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিতের ভৎর্সনা রামায়ণের একটি সুপরিচিত অংশ। তুলসী রামায়ণে ইহা নাই। লক্ষ্মণ-মেঘনাদের শেষযুদ্ধে বিভীষণ অনুপস্থিত। কারণ ভক্ত বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিতের ঘৃণাসূচক উক্তি ভক্ত কবির লেখনীতে আসা সম্ভব নয়। অথচ কম্বরামায়ণে অংশটি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে এবং সেখানে ইন্দ্রজিৎ পূর্ণ মহিমায় বিরাজিত। বালি-বধ-প্রসঙ্গ অপরিহার্য বলিয়া তুলসীদাস তাঁহার উল্লেখমাত্র করিয়াছেন। বলিয়াছেন, রামের প্রতি বালির যে ভৎর্সনা তাহা একান্তই মৌখিক, তাহার অন্তরে ছিল প্রীতি—হৃদয় প্রীতি, মুখ বচন কঠোরা। কিন্তু কম্বন্ এই সমস্ত আবেগমূলক উপাখ্যান বর্ণনায় বিশেষ আনন্দ পাইতেন। কম্বন্ ও

তুলসীদাসের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য বোঝা যাইবে শূর্পনখার প্রসঙ্গ হইতে। শূর্পনখাকে লইয়া হিন্দী কবি বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন বোঝা যায়। কারণ, এই পাপীয়সীকে রামের প্রতি ভক্তিমতী দেখাইতে গেলে রামায়ণের আসল কাহিনী অর্থাৎ রামরাবণের যুদ্ধ অসম্ভব হইয়া পড়ে। আবার শূর্পনখাকে বাদ দিলেও সেই একই সমাস্যা। নিরুপায় তুলসীদাস মাত্র নয়টি চৌপাঈ ও একটি দোহা দিয়া কাহিনীটি কোনমতে শেষ করিয়াছেন। অন্যদিকে কম্বন্ ১৩৫টি স্তবক বিশিষ্ট একটি সুদীর্ঘ সর্গে বাল্মীকি রামায়ণ হইতে বিস্তৃত তর রূপে শূর্পনখার কথাবলিয়াছেন। ভক্তিরসের দিক হইতে ইহা নিতান্ত অনাবশ্যক হইলেও কাব্যরসের দৃষ্টিতে কম্ব-রামায়ণের শূর্পনখা অধ্যায়টি পরম আস্বাদনীয়।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতে বোঝা যাইবে, ভক্তসাধক তুলসীদাসের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ভক্তকবি কম্বনের দৃষ্টিভঙ্গী কত পৃথক ছিল।

॥ ৫ ॥

রামচন্দ্রের মিথিলা প্রবেশ প্রসঙ্গে বাল্মীকি রামায়ণে আছে—"রাম লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইলেন" (১।৫০।১)। মাত্র এই একটি বাক্যেই কবিগুরু তাঁহার বর্ণনা শেষ করিয়াছেন। অথচ রামের এই মিথিলা প্রবেশ একটি সামান্য ঘটনা নয়, সমগ্র রামায়ণ কাহিনী যাঁহার জন্য কল্পিত সেই জনক-নন্দিনীকে তিনি পত্নীরূপে লাভ করিবেন। ভক্তের দৃষ্টিতে রাম ও সীতা বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর অবতার। বিষ্ণু নরদেহ ধারণ করিয়া প্রবেশ করিতেছেন মিথিলায়, সেখানে লক্ষ্মী প্রতীক্ষা কারিতেছেন তাঁহার দয়িতের জন্য। কম্বন্ রামের মিথিলা প্রবেশ বর্ণনা করিয়াছেন এইরূপে (তুলসীদাসে এই জাতীয় বর্ণনা নাই): সেই সমুজ্জ্বল মিথিলানগরী তাহার রত্নখচিত পতাকা উড়াইয়া দিয়া যেন সম্মুখে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিতেছে—আমি যে মহাতপস্যা করিয়াছিলাম তাহারই ফলে লক্ষ্মী তাঁহার কমলালয় পরিত্যাগ করিয়া আমার এখানে আসিয়া জন্ম লইয়াছেন। হে কমলাক্ষ প্রভু, তুমিও পদার্পণ কর।[১৮]

১৮। মৈ অরু মলরিন্ নীপ্পি, য়ান্ চেয় মা তবত্তিন্ বন্দু,
চেয়-য়বল ইরুন্দাল্ এণ্ডু চেলু মণিক্ কোডিকল্ এন্নম্

বাল্মীকিরামায়ণে রামসীতার পূর্বরাগের কিছুমাত্র আভাস নাই। কম্ব-রামায়ণে দেখা যায়, হরধনুর্ভঙ্গের পূর্বে রাম ও সীতার পরস্পর দর্শনে উভয়ের চিত্তে প্রণয় সঞ্চারিত হয়। কম্ব-রামায়ণের এই প্রণয় অংশটি বড়োই হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু প্রশ্ন এই, ভক্তকবি রামসীতার এই পূর্বরাগের বর্ণনা করিলেন কেন। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন; ইহা লৌকিক নতুন প্রণয়রূপে দেখা দিলেও কার্যত ছিল অলৌকিক চিরপুরাতন প্রেম। মিথিলায় প্রবেশ করিয়া রাজপথ ধরিয়া নগরীর সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলে এক জায়গায় আসিয়া রামের দৃষ্টি স্তব্ধ হইয়া গেল। সখী পরিবৃতা সীতা দাঁড়াইয়া ছিলেন কন্নিমাডম্‌এ অর্থাৎ কুমারীদের জন্য নির্দিষ্ট অলিন্দে। কম্বনের অনুসরণে আমরা সীতার সৌন্দর্য বর্ণনার চেষ্টা করিব না। কবি তাঁহাদের চারিচক্ষুর মিলন বর্ণনা করিয়াছেন এইভাবে: সেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেই দুর্লভ সৌন্দর্যের অধিকারিনী। চোখে চোখে মিলন হইল। একে অন্যকে যেন গ্রাস করিয়া লইল। কাহারও মুখে কথা নাই—তাহাদের চিত্ত এক হইয়া গেল। সীতা দেখিল রামকে, রাম সীতাকে।[১৯] কবি বলিতেছেন: কৃষ্ণ সমুদ্রের শয্যায় যাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন, আজ যখন তাঁহাদের পুনর্মিলন ঘটিল তখন তাহা ভাষায় বর্ণনা করিবার কোনও আবশ্যকতা আছে কি?[২০]

ইহার সঙ্গে তুলনীয় তুলসীদাসের বর্ণনা। তুলসী রামায়ণে রামসীতার সাক্ষাৎ ঘটে জনকপুরীর উদ্যানে। সদ্যঃস্নাতা সীতা আসিয়াছেন সখীদের লইয়া

কৈকলৈ নীট্টি অন্তক্ কডি নগর্, কমলচ্ চেঙ্ কণ্
ঐয়নৈ 'ওল্লৈ বা' এণ্ডু অলৈপ্পদু পোণ্ড্রু অম্মা! ১।১০।১

[বর্তমান প্রবন্ধে কম্বরামায়ণের সঙ্কেত সূত্রগুলি এস্ রাজম্ সংস্করণ হইতে গৃহীত।]

(১৯) এন্ন অরু নলত্তিনাল্ ইলৈয়ল্ নিণ্ড্রলী,
কন্নোডু কন্ ইণে কব্‌বি, ওৈণ্ড্রু ওণ্ড্রু
উন্নবুম্, নিলৈ পেরাদু উণর্‌ব্‌বুম্ ওণ্ড্রিড,
অন্নবুম্ নোক্কিনান্, অবলুম্ নোক্কিনাল্। ১।১০।৩৫

(২০) করুম্ কডল্ পল্লিয়িল্ কলবি নীণ্ডিপ্ শোয়্‌প
পিরিন্দরব কূডিনাল্, পেচল্ বেণ্ডুমো? ১।১০।৩৮

পার্বতীর পূজা দিতে। জনৈক সখী আসিয়া সীতাকে রামের কথা বলিলে রামকে দেখিবার জন্য সীতা চলিলেন অন্তরের ভালোবাসা লইয়া। সেই পুরাতন ভালোবাসার রহস্য কেহ জানিতে পারিল না—

প্রীতি পুরাতন লখই ন কোঈ।

কম্বরামায়ণে হরধনুভঙ্গের পরে বিবাহ-অনুষ্ঠানের পূর্বমুহূর্তে সীতা রামকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু কেমন করিয়া তাঁহাকে দেখা যায়? হাতের কঙ্কণ ঠিক করিবার অছিলায় সীতা চোখের প্রান্ত দিয়া রামকে একবার দেখিয়া লইলেন। অন্তরে যাঁহার মূর্তি আঁকা ছিল, বাহিরে তাঁহাকেই রূপবান্ দেখিলেন।[২১] তুলসী রামায়ণে ঐ একই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, সীতা তাঁহার হাতের মণিতে সৌন্দর্যনিধান শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিমূর্তি দেখিতে পাইলেন। পাছে এই দর্শন সুখ হইতে বঞ্চিত হন এই আশঙ্কায় সীতা তাঁহার বাহুলতা ও দৃষ্টিকে একটুও বিচলিত করিলেন না—

নিজ পানি মণি মহুঁ দেখি অতি মূরতি সুরূপনিধান কী।
চালতি ন ভুজবল্লী বিলোকনি বিরহ ভয় বস জানকী॥

রাবণ যখন ছিন্ন-নাসা শূর্পনখার কাছে জানিতে চাহিল যে, তাহার এই দুরবস্থা কিরূপে হইল, তখন শূর্পনখা অন্যান্য কথার মধ্যে সীতা সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিল: আমার মনে হয়, সেই রমণী স্বয়ং লক্ষ্মী, পদ্মালয় ত্যাগ করিয়া রামের সহিত বাস করিতে আসিয়াছে।

তন্মৈয়ন্ ইরামনোডুম্ তামরৈ তবিরপ্ পোন্দাল্ ৩।১০।৬৭

অনুরূপ প্রসঙ্গে তুলসী রামায়নে—

রূপরাসি বিধি নারি সঁবারী।
রতি সত কোটি তাসু বলিহারী॥

বাল্মীকি রামায়ণে—

সা সুকেশী সুনাসোরুঃ সুরূপা চ যশস্বিনী।
দেবতেব বনস্থাস্থ রাজতে শ্রীরিবাপরা॥

সীতা-প্রসঙ্গে আমরা সর্বশেষে রাবণের কথা উল্লেখ করিতেছি। কুটির-

---

(২১) ঐয়নৈ অকত্তু বডিবে অল পুরিওুম্
কৈ বলৈ তিরুত্তুপু কণ্ডেত্ত কণিন্ উণরন্দান্। ১।২২।৩৭

বাসিনী সীতাকে দেখিয়া রাবণ এই বলিয়া মনে মনে আক্ষেপ প্রকাশ করিল : এই যে মণি-কান্তি-ময়ী রমণী—যে তাহার পদ্মালয় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে—তাহার রূপ-দর্শনে আমার এই কুড়িটি নয়ন কি যথেষ্ট ? আহা, আমার যদি নিমেষহীন সহস্র চক্ষু থাকিত ! [২২]

বাল্মীকিরামায়ণে আছে, বৈদেহীকে দেখিয়া রাবণ মন্মথ শরাবিষ্ট হইল (৩।৩৪।১৫)। রাম চরিতমানসে আছে, সীতাকে দেখিয়া রাবণের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যাপারটা ঠিক দেখার পরেই ঘটে নাই, ঘটিয়াছে সীতার ভৎসনার পরে। ভক্ত কবি বলিতেছেন : সীতার তিরস্কার বাক্য শুনিয়া রাবণ ক্রুদ্ধ হইল, কিন্তু মনে মনে সীতার চরণ বন্দনা করিয়া আনন্দ লাভ করিল।

সুনত বচন দসসীস রিসানা।
মন মহুঁ চরণ বন্দি সুখ মানা॥

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য—তাহা হইল সীতার অপহরণ। বাল্মীকিরামায়ণে সীতার রাবণ অঙ্গস্পর্শ করিয়াছিল (৩।৪৯।১৭।১৮)। কৃত্তিবাসেও তাহাই—'ধরিয়া সীতার হাত লইল ত্বরিত।' ভক্ত কবির কল্পনায় ইহা অসহনীয়। তুলসীদাসে আছে, স্বর্ণমৃগরূপী মারীচের আবির্ভাবের পূর্বে লক্ষ্মণ যখন ফলমূল সংগ্রহে বাহির হইল, তখন রাম সীতাকে বলিলেন—"আমি এখন কিছু মনুষ্যলীলা দেখাইব। সুতরাং যে পর্যন্ত আমি রাক্ষসকুল ধ্বংস না করি ততদিন তুমি অগ্নিতে অবস্থান কর।" রামের উপদেশ অনুযায়ী সীতা অগ্নি-প্রবিষ্টা হইলেন। বাহিরে রহিল তাঁহার ছায়ামূর্তি। রাবণ এই ছায়ামূর্তিকেই অপহরণ করে। প্রকৃত সীতা অগ্নিমধ্যা ছিলেন, অগ্নিপরীক্ষাকালে সেই দুষ্টা অস্পৃষ্টা রমণীর পুনরাবির্ভাব ঘটিল। তুলসীদাস অবশ্য এই কল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে (দ্রষ্টব্য ৩।৭।১-৪)। কম্বরামায়ণে সীতা-হরণের প্রসঙ্গ একটু অদ্‌ভুতরূপে কল্পিত হইয়াছে। সেখানে দেখি রাবণ সীতার

(২২) 'চেয়িতল্‌ত্ তামরৈচ চেক্কৈ তীর্‌ন্দু ইবন্
মেয়বল্ মণি নির মেনি কাণু দর্‌কু
এয়ুমে ইরুপদু ? ইঙ্গু ইমেপ্পু ইল্ নাট্টঙ্গল্
আয়িরম্ ইল্লৈ !' এণ্ড অবলম্ এয়াদিনান্। ৩।১২।২৯

পর্ণকুটির উৎপাটন করিয়া তাহার বিশাল রথে স্থাপনপূর্বক লঙ্কার অভিমুখে প্রস্থান করিল (অরণ্যকাণ্ড) ১২শ সর্গ দ্রষ্টব্য। [২৩]

॥ ৬ ॥

শ্রীরামচন্দ্রের ভগবৎরূপ প্রদর্শনে তুলসীদাসের ন্যায় কম্বন্‌ও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তিনি নারায়ণ, পরমপুরুষ, বেদাতীত—কম্ব রামায়ণে এই জাতীয় প্রয়োগ নিতান্ত কম নয়। রাম যখন স্বর্ণমৃগের পশ্চাতে ধাবিত হন, তখন কবির বর্ণনায় "যে চরণ দিয়া তিনি ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন সেই পা বাড়াইয়া দেন" —নীট্টিনান্ উলকম্ মুত্তুম্ নিণ্ড এড়ুত্ত অলন্দ পাদম্ (৩।১১।৭১)। তুলসীদাসে আছে, বেদ যাঁহার অন্ত পায়না, শিব যাঁহাকে ধ্যানে আনিতে পারেনা, সেই অবাঙ্‌মনসোগোচর রাম চলিয়াছেন মায়া হরিণের পশ্চাতে—

নিগম নেতি সিব ধ্যান ন পাবা।
মায়ামৃগ পাছেঁ সো ধাবা ॥

রাম কর্তৃক অহল্যা উদ্ধারের পরে বিশ্বামিত্র রামকে বলিলেন—"তোমার হাতের শক্তি দেখিয়াছি তারকাবধের সময়ে; তোমার পায়ের শক্তির পরিচয় পাইলাম অহল্যা উদ্ধারে।" [২৪] ভগবান অবতাররূপে হস্ত দিয়া শাসন ও দণ্ডবিধান করেন—বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্; চরণে শরণ দান করেন—পরিত্রাণায় সাধূনাম্। বিশ্বামিত্রের উক্তির মধ্যে, বোধ করি এই কথারই ইঙ্গিত আছে। তুলসী রামায়ণে অহল্যা উদ্ধার প্রসঙ্গে বিশ্বামিত্রের এই জাতীয় কোনও উক্তি নাই।

রাম কর্তক পরশুরামের দর্পচূর্ণের পরে পরশুরাম রামের কাছে পরাভব স্বীকার করিয়া বলিল—"হে নীতি নিষ্ঠ, আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না। আজ আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি সকলের আদি, তুমি চক্রায়ুধ, বেদপুরুষ। শিবধনু কি তোমার মুষ্টিবদ্ধ হইলে না ভাঙিয়া পারে?" [২৫]

---

(২৩) তিব্বতী রামায়ণে সীতাহরণের প্রসঙ্গটি কম্ব রামায়ণের অনুরূপ। দ্রঃ কামিল বুলকে—রামকথা পৃ ২১০।

২৪। কৈ বন্নম্ অঙ্গুক্ কণ্ডেন্; কাল্ বন্নম্ ইঙ্গুক্ কণ্ডেন্। ১।৯।২৪

২৫। নীতিয়ায়! মুনিন্দিডেল্; নী ইঙ্গু য়াবর্ক্কুম্
আদি; য়ান্ অরিন্দনেন্; অলঙ্গল্ নেমিয়াম্।

রামলক্ষ্মণকে নাগপাশবন্ধন হইতে মুক্ত করার জন্য গরুড়ের আবির্ভাব প্রসঙ্গে দেখা যায়, পুরুষোত্তমের সম্মুখে প্রণত হইয়া গরুড় বলিতেছে: "হে প্রভু, আত্মগোপন করিয়া তুমি একী যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে! ব্রহ্মাদির পিতারও পিতা তুমি, মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া এ কী তোমার অতুল্য লীলা! তুমি সকল মানুষের চিন্তাপহারক, আজ গভীর দুঃখে নিমগ্ন ও নৈরাশ্যক্লিষ্ট। ইহা তোমার কিরূপ কার্য? হে পিতা, ভয় পাইওনা; হে প্রভু, দুঃখ পাইও না।" [২৬] আশ্চর্য এই যে, রামচরিতমানসে গরুড়প্রসঙ্গের উল্লেখ থাকিলেও তুলসীদাসের ন্যায় ভক্ত কবি ভক্তিধর্ম প্রচারে ইহার সুযোগ গ্রহণ করেন নাই।

যুদ্ধকাণ্ডের একটি স্থলে রাক্ষসপতি রাবণের দৃষ্টি পর্যন্ত রামের দিব্যশক্তির মহিমায় বিস্ময়াকুল হইয়াছে। অগ্নিঅস্ত্র, মায়াঅস্ত্র প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়াও যখন রাবণ রামকে পরাভূত করিতে পারিল না, তখন তাহার মনে পড়িল বিভীষণের উক্তি। রাবণ ভাবিল—"কে এই রাম? শিব নয়, ব্রহ্মা নয়, বিষ্ণু নয়। তবে কি এ বেদ কথিত প্রথম কারণ?" [২৭] অবশ্য এই সন্দেহের ফলে রাবণের যুদ্ধ সংকল্প শিথিল হইল না। বাল্মীকিরামায়ণে অতিকায় বধের পরে রাবণের বিলাপে এইরূপ একটি উক্তি পাওয়া যায়—

বেদিয়া! ইরুবদে অণ্ডি, বেণ্ মতিপ্
পাদিয়ান্ পিডিত্ত বিল্ পট্রপ্ পহুমো? ১।২৪।৩৭

২৬। বন্দায় মরৈন্দু; পিরিবাল্ বরুন্দুম্,
মলর্ মেল্ অয়ন্ তন্ মুদলোর্—
তম্ তাদৈ তাদৈ ইরৈবা! পিরন্দু
বিলৈয়াডুকিণ্ড তনিয়োয়!
চিন্তাকুলঙ্গল্ কলৈবায়! তলর্ন্দু
তুয়র্ কূরল্ এন্ন চেয়লো?
এন্দায়! বরুন্দল্; উডৈয়ায়! বরুন্দল্!.....
৬।১৯।২৫০

২৭। 'চিবনো অল্লন্; নান্মুখন অল্লন্; তিরুমালাম্
অবনো অল্লন্... ... ...
ইবনোতান্ অব্ বেদ মুদল্ কারণন্? এণ্ডান্। ৬।৩৭।১৩৫

'যস্য বিক্রমমাসাদ্য রাক্ষসা নিধনংগতাঃ।
তং মন্যে রাঘবং বীরং নারায়ণমনাময়ম্ ॥ ৬।৭২।১১

তুলসীদাসের রামায়ণে অনুরূপ প্রসঙ্গে রাবণের মুখে যে রামের ভগবৎ-সত্তা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ বা বিশ্বাসের কথা পাওয়া যায় না তাহা আপাত-শ্রুতিতে বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইতে পারে। বস্তুত ভক্ত কবি তুলসীদাস যুদ্ধকাণ্ড (বা লঙ্কাকাণ্ড) পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া অরণ্যকাণ্ডেই বিষয়টির নিষ্পত্তি করিয়াছেন। শূর্পনখার মুখে দণ্ডকারণ্যের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া রাবণের সেই রাত্রে আর নিদ্রা হইল না। সে মনে মনে বিচার করিতে লাগিল—'খর-দূষণ তো আমার তুল্য বলবান্। ভগবান্ ছাড়া আর কাহার হাতে তাহাদের মৃত্যু হইতে পারে? দেবতারঞ্জন ভবভার ভঞ্জন ভগবান্ যদি অবতীর্ণ হইয়া থাকেন তবে আমি বলপূর্বক তাঁহার শত্রুতা সাধন করিব এবং প্রভুর বাণের আঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিয়া ভবসাগর উত্তীর্ণ হইব। এই তামস দেহে যখন ভজনপূজন হইতে পারে না, তখন কায়মনোবাক্যে ইহাই আমার দৃঢ় সংকল্প।'—

খরদূষণ মোহি সম বলবন্তা।
তিন্হহি কো মারই বিনু ভগবন্তা ॥
সুর রঞ্জন ভঞ্জন মহি ভারা।
জৌ ভগবন্ত লীন্হ অবতারা ॥
তৌ মৈঁ জাই বৈরু হঠি করউঁ।
প্রভু সর প্রান তজেঁ ভব তরউঁ ॥
হোইহি ভজনু ন তামস দেহা।
মনক্রম বচন মন্ত্র দৃঢ় এহা ॥

সাধারণ কাব্যপাঠকের কাছে বিষয়টি নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হইলেও তুলসীদাসের কল্পনায় তামসদেহ সম্পন্ন রাবণের অন্তর ছিল ভক্তি-ভাবে পূর্ণ। রামকে না দেখিয়া কেবল তাঁহার কার্যকলাপের বিবরণ শুনিয়াই যে রাবণ তাঁহাকে ভগবান বলিয়া সিদ্ধান্ত করে; সীতার ভৎর্সনায় বাহ্যত ক্রুদ্ধ হইয়াও যে রাবণ সর্বান্তঃকরণে তাঁহার চরণ বন্দনা করে তাহার তুল্য ভক্ত কে? কৃত্ত-রামায়ণের রাবণে এই ভক্তিভাব অনুপস্থিত ॥

॥ ৭ ॥

রামাবতার ও ভক্তিধর্মের যে সমস্ত লক্ষণ কম্ব রামায়ণের নানাস্থলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, এতক্ষণ আমরা তাহারই কয়েকটির পরিচয় লইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, কবি রামভক্তির দিক হইতে প্রধানত চারিটি চরিত্রকে বিশেষভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাদের দুইজন বানর—হনুমান ও বালি; দুইজন রাক্ষস-কুল-জাত—বিভীষণ ও কুম্ভকর্ণ।

হনুমান চরিত্রের সবচেয়ে লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য তাঁহার রামানুগত্য। ঋষ্যমূক পর্বতে বিচরণ-রত রাম-লক্ষ্মণের প্রথম দর্শনেই হনুমানের চিত্তে যে প্রীতি-ভক্তির উদয় হয়, তাহার আনন্দ যেন বহুকাল বিচ্ছিন্ন বন্ধুর সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎজনিত আনন্দের তুল্য। হনুমান ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল: সিংহ, চিতাবাঘ প্রভৃতি হিংস্রদৃষ্টি ও করালদন্ত পশুগুলি যেমন নিজেদের শাবক দেখিয়া ব্যবহার করে, তেমনি স্নেহ ও মমতা লইয়া তাহারা রামলক্ষ্মণের অনুগমন করিতেছে। সূর্যকিরণের স্পর্শে রামের নীলকান্তমনি বর্ণবিশিষ্ট দেহ পীড়িত হইবে ভাবিয়া ময়ূর প্রভৃতি পাখীগুলি পাখা ছড়াইয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে যাহাতে তাঁহার উপর প্রখর রৌদ্র না আসিয়া পড়ে। সর্বত্র দৃশ্যমান মেঘসমূহ ধীরে ধীরে জলবিন্দু বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে শীতল করিতেছে। রামের প্রতি পদক্ষেপে অগ্নিতুল্য তপ্ত প্রস্তরসমূহ তাঁহার রক্ত-কমল সদৃশ চরণের সম্মুখে মধুময় পুষ্পের মতো কোমল হইয়া যায়। রাম যেদিকেই যান না কেন সমস্ত গাছপালা প্রণাম করার ভঙ্গিতে তাঁহার সম্মুখে নত হইয়া পড়ে। ইঁহারা কি ধর্মমূর্তি ?.....ইঁহারা কি দেবজন ? আমার হৃদয়ে যে প্রেমের উদ্ভব হইতেছে তাহার তো অবধি নাই। অপরিমিত ভালোবাসায় আমার অস্থিসমূহ বিগলিত হইতেছে (৪।২।১০।১৩)।

তুলসী রামায়ণে হনুমান রামকে দেখিয়া জিজাসা করিল—আপনি কে? আপনি কি সেই অখিলভুবন পতি জগতের মূল কারণ, যিনি ভূভার হরণের নিমিত্ত এবং মনুষ্যকুলকে ভবসাগর পার করাইবার জন্য স্বয়ং মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ?—

জগকারন তারন ভব ভঞ্জন ধরনী ভার।
কী তুম্হ অখিল ভুবন পতি লীন্হ মনুজ অবতার॥

প্রথমে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেও পরক্ষণেই হনুমানের সন্দেহ দূর হইল এবং প্রভুকে চিনিতে পারিয়া হনুমান তাঁহার চরণ যুগল ধরিয়া ভূপতিত হইল—

প্রভু পহিচানি পরেউ গহি চরনা।

কম্বরামায়ণে রামের প্রতি হনুমানের মনোভাব ধীরে ধীরে ভক্তিভাবে পরিণত হয়। তুলসীদাসের ন্যায় তাহা এত দ্রুত ও আকস্মিকভাবে উদ্ভূত হয় নাই। সুগ্রীবের কাছে রামের পরিচয় দিতে গিয়া হনুমান যাহা বলিল, তাহার মর্মার্থ এই যে, রাম মনুষ্য দেহধারী হইলেও মানুষ নন, কারণ মারীচকে যিনি বধ করিতে পারিয়াছেন তিনি চক্রধারী বিষ্ণু ব্যতীত আর-কে হইতে পারেন (৪।৩।১১)? তুলসীদাসের রামায়ণে হনুমান আসিয়া সুগ্রীবের কাছে রামের পরিচয় দেওয়ার আগেই সুগ্রীব রামচন্দ্রের দর্শন লাভ করিয়া নিজের জন্মকে ধন্য মনে করিল—

জব সুগ্রীবঁ রাম কহুঁ দেখা।
অতিসয় জন্ম ধন্য করি লেখা॥

কম্ব রামায়ণে রামের ভগবৎ সত্তায় হনুমানের বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল সম্পাতির সহিত সাক্ষাতের পরে। ছোট ভাই জটায়ুর মৃত্যু সম্পর্কে সম্পাতির প্রশ্নের উত্তরে হনুমান যখন প্রকাশ করিল যে, রামচন্দ্রের অপহৃতা সহধর্মিনী সীতাকে রক্ষা করিতে গিয়াই জটায়ুর মৃত্যু হয়, তখন সম্পাতির ভ্রাতৃশোক আনন্দে পরিণত হইল। সে বলিল: ধন্য আমার ভাই। রামপত্নীকে রক্ষার জন্য যাহার মৃত্যু হইয়াছে, সে কি অনন্ত কীর্তির অধিকারী হইয়া জীবিত নাই? তাহার পরিবর্তে যদি বলি – সে মরিয়া গিয়াছে, তবে তাহাই কি অধিকতর সত্য? রামের বন্ধুত্ব-রূপ অলভ্য বস্তু লাভ করিয়া যে অতুল্য কীর্তি পাইয়াছে, মৃত্যু তাহার কাছে তুচ্ছ। ইহার চেয়ে অধিকতর সুখ আর কী আছে (৪।১৬।৪৪—৪৫)? অতঃপর সম্পাতির অনুরোধে বানর-বাহিনী রাম-নাম উচ্চারণ করিতে থাকিলে তাহার দগ্ধ পাখা পুনরায় গজাইতে থাকে। রামনামের মহিমা দেখিয়া হনুমানের বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল।

অশোকবনে সাক্ষাতের সময়ে সীতা যখন জানিতে চাহিল যে, কোনওরূপ নৌকার সাহায্য ব্যতীত হনুমান্ কিরূপে সমুদ্র পার হইল, তখন হনুমানের উত্তর এইরূপ: যাহারা তোমার অতুল্য প্রভুর চরণ যুগলের ধ্যান করে তাহারা যেমন

এই বৃহৎ মায়া-সমুদ্র পার হইয়া যায়, আমিও তেমনি এই কৃষ্ণ সমুদ্র পার হইলাম।[২৮] তুলসী রামায়ণে এই জাতীয় কোনো প্রসঙ্গ নাই।

ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক বন্দী হইয়া হনুমান্ রাবণের সম্মুখে আনীত হইলে রাক্ষসপতির প্রশ্নের উত্তরে সে যেভাবে আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করিল তহো বিশেষ ভাবে রামচন্দ্রের ভগবৎ-মহিমার পরিচায়ক। হনুমান বলিল: 'আমি সেই কমল-নয়ন অদ্বিতীয় ধনুর্ধরেব দুত। তিনি কে যদি জানিতে চাও, তবে বলিতেছি শোন।' এই বলিয়া হনুমান একে একে ভগবৎ-স্বরূপের উল্লেখ করিয়া অযোধ্যায় তাঁহার অবতারের কথা প্রকাশ করিল (৫।১২।৬৯—৭৫)। তুলসী রামায়ণে হনুমান কেবল রামাবতারের কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সেই সঙ্গে সীতার প্রত্যর্পণ এবং বিশেষ ভাবে রামের চরণে শরণ গ্রহণের জন্য রাবণকে অনুরোধ জানাইয়াছে। সীতার প্রত্যর্পণের কথা বাল্মীকি-রামায়ণেও আছে। কিন্তু রাবণের মতো দুর্বিনীতকে রামের ভক্ত হইবার জন্য উপদেশ দান করা একমাত্র তুলসীদাসের ন্যায় ভক্ত কবির পক্ষেই সম্ভব। তুলসী-রচিত হনুমান-রাবণ-সংবাদের মূল কথা হইল—রামচন্দ্রের গুণ-কীর্তন ও নাম মহিমা খ্যাপন। হনুমান বলিয়াছে: 'তুমি রামের চরণকমল হৃদয়ে ধারণ করিয়া লঙ্কায় অচল রাজ্য প্রতিষ্ঠা কর।··· মদ-মোহ পরিত্যাগ করিয়া বিচার করিয়া দেখ, রামনাম ব্যতীত অন্য কোনও কথা শোভা পায় না'—

রাম চরণ পঙ্কজ উর ধরহু।
লঙ্কা অচল রাজু তুম্হ করহু॥ ··
রাম নাম বিনু গিরা ন সোহা।
দেখু বিচারি ত্যাগি মদ মোহা॥

॥ ৮ ॥

বালি-বধ প্রসঙ্গ রাম চরিত্রের দুরপনেয় কলঙ্ক বলিয়া ভক্ত কবি তুলসীদাস বিষয়টি খুব সংক্ষেপে এবং একটু ভিন্নরূপে সারিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাল্মীকি

(২৮) 'চুরুঙ্গু ইডৈ! উন্ ওরু তুণৈবন্ তুয় তাল্ ওরুম্ কুডৈ উণর্বিনোর্, ওয়বু ইল্ মায়ৈয়িন্ পেরুম্ কডল্ কডন্দনর্ পেয়রুম্ পেট্রিপোল্, করুম্ কডল্ কডন্দনেন্ কালিনাল্' এণ্ডান্। (৫।৪।৯৭)।

রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের অষ্টাদশ সর্গে বালি বধ সমর্থনে রাম যে সমস্ত যুক্তি দিয়াছেন, তাহার পরেও নিরপেক্ষ পাঠকের মনে বালি বধের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন থাকিয়া যায়। তাহার হৃদয়ে রাজিতে থাকে রামের উদ্দেশে বর্ষিত বালির সেই প্রসিদ্ধ তীক্ষ্ণ উক্তিগুলি : তুমি বিনা অপরাধে বাণ দ্বারা আমাকে হত্যা করিয়া যে নিন্দিত কার্য করিয়াছ সেই সম্পর্কে সাধুগণের মধ্যে তুমি কী বলিবে ? ·· তোমার মতো পাপ কিরূপে দশরথের ঘরে জন্মগ্রহণ করিল ? · তুমি যে অধর্ম অনুসারে আমাকে যুদ্ধে নিহত করিলে ইহা অযুক্ত।

হত্বা বাণেন কাকুৎস্থ মামিহানপরাধিনম্ ॥
কিং বক্ষ্যসি সতাং মধ্যে কৃত্বা কর্ম জুগুপসিতম্। ··
কথং দশরথেন ত্বং জাতঃ পাপো মহাত্ম না।···
অযুক্তংযদধর্মেণ ত্বয়াহং নিহতো রণে (৪।১৭ শ সর্গ)

এই সমস্ত অভিযোগের উত্তরে রামচন্দ্রের যুক্তি শুনিয়া বালিকে স্বীকার করিতে হইল : হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য। যত্তমাত্থ নর-শ্রেষ্ঠ তদেবং নাত্র সংশয় : (৪।১৮।৪৭)।

তুলসীদাস অত জটিলতার মধ্যে না গিয়া বালির মুখে প্রথমেই দিয়াছেন রামভক্তির কথা। তারা রামের কথা উল্লেখ করিয়া বালিকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিলে বালি বলিয়া উঠিল : হে ভীরু প্রিয়ে, রামচন্দ্র সমদর্শী। তিনি যদি আমাকে বধ করেন, তবে তাহা আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইবে। কারণ তাঁহার হাতে মৃত্যু হইলে আমি সনাথ হইব অর্থাৎ পরমপদ লাভ করিব—

কহ বালী সুনু ভীরু প্রিয় সমদরসী রঘুনাথ।
জোঁ কদাচি মোহি মারহি তৌ পুনি হোউ সনাথ ॥

কম্ব-রামায়ণেও বালিকে আমরা শেষ পর্যন্ত ভক্ত-রূপে দেখিতে পাই। কিন্তু সেখানে তাহার পরিণাম ধীরে ধীরে আসিয়াছে, তুলসী-রামায়ণের ন্যায় আকস্মিক হয় নাই। বাল্মীকি রামায়ণে বালি যে তারাকে বলিয়াছিল—

ন চ কার্যো বিষাদস্তে রাঘবং প্রতি মৎকৃতে।
ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ কথং পাপং করিষ্যতি ॥ ৪।১৬।৫

কম্বন্ সেই সূত্র ধরিয়া আরও অগ্রসর হইলেন। কম্ব-রামায়ণের বালি রামের শৌর্য, মহত্ত্ব, ভ্রাতৃত্ব, উদারতা সম্পর্কে এত কথ, শুনিয়াছে যে পূর্ব হইতেই রামের প্রতি তাহার একটা উচ্চ ধারণা ছিল দেখিতে পাই। বালির

দৃষ্টিতে রামচন্দ্র আদর্শ নায়ক। সুতরাং সেই রাম তাহাকে বিনা দোষে বধ করিবার জন্য সুগ্রীবের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বালি ইহা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। কেবল তাহাই নয়, তাহার হৃদয়স্থিত আদর্শপুরুষ সম্পর্কে তারার অশোভন ইঙ্গিত তাহার সহ্য হইল না। সুতরাং তারার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই বালি বলিল: জগদ্‌বাসীকে ধর্মমার্গ প্রদর্শনের জন্য যাঁহার আবির্ভাব, তুমি স্ত্রীলোক বলিয়াই তাঁহার মহত্ত্ব বুঝিতে পার নাই। সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও যিনি বিমাতার নির্দেশ মাত্রেই অপরিসীম আনন্দে তাহার পুত্রকে রাজ্য প্রদান করিলেন, তোমার মুখে তাঁহার প্রশংসা না শুনিয়া অন্যরূপ কথা শুনিলাম। ইহা কি সঙ্গত? ভ্রাতৃগণকে যিনি প্রাণের ন্যায় ভালোবাসেন, আমাদের এই ভ্রাতৃযুদ্ধে সেই করুণা-সাগর রাম কি আমার প্রতি শর নিক্ষেপ করিবেন (৪।৭।৩১-৩৫)?

কিন্তু সত্য সত্যই সেই শর যখন আসিয়া বালির দেহে বিদ্ধ হইল, তখন বালি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা ভাঙ্গিতে না পারিয়া শরাঙ্কিত নাম দেখিবার জন্য তাকাইল। দেখিল—ত্রিজগতের মূলমন্ত্র, ভক্ত-জনকে পরমপদ দায়ী, ইহলোকে জন্ম-ব্যাধির ঔষধ, মুক্তি-পথ-প্রদর্শক রাম-নাম তাহাতে লেখা রহিয়াছে। বালি একটু হাসিল, লজ্জাবোধ করিল এবং অবশেষে স্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, ইহাও কি তাঁহার বৃহৎ ধর্ম? ইদুবুম্ তান্ ওর্ ওঙ্গু অরমো? (৪।৭।৭৬-৭৯)

অতঃপর বালি ও রামের দীর্ঘ বিতর্ক। বিতর্কের শেষে বালি বুঝিতে পারিল, ভাই-এর সহিত সে যে অসৎ আচরণ করিয়াছে, তজ্জন্য মৃত্যুই তাহার উচিত শাস্তি এবং ত্রিলোকের অধিপতি রাম কখনও অন্যায় কাজ করিতে পারেন না বলিয়া তাহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। সুতরাং রামের কাছে প্রণত হইয়া বালি এই ভাবে তাঁহার স্তব করিতে থাকে—তোমার প্রেরিত তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে এই মুমূর্ষু অধম কিঙ্করকে তুমি দয়া করিয়া জ্ঞান দান করিয়াছে। তুমি সেই ত্রিমূর্তি, তুমি তাহাদের মূল কারণ; তুমি সর্বস্ব অথচ তুমি অজ্ঞেয়; তুমিই পাপ, তুমিই ধর্ম; তুমিই শত্রু, তুমিই বন্ধু—

এবু কুর্ বালিয়াল্ এয়দু নায়্ অডিয়নেন্
আবি পোম্ বেলৈবায়্ অরিবু তন্দু অরুলিনায়্;
মূবর্ নী! মুদলবন্ নী! মুট্রুম্ নী! মট্রুম্ নী!
পাব্ম্ নী! ধর্মম্ নী পকৈয়ুম্ নী! উরবুম্ নী! ৪।৭।১২৭

ধর্ম আসিয়া যাঁহার মধ্যে মনুষ্যমূর্তি গ্রহণ করিয়াছে, আমি সেই তোমাকে দেখিয়াছি। আর কী দেখিবার আছে? অতীত কাল হইতে আজ পর্যন্ত যত পাপ আমি করিয়াছিলাম, সমস্ত তিরোহিত হইয়াছে। ইহার পরেও কি আমি উচ্চপদ পাইব না!

উণ্ডু এন্নুম্ ধর্মমে উরুবম্মা উট্টৈয় নির্
কণ্ডু কোণ্ডেন্; ইনিক্ কাণ এন্ কডবেনো?
পণ্ডোড়ু ইণ্ডু অলবুমে এন্ পেরুম্ পলবিনৈত্
তণ্ডুমে; অডিয়নেকু উরু পদম্ তরুবদে!—৪।৭।১৩০

তুলসী রামায়ণে আমরা দেখিয়াছি, বালির প্রথম কথাই হইল এই যে, রামের হাতে মৃত্যু ঘটিলে তাহার পরমপদপ্রাপ্তি হইবে। তাই মুখে ভৎসনা করিলেও বালির হৃদয়ে ছিল রামের প্রতি প্রীতি—হৃদয় প্রীতি মুখ বচন কঠোরা। সুতরাং বালির ভৎসনার উত্তরে রাম প্রতিভৎসনা করিলে বালি দুঃখিত হইয়া বলিল: প্রভু, মৃত্যুকালে তোমার আশ্রয় পাইয়া এখনও কি আমার পাপ দূরীভূত হয় নাই যে, তুমি আমাকে ভৎসনা করিতেছ?—

প্রভু অজহুঁ মৈঁ পাপী অন্তকাল গতি তোরি।

কম্ব রামায়ণে বালি কেবল এই কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, রামের হাত দিয়া মৃত্যু ঘটাইবার জন্য সে সুগ্রীবের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছে: ইহা অপেক্ষা ভাই ভাই-এর আর কী মহৎ উপকার করিতে পারে? সুগ্রীব তোমাকে এখানে ডাকিয়া আনিয়া আমার অসার রাজ্য লইয়া আমাকে মোক্ষ-রাজ্য দান করিয়াছে—

মট্রু ইনি উদবি উণ্ডো? বানিন্নুম্ উয়র্ন্দ মানক্
কোট্রব! নিন্নৈ এন্নৈক্ কোল্লিয় কোণর্ন্দু তোল্লৈচ্
চিট্রিনক্ কুরঙ্গিনোড়ুম্ তেরিবু উরচ চেয়দ চেয়কৈ,
বেট্রু অরচু এয়দি এম্বি বীট্টু অরচু এনক্কু বিট্টান্। ৪।৭।১৩১

অতঃপর মুমূর্ষু বালি সুগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া বলিল: বৎস, মুনি, ব্রহ্মা, বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র যাঁহার কথা বলিয়াছে, সেই পরম পুরুষ পৃথিবীতে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য হাতে তীক্ষ্ণ ধনুঃ-শর লইয়া, পায়ে নূপুর ধারণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র রূপে আসিয়াছেন—ইহাতে লেশমাত্র সন্দেহ করিও না।—

মরৈকলুম্ মুনিবর্ যারুম্ মলর্ মিচৈ অয়ন্দুম্ মট্রৈত
তুরৈকলিন্ মুডিবুম্ চোল্লুম্ তুনি পোরুল্ তিনি বিল্ তুকি,
অরৈ কলল ইরামন্ আকি অর নেরি নিরুত্ত বন্দদু ;
ইরৈ ওরু চক্কৈ ইণ্ডি এন্ন দি এন্নম্ মিক্কোয় । ৪।৭।১৩৭

তুলসী-রামায়ণে সুগ্রীবের প্রতি মুমূর্ষু বালির এই জাতীয় কোনও উক্তি পাওয়া যায় না।

আর একটি কথার উল্লেখ করিয়া আমরা বালি-প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। বাল্মীকি-রামায়ণে অঙ্গদ ও রামের উদ্দেশ্যে বালির যে শেষ আদেশ ও অনুনয়ের কথা পাওয়া যায় তাহার মধ্যে একটু অসঙ্গতি রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের দ্বাবিংশ সর্গে বালি অঙ্গদকে যে উপদেশ দিয়াছে তাহাতে যে রামের কোনও উল্লেখ নাই, ইহা বিস্ময়কর। কম্ব-রামায়ণের বালি অঙ্গদকে বলিতেছে : আমি কঠোর তপস্যা করিয়াছি বলিয়াই আমার এই মঙ্গলময় পরিণাম। সকলের মধ্যে যিনি চিরন্তন সাক্ষী-রূপে বিরাজমান, সেই বীর পুরুষ স্বয়ং আসিয়া আমাকে মুক্তি বিতরণ করিলেন।...হে বৎস, অজ্ঞান-জনিত জন্ম-ব্যাধির যে মহৌষধ সেই রামকে তুমি নমস্কার কর—

য়ান্ তবম্ উট্টৈমৈয়াল্ ইব ইরুদি বন্দু ইচৈন্দদু ; য়ার্কুম্
চাণ্ডু এন নিণ্ড বীরন্ তান্ বন্দু বীডু তন্দান্।...
'মাল্ তরুম্ পিরবি নোয়ক্কু মরুন্দু' এন বণঙ্গু মৈন্দ। ৪।৭।১৫২-১৫৩

বাল্মীকি-রামায়ণে দেখা যায় বালির শেষ উক্তি অঙ্গদের প্রতি (২২শ সর্গ দ্রষ্টব্য), রামের প্রতি নয়। রামের প্রতি বালির উক্তি শেষ হইয়াছে অষ্টাদশ সর্গে। ভক্ত কবি কম্বনের দৃষ্টিতে এই পারম্পর্য কিছুটা বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল বলিয়াই তামিল কবি হয়ত বালির শেষ সম্ভাষণ রামের উদ্দেশে রচনা করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, বাল্মীকি, কম্বন্ ও তুলসীদাস তিন কবির রচনাতেই রামের প্রতি বালির উক্তির মধ্যে অঙ্গদের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা আছে। বাল্মীকি-রামায়ণে—

যা তে নরপতে বৃত্তির্ভরতে লক্ষ্মণে চ যা।
সুগ্রীবে চাঙ্গদে রাজংস্তাং ত্বমাধাতু মর্হসি॥ ৪।১৮।৫৫

কম্ব-রামায়ণে বালির উক্তি এইরূপ : আমার একমাত্র সন্তান এই অঙ্গদ। আমি তাহাকে তোমার আশ্রয়ে রাখিয়া গেলাম। তুলসী রামায়ণে আছে :

হে প্রভু, আমার পুত্র অঙ্গদ বিনয়ে ও বলে আমারই তুল্য। আপনি ইহাকে গ্রহণ করুণ। হে দেব ও মনুষ্য-কুলের নাথ, আপনি হাত ধরিয়া ইহাকে আপনার দাস করিয়া লউন।—

য়হ তনয় মম সম বিনয় বল কল্যাণপ্রদ প্রভু লীজিয়ে।
গহি বাঁহ সুর নর নাহ আপন দাস অঙ্গদ কীজিয়ে॥

স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভক্তিরসের দিক হইতে কম্বন্ অপেক্ষা তুলসী এখানে অধিকতর মর্মস্পর্শী।

॥ ৯ ॥

দক্ষিণ ভারতে বিভীষণ ভক্তশিরোমণিরূপে সম্মানিত হইলেও, বাল্মীকি-রামায়ণে তাহার চরিত্র যে নির্দোষ নয়, ভক্তি-মাধুর্য-মণ্ডিত নয়, বরং কিঞ্চিৎ রাজ্য-লোলুপতার কালিমায় কলঙ্কিত সে কথা প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে বিভীষণের যে দেশদ্রোহী রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে দক্ষিণ ভারতে তাহা অকল্পনীয়। মনে হয় রাম-কথার উদ্‌ভবের যুগ হইতেই তামিলনাডের অধিবাসীরা বিভীষণকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছে—বাল্মীকি রামায়ণের সহিত যে দৃষ্টির সম্পূর্ণ ঐক্য স্থাপন করা যায় না। কম্ব-রামায়ণে বিভীষণ তাই ভক্তরূপেই অঙ্কিত এবং তাহার এই ভক্ত-রূপকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য তামিল কবি বিশেষ সতর্কতার সহিত বাল্মীকি-রামায়ণের অবাঞ্ছিত অংশ গুলি বর্জন অথবা সংশোধন করিয়া লইয়াছেন। যেমন, রামকর্তৃক অভয় প্রদানের পরেই বিভীষণের কাছ হইতে লঙ্কার সেনাবাহিনীর বলাবল জিজ্ঞাসা করা ইত্যাদি অংশকে কম্বন্ অন্য ঘটনার সাহায্যে সুকৌশলে উপস্থিত করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, নাগপাশবদ্ধ লক্ষ্মণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিভীষণের যে আক্ষেপ বাল্মীকিরামায়ণ হইতে কম্ব রামায়ণে তাহা সম্পূর্ণ পৃথক। বাল্মীকি অঙ্কিত বিভীষণের বিলাপে রাজ্যলাভের দুরাকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। কম্ব রামায়ণের প্রাসঙ্গিক অংশ এইরূপ : পাশবদ্ধ লক্ষ্মণের চারিদিকে সকল বন্ধুজন যখন ভূপতিত, তখন একা আমি দাঁড়াইয়া আছি অক্ষত দেহে। মানুষ আমার সম্বন্ধে কী ভাবিবে? তাহারা মনে করিবে—'বিভীষণই সমস্ত দুর্ঘটনার মূল। সে লক্ষ্মণের পাশে দাঁড়াইয়া ভ্রাতুষ্পুত্র ইন্দ্রজিৎকে দিয়া তাহার নিধনের ব্যবস্থা করিয়াছে।' লক্ষ্মণকে দুর্দশাগ্রস্ত দেখিয়াও আমি তো তাহার শত্রুর দিকে ধাবিত হই নাই।

আজ আমি রাবণের পক্ষেও নই, আবার যাঁহারা আমাকে অভয় দিয়াছিলেন তাঁহাদের দলেও নই। আজ আমি দুই দিকে ধারযুক্ত শূলের ন্যায় অবস্থান করিতেছি (৬।১৯।২০৯-২১২)

মন্ত্রণা পরিষদে বিভীষণ রাবণকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছে তাহা কেবল নীতি শাস্ত্র অনুমোদিত সৎকথাই নয়, তাহার সঙ্গে ছিল রামাবতারে বিভীষণের দৃঢ় বিশ্বাস। এবং এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই বিভীষণ রাবণকে হিরণ্য কশিপুর পরিণামের কথা শুনাইয়াছে। বাল্মীকিও কম্ব রামায়ণের এই পার্থকটি লক্ষণীয়।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞস্থলে ইন্দ্রজিতের ভৎসনার উত্তরে বিভীষণ যাহা বলিয়াছে তাহার শেষ কথাটি এইরূপ : আমি জানি অধর্ম কখনও ধর্মকে জয় করিতে পারেনা এবং তাহা জানিয়াই দেব-দেব শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হইয়াছি। ইহার ফলে বাহ্যজগতে আমার স্তুতি হউক অথবা নিন্দা হউক, ভোগৈশ্বর্য সঞ্চিত হউক অথবা নষ্ট হউক সে বিষয়ে আমার কোনো চিন্তা নাই—

আরত্তিনৈপ পাবম্ বেল্লাদু এণ্ণুম্ অদু অরিন্দু ঞানত
তিরত্তিনুম্ উরুম্ এণ্ডু এন্নি দেবর্কুম্ দেবৈচ চেরন্দেন্ ;
পুরত্তিনিল্ পুকলে আক ; পলিয়োড়ুম্ পুণর্ক ; ভোগচ
চিরপ্পু ইনিপ পেরুক তীর্ক এণ্ডু নন্ চীর্ত্তম্ ইল্লান্। ৬২।৭।১৭৬

বিভীষণ যে রামচন্দ্রের শরণার্থি হইয়া আসিয়াছিল, তাহার পশ্চাতে ভক্তি অথবা রাজনীতি যাহাই থাক না কেন, একটা যে গভীর প্রত্যাশা ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং সেই প্রত্যাশা যে পূর্ণ হইবেই এমন কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। বস্তুত বাল্মীকি রামায়ণে দেখা যায়, বিভীষণকে আশ্রয় দান সম্পর্কে রামের শিবিরে দুই সর্গব্যাপী (৬।১৭।১৮) আলোচনা চলিয়াছে। কম্বন্ ও তুলসীদাসেও তাহার অনুবৃত্তি আছে। অথচ সুগ্রীব আসিয়া যখন বিভীষণকে রামের সম্মতির কথা জানাইল, তখন বিভীষণের হৃদয় যে রামের করুণার কথা স্মরণ করিয়া আনন্দ কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল বাল্মীকি বা তুলসী রামায়ণে তাহার কিছুমাত্র আভাস নাই। কম্ব রামায়ণের বর্ণনা এইরূপ : সুগ্রীবের মুখে রামের শরণ দানের কথা শ্রবণ করিয়া বিভীষণের চোখে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল। দেহমন শীতল হইল এবং অত্যধিক পুলকে তাহার অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। বিভীষণ ভাবিতে লাগিল—'যে পাপী রামের কাছ হইতে সীতাদেবীকে ছিনাইয়া লইয়াছে,

তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাকে তিনি অনুগ্রহ করিলেন ? 'এস' বলিয়া আহ্বান করিলেন ? আমাকে তিনি গ্রহণের যোগ্য মনে করিলেন ? বিষ যেমন শিবের কণ্ঠে স্থান পাইয়া উচ্চ হইয়াছে, প্রভুর কৃপায় আমিও তেমনি উচ্চ হইলাম—

চিঙ্গ এরু অনৈয়ান্ চোন্ন বাচকম্ চেবি পুকামুন্
কঙ্গুলিন্ নিরত্তিনান্ তন্ কণ মলৈত তারৈ কাণ্ড ;
অঙ্গমুম্ মনম্ অদু এন্নক্ কুলিবন্দদু ; অর্ অকত্তে মিক্কুপ
পোঙ্গিয় উবকৈ এন্নপ পোডিত্তন, উরোমপ পুল্লি।
পঞ্জু এনচ চিবক্কুম্ মেন্ কাল্ দেবিয়ৈপ পিরিত্ত পাবি
বঞ্চনুক্কু ইলৈয় এন্নৈ 'বরুক' এণ্ড অরুল্ চেয়দানো ?
তঞ্জু এনক্ করুদিনানো ? তাল্চডৈক্ কডবুল্ উণ্ড
নঞ্জু এনচ চিরন্দেন্ অণ্ডো নায়কন্ অরুলিন্ নায়েন্।

৬।৪।১২২-১২৩

তুলসী-রামায়ণে করুণা ঘন রাম সম্পর্কে বিভীষণের অনুরূপ চিন্তার কথা পাওয়া যায় একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে। রাবণকর্তৃক পদাহত হইয়া বিভীষণ মনের আনন্দে নানা একম চিন্তা করিতে করিতে রামচন্দ্রের শিবিরের অভিমুখে অগ্রসর হইল : আমি গিয়া প্রভুর সেই রক্তবর্ণ কোমল চরণ-কমল দেখিতে পাইব—যে চরণ সেবককে দান করে সুখ, যে চরণের স্পর্শে দণ্ডকারণ্য হইল পবিত্র, ঋষিপত্নী অহল্যা হইল শাপমুক্ত। যে চরণ রহিয়াছে জানকীর হৃদয়ে, যে চরণ ধাবিত হইয়াছিল মায়ামৃগের পশ্চাতে এবং যে চরণ-কমল প্রস্ফুটিত শিবের হৃদয়-সরোবরে অহোভাগ্য আজ আমি সেই চরণ দেখিতে পাইব !—

দেখি হউঁ জাই চরণ জলজাতা।
অরুণ মৃদুল সেবক সুখদাতা॥
জে পদ পরসি তরী রিষিনারী।
দণ্ডককানন পাবনকারী॥
জে পদ জনক সুতাঁ উর লাএ।
কপট কুরঙ্গ সঙ্গ ধর ধাএ॥
হর উর সর সরোজ পদ জেঈ।
অহোভাগ্য মৈঁ দেখিহউঁ তেঈ॥

তুলসীদাস ও কম্বনের ভাষা স্বতন্ত্র হইলেও ভক্ত বিভীষণের দৈন্য, আর্তি, বেদনা ও আনন্দ ফুটাইতে উহা একইভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে।

॥ ১০ ॥

রামভক্তির আলোচনায় কুম্ভকর্ণ যে একটি আলোচনার যোগ্য চরিত্র বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে বাল্মীকীয় কিংবা কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠে তাহা মনে হয় না। তুলসী-রামায়ণে দেখা যায়, কুম্ভকর্ণ প্রথম হইতেই বিভীষণের ন্যায় রাম-ভক্ত। কেবল ভক্ত নয়, উগ্র ভক্ত। বিভীষণ রাবণের আচরণ-বিরোধী হইলেও রাবণের উদ্দেশ্যে তাহার কথাগুলি সর্বদাই বিনীত। 'আমি চরণ ধরিয়া আপনার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি'—এই হইল বিভীষণের উক্তি। কিন্তু কুম্ভকর্ণ উদ্দণ্ড। রাবণের কাছে সীতাহরণ বৃত্তান্ত এবং রাক্ষস বংশের ক্ষয়ক্ষতির কথা শুনিয়া কুম্ভকর্ণ বলিল: অরে মূর্খ! জগজ্জননী সীতাকে চুরি করিয়া তুই এখন কল্যাণ চাহিস? হে রাক্ষসরাজ! তুই ভাল কাজ করিস নাই। এখন আমাকে আসিয়া জাগাইলে কী হইবে? এখনও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামকে ভজনা কর, মঙ্গল হইবে। হনুমানের ন্যায় সেবক যাঁহার, সেই রঘু নাথ কি মনুষ্য! তুমি সেই পরম দেবতার সঙ্গে শত্রুতা করিয়াছ, ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি যাঁহার সেবক।—

জগদম্বা হরি আনি অব সঠ চাহত কল্যাণ ॥
ভলন কীন্হ তৈঁ নিসিচর নাহা ॥
অব মোহি আই জগাএহি কাহা ॥
অজ হুঁ তাত ত্যাগি অভিমানা।
ভজহু রাম হোইহি কল্যানা ॥
হৈঁ দসসীস মনুজ রঘুনায়ক।
জাকে হনুমান সে পায়ক ॥
কীন্হেহু প্রভু বিরোধ তেহি দেবক।
সিব বিরঞ্চি সুর জাকে সেবক ॥

এইরূপ উগ্র প্রকৃতির ভক্তরামচন্দ্র-রূপী ভগবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে ইহা অকল্পনীয়। তথাপি যে কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে গেল তাহার কারণ—'আমি রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ত্রিতাপনাশন শ্যামশরীর কমলনেত্র রামচন্দ্রকে দেখিয়া নয়ন

সার্থক করিব।' এই কথা বলিয়া শ্রীরামের রূপ ও গুণ স্মরণ করিয়া কুম্ভকর্ণ একমুহূর্তে প্রেম-বিহ্বল হইয়া পড়িল—

.....লোচন সুফল করৌঁ মৈঁ জাঈ ॥
স্যাম গাত সরসীরুহ লোচন।
দেখৌঁ জাই তাপত্রয় মোচন ॥
রামরূপ গুণ সুমিরত মগন ভয়উ ছন এক।

তুলসীদাসের কুম্ভকর্ণ চরিত্র অতিরঞ্জিত, অস্বাভাবিক, অবিশ্বাস্য। অবিশ্বাস্য হইলেও তাহার মধ্যে এই একটা সঙ্গতি দেখিতে পাই যে ভগবানের হাতে মৃত্যুবরণ করিয়া অক্ষয় বৈকুণ্ঠলাভের আশাতেই সে অগ্রসর হইয়াছে। কৃত্তি-বাসের রামায়ণে এই সঙ্গতিটুকুও নাই। প্রথমে দেখি, কুম্ভকর্ণ রাবণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে :

রাম-লক্ষ্মণ যদি সে সামান্য হত নর।
জলের উপরে কেন ভাসিছে পাথর ?
বনের বানর বদ্ধ যে রামের গুণে
সামান্য মনুষ্য তারে না ভাবিও মনে ॥
কুম্ভকর্ণ বলে, হেন লয় মম মন।
মায়াতে মনুষ্যরূপ দেব নারায়ণ ॥

রাম সম্পর্কে কুম্ভকর্ণের এই দেবত্ব-বোধ থাকা সত্ত্বেও রাবণের ভৎসনায় পরক্ষণেই তাহাকে দেখিতে পাই সম্পূর্ণ বিপরীত-রূপে। কুম্ভকর্ণ বলিতেছে :

শ্রীরামের মাথা কাটি আজি দিব ডালি।
সীতা লয়ে চিরদিন সুখে কর কেলি ॥

রাবণের ধমকের ফলে কুম্ভকর্ণের মত-পরিবর্তনের জন্য তাহাকে একটা ভীরু নির্বোধ বলশালী ব্যক্তি ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।

বাল্মীকির কুম্ভকর্ণ মহত্তর হইলেও তাহার চরিত্র-অঙ্কণে বেশ কিছু ত্রুটি ও অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। তুলসীদাস ও কৃত্তিবাসের রামায়ণে কুম্ভকর্ণকে আমরা কেবল একটি দিনই দেখিতে পাই—যুদ্ধের দিন অকাল নিদ্রাভঙ্গের পরে। এবং সেই দিনেই তাহার মৃত্যু। বাল্মীকি-রামায়ণে কুম্ভকর্ণের সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয় যথোচিত নিদ্রাভঙ্গের পরে—রাবণের দ্বিতীয় মন্ত্রণাসভায়—যুদ্ধকাণ্ডের দ্বাদশ সর্গে। রাবণকর্তৃক সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইল প্রথম বক্তৃতায়

করে কুম্ভকর্ণ। বাল্মীকি রামায়ণে আছে, কুম্ভকর্ণ (রাবণের প্রতি) অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল—'সীতাহরণের পূর্বেই আপনার উচিত ছিল আমাদের সহিত পরমর্শ করা।...যে ব্যক্তি প্রথম কর্তব্য কার্য সকল পরে এবং পশ্চাৎ কর্তব্য কার্য সকল প্রথমেই করে, সে রাজার নীতি-অনীতি বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ।... আপনি পরিণাম ফল চিন্তা না করিয়া যে গুরুতর কার্য করিয়াছেন, তাহাতে রামচন্দ্র যে আপনার প্রাণ নাশ করে নাই ইহাই আপনার পরম সৌভাগ্য (৬।১২।২৮-২৯, ৩২, ৩৪) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এইরূপ তিরস্কার করিয়াও কুম্ভকর্ণ রাবণের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সঙ্কল্প ঘোষণা করিল। রাবণের দুষ্কৃতির জন্য কুম্ভকর্ণ যে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে তাহা নৈতিক সদ্‌বুদ্ধির ফল নয়, তাহার সঙ্গে পরামর্শ না করার জন্য অভিমান। কুম্ভকর্ণের শেষ কয়েকটি উক্তি আরও অমর্যাদাকর ও অসার আত্মম্ভরিতার লক্ষণ: "আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, রামের একটি বাণের পর দ্বিতীয় বাণ নিক্ষেপ করিবার পূর্বেই আমি তাহাকে বিনষ্ট করিয়া তাহার রুধির পান করিব। আপনি এখন সুস্থ চিত্তে বারুণী পান করিয়া ইচ্ছানুসারে বিহার করুন। আমি রামচন্দ্রকে যমলোকে পাঠাইলে সীতা চিরকালের জন্য আপনার বশবর্তিনী হইবে" (৬।১২।৩৮, ৪০)। 'চিরায় সীতা বশগা ভবিষ্যতি' ইহারই যেন বাংলা সংস্করণ—

'সীতা লয়ে চিরদিন সুখে কর কেলি।'

কম্ব রামায়ণের কুম্ভকর্ণ প্রথম দিনের সাক্ষাতেই পাঠকের চোখে অধিকতর উন্নত ও জীবন্ত বলিয়া বোধ হইবে। তাহার প্রতিবাদের মধ্যে, তুলসী কুম্ভকর্ণের ভক্তিও নাই, আবার বাল্মীকীয় কুম্ভকর্ণের অশুচি আত্মম্ভরিতাও নাই। একটা সুস্থ ও স্বাভাবিক ন্যায়বোধ ও আত্ম-মর্যাদাবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া কুম্ভকর্ণ রাবণকে বলিতেছে: তুমি যাহা করিয়াছ তাহা মোটেই শিষ্টজনের কাজ নয়, ইহাতে আমাদের রাক্ষসকুল হীন হইয়াছে। কিন্তু এখন আর সীতাকে ফিরাইয়া দেওয়া চলে না, কারণ তাহাতে আমরা বীর সমাজে কাপুরুষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইব। এই যুদ্ধে যদি আমাদের মৃত্যুও ঘটে, আমাদের বীরত্বের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে—

চিট্টর্ চেয়ল্ চেয়দিলৈ; কুলচ চিরুমৈ চেয়দায়;
মট্টরিল্ মলর্ কুললিনাৱৈ ইনি মন্না
বিট্টিডুদুমেল্ এলিয়ম্ আকুন্ অবর্ বেল্ল
পট্টিডুদু মেল্ অদুবুম্ নণ্ড্ পলি অণ্ড্রাল্। ৬।২।৫৩

কুম্ভকর্ণ রাবণের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংকল্প ঘোষণা করিলেও সেদিন তাহাকে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাই না। রাবণ ও কুম্ভকর্ণকে দ্বিতীয়বার এক সঙ্গে পাওয়া যায় যুদ্ধকাণ্ডের ৬৩তম সর্গে—যেখানে কুম্ভকর্ণ প্রায় পূর্বকথার পুনরাবৃত্তি করিয়া পরিশেষে বলিল: কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ সেদিন (অর্থাৎ প্রথম দিন) যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই আমাদের পক্ষে হিতকর কার্য। তবে আপনার যাহা অভিমত হয় তাহাই করুন—

যদুক্তমিহ তে পূর্ব ক্রিয়তামনুজেন চ।
তদেব নো হিতং কার্যং যদিচ্ছসি চ তৎ কুরু ॥ (৬।৬৩।২১)

'যদিচ্ছসি চ তৎকুরু' এই উক্তির মধ্যে দিয়া কুম্ভকর্ণের দুর্বল প্রকৃতির আভাস পাওয়া যায়। 'বিভীষণ যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই আমাদের পক্ষে হিতকর কার্য'—এই কথা শুনিয়া রাবণ ক্রোধপরবশ হইয়া উঠিলে কুম্ভকর্ণ তাহাকে নানারূপ মধুর বাক্যে শান্ত করিবার চেষ্টা করে। উপদেশ দানের কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলে: "আপনি যে অবস্থাতেই থাকুন, আপনাকে সর্বদা হিতবাক্য বলা কর্তব্য। এই জন্যই বন্ধুভাব ও ভ্রাতৃস্নেহ বশত আমি আপনাকে এরূপ বলিয়াছি।[২৯] অতঃপর সেই পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি: "আপনি বারুনী পান করিয়া যথাসুখে রমণ করুন। আমি রামকে বধ করিলে সীতা চির কালের জন্য আপনারই হইবে"—

ময়াস্য রামে গমিতে যমক্ষয়ং
চিরায় সীতা বশগা ভবিষ্যতি ॥ (৬।৬৩।৫৭)

অতঃপর কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ যাত্রা, যুদ্ধ ও নিধন। মোট কথা দ্বিতীয়দিনে কুম্ভকর্ণের মনোভাবে আমরা খুব সামান্য পরিবর্তনই দেখিতে পাই। বাল্মীকি রামায়ণে, কেন জানিনা, কুম্ভকর্ণ কোন একটা বিশিষ্ট রূপ লইয়া স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই।

কম্ব-রামায়ণে প্রথম দিনের কুম্ভকর্ণকে আমরা দেখিয়াছি। দ্বিতীয় দিনের কুম্ভকর্ণ ঠিক প্রথম দিনের অনুবৃত্তি নয়। প্রথম দিনে দেখিয়াছি তাহার ন্যায় বোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ। দ্বিতীয় দিনে যুক্ত হইল ধর্ম-বোধ। ইহা কিছু

(২৯) অবশ্যং তু হিতং বাচ্যং সর্বাবস্থং ময়া তব ॥
বন্ধুভাবাদভিহিতং ভ্রাতৃস্নেহাচ্চ পার্থিব। (৬।৬৩।৩২-৩৩)

আকস্মিক নয়। মন্ত্রণা-সভায় কুম্ভকর্ণের বক্তৃতার পরে রাবণের প্রতি বিভীষণের সদুপদেশ রাবণকে রুষ্ট করিলেও কুম্ভকর্ণের চিত্তে কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিবে। (ইহা বাল্মীকি রামায়ণেও লক্ষ্য করা যায়।) যে আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রথম দিন সে বলিয়াছিল—'এখন সীতাকে ফিরাইয়া দিলে আমরা বীর সমাজে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া বিবেচিত হইব'—বিভীষণে সৎপরামর্শের পরে সেই মর্যাদাবোধ তাহার কাছে মিথ্যা মনে হইল। স্বচ্ছদৃষ্টিতে সে দেখিতে পাইল—ধর্ম রহিয়াছে শত্রুপক্ষে। তাই সে রাবণকে বলিল: "আমাদের হৃদয় আছে কপটতা, তাহাদের হৃদয়ে করুণা। আমাদের কর্মে পাপ, তাহাদের কর্মে ধর্ম। আমাদের কথায় আছে ছলনা, তাহাদের কথায় সত্য। আমি তোমাকে একটি কথা বলিতে চাই। যদি তাহার তাৎপর্য বুঝিতে পার, গ্রহণ করিও; আর যদি না পার, তবে তোমার ধ্বংস অনিবার্য্য। আমি বলিতেছি—সীতাকে ফিরাইয়া দিয়া রামের চরণে প্রণত হও, তোমার কনিষ্ঠ ভাই বিভীষণের সঙ্গে মীমাংসা করিয়া ফেল। ইহাই বাঁচিবার একমাত্র উপায়" (৬।১৬।৮০-৮৩)।

কুম্ভকর্ণের এই শান্তিপ্রিয় ধর্মকথা শুনিয়া রাবণ ঘৃণাভরে উত্তর করিল—ভীরু কাপুরুষ বিভীষণ গিয়াছে, তুমিও যাও। গিয়া সেই নর ও বানরের সেবা কর। অতঃপর রাবণ স্বয়ং যুদ্ধে গমনের উদ্যোগ করিলে কুম্ভকর্ণের মন দ্বিধাগ্রস্ত হইল। একদিকে ভাই ও অধর্ম, অন্যদিকে শত্রু ও ধর্ম। এই জাতীয় কর্তব্যের দ্বন্দ্বে মানুষ চলে তাহার গুণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী। সত্ত্বগুণ সম্পন্ন বিভীষণ বাছিয়া লইল ধর্মের পথ; কিন্তু রজোগুণ প্রধান কুম্ভকর্ণের কাছে ন্যায়ধর্ম অপেক্ষা লোকধর্মই বরণীয় বলিয়া মনে হইল। কুম্ভকর্ণ যে শেষপর্যন্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল, তাহা রাবণের ভৎর্সনায় নয়। মৃত্যু সুনিশ্চিত জানিয়াও বিপন্ন ভ্রাতাকে রক্ষার জন্যই সে আত্মোৎসর্গের জন্য অগ্রসর হইল। কৃত্তিবাস ও বাল্মীকিরামায়ণে আমরা দেখিয়াছি উক্তি ও আচরণে কুম্ভকর্ণ কতটা ইতর ও ব্যক্তিত্বহীন। কম্ব রামায়ণে তাহার আভাস মাত্র নাই। কুম্ভকর্ণ ভ্রাতৃচরণে প্রণত হইয়া বলিতেছে: "আমি চলিলাম। যুদ্ধ হইতে যে জয়লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিব তাহা বলিতে পারি না। বিধি আমাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিতেছে। আজই আমার শেষ দিন। তোমার কাছে অনুরোধ, আমার মৃত্যুর পরে অন্তত সীতাকে ফিরাইয়া দিও। ... ...

শৈশব হইতে আজ পর্যন্ত যদি কোনও অন্যায় করিয়া থাকি, ক্ষমা কর। আমি আর তোমাকে দেখিতে পাইব না" (৬।১৬।৯০,৯৩)।

কম্ব রামায়ণে কুম্ভকর্ণ চরিত্রের চরমোৎকর্ষ ঘটিয়াছে রণক্ষেত্রে। বিভীষণ কুম্ভকর্ণের শিবিরে আসিয়া তাহার সহিত নির্জনে সাক্ষাৎ করিল। এই সাক্ষাৎকার দৃশ্যটি তামিল কবির নিজস্ব সংযোজন বলিয়া মনে হয়। ইহা বাল্মীকি রামায়ণে নাই। পরবর্তীকালে অধ্যাত্মরামায়ণ (৬।৮।৯-১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ও তুলসীরামায়ণে এই ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাই। কিন্তু তাহা কেবলই উল্লেখ মাত্র। তুলসীদাস মাত্র ৩টি চৌপাঈ ও ১টি দোহার মধ্যে ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কম্বন্ প্রায় ৪০টি স্তবকের সাহায্যে দুই ভাই-এর এই সাক্ষাৎকার দৃশ্যটিকে মহাকাব্যোচিত বিশালতা ও গাম্ভীর্যে মণ্ডিত করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, এই অংশের পরিকল্পনায় কবি হয়ত মহাভারতের উদ্‌যোগ পর্বের কর্ণ-কৃষ্ণ ও কর্ণ-কুন্তীর সাক্ষাৎকারের কথা স্মরণ করিয়া থাকিবেন।

বিভীষণ কুম্ভকর্ণের শিবিরে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিলে কুম্ভকর্ণ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তুলিয়া লইয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিল: "আমি শুনিয়া আনন্দ পাইয়াছিলাম যে, তুমি আমাদের অভিশপ্ত পক্ষ ত্যাগ করিয়া রামের শরণাগত হইয়াছ। কিন্তু আজ তোমার এই প্রত্যাবর্তনে বিমূঢ় হইলাম। আমরা তো মৃত্যুর মুখে থাকিয়া খেলা করিতেছি। তুমি কি অমৃত পানের পরে বিষপান করিবে?—

কালন্ বায়্ক্ কলিক্কিণ্ড্রুম্বাল্
নবৈ উর বন্দদু এন্‌নী? অমুদু উন্‌বায় নঞ্জু উন্‌বায়ো? ৬।১৬।১২৬

তুমি যাঁহাদের শরণ লইয়াছ তাঁহারা ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য আসিয়াছেন। সেই পুরুষোত্তমের সেবা করিয়া অবশেষে কি পরদার লোভীদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিবে?" প্রকৃতপক্ষে বিভীষণ আসিয়াছিল কুম্ভকর্ণকে রামের কথা জানাইতে — "যে পুরুষোত্তম অযোগ্য আমার উপর তাঁহার মধুর করুণা বর্ষণ করিয়াছেন, তিনি তোমাকেও তাঁহার বরাভয় দান করিবেন।" কিন্তু বিভীষণ কুম্ভকর্ণকে নানা-রূপে বুঝাইয়াও সম্মত করিতে পারিল না। অবশেষে তাহার ধর্মবোধের কাছে আবেদন করিয়া বলিল—"ধার্মিক ব্যক্তি কখনও পিতা-মাতা ও সন্তানের কথা চিন্তা করে না। তাহাই যদি হয়; তবে রাবণের কথা ভাবিয়া কেন আমরা এই

ঘৃণ্য অপরাধ সর্থমন করিব? শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে আমরা শরীরের রুগ্ন অংশকে ছিন্ন করিয়া ফেলিব।—

উডলিডৈত তোণ্ডিট্রু ওণ্ডৈত্ত অরুত্তু অদন্ উদিরম্ উট্টি
চুডল উরচ চুট্টু বেরুওর্ মরুন্দিনাল্ তুয়রম্ তীর্ববর্।—৬।১৬।১৪১

তাছাড়া, তুমি এখন আর রাবণকে রক্ষা করিতে পারিবে না। ধর্ম-সংস্থাপক রাম করুণাবশত আমাকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছেন। তুমি আমার অনুসরণ কর।" এই বলিয়া বিভীষণ কুম্ভকর্ণের চরণে প্রণত হইল।

স্বভাবতই বিভীষণের আবেদনে কুম্ভকর্ণের হৃদয় বিগলিত হইল, কিন্তু তাহার সংকল্প শিথিল হইল না। ভাইকে তুলিয়া লইয়া আলিঙ্গন করিয়া সাশ্রু-নয়নে পুনরায় বলিতে লাগিল—"যে আমাকে এতদিন পোষণ করিয়াছে, বিপন্ন হইয়া যে আমাকে জয়লাভের) আশায় রণক্ষেত্রে পাঠাইয়াছে, তাহার জন্য প্রাণ বিসর্জন না করিয়া আমি কোথাও যাইতে পারি না। ভাগ্যক্রমে তুমি ধর্ম-সাধনার অধিকারী হইয়াছ; কিন্তু আমি নীচ মৃত্যুর অভিমুখে চলিয়াছি।...বুদ্ধিহীন প্রভু পাপ-চিন্তায় মগ্ন হইলে তাহাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু সেই চেষ্টায় ব্যর্থ হইলে আশ্রিত ব্যক্তি কি অবিচলিতচিত্তে প্রভুর ধ্বংস দেখিতে পারে? রামের তীক্ষ্ণ শরে যখন আমার ভাই-এর দেহ ভূ-লুণ্ঠিত হইবে, তখন কি আমি বেদনা-কাতর হৃদয়ে রাম-নাম লইয়া মত্ত থাকিতে পারিব?...তুমি আর বিলম্ব করিও না। অন্য কোনও কথায় আমার সংকল্প টলিবে না ... শৈশব হইতে যে বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম, আজ আমাদের সেই বন্ধন ছিন্ন হইতে চলিয়াছে।" ইহা শুনিয়া বিভীষণ তাহার চরণতলে পতিত হইল। মন বিষণ্ণ, দেহ অবসন্ন। কুম্ভকর্ণকে সংকল্পে দৃঢ় জানিয়া আর কিছু বলা নিরর্থক হইবে ভাবিয়া বিভীষণ নীরবে রামচন্দ্রের শিবিরের অভিমুখে অগ্রসর হইল। কনিষ্ঠ ভ্রাতার গমন-পথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কুম্ভকর্ণের তপ্ত নয়ন হইতে অশ্রু-আকারে যেন রক্ত-ধারা নামিয়া আসিল (৬।১৬।১৬৪)।

প্রলোভনের প্রত্যাখ্যানে কম্ব-রামায়ণের কুম্ভকর্ণ মহাভারতের কর্ণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু কর্ণ ছিল অত্যন্ত রূঢ়-প্রকৃতির। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় (কর্ণকুন্তীসংবাদ) সেই পৌরাণিক চরিত্র কোমলে কঠোরে পরম হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠে। কম্ব-রামায়ণের কুম্ভকর্ণকে তাহার সম-তুল্য বলিয়া মনে করিলে,

আশা করি, অতিরঞ্জন হইবে না। "যে পক্ষের পরজয়, যে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান"—ইহা কেবল কর্ণের উক্তি নয়, কুম্ভকর্ণেরও।

বিভীষণকে বিদায় দেওয়ার সময় পর্যন্তও কুম্ভকর্ণের মনে রাম-ভক্তি অপেক্ষা রাবণ-প্রীতি প্রবলতর ছিল। তখনও সত্ত্বগুণ রজোগুণের উপর জয়ী হইতে পারে নাই। তখনও ন্যায়ধর্ম অপেক্ষা লৌকিক ধর্মেই তাহার আসক্তি। তখনও তাহার দৃষ্টির আবরণ অপসারিত হয় নাই। রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া কুম্ভকর্ণের দৃষ্টি স্বচ্ছ হইয়া আসিল। রজোগুণের স্থলে সত্ত্বগুণের ক্রমিক আবির্ভাবে তাহার অন্তরে ভক্তিভাব পরিস্ফুট হইতে থাকে। হস্ত-পদ-হীন মুমূর্ষু কুম্ভকর্ণের শেষ প্রার্থনা রাবণের জন্য নয়, বিভীষণের জন্য—"আমার ভাই তোমার চরণে শরণ লইয়াছে। রাক্ষসকুলজাত হইলেও কুলোচিত হীনতা হইতে সে মুক্ত। রাবণ এখনও জয়লাভের কামনা করিতেছে এবং সুযোগ পাইলেই সে বিভীষণের প্রাণ-নাশের চেষ্টা করিবে, ছোট ভাই বলিয়া ক্ষমা করিবে না। তোমার কাছে আমার প্রার্থনা এই যে, তুমি অথবা লক্ষ্মণ অথবা হনুমান যে কেহ একজন তাহার সঙ্গে থাকিবে—

উম্বিয়ৈত্তান্ উরৈত্তান্ অন্নুমনৈত্তান্ ওরু পোলুদুম্
এম্বি প্রিয়ানাক অরুলুদি য়ান্ বেণ্ডিনেন্।"—(৬।১৬।৩৫২)

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে বোঝা যাইবে, কম্ব-রামায়ণের কুম্ভকর্ণ ভক্তিরস ও কাব্যরস উভয় দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য। এই চরিত্রটির রূপ ও পরিণাম সম্পর্কে বাল্মীকি-রামায়ণে একটা দ্বিধা, অস্পষ্টতা ও অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখিতে পাই, কুম্ভকর্ণ আরও ভ্রষ্ট হইয়া একটা ভোজন-ও নিদ্রাপরায়ণ স্থূলবুদ্ধি হাস্যকর চরিত্রে পরিণত হইয়াছে। অন্যদিকে তুলসীদাস তাহার রামভক্তির পরিচয় দিতে গিয়া সম্ভাব্যতার সকল সীমাকে সম্পূর্ণরূপে লঙ্ঘন করিয়া বিষয়টিকে অবিশ্বাস্য ও দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছেন। কম্ব-রামায়ণের কুম্ভকর্ণ একটি জটিল চরিত্র। সে বিভীষণের ন্যায় মহাত্মা নয়, আবার রাবণের ন্যায় দুরাত্মাও নয়। একদিকে তাহার ধর্মবোধ, অন্যদিকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা। একদিকে বিভীষণের প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যদিকে রাবণের জন্য করুণা। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব অন্য কোনও রাক্ষস-চরিত্রে নাই। কেবল মৃত্যুর পূর্বক্ষণে সে নির্দ্বন্দ্ব হইতে পারিয়াছিল। তখন তাহার প্রার্থনা রাবণের জন্য নয়, নিজের জন্য নয়, বিভীষণের জন্য। কুম্ভকর্ণ তাই ভক্ত না হইলেও ভক্ত-কল্প।

কম্বন্ হইতে তুলসীদাস চার শ' বৎসরের ব্যবধান। এই চার শতাব্দীর মধ্যেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় ভক্তিসাহিত্যের উদ্‌ভব ও পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়া গিয়াছে। দক্ষিণভারতে তামিল সাহিত্যের সমস্ত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পূর্ণফল যেমন দ্বাদশ শতকের রামভক্ত কবি কম্বন্, উত্তর ভারতে তেমনি হিন্দী-সাহিত্যে ভক্তিধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটিয়াছে ষোড়শ শতকের রামভক্ত কবি তুলসীদাসে (১৫৩২—১৬২৩)। ভারতীয় ভক্তি-সাহিত্যের ইতিহাসে ইঁহারা দুই উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক॥

হেমিংওয়ের মৃত্যু—একটি জল্পনা

অদিতিনাথ রায়

হেমিংওয়ের সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে কোনও স্বীকৃতি বর্তমানে খুব নিরাপদ হবে বলে আমার মনে হয় না।

প্রথমত, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সংঘাতের যে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও তার ক্রূর বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার মানসিক অবনতির যে বর্ণনা হেমিংওয়ের সাহিত্যে পাওয়া যায় তার প্রকৃত মূল্যটা আমাদের পক্ষে (যারা বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আওতায় আসি নি) গ্রহণ করা কিছুটা কঠিন। অন্যদিকে, ইউরোপ ও আমেরিকায় যাঁরা এই যুদ্ধের নির্লিপ্ত হত্যার পরিচয় পেয়েছেন তাদের কাছে ওই অভিজ্ঞতা এতই প্রত্যক্ষ যে তার প্রকাশটার সত্য মূল্য তাঁদের পক্ষেও যাচাই করা সহজ নয়। অতএব কিছুটা সময়পাত না হলে হেমিংওয়ে সাহিত্যের সঠিক বিচার বোধহয় করা যাবে না।

কিন্তু হেমিংওয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু আমাদের কিছুটা জল্পনার খোরাক যোগাতে পারে যার ভিত্তি হবে তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবন ও সেই জীবনের পটভূমিকা।

নিজের হাতের যে গুলিটি হেমিংওয়ের মৃত্যু ঘটিয়েছে, সেই মৃত্যুকে বলা হয়েছে দুর্ঘটনা। কিন্তু তা হলে, ওই দুর্ঘটনার পিছনেও একটা নিয়ম আছে, অন্তত হেমিংওয়ের অবচেতন মনের নির্দেশ আছে বলে মনে হয়। দেহকে এই যে চরম আঘাত, তা একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক পটভূমিকায় একটি বিশিষ্ট মানুষের জীবনের কিরূপ পরিণতি? অবশ্য এখানে আগেই স্বীকার করছি যে হেমিংওয়ের মৃত্যুটা দুর্ঘটনা নয়, আত্মহত্যা।

এ কথা ভাববার কারণ এই যে হেমিংওয়ের জীবনে এতগুলিই দুর্ঘটনা যে তার মধ্যেও একটা লজিক বা নিয়মানুবর্তিতা আছে বলে মনে হয়। আঘাতের যন্ত্রণা ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর আশ্বাস বিলুপ্তির অভিজ্ঞতাকে তিনি দেহে ও প্রাণে, দুইভাবেই যেন অনুভব করতে চেয়েছেন। তাই একদিকে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বারবার নিজেকে বিপদের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছেন, অন্যদিকে, সাহিত্য-

সৃষ্টির মধ্যে ক্রমাগত হিংসা ও সংঘাতের ছবি এঁকে তিনি মনে মনে ওই যন্ত্রণাকেই নিবিড়ভাবে অনুভব করেছেন। আঘাত ও মৃত্যুর প্রকৃত রূপটা, তার পেছনের যান্ত্রিক নীতিটা, জানবার জন্য হেমিংওয়ের একটা অস্বস্তিকর (আপাত দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক) ঝোঁক ছিল। মৃত্যুর সম্বন্ধে এই যে কৌতূহল তা আশাহীন হতে বাধ্য, সেইজন্যই তা অস্বাভাবিক॥

দুই মহাযুদ্ধে হেমিংওয়ের দেহের নয়টি জায়গায় গুলি বেঁধে। শিকার, মুষ্টিযুদ্ধ, ইত্যাদি এমন খেলা তাঁকে আকর্ষণ করেছে যার মধ্য দিয়ে তিনি আঘাত দিয়েছেন ও পেয়েছেন। এ ছাড়া নানা আকস্মিক বিপদের তাঁকে সম্মুখীন হতে হয়েছে। একটি বিমান দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়ে পরের মুহূর্তে আর একটি বিমান দুর্ঘটনায় পড়তে হয়েছে। অতএব, যদি বলা যায় যে হেমিংওয়ের কাছে দৈহিক যন্ত্রণা সহ্য করা একটা মানসিক বৃত্তি ছিল, তবে বোধহয় খুব ভুল হয় না।

লেখার মধ্যেও প্রথম থেকেই তিনি বীভৎস ক্রূরতা ও দৈহিক আঘাত ও তার প্রতিক্রিয়ার কথা বর্ণনা করেছেন।

প্রথম প্রকাশিত ছোট গল্পের বই "ইন্ আওয়ার টাইম"-এ একটি চিত্রে রেড ইণ্ডিয়ান এক মহিলার উপর সজ্ঞান অবস্থায় সিজারিয়ান অপারেশনের বর্ণনা আছে। মহিলার অথর্ব স্বামী স্ত্রীর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে খুর দিয়ে নিজের গলা কেটেছে। আর এই সম্পূর্ণ নৃশংস দৃশ্যের দর্শক হয়েছে একটি বালক।

"ডেথ্ ইন্ দি আফ্টারনুন্" বইটিতে সাংবাদিকের ভঙ্গিতে ষাঁড়ের লড়াই এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ওই পশুগুলির শক্তি ও সেই শক্তির অর্থহীন ও প্রচণ্ড আঘাতের কথা এতে আছে। লেখক নির্লিপ্ত ভাবে তা দেখেছেন, নিজের মধ্যেই সেই আঘাত অনুভব করবার চেষ্টা করছেন।

হেমিংওয়ের সব উপন্যাসের নায়কের মত "ফেয়ারওয়েল টু আর্মস্"-এর নায়কও আহত। সে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়েছে—একটি ইংরেজ মেয়ের প্রেমকে সম্বল করে যুদ্ধ থেকে বিদায় নিতে চেয়েছে—কিন্তু এই চাওয়ার পিছনেও যে বিশেষ আশা আছে, জোর আছে, তা মনে হয় না। বরং যে পটভূমিকায় প্রেমের জন্য তাতে তাকে ছেলেমানুষী রোম্যান্টিসিজম্ বলে মনে হয়, উপন্যাসের বস্তুর কাছে অবান্তর বলে মনে হয়।

আর একটি বড় গল্প "টু হ্যাভ অর হ্যাভ নট্"-এর সমস্ত পরিস্থিতিটাই হিংসাত্মক ও বীভৎস।

এর পরে "ফর্ হুম্ দি বেল্ 'টোল্স্" লিখে হেমিংওয়ে প্রায় দশ বছর লেখা বন্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু এই স্তব্ধতার যুগ পার হয়ে এসে যে বই লিখে তিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন, সেই "ওল্ড ম্যান এণ্ড দি সি"-তেও হাঙ্গররূপী প্রকৃতির হিংসা ও বৃদ্ধের সঙ্গে তার সংগ্রাম সেই আঘাত প্রতিঘাতের ও তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ছবিই ফুটিয়ে তুলেছে। এই বইটি হেমিংওয়ের অন্যান্য বই থেকে কিছুটা পৃথক। কিন্তু তার বিচারের এখানে প্রয়োজন নেই।

এখানে প্রশ্নটা এই যে হেমিংওয়ের অভিজ্ঞতার ভিত্তিটা কোথায়? লেখকের জীবনে দেহকে কেন্দ্র করে আঘাত প্রতিঘাত ও উলঙ্গ নৃশংসতা এত সত্য কেন?

পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের ছোট একটি সহরের ডাক্তারের ছেলে হেমিংওয়ে কিশোর বয়স কেটেছে মিচিগানের বনে-জঙ্গলে শিকার করে ও মাছ ধরে। শিল্পীমনে এই সময়ের সুখ-স্মৃতিটা বোধ হয় শেষ পর্যন্ত জেগে ছিল। ভবিষ্যৎ জীবনে যে এড ভেঞ্চারের লোভ তাঁকে নানা দেশে ঘুরিয়েছে তার মূল প্রেরণা নিঃসন্দেহে এসেছে মিচিগানের অভিযানপূর্ণ জীবন থেকে। এই সময় থেকেই হেমিংওয়ে জীবনে সাহসকে একটি বিশেষ মূল্য দিয়ে এসেছেন। তাঁর উপন্যাসের জীবনে পরাজিত নায়কদের ওই একটি মাত্র গুণেরই উল্লেখ আছে। পরাজয় নিশ্চিন্ত জেনেও তারা পালিয়ে বাঁচতে চায় না।

কিন্তু এই একই সময় দেখা যায় যে হেমিংওয়ে মৃত্যুর সহানুভূতিশূন্য পরিণতির পরিচয় পেয়েছেন। শিকারের আনন্দের মধ্যে আহত পশুর যন্ত্রণা অনুভব করেছেন, যন্ত্রণার রূপটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন। পরে আফ্রিকার কয়েকটি কাহিনীতে এই অভিজ্ঞতারই তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। বিস্মিত পশুর সুনিশ্চিন্ত মৃত্যুর অতি প্রত্যক্ষ যান্ত্রিকতা নিচের বিবরণের মধ্যে পাওয়া যায়ঃ—

It was funny to M'Cola—to see a hyena shot at close range. There was a comic slap of bullet and the hyena's agitated surprise to find death inside him. It was fnnnier to see a hyena shot at a greater distance, to see him go over backwards, to

see him start that frantic circle, to see that electric speed that meant that he was racing the little nickelled death inside him.

মৃত্যু সম্বন্ধে হেমিংওয়ের যে নির্বিকার কৌতূহল দেখা যায়, তার প্রাথমিক প্রবণতা বোধহয় এসেছে শিকারের হিংসা বৃত্তির অভিজ্ঞতা থেকে। তা যদি হয়, একথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে সেই অল্প বয়স থেকেই হেমিংওয়ে শুধু যে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখতে শিখেছিলেন তাই নয়, সেই দেখার মধ্যে একদিকে তাঁর স্পর্শকাতর হৃদয় গভীর ক্লেশ বোধ করেছে, আবার অন্য দিকে সেই অভিজ্ঞতার জগতে তিনি অনেকটা স্বইচ্ছায় বন্দী হয়ে আছেন। এইটাই হেমিংওয়ে জীবনের একটা বড় দ্বন্দ্ব বা conflct।

তিনি হিংসাকে ঘৃণা করেছেন, কিন্তু ষাঁড়ের লড়াই, শিকার, মুষ্টিযুদ্ধ, ইত্যাদি হিংসা বৃত্তিকেই বেছে নিয়েছেন, বোধহয় পছন্দও করেছেন।

কিন্তু এই অসামাজিক বৃত্তিগুলির প্রতি এত ঝোঁকই বা কেন? এর একটা কারণ অবশ্য খুবই স্পষ্ট। কিশোর বয়সের অভিযানপূর্ণ জীবন তাঁকে যে খেলাধূলার মধ্যে সাহসের পরিচয় আছে তার দিকে টেনেছে। এর মধ্যে কষ্ট যেমন পেয়েছেন তেমন আনন্দও পেয়েছেন। এই দ্বন্দ্বটা মানুষের প্রকৃতিগত অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু হেমিংওয়ের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব অত্যন্ত নিগূঢ় হয়ে, অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়ে দেখা দিয়েছে।

অসামাজিক বৃত্তি নির্বাচনের আরও যে একটি কারণ তা আরও জটিল ও হেমিংওয়ের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব বেশী। সেটা কি বুঝতে হলে হেমিংওয়ের জীবনের অন্য আর একটি দিকের কথা আগে আলোচনা করতে হয়।

মিচিগানে হেমিংওয়ের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা হয় তা সুখের ছিল না। এখানে তিনি রেড ইণ্ডিয়ানদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের কেন্দ্র করে আমেরিকায় সমাজে যে ক্রূর দ্বন্দ্ব ও সংঘাত দেখেছিলেন, হিংসার যে রূঢ় অত্যাচার-অবিচার দেখেছিলেন, তাতে তাঁর স্পর্শকাতর চিত্তে আঘাত লেগেছিল, তাঁর নীতিবোধ ক্ষুব্ধ হয়েছিল। সামাজিক জীবনের এই ঘাত প্রতিঘাত প্রথম জীবনেই তাঁর মনে একটা ক্ষতের সৃষ্টি করে। এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে অতি অল্প বয়সেই হেমিংওয়ে একটি সংবাদপত্রে কর্ম-জীবন সুরু করেন। কর্ম-জীবনের সংঘর্ষও সেই বয়সে নিশ্চয়ই খুব সুখকর

ছিল না। এক হিসাবে হেমিংওয়ের অসামাজিকতা সামাজিক জীবনের এই তিক্ত অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বলে মনে করলে অন্যায় হয় না।

পরে স্বদেশের সামাজিক জীবনের রূপটা তাঁর চোখে আরও বিকৃত হয়ে ধরা পড়েছিল। প্রতিযোগিতার নামে এর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম ১৯২৯ সালের অর্থ-নৈতিক সঙ্কটে বেশী করে প্রকট হয়ে উঠে। নিজের সমাজ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়েন। এই নিরাশা ও সমাজ জীবন সম্বন্ধে বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর এই কয়টি লাইনে।

Our people went to America because that was the place to go then. It had been a good country and we had made a bloody mess of it and would go now somewhere else.....

আমেরিকার সমাজ জীবন সম্বন্ধে এই সমালোচনা আরও স্পষ্ট হয়েছে তাঁর Torrents of Spring-এ। হেমিংওয়ে আমেরিকার সমাজ-জীবনে একটা বিচার-বিবেচনাহীন হিংসাবৃত্তির পরিচয় দেখেছেন, তার আদর্শের স্থূলতা, তার কর্মোন্মত্ত ও কর্মব্যবস্থার অর্থহীনতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেখানের কর্ম-উন্মাদনাকে তিনি বলেছেন "endless succession of days of dull pistol collaring."

সামাজিক জীবনের এই অভিজ্ঞতা হেমিংওয়ের মনে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। তিনি সমাজের সঙ্গে কখনও এক হতে পারেন নি। নিশ্চয় বুঝেছেন যে সমাজের দেহে এমন একটা কীট বাসা বেঁধেছে যা জীবনকে ক্রমশ ক্ষয় করবেই। সমাজের গঠনেই এমন একটা দুর্নীতি প্রবেশ করেছে যে তার হাতে মানুষকে মার খেতেই হবে। কিন্তু বারবার আমেরিকার উপকূল ছেড়ে বিদেশে পালালেও, তিনি এই দুর্নীতির প্রভাব কখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাঁর অবস্থা হয়েছে গুলিবিদ্ধ পশুর মত। সমাজের মধ্যে যে বিবেকহীন শক্তিগুলি কাজ করেছে তার কাছে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বলে মনে হয়েছে এবং নিজের পরিণতি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়েই বিরুদ্ধে শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ক্ষত বিক্ষত করেছেন। ওই শক্তির প্রকৃতিটা, তার নৃশংস রীতিটা বোঝবার জন্যই যেন তার পীড়নটা তিনি দেহগতভাবে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। কারণ দৈহিক যন্ত্রণার অনুভূতির মধ্যেই ওটির বর্বরতাটা যেন বোঝা সম্ভব।

যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতাই সম্ভবত হেমিংওয়ের মনে পীড়নকে এইভাবে দেহগত করে দেখার প্রবণতা দিয়েছে। আবার দুই মহাযুদ্ধে অকারণ ঘাত প্রতিঘাত ও মৃত্যুর রূপটা তিনি আরও স্পষ্ট করে দেখেছেন। সমাজ জীবনে যে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল, তারই আরও ব্যাপক ও স্পষ্ট অভিজ্ঞতা হল যুদ্ধক্ষেত্রে এবং মৃত্যুকেই মনে হল জীবনের একমাত্র বাস্তব সত্য। সামাজিক জীবনের সব কাজকর্ম ও উদ্যমের পিছনে যে মৃত্যুর শীতলতা তিনি অনুভব করেছিলেন, সেই অনুভূতিটাই যুদ্ধক্ষেত্রে আরও গভীর হয়ে দেখা দিল। সেই হিসাবে যুদ্ধের বর্ণনার মধ্যে হেমিংওয়ে তাঁর সামাজিক জীবনের ছবিটাই আরও স্পষ্ট করে দেখতে চেয়েছেন। একদিকে সেই সামাজিক জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন আবার অন্যদিকে সেই জীবনের যে পীড়ন, তার মধ্যের যে ঘাত প্রতিঘাত সেইটাই দেহগতভাবে অনুভব করতে চেয়েছেন। হেমিংওয়ে হিংসার যে ছবি আঁকেন, তার পিছনে তাঁর নিজেরই হিংসাবৃত্তি তাঁর মনে এইভাবে কাজ করছে। এ যে একরকম আত্মপীড়ন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে এর মধ্যে সমাজের সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনাও আছে। হেমিংওয়ের সাহিত্য মার্কিন সমাজ-জীবনের আত্মঘাতী সংগ্রাম ও ঘাত প্রতিঘাতের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। কিন্তু এ এমনই একজন লোকের প্রতিবাদ যে ওই সমাজের পিছনের বিবেকহীন শক্তির বাস্তব পরিচয় জানে ও জীবনের শেষ পরিণতি সম্বন্ধে যে নিঃসন্দেহ।

হেমিংওয়ের মানসিক গঠনের এই পরিচয়ের মধ্যেই আত্মঘাতের কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কারণ একদিকে বাস্তবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অন্যদিকে তাকেই সুনিশ্চিত সত্য বলে জানার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আছে, তার মৃত্যু হতে বাধ্য!

কিন্তু হেমিংওয়ের মধ্যে এই যে দ্বন্দ্ব তা আরও নিগূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিল অন্য একটি কারণে ও সেইটাই হেমিংওয়ের মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ বলে মনে হয়।

জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে মুক্তির পথ খোঁজা স্বাভাবিক। হেমিংওয়ের সাহিত্যেও মাঝে মাঝে এই চেষ্টা দেখা যায়। প্রথমেই "ইন আওয়ার টাইম" এর একটি গল্পে হেমিংওয়ের আহত নায়ক যুদ্ধক্ষেত্রে আহত শত্রুপক্ষীয় বিদেশী সৈনিকের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করেছে: Senta Renaldi, Senta, you and me we have made a separate peace.

কিন্তু সে সন্ধি, সফল হয় নি, হেমিংওয়ে স্বসমাজের বিকারের প্রভাব কাটিয়ে নূতন জীবন সুরু করতে পারেন নি।

পরের কয়েকটি উপন্যাসেই হেমিংওয়ে বিবেকহীন সংঘাত ও আশ্বাসহীন মৃত্যুর ছবি এঁকে পরোক্ষভাবে সমাজের যান্ত্রিক ও ক্রূর শক্তিটার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছেন। এ যুদ্ধটা অনেকটা নিজের বিরুদ্ধেও, কারণ সমাজের বিচারহীন নিষ্ঠুরতার প্রবণতা তাঁর মধ্যেও রয়েছে।

কয়েকটি কাহিনীতে হেমিংওয়ে নিজের এই আবদ্ধ জগতের মধ্যেই আশ্বাসের পথ খুঁজেছেন "ফর হুম্ দি বেল্ টোল্স"এ নায়ক সাম্যবাদে বিশ্বাসী। তার জন্য সংগ্রাম করার মধ্যে সে যেন জীবনেরই একটা অর্থ খুঁজে পেয়েছে। বিশ্বাসের প্রলেপ দিয়ে নিজের ও মনের গভীর ক্ষতের যন্ত্রণাটা ভোলবার এই যে চেষ্টা তা হেমিংওয়ের পক্ষে ট্রাজিক। সে চেষ্টা সফলও হয়নি। হেমিংওয়ের সাম্যবাদে বিশ্বাসটা মৌখিকই রয়ে গেছে। কারণ দেখা যায় যে বহু পরের ও শেষ লেখা "ওল্ড ম্যান এণ্ড দি সি"তে বৃদ্ধ মৎস্য শিকারী অক্লান্ত একক সংগ্রামের পর জীবনের শেষ প্রাপ্তি হিসাবে একটা বিরাট কঙ্কাল বহন করে তীরে এসে ভিড়েছে।

জীবনে আশ্বাস লাভের চেষ্টা এই ভাবে ব্যর্থ হলেও, তার অপব্যয় ও ক্ষয় ক্ষতির দিকটা বড় হয়ে থাকলেও হেমিংওয়ের জীবনের ও সাহিত্যের এইটুকু তাৎপর্য ছিল যে তিনি সমাজের অন্তস্তলের একটা দুর্নীতি, তার মধ্যের বিকারকে কখনও স্বীকার করেন নি। সেই হিসাবে তিনি বিদ্রোহী।

কিন্তু "টু হ্যাভ অর হ্যাভ নট" বইটিতে দেখা যায় মৃত্যুকালে নায়ক স্বীকার করছে "One can not fight alone" এই প্রত্যয় কিন্তু শুধু নিরাশাসূচক। এর মধ্য দিয়ে হেমিংওয়ে যে কোনও সত্য বিশ্বাসের পথ খুঁজে পাননি তা তাঁর পরের লেখা প্রমাণ করে। অন্যদিকে ওই আশ্বাসহীন অনুভূতির পিছনে একটা নতি স্বীকার আছে, যাতে মনে হয় যেন বিপ্লবীর পতন ঘটেছে। হেমিংওয়ে শুধু ক্লান্তই নন, তিনি সমাজ ও জীবনের সঙ্গে একটা রফা করতে চেয়েছেন, একক ভাবে বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায় না, এই কৈফিয়ৎ দিয়ে বোধহয় সামাজিক হয়ে উঠতে চেয়েছেন। নিজের জীবনের বাস্তব অনুভূতিটাই এই ভাবে অস্বীকৃত হয়েছে—তার মূল প্রশ্নটাকে তিনি এড়াতে চেয়েছেন।

কিন্তু তাই কি সম্ভব? হেমিংওয়ের জীবনের, তাঁর স্বভাবের মধ্যেই যে

বিশেষ দ্বন্দ্ব; সন্ধির মধ্যে তার সমাধান হতে পারে? অন্তরে, অন্তরে তিনি কি সেই দ্বন্দ্বটাকেই আরও তীব্র ভাবে অনুভব করেন নি? ওই সন্ধির ঠিক পরেই দশটি বছর তার সাহিত্য সৃষ্টি যে স্তব্ধ হয়ে ছিল, তা কি শিল্পী মনের এক রকম মৃত্যুরই পরিচয় দেয় না? জীবনের যে মূল প্রশ্নটাকে তিনি জোর করে থামিয়ে দিতে চেয়েছেন, তারপর তার আর কি বলবার থাকতে পারে।

আমার মনে হয় হেমিংওয়ে সমাজের সঙ্গে সন্ধিকে অন্তরে স্বীকার করতে পারেন নি। নিজের জীবনের প্রশ্নটার তিনি উত্তর খুঁজে পাননি। মানুষের জীবনের যেটা হিংসার দিক, মার্কিন সমাজ-জীবনে ও ইউরোপের স্বার্থপূর্ণ সংগ্রামের মধ্যে তার যে প্রভাব তিনি দেখিয়েছিলেন, তার প্রকৃত পরিচয়টা, তার প্রভাবের মূল কারণটা তিনি সন্ধান করতে চেয়েছিলেন। মৃত্যুর যান্ত্রিকতার, ক্রূরতার বিশেষ রূপের তাই তার সাহিত্যে নিখুঁত বর্ণনার চেষ্টা আছে। এবং নিজেকে যে বারবার দুর্বিপাকে ফেলেছেন, দেহকে আঘাত দিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন, তার পিছনে রয়েছে এই চেতনা যে হিংসা ও মৃত্যুই জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য। এই পটভূমিকায় দেখলে হেমিংওয়ের মৃত্যুকে অপঘাত বলে মনে হবে না, বরং তাঁর জীবনের শেষ, স্থির ও সুনির্দ্দিষ্ট পরিণতি বলেই মনে হবে।

Statement of Ownership and other particulars of

PRABANDHA PATRIKA

Form—IV

According to 'Rule 8 of the Registration of Newspaper, (Central) Rules 1956

1.	Place of Publication :	20, Grey Street, Cal-5
2.	Periodicity of Publication :	Monthly.
3.	Printer's name :	Haraprosad Mookerji
	Nationality :	Indian
	Address :	20, Grey Street, Cal-5
4.	Publisher's Name :	Haraprosad Mookerji
	Nationality :	Indian
	Address :	20, Grey Street, Cal-5
5.	Editor's Name :	Chitta Ranjan Ghosh
	Nationality :	Indian
	Address :	57, Pataldanga St. Cal-9
		&
		Ramendu Dutta
		Indian
		33/1, Amherst St. Cal-9
6.	Name and address of individuals who own the Newspaper and Partners or Share holders holding more than one percent of the total Capital.	Haraprosad Mookerji 20, Grey Street, Calcutta-5

I, Haraprosad Mookerji, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date : 7. 3. 62

Signature of Publishers.

Sd/- Haraprosad Mookerji

CALC
UNIVE

৭৮৫৮—৩৫৭ ॥

প্র ব ন্ধ প ত্রি কা

বর্ষ ২ সংখ্যা ১২ ॥ চৈত্র ১৩৬৮ ॥ এপ্রিল ১৯৬২

সূচীপত্র

প্রসন্নময় লাহিড়ী	॥ ১—২১ ॥	রূপের আলোকে কবি-সঙ্গীত
অরুণ সান্যাল	॥ ২২—৩৬ ॥	কবিওয়ালাদের যোগ্যভূমিকা প্রসঙ্গে
এম্, বাগলাই	॥ ৩৭—৫২ ॥	'শ্রেণীশান্তি' ও ধনতান্ত্রিক বাস্তবতা
অনাদি লাহিড়ী	॥ ৫৩—৬৪ ॥	সার্ত্রীয় অস্তিবাদের সমীক্ষা
অনিরুদ্ধ ঘোষ	॥ ৬৫—৭৪ ॥	সাম্প্রতিক একটি কাব্যনাট্য
মিহির আচার্য	॥ ৭৫—৮০ ॥	নূতন রীতি
যোগানন্দ দাস	॥ ৮১—১০১ ॥	সজনীকান্ত ও শনিবারের চিঠি
ভাস্কর বসু	॥ ১০২—১০৬ ॥	'রবীন্দ্রজীবনে কাদম্বরী দেবী'

প্রচ্ছদশিল্পী ঃ সুবোধ দাশগুপ্ত

সম্পাদক

রামেন্দু দত্ত | চিত্তরঞ্জন ঘোষ

দাম এক টাকা ॥ ২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিঃ-৫ ॥ ফোন : ৫৪-৬৬২৫

প্রবন্ধ পত্রিকা

নববর্ষ (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) সংখ্যার সম্ভাব্য সূচী

॥ স্মরণ ॥

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত রচনা।
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'বিশ্বকবি'।
সজনীকান্ত দাসের প্রবন্ধ।

॥ অন্যান্য প্রবন্ধ ॥

শশিভূষণ দাশগুপ্ত	:	এ বছরের সাহিত্য
আদিতা ওহদেদার	:	'দূরাকাঙ্খের বৃথা ভ্রমণ'
আলেকজান্দার শিফম্যান	:	তলস্তয় ও বিবেকানন্দ
নীরেন্দ্রনাথ রায়	:	সোভিয়েতে রবীন্দ্র-গ্রন্থ
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	:	অমরেন্দ্র ঘোষ
হরপ্রসাদ মিত্র	:	বংকিম-প্রসঙ্গে
দেবীপদ ভট্টাচার্য	:	একটি উপন্যাস
সুধীর করণ	:	'তারাশঙ্কর'
শান্তি দাশগুপ্ত	:	রবীন্দ্র-প্রতীক-নাট্য
মৃণাল ভদ্র	:	সার্ত্রের মানবতাবাদ
অশোক মুস্তাফি	:	নারীমুক্তি প্রসঙ্গে
অধীর চক্রবর্তী	:	প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা
বিশ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায়	:	ভারতের শ্রমিক আন্দোলন
রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত	:	'পাকাধানের গান'
বহ্নিকুমারী চক্রবর্তী	:	বাংলা গাথা-কাব্য

রূপের আলোকে কবি-সংগীত

প্রসন্নময় লাহিড়ী

বাঙ্‌লার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান ; —বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। দেবতার বেদি-মণ্ডপে অথবা রাজার সভামণ্ডপে গীত প্রাচীন গানগুলি ভাবাদর্শ এবং রূপাদর্শের দুরূহ বিচার-পরীক্ষায় নীত হত। একদিকে যেমন দেবতার নৈবেদ্য সাজাতে আধ্যাত্মিক অন্তর-নিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল, অন্যদিকে তেমনি সূক্ষ্ম-রুচি রাজা-অমাত্যের মনোরঞ্জন করতে উচ্চাঙ্গ রূপ-শিল্প-প্রতিভার প্রমাণ দিতে হত। এই দুই-এ মিলে পুরোনো কালের কাব্যকবিতা কবিচিত্ত-শৈথিল্যের কোন অপরাধ সহ্য করে নি। কিন্তু দেব-মণ্ডপ অথবা সভা-মণ্ডপের আশ্রয় কবিচিত্ত থেকে যেদিন অপগত হয়ে গেল, রুচি-শাসনের প্রভাব যেদিন আর কবির ভাব-নিষ্ঠাকে সংযত করতে পারলো না, সম্ভ্রম-শীর্ণ মানব-কথার নিরুদ্ধ প্রবাহকে অবারিত করে দিয়ে স্বৈর রুচির স্বেচ্ছাপটে মনের অনুরক্ত ও অনুচ্চার্য প্রণয়-বেদন সেদিন মাথা তুলেছে। প্রেমের বহুবিচিত্র রস-রহস্য যখন দীক্ষিত চিত্তের অনুভব-ভূমি ত্যাগ ক'রে মুচি, ময়রা, বৈরাগী, বণিক, ফিরিঙ্গি, পাটুনী ইত্যাদি সাধারণ মানুষের কামনা-কল্পনাকে আশ্রয় করল, তখন রচনার মধ্যে গাঢ় উপলব্ধির নিষ্ঠাটুকু আর রইল না। আলোচ্য পর্বের কবিরা, সংস্কার-বশেই হোক, অথবা প্রেমের সুলভ নিদর্শন-প্রত্যাশাতেই হোক, বৈষ্ণব পদাবলীর পরকীয়া প্রণয়কথা এবং শাক্ত গীতির বাৎসল্য-কথাকে আপন রচনার বিষয়বস্তু করে নিলেন। এর সঙ্গে মিশলো কবিদের আপন আপন জীবন ভাবনার অদীক্ষিত দৃষ্টি। এ তো গেল কবিদের মনোভূমির কথা। এছাড়াও আছে, যুগ-প্রত্যাশা ; অর্থাৎ সেকালের পাঠক অথবা শ্রোতা আপন তৃপ্তির প্রয়োজনে কোন প্রকার কাব্যভাবুকতা প্রত্যাশা করেছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"ইংরেজের নূতন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং

সেই হঠাৎ-রাজার সভার উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান।" (লোকসাহিত্য-রবীন্দ্রনাথ।) সেখানে উদীয়মান বণিক-চেতনা কর্মক্লান্ত সন্ধ্যায় বৈঠকে বসে দুদণ্ড আমোদের উত্তেজনা চায়, সেখানে সাহিত্যরস অতিরিক্ত বলেই বোধ হবে।

আসরের চাহিদা মাফিক লঘু আমোদের উত্তেজনা সৃষ্টিকল্পে কবিয়াল তাঁর রচনার প্রকাশ ভঙ্গিতে কৃত্রিম এক প্রতিপক্ষতা আমদানী করলেন। তর্কের লড়াই দিয়ে আসর-জমানো একটা স্নায়বিক তাপ সহজেই সঞ্চার করা গেল। কবিতা তখন কথায় কলা এবং ভাব বিসর্জন দিয়ে কথার কৌশল ও চাতুর্যে নির্ভরশীল হল। এরই উদ্দেশ্যে কবিগণ রচনার একটা বিশেষ পদ্ধতি মধ্যে পাকাপাকিভাবে গড়ে উঠল। "গীতাবলী বা নিধুবাবুর (৺রামনিধি গুপ্তের) যাবতীয় গীত সংগ্রহ" (প্রকাশক—শ্রীবৈষ্ণব চরণ বসাক। ১৩০৩ সাল।) গ্রন্থে শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত রচিত প্রবন্ধ থেকে কবিগীতি রচনার নিয়ম সংক্রান্ত কিছুটা অংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করলুম,—

"দাঁড়াকবির প্রথমে চিতান ও পরচিতান, তৎপর ফুকা, ফুকার পর মেল্‌তা, মেল্‌তার পর মহড়া, পরে শওয়ারি থাকিবে। শওয়ারির পর খাদ, পুনর্বার ফুকা, মেলতা ও মেলতার পর অন্তরা রচনার নিয়ম। অন্তরা সমাপনে দ্বিতীয় চিতেন। পূর্বতন কবিগান রচয়িতাদিগের অন্তরা রচনার যে রীতি ছিল, এক্ষণে তাহা উঠিয়া গিয়াছে। ফুকার পরেই গীত সমাপন হয়। হাফ্ আখ্‌ড়াই গান রচনার নিয়মও অবিকল ঐরূপ। কেবল ফুকায় পর একটি ডবল ফুকা রচনা করিতে হয়। আর হাফ্ আখ্‌ড়াই গানে অন্তরা থাকে না। কবিগীত রচয়িতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মহড়া হইতে রচনা আরম্ভ করেন, কেহ বা চিতেন হইতে রচনা করিয়া থাকেন; কিন্তু চিতেন হইতে রচনা করিলে সহজে রচনা করিতে পারা যায়। আসরে প্রত্যুত্তর প্রদানকালে অতি অল্প সময়ের মধ্যে গান রচনা করা আবশ্যক। সুতরাং চিতেন হইতে রচনা আরম্ভ করিতে হয়। যে অক্ষরে চিতেনের শেষ হইবে, পরচিতেনের মিলও তাহার সমানাক্ষরে থাকিবে। ফুকার প্রথম ও শেষ পদে সমানাক্ষরে মিল। মেলতার শেষপদের সহিত মহড়ার শেষপদে সমানাক্ষরে মিল। খাদেও ঐরূপ মিল থাকিবে। যাদের পর যে দ্বিতীয় ফুকা ও মেল্‌তা থাকে, তাহার ও মহড়ার মিলের সহিত সমানাক্ষরে মিল। কেহ কেহ সখের দলের হাফ্ আখড়াই এবং দাঁড়াকবির ভাব গোপন

রাখিবার জন্য চাপাগীত রচনা করেন। এইরূপ চাপাগীত রচনার উদ্দেশ্য,—উত্তর রচনায় কালবিলম্ব ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। যদিও প্রথমত ভাব গোপন থাকে, তথাপি গানের শেষভাগে ভাবপ্রকাশ করিতে হয়। নচেৎ রচনা দোষশূন্য হয় না। যে বিষয় লইয়া গান রচনা করিবে, রচনার আরম্ভ হইতেই সে বিষয় প্রকাশিত থাকা আবশ্যক, নতুবা প্রত্যুত্তর—গান সুললিত হয় না, আর শ্রোতৃবর্গও সহজে ভাববোধ করিতে পারেন না।"

কবিগান এবং তার বিবিধ বিভাগের গঠনগত বিষয় আমাদের আলোচ্য বস্তু নয়। তথাপি শব্দবিন্যাসের, ছন্দ-গঠনের, মোটামুটিভাবে সমগ্র প্রকাশভঙ্গি মধ্যে কি পরিমাণ কৃত্রিম বিধি-নিষিধের নিয়ম কবিগান রচনায় ছিল, উদ্ধৃতাংশ থেকে সেটুকু একবার স্মরণ করে নিলুম। ভাষার কারিগরি এবং কথার কারসাজি দিয়ে গড়া এই কৌশলী কবিতায় কেবল উভয়পক্ষীয় দ্বন্দ্বে আঘাত প্রত্যাঘাতের আসর-গড়া আদর্শই একমাত্র, কাব্যের উচ্চভাব ও সৌন্দর্যের গভীর রস-প্রত্যাশা এখানে বৃথা। রবীন্দ্রনাথ চমৎকার একটি উপমার সাহায্যে এ কাব্য-কোলাহলের ভাবটি ব্যক্ত করেছেন,—"সরস্বতীর বীণার তারেও ঝন্‌ঝন্ শব্দে ঝংকার দিতে হইবে আবার বীণার কাষ্ঠদণ্ড লইয়াও ঠক্ ঠক্ শব্দ লাঠি খেলিতে হইবে।" (লোকসাহিত্য।)

এ উত্তেজিত আসরের সশব্দ বাহবা ধ্বনির কলহ কোলাহলে কাব্যের ললিত মাধুর্য দুর্লভ এ প্রসঙ্গে একটি দুটি নমুনা নেওয়া যাক,—

(১) একে আমি শ্যাম কলঙ্কী আছি কুলে।
এসে যমুনার কূলে, ভাবি কূলে কূলে,
যাই কোন্ কূলে, হাসে পাছে শত্রুকুলে,
আমি কুলের বৌ, ভাসি অকূলে,
তুমি হ'য়ে অনুকূল, রাখ রাখ কূল
নইলে দুকুল ডুবে যায় অকূলে ॥

(কলঙ্ক ভঞ্জন/পরাণ চন্দ্র সিংহ।)

(২) গেল গেল কুল কুল, যাক্ কুল—
তাহে নই আকুল।
লয়েছি যাহার কূল, সে আমার প্রতিকূল ॥
যদি কুলকুণ্ডলিণী অনুকূলা হন আমায়

অকূলের কূল পাব পুনরায় ॥
এখন ব্যাকুল হয়ে কি দুকূল হারাব সই।
তাহে বিপক্ষ হাসিবে যত রিপুচয় ॥

(কবিসংগীত প্রবন্ধ থেকে/লোকসাহিত্য/রবীন্দ্র নাথ।)

এখানে কুল শব্দের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি আছে, কোন কাব্যসৌন্দর্য নেই। অথচ আসর-গানের সশব্দ কলরবে সমস্ত শ্রোতৃচিত্ত উত্তেজনা-বিবশ। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মূল্যবান উক্তি স্মরণ করি। "একে বাঙলা শব্দের কোন ভার নাই, ইংরেজি প্রথামত তাহাতে অ্যাক্সেণ্ট নাই, সংস্কৃত প্রথামত তাহাতে হ্রস্ব-দীর্ঘ রক্ষা হয় না, তাহাতে আবার সমালোচ্য কবির গানে সুনিয়মিত ছন্দের বন্ধন না থাকতে এই সমস্ত অযত্নকৃত রচনাগুলিকে শ্রোতার মনে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্যে ঘন ঘন অনুপ্রাসের বিশেষ আবশ্যক হয়। সোজা দেওয়ালের উপর লতা উঠাইতে গেলে যেমন মাঝে মাঝে পেরেক মারিয়া তাহার অবলম্বন সৃষ্টি করিয়া যাইতে হয়, এই অনুপ্রাসগুলিও সেইরূপ ঘন ঘন শ্রোতাদের মনে পেরেক মারিয়া যাওয়া; অনেক নির্জীব রচনাও এই কৃত্রিম উপায়ে অতি দ্রুতবেগে মনোযোগ আচ্ছন্ন করিয়া বসে।" (লোক সাহিত্য),—

আর রাধার অভিমান কে সবে, বিনে কেশবে
হরি পরিহরি একি অন্যে সম্ভবে ॥
আমি যে সই গৌরবিনী, তারি গৌরবে।

(সখীসংবাদ/হরুঠাকুর।)

লক্ষণীয়, দৃষ্টান্তের শেষ পংক্তিটি বৈষ্ণব পদাবলী থেকে ধার-করা। বৈষ্ণব কবি গেয়েছেন, "তোমার গরবে গরবিণী হাম, রূপসী তোমার রূপে।" ছত্রের মধ্যে প্রসঙ্গ ও প্রকাশগত যে ভাবগৌরব এবং রূপসৌন্দর্যের আভাস তৎসহ একনিষ্ঠ প্রেমের করুণ আর্তি, আমাদের আলোচ্য অংশে তার বিন্দু-বিসর্গও নেই। যমকের সুলভ চপলতা ও চাতুর্য শেষ পংক্তির কবিভাবনাটিকে বিকশিত হতে দেয় নি। দৃষ্টান্তের শেষ পংক্তি এবং বৈষ্ণব পদছত্রটির বাক্যার্থ এক, কিন্তু বক্তব্যটি পৃথক প্রেরণা ও উপস্থাপনায় কত ভিন্ন। এ জাতীয় কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিয়ে আরও কিছু পরীক্ষা যাক,—

এত বড় জ্বালা হল শুন গো ললিতে,
'রাই' বলে রাই করিছে রোদন

ঐ বসে কৃষ্ণের বামেতে ॥
এত সুখে শ্রীমতীকে মনের দুঃখ
কে দিল বুঝিতে নারি।

(প্রেমবৈচিত্ত্য/বলহরি দাস।)

এই একই ভাবের পদ বৈষ্ণব কাব্যে পাই,—"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।" অপূর্ব সংযমে বৈষ্ণব কবি প্রেমিক-প্রেমিকার যে মিলিত প্রেমাতি প্রকাশ করলেন, কবির কথায় তাকে বলা যায়,—"দীপশিখা সম কাঁপে ভীরু ভালবাসা।" অথচ আলোচ্য দৃষ্টান্তে অজস্র কথার বাচালতায় রাধার প্রেমবেদনা শ্রোতৃচিত্তে বিজ্ঞাপিত হতে পেল না। প্রেমের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় দেবার কালেও বৈষ্ণব কবি এ ভাবাবেশের দুর্জ্ঞেয়তা ও রহস্যটুকু আপন শিল্প সংযমের দ্বারা রক্ষা করেছেন, শ্রোতাকেও এ বিষয়ে ভাব ভাবনার অবকাশ দিয়েছেন। কবিওয়ালার গান সেদিক থেকে একতরফা, এর শ্রোতা কেবল পুনর্সৃষ্টি করার সুযোগ বা সময় তার নেই। কবিগানে তাই বাক্যার্থ বড়, ভাব-তাৎপর্য গৌণ বিষয়।

তোমার কমলিনী, কাল মেঘ দেখে
কৃষ্ণ বলে ধরতে যায়,
... ...
দেখে বিদ্যুলতা কাল মেঘের সঙ্গে, কালাচাঁদ হে—
বলে পীতবসন, ওই সখি শ্যাম—শ্রীঅঙ্গে ;
যত গরজে জলধর, রাই বলে ধর গো ধর,
আমার বংশীধর, মোহন মুরলী বাজায়।

(বলন্ত/কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য।)

এখানে ভ্রমাত্মক কোন অলংকার (ভ্রান্তিমান অথবা সন্দেহ) নেই। রাধার উন্মাদ দশায় এ বাস্তবিক ভ্রম। গদাধর মুখোপাধ্যায়ের "মাথুর" অধ্যায়ে অনুরূপ একটি পদ আছে। উভয়ক্ষেত্রেই এই উন্মাদ-দশার বিবরণ বিস্তৃত। সখীর কৌতূহল, উদ্বেগ, আশঙ্কা, সান্ত্বনা ইত্যাদি অভিধা কথার অতিরিক্ত সমাবেশের ফলে প্রকাশ ভঙ্গির সাঙ্কেতিক সূক্ষ্মতা নষ্ট হয়েছে। অথচ, নায়িকার এই একই বিরহ মূর্তি অঙ্কন করেছেন চণ্ডীদাস : "রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা। ...সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে, না চলে নয়ান তারা।...ময়ুর-ময়ূরী কণ্ঠ করে

নিরীক্ষণে।"—এর দ্বারা নায়িকার ভাবোন্মাদনার যে সকরুণ রূপ সৃষ্টি করেছেন কবি, তার আর দ্বিতীয় মেলে না। রাধাচিত্তের সবটুকু কাতরতাই কবির সংযত প্রকাশের ব্যঞ্জনা বহন করছে, "সূক্ষ্ম" অলংকারের রূপ-সৌন্দর্যও অবারিত, তবু কবি রাধাহৃদয়ের রহস্য-বিস্ময়কে সূচনা-ছত্রের মধ্যে কিছুটা দুর্জ্ঞেয় রেখেছেন। শ্রোতৃহৃদয়ের অনুভব-ক্ষমতা এইভাবেই অবকাশ পায়।

আরও একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক।—

তুমি কার প্রাণ করি দেহ শূন্য এলে বাহিরে।
হেরে যেরূপো, বাসনা করে ॥
করি পরিত্যাগ, আপনো প্রাণ, সেইখানে রাখি তোমারে।
পদার্পণে যে কমলে পূর্ণিতো করিলে বসুমতী।
জ্ঞানো হয় প্রাণ্ তেমনি।
নয়ন কটাক্ষে কুমুদো প্রকাশ পাইতেছে তব অম্বরে।

(সখীসংবাদ/হরু ঠাকুর।)

প্রিয়তমের পদার্পণে বসুমতীতে কমল ফুটে উঠছে। হরু ঠাকুর এ ছবি আহরণ করেছেন বিদ্যাপতি থেকে। বিদ্যাপতি বলেছেন,—

যাহাঁ যাহাঁ অরুণ চরণে চল চলই।
তাহাঁ তাহাঁ থল-কমল-দল খলই ॥

আবার বিদ্যাপতির এ রূপাংশের ভাব কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের রূপ বর্ণনা থেকে নেওয়া, * রবীন্দ্রনাথ যার অনুবাদ সূত্রে বলেছেন,—

অশোক শাখা উঠ্‌তো ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে।

বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ বিদ্যাপতি-বর্ণিত দেহরূপ—শোভাতে প্রেমের আবেশ সৃষ্টি করলেন—

যাঁহা পহুঁ অরুণচরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত ॥

---

* রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেসরশ্চাত্র কান্তঃ প্রত্যাসন্নৌ কুরুবকবৃতের্মাধবী-
মণ্ডপস্য।
একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদন-মদিরাং
দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ ॥
(মেঘদূত/উত্তরমেঘ/১৭ শ্লোক।)

কবিওয়ালা বলেছেন, নয়ন-কটাক্ষে কুমুদ ফুটে ওঠে। গোবিন্দদাস বলেছেন,—

যে দরপণে পহুঁ নিজমুখ চাহ।
মঝু অঙ্গজ্যোতি হোই তথি-মাহ॥

অনুকরণই যদি করতে হয়, তবে পূর্বসূরীদের একাধিক প্রকাশভঙ্গির শ্রেষ্ঠ যেটি, তাকেই বেছে নেওয়া উচিৎ ছিল। বৈষ্ণব কবি কেবল ভাবের ব্যাপারে নয়, রূপের ক্ষেত্রেও অন্তরের এক গাঢ় অনুভূতিকে জাগিয়ে দিয়েছেন। পূর্বগামীদের এমন উৎকৃষ্ট নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও কবিওয়ালা, রূপাঙ্কনে যুগ-চাহিদা তৃপ্তির পথ ধরলেন। তাছাড়া, কবিগানের মধ্যে কাব্যগন্ধহীন এমন সব আটপৌরে বাচালতার দৌরাত্ম্য দেখা যায়, যার দ্বারা ক্বচিৎ দু একটি ছত্রের মনোহারিতা গানের সামগ্রিক আবেদনে নিঃশেষিত হতে বাধ্য।

কবিওয়ালার গানের বিষয়বস্তুতে আমরা তিনটি চরিত্র মোটামুটি পাই। নায়ক, নায়িকা এবং সখী। কলঙ্ক ও ছলনা,—এ দুটিই কবিগানের বর্ণনীয় বিষয়। সমাজে নিষিদ্ধ পরকীয়া প্রেমে গোপনীয়তা রক্ষাতেই তার ভাব-পবিত্রতা বাঁচে, বৈষ্ণব কাব্যে এ ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করেছি। কবিগানে নায়ক, নায়িকা অথবা দূতীর প্রগল্‌ভতায় সে প্রেমের সৌন্দর্য ও গভীরতা অনেক নিচে নেমে গেছে। দৃষ্টান্ত থেকে সে বিষয় বিচার করার আগে আমরা একটা ব্যাপার প্রথমেই স্বচ্ছ করে নিই। তা হল, কবিওয়ালার দৃষ্টিতে প্রেমিক পুরুষ এবং প্রেমিকা নারীর স্বরূপ-লক্ষণ। প্রেমিক-পুরুষ সম্বন্ধে কবিওয়ালার ধারণা :

কমল ফুটায় হে প্রভাকর আদরে,
পতি তার দিবাকর,
জেনেও ত মধুকর
ভুলেও ত্যজে না পদ্মেরে।

(বিরহ/ঠাকুরদাস চক্রবর্তী।)

প্রেমিকা-নায়িকা সম্বন্ধে কবিওয়ালার ধারণা হল,—

নলিনী তপনে তেজিয়ে
বনের পতঙ্গ, সে ভৃঙ্গ, তারে
মধু বিতরয়।

(সখী সংবাদ/রাম বসু।)

পরকীয়া প্রণয়কথা যে বৈষ্ণব কাব্যে অবারিত ধারায় বিচিত্র হৃদয়-রহস্যের ছবি এঁকেছে, সেখানেও পর্যন্ত বৈষ্ণব-কবি আপন সংযত কল্পনায় নারী-পুরুষের সে সম্পর্ককে অপরাধ হিসেবে অভিযুক্ত করতে অনিচ্ছুক। বরং সে প্রেমের সার্থক পরিণতির উদ্দেশ্যেই কবিমনের অকুণ্ঠ সমবেদনা প্রতিক্ষেত্রেই প্রকাশিত :

যাহে লাগি চলইতে চরণে বেঢ়ল ফণী
মণি-মঞ্জির করি মানি।
গোবিন্দদাস ভণ কৈছন সো দিন
বিছুরব ইহ অনুমানি ॥

(মাথুর, গোবিন্দদাস।)

সখির মতে সর্বদাই আনুকূল্য দিয়েছেন কবি। এ প্রেমের চরিতার্থতার কথা ভেবে কবিমন আকুল। আসলে, বৈষ্ণব কবির এ মনোভঙ্গি পরকীয়া তত্ত্বের এক আধ্যাত্মিক আদর্শবাদ থেকে জন্ম নিয়েছিল। শিল্পের সঙ্গে ভক্তির মিলন ঘটেছিল বলেই বৈষ্ণব ভাবাকাশে গড়া রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বাদ লোকায়ত স্থূলতার মলিন স্পর্শ থেকে মুক্ত। প্রেম আর এ বৈষ্ণব দৃষ্টিতে পণ্যের মত সকলের পক্ষেই সুলভ হয়ে রইল না, একটা মহৎ হৃদয়প্রেরণা রূপে জীবনের নিভৃত সংকল্পের মধ্যে স্থান পেল। কবিওয়ালার গানে বৈষ্ণবের সেই আদর্শ প্রেরণা অনুপস্থিত। রাধকৃষ্ণের প্রণয় ঘটনার বস্তুগত খবরটিকে সর্বস্ব করে কবিওয়ালা আপন বাসনানুকূল ও পরিবেশ যোগ্য ভাব রচনা করেছেন, বৈষ্ণবীয় মনোভঙ্গিটিকে আপন করতে পারেন নি। কবিওয়ালা মুক্তকণ্ঠে গোটা আসর জানিয়ে বলেছেন,—

উত্তমেরে ত্যজ্য কোরে অধমে যতন।
নারী বারি, দুই জনারি,
নীচ পথে গমন ॥
তার প্রমাণ বলি প্রাণ,……

(সখী সংবাদ, রামবসু।)

রাধাকৃষ্ণের নাম নিয়ে এইরকম সরব প্রগল্‌ভতার সঙ্গে কবিয়াল প্রেমের ব্যাভিচার অংশটিকে অকপট করেছেন। তত্ত্বের অনুভাবনায় ও উন্নত হৃদয়-দৃষ্টির আলোকে যে প্রেম একদা সমাজ-বহির্ভূত হয়েও সমাজ-স্বীকৃতি পেয়েছিল, কবিগানের অসংযত উচ্ছ্বসের মধ্যে তার স্তরচ্যুতি ঘটেছে,—

অতি নীচ যদি হয়, নিত্য ধন দেয় যেচে তারে সঁপে যৌবন।
তাহে কুৎসিতো কুজনা, নাহি বিবেচনা, স্বকার্য করে সাধন॥
কেবল অর্থেরই লোভো,
মৌখিকো সবো,
কহে যে প্রেমো কখন।
পীরিতি রসেরো, রসিকো নারী, সহস্রে মেলে একজন॥

(সখীসংবাদ, হরু ঠাকুর।)

কবি নিজেই বলে দিলেন, প্রকৃত প্রেমরসের রসিক সহস্রে একজনই মেলে। বাদ বাকি সকলের পক্ষেই প্রেম হল, নরনারীর দেহসম্ভোগের ভালো নাম। প্রেম ভাবাকাশে পণ্যের মত ক্রয় বিক্রয়ের বস্তু, গভীর হৃদয়বত্তার স্বীকৃতি যেখানে নেই, সেখানে রূপে রেখায় প্রেমকথার যে প্রকাশভঙ্গি, তার মধ্যে শরীরী লুব্ধতার চটুল ইঙ্গিত থাকতে বাধ্য।

পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।
শুন লো সজনি বলি তোমাকে॥
শুনেছ কখনো, জ্বলন্ত আগুনো, বসনে বন্ধনো, করিয়া রাখে।
প্রতি পদের চাঁদো, হরিষে বিষাদো, নয়নে না দেখে, উদয়ো লেখে।
দ্বিতীয়ের চাঁদো, কিঞ্চিতো প্রকাশো, তৃতীয়ের চাঁদো জগতো দেখে॥

(সখী সংবাদ, হরু ঠাকুর।)

এখানে পরপর দুটি অলংকারে কবিয়াল প্রেমের লক্ষণ বুঝিয়েছেন। প্রথমটি অতিশয়োক্তি অলংকার, অথচ ভাষাগত প্রকাশধ্বনিতে প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষার আভাস দেয়। "জ্বলন্ত আগুন" এখানে বিকশিত যৌবন। দেহের স্থূল লুব্ধতার প্রতি একটু ইঙ্গিত। জ্বলন্ত আগুন বসনে গোপন করার অসম্ভব প্রত্যাশার মত নবোদ্ভিন্ন দেহ যৌবন অগোচর রাখার ইচ্ছা ব্যর্থ। এখানে লক্ষ্মণীয়, "বসন" শব্দটি ব্যবহারের দ্বারা কবি নারী শরীরের মাংসল রূপের প্রতিই সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করেছেন, অথচ একই সঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখতে হচ্ছে, কবির বক্তব্য বিষয় হল হৃদ্‌গত "পীরিতি" বা প্রেম। মজার কথা হৃদয়ভাবকে প্রকাশের কৌশলে কবি কি সূক্ষ্মভাবে এক লুব্ধ দেহসংবাদে পরিণত করলেন! এ রূপ বিশ্লেষণ আরও বিশদ করলে দেখা যাবে, 'জ্বলন্ত আগুন নায়িকার লোভন দেহশোভার তাৎপর্যকে অতিক্রম করে নায়ক চিত্তের দুর্বার

কামতাপকে সংকেত করে দিয়েছে দ্বিতীয় অলংকারে হৃদয়গত "পীরিতি"র ভাব অধিকতর স্পষ্ট। প্রতিপদ থেকে সুরু করে তৃতীয়া পর্যন্ত চন্দ্রকলার ক্রমিক বৃদ্ধি যেমন দৃষ্টির অগোচর থেকে গোচরে আসে, নায়ক-নায়িকার প্রেমও তেমনি হৃদয়ের অদৃশ্য অন্তর থেকে প্রকাশ্য পল্লব শোভায় রূপ নেয়। গোচর অথবা গোপন, য-ই হোক না কেন, তার অস্তিত্ব যে ঐ মৃদুবৃদ্ধি চন্দ্রকলার মতই সত্য, কবি সে ইঙ্গিতটি উপমানের দ্বারা সার্থকভাবে দিতে পেরেছেন।

কবিওয়ালার দৃষ্টিতে প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়-দর্শন করা গেল। নায়ক-নায়িকার এ জাতীয় চিত্তস্তরকে মানদণ্ড ক'রে প্রেমের যে রূপচ্ছবি রচিত, সেখানে নিষ্ঠার পরিবর্তে ছলনা এবং ভাব-শুচিতার পরিবর্তে কলঙ্কের কথাই বড় হতে বাধ্য। এখন আমরা উদ্ধৃতি যোগে তারই বিশদ আলোচনা করব।

কবিসংগীতে বিশুদ্ধ দেহবর্ণনার অংশ খুব কম। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শরীরী রূপ-কথার সঙ্গে হৃদয়ভাবকে প্রকাশিত ক'রে দেখিয়েছেন কবি। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের দেহরূপ অজস্র অগণিত ভঙ্গিতে উপস্থাপিত ক'রে বৈষ্ণব-পদকর্তা তাঁর বর্ণনীয় পাত্রপাত্রীকে প্রথমে শোভাসৌন্দর্যের এক অপরূপ অনন্যতা দিয়েছেন। আর সেই অতুলনীয় মানুষটির প্রেমবৈচিত্র্য সেই কারণে (কতকাংশে) বারোয়ারী রুচির মলিন স্পর্শ থেকে মুক্ত হয়ে ভাবের এক অসামান্য লোকে উত্তীর্ণ। কবিওয়ালার প্রেমকথায়- দেহশোভা বর্ণনার ধৈর্য নেই। মুখর'কলঙ্ক-কথা এবং হৃদয়-ছলনার অভিযোগ দিয়ে কবিয়াল সরাসরি তাঁর বর্ণিতব্য চরিত্রগুলিকে আসরে এনে হাজির করেছেন। প্রেম যেখানে হৃদয়ের পণ নয়, সদাগরি পণ্যের মত যার সুলভ কেনাবেচা চলে, সেখানে দেহকে ঘিরে উচ্চাঙ্গের কোন রূপ-কল্পনা না থাকাই স্বাভাবিক। কাম-তর্পণের উপায় হিসেবে শরীরের লুব্ধতাটুকুই সেখানে যথেষ্ট, তার বিলম্বিত রূপ-উন্মোচনের দ্বারা সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা অকারণ-কালবিলম্বের হেতু মাত্র। অবশ্য দু এক ক্ষেত্রে এর কিঞ্চিত ব্যতিক্রমও দেখা যায়,—

ও কি অপরূপ দেখি শুনি।
পৃষ্ঠেতে লম্বিত ধরণী সম্বিত কিংবা ফণী কিংবা বেণী॥
অলক বেষ্টিত কনকে রচিত সীঁথি কিম্বা সৌদামিণী।
তার অধোদেশে অন্ধকার নাশে সিন্দূর কি দিনমণি॥
খঞ্জন যুগল নয়ন চঞ্চল কি সফরী অনুমানি।

কিবা বিধুবর কি মুখ সুন্দর কিছুই না জানি॥

(সখী সংবাদ, লালু নন্দলাল।)

পূর্ণাঙ্গ দেহবর্ণনার থেকে আমরা অংশমাত্র সংগ্রহ করেছি। সন্দেহ অলংকারে উপমেয় উপমানে তুল্য সংশয় থাকায় রূপশোভার পরিধি বিস্তার-লাভ করেছে। তাছাড়া, রূপবর্ণনার জন্যে আহৃত উপমানগুলি একান্তভাবেই প্রথাবদ্ধ।

সই, সজল নবজলদ বরণ ধরি নটবর বেশ।
চরণ উপরে থুয়েছে চরণ
এই কি রসিক শেষ॥
চন্দ্র চমকে চলিতে চরণ নখরের ছটায়।
আমার হেন লয় মনো, জীবনো যৌবনো
সঁপিব ও রাঙ্গা পায়॥

(সখী সংবাদ, হরু ঠাকুর।)

পদের চতুর্থ ছত্রে অনুপ্রাসের দ্বারা কবি গতিশীল চরণের চকিত রূপচ্ছটার আভাস দিয়েছেন। এছাড়াও অতিশয়োক্তি অলংকারে পদনখের রূপমাধুরী চন্দ্রের উপমানে পূর্ণ বিকশিত। আসলে শব্দালঙ্কার অনুপ্রাসের সহায়তায় অর্থালঙ্কার অতিশয়োক্তি আপন রূপ প্রকাশের মধ্যে অতিরিক্ত একটি আঘাত শক্তি পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা কবি ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের একটি রূপবর্ণনার অংশ উদ্ধৃত করি।

মুখপদ্মে নীলপদ্ম আঁখি।
আঁখিপদ্মে বহে জল, মুখ শতদল,
ভাসিছে দেখ গো সখী।
আমরা এ পথে আসি যাই, এমন রূপ দেখি নাই;
কমলের জলে কমল ভেসে যায়।
তোরা দেখে যা গো সখী হল একি দায়
তোরা দেখ ওই প্রাণসই, এ ত নয় অনল
শ্রীমুখ-কমল শুখাল বল করি কি উপায়।

(সখী সংবাদ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।)

পঞ্চম ছত্রের আলংকারিক প্রকাশভঙ্গিটি দৃপ্ত ও মনোহর। "কমলের জলে কমল ভেসে যায়।" পূর্বগামী ছত্রগুলির অলংকার বিবৃতি যেন উক্ত

ছত্রটিতে এসে নির্যাসের সংহত রূপ-বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী (শেষ) তিনটি ছত্র সখীর প্রগল্‌ভ উদ্বেগ-কথায় রূপ-কে তরল করে দিয়েছে। কবিওয়ালাদের আলংকারিক রচনার সাধারণ ত্রুটিই এই। অভিধা-কথার প্রগল্‌ভতা রূপের ঘনীভূত ব্যঞ্জনাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তরল করে আর তার ফলেই রূপের ছটা-ব্যঞ্জনা আমাদের আটপৌরে জীবনের অতি সন্নিহিত হয়ে লৌকিক আকার পায়।

এবার আমরা দেহরূপ-বর্ণনার একম কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখবো, যার মধ্যে অলংকার নায়ক-নায়িকার তৎকালীন মনোভাবটিও ঈষৎ ব্যঞ্জিত,—

রাই, তোমার ঐ চরণ তলে
দেখ কালো মাণিক কেমন জ্বলে
সূর্যকান্ত মণির কোলে
যেমন নীলকান্ত।
রক্ত শতদলে
ভ্রমর যেমন খেলে
পায় তেমন মাণিক জ্বলে এইক্ষণে।

(সখী সংবাদ, উদয় চাঁদ।)

রাই এর চরণতলে অনুগত কৃষ্ণের শোভা বর্ণনা করতে কবি দুটি দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন। এক, সূর্যকান্ত মণির কোলে নীলকান্তমণি। দুই, রক্ত শতদলে লীলাচপল ভ্রমর। কিন্তু লক্ষণীয় অলংকারের রূপগোচর শক্তিকে গৌণ করে সখির সাধারণ উক্তি অনেক বেশি আত্মঘোষণা করেছে। তাছাড়া, শেষ ছত্রটি পুনরুক্তি-দোষদুষ্ট। আসলে, গানের সুরে, তালে, কণ্ঠস্বরের কৌশলে মীড় গমকের লীলায় এ রূপের প্রকাশ-ত্রুটিগুলি যত সহজে পূরণ হয় কবিতার বিশুদ্ধ অনুভব-ভূমিতে এলে তাদের বিচার করলে শোভার তারতম্য ঘটবেই। সংগীতের কারসাজিতেই এ সব অযত্নে গড়া অসংযত ভাব-উচ্ছ্বাসগুলি উপস্থিতমত একটা রমণীয়তা পেয়েছিল। সুর থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার ফলে (হয়ত) অস্ত্রহীন সৈনিকের অসার আস্ফালনের মত এ রচনাগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লক্ষ্যভেদ করতে পারে নি। আর একটি উদ্ধৃতি—

আমার নাগরো, গিয়েছিলেন কারো
কলঙ্ক সাগর মথিতে।

ফুরায়ে মন্থনো, এনেছেন নিশানো,
আঁখির অঞ্জনো গলাতে ॥

(সখী সংবাদ/রাসু-নৃসিংহ।)

পৌরাণিক কাহিনীকে বিপর্যস্ত করে নায়িকার খণ্ডিতা রূপ নির্মাণে কবি আপন বাসনানুকূল অলংকার-চিত্র গঠন করেছেন। নায়িকার মৃদু অভিযোগের আড়ালে নায়কের রূপলক্ষণ প্রকাশিত। এখানে "অঞ্জন" হলাহলের ব্যঞ্জনায় রচিত। সমুদ্র মন্থনের প্রতিচ্ছায়ায় রাধাকথিত কৃষ্ণের এ কলঙ্ক-কথা রচনা করা হয়েছে। উপমার সংকেত শক্তি গভীরতা লাভ করতে পেরেছে, যেহেতু অভিধা-বাক্যের চপলতা এখানে নেই।

যাহারো লাগিয়ে নিশি করিলে প্রভাত।
ওই সই সেই প্রাণোনাথা
প্রভাতের অরুণ সহ উদয় আসি
বঁধুর হোয়েছে অরুণো আঁখি নিশি জাগরণেতে।

(সখী সংবাদ, হরু ঠাকুর।)

এখানেও নায়কের প্রতি খণ্ডিতার দৃষ্টি প্রকাশিত। সাধারণ বাক্যের বাহুল্যে অলংকারের পরোক্ষ রূপদ্যোতনা শক্তি জাগে নি। নইলে, উদয় সূর্যের রক্তাভার সঙ্গে সদ্য প্রত্যাগত "পরঘরিয়া" নায়কের নিশিজাগরণ ক্লান্ত রক্ত আঁখির উপমেয়—উপমানগত সাদৃশ্য-আয়োজনগুলি প্রস্তুতই ছিল, কেবল কথাকে সংযত করে তার সংকেতময়তা বাড়াতে পারলেই এটি অপূর্ব অলংকারে পরিণত হতে পারতো। কিন্তু, ব্যঞ্জনায় কলঙ্ক-কীর্তিকে রূপাঙ্কিত করা নয়, আসরের মাঝখানে রটনা করার উদ্দেশ্য কবিওয়ালার, তাই বক্তব্যটি পরিপূর্ণ সম্ভাবনা সত্ত্বেও অলংকার হয়ে ওঠে নি। বৈষ্ণব পদাবলীতে এই একই কলঙ্ক-কীর্তি যে প্রকাশ-সংযমের বলে অনন্য এক রূপশোভার হেতু হয়ে উঠেছিল, কবিয়ালের বিশিষ্ট প্রকাশরীতিহ স্পর্শে তাই শোভাবর্জিত পরিবাদ-রটনার প্রমাণ মাত্র। এখানে "অরুণো আঁখি" আলংকারিক শব্দ-প্রয়োগ নয়, তা শুধু যথার্থ বাস্তবের কথা। কবিওয়ালা তাঁর আহৃত উপমেয়-উপমানকে কোথাও নিকট সাদৃশ্য পেতে দেন নি, প্রায় সর্বদাই তাদের সাদৃশ্যকে দূরবর্তী রেখেছেন। আর একটি দৃষ্টান্ত,—

বিহার ছলে কদমতলে দেখাব তোমারে,
তার চরণে চরণে ছাঁদা বঙ্কিম নয়ান

হেরি জুড়াবে পরাণ !
তার কালো অঙ্গে শোভা করে বিন্দু বিন্দু ঘাম ॥

(সখী সংবাদ, লালু নন্দলাল।)

কৃষ্ণরূপের কথা। বিদ্যাপতি রাধার বয়ঃসন্ধি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, "চপল চরণগতি লোচন পাব।" অর্থাৎ চরণের চঞ্চলতা নায়িকার নয়নে এল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যৌবনাগমে শরীরী চঞ্চলতা যে স্থানান্তরিত হয়, বিদ্যাপতি তারই মনস্তাত্ত্বিক রূপরচনা করেছিলেন। এখানে কবিওয়ালা বলেছেন, নায়কের চরণ ও নয়ন একই চপলতার ছন্দে বাঁধা। অর্থাৎ চরণের চপলতায় বাস্তব লীলা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নায়ক নয়নের চপলতায় হৃদয়ভাবের লীলা প্রকাশ করছে। প্রণয়ীর পার্থিব গতিবিধি এবং হৃদয়ের ভাবভঙ্গি একযোগেই সংকেতিত। আর একটি উদ্ধৃতি আলোচনা করি,—

হর নহি হে, আমি যুবতী।
কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি ॥
.....
হায়, শুন শম্ভু অরি, ভেবে ত্রিপুরারি
বৈরি হও না আমার !
বিচ্ছেদ এ দশা, বিগলিত কেশা,
নহে নহে এ তো জটাভার ॥
কণ্ঠে কালকূট নহে,
দেখ পোরেছি নীলরতন।
অরুণো হোলো নয়ন,
কোরে পতিবিরহে রোদন ॥
এ অঙ্গ আমারো, ধূলায় ধূসরো,
মাখি নাই মাখি নাই বিভূতি।

(সখী সংবাদ, রাম বসু।)

এখানেও পুরাণের কাহিনী-স্মৃতিকে বিপর্যস্ত ক'রে কবি আপন বাসনানুকূল রূপচিত্র রচনা করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে এরই যে পূর্বরূপ পাওয়া যায়, তা ললিত মৈথিল ছন্দের দোলায় হৃদয়ের মিনতিমাখা আবেগটিকে অপূর্ব এক কাব্যরূপ দিয়েছে। কিন্তু সমালোচ্য অংশে চলতি কথার উৎপাত এত বেশি,

যার ফলে বক্তার আবেগ-কাতর চিত্ত রূপশোভায় ঘনীভূত হয়ে ওঠে নি। দ্বিতীয় ছত্র,—"কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি" ॥ ইত্যাদি জাতীয় ছত্র কাব্যের লক্ষণবর্জিত। আর এগুলিতে অকারণে ইতস্ততঃ সন্নিবেশিত করে ভাবাবেগ প্রবাহকে বহুস্থানেই ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। হয়ত, গানের সুরে এ সব জড় ও স্থাণু শব্দগুলিতে কিছুটা দোলা সৃষ্টি করা কৃত্রিম উপায়ে সম্ভব হত, কিন্তু পাঠ্য কবিতার আলোকে বিচার করতে গেলে এদের মধ্যে কোন হিল্লোলই জাগে না। অথচ, এ জাতীয় শব্দ, বাক্যাংশ ও পূর্ণ বাক্যের অজস্র আয়োজনে কবিওয়ালা তাঁর প্রকাশিত রূপাংশটিকে এমনভাবে ঘিরেছেন, যার দ্বারা কোন গানের কোন এক স্থানের সামান্য একটু অংশের শোভাও তার নিজস্ব সংকেত শক্তি অনেকাংশে হারিয়েছে। অবশ্য, এ পর্বের বিচারে আমরা সর্বদাই স্মরণ রেখেছি, কবি রচিত কবিতা এগুলি নয়, এগুলি আসলে কবিরচিত গান। কাব্যের পাঠমূল্য, অথবা আবৃত্তিমূল্যের চেয়েও সাংগীতিক মূল্যের প্রতি বেশি নজর দিয়ে এগুলি রচিত। কোনরকমে কথা বেঁধে ভাল ক'রে গাইতে পারাতেই এদের সার্থকতা। এ প্রসঙ্গে বলি রবীন্দ্রনাথের গানে, পক্ষান্তরে, ভাষা গঠনের বা ভাবস্থাপনের কোন অথবা অসংলগ্নতা নেই। কেননা, মূলে তিনি কবি, তারপরে গীতকার। কিন্তু কবি আখ্যাধারী হলেও আমাদের আলোচ্য করিয়া যত বড় গীতকার তত বড় কবি নন। আমাদের আলোচনায় যেহেতু এ সব রচনার গীতিমূল্য অবান্তর, হয়ত সেই কারণেই এদের আনন্দ-স্বাদটুকু থেকে আমরা বঞ্চিত।

কবিসংগীত থেকে এখন আমরা এমন কতকগুলি দৃষ্টান্ত-ছত্র আলোচনা করব, যাতে দেখা যাবে, কবিওয়ালার ভাবনায় প্রেমের আদর্শ ও মূল্য কত নীচে নেমে গেছে।

দেশ চলালেম প্রেম করে সই,
প্রাণ গেলে বাঁচি।
বিচ্ছেদ বিষে, লোকের রিষে,
আমি দুই জ্বালাতে জ্বল্‌তেছি ॥

(সখী সংবাদ, রাম বসু।)

বিরহিণী নায়িকার কাতর আর্তি এখানে অনুপস্থিত, জীবন সম্বন্ধে লকেব প্রগল্‌ভ বিতৃষ্ণার একটা নাগরালী-আক্ষেপ ধ্বনিত হয়েছে মাত্র। প্রেম যে জীবনের একটা বৃত্তিমাত্র অনন্য আদর্শ নয়, কবিওয়ালার নায়িকা আপন আক্ষেপ

বাণীতে তার পরিচয় দিয়েছে। আর, এই মানদণ্ডেই হৃদয়ভাবের সবটুকু লীলাকলা নির্ধারিত।

পীরিতি নগরে বিষমো সখি,
মনোচোরেরো সে ভয়।
বসতি ইহাতে দায়॥
নয়নে নয়নে সন্ধানো,
মনো অমণি হরিয়ে লয়।
সন্ধানো করিয়ে মনোচোর,
ভ্রমিছে নগরময়।

(সখী সংবাদ; নিত্যানন্দ বৈরাগী।)

নায়িকা তাই নায়ককে সম্বোধন ক'রে বলে,—

তুমি হে চোরা বোম্বেটে।
নবদ্বারের কপাট কেটে
কোন রমণীর যৌবন লুটে
বঁধূ ছুটে এলে প্রভাতে।
তোমার বাঁশীটি যেন সিঁধেলের কাটি
কাটে অনায়াসে সিঁধেলের মাটী।
জানা আছে।

(সখী সংবাদ, হরু ঠাকুর।)

সখীকে সম্বোধন করে নায়িকা বলেছে,—

সখি ঐ মনোচোরো মোরা
মনো লয়ে যায়।
কেমনে গো প্রাণসখি, ধরিব উহায়।
আঁখিরো অন্তরো হোতে অন্তরে লুকায়।

(সখী সংবাদ, নিত্যানন্দ বৈরাগী।)

প্রেমের প্রথম পর্বে হৃদয়ের এই যে লুকোচুরি, কবিয়াল স্বভাবোক্তি অলংকারে তার পরিচয় দিয়েছেন,—

কমল কম্পিতো পবনে।
অলি কাতরো প্রাণে॥

....

হায় যেদিকে নলিনী হেলে,
মধুকরো ধায়।
পবনেতে বাদো সাধে,
বসিতে না পায় পায়॥
হায় গুণ্ গুণ্ স্বরে কাঁদে অলি, অধোবদনে।
ধারা বহিছে অলির দুটি নয়নে॥
অলিরো দুর্গতি দেখি হাসে তপনে।
(সখী সংবাদ, নিত্যানন্দ বৈরাগী।)

সখীও কৃষ্ণপ্রেম রহস্যটুকু জানার জন্যে ব্যাকুল,—

কোন্ রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি, রাধায় কর উদাসিনী,
সাক্ষাতে বাজাও শুনি, আমার মাথা খাও॥
(সখীসংবাদ, হরু ঠাকুর।)

প্রেমের এই বেসাতিতেই কবিওয়ালার কল্পনা গড়া। উপরি উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলির কোথাও কোথাও আলংকারিক রূপ পরিচয় আছে, ভাবের গভীরতাও ক্বচিৎ মেলে, কিন্তু সব মিলিয়ে এ যেন দুশ্চরিত্রের প্রণয়লীলা হ'য়ে উঠেছে। কবি গেয়েছেন,—

আমার কাজ কি আর সতী নামে,
মন যেন তোমার প্রেমে,
সদাই রয় হে।
বলে বলবে কলঙ্কিনী হে।
ছলের জল নিতে এসে
না পারি কর্মদোষে,
তবে কালামুখ দেখাব শেষে
কেমন করে॥
.....
তাই বলে কি কৃষ্ণনিধি,
সৃজিলে চিন্তাজ্বর ব্যাধি,
আন্‌তে মহাজন ঔষধি

ছিদ্রঘট দিলে ॥

(কলঙ্কভঞ্জন, ভবানীচরণ বণিক ।)

সুভাষিত বাক্যে নায়িকার যে নির্ভীকতা কবি এঁকেছেন তার মধ্যে সব[illegible] নারীকণ্ঠ শোনা যায়, কিন্তু হৃদয়ভাবের গভীরতা নেই ।

বৈষ্ণবী নায়িকাও কলঙ্ককে কণ্ঠহার করেছিলেন, কিন্তু বঞ্চনার দ্বারা তাঁর প্রেমনিষ্ঠার অপমানকে সহ্য করতে পারেন নি। নীরব অশ্রুজলে কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে বসেও কোন মুহূর্তেই হৃদয় বল্লভকে বিস্মৃত হন নি। কবিয়ালের নায়িকা বঞ্চনাটুকু অকাতরে সহ্য করে যেন নায়ককে তিরস্কারের একটা দুর্লভ সুযোগ পেয়ে গেছেন,—

আমার প্রেম ভেঙ্গে প্রাণ, কার প্রেমে স[illegible]পেছে ।
এমন রসিকা নারী কোথা পেয়েছে ॥
বদন তুলি কথা কও হেসে, প্রাণ বুঝি আভাসে ।
তুমি ভালবাস কি সে ভালবাসে ॥
তুমি যেমন কি সে তেমন, দুই দুজনে মিলেছে ॥

(সখীসংবাদ, রাম বসু ।)

সমাজের চোখে কলঙ্কিণী নায়িকা প্রেমের মহিমা অনুভব করে বলেছে,—

হায় পীরিতিরো কিবা সৌরভো আছে,
সে সৌরভো মম অঙ্গে বয় ।
কলঙ্ক পবনে লইয়ে সে বাসো,
ব্যাপিলো জগতোময় ।

(সখীসংবাদ, হরু ঠাকুর ।)

এই রকম দু একটি ক্ষেত্রে নায়িকার নির্ভীকতায় গভীর আত্মসম্মান বোধ দেখা গেছে। কবির প্রকাশভঙ্গিগত শালীনতার দ্বারাই তা নির্ণীত ।

রাধা যে চিরন্তনী নায়িকা, তার মধ্যে মাতৃত্ব-কল্পনা যে তার রোমান্টিক ভাবাবঙ্গকে ধ্বংস ক'রে একটা উৎকট রসাভাস সৃষ্টি করবে, এ ধারণা বৈষ্ণব কবিদেরও নিশ্চয়ই ছিল। সুররসের সাম্য রক্ষার জন্যে প্রশ্নের দ্বারা এ [illegible] কণ্টকটিকে তীক্ষ্ণ করে তুলতে তাঁরা চান নি। বাচাল কবিওয়ালার সে সংযমটুকু নেই। তিনি সরাসরি সখিকে প্রশ্ন করে বসেছেন, কোন সদুত্তর মেলেনি,

তবু নায়িকার সেই অবাঞ্ছিত সম্ভাবনাটিকে আসরে উচ্চকণ্ঠে বিজ্ঞাপিত না করলে যেন রসোপভোগ পূর্ণতা পাচ্ছিল না।

কও দেখি সখি রাধারে কেন,
মা রাধা কেউ বলে না।
শ্রীমতী বটে সজনি, প্রকৃতিরূপে প্রধানা॥
যদি ভাবি মনে মা বলি বদনে,
জড় হয় তার রসনা।

(সখীসংবাদ, নিত্যানন্দ বৈরাগী।)

বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্ব অনুযায়ী হলাদিনী পরিচয়েই রাধার সমগ্র সত্তার প্রকাশ। একেই কবিরা নানান রূপে, রেখায়, রঙে বিচিত্র মূর্তি দিয়েছেন। প্রসঙ্গভ্রষ্ট হবার ভয়ে কোন দিনই সেই নায়িকা সম্বন্ধে অসঙ্গত জিজ্ঞাসার কৌতূহল মনে রাখেন নি। কিন্তু পল্লবগ্রাহী কৌতূহল নিয়ে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতির সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছেন কবিওয়ালা। প্রেমিকার দেহশুচিতার প্রসঙ্গ নিয়ে কথার লড়াই-এ যেখানে আসর জমে, মুক্তকণ্ঠ কবিয়াল যেখানে কুৎসা-কলঙ্কের লজ্জাকর বিষয়কে সুরে, তালে, ছন্দে, রূপে রসনাকূল করে তোলে, তেমনি একটি জুগুপ্সিত ভাবপটে রাধার মাতৃত্ব-সম্ভাব্যতার প্রশ্নকে অনুক্ত রাখাই সঙ্গত ছিল। কবিওয়ালার দৃষ্টিতে প্রেম যেহেতু ব্যাভিচারেরই ভালোনাম, সেই হেতু নায়িকার এ পরিচয় চিহ্নও তাঁর রুচিতে কুৎসিত বোধ হয় নি। বৈষ্ণব পদসাহিত্যের সুলভ সংস্করণের মত কবির গান ভাবের বাতাসকে কেবল দূষিতই করেছে। বৈষ্ণবীয় পরকীয়া প্রেম-কবিতায় ভাব্-দুর্বলতার যেটুকু আভাস ছিল, তারই প্রসঙ্গ বিচ্ছিন্ন, অষ্টাদশ শতাব্দীর রুচি-অনুশীলিত, এক অতিশয়িত (magnified) প্রকাশ দেখি কবিওয়ালার হাতে।

এবার আমরা নায়িকার বিরহমূলক কয়েকটি দৃষ্টান্তের আলোচনা করব।—

আজু সখি একি রূপ
নিরখিলাম হায়।
নীর মাঝে যেন স্থির
সৌদামিনী প্রায়॥
ঢেউ দিও না কেউ
এ জলে বলে কিশোরী।

দরশনে দাগা দিলে
হইবে সই পাতকী ॥
(সংখীসংবাদ, রাম বসু।)
সই দেখ দেখি শোভা, কিসের আভা
হেরি জলের মাঝেতে।
প্রস্ফুটিত তমাল বৃক্ষ যারো কালো
ঐ ছায়া কি ইথে ॥
(সখীসংবাদ, রাম বসু।)
আমি যেদিকে ফিরাই আঁখি
ঐ কালোরূপ দেখি,
সেই দিকে দেখি, উপায় করি কি,
আঁখি ছলে আমার মন ছলে ॥
(কৃষ্ণলীলা, ভীমদাস মালাকার।)
অঙ্গ দহে অঙ্গহীন জন।
ছি ছি নাথো বিনে কি লাঞ্ছন্।
হর কোপে যার তনু হয়েছে দাহন্।
সে দহিছে বিনে প্রাণনাথ।
করহীনে করে করাঘাত ॥
এ সব লাঞ্ছনা হতে বরঞ্চ ভালো মরণ ॥
(সখীসংবাদ, রাম বসু।)
দেখে এলাম শ্যাম, তোমার বৃন্দাবন ধাম,
কেবল নাম আছে।
তথা বসন্ত ঋতু নাই, কোকিল নাই, ভ্রমর নাই,
জলে কমল নাই, শুধু রাইকমল ধূলায় পড়ে রয়েছে।
(উদ্ধব সংবাদ, সাতু রায়।)
দেখলাম যমুনার কুলে
যত সব সখিগণ মিলে
রাইকে লয়ে কুলে
ভেসে যায় নয়ানের জলে।

তবে শ্রীরাধিকার নয়ন জলে
কুলনদীর জোয়ার হয়েছে ॥
(মাথুর, সারদা ভাণ্ডারী।).

দৃষ্টান্তগুচ্ছে রাধাবিরহের বিচিত্র অবস্থার কথা ব্যক্ত। কখনো সখির মুখে, কখনো বা নায়িকার বিলাপে তা প্রকাশিত। অলংকার কর্ম উদ্ধৃতির সর্বাঙ্গ জুড়ে নেই, এখানে ওখানে ক্বচিৎ তা দেখা যায়। কেবল প্রকাশভঙ্গিতে চাতুর্যটুকু সর্বত্রই চোখে পড়ে। এ অংশে রাধা হৃদয়ের কাতরতায় কিছুটা বেদনা ঘনীভূত হতে পেরেছে। শেষের দৃষ্টান্তটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য। "শ্রীরাধিকার নয়নজলে। কুলনদীর জোয়ার হয়েছে।" কুলপ্রথার সরল ধারা মানুষের সংস্কারের মধ্যে আশ্রয় নেয়। আদর্শের আদেশ-পালনের কালে এই কুল-প্রথা নায়িকার হৃদয়েরই একটা বড় বাধা। এতদিন পরে বিরহদশায় অশ্রুর মূল্য দিয়ে নায়িকা সেই কুলের কুলের মমতা কাটাতে পেরেছে। তাই কুলনদীতে জোয়ার এল। অর্থাৎ কুলের বৈধী-ধারা জোয়ারে বিপরীতমুখী হল। সূক্ষ্ম চাতুর্যের সঙ্কেতে কবিওয়ালা সে ভাবটি ব্যক্ত করতে পারলেন।

কবিসংগীতে ভবানী বিষয়ক কিছু গানও পাওয়া যায়। আমরা তাদের আলোচনায় বিরত হলুম। কেননা, সে অংশের রূপরচনা ও ভাব গঠন আরও অকিঞ্চিৎকর। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবকবিতায় রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কের যে একটি স্থূল বিষয়বস্তু আছে, কবিওয়ালা তার স্মৃতি রোমন্থন করেই আপন ভাবভাবনা অনুযায়ী এ সব গান রচনা করেছেন, এ রাধাকৃষ্ণ কথা বৈষ্ণবীয় ভাবদীক্ষা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। বাঙলা কাব্যে এতকাল পরে এই প্রথম মানব-কথার পূর্ণমুক্ত পরিচয় মিল্‌লো, যা কিছুটা শ্লীলতাদুষ্ট হলেও কোন বিশেষ তত্ত্বাশ্রয় অথবা দৈবানুগত্যের শাসন থেকে মুক্ত এর ফলেই অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে, বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে নিধুবাবুর গানে বাঙ্‌লা কাব্যের সত্যিকারের গীতিকবিতা জন্মলাভ করল। শিল্পসৃষ্টিতে কবিসংগীত যে স্তরের গৌরবই থাকি না কেন, নিরপেক্ষ মানব-প্রেমের গীতি-উৎস হিসেবে, আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের উদয়াভাস হিসেবে এর একটা ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকৃত হবে।

কবিওয়ালাদের যোগ্য ভূমিকা প্রসঙ্গে

অরুণ সান্যাল

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ সার্থক কবি ভারতচন্দ্র—কিন্তু ভারতচন্দ্রের পর যাঁরা বাংলা সাহিত্যের আসরটি জাঁকিয়ে বসলেন তাঁরা কবি নয়, কবিওয়ালা। এই সিদ্ধান্ত সাহিত্যের ইতিহাসের যে কোন পাঠকের কাছে কিছুটা পীড়াদায়ক বলেই মনে হবে, কারণ এই বক্তব্যটির মধ্যে এমন একটা অবজ্ঞা মিশ্রিত উন্নাসিকতার ভাব প্রকট হয়ে উঠেছে—যা অশ্রদ্ধেয়। অন্তত একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এ মন্তব্যের সত্যতা বিচারে গভীর পর্যালোচনার প্রয়োজন।

মন্তব্যটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য লক্ষ্য করলে মনে হয় যে বাংলা সাহিত্যের রসসৌন্দর্যের প্রবাহটি যে পথে অগ্রসর হচ্ছিল, তা ভারতচন্দ্রের পর (১৭৬০ ভারতচন্দ্রের মৃত্যু) সম্পূর্ণ ভিন্নতর একটা খাতে প্রবাহিত হলো, যার সঙ্গে বাঙ্গালীর রস-সংস্কারের যোগ একান্তই আকস্মিক। সম্ভবত এ সত্য স্বীকার্য, কিন্তু এই বক্তব্যটির অন্য যে দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেই দিকটিই পর্য্যালোচনার অপেক্ষা রাখে। বক্তব্যের সেই দিকটি হল: এই পর্বের সাহিত্য সাধনায় কাব্য রস ও শিল্প মহিমার একান্ত অভাব ঘটেছে—একদিকে যেমন আদর্শবিহীনতা এবং কৃত্রিম ভঙ্গিসর্বস্বতা দেখা দিয়েছে অন্যদিকে তেমনি তার রুচি ও রসচর্চা নিতান্ত স্থূলতার অঙ্কশায়ী হয়েছে। স্থূলতা বলতে দুটি দিকের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করা হয়েছে। (১) অনুভূতির স্থূলতা অর্থাৎ অগভীর তারল্য এবং (২) ভাব প্রকাশে কৃত্রিম ভঙ্গির প্রাধান্য। সামগ্রিক বিচারে ভারতচন্দ্রের পর থেকে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত এই দীর্ঘ সত্তর

বছরের বাংলা কাব্য মূল রসৈতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পঙ্কিল জলাশয়ে পরিণতি লাভ করেছে। আমাদের বিচার ও পর্যালোচনার বিষয় হবে এইটি এবং আলোচ্য সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সংশয় পোষণ করেই আমরা আলোচনার পথ অনুসরণ করব।

পর্যালোচনার সুরুতে তথাকথিত কবিওয়ালাদের সঙ্গীতের কাব্য-রস স্বরূপ আবিষ্কারের পর্বটির পূর্ব অধ্যায়ে বাংলা কাব্যের সে ঐতিহ্য বর্তমান ছিল তা বিশেষভাবে স্মরণীয়, অন্যথায় বর্তমান পর্বের অর্থাৎ কবিওয়ালাদের কাব্য সাধনার অভিনবত্ব ও স্বরূপ-লক্ষণ যথার্থভাবে উপলব্ধির অন্তরায় ঘটবে। কবিওয়ালাগণ তাদের অব্যবহিত পুর্বে রস সাধনার যে ঐতিহ্যকে লাভ করে তা থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন ; তা হলো রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্রের কালিকা মঙ্গল এবং শাক্ত সাধকগণের শ্যামা বিষয়ক আগমনী বিজয়া এবং অধ্যাত্ম-তত্ত্বের সঙ্গীতাবলী। তারও পূর্বের যে ঐতিহ্য সর্বজনীন আবেদন নিয়ে সেদিনেও বাঙ্গালীর বাস্তব ও মানস জীবনকে প্রভাবিত করেছে তা হলো রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বৈষ্ণব পদাবলী বাঙ্গালীর চিরন্তন সম্পদ। এদের মধ্যে সাধক কবি রামপ্রসাদের যে সুতীব্র হৃদয়ার্তি, মানবিক প্রেমাভিলাষের সমুন্নত ব্যাকুলতা এবং সুগভীরে ধর্মোৎমঠা উদ্বেল হয়ে উঠেছে তা একটি সার্বভৌম জীবনাদর্শের রূপ নিয়ে বাঙ্গালীকে একদিকে যেমন নন্দিত ও মুগ্ধ করেছে, অন্যদিকে তেমনি তার চেতনাকেও উদ্বুদ্ধ ও উজ্জ্বল করে তুলেছে। রামপ্রসাদ কমলাকান্তের বাৎসল্য রসের অকপট সুর মাধুর্যের মধ্যে পার্থিব জগতের স্নেহ মমতা মান-অভিমানের কথাটাই মনোরম হয়ে উঠেনি শুধু, সেই সঙ্গে একটি অপার্থিব অধ্যাত্ম সাধন তাৎপর্য সংমিশ্রিত হয়ে তার ব্যঞ্জনাকে ধর্মো-পলব্ধির সপ্ততন্ত্রী বীণায় ধ্বনিত করে তুলেছে। ঠিক একই আদর্শ সমুন্নতি লাভ করেছে বৈষ্ণব পদাবলীতেও। এখানে মানবিক প্রেমের ভাবে ভাষায় বৈষ্ণব পদকর্তা দিব্য প্রেমেরই জয়গান কীর্তন করেছেন ;—মানুষের স্বতঃস্ফুর্ত সহজ হৃদয়াবেগানুভূতির উপচার নিয়ে তাঁরা হৃদয়নাথের চরণেই অর্ঘ্যদান করেছেন। এইভাবে বৈষ্ণব ও শাক্ত সাধকগণ তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাকেই অধ্যাত্ম সাধনার পাথেয় রূপে গ্রহণ করে যে নোতুন পথ উন্মোচিত করেছিলেন, তার আবেদন বাঙ্গালীর কাছে অবিস্মরণীয়। কিন্তু এই দুই ধারার সঙ্গেই অষ্টাদশ শতকের মধ্যপর্বে মঙ্গল কাব্যের ভাবাদর্শ

থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের হাতে কালিকা মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর নামে যে এক নোতুন সাহিত্য-রূপের পত্তন হলো; তার হীরক খচিত উজ্জ্বল স্বর্ণপাত্রে কুরুচিপূর্ণ দেহসর্বস্ব সম্ভোগ রস পরিবেশন সেদিনের সমস্ত স্তরের বাঙ্গালীকেই বিহ্বল বিমূঢ় ও উত্তেজিত করে তুলেছিল। রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্র প্রবর্তিত গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথে কামাচারী প্রেমের যে সম্ভোগ-লীলা বিদ্যা ও সুন্দরের হীনতম লাম্পট্যের মধ্যে অনুষ্ঠিত হলো, তাকেই জীবনচর্চার মহত্তম ও সুখসার আদর্শরূপে গ্রহণ করে নিল অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যায়ের বাঙ্গালী রুচি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর এই রুচি কি ধরণের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে গড়ে উঠেছিল তার সুন্দর পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও সাহিত্য"—গ্রন্থের গ্রন্থকার নিরঞ্জন চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় "দেশ-কাল" পর্বে, যেখানে তাঁর বক্তব্যের সূত্রপাত..."অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা দেশ মহিমাচ্যুতির আঘাতজনিত বেদনায় বড় বিষণ্ণ", এই উক্তি দিয়ে। সম্রাট ঔরংজেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আকাশে যে রাজনৈতিক দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দিয়েছিল, তা কিভাবে বাংলার রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছিল, কি করে বাংলার স্বাধীনতা সূর্যের অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ শাসনের নামে শোষণ ও পীড়নের পত্তন ("ইংরেজ টাকা আদায় করে, মুসলমান লুচি খায় আর বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্নে যায়"), কি করে সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি মুর্শিদাবাদ থেকে কোলকাতায় স্থানান্তরিত হলো, দেখা দিল নাগরিক সভ্যতার সূত্রপাত। সামাজিক বন্ধন বিপর্যস্ত ও স্বৈরাচারী চেতনার পরিপোষণ—এরই বিস্তৃত বিবরণ হলো অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস। সামাজিক অবস্থাও পরিবর্তিত হয়ে চলেছিল রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল দিয়ে। তাই দেখি সামাজিক বন্ধনচ্যুতির ফলে দেহে মনে স্বৈরাচারী অবস্থার পত্তন, রুচি ও নীতিগত শৈথিল্যের উপর ভারতচন্দ্রের কাব্যে কামাচারী উজ্জ্বল নাগর চিত্রের তীব্র প্রভাব। বাঙ্গালীর জীবিকার্জনের সমস্ত সাধুপথ অবরুদ্ধ—একমাত্র পথ যাত্রা, কবিগান ও মজলিসী সঙ্গীত বাঙ্গালীর স্থূল রুচির অনুগামী করে পরিবেশন—সেই রুচির পোষণ ও তোষণ। সুতরাং এই ধরণের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবেশের মধ্যে যে-সাহিত্যরুচির জন্মলগ্ন নিহিত—সে-সাহিত্যরুচি আর

যাই হোক পুরোপুরি সুস্থ ও স্বাভাবিক নয়। সাহিত্যিক এ মনোহর ঐতিহ্য সাধারণ বাঙ্গালীর শিথিল প্রায় রুচি, নীতি ও আদর্শবোধকে আরও শিথিল ও কদর্য প্রবৃত্তি তারণের অভিমুখী করে তুলে সর্বাত্মক ভাবে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে "মহতী বিনষ্টি" ডেকে আনলো এবং তার ফল হলো শোচনীয়।

এই রুচি ত্রুটি ও আদর্শবিচ্যুতির গভীর সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কারণও যে ছিল সে কথা আগেই বলেছি। অষ্টাদশ শতকের মধ্যপর্বেই বর্গীর আক্রমণ ও ইংরেজ আক্রমণ বাঙ্গালী-জীবনের সমস্ত আদর্শ, বন্ধন ও ভারসাম্যকে বিধ্বস্ত করে দিল। এই বহিরাক্রমণ ও ও ইংরেজ অধিকারজাত দ্বৈতশাসনের ফলে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিন্যাস কেন্দ্রচ্যুত হয়ে গেল। সমস্ত সংযম ও নিয়মাদর্থবোধ হলো পঙ্কিল ও অসুস্থ। মানসিক এই অসুস্থতা ও রুচিহীন বিলাসচর্চা তাই তাদের রস সংস্কারকেও আচ্ছন্ন করে ফেললো। সুতরাং এই শতকের শেষ পর্বের জীবন ও সাহিত্য সাধনায় একদিকে যেমন আদর্শবোধ ও ভাবগভীরতা লঘু হলো, অন্যদিকে রুচিহীন নগ্ন প্রবৃত্তিচারণা, অশ্লীল গ্রাম্য গালাগালি, আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ ও স্থূল অস্বাস্থ্যকর চাতুর্য ও অনুপ্রাস সংঘর্ষের মাধ্যমে প্রকট হয়ে উঠলো। মানসিক এই দীনতায় প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করলো ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর। কবিওয়ালা সম্প্রদায় সেই আদর্শকে সম্মুখে রেখে তার ভোগ পঙ্কিল নগ্ন প্রেমবৃত্তিকে আরো চপল ও আবিল করে তুললেন। এবং সেই কাব্যের রূপের স্বর্ণোজ্জ্বল শিল্পসমৃদ্ধিকে আয়ত্ত করতে না পেরে তার 'কথায় হীরার ধার'-কে অনুপ্রাস যমকের স্থূলতাকেই বরণ করে নিলেন। জনসাধারণের নিম্নগামী রুচিকে তুষ্ট ও মুগ্ধ করার এ ছাড়া সেদিন আর অন্য পথ ছিল না। তার ফলেই ঘটলো বাংলা সাহিত্যের শোচনীয় এক পরিস্থিতি। রসের ও রূপের এই আদর্শকে নিয়ে এই কবি সপ্রদায় শুধু যে কবি গান, খেউড়, হাফ-আখড়াই রচনা করেই ক্ষান্ত হলেন তা নয়—সহজ মানবিক নীতি বিমূঢ় করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পূর্বাগত সাহিত্যিক ঐতিহ্যও এঁদের হাতে আবিল ও মহিমাবর্জিত হয়ে গেল।

রাধাকৃষ্ণ প্রেম ও শাক্ত পদাবলীর বাৎসল্য প্রেম সাধনার বিষয়কে এঁরা গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু তার আদর্শগত মহিমা ও অধ্যাত্মবিশ্বাসী এঁদের

গানের মধ্যে ধরা না পড়ে, চপল চাতুর্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কৃত্রিম চর্চায় তা নিঃশেষিত হলো। ভাবাদর্শের ও বিকৃতি রূপের উজ্জ্বলতা ও প্রসাদগুণকে বিকৃত করে তাকে অনুপ্রাস শ্লেষের কৌশলকলায় অসার্থক করে ফেললো। এই প্রসঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন স্বনামধন্য সমালোচক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের প্রাসঙ্গিকালোচনা স্মরণীয়ঃ "রাম বসুর গানের ভাব ও শব্দ-বিন্যাসকৌশল, উভয়েরই আমরা প্রশংসা করিয়াছি, মোটামুটি এরূপ প্রশংসা করা যায়। কিন্তু আঁটাআঁটি করিয়া ধরিয়া সূক্ষ্ম সমালোচন করিতে গেলে বলিতে হয় যে ইঁহার ভাবপারিপাট্য অপেক্ষা রচনাচাতুর্য অধিকতর জাজল্যমান—ভাবুকতা অপেক্ষা মুন্সিগিরি অধিক, কথার বাঁধুনি কথার গাঁথুনি যেমন, ভাবের মনোহারিতা; ভাবের চমৎকারিতা তদ্রূপ নহে, সুতরাং ইঁহার বিরহিণীদিগের বিরহসঙ্গীত শুনিয়া বাহবা দিতে ইচ্ছা করে কিন্তু আহা কথাটা মুখে আসে না।

রামবসুর বিরহ সঙ্গীতে যেরূপ বিরহের বর্ণনা তাহাকে আমরা বিরহ না বলিতে পারি। এ-বিরহ না প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগেব বিরহ, না অধুনাতন নাটকোপন্যাস লেখকদিগের বিরহ। ইহাতে ব্যাকুলতা নাই; আত্মবিস্মৃতি নাই, স্মৃতিদংশন নাই, মর্মদাহ নাই, তন্ময়তা নাই। ইহাতে হাহাকার নাই, চক্ষের জল নাই, ভূপতন নাই, মূর্চ্ছা নাই, মৃত্যু নাই। আছে কেবল প্রগলভার বাক্‌চাতুরী। তীব্র ব্যঙ্গ ও অগ্নিময় শ্লেষ ইহার প্রাণ। ইহার নায়িকারা—নায়কের উক্তি বিরহ বড় বিরল—বিরহপীড়িতা হইয়া উষ্ণ নিঃশ্বাসে এবং উষ্ণতর অশ্রুপাতে প্রেমতর্পণ করে না; নায়কের দেখা পাইলে বাক্যবিষে তাঁহাকে দগ্ধ করেন। ···যখন বহুদিনের অদর্শনের পর দৈবযোগে বাঞ্ছিতের দেখা পাইয়া প্রেমতৃষ্ণা নিবারণের জন্য মিনতি করিয়া বলেন—

"দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ
হলো এ পথে আগমন।
কও কথা, একবার কও কথা
তোল ও বিধু বদন ॥"

—তখনও সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ—

"পিরীত ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি
এমন তো প্রেম ভাঙ্গাভাঙ্গি অনেকের দেখি।"

আমরা বলি, ইহার অপেক্ষা দু ঘা মারা বরং ভাল।

এই সকল বিরহ সঙ্গীতে যে প্রকার প্রেম পরিব্যক্ত হইয়াছে তাহা প্রেমের আদর্শ নহে, কেন না তাহা পবিত্র নহে। ইহার অধিকাংশ নায়িকাই পরকীয়া নায়িকা। সুতরাং ইহাদিগের প্রেম আত্মবিসর্জনে পরাঙ্মুখ আত্মোৎসর্গে কুণ্ঠিত ভোগবিলাসে কলুষিত; আত্মসুখান্বেষণে অপবিত্র।...ইহাদের যত জ্বালা কেবল যৌবন জনিত, বসন্ত জনিত।

ইহাদের দুঃখ,—"যৌবন রসের ভার অতিভার
নারী নারি আর বহিতে।"

ইহাদের অনুযোগ—"একে আমার এ যৌবন কাল
তাহে কাল বসন্ত এলো
এ সময়ে প্রাণনাথ প্রবাসে গেল।"

তাই বলিতেছিলাম যে ইহা প্রেমের উচ্চ আদর্শ নহে। যে প্রেম আত্ম-নিগ্রহরত, আত্মবিস্মৃত ইহা সে প্রেম নহে।...যে প্রেম প্রলোভনে পরীক্ষিত, দুঃখে দৃঢ়ীকৃত, অদর্শনে অবিচলিত, অনাদরে অক্ষুণ্ণ এবং কালস্রোতে অপরিশ্রান্ত ইহা সে প্রেম নহে। যে প্রেম আত্মায় আত্মায় হৃদয়ে হৃদয়ে, যে প্রেমের সৌরভ বৈকুণ্ঠধাম পর্যন্ত প্রসারিত হয়, যে প্রেমে মানুষকে দেবতা করে ইহা সে প্রেম নহে।"—শ্রীরাধার সমগ্র আর্তি ও আচরণের মধ্যে যে একটি গভীর দিব্য সাধনার সুর গোবিন্দদাসের পদে—

"মাধব তুয়া অভিসারক লাগি,
পন্থ গমনধ্বনি মাধয়ে—
মন্দিরে যামিনী জাগি।"

প্রভৃতি অংশে সহজ গভীর প্রকাশ লাভ করেছে, সে সাধনার আধ্যাত্মস্পর্শ তো এ গানে নেইই এমন কি কবি স্বাভাবিক মানবীয় বেদনার ভাষা ভঙ্গিতেও পর্যন্ত সমুচ্চ করতালির আকাংখায় বিকৃত করে তুললেন। ভাবানুভূতি ও ধর্মোৎকণ্ঠার এই অগভীরতা এবং প্রকাশের কৌশল ধর্ম শাক্ত পদাবলীর আগমনী গানের মাতৃস্নেহের সহজ ব্যাকুলতাকেও লঘু ও কৃত্রিম করে ভুলেছে। যেমন দাশরথি রায়ের পদ—

"নন্দি, গিরিনন্দিনী ত্রি-নয়নের নয়নতারা
তারাহারা হয়ে আমি হয়ে আছি তারাহারা।"

—এখানে দাশুরায় মানবিক উৎকণ্ঠার মাধুর্য ও গভীরতাকে বিমূঢ় করে দিয়ে সহজ সম্যক অনুপ্রাসের কৌশলকেই গ্রহণ করেছেন। এই ভাবে শাক্ত ও বৈষ্ণব পদাবলীর রসঐতিহ্যের স্বাভাবিক নির্বিশেষ ধর্মানুভূতির সুরও এই দীন কাব্যবুদ্ধিসম্পন্ন কবিগোষ্ঠির হাতে স্বরূপবিকৃতি লাভ করলো। বিকৃতির এই অনুশীলন মূলতঃ চাতুর্যময় প্রকাশভঙ্গির পথই অনুসরণ করেছে বলে এই গানের রূপের প্রধান পরিচয় হলো অনুপ্রাসের ঝংকার এবং যমক, শ্লেষের বদ্ধ অস্পষ্টতা। অনুপ্রাস যমকের এই রসহীন অপপ্রয়োগকে কটাক্ষ করে প্রমথ চৌধুরী যে মন্তব্য করেছেন, এ প্রসঙ্গে তা স্মরণীয়। তিনি মন্তব্য করেছেন— "ভাব ও ভাষার খেলো জমির উপর অনুপ্রাস যমকের চুমকি বসানো মন্দ কবির কারদানি।" বঙ্কিমচন্দ্রও কবিওয়ালাদের অধিকাংশ রচনাকেই 'অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য' বলেছেন, তা অবশ্যই আযার কৃত্রিমতা ও রুচির স্থূলতার জন্যে। কিন্তু কবিওয়ালাদের এই দুর্বলতাকে অনেকেই যখন কটাক্ষ করেছেন, তখন অন্ততঃ একজন সাহিত্যাচার্যের মতামত আমরা উদ্ধার করতে পারি, যিনি কবিওয়ালাদের প্রচেষ্টার দুর্বলতাকে সহানুভূতির সঙ্গে বোঝবার চেষ্টা করেছেন, তাই অন্যান্যদের কাছে তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে একটি প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। আমরা সাহিত্যাচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের মতামত-এর কথাই উল্লেখ করতে চাই।

"…ভারতচন্দ্রের পর যখন রাজসভার পণ্ডিতবর্গের প্রশংসার গণ্ডী ছাড়াইয়া ভাষা জনসাধারণের দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সংস্কৃতের তোড়জোড় ও আসবার তাহাকে কতকটা ছাড়িয়া আসিতে হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক সংস্কৃত শব্দ বঙ্গভাষায় ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং জনসাধারণের ভাষাও আর তখন ময়নামতীর গানের ভাষার মত একেবারে পাড়াগেঁয়ে রকমের ছিল না।

"এইবার সংস্কৃত ও বাংলা এই দুই ভাষার মিলন ঘটাইয়া বাংলা প্রাকৃতের জোর কোথায় তাহা নির্দেশ করিবার সময় হইল। কবিওয়ালা ও যাত্রাওয়ালারা —এমন কি পাঁচালীকার ও তর্জা রচকেরা—এইবার সেই সুযোগ সন্ধান করিবার প্রয়োজন অনুভব করিলেন; কারণ তাঁহারা এবার শুধু রাজা ও পণ্ডিতগণের কাছে প্রশংসাপত্রের প্রত্যাশী নহেন। এখন জনসাধারণের নিকট উপস্থিত। তাহারা ব্যকেরণ জানে না, ব্যাস বাল্মীকির মর্ম তাহারা বোঝে

না ; তাহাদের কাছে 'বাহবা' নিতে হইলে কবিকে শুধু কথিত ভাষা রূপ অস্ত্রই ব্যবহার করিতে হইবে। আগেকার কবিরা নিজেদের ভাষাগ্রন্থে সংস্কৃত কোন কাব্য বা শ্লোকের ইঙ্গিত দিলেই পণ্ডিতরা খুশী হইতেন। কিন্তু এখনকার বিচারকগণ এক হিসাবে শক্ত। তাহাদিগকে শুধু কথা দিয়া ভাব দিয়া ভুলাইয়া রাখিতে হইবে। পাণ্ডিত্য এই হাটে বিকাইবার নহে। এই ক্ষেত্রে কবিরা অসামান্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুপ্রাস লইয়া অনেক পণ্ডিত পরিহাস রসিকতার অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে সংখ্যাতীত প্রণিপাত জানাইয়া আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই "এই বাংলা কবিদের অনুপ্রাসের জোরটা কোথায়, তাহা তাঁহারা অনুসন্ধান করিবার সুযোগ পাইয়াছেন কি ?"

সুতরাং একথা ঠিকই যে জনমন তোষণের পক্ষে এ পন্থা বিশেষ উপযোগী। কিন্তু এই কলাকৌশল, বৈদগ্ধ্যহীন প্রকাশ রীতি ও সৌন্দর্যবোধগত দীনতারই পরিচয় দেয়। সব চাইতে শোচনীয় মনে হয় তখন, যখন দেখি এই কৃত্রিম নীরস ভঙ্গি বিশেষ করে হৃদয়ানুভূতির গভীর ও তীব্রতম বেদনা ও মূর্চ্ছনা প্রকাশেই নিঃশেষিত হচ্ছে। যেমন মোহনদাস বৈরাগীর গান—

"দেখো কৃষ্ণ যাই জলে, তব কষ্টে প্রাণ জ্বলে,
লজ্জা যদি পাই হে জলে
ঝাঁপ দিব যমুনার জলে",

—এ পদে জল-প্লাবন থাকলেও কাব্যরস কোথাও উৎসারিত হয়নি। শব্দালঙ্কারসর্বস্ব এমন অনেক গানই উদ্ধৃত করা যেতে পারে! যেমন—

"গেছে কূল, যাক কূল
যে প্রেমে ধরিলাম কূল, সে কূল নয় অনুকূল
এবার কুলকুণ্ডলিনী সাধিব হৃদয়ে।"

গায়ক এখানে অনেক কথা বলে গেলেন বটে, কিন্তু সহজভাবে এ গীতের অর্থ ও রসের কূল পাওয়া অনিবার্যভাবে দুষ্কর হয়ে ওঠে। রূপকল্পের দিক থেকে উপমার প্রসঙ্গটিও এ বিষয়ে লক্ষণীয়। বিখ্যাত কবিওয়ালা হরুঠাকুর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়ে যখন বললেন—

"একদিন শ্রীহরি মৃত্তিকা ভক্ষণ করি ধূলায় পড়িয়া বড় কাঁদে
রাণী অঙ্গুলি হেলায়ে ধীরে, মৃত্তিকা বাহির করে, বড়শী বিঁধিল যেন

চাঁদে।" এ উপমায় চাতুর্য্য, চমৎকারিত্ব এবং বাস্তব জ্ঞানের বিশেষ পরিচয় আছে বটে, কিন্তু নিঃসংশয়ে সত্য যে এ উদ্ভাবনের মধ্যে যতখানি হাস্যবোধ চরিতার্থ হয়েছে—ততখানি কাব্যরস উৎসারিত হয়নি।

এই প্রসঙ্গে আমরা সমালোচক চন্দ্রশেখরের বক্তব্যকে আবার কিছুটা পরিমাণে গ্রহণ করতে পারি! তৎকালীন অবস্থা বিশ্লেষণে তিনি লিখেছেন, ...একটি কথা আছে, প্রত্যেক মনুষ্যের প্রবৃত্তি ও রুচি অনেকটা সমসাময়িক সামাজিক অবস্থানুসারে গঠিত হয়। কার্লাইল একস্থলে বলিয়াছেন যে, "প্রত্যেক ব্যক্তির কার্যকলাপের জন্য সেই ব্যক্তি যতটা দায়ী সমাজ তদপেক্ষা অধিকতর দায়ী।" ইহা সত্য, এ জগতে কেহ একা নহে, কেহই অন্য-নিরপেক্ষ নহে। পরস্পর নির্ভর, পরস্পরালম্বন মনুষ্যের জীবন। ...সেইজন্য বলিয়াছিলাম যে মনুষ্যের রুচি প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি অনেকটা তৎকালীন বর্তমান সামাজিক সংস্থানের প্রতিকৃতি মাত্র। কালের অভাবনীয় মাহাত্ম্য দুর্দম স্বানুবর্ত্তিকাকে পর্য্যন্ত আপন বর্ণে রঞ্জিত করিয়া লয়। —মনুষ্য কালের ক্রীড়নক, কালের ছায়া। কারণ সকলের মধ্যেই বিকাশেরভাব এতই প্রবল যে উহা সর্বত্রই প্রবেশ করিয়াছিল। সকল বিষয়কেই স্পর্শ করিয়াছিল পূজ্যপাদ বৃদ্ধ ঋষি ভক্তিরসে ভোর হইয়া গঙ্গার স্তব করিলেন। তাহাতেও একটু চন্দনের ছিটা না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাহার মধ্যেও 'বসুধা শৃঙ্গার হারাবলী' তারপর এই বহু প্রচলিত দেশে যৌন সহচর্য্য বিষয়ে দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠার ভাব কাজেই দুর্বল। আজকাল যে আমরা পবিত্রতা ও একনিষ্ঠতার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছি যে প্লেটো ও কোমতে প্রসাদাৎ। তাহাতে আমাদের জাতীয় গৌরব কিছু নাই। ইহার উপর বৈষ্ণব ধর্মের ধর্ম পরকীয়া নায়িকাকে প্রাধান্য দিয়া সোনায় সোহাগা সংযোগ করিল। .....বাঙ্গালী আপন আপন অভিধানে লিখিল যে আপন স্ত্রীকে ভালবাসিবে সে স্ত্রৈণ, যে পরের স্ত্রীকে ভালবাসিবে সেই প্রেমিক। ইহার উপর মুসলমান আপন আপন দৃষ্টান্ত চক্ষের উপর ধরিয়া ষোলকলা সম্পূর্ণ করিলেন। সেই সময় এই সকল সঙ্গীত রচিত হইল।"

তাই ভাবাদর্শ, পরিকল্পনা ও রূপকল্প গঠনে এই আদর্শহীন বিকৃতির জন্য ডক্টর সুশীলকুমার দে কবিওয়ালাদের সঙ্গীত সাধনাকে 'debased' এই অভিধা যুক্ত করেছেন। অষ্টাদশ শতকের শেষ অধ্যায় বাঙ্গালীর জাতীয়

জীবনের সর্ব্বাত্মক অপচয় ও তার বিকৃতি (decadence and bankruptcay) তার সাহিত্য সাধনার মধ্যেও যে পথ করে নিয়েছিল,এ বিষয়ে সংশয় মাত্র নেই।

কিন্তু এই বিচারই কবিওয়ালাদের সম্পর্কে শেষ বিচার তো নয়ই—হওয়াও উচিত নয়। এবং উচিত নয় বলেই 'কবি-সঙ্গীত' নামক প্রবন্ধে কবিগুরুর সেই তীব্র মন্তব্য…"বাংলার প্রাচীন কাব্য সাহিত্য এবং আধুনিক কাব্য সাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান। ইহা এক নূতন সামগ্রী এবং অধিকাংশ নূতন পদার্থের ন্যায় ইহার পরমায়ু অতিশয় অল্প। একদিন হঠাৎ গোধুলির সময়ে যেমন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়া যায়, মধ্যাহ্নের আলোকেও তাহাদিগকে দেখা যায় না এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্বেই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়—এই কবিগানও সেইরূপ এক সময় বঙ্গ সাহিত্যের স্বল্পজন স্থায়ী গোধূলি আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল। তৎপূর্বেও তাহাদের কোন পরিচয় ছিল না, এখনও তাহাদের কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।" এ কে চূড়ান্ত রায় হিসাবে গ্রহণ করা একান্ত অপ্রত্যাশিত। একথা অবশ্যই সত্য বে সে যুগের অনেক কবি ও গায়কের কণ্ঠেই ভারানুভূতি লঘু হয়ে গিয়ে কৌশলধর্ম প্রখর হয়ে উঠেছিল; একথাও সত্য যে যুগচিত্তের রুচি-শৈথিল্য ও আদর্শবিচ্যুতি কবিদের রস সাধনাকেও আবিল করে তুলেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বিস্মৃত হলে চলবে না, যে এই আদর্শবিহীন গ্রাম্যতার মধ্যে সঙ্গীত সাধনা করেও এদের মধ্যে অনেকেই এমন চমৎকারভাবে মানসিক সুখ দুঃখের ক্রন্দন আর্তির সুরটি পরিস্ফুট করেছেন যা সত্যই প্রশংসনীয়। হরু ঠাকুরের ঈশ্বরানুভূতির গানে এবং রাসু নৃসিংহের 'সখী সংবাদে' এবং রাম বসুর কিছু কিছু বিরহ সঙ্গীতে বৈষ্ণব ভাবাদর্শের সেই আধ্যাত্মিক মহিমা ও সমুন্নতি নাই বটে, কিন্তু সেখানে রাধার ক্রন্দন করুণ বিলাপধ্বনির মধ্যে মানবিক সংবেদনটি এমন গভীর ও তীব্র হয়ে উঠেছে যা সহৃদয় রসিকের চিত্তের গোপন অভিলাষ ও বেদনার স্তরকে অনিবার্য গতিতে স্পর্শ করে উতরোল করে তোলে। রাসু নৃসিংহের বিখ্যাত 'সখী সংবাদ গান—

"শ্যাম প্রদীপের আলো প্রকাশ পাইলো
চন্দ্রমা লুকালো গগনে।
ওহে, গো-খুরের জলো জগত ব্যাপিলো

সাগরো শুকালো তপনে"—এর তির্যক ব্যাকুল অভিমানের সুরে শ্রীরাধার যে কোমল স্পর্শকাতর অন্তরটি উদ্ঘাটিত হলো তা ভাষা ও ছন্দের তীব্র আবেগ এবং ব্যঞ্জনায় অনবদ্য প্রকাশ লাভ করেছে। সমস্ত বেদনাভিমানটিকে উপমার তির্যক ভঙ্গিতে প্রকাশ করার মধ্যে যে শিল্পকৌশল প্রকাশ পেয়েছে তার বিচারে অকপটে একথা বলা চলে যে এমন রাধাকৃষ্ণপ্রেম বিষয়ক পদে আধ্যাত্মসাধনার মহিমা না থাকলেও মানবিক মহিমায় তা উজ্জ্বল। নিরঞ্জন চক্রবর্তী রামবসুর গানের এই মানবিক দিকটি প্রসঙ্গে যে আলোচনা করেছেন এখানে তার অংশ বিশেষ উদ্ধার করছি.....এই কবিওয়ালাদের মধ্যে রামবসুও একজন ছিলেন। যিনি নববধূর বিরহ বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন,—

"প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি করে বলা হলো না,

সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।—"এই কয়েকটি ছত্রে আধ ফোটা কলিটির সুবাসের ন্যায় বঙ্গীয় বধূর নবজাত সলজ্জ প্রেম যেন ভয়ের সহিত আধ কথায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহার পরের দুই ছত্র অতুলনীয়—

"হাসি হাসি আসি যখন সে 'আসি' বলে ;
সে হাসি দেখে ভাসি নয়ন জলে।"—সে এরূপ নিষ্ঠুর যে বিদায়ের সময়েও তাহার মুখে হাসি আসিয়াছিল। সেই হাসি দেখিয়া নববধূর চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

তারে পারি কি ছেড়ে দিতে,
মন চায় রাখিতে
লজ্জা বলে ছি ছি ছুঁয়ো না
এ যে বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।—"

এ যে বঙ্গ কুটিরের সেই কুল-বালিকার প্রেম। বাংলা ঘরের নববধূ অপর যাহাই হউন না কেন, বক্তৃতাদায়িনী ছিলেন না।

"তার মুখ দেখে মুখ ঢেকে কাঁদিলাম সজনী,
অনায়াসে প্রবাসে গেল যে গুণমণি।" তাঁর হাসি মুখ দেখে কান্না আসিল ; কিন্তু সে কান্না তাঁহাকে দেখিতে দিলাম না। মুখ ঢেকে চোখের জল সামলাইয়া লইলাম।" এ চোখের জল কোন কল্পলোকবাসিনী স্বর্ণসীতার নয়। এ

চোখের জলে আছে আমাদের মাটির ঘরের সব কম্প্রবক্ষ-লজ্জাকুণ্ঠ নারী-মনের পূর্ণাভাসটু লুকিয়ে, আছে মানবিক অবেদনের আবেশটুকু।

নৃসিংহের বিরহ বিষয়ক গানও কৌশল ধর্মকে বর্জ্জন করে মানবিক অনুভূতিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে।—

"কহ সখি! কিছু প্রেমেরি কথা।
ঘুচাও আমারো মনের ব্যথা॥
আমি এসেছি বিবাগে মনের বিরাগে,
প্রাতি প্রয়োগে মুড়াবো মাথা।"

প্রেম যে পবিত্র, এর সাধনা যে দুর্লভ সাধনা—এ চেতনা থেকেই কয়েকজন বিশিষ্ট কবিওয়ালা তাঁদের প্রেমানুভূতিকে গভীর স্বরে উদ্গীত করেছেন। প্রেমানুভূতি জাত রাধাচিত্তের আনন্দ বিহ্বলাবস্থাকে নিতাই বৈরাগী অনবদ্য ছন্দ নৈপুণ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করলেন।

বঁধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে॥
নহে কেন অন্ধ অবশো হইলো।
সুধা বরষিলো শ্রবণে॥

প্রণয়বেদনার এই তীব্র আবেগময় গভীর প্রকাশ সৌন্দর্যের মধ্যে কবিওয়ালাগণ যে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনাভিজ্ঞতাকেই সংমিশ্রিত করে দিয়ে এর আবেদনকে আরো তীব্র করে তুলেছেন, সে বিষয়ে সংশয় নেই। নেই রুচি দুষটির যুগেও রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মধ্যেকার মানবিক উপলব্ধির দিকটি পৃথক করে নিয়ে তারই সঙ্গে ব্যক্তি হৃদয়ের আক্ষেপ অনুরাগকে সম্পৃক্ত করে সঙ্গীত রচনা উচ্চতর শিল্প বোধের পরিচায়ক, এবং প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মানবিক প্রেমানুভূতির এই সহজ অকপট প্রকাশে শ্রেষ্ঠ কবিওয়ালারা কখনও অনুপ্রাস যমকের মায়াময় ছায়ালোক কিংবা অকারণ ঘনঘটার অপ্রয়োজনীয় কোন পরিবেশ সৃষ্টি করেন নি। বরং সংযম ও সামঞ্জস্য বোধের যে পরিচয় দিয়েছেন, সে যুগের পক্ষে তা সত্যই বিস্ময়াবহ। কবিওয়ালাদের মধ্যে বলিষ্ঠতম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রামবসুর বিরহের পদ সেদিন বাঙ্গালীর হৃদয় যমুনাকে উচ্ছল করে তুলছিল।

বিরহ ও সখীসংবাদ—এর গানে হৃদয়ানুভূতি ও ভাবসত্যের যে

দিকটি একটি চারিত্রিক দীপ্তির আধারে প্রকাশ লাভ করেছে, তার আবেদনের অনিবার্য্যতা প্রকাশের সহজ সুন্দর অকপট লাবণ্য এবং আবেগের তীব্রতা সম্পর্কে মত পার্থক্যের কোন অবকাশ নেই। এঁদের রচনার রত্ন সিংহাসনে যে রাধামূর্তির অম্লান প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সে রাধা বৈষ্ণবাচার্য্যগনের বৃন্দাবন বাসিনী মহাভাবস্বরূপিণী, দিব্যসাধনপথযাত্রী রাধিকা নন্ রাধা আমাদের এই আনন্দ বেদনায় উদ্বেল সংসার সীমারই প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও অপার বেদনার রসঘনরূপ। অর্থাৎ কবির ব্যক্তি হৃদয়ের আন্তরিক অনুরাগ স্পর্শে সমস্ত গানের মধ্যে একটি চমৎকার দ্রুতি ও গতিসঞ্চার ঘটেছে, এবং সামগ্রিক রূপ লাবণ্যে তা বৈষ্ণব পদাবলীরই একটি প্রকাণ্ড 'মানবিক সংস্করণ' হয়ে উঠেছে।

কবিওয়ালাদের গানের জগতে একদিকে হৃদয়ানুভূতির অপরূপ লাবণ্য আর একদিকে শিল্পবোধের পরম ঐশ্বর্য্য—যুক্তবেণী রচনা করেছে। তাঁদের ঈশ্বরানুভূতির গানেও আছে এই লাবণ্য ও ঐশ্বর্যের আশ্চর্য্য ব্যঞ্জনা। হরুঠাকুর, এণ্টণী ফিরিঙ্গির রচনা তার প্রমাণ। বোলান সঙ্গীতও তার সার্থক উদাহরণ। বিশ্বাসের সহজ সত্যতায় এঁদের ধর্মবোধ উদ্দীপ্ত হয়েছে বলেইতা কোথাও শান্ত আপন-বোধের সুরে কোথাও বা উৎকণ্ঠার মধ্যে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। হরুঠাকুরের বিখ্যাত গান—

"হরি নাম লইতে অলস কোর না রসনা
যা হবার তাই হবে।
ভবেরো তরঙ্গ বেড়েছে বলে কি
ঢেউ দেখে লা ডুবাবে।—

ধর্মবিশ্বাসের এই অকপট অভিব্যক্তি অনুভূতির বলিষ্ঠতার মধ্যে এণ্টণী ফিরিঙ্গির শ্যামাবিষয়ক গানে প্রকাশ পেয়েছে।

"আমি সাধন ভজন জানিনে মা! জাতিতে ফিরিঙ্গি
যদি দয়া করে কৃপা কর শিবে শাতঙ্গী।"

সাধারণতঃ ধর্মও শিবের গাজনে গীত 'বোলান' সঙ্গীতের মধ্যে নিত্যানন্দ বিষয়ক ও গোষ্ঠবিষয়ক গানগুলো নিরাবরণ ও নিরাভরণ সহজ প্রকাশে এবং উপলব্ধির লোকায়ত প্রাঞ্জলতার মধ্যে চমৎকার হয়ে উঠেছে।—

"হায়রে অভাগার প্রাণ কি সুখেতে আছ
নিতাই বলিয়া কেন মরিয়া না যাইছ
নিত্যানন্দের নাম লয়ে, প্রাণ যাও বাহির হয়ে।—"

নিত্যানন্দ বিষয়ক এইসব গানে শিল্পগুণ হয়তো তেমন কিছুই নেই। কিন্তু অনুপ্রাস যমকের কৃত্রিমতার মোহকে অস্বীকার করে ভক্তির বেদনা বিধুর মানসস্বরূপটি পরিস্ফুট করার যে অপূর্ব কৃতিত্ব—সে সম্মানটুকুর অধিকারী হওয়ার যোগ্যতা নিশ্চয়ই এঁদের আছে।

আশ্চর্য লাগে এই ভেবে যে একই যুগে কৃত্রিম ভঙ্গিসর্বস্বতার পাশাপাশি এমন চমৎকার ভাবে অকপট সহজ কবিত্বের অনুশীলন চলেছে। এই স্বাভাবিক অনুশীলনের মধ্যে যেমন ঈশ্বরবিষয়ক, শ্যামাবিষয়ক এবং রাধা কৃষ্ণবিষয়ক গান উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তেমনি পার্থিব প্রেমের করুণ মধুর সংবেদনাটিও স্নিগ্ধ প্রসবনে অভিষিক্ত করেছিল বাঙ্গালী হৃদয়। রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ বিরহিত পার্থিব প্রেমের এই অনিন্দ্য মধুর দিকটি অপূর্বমায়াময় সুরলোক সৃষ্টি করেছে যে টপ্পা গানে সে গানের অন্যতম স্রষ্টা হলেন শ্রীধর কথক আর নিধুবাবু। নিধুবাবুর গানের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো এর মানবিক সুরের আবেদন। বাঙ্গালী হৃদয়ের কান্তকোমল অনুভূতিটিই সহজ সরল সুরের কৃত্রিম কলা কৌশলে রামনিধি গুপ্ত ও শ্রীধর কথকের টপ্পা গানের প্রেমের ব্যাকুলতার দিকটি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি। মানবিক রসাবেদনের ফলেই নিধুবাবুর টপ্পা এই সেদিন পর্যন্তও বাঙ্গালীকে আনন্দধারায় আপ্লুত করেছে—বেদনা বিষণ্ণতায় উদাসবিভোর করে তুলেছে। নিধুবাবুর বিখ্যাত গান—

"ভালবাসিবে বলে ভাল বাসিনে,
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।"

এসব গানের মধ্যে পার্থিব প্রেমের সহজানন্দ ও প্রশান্ত বিষণ্ণতার সুর লেগেছে। উচ্চারিত হয়েছে সুরের আধারে মানবীয়তার মহিমা।

এ পর্যন্ত অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও পাঁচালী কবিদের সঙ্গীত ও কাব্য সাধনার দুটি দিক বিশ্লেষণ করে আমরা একটি আশ্চর্য সত্যের সন্ধান লাভ করেছি একথা অনস্বীকার্য। সে সত্যটি হল এই—কবিওয়ালাদের কাব্য সাধনার যুগ শুধুমাত্র রুচি বিকারের, শুধুমাত্র অগভীর ভাবালুতা আর কৃত্রিমানুপ্রাসচ্ছটার যুগ নয়—এই যুগের এই অবস্থা ধারার পাশাপাশি

আত্মপ্রকাশ করেছে মানবিক রস ও ধর্মবিশ্বাসের অকৃত্রিম সুরটি বলিষ্ঠবেগে। যেখানে জনমন তোষণের সহজ পথ পরিত্যাগ করে এঁরা আপন হৃদয়ানুভূতির গভীরে প্রবেশ করে তাকেই উন্মোচিত করতে চেয়েছেন সেখানে তাঁদের প্রকাশ কলাকৌশলহীন সহজ ও অকুণ্ঠ। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বিরহ ও সখী সংবাদের গানে কিংবা নিধুবাবুর একান্তভাবে পার্থিব প্রেমের গানে কোথাও তেমন দুষিত রুচি ও রূপবিকৃতির পরিচয় নেই। এখানে এঁরা সামান্য কবিওয়ালা না থেকে যথার্থ কবির মর্যাদাই পেয়েছেন—এ কথা স্বচ্ছন্দেই বলা যায়। এই বক্তব্যের সমর্থনে আর একজন আলোচকের মত উদ্ধার করি। "...যাহাই হোক, যথার্থ বিচারের ক্ষেত্রে, কবি গানের যুগ—আধুনিক বাংলা কাব্যের জীবনভূমি। বিদ্যাসুন্দরের রতি-বিলাপ কথনের উল্লাসময়তা অবলম্বন করিয়া প্রণয়মূলক আখ্যায়িকা কাব্যের যে ধারা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবহমান ছিল, তাহার পাশাপাশি যদি কবিগানের কলস্বর না জাগিয়া উঠিত তা হইলে ইংরেজ প্রভাবান্বিত বাংলা সাহিত্যের বিকাশক্ষণ পর্য্যন্ত এই রতি-বিলাপ বা মদনমঞ্জরীর উল্লাসময়তা সহ্য না করিয়া উপায় ছিল না। তৎকালীন যুগের সংচেতনা হইতেই কবিগানের জন্ম।"

বাঙ্গালী কবি সম্প্রদায় বহিরঙ্গের নানা বিকৃতি বিচ্যুতির দ্বারা প্রভাবিত হলেও অন্তর সত্যে যে মানবিক সংবেদনকে কখনও কলুষিত ও কৃত্রিম হতে দেয়নি, তা তাঁদের চিরকালের প্রশংসার কথা। বরঞ্চ এই সহজ কবিত্বের ধারা ঈশ্বর গুপ্তের "বাজিছে ঝম্প, দিতেছে ঝম্প, মারিছে লম্ফ, হতেছে কম্প", ইত্যাদি ভাষা ও ছন্দের কৃত্রিমতায় আচ্ছন্ন ও আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল এবং শেষে মধুসূদনের অসামান্য প্রতিভার অগ্নি স্পর্শে আবার প্রাণ স্বাচ্ছন্দ্যে তীব্র ও মধুর হয়ে উঠেছিল। তাই বিচারান্তে একথাই বলবো—বাংলা সাহিত্যের মানবিক রসপ্রবাহটি সঙ্গীত সাধনায় অক্ষুণ্ণ রাখার সার্থকতায় এবং ব্যক্তিগত ভাব-বেদনার কবিত্বপূর্ণ প্রকাশের স্বাদুতার ফলে তথাকথিত কবিওয়ালা সম্প্রদায় শুধু কবিওয়ালাই নন,—তাঁরা কবিও।

'শ্রেণীশান্তি' ও ধনতান্ত্রিক বাস্তবতা

এস্. বাগলাই

শ্রমিক শ্রেণীকে পরাস্ত করবার জন্য একচেটিয়া মালিক-গোষ্ঠী "শ্রেণী শান্তি"র অন্ধ ধারণা একটি বড় আদর্শ-গত অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেন। আমেরিকায় এই অন্ধ বিশ্বাস বিশেষভাবে প্রচারিত হয়েছে। বুর্জোয়া আদর্শবাদীরা তাদের "শ্রেণী শান্তি" প্রচারে তথ্য উল্লেখ করার ভাণ করেন, আসলে কিন্তু তাঁরা সেই সমস্ত তথ্যের অর্থ-বিকৃতি ঘটান। তাঁরা শ্রমিকদের বিশ্বাস করাতে চান, যে, আমেরিকার ধনতন্ত্র এক বিশেষ ধরনের বা অনন্যসাধারণ ধনতন্ত্র, যাকে ঠিক ধনতন্ত্র বলা যায় না এবং যুক্তরাষ্ট্রে বুর্জোয়া ও শ্রমিকের স্বার্থ এক হয়ে গেছে, যার ফলে সেখানে শ্রেণী সংগ্রামের কোন অবকাশ নেই। এ থেকে মনে হবে যে শ্রমিক শ্রেণী ও ধনিক গোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক সংগ্রামে শ্রেণীগত রূপ অনিবার্যভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে এসেছে, আর তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সংগ্রামের অবসান ঘটেছে। "শ্রেণী শান্তি"র মতবাদের এই হোল যুক্তিগত ভিত্তি এবং উদ্দেশ্য শ্রমিকদের বিশ্বাস করান যে, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কোন প্রয়োজন নেই।

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে "শ্রেণী শান্তি"র এই ব্যাপক প্রচার যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক আন্দোলনের গতিকে বিশেষভাবে রোধ করেছে। অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের পক্ষে বিপদের সম্ভাবনাও এ থেকে আসছে, কারণ যুক্তরাষ্ট্রীয় "শ্রেণী শান্তি"র এই অন্ধ ধারণা সমস্ত বুর্জোয়া ও সংস্কারক আদর্শবাদীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত যুক্তির উপর "শ্রেণী শান্তি"র ধারণা প্রতিষ্ঠিত সেগুলির পরীক্ষামূলক আলোচনা রাজনৈতিক ও আদর্শগত দিক্ দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

"শ্রেণী শান্তির" নীতি, প্রাথমিকভাবে এই দাবীর উপর স্থাপিত যে শ্রমিকের ও মালিকের শ্রেণীগত স্বার্থ এক। শ্রমিকরা "তাদের ও মালিকের স্বার্থের মধ্যে যে মূল ঐক্য আছে" তা বুঝবে আশা করা যায়। অর্থনীতিবিদ্

C. Ogburn-এর "Economic Plan and Action (N. Y. 1959, পৃঃ ১৫৪) গ্রন্থে আমরা এই দাবী দেখতে পাই। "স্বার্থ ঐক্যে"র জন্য অস্পষ্টভাবে অর্থনৈতিক প্রগতিকে কারণ বলে মনে করা হয়, যা প্রচলিত অর্থের ধনতন্ত্রকে বিনষ্ট করছে এবং এক নূতন সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি করছে যেখানে "সমন্বয়" এবং "সংযুক্ত কর্মপদ্ধতি" বিরাজ করবে। ফলতঃ সেখানে শ্রেণী সংগ্রামের প্রয়োজন নেই। বুর্জোয়া মতবাদীদের ধারণা অনুযায়ী, তিনটি প্রধান ধারায় পদ্ধতিটি গড়ে উঠেছে যথা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অংশ ভোগ ; ধনতান্ত্রিকের পরিবর্তে "উৎপাদন ব্যবস্থাপকের" নিয়োগ ; উঁচু ও নীচু শ্রেণীর জীবন ধারণের মানে সমতা আনয়ন।

আমেরিকার সাম্প্রতিক সমাজ বিজ্ঞান আলোচনায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রসারণের পুরানো ধ্বনিই শোনা যাচ্ছে। অধ্যাপক M. Salvadori তাঁর The Economics of Freedom, American Capitalism To-day (London, 1959, পৃঃ ৭১) গ্রন্থে তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। সমাজবিজ্ঞানী M. Vincent ও J. Mayers তাঁদের New Foundations for Industrial Sociology (Princeton, 1959, পৃঃ ১০৯) তেও তাই করেছেন।

এটা খুবই পরিষ্কার, যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সাধারণীকরণের কোন ব্যবস্থাই সেখানে ঘটেনি। এ ধরণের আশ্চর্য পরিবর্তনের নমুনা হিসাবে যে যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানগুলিকে তুলে ধরা হয়, তা সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা আট ভাগমাত্র। কিন্তু জনসংখ্যার বৃহৎ অংশ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হলেও শোষণ চলতে থাকবে, কারণ যারা শ্রমদান করে, তারা শ্রমের ফল পায় না।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রসারিত এবং বহুজনের দ্বারা ভুক্ত হওয়ার যুক্তিকে যে ঘটনা খণ্ডন করছে, তা হোল অল্পসংখ্যক শোষকের হাতে প্রভূত পরিমাণে ধনসম্পত্তি মজুত হয়েছে। আমেরিকার অর্থনীতি সম্বন্ধে ফরাসী বিশেষজ্ঞ C. Julieu বলেন মূলধনের শতকরা ৬০ ভাগ শতকরা একজনের হাতে জমা হওয়ায় তারাই সমগ্র উৎপাদনের পরিচালনায় কর্তৃত্ব করে। সুতরাং একথা কি করে বলা যায়, যে সম্পত্তি ভাগ হচ্ছে ? (C. Julieu, Le Nouvean Nouvean Moudi, L'elite au Prouioir, Les Syndicats oveers, Paris 1960 পৃঃ ৩৯)। T. Livingstone তাঁর The American Stockholders (Philadelphia, 1958, পৃঃ ১৮১) তে বলেছেন, "আমেরিকার একজন

মোটর উৎপাদনের শ্রমিক বা খনির শ্রমিককে বলতে চেষ্টা করুন, যে সে ত 'জনসাধারনের ধনিক প্রতিনিধি।' একথা শুনে সে শুধু হাসবে।"

"ব্যবস্থাপনায় বিপ্লব" ঘটেছে এদাবী সমর্থন করার মত তথ্য নেই। লাভের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য শ্রমিকদের কল্যাণ কামনায় উৎসর্গীকৃত কোন নূতন লোক ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় আসে নি। পুস্তক ব্যবসায় সংগঠনে উপযুক্ত সামাজিক পটভূমিকায় এই তথাকথিত বিপ্লব সম্বন্ধে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক A. Coler (Cambridge, Mass. 1959) লেখায় পড়তে পারি। আমরা অবশ্য অস্বীকার করি না যে অধিক পরিমাণে ধন মজুত হতে থাকলে মালিকদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। এও সত্য যে উৎপাদন ব্যবস্থাপক কর্ম ক্ষেত্রে কিছুটা স্বাধীনতা পান। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মালিকপক্ষ উৎপাদনে তাদের কর্তৃত্ব ছেড়ে দিয়েছেন অথবা আধুনিক ব্যবস্থাপক পুরানো যুগের মালিকের চেয়ে শ্রমিকদের খুব কাছের লোক। সমস্ত বৃহৎশিল্পের ব্যবস্থাপনার কাজে তাঁরাই নিযুক্ত হন, যাঁরা সম্পূর্ণভাবে মালিকদের উপর নির্ভরশীল। সাধারণতঃ তাদের অত্যধিক বেশি বেতন দেওয়া হয় এবং কখনও তারা যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করে, তার সহ-মালিকও হয়।

"ব্যবস্থাপনায় বিপ্লবে"র তত্ত্ব "মানবিক সম্বন্ধে"র প্রচারের সঙ্গে যুক্ত। তার ফলে যা দাঁড়ায় তা হোল ব্যবস্থাপক শ্রমিকদের সম্বন্ধে আগ্রহের ভাব দেখান এবং তা চিকিৎসা কেন্দ্র বা শিশু-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা, শ্রমিকদের খ্রীষ্টমাস উপহার দেওয়া অথবা বেশি উৎপাদনের জন্য বোনাস দেওয়া ইত্যাদিতে প্রকাশিত হয়। আমাদের একথা না বললেও চলে যে এই ধরনের অনুগ্রহের সংখ্যা খুবই সীমাবদ্ধ এবং এ সবের পিছনে কল্যাণ মনোবৃত্তি বিশেষ নেই, কারণ শ্রমিককে "দয়ালু" মালিকের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয়। শ্রমিক দরদের এই প্রকাশকে মালিক এবং শ্রমিকের সম্পর্ক যে বৈরীমূলক নয় বরং মৈত্রীভাবাপন্ন এবং সহানুভূতিশীল তা প্রমাণ করার জন্য তুলে ধরা হয়। শ্রমিক আন্দোলনকে স্তিমিত করে রাখার উপায় হিসাবে এ পন্থা সত্যই কার্যকরী।

"শ্রেণী শান্তি" গবেষণাকারীদের দাবী আরও হাস্যকর। তাঁরা বলতে চান, যুক্তরাষ্ট্রে ধনিক ও শ্রমিকের উপার্জনের পার্থক্য অনেক কমে গেছে, এখানেই রয়েছে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ "মধ্যবিত্ত" শ্রেণী এবং এই দেশই হচ্ছে প্রাচুর্যের দেশ,

এই ধরনের আরও অনেক কিছু। ১৯৫৯ এর গ্রীষ্মে মস্কোতে আমেরিকা প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রাক্তন ভাইস-প্রেসিডেন্ট এমন কথাও বলেন, "পৃথিবীর বৃহত্তম ধনিক দেশ যুক্তরাষ্ট্র সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদের বণ্টনের দিক থেকে শ্রেণীহীন সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের খুবই কাছকাছি আসতে পেরেছে।"

একথা কেউ অস্বীকার করবেন না যে, আমেরিকার জনগণের শক্তি ও শ্রম অনুকূল ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পরিণত শিল্প শক্তি হিসাবে গড়ে তুলেছে, আরও অস্বীকার করা যায় না মালিকদের বিরুদ্ধে আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণী কঠোর সংগ্রাম করে উন্নত ধরণের জীবনযাত্রা অর্জন করেছে। কিন্তু যে রকম নির্লজ্জভাবে বুর্জোয়া প্রচারকরা এই ঘটনাগুলি সম্বন্ধে গবেষণা করে সমাজতন্ত্র অপেক্ষা ধনতন্ত্রকে বড় বলে প্রমাণ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেন, তা মোটেই বাস্তব চিত্র নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় "সুযোগ সুবিধাও সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের" অক্ষমতা বিশেষভাবে প্রমাণিত করে। সমস্ত জগত জানে যে বিরাট বিলাসের মধ্যে মুষ্টিমেয় শোষক বাস করে, তারই পাশাপাশি বিপুল সংখ্যায় শ্রমিক ও কৃষকের দৈনন্দিন জীবন চালানো কষ্টকর। ধনিক ও শ্রমিকের আয়ের ব্যবধান বিরাট এবং তা প্রত্যহ বেড়ে চলেছে। গত দশ বছরে প্রাণপণ সংগ্রাম করে শ্রমিকশ্রেণী মালিকদের কাছ থেকে যেটুকু রোজগার বৃদ্ধি আদায় করতে পেরেছে তা সেই সময়ের শ্রম উৎপাদনের সমানুপাতী নয় এবং এ থেকে বলা যায়, জাতীয় আয়ে শ্রমিক শ্রেণীর অংশ কমে যাচ্ছে। ১৯০০ থেকে ১৯৫৬ মধ্যে জাতীয় আয়ের যে অংশ কারখানাতে অফিস কর্মচারী এবং শ্রমিক শ্রেণী পেত, যারা আমেরিকার জনসংখ্যার শতকরা ৮৩ ভাগ, তা ৫৯·৭% থেকে ৪৫·৯% কমেছে। আমেরিকা ধনতন্ত্রের সমর্থকদেরও একথা স্বীকার করতে হয় যে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকরা কষ্টের মধ্যে দিন কাটায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, R. Lindholm এবং P. Driscoll যুক্তরাষ্ট্রের ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে গগনচুম্বী প্রশংসা করলেও স্বীকার করেন, আমেরিকার বহু পরিবার উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থান পায় না। (Lindholm ও P. Driscoll—Our American Economy, N. Y. Chicago, 1959, পৃ: ৯১)

অর্থনৈতিক বাস্তবতা একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে যুক্তরাষ্ট্রে ধনতন্ত্রের

প্রকৃতি পরিবর্তনের কোন ভিত্তি নেই। আমেরিকার ধনতন্ত্র স্বদেশে ও অন্যদেশে জনগণকে শোষণ করার প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল এবং এখনও তাই আছে। একমাত্র এই বিষয়েই একে "অতুলনীয়" বলা যায়। ধনতন্ত্র বিকাশ লাভ করবার যে সাধারণ নিয়মগুলি আছে, যুক্তরাষ্ট্রে সেগুলি অকেজো, একথা বলা যায় না, বিশেষ করে শ্রেণী সংগ্রামের নিয়মগুলি সম্বন্ধে ত নয়ই।

"শ্রেণী শান্তি" কল্পনা শ্রেণী সংগ্রামে বাস্তব ঘটনার দ্বারা এবং সর্বোপরি শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রামের দ্বারা মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত নিয়মগুলি অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিবিম্বিত এবং সেগুলি থেকেই এই সংগ্রামের জন্ম। এই সব পর্যায় বা উপাদানের উপর শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা নির্ভর করে এবং বিভিন্ন স্তরে শ্রেণী সংগ্রামের শক্তি বৃদ্ধির জন্যও এইগুলি দায়ী। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়গুলি নীচে উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

১। বহু সংখ্যক শ্রমিকদের জন্য স্বাভাবিক কর্ম-পরিবেশের অভাব—বেতনের গড়পড়তা পরিসংখ্যান দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিকদের হারের সত্যকার ব্যবধান গোপন রাখে, নিগ্রো, নারী ও শিশু শ্রমিকদের প্রতি বেতন ব্যবস্থায় যে নৃশংস বৈষম্যমূলক নীতি রয়েছে, তা প্রকাশ করা হয় না, রাত্রিকালীন কাজের জন্য যে অন্যায় বেতন দেওয়া হয়, রবিবার বা অন্য ছুটির দিন যে বেতন দেওয়া হয়, বিশেষ কাজের জন্য হার ঠিক করতে মালিকরা যে অশ্রাব্য গালিগালাজ করে, সবই অপ্রকাশিত থাকে। অনেক শ্রমিক পুরো সপ্তাহের কাজ পায় না, আবার অনেকে বাড়তি সময় খাটতে বাধ্য হয়।

কাজের জন্য অনুকূল পরিবেশ না থাকাই প্রায় সব শ্রমসমস্যা, এমন কি ধর্মঘটের একটি প্রধান কারণ। ১৯৫৮তে ৩,৬৯৪টি ধর্মঘটের মধ্যে ৩,৩৩৪টি বেতন সমস্যা, খাটুনির সময়, সুবিধা সঙ্কোচন ট্রেড ইউনিয়নেওর অধিকার এবং শ্রম সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়কে কেন্দ্র করে ঘটেছিল।

২। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বতঃক্রিয় যন্ত্র—আধুনিক ব্যবস্থায় স্বতঃক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার শ্রমিকের শ্রেণী-স্বার্থের সঙ্গে মালিকের বিরোধকে আরও তীব্র করে তুলেছে, উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্ব আরও সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছে। স্বতঃক্রিয় যন্ত্র ধনিকের মুনাফাকে বৃদ্ধি করে, কিন্তু শ্রমশক্তিকে তীব্র করে শ্রমিকের অবস্থাকে শোচনীয় করে তোলে এবং বেকারীর সংখ্যা বেড়ে যায়।

শ্রমশক্তির বৃদ্ধি শ্রমিককে আগের থেকে বেশি মানসিক ও দৈহিক শক্তি ব্যয় করায় কিন্তু অতিরিক্ত শক্তি ব্যয়ের কোন মূল্য পাওয়া যায় না, বেতন বৃদ্ধি বা কর্ম পরিবেশের উন্নতিতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। ফলে শ্রমিকের শক্তি তাড়াতাড়ি হ্রাস পায় এবং তার সমস্ত শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অসুস্থতা, দুর্ঘটনা এবং অকালমৃত্যুই এর ফল। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছরে দুর্ঘটনার সংখ্যা প্রায় কুড়ি লক্ষ এবং মূলতঃ অত্যধিক গতিবৃদ্ধি এবং নিরাপত্তার সুবন্দোবস্তের অভাবেই এগুলি ঘটে থাকে।

৩। বেকারী—আমেরিকা ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত সংকট এবং জনসাধারণের স্বার্থ বিরোধিতার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রকাশ। যুক্তরাষ্ট্রে এক বিপুল সংখ্যক স্থায়ী বেকারের অস্তিত্ব (১৯৬০ ফেব্রুয়ারীতে এই সংখ্যা ছিল ৭০ লক্ষ) শুধু অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক দিয়েও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ফলে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী চেতনা গড়ে উঠছে। একথা জেনেই একচেটিয়া শিল্পপতিরা বেকার-ভাতা দেবার ব্যবস্থা করেছেন, যার লক্ষ্য হোল শ্রমিকদের সংগ্রামকে শক্তিহীন করা।

কাজ না থাকাও মজুরের সংগ্রামকে ব্যাহত করে, কারণ কাজ চলে যাওয়া আমেরিকার মজুরের কাছে সব চেয়ে বড় দুঃখজনক ঘটনা। লড়াই করে কাজের সর্তাবলীর যেটুকু উন্নতি করা সম্ভব হয়, ধনপতিরা এই অবস্থার সুবিধা নিয়ে সেটুকু থেকেও তাকে বঞ্চিত করেন। ধনিকরা একথা বলতে কুণ্ঠিত হননা যে, শ্রম-উৎপাদন এবং পণ্যের গুণের উপর বেকারীর একটা সু-প্রভাব আছে, মজুরদের ঝামেলা মেটাতে এতে সুবিধা হয় এবং এই ধরণের আরও অনেক কিছু তারা বলেন। শ্রমিক শ্রেণীতে ভাঙ্গন ধরাবার জন্য তারা বেকারীকে ব্যবহার করেন। ধর্মঘট-বিঘ্নকারী গুপ্তচর এবং দালালদের তারা বেকারদের ভিতর থেকে বাছাই করেন এবং শ্রমিক-সংঘে তাদের কাজে লাগান।

৪। সংকট এবং উৎপাদনে মন্দা—যুক্তরাষ্ট্রে এই ঘটনাগুলি প্রায়ই ঘটে। গত মহাযুদ্ধের পর তিনবার মন্দার কাল এসেছে (১৯৪৮-৪৯,১৯৫৩-৫৪ এবং ১৯৫৭-৫৮) যার ফলে বেকারের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বেড়ে গেছে এবং শ্রমিকদের জীবনের মান অনেক নেমে গেছে। বহু আশাজনক ভবিষ্যদবাণী সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি বর্তমান সময়ে একটা গুরুতর সংকটের আবর্তে পড়েছে। এর প্রধান শিল্প, লোহা এবং ইস্পাত, ১৯৬০ এর শেষদিকে ৫৩% থেকে ৫৫% কাজ করছিল। যুক্তরাষ্ট্রের ইস্পাত-শ্রমিক সংঘের এক তৃতীয়াংশের

বেশী কর্মহীন হয়ে পড়েছিল বা আংশিক কাজ পাচ্ছিল।

উল্লিখিত উপাদানগুলিই হচ্ছে মূল কয়েকটি বিষয় যেগুলিকে ঘিরে অর্থনীতি-জগতে শ্রম, এবং মালিকের শ্রেণীদ্বন্দ্ব খুবই তীব্র হয়ে উঠেছে। শ্রেণীদ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করার প্রধান কারণ এইগুলিই।

সাধারণভাবে, যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক শ্রেণীসংগ্রাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সংগ্রাম একটানা গতিতে এগুচ্ছে না। এর উত্থান এবং পতন আছে, এবং তা নির্ভর করে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাসংঘাতের উপর। সংগ্রামের উত্থানের পরে হয়ত শান্তভাব দেখা যেতে পারে এবং বুর্জোয়া প্রচারকরা সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামের শেষ বা ভাঙ্গন বলে তাকে প্রমাণিত করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু প্রতি পরবর্তী স্তরই সংগ্রামকে উন্নত ধাপে নিয়ে যাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সংগ্রামে অন্ততঃ তিনটি বড় অভ্যুত্থান ঘটেছে: (১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, (২) ১৯২৯ এর অর্থনৈতিক সংকটের ফল, (৩) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। প্রতিটি স্তরেই সংগ্রাম আগের থেকে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

শোষণ তীব্র আকার ধারণ করে বলেই, মজুররা ধনিকদের কাছে তাদের দাবী পেশ করে। বর্তমানে তারা যার জন্য লড়াই করছে তা হোল: কর্ম-সংস্থানের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা, ভাড়া করা এবং গুলীচালনা বন্ধ করা, বাড়তি সুবিধা এবং বোনাস, কারখানাগুলিতে শ্রমিক-সংস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ইউনিয়নের ট্রেড্ ক্ষমতা, উন্নততর সামাজিক আইন ইত্যাদি।

পৃথিবীর অন্য কোন দেশের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রেই বেশি ধর্মঘট হয়ে থাকে। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি বছরে ৩৫০০০ থেকে ৫০০০ ধর্মঘট হয়, যাতে ১·৫ থেকে ৯৪·৫ মিলিয়ন মজুর যুক্ত থাকে। এই পরিসংখ্যান সমস্ত ধর্মঘটগুলিকে ধরে না। তা সত্ত্বেও, এ থেকে বোঝা যায় আমেরিকার শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংগ্রাম কি ব্যাপক এবং যুক্তরাষ্ট্রের মেহনতী মানুষ সম্পদ ভোগ ভোগ করেনা বা তারা শ্রেণী-শান্তিতে বিশ্বাস করে না।

বহুব্যাপক অর্থনৈতিক সংগ্রামের প্রমাণ এতই পরিষ্কার যে বুর্জোয়া অর্থনীতি-বিদরা আর চোখ বন্ধ করে থাকতে পারছেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা ভান করছেন, যে, এ ঠিক শ্রেণীসংগ্রাম নয়, অথবা একটি তৃতীয় শক্তি অর্থাৎ রাষ্ট্র শ্রমিকও মালিকের স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন করছে।

একথা ঠিক, সম্প্রতি রাষ্ট্রের ক্ষমতা বেড়েছে, যেমন দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রীয় কয়েকটি সংস্থার ক্ষমতার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আগের থেকে সামাজিক সম্পর্কের বিস্তৃততর এলাকা রাষ্ট্রের আয়ত্তে এসেছে, এবং তার মধ্যে বিশেষ ভাবে, অর্থনৈতিক এবং শ্রম-সম্পর্ক পড়ে।

কিন্তু এ ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় না যে, সমসাময়িক আমেরিকা রাষ্ট্রের শ্রেণী বৈশিষ্ট্য বা তার মূল চরিত্রের পরিবর্তন হয়েছে। প্রধান প্রশ্ন এখনও এক : কার স্বার্থে অর্থনৈতিক এবং শ্রম-সম্পর্ক পরিচালনা করবার আইনগুলি গঠিত হয় এবং কাদের হাতে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ন্যস্ত? বাস্তব ঘটনা থেকে জানা যায়, এসবের উদ্দেশ্য ধনতান্ত্রিক সমাজকে সুদৃঢ় এবং রক্ষা করা, আর বৃহৎ একচেটিয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজে প্রধান অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পদ-গুলি অধিকার করে আছে। যেহেতু রাষ্ট্রের কয়েকটি ব্যবস্থা যথা, সামাজিক আইন সংগত শ্রমিকদের দাবী মেনে নিয়েছে, এ থেকে প্রমাণ হয়না যে, রাষ্ট্র সমানভাবে শ্রমিক-স্বার্থ রক্ষায় উৎসাহী। একচেটিয়া শিল্পপতিরা শ্রমিকশ্রেণীর চাপে কখনও কখনও বিচ্ছিন্ন সাহায্য করে থাকেন। কিন্তু এ ধরণের সাহায্য করে থাকেন। কিন্তু এ ধরণের সাহায্য করার পিছনে তাদের একমাত্র লক্ষ্য হোল শ্রমিকসমাজকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর বিপ্লবী আঘাত হানা থেকে নিরস্ত করা। এখানেও, রাষ্ট্র ধনিকের স্বার্থে পরিচালিত একটি যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। রাষ্ট্রের "অর্থনৈতিক" এবং "রাজনৈতিক" কার্যাবলী প্রত্যেক বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার নতুন- পন্থা মাত্র; আর তা হোল শোষিত জনগণকে নিপীড়ন করা এবং শোষকের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। এই ধরণের কার্যা-বলীর আবির্ভাবের কারণ ধনতন্ত্রের সংকটবৃদ্ধি এবং যুক্তরাষ্ট্রে শ্রেণীসংগ্রাম।

"শ্রেণী শান্তির" স্বপক্ষে আমেরিকা প্রচারকদের প্রিয় "যুক্তি গুলি" রাজনৈতিক জগতকে স্পর্শ করে। তাদের সাধারণ বক্তব্য হোল, আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীর কাছে সমাজতন্ত্রের আদর্শবাদ "বিদেশী" যার জন্য তারা রাজ-নৈতিক সংগ্রামে "বর্জন" করেছে। প্রমাণ স্বরূপ, তারা জনসাধারণের কোন রাজনৈতিক দল যুক্তরাষ্ট্রে নেই, একথা বলেন। তাদের সমগ্র যুক্তি ধারা বাস্তব ঘটনাকে বিকৃত করে প্রতিষ্ঠিত।

অন্যান্য বৃহৎ ধনবাদী দেশগুলির তুলনায়, আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীর রাজ-নৈতিক সংগ্রাম দুর্বল কিন্তু তার কারণ রাজনীতিতে তাদের জন্মগত বিতৃষ্ণা বা

সাম্যবাদের প্রতি বিরোধ এবং ধনতন্ত্রের প্রতি "ভক্তি" নয়, যদিও বুর্জোয়া ব্যবস্থার সমর্থকরা এই ধরণের কথাই বলতে চান। বরং যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক কালের অনন্যতা, বাণিজ্যিক পরিস্থিতির অনুকূল পরিবেশ এবং আমেরিকার শ্রমিকদের জীবনের মানে কিছুটা উন্নতির ফলে এমন হওয়া স্বাভাবিক।

এই শতাব্দীতে দুটি বিশ্ব-যুদ্ধ লক্ষ লক্ষ প্রাণ ধ্বংস করেছে, বিপুল খনিজ সম্পদকে নষ্ট করেছে এবং প্রায় সবদেশেই অর্থনৈতিক বিকাশকে ব্যাহত করেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের ৪৩ বৎসরের জীবনের মধ্যে ১৮ বছর কেটেছে বহিঃশত্রুকে দূর করতে, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করতে। ধ্বংসকারী যুদ্ধ বৃটেন, ফ্রান্স, যুক্ত জার্মানী এবং ইটালীর অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত করেছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র শুধু যুদ্ধের ধ্বংস হতেই রক্ষা পায়নি, যুদ্ধের ফলে অবিশ্বাস্যভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। আমেরিকার শ্রমিকদের দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পরে যে বেতন বৃদ্ধি হয়েছে, তা সম্ভব হয়েছে একচেটিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির যুদ্ধকালীন অভূতপূর্ব মুনাফা স্ফীতির ফলে, একথা মোটেই গোপন নয়।

বহু বৎসর ধরে যুক্তরাষ্ট্র অন্য দেশের জনসাধারণকে বিনা বাধায় লুণ্ঠন করছিল এর উন্নতমানের জীবনযাত্রা আমেরিকা সাম্রাজবাদ দ্বারা পদানত দেশগুলি এবং উপনিবেশসমূহের জনগণের শোচনীয় দারিদ্র্য এবং অবনতির বিনিময়ে সম্ভব হয়েছে। আজ যুক্তরাষ্ট্র সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক শোষক এবং উপনিবেশবাদের সুদৃঢ় স্তম্ভ।

এই সমস্ত সামগ্রী থেকেই একচেটিয়া ধনতন্ত্রবাদ যুক্তরাষ্ট্রের "অদ্বিতীয় সত্তা" এবং "সমৃদ্ধি"র মিথ্যা কল্পনা রচনা করেছে, যার ফলে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সক্রিয়তা কমে গেছে। কেবলমাত্র রাজনীতিতে অন্ধবিশ্বাসী এবং স্বেচ্ছা-প্রণোদিত মিথ্যাভাষীরাই বলতে পারে, যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক শ্রেণী সংগ্রাম দূর হয়েছে, অথবা শ্রমিকরা সে সংগ্রাম বর্জন করেছে।

শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রামের কিছুটা দুর্বলতা আমেরিকার সমগ্র ইতিহাসের ধারার বৈশিষ্ট্য নয়, বুর্জোয়া আদর্শবাদীদের বিপরীত উক্তি সত্ত্বেও একথা বলা যায়। একথা সকলেই জানে যে উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলন সে দেশের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু পরে একচেটিয়া ধনতন্ত্র শ্রমিক শ্রেণী যে অর্থনৈতিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত ছিল, তা সার্থকভাবে ব্যবহার করে শ্রমিক জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা অবসন্ন করে দেয় এবং বহু রাজনৈতিক আইন প্রণয়ণ করে তাদের রাজনৈতিক কাঠামোকে দুর্বল করে দেয়। একচেটিয়া ধনতন্ত্র যে সমস্ত শ্রমিক অভিজাতকে কিনে নিয়েছে, তাদেরও দোষ কম নয়। যে সব দক্ষিণপন্থী সংস্কারকরা বুর্জোয়াদের দাস যেমন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, গোম্পেরস্, গ্রীন এবং অধুনা মিনি, রয়থার ইত্যাদি।

বর্তমানে একচেটিয়া ধনতন্ত্র শ্রমিক-সঙ্ঘের বিরুদ্ধে যে সমস্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত আক্রমণ জটিলভাবে চালনা করেছে তাতে শ্রমিকদের রাজনৈতিক সংগ্রাম শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। এদের হাতের মুঠোয় রয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল প্রচার ব্যবস্থা এবং দলগত যন্ত্র, অসংখ্য সাধারণ প্রতিষ্ঠান এবং ধর্ম-প্রতিষ্ঠান। তারা তাদের শক্তিশালী অস্ত্র রাষ্ট্রকেও একইভাবে ব্যবহার করে। যুদ্ধের পর থেকে আমরা দেখছি, ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা দূরীকরণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা প্রগতিবাদী ব্যক্তিদের উপর হামলা করেছে, এবং সেই সঙ্গে জাতীয় শ্রম-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠিত হয়েছে। বিচার-বিভাগ এফ, বি, আই, (কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান দপ্তর) এবং অন্যান্য সংগঠন যারা সাধারণের আদর্শগত ধারণা সাফ্ করবার কাজে লিপ্ত রয়েছেন, তাদের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বহু বছর ধরে সমগ্র দেশ ম্যাককার্থীর "আমেরিকা-বিরোধী" কার্যাবলী সমিতির দ্বারা সন্ত্রস্ত হয়েছিল, যার কাজ ছিল ফ্যাসীবাদী পন্থা অনুযায়ী শ্রমিক-আন্দোলনের প্রগতিবাদী নেতাদের দমন করা। রাষ্ট্র আন্দোলনের বিরুদ্ধে তার শাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করেছে থেকেই বোঝা যায় যে, শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম কখনই 'শেষ' হতে পারে বা 'ভেঙে' পড়েনি।

যুক্তরাষ্ট্রের কমুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধেই একচেটিয়া ধনতন্ত্র চরম আঘাত হেনেছে! ১৯৪৭এ কম্যুনিষ্ট-বিরোধী একটা কৃত্রিম-জিগির তুলে সেই পরিবেশে ট্যাফ্ট্-হার্টলে আইন পাশ হয়, ট্রেডইউনিয়নের দায়িত্বপূর্ণ পদ অধিকার সম্পর্কে কমুনিষ্ট পার্টি সদস্যের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। ১৯৫০এ, কংগ্রেস ম্যাক্‌ক্যারান অন্তর্নিরাপত্তা আইন পাশ করে এবং ১৯৫৪তে কম্যুনিষ্ট কার্যাবলী সংকোচন আইন পাশ হয় যার ফলে কমুনিষ্ট পার্টি প্রায় বেআইনী হয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রে কমুনিষ্ট পার্টির নেতাদের বিরুদ্ধে অবিরাম অভিযোগ আনা হতে

থাকে, যার ফলে পার্টির সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সাংঘাতিকভাবে নিপীড়িত হন। পার্টির সদস্যদের কর্মচ্যুত করা হয় এবং 'ডেলী ওয়ার্কার'-এর অফিস চড়াও করা হয়। ১৯৫৯ এর গ্রিফিন আইনে ট্রেড ইউনিয়নে কমুনিষ্টদের যে কোন রকম পদ অধিকারের বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয়।

তথাকথিত বুর্জোয়া সমর্থকেরা আমেরিকার শ্রমিকের 'কম্যুনিজম-বিরোধ' সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলতে পছন্দ করেন। যদি তারা যা বলেন তা যদি সত্য হয়, তা হলে কমুনিষ্টপার্টির বিরুদ্ধে এই সমস্ত কঠোর ব্যবস্থার প্রয়োজন কি? যে আদর্শ আমেরিকার কাছে 'বিদেশী' তা নিশ্চিহ্ন করবার জন্য এত আইনের কি প্রয়োজন? অথবা সমগ্র রাষ্ট্র শক্তিকে একত্রই বা করতে হবে কেন এবং কম্যুনিষ্ট বিরোধী জিগিরকে নির্লজ্জভাবে জাগিয়ে তুলতে হবে কেন? বুর্জোয়া সমর্থকেরা এই সমস্ত প্রশ্ন অগ্রাহ্য করতে চান। তাঁরা ভাল করেই জানেন, উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি আমেরিকার শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রচারে প্রধান বাধা।

১৯১৯এ যুক্তরাষ্ট্রে কমুনিষ্ট পার্টি স্থাপিত হয় এবং তখন থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত পার্টি শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে এবং শ্রমিক আন্দোলনের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। যুদ্ধের পরে কতকগুলি বাস্তব ঘটনার জন্য আমেরিকার শ্রমিকদের এক বৃহৎ অংশে'সমৃদ্ধির' মিথ্যা ধারণা প্রচারিত হওয়ায়, কম্যুনিষ্টদের উপর অমানুষিক উৎপীড়নের ফলে, বস্তুতঃ কম্যুনিষ্ট পার্টি বেআইন হওয়ায় এবং দক্ষিণ-পন্থী ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের বিশ্বাসঘাতক ভূমিকার জন্য আমেরিকা কম্যুনিষ্ট পার্টি কিছু পরিমাণে-শক্তি হারায়! সুবিধাবাদী লভ্‌স্টোন্ এবং ব্রাউডেন যারা আগে পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন, এবং আরও সম্প্রতি-কালে গেট্‌স্ এবং বিট্‌লমেল কর্তৃক পরিচালিত সংস্কারক বাদীদের দায়িত্বও কম নয়।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও, কমুনিষ্ট পার্টি নিজের শক্তিকে বজায় রেখেছে এবং এখনও সামান্য হলেও, আমেরিকার শ্রমিকদের দাবীও অধিকারের সংগ্রামে অগ্রগামীর ভূমিকা গ্রহণ করে। জনসাধারণের স্বার্থের জন্য পার্টি নির্ভীক সংগ্রাম করছে এবং তাদের শ্রেণী-চেতনা এবং রাজনৈতিক সক্রিয়তাকে উদ্দীপ্ত করছে।

একচেটিয়া ধনতন্ত্র শ্রমিক সাধারণের কোন পার্টি যাতে গঠিত না হয়, তার তার জন্যই কোন চেষ্টাই বাদ রাখছে না। সেই উদ্দেশ্যে তারা নতুন পার্টির

আইনগত স্বীকৃতিলাভে বাধা সৃষ্টি করছে এবং নির্বাচিত সংস্থাগুলিতে শ্রমিক প্রতিনিধি কমানর চেষ্টা করছে। তারা ভোট রাকস মিথ্যা দিয়ে পূরণ করছে এবং যে সমস্ত রাষ্ট্রে শ্রমিক ও শ্রম-কৃষিজীবিদের সংগঠন আছে, সেখানে তাদের বিরুদ্ধে সর্বদা অপপ্রচার চালাচ্ছে।

আমেরিকার একচেটিয়া ধনতন্ত্রবাদীদের আক্রমণের আর একটি লক্ষ্য ট্রেড ইউনিয়ন কারণ তারা বুঝতে পেরেছে যে, ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের সর্বাপেক্ষা প্রতিনিধিমূলক সংঘ এবং সেগুলির বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল নেতারা ধনতন্ত্রের সমর্থক হলেও উপযুক্ত অবস্থায় প্রগতিবাদী নেতাদের দ্বারা স্থানচ্যুত হতে পারে। এইজন্য তারা দক্ষিণপন্থী নেতাদের ট্রেড ইউনিয়ন থেকে পরিষ্কারভাবে পৃথক করে নেন এবং তাদের পূর্ণ সমর্থণ করলেও শ্রমিক সংগঠন হিসাবে ট্রেড-ইউনিয়নকে দুর্বল করতে চান।

যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে প্রচলিত সংগঠনবিরোধী আইন (১৯৪৭ এর ট্যাফ্‌ট-হার্টলে আইন এবং ১৯৫৯ এর লেনড্যাম-গ্রিফিন আইন) ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার ও স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করেছে, তাদের স্বাভাবিক কার্যাবলীতে বিঘ্ন ঘটায় এবং তাদের উপর সরকারীভাবে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হয়েছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রে তথাকথিত কাজে অধিকার আইন পাশের জন্য আন্দোলন হচ্ছে, যার গোপন উদ্দেশ্য ট্রেড ইউনিয়নের সভ্যসংখ্যা লাঘব করা এবং ট্রেড ইউনিয়নের সংগ্রামী চেতনাকে নিস্তেজ করা। প্রকৃত পক্ষে, ১৯টি রাষ্ট্রে এই ধরণের আইন পাশ হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়কে রাজনৈতিক কাজে অংশ গ্রহণে নিষেধ করে সংবিধান বিরোধী আইন পাশ হয়েছে; রাজনৈতিক এবং সংঙ্ঘবদ্ধ ধর্মঘট বেআইনী ঘোষিত হয়েছে। প্রগতিশীল ট্রেড ইউনিয়নের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে ইত্যাদি।

শ্রমিক সংঘগুলিকে শক্তিহীন করার এই সমস্ত ব্যবস্থার পটভূমিকায় শ্রেণীশান্তি ও শ্রেণী সমন্বয় নীতির বিশ্বাসঘাতক কাজের অর্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা এই নীতি সমর্থন করেছে এবং যখন এক-চেটিয়া ধনতন্ত্র শ্রমিকদের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানতে প্রস্তুত, তারা তখন শ্রমিক-শ্রেণীকে শক্তিহীন করার সোজা কর্মপন্থা গ্রহণ করছে। AFT-CIO সভাপতি জি, মিয়েনীর কাজের দ্বারাই এ ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে। ইস্পাত-শ্রমিকদের ১১৬দিন ব্যাপী বিরাট ধর্মঘট বেআইনী ঘোষিত হলে মিয়েনী প্রেসিডেন্ট

আইসেনহাওয়ারকে একটি সম্মেলন আহ্বান করতে অনুরোধ জানান যার কাজ হবে 'ভবিষ্যতে এধরণের ধর্ম্মঘট কন্ধ করা' এবং 'শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে ঐক্য পুনরুদ্ধার করা।' এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা প্রতিক্রিয়াশীল শ্রমিক-বিরোধী নীতি গ্রহণ করে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সক্রিয়তাকে নিস্তেজ করার চেষ্টা করছেন! এই নীতি যে একচেটিয়া ধনতন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধি করে এবং শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংগ্রামকে দুর্বল করে, তা জানা সত্ত্বেও ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা এই নীতিকেই তাদের প্রধান লক্ষ্য বলে স্থির করেছেন।

শ্রেণী সংগ্রামের রাজনৈতিক রূপ বুঝতে গেলে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক অবস্থা ভুলে গেলে চলবে না। আমেরিকার শ্রমিকরা এত উৎপীড়িত এবং তাদের অধিকার থেকে এতখানি বঞ্চিত যে, আমেরিকাকেই প্রধান ধনতন্ত্রবাদী দেশগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎপীড়ক রাষ্ট্র বলা যেতে পারে। আমেরিকার প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থা থেকেই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে কারণ আমেরিকা কংগ্রেসে একজনও শ্রমিক নেই। প্রচলিত দ্বি-দলীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্র এবং ভোটদানের নিয়ম দেশের সর্বোচ্চ আইন পরিষদের দ্বারা শ্রমিক প্রতিনিধিদের কাছে রুদ্ধ করে রেখেছে। কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় আইন এবং শাসন পরিষদ, বিচার ব্যবস্থা সবই ধনতন্ত্রের গোঁড়া সমর্থকদের দ্বারা পরিচালিত হয়। একচেটিয়া ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আইনগত সংগ্রামের কোন অধিকারই শ্রমিকশ্রেণীর নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক জীবনের এই প্রধান বৈশিষ্ট্য আমেরিকার শ্রমিক-শ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের বিকাশে গভীর রেখাপাত করেছে এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্বে বিভিন্ন ধারা এবং রূপের ব্যাখ্যা করতে পারে। কিন্তু আমেরিকার জীবনযাত্রার এই বৈশিষ্ট্যগুলির পিছনে ধনতন্ত্রের সাধারণ নিয়মগুলি কার্যকরী নেই একথা মনে করা ভুল হবে, কারণ শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম এইভাবেই সৃষ্টি হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে শ্রেণী-সংগ্রামের রাজনৈতিক আকারের প্রধান প্রকাশ থেকে এ কথা বলা সম্ভব নয়, যে, এই আন্দোলনে সরাসরি ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে লক্ষ্যীভূত। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে থেকে যতটা সম্ভব ততটা সংগ্রামই শ্রমিকশ্রেণী

একচেটিয়া ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে চালিয়ে যাচ্ছে। সংগ্রামের মাধ্যমে একচেটিয়া ধনতন্ত্রবিরোধী যে সংঘবদ্ধতা গড়ে উঠেছে তাতে তাদের রাজনৈতিক প্রভুত্বে ভাঙ্গন ধরেছে এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী আরও এগিয়ে আসবে।

শান্তি ও গণতন্ত্রের মূলমন্ত্রে আমেরিকা জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংহত হচ্ছে। আমেরিকা জনসাধারণের বৃহৎ অংশ শান্তি, নিরস্ত্রীকরণ এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। খুব অসম্ভব নয়, যে একচেটিয়া ধনতন্ত্রের প্রতিক্রিয়াশীল বৈদেশিক নীতির বিরুদ্ধে ধনতন্ত্র-বিরোধী শ্রমিক, চাষী এবং নিগ্রো একজোট হবে। ধনতন্ত্রের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য ঠাণ্ডা লড়াই, অস্ত্রের উৎপাদন এবং যুদ্ধ-অর্থনীতিকে অব্যাহত রাখা। এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, একচেটিয়া ধনতন্ত্রের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণী এবং সমস্ত আমেরিকার জনসাধারণের স্বার্থে বিরোধ আছে। প্রতিক্রিয়াশীল বৈদেশিক নীতি একচেটিয়া ধনতন্ত্রকে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহায্য করছে। লিন্‌কন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ককস্ বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র বৈদেশিক রাজনৈতিক জগতে নিজের দেশের শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।" (O. Cox, Caste, Class and Race. N. Y. ১৯৫৯। পৃঃ ১৭০)

সাম্প্রতিককালে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা এবং নাগরিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম এত বিরাট আকার ধারণ করেছে যার ফলে শাসকগোষ্ঠী প্রগতিবাদী ব্যক্তিদের বিদেশযাত্রার সম্পর্কে পাশপোর্টের উপর নিয়ন্ত্রণ তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে, কমুনিষ্ট পার্টির সদস্যদের বিরুদ্ধে যে সব মামলা চলছিল তা বন্ধ করেছে, কুখ্যাত ম্যাক্‌কার্থি কমিটিকে ভেঙে দিয়েছে এবং নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে অনিচ্ছার সঙ্গে হলেও ১৯৬০-এর আইনে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু ম্যাক্‌কার্থীবাদের হুমকী এখনও শোনা যাচ্ছে, এবং আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীর নাগরিক অধিকারের জন্য তীব্র সংগ্রাম করতে হবে। নিগ্রো জনসাধারণ বর্ণগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাৎপর্যপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের লক্ষ্য হোল সমান নাগরিক অধিকার এবং স্বাধীনতা। লিট্‌ল রকের ঘটনা এবং সুপ্রীম বিচারালয়ের পৃথকীকরণ বিরোধী আদেশ জারী হওয়ার এই সংগ্রাম খুবই জোরালো হয়ে উঠেছে। বর্ণনির্বিশেষে সমানাধিকারের জন্য তরুণদের অবস্থান-ধর্মঘট সংগ্রামের একটি

বিশেষ রূপ। শ্রমিক আন্দোলনের প্রগতিশীল শক্তি নিগ্রোদের এবং অন্যান্য যে সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শ্রমিকশ্রেণীতে ভাঙ্গন ধরার বা জন্য বৈষম্য-মূলক প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, তাদের দাবীকে সমর্থন করছে।

বুর্জোয়া আদর্শবাদীরা শ্রমিকদের ধনতন্ত্রের সঙ্গে সমন্বিত করাবার যতই চেষ্টা করুক না কেন, বাস্তব ঘটনা হোল যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক শ্রেণীসংগ্রাম রয়েছে, শুধু তাই নয়, এই সংগ্রাম গুরুতর আকার ধারণ করছে। সমগ্র বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রভুত্বের অবসান হয়ে আসছে। অল্পদিনের মধ্যেই সোভিয়েট ইউনিয়ন জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনযাত্রার মান প্রতিষ্ঠিত করবে। এশিয়া আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার জনসাধারণের বিরাট স্বাধীনতা সংগ্রাম আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি কাঁপিয়ে তুলেছে এবং বিদেশের ভূমিতে অপ্রতিহত লুণ্ঠনকে বন্ধ করেছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নূতন অভ্যুত্থান ঘটছে এবং নূতন শক্তিগুলি সংঘর্ষে উপনীত হচ্ছে। এই সব ঘটনাগুলি ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হবে এবং ধনতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী অবসান ঘটবে।

এই সব নূতন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার শ্রমিক সাধারণের শ্রেণী চেতনা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে সমাজতন্ত্রের আদর্শ আরও ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, ব্যক্তিগত উপাদান যা এখনও অপরিস্ফুট আরও শক্তিলাভ করলে আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণী একচেটিয়া ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রাম ঘোষণা করবে এবং ধনতন্ত্রে দাসত্বকে মুক্তিলাভ করবে।

আমেরিকার অর্থনৈনিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির বাস্তবতা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রে "শ্রেণীশান্তি" বলে কোন পদার্থ নেই এবং শ্রমিক এবং ধনতন্ত্রবাদের মধ্যে সংঘাত বৃদ্ধি পেয়ে শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্রতর করে তুলছে। "শ্রেণীশান্তি" একটি মিথ্যা ধারণা এবং শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংগ্রামকে ধ্বংস করার জন্য, ধনতন্ত্রবাদ ধীরে ধীরে "শান্তিপূর্ণভাবে" সমাজতন্ত্রবাদে রূপান্তরিত হতে পারে এবং সংগ্রম ও বিপ্লবের কোন প্রয়োজন নাই এরকমের অলীক ধারণা সৃষ্টি করবার জন্য "শ্রেণীশক্তি"র ধারণাকে আবিষ্কার করা হয়েছে। এইকারণে সমগ্র আন্তর্জাতিক এবং কমুনিষ্ট আন্দোলনের,

মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের শ্রেণীশান্তির ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা কর্তব্য।
(Communist No. 6, 1961)

M. Baglai-র The Myth of "Class Peace" and Capitalist Realities-এর অনুবাদ করেছেন মৃণাল ভদ্র ॥

সার্ত্রীয় অস্তিবাদের সমীক্ষা

অনাদিকুমার লাহিড়ী

প্রত্যেক মানুষই কিছু-না-কিছু পরিমাণে মনোবিজ্ঞানী ও দার্শনিক—দুই-ই। অভিজ্ঞতা-পুষ্ট পার্থিব জীবনকে কেন্দ্র ক'রে পরিদৃশ্যমান জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বহুবিধ সমস্যা আত্মপ্রকাশ করে। সেই সকল সমস্যার সমাধানকল্পে সচেতন বা অবচেতনভাবে প্রায় প্রতিটি মানুষই সুসংবদ্ধ, অর্দ্ধ-সংবদ্ধও অসংবদ্ধ এক এক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলে। সকলের মধ্যে এই জীবন জিজ্ঞাসা ও তার উত্তর প্রদান স্বভাব সিদ্ধ ব্যাপার হ'লেও স্বভার-দার্শনিক বা মনীষী ব্যক্তিগণের মধ্যেই আমরা এমন আকারে জগৎ ও জীবন সংক্রান্ত নানা মৌলিক জিজ্ঞাসা ও সমাধান প্রচেষ্টা লক্ষ্য করি যা'র ফলে আমরা সহজেই তাঁদের নানা ভাব-বিপ্লবের জনক হিসেবে চিনতে পারি আর ইতিহাসের পাতায় সেই সকল মনীষীদের নাম লিপিবদ্ধ করি। বিশ্বের চিন্তাধারায় বিভিন্ন যুগে মনোবিজ্ঞানী ও দার্শনিক তাঁদের স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। অতি আধুনিককালে যে সকল বিশিষ্ট ভাবধারা অতীত ঐতিহ্যের একঘেঁয়েমীর পাশ ছিন্ন করতে সচেষ্ট ও সফল (অন্ততঃ আংশিকভাবে) হয়েছে—তাদের মধ্যে ফরাসী ও জার্মেনীদেশে আবির্ভূত 'অস্তিবাদ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফরাসী 'সার্ত্র' হলেন এই ইউরোপীয় 'অস্তিবাদে'র এক বলিষ্ঠ ও প্রখ্যাত প্রচারক। একমাত্র অস্তিবাদী না হ'লেও সার্ত্র জনসাধারণের পরিচিত ও প্রশংসাপ্রাপ্ত একমাত্র অস্তিবাদের বিবেচ্য। সাহিত্য উপন্যাসের মাধ্যমে তাঁর ভাব প্রচারই এই জনখ্যাতির মূল কারণ। অধুনা-প্রকাশিত বিশ্বসাহিত্যে ছোটগল্প ও উপন্যাসের মধ্যে যে ব্যক্তিকেন্দ্রিকভাব সুপরিস্ফুট হয়েছে—সার্ত্রের মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ব্যক্তি-রূপের পরিকল্পনায় তার এক বিশেষ সমর্থন রয়েছে। সাহিত্যের গবেষণাগারে সার্ত্র-প্রদর্শিত ব্যক্তিরূপের সাধারণ টাইপ' যে অত্যন্ত মূল্যবান—তা' নিঃসন্দিগ্ধ। তবে এখন প্রশ্ন উঠে সে, সার্ত্রের ভাবস্রোত বাস্তবিকই মনোবিজ্ঞান ও দর্শন-শাস্ত্র সম্মত কিনা।

নিরপেক্ষ বিচারের আলোকে আমাদের দেখা প্রয়োজন যে, সার্ত্রের অভিনব চিন্তাধারা মূল্যবান শিল্প প্রকাশ হিসেবে বরণীয় হলেও মনোবিজ্ঞান ও দর্শনের আসরে তার স্থায়ী আসন লাভ কতখানি সম্ভব ও যুক্তিযুক্ত। সার্ত্রের চিন্তা-বৈশিষ্ট্যের কারণ জানার জন্য এক সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পটভূমিকার অবতারণা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।—

ঐতিহাসিক পট-ভূমিকা ঃ অনেকে অস্তিবাদের উৎস সন্ধান করেন প্রাচীন গ্রীক্ দর্শনে বিশেষতঃ 'সিনিক্' ও 'সিরেনাইক্' দর্শনে। উল্লিখিত এই দর্শনশাখা দুইটি প্রকৃতপক্ষে দর্শন-সম্প্রদায় নয়—কিন্তু জগতের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী এবং মূলতঃ জীবন যাপনের দুইটি ধারা বা খসড়া। ব্যক্তি মনের অনুভূতি ও ইচ্ছা সংবলিত যে অপরোক্ষ দিক আছে—তার উপর জোর দেওয়াতেই এই সম্প্রদায় দুইটি অস্তিবাদের আবির্ভাব সূচনা করে। অস্তিবাদের যে ভাব বন্যা—তার সুস্পষ্ট সূচনা করেন হল্যাণ্ডের ধর্ম্ম-শাস্ত্রজ্ঞ সোরেন কির্কেগার্ড (১৮১৩—'৫৫)। অতি-তন্ত্রগঠন, অতি-প্রজ্ঞাবাদ, বিমূর্ত্ত পরমতত্ত্ব বাদ, ব্যক্তি-চ্যুতি-করণ ও নিষ্ফল চিন্তনের সকল ধারার বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ ভাব বিপ্লব হিসেবে এই অস্তিবাদ আত্ম-প্রকাশ করে। হেগেলীয় ও নয়া হেগেলীয় দর্শনের বিরুদ্ধেই অস্তিবাদের প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট। এই কারণে, অস্তিবাদের নূতন ভাব-বিপ্লব-প্রায় সমসাময়িক নানা উল্লেখযোগ্য ভাব-বিপ্লবের সঙ্গে উক্ত বিষয়ে সঙ্গতিপূর্ণ। বের্গসোঁ-র 'সৃষ্টিধর্ম্মী বিবর্ত্তনবাদ, জেম্‌স্ ও ডিউই-র 'প্রয়োগবাদ', শীলারের 'মানবতা-বাদ, কার্ণাপ ও আয়ারের 'ন্যায় সঙ্গত প্রত্যক্ষবাদ' এবং ক্রোচে-জেন্টিলের নয়া-ভাববাদ—আধুনিক বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইচ্ছাতন্ত্র-বাদের স্বাধীন মত পোষকদের মধ্যে সোপেন্‌হাওয়ার ও নীশের নাম প্রণিধানযোগ্য। প্রতি-ক্রিয়াশীল সকল প্রকার ভাব-ধারার মধ্যে যে সাধর্ম্য বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয়—তা' হল বুদ্ধিজাত ছক প্রণালীর সাহায্যে সমগ্র সত্তাকে নিঃশেষিত করার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্র ঘোষণা। সম সাময়িক আর সকল ভাব-ধারার সঙ্গে ঐক্য বজায় রেখে অস্তিবাদ,—চিন্তাকর্ষক পরমতত্ত্ববাদ হ'তে ব্যক্তি কেন্দ্রিকতার দিকে,—বিমূর্ত্ত চিন্তন-প্রক্রিয়া হতে মূর্ত্ত অভিজ্ঞতার দিকে ও অভিজ্ঞতা পূর্ব্ব নিয়ন্ত্রণ সকল হতে অভিজ্ঞতা পর নিয়ন্ত্রণ শূন্যতার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরাতে সচেষ্ট হয়েছে। জাগতিক পট ভূমিকায় অভিজ্ঞতা

অর্জনকারী ব্যক্তি-সকলকে ঘিরে যে নিয়ত পরিবর্ত্তন ও আকস্মিকতা দেখা যায়—অস্তিবাদে তাদেরই বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছে। সার্ত্রের অস্তিবাদে ব্যক্তি মনের বিভিন্ন সমস্যা—উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, আশা-নৈরাশ্য, দায়িত্ব-স্বাধীনতা প্রধান আলোচ্য বিষয় রূপে দেখা দিয়েছে। এই বিষয়-সকলের আলোচনার জন্য সার্ত্রের পূর্ব্বসূরীদের মূল চিন্তাধারার পর্য্যায়ে ক্রম জানা দরকার।

সার্ত্র-পূর্ব্ব-অস্তিবাদ ঃ হেগেলীয় জীবন বৃত্তের অব্যবহিত পরেই কির্কেগার্ডের আবির্ভাব হয় এবং তিনি হেগেলের পূর্ণতত্ত্ববাদের তীব্র সমালোচনা করেন। তার প্রধান কারণ এই যে, হেগেলীয় সত্তার রূপ-কল্পনায় সীমিত ব্যক্তি বিশেষের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে। পূর্ণসত্তার চৈতন্য প্রকাশের এক ক্ষুদ্র মাধ্যম হল ব্যক্তি চৈতন্য; সামগ্রিকতার আকারে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। আস্তিক ও নাস্তিক প্রকার ভেদে 'অস্তিবাদ'—দুইটি বৃহৎ শাখায় বিভক্ত। তাদের মধ্যে,—প্রথম শাখার ধারক হলেন কির্কেগার্ড, কার্ল য়েস্পার্স (১৮৮৩—) ও গ্যাব্রিয়েল মার্সেল্ (১৮৮৯—); দ্বিতীয় শাখার প্রচারক হলেন মার্টিন হাইডেগার (১৮৮৯—) ও জাপল্ সার্ত্র (১৯০৫—)। নাস্তিক অস্তিবাদীদের বিরুদ্ধে আস্তিক অস্তিবাদীদের সমর্থিত বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বরের সত্তায় ব্যক্তি সকলের ঐকান্তিক অংশ গ্রহণ কেবলমাত্র এক প্রাপনীয় আশা নয়—এক নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যও বটে। এই অংশ গ্রহণের ব্যাপার ব্যক্তি জীবনকে আলোকিত ও পরিবর্ত্তিত করে! ব্যক্তি সকলের অনন্ত সম্ভাবনা ও ঈশ্বরীয় সত্তার অনন্ত সম্পদ বাস্তবিকই আমাদের বোধাতীত; কিন্তু ঈশ্বরীয় সত্তার সহিত ব্যক্তি জীবনের অপরোক্ষ সংযোগ ব্যক্তি বোধের অপূর্ণতা বিদূরিত করে।

বাস্তবভাসবাদী হুসের্লের শিষ্য মার্টিন হাইডেগার নাস্তিক অস্তিবাদের সূচনা করেন। হাইডেগার 'সত্তা' এবং 'সারবত্তা'র মধ্যে এক ভেদরেখা প্রদর্শন ক'রে বলেন সে, আমাদের ক্ষেত্রে 'সারবত্তা'র বহুপূর্বেই প্রত্যক্ষভাবে 'সত্তা' প্রকটিত হয় এবং 'সারবত্তা' সম্পদ্যমান অবস্থায় অস্পষ্টভাবে দেখা দেয়। এই ব্যাপারে এবং আরও নানা ব্যাপারে সার্ত্র—হাইডেগারের মত অনুসরণ করেন; আর সেই কারণে হাইডেগারের মত-বৈশিষ্ট্য বিশদাকারে বিবৃত করা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

সার্ত্রের অস্তিবাদ ঃ অস্তি-বাদের সকল পর্যায়ের এবং বিশেষতঃ সার্ত্রের

মতবাদের মূলকথা হ'ল ঃ 'সত্তা, (existence)'-সার-বত্তা'র অগ্রণী'। জাগতিক ব্যক্তিতার অস্তিত্ব ছাড়া আর কোন কিছু সম্পর্কেই সরাসরিভাবে সচেতন নয়। তার জন্মের পূর্বে কি ঘটেছে আর পরেই বা কি ঘটবে—সে সম্পর্কে সে অজ্ঞ। সে কেবল তার প্রাণ-শক্তি আর ইচ্ছা-শক্তির বিষয়ে পূর্ণ সচেতন। যেহেতু কোন মানুষ নিজের ইচ্ছানুযায়ী তার স্বরূপ প্রস্তুত ক'রতে পারে, সেই কারণে সে সর্বদাই কেবলমাত্র স্বীয় পরিশ্রমে তার 'সারবত্তা সৃষ্টি ক'রে চলে। 'সারবত্তা' (essence)—সুগঠিত, সুসিদ্ধ কোন পদার্থ নয়—কিন্তু তা'হ'ল সদা-ক্রিয়মান, অস্পষ্ট, পূর্ব-গনন-অযোগ্য ঐচ্ছিক শক্তি পূর্ণ ব্যক্তির এক প্রকৃতি। জাগতিক দশায় মানুষ যে সত্তা উপভোগ করে—তা' কোনক্রমেই স্ব-নির্বাচিত নয়—অজ্ঞাত শক্তির দ্বারা বহিরারোপিত ব্যাপার মাত্র। মানুষের চৈতন্য ধর্ম—এক আগন্তুকফলমাত্র। ব্যক্তির চৈতন্য বা স্ব প্রয়োজনীয় সত্তা (being-for-itsclf) ব্যক্তি-সত্তাকে অতিক্রান্ত করতে উন্মুখ—কিন্তু স্বরোপিত প্রতিবন্ধকতার ফলে স্বীয় প্রচেষ্টায় ব্যর্থকাম হ'য়ে সে হতাশার আবির্ভাব ঘটায়। জাগতিক জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে অপর কোন সাহায্যকারী না থাকায়, ব্যক্তি বিশেষ তা'র কার্য্য পরিধির' সঙ্কীর্ণতা সত্ত্বেও কার্য ধারা নির্বাচনে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ব্যক্তির সীমাহীন স্বাধীনতার সঙ্গে পূর্ণ দায়িত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। সার্ত্রের মতবাদ অনুসারে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বর্জনের ফলে আমরা জগতে সম্পূর্ণ অসহায়ভাবে পরিত্যক্ত হই। আর সেই কারণে সকল দায়িত্ববোধ সরাসরি আমাদের সীমিত শক্তির সহায়তায় আমরা মৃত্যুর সঙ্গে সর্বদা সংগ্রাম করি—আর তার ফলে আমরা এক রুদ্ধ আবেগ (amguish) ও ভীতি-ভাব (dread) পোষণ না করে পারিনা। মুষ্টিমেয় আশাপূর্ণ সম্ভাবনার সম্মুখে নিজ কার্য নির্বাচন আমাদেরই ব্যাপার হওয়ায় সহজেই 'হতাশা' দেখা দেয়। আপন ব্যাপারে আপনাকেই সহায্য করতে হয়। সার্ত্রের মতানুসারে, ডেকার্টের 'চিন্তাকর্তা' ('cogito') ব্যক্তি-নিষ্ঠ হলেও বাহ্যবস্তুর সম্পর্কে সকলের নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ম কানুন প্রচার করে। কাণ্টের 'সার্বজনীন নৈতিক আকার সকল' কিন্তু অন্তঃসারশূন্য ও নিরর্থক। 'ধর্মাধর্ম-বিচারবিদ্যা'র উল্লেখ করলে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়। ব্যক্তি স্বয়ংই নৈতিক নির্বাচনের যোগ্য মালিক—তার হয়ে অন্য কোন ব্যক্তি নৈতিক নির্বাচন করতে সক্ষম নয়। স্ব-মত-সমর্থনে সার্ত্র একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ

করেন। এক ফরাসী ছাত্র দুইটি বিকল্প কর্মপন্থার সম্মুখীন—(১) অসহায়া মাতৃদেবীর পার্শ্ববর্ত্তী থেকে তাঁর সেবা করা; (২) মাতৃভূমির রক্ষা কল্পে ফরাসী সৈন্যদলে যোগদান করা। প্রথম ক্ষেত্রে লক্ষ্যটি সুস্পষ্ট কিন্তু সঙ্কীর্ণ আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে লক্ষ্যটি দূরবর্ত্তী কিন্তু ব্যাপক। সার্ত্রের মতে, এই জাতীয় সমস্যাসঙ্কুল নির্বাচন ব্যাপারে 'কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্যের' উপায় হিসাবে ব্যবহার না করার কান্টীয় নীতি একেবারেই অচল। সেইজন্য সার্ত্র উল্লিখিত ছাত্রকে স্বকীয়ভাবে তার কর্মপন্থা নির্বাচন করতে পরামর্শ দেন।

ছাত্রটি যদি কোন ক্ষমতাসীন ব্যক্তির নির্দেশানুযায়ী কাজ করার সিদ্ধান্ত করত—তবে সে সম্ভাব্য নির্দেশ বা উত্তর সম্পর্কে তার পূর্ব-কল্পিত নির্বাচন প্রকাশ করত। অতএব দেখা যায় সে, ছাত্রটি নৈতিক দায়িত্ব বোধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ একাকী ও নিঃসহায়। চিরাচরিত আর এক মতবাদকেও সার্ত্র তীব্র আঘাত হানেন। অনেকে আত্ম-স্খলন গোপনের জন্য এই মতের আশ্রয় নেয়। ভীরুতার কারণ দেখবার ছলে কোন ভীরু ব্যক্তি তার ভীরু মেজাজ বা পুরুষানুক্রমিক প্রভাবের উল্লেখ করতে পারে। কিন্তু সার্ত্রের মতে কোন ব্যক্তিই আজন্ম ভীরু বা আজন্ম বীরপুরুষ নয়। মানুষ নিজেকে যেমন গঠন করে—সে সেইরকমই গঠিত হয়। কোন নিয়ন্ত্রণকারী কারণ উল্লেখ করলে নৈতিক ক্রিয়ার দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না সার্ত্রের অভিনব চিন্তাধারায় আর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল এই যে, সার্ত্র মনে করেন; কোন ব্যক্তির প্রতিভা তার বাহ্য সৃষ্টির সম্পূর্ণ হিসাবের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় ধরা পড়ে। প্রতিভার মূল্যায়নে সুপ্ত সম্ভাবনা সকলের কোন স্থান নেই। সম্পূর্ণ হিসাবের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় ধরা পড়ে। প্রতিভার মূল্যায়ণে সুপ্ত সম্ভাবনা সকলের কোন স্থান নেই। সম্পূর্ণ শিল্প-কৃতির মাধ্যমেই যে কোন শিল্পীর শিল্প-রূপেই যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়।

সার্ত্র নিজেকে মানব-বাদী বলে প্রচার করেন। তিনি কিন্তু 'মানব-বাদে'র প্রচলিত অর্থানুযায়ী মানববাদী নন। প্রকৃতির উদ্দিষ্ট লক্ষ্যস্থল হিসেবে সার্ত্র মানুষকে রূপায়িত করেন না। সার্ত্রের 'অস্তিবাদী মানবতা-বাদ' ইঙ্গিত করে যে 'মানুষ সর্বদা তার স্ব-সত্তার বাহিরে অবস্থান করতে চায়; স্বীয় সত্তার বাইরে আপনাকে প্রতিফলিত করে এবং আপনাকে হারিয়ে মানুষ তার মানব সত্তা'কে বাঁচিয়ে রাখে। আবার—সে জগৎ ব্যতিরিক্ত লক্ষ্য সকল অনুসরণ

করেই বেঁচে থাককে সমর্থ হয়। যেহেতু, মানুষ এরূপ আত্ম-অতিক্রমণকারী এবং এই অতিক্রমণের সম্পর্কেই সে বাহ্য বস্তুগ্রহণে সক্ষম—সেই কারণে সে আত্ম-উৎক্রমণের মূল কেন্দ্র। মানবীয় জগৎ ছাড়া—মানুষের আত্ম-কেন্দ্রিকতার জগৎ ছাড়া আর কোন জগতেরই অস্তিত্ব নেই। (পৃষ্ঠা-৫৫ "অস্তিবাদ"—জাঁপল্‌সার্ত্র-মেথুয়েন-৫১)

সার্ত্রের অস্তিবাদ—প্রকৃতিবাদ, পূর্ণতত্ত্ববাদ ও সাম্যবাদের বিরুদ্ধে এক প্রতিক্রিয়া সূচনা করে। সার্ত্রের মতে দলগতভাবে আদর্শ সমূহ পোষণের আস্থা নিতান্তই ভ্রান্ত। মানব প্রকৃতির অভিজ্ঞতা-পূর্ব নিয়ন্ত্রণ-করণের ব্যাপারে সার্ত্র যেমন আমাদের সতর্ক করেন ও মোহশূন্য হতে নির্দেশ দেন—দলীয় আদর্শ-সংরক্ষণ ও লক্ষ্যানুসরণের ব্যাপারেও তিনি আমাদের মোহ ত্যাগ করতে পরামর্শ দেন।

এখন আমরা সার্ত্রীয় অস্তিবাদের—উপরি-প্রদত্ত ভাষ্যের এক সমীক্ষা উপস্থাপিত করব। প্রদত্ত ভাষ্য থেকে দেখা যায় যে সার্ত্রীয় মতবাদ যুক্তি-ভিত্তিক বা দর্শন-ভিত্তিক না হয়ে অধিকমাত্রায় মনোবিজ্ঞানভিত্তিক বস্তুভাস-বাদ-ভিত্তিক (phenomenological) হয়ে পড়েছে।

সমীক্ষা ঃ আমরা আগেই দেখেছি যে, অস্তিবাদের নানা আস্তর বিভাস আছে। য়েস্পার্সের সুমহান ঈশ্বরবাদ, সার্ত্রের নিরীশ্বরবাদ, হাইডেগারের চরম অজ্ঞেয়তাবাদ ও মার্সেলের জীব-ঈশ্বরানুষঙ্গী মতবাদ—এই সকল মত-বাদের পক্ষেই এই একই নাম অর্থাৎ 'অস্তিবাদ' সমানভাবে প্রযোজ্য। অতএব সার্ত্র যুক্তি যুক্ত ভাবেই বলেন যে, ঐ নাম এখন আর কোন অর্থই প্রকাশ করে না।

এখানে আমরা প্রখ্যাত অস্তিবাদী হিসাবে, জাঁপল সার্ত্রের-মত সকলই যুক্তির আলোকে বিচার করে দেখবো যে—সে সকল মত কত দূর সুসঙ্গত ও গ্রহণ যোগ্য।—

(১) সার্ত্র, যতই তাঁর মত-বাদকে যুক্তি-সিদ্ধ চিন্তা প্রসূতি হিসেবে দেখবার চেষ্টা করবেন ততই তিনি স্ব-বিরুদ্ধ কথা বলে সমালোচকের লক্ষ্য বস্তু হয়ে দাঁড়াবেন। সার্ত্রের মতে, 'চিন্তা' হল ইচ্ছা প্রবাহের এক আকস্মিক প্রকাশ—উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার ফল; আর সেই কারণে সার্ত্রের পাঠকবর্গ তাঁর উদ্ভাবিত 'অস্তিত্ব', 'নাস্তি', 'সারবত্তা' ও 'স্বাধীনতা' প্রভৃতি বিষয়ক তথ্য

সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণভাবে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে। অস্তিবাদ যদি যুক্তির অসারতা প্রকাশ করে—তবে—তবে অস্তিবাদ স্বয়ং যুক্তি সিদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়না। ইচ্ছা ও অনুভূতির প্রাধান্য প্রকাশক অস্তিবাদ বাস্তবিক কোন মত-বাদ কিনা তা লন্দিগ্ধ বিষয়। এক বা একাধিক ভাবোচ্ছ্বাসের রূপ কল্পনা ও চিন্তা ছাড়া চলতে পারে না।

(২) সুসমঞ্জস অনিয়ন্ত্রণবাদ ও স্বাধীনতার সম্যক ধারণা—পরস্পর বিরুদ্ধ বিষয়। জগৎ সম্পর্কে যে অজ্ঞাবাদ সাত্র পোষণ করেন এবং যে মতে মানুষের প্রকৃতি অনির্দিষ্ট সেই মতে তর্ক-সিদ্ধভাবে যা স্বীকার করা যায়—তা' গুরু দায়িত্ব বোধ পূর্ণ স্বাধীনতা নয়—তা' হ'ল বিচক্ষণভাবে জগতে কাজ-কর্ম করবার ছাড় পত্র মাত্র। কোন ব্যক্তি যদি তা'র বর্ত্তমান অস্তিত্বের পূর্বের ও পরের অবস্থা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ থাকে—তবে সে বিনা দ্বিধায় স্থূল ভোগ-বাদ স্বীকার করে নিতে পারে। সাত্র অবশ্য বলতে পারেন যে, মনুষ তার স্ব-কর্ম-পন্থা নির্বাচনকালে সকলেরই কর্ম-পন্থা নিয়ন্ত্রিত করে বলে, সে কখনই অসৎ পন্থা বেছে নিতে পারে না। কিন্তু সাত্রের এই অভিমতের পাল্টা জবাব হবে এই যে, কর্মকর্তা যখন সামাজিক সাহায্য প সামাজিক ন্যায় বিচার সম্পর্কে সম্পূর্ণ সন্দিগ্ধ—তখন সে কোন কারণেই অপর-সকলের কর্ম-পন্থা নির্দিষ্ট ক'রতে পারেনা। সার্বিক মানব-সত্তায় আস্থাহীন নিঃসহায় ব্যক্তি বিশেষ আত্ম-কেন্দ্রিক ও বিচক্ষণ স্বার্থন্বেষী হ'তে বাধ্য।

অপরাধ-বোধ ও অনুস্যুয়মান কুফলের ধারণা মানুষকে অসদাচারণ হ'তে নিবৃত্ত ক'রতে পারে, আর সেই কারণে, আস্তিক অস্তিবাদী কির্কেগার্ড এই সকল কর্ম-নিবর্ত্তক স্বীকার করেন। কিন্তু সাত্র এইরূপ আস্তিক বা নৈতিক ভাব-পোষণে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। সাত্র কথিত আন্তর্ব্যক্তিক জগতের ধারণা যুক্তিহীন এক রহস্যময় ধারণা বা কষ্ট-কল্পনা মাত্র। কেবলমাত্র বোধির সাহায্য সাংসারিক জীবনের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য ক'রে আমরা ব্যক্তি-সকলের কোন ভিত্তিমূলক সহযোগিতা-পূর্ণ আচরণের বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হ'তে পারিনা। সার্বিক-নিশ্চয়াত্মক বচনরাশির প্রয়োজীয়তা সম্পর্কে বা হোয়াইট্-হেডের পরিচ্ছন্ন কালসমূহের মধ্যে সাধারণ কালের অনুপ্রবেশের মত-সম্পর্কেও সাত্র যখন উদাসীন সখন তিনি যুক্তি সঙ্গতভাবে আরোহ-মূলক সামান্যীকরণে আস্থাশীল হ'তে পারেন না।

(৩) সার্ত্র যতই বলুন না কেন, তাঁর 'অস্তিবাদ' আমাদেরকে 'নৈরাশ্য-বাসের পরিণতি থেকে অব্যাহতি দেয়না। তাঁর মতে, ব্যক্তির অস্তিত্ব মৃত্যুর ছায়া বহন করে—আর 'সত্তা' 'নাস্তিত্ব' অন্তর্ভুক্ত করে—যে নাস্তিকের বিভীষিকা সকল সময়ে ব্যক্তিকে আতঙ্কিত করে—আর যেহেতু মানুষ কোন 'দেবতা' বা 'ভবিষ্যৎ বংশধর'দের মুখাপেক্ষী থাকতে পারেনা,—অতএব মানুষ, চরম নিরাপত্তার সম্ভাবদাভাবে সর্বদা দুঃখ-নিমগ্ন থাকে। সার্ত্র বলেন যে, অসীম স্বাধীনতা আছে—তাই আমাদের প্রকৃত আশাবাদী ক'রে তোলে। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে, এই 'স্বাধীনতা'-'খাম-খেয়ালী কাজ করার ক্ষমতারই নামান্তর ; অতএব মানুষের কোন আশা ভরসাই আর থাকেনা।

নানা বৈষম্য ও মৃত্যুর আলয় এই জগতে, মানুষেরা সদা উদ্বিগ্ন অপরাধী আসামীদের মতই চরম সর্ব্বনাশের প্রতীক্ষা করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কোন ব্যক্তিই আশাবাদী হতে পারে না। বিজাতীয় ও অনিশ্চিত ঘটনা-প্রবাহের মাঝে ব্যক্তি স্বাধীনতার কোন মাত্রাই মানুষকে সুখী করতে পারে না।

(৪) আধুনিক মনোবিজ্ঞানের তদন্ত—অনিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম নির্ব্বাচন বাদের বিরুদ্ধে রায় দেয়। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, আত্ম নিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম নির্ব্বাচনের ফলেই কর্ম্মধারা অনুসৃত হয়। এই আত্ম-নিয়ন্ত্রণ—উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, পারিপার্শ্বিক প্রভাব ও সচেতন অচেতন অবচেতন সংবলিত মনের নিজস্ব নানা নিয়মের ফলে,—সংগঠিত হয়। অতএব দেখা যায় যে, অনিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম নির্ব্বাচনের যে ধারণা অস্তিবাদীরা পোষণ করেন—তা, সম্পূর্ণ অ-মনো-বিজ্ঞানী ধারণা। এই ধারণা অ-নীতিশাস্ত্রীয় ও বটে।

(৫) অস্তিবাদীরা জগৎ-সম্পর্কে কোন সুসঙ্গত ও সম্পূর্ণ মত উপস্থাপিত করেন না ; বরং তাঁরা কতকগুলি অযৌক্তিক ও অ-বৈজ্ঞানিক সত্য (assumption) স্বীকার করে নেন। উদ্বেগ-প্রপীড়িত জর্জ্জরিত জনসাধারণের ভাব প্রবণতার কাছে আবেদন করে অস্তিবাদের অভিমত সকল সাময়িক স্বীকৃতি লাভ করে। নাস্তিক মতাবলম্বী অস্তিবাদীরা ক্ষীণদৃষ্টিগোচরীভূত, পূর্ব্ব পশ্চাৎ সম্পর্কশূন্য জগতের বিষয়ে নিজ মত ব্যক্ত করেন, ফলে তাঁরা জ্ঞানের বিষয়ীভূত, বাস্তব জগতকে ছাড়িয়ে এক কাল্পনিক, অবাস্তব, মূক জগতের বিষয়ে আলোচনা করেন।

(৬) সার্ত্রের মতে, বাহ্য প্রকাশের সামগ্রিকতার মধ্যেই 'প্রতিভা

নিঃশেষে ধরা পড়ে। এর বিরুদ্ধ মতের তিনি সমালোচনা করেন। কিন্তু সর্ত্রের বিবেকী পাঠকবর্গ এই মত সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন প্রতিভার প্রতিটি ক্ষেত্রেই কী বহিঃপ্রকাশের সামগ্রিকতা প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিমাণ ও গুণ নির্দ্ধারিত করতে সক্ষম? জ্ঞাত কার্য হতে কারণের মাত্রা অনেকক্ষেত্রেই বেশী হয়। সার্ত্র যদি এমন এক সাধারণ অন্তর্দৃষ্টির ধারণা দিতে পারতেন—যার সাহায্যে সাহিত্য কৃতির বিচারের মাধ্যমে 'প্রতিভার' সম্পূর্ণ মূল্যায়ণ সম্ভবপর হত—তবে সার্ত্রের অভিমত গ্রহণযোগ্য হত; কিন্তু আমরা জানি যে, বাহ্যফল হতে আন্তর প্রকৃতি পরিমাপের ক্ষমতা নানা ব্যক্তিতে নানারূপ।

(৭) সার্ত্র এক নোতুন অর্থে 'মানবতা-বাদ' কথাটি ব্যবহার করেন। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে, সার্ত্র কথিত 'আন্তর্ব্যক্তিকতা' (Inter-subjectivity) বুদ্ধিগ্রাহ্য ও যুক্তিসিদ্ধ নয়। অতএব, পারমাণবিক ব্যক্তি সকল কোন যুক্তিসঙ্গতভাবে 'মানবতা বাদে'র কথা বলতে পারে না। সার্ত্র কোন 'সার্ব্বিক মানব প্রকৃতি'-তে আস্থাশীল নন। 'সর্ত্তের সার্বজনীনতা'র যে কথা সার্ত্র উলেখ করেন—তা কেবলমাত্র সংস্কারাচ্ছন্ন, রক্ষণশীল মনোভাবেরই প্রকাশ করে; কেননা, কালকের জগৎ যে আজকের জগতের সুসদৃশ হবে—তার সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। সার্ত্র নিজেই দেখিয়েছেন যে, বিদায়ী আত্মা—যতই না কেন তৃষিত, সুদীর্ঘ পশ্চাদপর দৃষ্টিপাত করুক সে তার ভাব ও আদর্শের রক্ষণ সম্পর্কে তার সুহৃদগণের উপর আদৌ আস্থা-স্থাপন করতে পারে না।

মানবীয় প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ শূন্যতা যদিও স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়—তার ফলে কিন্তু 'মানবতা-বাদ' সম্পর্কে মানুষের গর্ব্ব করবার কিছু থাকে না। অনিয়ন্ত্রণবাদ যে নিয়ন্ত্রণবাদ হতে শ্রেয়ঃ—অনিয়ত, লক্ষহীন যাত্রা যে অদৃষ্ট শক্তির হাতে নিরুদ্বিগ্ন আত্ম সমর্পণ হতে অধিক প্রাপনীয়—তা' অবিসংবাদিত ভাবে প্রমাণ করবার কোন নিরপেক্ষ নির্ণায়ক পাওয়া যায় না। সার্ত্র অবশ্য উত্তর দিতে পারেন যে, তাঁর বক্তব্য-বিষয়টি আমার আদৌ লক্ষ্য করিনি। সার্ত্রের মতে, ব্যক্তি যে স্বয়ং তার আত্মোৎক্রমণের কেন্দ্র—এই ব্যাপারটিরই নাম-করণ হল 'মানবতা-বাদ'। এখন, মানবতা-বাদের এই অর্থ গৃহীত হলে—এই জাতীয় সাধারণ পদ মানবেতর প্রাণী সমূহের নানা গোষ্ঠীর উপরও প্রয়োগ করা যায়;

কারণ সকল জীব-শ্রেণীর মধ্যেই জাগতিক বিবর্ত্তন প্রক্রিয়ায় শ্রেণীসত্তা উৎক্রমণের প্রচেষ্টা দেখা যায়। সেই অর্থে, 'উষ্ট্রবাদ', 'জেব্রা বাদ'—প্রভৃতি পদও স্বার্থকনামা হবে। এখন প্রত্যুত্তরে বলা যেতে পারে যে, জীব-জগতের নিম্ন শ্রেণীর সভ্যদের মধ্যে যে আত্মোৎক্রমণের প্রবৃত্তি দেখা যা অন্ধ আবেগ স্বরূপ—সচেতন অভিপ্রায়াত্মক নয়। কিন্তু একথা স্বীকার ক'রে 'মানবতা বাদ' কথাটিকে বিশিষ্ট অর্থে গ্রহণ করলেও অনিশ্চিত লক্ষ্যানুসারী মানুষের বিচ্ছিন্ন, ব্যক্তি কেন্দ্রিক প্রচেষ্টা সমূহের উপর সার্ব্বিক অর্থ সংবলিত 'মানবতা বাদ' পদটি কীভাবে প্রযুক্ত হতে পারে—তা' বোঝা যায় না।

(৮) সার্ত্রের মতে, নৈতিক বিচারের কান্টীয় নীতি উপাদানশূণ্য আর সেই কারণে বাস্তবক্ষেত্রে ব্যবহারের পক্ষে তা' অনুপযোগী। এই সমালোচনা কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। নীতিশাস্ত্রকে মানতে গেলে, নৈতিক বিচারের সর্ব্ব ব্যাপক ও যুক্তিসিদ্ধ এক নির্ণায়ক দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সার্ত্র যখন তাঁর উল্লিখিত ছাত্রকে নৈতিক কর্ম্মপন্থা নির্ব্বাচনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন—তখন তিনি প্রকারান্তরে 'স্বজ্ঞা-বাদের'ই উল্লেখ করেন। এই স্বজ্ঞা-বাদের যে বিশেষ পর্য্যায়ের কথা সার্ত্র বলতে চান—তা হল Lilli কথিত 'ব্যক্তি কেন্দ্রিক স্বজ্ঞাবাদ' ('Individual Intuitionism')। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উক্ত পর্য্যায় ছাড়াও 'সাধারণ স্বজ্ঞাবাদ' (General Intuitionism) ও 'সার্ব্বিক সজ্ঞাবাদ' (Universal Intuitionism)-নামক স্বজ্ঞাবাদের আরও দুইটি পর্য্যায় আছে। আর প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেক সম্পর্কেই বলা চলে না যে তা অভ্রান্ত হবে। কারও কারও বিবেক গর্দ্দভের বিবেকের সমতুল্য হতে পারে। অতএব স্বজ্ঞা-বাদের নৈতিক বিচারের মূল্যায়ণ কার্য্যে যতই প্রয়োজনীয়তা থাক্—এই মতবাদ একান্ত নিরপেক্ষ ও সম্পুর্ণ নয়। তা ছাড়া স্মরণ রাখতে হবে যে কান্ট সর্ব্বোচ্য নৈতিক সূত্র ছাড়াও ব্যবহার ক্ষেত্রের জন্য নানা নৈতিক নীতির (Moral Maxims) কথা উল্লেখ করেন। তবে বাস্তব উপাদান রাশির (Contingent facts) পূর্ণ অভিজ্ঞতা পূর্ব্ব হিসাব সে সম্ভব নয় ও বিশেষ প্রয়োজনীয়ও নয়—সেকথা কান্টও স্বীকার করে নিয়েছেন। একথা সত্য যে সকল ব্যক্তিই বিবেকের বাণী অনুসারে কর্ম্মপন্থা নির্ব্বাচন করতে সম্ভব নয়। আর সেজন্য নীতিশাস্ত্রের বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তির পক্ষে

অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে।

(৯) প্রয়োগবাদীদের মত সার্ত্রও বলেন যে, 'সত্য আত্মবিষয়ীভূত' (Truth is in subjectivity)—আর সকল মূল্যও সেই রকম। এই মত আমাদের চিত্তাকর্ষক হতে পারে বটে; কিন্তু সার্ত্র তাঁর পাঠকবর্গকে ঐ মত বুদ্ধিগ্রাহ্য হিসেবে গ্রহণ করায় বাধ্য করতে পারেন না। মূল্য সকলের বস্তু তান্ত্রিকতা বজায় রাখার জন্য সার্ত্র যে আন্তর্ব্যক্তিকতা রূপ নির্ণায়কের উল্লেখ করেন—যুক্তিসিদ্ধ বলে প্রতিভাত হয় না। কিন্তু মূল্যসকলের যদি কোনরূপ বস্তু-তান্ত্রিকতা স্বীকার করা না যায়, তবে আমাদের সকল বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বচনরাশি নিরর্থক ও অব্যাখ্যেয় হয়ে পড়ে। মূল্যায়ণ-ব্যাপারটি যে ব্যক্তির খেয়াল খুশীর উপর নির্ভর করে না—একথা প্রায় সকল বিবেচক পুরুষই স্বীকার করবেন।

(১০) সার্ত্রের 'অস্তিবাদী মানবতাবাদে' ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্কটি বিশদভাবে দেখানো হয়নি। অবশ্য একথা সুস্পষ্ট যে, সার্ত্র, হেগেলীয় মতের দুইটি বিপরীত ভাষ্যেরই কঠোর সমালোচনা করেন। পূর্ব্ব-নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ প্রণালী অনুসারে যে ধারাবাহিক সমাজ বিবর্তনের কথা হেগেলীয় বামপন্থীরা বলে থাকেন—সার্ত্রের তাতে কোন আস্থা পরিলক্ষিত হয় না। যদি যুক্তিসঙ্গতভাবে তাঁর ব্যক্তিপ্রবাদকে অনুসরণ করা যায়, তবে আমরা কোন প্রকার সমাজতন্ত্রবাদে না এসে স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদে এসে উপস্থিত হই। দক্ষিণপন্থী হেগেলীয়গণ যখন রাষ্ট্রকে আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক হিসেবে ব্যক্তি-গণের কর্ম্ম পরিচালনার ভার দেন; আর বামপন্থী হেগেলীয়রা যেইকালে রাষ্ট্রকে ব্যক্তি সকলের সাধারণ সুহৃদ হিসেবে তাদের শুভ বণ্টনের ভার ন্যস্ত করেন—সার্ত্র সেই সময়ে ব্যক্তিকেই স্বীয় মঙ্গল নির্ব্বাচনের সমকালে সর্ব্ব-পালনীয় বিধি নির্দেশের অধিকারী বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠে যে, ব্যক্তি স্বীয় কর্ম্মপন্থা নির্ব্বাচনের অধিকারী হিসেবে সর্ব্ব-সাধারণের মঙ্গল কতখানি অন্বেষণ করতে পারে,—বা আদৌ তা পারে কিনা। মূল্য সকলের স্থায়িত্ব ও বস্তুতান্ত্রিকতা বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে পুরো সামাজিক কাঠামো ভূমিসাৎ হয়। আর তার অপরিহার্য্য ফল হল সম্পূর্ণ নৈতিক বিশৃঙ্খলা। যদি সমাজ সংহতি বজায় রাখতে হয়, তবে সার্ত্রকে অমন এক স্থায়ী মানব প্রকৃতির কথা স্বীকার করতে হয় যার সাহায্যে কতকগুলি সাধারণ আকারের আচরণ ও

প্রতীক্ষা, ইচ্ছা ও বোধক্রিয়া সুবিখ্যাত হতে পারে। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে গেলে, ব্যক্তি মানুষের অনির্দিষ্ট প্রকৃতি সম্পর্কীয় সার্ত্রের মূল মতের, অনেকখানি বর্জ্জন করতে হয়।

শেষ কথা ঃ সার্ত্রীয় আস্তিবাদের উপরি প্রদত্ত সমীক্ষা হতে এ ধারণা হওয়া বিচিত্র নয় যে এই অস্তিবাদ একেবারে নিরর্থক ও হাস্যকর প্রলাপোক্তি। কিন্তু সে ধারণা ভ্রান্ত। একথা সত্য যে, সার্ত্রের মতবাদকে এক সম্পূর্ণ দর্শন বলা চলে না, কারণ এই মতবাদ বিচার বুদ্ধির উপর ভিত্তি করে নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই মতকে 'দর্শন-সাহিত্য' বা 'সাহিত্য-মুখ-দর্শন' আখ্যা দেওয়াতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। সার্ত্রীয় ভাবকল্পনার বিপুল জনস্বীকৃতির কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দিকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সার্ত্র তাঁর মতবাদের সামগ্রী লাভ করেছেন, আর সকল পাঠকের উদ্দেশে তাঁর অভিজ্ঞতা নিবেদনের মাধ্যমে সার্ত্রীয় অস্তিবাদ বিশেষ পুষ্টিলাভ করেছে। প্রশ্নকারীদের প্রত্যুত্তরে সার্ত্রের যে আলোচনা আমরা পাই,—তাতে দেখা যায় যে সার্ত্র মনোবিজ্ঞানী দার্শনিকের সুরে কথা বলছেন। সার্ত্রের The Literary and Philosophical Essays'—গ্রন্থের অন্তর্গত 'Cartesian freedom'-নামক প্রবন্ধটি তাঁর অ-সার্বজনীন অনুভূতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন সত্ত্বেও সুগভীর বুদ্ধিমত্তার ও প্রতিভার পরিচয় বহন করে।

আধুনিক কাব্যনাট্য ঃ সাম্প্রতিক সংযোজনা

অনিরুদ্ধ ঘোষ

॥ এক ॥

সন্দেহ নেই মনের ভাব আমরা সাধারণতঃ লৌকিক ভাষায়, নিরাভরণ অনলংকৃত গদ্যেই প্রকাশ করে থাকি। দিনানুদিন জীবনে মোটামুটি ওতেই আমাদের সর্বকাজ নির্বাহ হয়। বিব্রত হই না স্বাভাবিক স্ব-উক্তিতে ব্যঞ্জনা বা ধ্বনির অনুরণন এসেছে কিনা তাই নিয়ে। কথা বলেই আমরা সন্ধানী দৃষ্টিক্ষেপ করি নির্দিষ্ট ব্যক্তিটির দিকে; দেখি তার মুখাবয়বে আমার কথা বা ভাবের প্রতিচ্ছবি বিতত হয়েছে কিনা। যদি অনুকূল আভাষ না পাই—ফিরে আবার ব্যাখ্যা করি আমার উক্তির, সাধ্যমত প্রাঞ্জল্যের সীমায় আনতে চেষ্টা করি ভাব-টিকে। তাতেও অনবহিত থাকলে, শ্রোতার গ্রহণ ক্ষমতার দিগন্ত নির্ধারণ করে আমার বক্তব্যের আকাশটিকে ছোট করে সীমায় আনতে চেষ্টা করি। এবং সে সীমা আমার প্রকাশের নয়, অনিবার্যভাবেই তা আমার নির্দিষ্ট শ্রোতাটির। স্থূল, চিহ্নিত, সাধারণবোধ্য ভাবের প্রকাশে এই পথেই আমরা প্রতিদিন পায়ে চলি, দৈনন্দিন শতকাজ এতেই আমাদের সাধিত হয়। কিন্তু জীবনের ভাব ও চিন্তা প্রকাশের সব পথই ঠিক পায়ে চলার নয়। অত ধীর মন্থর গমনে অনেক ভাবই অভিপ্রেত কক্ষে পৌঁছায় না—আবর্তন করে না আবহমানের সহৃদয় মনের চিরকাম্য সেই স্বর্ণবলয়ে, যেখানে বর্ণালীর সপ্তরঙ একাঙ্গ হয়ে ইন্দ্রধনুর আকাশ-ছোঁয়া বিস্তার লাভ করে। সেই অপরিমেয় প্রকাশের সুদূর ব্যাপ্তিতে ভাবেরও দূরান্ত ভ্রমণ ঘটে—সহৃদয় মন ডানা মেলে তার মুক্তিতে; কল্পনা তার স্বচ্ছন্দ পথটিতে ফিরে আসে, অনুভব তাঁর সঙ্গী হয়—মনের একটা কক্ষ যে এবার আলোকিত হবে, ব্যক্তির তাতে আর সন্দেহ থাকে না। ভাবানুভূতির সূক্ষ্ম বিকাশে জীবনের নতুন এক উপলব্ধির স্ফটিক আলোয় সে কক্ষ নিয়তই প্রভাময়

গিরিশংকর ঃ সমুদ্রধ্রুপদী।

হয়ে থাকে। কিন্তু এই আলোক-সাধনের পথটি স্বভাবতঃই প্রথমোক্ত স্থূল, নির্দিষ্ট, দিনানুক্রমিক পথ থেকে অনেক দূরের। কালিদাসের পূর্বমেঘের সঞ্চরণের মতই এর পথে অনেক বিস্তার—অনেক সৌন্দর্য—অনেক ভঙ্গিমা। ছন্দের নিয়ন্ত্রিত লয়ক্ষেপ, মুখের নিস্যন্দন গতিমাধুর্য এমন একটি সুনিবিড় মনের মধ্যে বিশ্বাস লাভ করে; যাতে মন, মানুষের সমস্ত মনের ভাবানুভূতি সুচিরতৃপ্ত হয়, উপলব্ধির গভীরতা নতুন দিগন্তের সন্ধান করে।

এবং এই সংগত কারণটির অভিক্ষেপেই সাধারণতঃ আমরা কাব্যের বিশেষ আঙ্গিকে আমাদের ভাবকে রূপ দি। তাই এই রূপ সংগত কারণেই গদ্যের প্রাত্যহিক সঞ্চরণ পথ থেকে অনেক দূরের। এর উক্তিতে তাই সুর বেশী, লয় সীমিত, ভাব সুগভীর, সংকেত সুবিন্যস্ত, ব্যঞ্জনা সুচির-রম্য। ধরা থেকে অধরায়—লৌকিক থেকে অলৌকিকে—স্থূল থেকে সূক্ষ্মে এখানে নিত্য আবর্তন মানুষের ভাবের। মনের উপলব্ধির কবাট কাব্যের বিভাব-অনুভাবের স্পর্শনে সর্বদাই স্পন্দিত।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাই ভাবের অধিবাসন আনতে আমরা কাব্যের ব্যবহার করি। নাটক জীবনের অন্বিষ্ট রূপ। তাই অনিবার্যভাবেই নাটক কাব্য হয়। গদ্য কাব্যে রূপ নেয়। নাটক লেখা হয় নতুন ধারায়—নতুন ব্যঞ্জনা আনতে নাটকের সংলাপ রূপ নেয় কবিতায়। পাত্রপাত্রীর আকার ইঙ্গিত নৃত্যের গতিশীলতায় স্পন্দিত হয়ে ওঠে—সংলাপে সুর আসে, বাঁধা ছন্দ লয় ফিরে ফিরে আসে, আবর্তিত হয়, নতুন ভাববলয় সৃষ্টি ক'রে। Objective বস্তুকল্পনা একান্তভাবেই Subjective impression-এ রূপ নেয়। বস্তু অস্তিত্বের নানাবিধ বিশেষ রূপ individual emotion-এর চিত্রকল্পে নির্বিশেষ দার্শনিকতার ভাবানুভূতিতে সমর্পিত হয়। simple feelings-এর গদ্যময়তা থেকে কাব্যের স্বতঃসিদ্ধ impression-এ আমরা উন্নীত হই। শব্দ আর নিরেট শব্দ থাকে না, ধ্বনি ও লয়ের নিয়ন্ত্রণে চিত্রকল্পে রূপ নেয়।

নাটকে কবিতার আশ্রয় সুপ্রাচীন কাল থেকে ঘটে আসতে দেখছি। প্রাচীন গ্রীক ট্রাজেডি, সেক্সপীয়ার থেকে সুরু করে আধুনিক যুগের নাট্যকারগণ সকলেই কাব্যের প্রক্ষেপন স্বাভাবিকভাবেই নাটকে ঘটিয়েছেন। কিন্তু সে সংঘটনায় কোন সুনিয়ন্ত্রিত ভাবানুভতার পরিকল্পনা ছিল না, কোন নতুন আদর্শের আধারে বিশেষভাবে চিন্তাধারাকে অন্যপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা ঘটেনি। মনের

উঁচু সুরে বাঁধা অনুভূতিগুলি, অথবা পরিশীলিত মানসপ্রকাশগুলি সংলাপের মধ্যে রাখতেই কবিতা আসতো সেখানে অনায়াস মাধ্যম হিসাবে। এবং লৌকিক ভাব অন্ত্যজ-শ্রেণীর সংলাপে ব্যবহৃত হত গদ্য। কিন্তু এমন একটি সময় এলো যখন একান্তভাবেই প্রয়োজন হ'ল এই গতানুগতিক দ্বিধাচরণ পরিত্যাগ করার। গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণ কোনক্রমেই একই অঙ্গে শোভা বর্দ্ধন করতে পারলো না। মাধ্যম হিসাবে কবিতা বা গদ্যের একটিকে গ্রহণ করা শ্রেয় বলে উপলব্ধি ঘটলো। দর্শক সমাজও আগেকার মত গদ্যপদ্যের সংমিশ্রণ একাগ্রমনে মেনে নিতে দ্বিধান্বিত হ'ল। তাই সংগত কারণেই বর্তমানে সেই সুপ্রাচীন ধারা নাট্যশরীর থেকে দূরীভূত হয়েছে। অতীতের সেই মিশ্রণের কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই, দর্শকের বিশেষ একটি মনোভঙ্গীর চাহিদা মেটানোর তাগিদেই এই মিশ্রণকে গ্রহণ করা হত। তাঁরা চাইতেন নাটকের একই অঙ্গে দু'টি ভাবই থাকুক; উঁচু সুরে বাঁধা জীবনের বিশেষ বিশেষ ভাবানুভূতির প্রক্ষেপনও যেমন থাকবে, নাটকে তেমনি কৌতুকের সহজ উচ্চকিত হাস্যরসও একই আধারে হরিহরআত্মার মত মিশে থাকবে।

উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ থেকেই এ সত্য সহজবোধ্য যে কবিতা নাট্যদেহকে শুধুমাত্র সজ্জিত করেই ক্ষান্ত হয় না; সে তাকে গভীরতম বাণী-বহনে সহায়তা করে। কবিতার স্বাভাবিক যে পরিশীলিত সুর আমাদের হৃদয়ের গভীর রহস্য উপলব্ধির সুযোগ এনে দেয় তা কাব্য নাটকে অনিবার্যভাবেই আসতে বাধ্য! এবং বর্তমান যুগে, যেখানে জীবনের বহিরঙ্গ অবলোকনেই সাহিত্য সীমিত নয়, অন্তরঙ্গের পরিচয় দিতেই তার সত্ত সতত অভিলাষ, সেখানে কাব্য অনিবার্যভাবেই কবিতা অন্বিত আলোকদৃষ্টিকে নাট্য মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করবে।

এখানে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে আসতে পারে; কাব্যনাট্য রচনায় কবির স্থান বড়ো না সাধারণ গদ্যনাট্যে অভ্যস্ত নাট্যকারের দাবী এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। প্রশ্নটি যদিও একটি বিশেষ ভঙ্গীর এবং এর বিরুদ্ধে কণ্ঠ উচ্চকিত করারও যুক্তিনির্ভর ক্ষেত্র আছে; তবু বর্তমান লেখকের মনে এ প্রশ্নটি এসেছে। এবং এই সূত্রে অনুল্লেখ্য না রাখাই শ্রেয় যে এই প্রশ্নটির প্রতিধ্বনি আমি কয়েকজন উৎসাহী কাব্যনাট্য রচয়িতার কাছ থেকে শুনেছি। আমরা স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিতে দ্বিধা করবো না যে,সেক্সপিয়ারের মত নাট্য ও কাব্যের দুটি মেরু-

তেই অনায়াসগম্য প্রতিভা কোটিকে গুটিক। এবং বর্তমান যুগ যখন সম্মিলিতের যুগ এককের নয় তখন তেমন প্রতিভা আমরা ধরে নিতে পারি বিরল। তাই যদি প্রতিষ্ঠিত কবিবৃন্দ কাব্যনাট্য রচনায় ব্রতী হন এই বিশ্বাস নিয়ে যে তাঁদের কবিতার ফর্মও কাব্যভাবের জগতের সঙ্গে পূর্বপরিচয়ের ফলে কাব্যের ফলশ্রুতি ঘটবে কাব্যনাট্য রচনার ক্ষেত্রে এবং সংগত কারণেই বিব্রত থাকতে হবে না নাট্যদেহে কাব্যিক গঠনভঙ্গির সুষমার দিকে—তাহলে তাঁদের চিত্তকে উপহসিত করার কোন কারণ নেই। এই সূত্রে এই ভাবের ও বিশ্বাসের প্রতিভূ টি, এস এলিয়টের উক্তি স্মরণযোগ্য। তিনি কবিতা ও নাটকের হৃদয় আলোচনার মধ্যে দিয়ে নিজের কাব্যনাট্য রচনার সুসমীক্ষা করেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন ;

"that if we are to have a poetic drama, it is more likely to come from poets learning how to write plays, than from skilful prose dramatists learning to write poetry. That some poets can learn how to write plays, and write good ones, may be only a hope, but I believe or not unreasonable hope ; but that a man who has started by writing successful prose plays should then learn how to write good poetry, seems to me extremely unlikely."

উক্তিটি অনুধাবনযোগ্য। কাব্যগুণসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট স্বাভাবিক অনুশালনের মাধ্যমে কাব্যনাট্য সহজলেখ্য হবে এটি নিঃসন্দেহে যুক্তিহীন উক্তি নয়। কিন্তু নাটকীয় কলাকৌশলের অনুশীলন সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। কারণ কাব্যনাট্য কবিতা থেকে মৌল, রীতিগতভাবে নয় আত্মগতভাবেই ভিন্ন। কাব্যের রসকি এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। কারণ কাব্যরস যুক্তিগ্রাহ্য বা প্রমাণযোগ্য নয়, অনুভূতিগ্রাহ্য ও উপলব্ধিরযোগ্য। এর বিকাশে কবির আশ্রয় ভাবাবেগই প্রধান। যথার্থ কবিতা কবি মনের সজ্ঞান নিয়ন্ত্রাধীনে সর্বদা আবদ্ধ নয়—অনুভূতি ও আবেগের গাঢ়তা সেখানে বিশেষভাবেই প্রাধান্য পায়। এটি মানুষের subjective মনের রমণীয় রসময় প্রকাশ। কিন্তু নাটক একটি যৌথকলা। এখানে objectivity-র মূল্য সবিশেষ। এর সফলতায় নাট্যকারের সৃজন ক্ষমতা সব সময়েই ক'টি বিশেষ বিধিনিষেধের বেড়ায় আবদ্ধ। তাঁকে

রচনার ক্ষেত্রে কাহিনী, চরিত্র, ঘটনাসমাবেশ, সংলাপ—এই বিশেষ চারিটি দিকে প্রখর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হয়। চরিত্রের Inner ও outer conflict এবং সংঘাতের ক্রমপরিণতির স্তর-পরম্পরা catastrophe of conclusion-এ অবরোহণের সর্বগ্রাহ্য ছকটি তাঁর সৃষ্টিকর্মের মধ্যে ফল্গুধারার মত অনুসৃত হয়ে থাকে।

তাই কবির পক্ষে নাটকীয় কলাকৌশল ও আঙ্গিকের চর্চা মোটেই অনায়াস-লব্ধ বস্তু নয়। বরং কঠিনতর ও সুনিষ্ঠ অধ্যাবসায় সাপেক্ষ। কারণ কাব্য নাট্যকে আমরা বিচার করবো শুধুমাত্র কাব্যরসের কষ্টিপাথরেই নয়, নাট্যতত্ত্বের অধিক্ষেপণ অনিবার্যভাবেই সেখানে আমরা খুঁজবো। তাই এলিয়ট যাকে self education বলেছেন, তা অর্জন করা অত্যন্তই দুরূহ; দীর্ঘকালের নিয়মানুগ অনুশীলন সাপেক্ষ এবং কবির নাট্যকৌশলের দ্বিতীয় প্রকৃতি second nature নিজের মধ্যে অর্জিত না করা পর্য্যন্ত কাব্যনাট্যের সার্থক রূপায়ণ মোটেই সম্ভব নয়।

এবং এ সত্যটিও অনস্বীকার্য যে কাব্যনাট্য শুধুমাত্র শ্রুতিতেই সম্পূর্ণ নয়; নাটকের যে দৃশ্যময়তা তার দিকেও এর একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ। নাটকের সার্থকতা তার অভিনয় গৌরবে। কাব্যনাট্যের ক্ষেত্রেও এই দাবী অগ্রগণ্য। অভিনয় সাফল্যের মধ্যেই এর সর্বাঙ্গীণ রমণীয়তা উপলব্ধি ঘটে। বিশেষ করে কাব্য-নাট্যের মধ্যে সুরের ললিত কঠোর কোমল গান্ধারের বিলসন, এবং ভঙ্গীর যে অনিবার্য্য নৃত্যময়তা কাব্যনাট্যের দেহে অতিরিক্ত সৌষ্ঠব দান করে সেটি অভিনয় ব্যতিরেকে সম্ভবে না। এই কারণেই প্রয়োগনৈপুণ্য এবং নাট্যআঙ্গিকের সবিশেষ জ্ঞান ব্যতিরেকে কাব্যনাট্য কোনমতেই সার্থক সর্বাঙ্গসুন্দর সৃষ্টির কোঠায় উন্নীত হতে পারে না।

॥ ২ ॥

রবীন্দ্রোত্তর কালে কাব্যনাট্যের ধারাটি খুব স্ফীত নয়। বরং ক্ষীণস্রোতা। কিন্তু সম্প্রতি ক'টি বর্ষের হিসাব নিতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই কাব্যনাট্য উৎসাহীর কিছুটা চকিত আনন্দের পুলক জাগতে পারে। দেখা যায় গুটি-কতক কর্মক্ষম লেখকের সমর্থ প্রচেষ্টা বাংলা কাব্যনাট্যের ভূমিকে সুফলা করার অঙ্গীকার নিয়েছে। নির্দিষ্ট ক্রমচিহ্নিত করতে গিয়ে পাঁচটি নামের

কথা মনে পড়ছে ; মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ; কৃষ্ণধর ; রাম বসু ; দিলীপ রায় ; গিরিশংকর। পঞ্চনামের মধ্যে প্রথমোক্ত চারটি বাংলা-আধুনিক কাব্য জগতে সুচিহ্নিত কাব্যাঙ্গনে এদের স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ দীর্ঘকালের। কাব্যনাট্য তাঁদের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা। কবি থেকে কাব্যনাট্য রচয়িতার সঞ্চরণ পথটি এঁদের ক্ষেত্রে মোটামুটি সুচিহ্নিত। এঁদের চারজনের মধ্যে এলিয়ট-উক্ত সুবিধাগুলি কতদূর ফলপ্রসূ এর আলোচনার পূর্বে পটভূমিস্বরূপ নির্দিষ্ট একক যে নামটি সেটির আলোচনা ক্ষেত্রটি আমি আগে গ্রহণ করতে চাই।

বাংলা নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে নাট্যকার রূপে গিরিশংকরের প্রথম আবির্ভাব। আজকের নাটক পর্যায়ের ক'টি নাটক এবং একাঙ্ক সংকলন 'শেষ-সংলাপ'-এর মাধ্যমেই তিনি সুধী সমাজে প্রশংসা লাভ করেছেন। তিনি সুধুমাত্র একজন নাট্যকারই নন তিনি কুশলী অভিনেতাও। শুধু বাস্তববাদী নয় প্রতীকনাটকও তিনি রচনা করেছেন। জীবনকে খুঁটিয়ে দেখার মত ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং সুপরিমিত নাট্যবোধ দুই তাঁর আছে। নাটক রচনার যে স্বাভাবিক গুণপণার দরকার তার স্বীকৃতি আমরা নাট্যকারের মধ্যে পাচ্ছি। এতে আমরা আলোচ্য নাট্যকাদের নাটকীয় কলাকৈবল্যের পূর্বপরিশীলিত স্বঅর্জিত ক্ষমতার ভিত্তিভূমিই খুঁজে পাচ্ছি। এলিয়ট-উদ্ধৃতির বিপরীত ক্রমে এখন দেখা প্রয়োজন নাট্যকারের পক্ষে কাব্যনাট্য রচনা প্রচেষ্টা গিরিশংকরের ক্ষেত্রে কতখানি সার্থকরূপ গ্রহণ করেছে। সমুদ্র-ধ্রুপদীতে প্রকাশিত দু'টি কাব্যনাট্যের মানস-পরিমণ্ডল থেকে আমরা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করতে পারি যে নাট্যকার তার কর্মের প্রতি বিশ্বস্ত এবং সচেতনভাবেই তিনি সৃষ্টির বৈচিত্র্য-সম্পাদনে প্রয়াসী। জীবন ও জগতকে নতুন দৃষ্টিতে দেখার আলো তাঁর চোখে আছে। দৈন্যজর্জর অভাব পীড়িত, দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ জীবনের হৃদয়-যন্ত্রণা তিনি অপরিসীম আকুলতা নিয়ে উপলব্ধি করেছেন। সাধারণ মানুষের বিপর্যস্ত জীবনের প্রতি তার সহানুভূতি সম্পূর্ণ মানবিক। এবং তার ভার দৃষ্টি-ভঙ্গির মধ্যে সত্য-সন্ধানী অনুসন্ধিৎসু মানস-প্রক্ষেপণ আমরা সহজেই খুঁজে নিতে পারি। সন্দেহ নেই উপরিউক্ত গুণাবলীর বিশ্লেষণের মধ্যে নাট্যকারের আদর্শ বিধৃত। বলতে পারি সে আদর্শ জীবননিষ্ঠ।

কিন্তু বর্ত্তমান নব্য সাহিত্যিকবৃন্দের মত তাঁরও সাহিত্য ছবির মধ্যে বিশেষ কটি বৈলক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। তার একটি হ'ল সংশয়বোধ। জীবনের ক্ষেত্রে আমাদের

কতগুলি বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হয়, যা থেকে শুধুমাত্র আদর্শের দ্বারাই আমরা ক্রান্তি লাভ করি না। যখন কালপরম্পরায় আমাদের সামনে দিয়ে চলে যায় মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ-জনিত দুরবস্থা, বেকার সমস্যা, উদ্বাস্তু জীবনের দুর্বিষহ অস্থিতিজ্বালা, মধ্যবিত্তের অবক্ষয়—তখন আমাদের বিশ্বাস, জীবননিষ্ঠা, আদর্শ আর তার পূর্বের দৃঢ়ভূমিতে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সে স্বাভাবিক ভাবেই নুয়ে পড়ে অবসাদে। হতাশা ও নিরাশ্বাস একটা প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত জীবনকে বিরাট এক ঋণাত্মক অস্তিত্বের সম্মুখীন করায়। এবং অনিবার্য ভাবেই আমাদের সাহিত্যকৃতির মধ্যে তার প্রকাশ ঘটে। গিরিশংকরের কাব্যনাট্যের মধ্যেও এই মানসিকতার সুগভীর স্পর্শ সুস্পষ্টগোচর।

'সমুদ্রধ্রুপদীর' প্রথম কাব্যনাট্য 'শর্বরী ঃ মানস ঃ সবিতা'র মধ্যে জীবনের সংশয়-অবসাদ-নিরাশ্বাস-অস্তিত্বের নিরালম্ব বিভাবনা অপূর্ব রূপ নিয়েছে মানস চরিত্রের মধ্যে। শর্বরী-আক্রান্ত মানস একটি আধুনিক দোলাচল মন। জীবনের পথপরিক্রমায় যে ক্লান্ত ও বেপথু। একটা সুনির্দিষ্ট আশ্বাসের অভাবে মানব-জীবনের সকল হৃদ্যভাব প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসাবাসি তার রমণীয়তা হারিয়েছে তার কাছে। বড়ো ক্লান্ত, দ্বিধান্বিত অস্তিত্ব নিয়ে মানস আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু শর্বরী অন্তে সবিতার আবির্ভাবের মতই এ-হতাশা তার জীবনে স্থায়ী অন্ধকারের অপলেপন ঘটাতে পারে না। সবিতা তার কাছে নির্দিষ্ট এক আশ্বাসের মত, আশ্রয়ের মত, প্রেরণার মত তার আলোকসত্তা নিয়ে উপস্থিত হয়। মানস উপলব্ধি করে শর্বরী নয় সবিতা ; অন্ধকার নয় আলোকই জীবনের স্বরূপ।

মানসের ছায়া।

এখনই তো সবিতা আসবে তার চোখে
চোখ রেখে জীবনের কোন মানে হয়তো বা খুঁজে
পাওয়া যাবে।

সবিতার কণ্ঠ।

আহা—মানস আমার সূর্যের প্রত্যয় পেয়েছে।

এবং শর্বরীও উপলব্ধি করে ঃ

এই ঘরে প্রতিদিন সকালে
সন্ধ্যায় সবিতাকে মানস কামনা করবে আমি জানি।

দ্বিধা নৈরাশ্য-অবসাদ-ক্লান্তি পীড়িত মানব-মানসে অনাক্রান্ত শর্বরীর পট ভূমিকায় সবিতার আবির্ভাব। এবং সংশয় নিরাশা-দ্বিধাক্ষুব্ধ জীবন থেকে গভীর প্রত্যয় ও আশ্বাসের সুদৃঢ় ভূমিতে উৎক্রান্তিই 'শর্বরী মানস সবিতা' কাব্যনাট্যের মধ্যে ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। কাব্যনাট্য দেহে প্রতীকী ব্যঞ্জণা অনেক ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত ও সুবিন্যস্ত। স্থানে স্থানে যদিও সংগতিহীনতা এবং অসংলগ্নতা স্বনিষ্ঠ পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। বিশেষ করে চরিত্র-পরিচিতি ক্ষেত্রে লেখকের কাব্যিক চরিত্রানুযায়ী ভাবসংকেত আমার মতে নাট্যকাব্যের ব্যঞ্জনার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। অন্ততঃ আমার দৃষ্টিভঙ্গির সাযুজ্যে এরা পারম্পর্যহীন। উক্তিটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। নাট্যকাব্যের যে ভাবব্যঞ্জনা আমি উপরে উল্লেখ করেছি তাতে সন্দেহ নেই 'শর্বরী ঃ মানস ঃ সবিতা' তিনটি চরিত্রই প্রতীকী ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। কিন্তু চরিত্র সংকেতে সে ব্যঞ্জনার ছায়াসম্পাত লক্ষ্য করি না। চরিত্র পরিচিতিতে মানস ও সবিতার পরিচয় নিম্নরূপ ঃ

মানস ঃ সুবর্ণ পিঞ্জরে বাঁধা এক পাখী।

সবিতা ঃ মানসের দূরের আকাশ।

কিন্তু দ্বিধাচলচিত্ত, নিরাশা সংশয় অবসাদগ্রস্ত জীবন সংগ্রামে পথভ্রষ্ট মানসকে আমরা কি করে সুবর্ণ পিঞ্জরে বাঁধা এক পাখী বলে মনে করতে পারি। সোনার পিঞ্জরে বাঁধা থাকার যে ব্যঞ্জনা তা অন্ততঃ মানসের পরিবেশ বা মনোভঙ্গির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। শর্বরীর প্রেমকে, সন্দেহ নেই, আমরা সুবর্ণপিঞ্জর বলে ভুল করবো না। এবং এও সুস্পষ্ট শর্বরীর প্রেমে বাঁধা থাকার কোন লক্ষণই আমরা মানসের মানস-প্রকাশে লক্ষ্য করি না। আঘাত ও যন্ত্রণা জর্জর জীবনের মধ্যে সবিতার আবির্ভাব প্রথম দৃষ্টিতেই সে গ্রহণ করেছে—এবং শর্বরীর বাসনা আকুল প্রেমকে দূরে রাখতে তার সামান্যও দেরী হয়নি। মানস উপলব্ধি করেছে সবিতা ''অন্ধকার উত্তাল সমুদ্রে বাতিঘর।' এবং এই বাতি-ঘরের সুনির্দিষ্ট অশ্বাসের আকাংক্ষায়ই যে মানস এতদিন করেছে তার প্রমাণ আমরা তার পূর্বের উক্তিতে জেনেছি।

মানস ঃ সবিতা, আজ দিশাহীন নাবিকের মত আকুল
আগ্রহে খুঁজি এক বাতিঘর যে আমায় আলো দেবে
দিশা দেবে।

মানসের এই মনোভঙ্গি থেকেই আমরা উপলব্ধি করি সবিতার মধ্যে সত্যই

মানস কোন দূরের আকাশ খোজে না। কারণ, আকাশের ব্যঞ্জনা অনিকেত; সুদূর অসীম বিস্তৃতির, যেখানে সুনির্দিষ্ট কোন দিশা আঁকা থাকে না। কিন্তু সবিতার মধ্যে আমরা তো দেখি মানস সুনির্দিষ্ট এক আশ্বাসের মত, আশ্রয়ের মত অনন্ত আকাশ ব্যপ্তির এক কোণের একটি মাত্র নক্ষত্র ধ্রুবতারাকে খোজে। এবং অন্য আর একটি উপমা যা মানস ব্যবহার করেছে সবিতাকে বিশেষিত করতে তা-ও হচ্ছে 'বাতিঘর' যার মধ্যেও ঐ একই ধ্বনি রয়েছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই আমরা চরিত্র নির্দ্দেশনাটিকে গ্রহণ করতে পারি না নাট্যকাব্যের প্রতীকী ব্যঞ্জনার সারূপ্যে। মনে হয় শর্বরী : মানস : সবিতার চরিত্র ব্যঞ্জনা পাঠকের জন্য সমীক্ষিত রাখলেই নাট্যকার ভালো করতেন।

'সমুদ্র ধ্রুপদীর' দ্বিতীয় কাব্যনাট্য 'সাইরেণ'। এর ভাবস্তর মধ্যে পরিবেশ-প্রাধান্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যে সত্যটি ধ্বনিত কাব্যনাট্যের মধ্যে তা হল পরিবেশের লোভ-হিংসা-দ্বন্দ্ব-সংক্ষোভের উর্ধ্বে চিরন্তন মানবাত্মার সুমহান প্রাধান্য। অন্ধকার আর্তনাদ নৈতিক নোংরামির মধ্যে বাজনদারের রেখাবহুল প্রৌঢ় একটি মুখ যেন জীবনের অনুচ্চারিত কোন অর্থ অনুসন্ধান করছে। প্রশ্নটি একান্তভাবেই এই সমাকীর্ণ দীনতা থেকে মুক্তির। 'What must I do to be saved?' খৃষ্টের মত তার মনেও এই প্রশ্ন! তাই কবির প্রশ্নের উত্তরে যে বলেছে :

কি করি? কি করবো বলো?

এবং ঘটনা পরম্পরায় এ উপলব্ধি তার ঘটেছে :

"Every man is tempted.....of his own lust. Then when lust hath conceived, it ringeth forth sin : and sin when it is finished, ringeth forth death."

(James 1. 14. 15)

এবং তাই 'যেখানে মৃত্যুর প্রহরায় জীবন বন্দিনী – আমি যাই····· আমি মৃত্যুর কুহক ভেদকরে জীবনের প্রত্যয়কে ফিরিয়ে আনবো।'

তাই বাবুরাম, খুড়ো, ললিতার উন্মাদ কামনা-নৃত্যের মধ্যে, 'হলা পিয়'র মধ্যে থেকে, জীবনের দুঃখ-অন্ধকার-ভীত-কদর্য কামনার বিকৃত সংকীর্ণ গুহা থেকে বাজনদার ছুটে বেরিয়ে যায়। এর পরে কবির উক্তিগুলি তার এই নিষ্ক্রমণের সার্থক ব্যঞ্জনা দান করেছে।

কবি। তোমরা জাননা বুঝি—লোভজর্জর হায়নার হিংস্র
মুখের ওপর ও গেয়ছে শ্লেষ আর বিদ্রুপের জবাব
ছুঁড়ে দিতে।

* *

লোভ আর হিংসার চক্রান্তকে ব্যর্থ করে জীবনকে
ফিরিয়ে আনতে।

এবং যে বিশ্বাস প্রদীপের শিখার মতন বুকের আড়াল করে বসে ছিলো কবি, যেখানে মৃত্যুর কুহক ভেদ করে প্রজ্বলিত একটি শিখার মত বাজনদার ফিরে আসে যে গান প্রাণের অন্ধকারে জন্ম য়েয় সেই গানকে বুকে নিয়ে। এবং সন্দেহ নেই কবির মনে তার ছোঁওয়া আলোর ঝরণার মত জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুর তুলবে। তাই ললিতা, ব্যথা-বেদনা-কুৎসিত কামনায় লাঞ্ছিত জীবনের প্রতীক, উপলব্ধি করেছে তার খোকন, নবজাতক, চিরজীবিতের, নবজীবনের প্রতীক আবার ফিরে এসেছে। কবির উক্তি ঃ

হে জীবন, সর্বাঙ্গে মৃত্যুর প্রহারকে অলংকার করে
তুমি শুয়ে আছো সর্বজয়ী খৃষ্টের মতন।

"The Lord Jesus Christ gave Himself for our sins, that He might deliver us from this pressent evil world"

(Galatians 1. 4)

জানিনা পবিত্র-সংহিতা থেকে উদ্ধৃতিগুলি সমালোচ্য নাট্যকাব্য রচনায় নাট্যকারকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো কিনা! এবং এই সূত্রে সাধারণ ভাবেই মনে আসছে সম ব্যঞ্জনাসম্পন্ন আরও দুটি মহত কাব্য সৃষ্টির কথা। এলিয়েটের 'The jouney of the magi' এবং রবীন্দ্রনাথের শিশুতীর্থ! তবে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই সুপ্রযুক্ত বিস্তৃতির অভাব থাকতেও বাজনদারের মধ্যে খৃষ্টের ব্যঞ্জনা সুহিত সার্থকভাবেই কাব্যনাট্যে অন্বয়িণ!

ফরাসী দেশের সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী রোঁদা-কে তার এক প্রিয় শিষ্য প্রশ্ন করেছিলেন—can an artist get along without technique.' শিল্পগুরুর উত্তরটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই কারণে যে আজকের সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে কলাকৈবল্যের, আঙ্গিকের ব্যাপক চর্চা একান্তভাবেই পরিলক্ষিত। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন ; "On the contrary, it is necessary to have consum-

mate technique in order to hide what one knows.....the great difficulty and crown of art is to draw, to paint, to write with ease and simplicity."

বর্তমানযুগের কবিসাহিত্যিকবৃন্দ কতখানি শিল্পগুরুর ভাবকে অনুসরণ করছেন তার মীমাংসায় না গিয়ে এ-কথা সমর্থনযোগ্য ভাবেই উচ্চারণ করা যায় আজকের কবিতা-নাটক-গল্পের ক্ষেত্রে আঙ্গিকের চর্চা এবং তার নিত্য-নূতন প্রয়োগকৌশল সৃষ্টির অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গ শোভার মত পরিদৃশ্যমান। এবং বহুক্ষেত্রেই এই আঙ্গিক প্রকরণ অনেষণ ভাবটিকে সহজ ও সরল না করে তাকে সাধারণের বোধির নিকট দুরূহ করে তোলে। বর্তমান কাব্যনাট্যের ক্ষেত্রে এ-উক্তিটি আংশিকভাবে সত্য। এবং এই সত্য-যে সর্বদা আশংকার এ-কথা বর্তমান সমালোচক মনে করেন না। কারণ আজকের জীবন আগের চেয়ে অনেক জটিল হয়েছে। জগত ও জীবনের দুর্নিরীক্ষ্য বহু অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নানা জটিল ভাবের সমাবেশ হয়েছে যাকে রূপ দিতে গেলে পুরাতন প্রকাশধারাকে অনুসরণ করা সব সময় সম্ভব নয়। কারণ বহু ব্যবহারে ঘষা পয়সার মত সেই সুনির্দিষ্ট প্রকাশভঙ্গি নতুন করে আমাদের জীবনের মূল্য-সন্ধানে স্বাভাবিক ভাবেই ব্যর্থ হচ্ছে। সামাজিক-রাষ্ট্রীক পরিবর্তন, আর্থিক ও সাস্কৃতিক বিপর্য্যয় : ধর্মতন্ত্র ও সাম্যবাদের সংঘাত, শ্রেণীসংঘর্ষ, ফ্রয়েড-ইয়ুঙ প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীর আবির্ভাব—জীবনের স্থিতিশীলতার অভাব—সর্বাত্মক হতাশা—সমস্ত কিছুই আমাদের প্রতি-দিনের জীবনকে একটা অরুন্তুদ জটিলতা দান করেছে—যা থেকে রেহাই পাওয়া একান্তভাবেই আজ অসম্ভব। তাই জীবন জিজ্ঞাসার তাগিদে, নতুন ভাববস্তু ও মানসভঙ্গির প্রেরণায় সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তাই স্বাভাবিকতাবেই কাব্যনাট্য শুধুমাত্র প্লট ও চরিত্রের রূপায়ণ নিয়েই ব্যস্ত থাকে না, জীবনের বহমানতাকেও তার অবয়বে স্থান করে দেয়। চরিত্র হয়ে উঠে অন্তর্মুখীন, প্রতীকীভাব অন্বিত প্লটের মধ্যে আত্মিক ও আঙ্গিক-প্রকরণ অবশ্য-ম্ভাবীভাবে উৎসঙ্গিত হতে থাকে। মনের প্রকাশভঙ্গি-পরিবেশের প্রাধান্য বা ডায়ালেকটিক যুক্তিধারার সংশ্লেষণ, ফ্রয়েডের ইদ-ইগো-সুপারইগোর রহস্যময়তা অথবা ইয়ুঙ্গীয় আদিচেতনার অধিবাসন সমস্তই একান্তভাবে আধুনিক কাব্য-নাট্যদেহে অবতমস রহস্যের মত জড়িয়ে আছে।

গিরিশংকরের 'শর্বরী : মানস : সবিতার' মধ্যে এই প্রতীক ও আঙ্গিকী

চক্রমনের ধারাটি সুস্পষ্ট। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সুস্পষ্ট প্রভাব রেখে তিনি তাঁর চরিত্রগুলিকে ; চরিত্রের আত্মিক ও মানসিক ব্যঞ্জনা আনতে বাইরে থেকে নয় মনের ভিতর থেকে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এবং এই কারণেই সংলাপের মধ্যে প্রতীকী লক্ষণা যা বেশীভাগই ব্যক্তির অবচেতনা থেকে আনয়ন, বিভিন্নশব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগ ; কিছু অসংলগ্ন বাক্য ; শর্বরী-মানস-সবিতার মুখর ছায়া ; অদৃশ্যকণ্ঠের বিঘূর্ণিত শ্লেষ উচ্চারণ ইত্যাদি কাব্যনাট্য শরীরে স্থান পেয়েছে। যদিও সর্বক্ষেত্রে তা নাট্যবিধৃত ভাবের সঙ্গে সৌগন্ধ্যের মত মিশে যায় নি।

'সমুদ্র-ধ্রুপদীর দু'টি ভিন্ন সুরের কাব্যনাট্যের মধ্যে গিরিশংকরের অন্তর্মুখীন নাট্যচর্চা প্রয়াস এবং আঙ্গিকী ও প্রতীকী ব্যঞ্জনার অন্বয় সাধন ; সংলাপের সুষমাময় ভাবব্যঞ্জনা, স্পষ্টত'ই নাট্যকারের সৃজনীশক্তির এবং স্বনিষ্ঠ অনুশীলন ও প্রয়োগ নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। এবং এলিয়ট উক্ত যে বিশেষ সুবিধার কথা আলোচিত হয়েছে প্রবন্ধের সুরুতে ; যার দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই কবিরা উপকৃত হন নাট্যকার অপেক্ষা নাটক রচনার ক্ষেত্রে তার গৌণ লক্ষণই পেয়েছি আলোচ্য নাট্যকাব্য দু'টিতে। সীমিত কয়েকটি ক্ষেত্রে শব্দ প্রয়োগের অসংলগ্নতা এবং কিছু স্ব-বিরোধী উক্তি ছাড়া ব্যঞ্জনার্থে গ্রাহ্য সুষমাময় কাব্যশরীর গঠন করেছেন নাট্যকার। তবে সুপযুক্ত শব্দপ্রয়োগের পিছনে স্রষ্টার fundamental brain work-এর সুস্পষ্ট লক্ষণ দুর্নিরীক্ষ্য নয়। এবং সুপ্রলম্ভ শব্দের অভাবে মাঝে-মাঝে তাঁর চিন্তনে ও ভাবব্যঞ্জনায় ঈপ্সিত সাদৃশ্য বোধ রক্ষিত হয় নি। যদিও এই সামান্য বিচ্যুতি নাট্যকারের পূর্ণতাভিসারী আত্মপ্রত্যয়ী অগ্রগমনে বাধা সৃষ্টি করবে না। কারণ কাব্যনাট্য ক্ষেত্রে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা দীর্ঘ অতন্দ্র সাধনা সাপেক্ষ। স্বয়ং এলিয়টও তাঁর উচ্চয় সাধনা অন্তে নাট্যকাব্য-কলার সংসিদ্ধ সমাহৃতির পরেও একথা স্বীকার করতে দ্বিধা করেন নি ;

"the ideal towards which poetic drama shall strive, is an unattainable ideal, and that is why it interest, me, for it provides an incentive towards further experiment and exploration ; beyond any goal which there is prospect of attaining.

নতুন রীতি, না রীতির নতুনত্ব

মিহির আচার্য

"প্রবন্ধ পত্রিকা"য় এর আগের কয়েকটি সংখ্যায় সাম্প্রতিক বাংলা ছোট গল্পের কোন বিশেষ প্রবণতা বিষয়ে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত ও সমীর কুমার মুখোপাধ্যায় যে আলোচনা করেছেন, সে সম্পর্কে আমার মতামত রাখছি।

সেদিন এক প্রখ্যাত গল্পলেখক দুঃখ করছিলেন লেখক হিসাবে তাঁরা বড় তাড়াতাড়ি পুরনো হয়ে যাচ্ছেন। অবাক হয়ে বরেণ্য লেখককে লক্ষ্য করছিলাম: তাঁর লেখক জীবনের শুরু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী কাল। বিচার করে দেখলে সময়ের মাপকাঠিতে সেটা কিছু পুরনো নয়! পরবর্তীকালে এ বিষয়ে বর্তমান প্রবন্ধকারের সঙ্গে লেখকের আলোচনা হয়েছিল। লেখকের বক্তব্য: হালফিল ছোটগল্প লেখার মেজাজের সঙ্গে তাঁদের রচনা-ভঙ্গির ন্যূনতম সাদৃশ্য নেই। একজন স্বনামধন্য লেখকের এমন মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

এই পরিপ্রেক্ষিতে হালের ছোটগল্পের গতিপ্রকৃতি বিচার করে দেখা যাক। কোন একজন দূরদর্শী সমালোচক সিদ্ধান্তে এসেছেন সাম্প্রতিক ছোটগল্প ক্রমশ ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠছে এবং কালে তা কবিতার রূপ নেবে। আমরাও বলি: নিক। কিন্তু এ কথা ভাববার প্রয়োজন এসেছে গল্প শেষ পর্যন্ত গল্পের ধর্ম মেনে চলবে কিনা। অন্তত ছোটগল্প যে কবিতা নয় এবং কোনোকালে তা হওয়া উচিত নয় আশা করি সে সম্বন্ধে কারুর দ্বিমত নেই। অর্থাৎ গল্পে ঘটনা চরিত্র ভাবমণ্ডল এবং সর্বোপরি জীবনদর্শন সাধারণ অর্থে থাকা উচিত। অথচ আশ্চর্যের বিষয় সাম্প্রতিক গল্পে একমাত্র লেখকমানসের মেদুর ভাবালুতা ছাড়া অন্য ধর্ম দুষ্প্রাপ্য। তারা লেখায় মনোহারি পরিবেশ সৃষ্টি করেন কিন্তু গল্প পাঠ শেষ করে পাঠকের কেবল মনে হয় এই পরিবেশ শুধু পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে। না-ঘটনা না-চরিত্র না-জীবনদর্শন কোনো কিছুকেই তা কাজে লাগাতে পারছে না। যেন কবিতার মতোই একটা মুড্ সৃষ্টি করবার প্রয়াস। তারপর এল খুঁটিনাটি বর্ণনা—এখনকার গল্প লেখক শ্যামবাজারের পাঁচমাথা থেকে কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে আসতে নিদেনপক্ষে চারদিন সময় নেবেন। তিনি দুধারের

বাড়ি দেখবেন, কার্ণিশে হেলান দেয়া অষ্টাদশীর ঝুলিয়ে দেয়া ময়ূরকণ্ঠী শাড়ি, ট্র্যামের তারে কাকের উপবেশন কি ছেঁড়া ঘুড়ির টুকরো, সিনেমার প্রচীর পত্র মায় রাস্তার বাথরুমের গায়ে কোন রোগের বিজ্ঞাপন। আর চরিত্র-চিত্রণ, ধরুন সওদাগরী আপিসের প্রবীনতম কেরানি হরিপদবাবুর চরিত্র উপস্থাপিত করবেন, তাঁর বৈঠকখানার কড়িকাঠে মাকড়সার ঝুল, দেয়ালে টিকটিকি, জানালার পরদা, ঘরের তক্তপোশ কত ডিগ্রি কোণাকুনি আছে (দরকার হলে কি কাঠের তৈরি এবং চোরাবাজার থেকে কেনা কিনা), তারপর রাত্রে মুখ হাঁ করে শোনে কিনা, নাক ডাকে কিনা। এর পর আছে ভোরবেলা থলি হাতে বাজারে যাওয়া, মেছুনীর সঙ্গে রসালো দরাদরি, বাড়িতে ফিরে দাড়ি কামানো, গামছা পরে আদুর গায়ে তেল মাখা (এই সময়ে লোমশ গায়ের বর্ণনা) কলের ঘরে কুলি করার আওয়াজ, ভোজনপর্ব থেকে কোটের বোতাম আঁটা পান চিবনো, টিফিন কৌটো এবং ট্রামে উঠে আপিস তরুণীদের দিকে দৃষ্টিদান ইত্যাদি ইত্যাদি।

আজকের পাঠক সত্যিই বিস্ফারিতনেত্র হয়ে ওঠেন এইসব গল্প লেখকদের খুঁটিনাটির ওপর এমন নির্ভুল মনোযোগ দেখে। শ্যামবাজার থেকে কলেজ ষ্ট্রীট তারাও হামেশা যাতায়াত করেছেন কিন্তু এই পথে এমন ঐশ্বর্য আছে। তাঁরা কোনদিন খবর পাননি। হরিপদ কেরানির দিনর্চ্চায় এত জানবার আছে পাশের বাড়িতে বছরের পর বছরের পর বছর থেকেও তাঁরা তার খবর রাখেননি। এই গল্পকারদের দর্শনশক্তি সম্পর্কে তাঁরা যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু তারপর ? গল্প কোথায় ? পথ পরিক্রমার ফাঁকে লেখকের কোন্ জীবন-দর্শন আভাসিত হয়ে উঠছে। হরিপদ কেরানির বিস্তারিত জীবনধারার মারফত তার চরিত্রের কোন্‌গুণটির প্রতি লেখক অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন ? বিন্দুতে সিন্ধু যদি না ফুটে ওঠে তাহলে সিন্ধুকে বিন্দু করে কি অভিলাস চরিতার্থ হচ্ছে ? নাকি নূতন রীতির ভেজালে হালের গল্পকাররা অর্থহীন ন্যাচারিলিজমের প্রবর্তন করেছেন।

তবে কি ডিটেলস্-এর প্রয়োজনীয়তা নেই, চারদিকের পরিবেশকে সৎভাবে তুলে ধরবার দরকার নেই ? আছে। অবশ্যই আছে। একজন বেকার ক্ষুধার্ত যুবক শ্যামবাজার থেকে কলেজ ষ্ট্রীটে হেঁটে আসতে অবশ্যই পারেন, কিন্তু তার তখনকার মানসযন্ত্রণার দর্পণেই পরিবেশ ফুটে-ওঠাটাই স্বাভাবিক।

তিনি কেবল ট্র্যামের তার কাক দেখলেন কি ছাদে যুবতী দেখলেন কি কোন রোগের বিজ্ঞাপন পড়লেন সেটা সম্পূর্ণ সত্য নয়, ক্ষুধার্ত মানসিকতাকে সেই সঙ্গে বিচার করার সার্থকতা রয়েছে গল্পের প্রয়োজনে। অর্থাৎ দেখাটা যদি ক্ষুধার্ত-মনন-দ্বারা জারিত না হয় তাহলে সে বস্তু রিপোর্ট হতে পারে গল্প নৈব নৈবচ। আর হরিপদ কেরানির চরিত্র চিত্রণ! লেখক নিশ্চয় কেরানীকুলের চরিত্র আঁকতে যাচ্ছেন না, (সাহিত্য কৌলিক নয় ব্যক্তিক) কাজেই হরিপদবাবুর চরিত্রের একটি বিশেষ দিককেই লেখক পরিস্ফুট করবেন। ধরা গেল হরিপদ নামধারী বিগত যৌবন ব্যক্তিটি স্থূলরুচি লোলুপ প্রকৃতির। এক্ষেত্রে তার বৈঠকখানার সিলিঙে মাকড়সা কি টিকটিকি দেখাবার আবশ্যকতা নেই—তার লোলুপ চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতেই চাই পরিমণ্ডল।

আজকের গল্পলেখকরা যথেষ্ট শক্তিমান—ভাষা আছে দৃষ্টি আছে, কিন্তু কি জানি শক্তি-অপব্যয়কেই তাঁরা শক্তির প্রদর্শনী মনে করছেন কেন!

কেউ কেউ মনে করেন এটা বিদেশী লেখকদের প্রত্যক্ষ প্রভাব। হালের লেখকেরা শুনতে পাই অনেকে সমসাময়িক বিদেশী গল্প সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। তাঁরা সার্ত্রে, কামু, মোরাভিয়া (টমাস মানে নয়!) আশা করি পড়েছেন। অবাক লাগে এঁদের কারুর লেখায় তো অর্থহীন নকশা বোনার কাজ নেই।

তবে এ'রা এই অভিনব রীতি কোথা থেকে আমদানী করলেন? নাকি বাঙলার মাটি ফুঁড়েই উঠেছে এই রীতি! এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা হতে পারে, কিন্তু অভিনব মাত্রই প্রগতিশীল নয় এ কথা ভাববার সময় এসেছে। আসলে বিস্তারের তাগিদে গভীরতা উপহাসিত হচ্ছে। আমার তো মনে হয় এট মস্ত বড় দুর্লক্ষণ। জীবনদর্শনের অভাবে চরিত্রকে চেনবার অক্ষমতাকে ভাষার কারুকার্যে আবারিত করবার প্রায়াস। হালের লেখকেরা একই ভঙ্গি এমন মকশো করে যাচ্ছেন যে তার ভেতর থেকে লেখক ব্যক্তিত্বকে খুঁজে পাওয়া গবেষণার ব্যাপার হয়েছে। নাম চেপে দিয়ে সাম্প্রতিক লেখকদের যে কোনো গল্প যে কোন নামে চালিয়ে দিলে ধরা যাবে না। এটাকে ঘুথ প্রবৃত্তি আখ্যা দেয়া যেতে পারে, কিন্তু আদিম প্রবৃত্তি এবং শিল্পকর্মের ব্যাপারে এ প্রবৃত্তি ব্যক্তিত্বের অপহ্নুতি ঘটায়।

তাহলে এই বিচিত্র ঢঙে গল্প রচনার কায়দা এঁরা কোথা থেকে রপ্ত করলেন। নাকি এটা একটা দুর্ঘটনা। কালির দোয়াত বেকায়দায় উলটে

গিয়ে কাগজের ওপর উট কি কচ্ছপের মতো কিছু-একটা গড়ে-ওঠা। এবং তারপর কিছু-একটা গড়ে-ওঠাকেই শিল্পকর্ম বলে চালানো। এটা হাসির কথা নয়। রচনা-প্রক্রিয়ার সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎ যোগাযোগ আছে তারা জানেন অনেক সময় গল্প লিখতে-লিখতে দেখা যায় গল্প হয়ে উঠছে না, দশ পৃষ্ঠা লিখে লেখক দেখলেন না-ল্যাজা না-মুড়ো, না-আলাপ না-বিস্তার। অতঃপর লেখক কি করলেন? ছিঁড়ে ফেললেন দশ পৃষ্ঠার প্রাণান্তক ধকল? না। হঠাৎ স্বর্গীয় উত্তেজনার মতো একটা লাগসৈ উপমা ধক্ করে উঠল মস্তিষ্কে। গল্প লেখক এইভাবে গল্প করলেনঃ কলকাতা শহরটা আজ এখন এই মুহূর্তে মনে হল চর্যাপদের হরিণী হয়ে গেছে যদি লেখকের মুখ থেকে শোনেন, তিনি বলবেনঃ ওটা একটা দুঃসাহসিক এক্সপেরিমেন্ট করেছি। কথাটাই একটা মস্ত বড় ফাঁকি। সাহিত্য finished product—গল্প যদি শেষ পর্যন্তও এক্সপেরিমেন্টাল বেসিসে-ই থেকে যায় তাহলে তা সাহিত্যপদবাচ্য হতে পারে না! আসলে লেখক নিজেকে ঠকালেন এবং পাঠককেও। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাশে চর্যাপদ-পড়া মন এখানে কাজ করেছে। সেই বিখ্যাত ছত্রঃ 'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী। ম্লেচ্ছের আবহে যদি এ পরিণাম এসে থাকে তাহলে আপত্তির কিছু নেই, কিন্তু বুঝতেই পারছেন এক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয়।

প্রায় ক্ষেত্রে এই অদ্ভুদ রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরি হচ্ছে আজকের গল্প। এবং এরই নাম নবরীতি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবার পুরনো কথায় আসি। এ ধরণটা সাম্প্রতিক গল্পকাররা কার মারফত পেলেন। আধুনিক কালের দুজন গল্পকার এই উৎসাহ-উদ্দীপনার কারণ। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এবং বিমল কর। এঁদের লেখায় ভাষার কারুকাজ আছে, খুঁটিনাটি বলবার ঝোঁক আছে, কিন্তু সর্বোপরি এঁদের আছে কাহিনী-চরিত্র-ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করবার স্বাভাবিক ক্ষমতা, যা হালের গল্পকারদের রচনায় গরহাজির। তাঁরা যদি অনুকরণই করতে চান তাহলে সমস্তটা না-করে অর্ধেকটা কেন। প্রীক্ষা-নিরীক্ষার ধর্ম চিরকালই চরৈবেতি, পশ্চাদ্‌গতি নয়। উক্ত লেখকদ্বয়ের সীমাবদ্ধ শিল্পকর্মকে নতুন অভিজ্ঞতায় আরো বিশদ করা, এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দরকার। তা না হলে প্রচুর শক্তির উৎসও কিছুদিন বুদবুদ্ তলে অচিরে নিশ্চিহ্ন হয়ে হয়ে হারিয়ে যাবে।

গল্পলেখকদের নিজের স্বার্থেই এ সম্পর্কে অবহিত হবার সময় এসেছে।

সজনীকান্ত ও শনিবারের চিঠি

যোগানন্দ দাস

[এই প্রবন্ধের লেখক যোগানন্দ দাস শনিবারের চিঠির প্রথম সম্পাদক। শনিবারের চিঠির জন্মলগ্নের কথা বলেছেন তিনি এখানে। যুগান্তরের সৌজন্যে প্রাপ্ত। সম্পাদক।]

১৯২৪ সাল। ভরা ভাদর।

গড়পারের কাছে, আপার সার্কুলার রোডের (বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডের) পশ্চিম দিকে, বাদুড়বাগানের একটি ছোট্ট সরু গলি, উত্তর-দক্ষিণ খোলা। কোনো রকমে দু'জন মানুষ পাশাপাশি চল্‌তে পারে।

গলির মাঝ বরাবর, পূর্বে একটি গোয়াল, পশ্চিমে মেস্-বাড়ী।

মেস্‌বাড়ীতে ঢুকলেই মাঝখানে উঠোন, পূবে গলির দিকের অংশটি দোতালা, পশ্চিমে উঠোন পেরিয়ে পিছনের অংশটি তিনতলা।

তেতলায় সার সার লম্বা হ'য়ে ঘেঁষা-ঘেঁষি শুয়ে আছে ছ'সাতটি একফালি ঘর। এক একটি ঘরের বাসিন্দা এক-একজন মেসবাসী। প্রত্যেক ঘরের পূবে একটি ক'রে দরজা চেয়ে আছে তেতালা চারতলা বাড়ীর ছাদ ডিঙিয়ে সূর্য্যির মুখ দেখবার আশায়। পশ্চিমে একটি ক'রে জানালা পরের বাড়ীতে উঁকি মারছে। কোলে, পূব দিকে টানা বারান্দা সব ক'টা দরজায় সেলাম জানিয়ে যাচ্ছে।

ঘর হিসাবে প্রত্যেকটির ভাড়া একই, ছাত্র-চাকুরে নির্বিশেষে। খাওয়া ইচ্ছামত, মেসে অথবা বাইরে।

এই ঘরগুলির একটিতে থাকেন শ্রীযতীশচন্দ্র সেন, পূর্ববঙ্গের একটি প্রাচীন (ইংরেজ আমলেরও আগেকার) বনেদী জমিদার বংশের যুবক—বেথুন কলেজের এককালীন অধ্যাপক, আদর্শ সাধুচরিত্র, বহুজন প্রতিপালক ও একদা বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পরেশচন্দ্র সেনের একমাত্র পুত্র।

অদ্ভুত খেয়ালী মানুষ যতীশচন্দ্র নানা বিষয়ে সুপণ্ডিত, সাহিত্যরসিক, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের আদি পর্বে তার অন্যতম বিজ্ঞান-কর্মী 'নব্যভারত' পত্রিকায় নব-সংগঠনের সংগঠনের গঠন-শিল্পী। অতি শাদা-সিধা নিরহঙ্কার, কিন্তু নরমে-গরমে সাবেকী জমিদারী মেজাজ। সাধারণত অত্যন্ত শান্তস্বভাব এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গপ্রিয়।

আর এক ঘরে থাকেন সজনীকান্ত দাস, এম্ এস্ সি-র ছাত্র।

তৃতীয় একটি ফালি ঘরে কবি ও 'নব্যভারতে' সদ্যোজাত সমালোচক 'সত্যসুন্দর দাস' মোহিতলাল মজুমদার—মেট্রোপলিটান্ ইন্‌ষ্টিটিউশনের বাংলার শিক্ষক।

চতুর্থ একটি ঘরে শ্রীসুধানলিনীকান্ত দে, অর্থনীতিতে এম্-এ'র ছাত্র। বর্তমানে মধ্যপদলোপী শ্রীসুধাকান্ত দে, কয়েকখানি উপন্যাসের প্রণেতা, একদা একটি জাত-মৃত মাসিক পত্রিকার জন্মদাতা ও সম্পাদক এবং ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার সাহিত্যিক সেক্রেটারী।

এই যতীশচন্দ্রের মারফৎই সজনীকান্তের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। তখন 'শনিবারের চিঠি'র পাঁচ-ছটি সংখ্যা বেরিয়ে গিয়েছে।

শনিবারের চিঠির সঙ্গে সজনীকান্তের জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং সজনীর কথা জানতে গেলে শনিবারের চিঠির জন্মকথাও জানা দরকার। মূল তিনজন প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে কেউই এখনও সে-কথা লেখেন নি।

'শ নি'-র জন্ম

১৯২৪ সাল। আষাঢ়ের সন্ধ্যা।

হেদুয়া পুকুরের (বর্তমান আজাদ হিন্দ্ বাগিচার) উত্তর পাড়ে, জলের কিনারায় ঘাসের উপরে, তিনটি যুবক। প্রথম, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়; দ্বিতীয়, রামানন্দবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়; তৃতীয়, বর্তমান লেখক।

তিনজনেই সে সময়ে কলকাতার বিভিন্ন চা-খানার নিত্য আড্ডাধারী এবং নিয়মিত চা, কফি, ও সিগার ধ্বংসকারী।

অশোক কেম্‌ব্রিজ-সমুদ্র থেকে সবে স্নান ক'রে উঠেছেন অর্থাৎ কেম্‌ব্রিজের সদ্য-স্নাতক। 'প্রবাসী' ও মডার্ন রিভিউ'-এর 'বিজনেস ডাইরেক্টর'।

বিজ্‌নেসের' প্রথম পরিচয় প্রবাসীর নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডে, সায়েন্স্ কলেজের দক্ষিণে, বর্তমানে আণ্টুল কোম্পানীর বাড়ীতে। বহুকাল পূর্বে এই বাড়ীতেই ছিল বেঙ্গল কেমিকেলের কারখানা ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাস।

অশোক লেখেন প্রবাসীতে বাংলায় ও মডার্ণ্ রিভিউয়ে ইংরেজীতে, অর্থ-নীতির প্রবন্ধ। তখনো বাংলা ভাষার অর্থনীতির প্রবন্ধ বেশী চালু হয়নি। কবি, নাট্যকার ও গল্পলেখক অশোক কলমী-আঁটা ধূম্রাকার দৈত্যের মতে ভিতর থেকে চুঁ মারেন, বেরুবার পথ পান না। পথ চাই-ই।

হেমন্ত প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সহ-সম্পাদক, অফিসে ঔপন্যাসিক চারু বন্দ্যোর ও কবি সুধীর চৌধুরীর সহকর্মী। শ্রীসুধীরকুমার তখনো রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা হ'ন নি।

হেমন্তকুমার প্রবাসীতে নিয়মিত 'পঞ্চশস্য' লেখেন। লিখে লিখে একটু লেখার সাম্রাজ্য-বিস্তারের ইচ্ছা গজিয়েছে,—হিট্‌লারের ভাষায় 'লেবেন্‌স্‌রাউম্'। ১৯২৩ সালে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা'র অন্যতম প্রবন্ধকার হিসাবে কিঞ্চিৎ জমি দখল করেছেন। আরো দেশ চাই। ব্যঙ্গ লেখক হেমন্ত যে গজিয়ে উঠবেন, তার ক্ষেত্র কই?

বর্তমান লেখক 'নব্যভারতে' (১৯২২) ও 'সোনার বাংলা'য় (১৯২৩) সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধে, কবিতায়, কথিকায়, সম্পাদকীয় নিবন্ধে হাত মক্স করেছে। 'সংবর্ধনা'র হুম্‌কি পেয়ে ভয়ে লেখা বন্ধ করেছে। অসহযোগ আন্দোলনে মেডিক্যাল্ কলেজ ছেড়ে বেকার ব'সে আছে। সাহিত্য কণ্ডুয়ন চল্‌ছে। যত চুলকয়, চুল্‌কবার ইচ্ছা তত বাড়ে। স্বাধীন ক্ষেত্র চাই।

তিনজনের মুখেই সিগার। 'চাচার হোটেলের' পাশে বিজয় সাঙ্গুভ্যালী থেকে কয়েক পেয়ালা চা শেষ ক'রে হেদোর পাড়। আমায় কোলে মাথা রেখে ঘাসের উপর লম্বা হ'য়ে শুয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছেড়ে অশোক বল্‌লেন:

'একটা কাগজ দরকার। এগেন্‌স্ট অল্ বোগেসিটিজ। সাহিত্যে, সমাজ পলিটিক্‌সে, ধর্মে যেখানে যতো 'বোগোসিটি' আছে, সমঞ্জ-র বিরুদ্ধে একটা কড়া চাবুক দরকার হ'য়ে পড়েছে।'

'কাগজটা হবে সাপ্তাহিক, শনিবারে শনিবারে বেরুবে, নাম রাখা যাক্

'শনিবারের চিঠি'। আপাতত এক ফর্মা (১৬ পৃষ্ঠা) ক'রে বা'র করা যাক্। দাম হবেএক আনা। প্রবাসী প্রেসে ছাপা হবে, হিসেব পরে হবে। খরচ অল্পই, যতদিন না কাগজ দাঁড়ায় আমরা মাসে মাসে পাঁচ টাকা ক'রে চাঁদা দিয়ে কাগজ চালাবো, কি বলো?'

(তখন এক ফর্মা এক হাজার ছাপতে এক রীম্ কাগজের দাম ছিল দু-তিন টাকা ও ডবল ক্রাউন ১৬-পেজী (সাধারণ স্কুল-পাঠ্য বইয়ের আকার) ফর্মা পিছু কম্পোজিং ও ছাপবার বাজার দর ছিল আট থেকে দশটাকা। নিজস্ব ছাপাখানা থাকলে পড়তা আরো কম।)

হেমন্ত বললেন, 'আমরা খুব রাজী। তবে, নাম যখন হবে 'চিঠি' তখন প্রত্যেক সংখ্যা খামে ভ'রে দিতে হবে।'

তিনজনের মধ্যে ঠিক হ'য়ে গেল, লেখার জন্য কারো খোসামোদ করব না, দরকার হ'লে সবটাই নিজেরা লিখবো। সব লেখা হবে বেনামীতে। নাম প্রকাশ করা চল্‌বে না। লেখার যদি নাম হয়, 'মেরিট্'-এর জোরে হবে।

ক্ষুবতশ্চ মনোরিক্ষাকুর্বভুব। মনু হাঁচলেন, ইক্ষাকু হ'লেন।

হে'দুয়ার জলের ধারে, শেষ আষাঢ়ের শেষ বেলায়, ত্রয়ীর সিগার-ধূম্রালোকে অশোক কইলেন, জন্ম হ'ল শনিবারের চিঠির 'আইডিয়া'র। প্রথম সংখ্যা শ্রাবণ ১০, ১৩৩১।

পত্রিকার হেড্‌পাস্'—পিছনে একটা থাম-ভাঙা প্রাচীন জীর্ণ অট্টালিকা, সামনে ভাঙা-থামের উপরে একটা-হাঁটু চেপে-দাঁড়িয়ে এক বলিষ্ঠ যুবকের মাথার-উপরে-তোলা ডান হাতে ঘূর্ণায়মান বহু-পুচ্ছ-বিশিষ্ট একলক্‌লকে চাবুক ('ক্যাট্-ও'-নাইন্-টেল্‌স্')। জীর্ণ অট্টালিকাটা হ'ল দেশের ট্যাটাস্-কো বা স্থিতাবস্থা। পলিটিক্‌স্ সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি বহুপুচ্ছ বিশিষ্ট চাবুকটি হ'ল শনিবারের চিঠি।

ঐ :একই ছবি খামের উপরেও থাকতো। মোরগ-চিহ্ন অনেক পরের কথা।

কবি-আবিষ্কার

বাদুড়বাগানের মেস্‌বাড়ী। হঠাৎ একদিন যতীশচন্দ্র বল্‌লেন; 'তোমার সঙ্গে শনিবারে চিঠির একজন ভক্তের আলাপ করিয়ে দিই।'

সজনীকে ডাকলেন। বছর ২৪ বয়সের (আমার চেয়ে বছর চারেকের ছোট) একটি বলিষ্ঠ যুবক, ঠোঁটের উপর তরুণ গোঁফ, হাসিতে ভরা মুখ।

ভনিতা নেই, একেবারে 'যোগানন্দদা।' গড়গড় ক'রে শনিবারের চিঠির কয়েকটি কবিতা মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন। দেখলাম, শনিবারের চিঠির সত্যিকারের একজন ভক্ত। মনটা সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে পড়ল। কারণটা গোপনে বলি,—কবিতাগুলির একটা ছিল আমার লেখা।

কবিতাগুলি শুনিয়েই অত্যন্ত আব্দারের সুরে,—'যোগানন্দদা কোন্‌টা কার লেখা?"

সজনীকান্তের অপরাধ নেই। প্রথম পাঁচ ছ'সংখ্যার মধ্যেই স্বনামে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ও শ্রীশিবরাম চক্রবর্তীর একটি কবিতা ছাড়া বাকী সব লেখাই ছদ্মনামে বেরিয়েছে—দু'ডজনের উপর ছদ্মনাম।

নামগুলোও বিচিত্র, যেমন শ্রীশঙ্করাচার্য, কুদ্‌রৎ, ইছমেদ ছুরোমদ্দি, গাজী আব্বাস্ বিটকেল, কৃষ্ণসুন্দর, মৌলা দোপেঁয়াজী, শান্তনু, শ্রীপ্রকাশ রায়, "শুভগ্রহ", শ্রীশুকদেব, সোনা-বৌদি, শ্রীরাজহংস, সেলিম, অবেদন, শ্রীস্বর্ণেন্দ্রকুমার রায়, পীরু, খয়ের খাঁ ইব্রাহিম, শ্রীমঙ্গলচন্দ্র শর্মা, শ্রীসনাতন দেবশর্মা, শ্রীমতী ভামিনী দাসী, নটনারায়ণ, বঙ্গসনাতন, উপগ্রহ, শ্রীকেয়ারীরঞ্জন কবিরাজ, শ্রীপিট্‌টান চম্পটী, শ্রীমধুকরকুমার কাঞ্জিলাল, ভজনরাম পাহাড়ী, বিনামা, প্রাণবল্লভ জানা প্রভৃতি।

এইসব ছদ্মনামের আড়ালে কখনো মুখ টিপে হাসছেন, কখনো ধমক দিচ্ছেন, কখনো নির্মম চাবুক চালাচ্ছেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শান্তা দেবী, সুধীরকুমার চৌধুরী, রবি মৈত্র, আল্‌তাফ্ আলি। এঁদের কিছু পরেই স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রসুন্ আলী' ছদ্মনামে।

আমরা তিনজন তো আছিই।

সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো ছদ্মনাম ('পেন্‌নেম্') অন্য কোনো কাগজে কোনো দিন বেরোয় নি। কখনো কখনো একই লেখকের আধ ডজন ছদ্মনাম।

কৌতূহল স্বাভাবিক।

বললাম,—সে কথা গোপন। ফাঁস করা নিষেধ। নিষিদ্ধ ফল খেতে নেই।

সজনীকান্ত ক্ষুণ্ণ হলেন, কিন্তু দুজনে জমে গেল। সজনীকান্তের ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। একপাশে চৌকি জানলার ধারে এক কোনে মেস্-টেবিল। দৌড়ে পালানো ডালের মতো মেসের টেবিলেরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কেরোসিন কাঠের ছোট্ট কোনা-ভাঙা জন্ম-অথর্ব অর্থাৎ নড়বড়ে না হলে মেসের টেবিল হয় না।

টেবিলের উপর একগাদা বই ও একগাদা খাতা। খাতাগুলো নেড়ে চেড়ে দেখলাম, অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতির নিরেট্ নোটেভরা,—নিতান্ত বেরসিক। হঠাৎ একটা মোটা খাতা টান্‌তেই বেরিয়ে পড়ল পাতার পর পাতা কবিতায় ঠাসা। কোনো কোনো কবিতা পঞ্চাশ লাইনেরও বেশী।

ডুবে গেলাম। দেখলাম সত্যিকারের একজন কবি আবিষ্কার করেছি। ঐ খাতার কিছু কবিতা পরে 'শনিবারের চিঠি'তে ছাপা হয়েছে, কিন্তু তাছাড়া আরো কবিতা আছে, যেগুলো সজনীকান্ত কখনো ছাপেন নি।

তখন পর্যন্ত শনিবারের চিঠির ফলে রবি মৈত্র, আল্‌তাফ্ আলি চৌধুরী (জাহানারা বেগমের ভাই; ভাই-বোনে মিলে এক সময়ে শারদীয় পূজার সময়ে 'বর্ষবাণী' নামে একটি সুন্দর সাহিত্য বার্ষিকী বার করতেন; বাংলা লেখায় আল্‌তাফের চমৎকার দখল), ডাঃ কালিদাস নাগ, শান্তা দেবী, সুধীর কুমার চৌধুরী, জীবনময় রায় প্রভৃতি অনেকেই এসেছেন বটে, কিন্তু 'শনিবারের চিঠি'র কবি হিসেবে তখন পর্যন্ত মাত্র তিনজন, অশোক, হেমন্ত, ও আমি। কবি জীবনময় রায় তখনো পর্যন্ত 'চিঠি'তে কিছু লেখেন নি।

মনে মনে আমাদের কবির দলে সজনীকান্তের নাম লিখে ফেললাম। মুখে কিছু বললাম না। আসরে এসে খবর দিলাম, একটি কবি আবিষ্কার করেছি।

'দশটা টাকা দেবো'

কবি মোহিতলাল প্রায়ই সন্ধ্যায় আসরে মেসের ছাদে সকলকে কবিতা পাঠ করে শোনাতেন। একদিন বললাম, 'মোহিতবাবু, মেসে যে আর একজন কবি আছে তার খোঁজ রাখেন?' এই বলে সজনীর খাতা থেকে কবিতা পড়ে শোনালেন।

মোহিতলাল খুব খুশী হলেন বলে মনে হল না। তার মানে এ নয় যে, সজনীর কবিতা তাঁর পছন্দ হয় নি নি। আসলে একজন নূতন কবিকে তিনি

নিজে আবিষ্কার না করে আর একজন করবে, এটা তাঁর পছন্দসই নয়।

এক সময়ে স্বভাবকবি নজরুলকে বগলদাবা করে কবি মোহিতলাল অনেক আসরে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সজনীকান্ত সম্বন্ধেও সেইটিই ছিল তাঁর মনোগত ইচ্ছা।

এরই কিছু পরে সজনীকান্ত একদিন বললেন, 'যোগানন্দদা, দশটা টাকা দেবো। আমার একটা কবিতা শনিবারের চিঠিতে ছাপবেন?

মনে মনে আনন্দ ও গর্ব হল, শনিবারের চিঠিকে কতো উঁচুতে জায়গা দিলে তবে একজন সাহিত্যিক একথা বলতে পারে?

হেসে বললাম, 'আলবৎ, তবে টাকা লাগবে না।'

খাতা সমেত প্রবাসী আপিসে 'চিঠি'র আড্ডায় হাজির হতে বললাম।

কাব্যে ও পাঞ্জায়

পরের দিনই দেখি সজনীকান্ত আড্ডায় হাজির। কিন্তু সেটা শুধু আমার আমন্ত্রণের জন্যই নয়।

সজনীকান্ত শুধু কবি নন, উৎসাহী করিৎকর্মা যুবক। অশোক, হেমন্ত প্রভৃতির সঙ্গে আলাপের তর সইছিল না, নিজেই দেখা করবার ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। উপলক্ষ্য সাহিত্য নয়,—পাঞ্জা।

আমার সঙ্গে যেমন যতীশচন্দ্র মারফৎ সজনীকান্তের আলাপ হয়েছিল তেমনি পৃথকভাবে সজনীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, যতীশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কবি ও পাঞ্জা লড়িয়ে শ্রীজীবনময় রায়ের।

কবি জীবনময় হলেন গিরিডি প্রবাসী পাবনার পাঞ্জা-বীর গিরিশচন্দ্র শর্মার মন্ত্রশিষ্য। মন্ত্রটি যে কোন উপায়েই হোক, বিরোধীর পাঞ্জাকে ভাঙতেই হবে। (যেমন ভোটের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়)। গিরিশচন্দ্রের আর একটি মন্ত্র ছিল, রাস্তায় চলতে গেলে 'কীপ্ টু দি রাইট।' বাঁদিক ঘেঁষে চললে পিছন থেকে গাড়া এলে দেখতে পাবে না, চাপা পড়তে পারো। ডান দিক দিয়ে চললে, সামনে গাড়ী আসলে দেখতে পাবে, সাবধান হতে পারবে।

কবি সজনীকান্তের সঙ্গে কবি জীবনময়ের প্রথম আলাপেই ঐ মৌলিক নীতিতে পাঞ্জার লড়াই। সজনীর পাঞ্জার জোরে ধ্ব হয়ে জীবনময় সজনী

কান্তকে নিয়ে যান অশোকের কাছে পাঞ্জা কষতে। মুষ্টিযোদ্ধা অশোকও একজন পাঞ্জার ওস্তাদ।

কাব্য ও পাঞ্জার জোড়া যোগসূত্রে 'শনিবারের চিঠির সঙ্গে বাঁধা পড়লেন সজনীকান্ত দাস।

সহ-সম্পাদক

শনিবারের চিঠিতে নকল বিদ্রোহের অন্যতম কল্পিত কবি 'গাজী আব্বাস্ বিট্‌কেল'-এর জন্ম প্রথম সংখ্যাতেই। জন্মদাতা অশোক চট্টোপাধ্যায়। সতেরো লাইন কবিতার নাম, "প্রলয়ের ফুলকি।" আরম্ভ ঃ

"ঘরে বাঁধা সারাদিন নিধিরাম সর্দার,
ফস করে ফেঁসে গেল আবরণ পর্দার।
কিল্ চড় ফটাফট লাফ ঝাঁপ দুদ্দাড়
পরাণে বাঁচিতে চাও যদি ত খবরদার।"

সমাপ্তি (অন্য ছন্দে) ঃ

"দেখে ভয়
হোক্ জয় ;
এস ভাই
চুমু খাই।"

ঐ একই ছদ্মনামে গোড়া থেকেই অশোক, হেমন্ত ও আমি আমরা তিন-জনেই লিখতাম। সম্ভবত শনিবারের চিঠির বিভিন্ন ছদ্মনামের মধ্যে ঐ নামটাই সজনীকান্তকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল সবচেয়ে বেশী।

শনিবারের চিঠিতে ছাপার অক্ষরে তাঁর প্রথম আবির্ভাব, 'ভাবকুমার প্রধান' এই ছদ্মনামে, কবি গাজী আব্বাসের উদ্দেশে লিখিত এক কবিতায়।

আগেই, চতুর্থ সংখ্যাতে, অশোক কবি গাজীর ছদ্মনামে লেখা, অজস্র জর্মান শব্দের কণ্টকাকীর্ণ এক "বাংলা কবিতা"র মুখবন্ধে কবিবর গাজী আব্বাস বিট্‌কেলকে এক দুর্ঘটনায় ফলে হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে থাকার দরুণ সপ্তম সংখ্যা পর্যন্ত 'চিঠি'র পাতায় কবি গাজীর আর আবির্ভাব হয়নি।

অষ্টম সংখ্যায় (ভাদ্র ২৮, ১৩৩১) সজনীকান্ত "আবাহন" শীর্ষক এক চিঠিতে গাজীকে আবাহন করে লিখছেন ঃ

"শনিবারের চিঠির সম্পাদক মহাশয়,

জাতীয় মহাকবি বন্ধুবর গাজী আব্বাস বিট্‌কেলের বর্তমান ঠিকানা না জানাতে আপনার কেয়ারে আমার চিঠিখানা পাঠাইলাম, আশা করি আপনি কবিবরকে এই চিঠিখানা দিবেন। অগ্রেই ধন্যবাদ দিলাম।

ইতি—শ্রীভাবকুমার প্রধান।

"পুঃ। জাতীয় কবিকে লেখা চিঠিখানি তো জাতীয় সম্পত্তি, সুতরাং আপনার শনিবারের চিঠিতে ইচ্ছা করিলে কবিতাটি ছাপাইয়া ধন্য হইতে পারেন।

"বন্ধুবর গাজী আব্বাস বিট্‌কেল সমীপেষু,

ওরে ভাই গাজি রে
কোথা তুই আজি রে
কোথা তোর রসময়ী জ্বালাময়ী কবিতা।"

ইত্যাদি। ৪২ লাইনের কবিতা।

সমাপ্তি (অন্য ছন্দে) ঃ

"আয় ভাই আয় গাজি
(দুই পাটি দাঁত মাজি)
রেখেছি ছিলাম সাজি
আয় তুই আয় ভাই স্বরাজের শেলি রে।"

সাহিত্য জগতে ছাপার অক্ষরে সজনীকান্ত দাস এই প্রথম উদিত হলেন।

সজনীকান্ত একেবারে মিশে গেলেন আমাদের সঙ্গে।

যে আদর্শ নিয়ে—সাহিত্যে পলিটিক্‌সে, সমাজে, ধর্মে, সব রকম 'বোগোসিটি' বা ভেজাল নকল ও ধাপ্পাবাজির বিরুদ্ধে যে স-চাবুক অভিযানের উদ্দেশ্য নিয়ে —আমরা কাগজ আরম্ভ করেছিলাম, সজনীকান্ত হয়ে গেলেন তার সঙ্গে হরিহর-আত্মা। তখনো মোহিতলালের আগমন হয়নি।

সজনীকান্তর তখন দিনের মধ্যে বেশীর ভাগ কাটতো 'চিঠি'র আড্ডায়, প্রবাসী আপিসে।

ঐ লেখা ছাপা হবার কিছু পরেই আমাকে আলাদা পেয়ে সজনীকান্ত আব্দার ধরলেন—"যোগানন্দ দা, আমার নাম 'সহ-সম্পাদক' ছাপতে হবে।'

অশোকের কাছে আর্জি বোধ হয় আগেই পাশ হয়ে গিয়েছে।

তক্ষুণি রাজি। আমরা তখন সবাই এক।

দু'এক সংখ্যা পর থেকেই দু'রঙে ছাপা আর্ট পেপারের এক মলাট যোগ করা হল ডোয়ার্কিন হারমোনিয়মের বিজ্ঞাপন সমেত। মলাটের উপরে সম্পাদক হিসেবে আমার নামের নীচেই ছাপা হল ঃ

"সহ-সম্পাদক ঃ **শ্রীসজনীকান্ত দাস**" **সম্পাদনা ও মালিকানা**

শনিবারের চিঠি যখন আমরা আরম্ভ করি—অশোক, হেমন্ত ও আমি—তখন সেটা টাকা আনা পাইয়ের হিসেব কষে লাভ লোকসান খতিয়ে করিনি, একটা আদর্শ প্রচারের জন্য মিথ্যা ও নকলের বিরুদ্ধে চাবুক হাতে নেমে ছিলাম।

কাগজ আরম্ভ হবার আগেই, আমরা তিনজনেই ছিলাম এক যুবআন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ঐ আন্দোলনের প্রধানতম নেতা ছিলেন সুবিখ্যাত 'আবোল্ তাবোল্'-এর গ্রন্থকার কবি ও চিত্রকর, অনন্য 'ননসেন্স্ ক্লাব'-এর জন্মদাতা, 'ভারতী'র সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অন্যতম নায়ক, বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন গীতকার, যন্ত্রসংগীতের দক্ষ শিল্পী, চিত্রকর ও সাহিত্যিক, শিশুসাহিত্যে যুগান্তকারী 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রকিশোর রার চৌধুরীর উপযুক্ত পুত্র—অসাধারণ রসস্রষ্টা ও অসাধারণ প্রতিভাশালী সুকুমার রায়।

কবি কালিদাস, বৈষ্ণব কবি, কবি টেনিসন্ ও শেলি, বাউল কবি, উপনিষদের কবি, অনেকেরই সুরে সুর মিলিয়ে যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব কাব্য সৃষ্টি করেছেন, সেই রবীন্দ্রনাথ বলতেন, 'আমি সব হতে পারি, পারি না শুধু সুকুমার রায় হতে।'

এ হেন সুকুমার রায়, অজিত চক্রবর্তী প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত যুব-আন্দোলনের বিষয় ছিল সাহিত্য সমাজ ধর্ম প্রভৃতি সব কিছুই।

শনিবারের চিঠির জন্মের আগে থেকেই আমরা তিনজনে একসঙ্গে হলেই, তাই, চায়ের পেয়ালায় ও সিগারের ধোঁয়ায় দেশোদ্ধার করতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

'চিঠি'র ব্যাপারে, সেই জন্যই, আমাদের টাকার হিসেবটা ছিল সকলের পিছনে।

আষাঢ়ে সন্ধ্যায়, হেদোর পাড়ে, শনিবারের চিঠির পরিকল্পনার জন্মলগ্নে অশোকের কথায় যেদিন তার সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর হলাম, সেদিন টাকার জন্য হইনি এবং যতদিন ঐভাবে 'চিঠি'র সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, ততদিন

অবৈতনিকভাবে নিজেদের কাগজ ভেবেই ছিলাম, মাইনের বা মালিকানার কথা কোনোদিন কারো মনেও ওঠেনি।

শনিবারের চিঠির সঙ্গে যোগাযোগের গোড়া থেকেই, পাঞ্জায় জেতার পুরস্কারস্বরূপ প্রবাসীর 'বিজ্‌নেস ডাইরেক্টর' অশোক সজনীকে প্রবাসী ছাপাখানায় চাকরী দিলেন ও পরে প্রবাসীর প্রেস ম্যানেজার করলেন। 'চিঠি'র একক মালিক হবার পরেও কিছুকাল পর্যন্ত সজনীকান্ত ঐ পদে ছিলেন!

সজনীকান্তের পরবর্তী সাফল্যের, খ্যাতির ও উন্নতির যে বিশাল সৌধ নির্মিত হয়েছিল, তার ভিত্তি মূলে ছিল, সুদীর্ঘকালব্যাপী বন্ধুবৎসল অশোকের অকৃপণ পৃষ্ঠপোষকতা।

কিন্তু সে সময়ে সজনীকান্ত যে 'চিঠি'র সহ-সম্পাদক হলেন, সেটা মাইনের জন্য নয়। আমরা সবাই ছিলাম লেখক, সবাই মালিক।

গোটা সাপ্তাহিক সংস্করণের ও মাসিক সংস্করণের গোড়ার দিকের 'শনিবারের চিঠি কারো একলার কীর্তি নয়, 'শনিমণ্ডলের' মিলিত সৃষ্টি।

সেই গোড়ার কথা স্মরণ করে পরবর্তীকালে নিজের একক মালিকানায় কথা বলতে গিয়ে সজনীকান্ত সেইজন্য বহুবচন ব্যবহার করেছেন (শ্রীপরিমল গোস্বামী সম্পাদনায় 'শনিবারের চিঠি', পৌষ, ১৩৩৯, পৃঃ ৪৭৭): "যাঁহারা ইচ্ছা করিলে আমাকে স্বত্বচ্যুত করিতে পারিতেন তাঁহারা কৃপাপরবশ হইয়া করেন নাই বলিয়া আজ আমি শনিবারের চিঠির মালিক।"

যদিও সত্যিকারের মালিক ধরা উচিত অশোক বটোপাধ্যায়কে, কারণ শুধু যে মূল আইডিয়াটাই তাঁর ছিল তাই নয়, সব ধাক্কা শেষ পর্যন্ত সামলাতে হয়েছিল তাকেই। তবুও, তিনি কোনোদিন কোনোভাবেই মালিকানা জাহির করতেন না বলেই আমরা সবাই জানতাম আমরা সবাই মালিক, সবাই সমান।

সেই ভাবেই শনিবারের চিঠির কাজ চলতো, লেখা চলতো।

লেখা-মনোনয়ন

চিঠির আড্ডা, প্রবাসী অপিসের বড় হলঘর।

ঘরের মধ্যে দুজন ষণ্ডামার্কা যুবক ঠেলাঠেলি করে একজন অন্য জনকে নিয়ে যাচ্ছে এ-কোণ থেকে ও-কোণ, আবার ঠেলে আনছে ও-কোণ থেকে এ-কোণ।

হাতে হাতে বাঁধা। অশোক ও সজনী।

ব্যাপার কী ?

আপনি বলবেন,—দুজনে পাঞ্জার লড়াই হচ্ছে।

আমি বলব, না, শনিবারের চিঠির লেখা মনোনয়ন হচ্ছে।

একদিন কথা উঠল, যদি আমাদের একজন বলে, অমুক লেখাটা 'চিঠি'তে যাবে আর একজন বলে, না, যাবে না, তবে ঐ সমস্যার সমাধান কোথায় ?

ঠিক হল, মীমাংসা খুব সহজ। যে দুজনে মতভেদ হবে, তাদের মধ্যে লড়াই হবে। যে জিতবে, তাঁর কথা থাকবে।

অবশ্য কীভাবে লড়াই হবে, অর্থাৎ পাঞ্জা না কুস্তি না ঘুষোঘুষি, সেটা যোদ্ধারা নিজেদের মধ্যে আপোষে ঠিক করে নেবেন।

আমি ছেলেবেলায়, বাংলার স্বদেশী ও বোমার যুগে (১৯০৫-১০) সে সময়ের বিপ্লবীদের ছদ্মাবরণ স্বরূপ সতীশচন্দ্র বসুর অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলাম।

সেখানে শেখানো হত বিলাতী জিম্‌নাসটিক্‌স্‌ ও স্বদেশী লাঠিখেলা ছোরা খেলা, অসি, গুল্‌তি, ডাকাতি করবার রণপা, মুগুর ও কুস্তি। তখনকার ভারত-বিখ্যাত কুস্তিগীর কিক্কড় সিং যখন কলকাতায় আসতেন, সে সময়ে আমাদের সমিতির বাড়ীতে (কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রিট) থাকতেন ও আমাদের 'দম' কষাতেন।

তাঁর কাছে 'দম' করবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

কুস্তির মধ্যে যে-পাঁচটি ভালোভাবে শিখেছিলাম সেটি হল মাটি নেওয়া। একবার উপুড় হয়ে মাটি নিলে চিৎ করা শক্ত ছিল।

অশোকও ছেলেবেলা থেকে অনেক রকমে শরীর চর্চা করে এসেছেন। তাঁর প্রিয় ছিল মুষ্টিযুদ্ধ।

সজনী ও হেমন্তও ছিলেন দুরন্ত ডানপিটে।

এককালীন বিপ্লবী গোপাল হালদারের বন্ধু সজনীকান্তের গায়েও যে বিপ্লবের আঁচ একেবারে লাগেনি তা নয়।

পরবর্তীকালে অশোক ও সজনী দুজনেই পুলিন দাসের কাছে লাঠি ও অসি শিক্ষা করেছেন।

আমার সঙ্গে লেখা মনোনয়নের মতভেদ হলে আমি বেছে নিতাম কুস্তির পথ। মাটি নেবার পর আমাকে চিৎ করবার চেষ্টা দু'একবার করে সজনীকান্ত সুবিধা করতে না পারায় আমার সঙ্গে মতভেদ বড় একটা হতো না।

অশোকের সঙ্গে ঘুষোঘুষির ধার ঘেঁষতেন না সজনীকান্ত কারণ ও বিদ্যায় অশোক একজন পাক্কা ওস্তাদ।

মাঝে মাঝে পাঞ্জার লড়াই হত অশোক-সজনীতে, প্রায় সমানে সমানে। কখনো হার, কখনো জিত!

আসলে, লেখা মনোনয়নের ব্যাপারে 'চিঠি'র ঐ যে মৌলিক প্রণালী ও-টা ছিল আমাদের একটা 'স্পোর্ট', একটা খেলা।

ঐ বিষয়ে বা অন্যান্য বিষয়ে, মোহিতলালের আগমনের আগে পর্যন্ত আমাদের মধ্যে 'মতভেদ' ব'লে কোনো বস্তু বড়ো একটা ছিল না!

অশোক, হেমন্ত, অজনী, রবি মৈত্র, আমি, আমরা সবাই তখন ছিলাম একই ভাবে ভাবিত, এক কাট্টা।

আমাদের সম্পর্ক ছিল মধুর।

পরস্পরের মধ্যে হরদম যে পাঞ্জার লড়াই হত সেটা হল সাহিত্যের, বিশেষ-ভাবে কবিতার।

এই লড়াই পুরো জমে উঠেছিল, যখন সজনীকান্ত এবং আমি রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রিটের উপর এক মেসবাড়ীতে দুজনে দু'খানা পাশাপাশি ঘর ভাড়া নিয়ে একসঙ্গে বাস করেছিলাম, মাসের পর মাস।

'চিঠি'র আপিস

সজনীকান্তের সঙ্গে একত্র মেসবাসের কথা বল্‌বার আগে শনিবারের চিঠির প্রথম আপিসের সংবাদ কিছু বলা দরকার। কারণ, তার মধ্যেও কিছু নূতনত্ব কিছু মৌলিকতা ছিল।

সুকিয়া স্ট্রীট (বর্তমান মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট) ও আপার সার্কুলার রোডের (বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডের) মোড়ে, উত্তর-পশ্চিমের কোণে আজ সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে মস্ত বড়ো ফ্ল্যাট বাড়ী।

আগেছিল এটি একটি পুরানো চটাওঠা দোতালা বাড়ী, সামনে বারান্দা। নীচে 'সি, সি, বিশ্বাসের' ডাক্তারখানা। ভিতরে ও উপরে থাকতেন নারীশিক্ষা সমিতির ও বিদ্যাসাগর বাণী ভবনের প্রতিষ্ঠাত্রী লেডী অবলা বসুর (আচার্য জগদীশচন্দ্রের পত্নীর) দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক।

তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালীন প্রতিভাবান ছাত্র কিরণকুমার

বসাক ছিলেন যতীশচন্দ্র সেন, জীবনময় রায়, অশোক, হেমন্ত ও আমি, আমাদের সকলের এবং আরো অনেকেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অত্যন্ত মজ্‌লিশী ও জনপ্রিয়।

তাঁদের বাড়ী ছিল আমাদের একটি স্থায়ী ব্রিজ খেলার আড্ডা। ১০৫নং আপার সার্কুলার রোড। আমাদের বাড়ী ছিল কাছেই—১০৮ নম্বর।

ঐ মোড়ের ১০৫ নংকেই (আমাদের বাড়ীকে নয়) আদালতে 'চিঠির'র আপিস ব'লে ঘোষণা করলাম। সরু 'প্যাসেজ্‌' দিয়ে ভিতরে ঢুকেই ডানদিকে দেওয়ালের গায়ে শনিবারের চিঠির নাম লেখা একটি ডাকঘর ঝোলানো থাকতো।

ঐ বাক্সটিই ছিল শনিবারের চিঠির আইনসঙ্গত আপিস। চেয়ার নেই, ঘর নেই, মানুষ নেই, সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, প্রুফরীডার, লেখাসহ লেখকের দল কিছু নেই,—শুধু একটি বাক্স ঝুলছে। একটা পুরো আপিস দেখবার আশায় চোখ রগ্‌ড়ে ফের তাকান,—ঐ বাক্স। দারোয়ানের খোঁজ করুন—ঐ বাক্স।

আসল আড্ডাখানা ছিল প্রবাসী আপিস্। সেই জন্য শনিবারের চিঠিতে নোটিশ পড়ল ঃ

—শনিবারের চিঠি—

কার্যালয়—১০৫ সার্কুলার রোড,
কলিকাতা

সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকর—শ্রীযোগানন্দ দাস। সম্পাদক মহাশয়ের সহিত কোন কাজে দেখা করিতে হইলে দেখা পাইবার উপায় নাই, পত্র লিখিতেই হইবে। দরকার না হইলে পত্র লিখিবার প্রয়োজন নাই।

লেখা চাই না।

টাকা ইত্যাদি পাঠাইবার ঠিকানা—

সম্পাদক, শনিবারের চিঠি
১০৫, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

যাঁহার ইচ্ছা আমাদের যে কোন লেখার প্রতিবাদ করিতে পারেন তবে আমরা তাহা না ছাপিলে অন্য কাগজে ছাপিতে পারেন।

এই রকম সব নিয়ম আমাদের দরকার-মত মানিয়া চলিত হইবে—তবে

দরকার মত নিয়ম বদলাইব ও ভাঙ্গিব। ইহাতে কাহারো আপত্তি থাকিলে আমাদের জানাইতে হইবে না, কারণ আমরা তাহা মানিব না।

বিজ্ঞাপনগুলি পড়িবার ও পরখ করিয়া দেখিবার জন্য দেওয়া হইয়াছে, কাগজের শোভার জন্য নহে।

(ষষ্ঠ সংখ্যা, ভাদ্র ২১, ১৩৩১, পৃঃ ১৫০ হইতে পুনর্মুদ্রিত। প্রথম সংখ্যাতেও (শ্রাবণ ১০) একই নোটিস্ ছিল, শুধু বিজ্ঞাপনের অংশটি বাদ।)

রচনা হেমন্তের। নূতনত্বের জন্য নোটিস্ সে-সময়ে ব্যাপকভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

মেসে দ্বৈতবাস

মন বল্‌ল, বাড়ী ছেড়ে মেসে বাস করব। সঙ্গে সঙ্গে সজনীকে মনের খবরটা জানালাম। সজনী বল্‌লেন, তা'হলে আমিও মেস্ বদল করব। দুজনে একসঙ্গে থাকা যাবে।

মেসটা সজনীই খুঁজে বার করলেন।

৫৭। ৬ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট। যোগী-পাড়ার কাছে। বর্তমানে, নীচে রাস্তার ধারে মহাদেবের চুল কাটার সেলুন।

আমরা নিলাম দোতালায় উত্তর দিকের শেষ দুখানা লাগাও ঘর, সামনে-পিছনে। সামনে, রাস্তার দিকের ঘরে আমি, পিছনের ঘরে সজনীকান্ত। মাঝে একটা দরজা, চব্বিশ ঘণ্টা খোলাই থাকে। রাস্তার দিকে টানা বারান্দা। খাওয়া মেসেই।

এক একটি প্রায় ১০ ফুট × ১০ ফুট ঘরের ভাড়া মাসে দশ টাকা। ১৯২৪ সাল।

শনিবারের চিঠির আড্ডা ছাড়া বাকী সময়টা কাটতো ঐ মেসে, কাব্যপাঞ্জা, কবির লড়াই।

কবিতার বিষয়ের কখনো অভাব ঘটেনি।

একদিন দেখা গেল, আমার টেবিলের উপর রয়েছে রেলের সেণ্টাল্ বোর্ডের (দিল্লীর কেন্দ্রীয় কমিটির) একটি ইংরেজী রিপোর্ট,—আস্ত একটি বই। যাকে বলে খাঁটি নীরস, নিংড়োলে বেরোয় রেলের চাকার ঘড়ঘড়ে আওয়াজ ও গুঁড়ো গুঁড়ো কয়লার ওজনে ইঞ্জিনের কালো কালো ধোঁয়া।

ঠিক হ'ল তার প্রথম প্যারাগ্রাফ্‌টির ভাবার্থ বাংলা কবিতায় গাঁথতে হবে। যে সকলের আগে শেষ করবে, তার জিৎ।

প্রথম স্থান অধিকার করলেন সজনীকান্ত। বোধ হয় মাত্র পাঁচ সাত মিনিট সময় নিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় হ'লেন অশোক। আমি হ'লাম 'লাস্ট্'।

সজনীকান্তের মতো এরকম কবিতার তুফান মেল্ আমার চোখে আর পড়ে নি। একবার হুইসিল্ দিলেই চল্‌ল গাড়ী। একেবারে বোম্বাই পৌঁছে তবে গাড়ী থাম্‌বে। বোধ করি, এঁর সঙ্গে ব্রাকেটে যেতে পারতেন স্বভাব-কবি কাজী নজরুল্ ইস্‌লাম।

মোহিতলালের একটি কবিতা মেজেঘষে খাড়া করতে লাগতো অন্তত তে-রাত্তির।

মেস্-বাসের সেই সারাদিনব্যাপী কাব্যচর্চার আখড়ায় যে-কোনো বিষয়ে এবং যে-কোনো ছন্দে কবিতা লেখা ছিল তখন আমাদের জল-ভাত। এই সময়েই 'চিঠি'র দশম সংখ্যায় কবি 'ভাবকুমার প্রধান' (সজনীকান্ত) "প্রকাশের বেদনা" শীর্ষক কবিতা শেষ করলেন এই ব'লে (পৃঃ ২৪৫) ঃ

"যে দিকে তাকাই হায়
ভাবের বন্যা ধায়
লিখিবার বিষয় কত রে,
মুখে অন্ন রোচে না ক
বৌদিদি বোঝে না ক
খোঁচা দেয় বিবাহের তরে।
ভাবের সমুদ্র বুকে
রয়েছি সৃজন সুখে
প্রকাশের ব্যথা কারে কই,
নোট বই সাথে ফেরে,
রেখেছি পেন্সিল বেড়ে
প্রস্তুত হইয়া সদা রই।

কবি হিসেবে সজনীকান্তের প্রেরণার মূল উৎস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মোহিত-লালের পাচনবাড়ি সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তিনি কোনো দিনই কাটিয়ে

উঠতে পারেন নি। ছাত্রাবস্থায় একবার রবীন্দ্রনাথের বই কিনতে না পেরে গোটা কবিতার বইটিই নকল ক'রে নিয়েছিলেন।

শনিবারের চিঠিতে এই প্রভাবের প্রথম পরিচয় রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্যারডিতে। রবীন্দ্রকাব্যের প্যারডি অন্যেরাও করেছেন, কিন্তু শনিবারের চিঠির সাপ্তাহিক সংস্করণে প্রকাশিত সজনীকান্তের ও জীবনময় রায়ের লেখা অন্যদের প্যারডির চেয়ে অনেক উঁচুদরের, শুধু কাব্য প্রতিভার দিক থেকেই নয়, কাব্য-সৃষ্টির অনাবিল আনন্দের দিক থেকে। এগুলিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি খোঁচা বা বিদ্বেষের চিহ্ন মাত্র নেই।

এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখন করব না। শুধু শনিবারের চিঠিতে রবীন্দ্র-প্যারডি বিষয়ে সজনীকান্তের প্রথম আবির্ভাব "যদি—" কবিতার আরম্ভটুকু (১১ সংখ্যা, পৃঃ ৩০৬) তুলে দিচ্ছি: 'আমি যদি হতেম বেড়াল ছানা

কোলের পাশে শুতেম, তুমি করতে নাক মানা
আদর করে চুমো খেতে মুখে
গলা ধরে নিতে আমায় বুকে
মেরে ঠোনা বলতে "সোনা রাগ করো না, না—না"
আমি যদি হতেম বেড়াল ছানা।" ইত্যাদি।

অপূর্ব। সজনীকান্তের পরতে পরতে রবীন্দ্রকাব্যের সুর এমনভাবে ঢুকে গিয়েছিল যে, শত মোহিতলালের ক্ষমতা ছিল না, তাকে তাড়াতে পারে।

সে-সময়ে আমাদের সকলকে কবিতায় এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে,

যাহা দেখি সবি তাই
মনে হয় কবিতাই।

গোটা 'বিদ্রোহ' সংখ্যাটাই (দ্বাদশ সংখ্যা) লেখা হ'ল কবিতায়। সজনী-কান্তের কথায় "কবিতায় বিদ্রোহে, বিদ্রোহ কবিতাই।"

সম্পাদকীয় বিভাগ—'সংবাদ সাহিত্য"—নামকরণ হেমন্তের। গোড়া থেকেই 'সংবাদ সাহিত্য' লিখতেন প্রধানত হেমন্ত ও অশোক। বেশীর ভাগই হেমন্ত।

লেখা হ'ত গদ্যে। কিন্তু ঐ গদ্যের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, সবগুলিই ব্যঙ্গাত্মক রীতিতে লেখা। ঐ ধরণের পলিটিক্যাল্ ব্যঙ্গের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়, সম্ভবত কেশবচন্দ্র সেনের 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায়। 'চিঠি'র আদিপর্বের এই সংবাদ সাহিত্যগুলি সংগৃহীত হ'লে বাংলা সাহিত্য একটি নূতন জিনিষ পাওয়া

যাবে। বিদ্রোহ সংখ্যায় সংবাদ সাহিত্যও লেখা হ'ল কবিতায়। লেখক, অশো
ও সজনী। অশোক লিখলেন ঃ

"মহাত্মা একুশ দিন
না খাইয়া দেহ ক্ষীণ
মনে আছে জোর তাই
বড়ি বলে "ভয় নাই।" * * * *
দিল্লীতে বন্যা
মোলো কার কন্যা ?
পি, সি, রায় শিশি ফেলি
যায় বুঝি জল ঠেলি। * * *
জাভানিরা হাবা হায়
বারো গোল খেয়ে যায়
বাঙ্গালির কাছে।
বাঙ্গালিরা থপাথপ্ ধপাধপ্ নাচে। * * *
ইরাকে তুর্কী সেনা
বৃটিশের তেল কেনা
করে বুঝি বন্ধ,
ভাঙ্গে বুঝি লোজানের ছন্দ।' ইত্যাদি

সজনীকান্ত ছন্দ বদলিয়ে শেষ করলেন ঃ

"বিষ্ণুপুর অন্তর্গত শাঁখারী পাড়াতে
অক্টোবর মাসে হায় ১৬ই তারিখে ধায়
দলে দলে নরনারী হিংসার তাড়াতে।" ইত্যাদি

শনিবারের চিঠির আদি পর্বে সজনীকান্ত দাস আমাদের সঙ্গে কতখানি এক হ'য়ে মিশে গিয়েছিলেন, তার একটি নমুনা হ'ল কবি 'শ্রীঅবলানলিনীকান্ত হাঁ এম্ এ, এ-জেড্'-এর লেখা কবিতা। তখন আমরা মেকী বিদ্রোহের বিরুদ্ধে চাবুক ধরেছি। ঠিক হ'ল, 'আমি বীর' বলে একটা বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখতে হবে। অশোক কোথা থেকে এক গাউন ও হুড্ পরা স্নাতকের ছবি জোগাড় করলেন। তাকে কিছু অদল বদল করে একটি অপরূপ বীরপুঙ্গবের ছবি খাড়া হল,—রোগা হাড্ডিসার, কোটরে ঢোকা দুই গাল, পড়ে পড়ে দুচোখে পুরু

কাচের চশমা,—হাঁ করে ধুঁকছে। ছবি দেখেই আমাদের প্রেরণা এসে গেল।

আমি শুরু করে দিলাম (একাদশ সংখ্যা, পৃঃ ২৭৪) ঃ "আমি বীর।

আমি দুর্জয় দুর্ধর্ষ রুদ্র দীপ্ত উচ্চশির
আমি বীর।
দুচোখে আমার দাবানল জ্বলে জ্বল্ জ্বল্ জ্বল্
স্তব্ধ বিশ্ব ইঙ্গিতে ভ্রূকুটির
আমি বীর! আমি বীর!!"·····

বারো তেরো লাইন লিখতে না লিখতে আমার হাত থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে অশোক শুরু করে দিলেন ঃ "ভাবী শ্বশুরের হিসাব খতিয়া
তরুণ বাঙালী-সাগর মথিয়া
উঠেছি যে আমি নিছক শুদ্ধ ক্ষীর!
আমি বীর! আমি বীর!!"·····

সজনী ততক্ষণে তৈরী। অশোকের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ঃ

"আমি ভাঙ্গি বেঞ্চি ও চেয়ার
আমি করি না কারেও কেয়ার
হৃদি নিয়ে আমি ছিনিমিনি খেলি
লাখ লাখ তরুণীর! আমি বীর!"·····

ব্যস! আয় যায় কোথা? অশোক এক প্যাঁচে সজনীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একেবারে ঝড়ের বেগে বাকী ১৪ লাইনে কবিতা শেষ ঃ "···আমি বীর।

দু'চোখে আমার প্রলয় জ্বলিছে
স্তব্ধ বিশ্ব ইঙ্গিতে ভ্রূকুটির! আমি বীর!!!"

হেমন্ত ফ্যাল্‌ফেলিয়ে চেয়ে রইলেন। আমরা কেউ আর 'চান্স্' পেলাম না।

কবিতা তো হ'ল। এখন নতুন কবির একটা নতুন নাম তো চাই। চট্ করে মনে পড়ে গেল পুরোনো মেসের প্রতিবেশী শ্রীসুধানলিনীকান্ত দে-র কথা।

আর ভাবতে হ'ল না। ছবির সঙ্গে তাল রেখে 'আমি বীর' কবিতার কবির নাম হ'ল,—'শ্রীঅবলানলিনীকান্ত হাঁ এম-এ, এ-জেড্' কবিতার সঙ্গে ছবিটিরও ব্লক ক'রে ছাপা হ'ল।

এই সচিত্র কবিতাটি ছাপা হ'বার পরে শ্রীসুধানলিনীকান্ত দে তাঁর প্রথমা "সুধা"-কে কায়েমীভাবে ঘরে বহাল রেখে বিনা অপরাধে সেই যে তাঁর দ্বিতীয়া

'নলিনী'-কে বনবাসে পাঠালেন, বেচারীকে আর কখনো গ্রহণ করলেন না। ব্যাপার দেখে শুনে কবি অবলানলিনীকান্ত হাঁ হয়েই রইলেন।

যৌথ খামারের মতো যৌথ কবিতা ও গদ্য সজনীকান্ত এইভাবে আমাদের সঙ্গে শনিবারের চিঠির আদি পর্বে আরো লিখেছেন।

তার মধ্যে ছিল, অসমাপ্ত বারোয়ারী উপন্যাস 'অতিক্রম'। অর্থাৎ পরের লেখক অতিক্রম ক'রে যাবেন আগের লেখককে। প্লট যতো উত্তরোত্তর বিদ্‌ঘুটে হয় ততই ভালো লেখকদের নাম,—কিম্ভূত, মেঘভূত, খোঁনাঁভূত, মাম্‌দো ভূত, হেটো ভূত, মেঠো ভূত, ইত্যাদি।

সাপ্তাহিক শনিবারের চিঠির এই ঔপন্যাসিক বারোয়ারী ভূতের দলে বিখ্যাত উপন্যাস লেখিকা শান্তা দেবীও বেনামীতে যোগ দিয়েছিলেন। সাপ্তাহিক শনিবারের চিঠির একটা মস্তবড়ো বিজয় হ'ল, মোহিতলাল মজুমদারের ধর্মান্তর গ্রহণ।

যে-মোহিতলাল ছিলেন অত্যন্ত 'সিরিয়াস্' প্রকৃতির মানুষ, গম্ভীর কবিতা ছাড়া কবিতা লিখতেন না, মাষ্টার মশাইয়ের বেত হাতে সমালোচনা করতেন, নবাগতের সঙ্গে নতুন আলাপ করতে করতে যাই জান্‌তে পারলেন তিনি পদ্মাপারের লোক, তাঁর সঙ্গে সাহিত্য আলাপন তৎক্ষণাৎ যিনি বন্ধ ক'রে দিতেন সেই গুরুগম্ভীর মোহিতলাল পর্যন্ত আমাদের পাল্লায় প'ড়ে রসিক হয়ে উঠলেন।

সজনীকে সম্বোধন ক'রে ত্রয়োদশ সংখ্যায় 'চামার-খায়-আম' ছদ্মনামে মোহিতলালের সর্বপ্রথম রসের কবিতা 'নব-রুবাইয়ত্' শনিবারের চিঠিতে ছাপা হ'ল। আরম্ভ (পৃঃ ৩৫৭) : "ঘাট থেকে হাটে চুব্‌ড়ী মাথায়

যেয়ো না, সজনি, যেয়ো না।
নিশি দিয়ে দাঁতে শুধু মুখে সখি
দোক্তা ও চুন খেও না।
তুমি যে আমার কবিতার বঁধু
বয়স-কালের চাক-ভাঙা মধু!
মৎস্যগন্ধা প্রেয়সী আমার
যেথা সেথা তুমি ধেয়ো না!
ঘাট হতে হাটে চুব্‌ড়ী মাথায়
যেয়ো না সজনি যেয়ো না।" ইত্যাদি।

মোহিতলালের এই ধরণের আরো রসালো কবিতা 'চিঠি'র সাপ্তাহিক সংস্করণে

ছ। শনিবারের চিঠিকে 'প্রভাবিত' করবার অনেক আগেই সাপ্তাহিক রের চিঠি গভীর প্রভাব বিস্তার করল সিরিয়াস কবি মোহিতলালের উপর। হিতলাল সাহিত্যিক ধর্মান্তর গ্রহণ করলেন, গভীর কবি হ'লেন রসিক কবি। রসের ছোঁয়াচ লাগল মোহিতলালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শনিমণ্ডলস্থ নবাগত সংস্কৃত ণ্ডত ডক্টর সুশীলকুমার দে-র গায়ে-তিনি বেদ-বেদান্ত, তন্ত্র পুরাণ, ষড়দর্শন নব্য-ায়, মনুস্মৃতি ছেড়ে সংস্কৃত-সংস্কৃতির প্রেমের অমর কবি অমরুর বাছা বাছা রসসিক্ত কবিতাগুলির বাংলা অনুবাদ করলেন। একটা নয় দু'টো নয়, একেবারে 'সেঞ্চুরি আপ্'। পরে, এগুলি 'অমরুশতক' নামে বই হ'য়ে বেরিয়েছে।

শনিবারের চিঠির আদি পর্বের শুধু হাল্কা দিকের সামান্য কিছু লিখলাম। এখনো অনেক আছে। কিন্তু তা ছাড়াও বাংলার সাহিত্যিক, সামাজিক রাষ্ট্র-নৈতিক ইতিহাসে সাপ্তাহিক শনিবারের চিঠির ও শনিমণ্ডলের একটা উল্লেখযোগ্য আসন আছে। 'কল্লোল যুগ' নিয়ে যেমন বই বেরিয়েছে ও বেরুনো উচিত, শনিবারের ইতিহাসও তেমনি লিপিবদ্ধ হওয়া দরকার।

শনিবারের চিঠি ভুঁইফোড় জন্মায় নি। সে-সময়ের যুগ-প্রয়োজনেই সে জন্মেছিল।

কারো একার জন্য নয়, গোটা শনিমণ্ডলের জন্যই 'চিঠি'র নাম হয়েছিল। সেই শনিমণ্ডলের পূর্ণ পরিচয় আজো চাপা পড়ে আছে। গোড়ার দিকে প্রায় সকলেই ছদ্মনামে লিখতেন ব'লে, কে-কে লিখতেন, কে-কোনটা লিখেছেন, কেন লিখেছেন, সে-কথা সাধারণের অজ্ঞাত।

সেই সব শক্তিমান লেখকের নামের ও লেখার পরিচয় আজ জানা দরকার হয়েছে।

সাহিত্য আলোচনা এমনকি সাহিত্যিক দারোগাগিরিই শনিবারের চিঠির জন্মের একমাত্র তাগিদ ছিল না। কিন্তু সে কথা বুঝতে গেলে সে-সময়ের সামগ্রিক পটভূমিকার আলোচনা প্রয়োজন।

দুঃখের বিষয়, সাপ্তাহিক ও প্রথম দিকের মাসিক ('নবপর্যায়') শনিবারের চিঠি আজ অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে পড়েছে। যদি তার সন্ধান পাই ও ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ হয়, তবে সেই মূল্যবান ইতিহাস রচনার ইচ্ছা রইল।

পাঠকের মত

"রবীন্দ্রজীবনে কাদম্বরী দেব

ভাস্কর ব

প্রবন্ধ পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় শ্রীযুক্ত আদিত্য ওহদেদার লিখিত 'কবি জীবনে কাদম্বরী' প্রবন্ধটি সম্পর্কে নিম্নলিখিত বক্তব্য জানানো প্রয়োজন। আশা করি পত্রখানি প্রবন্ধে প্রকাশ করে আমাকে অনুগৃহীত করবেন।

আমার বক্তব্য, 'কবিজীবনে কাদম্বরী' প্রবন্ধটি 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় প্রকাশিত অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের 'কবিমানসী' পড়ে লেখা। ওহদেদার মহাশয় অধ্যাপক ভট্টাচার্যের বক্তব্য ও সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেছেন, অথচ কোথাও অধ্যাপক ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ করেন নি।

'কবি মানসী' শনিবারের চিঠিতে ১৩৬৪ সালের অগ্রহায়ণ থেকে ১৩৬৬ সালের আষাঢ় এবং ১৩৬৮ সালের আষাঢ় থেকে ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এই আলোচনা সাম্প্রতিক কালে রবীন্দ্রমানস ও রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এক গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করেছে এবং অনেকের বিশ্বাস এর প্রভাবও সুদূরপ্রসারী। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের বক্তব্য প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। যতদূর মনে পড়ছে সেখানেই তিনি প্রথম 'রাবীন্দ্রিক প্লেটোনিজম্' কথাটি ব্যবহার করেছেন [কথাটি শ্রীওহদেদারের প্রবন্ধেও দেখা গেল ও এমন কি, 'কবি মানসী' শব্দটি পর্যন্ত!] প্লেটোনিক প্রেমের আলোকে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা তত্ত্বের আলোচনাও অধ্যাপক ভট্টাচার্যই প্রথম করলেন। বেয়াত্রিচের প্রতি দান্তের প্রেম এবং লরার প্রতি পেত্রার্কার প্রেমের সঙ্গে কাদম্বরী দেবীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ানুরাগের তুলনাও অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের আলোচনায় সর্বপ্রথম দেখা গেছে। "আসলে জীবনদেবতাতত্ত্বই রবীন্দ্র জীবনতত্ত্ব এবং কবি প্রেমিকের মানসলক্ষ্মীই তাঁর জীবনদেবতা" শনিবারের

[illegible]তে প্রকাশিত অধ্যাপক ভট্টাচার্যের কবিমানসীর এই বিপ্লবী প্রতিপাদ্য [illegible]ধু তাঁর মৌলিক চিন্তারই পরিচায়ক নয়, এই সিদ্ধান্ত গৃহীত ও স্বীকৃত হলে রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনায় সম্ভবত যুগান্তর উপস্থিত হবে।

১। অধ্যাপক ভট্টাচার্য তাঁর আলোচনার প্রথম অধ্যায়েই লিখেছেন,

"রবীন্দ্রনাথ একদিন 'বৈষ্ণব কবিতায়' রসিক চিত্তের কৌতূহল নিয়ে বৈষ্ণব কবির উদ্দেশে একটি জিজ্ঞাসাকে কাব্যচ্ছন্দে গ্রথিত করেছিলেন। কবির জিজ্ঞাসা ছিল :

সত্য ক'রে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
... ...
এত প্রেমকথা,
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা,
চুরি করি লইয়াছ, কার মুখ কার
আঁখি হতে ?

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও আমাদের একই জিজ্ঞাসা।" শ. চি. অগ্রহায়ণ ১৩৬৪]

শ্রীযুক্ত ওহদেদারও তাঁর প্রবন্ধ আরম্ভ করেছেন এই ভাবে—

"পরম উৎসুক হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বৈষ্ণবকবিতায় বৈষ্ণবকবিদের প্রশ্ন করেছেন—

সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
... ...
চুরি করি লইয়াছ, কার মুখ, কার
আঁখি হতে ?

এমন প্রশ্ন কবি এত স্পষ্টভাবে করতে পেরেছেন, তার কারণ তিনি তাঁর নিজেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বুঝতে পেরেছিলেন যে বৈষ্ণব কবিতায় কবিরা আপন অন্তরের প্রেম রসোপলব্ধিকেই রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন।"

২। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের কবিমানসী থেকে : "দান্তের জীবনে রেখাচিত্রে এবং পেত্রার্কার জীবনে লরার আবির্ভাবের মত রবীন্দ্রজীবেনেও তাঁর মানসলক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটেছিল।" [শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৬৩]

শ্রীযুক্ত ওহদেদার—

"কবিজীবনে কাদম্বরী ছিলেন প্রেমোপলব্ধি ও কাব্য সৃষ্টির প্রের লীলাময়ী মানসী মূর্তি। ··যেমন দান্তের বিয়াত্রিচে, অথবা পেত্রার্ক-এর লরা।

৩। 'কবি-মানসী'র দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম বাক্য: "রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাদাত্রী দেবী মানবী মূর্তিতে মহর্ষিদেবের শুদ্ধান্তঃপুরে প্রবেশ করলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বধূরূপে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহ হয় ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ২৪শে আষাঢ় অর্থাৎ ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুলাই। [শ. চি. পৌষ ১৩৬৪]

শ্রীযুক্ত ওহদেদার তাঁর প্রবন্ধেও দ্বিতীয় পর্বের প্রথম বাক্যে' বলেছেন—

"কাদম্বরী বালিকা বধূরূপে ঠাকুর বাড়ির অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন ১২৭৫ সালের ২৩শে আষাঢ়।"

৪। শনিবারের চিঠির ঐ সংখ্যাতেই—

"কাদম্বরী যেদিন ঠাকুর বাড়িতে নতুন বউ হয়ে এলেন সেদিন মহর্ষি ভবনে সেকাল ও একালের সন্ধিলগ্নের ভাঙন গড়নের কাজ চলচে।"

ওহদেদার মহাশয় লিখেছেন— "বাড়িতে তখন একাল ও সেকালের বিরোধ সুরু হয়ে গেছে, ভাঙা-গড়ার কাজ চলছে।"

৫। "গাঙ্গুলি বাড়ির অষ্টমীর শশিকলা যেদিন ঠাকুর বাড়ির অভিনব পরিবেশ, প্রেরণা ও শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে উঠলেন, সেদিন তাঁর সেই জ্যোতির্ময়ী মূর্তির ধ্যানে বিহ্বলচিত্ত সে যুগের কবিগুরু বিহারীলাল তাঁর বন্দনাগীতি রচনা করে বললেন.

তুমি প্রভাতের উষা,
স্বর্গের ললাট ভূষা,
ব্রহ্মার মানসসরে প্রফুল্ল নলিনী গো!

বাঙলার সারস্বতসত্রে বিহারীলালের কবিকণ্ঠে তাঁর প্রেরণাদাত্রীরূপে কাদম্বরী দেবী এই বাগ্ময়ী দেবীমূর্তিতেই অমর হয়ে রয়েছেন।"

[শনিবারের চিঠি, পৌষ ১৩৬৪]

"কাদম্বরীর মহিমাময়ী প্রেরণাদাত্রীরূপে মুগ্ধ বিহ্বল হয়ে কবি বিহারীলাল গেয়ে ওঠেন: তুমি প্রভাতের উষা,
স্বর্গের ললাট ভূষা
ব্রহ্মার মানস সরে প্রফুল্ল নলিনী গো।" [প্রবন্ধ পত্রিকা, ফাল্গুন ১৩৬৮]

৬। অধ্যাপক ভট্টাচার্যই প্রথম বিহারীলালের 'সাধের আসনে'র প্রতি-অঙ্গুলি নির্দেশ করে প্রমাণ করলেন যে, কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার জন্য রবীন্দ্রনাথ দায়ী নন, বিহারীলাল এজন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেই দায়ী করেছেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য লিখছেন—

"জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনাদর ও অবহেলার জন্য কাদম্বরী দেবী মৃত্যু বরণ করেছেন, এই প্রত্যয়ে বিহারীলাল এত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, কাব্যের আবেশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর ভর্ৎসনা সংযমের সীমানা লঙ্ঘন করেছে।..... পত্নীর মৃত্যু সম্পর্কে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেই যে দায়ী করেছেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।" [শনিবারের চিঠি অগ্রহায়ণ ১৩৬৫]

শ্রীযুক্ত ওহেদদার লিখছেন,

"স্পষ্টই দেখছি বিহারীলাল কাদম্বরীর আত্মহত্যার জন্য কাদম্বরীর স্বামীকেই দায়ী করেছেন। এবং স্বামীর দোষ কোথায় তার প্রতিও ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট ও তীব্র।"

৭। অধ্যাপক ভট্টাচার্য কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি গান ['তোর বসে গাঁথিস মালা'] উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন—

"এর ভাববস্তু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথেরও অনুযোগ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে। 'তোরা' এবং 'তারা'র বহুবচনের দ্বারা সাধারনীকৃতির চেষ্টা স্বত্বেও তরুণ কবির লোভ 'কেন' ও 'কোথায়' তা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর নয়।" [শনিবারের চিঠি অগ্রহায়ণ ১৩৬৫]

শ্রীওহদেদারও ঐ একই গান উদ্ধৃত করে বলছেন,

"এখানে বক্তব্য বহুবচনের দ্বারা সাধারণীকৃত হয়েছে, কিন্তু বহুবচনের আবরণটি ভেদ করলেই বোঝা যায় যে, কাদম্বরীর আত্মহত্যায় শোকতপ্ত হ'য়ে রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেই দায়ী করেছেন।"

৮। 'কবিমানসী' প্রবন্ধে পাই—

"কবি তরুণ বয়সে দান্তের জীবনে বেয়াত্রিচের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, 'বিয়াত্রীচেই তাঁহার (দান্তের) সমুদয় কাব্যের নায়িকা, বিয়াত্রিচেই তাঁহার জীবন কাব্যের নায়িকা। বিয়াত্রিচেকে বাদ দিয়া তাঁহার কাব্য পাঠ করা বৃথা, বিয়াত্রিচেকে বাদ দিলে তাঁহার জীবনকাহিনী শূন্য হইয়া পড়ে! তাঁহার জীবনের দেবতা বিয়াত্রীচে তাহার সমুদয় কাব্য

স্তোত্র।'..... "তাহার জীবনের দেবতা বিয়াত্রীচে,-এই বাক্যটিতে আছে দৈবে পাওয়া একটি দিব্য সংকেত। জীবনের দেবতা কথা দুটি সমাসবদ্ধ ও সংশ্লিষ্ট হলেই হয় 'জীবন দেবতা'। কিন্তু বেয়াত্রিচে খ্রীষ্টভক্ত দান্তের দেবতা ছিলেন না। তবু ত্রিভুবন পরিক্রমায় তিনিই ছিলেন দান্তের কর্ণধার। রবীন্দ্রজীবনের বেয়াত্রিচেও এই অর্থেই তাঁর জীবন দেবতা, এই অর্থেই তাঁর কর্ণধার।" [শনিবারের চিঠি, ভাদ্র, ১৩৬৮]

শ্রীযুক্ত ওহদেদার তাঁর প্রবন্ধের উপসংহারে লিখছেন,

"বালক বয়সে রচিত প্রবন্ধে কবি বলেছিলেন, দান্তের জীবনদেবতা হলেন বিয়াত্রিচে। কবির নিজের ক্ষেত্রেও কাদম্বরী বুঝি তাই।"

পত্র দীর্ঘ হয়ে গেল, যদিও দীর্ঘতর করার আরও সাদৃশ্যমূলক দৃষ্টান্ত ছিল। সম্পর্কে প্রবন্ধকারের এ বক্তব্য শোনার জন্য আগ্রহান্বিত রইলাম।

এই অপ্রিয় প্রসঙ্গটি উত্থাপন করার আরও একটি কারণ আছে। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিশ্বভারতীর ঘনিষ্ঠ মহলের জনৈক লেখকের একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানেও রবীন্দ্রপ্রতিভার নেপথ্যবর্তিনী প্রেরণারূপে কাদম্বরী দেবী-র প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধটির পাদটীকায় 'সরোজিনী প্রয়াণ' নামক বিচিত্র প্রবন্ধের রচনাটি সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকারের 'বিভ্রান্তি' প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্যই প্রথম শনি[১] চিঠিতে [১৩৬৫-র অগ্রহায়ণ] উক্ত প্রবন্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনী-লেখকের 'বিভ্রান্তি'-র কথা বিস্তারিত আলোচনা করেন। অথচ উক্ত গ্রন্থের লেখক কোথাও অধ্যাপক ভট্টাচার্যের নামোল্লেখ করেন নি। গবেষণার ক্ষেত্রে পূর্বসূরীর নাম উল্লেখের রীতি বাঙলা সাহিত্য থেকে অপসারিত হচ্ছে, এটি মোটেই সুলক্ষণ নয়।

প্রবন্ধ পত্রিকা

বর্ষসূচী : লেখক-অনুক্রম। বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৬৮

[সংকেত : বৈশাখ=ব, জ্যৈষ্ঠ=জ, আষাঢ়=আ, শ্রাবণ=শ, ভাদ্র-আশ্বিন=ভ, কার্তিক=ক, অগ্রহায়ণ=অ, পৌষ=প, মাঘ=ম, ফাল্গুন=ফ, চৈত্র=চ। রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ=*]

অচ্যুত গোস্বামী	রাষ্ট্র ও স্বাধীনতা	ক	১
অজয় ভট্টাচার্য	* রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভূমিকা	জ	৯৩
অতীন্দ্রনাথ বসু	নায়কের মৃত্যু	অ	৭৭
অদিতিনাথ রায়	হেমিংওয়ের মৃত্যু : একটি জল্পনা	ফ	৯৬
অনিমেষ পাল	সাধু ভাষার প্রসঙ্গে	ক	৭৪
অধীর চক্রবর্তী	ভারতীয় প্রাচীন সমাজেতিহাস	ম	৮২
অরুণ সান্যাল	গুপ্ত কবি ও বাংলার নব-জাগৃতি	আ	৭২
	কবিওয়ালাদের যোগ্য ভূমিকা	চ	২১
অনাদি লাহিড়ী	সার্ত্রীয় দর্শনের ভূমিকা	চ	৫২
অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়	আদিবাসী সমাজজীবনের স্বরূপ	প	১১
অনিরুদ্ধ ঘোষ	সাম্প্রতিক কাব্যনাট্য	চ	৬৫
অমলেন্দু ঘোষ	বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধানচর্চার এক অধ্যায়	ম	৩১
অশোক মুস্তাফি	* রবীন্দ্র দর্শন : সমাজ ও কাল	জ	১০৩, আ ৪৪
	একজন বিস্মৃত চিন্তানায়ক ও স্ত্রী স্বাধীনতা	প	৯১
অশোক ভট্টাচার্য	ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব প্রসঙ্গে	ফ	৪৫
আই. সেদফ	লেবেদফ	অ	২১
আদিত্য ওহদেদার	* রবীন্দ্র দৃষ্টিতে 'কল্পনা'	ব	১৬১
	* অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ	ভ	১১৬
	* কবি জীবনে কাদম্বরী	ফ	১২
আনন্দ দে	* রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এজরা পাউণ্ড	ব	৬২
আর্নেস্ট হেমিংওয়ে	উপন্যাস শিল্প প্রসঙ্গে	আ	৮০
আর. পি. ভাস্কর	* ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ	জ	১৩
আবুল ফজল	জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ	ভ	৬৭
আঁদ্রে জিদ্	* ফরাসী গীতাঞ্জলির ভূমিকা	ব	৮১
ই. এম. ফরস্টার	* রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'	আ	১০১
	* রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা'	আ	১০৪
ই. গোরেফ	রাষ্ট্রসংঘ ও প্রাকৃতিক সম্পদ	ম	৮২

উইলিয়ম আর্চার	* রবীন্দ্রনাথের ছবি	ভ	১৬১
এম্. বাগ্‌লাই	'শ্রেণীশান্তি' ও ধনতান্ত্রিক বাস্তবতা	চ	৩৮
কৃষ্ণ ধর	* রবীন্দ্রনাথ : পশ্চিমের জানালায়	ভ	৯২
গুরুদাস ভট্টাচার্য	বাংলাসাহিত্যের যুগবিভাগ	ক	৮৪
	* একতা : রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ সংখ্যা	ম	৫৮
গিরিশংকর	* রক্তকরবীর শিল্পরূপ	প	৭৫
গৌতম চট্টোপাধ্যায়	এক্ষণ : ইতিহাসসংখ্যা	প	৮৬
চিত্তরঞ্জন ঘোষ	বাংলাদেশের লোকচর্যার এক অধ্যায়	আ	১
	* রবীন্দ্রোত্তর নাটক : ভূমিকা	প	৬৭
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	ইভো আন্দ্রিচ্	ম	৬৩
জিতেন্দ্র ঘোষ	* রবীন্দ্রনাথের কথাশিল্প	জ	৯৩
জগন্নাথ গুপ্ত	সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপরিচয়	শ	৯৫
জে.বি.এস. হলডেন	মানবপ্রকৃতির পরিবর্তন কি সম্ভব	ভ	১৮২
জগদীশ ভট্টাচার্য	জীবনানন্দ দাশের অপ্রকাশিত দুটি পত্র ও চারটি কবিতা	ম	৭
তরুণ সান্যাল	হে নক্ষত্রবীথি	ভ	১৬৪
দেবীপদ ভট্টাচার্য	* অচলায়তন	ব	২৬
	হেমিংওয়ে প্রসঙ্গে	প	১০৫
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	* রবীন্দ্রনাথের জাতিচেতনা	ব	১৩
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	মার্কসবাদে তত্ত্ব ও প্রয়োগ	শ	৬৫
দেবব্রত চক্রবর্তী	প্রকল্পনা ও বিকল্পনা	ক	৫৪
দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য	সাহিত্য ও প্রতীচী	অ	২৪
	উপন্যাস ও প্রিস্ট্‌লে	ম	১২
ধূর্জটিপ্রসাদ	* মুখোপাধ্যায় পাঁচজন লেখক	ব	১৩
সমাজধর্ম ও সাহিত্য		আ	৩৫
নিখিল চক্রবর্তী	* ঐতিহ্যর উত্তরাধিকার	ব	১৬৯
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	আর্নেস্ট হেমিংওয়ে	ভ	২৯
	নতুন গল্পের কথা	অ	১
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	* আমায় হয়তো করতে হবে আমার লেখার সমালোচন	ব	১৭
প্রণবেশ সেন	* গল্পগুচ্ছে মৃত্যু	জ	৭৩
প্রফুল্লচন্দ্র রায়	অপ্রকাশিত পত্র	শ	২
	প্রাচীন হিন্দুদিগের রসায়ন-শাস্ত্রজ্ঞান	শ	৩
প্রসন্নময় লাহিড়ী	রূপের আলোকে কবি-সংগীত	চ	১
বিপিনচন্দ্র পাল	* রবীন্দ্রনাথ	ব	৩৩

...জিতকুমার দত্ত	* দুটি সমালোচনা	ব	১৪২
...সব সরকার	* রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিচিন্তা	জ	১৭
	নিরপেক্ষবাদের রাজনীতি	ভ	১২৬
...র্ণিক রায়	* রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য	আ	৯০
...দ্ধবান্ধব উপাধ্যায়	* নৈবেদ্য	শ	৯৯
...লা দত্তগুপ্ত	'কালো' কবিতা	অ	৫
...ষ্ণুপদ ভট্টাচার্য	ভক্তিরসরাজ ত্যাগরাজ	প	২৬
	তামিল কবি কম্বন্	ফ	৫৬
...শ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায়	* বিজ্ঞানশিক্ষা ও রবীন্দ্রনাথ	প	৯৯
...ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	সজনীকান্ত : গ্রন্থপঞ্জী	ফ	৫১
ভাস্কর বসু	* অভিজ্ঞতার নদীতীরে	ব	১১৬
	* রবীন্দ্রজীবনে কাদম্বরী দেবী	চ	১০১
ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ	আচার্য স্মৃতি	শ	২১
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত	বাংলার নবজন্ম	ম	১
মহম্মদ শহীদুল্লাহ	পুণ্যস্মৃতি	শ	১৯
মিহির আচার্য	নতুন রীতি না রীতির নূতনত্ব	চ	৭৪
মৃণালকান্তি ভদ্র	* রবীন্দ্র-আলোচনা	শ	৯১
	জঁা পল সার্ত্র : অস্তিবাদ ও স্বাধীনতা	ভ	১৪১
	সার্ত্রের দর্শন : আমি ও সে	অ	৫০
	রবীন্দ্রদর্শনে বিবর্তন	ব	৬৭
...নাথ সরকার	* বাবু রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প	ভ	৩
...গানন্দ দাস	সজনীকান্ত ও শনিবারের চিঠি	চ	৮১
...ন্দ্রনাথ ঠাকুর	* অপ্রকাশিত পত্র	ব	১
	* অপ্রকাশিত কবিতা	ব	১১
	* অপ্রকাশিত চিঠি	জ	১
	* অভিনন্দন	শ	১৭
...থীন্দ্রনাথ রায়	* রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূত	ব	১
	* রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূত	জ	
	* রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি	ভ	৫
	* 'ঘরে বাইরে'	প	১
	* রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ'	ফ	১
...ন্দ্রনাথ গুপ্ত	* উপন্যাসে আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ	জ	৩৬
...শেখর বসু	অপ্রকাশিত পত্র	ভ	১
...প্রসাদ সেনগুপ্ত	ইংরাজী একাংক	ভ	১০২
...রেও আঁতোয়া	* আমার রবীন্দ্রনাথ	ভ	১৮৬

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত	সাম্প্রতিক ছোটগল্প	অ	৮
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	মনোবিদ্ ইয়ুং	শ	
শশিভূষণ দাশগুপ্ত	আধুনিক জগৎ ও হিন্দুধর্ম	ভ	
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	ভারতে জৈনধর্ম	ভ	২
শান্তি সিংহ রায়	* রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা	ভ	১
	* নামে বাঁধিবারে চাই, না মানে নামের পরিচয়	ব	৪
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়	হেমিংওয়ে	ক	৩
সুধীর করণ	* রবীন্দ্রনাথ ও কুন্তক	ব	২
সত্যজিৎ চৌধুরী	* রবীন্দ্রনাথের নাটক : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ	ব	১০
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	* রবীন্দ্রনাথ : অপরাজেয় পথিকৃৎ	ব	১৪৭
সরোজ আচার্য	* রবীন্দ্রনাথ : চার অধ্যায়	জ	৪৪
সুনীল চক্রবর্তী	* তিনসঙ্গীর স্বরূপ ও সামগ্রিকতা	জ	৫৬
	তারাশংকর : ছোটগল্পে	ম	৩৭
সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ	আধুনিক ফরাসী কবিতা	আ	৫২
সুধাংশু ঘোষ	গ্রেহাম গ্রীনের সাম্প্রতিক উপন্যাস	শ	৫৮
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	সঙ্গীতের ভাষা	ভ	২৫
সত্যজিৎ রায়	ইতালীয় ফিল্ম	ভ	৮০
সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	কালীঘাটের পট	ভ	১০৭
সৈয়দ আলী আহ্সান	মেঘনাদ কাব্যে উপমা	ক	৯৭
সরোজ গঙ্গোপাধ্যায়	প্রাচীন ভারতে শ্রেণী সংগ্রাম	অ	
সুভাষ সরকার	কাব্যনাট্য ও 'চারচোখ'	প	
সমীর কুমার মুখোপাধ্যায়	সাম্প্রতিক ছোটগল্প	ফ	
হরপ্রসাদ মিত্র	* রবীন্দ্রনাথের গল্পরচনা	ব	
হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	প্রাচীন ভারতীয় রসায়ন	শ	
হারাণচন্দ্র নিয়োগী	প্রাচীন প্রাচ্যে ইতিহাসচর্চা	ক	৭
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	* "বালক"	ফ	২৪
[illegible]তীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	পশ্চিমবঙ্গে জাতিভেদপ্রথা	ভ	